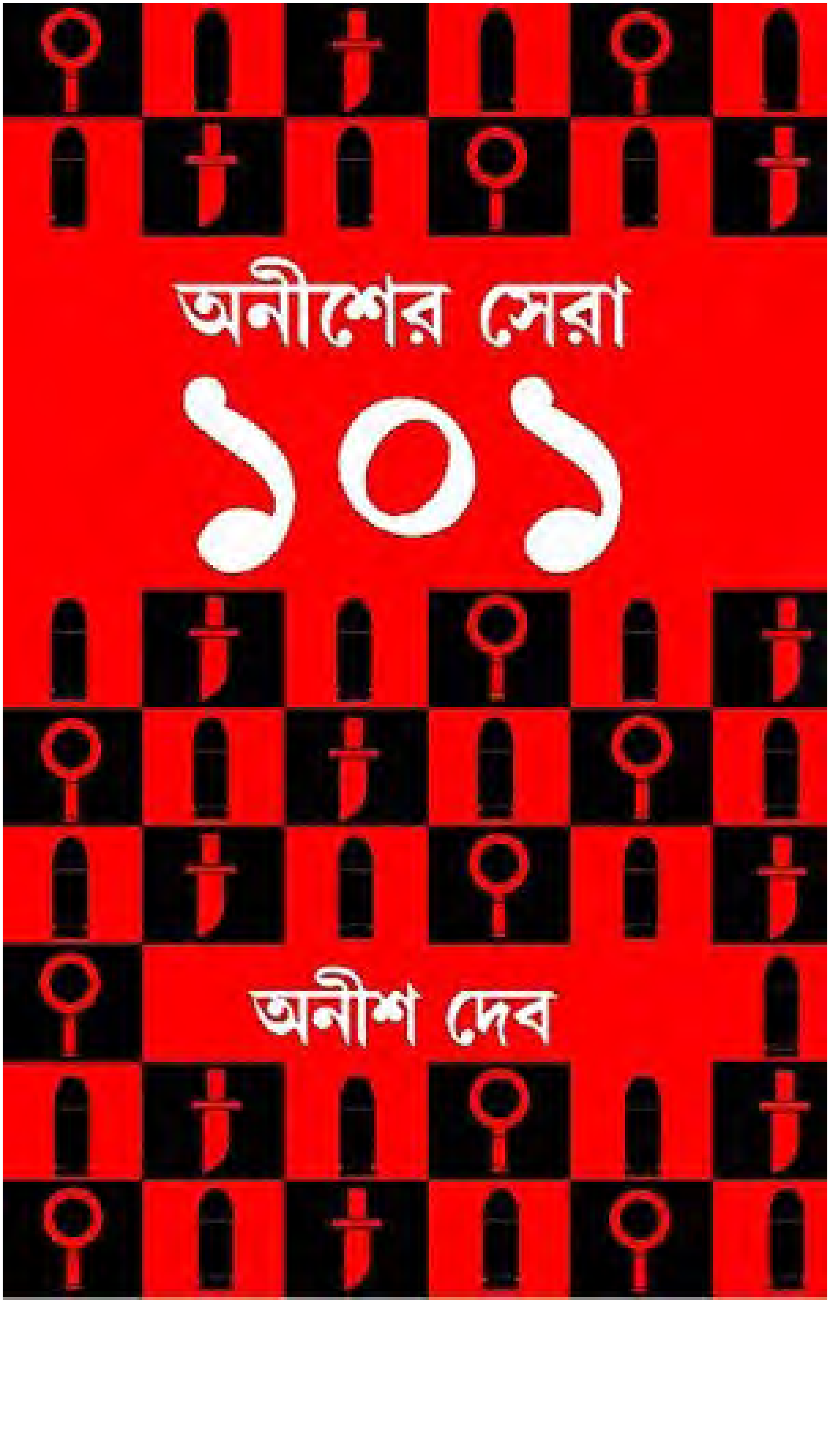
# অনীশের সেরা ১০১

অনীশ দেব


অনীশের সেরা
১০১
অনীশ দেব

# অনীশের সেরা ১০১

## অনীশ দেব

# Table of Contents

# Suggested eBook Reader

◇ Android ◇

Lithum / Moon Reader

◇ Desktop ◇

Calibre

◇ Apple ◇

iBooks

# Acknowledgment

করোনা প্রকোপের লকডাউনে বসে পাইথন শেখার প্রক্রিয়ায় বানানো বইগুলি।

Without many open source codes, projects available at Github and StackOverflow this would not have been possible. Cheers to those contributors. And of course to eBanglaLibrary..

For any ideas/suggestions on books, you would like to get implemented go to @bongboi or @boibongo_req

আরও ইপাব বা মোবি বই পেতে জয়েন করুন টেলিগ্রাম-এ @bongboi / @kindlebengali তে।

# ◇ Contributor ◇

This ebook is auto generated using python. Some parts/fonts may be broken. If you find such please improve and submit or report to telegram.

# ◇ Disclaimer ◇

⚠

# আমার বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল

**আমার বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল**

মৌমিতাকে আমার বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলের আসল ব্যাপারটা খুলে বলিনি। কারণ, খুলে বলাটা খুব সহজ নয়। কিন্তু ও যে বারবারই আমার বাঁ-হাতের দিকে তাকায় সেটা আমি লক্ষ করেছি। এখনও দেখছি, ও কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমার বাঁ-হাতের দিকে চেয়ে আছে।

আমি বাঁ-হাতে সবসময় সাদা দস্তানা পরে থাকি। কাপড়ের দস্তানা। ঠাটবাটওলা রেস্তোরাঁয় বেয়ারারা যেমন পরে থাকে। এখনও আমাদের টেবিলের আশেপাশে দু-তিনজন বেয়ারা এরকম সাদা দস্তানা পরে আছে।

মৌমিতাকে আজ ডিনার খাওয়াতে দ্য অর্কিড-এ নিয়ে এসেছিলাম। ই এম বাইপাসের ধারে এই দ্য অর্কিড রেস্তোরাঁটা মন্দ নয়। এখানে জগঝম্প নাচ-গান নেই। তার বদলে শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ। খুব সফট টোনে খুশির মুড তৈরির মিউজিক বাজছে। এসি-র তীব্রতা প্রায় শীত করার মতো। বেশিরভাগ টেবিলই ভরতি থাকলেও কারও কথা শোনা যাচ্ছে না। সবাই নিশ্চয়ই নীচু গলায় কথা বলছে। আমাদেরই মতো।

একটা কথা জিগ্যেস করব? মৌমিতা হঠাৎ মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

করো। আমি জানতাম ও কী জিগ্যেস করবে।

তুমি বাঁ-হাতে সবসময় গ্লাভস পরে থাকো কেন?

গ্লাভস নয়–গ্লাভ বলো… হেসে বললাম আমি, আমি তো শুধু বাঁ-হাতে পরেছি–দু-হাতে পরিনি।

তুমি আনসারটা এড়িয়ে যাচ্ছ। কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বায়নার সুরে ও বলল, বলো না! বলতে কোনও প্রবলেম আছে?

আমার মনটা হঠাৎ কেমন-কেমন হয়ে গেল। প্রবলেম? ভালো কথাই বলেছে মৌমিতা। প্রবলেম নেই আবার!

একহাতে দস্তানা পরে থাকি বলে অনেকের কাছেই আমাকে জবাবদিহি করতে হয়। কাউকে বলি, এটা আমার এক বিচিত্র শখ। কাউকে বলি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময় এই অভ্যেসটা ডেভেলাপ করেছে। আবার কাউকে বা তিতিবিরক্ত হয়ে বলি, আমার বাঁ-হাতে স্কিন ডিজিজ আছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কী সেটা একজন ছাড়া কাউকে বলিনি–অন্তত এখনও। কৌতূহল থাকাটা দোষের নয়। সুতরাং মৌমিতার কোনও দোষ নেই। ব্যাপারটা ওর জানতে ইচ্ছে করতেই পারে। তাই ওর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, মৌ, বলতে কোনো প্রবলেম নেই। তবে..মানে…এর পেছনে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে…।

ও বড়-বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই? তা হলে বলো প্লিজ…।

রেস্তোরাঁর ছায়া-ছায়া আলোয় আমি ওকে ভালো করে দেখতে চাইলাম।

মৌমিতা। লম্বা স্লিম চেহারা। মাথার একরাশ চুলে সোনালি রঙের ঝিলিক। লম্বাটে ফরসা মুখ। টানা-টানা চোখ। এই চোখে চোখ পড়লে নজর ফেরানো যায় না। চোখা নাক। সামান্য ফোলা দু-ঠোঁট যেন সবসময়েই দুষ্টু হাতছানি দিচ্ছে।

মৌমিতাকে আমি ভালোবাসি। খুব সাধ ওকে নিয়ে বাকি জীবনটা একসঙ্গে থাকব। আমার ভেসে-বেড়ানো দিকশূন্য ছন্নছাড়া জীবনে ও সারথি হয়ে আসুক। আমাকে সামলে নিক। আমার সুখ-দুঃখের শরিক হোক। আমার অভিভাবক হয়ে উঠুক।

মৌমিতাকে এখনও এসব কথা বলিনি। দস্তানার গল্পটা বলার পর বলব। মনে হয় না ও আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

আমি বেয়ারাকে ডেকে বিল দিতে বললাম। তারপর মৌ-কে চাপা গলায় বললাম, এখানে নয়–গল্পটা তোমাকে গাড়িতে যেতে-যেতে বলব।

ও খুব খুশি হল। কোল্ড ড্রিঙ্কের খালি গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, সোনু, আই লাভ য়ু…।

আমি বললাম, গল্পটা তো এখনও শোনোনি…আগে শোনো…তারপর…।

বিল মিটিয়ে আমরা দুজনে উঠে পড়লাম। রেস্তোরাঁর কাচের দরজার কাছে এসে দেখি বৃষ্টি পড়ছে–তবে তেমন জোরে নয়। আমি আর মৌ হাত ধরাধরি করে ছুট লাগালাম গাড়ি লক্ষ করে।

গাড়িতে গুছিয়ে বসার পর মৌ বলল, বৃষ্টিটা হেভি রোম্যান্টিক–তাই না?

তুমি পাশে থাকলে আমার কাছে মরুভূমিও রোম্যান্টিক লাগবে।

হোয়াও! বলে আমার জামা ধরে টান মারল মৌ। ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে ছোট্ট ঠোকরানো চুমু খেল গালে।

জানলার কাচ তোলাই ছিল। হালকা করে এসি চালিয়ে দিলাম। তারপর পার্কিং লট থেকে গাড়ি তুলে নিয়ে এলাম বৃষ্টিভেজা রাস্তায়।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল।

বৃষ্টির জন্যে রাস্তা দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে ওয়াইপার চালিয়ে দিলাম। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে চোখ গেল। আটটা ঊনচল্লিশ।

নাঃ, রাত বেশি হয়নি। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে মৌ-কে বাড়িতে পৌঁছে দিলেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাইডরোডে ঢুকে পড়লাম। এ-রাস্তাটায় গাড়ি-টাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। দোকানপাটও চোখে পড়ছে না। আলো বলতে রাস্তার দুপাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর সোডিয়াম বাতি।

মৌমিতার দিকে তাকিয়ে বললাম, এই দস্তানার ব্যাপারটা তোমার অনেকদিন ধরেই জানতে ইচ্ছে করছে, তাই না?

হ্যাঁ। য়ু আর স্মার্ট, সোনু। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই এটা আমার কাছে একটা বিশাল কিউরিয়োসিটি…। আজ কৌতূহল চাপতে না পেরে তোমাকে স্ট্রেটকাট জিগ্যেস করে ফেলেছি..। হঠাৎ কী ভেবে ও বলল, তুমি কি মাইন্ড করলে, সোনু? তা হলে থাক…।

ওহহো, কী যে বলো! হোয়াই শুড আই মাইন্ড? কথা বলতে-বলতে ঝুঁকে পড়ে ওর মাথায় একটা চুমু খেলাম ও তোমাকে সবকিছু খুলে বলতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, গল্পটা শুনলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না।

উত্তরে মৌ আমার দস্তানা-পরা আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল। প্রায় ফিশফিশ করে বলল, আই উইল বিলিভ এনিথিং য়ু সে।

ভালোবাসা এমনই জিনিস, আজগুবি রূপকথাও বিশ্বাস করতে মন চায়।

রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়ে ঝোঁপজঙ্গল ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালাম। মৌমিতা তাতে অবাক হল না। কারণ, আগেও এরকম ফাঁকা স্পটে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়েছি। এবং মৌমিতা আর আমি গাড়ির মধ্যে খুশিমতন হুটোপাটি করেছি। ইংরেজিতে একেই বোধহয় হেভি পেটিং বলে। আজও গল্প-টল্প বলা হয়ে গেলে ওসবে মন দেওয়া যাবে।

গাড়ির চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। জানলার কাচ বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। ওয়াইপার দুটো প্রাণপণে উইন্ডশিল্ডের জল সরাচ্ছিল। ওদের চলার তালে-তালে মোটরের মিহি শব্দ হচ্ছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই মেঘের ডাক শোনা গেল।

আমি গল্পটা বলতে শুরু করলাম।

.

মৌ তোমাকে কখনও বলা হয়নি…মানে, আমার বাবা দেড় বছর আগে মারা গেছেন..মানে, খুন হয়েছিলেন। সেইসময় কলকাতায় একটা জঘন্য সিরিয়াল কিলিং চলছিল। একের পর এক খুন করে চলেছিল লোকটা। প্রথমে খুন করেছিল একটা এগারো বছরের বাচ্চা মেয়েকে। না–শুধুই খুন করেছিল–অন্য

কিছু করেনি। মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছিল। খুনের পর মেয়েটার যা চেহারা হয়েছিল..মানে, কাগজে যেসব ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল…সেসব দেখলে তুমি শিউরে উঠতে। মেয়েটার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। ঠোঁটের কোণে ফেনা ছিল। আর জিভটা মরা ছাগলের জিভের মতো বাইরে বেরিয়ে ঝুলছিল।

মেয়েটার মারা যাওয়ার আগের ছবি আর পরের ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল কাগজে। দেখে মনে হচ্ছিল, দেবশিশু আর পিশাচ। খুনির হাত ওকে এমনই বদলে দিয়েছিল।

কাগজে দিনের পর দিন এই খুনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তাতেই পড়েছিলাম, খুনি এত জোরে মেয়েটার গলা টিপে ধরেছিল যে, থাইরয়েড বোন আর কার্টিলেজ বোন ভেঙে গিয়েছিল। এই যে…গলায়…এখানে। কণ্ঠমণি…মানে, ইংরেজিতে অ্যাডাম্‌স অ্যাপল যাকে বলে। না, না, তোমার শিউরে ওঠার কোনও কারণ নেই। বললাম যে, ব্যাপারটা তিনবছরেরও বেশি পুরোনো।

মেয়েটার নখের ভেতরে আঁশমতন কিছু পাওয়া গিয়েছিল। ফোরেনসিক পরীক্ষায় জানা গেল, সেগুলো পুরোনো শুকনো কোনও চামড়ার আঁশ। অর্থাৎ, খুনি চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করেছিল। নাঃ, কোনওরকম আঙুলের ছাপ-টাপ পাওয়া যায়নি। পুলিশ ফুল এনথু নিয়ে ইনভেস্টিগেট করেও কিদ্যু করতে পারল না। মেয়েটার খুনি ধরা পড়ল না।

দ্বিতীয় খুনটা হওয়ার পর পুলিশ নড়েচড়ে বসল।

এবারে খুন হল একজন মাঝবয়েসি পুরুষ। খুনের স্টাইল একই। মার্ডার বাই স্ট্র্যাংগুলেশান। এবারেও ভিকটিমের নখের নীচে চামড়ার ফাইবার পাওয়া গেল। অর্থাৎ, সেই দস্তানা। প্রথমবারে যেমন খুনের মোটিভের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, এবারেও তাই। সব মিলিয়ে পুলিশ বেকুব বনে গেল। খুনি রয়ে গেল সবার চোখের আড়ালে।

তিননম্বর খুনটা হওয়ার পর পুলিশ বুঝতে পারল ব্যাপারটা সিরিয়াল কিলিং। মিডিয়া খুনির নাম দিল দস্তানা-খুনি। ইংরেজি চ্যানেল আর খবরের কাগজ নাম দিল গ্লাভ কিলার। সারা শহর জুড়ে খুনির খোঁজ চলতে লাগল। সবাই জোট বেঁধে দস্তানা পরা লোক খুঁজে বেড়াতে লাগল। বুঝতেই পারছ, কলকাতা শহরে

চামড়ার দস্তানা আর কোন কাজে লাগে! তাই দস্তানা পরা লোক খোঁজার কাজটা বেশ সহজ। কিন্তু সেরকম কাউকেই পাওয়া গেল না।

এদিকে খুনের ব্যাপারটা চলতেই লাগল। তিননম্বরের পর চারনম্বর, চারনম্বরের পর পাঁচনম্বর, তারপর ছনম্বর। আর ছনম্বরের পর..সাতনম্বর আমার বাবা।

বাবা খুন হওয়ার পরই সিরিয়াল কিলিং-এর ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। খুনি যেন হঠাৎই চলে যায় বনবাসে। কেউ-কেউ বলল, সাতটা খুন করাটাই লোকটার টার্গেট ছিল। আবার কেউ-বা বলল, ভয় পেয়ে খুনি গা-ঢাকা দিয়েছে। কারণ, গোটা শহরের লোক সাবধান হয়ে গেছে। তা ছাড়া সবাই এমন হন্যে হয়ে দিন-রাত দস্তানা পরা লোকের খোঁজ করছে যে, নতুন খুনের ভিকটিম খুঁজে পাওয়াই মুশকিল–তাকে খুন করা তো অনেক পরের ব্যাপার।

বাবা খুন হওয়ার পর আমি অনাথ হয়ে গেলাম, কিন্তু সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, সাইকোপ্যাথ খুনির সিরিয়াল কিলিং বন্ধ হয়ে গেল।

এতে সমস্যা মিটলেও নতুন কিছু প্রশ্ন উঠে এল পুলিশের সামনে। আমার বাবা খুন হয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। মানে, এলাকার বাউন্ডারি ওয়ালের কাছাকাছি ঝোঁপের মধ্যে বাবার ডেডবডিটা পড়েছিল।

শুনলে তোমার অবাক লাগবে মৌ, বাবাকে কিন্তু গলা টিপে খুন করা হয়নি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাগলের মতো কোপানো হয়েছিল বাবাকে। ছত্রখান হওয়া ডেডবডিটা পড়ে ছিল ঘাসের ওপরে। মুখটা ধারালো ফলার কোপে শতচ্ছিন্ন। হাতের আঙুলগুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে এখানে-সেখানে পড়েছিল। বাঁ-হাতটা কাঁধের কাছ থেকে প্রায় খুলে এসেছিল। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

বাবার পকেটে পাওয়া ক্রেডিট কার্ড থেকে পুলিশ পরিচয় আর ঠিকানার খোঁজ পায়। আমি বাবাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম হাতের একটা আংটি দেখে, আর ডানহাঁটুর নীচে একটা কাটা দাগ দেখে। আইডেনটিফাই করার পরই আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম।

এবারে তোমাকে প্রশ্নগুলোর কথা বলি।

প্রথমত, বাবাকে গলা টিপে খুন করা হয়নি। ফলে খুনের কায়দাটা সিরিয়াল কিলারের স্টাইলের সঙ্গে মিলছে না। কেন খুনি হঠাৎ স্টাইল বদলাতে গেল?

দ্বিতীয়ত, মার্ডার স্পটে একটা কালো চামড়ার দস্তানা পাওয়া যায়। রক্তমাখা দস্তানা–ছুরির কোপে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। দস্তানার রক্তের সঙ্গে বাবার রক্ত মিলে গিয়েছিল। এই দস্তানাটি কি খুনির দস্তানা হতে পারে?

তৃতীয়ত, খুনের ধরনটা এমনই যে, পুলিশের মনে হয়েছে, খুনটা প্রতিহিংসা বা আক্রোশ থেকে করা হয়েছে। প্রচণ্ড আক্রোশ না থাকলে কেউ এভাবে খুন করে না। তা হলে সিরিয়াল কিলার হঠাৎ এই আক্রোশ দেখাল কেন?

পুলিশ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইছিল। কিন্তু তাতে একটিমাত্র বাধা ছিল। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ কী সেই সিদ্ধান্ত, আর কী সেই বাধা?

যাকগে, আমিই বলছি।

পুলিশের সেই সিদ্ধান্ত হল । আমার বাবা-ই সেই সিরিয়াল কিলার। খুন হওয়া কোনও ভিকটিমের রিলেটিভ বা বন্ধুবান্ধব প্রতিহিংসায় আক্রোশে বাবাকে ওরকম বীভৎসভাবে খুন করেছে।

আর এই সিদ্ধান্তের পথে বাধা হল, খুঁজে-না-পাওয়া বাঁ-হাতের দস্তানা।

দস্তানাটা পুলিশ কেন খুঁজে পায়নি জানো? ওটা আমি নিয়ে এসেছিলাম।

প্রথমদিন অন্ধকারে পুলিশ ভালো করে জায়গাটা সার্চ করতে পারেনি। হয়তো বাবার সঙ্গে খুনি বা খুনিদের ধস্তাধস্তির সময় দস্তানাটা দূরে কোনও ঝোঁপের মধ্যে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তাই ওরা সেটা দেখতে পায়নি।

খুনের পরদিন দুপুরে গোয়েন্দারা লোকজন নিয়ে এসে জায়গাটা তন্নতন্ন করে সার্চ করে। কিন্তু ওটার খোঁজ পায়নি। কারণ, সেদিন ভোরবেলা পাহারাদার কনস্টেবলদের চোখে ধুলো দিয়ে দস্তানাটা আমি খুঁজে বের করি। ঘন ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ওটা লুকিয়ে ছিল। ওটার গায়ে কোনও ছুরির কোপ ছিল না। শুধু দু-একজায়গায় শুকনো রক্ত লেগে ছিল।

দস্তানাটা বাড়ি নিয়ে এসে আমি লুকিয়ে রাখলাম। বাবার শোক ভুলতে আমার কয়েক মাস লেগে গিয়েছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, পুলিশের সন্দেহ ঠিক। আমার বাবা-ই সেই সিরিয়াল কিলার।

না, না–মৌ, তোমার আপসেট হওয়ার কিছু নেই। আফটার অল ট্রুথ ইজ ট্রুথ। সিরিয়াল কিলার লোকটা যে আমার বাবা, এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বহু সিরিয়াল কিলারই ফ্যামিলি ম্যান ছিল। মানে, ওরা কারও না কারও বাবা ছিল।

এবারে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আরও একটু বলি। আমার মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। তাই মা-কে আমার ভালো করে মনে নেই। কিন্তু মায়ের সম্পর্কে বাবা খুব বাজে-বাজে কথা বলতেন। প্রথম-প্রথম আমার খারাপ লাগত। কিন্তু পরে একই ধরনের কথা রোজ-রোজ শুনতে-শুনতে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে এসেছিল। কে জানে, হয়তো বাবার অভিযোগগুলো বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিলাম।

বাড়িতে মায়ের কোনও ফটো ছিল না। বাবা রাখেননি। তাই আমি আজও জানি না, আমার মা-কে কেমন দেখতে ছিল। এই শূন্যতা নিয়ে আমি বড় হয়েছি, মৌ।

আমার বাবা এমনিতে শান্ত মানুষ হলেও হঠাৎ-হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠতেন। ঘরের জিনিসপত্র পাগলের মতো ভাঙচুর করতেন। আমার মরা মা-কে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নোংরা গালিগালাজ করতেন।

বাবার একটা ব্রিফকেস ছিল। ব্রিফকেসটা খুলে আমি কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছিলাম। মেয়েদের মাথার ক্লিপ, ছেলেদের দুটো রিস্টওয়াচ, তিনটে আংটি, একটা চামড়ার বেল্ট, আর দুটো নাইলনের প্যান্টি।

জিনিসগুলো দেখে আমার মনে হল, ওগুলো ভিকটিমদের গা থেকে বাবা খুলে নিয়েছেন। মানে, জিনিসগুলো মার্ডার সুভেনির।

সিরিয়াল কিলিং-এর ব্যাপারটা অনেক নিউজপেপারেই বেশ বড় করে দিনের পর দিন বেরিয়েছিল। বাবার ওই ব্রিফকেসে তার কাটিংগুলো আমি পেয়েছিলাম। সেগুলো বারবার করে খুঁটিয়ে পড়ে ভিকটিমদের হারানো কয়েকটা জিনিসের কথা জানতে পারলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, হারানো জিনিসগুলো বাবার ব্রিফকেসেই রয়েছে। সুতরাং, সন্দেহের আর কোনও জায়গা রইল না।

এবারে তোমাকে দস্তানাটার কথা বলি।

মাস আষ্টেক আগের কথা। তুমি তো জানো, আমি মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করি। একদিন রাতে বাড়িতে একা-একা বসে হুইস্কি খাচ্ছিলাম আর বাবার কথা ভাবছিলাম। ঘরে নাইটল্যাম্পের আবছা নীল আলো। সিডি প্লেয়ারে হালকা মিউজিক বাজছে। নেশা বেশ জমে উঠেছে।

সামনের টেবিলে বোতল আর গ্লাসের পাশে পড়ে ছিল বাবার দস্তানাটা।

আমি ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এর ভেতরে একটা খুনি হাত বাস করত। আর সেই হাতটা আমার বাবার হাত।

গ্লাভটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ কী-খেয়াল হল, আমি ওটা বাঁ-হাতে পরে ফেললাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কী যে হল, তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার বাঁ-হাতের আঙুলের ডগাগুলোয় যেন হাই ভোল্টেজের শক খেলাম। বাঁ-হাতের প্রতিটি শিরা চিনচিন করতে লাগল। অসহ্য জ্বালায় আমি ছটফট করতে লাগলাম। ছটফট করতে করতে বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ে গেলাম চেয়ার থেকে। আমার পায়ের লাথিতে টেবিলটা উলটে গেল। তার সঙ্গে-সঙ্গে গ্লাস আর বোতলও।

হাতের অসহ্য জ্বালাটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। আমি মরিয়া হয়ে দস্তানাটা টেনে খোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! ওটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না। ওটা সিমেন্টের ঢালাইয়ের মতো আমার হাতে একেবারে সেঁটে গেছে!

মেঝেতে পড়ে আমি হিস্টিরিয়ার রুগির মতো হাত-পা ছুড়ছিলাম আর গ্লাভটা খোলার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। হাতের জ্বালা-পোড়াটা এত বাড়তে লাগল যে, একসময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, টের পেলাম, জ্বালাটা আর নেই। নেশাও পুরোপুরি কেটে গেছে।

কোনওরকমে উঠে ঘরের টিউবলাইট জ্বেলে দিলাম। তারপর তাকালাম আমার বাঁ-হাতের দিকে।

কবজি থেকে আমার হাতের পাঞ্জা, আঙুল সব কালো চামড়ার ঢাকা। এমনকী হাতের তালুর রং-ও কালো হয়ে গেছে। তবে দস্তানাটাকে আর দস্তানা বলে চেনা যাচ্ছে না। ওটা যেন আমার হাতেরই চামড়া হয়ে গেছে। কারণ, কালো চামড়ার তালুতে হাতের রেখাগুলো আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। নখগুলোর আকার বোঝা গেলেও সেগুলোর রং আর চরিত্র বদলে গেছে।

কী আশ্চর্যভাবেই না আমি একটা কালো হাতের মালিক হয়ে গেলাম!

হতভম্ব হয়ে হাতটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎই শুনলাম একটা কর্কশ স্বর: এইবার তুই উপযুক্ত হয়েছিস, সোনু। আমার অসম্পূর্ণ কাজ তুই শেষ করবি। যারা ঘোর পাপী, দুশ্চরিত্র, ব্যাভিচারী, তাদের সবাইকে তুই শাস্তি দিবি। আমার সব শক্তি আমি তোকে দিলাম। নে...।

আবার একপ্রস্থ জ্বালা-যন্ত্রণা, ছটফটানি, চিনচিনে ব্যথা।

তারপর, কিছুটা সময় কেটে যেতেই, আমি চেতনা ফিরে পেলাম। টের পেলাম, অদ্ভুত এক আনন্দ আর তৃপ্তিতে আমার মনটা টগবগ করছে।

তবে সমস্যা একটা হল। আমার এই কালো রঙের বাঁ-হাতটা দেখে কৌতূহলী লোকজন স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত করে মারবে। কিন্তু সবাইকে তো আর এ-গল্প বলা যায় না। তাই আমি সবসময় বাঁ-হাতে সাদা দস্তানা পরে থাকি। লোকে আমাকে হয়তো রেস্তোরাঁর বয়-বেয়ারা ভাবে। তা ভাবুক! অন্তত পাগল করা কৌতূহলের হাত থেকে তো আমি রেহাই পাব। কী বলো?

.

আমার গল্প শেষ হতেই মৌমিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সোনু, তুমি ফ্যানট্যাস্টিক! তোমার জবাব নেই। এই অন্ধকার...এই অল্প-অল্প আলো... এই বৃষ্টি...মাঝে-মাঝে মেঘের গর্জন...বিদ্যুতের ঝলকানি–এর চেয়ে আইডিয়াল পরিবেশ আর কী হতে পারে, সোনু? তোমার দস্তানার গল্পটা বানিয়েছ দারুণ। এবারে প্লিজ, রিয়েল স্টোরিটা বলো–।

কথা বলতে বলতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল মৌ। আমার গায়ে হাতও রেখেছিল। আর একইসঙ্গে ওর মিষ্টি গলায় খিলখিল করে হাসছিল।

আমি বারবার ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম...বলতে চাইলাম যে, আমি যা বলেছি সেটাই আসল ঘটনা কিন্তু কে শোনে কার কথা!

বৃষ্টি কিছুটা কমে এলেও মেঘের ডাকাডাকি চলছিল। আমি উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকালাম।

আর ঠিক তখনই মৌ একটানে আমার হাত থেকে সাদা দস্তানাটা খুলে নিয়েছে। আমি চমকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখের রং সাদাটে হয়ে গেছে। ও গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার কালো রঙের বাঁ-হাতটার দিকে, কালো রঙের পাঁচটা আঙুলের দিকে।

আমি নীচু গলায় বললাম, মৌ, প্রথম মেয়েটাও তোমারই মতন ছিল। ওর নাম ছিল জিনিয়া। সুন্দরী, ছটফটে, চঞ্চল, মুখে সবসময় খই ফুটছে। তার সঙ্গে উগ্র পোশাক। চটকদার মেকাপ। জিনিয়াও আমার গল্পটা বিশ্বাস করতে চায়নি। তখন বাবা ওকে শাস্তি দিতে বলল...।

মৌমিতা আর কোনও কথা বলতে পারছিল না–শুধু আমার কালো হাতটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

এমন সময় আমার কালো হাতের আঙুলগুলো মাকড়সার পায়ের মতো নড়ে উঠল। আর কর্কশ গলায় হাতটা বলে উঠল, সোনু, আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোর গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। নে, চটপট কাজ সেরে নে...।

পিতাশ্রীর আদেশ অমান্য করি কেমন করে!

আমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো যখন সাঁড়াশি হয়ে মৌমিতার গলায় চেপে বসল, তখনও ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। ব্যাপারটা কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছে না।

জিনিয়াও বিশ্বাস করতে পারেনি। মৌমিতাও পারল না।

আর পরের মেয়েটাও পারবে না।

# উনিশ বিষ

**উনিশ বিষ**

ইমেইলটার হেডিং দেখেই ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল পীতাম্বরের। এরকম খেলা কখনও আবার হয় নাকি! কী অদ্ভুত নাম : আলট্রানিড পয়জন গেম!

পীতাম্বরের ইমেইল আইডি-তে প্রচুর আজব মেইল আসে। যেমন, নামিবিয়ার কোনও ব্যাঙ্কে বেওয়ারিশ দেড় মিলিয়ন ডলার পড়ে আছে। সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পীতাম্বরকে মেইল করে জানাচ্ছেন, টাকাটা তিনি পীতাম্বরের নামে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দেবেন। এর জন্য কাগজপত্র যা-যা দরকার সবই তিনি তৈরি করবেন। পীতাম্বরকে শুধু বাড়ির ঠিকানা আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেইল্স জানাতে হবে। তারপর, টাকাটা দেশের বাইরে নিশ্চিন্তে পাঠিয়ে দেওয়ার পর, তিনি ইন্ডিয়াতে এসে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকাটা ভাগাভাগি করে নেবেন।

আবার এমন মেইল-ও আসে যাতে এক সুন্দরী বিদেশিনীর ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য তথ্য রয়েছে। তিনি ভারতীয় পাত্র খুঁজছেন। পাত্রের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে হলেও আপত্তি নেই। আর বিপত্নীক কিংবা ডিভোর্সি হলেও চলবে।

পীতাম্বরের চেহারা ছোটখাটো। মাথায় বড়সড় টাক। বয়েস বাহান্ন পেরিয়েছে। কিন্তু হলে হবে কী। মেয়েটির ছবি বেশ লোভ জাগায়। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা। পদ্মাবতী...। পদ্মাবতীর ব্যাপারটা আগে ভাবতে হবে।

আজব বিয়ের প্রস্তাব ছাড়া সাংঘাতিক ডিসকাউন্টে নানান সফ্টওয়্যার কেনার প্রস্তাবও আসে ইমেইল-এ। আবার পুরুষত্বকে তেজি করে তোলার বিচিত্র সব পদ্ধতির খোঁজখবরও পাঠায় নানান কোম্পানি।

সাধারণত এসব মেইল পীতাম্বর খোলেন না। তাই এগুলো ইনবক্স-এ না এসে বাল্ক এ জমা হয়। যদি বাক-এর কোনও মেইল-এর টাই পীতাম্বরের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয় তবেই তিনি সেই মেইলটা খোলেন।

যেমন এই আলট্রানিউ পয়জন গেম।

আজ পর্যন্ত এ ধরনের কোনও মেইল-এ সাড়া দেননি পীতাম্বর। কিন্তু এই পয়জন গেম-এর মেইলটা দেখে মনে হল, এটা খুলে একটু নেড়েচেড়ে দেখলে হয়।

কিন্তু ঠিক তখনই পদ্মাবতীর ডাক এল।

এ-ডাক নিশির ডাক। অথবা তার চেয়েও বেশি।

সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে ইয়াহু থেকে সাইন আউট করলেন পীতাম্বর। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতেই চেঁচিয়ে বললেন, যাই।

বয়েস পঞ্চাশ পেরোলেও পীতাম্বরের সব ইন্দ্রিয় এখনও দিব্যি টগবগে। ফলে যে-ক্ষিপ্রতায় তিনি পদ্মাবতীর ডাক লক্ষ্য করে শব্দভেদী বাণের মতো ছুটে গেলেন সেটা অবাক করার মতো।

পদ্মাবতী বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর গায়ে গোলাপি নাইটি জাতীয় যে-বস্তুটি চাপানো রয়েছে সেটা বোধহয় কাচের তৈরি। অথবা, গোলাপি রং-টা পদ্মাবতীর গায়ের রং-ও হতে পারে।

বউকে অচেনা পুরুষের চোখ দিয়ে দেখতে চাইলেন পীতাম্বর। সত্যি, ওর সারা শরীরে শুধুই মারকাটারি বক্ররেখা। ওর দিকে তাকানোমাত্রই দুটো জিনিসের কথা মনে পড়ে : সুকুমার রায়ের খাই খাই কবিতা, আর আবার খাব সন্দেশের কথা।

কিন্তু পীতাম্বর তো আর অচেনা পুরুষ নন! তিনবছর আগে তাই ছিলেন। সুতরাং এখন পদ্মাবতীর দিকে তাকালে ও-দুটো জিনিসের কথা ওঁর আর মনে পড়ে না। বরং মনে পড়ে কবিতায় পড়া ডাকিনী যোগিনী এল কত নাগিনী... লাইনটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদ্মাবতীর নেশার টান এড়াতে পারেন না পীতাম্বর। কী করে যেন তিরিশের এই মেয়েটা বাহান্নর পীতাম্বরকে এখনও বশ করে রাখতে

পারছে। শুধু মাঝে-মাঝে ভেতরে-ভেতরে উথলে ওঠা প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চান পীতাম্বর–কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোন এক ম্যাজিকে এই মায়াবী মেয়েটা ওঁকে সামলে নেয়–যেমন, এখন।

স্বামীকে কাছে ডেকে পদ্মাবতী যেভাবে হামলে পড়ে তাকে আদর করতে শুরু করল তাতে মেনকাও লজ্জা পাবে। পীতাম্বর অবাক হয়ে কাঠ কাঠ অবস্থায় আদর খাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন কতক্ষণ ব্যালান্স রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন।

পদ্মাবতীর আদরের কোনও সীমানা নেই। তা ছাড়া কতরকম কলাকৌশল যে ও জানে। ওর পাল্লায় পড়লে চিতায় ওঠা পুরুষও জেগে উঠবে। পীতাম্বরের মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা ঠিক স্বামী-স্ত্রীর আদর নয়, পদ্মাবতী কোনও ব্লু-ফিল্ম-এর শুটিং-এ শট দিচ্ছে।

সে যা দেয় দিক–মনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পীতাম্বরের শরীর অনেকক্ষণ আগেই জেগে উঠেছিল। পদ্মাবতী তাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলল। তারপর প্রবল ঝটাপটি করে ডাকিনী-যোগিনীর মতো পীতাম্বরকে কাবু করে বলতে গেলে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিল।

একটু পরে পদ্মাবতী উঠে দাঁড়ালেও পীতাম্বর তুলোঠাসা পুতুলের মতো এলোমেলো হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে রইলেন। বড়-বড় শ্বাস নিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। তৃপ্তিতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু এখনই অফিসে বেরোতে হবে কামাই করা যাবে না। তাই জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে পদ্মাবতীর ঘোর কাটালেন পীতাম্বর। শরীরটা আধপাক গড়িয়ে খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে হাতে পায়ে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

পদ্মাবতীর দিকে তাকালেন পীতাম্বর। সত্যি, এসব ব্যাপারে ওর ক্যালির কোনও জবাব নেই। তখন পীতাম্বরের ওকে দারুণ লাগে। কিন্তু বাকি সময়টা অসহ্য।

পীতাম্বর একটু সঞ্চয়ী মনের মানুষ। ফলে আয় করেন দু-হাতে, কিন্তু ব্যয় করেন কড়ে আঙুলে। আর পদ্মাবতী যেন সেই সঞ্চয় প্রকল্প-এর পদ্ম বনে মত্ত হাতি। দু-হাতে খরচ করাটাই ওর প্রথম কথা এবং শেষ কথা। ব্যাপারটা অপছন্দ

হলেও পীতাম্বরের কিছু করার নেই। কারণ, পদ্মার নেশায় পড়ে ওকে বিয়ে করার সময় সব সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা ওর নামে লিখে দিয়েছেন।

কী হল? কী ভাবছ?

পীতাম্বর চমকে উঠে বললেন, কই, কিছু না তো!

পদ্মাবতী জলতরঙ্গের শব্দ করে হাসল। পীতাম্বরের সামনেই ড্রেস বদলাতে শুরু করল। নতুন পোশাক পরতে-পরতে বলল, শোনো, দুপুর দুটো নাগাদ জিমি আসবে। তারপর আমরা একটু বেরোব…ফিরতে রাত হবে…। তুমি ডিনার করে শুয়ে পোড়ো…।

পীতাম্বরের গা জ্বালা করে উঠল। এই জিমিটার জন্যই পদ্মাবতাঁকে আরও অসহ্য লাগে। ছেলেটার যেমন কুকুরের মতো নাম তেমনই কুকুরের মতো স্বভাব। সবসময় পদ্মাবতাঁকে ঘিরে ছোঁকছোঁক করছে। জিভ বের করে লালা ঝরাচ্ছে।

পীতাম্বর ভালো করেই জানেন, পদ্মাবতী ডিভোর্স চায় না–জিমিকে বিয়ে করতেও চায় না। কারণ, পীতাম্বরের টাকাপয়সা, এসি ফ্ল্যাটের আরাম, প্রিমিয়াম গাড়ির নরম গদি সবই পদ্মার দারুণ পছন্দ। তার পাশাপাশি ওর দরকার একটা পোষা তেজি যুবক–যে সবসময় মুখবুজে ওর ফরমাশ খাটবে আর ওর প্রবল আহ্বাদের চাপে কখনও কাহিল হয়ে পড়বে না। ফলে পদ্মাবতী যে উৎফুল্ল থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পীতাম্বর? সবসময় অসহ্য এক টানাপোড়েনের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন নাকি মরে রয়েছেন! চোখের সামনে রোজ জিমির হ্যাংলাপনা পীতাম্বরের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু পদ্মার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না–শুধু ভেতরে-ভেতরে ছটফট করেন।

যদি পদ্মাবতাঁকে কোনওভাবে সরিয়ে দেওয়া যেত? তা হলে জিমির সমস্যাটাও আর থাকত না। পীতাম্বরের গলায় এঁটে বসা ফঁসটা খুলে যেত তখন।

সেই দিনটার কথা ভেবে পীতাম্বরের মন ভালো হয়ে যায় পলকে। ইস, যদি…।

পদ্মাবতী চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ার পরেও পীতাম্বর ঘোর লাগা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আসলে তখন ভাবছিলেন, কী রহস্য লুকিয়ে

রয়েছে আলট্রানিউ পয়জন গেম মেইলটার মধ্যে।

.

বিষ মেশানো খাবার একই টেবিলে বসে খাবে ছজন। কিন্তু মারা যাবে চারজন। দুজন দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে। এটা কীভাবে সম্ভব?

আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?

বিষ মেশানো খাবার একইসঙ্গে বসে সমানভাবে ভাগ করে খাবে তিনজন। কিন্তু মারা যাবে দুজন। তৃতীয়জন বেঁচে থাকবে।

কেমন করে বলতে পারেন?

বিষ মেশানো খাবার খেল তিনজন। একজন মারা গেল। বেঁচে রইল দুজন।

বলুন, কোন ম্যাজিকে এটা সম্ভব?

ইমেইলটায় এইরকম অদ্ভূত তীব্র সব প্রশ্ন। আর তার সঙ্গে কার্টুন ছবির ঢঙে আঁকা অ্যানিমেশান। খাবার টেবিলে বসে সবাই খাবার ভাগ করে নিচ্ছে। তাতে নীলরঙের বিষ মেশানো হচ্ছে। তারপর সবাই তৃপ্তি করে খাচ্ছে। এবং কয়েকজন টেবিলেই ঢলে পড়ছে–বাকি কয়েকজন দিব্যি বেঁচে থাকছে।

সিনেমার মতো বারবার একই ঘটনা দেখাচ্ছে কার্টুন অ্যানিমেশান। তার নীচে বিজ্ঞাপনের কায়দায় নানান স্লোগান লেখা। আর সবশেষে একটা মোবাইল নম্বর। নম্বরটার পাশে লাল রঙের হরফে লেখা রয়েছে : ইফ য়ু ওয়ান্ট টু প্লে দ্য পয়জন গেম কনট্যাক্ট ইমিডিয়েটলি।

পীতাম্বর ইমেইলটা বারবার পড়লেন। তারপর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন। কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে মোবাইলের বোতাম টিপে নম্বরটা স্টোর করে নিলেন।

পদ্মাবতী এখন বাড়িতে নেই। নিশ্চয়ই কুকুরটাকে বগলদাবা করে কোথাও ঘুরতে গেছে। অথবা দুজনে কোনও জলপান স্টোর্সে পাশাপাশি গ্লাস হাতে বসে চাপা গলায় বুড়বুড়ি কাটছে।

তবুও কী ভেবে কম্পিউটার-টেবিল ছেড়ে ঘরের বাইরে এলেন পীতাম্বর। ফ্ল্যাটের এ-ঘর ও-ঘর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলেন যে, পদ্মাবতী সত্যিই ফ্ল্যাটে নেই।

তারপর আলট্রানিউ পয়জন গেম-এর ফোন নম্বরে ফোন করলেন।

গুড মর্নিং। আলট্রানিড পয়জন গেম। মে আই হেল্প য়ু? মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে কথা বলল।

পীতাম্বর মাথা চুলকোলেন দুবার। তারপর খসখসে গলায় বললেন, আপনাদের এই নতুন পয়জন গেমটার ব্যাপারে একটু ডিটেইলসে জানতে চাই…।

কথাবার্তা চালাতে কোনও অসুবিধে হল না। ওদের ঠিকানা লিখে নিলেন পীতাম্বর। বললেন যে, আগামীকাল তিনি ওদের অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করবেন।

মেয়েটি একগাল হেসে বলল, আই ওয়েলকাম য়ু টু আওয়ার গেমল্যান্ড, স্যার…।

পীতাম্বরের বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ হচ্ছিল। বারবার ভাবছিলেন, ব্যাপারটা কি শুধু গেম, নাকি তার চেয়েও কিছু বেশি?

.

এই কথা ভাবতে-ভাবতেই পরদিন পয়জন গেমের ঠিকানার পৌঁছে গেলেন পীতাম্বর। এবং ওদের দোকান কিংবা অফিস–দেখে রীতিমতো হতাশ হলেন।

থুত্থুড়ে একটা তিনতলা বাড়ি কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাইরের পলেস্তারা-খসা নোনা-ধরা চেহারাটা এমন যেন আগমার্কা ভূতুড়ে বাড়ি। দেখে পীতাম্বরের মনে হল, জোরে ঝড়ঝাপটা এলেই কাঠামোটা হুড়মুড় করে খসে পড়বে।

বাড়ির একতলায় একটা ছোট দরজা। তার মাথাতেই একটা বড় সাইনবোর্ড। বোর্ডের লেখা যথেষ্ট রং-চটা হলেও পড়া যাচ্ছে : রানিবালা চিকিৎসালয়। তার

নীচে লেখা : অব্যর্থ কবিরাজি ঔষধে বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়া দোকানের ঠিকানাটা শেষ লাইনে লেখা। কাঁচা হাতে নতুন রং বুলিয়ে ঠিকানাটাকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

ঢুকব-কি-ঢুকব-না করেও দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়লেন পীতাম্বর। বাড়িটার বাইরের চেহারা যেমন ভেতরটাও তাই। সামনে তেলচিটে ধরা কাঠের শো-কেস কাম কাউন্টার। তার কাচগুলো সব ময়লা হলদেটে। কোনও-কোনও ফাটা কাচ আঠা দিয়ে কাগজ জুড়ে মেরামত করা হয়েছে।

ঘরের পিছনের দেওয়ালে দুটো বড় বড় কাঠের আলমারি। আলমারির পাল্লায় কাচ বসানো। তবে কয়েকটা খোপে কাচ নেই। আর কয়েকটা ফাটা কাচ কাগজ সেঁটে সামাল দেওয়া হয়েছে। কাচগুলো ময়লা হলেও তার ভেতর দিয়ে তাকে রাখা প্রচুর শিশি-বোতল বেশ নজরে পড়ছে। ডানদিকের আলমারির পাশ ঘেঁষে একটা সরু পথ। পথের মুখ কালো পরদায় ঢাকা।

পীতাম্বর ঘরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘরের ফাঁকা দেওয়ালের বেশিরভাগ অংশই নানান ঠাকুর-দেবতার ক্যালেন্ডারে ঢাকা। সিলিং-এ কাচকাচ শব্দ করে একটা বেঢপ মাপের পাখা ঘুরছে। তার হাওয়ায় ক্যালেন্ডারগুলো ছটফটে পাখির মতো উড়ছে।

ঘরে কাউকে দেখতে পেলেন না পীতাম্বর। ভুরু কুঁচকে গেল। তা হলে কি চলে যাবেন? কিন্তু ঠিকানাটা তো ঠিক-ঠিক মিলেছে।

শেষ পর্যন্ত কাউন্টারে ঠকঠক করে শব্দ করলেন, আর একইসঙ্গে ডেকে উঠলেন, কেউ আছেন?

সঙ্গে-সঙ্গে আছি–আছি বলতে বলতে একগাল স্মিত হাসি নিয়ে একজন বেঁটেখাটো চেহারার বৃদ্ধ কালো পরদা সরিয়ে কাউন্টারের কাছে চলে এলেন। রং ফরসা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মাথার চুল সাদা ধপধপে হলেও গোঁফে সাদা-কালোর মিশেল রয়েছে।

বৃদ্ধের গায়ে একটা ময়লা ঘিয়ে রঙের ফুলহাতা শার্ট। পায়ে একইরকম ময়লা একটা খাকি প্যান্ট।

পীতাম্বর লক্ষ করলেন, বৃদ্ধ একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন।

বলুন– বলে ছোট্ট করে কাশলেন। ডানদিকের গালটা একবার চুলকে নিলেন।

আমার ইমেইল-এ আপনাদের একটা গেম–মানে, আলট্রানিড পয়জন গেম–তার একটা অ্যাড দেখেছি…। পীতাম্বর ইতস্তত করে একটু থামলেন।

বৃদ্ধের উজ্জ্বল চোখ সরাসরি ভেদ করল পীতাম্বরকে। একটু হেসে যেন অভয় দিয়ে বললেন, হা, হা বলুন…।

মানে, ওই পয়জন গেমটা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে এসেছি। ওটার অ্যানিমেশান দেখে এত ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে…।

তাই? পীতাম্বরকে জরিপ করলেন বৃদ্ধ। একটুকরো শব্দ করে হাসলেন। তারপর বললেন, আসুন–ভেতরে আসুন।

কাউন্টারের একপাশের ডালা তুলে বৃদ্ধ পীতাম্বরকে ভেতরে আসতে ইশারা করলেন।

বৃদ্ধের পোশাক থেকে আতর টাইপের একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল। কাউন্টার ডিঙিয়ে ওপাশে ঢুকতেই গন্ধটা আরও উগ্র হল।

পীতাম্বরের কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল।

আধুনিক পদ্ধতিতে ইমেইল-এ বিজ্ঞাপন। মোবাইল নম্বরে ফোন করে শোনা গেল আধুনিক তরুণীর মিষ্টি গলা। অথচ আসল জায়গায় এসে এ কী উলটো ছবি! যেমন সেকেলে জরাজীর্ণ দোকানঘর তেমনই নড়বড়ে দোকানদার! ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠাট্টা নয়তো?

পরদা সরিয়ে ভেতরের ঘরটায় ঢুকলেন বৃদ্ধ। পিছন পিছন পীতাম্বরও।

ঢুকতেই পীতাম্বরের নাকে বিচিত্র গন্ধের একটা ঝাপটা এসে ধাক্কা মারল। ওঁর মনে হল, একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে এসে পড়েছেন। কারণ, ঘরটা শিশি-বোতলে ছয়লাপ। তার কোনওটায় সাদা পাউডার, কোনওটায় রঙিন তরল, আবার কোনওটায় ছোট কিংবা বড় ট্যাবলেট। এ ছাড়া শুকনো গাছগাছড়া শেকড়বাকড়ও কিছু কম নেই।

ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিল। তার দু-দিকে মোট তিনটে চেয়ার। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, খাতা, তিনটে বলপয়েন্ট পেন, আর একটা পুরোনো মডেলের টেলিফোন।

বৃদ্ধ একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। একটু হাঁপ ছেড়ে টেবিলের উলটোদিকের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

পীতাম্বর চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে বসে পড়লেন।

এবারে বলুন স্যার, আপনার কী উপকার করতে পারি…।

ওই যে বললাম…ওই পয়জন গেম-এর ব্যাপারটা…।

পীতাম্বরকে খুঁটিয়ে দেখলেন বৃদ্ধ। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, আসলে ওই গেমের একটা অ্যানিমেশান সিডি আমরা বিক্রি করি। দাম দুশো তিরিশ টাকা। কম্পিউটারে গেমটা লোড করে আপনি খেলতে পারেন। মানে, টাইম পাস করার জন্যে। ওতে অনেক অপশন আছে, অনেক পাজল আছে, পয়েন্ট আছে–আপনি ভালোই এনজয় করতে পারবেন…।

পীতাম্বরের মুখে বিরক্তি আর হতাশা ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে খুকখুক করে হাসলেন বৃদ্ধ। ভুরু উঁচিয়ে সরাসরি তাকালেন পীতাম্বরের চোখে। বললেন, বুঝতে পারছি, আপনি খুশি হননি…।।

কেমিক্যালের শিশি-বোতলগুলোর দিকে ইশারা করে দেখালেন পীতাম্বর : এগুলো তা হলে কী? ওই গেমের জন্যে? নাকি…।

ঠিক ধরেছেন। ওপর-নীচে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ ও এগুলো আসল পয়জন গেমের জন্যে। হঠাৎই শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, বলুন, কে আপনাকে ট্রাবল দিচ্ছে? কাকে আপনি মাইনাস করতে চান?

পীতাম্বর এ ধরনের সরাসরি প্রশ্নে একটু বিব্রত হলেন। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। এদিক ওদিক তাকালেন।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, সিক্রেসি আমার গুডউইল। আমি ক্লায়েন্টদের চাহিদা মেটাই–বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিই, ব্যস।

কেমিক্যালের গন্ধে পীতাম্বরের দম আটকে যাচ্ছিল। মাথার ওপরে ছোট একটা পাখা ঘুরলেও পীতাম্বর বেশ ঘামছিলেন।

আমি…মানে…।

আপনি কি আপনার ওয়াইফকে সরাতে চান?

বৃদ্ধের প্রশ্নে যেন ইলেকট্রিক শক খেলেন পীতাম্বর। ওঁর শরীর কেঁপে গেল। মনের কথা পড়তে পারে নাকি এই বুড়োটা!

দোকানদার সবজান্তা-হাসি হাসলেন অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার কাছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ-এর কেসই বেশি আসে। হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফকে সরাতে চায়, নয় ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে। আপনি…।

বৃদ্ধকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে পীতাম্বর বললেন, হ্যাঁ, হাওয়াইফকে।

জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে একটা দুঃখের শব্দ করলেন বৃদ্ধ। নরম গলায় বললেন, একটা সময়ের পর সব বিয়ে কেমন তেতো হয়ে যায়। তখন মনটা মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি..হাসলেন বৃদ্ধ ও আর সেইজন্যেই আপনাদের মতো নিপীড়িত ক্লায়েন্টদের আমি সার্ভিস দিই…।

এবারে আসল কথায় আসি হাতে হাত ঘষে পীতাম্বরের দিকে ঝুঁকে এলেন বৃদ্ধ ও যে আলট্রানিউ পয়জনটার কথা আপনাকে এখন বলব সেটা আমার বাবার আবিষ্কার। আমার বাবা নেপালপদ সরকার এককালের বিখ্যাত কোবরেজ ছিলেন। বাবার তৈরি মোদক একবার খেলে মানুষ নেশার ফাঁদে পড়ে যেত। বাবা সবসময়েই হাজাররকম গাছগাছড়ার নির্যাস আর কেমিক্যাল নিয়ে হাজাররকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তো ওইসব করতে করতেই একদিন–আজ থেকে প্রায় বাহাত্তর বছর আগে–এক মারকাটারি বিষ আবিষ্কার করলেন। তার কেমিক্যাল ফরমুলা এখন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

পীতাম্বর অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, মারকাটারি বিষ মানে?

এ-প্রশ্নে বৃদ্ধ বেশ মজা করে হেসে উঠলেন। বললেন, মারকাটারি মানে একেবারে স্পেশাল টাইপের অব্যর্থ বিষ। এই ধরুন খাবারের মধ্যে এই বিষ মাপা পরিমাণে মিশিয়ে আপনি আর আপনার ওয়াইফ একসঙ্গে খেয়ে নিলেন।

আপনার ওয়াইফ যে মারা যাবেন তার একেবারে ফুল গ্যারান্টি। কিন্তু আপনি, বিষাক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেও বেঁচে যাবেন। মানে, দু-চারদিন নার্সিংহোমে কাটাতে হলেও প্রাণে বেঁচে যাবেন। তখন পুলিশ আপনাকে মোটেই সন্দেহ করবে না–যেহেতু একই বিষ মেশানো খাবার আপনিও খেয়েছেন, অথচ লাকিলি আপনি বেঁচে গেছেন।

ব্যস, তখন মুক্তি–এবং মনের মতো করে নবজীবন শুরু। এককথায় আনন্দের আর সীমা নেই! কী বলেন?

পীতাম্বর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃদ্ধের কথা শুনছিলেন। এসব কি রূপকথা, নাকি বাস্তব? ওঁর বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটাচ্ছিল কেউ, আর অঝোরে লোভের লালা ঝরছিল।

কিন্তু ভদ্রলোকের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে না! বিষ মেশানো খাবার খেলেন দুজন কিন্তু একজন বেঁচে যাবে কেমন করে? তার রহস্যটা বৃদ্ধ এখনও ফাস করেননি।

সে-কথা জিগ্যেস করতেই টেবিলে চাপড় মেরে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, ওটাই তো আসল মিস্ট্রি। ওটার জন্যেই তো আমার এত পসার।

এবার মনোযোগ দিয়ে কৌশলটা শুনুন… বৃদ্ধ বড় করে একটা হাই তুললেন। হাঁ-করা মুখের সামনে দু-আঙুলে কয়েকবার তুড়ি বাজালেন। তারপর ও ওই বিষটার একটা অ্যান্টিডোট– মানে, প্রতিষেধকবাবা তৈরি করতে পেরেছিলেন। আসলে সেটাও একরকমের হালকা বিষ।

বিষ মেশানো খাবার খাওয়ার আগে…ঠিক তিনঘণ্টা আগে..ওই অ্যান্টিডোটটা খেয়ে নিতে হবে। তা হলেই আপনি হয়ে গেলেন পুরোপুরি সুরক্ষিত। তখন মনের আনন্দে বিষ মেশানো খাবার খান–নো প্রবলেম। তবে হ্যাঁ… মাথা চুলকোলেন বৃদ্ধ। চোয়ালে হাত বোলালেন। বললেন, তবে হা…একটু কষ্ট তো হবেই। আপনি বিষ মেশানো খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, নার্সিংহোমে যাবেন, জীবন নিয়ে একটু টানাটানি হবে–কিন্তু শেষ পর্যন্ত যমরাজ জিতবে না…আপনিই জিতবেন। আর…বুঝতেই পারছেন, আপনাকে সন্দেহ করার কোনও প্রশ্নই উঠবে না…।

টেবিলে চাপড় মেরে বক্তৃতা শেষ করলেন বৃদ্ধ। মুখে তৃপ্তির হাসি। কারণ, ব্যাপারটা তিনি ক্লায়েন্টকে ঠিকমতো বোঝাতে পেরেছেন।

পীতাম্বরও মনে-মনে খুশি হয়েছিলেন। সত্যিই এই প্ল্যানটায় হিসেবের কোনও ফঁক নেই। তবে একটা ছোট্ট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে : বিষটায় কোনও গন্ধ নেই তো! খাবারে মেশানোর পর যদি উৎকট কোনও গন্ধ পাওয়া যায়…?

সেই প্রশ্ন করতেই বৃদ্ধ হেসে বললেন, নো প্রবলেম। মাংসের ঝোল।

মাংসের ঝোল মানে?

আপনার ওয়াইফ মাংস খেতে পছন্দ করেন তো?

পছন্দ মানে! ও পুরোপুরি মাংসাশী প্রাণী। কষা মাংস ওর হট ফেবারিট।

চমকার। বেশ করে মশলাপাতি দিয়ে কষে মাংস রান্না করার বন্দোবস্ত করবেন। মানে, দুজনের জন্যে। তাতে আমি যে-শিশিটা দেব ওটার লিকুইডটা পুরোটা ঢেলে দেবেন। ব্যস কাজ শেষ।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন পীতাম্বর। কোথাও কোনও রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কি না সেটাই খতিয়ে দেখছিলেন। পদ্মাবতীর মুখটা মনে পড়ল ওঁর। কল্পনায় দেখলেন, সেই সুন্দর মুখটা চোখের পলকে নীল হয়ে গেল।

মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তাই বৃদ্ধের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কত?

বিশহাজার।

বিশহাজার? আলট্রানিউ পয়জনের দাম শুনে আঁতকে উঠলেন পীতাম্বর।

হ্যাঁ, স্যার–বিশহাজার। হাসলেন বৃদ্ধ ও দামটা বেশি মনে হলে আপনি বরং ছুরি দিয়ে কাজ সেরে নিন বিশটাকায় হয়ে যাবে। আর যদি ঘরোয়া কোনও ব্লান্ট ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করেন তা হলে পুরো বিনিপয়সায় হয়ে যাবে…। একটু কেশে নিয়ে আরও যোগ করলেন, আপনার যা সমস্যা তাতে বিশহাজার তো জলের দর!

পীতাম্বর টাকা খরচ করার চেয়ে জমাতেই বেশি ভালোবাসেন। পদ্মাবতীর উচ্ছুঙ্খল খরচের লাটসাহেবিয়ানা পীতাম্বরকে ভেতরে-ভেতরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। তাই বৃদ্ধের মুখে বিয়ের দাম শুনে তিনি রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু…।

এ ছাড়া উপায়ও তো নেই।

তবে একটাই সান্ত্বনা, এই বিশহাজার টাকা খরচ করার পর তিনি পদ্মাবতীর বেপরোয়া খরচের জ্বালাপোড়া থেকে মুক্তি পাবেন–চিরকালের জন্য।

পীতাম্বর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, ও. কে., এগ্রিড। বিশহাজার।

আপনি বুদ্ধিমান। থ্যাংক য়ু– হেসে বললেন বৃদ্ধ, এবারে আপনার কাজ হল পাঁচহাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া। তারপর পরশুদিন সন্ধেবেলা এসে বাকি পনেরো দিয়ে..ইয়ে…মানে ওষুধের শিশিদুটো নিয়ে যাওয়া…।

পরশু পনেরোহাজার টাকা দিয়ে দেওয়ার পর যদি বাই চান্স ওষুধে কাজ না হয়, তখন?

পীতাম্বর বেশ দোটানায় পড়ে গেলেন। কেস জন্ডিস হয়ে গেলে পীতাম্বর কার নামে অভিযোগ করবেন? আর কার কাছেই-বা করবেন? এই বুড়োটা যদি ডাহা ঠকায়, তখন? আচ্ছা, পরশুদিন পাঁচহাজার দিলে হয় না–তার পরে, কাজ ঠিকমতো চুকে গেলে বাকি দশ?

সে কথাই বৃদ্ধকে বললেন পীতাম্বর।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, হতে পারে–তবে একটা কন্ডিশান আছে। পরশুদিন আপনাকে আইডেন্টিটি প্রুফ আর অ্যাড্রেস প্রুফ নিয়ে আসতে হবে মানে, ভোটার কার্ড আর লেটেস্ট ইলেকট্রিক বিল কিংবা টেলিফোন বিল নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে, আলট্রানিড পয়জনের কাজ মিটে গেলে যদি আপনি আর টাকা না দেন? তখন আমি কার পেছনে টাকার জন্যে ঘুরব?…যদি রাজি থাকেন তা হলে পাঁচহাজার টাকা দিন।

অ্যাড্রেস প্রফের কথা বলতেই পীতাম্বরের মুখে ফুটে ওঠা অস্বস্তির ভাব বৃদ্ধের নজর এড়ায়নি। তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, বেকার দুশ্চিন্তা করবেন না।

আগেই তো বলেছি, সিক্রেসি আমাদের গুডউইল। ক্লায়েন্টদের ট্রাস্ট যদি একবার চলে যায় তা হলে আমার ব্যাবসা দু দিনেই লাটে উঠবে। সুতরাং একবার কানের লতি চুলকে নিলেন? সুতরাং পরশু সন্ধেবেলা সাতটা নাগাদ নিশ্চিন্তে চলে আসুন আইডেন্টিটি প্রুফ আর অ্যাড্রেস প্রুফ নিয়ে..সঙ্গে ক্যাশ পাঁচহাজার টাকা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও এখন তা হলে পাঁচহাজার দিন…।

পীতাম্বর নীরবে শর্ত পালন করলেন।

বৃদ্ধ একটা খাতা খুলে ছোট-ছোট হরফে কীসব লিখে নিলেন। তারপর খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, তা হলে এই কথা রইল। পরশু সন্ধে সাতটা।

.

নীল লেবেল লাগানো ছোট্ট শিশিটার দিকে তাকালেন পীতাম্বর।

কবিরাজ নেপালপদ সরকারের আশ্চর্য আবিষ্কার। হালকা বিষ। অ্যান্টিডোট। প্রতিষেধক। আসল বিষের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র দাওয়াই।

এটা খাওয়ার পর তিনঘণ্টা কাটবে। রাত দশটা নাগাদ তিনি আর পদ্মা খেতে বসবেন। তেল ঝাল মশলা দিয়ে রান্না করা কষা মাংস আর পরোটা সঙ্গে বাদশাহী স্যালাড। মাংসের মধ্যে মেশানো থাকবে লাল লেবেল লাগানো শিশির মারাত্মক বিষ। তার একফেঁটা গন্ধও টের পাবে না পদ্মাবতী। কারণ, রানিবালা চিকিৎসালয়ের বৃদ্ধ দোকানদার বলেছেন, বিষটা কষা মাংসে মিশিয়ে দিলে তার কোনও স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া বেশিরভাগ রাতেই পদ্মা অল্পবিস্তর নেশা করে ফেরে।

সুতরাং কষা মাংস এবং পরোটা ইত্যাদি খাওয়ার পরেই পদ্মার গল্প শেষ। নতুন গল্প শুরু।

এইসব কথা চিন্তা করতে করতে নীল লেবেল লাগানো শিশিটার ছিপি খুললেন পীতাম্বর। মাথা পিছনে হেলিয়ে বড় মাপের হাঁ করে শিশির স্বচ্ছ তরলটুকু নিশ্চিন্তে গলায় ঢেলে দিলেন।

পীতাম্বরের গলা জ্বলতে শুরু করেছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি খাওয়ার টেবিলে রাখা জলের বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু ঠিকমতো

বোতলটা ধরতে পারলেন না। ওঁর হাতের ধাক্কায় বোতলটা টেবিলে কাত হয়ে পড়ে গেল। জলে ভেসে গেল টেবিল।

পীতাম্বরের হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। দম নিতে অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল।

ওঁর শরীরটা হঠাৎই টলে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই অবস্থাতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল ফোনটা বের করার চেষ্টা করলেন–পারলেন না।

ওঁর গল্প শেষ হয়ে গেল।

মারা যাওয়ার আগে পীতাম্বরের শেষ চিন্তা ছিল, দুটো শিশির লাল আর নীল রঙের লেবেল ভুল করে উলটে যায়নি তো!

.

পদ্মাবতী রাতে ফিরে পীতাম্বরের মৃতদেহটা দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে ও মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে একটা নম্বর ডায়াল করল।

হ্যালো, রানিবালা চিকিৎসালয়?

হ্যাঁ–বলুন।

আমি পীতাম্বর বিশ্বাসের ওয়াইফ বলছি। কাজটা হয়ে গেছে…।

আপনি খুশি তো, ম্যাডাম?

অফ কোর্স।

ক্লায়েন্টদের স্যাটিসফ্যাকশনই আমাদের মটো। এবার তা হলে…ইয়ে… আমাদের সার্ভিস চার্জের বাকি বিশহাজার টাকাটা কাউকে দিয়ে কাইন্ডলি একটু পাঠিয়ে দেবেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি, টোটাল তিরিশ হাজারের দশহাজার টাকা আপনার হাজব্যান্ড দিয়ে গিয়েছিলেন…।

কোনও চিন্তা করবেন না কালই টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

থ্যাংক য়ু, ম্যাডাম।

ফোনে কথা শেষ করে বৃদ্ধ ভাবছিলেন, কী অদ্ভুত পেশায় তিনি জড়িয়ে আছেন! যারা খুন হতে চায় তারা নিজের ইচ্ছেয় তার দোকানে আসে। খুন হওয়ার জন্য আগাম দেয়..অবশ্য কেউ-কেউ পুরো পেমেন্টও করে দেয়। তারপর নিজেই নিজেকে খুন করে। আর পুলিশের খাতায় সুইসাইডের সংখ্যা একটা বেড়ে যায়।

ইস, খুন হয়ে যাওয়া লোকগুলো যদি জানত আসল ক্লায়েন্টরা কখনও তার দোকানে আসে না–তারা ফোনেই কাজ সারে–আর নিজের কবর খোঁড়ার জন্য শিকারকেই পাঠিয়ে দেয় তার দোকানে!

# সন্ধের পর, একা

**সন্ধের পর, একা**

মল্লিকা বেশ বুঝতে পারছিল চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বিকৃত চিৎকার ওর ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আজকের এই মুহূর্তটার জন্য ও মনে-মনে বহুবার তৈরি হয়েছে। তাতে ওর মনে হয়েছিল, বেশ শান্তভাবে ঠান্ডা মাথায় ও ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে পারবে। কিন্তু এখন, নির্জন ঘরে, ভয়ংকর মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মল্লিকার সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

মোহনদাস জোয়ারদার তখন ঘরের একমাত্র দরজাটা লক করে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মেয়েটার মুখের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে। আজ পর্যন্ত মোহনদাস এমন কাউকে দেখেনি যে ভয় পায়নি। আচ্ছা-আচ্ছা সাহসী মেয়েও এই অবস্থায় ভয় পেয়েছে। অনেকে তো আবার কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মেয়েগুলো ছিচকাদুনে হলে মোহনদাস তেমন মজা পায় না। বরং বিরক্ত লাগে।

কী, দিদিমণি, ভয় করছে? চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে? রীতিমতো স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন দুটো করল মোহনদাস।

মল্লিকা জোর করে মাথা নাড়ল।

মোহনদাস কী বুঝল কে জানে! হেসে বলল, ভয়ের কী আছে! কিস্যু নেই। আমি তো তোমাকে আর খেয়ে ফেলছি না। শুধু একটু আদর করব। এ-কথা বোলো না যে, লাইফে কেউ কখনও তোমাকে আদর করেনি। তোমাদের গায়ে তো আর কিছু লেখা থাকে না–মানে, কজন লোক আদর করেছে তাদের নাম-ঠিকানা

তো আর ট্যাক্সির মিটারের মতো তোমাদের কপালে বা...ইয়ে...বুকে লেখা হয়ে যায় না। তোমাদের বডি যদি কম্পিউটার হত তা হলে কী হত সেটা বলা মুশকিল।

মোহনদাস জোয়ারদার একটা গানের কলি গুনগুন করে ভাজতে-ভজতে ঘরের বাঁ-দিকে রাখা একটা বড় সোফায় গিয়ে বসল। তার পাশের একটা ক্যাবিনেট থেকে ধীরেসুস্থে মদের বোতল, গ্লাস, আর সোডা বের করে নিল। কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে সে মল্লিকার দিকে আড়চোখে দেখছিল। মল্লিকা ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। একটু পরেই হয়তো জওহরলাল নেহরু রোডে জল দাঁড়িয়ে যাবে। গাড়িঘোড়া যানবাহন সব জট পাকিয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকবে না কারও। সুতরাং মল্লিকার আজ দেরি হওয়াটা কারও কাছেই তেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। আর মল্লিকাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার লোক এখন তো একজনই বুড়ি মা। অথচ গত বছরেও ওকে নিয়ে চিন্তা অথবা দুশ্চিন্তা করার দুজন মানুষ ছিল। এখন একজন আর নেই।

জওহরলাল নেহরু রোডের ওপরে মস্ত বাড়ি ব্যানার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার। বড় রাস্তার দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে তাকাতে হলে আকাশমুখো হতে হয়, ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। পরিভাষায় এ ধরনের বাড়িকেই বোধহয় বলে গগনচুম্বী অট্টালিকা। এই বাড়িরই টেন্থ ফ্লোরে মোহনদাস জোয়ারদারের কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল।

মল্লিকা এখানে রিসেপশনিস্টের চাকরিতে ঢুকেছে প্রায় একমাস। ও নিজেই একদিন চাকরির জন্য এসে হাজির হয়েছিল মোহনদাসের অফিসে। মল্লিকার যোগ্যতা ছিল তিনটি? পাস কোর্সে বি.এ. পাশ, অল্পসল্প টাইপিং-এর জ্ঞান, এবং ওর রূপযৌবন। মল্লিকা জানত, এরমধ্যে তৃতীয় যোগ্যতাটিই মোহনদাসের সবচেয়ে বেশি মনে ধরবে। কারণ, মোহনদাস জোয়ারদার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিয়ে তবেই মল্লিকা যেচে ওর কাছে এসেছে–ওর ফাঁদে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে। কারণ, মল্লিকার লক্ষ্য ছিল একটাই ও মোহনদাস জোয়ারদারকে শায়েস্তা করা। এই জানোয়ারটা গত দেড় বছরে অন্তত চারটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। বেচারা মেয়েগুলো নিতান্ত পেটের দায়ে মোহনদাসের কাছে চাকরি করতে এসেছিল–রিসেপশনিস্টের চাকরি। লাঞ্ছিত চারজনের মধ্যে দুজন ব্যাপারটা চেপে যায়। কিন্তু বাকি দুজন পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেও শেষ পর্যন্ত মোহনদাসের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়েনি। পুলিশ ও উকিলের যৌথ কেরামতিতে মোহনদাস ছাড়া পেয়ে যায়।

আপনি…আপনি আমাকে ছেড়ে দিন… কথাটা বলতে গিয়ে মল্লিকার গলা কেঁপে যায়? এভাবে আমার লাইফটা নষ্ট করবেন না, প্লিজ…।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মোহনদাস হাসল। মেয়েটা দেখতে সত্যি সুন্দরী। আগের চারটে মেয়ের মধ্যে সুলক্ষণা নামের মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। মেয়েটা ঘটনার পর বিস্তর কান্নাকাটি করেছিল। করবেই তো! ওর বয়েস যে ছিল মাত্র উনিশ। তবে মোহনদাস ওকে দু-হাজার টাকা দিয়েছিল। বিয়ে করবে এরকম একটা বেহুদা শপথও করেছিল। এতে সুলক্ষণার কান্না থেমে গিয়েছিল। এবং মোহনদাস প্রায় দু-মাস মেয়েটাকে ভোগ করতে পেরেছিল।

এভাবেই দিব্যি চলছিল, কিন্তু কে যে সুলক্ষণার মাথায় কুমতলব ঢোকাল কে জানে! মেয়েটা হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে গেল। তার কদিন পরেই পুলিশি ঝাট, কোর্টকাছারি। বহু টাকা আর বুদ্ধি খরচ করে সেবার মোহনদাস পিঠ বাঁচাতে পেরেছিল।

এই মেয়েটার বয়েস হয়তো সাতাশ-আঠাশ হবে, তবে সুলক্ষণার চেয়েও সুন্দরী দেখতে, আর জিনিসও ভালো।

মল্লিকার কথার উত্তরে মোহনদাস অভয় দেওয়ার হাসি হাসল দ্বিতীয়বার। বলল, কী যে বাচ্চা মেয়ের মতো কথা বলো! তোমাকে ছেড়ে দেব না-তো কি আটকে রাখব! তুমি লাইফ নষ্ট করার কথা বলছ কেন, মল্লিকা? আমরা দুজনে এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় যদি বন্ধ ঘরে একটু বুলবুলি করি তাহলেই তোমার লাইফ নষ্ট হয়ে যাবে! আরে, দিদিমণি, লাইফ কি এতই সস্তা! গলাখাঁকারি দিল মোহনদাস। আর-একবার চুমুক দিল গ্লাসে। না, বেশি মদ গিললে চলবে না। তাতে শরীরের আঁকুপাঁকু ভাবটা বাড়বে, শরীরটা চাগাড় দিয়ে উঠবে কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করা যাবে না। কিছুক্ষণ ঠুকঠুক করেই আউট। মল্লিকার সঙ্গে মোহনদাস অনেকক্ষণ তারিয়ে-তারিয়ে ব্যাট করতে চায়। এরমধ্যেই মোহনদাস বেশ বুঝতে পারছে, ওর শরীরটা অধীর হয়ে উঠেছে।

মল্লিকার চোখে এবার সত্যি-সত্যি জল এসে গেল। ভাঙা গলায় ও কোনওরকমে উচ্চারণ করল, আপনি..আপনি একটা রেপিস্ট!

মল্লিকা কী ভেবে এসেছিল, আর কী হচ্ছে! ও মন শক্ত করে এসেছিল মোকাবিলা করতে, লড়াই করতে, শোধ নিতে–অথচ এভাবে ভেঙে পড়ছে।

কোনও রেপিস্টের সামনে মেয়েদের মনটাই বোধহয় আগে তছনছ হয়ে যায়, তারপর শরীর।

মোহনদাস জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, মল্লিকা, তুমি বড় উলটোপালটা কথা বলো! ব্যাপারটা রেপ হবে কি হবে না তার সবটাই ডিপেন্ড করছে তোমার ওপরে। তুমি যদি কোনওরকম ঝামেলা না করে ব্যাপারটা ইয়ে…মানে…এনজয় করো, তা হলে সেটাকে মোটেই রেপ বলা যায় না। আর তুমি যদি ফালতু-ফালতু চিৎকার-চেঁচামেচি করো, হাত-পা ছুঁড়ে ঝামেলা পাকাও তা হলেও রেজাল্ট সেই একই–তবে তখন ব্যাপারটা ওই রেপ হয়ে দাঁড়াবে। মোহনদাস হাসল চাপা শব্দ করে ও এখানে যে লড়াই বা চেঁচামেচি করে বিশেষ সুবিধে হবে না সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পেরেছে মল্লিকা। এই ঘরটা এই বেপরোয়া জাদটার প্রাইভেট অফিস। তবে বড় বেশি প্রাইভেট।

আজ সকাল থেকেই মল্লিকার মনটা কেমন করছিল। মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, আর ঝোড়ো হাওয়া। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, আজই মোহনদাসের সঙ্গে মোকাবিলার দিন–অথবা, মোকাবিলার রাত। আর হলও ঠিক তাই।

পাঁচটার পর মোহনদাস জোয়ারদার একগাদা টাইপের কাজ চাপিয়ে দিয়েছে মল্লিকার ওপরে। তারপর, সাতটার সময়, যখন ক্লাস হয়ে গেল, ছাত্রছাত্রীরা সব চলে গেল একে-একে, তখন মোহনদাস মল্লিকাকে ওর ভেতরের প্রাইভেট অফিসে ডেকেছে ডিক্টেশান দেওয়ার জন্য। গোটা অফিসে তখন ওরা দুজন, আর দারোয়ান কাম-সিকিওরিটি গার্ড মনোজিৎ। একটু পরেই মোহনদাস একমিনিট আসছি। বলে উঠে গেছে এবং একমিনিট বা ষাট সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার আগেই ফিরে এসেছে।

মল্লিকা আন্দাজ করতে পেরেছিল, মোহনদাস মনোজিৎকে ছুটি দিয়ে এল। আর তখনই ওর বুকের ভেতরে কেউ টিপটিপ করে কিল মারতে শুরু করেছিল। কিন্তু মল্লিকা ঠিক প্রকৃত অর্থে ভয় পায়নি। সেটা পেয়েছে এখন, একটু আগে। আগের চারটে মেয়ের করুণ অবস্থার কথা মল্লিকা এখন আরও ভালো করে বুঝতে পারছে। ওদের জন্য এক অদ্ভুত দুঃখ আর মমতা উথলে উঠছিল মল্লিকার মনে। এমনকী নিজের জন্যও।

ওই চারজন মেয়ের ঘটনা নিয়ে হইচই কম হয়নি। ব্যাপারটা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ সমিতি-ও অনেক মিটিং-মিছিল করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। মল্লিকা খবরের কাগজে এই ঘটনার প্রত্যেকটি রিপোর্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। আর তখন থেকেই মোহনদাস জোয়ারদার নামের এই লোকটার ওপরে বিজাতীয় এক রাগ আর আক্রোশ তৈরি হয়েছে। মল্লিকার তো আর কিছু হারাবার ভয়ডর নেই। সুতরাং ও সটান বেলঘরিয়ার আস্তানা থেকে একদিন চলে এসেছে রাজা রামমোহন সরণিতে, পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ সমিতি-র ছোট্ট অফিসে। সেখানে ও দেখা করেছে সেক্রেটারি বেলা সরকারের সঙ্গে।

ড্যাম্প ধরা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু, মাদার টেরেজা, ইন্দিরা গান্ধির আর কিরণ বেদির ছবি। এদিকে-ওদিকে কিছু ঝান্ডা আর পোস্টার। ঘরের কোণে আঠা-রং-তুলি। দুটো বেঞ্চে দুজন মহিলা বসে রয়েছে।

বেলা সরকার একটা বড় টেবিল সামনে রেখে বসেছিলেন। তার বয়েস হয়েছে, চোখে চশমা, পোড়খাওয়া মুখ, সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই।

মল্লিকা ওঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চেয়েছে। সুতরাং বেলা সরকার নরম গলায় কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন দুই সদস্যাকে। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মল্লিকা বুঝতে পেরেছিল, বেলাদি-র নির্দেশ সহজে অমান্য করা যায় না।

মল্লিকা নিজের আক্রোশের কথা জানিয়েছিল বেলা সরকারকে। বলেছিল, দিদি, মোহনদাস জোয়ারদারকে আমি শায়েস্তা করতে চাই।

বেলাদি অবাক হয়ে বলেছেন, তুমি তুমি কেমন করে পারবে! সমিতি থেকে লড়াই করে আমরাই কিছু করতে পারলাম না...।

আমি পারব! জেদের গলায় বলেছে মল্লিকা।

বেলা সরকার অবাক চোখে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখছিলেন। একে কবজায় পেলে মোহনদাস কিছুতেই ছাড়বে না–চোখের পলকে গতি করে দেবে। সুলক্ষণা নামের মেয়েটা কীভাবে না নাস্তানাবুদ হয়েছে। এবার এই মেয়েটা হেনস্থা হতে চায়সাধ করে।

বেলা সরকারের কোনও বারণই শোনেনি মল্লিকা। শুধু বলেছে, আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন, প্লিজ। আপনাদের না-জানিয়েও আমি যেতে পারতাম…কিন্তু পরে যদি কোনও পুলিশি ঝাট হয়, সেইজন্যে আপনাদের জানিয়ে কাজে নামতে চাই। আপনারা তখন আমার পেছনে দাঁড়াবেন। দাঁড়াবেন তো?

মেয়েটার কথায় কী যেন ছিল। বেলা সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিলেন। মল্লিকাকে ওঁর কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছিল। কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটার মুখ!

মল্লিকা কাজে নামার আগে আরও দুদিন বেলাদির সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেছিল। তারপর সোজা মোহনদাস জোয়ারদারের দপ্তরে।

কিন্তু শায়েস্তা করতে যুদ্ধে নেমে এ কী করুণ অবস্থা মল্লিকার! বারবার বুড়ি মায়ের কথা মনে পড়ছে। চোখ ফেটে জল আসছে। বাইরে বাজ পড়ার শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠছে ও।

ভয়ার্ত চোখে মোহনদাসকে দেখল মল্লিকা। ফরসা, টিকোলো নাক, মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, গাল দুটো সামান্য ফোলা, চোখে রিমলেস চশমা। বয়েস কত হবে? বড়জোর পঁয়তাল্লিশ। দেখে কে বলবে সুশ্রী ভদ্র এই মানুষটার খোলসের ভেতরে একটা অমানুষ লুকিয়ে আছে।

মোহনদাস তখন আবার গুনগুন করে গান ধরেছে : চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়, চুনরি কে নীচে কেয়া হ্যায়…।

সুর ভাঁজতে-ভাঁজতেই গ্লাস-বোতল ইত্যাদি আবার ক্যাবিনেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল মোহনদাস। চোখ থেকে চশমা খুলে রেখে দিল ক্যাবিনেটের ওপরে। তারপর আবার এসে বসল সোফায়। গদির ওপরে হাতের চাপড় মেরে বলল, এসো, আর দেরি কোরো না…তোমাকে তো আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। এসো, এসো–তোমার কোনও চিন্তা নেই–এটা সোফা নয়, সোফা কাম-বেড। বিশ্রীভাবে হাসল, গদিতে আলতো করে তিনটে চাপড় মেরে বলল, সোফা মানে তো জানোই। আর কাম কিংবা বেডও তোমার নিশ্চয়ই জানা। কাম, কাম..ফালতু ঝামেলা কোরো না, লক্ষ্মীটি সোফা থেকে উঠে তার কলকবজা নেড়ে পিঠের

গদিটাকে পেতে দিল মোহনদাস, বলল, সোফায় কাজ শেষ। এখন শুধু কাম আর বেডের ব্যাপার…

হঠাৎই মল্লিকার বুকের ভেতরে সমস্তরকম ঝড়-ঝা থেমে গেল। চোখের কোণে জল থাকলেও বুকের গভীরে উথালপাতাল আর নেই। সাপ যখন ছোবল মারবেই তখন আর কীসের ভয়।

প্রতিশোধের কথা মনে পড়ছিল মল্লিকার, মনে পড়ছিল ওই চারটে মেয়ের কথা। আর একটু পরেই মল্লিকা ওদের দলে যোগ দেবে। তারপর? তারপর সত্যিই কি ক্ষান্ত হবে মোহনদাস? মল্লিকা কি পারবে লোকটার বিষদাঁত ভেঙে দিতে?

মল্লিকা অবাক হয়ে দেখল, ও ধীরে-ধীরে মোহনদাসের সোফা কাম-বেডের দিকে এগিয়ে চলেছে সাপের চোখের টানে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। তবে মল্লিকার শরীরটা এক স্থির কম্পাঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আর কান্না অথবা গোঙানির একটা আওয়াজ পা টিপে টিপে উঠে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে। কিন্তু মল্লিকা দাঁতে দাঁত চেপে শব্দটাকে বন্দি রেখে দিয়েছে গলার ভেতরে।

মল্লিকাকে বেশিদূর এগোতে হল না। অধীর উত্তেজিত মোহনদাস নিজেই উঠে এল সোফা কাম-বেড থেকে। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায়ে একেবারে জাপটে ধরল মল্লিকাকে। মল্লিকা যে সামান্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল সেটা বোধহয় প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বশে। কারণ, ওর চোখে তখন কোনও দৃষ্টি ছিল না, হৃৎপিণ্ডে কোনও শব্দ ছিল না, ফুসফুঁসে কোনও বাতাস ছিল না। একটা কোমল মৃতদেহ যেন আত্মসমর্পণ করল মোহনদাস জোয়ারদারের হাতে।

ঘরে টিউব লাইট জ্বলছিল। সেই ঝকঝকে আলোতেই মল্লিকার জামাকাপড় ধরে বেপরোয়া টানাটানি শুরু করে দিল মোহনদাস। আর একইসঙ্গে মল্লিকাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে চলল সোফা কাম-বেডের দিকে। বলল, রুমিনি, রুমিনি, শাদি কে বাদ কেয়া কেয়া হুয়া….হাঃ, হাঃ, উ-উ উ– মল্লিকার গলার খাঁজে মুখ ঘষতে ঘষতে আরও বলল, ফুল ছাড়াই ফুলশয্যা করছি বলে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি… মোহনদাসের মুখ থেকে হুইস্কি মেশানো বাতাস বেরিয়ে এল।

মল্লিকা আর বাধা দিচ্ছিল না। ওরা পৌঁছে গেল শয্যায়। উজ্জ্বল আলোয় জীবনে এই প্রথম সম্পূর্ণ নগ্ন হল মল্লিকা। মোহনদাস নিজের পোশাক ছিঁড়ে-টিড়ে কোনওরকমে খুলে একেবারে হামলে পড়ল মল্লিকার শরীরের ওপরে।

ঘরের টিউব লাইটটা এ-দৃশ্য বহুবার দেখেছে, কিন্তু মোহনদাসের জানোয়ারের মতো আচরণে সে-ও একবার কেঁপে উঠল। আর বাইরের বৃষ্টি যেন নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মাথা কুটে মরতে লাগল বাইরের দেওয়ালে, জানলার শার্সিতে।

আর ঠিক তখনই অদ্ভুত কান্না একেবারে ভাসিয়ে দিল মল্লিকাকে।

মোহনদাস জোয়ারদার মল্লিকার কান্না খেয়াল করেনি। কারণ মল্লিকা কঁদছিল প্রায় নিঃশব্দে– শুধু ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। মোহনদাস অর্ধেক চোখ বোজা অবস্থার সেটাকে মল্লিকার সুখের সংকেত বলে ভুল করল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ওর আদরের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। ব্যাট করার আনন্দে খেলার নিয়ম-কানুনের ব্যাপারটা মোহনদাসের আর খেয়াল ছিল না।

খেলা যখন শেষ হল মল্লিকা তখনও কাঁদছে। এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চলছিল ওর মনের ভেতরে। কাজটা কি ঠিক হল? শাস্তির পরিমাণটা পাপের তুলনায় বেশি হয়ে গেল না তো! ও চারটে অসহায় মেয়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মন থেকে দুঃখবোধটা মুছে যাচ্ছিল না। মোহনদাস যখন ওকে ছেড়ে দিল, তখনও ওর চোখে জল।

মোহনদাস ক্লান্তভাবে নিজের পোশাক ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, আর সতর্ক চোখে দেখছিল মল্লিকাকে। মেয়েটা দারুণ। কিন্তু হঠাৎ করে কোনও পাগলামি করে বসবে না তো! বেশ মনে আছে, অনুশ্রী না তনুশ্রী নামের বছর পঁয়ত্রিশের মেয়েটা সবকিছু মিটে যাওয়ার পর হঠাৎই ঘরের টেবিল থেকে একটা পেন-স্ট্যান্ড তুলে নিয়ে ক্ষিপ্তের মতো আক্রমণ করেছিল মোহনদাসকে। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। মোহনদাস সতর্ক তো ছিলই, তা ছাড়া ওর গায়ে জোরও যথেষ্ট। প্রচণ্ড থাপ্পড়ে মেয়েটাকে কাহিল করে দিয়েছিল মোহনদাস।

কাঁদতে কাঁদতে শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পরে নিল মল্লিকা। টিউব লাইটের আলোয় ওর দু-গাল আশুতে চকচক করছিল।

মোহনদাস বিরক্ত-জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, কী হল, এখন আবার কঁদছ কেন? কান্নার কী আছে?

মল্লিকা ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, আপনার জন্যে কাঁদছি।

বাইরে বৃষ্টির তেজ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল পলকে। কোথাও বাজ পড়ল কান-ফাটানো শব্দে।

ব্যঙ্গের একটুকরো হাসি তেরছাভাবে ছড়িয়ে গেল মোহনদাসের মুখে : কেন, হঠাৎ আমার জন্যে দুঃখু হচ্ছে কেন?

মল্লিকা শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে সেটা দিয়ে চোখ-গাল মুছে বলল, আপনি আর নেই বলে।

কী যে সব উলটো-পালটা কথা বলো! সোফা কাম-বেড থেকে উঠে দাঁড়াল মোহনদাস জোয়ারদার। ক্যাবিনেটের ওপরে রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে মল্লিকাকে কাছে ডাকল ও এসো, এদিকে এসো। আর-একটু আদর করি। তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। দেখলে তো, একটু-আধটু বুলবুলি করে তোমার লাইফ একটুও নষ্ট হয়নি! আরে বাবা, এ কি ঘটি-বাটি যে টোল খেয়ে যাবে!

মল্লিকা পিছিয়ে গিয়েছিল ঘরের এককোণে রাখা একটা টেবিলের কাছে। আলোয় দিকে পিঠ করে দাঁড়ানোয় ওর মুখটা আবছা দেখাচ্ছিল। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে শক্ত গলায় মল্লিকা বলল, আমি লক্ষ্মী নই–অলক্ষ্মী। তা ছাড়া আমার লাইফ বলে কিছু থাকলে তবে তো আপনি নষ্ট করবেন। তখন ভয় পেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতো কথা বলেছি। আসলে আমি আপনার কাছে চাকরি নিয়েছিলাম আজকের দিনটার জন্যে। আপনি যে একটার-পর-একটা মেয়ের সর্বনাশ করে যাচ্ছিলেন, সেটা রোখবার জন্যে…আর আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে।

শায়েস্তা! আমাকে! বেশ জোরে হেসে উঠল মোহনদাস।

কিন্তু মল্লিকার কানে হাসিটা ফঁপা শোনাল। ও বলল, খুব খারাপ লাগছে, জানেন– আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল মল্লিকা? কিন্তু কী করব! আমার তো আর কোনও উপায় ছিল না।

তুমি কী করেছ আমাকে? চাপা কর্কশ গলায় মোহনদাস কথা বলল।

মল্লিকা ঘাড় ঘুরিয়ে অদ্ভুত চোখে দেখল মোহনদাসকে। হেসে বলল, এখনও বোঝেননি? আপনার না আই. কিউ. ভীষণ কম। এইস-এর নাম শুনেছেন?

মোহনদাস জোয়ারদারের চোখের সামনে গোটা ঘরটা দুলে উঠল। এইচ. আই. ভি., এই — কাগজে এ-নিয়ে কত লেখালেখি চলেছে গত কয়েকবছর ধরে। মেয়েটা কি সত্যি বলছে, না মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে? মোহনদাসের শরীরের ভেতরে কতকগুলো অশরীরী পোকা যেন কিলবিল করে উঠল। ও এপাশ-ওপাশ তাকাল অসহায়ভাবে। আবার বসে পড়ল সোফায়। আমতা-আমতা করে বলল, তুমি…তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। ঠাট্টা করছ।

মল্লিকার ভীষণ স্নান করতে ইচ্ছে করছিল। মাথায় টিপটিপ ব্যথা আর গা-বমি ভাব। ও সোফায় বসে থাকা লম্পট জানোয়ারটাকে দেখছিল। ওটার দাঁত-নখ আর নেই। সব খতম। মল্লিকার কেমন যেন মায়া হল। বলল শান্ত নরম গলায়, না ভয় দেখাচ্ছি না। আপনার অবস্থাটা এখন ঠিক কীরকম জানেন? ধরুন, সাঁতার জানে না, এমন একজন লোক হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিল গঙ্গায়। হিসেবমতো জলে ডোবার পর কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেয়ে তারপর লোকটা মারা যাবে। ওর ফুসফুঁসে বাতাসের বদলে হুহু করে ঢুকে পড়বে গঙ্গার জল। তারপর একসময় বেচারা মরবে।

একটু থামল মল্লিকা। কপাল থেকে চুল সরাল। আয়না দেখার কোনও উপায় নেই। গলার কাছে, গালে সামান্য জ্বালা করছে। শরীরে সামান্য ব্যথা। হাতব্যাগটা রয়েছে রিসেপশান কাউন্টারের ডেস্কের মধ্যে। ওটা পেলে নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিত।

এ তো গেল ডাক্তারি হিসেব। মল্লিকা আবার বলতে শুরু করল। এতটা মন খুলে নিজের অসুখের কথা কাউকে বলতে পারেনি ও : কিন্তু আমার হিসেব কী বলে জানেন? যে-মুহূর্তে লোকটা ব্রিজের আশ্রয় ছেড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে সেইমুহূর্তেই খতমের খাতায় ওর নাম উঠে গেছে। শুন্যে ভেসে থাকার সময়টুকুই ওর বিচিত্র জীবন–যা থেকেও নেই–অনেকটা মরীচিৎকার মতো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মল্লিকা : আপনার-আমার জীবনটা এখন তাই। আমার..আমার স্বামী জাহাজে কাজ করত। কোথা থেকে, কোন বিদেশ থেকে, সে এইডস-এর জীবাণু নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। যখন সব জানা গেল, তখন সে-ও শেষ…আর, আমিও।

মল্লিকা, এসব তুমি কী বলছ! শিশুর মতো অসহায় সুরে কথা বলল মোহনদাস জোয়ারদার। ওর গলার স্বরে আতঙ্ক নিশ্চিত ছাপ ফেলেছে। ও ভাবতেই পারছে

না, ওর জীবনটা এখন শুধু মায়া–আছে অথবা নেই, এই দুয়ের মাঝখানে দুলছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশের লালচে আভার কথা মনে পড়ল মোহনদাসের। সেতারের তারে শেষবারের মতো টান মেরে সেতারি যখন চলে যায়, তখন সেই সুরের রেশ কী চেষ্টাই না করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে! মোহনদাসের বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। একটু আগেই ওর জীবন কী সম্পূর্ণ ছিল! আর এখন…সব ফাঁকা!

মল্লিকা তখন আপনমনেই বিড়বিড় করে নিজের কথা বলে যাচ্ছে? ..আমার স্বামীর প্রথম ফ্লু মতো হয়েছিল। তারপর জ্বর, গলা ব্যথা। আর দেখতে-দেখতে বছরখানেকের মধ্যে, সব শেষ।…কিন্তু আমি রয়ে গেলাম…হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়া ওই মানুষটার মতো…শুন্যে…এখনও গঙ্গা ছুঁতে পারেনি।

পায়ে-পায়ে মোহনদাসের কাছে এগিয়ে এল মল্লিকা : ..গত বছর কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছিল। আপনি বোধহয় ছবিটা খেয়াল করেননি। অবশ্য কেই-বা খেয়াল করে! জানেন, অসুখটা হওয়ার পর এটা নিয়ে কত খোঁজখবর করেছি, কতবার সুইসাইড করার কথা ভেবেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আমি মরে গেলে আমার বুড়িমা-টাকে যেন দেখার কেউ নেই! হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল মল্লিকা। এমনভাবে বারবার মুখে হাত বোলাতে লাগল যে অদৃশ্য কতকগুলো মাছি ঘনঘন বসছে ওর মুখের ওপরে । আপনি হয়তো জানেন না, এইডস ছড়ালে ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ২৬৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাতে ছ-মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। আবার ২৭০ নম্বর ধারায় এ-জাতীয় রোগ ছড়ালে দু-বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে, ফাইন হতে পারে, এমন কথাও লেখা আছে। হাসল মল্লিকা তেতো হাসি, বলল, এসব আইনই হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, প্লেগের কথা ভেবে। তবে প্লেগের বদলে লেখা হয়েছিল বিপজ্জনক কোনও সংক্রামক অসুখ। এখন তো এই এসেছে…আর, প্লেগও একবার উঁকিঝুঁকি মেরে গেছে।… কিন্তু শাস্তির ভয় আমার থাকবে কী করে! ফাঁসির আসামি কখনও জেলের ভয় পায়। তা ছাড়া আমি তো আপনাকে শায়েস্তা করতে এসেছিলাম।

হঠাৎই মোহনদাস হাউমাউ করে ভাঙা গলায় কাঁদতে শুরু করল। জড়ানো গলায় কীসব বলতে লাগল কে জানে!

মল্লিকা শাড়ি-টাড়ি ঠিকমতো গুছিয়ে নিল শেষবারের মতো। মুখে আঁচল ঘষল কয়েকবার। তারপর বলল, নিন, এবার দরজা খুলে দিন…আমি বাড়ি যাব..মা চিন্তা করবে। একটু হেসে? নাকি আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন!

আচমকা মল্লিকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনদাস জোয়ারদার। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে টিপে ধরল মল্লিকার গলা। লোকটার মুখ থেকে জন্তুর মতো শব্দ বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে মদের গন্ধ।

মল্লিকা প্রাণপণে বাধা দিল। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, কী ছেলেমানুষি করছেন! আপনি বুঝতে পারছেন না, আমরা দুজনে কেউই আর ঠিকমতো বেঁচে নেই। আপনি আমাকে খুন করতে চান করুন, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। একটা মড়া আর একটা মড়াকে খুন করলে কার কী আসে। যায়– ধস্তাধস্তি করতে করতেই হাসি পেয়ে গেল মল্লিকার। ও হেসে উঠল শব্দ করে।

মোহনদাস কেমন যেন হতভম্ব হয়ে ছেড়ে দিল মল্লিকাকে। লোকটার ফরসা মুখ নীলচে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, প্রথম সুযোগেই কি এইচ. আই. ভি. বাসা বাঁধে শরীরে? মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজল মোহনদাস। ওর শরীরের সব শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। ও সম্মোহিতের মতো প্রাইভেট অফিসের দরজা খুলে দিল। ভয়ংকর সুন্দরী মেয়েটা সহজ পা ফেলে বেরিয়ে গেল বাইরে। মোহনদাসকে রেখে গেল শূন্যে হাওড়া ব্রিজ আর গঙ্গার মাঝখানে।

তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল মল্লিকা। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল, মোহনদাসের হাতে হেনস্থা হওয়া চারটে মেয়ের কথা। ওদের কথা ভাবতে-ভাবতে মল্লিকা নিজের ভেসে থাকা জীবনের একটা মানে খুঁজছিল।

# মনে করি, খুনির নাম এক্স

**মনে করি, খুনির নাম এক্স**

আসুন, ইনস্পেক্টর–আসুন। এই দুর্ঘটনা-গৃহে আপনাকে স্বাগত জানাই। কী বলছেন? দুর্ঘটনা নয়, খুন? না, না, খুন কেমন করে হবে! খামোখা কেন কাকাকে কেউ খুন করতে যাবে? হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, আমার কাকা বিনোদন সামন্ত লোক খুব সুবিধের ছিল না। নামের সঙ্গে কাজকর্মের দারুণ মিল ছিল। হোল লাইফ বিনোদন করে গেল কোনওরকম অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স ছাড়াই। কাকিমার দিকে ফিরেও তাকাত না। আর ছেলে, রাকেশ, সে যেন থেকেও নেই। ছেলেটা গতবছর স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করার পর রেজাল্ট নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল ওর বাবা তখন জলপথের একজন ইয়ারকে নিয়ে মাইফেল করতে রওনা দিচ্ছে। বুঝুন! রাকেশ মার্কশিট দেখাতে চাইলে জবাব দিল, দেখার আবার কী আছে! ওটা বাঁধিয়ে গলায় ঝুলিয়ে চরকি কাট। তা হলেই দেখুন কীরকম বাবা! বাবা তো নয়, একেবারে পিতাশ্রী!

আপনি আবার আমাদের স্টেটমেন্ট নেবেন? কোনও মানে হয়! কী বলছেন? আপনার হাতে কিছু সূত্র এসেছে? পরিভাষায় যাকে বলে ক্লু? বেশ, আবার নিন জবানবন্দি। তবে, বন্দি করবেন না, প্লিজ–অন্তত আমাকে। আমি মশাই আগাপালা নির্দোষ। যদিও আমি কাকাকে খুব একটা পছন্দ করতাম না।

না, নতুন কী আর বলব!

পরশু সকালে কাকিমা প্রথম চেঁচামেচি শুরু করে। আপনার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, ইনস্পেক্টরবাবু। কাকা আলাদা ঘরে শুত। কাকিমা আর রাকেশ অন্য ঘরে। সকালে কাকার জন্যে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে কাকিমা দ্যাখে দরজা তখনও বন্ধ। কাকিমা হেভি পতিব্রতা ওয়াইফ। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দরজা

ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার। রাকেশ ছুটে এল। একতলার ঘর থেকে আমি ছুটে গেলাম। ছোটকা ছুটে এল। হ্যাঁ, ছোটকা মানে কাকার ছোটভাই সনাতন সামন্ত। ওরও আবার নামের সঙ্গে কাজকর্মের দারুণ মিল। একেবারে তিলক কাটা গৌর-নিতাই। দাদাকে–মানে, আমার কাকাকেযমের মতো ঘেন্না করত। সুযোগ পেলেই জ্ঞান দিত, বলত, ভগবান তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবে।

তো ভগবান উচিত শিক্ষা দিল।

দরজা ভেঙে দেখি কাকা চন্দ্রবিন্দু।

কাকিমা একেবারে বাংলা সিনেমার মতো কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ছোটকা থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আর রাকেশ চোয়াল শক্ত করে মা-কে সামলানোর চেষ্টা করছিল।

আমার কথা জিগ্যেস করছেন, ইনস্পেক্টর?

আমি বাউন্ডুলে মানুষ। শখের নাটক-ফাটক করি। দু-একটা টিউশানি করি বটে, কিন্তু তাতে আর কপয়সা হয়! কাকাই আমাকে টাকাটা পয়সাটা দিত। কাকা চলে গিয়ে আমার বেশ প্রবলেম হয়ে গেল। ছোটকা আমাকে–এই দামড়া বেকার ভাইপোটাকে খুব একটা লাইক করে না। সে যাই হোক, কাকা চলে যাওয়ায় আমি শক পেয়েছি কি না জিগ্যেস করছেন? বেশক, বেশক। একে তো আত্মীয়, তার ওপরে লক্ষ্মী-টক্ষি দিত। তবে বেচারি কাকিমাকে উদোম টরচার করত। এখন রাকেশ বড় হয়ে গেছে…আগে তো বিনোদন সামন্তের মেইন বিনোদন ছিল যখন-তখন বউয়ের গায়ে হাত তোলা। আমি তো বহুবার প্রোটেস্ট করেছি, কাকাকে ধরে থামিয়েছি। কিন্তু পেটে জলপানি পড়লে কাকার আর জ্ঞান থাকত না। কী বলব আপনাকে…তখন খেদি-পেচিকেও নূরজাহান দেখত। আর নুরজাহানকে খেদি-পেঁচি।

কী বলছেন? কাকা কীভাবে মারা গেছে? কেন, হার্টফেল করে! না, না–আপনার খুন বলে মনে হচ্ছে কেন? পোস্ট মর্টেমে সেরকম কিছু কি পাওয়া গেছে? ও, পাওয়া যায়নি। তবে আর সমস্যাটা কোথায়! কাকা পাতি হার্টফেল করে মারা গেছে। কী বলছেন? ইলেকট্রিক শক দিলেও মানুষ হার্টফেল করে মারা যায়? তা আপনি কি সেরকম কোনও ইয়ে, মানে, ক্লু পেয়েছেন?

না, দেখুন, একটা লম্বা ইলেকট্রিকের তার খুঁজে পাওয়াটা কোনও ব্যাপার নয়। আপনি কি বলতে চান এটা কোনও প্রমাণ? কোনও দরকারে কেউ তো তারটা কিনে থাকতেই পারে। কিন্তু তারটা আপনি পেলেন কোথায়? ছোটকার ঘরে! দাঁড়ান, ছোটকাকে ডাকছি। মিছিমিছি কাউকে সন্দেহ করা ঠিক নয়, ইনস্পেক্টর।

এই যে, ছোটকা, তুমি একটা লম্বা ইলেকট্রিকের তার কিনেছিলে? এই পুলিশ অফিসার বলছেন…কী কেনোনি! চমৎকার! দেখলেন তো, অফিসার, ছোটকা তার-টার কিছু কেনেনি। আপনার সন্দেহ-টন্দেহর কোনও মানে হয় না।

কী বলছেন? তারটা অন্য কেউ কিনে ছোটকার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল? যাঃ, এটা কখনও হয়! আর কে তার কিনবে! আমি, কাকিমা, রাকেশ…আমাদের কারও তার দরকার পড়েনি। কাকার পায়ের চেটোয় আপনি পোড়া দাগ পেয়েছেন বলছেন? হতে পারে কাকা হয়তো জ্বলন্ত সিগারেটের ওপরে ভুল করে পা ফেলেছিল। কেন, এটা অসম্ভব বলছেন কেন? পোড়া দাগ দু-পায়ের তলাতেই রয়েছে। হ্যাঁ, এটা একটু অদ্ভুত মানছি। একসঙ্গে দু-দুটো জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা–তা-ও আবার দু-পায়ের তলায়!

আচ্ছা, আপনিই বলুন কাকাকে খুন করে আমাদের কী লাভ! কাকিমা নিশ্চয়ই নিজে থেকে বিধবা হতে চাইবে না! রাকেশের পক্ষে বাবাকে খুন করা অসম্ভব। ছোটকা ধার্মিক মানুষ। এ ধরনের লোক বিশ্বাস করে, কাউকে শাস্তি-টাস্তি যা দেওয়ার ভগবানই দেবেন। কী বলছেন, আমি? হাসালেন, ইনস্পেক্টর। যে আমাকে রোজ সোনার ডিম পেড়ে দেয় তাকে আমি খুন করতে যাব কেন! না, না, সন্দেহ আপনি করতেই পারেন। কারণ, সন্দেহ করার জন্যেই আপনি মাইনে পান।

ইনস্পেক্টর, একটা গুপ্তকথা আপনাকে বলি। কাকা ব্যাপক ভীতু ছিল। ভুতের গল্প একটুও সহ্য করতে পারত না। টিভিতে ওরকম ফিলিম-টিলিম কিছু হলে ভয়ে কেঁপে উঠে টিভি অফ করে দিত। রাকেশকে এইসব ছবি দেখা নিয়ে বেশ বাজেভাবে বকাঝকাও করত। খেয়াল রাখত না যে, ছেলে বড় হচ্ছে। এই তো, রাকেশ এসেছে। ওকেই জিগ্যেস করে দেখুন।

আচ্ছা, ইনস্পেক্টর, আপনাকে দেখে তো বেশ চালাক-চতুর বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই এলিমিনেশান থিয়োরির কথা শুনেছেন। কাকা যদি সত্যি-সত্যিই খুন হয়ে থাকে, তা হলে আপনি মনে-মনে একটা লিস্ট তৈরি করুন–তাতে

লিখুন, কারা কারা কাকাকে খুন করতে পারে। সেই লিস্টে নিশ্চয়ই আমাদের তিনজন কি চারজনের নামই থাকবে। এইবার আপনি যুক্তি দিয়ে, লজিক দিয়ে, অ্যানালিসিস করে একে-একে নাম বাদ দিয়ে লিস্টটাকে ছোট করে আনুন। মানে, মেথড অফ এলিমিনেশান আর কী! তা হলেই দেখবেন, সব নামই একে-একে বাদ হয়ে গেছে। হাতে রইল শূন্য। হাঃহাঃহাঃহাঃ।

কী, আপনি ওসব লিস্ট-ফিস্ট বানাতে চান না? ওগুলো গল্পে-টল্পে হয়? আপনার টেকনিক একটু আলাদা? আপনি ভীষণ একবগ্গা টাইপের লোক দেখছি। বলুন তো, বাড়ি সার্চ করে আপনার কী লাভ! এখনও আমাদের অশৌচ কাটেনি, তার মধ্যে আপনার তত্ত্বতালাশের ঝঞ্ঝাট!

ওই দেখুন, আপনার সিপাইরা কী নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য! এ তো দেখছি ড্রাকুলার ড্রেস। কালো আর লাল রঙের আলখাল্লা! লম্বা ছুঁচলো দুটো নকল দাঁত! কী বলছেন, কাকাকে এই পোশাক পরে কেউ হয়তো ভয় দেখিয়েছিল?

হ্যাঁ, কাকার হার্ট খুব উইক ছিল, তার ওপর কাকা ছিল রামভিতু আগেই তো আপনাকে বলেছি। ড্রাকুলার মেকাপ নিয়ে রাতে কাকাকে কেউ ভয় দেখালেই কাজ শেষ। কিন্তু কে ভয় দেখাবে? আচ্ছা, আপনি আলখাল্লার হাইটটা মাপুন তো…হা, প্রায় সাড়ে পাঁচফুট। তা হলে তো কাকিমা আর রাকেশ সরাসরি বাদের খাতায়–ওদের হাইট অনেক কম। বাকি রইলাম আমি আর ছোটকা..আমাদের আপনি মিছিমিছি সন্দেহ করছেন।

কী বলছেন, আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনি? ড্রাকুলার ছদ্মবেশে কেউ কাকাকে ভয় দেখালেও কাজ হয়নি কাকা তাতে মারা যায়নি! ও…তারপরই খুনি শিয়োর হওয়ার জন্যে কাকাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে খতম করেছে! ও মাই গড!

ড্রাকুলার ড্রেসটা কোথায় খুঁজে পেল ওরা? কী? আমার ঘরে! সুটকেসের ভেতরে। ইমপসি! না, না খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব বলছি না, বলছি, ড্রেসটা আমার ঘরে থাকাটাই আজগুবি। বলুন তো, ওরকম হতচ্ছাড়া একটা ড্রেস আমি খামোখা কিনতে যাব কেন! না, না, আমার কোনও নাটকে ড্রাকুলার সিন-ফিন নেই। এ তো আচ্ছা মুশকিল! বলছি আমি কিছু জানি, তবুও আপনি আমাকে হ্যারাস করছেন। বিশ্বাস করুন, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না।

কী, আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে চাইছেন? নিয়ে কীসের সঙ্গে মেলাবেন? ও, ওটা আপনার সিক্রেট ব্যাপার! ভালো। না, না, আমি কিছু জানতে চাই না। আমি বরং জানাতে চাই যে, আপনি ঠিক পথে এগোচ্ছেন না। নিন, নিন, প্রাণভরে ছাপ নিন। এ-এ-এই। এবার ছোটকা, তুমি দাও। হুঁ, এইবার রাকেশ।

কী বললেন? কাকিমারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনার চাই? আপনি কি মানুষ, না কসাই! ঠিক আছে, মশাই ডাকছি। রাকেশ, যা তো, তোর মা-কে ডেকে দে। বল, হবিষ্যি পরে হবে। আগে খুনের তদন্ত। আমাদের রেসপেক্টেড ইনস্পেক্টর এই ফরমান জারি করেছেন।

এই যে, কাকিমা, কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমার ডানহাত আর বাঁ হাতের আঙুলের ডগাগুলো এই প্লেটটার ওপরে চেপে ধরো। ব্যস...কাজ শেষ। থ্যাংক য়ু, কাকিমা।

বলুন, আর কী বাকি রইল, ইন্সপেক্টর? এবার ছাপ মেলানোর কাজ শুরু করুন...।

কী বলছেন? আঙুলের ছাপ মিলিয়েই আপনি আসল খুনির সন্ধান পেয়ে গেছেন? যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন! বলছেন ঠাট্টা নয়! ঠিক আছে, বলুন, শুনি কে সেই মিস্টার এক্স।

ড্রাকুলার ড্রেসটা আমার সুটকেসে কেউ ঢুকিয়ে রেখেছিল...যাতে সন্দেহটা আমার ঘাড়ে পড়ে? আচ্ছা...তারপর? ও, ছোটকার ইলেকট্রিক তারের কেসটাও তাই! বাঃ, চমৎকার। বলুন, বলুন, আমি কান পেতে আছি।

কী, রাকেশ খুনিকে চেনে! ও-ই খুনের একমাত্র আই উইটনেস! খুনি রাকেশের খুব ক্লোজ? কী বলছেন আপনি! কাকিমা কখনও একাজ করতে পারে না। প্লিজ, আপনি কিন্তু লিমিটের বাইরে চলে যাচ্ছেন, ইনস্পেক্টর! কাকিমা কী টাইপের ওয়াইফ আপনি জানেন না! কাকা যতই ইয়ে হোক, কাকিমা সবসময় কাকাকে ভাবত–স্বামী নয়–স্বামীদেবতা। কাকিমার পক্ষে একাজ অসম্ভব! প্লিজ, স্টপ, ইনস্পেক্টর..ফর গড় সেক শাট ইয়োর মাউথ। কাকিমা...।

কী, আপনার কথা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি? কাকিমা নয়, রাকেশ। রাকেশ ওর বাবাকে খুন করেছে! কীসব আনসান বকছেন আপনি! এই মুহূর্তে

বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। জাস্ট... গেট..আউট!

আচ্ছা, রাকেশ কী করে খুন করবে বলুন তো! ওইটুকু ছেলে! সবে সতেরো ছুঁয়েছে। কাকার খাটে ওর আঙুলের ছাপ পেয়েছেন? সে তো থাকতেই পারে। কী বলছেন? ইলেকট্রিকের তারটার নানান জায়গায় ওরই আঙুলের ছাপ? ওর রাফ খাতায় আরও প্রমাণ পেয়েছেন? কী প্রমাণ? ও ডায়েরি লিখত! জানতাম না তো! কী লিখেছে সেখানে? মায়ের ওপরে বাবার টরচার ও আর সইতে পারছিল না? বাবাকে ও ভয় দেখিয়ে কিংবা শক দিয়ে খতম করবে? হতেই পারে না! ফুলের মতো ওইটুকু ছেলে! দেখি ওর সেই ডায়েরি...।

ও মাই গড! মা-কে এত ভালোবাসে ও! আমি বা ছোটকা যে কাজ করতে পারিনি তাই করে দেখাল রাকেশ! আমার ছোট ভাইয়ের ওইটুকু বুকে এত সাহস লুকিয়ে ছিল।

এ তুই কী করলি, রাকেশ! এ তুই কী করলি! রাকেশ রে...রাকেশ...! এই দাদাটাকে একবার বললি না তোর মনের কথা? তোর মা-কে তুই এত ভালোবাসিস! আমিও তো তোর মা-কে ভালোবাসি...তোকে ভালোবাসি। মনে-মনে তোর বাবাকে আমি দুশো সাঁইতিরিশবার খুন করেছি। হা, দুশো সাঁইতিরিশবার। মনে-মনে। আর তুই করেছিস মাত্র একবার–তবে মনে-মনে নয়, সত্যি সত্যি। কী করে পারলি রে তুই? আমাকে তুই ভালোবাসার টানে হারিয়ে দিলি?

ইনস্পেক্টর, প্লিজ, রাকেশকে আপনি ছেড়ে দিন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি। ওর জীবন তো সবে শুরু। কত আলো, কত আকাশ ওর দেখার বাকি আছে। আর আমি? স্রেফ একজন বেকার যুবক, অন্যায় ভালোবাসা বুকের ভেতরে লুকিয়ে চোরের মতো বেঁচে আছি। বিশ্বাস করুন, রাকেশের জেল কিংবা সি-টাসি হলে কাকিমা নির্ঘাত সুইসাইড করবে। আর ও সুইসাইড করলে...। তারপর বাকি থাকব শুধু আমি...। কিন্তু যে-দুজনের কথা ভেবে আমার ছন্নছাড়া ছিন্নছেঁড়া জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে করত, তারা দুজনেই যদি না থাকে তা হলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী! সে বেঁচে থাকার কোনও মানে আছে বলে আপনি মনে করেন, ইনস্পেক্টর?

আচ্ছা, একটা লাস্ট রিকোয়েস্ট করব আপনাকে? একটা কথা রাখবেন আমার ও আমাকে ফাঁসি দেবেন? কিংবা যাবজ্জীবন? প্লিজ, আপনার পায়ে

ধরছি, ইনস্পেক্টর। হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি কাকাকে। আমিই খুন করেছি। আমি-আমি-আমি! এবার অন্তত আমাকে আপনি অ্যারেস্ট করুন। প্লিজ, অ্যারেস্ট করুন আমাকে…।

আসুন, রাকেশের ওই দুরন্ত ভালোবাসার কাছে অন্তত একটিবারের জন্যে আমরা হেরে যাই…।

# হঠাৎ বজ্রপাত

## হঠাৎ বজ্রপাত

এখন আমি আপনাদের যে-খুনটার কথা বলব সেটা কিন্তু যথেষ্ট চাতুর্যপূর্ণ। সাধারণ হত্যাকারীরা খুনের পেছনে টাকা খরচ করে, কিন্তু বুদ্ধি খরচ করে না। ছোটবেলা থেকেই স্কুলের মাস্টারমশায়রা আমার মেধা লক্ষ করেছিলেন। সেই মেধা আমি লক্ষ করেছি আমার একমাত্র মেয়ে রাখীর মধ্যেও। ক্লাস ফোরে পড়লে কী হবে, সবাই ওর বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে ওর মা– আই মিন আমার ওয়াইফ, সবিতা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। যদি এরকম বউ কারও থেকে থাকে, তবে একমাত্র তিনিই বুঝতে পারবেন। মোটকথা ওরকম বউকে খুন করতেও কারও বাধে না–অন্তত আমার নয়।

সত্যিই আশ্চর্য ধাতুতে গড়া সবিতা। দিনরাত পার্টি, ফুর্তি আর কসমেটিক্স-এর পেছনে লেগে আছে তার সঙ্গে বারোজোড়া চটি–আটান্নখানা শাড়ি (এসবই রাখীর দৌলতে আমার জানা–ওর মায়ের কোন জিনিস কটা আছে তা ওর মুখস্থতা ছাড়া নতুন কিছু কেনা হলেই সবিতারও রাখীকে ডেকে কোলে বসিয়ে দেখানো চাই। ভয় হয়, শেষে রাখীও না ওর মায়ের মতো হয়!), আংটি, ঘড়ি, উইগ ইত্যাদির ঠেলায় আমার প্রাণ বর্তমানে গলার কাছে। আমি মাঝে-মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি। পরে ভেবে দেখেছি, অফিসের ক্যাশ ভাঙার চেয়ে বউকে খুন করা অনেক সহজ।

আমার বাড়ির বাগানে পেছনদিকে একটা বড় পিপুল গাছ আছে। তার গুঁড়িটা ফঁপা চোঙার মতো। মাটি থেকে প্রায় আটফুট উঁচুতে গুঁড়িটায় একটা মাঝারি সাইজের ফোকর আছে। গুঁড়ির ভেতরটা বাইরের জমি থেকেও প্রায় দু-ফুট নিচু। ভাবলাম, এই গাছটাকেই সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ সেরে নেওয়ার পর পুরোপুরি তৈরি হয়ে একটা দিন ঠিক করলাম। সবিতাকে বললাম, চলো, আজ দুজনে একটা সিনেমা দেখে আসি। ও কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিল, অ্যাদ্দিন পর এ কী খেয়াল?

কথাটা বলে ও লিপস্টিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি জোরজবরদস্তি করে ওকে রাজি করালাম। তখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে। রাখীকে এসব কিছু না জানিয়ে বোঝালাম, তোর মা একটু পরে রাত আটটার ট্রেনে একজন বন্ধুর সঙ্গে (এসব ব্যাপার রাখীও জানত) শিলং বেড়াতে যাবে–আমি পৌঁছে দিয়ে আসতে যাচ্ছি–তুই ভেতরের ঘরে খিল দিয়ে সাবধানে থাকিস।

শিলং বলার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, সবিতার অসংখ্য বন্ধুদের মধ্যে একজন ইন্দ্রজিৎ দস্তিদার–শিলং যাবে সেদিনই রাতের ট্রেনে। আর দ্বিতীয়ত, এটা জানতে পেরে আমিও ওই একই ট্রেনে একটা বার্থের রিজার্ভেশান টিকিট কেটে নিয়ে এসেছি (অনেক বুদ্ধি, পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করে)।

আমাদের এলাকাটা তেমন জনবহুল নয়, তাই রক্ষে। রাখীকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে বলে দরজাটা বন্ধ করে বাইরের ঘরে এলাম। এ-ঘরটাই সবিতার। ওর বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনার সুবিধের জন্যে ও এই বাইরের ঘরটাই থাকার জন্যে বেছে নিয়েছিল। ঘরে আলমারি, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিংটেবিল ইত্যাদি সাজানো। সবই সবিতার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

সবিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওকে বললাম, তোমার জন্যে একটা নেকলেস এনেছি।

আমার দু-হাত তখন আমার পেছনে।

সবিতা নেকলেসের কথায় একেবারে লাফিয়ে উঠল-আনন্দে দু-একবার ডার্লিং পর্যন্ত বলে ফেলল।

আমি ওকে বললাম, চোখ বোজো, পরিয়ে দিচ্ছি।

ও গয়নার নামে সরল মনে চোখ বন্ধ করল।

আমি শক্ত দড়িটা ওর গলায় পেঁচিয়ে টেনে ধরলাম।

আয়না দিয়ে দেখলাম, ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে উঠল–আপ্রাণ চেষ্টা করল দড়িটা ছাড়ানোর–পারল না। ওর দেহটা ধপ করে মাটিতে পড়ে যেতেই আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। একটা অজানা ভয় আমাকে ঘিরে ধরল।

নিজেকে শক্ত করে এবার মূল নাটকের প্রধান অংশে হাত দিলাম। তাড়াতাড়ি ওর দেহটা টেনে নিয়ে গেলাম বাগানে–পাশের দরজা দিয়ে। তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলাম। সবিতার দেহটাকে খাড়া করে পাশে বসিয়ে স্টিয়ারিং ধরলাম। গাড়ি স্টার্ট করার আগে ওর চোখে একটা সানগ্লাস বসিয়ে দিলাম (যাতে মৃত বলে বোঝা না যায়)। আর ওকে বাঁ-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম, যাতে দেহটা টলে না পড়ে যায়।

সদর দরজা পার হয়ে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। সদর দরজায় তালা দিয়ে আবার ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম। মৃতদেহটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বসিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

এইভাবে রেলস্টেশন পর্যন্ত গেলাম। সেখানে একটা নির্জন জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম। তারপর কায়দা করে সবিতার বডিটাকে সিটের নীচে ঠেলে দিলাম। সবশেষে গাড়ি চালালাম বাড়ির দিকে।

বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে দরজা খুললাম। তারপর গাড়ি গ্যারেজে তুললাম। সবিতার বডিটা টেনে বের করলাম–ওর চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরলাম। তারপর ওর মৃতদেহটা গ্যারেজ থেকে পিপুল গাছ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে অতিকষ্টে ফোকর দিয়ে কঁপা গুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। বাগানের যত জঞ্জাল, গুঁড়ো মাটি, সব নিয়ে এসে ঢালোম ওই গুঁড়ির ভেতরে।

একটু পরে চুপিচুপি ফিরে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে টুক করে বসবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। হাত-পা ধোয়ার পর চেঁচিয়ে রাখীকে ডাকলাম (এটা বোঝাতে যে, গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে আমি সোজা এসে বাথরুমে ঢুকেছি)। বললাম, আমার তোয়ালে আর সাবান দিয়ে যা…।

ও এসে বলল, তুমি কখন ফিরলে?

আমি নির্বিকার গলায় জবাব দিলাম, তা অনেকক্ষণ হল। গাড়ির আওয়াজ শুনিসনি তুই? শরীরটা ভালো লাগছে না বলে এসেই সোজা বাথরুমে ঢুকেছি

হাত-পা ধুয়ে চান করতে।

ও5, জবাব দিল রাখী, মা বুঝি চলে গেল?

আমি কোনওরকমে জবাব দিলাম, হ্যাঁ আমি আর স্টেশানের ভেতর পর্যন্ত যাইনি।

একটু পরে ও এসে তোয়ালে আর সাবান দিয়ে গেল।

.

এরপর কয়েকদিন ধরে হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ প্রয়োজনমতো কাপড় দিয়ে মুছে সাফ করেছি। গাছের ফঁপা গুঁড়ির ভেতরে বেশ কয়েক বোতল ফর্মালিন ঢেলে দিয়েছি। সত্যি বলতে কী এখন অনেক নিশ্চিন্তে আছি।

রাখী মাঝে-মাঝেই জিগ্যেস করে, বাবা, মা কবে আসবে?

আমি বলি, সে তো বলে যায়নি। তুই-ই বল না, কোনওবার তোর মা আমাকে বা তোকে বলে কোথাও গেছে?

একথায় ও চুপ করে থাকত।

অবশ্য অস্বীকার করতে পারব না, বাড়িটা এখন বেশ ফাঁকা-ফাঁকাই লাগে। সবিতা সবসময় সেজেগুজে টিপটপ হয়ে থাকত–নিত্য বাইরে যেত-আসত। বলতে গেলে গাড়িটা ওই ব্যবহার করত সর্বক্ষণ।

এইভাবে প্রায় পনেরোদিন যাওয়ার পর আমি ইন্দ্রজিৎ দস্তিদারের ঠিকানা জেনে তাকে একটা চিঠি দিলাম। অবশ্যই সবিতার খবর জানতে চেয়ে। কেন সে এখনও চিঠি দেয়নি? ইত্যাদি ইত্যাদি। চিঠির শেষে রাখীও কয়েক লাইন সবিতাকে লিখেছিল।

চিঠির উত্তর কী এল আপনারা আশা করি বুঝতেই পারছেন।

ইন্দ্রজিৎ লিখল যে, সে আমার চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়েছে। সবিতা তার সঙ্গে মোটেই যায়নি। সবিতা কোথায়, তাও সে জানে না।

চিঠি পেয়ে অবাক হওয়ার ভান করলাম। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গাতেই সবিতার খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথাও ওর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে নিয়মিত ফর্মালিন ঢেলে মৃতদেহটাকে ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করেছি–আর মনমরা হয়ে থাকার ভান করেছি। এমনকী দু-চারদিন অফিসও কামাই করে ফেলেছি। শেষে পাড়ার কয়েকজন প্রতিবেশীর অনুরোধে আমি গেলাম পুলিশে খবর দিতে। সঙ্গে কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষীও গেলেন। সেখানে ডায়েরি করে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এলাম থানা থেকে।

আমার এই অভিনয় চালাতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। বরং রাখীর কাছ থেকে সহানুভূতি পাওয়ার আশায় একদিন রাখীকে না দেখার ভান করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছিলাম। রাখী এসে আমার পিঠে হাত দিল। জানি না, বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু আমার মতই মেধা পেয়েছে–এটাও বুঝেছে যে, ওর মা-কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

.

পরদিন সকালবেলা পুলিশ এল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি তৈরি ছিলাম–তাই এতটুকু ছটফটে ভাব প্রকাশ পেল না আমার ব্যবহারে। ওদের অভ্যর্থনা করে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। কিছুক্ষণ আলোচনার পর একজন অফিসার আমাকে সবিতার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। আমি অবিচলিত কণ্ঠে বলে গেলাম যে, সবিতার কাছে শিলং যাওয়ার একটা রিজার্ভেশান টিকিট দেখেছিলাম, এবং এও জানালাম যে, ও আমার কাছে বলেছিল ইন্দ্রজিতের সঙ্গে শিলং যাবে। কথাসূত্রে ইন্দ্রজিতের পরিচয়, ঠিকানা, ইত্যাদি বললাম এবং আমার চিঠির উত্তরে পাওয়া ওর চিঠিটাও দেখালাম। একইসঙ্গে বললাম যে, আমি নিজে গাড়ি করে সবিতাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছি।

ইনস্পেক্টর সবিতার ঘর সার্চ করলেন, কিন্তু দরকারি বিশেষ কিছুই পেলেন না। বোধহয় এরকম অদ্ভুত নিরুদ্দেশের কেস তিনি আগে পাননি। যাওয়ার সময় তিনি বললেন, এই অন্তর্ধান রহস্য সমাধান করার জন্যে আমি আটমোস্ট চেষ্টা করব–তবে আমার মনে হয় আপনার স্ত্রী আর বেঁচে নেই।

ইনস্পেক্টর একথা বলামাত্র আমি খুব অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, নানা, অফিসার, এ কখনওই হতে পারে না। এ যে আমি চিন্তাও করতে পারছি না... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরের সপ্তাহে ইনস্পেক্টর আবার এলেন। তিনি বললেন, আপনার ইনফরমেশানের ওপরে বেস করে আমি খোঁজ করেছি, মিস্টার বর্মন। কিন্তু সমস্ত জায়গায় এনকোয়ারি করেও আপনার মিসেসের খোঁজ আমরা পাইনি। এটা আমাদের পক্ষে সত্যিই খুব লজ্জার কথা। তবে একটা বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ জেগেছে। আশা করি আপনি সে-বিষয়টার এক্সপ্লানেশান দিতে পারবেন।

আমার ভুরু কুঁচকে উঠল। একটু চিন্তিত হলাম, বললাম, কী ব্যাপার?

মিস্টার বর্মন, একটি লোক আমাদের বলেছে যে, সে যখন আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে গাড়ি করে স্টেশানের দিকে যেতে দ্যাখে, তখন সে লক্ষ করে যে, আপনার ওয়াইফের চোখে একটা কালো চশমা ছিল...।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে লোকটি। সবিতা চায়নি যে, ওর বাইরে যাওয়ার খবর আর-কেউ জানুকবোঝেনই তো, বিবাহিতা হয়ে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া...।

আপনি বাধা দেননি?

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, না বাধা দিইনি। কারণ, দিয়ে কোনও লাভ হত না।

ইনস্পেক্টর এবার রাখীকে নিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাখী আমার ধারণামতোই সুন্দরভাবে সব জবাব দিয়ে গেল। ইনস্পেক্টর কোনও হদিশ করতে না পেরে চলে গেলেন।

সবকিছু আমার প্ল্যানমতো ঘটতে লাগল। আমার ইচ্ছে আছে, তদন্তের ঝামেলা মিটে গেলে মৃতদেহটার একটা বন্দোবস্ত করব।

একদিন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ইনস্পেক্টর এলেন দলবল নিয়ে। আমি তাদের নিয়ে সবিতার ঘরে গেলাম। ইনস্পেক্টর আজ সবিতা সম্পর্কে অনেক কথা জিগ্যেস করলেন– বারবার। আমিও সাধ্যমতো জবাব দিয়ে গেলাম।

রাখীকেও এ-কথা সেকথা জিগ্যেস করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার বর্মন, এ-কেস সভ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। হয়তো আপনার ওয়াইফ কোথাও নিজের ইচ্ছেয় লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তার যে ভালো-মন্দ কিছু হয়েছে তার কোনও সূত্রই আমাদের হাতে নেই। তবে ভগবান করুন, তাঁর যেন কোনও অমঙ্গ ল না হয়। আপনার কথা ভেবে আমার সত্যিই খারাপ লাগছে।

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন ইনস্পেক্টর।

রাখী আলনার কাছে বসে-বসে কী যেন করছিল, হঠাৎই উঠে দৌড়ে এল আমার কাছে। ওর ওই ছোট্ট গলায় তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, মা যদি শিলং গিয়ে থাকবে তবে মায়ের বারোজোড়া চটিই আলনার পড়ে আছে কেন? মা কি কোনওদিন খালি পায়ে বাড়ির বাইরে গেছে?

সমস্ত পৃথিবী আমার সামনে দুলে উঠল। পায়ের নীচে মাটি নড়ে উঠল। টলে পড়ে যাওয়ার আগে শুধু দেখলাম, ইনস্পেক্টর চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

# একটা ঘুঁটি কম ছিল

**একটা ঘুঁটি কম ছিল**

চন্দ্রাণীকে খুন করার জন্য দেবপ্রিয় যে-ছক তৈরি করেছিল তাতে কোনও ভুল ছিল না। ছকটাকে নানাদিক থেকে বারবার খতিয়ে দেখে দেবপ্রিয়র অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল।

সবাই জানে, কোনও বিবাহিতা মহিলা খুন হলে পুলিশ সবার আগে তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করে। দেবপ্রিয়ও একথা জানত। সেইজন্যই ও বারবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছকটাকে যাচাই করছিল।

ব্যাপারটা অনেকটা স্লো মোশানে অ্যাকশন রিপ্লে দেখার মতো।

প্রায় মাসখানেক ধরে খুনের ছকটায় খুঁটি চালাচালি করে দেবপ্রিয় যেদিন নিশ্চিত হল যে,, ছকটায় কোনও গোলমাল নেই, সেদিন ফুর্তিতে ও তিন পেগ হুইস্কি চড়িয়ে বাড়ি ফিরল। চন্দ্রাণীকে ও আর ভয় পায় না।

ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে পাখির ডাকের কলিং বেল টিপতেই ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখল চন্দ্রাণী। তারপর দরজা খুলল।

এবং মদের গন্ধ পেল।

আজ আবার এসব গিলে এসেছ। চাপা গলায় হিসহিস করে বলল চন্দ্রাণী। ও চায় না ঘরের অন্তর্বাস চৌরাস্তার মোড়ে কাঁচা হোক, তাই গলার স্বর তিরিশ ডেসিবেলের ওপরে উঠল না।

তেমন কিছু খাইনি। জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে জবাব দিল দিবপ্রিয়, ওরা জোর করে খাইয়ে দিল…।

ওরা কারা দেবপ্রিয় জানে না। জানার দরকার নেই।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে চন্দ্রাণীর গীতাপাঠ শুরু হল; ভদ্রসমাজে বাস করতে হলে সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়; আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি বোধ থাকা দরকার; সম্মান গেলে কখনও আর ফিরে আসে না; ডিসিপ্লিন একটা সুখী সংসারের চাবিকাঠি।

গীতাপাঠ চলছিল, আর দেবপ্রিয় এক অদ্ভুত চোখে বউকে দেখছিল। মনে-মনে বেশ মজা পাচ্ছিল ও। চন্দ্রাণী জানে না, ওর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। আর কদিন পর যখন ও নেই হয়ে যাবে, তখন বেনিয়ম করলে দেবপ্রিয়কে এরকম জ্ঞান দেবে কে!

আক্ষেপের চুক-চুক শব্দ বেরিয়ে এল দেবপ্রিয়র মুখ থেকে। ও বলল, সরি, চন্দ্রা….আর হবে না। প্লিজ, ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।

দেবপ্রিয় অন্যদিন এত সহজে বশ মানে না। আজ মানল, কারণ, আজ একটু আগেই ও চন্দ্রাণীর কপালে মনে-মনে কাটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এখন থেকে ও চন্দ্রাণীর সব কথা শুনবে, পদে-পদে ওর কাছে হার মানবে। আর তো মাত্র কটা দিন!

চন্দ্রাণীর বাবা রিটায়ার্ড বিচারপতি। আর মা কলেজের প্রফেসর। চন্দ্রাণী ওঁদের একমাত্র মেয়ে।

বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মেলামেশা করে দেবপ্রিয় যা বোঝার বুঝেছে। ওর মনে হয়েছে, চন্দ্রাণীর বাবার ডাকনাম ডিসিপ্লিন, আর মায়ের ডাকনাম আত্মসম্মান। এই দুটি মহান মানুষের মিলনে জ্ঞান লগ্নে অহংকার রাশিতে চন্দ্রাণীর জন্ম। ওর ডাকনাম চানু, কিন্তু দেবপ্রিয়র মনে হয়েছে ডাকনামটা গীতা হলেই ভালো মানাত।

প্রেম গীতা-টিতা মানে না। তাই দেবপ্রিয়র সঙ্গে চন্দ্রাণীর প্রেম হয়েছিল। বিয়েও।

তার পাঁচ বছর পর আবার প্রেম এল। শরীরী প্রেম।

মেয়েটির নাম ললনা। দেবপ্রিয়দের অফিসে সিস্টেম অ্যানালিস্ট-এর কাজ করে। দেখতে রীতিমতো কুৎসিত। কিন্তু ওর অন্য লুকোনো গুণ আছে। যে-গুণ মরা মানুষের শরীরেও শ্মশানের লকলকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ললনার কোনও ডাকনাম নেই। তাই দেবপ্রিয় ওর ডাকনাম রেখেছিল কামনা। ডাকনামটা কামনার বদলে বাসনা অথবা বিছানা হলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

অনেকে হয়তো ভাববে কামনাকে বিয়ে করার জন্যই চন্দ্রাণীকে দেবপ্রিয় খুন করতে চাইছে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। কারণ, কামনাকে বিয়ের ব্যাপারে দেবপ্রিয়র কোনও মাথাব্যথা নেই। তা ছাড়া কামনার ইন্টারেস্ট শুধু ইয়েতে বিয়েতে নয়। ও কারও আন্ডারে থাকতে ভালোবাসে না। যেমন দেবপ্রিয় চন্দ্রাণীর আন্ডারে রয়েছে।

যখন ওরা আদরে-আদরে ব্যস্ত থাকে তখন এই আন্ডারে থাকা নিয়ে দেবপ্রিয়কে মাঝে-মাঝে খোঁচা দেয় কামনা। সেইসঙ্গে খিলখিল হাসি এবং মারাত্মক শরীর ঝাঁকুনি–যা একমাত্র ও-ই পারে। তখন দেবপ্রিয় সুখে পাগলের মতো হয়ে যায়।

এখন তুমি আমার আন্ডারে আছ। শব্দ করে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে এলোচুল সরিয়ে দেয় কামনা। তারপর ও কাল রাতে আমি তোমার আন্ডারে ছিলাম। খিলখিল হাসি ও এইরকম আন্ডারে থাকতে ভালো লাগে। তবে তুমি যেভাবে তোমার বউয়ের আন্ডারে দিন কাটাও সেরকম নয়। আমার কাছে লাইফের মানে হচ্ছে ফ্রিডম…।

এইরকম একটা অবস্থায়, অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কামনার কথা শুনতে-শুনতে হঠাৎই আন্ডারওয়ার্ল্ড শব্দটা দেবপ্রিয়র মাথায় আসে। এবং মনে হয়, চন্দ্রাণীকে খুন করলে কেমন হয়!

আশ্চর্য! এ-কথা ভাবামাত্রই ওর শরীর উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইল। লোহা হার মেনে গেল ওর শরীরের দৃঢ়তার কাছে।

কামনা সেটা টের পেল। টের পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ওর কাজে মন দিল।

দেবপ্রিয় যখন পিছন ফিরে ভাবে তখন ও বেশ বুঝতে পারে সেই বিশেষ মুহূর্তেই চন্দ্রাণীকে খতম করার মতলবটা প্রথম ওর মাথায় জন্ম নিয়েছিল।

তারপর থেকে দেবপ্রিয় ধীরে-ধীরে টাকা জমাতে শুরু করে। কারণ, আন্ডারওয়ার্ল্ডের যে পেশাদারি খুনিকে ও চন্দ্রাণীর দায়িত্ব দেবে তাকে টাকা দিতে হবে। এখন এসব কাজের যা বাজারদর তাতে হাজার পঞ্চাশেক হলেই কাজ হয়ে যাবে।

এই ধরনের খুনের ক্ষেত্রে পুলিশ স্বামীকে সন্দেহ করে প্রথমেই খোঁজ করবে সম্প্রতি স্বামীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা টাকা তোলা হয়েছে কি না। সেইজন্যই দেবপ্রিয় প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা তুলে নিজের কাছে ক্যাশ টাকা জমাতে লাগল। যেদিন ওর লুকোনো ক্যাশ টাকার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছোবে সেদিন ও ছকের নতুন ধাপে পা দেবে।

টাকাটা জমাতে আট মাস সময় লাগল। তারপর দেবপ্রিয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রফেশনাল কিলারের খোঁজ করতে শুরু করল।

পাড়া থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে প্রোমোটার সেজে জমির খোঁজে নেমে পড়ল দেবপ্রিয়। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করতেই একজন পেশাদার খুনির খোঁজ পেয়ে গেল ও।

লোকটার নাম স্টেন মদন। কালো, রোগা দড়ি পাকানো চেহারা। বাঁ-চোখটা সামান্য ট্যারা। বয়েস বড়জোর পঁয়তিরিশ। তবে ওর কারিকুলাম ভিটা দেখবার মতো। পাঁচটা খুন, তিনটে ধর্ষণ, আটবার ডাকাতি, এ ছাড়া গুলি-গোলা বোমাবাজি তো আছেই! এ-পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট সাত বছর জেল খেটেছে।

মদনের গলায় সোনার চেন, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে জিনস, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাতে সোনার ব্যান্ড লাগানো ঘড়ি। ছিটেবেড়া আর টিনের চাল লাগানো একটা মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে টেপ-রেকর্ডারে গান শুনছিল আর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

দেবপ্রিয় চুল উশকোখুশকো করে চোখে রে-বান-এর সানগ্লাস লাগিয়ে মদনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একমিনিটের মধ্যেই ওর কাজের কথা শেষ হয়ে গেল।

দরাদরির মধ্যে না-গিয়ে ও প্রথমেই মদনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অফার করে বসল। তারপর চন্দ্রাণীর একটা রঙিন ফটো ওকে দিল। সঙ্গে টাইপ করা ঠিকানা।

নোংরা বালবের আলোয় মদন ফটোটা তেরছা চোখে দেখল। গ্লাসে একটা জোরালো চুমুক মেরে বলল, কোনও টেনশন নেই–মাল নেমে যাবে।

দেবপ্রিয় গলাটা অন্যরকম করে বলল, এই মেয়েটি ফ্ল্যাটে একাই থাকবে। তবে কলিং বেল বাজালেই আপনাকে দরজা খুলে দেবে না। তখন আমার লেখা একটা চিরকুট আপনি দরজার নীচ দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন। ওটা পড়লেই ও দরজা খুলে দেবে। তারপর ফ্ল্যাটে ঢুকে....।

কথা শেষ না করে মদনকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল দেবপ্রিয় লাল রঙের তিরিশটা নোট। তারপর স্টেন মদনের মোবাইল নাম্বার নিয়ে চলে এল। বলল, ওর সঙ্গে মদনের আর দেখা হবে না। বাকি আলোচনা ও ফোনে করবে।

মদনকে দেবপ্রিয় নিজের নাম বলেনি। ওদের আলাপ-পরিচয় যত কম হয় ততই ভালো। তাতে ধরা পড়ার ভয় কম। খুনের দিন সকালে মদন ওর নাম জানতে পারবে–তার আগে নয়।

কিন্তু আপনি ফোন করলে বুঝব কেমন করে? মদন জানতে চাইল।

আমি ফোন করে প্রথমেই বলব, চন্দ্রাণী বলছি। তাতে আপনি বুঝে নেবেন। আর কবে, কখন কাজটা সারতে হবে সেটা আমি কাজের দিন সকালে আপনাকে জানাব। এসবই সেফটির জন্যে। বাকি কুড়ি হাজার টাকাও আপনি সেদিনই পেয়ে যাবেন–তবে কীভাবে পাবেন সেটা এখনই বলছি না।

মদন হাসল। বলল, ডিউ বিশ হাজার টাকা নিয়ে কোনও পরেনি আমার নেই। আমার টাকা কেউ চোট করতে পারে না...তাহলে সে নিজেই চোট হয়ে খাল্লাস হয়ে যাবে।

দেবপ্রিয় কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এল। গলা ছেড়ে হিন্দি গান গাইতে গাইতে ফ্ল্যাটে ঢুকল।

চন্দ্রাণী ওর হেঁড়ে গলার গান শুনে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আনকাম্ফার্ড।

রাতে বিছানায় শুয়ে ক্রিকেটারদের ক্যাচ প্র্যাকটিসের মতো খুনের ছকটাকে নিয়ে অন্ধকারে লোফালুফি করতে লাগল দেবপ্রিয়। ওর ভেতরে একটা খুশির তুবড়ি জ্বলছিল।

সারা রাত ধরে খুনের ছকের প্রতিটি ধাপ খতিয়ে দেখল দেবপ্রিয়। নাঃ, কোথাও কোনও ফঁক নেই। সব খুঁটি ঠিক-ঠিক জায়গাতেই বসানো আছে।

দেবপ্রিয়র ছকের ধাপগুলো এইরকম :

১. চন্দ্রাণীকে খুন করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

২. ধীরে-ধীরে, বেশ সময় নিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকা গোপনে জমানো। টাকাটাকে ধীরেসুস্থে নানান জায়গা থেকে হাজার টাকার নোটে বদলে নেওয়া। এতে টাকা দেওয়া-নেওয়ার সুবিধে হবে।

৩. একজন ভাড়াটে খুনিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া। সঙ্গে চন্দ্রাণীর রঙিন ফটো এবং কম্পিউটারে ছাপানো ফ্ল্যাটের ঠিকানা।

সতর্কতাঃ খুনিকে ঠিক করতে হবে বেশ দুরের কোনও এলাকা থেকে। খুনির সঙ্গে দেখা করার সময় হালকা ছদ্মবেশ–যেমন, সানগ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। খুনির সঙ্গে একবারের বেশি দেখা করা ঠিক হবে না। সব যোগাযোগ ফোনে সারতে হবে। ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা যে-কোনও একটা কম্পিউটার সেন্টার থেকে অন্যান্য বাজে ঠিকানার সঙ্গে ছাপিয়ে নিতে হবে। তাতে হাতের লেখা মিলিয়ে পুলিশ তদন্তে এগোতে পারবে না।

৪. খুনের দিনক্ষণ ঠিক করার পর তার দু-দিন কি তিনদিন আগে ঘরের রঙিন টিভিটা খারাপ করে দিতে হবে।

৫. পাড়ার এমন একটা ইলেকট্রিকের দোকানে খবর দিতে হবে, যার বেশ গাফিলতি আছে। সাতবার কি আটবার তাগাদা না-দিলে মিস্তিরি পাঠায় না।

৬. খুনের দিনটা কাজের দিন হিসাবে বেছে নেওয়া হবে–যাতে অফিস-কাছারি সব খোলা থাকে। সেদিন বেলা বারোটার সময় ভাড়াটে খুনিকে ফ্ল্যাটে আসতে বলবে।

৭. খুনি টিভি সারানোর মিস্তিরি সেজে বাড়িতে ঢুকবে। একতলায় সিঁড়ির নীচে দেবপ্রিয়দের নাম লেখা লেটার বক্সে একটা চিরকুট রাখা থাকবে। চিরকুটে চন্দ্রাণীর নামে একটা ছোট্ট চিঠি লিখবে দেবপ্রিয়। যার সারমর্ম হল, টিভি সারানোর মিস্তিরি যাচ্ছে–ওকে টিভিটা সারাতে দিয়ো। টাকাপয়সা কিছু দিয়ো না দেওয়ার আমি দিয়ে দেব। চিঠির ওপরে ইলেকট্রিকের দোকানের নাম ও মালিকের নাম লেখা থাকবে–যাতে খুনি নাম দুটো জানতে পারে, চন্দ্রাণী আচমকা জিগ্যেস করলে ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারে।

৮. লেটার বক্স থেকে চিরকুটটা নিয়ে খুনি দেবপ্রিয়দের ফ্ল্যাটে যাবে। কাজ শেষ করে চিরকুটটা মুখে পুরে স্রেফ গিলে ফেলবে–অথবা, লেটার বক্সে রেখেই চলে যাবে। দেবপ্রিয় পরে ওটা সরিয়ে নেবে।

সতর্কতাঃ চিরকুটটা যাতে কিছুতেই পুলিশের হাতে না-পড়ে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ওতে দেবপ্রিয়র হাতের লেখা থাকবে। তা হলেই জানা যাবে মিস্তিরি পাঠানোর ব্যাপারটা মিথ্যে। আর খুনির সঙ্গে দেবপ্রিয়র যোগাযোগের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে।

৯. চন্দ্রাণীর খুনটা নিশ্চিত করতে বড়জোর দুটো গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। গুলির শব্দ চাপা দেওয়ার জন্য সাইলেন্সার অথবা বালিশ কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্যাপারটা ফোনে খুনির সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ খুনিকে মোবাইলে ফোন করবে দেবপ্রিয়। যখন জানবে কাজ শেষ, তখন খুনিকে বলবে মোবাইল ফোনের সিম কার্ডটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা সিম কার্ড ভরে নিতে। তখনই ও জেনে নেবে, খুনির বাকি টাকাটা কোনও মিলম্যানের মারফত কবে কখন খুনিকে পৌঁছে দিতে হবে।

সতর্কতাঃ সিম কার্ড পালটানোর ব্যাপারটা বেশ জরুরি। দরকার হলে একাজের জন্য খুনিকে বাড়তি দু-হাজার টাকা অফার করা যেতে পারে।

১০. চন্দ্রাণীকে খুন করানোর অন্তত একমাস আগে থেকেই ললনার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দিতে হবে। খুনের পর কমপক্ষে ছ-মাস ললনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলবে দেবপ্রিয়। তারপর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।

১১. চন্দ্রাণী খুন হওয়ার পর পুলিশ যথারীতি দেবপ্রিয়কে সন্দেহ করবে এবং পাগলা কুকুরের মতো খুনের মোটিভ খুঁজে বেড়াবে। সেইজন্যই দেবপ্রিয় শ্রদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর চন্দ্রাণীর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি কোর্টের কাগজ তৈরি করে চন্দ্রাণীর মা-বাবাকে গিফ্ট করে দেবে। তাহলে পুলিশ কিছুতেই আঁচ করতে পারবে না, চন্দ্রাণীর আন্ডারে-আন্ডারে থেকে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লান্তি থেকেই দেবপ্রিয় চন্দ্রাণীকে খুন করার ছক কষেছে। অর্থাৎ, ওরা কোনও মোটিভ খুঁজে পাবে না।

.

এগারোটা ধাপের পর আবার সুস্থ স্বাভাবিক স্বাধীন জীবন। তার মধ্যে তিনটে ধাপ ইতিমধ্যেই দেবপ্রিয় শেষ করে ফেলেছে। বাকি আর মাত্র আটটা ধাপ।

তৃপ্তিতে দেবপ্রিয়র চোখ বুজে এল। অন্ধকারে পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে ফিশফিশ করে দুবার ললনা বলে ডাকল। পাশবালিশ কোনও উত্তর দিল না। তবে দেবপ্রিয়র শরীরের চাপ টের পেল।

.

একটা মঙ্গলবারকে চন্দ্রাণীর অমঙ্গলের দিন বলে দেবপ্রিয় বেছে নিল।

তার আগের বৃহস্পতিবার স্টেন মদনকে ও ফোন করল। বলল, দিন এগিয়ে আসছে– তৈরি থাকতে। খুনের দিন সকাল নটায় ও মদনকে ফাইনাল সিগনাল দেবে। তারপর ওর সঙ্গে মদনের যোগাযোগ হবে বেলা সাড়ে বারোটার। তারপর আর কোনওদিন হবে না।

শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ চন্দ্রাণী কিছু কেনাকেটা করতে কাছেই সুপারমার্কেটে গিয়েছিল। সেই সুযোগে টিভির পিছনের ঢাকনা খুলে সার্কিট বোর্ডে জল ঢেলে রাখল দেবপ্রিয়।

মার্কেট থেকে ফিরে এসে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল চন্দ্রাণী। দেবপ্রিয় তখন ফ্ল্যাটের গেস্টরুমে অফিসের কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজের ভান করছে। কিছুতেই ও টিভির সুইচ অন করবে না।

দেবপ্রিয়কে মন দিয়ে কাজ করতে দেখে খুশি হল চন্দ্রাণী। রান্নার ফাঁকেই ওকে এক কাপ চা করে দিল। তারপর হাতের কাজ সেরে যেই না টিভি অন করেছে অমনি শর্ট সার্কিট, শব্দ, অন্ধকার, পোড়া গন্ধ। নিশ্চয়ই ফিউজ উড়ে গেছে।

পত্নীব্রতা স্বামীর মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল দেবপ্রিয়। ফিউজ-টিউজ পালটে সবকিছু ঠিকঠাক করল। তারপর টিভি অন করে দেখল টিভি চলছে না।

অতএব চার নম্বর ধাপ শেষ।

পরদিন দেবপ্রিয় পাড়ার বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক-এ খবর দিল। মালিক অনিমেষ পাত্র– দেবপ্রিয়র অনিমেষদা বললেন, চিন্তার কিছু নেই…দু-একদিনের মধ্যেই তিনি লোক পাঠাচ্ছেন।

দেবপ্রিয়র ছকের পাঁচ নম্বর ধাপ মসৃণভাবে শেষ হল।

সোমবার রাতে কাজের ছল করে প্রায় বারোটা পর্যন্ত জেগে রইল দেবপ্রিয়। অনেক মকশো করার পর একটা ছোট্ট চিঠি দাঁড় করাল ও

বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক
অনিমেষ পাত্র

চন্দ্রা, টিভি সারানোর মিস্তিরি যাচ্ছে। ওকে টিভিটা সারাতে দিয়ো। টাকাপয়সা কিছু দিয়ো –যা দেওয়ার আমি পরে হিসেব করে দিয়ে দেব। বাড়ি ফিরে কথা হবে। লাভ ইউ।

দেবপ্রিয়
১৮/৯/২০০১

পরদিন–অর্থাৎ, মঙ্গলবার বাজার থেকে ফেরার সময় মদনকে ফোন করে ফাইনাল সিগনাল দিল দেবপ্রিয়। তারপর বাড়িতে ঢুকে চিঠি দেখার ভান করে লেটার বক্স খুলে হাতড়াল। আর সেই ফাঁকে চিরকুটটা লেটার বক্সের মেঝেতে শুইয়ে রাখল। তারপর বাক্সের টিপতালাটা না টিপে এমনিই ঝুলিয়ে রাখল আংটার গায়ে। যাতে মদনের কোনও অসুবিধে না-হয়।

বেলা এগারোটা নাগাদ চন্দ্রাণী যখন স্নান করতে ঢুকল তখন দেবপ্রিয় তৈরি হয়ে অফিসে বেরোল।

এই কাজটা ওকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে করতে হয়েছে।

শরীরটা ভালো নেই। গা ম্যাজম্যাজ করছে। সকাল থেকে এইসব বলে সময় কাটিয়েছে। দেবপ্রিয়। এমনকী অফিসে ফোন করে বলেও দিয়েছে, আজ অফিসে যাব না। তারপর দশটা নাগাদ হঠাৎ অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করেছে।

চন্দ্রাণী রোজই পৌনে এগারোটা-কি-এগারোটা নাগাদ স্নান করতে যায়। দেবপ্রিয় ঠিক করল, চন্দ্রাণী যখন বাথরুমে থাকবে তখনই ও ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোবে। অর্থাৎ, বেরোনোর ভান করবে।

আমি বেরোলাম। বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল দেবপ্রিয়।

বাথরুমে শাওয়ারের জল পড়ার শব্দ হচ্ছিল। চন্দ্রাণী ঠিক আছে জাতীয় কিছু একটা বলল। দেবপ্রিয় ভালো করে বুঝতে পারল না।

বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিকে একবার মিস্তিরির জন্যে তাগাদা করে যাব– দেবপ্রিয় বলল।

হুঁ…আচ্ছা। জলের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে কথাগুলো শোনা গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দেবপ্রিয়। নাইটল্যাচের নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল। তারপর দরজাটা বেশ শব্দ করে ঠেলে বন্ধ করে দিল। দরজা নিজে থেকেই লক হয়ে গেল।

দেবপ্রিয় কিন্তু ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোল না–ভেতরেই থেকে গেল।

সাবধানে পা ফেলে ও ফিরে গেল জামাকাপড়ের আলনার কাছে। চটপট অফিসের পোশাক খুলে ঘরোয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর অফিসের পোশাক আর ব্রিফকেস আঁকড়ে ধরে চলে গেল গেস্টরুমে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল গেস্টরুমের খাটের নীচে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল দেওয়ালের গায়ে, অন্ধকার এলাকায়।

এবং রুদ্ধশ্বাসে বেলা বারোটা বাজার অপেক্ষা করতে লাগল।

এটা ছকের একটা নতুন ধাপ। দেবপ্রিয় ছকটা একটু-আধটু বদলেছে। তাতে ওর মনে হয়েছে, খুনের ব্যাপারটা আরও নিখুঁত হবে।

দেবপ্রিয় লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল আর দাঁতে নখ কাটছিল। ওর জামাকাপড়ের আলনাটা যেরকম লন্ডভন্ড থাকে তাতে পাজামা-পাঞ্জাবির ঘাটতিটা নিশ্চয়ই চন্দ্রাণীর চোখে পড়বে না। আর পড়লেও হয়তো ভাববে ওগুলো লন্ড্রিতে দেওয়া হয়েছে।

ওর এইসব উথালপাথাল ভাবনার মধ্যেই ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

দেবপ্রিয়র বুকটা ধড়াস করে উঠল। তারপর ওর হৃৎপিণ্ড যেন বাজি জেতার ঘোড়দৌড় শুরু করে দিল।

ছক অনুযায়ী দেবপ্রিয়র লেখা চিরকুট দেখিয়ে স্টেন মদন ফ্ল্যাটে ঢুকল। চন্দ্রাণীকে বউদি, বউদি করে একগাল হেসে টিভির কাছে গেল। হাতের ব্রিফকেস খুলে যন্ত্রপাতি বের করতে লাগল।

টিভির পিছনের ঢাকনাটা খুলে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কিছুক্ষণ কীসব দেখল। চন্দ্রাণী টিভির পাশে দাঁড়িয়ে মদনের কাজ দেখছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল, সুইচ অন করতেই ফ্ল্যাশ-ট্যাশ হয়ে একেবারে সব ফিউজ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে এখন কত খরচ হবে…।

আপনার কোনও চিন্তা নেই, বউদি..যতটা কমে হয় করে দেব। বিজ্ঞের মতন টিভির ভেতরটা দেখতে-দেখতে মদন বলল।

তারপর হঠাৎই ওর হাত থেকে ক্রু-ড্রাইভারটা পড়ে গেল মেঝেতে।

বউদি, স্ক্রু-ড্রাইভারটা একটু তুলে দিন না…।

মদনের অনুরোধে চন্দ্রাণী ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর। হাত বাড়িয়ে স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলতে গেল।

স্টেন মদন চট করে টিভির একদিকে চলে এল। পকেট থেকে রিভলভার বের করে টিভির অন্যদিকে ঝুঁকে-পড়া চন্দ্রাণীর মাথায় নল একেবারে ঠেকিয়ে গুলি করল।

ফট করে একটা চাপা শব্দ হল।

টিভির পিছনের দেওয়ালটা বিচ্ছিরিরকম লাল হয়ে গেল। চন্দ্রাণীর জ্ঞান, অহংকার, আর আই. কিউ. ছত্রখান হয়ে দেওয়ালে লেপটে গেল। ও টু শব্দটি করার সময় পেল না।

টিভির আড়াল থাকায় মদনের গায়ে রক্ত ছিটকে এসে লাগেনি। লাগলেও কোনও ক্ষতি ছিল না, কারণ, ওর ব্রিফকেসে একই রঙের আর-এক সেট জামা প্যান্ট ছিল। মদন পেশাদার খুনি। ও-ও নিজের মতো করে ছক কষতে জানে।

রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে মদন অবাক হয়ে গেল।

একটা ভারী খিল হাতে দেবপ্রিয় কখন যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মদন অবাক হয়ে কিছু একটা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দেবপ্রিয় খিলটা সপাটে মদনের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে।

মদন টাল খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

দেবপ্রিয় পাগলের মতো মদনের মাথা লক্ষ্য করে খিল চালাতে লাগল। একবার… দুবার…তিনবার…চারবার…।

দেবপ্রিয় যখন থামল তখন মদনের মাথাটা থেঁতলে যাওয়া কালোজামের মতো দেখাচ্ছিল।

খিলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে চটপট কাজ শুরু করে দিল দেবপ্রিয়।

সাবধানে মদনের পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নিল। ফোনের পিছনটা খুলে সিম কার্ডটা টেনে খুলল। তারপর সেটা টক করে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। ফোনটা ঠিকঠাক করে লাগিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল মদনের পকেটে।

মুখ নাড়তে নাড়তেই টিভির পাশে রাখা একটা ছোট টি-টেবিলের দিকে গেল দেবপ্রিয়। টেবিলে ওর লেখা চিরকুটটা রাখা ছিল।

সেটা তুলে নিয়ে একবার দেখল। শেষের দুটো লাইন মিহি গলায় ব্যঙ্গ করে পড়ল : .বাড়ি ফিরে কথা হবে। লাভ ইউ। তারপর চিরকুটটাও মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল।

যাক, ছকের নটা ধাপ শেষ! হাঁফ ছাড়ল দেবপ্রিয়। এরপর ললনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলা আর চন্দ্রাণীর সবরকম সম্পত্তি ওর মা-বাবাকে নিঃশর্ত গিট করে দেওয়া। এই দুটো ধাপ তেমন কঠিন নয়।

খুনের ছকের কয়েকটা খুঁটি দেবপ্রিয় ইচ্ছে করেই একটু নতুনভাবে সাজিয়েছিল। স্টেন মদনের বেঁচে থাকাটা ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। এত কাণ্ড করার পর মদনকে বাঁচিয়ে রাখাটা নিতান্ত বোকামি। তাই…।

চিবোনা কাগজের মণ্ডটা এইবার জোর করে গিলে ফেলল দেবপ্রিয়।

তারপর গলার স্বর দু-রকম করে এক কাল্পনিক পুলিশ ইনস্পেক্টরের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে লাগল। আর একইসঙ্গে মদনের জামাকাপড় হাতড়ে চন্দ্রাণীর রঙিন ফটোটা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে লাগল মদনকে চিনে ফেলা যায় বা মদনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ধরে ফেলা যায় এমন কোনও কাগজপত্র আছে কি না।

মার্ডারার যখন আপনার ওয়াইফকে গুলি করে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানার এককোণে শুয়ে ছিলাম। গুলির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি একটা লোক চন্দ্রাকে গুলি করে পালাচ্ছে। তখন আমার জ্ঞান ছিল না। শোওয়ার ঘরের দরজার পাশ থেকে খিলটা তুলে নিয়ে…। ব্যঙ্গ করে কাঁদতে লাগল দেবপ্রিয়। চন্দ্রাণীর ফটোটা খুঁজে পেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কালচার্ড ওয়াইফ, এবার তোমাকে চিবিয়ে খাব।

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে ফটোটা মুখে পুরে দিয়ে হিংস্রভাবে চিবোতে লাগল দেবপ্রিয়। চিবোতে চিবোতেই কাঁদতে লাগল আর কাল্পনিক ইনস্পেক্টরকে বলতে লাগল, জানেন, আমার জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল..সত্যিকারের আত্মীয় বলতে আর কেউ রইল না…কেউ রইল না…।

দেবপ্রিয় ফ্ল্যাটটা যেটুকু গোছগাছ করার করে নিল। তারপর দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। চন্দ্রাণী খুন হওয়ার পর প্রায় আট মিনিট পার হয়ে গেছে। এইবার চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা যেতে পারে।

মুখে রাখা ফটোর পিণ্ডটা গিলে ফেলে সর্বহারা স্বামীর মতো হইচই শুরু করে দিল দেবপ্রিয়।

খুন! খুন! বলে ফ্ল্যাটবাড়ি একেবারে মাথায় তুলল।

ফলে, আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, সব এসে হাজির হল।

দেবপ্রিয় বাইরে কাঁদছিল, তবে ভেতরে-ভেতরে মজা দেখছিল। নিখুঁত খুন করতে পারার অহংকার ওর ভেতরে ফুলে-ফুলে উঠছিল।

*

দেবপ্রিয় জানত না, ওর খুনের ছকে সব ঘুঁটি ঠিকমতো সাজানো হয়নি। তাই ওর খুনটাও নিখুঁত হয়নি।

কারণ, ওর হাতে লেখা চিরকুটটা পাড়ারই একটা দোকান থেকে স্টেন মদন ফোটোকপি করে নিয়েছিল। তারপর সেই কপিটা দেবপ্রিয়র লেটার বক্সে রেখে ওপরে উঠে এসেছিল। ভেবেছিল, খুনের কাজ সেরে ফেরার পথে ওটা নিয়ে যাবে। মদন পেশাদার খুনি। সেইজন্যই একটা অস্ত্র ও হাতে রাখতে চেয়েছিল। দরকার হলে যাতে দেবপ্রিয়র বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেটা মদন আর হাতে পায়নি। কারণ, দেবপ্রিয়র লেটার বক্সের অন্ধকার এককোণে চিরকুটের জেরক্স কপিটা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

# ফিরে আসা

**ফিরে আসা**

ওকে নিয়ে হইচই কম হল না। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, এই প্রথম একটা মানুষ চুক্তিমাফিক দাম দিয়ে ফিরে এল ভিনগ্রহের কলোনি থেকে।

আঠারো বছর ধরে মানুষটা দেশছাড়া। রুক্ষ বেজান নভোনি-নাইন গ্রহে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্রীতদাসের মতো খেটেছে, আর তিল তিল করে সঞ্চয় করেছে ঘরে ফেরার গাড়িভাড়া। হবেই তো–মহাকাশ-পাড়ির খরচ তো আর কম নয়!

তা ছাড়া রসালো গুজবও রটেছিল একটা। সবাই বলাবলি করছিল, একটা মেয়ে নাকি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। যদি তাই হয়, তাহলে এ তো শতাব্দীর সেরা প্রেমকাহিনি। মানুষটাকে নিয়ে মহাকাশযান কলকাতার স্পেসপোর্টে এসে নামার আগেই চন্দন দাশগুপ্ত বিখ্যাত হয়ে গেছে। কী করে যেন খবরটা রটে গেছে আগেভাগেই। শুধু খবর নয়, তার সঙ্গে গুজব, কিংবদন্তি, রূপকথার আরব্যরজনী।

ছায়াপথের একপ্রান্ত থেকে দুস্তর মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ভেসে আসছিল নক্ষত্রযান রাকেশ। নক্ষত্রযানে এই প্রথম ছিল এক পৃথিবীযাত্রী–চন্দন। সুতরাং স্পেসপোর্টে যে সাংবাদিকদের আগাম ভিড় হবে সে আর আশ্চর্য কী!

আকাশমুখী তাকিয়ে নাক উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা নক্ষত্রযানের ল্যান্ডিং এলিভেটর যখন সেই মানুষটিকে নিয়ে জমির দিকে নেমে আসতে লাগল তখনই শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন।

চন্দন দাশগুপ্তের চেহারা রূপকথার নায়কের মতোই বটে। লম্বা, ছিপছিপে, শক্তিমান। শান্ত মুখ, ঠোঁট পাতলা বিবর্ণ, এই মাঝ-চল্লিশ বয়েসেই মাথার

নব্বইভাগ চুল সাদা। তবে চোয়ালের রেখা শক্ত, চোখের নজর স্বপ্নমাখা এবং গভীর। কিংবদন্তির সঙ্গে সবকিছুই যেন মিলে যাচ্ছে? চেহারা, মুখ, চোখ। হ্যাঁ, এই মানুষটাই পারে ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে অভিমানে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে, তারপর নিছক সেই অপূর্ণ ভালোবাসায় শক্তিতে পরিশ্রম করে যেতে পারে আঠারো বছর!

ক্যামেরা চলছে। চলছে টিভি আর ভিডিয়ো ক্যামেরা। এপাশে-ওপাশে ফ্ল্যাশগানের ঝিলিক। প্রায় পাঁচশো সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারের জিভ শুকিয়ে এল, গলায় রবারের বল। একটু পরেই জানা যাবে শতাব্দীর সেরা খবর, রোমাঞ্চকর সত্যকাহিনি।

চন্দন ঠান্ডাভাবে হাসল, খবরের কাগজের লোকজনদের দিকে হাত নাড়ল। ওর চোখের পাতা পড়ল না। হাত দিয়ে ফ্ল্যাশগানের চড়া ঝিলিক আড়াল করল না। মুখও ফেরাল না ক্যামেরার দিক থেকে। অদ্ভুত এক শান্তভাব ওর চোখেমুখে, অস্বাভাবিক এক নিয়ন্ত্রণ কাজ করছে যেন সেখানে। সবাই ভেবেছিল, আঠারো বছর পর জন্মভূমিতে পা রেখে মানুষটা বাচ্চা ছেলের মতো অঝোরে কাঁদবে। হাঁটুগেড়ে বসে চুমু খাবে মাটিতে। কিন্তু ও কিছুই করল না। শুধু ঠোঁটে হাসল আর হাত নাড়ল।

গ্লোবাল নিউজ কাগজের রিপোর্টার সামনে এগিয়ে এল। ইন্টারভিউ নেওয়ার লটারিতে সে-ই জিতেছে। সুতরাং প্রথম ইন্টারভিউর সুযোগ তার।

পৃথিবীতে স্বাগত জানাই, মিস্টার দাশগুপ্ত। ফিরে এসে কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে। মাপা ভারী গলায় উত্তর দিল চন্দন। ওর সবকিছুর মধ্যেই যেন নিয়ন্ত্রণ কাজ করছে।

খবরের কাগজের এত লোক দেখে আপনি নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাননি?

একসঙ্গে এত লোক আমি আঠারো বছর ধরে দেখিনি। তবে তার জন্যে ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে!

মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। চুক্তিপত্র সই করে বহু মানুষ পৃথিবী ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে, কিন্তু ফিরে কেউই আসেনি–মানে, আপনি ছাড়া।

তাই? জানতাম না তো! হাসিটা সামান্য চওড়া করে সহজ গলায় জবাব দিল চন্দন।

আপনি না জানলে কী হবে, দুনিয়ার আর সবাই জানে। আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ আপনার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। আপনার এই চলে যাওয়া-আর দেড়যুগ পরে ফিরে আসা–এর নেপথ্য কাহিনি জানার জন্যে ছটফট করছে সবাই। প্রথমত, আপনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন, মিস্টার দাশগুপ্ত? আবার নভোনি-নাইন থেকে ফিরেই বা এলেন কেন?

বিষণ্ণভাবে হাসল চন্দন। বলল, একটা মেয়ের জন্যে। সুন্দরী এক তরুণীর জন্যে। সে এখন খুব বিখ্যাত। ও আমাকে ভালোবাসত। আমিও ওকে ভালোবাসতাম। কিন্তু যখন ও আমাকে মানে, যেদিন থেকে ও আমাকে ফিরিয়ে দিল, সেদিনই আমি ঠিক করি, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। এতদিন পর আমার মনে হয়েছে, ওর ভালোবাসা আবার ফিরে পাব আমি–তাই ফিরে এসেছি। একটু থেমে কপালে হাত বুলিয়ে নিল চন্দন, বলল, আমি খুব টায়ার্ড। যদি আমাকে এখন ছেড়ে দেন…পরে কথা বলব।

মিস্টার দাশগুপ্ত, প্লিজ, যদি ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলেন–

লম্বা জার্নি করে এসেছি–একটু বিশ্রাম না নিতে পারলে মরে যাব। কাল বিকেলের প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দেব।

একথা বলেই ও ভিড় ঠেলে একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল। স্পেশাল সিকিওরিটি গার্ডের দল ওকে নিরাপদে একটা ম্যাগনেটিক মোবাইলে তুলে দিল। স্পেসপোর্ট ছেড়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল ম্যাগ-মোবাইল।

.

নিউজ মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রত্যেকেই এই সংক্ষিপ্ত ইন্টারভিউ দেখেছে অথবা তার খবর শুনেছে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। চন্দন দাশগুপ্তের ফিরে আসার খবর ছবি-টবিসমেত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে। আগে চন্দনকে ঘিরে জনতার কৌতূহল ছিল, এখন সেটা দাঁড়িয়ে গেল প্রায় মনের অসুখে। ভালোবাসায় ব্যথা পেয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া, তারপর দ্বিতীয় সুযোগের

জন্য আঠারো বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা–এ যেন সেই আদ্যিকালের রূপকথার গল্প হাই-টেক চব্বিশ শতকের মাঝামাঝি আবার জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

তা ছাড়া, ভিনগ্রহের কলোনিতে নাম লিখিয়ে, পরে চুক্তিমাফিক দাম মিটিয়ে কলোনি ছেড়ে পৃথিবীতে ফিরে আসা তো নেহাত সহজ কাজ নয়! সোলার ফেডারেশন নামের আন্তর্জাতিক একটি সংস্থা প্রায় একশো বছর আগে একটি প্রকল্প চালু করে ৪ ডিসট্যান্ট প্ল্যানেট কোলোনাইজেশন। ভিনগ্রহে কলোনি স্থাপন করে মানবসভ্যতা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। ভিনগ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করে সেখানকার পাকাপাকি বাসিন্দা হতে চায় এমন মানুষদের আহ্বান জানিয়েছিল তারা। শর্ত ছিল, বিনা খরচে সেইসব মানুষকে পৌঁছে দেওয়া হবে অন্য নক্ষত্রজগতের কোনও গ্রহে। তাদের যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে, জমি দেওয়া হবে। বিনিময়ে তাদের শপথ করতে হবে যে, তারা সেখানেই বসবাস করবে চিরকালের জন্য বিয়ে করবে, মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে মানবসভ্যতার স্বার্থে। গত একশো বছরে এই প্রকল্প মানবসভ্যতাকে ছড়িয়ে দিয়েছে ছায়াপথের নানা গ্রহে। মহাকাশে প্রায় পাঁচশো আলোকবর্ষ ব্যাসার্ধ জুড়ে এখন খুঁজে পাওয়া যাবে এরকমই নানা কলোনি। তবে সেইসব মানুষের কেউ ফিরে আসেনি–একমাত্র চন্দন ছাড়া।

না, কলোনি ছেড়ে কোনও মানুষের ফিরে আসাটা যে তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব তা নয়। তবে খুব কম লোকই ফিরে আসতে চায়। আর যেকজনের মনে সে-ইচ্ছে জাগে, শর্তের কথা শুনলেই তারা পিছিয়ে যায়। শুধু চন্দন দাশগুপ্ত পিছিয়ে যায়নি।

ফিরে আসতে গেলে প্রথমেই সরকারি ঋণ মেটাতে হবে। সেই ঋণের একটা মোটামুটি হিসেব এইরকম : যাতায়াতের খরচ আট লক্ষ টাকা, জমির জন্য দু-লাখ টাকা, আর যন্ত্রপাতির জন্যও তাই–মোট বারো লক্ষ টাকা। এ ছাড়া রয়েছে দশ পার্সেন্ট হারে সুদ।

পৃথিবীতে যে দিব্যি সুখে-শান্তিতে আছে, যার পয়সাকড়ি সম্পত্তি আছে, সে কখনও কলোনিতে যাওয়ার জন্য নাম লেখাবে না। আর নিঃস্ব যে-মানুষটি ভিনগ্রহের কলোনিতে গিয়ে বাস করবে সে কী করে এত টাকা জোগাড় করবে! সেই কারণেই বন্ডের টাকা মিটিয়ে কলোনির কোনও মানুষ ফিরে আসতে পারেনি পৃথিবীতে।

চন্দনই প্রথম পারল। নভোটনি-নাইন-এ গিয়ে ঘড়ির কাঁটা ধরে ও পরিশ্রম করেছে, ঘাম ঝরিয়েছে। প্রতিবেশীদের চেয়ে অনেক বেশি ফসল ফলিয়েছে, যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে তারপর বাড়তি জিনিস বিক্রি করেছে তাদের কাছে। সঞ্চয়ের টাকা কেন্দ্র করে পাঠিয়েছে পৃথিবীতে। টেলি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে শেয়ার বাজারে লাগিয়েছে সেই টাকা। জুয়া খেলেছে ও। প্রাণপণ শ্রম দিয়ে কান্না-ঘাম-রক্ত দিয়ে জুয়া খেলেছে চন্দন। ওকে যে ফিরতেই হবে। ভালোবাসার মানুষের কাছে ওকে ফিরতেই হবে। তা সে যতদিন পরই হোক।

এইভাবে কেটে গেছে আঠারো বছর। বারো লক্ষ টাকা চুক্তিপণ দিয়ে চন্দন ফিরে এসেছে।

এখন সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে চায়, ও কেন ফিরে এল, কার জন্য ফিরে এল।

ফিরে আসার পরদিনই হোটেলের ঘরে প্রেস কনফারেন্স ডাকল ও। সোলার ফেডারেশন ওর জন্য হোটেলের সেরা সুইট ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ ছাড়া ওর নিরাপত্তার জন্য রয়েছে স্পেশাল সিকিওরিটি গার্ডের দল। কর্তৃপক্ষ বাছাই করে কুড়িটি প্রথম সারির সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে চন্দনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে।

চন্দন দাশগুপ্ত রিপোর্টারদের সামনে এল। পরনে জিক্স-এর জামা, জিল্স-এর প্যান্ট। পায়ে ছাইরঙের স্পোর্টস শু। আচরণের প্রতিটি কণায় আভিজাত্যের ছাপ। মুখে স্থির প্রতিজ্ঞা। বলিষ্ঠ হাতের শিরা-উপশিরা চেয়ে আছে। মাথার চুলে সাদাকালো ছবি। এখনকার আধুনিক প্রসাধন-পদ্ধতির যুগে কারও বয়েস বাড়ে না। কিন্তু চন্দনের যে প্রসাধন দরকার নেই। ওর চলাফেরার ভঙ্গিতে সেই ঔদ্ধত্য নজরে পড়ছে। আর চোখ দুটো যেন লাইটহাউসের তীব্র আলো, ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের চারদিকে, প্রত্যেককে একবার করে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে সকলেই অস্বস্তিতে পড়ল। মানুষের চোখে এমন দৃষ্টি ওরা আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু কলোনি থেকে ফিরে আসা কোনও মানুষকেও তো ওরা আগে দেখেনি।

যান্ত্রিক হাসি হাসল চন্দন। বলল, গুড আফটারনুন। বলুন, আপনারা কী জানতে চান–

খুবই সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে রিপোর্টারদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

নভোনি-নাইন কীরকম গ্রহ, মিস্টার দাশগুপ্ত?

ঠান্ডা। টেমপারেচার কখনও পনেরো ডিগ্রির ওপরে ওঠে না। আর মাটি ভীষণ রুক্ষ। চাষবাস খুব মেহনতের ব্যাপার। স্রেফ বেঁচে থাকতে গেলেই ওখানে দিনরাত খাটতে হয়।

সইসাবুদ করে যখন ওখানে রওনা হন তখন এসব জানতেন?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল চন্দন : হ্যাঁ, জানতাম। আমি সবচেয়ে খারাপ গ্রহের খারাপ কলোনিতে যেতে চেয়েছিলাম।

সেখানে কত লোক আছে?

প্রায় বিশ হাজার। বুঝতেই পারছেন, সহজে কেউ নভোনি-নাইন-এ যেতে চায় না।

মিস্টার দাশগুপ্ত, কলোনিতে যাওয়ার চুক্তির মধ্যে একটা শর্ত আছে যে, ওখানে গিয়ে বিয়ে করতে হবে। আপনি কি বিয়ে করেছেন?

বিষণ্ণভাবে হাসল চন্দন : ওখানে পৌঁছোনোর এক সপ্তাহ পরেই বিয়ে করেছিলাম আমি। সেই ২৩১৯ সালেই। কিন্তু সে-বছরের শীতেই আমার স্ত্রী মারা যায়। কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি আমাদের। পরে আর বিয়েও করিনি।

কবে আপনি ঠিক করলেন যে চুক্তিপণ দিয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবেন? নভোটুনি-নাইন-এ যাওয়ার প্রায় আড়াই বছর পরে।

তার মানে প্রায় পনেরো-সাড়ে পনেরো বছর ধরে আপনি পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য পরিশ্রম করেছেন!

ব্যাপারটা আমারও বিশ্বাস হতে চায় না কিন্তু সত্যি।

ট্রান্সওয়ার্ল্ড নিউজ-এর এক তরুণ রিপোর্টার শেষ পর্যন্ত লাখ টাকার প্রশ্নের দিকে ঝুঁপ দিল ও কিন্তু আপনি কলোনি ছেড়ে ফিরে আসার ডিসিশন নিলেন কেন? স্পেসপোর্টে আপনি বলছিলেন, সুন্দরী এক তরুণীর জন্যে আপনি ফিরে এসেছেন।

চন্দন হাসল, তবে সে-হাসিতে খুশি নেই। বলল। হ্যাঁ, তাই। আসলে যখন আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই তখন আমার বয়েস কম ছিল মাত্র পঁচিশ। তখন একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু সে অন্য আর একজনকে বিয়ে করে। তখন ব্যর্থ প্রেমিক হয়ে রোমান্টিক জেদের বশে আমি নভোটনি-নাইন-এ যাবার জন্যে সই করে দিই। আড়াই বছর পর পৃথিবী থেকে পাওয়া টেলি-নিউজে জানতে পারি ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে–অর্থাৎ ২৩২২ সালে। তখনই ঠিক করি, পৃথিবীতে আমি ফিরে আসব, ওকে বিয়ে করব–যে করে থোক, ওকে রাজি করাবই।

আর একজন সাংবাদিক বলল, তার মানে পুরোনো প্রেম জোড়া দেবার জন্যে আপনি পনেরো বছর ধরে লড়াই করে গেছেন। এর মধ্যে এই ভদ্রমহিলা যে আবার বিয়ে করেননি সেটা কী করে জানলেন?

সবাইকে চমকে দিয়ে চন্দন নির্লিপ্ত গলায় বলল, না, বিয়ে ও করেছে—

বিয়ে করেছে! তাহলে–।

২৩২৪ সালে ওর দ্বিতীয় বিয়ের খবর আমি পাই। সেটা ডিভোর্স হয়ে যায় ২৩২৫-এ। তারপর ২৩২৭-এ আবার বিয়ে, ২৩২৯-এ ডিভোর্স। সে-বছরই আবার বিয়ে, আর ২৩৩৪-এ ডিভোর্স। ২৩৩৫-এ শেষ বিয়ে, আর চার মাস আগে সেটা ডিভোর্স হয়ে গেছে। তারপর ওর আর কোনও বিয়ের খবর পাইনি।

রিপোর্টাররা মনে মনে হিসেব কষছিল, কোন বিখ্যাত মহিলা পাঁচবার বিয়ে করে পাঁচবারই ডিভোর্স করেছেন স্বামীকে। কিন্তু হিসেবটা খুব সহজ নয়। বিয়ে আর ডিভোর্সটা এখন আর কোনও ঘটনার মধ্যে পড়ে না। নেহাতই সাদামাঠা। তা সত্ত্বেও

এই বিয়ের খবর পাওয়ার পর আপনার মনের অবস্থা কী হত? হাল ছেড়ে দিতেন?

চন্দন মাথা নাড়ল? না, আমি টাকা জমিয়েই যাচ্ছিলাম–থামিনি। কারণ আমার কেন যেন মনে হত, ওর কোনও বিয়েই টিকবে না। ওকে তো আমি চিনি। এতগুলো বছর ধরে ও শুধু আমার শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। হবেও না। কারণ একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের কখনও হুবহু মিল থাকে না। ওর পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে আমি সহ্য করেছি। ছনম্বর বিয়েটা আর সহ্য করতে হবে না, ওটা আমার ভালো লাগবে। কারণ ছনম্বর বিয়েটা হবে আমার সঙ্গে।

এই মহিলা কে? মানে, ওঁর নামটা আমাদের বলবেন, মিস্টার দাশগুপ্ত?

ঠান্ডা হাসি হাসল চন্দন। বলল, এখনও নাম বলার সময় আসেনি। আপনাদের আর কোনও প্রশ্ন আছে?

.

চন্দনের প্রেস কনফারেন্স যখন শেষ হল তখন সন্ধে গাড়িয়ে গেছে। সাংবাদিকদের কাছে কিছুই লুকোয়নি ও : কত কষ্ট করে টাকা জমিয়েছে; কলোনির জীবন কেমন ছিল; কত লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে সেখানে। যার জন্য ও এত কাণ্ড করেছে শুধু তার নামটা এখনও বলেনি।

ওরা সবাই চলে যাবার পর হোটেলের বিলাসবহুল সুইটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার কলকাতা দেখছিল চন্দন। এখানে-ওখানে হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের আলো জোনাকির মতো জ্বলছে। আকাশপথে জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছে ঘন ঘন। তাদের তীব্র আলো থেকে থেকেই অন্ধকার চিরে দিচ্ছে খুশিমতো। কোথা থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রের শব্দ। নভোটনি-নাইন-এর কথা মনে পড়ছিল বারবার। গ্রহটা রুক্ষ ছিল, ঠান্ডা ছিল, কিন্তু যান্ত্রিক ছিল না। প্রকৃতির উষ্ণতা ছিল সেখানে।

চন্দনের যে না ফিরে কোনও উপায় ছিল না। একটা অদৃশ্য টান ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। অনেকটা মহাকর্ষের টানের মতো–যেটানের রহস্য এখনও সকলের অজানা।

ঘরে ঢুকে এল চন্দন। একটা সুইচ টিপে জানলার কাচ অস্বচ্ছ করে দিল। আপনমনেই হাসল ও। এখন নভোটনি-নাইন-এ শীতকাল। এখন সরীসৃপদের মতো শীতঘুমে লুকিয়ে পড়ার সময় সেখানে। পাহাড়ের মতো উঁচু নীলচে-সাদা

বরফের তাল তুষারঝড়ে চলে বেড়ায় সেই গ্রহের মাটিতে। এখানকার ষোলো মাসে ওখানকার একবছর। তার মধ্যে আটমাসই শীত। তখন মাটিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেঁধিয়ে যেতে হয় ইঁদুরের মতো–একটু উষ্ণতার জন্যে। আর বাকি আটমাসের মধ্যে মোটামুটি চারমাস বাসযোগ্য আবহাওয়া থাকে। কিন্তু এত প্রতিকূল অবস্থাতেও মানুষ লড়াই করতে পারে। চন্দন পেরেছে।

সেখানে ওর বন্ধুবান্ধবও ছিল। না, পৃথিবী থেকে যাওয়া অন্যান্য কলোনিবাসী নয়। তারা পরিশ্রমী ভালোমানুষ। চন্দন ভাবছিল, কাঁপাসিয়াদের কথা–নভোটনি-নাইন-এর যারা বরাবরের বাসিন্দা।

পৃথিবী থেকে যে-সব সার্ভে প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল তাতে নভোটনি-নাইন-এর কাঁপাসিয়াদের কথা জানা যায়নি। অবশ্য ওদের সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র শপাঁচেক-এ এসে ঠেকেছিল। চন্দনের কাঁপাসিয়া বন্ধু ডোনোই সেরকমই বলেছিল ওকে। তাছাড়া চন্দনও কখনও একসঙ্গে একডজনের বেশি কাঁপাসিয়া দেখেনি। ওদের সবাকেই একই রকম দেখতে। উচ্চতায় ফুট তিনেক, রোগা ভঙ্গুর চেহারা, ছোট্ট মুখে বড় বড় দুটো বিষণ্ণ চোখ। ভীষণ ঠান্ডাতেও ওরা বিনা পোশাকে ঘুরে বেড়ায়। মাটির নিচে ছোট ছোট গুহায় ওরা বাস করে। এইরকমই একজন কাঁপাসিয়া ডোনোই চন্দনের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

ডোনোই-এর কথা মনে পড়তেই চন্দন ঠোঁটে হাসল। তুষারঝড়ের মধ্যে একদিন ডোনোইকে খুঁজে পেয়েছিল ও। দেখে মনে হয়েছিল, বেঁচে নেই। কিন্তু ডোনোই বেঁচে উঠেছিল, সেরে উঠেছিল। সেবারে শীতকালটা ও চন্দনের কেবিনেই কাটিয়েছিল। খুব সামান্য কথা বলেছিল চন্দনের সঙ্গে। বরং বেশিরভাগ সময় ও চুপচাপ শুধু চন্দনের কথাই শুনত।

চন্দন ওকে সব কথাই বলেছিল। বলে মন হালকা করেছিল। বলেছিল নিজের বোকামির কথা, ওর অন্ধ বিশ্বাসের কথা যে মাধুরী এখনও ওকে ভালেবাসে, আর বলেছিল পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পাগলকরা বাসনার কথা। মাধুরীকে যে কিছুতেই ও ভুলতে পারছে না।

সব শোনার পর, বোঝার পর, ডোনোই বলেছে, পৃথিবীতে তুমি ফিরে যাবে। দেখবে, মাধুরী তোমার কাছেই ফিরে আসবে আবার।

তখন মাধুরীর দ্বিতীয় বিয়ে চলছে। যেদিন টেলি-নিউজে মাধুরীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর চন্দন জেনেছিল সেদিন ও একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ডোনোই ছিল কাছে! ওই ছোটখাটো কৃশকায় ভিনগ্রহীর মনে এত জোর কে জানত! ডোনোই ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, আশ্বাস দিয়েছিল, ভরসা দিয়েছিল। তারপর থেকে চন্দনের প্রতিজ্ঞা একচুলও টলেনি। মাধুরী একটার পর একটা বিয়ে করেছে, বিয়ে তেতো হয়েছে, নষ্ট হয়েছে, শেষমেশ ভেঙে ছত্রখান হয়েছে কিন্তু চন্দন পরিশ্রম করে গেছে অবিচলভাবে। ওর মনে শুধু এই বিশ্বাস ছিল, ও পৃথিবীতে ফিরে এলে মাধুরীকে পাবে।

ডোনোই শান্ত ধীর স্বরে চন্দনকে বলেছিল, বন্ধু, তেমন করে যদি চাওয়া যায়, তাহলে ঠিক পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস কখনও নষ্ট হতে দিও না। দ্যাখো, আমি তো বরফে চাপা পড়ে মরেই যাচ্ছিলাম। আমি মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম তুমি এসে আমাকে খুঁজে বের করো। ব্যস, তুমি এলে, আমাকে বাঁচালে।

চন্দন তখন প্রতিবাদ করে বলেছে, কিন্তু ডোনোই, আমি তো তোমার মতো কাপাসিয়া নই! আমার মনে এত জোর নেই। আমি ইচ্ছে করলেই অন্যের ইচ্ছে বদলে দিতে পারি না।

ভুল, বন্ধু। যে প্রাণী চিন্তা করতে পারে, তারই ইচ্ছাশক্তি আছে। দেখি, তোমার হাতটা দাও, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি–

পনেরো বছর আগের কথা মনে পড়ল চন্দনের। ও তৃপ্তির হাসি হাসল। সারাজীবনে কোনও বন্ধু ডোনোই-এর মতো করে কখনও ওর হাত ধরেনি। ওর মনে পড়ল ডোনোই-এর সরু নরম হাতটার কথা। হাড় প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ হাতটা ধরামাত্রই একটা অলৌকিক ঝাঁকুনি টের পেয়েছিল ও। এক অদ্ভুত শক্তি চিনচিন করে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল চন্দনের শরীরে। তার পর বহু দিন ধরে ও টের পেয়েছিল সেই আশ্চর্য অনুভূতি। কিন্তু স্পর্শের সেই ক্ষণ থেকেই চন্দন বুঝতে পেরেছিল, ও জিতবেই। মাধুরী আর কারও নয়। আর কারও হতে পারে না।

*

পরদিন সকালে চন্দনের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন।

সেদিন বিকেলে আর একটা প্রেস কনফারেন্স হওয়ার কথা ছিল। সেইজন্য চন্দন বলে রেখেছিল আলাদাভাবে আর কোনও ইন্টারভিউ দেবে না। কিন্তু যিনি দেখা করতে এসেছেন তিনি নাছোড়বান্দা। সুতরাং শেষ পর্যন্ত হোটেলের রিসেপশান থেকে চন্দনকে ফোন করে জানাল যে, জনৈক রাকেশ চিরিমার ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

নামটা যেন চেনা চেনা ঠেকল। চন্দন ফোনে বলল, ওপরে পাঠিয়ে দিন–

কয়েক মিনিট পরই রাকেশ চিরিমার চন্দনের ঘরের বেল বাজালেন। তারপর দরজা খোলাই আছে জেনে ঢুকে পড়লেন ঘরে।

মাথায় চন্দনের তুলনায় খাটো, মোটাসোটা, ফরসা রং, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত করে কামানো। ডান হাতের মাঝের আঙুলে একটা সুন্দর আংটি। তার পাথরটা ভিনগ্রহের বলেই মনে হল।

রাকেশ হাত বাড়িয়ে দিলেন। চন্দন হাত মেলাল। জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার, বলুন–।

রাকেশ তার হাতে ধরা একটা নিউজফ্যাক্স দেখালেন। তার প্রথম পাতায় ছবি দিয়ে বড় করে চন্দনের ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে। সেটা আঙুল ঠুকে দেখিয়ে বললেন, মিস্টার দাশগুপ্ত, এটা পড়েই আমি বুঝতে পেরেছি মেয়েটা কে। আমি আপনাকে ইয়ে মানে সাবধান করতে এসেছি– বন্ধু হিসেবে। ওর সঙ্গে আপনি জড়াবেন না।

চন্দনের চোখে হিরের কুচি ঝিলিক দিল। জিগ্যেস করল, কেন জানতে পারি?

রাকেশ জড়ানো গলায় বললেন, মেয়েটা মেয়ে নয়, ডাইনির বাচ্চা। ও শুধু ছেলে ধরে আর ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়। আমি তো জানি। আপনি শুধু ওকে ভালোবেসেছিলেন। আর আমি....আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম।

হ্যাঁ, আঠারো বছর আগে আপনিই ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

না, মোটেই তা নয়– রাকেশ প্রতিবাদ জানালেন ঃ ও আমাকে বিয়ে করেছিল ওর কেরিয়ারের পক্ষে সুবিধে হবে ভেবে। তা যে হয়নি তা নয়। আপনি নভোটুনি-

নাইন-এ রওনা হওয়ার দিন ওকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটা দেখে আমি প্রথম জানতে পারি আপনার কথা। তার আগে কিছুই জানতাম না, বিশ্বাস করুন! ও সে-চিঠি আমাকে যখন দেখায় তখন আপনার নামে বহু কথা বলেছিল। সে-সব কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না, মিস্টার দাশগুপ্ত। শুধু ওর তখনকার হাসিটা মনে পড়লেই আমার অস্বস্তি হয়। আর বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের বিয়েটাতে চিড় ধরতে শুরু করে। পুরোপুরি ফাটল ধরতে অবশ্য বছর আড়াই লেগেছিল। ওকে আমি কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিইনি, মিস্টার দাশগুপ্ত। ও-ই একরকম আমার গলায় ঝুলে পড়েছিল। বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস করলাম।

রাকেশ চিরিমার রুমাল বুলিয়ে নিলেন কপালে। একটু দম নিয়ে বললেন, ওর অন্য বিয়ের গল্পও সেই একই। ওর কেরিয়ারের দিকে বরাবরই আমার নজর রয়েছে। ও বাঁচে স্রেফ নিজের জন্যে-মাধুরী মিত্রের জন্যে। আমাকে ও ডিভোর্স করেছিল মোহন রসতোগিকে বিয়ে করার জন্যে। রসতোগি বেচারার বয়েস হয়েছিল। তার ওপরে হার্টের ট্রাবল ছিল। বুকে বসানো ছিল পেসমেকার। ফিলিম স্টারকে বিয়ে করার আনন্দে ওর বোধহয় মাথার ঠিক ছিল না। একদিন সকালে চা খেতে খেতে মাধুরী হঠাৎই ওকে বলে, আমি চললাম। তোমার মতো বুড়োকে বিয়ে করে কোনও মজা নেই। ব্যস... দুপাশে হাত ছড়িয়ে করুণ হাসলেন চিরিমার। বললেন, রসতোগি সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করেছিল। কিন্তু মাধুরীর তাতে কোনও প্রবলেম হয়নি। রসতোগির পর একে একে এসেছে সমীরণ দাশুগুপ্ত, অনুপম মহান্তি, রঞ্জিত কাপুর। মাধুরী মইয়ের ধাপে ধাপে পা রেখে পৌঁছে গেছে খ্যাতির চূড়ায়। সেই সঙ্গে পয়সাও কামিয়ে নিয়েছে দুহাতে। শুধু ওর চলার পথে পড়ে ছিল পাঁচটা স্বামীর ছিবড়ে। তেতো হাসি হাসলেন রাকেশ। নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললেন, তার মধ্যে একটা ছিবড়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এখন কথা বলছে।

চন্দন কাধ আঁকিয়ে বলল, মাধুরীর পুরোনো ব্যাপার নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।

আপনি কি সত্যি সত্যি ভাবছেন মাধুরী আপনাকে বিয়ে করবে?

হ্যাঁ, বিয়ের কথায় ও একেবারে লাফিয়ে উঠবে। বিশেষ করে আমাকে এখন বিয়ে করলে ও জোর পাবলিসিটি পাবে। কাগজে বড় বড় হেডলাইন ছাপা হবে :

পাঁচবার ঘর-ভাঙা রমণী এবারে তার প্রথম প্রেমিকের ঘরণী হতে চলেছে।

রাকেশ চিরিমার শুকনো ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চন্দনের উত্তরে তিনি খুশি হতে পারেননি। তবে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন : হ্যাঁ, পাবলিসিটির এমন সুযোগ মাধুরী হাতছাড়া করবে না। কিন্তু কদ্দিন টিকবে আপনাদের বিয়ে? ছমাস, একবছর পাবলিসিটির ঢেউ থিতিয়ে গেলেই বিয়েতে ইতি পড়বে। তারপর আপনি আবার পথে বসবেন। আপনার মতো ভিখিরি স্বামী মাধুরীর কোনও কাজে লাগবে না।

না, ও আমাকে ছাড়বে না।

চন্দনের গলায় আস্থা ছিল। রাকেশ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ রইলেন। তারপর বললেন, আপনি তাহলে খাল কেটে কুমির ডাকবেন বলেই ঠিক করেছেন? কী ব্যাপার বলুন তো, দাশগুপ্ত? আপনি কি ওকে বিয়ে করবেন বলে মা কালীর কাছে দিব্যি কেটেছেন?

চন্দন শান্ত গলায় বলল, ওসব ভগবানের চেয়ে আমি নিজেকে বেশি বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি কি এসব কথা বলার জন্যেই দেখা করতে এসেছেন?

রাকেশ চিরিমার একবার মাথা নাড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, না, আসলে আমি একটা অফার নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি তো এখন পৃথিবী বিখ্যাত। আপনার পাবলিসিটি আমার কোম্পানির কাজে আসবে। আমার কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর দরকার, মাসে দু-কোটি করে আপাতত দেব। এখন তো মশাই দুনিয়ার সব মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে। একবার কসমেটিক সার্জারি করালেই আপনার বয়স আবার সুড়সুড় করে পঁচিশে নেমে যাবে। তখন কাণ্ডটা দেখবেন! শুধু মাধুরীকে নিয়ে এই পাগলামি ছাড়ুন। এখানে একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে-থা দিয়ে দেব। তখন দেখবেন, ওই নাইন না টেন গ্রহের সব ব্যাপার-স্যাপার দিব্যি ভুলে যাবেন।

না, আমার কোনও ইচ্ছে নেই।

মিস্টার দাশগুপ্ত, ভাববেন না আপনাকে আমি দয়া দেখাচ্ছি। আপনাকে পেলে সত্যিই আমার কোম্পানির সুবিধে হবে। তাছাড়া, এটাও সত্যি যে, মাধুরীর মতো মেয়ের খপ্পর থেকে আপনাকে বাঁচানো দরকার। আঠারো বছর আগে আমি

অজান্তে আপনার ওপরে অবিচার করেছিলাম। তারও তো প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। সেইজন্যেই এই অফারটা–

সরি, মিস্টার চিরিমার। এখন আমার মাথায় মাধুরী ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা নেই। আপনি অন্য লোক খুঁজুন। আপনার অ্যাডভাইসের জন্যে ধন্যবাদ।

রাকেশ চিরিমারের মুখ লাল হল। উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর ভারী গলায় বললেন, ঠিক আছে। তাহলে মাধুরীর কাছেই যান–একবার বাতি দেখতে পেলে শ্যামাপোকা কারও কথা মানে না। আমার ওপেন অফার রইল। প্লিজ হ্যাভ মাই ডিপেস্ট সিমপ্যাথি।

সেদিন বিকেলের প্রেস কনফারেন্সে মেয়েটির নাম বলল চন্দন। মাধুরী মিত্র। খবরটা পেয়ে নিউজ নেটওয়ার্ক টগবগ করে ফুটতে লাগল। একঘণ্টার মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়।

পঁচিশ বছর ধরে ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্রের গ্ল্যামার কুইন মাধুরী মিত্রের জন্য চন্দন দাশগুপ্ত নভোটনি-নাইন-এর কলোনি থেকে ফিরে এসেছেন। চন্দন দাশগুপ্ত বলেন, আঠারো বছর আগে মাধুরীদেবী নেহাতই ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করতেন। ২৩১৯ সালে চন্দন দাশগুপ্তকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বম্বের প্রখ্যাত শিল্পপতি রাকেশ চিরিমারকে বিয়ে করেন। কিন্তু এইভাবে মাধুরীদেবী পাঁচবার বিয়ে করেও সংসারী হতে পারেননি।

এ-বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে চন্দন দাশগুপ্ত বলেন, আমি ওকে আঠারো বছর আগে যেমন ভালোবাসতাম, এখনও তাই বাসি। ওকে আমি বিয়ে করতে চাই।

এই প্রসঙ্গে বম্বেতে মাধুরীদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তিনদিন মাধুরী চুপচাপ রইল। কারও সঙ্গে দেখা করল না। নিউজ মিডিয়াকে কোনও স্টেটমেন্ট দিল না। চন্দন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। আঠারো বছরের অপেক্ষা মানুষকে ধৈর্য ধরতে শেখায়। তাছাড়া নভোনি-নাইন-এ ও আর ডোনোই যখন বসন্তকালের বনানীর পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন ডোনোই বলেছিল, বন্ধু, যে তাড়াহুড়ো করে সে ইচ্ছের লড়াইয়ে বোকার মতো সব সুযোগসুবিধে জলাঞ্জলি দেয়।

একটি ভিনগ্রহী প্রজাতির শেষ যুগের প্রাণী ডোনোই। সেই প্রজাতির প্রায় সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা ছিল ডোনোই-এর মধ্যে। খুদে ভিনগ্রহীর উপদেশ মনে রেখে হোটেলের সুইট ছেড়ে বেরোল না চন্দন। ডোনোই কখনও চন্দনের ইচ্ছের ভালো-মন্দ নিয়ে মন্তব্য করেনি। শুধু দরকারি পরামর্শ দিয়েছে, উপদেশ দিয়েছে। আর শিখিয়েছে ইচ্ছেশক্তির ব্যবহার, কুশলতা।

চন্দনের সম্পর্কে আর কোনও নতুন তথ্য নিউজ মিডিয়া পেল না। চন্দনও ওদের আর কোনও নতুন খবর দিতে চায়নি। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই, ওদের আগ্রহ গেল কমে। তৃতীয় দিন থেকেই প্রেস কনফারেন্সের আর কোনও দরকার হল না। চন্দন দাশগুপ্ত ফিরে এসেছে, বলেছে। মাধুরী মিত্রের প্রতি ওর আঠারো বছরের পুরোনো ভালোবাসার কথা। তারপর থেকেই ও বসে রয়েছে চুপচাপ শুধু অপেক্ষা করেছে।

শান্ত হয়ে বসে থাকতে চন্দনের কষ্ট হচ্ছিল। পৃথিবীতে এখন হেমন্তের শুরু। আর নভোনি নাইন-এ হিমশীতল শীতের হাহাকার। এখানে পাঁচশো কোটি মানুষের কর্মব্যস্ততা, হইচই। অথচ চন্দন একা। আঠারো বছর নিরিবিলি শান্ত জীবন কাটিয়ে ও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, মাধুরীকে ফোন করলে কেমন হয়! ভিজিফোনের ডিজিটাল প্যানেলে আঙুল ছোঁয়ালেই বম্বে আর কলকাতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে। চন্দন। আজ হোক, কাল হোক মাধুরী ওকে ফোন করবেই।

চতুর্থ দিনে ফোনটা এল।

মাধুরী ভিজি সারকিট অফ করে রেখেছিল, তাই শুধু ওর গলা শোনা গেছে–ছবি দেখা যায়নি। সুতরাং চন্দনও ওর ভিজি সারকিট অন করেনি।

অপারেটর লাইন দেওয়ামাত্রই শোনা গেল মাধুরীর গলা। কোনওরকম ভূমিকা না করেই ও বলল, এত বছর পর কেন ফিরে এলে, চন্দন?

তোমার জন্যে। তোমাকে এখনও আমি ভালোবাসি—

এখনও?

হ্যাঁ, এখনও। বিশ্বাস করো।

মাধুরী ওর নেশা ধরানো বিখ্যাত হাসি হাসল। এখন এ-হাসি শুধু চন্দনের জন্য। তারপর ঠাট্টার সুরে বলল, তোমার আই. কিউ. দেখছি আগের চেয়েও অনেক কমে গেছে, চন্দন

আই. কিউ. হয়তো কমেছে–ভালোবাসা কমেনি। চন্দন শান্ত গলায় বলতে চাইল। কিন্তু ওর বুকের ভেতরটা কীরকম যেন করছিল।

এই পাগলামির কথা প্রেসকে বলে তুমি আমাকে দারুণ পাবলিসিটি দিয়েছ। তার জন্যে ধন্যবাদ। জানোই তো, আমার এই বয়েসে এ-লাইনে পাবলিসিটি কুড়িয়ে বাড়িয়েই বাঁচতে হয়।

প্রেসকে আমি মিথ্যে কিছু বলিনি।

কী ইয়ারকি মারছ, চন্দন! তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে বিয়ে করতে চাও নাকি? এত বছর পরে এসবের কোনও মানে হয় না। প্রথম প্রেমের অসুখ কখনও এতদিন থাকে না।

আমার অসুখ সারেনি, মাধুরী।

বাজে কথা ছাড়ো, চন্দন। তুমি সত্যি সত্যি কী চাও বলো তো! মাধুরীর গলা তীক্ষ্ণ হয়েছে, বেড়ে যাওয়া বয়েস হঠাৎই উঁকি মেরেছে সেখানে।

চন্দন শান্ত গলায় বলল, প্রথমত আমি তোমাকে চাই। দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই। তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই। শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই।

চন্দন, কী হচ্ছে! কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল মাধুরী। তারপর গলা শক্ত করে বলল, তুমি কেমন করে ভাবলে তোমাকে আমি বিয়ে করব? এখন তোমার পুঁজিতে সস্তা পাবলিসিটি ছাড়া আর কী আছে! আঠারো বছর আগে তোমার অন্তত যৌবন ছিল। এখন তাও নেই।

মাধুরী, তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে—

আমার ইচ্ছে করছে না।

প্লিজ, মাধুরী, একবার–একটিবার দেখা করো আমার সঙ্গে। আমি তোমার কাছে যাব–

ও-প্রান্ত চুপচাপ।

মাধুরী, তোমাকে আমি আঠারো বছর ধরে ভালোবেসেছি। আর তুমি-তুমি আমাকে আঠারো মিনিট সময় দিতে পারবে না!

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর মাধুরী বলল, ঠিক আছে। এসো দেখা করতে। তবে বিয়ে আমি তোমাকে করব না।

·

মাঝরাতের কাছাকাছি কলকাতা ছেড়ে বম্বে রওনা হল চন্দন। সোলার ফেডারেশন ওর জন্য গোপনে একটা জেট প্লেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সকলের নজর এড়িয়ে সেই প্লেনে চড়ে বসেছে চন্দন। রিপোর্টাররা একবার এই খবর জানতে পারলেই সর্বনাশ! চন্দন প্লেনের জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছিল। ওর মনে পড়ছিল আঠারো বছর আগের দিনগুলোর কথা। সেই মিষ্টি ক্ষণগুলোর কথা। মাধুরীর সঙ্গে ওর দূরত্ব সময়ের হিসেবে আর মাত্র পনেরো মিনিট।

প্লেনটা একটু সেকেলে মডেলেরসলিড ফুয়েল পাওয়ার্ড জেট। তবুও ষোলো মিনিটের মাথায় ওকে পৌঁছে দিল বম্বে এয়ারপোর্টে। মাধুরী গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। রুপোলি রঙের টারবাইন পাওয়ার্ড লিমুজিন। সেই গাড়ি চন্দনকে নিয়ে বাতাসের বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেল মাধুরীর বিলাস বাংলোয়।

কী নেই সেখানে।

কৃত্রিম হ্রদ। তার শান্ত জলে ছোট ছোট খেলনা-নৌকো ভাসছে। তাদের ঘিরে রঙিন আলোকমালা। হ্রদ থেকে সবুজ তৃণভূমি মসৃণভাবে ঢাল তৈরি করে উঠে গেছে ওপরে। সেখানে রূপসির কপালে মনোরম টিপের মতো সুন্দরী এক বাংলো। ধবধবে সাদা তার রং।

অপরূপ পথ বেয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে। চন্দন নেমে পড়ল। এবং ঢুকে পড়ল আঠারো বছর আগের এক স্বপ্নের মধ্যে।

বড় বড় ঘর আর ফিনফিনে পরদা পেরিয়ে ও দেখতে পেল মাধুরীকে। একটা সোফায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বসে আছে। স্বপ্নের মতো। ভীষণ দামি এক পোশাক ওর শরীর ঢেকে রেখেছে। আর পোশাকের ভেতরের মেয়েটা–সেই আগের মতোই। চোখে কটাক্ষ, ভুরু সজীব, পুরু প্রাণবন্ত ঠোঁট। সব মিলিয়ে ওর বয়েস যেন বাড়েনি।

চন্দন খানিকটা দূর থেকেই দেখছিল মাধুরীকে।

মাধুরী!

কী দেখছ?

চন্দন হাত তুলে ক্ষণিক চুপ করতে বলল ওকে। তারপর অস্ফুটে উচ্চারণ করল, আমি স্বপ্ন দেখছি, মাধুরী। প্লিজ, আমাকে জাগিয়ে দিয়ো না–

তুমি বুড়িয়ে গেছ, চন্দন।

তেতাল্লিশে কেউ বুড়িয়ে যায় না। তবে তুমি ঠিক সেই আগের মতোই রয়ে গেছ।

তার জন্যে আমার ডাক্তারদের ধন্যবাদ দিও। কে বলবে আমার বয়েস চল্লিশ! তুমিও কসমেটিক সার্জারি করিয়ে নাও। খরচ যা লাগে আমি দেব। তখন আবার তুমি পঁচিশ বছরে ফিরে যাবে।

চন্দন আরও কাছে এগিয়ে এল। মাথা নাড়ল। বলল, গত আঠারোটা বছর আমি কিছুতেই আমার জীবন থেকে মুছে ফেলতে চাই না। সেই দিনগুলো আমি যে সবসময় তোমাকে নিয়েই ভেবেছি। তাই মনে রাখতে চাই।

মাধুরী কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, সত্যি করে বলো তো, তোমার মতলবটা কী!

তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

ও খিলখিল করে হাসল। অসংখ্য হিরের কুচি যেন কেউ ঢেলে দিচ্ছে কোনও কাচের নলের ভেতরে। একসময় থামল মাধুরী, চোখের কোণ দিয়ে তাকাল ও আঠারো বছর আগে এই জেদের হয়তো মানে ছিল, আজ আর নেই। তাছাড়া

লোকে বলবে, তুমি টাকার জন্যে আমাকে বিয়ে করছ। জানো তো, আমি এখন বেশ বড়লোক।

যে যা বলে বলুক। আমি তোমার টাকা চাই না। শুধু তোমাকে চাই।

মাধুরী উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গলায় বলল, চন্দন, চন্দন, আমাকে এই যে ফিরে পেতে চাইছ, এ তোমার নিছকই একটা জেদ। আঠারো বছর আগে তুমি যাকে ভালোবাসতে আমি মোটেই সেই মিষ্টি মেয়ে আর নই। আমি এই আঠারো বছরে আরও লোভী হয়েছি, আরও বুড়ি হয়েছি। আমাকে তুমি সইতে পারবে না, চন্দন।

মাধুরীর শরীর থেকে মিষ্টি ঘ্রাণ টের পাচ্ছিল চন্দন। ওদের দুজনের মধ্যে আর মাত্র হাত কয়েক দূরত্ব। চন্দনের বুকের মধ্যে সেই পুরোনো কষ্টটা জেগে উঠছিল। চোখের নজর ঠিকঠাক কাজ করছিল না। ওর জীবনের শান্ত হ্রদে আঠারো বছর আগে একটা ঢিল পড়েছিল। মাধুরী এসেছিল। এতে ঢিলের কোনও কষ্ট হয় না। সে অতি দ্রুত ডুবে যায় হ্রদের জলের গভীরে। কিন্তু হ্রদে জেগে ওঠা তরঙ্গমালার যে কী কষ্ট! ওরা বারবার ছুটে যায় পাড়ের দিকে। মাথা কুটে ফিরে আসে। আবার যায়। আবার ফিরে আসে। শুধু যাওয়া-আসা চলতে থাকে।

আঠারো বছর ধরে হ্রদের পাড়ে মাথা কুটে মরেছে চন্দন। কিন্তু এখন অন্তত শেষ হোক ওর তরঙ্গের যন্ত্রণার জীবন!

মাধুরী, তোমাকে আমি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল তক, আপাদমস্তক, এখনও ভালোবাসি

তেতো হাসল মাধুরী। বলল, জানো, আমার এই শরীরটা কতবার ব্যবহার হয়েছে? বারোয়ারি পান্থনিবাসের মতো কত পথিক

চন্দনের মধ্যে কী হয়ে গেল। এক পলকে হাত কয়েকের দূরত্ব কমিয়ে ফেলে ও মাধুরীর ঠোঁটে হাত রাখল। থামিয়ে দিল ওর কথা। বলল, তোমার শরীরটাই ব্যবহার হয়েছে–মন ব্যবহার হয়নি, মাধুরী।

ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো ডান হাতটা শূন্যে তুলল মাধুরী। আর চন্দন উষ্ণ হাতে সেই হাত আঁকড়ে ধরল!

মাধুরী অস্ফুট স্বরে বলল, আমার মাথা আর কাজ করছে না…

চন্দনের মনে পড়ল ডোনোই-এর কথা? তেমন করে যদি চাওয়া যায়, তাহলে ঠিক পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস কখনও নষ্ট হতে দিয়ো না।

ডোনোই চন্দনের হাতে হাত রেখেছিল। অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি প্রবাহিত হয়েছিল হাত থেকে হাতে। এখন চন্দন ধরে রেখেছে মাধুরীর নরম ফরসা হাত। ও প্রাণপণে চাইছে, আর কখনও যেন এই দুটো হাতের মধ্যে কোনও দূরত্ব তৈরি না হয়।

ডোনোই বলেছিল? যে-প্রাণী চিন্তা করতে পারে, তারই ইচ্ছাশক্তি আছে।

চন্দন তীব্র আকুলভাবে মনে মনে একটাই কথা উচ্চারণ করছিল ও তোমাকে চাই।

ওর হাতের মুঠোয় মাধুরীর হাত কেঁপে উঠল। আর একই সঙ্গে মাধুরী হঠাৎ আঠারো বছরের পুরোনো স্বরে বলে উঠল, চন্দন, চলো, আমরা নভোনি-নাইন-এ চলে যাই। এখানে আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না

চন্দন মাধুরীকে কাছে টানল। কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই গভীর চুমু খেল ওর ঠোঁটে। তারপর অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, আমি জানতাম, মাধুরী, আমি জানতাম

ও ভাবছিল, কাল নিউজ মিডিয়ার লোকজন নতুন এই খবরটা শুনে কী সাংঘাতিকভাবেই না চমকে উঠবে!

# জীবন যখন ফুরিয়ে যায়

**জীবন যখন ফুরিয়ে যায়**

ভিসি আর-এ অমরসঙ্গীর ক্যাসেট চালিয়ে দেখছিলেন কল্যাণ চৌধুরি। সারাটা সন্ধে একঘেয়েভাবে কেটেছে। অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর থেকেই এই একঘেয়েমির শুরু। অজন্তা বাড়ি না থাকলে এরকমটাই হয়। আজও ও বাড়ি নেই। আজ সকালেই অফিসের মিটিং-এ দিল্লি গেছে। চারদিন পর ফিরবে। মনে মনে আজকের একঘেয়েমিকে চার দিয়ে গুণ করলেন কল্যাণ। অঙ্কের তত্ত্ব ওলটপালট করে দিয়ে গুণফল বেরোল চল্লিশ। রঙিন টিভি-র পরদায় তখন একটি যুবক একটি যুবতাঁকে প্রাণপণে প্রেম নিবেদন করে চলেছে। চিরদিনই তুমি যে আমার... ইত্যাদি একটা গানও হচ্ছিল। কল্যাণ হাসলেন মনে মনে। ছাব্বিশ বছর আগে তার বয়েস ছাব্বিশ বছর ছিল। তখন এরকম গানের বয়েস থাকলেও গান করেননি ঠিকই, তবে বাকি কাজটুকু করেছেন। প্রাণপণে প্রেম করেছেন অজন্তার সঙ্গে।

এমন সময় ঘরের এককোণে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল।

সোফা ছেড়ে উঠলেন কল্যাণ। টিভি-র ভলিয়ুম কন্ট্রোলের নব ঘুরিয়ে শব্দ কমিয়ে দিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন। টেলিফোনটা আসায় তার ভালো লাগছে। একঘেয়েমির শান্ত পুকুরের জলে কেউ যেন একটা পাথর ছুঁড়ে জল তোলপাড় করার চেষ্টা করছে।

হ্যালো

মিস্টার কল্যাণ চৌধুরি? সল্ট লেক সিটি? একটা ভারী কণ্ঠস্বর নিপ্রাণ গলায় ওপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন করল।

অচেনা গলা। সম্পূর্ণ অকারণেই কল্যাণের বুকের ভেতরটা আচমকা টিপটিপ করতে শুরু করল।

হ্যাঁ, আমি কল্যাণ চৌধুরি বলছি। কী হয়েছে? আপনি কে বলছেন? কথা বলতে গিয়ে কল্যাণের গলা কেঁপে গেল।

লালবাজার থেকে বলছি। আপনার ওয়াইফের নাম মিসেস অজন্তা চৌধুরি?

হ্যাঁ। কী হয়েছে অজন্তার?

আপনি বাড়িতে থাকুন। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আপনার বাড়ি যাচ্ছি।

কল্যাণ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ওপ্রান্তের রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। ভারী কণ্ঠস্বরের মালিক।

রিসিভার জায়গামতো রেখে দিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো কোয়ার্জ ঘড়ির দিকে তাকালেন কল্যাণ। পৌনে নটা। এক ঘণ্টার মধ্যে ওঁরা আসছেন। কল্যাণের বুকের ভেতরে একটা বড় পাথর নিষ্ঠুরভাবে চুরমার করছিল কেউ। কী হয়েছে অজন্তার!

ভি সি আর-এর সুইচ অফ করে দিলেন কল্যাণ। একই সঙ্গে মনে হল তার ভেতরেও কেউ যেন একটা সুইচ অফ করে দিয়েছে।

অজন্তা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করে ক্যামাক স্ট্রিটের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি কম্পিউটেক লিমিটেড-এ। আর কল্যাণ আর্কিটেক্ট হিসেবে মোটামুটি নাম করেছেন। সল্ট লেকে এ পর্যন্ত এগারোটা শৌখিন বাড়ি তৈরি করেছেন। তার অফিস কঁকুড়গাছিতে। পাঁচজন স্টাফ নিয়ে ছোট হলেও সফল ব্যবসা।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ব্যস্ত থাকেন নিজেদের কাজ নিয়ে। কিন্তু অফিসের বাইরের সময়টুকু একসঙ্গে কাটানো ওঁদের বহুদিনের অভ্যেস। অজন্তাকে প্রায়ই অফিসের মিটিং-এ বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ করে বেড়াতে হয়। গত তিন বছরে এই মিটিং-এর ব্যাপারটা বেশ বেড়ে গেছে। ফলে অজন্তা না থাকলে কল্যাণ কেমন একা হয়ে যান। গত বাইশ বছরের চেষ্টাতেও ওঁদের দুজনের সংসারে তিনজন হননি। অজন্তা অনেকবার বিশদ ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বলেছে, কিন্তু কল্যাণ রাজি হননি। বলেছেন, কী হবে ডাক্তারি পরীক্ষা করে, অজন্তা! পরীক্ষার রিপোর্টে

জানা যাবে, হয় তুমি দোষী, নয় তো আমি। কিংবা দুজনেই। যদি তুমি বা আমি দোষী হই তা হলে জেনো আমাদের একজন নির্ঘাত ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভুগবে। আমাদের এতদিনের সুন্দর সম্পর্কে চিড় ধরে যাবে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যাবে না, তবে ভেতরে ভেতরে থাকবে। সুতরাং এই বেশ ভালো আছি, ডার্লিং।

অজন্তা রাজি হয়েছে কল্যাণের প্রস্তাবে। হেসে বলেছে আমরা দুজন ছিলাম, দুজন আছি, দুজনই থাকব। কোনও থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জায়গা নেই এখানে, কী বলো!

কল্যাণ ওকে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছেন। বলেছেন, অজন্তা-ইলোরাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

অজন্তাকে প্রায়ই কল্যাণ মজা করে অজন্তা-ইলোরা বলে ডেকে থাকেন। সেই অজন্তা ইলোরার কোনও বিপদ হল নাকি!

কল্যাণ দোতলার ঘরে-বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। বাড়িটা এখন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। রাতদিনের কাজের লোক পরাশর একতলায় ওর ছোট্ট ঘরটিতে বসে নিশ্চয়ই রেডিয়ো শুনছে। ঠিক সাড়ে নটা বাজলেই ও এসে খেতে দেবে কল্যাণকে। রোজকার রাঁধুনি-বউ গীতা এসে রান্না bast করে ফ্রিজে তুলে রেখে গেছে। পরাশর শুধু গরম করে নেবে। কিন্তু কল্যাণের এতটুকু খাওয়ার ইচ্ছা নেই। বারান্দায় ছুটে আসা হালকা বাতাসে অকারণেই তার শীত করছিল।

পরাশর যখন জিগ্যেস করতে এল খাবার দেবে কি না, তখন কল্যাণ সংক্ষেপে শুধু বলে দিলেন, খিদে নেই। তুই খেয়ে শুয়ে পড়। তারপর নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু অপেক্ষা। কখন একতলার কলিংবেলের সুইচে কেউ আঙুল ছোঁয়াবে, আর মিষ্টি সুরে বেজে উঠবে ইলেকট্রনিক ঘণ্টা।

কতক্ষণ পরে কে জানে, একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল, আর তারপরই বেজে উঠল কলিংবেল।

কল্যাণের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ল ভয়ঙ্কর শব্দে। প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নীচে। পরাশর দরজা খুলতে যাচ্ছিল। ওকে ইশারায় চলে যেতে বলে কল্যাণ নিজেই সদর দরজা খুলে দিলেন।

দরজার কাছে লাগানো শৌখিন আলোয় একজন শক্তপোক্ত মানুষকে দেখা গেল। চোয়ালের রেখা স্পষ্ট। চৌকো মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ। চওড়া গোঁফ। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখা নাক। গায়ের রং মাজা।

আমরা লালবাজার থেকে আসছি। আপনি মিস্টার কল্যাণ চৌধুরি?

টেলিফোনে শোনা ভারী গলা চিনতে পারলেন কল্যাণ। কোনওরকমে মাথা নেড়ে ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দিলেন। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন–

প্রথম ভদ্রলোককে অনুসরণ করে ফরসা রোগা চেহারার আর একজন মানুষ বাড়ির ভেতরে ঢুকে এল। ওকে হিসেবে ধরেই আমরা শব্দটা ব্যবহার করেছেন প্রথম জন।

কল্যাণের গলা শুকিয়ে আসছিল। কেশে গলা পরিষ্কার করে তিনি ওঁদের নিয়ে এলেন বসবার ঘরে। ওঁরা সোফায় বসামাত্রই কল্যাণ গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে। একটু বলবেন?

প্রথমজন কোনওরকম ভণিতা না করে সরাসরি বললেন, খুব খারাপ খবর। আপনি মন শক্ত করুন।

দ্বিতীয় জন তখন ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখেমুখে তারিফ করার ছাপ। কল্যাণের ড্রইংরুম সত্যিই প্রশংসা করার মতো। দেওয়াল আর আসবাবে মানানসই রং। এ ছাড়া দুটো অভিনব অয়েল পেইন্টিং আর একটা পিতলের ভাস্কর্য ঘরের সৌন্দর্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কল্যাণের বুকের ভেতরে এবার ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় তিনি বললেন, বলুন–

অজন্তার নিশ্চয়ই কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মনে মনে ভাবলেন কল্যাণ। নাকি দিল্লিতে পৌঁছে এয়ারপোর্ট থেকে কোম্পানির গেস্ট হাউসে যাওয়ার পথে কোনও গ্যাঙের হাতে পড়েছে? কিন্তু অজন্তার বয়েস তো প্রায় তেতাল্লিশ। অবশ্য দেখতে এখনও সুন্দরী। পুরুষদের নজর কাড়তে পারে এখনও। তা হলে কি নির্জন রাস্তায় ওর গাড়ি আটকে কোনও গুন্ডার দল…

মিস্টার চৌধুরি, আপনার স্ত্রী তমলুকের কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। প্রথম জনের ভারী কণ্ঠস্বরে কোনও আবেগ নেই। যেন খবরের কাগজের খবর পড়ে শোনাচ্ছেন।

কল্যাণের চোখের সামনে ওঁর শৌখিন ড্রইংরুমটা মুহূর্তের মধ্যে মর্গ হয়ে গেল। বরফের দেওয়ালে ঘেরা একটা ঘরে কল্যাণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বরফের দেওয়াল থেকে ঘন সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে কল্যাণের নাকে-মুখে ঢুকে পড়ছে। কল্যাণের শরীরের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

কল্যাণ চৌধুরির মাথা টলছিল। অজন্তা-ইলোরা আর নেই! চারপাশে আর কেউ নেই। কিচ্ছু নেই।

কল্যাণের গলার কাছে অনেক প্রশ্ন এসে জড়ো হল। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন, কথা বলতে গেলেই একরাশ কান্না তাঁকে ভাসিয়ে দেবে। গলায় জমাট বেঁধে ওঠা শক্ত ডেলাটাকে দম বন্ধ করে নিয়ন্ত্রণে রেখে তিনি সর্বহারার ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

কতক্ষণ কেটে গেল কে জানে! এক সময় কল্যাণের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দু-হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে তার শরীর থরথর করে কাপল। অফিসার দুজন কল্যাণকে বাধা দিলেন না। পাথরেরর মুখ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে নিজেকে খানিকটা সামলে নিতে পারলেন কল্যাণ। মুখ তুলে প্রথম অফিসারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী করে অ্যাক্সিডেন্ট হল?

উত্তরে জানা গেল, হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল অজন্তা চৌধুরির গাড়ি। হঠাৎই একটা মালবোঝাই ট্রাক বেসামাল হয়ে গাড়িটাকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। চোখের পলকে সব চুরমার। এবং সব শেষ। ট্রাকের ড্রাইভার এবং খালাসি দুজনেই পালিয়েছে। অজন্তার হাতব্যাগ থেকে কল্যাণের একটা কার্ড পাওয়া গেছে। তাতে ঠিকানা, ফোন নম্বর সবই ছিল। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ কল্যাণের সঙ্গে যোগযোগ করতে পেরেছে।

প্রথম জন যখন দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বিশদভাবে বলছিলেন, তখনই কল্যাণ একটা ভয়ংকর ধাক্কা খেলেন।

অজন্তা তো অফিসের মিটিং-এ দিল্লি রওনা হয়েছিল! তা হলে তমলুকের কাছে ওর অ্যাক্সিডেন্ট হল কেমন করে! কোথায় দিল্লি, কোথায় তমলুক! কল্যাণের সব কিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। অজন্তা, গাড়ি, তমলুক!

কল্যাণদের গাঢ় নীল মারুতি এখন, এই মুহূর্তে, বাড়ির গ্যারেজেই রয়েছে। তা ছাড়া অজন্তা তো গাড়ি চালাতে জানে না!

ওইরকম একটা ভয়ংকর মানসিক অবস্থার মধ্যেও কল্যাণ বুঝতে পারছিলেন, অজন্তার দিল্লিতে মিটিং-এ যাওয়ার নাম করে রওনা হওয়ার ব্যাপারটা এঁদের বলা যায় না। কাউকে বলা যায় না।

কিন্তু দিল্লির নাম করে, কল্যাণের কাছে মিথ্যে কথা বলে, অজন্তা হঠাৎ তমলুকের দিকে গেল কেন? আর কার গাড়িতে করেই বা ও যাচ্ছিল?

কল্যাণের মনে পড়ল, তমলুকের ওপর দিয়ে তিনি দুবার গেছেন অতীতে। দুবারই অজন্তাকে নিয়ে তিনি দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। একবার শৌখিন বাসের যাত্রী হয়ে, আর একবার গাড়িতে চড়ে। কল্যাণ নিজেই গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন দীঘায়, সমুদ্রের কাছাকাছি।

অজন্তা কি তাহলে দীঘা যাচ্ছিল? কী কারণে যাচ্ছিল, বেড়াতে? কে চালাচ্ছিল গাড়ি? আর কে কে ছিল ওই গাড়িতে?

কল্যাণ চৌধুরির ভেতরে নানা রকমের ভাঙচুর চলছিল। গাড়িটা কি প্রাইভেট কার, না ট্যাক্সি? ট্যাক্সি ভাড়া করে কলকাতা থেকে কেউ দীঘা যায় না! তা হলে?

অজন্তা ছাড়া আর কে কে ছিল ওই গাড়িতে? কেমন এক শূন্যতার মধ্যে থেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন কল্যাণ।

আর এক ভদ্রলোক ছিলেন গাড়িতে। উনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

কল্যাণ অবাক চোখে প্রথম অফিসারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অজন্তা আর এক ভদ্রলোক! কে সে? অজন্তার প্রেমিক? অজন্তা বলত, ওঁদের দুজনের মাঝখানে আর কেউ নেই। তা হলে কে এই লোকটা? থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার?

কল্যাণ এলোমেলোভাবে আরও সব প্রশ্ন করে গেলেন। উত্তরে যেসব কথা তার কানে ঢুকল সেগুলো কেমন বুদবুদের মতো ভেসে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছিল মাথার ভেতরে।

লাল রঙের মারুতি গাড়ি নিয়ে হাইওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ওরা দুজনে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই শেষ। গাড়িটা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে। না, ওই ভদ্রলোকের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে খোঁজখবর নেওয়ার কাজ চলছে। পুলিশ হাল ছাড়েনি।

আপনাকে আমাদের সঙ্গে তমলুক যেতে হবে, মিস্টার চৌধুরি। আপনার স্ত্রীর বডি আইডেন্টিফাই করতে হবে।

অনেক দিন পর একটু বেশি মাত্রায় মদ্যপানের সাধ জেগে উঠল কল্যাণের। অন্ধকার দোতলার বারান্দায় বসে চাঁদ-তারাকে সাক্ষী রেখে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি। গাঢ় গাছপালা আর ঘন নীল ছায়াময় আকাশের দিকে শুন্য চোখে তাকিয়ে ছিলেন। সেখানে অত্যন্ত দ্রুতগামী চলচ্চিত্রের ছবির মতো পরপর ভেসে যাচ্ছিল গত তিন দিনের ঘটনা।

পুলিশের সঙ্গে তমলুক গিয়ে অজন্তার মৃতদেহ–অথবা, বলা যায় মৃতদেহের অবশেষ শনাক্ত করতে কোনও অসুবিধে হয়নি কল্যাণের। মৃতদেহটা বলতে গেলে একরকম তালগোল পাকিয়ে গেছে। কিন্তু মুখটা কোন এক অলীক লীলায় প্রায় অক্ষত থেকে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল, একটু জোরে অজন্তা-ইলোরা বলে ডাকলেই বোধ হয় জেগে উঠবে। আর মুখে কোথাও অপরাধবোধের ছায়া পর্যন্ত নেই।

শুধু মুখ ছাড়াও অনেক কিছু শনাক্ত করেছেন কল্যাণ। পায়ের চটি, কানের দুল, গলার হার, লেডিজ ব্যাগের টুকিটাকি জিনিসপত্র, আরও কত কী! ভেবেছিলেন, এতটুকুও দুর্বল হবেন না, কিন্তু চোখের জলের ফোঁটাগুলো কোথায় লুকিয়ে ছিল কে জানে! সামান্যতম সুযোগেই কল্যাণের চোখ ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়েছে গালে। ভালোবাসা বড় নিষ্ঠুর। সুযোগ পেলেই কাদায়।

শনাক্ত করার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা যখন কেটে গেছে, তখন কল্যাণের মনের ভেতরে কৌতূহল ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিল। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল তার

মৃতদেহটা কোথায়? সেটারও কি মুখটা অবিকৃত রয়েছে অজন্তার মতো? কল্যাণ কি মুখ দেখলে চিনতে পারবেন লোকটাকে?

অফিসারদের প্রশ্ন করে তিনি জানতে পারলেন, পুরুষ সহযাত্রীটির মৃতদেহ এতই বীভৎসভাবে গুঁড়িয়ে গেছে যে, চেনার কোনও উপায় নেই। তবুও পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, নানান কায়দায় খোঁজখবর করছে।

শূন্য হাতে শূন্য হৃদয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন কল্যাণ। অফিসে বেরোনো বন্ধ করে দিলেন কিছুদিনের জন্য। শূন্য বাড়িতে তার ভালোবাসার অশৌচ শুরু হয়ে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন কল্যাণ।

অজন্তার মৃতদেহ কলকাতায় এসেছে, পোস্ট মর্টেম হয়েছে, তারপর দাহ করা হয়েছে নিমতলা শ্মশানে। উভয়পক্ষের কয়েকজন করে আত্মীয়স্বজনকে সাক্ষী রেখে অজন্তা পুড়ে ছাই হয়েছে। শেষ হয়েছে অসতীদাহ। কিন্তু কল্যাণের বুকের ভেতরটা তখনও জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল।

অজন্তা যে অফিসের মিটিং-এ দিল্লি যাচ্ছি এ কথা বলে গিয়েছিল, সে কথা কাউকে বলেননি কল্যাণ। কেউ জানে না ওঁদের জীবনে অজ্ঞাত সেই তৃতীয় ব্যক্তির কথা। অজন্তা নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিল সেই লোকটার সঙ্গে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রেম করতেই বোধ হয় ওরা দীঘা রওনা হয়েছিল।

কল্যাণ জানেন, ভালোবাসলে অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করে–সেগুলোই শেষ পর্যন্ত হয়ে যায় প্রেমপত্র। অজন্তার আলমারিতে সেরকম কি কিছু নেই? একটাও কি চিঠি লেখেনি দুর্ঘটনার মরে যাওয়া তালগোল পাকিয়ে যাওয়া ওই লোকটা।

অসহ্য এক জ্বালায় নেশা-টেশা ছেড়ে উঠে পড়লেন কল্যাণ। একটু এলোমেলো পায়ে চলে এলেন শোবার ঘরে পাশাপাশি দাঁড় করানো দুটো স্টিলের আলমারির কাছে। একটা আলমারিতে কল্যাণের জিনিসপত্র, অন্যটায় অজন্তার। গোড়ার দিকে এই ভাগাভাগিটা বজায় ছিল। কিন্তু পরে কিছু কিছু জিনিস এলোমেলোভাবে রাখা হয়ে গেছে। আর তার জন্য কল্যাণ নিজেই দায়ী। কারণ, অজন্তা যতটা গোছানো স্বভাবের, কল্যাণ ঠিক ততটাই অগোছালো।

অজন্তার আলমারির দরজায় দুটো কালো টিপ লাগানো রয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাতেও এরকম দু-একটা টিপ লাগানো থাকে। ওর ফরসা কপালে কালো টিপ চমৎকার মানাত। কল্যাণ এক লহমার জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আলমারিটা খুলতেই হালকা পারফিউমের গন্ধ নাকে এল কল্যাণের। অজন্তা ওর শাড়ি জামাকাপড়ে মাঝে-মাঝেই পারফিউম স্প্রে করে রাখত। পয়জন পারফিউমের গন্ধ খুব ভালোবাসত ও। আলমারির দু-পাল্লা খুলে অনেক সময়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত। বুক ভরে সুগন্ধির ঘ্রাণ নিত। গন্ধটা কল্যাণেরও প্রিয় ছিল।

এখন আলমারি খুলতেই পয়জন-এর গন্ধ অন্যরকমভাবে কল্যাণের নাকে এসে ধাক্কা মারল। কল্যাণের গা গুলিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করলেন তিনি। একটা চিঠিও কি পাওয়া যাবে না?

একটু খোঁজাখুজি করতেই চিঠির গোছাটা পাওয়া গেল। কতকগুলো দামি শাড়ির ভাজের তলায়, আলমারির পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ছিল চিঠিগুলো। অনেকগুলো চিঠি–অন্তত কুড়ি পঁচিশটা তো হবেই। তারই একটা টেনে বের করলেন কল্যাণ। লক্ষ করলেন, এক অকারণ উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে। নিজেকে সি আই এ বা কে জি বি-র গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছিল। অথচ কারও হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। অজন্তা নেই, সে-ও নেই।

বোধহয় নিজের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন কল্যাণ। এ কদিন যা নিছক আশঙ্কা অথবা অনুমান ছিল এখন আর তা নয়। হাতে এসেছে অকাট্য প্রমাণ। চিঠিটা খামসমেতই রেখে দিয়েছে অজন্তা। খামের ওপরে সুন্দর হাতের লেখায় মিসেস অজন্তা চৌধুরী এবং ঠিকানা লেখা রয়েছে।

কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলেন কল্যাণ। আবেগজর্জর এলোমেলো লেখা। আপনি সম্বোধনে লেখা হলেও প্রেমপত্র বলে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। আর চিঠির কিছু কথা পড়লে বেশ অনুমান করা যায় ওরা পরস্পরের যথেষ্ট কাছাকাছি এসেছে। হয়তো আরও কাছে আসার জন্য ওরা দীঘা যাচ্ছিল।

চিঠিটা খুলে ধরামাত্রই কল্যাণ চৌধুরীর চোখ বিদ্যুতের মতো ছিটকে চলে গিয়েছিল একেবারে শেষের লাইনে–যেখানে লেখকের নাম লেখা আছে। নামটা

পড়লেন কল্যাণ ও কাজল। না, এ নামে সেভাবে কাউকে চেনেন না তিনি।

একটা একটা করে বেশ কয়েকটা চিঠি পড়ে ফেললেন কল্যাণ। কোনওটায় তুমি আর কোনওটায় আপনি সম্বোধন। তবে চরিত্র সব চিঠিরই এক। কিন্তু কোনও চিঠি থেকেই লেখকের স্পষ্ট পরিচয়ের কোনও সূত্র বেরিয়ে এল না। শুধু এটুকু অনুমান করা গেল, ভদ্রলোক কোনও একটি কোম্পানির দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন মানে, ছিলেন। বহু চেষ্টা করেও সেই কোম্পানির নাম কিংবা ঠিকানা কল্যাণ আঁচ করতে পারলেন না।

চিঠিগুলো আবার জায়গামতো রেখে দিয়ে আলমারি বন্ধ করে দিলেন কল্যাণ। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এখন এই চিঠিগুলোর মালিক। অজন্তা দুর্ঘটনার মারা গিয়ে তাকে অনেক জ্বালা, যন্ত্রণা, লজ্জা এবং অস্বস্তির মালিক করে দিয়ে গেছে।

গতকাল দুটো খবরের কাগজে এই দুর্ঘটনার খবর ভারী অদ্ভুতভাবে ছাপা হয়েছে। কাগজের তিনের পাতায় অজন্তার নাম এবং বয়েস দিয়ে চার লাইনের একটি খবর ছাপা হয়েছে। আর তার সামান্য নীচেই ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় একটি দুর্ঘটনার খবর। তাতে বলা হয়েছে, তমলুকের একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রাকের সঙ্গে তাঁর গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

বাঃ! চমৎকার! একটা দুর্ঘটনাকে কী অনায়াসে দু-দুটো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনায় দাঁড় করানো হয়েছে! এর পিছনে কোন কারসাজি কাজ করছে কে জানে! এর মধ্যে নিশ্চয়ই পুলিশ অথবা চতুর সাংবাদিকদের হাত রয়েছে। কিন্তু কল্যাণ কিছুতেই ভেবে পাননি, একটা দুর্ঘটনাকে দুটো আলাদা দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টার কারণ কী!

আবার অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কল্যাণ চৌধুরী। অন্ধকার আকাশ, চাঁদ-তারা, আর কয়েকটা গাছের ভৌতিক ছায়ার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, ওরা সবাই তার লজ্জার কথা জানে। কিছু একটা করার জন্য কল্যাণ ভেতরে ভেতরে জানোয়ারের মতো ছটফট করছিলেন কিন্তু কী করবেন! অন্তত ওই খুনি ট্রাক ড্রাইভারটিকেও যদি হাতের কাছে পেতেন।

কল্যাণ প্রায় ছুটে চলে গেলেন রান্নাঘরে। সাদা রং করা ক্যাবিনেটের পাল্লা খুলে স্টেইনলেস স্টিলের একটা চপার বের করে নিলেন। এই মাংস কাটা ছুরিটা খুব একটা ব্যবহার করা হয়নি। কালো ফাইবার গ্লাসের হাতল। ঝকঝকে চওড়া ফলা। তার একদিকে করাতের ধারালো দাঁত।

ছুরিটা ডান হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আবার বারান্দায় চলে এলেন কল্যাণ। পশুর হিংস্রতায় ছুরিটা ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দিলেন বারান্দায় শৌখিন কাঠের রেলিং-এ। তারপর এক হ্যাঁচকায় গেঁথে যাওয়া ছুরিটা তুলে নিলেন। এবং দ্বিতীয়বার বসিয়ে দিলেন।

কল্যাণ চোখের সামনে অচেনা ট্রাক ড্রাইভারের নিষ্ঠুর মুখটা দেখতে পাচ্ছিলেন। লোকটার লাল চোখ থেকে আগুন আর মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। এই লোকটা কল্যাণের জীবন খতম করে দিয়েছে। এই লোকটা না থাকলে কল্যাণ অজন্তার পরকীয়ার কথা জানতে পারতেন না। হয়তো তথাকথিত সুখে কাটিয়ে দিতে পারতেন জীবনের বাকি দিনগুলো। কিন্তু… ।

বারান্দায় রেলিংটাকে কল্যাণ পাগলের মতো কুপিয়ে যাচ্ছিলেন বারবার। চাঁদের আলোয় ভোতা শব্দগুলো পরপর ভেসে যাচ্ছিল। কল্যাণের মুখ থেকে গোঙানির মতো টুকরো কিছু আওয়াজও বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু কল্যাণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য একজন শত্রু এই মুহূর্তে তার কাছে খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

সংবিৎ ফিরে পেলেন পরাশরের ডাকে।

দাদাবাবু–

কল্যাণের হাত থেমে গেল। ভাঙাচোরা মুখে তাকালেন আধো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা পরাশরের দিকে। তারপর কী যে হয়ে গেল! ছুরিটা ফেলে দিয়ে ক্ষতবিক্ষত রেলিংটাকে আঁকড়ে ধরে চাঁদের আলোয় হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। জীবনটা তার শেষ হয়ে গেলেও কোথায় যেন একটু গ্লানিময় অবশেষ থেকে গেছে।

অজন্তার অকালমৃত্যুর অনুষ্ঠান একেবারে নীরবে শেষ করলেন কল্যাণ চৌধুরী। সেই সময়ে, যখন তার চোখ জলে ভেসে যাওয়ার কথা, তিনি ফুলের

মালা, ধূপ আর অজন্তার ফটোর দিকে তাকিয়ে কাজল লোকটার কথা ভাবছিলেন। লোকটার পরিচয় না-জানা পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। সুতরাং সেই মুহূর্তেই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, আগামীকাল থেকেই কাজলের খোঁজ শুরু করবেন।

লালবাজার থেকে যে দুজন অফিসার তার সঙ্গে প্রথম দিন যোগাযোগ করেছিলেন তাদের নাম বিনয় তালুকদার আর অভিজিৎ দাস।

তবে তালুকদারই বরাবর কথাবার্তা চালিয়েছেন কল্যাণের সঙ্গে। তাই শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারটা মিটে যেতেই কল্যাণ দেখা করলেন বিনয় তালুকদারের সঙ্গে।

আপনারা এখনও জানতে পারেননি, ওই লোকটা কে?

তালুকদার একটা মোটা ফাইল উলটে-পালটে দেখছিলেন। পাখার হাওয়ায় ফাইলের কাগজ উড়ছিল। হাত দিয়ে সেটা ঠিক করে নিয়ে ছোট্ট করে জবাব দিলেন, নাঃ, এখনও পারিনি।

কল্যাণের কেন যেন মনে হল তালুকদার সত্যি কথা বলছেন না। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া গাড়িটার নম্বর থেকে কোনও খোঁজখবর করেননি আপনারা?

তালুকদার খোলা ফাইলটা শব্দ করে বন্ধ করে কল্যাণের চোখে সরাসরি তাকালেন। তার নজরে স্পষ্ট বিরক্তি। একটা জলের মতো সহজ ব্যাপার কেউ বুঝতে না পরলে যে ধরনের বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক।

ছোট ছোট চোখের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তুললেন বিনয় তালুকদার, বললেন, মিস্টার চৌধুরি, আপনি কি এখনও ছেলেমানুষ সেজে বসে থাকবেন! বলুন তো মশাই, ওই লোকটার নাম ধাম জেনে আপনার কী লাভ!

কল্যাণ জেদি সুরে বললেন, ওই লোকটার জন্যে আমার স্ত্রী মারা গেছে।

তালুকদার শ্বাস ফেলে চোখ বুজে মাথা নাড়লেন। তারপর খানিকটা খোঁচা দিয়ে বললেন, ওই লোকটার জন্যে আপনার বউ মারা গেছে! আপনি এখনও বোঝেননি ওরা গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল..কেন যাচ্ছিল?

কল্যাণকে একটু সময় দিলেন তালুকদার। যখন দেখলেন কল্যাণ কোনও উত্তর দিচ্ছেন না, তখন বললেন, মিস্টার চৌধুরী, এটা সুইসাইড বা মার্ডার কেস নয়–প্লেন অ্যাকসিডেন্ট। সুতরাং এ-নিয়ে আর ফালতু মাথা ঘামাবেন না। শুধু শুধু খুঁচিয়ে স্ক্যান্ডাল করে লাভ কী! সব কিছু যখন মিটে গেছে তখন বাদ দিন। একটা হাই তুলে তালুকদার বললেন, আমরা তো ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছি। যান, বাড়ি যান।

শেষ কথাটা রুক্ষভাবে বললেন বিনয় তালুকদার। এবং কথাটা বলেই টেবিলের বাঁদিকে বসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তায় মনোযোগ দিলেন। অর্থাৎ, কল্যাণ এবার যেতে পারেন।

কল্যাণ অপমানটা টের পেলেন। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন একবার। অন্তত পাঁচ ছজন লোক রয়েছে ঘরে। তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই শুনেছে ওঁদের কথাবার্তা। এখন কী করবেন কল্যাণ? তালুকদারকে বাড়তি কিছু বলতে গেলে তিনি যদি একঘর লোকের মাঝখানে অজন্তার ব্যাপারটা নোংরাভাবে খোলাখুলি বলতে শুরু করেন।

কল্যাণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিছু বলবেন না ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তবুও তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।

ওই লাল মারুতির নম্বরটা আপনারা তা হলে পাননি?

লেজে পা দেওয়া সাপের মতো চকিতে কল্যাণের দিকে মুখ ফেরালেন বিনয় তালুকদার। স্থির চোখে কল্যাণকে কিছুক্ষণ দেখলেন। মানুষটাকে দেখে বোধ হয় মায়া হল তাঁর। তাই ঠান্ডা গলায় শুধু বললেন, না। পাইনি।

ঘোর লাগা মানুষের মতো আনমনা পা ফেলে কল্যাণ চৌধুরি বেরিয়ে এলেন লালবাজার থেকে। চারপাশের যানবাহন মানুষজন কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। একটা আগুনের গোলা তার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যে করে তোক ওই লাল মারুতির নম্বরটা তার চাই। তারপর, গাড়ির নম্বরের সূত্র ধরে কাজলের পুরো নাম-ঠিকানা। তারপর…। তারপর যে কী সেটা কল্যাণ নিজেই ভালো করে জানেন না। কাজল আর বেঁচে নেই। অজন্তাও নেই। তা হলে শূন্য ভাগশেষ থেকে কল্যাণ নিজের জন্য নতুন করে আর কোন শূন্যতা তৈরি করবেন!

আশ্চর্য! এতসব স্পষ্ট করে বোঝা সত্ত্বেও কল্যাণের ভেতরে একরোখা একটা আক্রোশ কাজ করছিল। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো কাজলের নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করার জন্য ছটফট করছিলেন তিনি–মরণাপন্ন কোনও মানুষ জীবনকে ধরে রাখার জন্য যেভাবে ছটফট করে।

দাদা কত টাইম হয়েছে?

ট্রামরাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চোখ তুলে তাকালেন কল্যাণ। একজন ভদ্রলোক তার কাছে সময় জানতে চাইছেন। গোলগাল ফরসা চেহারা। সরু গোঁফ। পাতলা চুল। চোখে চশমা। পরনে পরিচ্ছন্ন শার্ট-প্যান্ট। বয়েস কল্যাণের কাছাকাছি। তবে হাতে ঘড়ি নেই।

কাজলকে কি খানিকটা এইরকম দেখতে? মানে, এইরকম দেখতে ছিল. তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার আগে?

কল্যাণ অদ্ভুত চোখে ভদ্রলোককে দেখছিলেন। এই মুখের ছবিটাকে একটু-আধটু ঠিকঠাক করে নিলে কি কাজলের মুখটা পাওয়া যাবে না?

ভদ্রলোক তার প্রশ্নের কোনও উত্তর না পেয়ে ভুরু কুঁচকে কল্যাণের দিকে বিরক্তির দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। অকারণে অপেক্ষা করার সময় তার নেই। কিন্তু কল্যাণের আছে। অফুরন্ত অনন্ত সময়। সময় ছাড়া এখন তার হাতে আর কিছু নেই।

পুলিশ যখন ব্যাপারটা নিয়ে সহযোগিতা করবে না, তখন কল্যাণকে একাই কিছু একটা করতে হবে। সেই কিছু একটা কী? যেমন, অজন্তার অফিসে গিয়ে ওর সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা যায়। নানান প্রশ্ন করা যায় অজন্তার আচার-আচরণ নিয়ে। কার সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল অজন্তার, এমনকী অফিসের মিটিং-এ দিল্লি যাচ্ছি বলে কার সঙ্গে দীঘার দিকে বেড়াতে যেতে পারে ও–এ-সব নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে।

কিন্তু সমস্যা একটাই ও কী করে সকলের সামনে তিনি অজন্তার গোপন ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন! অন্তর্বাস কি চৌরাস্তায় বসে কাঁচা যায়! কাউকে কি বলা যায় কাজলের কথা!

অজন্তাকে একটা ডায়েরি উপহার দিয়েছিল কাজল। চিঠির গোছার নীচেই ছিল ডায়েরিটা। তার প্রথম পৃষ্ঠায় সুন্দর অক্ষরে লেখা আছে দুটি ছত্র ও ব্যক্তিগত বর্ণমালা লিখে যাও গোপন অক্ষরে,/মনচিহ্ন রেখে যাও প্রতিদিন নিজের স্বাক্ষরে।

কল্যাণ কখনও এ-ভাবে কাব্য করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেননি। তবে…।

অবাক হয়ে কল্যাণ খেয়াল করলেন, কখন যেন তিনি কাজলের সঙ্গে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন।

পথ চলতে চলতে চিঠিগুলোর নানান অংশ মনে পড়ছিল।

হয়তো আপনাকে সত্যিকারের ভালোবাসব বলেই আর কাউকে এতদিন সত্যিকারের ভালোবাসা হয়নি।

ভালোবাসায় যদি পরিণতি না থাকে তা হলে সে কি পূর্ণতা পায় না? সমাজ যে-ভালোবাসাকে স্বীকার করে না, তারই নাম কি ব্যভিচার? তা হলে আমাদের ইচ্ছের কোনও দাম নেই।

আমাদের সংসারী জীবনে তৃতীয়জনের আসাটা কি অন্যায়? আর যদি বা কেউ আসে, তা হলে দ্বিতীয়জনকে কি অস্বীকার করা হয়! আর তৃতীয় জনের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়াটা কি দুর্বল হৃদয়ের রোগলক্ষণ? জানো, নিজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে করে আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। মনে হচ্ছে, আমি শেষ হয়ে গেছি।

আমাদের ভালোবাসা যদি নিতান্ত শরীরের আকর্ষণই হবে তা হলে কেন তুমি স্পর্শ করলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়, কেন তোমাকে দেখামাত্রই বুকের ভেতরে একটা বাচ্চা ছেলে খুশিতে তিনতলার সমান লাফিয়ে ওঠে, কেন আনন্দে আমার চোখে জল এসে যায়!

অজন্তা, চৈত্র মাসে আমাদের প্রথম দেখা হয়নি, তবে সর্বনাশ দেখেছিলাম পরস্পরের চোখে। বুঝলে, সর্বনাশ বোধ হয় মাসের তোয়াক্কা করে না।

তীব্র রোদে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল কল্যাণের, কিন্তু তিনি নিজেকে কষ্ট দিতে চাইছিলেন। তার মাথার ভেতরে ঝড় উঠেছে। সব কিছু এলোমেলো ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। কাজলের পরিচয় না জানা পর্যন্ত এ ঝড় বোধ হয় থামবে না। তবে এটা বোঝা যায়, অজন্তা আসার পর কাজলের জীবনের মনে অনেক পালটে গেছে। কল্যাণের এই ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে কাজলের আর একটা চিঠিতে ও চরণতলে পড়ে ছিলাম সরল অভিমানে,/আদর করে কুড়িয়ে নিলে, জীবন পেল মানে,/ একথা আর কেউ জানে না, যে জানে সে জানে।

একটা মৃত মানুষের অশরীরী অস্তিত্বের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে করতে কল্যাণ ক্রমেই যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। এই অর্থহীন বাড়তি জীবনটাকে নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এরকম এক অসহায় মুহূর্তে কল্যাণ ঠিক করে ফেললেন, তিনি তমলুক যাবেন। সেখানে গিয়ে যে করে-তোক খুঁজে বের করবেন ওই মারুতি গাড়ির নম্বর। আর সেই নম্বরের সূত্র ধরে কলকাতার মোটর-ভেহিকলস-এর দফতর থেকে বের করবেন গাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা। সেই নাম-ঠিকানাই যে কাজলের নাম-ঠিকানা সেটা শতকরা নিরানব্বই ভাগ হলফ করে বলা যায়। তারপর…।

তারপর কী? হা ঈশ্বর! তারপর কী করবেন কল্যাণ!

এইরকম একটা মনের অবস্থা নিয়ে পরদিন তমলুক রওনা হয়ে গেলেন কল্যাণ চৌধুরী।

.

অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৪, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা ৭০০০৪৫।

একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা অক্ষরগুলো বারবার পড়ছিলেন কল্যাণ। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পোশাকি নাম আর ঠিকানা। গত উনিশ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

গাড়ির নম্বর জোগাড় করতে গিয়ে দুর্ঘটনার প্রায় গোটা এলাকাটাই একরকম চষে ফেলেছেন কল্যাণ। সাধারণ মানুষের কাছে তিন দিন ধরে একটানা অনুসন্ধানের এই পরিশ্রম হয়তো অমানুষিক, তবে কল্যাণের মতো ভূতে পাওয়া মানুষের কাছে কিছুই নয়। তৃতীয় দিনের মধ্যে অন্তত তিনজনের কাছ থেকে

গাড়ির নম্বরটা পেয়েছেন কল্যাণ ও ডব্লিউ. এন. সি. ১২৩। তারপর বাকি পনেরো ষোলো দিনে নম্বর থেকে মালিকের নাম-ঠিকানা।

কিন্তু কী করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ডাকনাম কাজল? এই নামটাই ওঁদের জীবনে তৃতীয় নাম?

অনেক চিন্তাভাবনার পর কল্যাণ ঠিক করলেন অজন্তার অফিসে একবার ফোন করবেন। অজন্তা গল্প করতে করতে অফিসের দু-চারজন সহকর্মীর নাম প্রায় বলত? যেমন, ঘোষদা, জিতেনবাবু, সলিলদা, সরকার সাহেব। এর মধ্যেই ঘোষদাই বোধহয় ওর খুব কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু…।

একটা লোহার ডাইসে কল্যাণের মাথাটা চোপে ধরে কেউ বোধ হয় হাতল ঘোরাচ্ছিল। মড়মড় করে শব্দ হচ্ছিল। ধীরে ধীরে শেষের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কল্যাণ। এক ঝটকায় অবসন্ন শরীরটাকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে কল্যাণ টেলিফোনের কাছে চলে গেলেন। টেলিফোনের পাশে রাখা ছোট্ট টেলিফোন-বই দেখে অজন্তার অফিসের ফোন নম্বরটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর কাঁপা হাতে পুশ বাটনগুলো টিপে দিলেন একে একে।

গুড মর্নিং, কম্পিউটেক লিমিটেড। অপারেটরের মিহি পেশাদারি গলা ভেসে এল।

একটু সময় নিয়ে কল্যাণ বললেন, একটু…একটু সফ্টওয়্যার ডিভিশনে দেবেন।

ধরুন দিচ্ছি–

সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক্ষার ইলেকট্রনিক মিউজিক বাজতে শুরু করল টেলিফোনে। অপেক্ষা করতে করতে বুকের ভেতরে একটা অদ্ভুত চাপ অনুভব করছিলেন কল্যাণ। কীভাবে কথাগুলো বলবেন সেটা মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। যদি কোনও কারণে ঘোষদা অফিসে না থাকে তা হলে জিতেনবাবু, সলিলদা, সরকার সাহেব–যাকে পাবেন তাকেই জিগ্যেস করবেন।

হঠাৎই মিউজিক থেমে গিয়ে শোনা গেল ।

হ্যালো, সফ্টওয়্যার ডিভিশন—

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কথা বললেন কল্যাণ, মিস্টার ঘোষ আছেন?

এক মিনিট ধরুন, দিচ্ছি।

কল্যাণের বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক, ঘোষদা তা হলে আছেন।

হ্যালো, অজিত ঘোষ স্পিকিং ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তবে কেন যেন মনে হয়, এই কণ্ঠস্বরের মালিকের ওপর আস্থা রাখা যায়।

আমি..আমি কল্যাণ চৌধুরি বলছি। আপনার কোলিগ অজন্তা চৌধুরির হাজব্যান্ড। মানে, আমাকে আপনি ঠিক…বোধহয়…চিনবেন না।

বুঝেছি। অজিত ঘোষ আশ্বাসের গলায় বললেন, আর্কিটেক্ট কল্যাণ চৌধুরি, তাই তো?

হ্যাঁ…মানে, একটা বিশেষ দরকারে…।

খুব স্যাড ব্যাপার, মশাই। কী বলে যে আপনাকে সান্ত্বনা দেব জানি না। অবশ্য সান্ত্বনা দেবার কোনও মানেও হয় না। আসলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে একেবারে আনএক্সপেক্টেড…

হ্যাঁ, কাজলের ব্যাপারটা আমার কাছেও একেবারে আনএক্সপেক্টেড।

অজিত ঘোষ কথা বলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু কল্যাণ কখন যেন লাল মারুতি, দুজন আরোহী, দুর্ঘটনা–এ-সবের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ওঁর সংবিৎ ফিরল মিস্টার ঘোষের প্রশ্নে : …আপনি তো একদিনও এলেন না। যাই হোক, বলুন কী দরকার, যথাসাধ্য হেল্প করব।

একটু ইতস্তত করে কল্যাণ বললেন, আচ্ছা..আপনি…অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কাউকে চেনেন, মিস্টার ঘোষ?

ও-প্রান্ত থেকে কোনও কথা নেই–অন্তত দশ সেকেন্ড। তারপর ও হ্যাঁ, চিনি। অচিন্ত্য ব্যানার্জি–নিউট্রেন্ড লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার। ওঁর কথাই কি বলছেন?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ওনার কীরকম আলাপ?

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন অজিত ঘোষ। একটু সময় নিয়ে বললেন, তা... ইয়ে...ভালোই আলাপ ছিল। মানে, উনি..মাসখানেক মাসদেড়েক আগে..মারা গেছেন। মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের অফিসে মাঝে মাঝে আসতেন–অফিসের কাজে। ওঁদের কোম্পানির মেইনলি সফটওয়্যার এক্সপোর্টের কাজ। তাই...।

কল্যাণ একবার ভাবলেন, অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে মারা গেছেন সেটা জানতে চাইবেন। তারপর মত পালটালেন। জিগ্যেস করলেন, নিউট্রেন্ড লিমিটেড-টা কোথায়?

২৩৭ উড স্ট্রিট। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ফ্লোর।

ওই অফিসের ফোন নম্বরটা আমাকে দিতে পারেন?

এক মিনিট।

কিন্তু এক মিনিট শেষ হওয়ার আগেই অজিত ঘোষের গলা পাওয়া গেল আবার : লিখে নিন। টু নাইন ফোর সেভেন জিরো ওয়ান।

কল্যাণ টেলিফোনের পাশে রাখা পেন তুলে নিয়ে নম্বরটা টুকে নিলেন। নম্বরটা পড়ে শোনালেন অজিত ঘোষকে। তারপর ছোট্ট কাছে থ্যাঙ্ক য়ু বললেন।

অজিত ঘোষ ফোন ছেড়ে দেননি। কল্যাণের ধন্যবাদের উত্তরে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, মিস্টার চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে..অজন্তার সঙ্গে ছিল। ওকে আমি ছোট বোনের মতোই ভালোবাসতাম ।

আমিও ওকে ভালোবাসতাম! হে ঈশ্বর, তুমি তো জানো, আমি ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম!

–খুব ভালো মেয়ে ছিল। আপনার জন্যেও আমি ফিল করছি। হয়তো আপনাদের বাড়িতে যেতাম... কিন্তু এরকম একটা আনফরচুনেট ব্যাপার..কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াব! তাই শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি। তবে একটা কথা আপনাকে বলি... অজিত ঘোষ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর বললেন, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। ওসব নাড়াচাড়া করে আর কী লাভ!

কল্যাণ সব শুনছিলেন, কিন্তু কোনও কথা বলেননি। অজিত ঘোষের শেষ কথাটা তিনি পাথরের মূর্তি হয়ে শুনলেন।

অস্বস্তিকর নীরব মুহূর্তগুলো ডিঙিয়ে অজিত ঘোষ আলতো গলায় বললেন, মিস্টার চৌধুরি, আশা করি এই বুড়ো মানুষটার অনুরোধ আপনি শুনবেন। অজন্তার আত্মাকে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে কোনও লাভ আছে! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ও-প্রান্তে ও আচ্ছা, রাখছি। কোনও দরকার হলে উইদাউট হেজিটেশান আমাকে ফোন করবেন। অজন্তার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট কাগজপত্র সব তৈরি করছে। ওগুলো রেডি হয়ে গেলে আপনি বাড়িতে অফিসিয়াল চিঠি পাবেন।

কল্যাণ আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় গা এলিয়ে বসলেন। পরিচয়হীন একটা মানুষ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। কল্যাণ বুকের ভেতরে অদ্ভুত ধরনের এক উত্তেজনা টের পাচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার মানুষটি ধীরে ধীরে যেন কাছে এগিয়ে আসছে।

সিগারেটের ধোঁয়ার ফিনফিনে পরদা ভেদ করে ডানদিকের দেওয়ালে নজর গেল কল্যাণের। অজন্তার বড় মাপের ফটোগ্রাফ টাঙানো রয়েছে সেখানে। কী নিষ্পাপ সুন্দর মুখ! ব্যভিচারের কণামাত্রও নেই কোথাও।

হঠাৎই মন খারাপের বাতাস কল্যাণকে ভাসিয়ে দিল। চোখে জল এসে গেল পলকে। সম্পূর্ণ অকারণে অবুঝ বাচ্চা ছেলের মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করলেন কল্যাণ। এখন তিনি কী চান তা নিজেই জানেন না।

এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অজন্তাকে থেতলে চুরমার করে দিয়েছে। একইসঙ্গে কল্যাণকেও। অজন্তার বাইরেটা, আর কল্যাণের ভেতরটা। অজিত ঘোষ অজন্তার আত্মার কথা বলছিলেন। কেন, কল্যাণের বুঝি আত্মা নেই।

সময় কখন কীভাবে গড়িয়েছে কল্যাণের স্পষ্ট খেয়াল নেই। তবে সংবিৎ ফিরে পেয়েই কল্যাণ শ্লথ পায়ে আবার চলে এসেছেন টেলিফোনের কাছে। অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ফোন নম্বরটা তার দরকার। তারপর…।

নিউট্রেন্ড লিমিটেড থেকেই অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ফোন নম্বরটা পাওয়া গেল। অচিন্ত্যর ছোটবেলার বন্ধু, বারো বছর বিদেশে ছিলেন, দেশে ফিরেই ওঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন– এইসব বলতেই আর কোনও অসুবিধে হয়নি। উপরন্তু কাজল নামটাও কল্যাণ একবার ব্যবহার করে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পরিচয় দিলেন।

ও-প্রান্ত থেকে একজন তরুণী যখন অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন নম্বরটা উচ্চারণ করছিল আর কল্যাণ সংখ্যাগুলো লিখে নিচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন একটা অপার্থিব ভয়ংকর দরজার কম্বিনেশান লকের নম্বর জেনে নিচ্ছেন। সেই দরজার ওপিঠে রয়েছে একটা অন্ধকার ঘর। সেই ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে আবছায়া চেহারার একজন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। আর সেই ঘরের অন্ধকারে মৃত্যুর ঠান্ডা বাতাস বইছে।

অনেকক্ষণ পর কল্যাণের নিজেকে ক্লান্ত মনে হল। তৃপ্তির অবসাদ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। ঘুঘু-ডাকা দুপুরের সেই ঘুমের মধ্যে অজন্তা-ইলোরাকে তিনি স্বপ্নে দেখলেন। তবে অজন্তার মুখটা কেমন অস্পষ্ট অচেনা ঠেকছিল। আর একটা লম্বা কালো ছায়া তেরছাভাবে এসে পড়ছিল অজন্তার সুঠাম শরীরে।

*

কল্যাণ চৌধুরীর ঘুম যখন ভাঙল তখন আকাশ ভগবানের স্লেট। বিছানা ছেড়ে ওঠামাত্রই অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন নম্বরটা মাথায় ধাক্কা মারল। কিন্তু কল্যাণ সংখ্যাগুলো স্পষ্টভাবে মনে করতে পারছিলেন না।

পরাশর এসে কফি আর বিস্কুট দিয়ে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে কফির কাপে চুমুক দিলেন কল্যাণ। ফোন নম্বরটা দেখে নিয়ে এখুনি ফোন করতে হবে। নিশ্চয়ই মিসেস ব্যানার্জি ফোন ধরবেন। তখন কী বলবেন কল্যাণ?

কফি শেষ করে অস্থির মন নিয়ে টেলিফোনের কাছে চলে এলেন। একটা চিরকুটে লেখা অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন নম্বরটা একপলক দেখে নিয়ে রিসিভার তুলে বোতাম টিপলেন। তাঁর চোখ চলে গেল অজন্তার ফটোর দিকে। ওর চোখের দৃষ্টি যেন বলতে চাইল, এ-সব কী ছেলেমানুষি করছ!

কল্যাণ চোয়াল শক্ত করে রিসিভার কানে চেপে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ও-প্রান্তে। টেলিফোন বাজছিল। কল্যাণের হঠাৎই মনে হল, এই বুঝি অচিন্ত্য নিজেই ফোন ধরে কল্যাণের সঙ্গে কথা বলবেন। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের কথা হবে, বোঝাঁপড়া হবে।

ও-প্রান্তে কেউ ফোন তুলে হ্যালো বলতেই কল্যাণ জিগ্যেস করলেন, ফোর সেভেন থ্রি, এইট সেভেন থ্রি এইট?

হ্যাঁ…বলুন… একটি অল্পবয়েসি মেয়ের গলা। বয়েস বড়জোর চোদ্দো-পনেরো হবে। অচিন্ত্যর মেয়ে নয়তো! নাকি অন্য কেউ!

মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আমার নাম কল্যাণ চৌধুরি। গলা যাতে না কেঁপে যায় সেদিকে খেয়াল রেখেছিলেন কল্যাণ। আর একই সঙ্গে ও-প্রান্তের প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে শুনতে চাইছিলেন।

একটা চাপা ঠনঠন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অনেকটা করতাল কিংবা খঞ্জনির শব্দের মতো। তার সঙ্গে টিভির অনুষ্ঠানের নানান টুকরো শব্দ মিশে যাচ্ছিল। সেইসব শব্দ ছাপিয়ে মেয়েটি বলল, একটু ধরুন দিচ্ছি।

তারপর মা, তোমার ফোন। কথাটা আলতোভাবে শুনতে পেলেন কল্যাণ। অচিন্ত্যর মেয়েই তা হলে ফোন ধরেছিল!

একটু পরেই মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল টেলিফোনে ও মিসেস ব্যানার্জি বলছি–

কণ্ঠস্বর খানিকটা ভারী, একটু যেন পুরুষালি ছোঁয়া–পপ গায়িকাদের মতো। আর প্রচ্ছন্ন হলেও ব্যক্তিত্বটা টের পাওয়া যায়।

নমস্কার মিসেস ব্যানার্জি। আমার নাম কল্যাণ চৌধুরী। আমি..আমি কাজল–মানে, অচিন্ত্যর খুব ক্লোজ…ইয়ে…ছিলাম। শুনলাম ও অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারলে খুব ভালো হত।

শান্ত গলায় মিসেস ব্যানার্জি জিগ্যেস করলেন, কী কথা?

আমার কথা শোনার পর আপনি কি এমন শান্ত গলায় কথা বলতে পারবেন, ম্যাডাম?

কয়েকটা জরুরি কথা। এগুলো আপনাকে না বলা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিসেস ব্যানার্জি বললেন, বলুন, কী বলবেন–

সেকথা টেলিফোনে বলা যাবে না। আপনার সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে। ভয় নেই, বেশিক্ষণ নেব না–মাত্র দশ-পনেরো মিনিট।

ওই দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই সবকিছু পালটে যাবে। জানি, সূর্য রোজ যেমন ওঠে তেমনই উঠবে, রোজ যেমন অস্ত যায় তেমনই অস্ত যাবে। কিন্তু তবু, বিশ্বাস করুন, সব কিছু পালটে যাবে।

আপনি কবে দেখা করতে চান, বলুন–

কল্যাণ কণ্ঠস্বর শুনে মিসেস ব্যানার্জির চেহারাটা আঁচ করতে চেষ্টা করছিলেন। ফরসা, লম্বা চওড়া, চোখে রিমলেস চশমা, পরনে সাদা থান, নাকি…?

আপনি যদি আপত্তি না করেন তা হলে আজই সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ দেখা করতে পারি–

কল্যাণ মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বর বা যাহোক কাউকে ডাকছিলেন। মিসেস ব্যানার্জি যেন আপত্তি না করেন। আজ রাতেই যেন কল্যাণ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তারপর বলতে পারেন নিজের কথা। অজন্তার মৃত্যুকে ঘিরে এতদিন ধরে জমানো তিলতিল যন্ত্রণা যেন আজ শুকনো ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে পড়ে তার বুকের ভেতর থেকে।

অজন্তাকে এ কেমন ভালোবাসা, এ কেমন ঘৃণা! এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে কল্যাণ যেন এক আশ্চর্য মানুষ হয়ে গেছেন।

ঠিক আছে–আসুন। আমাদের ফ্ল্যাটটা চেনেন তো?

কল্যাণের অনুরোধে বাড়ির ঠিকানা, কীভাবে সেখানে পৌঁছোনো যাবে, সবই বলে দিলেন মিসেস ব্যানার্জি। কল্যাণ অন্যমনস্কভাবে ওঁর কথা শুনছিলেন। ঠনঠন ধাতব শব্দটা তখনও একঘেয়েভাবে শোনা যাচ্ছিল।

কথা শেষ হলে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলেন কল্যাণ চৌধুরি। অজন্তার ফটোর দিকে তাকালেন। তারপর কী ভেবে তাকালেন টেলিফোনের দিকে। এই টেলিফোন সব জানে। অচিন্ত্যর কণ্ঠস্বর কতবার তার বেয়ে এই টেলিফোনে পৌঁছে গেছে তার সব হিসেব ধরা রয়েছে এই যন্ত্রের শরীরে। যে-টেলিফোন নম্বর এত কাঠখড় পুড়িয়ে কল্যাণ হাতে পেয়েছেন সেটা অজন্তার ঠোঁটে হাজির ছিল। অজন্তার সুন্দর ঠোঁটের দিকে তাকালেন কল্যাণ। অচিন্ত্য বেঁচে থাকলে কি এই ঠোঁটজোড়াকে ওষ্ঠাধর বলতেন? অদ্ভুত এক হীনম্মন্যতা কল্যাণকে জড়িয়ে ধরছিল। কোন এক অজানা কারণে নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাচ্ছিলেন। আর একটা হাউইবাজি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বুকের ভেতরে। ভেতরটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল।

.

রাত আটটা নাগাদ লেক গার্ডেন্সে অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজায় কল্যাণ যখন পৌঁছোলেন, বুকের ভেতরে ছুটে বেড়ানো হাউইটা তখনও নেবেনি।

পাড়াটা নির্জন হয়ে গেছে এখন। মাঝারি মাপের গলি দিয়ে পাক-পাক হর্ন বাজিয়ে দুটো সাইকেল-রিকশ চলে গেল। চোখে পড়ল দু-চারজন পথচারী। একটা স্টেশনারি দোকান ঝাঁপ বন্ধ করছিল। দোকানের ভদ্রলোককে ৭৪ নম্বরের কথা জিগ্যেস করতেই উলটোদিকের ছাই-রঙা একটা চারতলা বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। বাড়িটার সামনে একটা ল্যাম্প পোস্ট–তার টিউবলাইট বিকল হয়ে যাওয়ায় একটা উলঙ্গ বা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির চারপাশে খাটো পাঁচিল। তারই এক জায়গায় কালো রং করা গ্রিলের দরজা।

ল্যাম্প পোস্টের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে দরজা খুললেন কল্যাণ। সামান্য শব্দ হল। কল্যাণ ভেতরে ঢুকলেন, এগোলেন একতলার ফ্ল্যাটের দিকে। তার ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হল।

সিঁড়ির নীচে সরাসরি আলো না পড়ায় লেটার বক্স আর মেইন সুইচগুলো আবছাভাবে দেখা গেল। দু-ধাপ সিঁড়ি উঠে কল্যাণ একতলার ফ্ল্যাটের কোলাপসিবল দরজার মুখোমুখি হলেন। তার পরেই কাঠের দরজা। বন্ধ।

একটা চাপা উত্তেজনা কল্যাণকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। তিনি কাঠের দরজায় বসানো প্লাস্টিকের নেমপ্লেট পড়লেন মিস্টার এ. ব্যানার্জি, মিসেস এস. ব্যানার্জি। অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা এখনও মুছে যায়নি। ওঁর নাম মুছে ফেলা বোধ হয় সহজ নয়।

নেমপ্লেটের ওপরেই ম্যাজিক আই। আর তার বাঁদিকে, কাঠের দরজার ফ্রেমে, বসানো কলিংবেলের সুইচ।

দরজার ওপার থেকে কিছু শব্দের টুকরো শোনা যাচ্ছিল। টেলিফোনে যেমন শুনেছেন, প্রায় সেইরকমই।

কল্যাণ কলিংবেলের বোতাম টিপলেন। টুং-টাং করে ইলেকট্রনিক মিউজিক বেজে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল কাঠের দরজা। সুন্দর ফরসা গোলগাল চেহারার একটি মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। চোখে কার্বন ফ্রেমের চশমা। পরনে সবুজ কালোয় ছাপা চুড়িদার।

ডান হাতের তর্জনির ডগা দিয়ে চশমাটাকে নাকের গোড়ায় ঠেলে দিয়ে প্রশ্নের দৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকাল মেয়েটি।

তুমি কাজলের মেয়ে?

প্রশ্নটা কেমন সহজভাবে বেরিয়ে এল কল্যাণের ঠোঁট চিরে। কল্যাণ নিজেই ভারী অবাক হয়ে গেলেন। একটু আগেই তিনি ভেবেছিলেন, কীভাবে নিজের পরিচয় দেবেন, তারপর মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয়ের পালা সেরে...।

মেয়েটি সামান্য হেসে বলল, হ্যাঁ। আপনি?

আমার নাম কল্যাণ চৌধুরি। আজ সন্ধেবেলা আমি ফোন করেছিলাম...

হ্যাঁ, মা বলছিল। কোলাপসিবল দরজা খুলে গেল? আসুন, ভেতরে আসুন–

ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ ডুবে গেলেন নতুন এক জগতে। অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেলে যাওয়া ঘর-সংসার তাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। শব্দ, গন্ধ, অনুভব–সব কিছু তাকে দ্রুত আপন করে নিচ্ছিল। কল্যাণের ভীষণ অবাক লাগছিল। এ তোমার কেমন খেলা, ঈশ্বর!

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টিভির শব্দ আরও জোরালো হয়েছে। আর টেলিফোনে শোনা ঠনঠন ধাতব শব্দটার কারণটাও বোঝা গেছে।

ঘরের বাঁদিকের কোণে মেঝেতে প্রচুর খেলনা ছড়ানো। আর খেলনার পুকুরের মাঝে পাঁচ-ছবছরের একটা ফুটফুটে ছেলে বসে আছে। সে একমনে একটা প্লাস্টিকের স্টেনগান ফায়ার করে চলেছে, আর বকবক করে যাচ্ছে আপনমনে।

তার ছড়ানো এলোমেলো খেলনার মাঝে একটা বানর চোখে পড়ল কল্যাণের। খুব সাধারণ সস্তা খেলনা। বানরটার মাথায় টুপি আর পরনে ডোরাকাটা শার্ট ও হাফপ্যান্ট। দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। দু-হাতে দুটো পিতলের করতাল। হাত দুটো ফাঁক করে মুখে বিমূঢ় হাসি ফুটিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। চাবি ঘুরিয়ে দম দিলেই শুরু হয়ে যাবে ঠনঠন বাজনা।

বাচ্চাটার কাছাকাছি মেঝেতে বসে কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে কী যেন সেলাই করছিল। কল্যাণকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

যে-মেয়েটি দরজা খুলে দিয়েছিল সে ঘরে ঢুকে তাকিয়েছে তার মায়ের দিকে। মা টিভির। কাছ থেকে খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসেছিলেন। কল্যাণের দিকে চোখ ফেরাতেই মেয়েটি আলতো করে বলল, কল্যাণবাবু। তুমি আসতে বলেছিলে।

উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন কল্যাণকে, বললেন, আসুন…আসুন…

অভ্যর্থনায় ত্রুটি ছিল না, তবে কোথায় যেন উষ্ণতার অভাব ছিল।

ভদ্রমহিলা মেয়েকে বললেন, অনি, দরজাটা বন্ধ করে দাও। তারপর কল্যাণের দিকে তাকিয়ে সামান্য ইতস্তত করে হেসে বললেন, আমার মেয়ে অনমিতা। আপনি বসুন–

অনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ডানদিকে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা বুক শেলফের কাছে গেল। কয়েকটা বই নিয়ে চলে গেল ভেতরের কোনও ঘরের দিকে। যাবার আগে ছোট্ট করে বলে গেল, আমি পড়তে গেলাম।

কল্যাণ আর একটা সোফায় বসলেন। দেওয়ালে টাঙানো সুদৃশ্য কোয়ার্জ ঘড়িতে আটটার সংকেত বেজে উঠল নানা সুরে। মিসেস ব্যানার্জি টিভিটা অফ করে দিলেন। তারপর খেলনা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ছেলে নয়ন। খুব দুরন্ত। ওর বাবাকে একেবারে নাজেহাল করে দিত– শেষ দিকে ওঁর গলার স্বরটা সামান্য ধরে গেল।

একটু সময় নিয়ে তারপর আবার কথা বললেন মিসেস ব্যানার্জি, শীলা, তুই নয়নকে ভেতরে নিয়ে যা। এখানে আমরা কথা বলব। নয়নকে অনির কাছে দিয়ে তুই আমাদের একটু চা-টা কিছু দে…

কল্যাণ নীচু গলায় বললেন, শুধু চা, আর কিছু না…

শীলা বাচ্চাটাকে খানিকটা টানা-হাচড়া করে খানিকটা ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেল। তবে যাবার আগে দুরন্ত ছেলেটা বন্দুক ছাড়াও বেশ কয়েকটা খেলনা বগলদাবা করে নিয়ে গেল।

বসবার ঘরে এখন শুধু ওঁরা দুজন। কোনও কথা নেই, কোনও শব্দও নেই।

কল্যাণ ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। সুদৃশ্য ছিমছাম। দুটো সোফা, একটা ডিভান, বুক সেলফ, গ্লাসটপ, ছোট টি-টেবল। দেওয়ালে টাঙানো একটা গ্রুপ ফটো, আর একটা মধুবনী ছবি কাপড়ে সুতোর কাজ করে আঁকা। টিভিটা ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে চাকাওয়ালা টেবিলে বসানো। আর তার খানিকটা দূরেই একটা বুককেসের ওপরে টেলিফোন। তার পাশে নতুন টেলিফোন ডিরেক্টরি।

অচিন্ত্যর ছবি কোথায়? কোথায় সেই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, যাকে আমি এত কাঠখড় পুড়িয়ে দেখতে এসেছি।

অচিন্ত্যর কোনও ছবি বাঁধিয়ে রাখেননি? ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে বললেন কল্যাণ। তাঁর কথায় প্রশ্নের সুরটা খুব হালকা শোনাল।

বেডরুমে আছে। ছোট্ট করে জবাব দিলেন মিসেস ব্যানার্জি, আর ওই গ্রুপ ফটোটা– ওদের অফিসে তোলা–ওতেও আছে।

বিধবা মহিলাকে ভালো করে জরিপ করলেন কল্যাণ। লম্বাটে ফরসা মুখ। টানা ভুরু। আলতো খোঁপা করা চুল। রগের পাশে একটা কি দুটো রুপোলি সুতো। লম্বা নাক। চোয়ালের রেখা স্পষ্ট। চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা। অনেকটা যেন দিদিমণি-দিদিমণি চেহারা। কিন্তু কাছাকাছি এসে বসলেই ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য কোমল বিকিরণ অনুভব করা যায়।

মিসেস ব্যানার্জির পরনের শাড়িটা সাদা নয়, খুব হালকা আকাশি। তার ওপরে কপালের টিপের মতো অসংখ্য গাঢ় নীল বুটি। সরু পাড়ে রুচিসম্মত নকশা। দেখে মনে হয় না প্রথাগত বিধবা-জীবনযাপন করছেন। নিরামিষ খাওয়াদাওয়া মেনে নিয়েছেন কি না কে জানে!

কল্যাণের কৌতূহল এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আপনি কী জরুরি কথা বলবেন বলছিলেন…

বোঝা গেল, মিসেস ব্যানার্জি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে চান না। তা ছাড়া কল্যাণ চৌধুরি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কল্যাণ নিজেকে মনে মনে নিষ্ঠুর করলেন। গড় দেড় মাসের যন্ত্রণা তিনি একা সয়েছেন। একটু পরেই তিনি আর একা থাকবেন না। তার মনে হল, অচিন্ত্যকে হারিয়ে মিসেস ব্যানার্জির সংসার যতটা সুখী হওয়া সম্ভব ঠিক ততটাই সুখী। কী সুন্দর! যেন স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি একটা মনোহারি বল–অনেকটা প্রকাণ্ড বুদবুদের মতো। কল্যাণ মনে মনে সেই বলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি শুরু করলেন।

কল্যাণ উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন গ্রুপ ফটোটার দিকে। ওটার খুব কাছে গিয়ে গভীর মনোযোগে ছবির মানুষগুলোর মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎই ঘুরে তাকালেন মিসেস ব্যানার্জির দিকে । এর মধ্যে কে কাজল?

মিসেস ব্যানার্জির মুখে পলকে বিস্ময় ফুটে উঠল, চোয়াল শক্ত হল। একটু সময় নিয়ে তারপর কথা বললেন তিনি, আপনি এঁকে চেনেন না! ফোনে যে বললেন—

চিনি। তবে কখনও সামনা-সামনি দেখিনি। এ-ছবিতে কোন জন? কল্যাণ স্ফটিকের বলটা নিয়ে তখনও লোফালুফি করছেন। যে-কোনও মুহূর্তে শূন্যে ছুঁড়ে

দেওয়া বলটা না লুফে হাত সরিয়ে নিলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিশ্রী শব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ে সুন্দর বলটা চুরমার হয়ে যাবে।

বাঁদিক থেকে ফোর্থ।

কল্যাণ আবার ফটোর দিকে তাকালেন। বাঁদিক থেকে চতুর্থ জনই সেই তৃতীয় ব্যক্তি।

অচিন্ত্যকে দেখে কল্যাণ কেমন দিশেহারা হয়ে গেলেন। ফটোতে মুখটা মাপে ছোট হলেও স্পষ্ট বোঝা যায়। খুবই সাধারণ চেহারা, কিন্তু চোখ দুটো একেবারে অন্য জগতের কেমন যেন মায়া জড়ানো। যেন বোঝা যায়, এ-চোখের আড়ালে একটা অন্যরকম মন আছে। অসুখী এই মানুষটাকে অজন্তা আদর করে কুড়িয়ে নিয়েছিল। তার অর্থহীন জীবনের একটা মানে খুঁজে পেয়েছিল মানুষটা।

হঠাত্ কল্যাণের এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। দুজ্ঞেয় এক জ্বালা তাকে অস্থির করে তুলল। ছবির দিকে চোখ রেখেই তিনি বললেন, মিসেস ব্যানার্জি, আপনার স্বামী যেদিন তমলুকে অ্যাকসিডেন্টে মারা যান, সেদিন ওখানে আরও একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। কাগজে দুটো খবরই বেরিয়েছিল–পড়েননি?

স্ফটিকের বলটা এখন শূন্যে। কল্যাণ ওটা শেষ মুহূর্তে লুফে নেবেন, নাকি হাত সরিয়ে নেবেন?

কল্যাণ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসছিলেন সোফার দিকে, মিসেস ব্যানার্জিকে দেখছিলেন, তখনই একটা খেলনার হোঁচট খেলেন।

সেই করতাল বাজানো বানরটা। কাত হয়ে পড়ে গিয়ে হঠাৎই করতাল বাজাতে শুরু করেছে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ ঘরের চুপচাপ পরিবেশে এলোপাতাড়ি ছুরি চালাতে লাগল।

মিসেস ব্যানার্জি ইতস্তত করে বললেন, কাগজে বেরিয়েছিল? আমার ঠিক খেয়াল পড়ছে না।

কল্যাণ কোনও জবাব না দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বানরটা তুলে নিলেন। প্রাণহীন চোখ। ভোম্বলদাস মুখ নিয়ে বানরটা করতাল বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। বোধ হয় ওটার ভেতরে কিছুটা দম তখনও ছিল।

করতালের শব্দটা খানিকটা ঢিমে হয়ে আসতেই কল্যাণ চাবি ঘুরিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত দম দিলেন। কিন্তু বানরটা চুপচাপ রইল। কল্যাণ একটু অবাক হলেন। কী ভেবে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন খেলনাটাকে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র শব্দে শুরু হয়ে গেল বাজনা। কল্যাণের দিকে শুন্য চোখে তাকিয়ে বানরটা করতাল বাজাচ্ছে। বানরটার পুরু ঠোঁটের কাছে কি এক চিলতে হাসি? কল্যাণের কেমন অস্বস্তি হল। মনে হল, বানরটা করতাল বাজিয়ে তাকে দুয়ো দিচ্ছে।

খেলনাটা মেঝেতে বসিয়ে রেখে আবার মিসেস ব্যানার্জির কাছে এসে বসে পড়লেন কল্যাণ। বললেন, মিসেস ব্যানার্জি, আপনাকে আমি একজন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের গল্প শোনাতে এসেছি। মিসেস ব্যানার্জির বিমূঢ় চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে কল্যাণ আবার বললেন, আপনার স্বামীর গল্প। অনমিতা আর নয়নের বাবার গল্প। না কি ওরা আবার ড্যাডি বলে ডাকত অচিন্ত্যকে?

মিসেস ব্যানার্জি তখনও ঠিক বুঝতে পারেননি কল্যাণ কী বলতে চাইছেন।

এমনসময় শীলা ট্রে-তে করে চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। কাচের টেবিলের ওপরে। কাপ-প্লেট সাজিয়ে দিয়ে ট্রে নিয়ে চলে গেল।

বানরটা তখনও করতাল বাজাচ্ছে, তবে তার বাজনার জোর কমে এসেছে। সেদিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন কল্যাণ। স্ফটিকের বলটা ওপর থেকে নেমে আসছে। এখনও সময় আছে লুফে নেওয়ার। কিন্তু...।

চা খান।

মিসেস ব্যানার্জির অনুরোধে চায়ের কাপ তুলে নিলেন কল্যাণ। কাপে পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে সরাসরি তাকালেন ওঁর চোখের দিকে।

তারপর এক ঝটকায় মনস্থির করে নিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। স্ফটিকের বলটা মেঝেতে আছড়ে পড়ল। ঝনঝন শব্দে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল চারদিকে। কল্যাণ সেই শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

কল্যাণ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে সব বলে গেলেন একে একে, কিছুই বাদ দিলেন না। অজন্তার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত সময়টা তার কাছে যেন একটা অন্ধকার টানেল। এই টানেলের মধ্যে দিয়ে

এতদিন দৌড়ে এসেছেন কল্যাণ। এখন, পুরোনো কথা বলতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, আবার সেই টানেলের মধ্যে দিয়ে তিনি দৌড় শুরু করেছেন।

কল্যাণ কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। কিন্তু একটা সময়ে আর চুমুক দিতে পারলেন না। তার ঠোঁট অকারণেই কাঁপছিল। গলার মধ্যে একটা রবারের বল ঢুকে পড়েছিল।

মিসেস ব্যানার্জি চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই হয়েছে প্রথম এবং শেষ চুমুক। তিনি মাথা নীচু করে কল্যাণের কথা শুনছিলেন। চোয়াল শক্ত করে কান্না চেপে রাখতে চেষ্টা করছিলেন। আর মনেপ্রাণে চাইছিলেন, অনি যেন এখন এ-ঘরে না আসে।

এক সময় কথা শেষ করলেন কল্যাণ। গলার কাছটায় কী একটা যেন বারবার আটকে যাচ্ছিল, গলা ধরে যাচ্ছিল–তাই কেশে গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছিলেন। তবে নিজেকে কী অদ্ভুত হালকা লাগছিল, বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

এই…এই আপনার জরুরি কথা! ভাঙাচোরা গলায় বললেন মিসেস ব্যানার্জি।

জরুরি কি না জানি না, তবে এই কথাগুলো আপনাকে আমি জানাতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আপনার সঙ্গে আমার অবস্থার খুব একটা তফাত নেই। অবশ্য তখন তো আমি নয়ন বা অনমিতার কথা জানতাম না–

অচিন্ত্যর ব্যাপারটা আমি আঁচ করেছিলাম…খানিকটা জানতে পেরেছিলাম, তবে কোনও অশান্তি করিনি– শাড়ির আঁচল দিয়ে কান্না চাপতে চাইলেন মিসেস ব্যানার্জি, কিন্তু দু-একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে? আসলে আমি নয়ন আর অনির কথা ভেবেছিলাম…আমাদের কথা ভেবেছিলাম।

কল্যাণ তেতো হাসলেন, বললেন, জানেন, খুব নিশ্চিন্তে জীবন কাটাচ্ছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, আমার জীবনে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু পরে বুঝেছি, এই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বাররা সবসময় থেকে যায়…কোথাও না কোথাও থেকে যায়..হয় স্টেজের ওপরে, নয়তো উইংস-এর ফাঁকে, দর্শকদের মাঝে, অথবা গ্রিনরুমে। এরা থাকবেই।

মিস্টার চৌধুরী, এখন এ সব পুরোনো কথা তুলে কী লাভ! আমাকে আমার সংসার নিয়ে বাঁচতে হবে..আর আপনাকেও তো বাঁচতে হবে…আমাদের তো

আর কিছু করার নেই কথার শেষ দিকটা কান্নায় মিশে গেল।

মিসেস ব্যানার্জির কষ্ট কল্যাণের মনে খুব একটা আচঁড় কাটতে পারছিল না। মিসেস ব্যানার্জির কথার জের টেনে তিনি বললেন, আপনার কি ধারণা আমি এখনও বেঁচে আছি! অজন্তার অ্যাকসিডেন্টের খবরটা শোনার পরই আমার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে…

জীবনটা তো একটা স্বপ্ন। ঘুম ভাঙলেই সেই স্বপ্নের ইতি–মৃত্যু। স্বপ্ন শেষ হওয়ার মুহূর্ত থেকে কল্যাণ জীবনের মৃতদেহ কাঁধে করে ক্লান্ত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্যহীন সেই ঘুরে বেড়ানো হয়তো আজ শেষ হবে।

কাজলের লেখা চিঠিগুলো আমাকে একবার দেখাবেন? আর্ত খসখসে গলায় মহিলা অনুরোধ করলেন।

চিঠি! কল্যাণের মনে পড়ল কাজলের লেখা আন্তরিক চিঠিগুলোর কথা। কী সুন্দরভাবেই না কাজল আর অজন্তা নিজেদের আলাদা একটা ভালোবাসার জগৎ গড়ে নিয়েছিল। চোখের আড়ালে থাকা সেই জগতের কথা কেউ জানত না। সেই জগতে কল্যাণ মানে, মিস্টার চৌধুরি বা মিসেস ব্যানার্জির কোনও জায়গা ছিল না। ওঁরা ছিলেন বাইরের লোক। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার।

কল্যাণের মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল আচমকা। তিনি চায়ের কাপের দিকে চোখ রেখে অসহায় সুরে বললেন, ওগুলো দেখে কী করবেন? শুধু শুধু কষ্ট পাবেন। ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার…আমাদের দেখা কি ঠিক হবে?

অজন্তাকে দেওয়া কাজলের ডায়েরিটার কথা মনে পড়ল কল্যাণের। ওদের ব্যক্তিগত বর্ণমালা কিছুই বোঝেননি ওঁরা। ওদের মনচিহ্নও বুঝতে পারেননি। একই চিহ্নের তো কতরকম মানে হয়। যেটা সাধারণ যোগচিহ্ন, সেটাকে সামান্য ঘুরিয়ে দিলেই হয়ে যায় গুণচিহ্ন অথবা কাটা চিহ্ন। কল্যাণ কল্পনায় নিজের মুখের ওপরে কুৎসিত এক কাটাচিহ্ন দেখতে পেলেন। মিসেস ব্যানার্জির মুখেও। অজন্তা আর কাজল যেন ওদের দুনিয়া থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে এই দুটি প্রাণীকে, তারপর মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই অপমান আর গ্লানি নিয়ে ওঁরা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছেন।

মিসেস ব্যানার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণের মায়া হচ্ছিল। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই ব্যক্তিত্ব। তার বদলে বসে আছে এক ভাঙাচোরা রমণী। অচিন্ত্য আর অজন্তাকে পাশ কাটিয়ে অনমিতা আর নয়নকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখছিলেন মিসেস ব্যানার্জি। কল্যাণ ওঁকে হয়তো পাশ কাটাতে দেননি, কিন্তু স্বপ্নটা কি পুরোপুরি কেড়ে নিতে পেরেছেন? অনমিতা আর নয়ন যে থেকে গেছে। ওদের চারটে চোখ দিয়ে এখন এই বিষণ্ণ দুটি চোখ স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করবে।

কল্যাণের বুকের ভেতরটা কেমন চিনচিন করছিল। চাপা অথচ তীব্র যন্ত্রণা। তেতো হাসলেন কল্যাণ। দ্বিতীয়বার মরতে কে আর ভয় পায়! ঘরের মেঝেতে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে বসে থাকা বানরটার দিকে চোখ গেল তার। লোমশ প্রাণীটার কুতকুতে চোখে কি সামান্য হাসির ছোঁয়া?

ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বানরটার কাছে গেলেন কল্যাণ। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলেন খেলনাটা। এক অদ্ভুত জ্বালায় ওটাকে আচ্ছা করে কষে দম দিলেন। তারপর বাঁধন আলগা করতেই ঠনঠন শব্দে করতাল বাজতে শুরু করল। বাজতেই থাকল।

পায়ে পায়ে চায়ের টেবিলের কাছে চলে এলেন কল্যাণ। নিথর হয়ে বসে থাকা মিসেস ব্যানার্জির সামনে টেবিলের কাচের ওপরে বসিয়ে দিলেন খেলনাটাকে। তারপর ছোট্ট করে বললেন, আসি–

মিসেস ব্যানার্জি কোনও উত্তর দিলেন না।

কল্যাণ রবারের পা ফেলে বেরিয়ে এলেন ফ্ল্যাটের বাইরে। করতালের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকার নির্জন রাস্তায় করতালের শব্দটা কল্যাণকে একঘেয়েভাবে অনুসরণ করে চলল।

# ব্ল্যাকমেল ডট কম

**ব্ল্যাকমেল ডট কম**

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল মোবাইল ফোনের একটা ক্রস কানেকশন থেকে। তা না হলে কোনওদিনই কিছু জানা যেত না। আর ক্যালকাটা পুলিশের নাকের ডগায় এরকম একটা মারাত্মক ক্রাইম চলতেই থাকত।

অফিসে আমার চেম্বারে বসে কম্পিউটারের কীর্বোডে আঙুল চালাচ্ছিলাম। গত দশ বছরে কলকাতার নানান ধরনের ক্রাইম কী হারে বেড়েছে তার একটা তুলনামূলক গ্রাফিক্স তৈরি করছিলাম। হঠাৎই কাচের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল অরিন। অরিনকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

স্যার, একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশান আছে।

আমি কম্পিউটার ছেড়ে অরিনের দিকে তাকালাম। শরীরের মোচড়ে রিভলভিং চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে অরিনের মুখোমুখি হলাম।

কী ইনফরমেশান? ইশারায় অরিনকে বসতে বললাম।

অরিন বসল। তারপর বলল, আজ সকাল নটা নাগাদ আমি মোবাইল ফোনে একজন রিলেটিভকে ফোন করছিলাম। তখন হঠাৎ করে ক্রস কানেকশান হয়ে যায়। শুনতে পেলাম একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে। কথাগুলো অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, না, না–প্লিজ, বলবেন না। উত্তরে মেয়েটি খুব হাসল। তারপর বলল, আপনার বুদ্ধি আছে। চট করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। যারা বুঝতে না পারে, শুধু তর্ক করে, পুলিশের ভয় দেখায়– তারা শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করে। লাস্ট দু-মাসে তিনজন কোটিপতি সুইসাইড

করেছে আপনি জানেন তো? নাকি আপনার খবরের কাগজে চোখ বোলানোর সময় হয় না।

কথা শেষ করে মেয়েটি আবার হাসল। তখন ভদ্রলোক বললেন, না, নাজানি কাগজে দেখেছি। তবে কেন সুইসাইড করেছে বুঝিনি। আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দেব।

মেয়েটি বলল, পাঁচ লাখ ক্যাশ। অবশ্য চেকে দিলেও কোনও অসুবিধে নেই। আপনি তো আসল কথাটা কাউকে বলতে যাচ্ছেন না! আপনি বরং বলবেন আমার চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশানে আপনি টাকাটা ডোনেট করেছেন। নইলে আমি কিন্তু সব সিক্রেট ফঁস করে দেব–আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না।

ভদ্রলোক খুব ভয় পাওয়া গলায় বললেন, না, না কাউকে বলব না। আপনি কাল বেলা এগারোটায় আমার থিয়েটার রোডের অফিসে এসে নিয়ে যাবেন। পাঁচ লাখ ক্যাশ।

খিলখিল করে হাসল মেয়েটি। মিষ্টি করে বলল, গুড বাই, মিস্টার টাটা। সি য়ু টুমরো অ্যাট ইলেভেন। তারপর লাইন কেটে দিল।

কথা শেষ করে হাঁফাচ্ছিল অরিন। আমি ডান পাশে রাখা ক্যাবিনেট থেকে একটা কোকের ক্যান ওকে দিলাম। লালবাজারের গোটা বিল্ডিংটাই সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড। সুতরাং আলাদা করে কোক ঠান্ডা করার দরকার হয় না। কোল্ড ড্রিঙ্কস আমার পার্কস-এর মধ্যে পড়ে।

অরিন খুব পরিশ্রমী আর সৎ। স্পেশাল ব্রাঞ্চে জয়েন করেছে বছর দুয়েক। আমরা সবাই ওর মতো হলে কলকাতা পুলিশের গল্প অন্যরকম ভাবে লেখা হত। আজ একুশ শতকের শেষ দিকে পৌঁছেও কলকাতা পুলিশের চরিত্র বিশ শতকের মতোই রয়ে গেছে। ঐতিহ্য একেই বলে!

কোকটা প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করল অরিন। তারপর হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বলল, স্যার, এটা তো স্ট্রেট কেস অফ ব্ল্যাকমেল।

আমি টেবিলে আঙুলের টোকা মারছিলাম আর চিন্তা করছিলাম।

থিয়েটার রোডে অফিস, পদবি টাটা–যিনি এক কথায় পাঁচ লাখ ক্যাশ দিতে পারেন…। এরকম একজনই আছেন কলকাতায় : রাজীব টাটা–টাটা হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটিড-এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাদা কথায় যাকে মালিক বলা যায়।

রাজীব টাটাকে একটি মেয়ে ব্ল্যাকমেল করছে!

এটাও ঠিক যে, গত দুমাসে কলকাতায় তিনজন কোটিপতি সুইসাইড করেছেন। সুইসাইডের কারণ আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি। মিনিস্টারদের প্রচণ্ড চাপ থাকায় আমরা তন্নতন্ন করে ইনভেস্টিগেট করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। এখন তা হলে একটা ক্লু পাওয়া গেল। সম্ভবত এই মেয়েটিই ওদের তিনজনকে ব্ল্যাকমেল করছিল। তারপর ওঁরা টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ওঁদের পুরোনো কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। ফলে ওঁরা স্রেফ ভয় পেয়ে সুইসাইড করেছেন।

আমি অরিনকে বললাম, অরিন, তোমাকে এখনই একটা অ্যাকশন প্ল্যান দিচ্ছি। তুমি কাজে নেমে পড়ো। সঙ্গে লোরাকে নিয়ে নাও। খুব এনার্জিটিক মেয়ে–ওকে আমি পছন্দ করি। তা ছাড়া ও খুব ভালো ফটো তুলতে পারে…।

আমি জানি, অরিন লোরাকে আমার চেয়ে টু-কে টাইমস বেশি পছন্দ করে। আর লোরাও অরিনের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। সেইজন্যেই ওদের দুজনকে একসঙ্গে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে আমি ভালোবাসি তাতে অনেক বেশি কাজ আদায় করা যায়।

তোমরা কাল সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাজীব টাটার থিয়েটার রোডের অফিসে হাজির থাকবে। লোরাকে আমি বলে দিচ্ছি, সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বেস্ট ফাজি ডিজিটাল ক্যামেরাটা নিয়ে যাবে। মেয়েটি এগারোটার সময় রাজীব টাটার অফিসে এলেই ওর পটাপট ছবি তুলবে। আবার অফিস থেকে যখন বেরোবে তখনও শট নেবে। আমি ওর অন্তত দু-ডজন ছবি চাই ডিস্কে ছবিগুলো স্টোর করে নেবে–অ্যান্ডারস্ট্যান্ড?

ও.কে, স্যার।

মেয়েটি টাটার অফিস থেকে বেরোলে তুমি রাজীব টাটার সঙ্গে গিয়ে কথা বলবে। একটা জেনারাল এনকোয়ারি গোছের করবে...যতটা ডিটেইল বের করতে পারো আর কী! আর লোরা মেয়েটিকে ফলো করবে–ওর বাড়িটা চেনার চেষ্টা করবে। তারপর বিকেল চারটে নাগাদ আমাকে তোমরা ফুল রিপোর্ট দেবে। তখন আমি নেক্সট অ্যাকশন প্ল্যান চক আউট করব।

অরিন মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমি ভিডিয়োফোনে লোরার নম্বর ডায়াল করলাম।

ছোট পরদায় লোরার ছবি ফুটে উঠল। ওকে দেখলেই বয়েসটা কমাতে ইচ্ছে করে।

লোরাকে সংক্ষেপে গাইডলাইন দিলাম। তারপর বললাম, অরিনের সঙ্গে ও যেন কথা বলে নেয়।

তখনও জানি না, একটা অদ্ভুত রিপোর্ট আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

*

পরদিন বিকেল চারটের সময় লোরা আর অরিন আমার চেম্বারে এল।

ওদের বসতে বললাম।

অরিন একটা ফোল্ডার আমার দিকে এগিয়ে দিল? এতে তিরিশটা কালার প্রিন্টআউট আছে।

ফোল্ডার খুলে ছবিগুলো দেখলাম।

ডিজিটাল ক্যামেরার ডিস্ক থেকে কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে ছাপা ছবি। ছবিগুলো ফটোগ্রাফের চেয়েও জীবন্ত।

মেয়েটিকে দেখতে অতি সাধারণ। লম্বাটে মুখ। গায়ের রং মাঝারি। কপালে ছোট টিপ। গলায় সোনার চেন। পরনে গাঢ় নীল পাড় আকাশি রঙের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ।

মেয়েটির কাঁধে সমাজসেবিকা ঢঙের একটা ব্যাগ ঝুলছে।

এই আমাদের ব্ল্যাকমেলার?

হ্যাঁ, স্যার। অরিন বলল।

অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে দেখলাম আমি।

এই সাদামাটা মেয়েটা একের পর এক কোটিপতিকে অকাতরে ব্ল্যাকমেল করে চলেছে! চেহারা দেখে বিশ্বাস হতে চায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অরিন বলল, রাজীব টাটা গতকাল ওকে পাঁচ লাখ টাকার চেক দিয়েছেন। বললেন, এই ভদ্রমহিলা নানারকম সোশাল ওয়েলফেয়ারের কাজে যুক্ত আছেন। তাই তিনি খুশি হয়ে ওঁকে পাঁচলাখ টাকা দিয়েছেন। এটা ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি কখনও ব্যাপারটা পুলিশের আওতায় আসে রাজীব টাটা নিশ্চয়ই আমাদের জানাবেন আমাদের হেল্প চাইবেন।

আমি ব্ল্যাকমেল শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে উনি যেভাবে হেসে উঠলেন তাতে মনে হল আমি যেন চাঁদকে চৌকো বলেছি। আমার খুব ইনসাল্টিং লেগেছে, স্যার। এরপর চুপচাপ চলে আসা ছাড়া কোনও পথ ছিল না।

অরিন গম্ভীর মুখে কথা শেষ করল। বুঝলাম, সকালের অপমানটা বিকেলেও মিলিয়ে যায়নি।

এবার লোরার পালা।

ও যা বলল সেটা সত্যি-সত্যিই অবাক হওয়ার মতো।

মেয়েটির নাম নিশিকা। এলগিন রোডে থাকে। লোরা ওকে অনুসরণ করার সময় নিশিকা বেশ কয়েকবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। লোরার মনে হয়েছে নিশিকা অনুসরণের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তাতে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, একফোঁটাও বিচলিত হয়নি। ফলে লোরা অতি সহজেই ওর বাড়ির কাছে পৌঁছে যায়। ওর নাম-ঠিকানাটাও টুকে নিয়ে আসে।

তোমার ফলো করার কাজটা তা হলে জলের মতো সহজ হয়ে গেছে? লোরাকে জিগ্যেস করলাম।

হ্যাঁ, স্যার–অ্যাট লিস্ট আমার তাই মনে হয়েছে।

সত্যি, একজন ব্ল্যাকমেলারের পক্ষে এ ভারী অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর অরিনকে বললাম, অরিন, নিশিকা রাজীব টাটাকে কিছু একটা ফাঁস করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল। লেট আস ডিগ ইনটু রাজীব টাটাস পাস্ট। খুঁজে বের করো, রাজীব টাটা কী এমন কেলেঙ্কারির কাজ করেছেন যা ফাস হলে ওঁর মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। আর যে-তিনজন মালটি মিলিওনেওয়ার গত দুমাসে সুইসাইড করেছেন খোঁজ করে দ্যাখো ওঁদের লাইফে কোনও গোপন স্ক্যান্ডাল ছিল কি না। সিক্রেট ইনফরমেশানই ব্ল্যাকমেলারদের স্ট্রেংথ।

অরিন বলল, ও.কে, স্যার।

এই পাস্ট হিস্ট্রিগুলো স্ক্যান করার কাজে লোরা তোমাকে হেল্প করবে। য়ু আর পাটনার্স।

অরিন আড়চোখে লোরার দিকে দেখল। লোরার মুখে একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল।

ওরা চলে গেলে আমি ছবির ফোল্ডারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কম্পিউটারের দিকে ঘুরে বসলাম। পুরো ব্যাপারটার একটা ব্রিফ রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করলাম। কাজ করতে করতে আমার চোখ বারবার টেবিলে রাখা খোলা ফোল্ডারটার দিকে চলে যাচ্ছিল।

সেখান থেকে নিশিকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। চ্যালেঞ্জের হাসি।

মেয়েটা আরও কজন কোটিপতিকে ব্ল্যাকমেল করছে কে জানে!

.

নিশিকা আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসল। শাড়িটা সামান্য গুছিয়ে নিয়ে কাঁধের ব্যাগটা কোলের ওপরে রাখল। তারপর আত্মবিশ্বাস ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

হাসিটা এমন যেন ও বুঝতে পেরেছে আমার ডিপার্টমেন্টের তদন্তের নিটফল শূন্য, কিংবা মহাশূন্য।

অরিন আর লোরা আমাকে গতকাল রিপোর্ট দিয়েছে যে, রাজীব টাটা এবং সুইসাইডে মারা যাওয়া তিন কোটিপতির জীবনে বলার মতো তেমন কোনও কুকাজ নেই। চারজনেরই জীবন মোটামুটিভাবে যুধিষ্ঠির কিংবা সত্যবানের মতো।

সুতরাং নিশিকাকে আমার দপ্তরে একবার ডেকে পাঠিয়েছি।

এসব ভাবছিলাম আর নিশিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওর চোখদুটো আমার কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছিল। সোজা চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখে পলক পড়ছে না।

ঠান্ডা গভীর চোখ। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। যেন আমার আপাদমস্তক অন্তরতম আনাচকানাচ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে জরিপ করে নিয়েছে। আমার সম্পর্কে কিছুই আর ওর জানতে বাকি নেই।

কোনওরকমে অস্বস্তি কাটিয়ে আমি কথা বললাম, নিশিকা, আপনি রাজীব টাটাকে ব্ল্যাকমেল করছেন। আরও তিনজন মালটি মিলিওনেয়ার আপনার ব্ল্যাকমেলের টার্গেট হয়ে সুইসাইড করেছেন। এখনও আমরা কোনও কংক্রিট প্রুফ পাইনি–তবে আজ না হয় কাল প্রমাণ পাবই। তখন আপনার এই হাসি মিলিয়ে যাবে। তার চেয়ে বেটার আপনি এখন নিজে থেকেই পুরো ব্যাপারটা খুলে বলুন।

নিশিকার চোখ অপলক। ঠোঁটে একচিলতে হাসি। ও বলল, আপনাকে সব বলব।

আমি মাথা নেড়ে ইন্টারকম ভিডিয়োফোনের দিকে হাত বাড়ালাম : হ্যাঁ, কনফেস করাটাই বেটার। শাস্তি কম হবে।

নিশিকার হাসিটা চওড়া হল? কাউকে ফোন করে ডাকার দরকার নেই। আমি কনফেস করব শুধু আপনার কাছে–আর কারও কাছে নয়।

তার মানে! আমার কেমন যেন নার্ভাস লাগছিল।

রামা-শ্যামার কাছে সব খুলে বলে কোনও লাভ নেই। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। জানতাম আমাদের দেখা হবেই। আপনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

কীভাবে জানলেন আমি ডেকে পাঠাব?

হাসল নিশিকা, বলল, জানি। এই জানাটাই আমার অলৌকিক ক্ষমতা।

মেয়েটা কি জ্যোতিষী নাকি! কে জানে, হয়তো ব্লাফ দিচ্ছে! কিন্তু ওর চোখ তো সে কথা বলছে না। বরং মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছে। ওঃ, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা কেমন করছে!

এবারে বলুন, রাজীব টাটাদের মতো বড়লোকদের কী কেলেঙ্কারির ঘটনা আপনি জানেন যা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওঁদের থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা নিচ্ছেন! ওঁদের পাস্ট লাইফের কী গোপন খবর আপনি জানেন?

নিশিকা হাসল, মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ–যেন আমি কোনও ছেলেমানুষি কথা বলেছি। তারপর ও ওঁদের অতীতের কোনও খবর তো আমি জানি না! আমি জানি শুধু ওঁদের ভবিষ্যতের কথা–আগামী দিনে ওঁদের জীবনে কী হতে চলেছে।

কী বলছেন আপনি! বুঝতে পারছিলাম আমার মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চোখ বড় বড় : আপনি কি জ্যোতিষী? ফরচুন-টেলার?

না। জ্যোতিষীরা আন্দাজ করে ভাগ্যের কথা বলে। প্রতিদিনের খবর জানে না। আমার সামনে ঝুঁকে এল নিশিকা? আমি প্রতিদিন, প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মুহূর্তের খবর জানি। আমি আন্দাজে কিছু বলি না। আমি ফরচুন-টেলার নই…ফিউচার-টেলার।

আমি নিশিকার অন্তর্ভেদী চোখের দিকে দেখছিলাম। অপলক ওই চোখ ভবিষ্যতের সবকিছু দেখতে পাচ্ছে!

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা খুব সহজ–আমি ওই বড়লোকগুলোর কাছে গিয়ে বলি আমি ওদের ভবিষ্যতের সব খবর জানি। তাই আমাকে টাকা দিতে হবে। একটু থেমে তারপর ও বড়লোকদের আমি ঘেন্না করি। আর আপনার

মতো সমাজে যারা উঁচু চেয়ারে বসে রয়েছে তাদেরও আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। আপনারা সবাই মিলে দেশটাকে উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছেন।

নিশিকা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল।

আমি হাত তুলে ওকে শান্ত হতে বললাম। তারপর ও তার মানে ওঁদের ভবিষ্যতের কুকীর্তি গোপন রাখার জন্যে ওঁরা আপনাকে টাকা দেন? যাতে কাউকে আপনি সেসব কথা না বলে দেন?

না, না! আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি। ফিউচারের সব গোপন কথা অন্যদের কাছে ফাস করে দেব বলে আমি ওদের ভয় দেখাই না। আমি ওদের ভবিষ্যতের কথা ওদেরই বলে দেব– এই বলে ভয় দেখাই। যেমন ধরুন, রাজীব টাটা কোন বছরে কোনদিন কটার সময় কীভাবে মারা যাবে আমি জানি। সেটা যদি ওকে জানিয়ে দিই তা হলে লোকটা কি আর নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারবে? রোজ গুনবে মরতে ওর আর কদিন বাকি। এই টেনশানে-টেনশানে ওর লাইফ হেল হয়ে যাবে। তারপর একদিন আর সইতে না পেরে সুইসাইড করবে। তাই না?

আমি পাথর হয়ে বসে রইলাম। ব্ল্যাকমেলের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার আরও কাছে ঝুঁকে এল নিশিকা। প্রায় ফিসফিস করে বলল, আপনার মারা যাওয়ার দিনক্ষণও আমি জানি। যদি আপনি আমাকে পুলিশের তরফ থেকে প্রোটেকশান দেন–মানে, আমাকে ডিসটার্ব না করেন, তা হলে সেসব সিক্রেট আপনাকে বলব না। আপনি নিশ্চিন্তে জীবনটাকে এনজয় করতে পারবেন।

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল। ওর কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। আমি সুইসাইড করতে চাই না–নিশ্চিন্তে বাঁচতে চাই।

নিশিকা চলে যাওয়ার আগে বলে গেল, ব্ল্যাকমেল করে পাওয়া টাকার প্রায় সবটাই ও সত্যি-সত্যি সোশাল ওয়েলফেয়ারের কাজে খরচ করে।

# আকাশবাণী নরক

**আকাশবাণী নরক**

মণিকার কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একটা নামগোত্রহীন আতঙ্ক পায়ের পাতায় বরফঠান্ডা স্রোতের মতো প্রবেশ করে সূক্ষ্মতন্তুজাল বেয়ে আঁকাবাঁকা পথে উঠে আসতে লাগল মস্তিষ্কের দিকে। ঘরের মেঝেটা মনে হল নরম একতাল জেলি হয়ে গেছে। ভারসাম্য রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার।

মণিকা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওর সৌন্দর্য উবে গিয়ে ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে। ওর আয়ত চোখে আতঙ্কের ঢেউ ঝাপটা মারছে। ও বলল, এখন কী করব?

টের পেলাম মণিকার গলা বিশ্রীভাবে কেঁপে গেছে। কে বলবে একদিন ওর অলৌকিক সুরেলা গান আমাকে পাগল করে দিয়েছিল–আজও দেয়! অন্তত এই মুহূর্তটুকুর আগে আমার এটাই বিশ্বাস ছিল।

সত্যিই তো! কী করব এখন? মণিকা জানতে চাইছে।

স্বপন–স্বপন বক্সী এভাবে কখনও যে ঝড় তুলবে এ তো কোনওদিন ভাবিনি।

কিছুক্ষণ পর মণিকাকে বললাম, তুমি যাও। চিকুর কাছে শোও গিয়ে। আমি দেখছি, কী করা যায়।

মণিকা চলে গেল। চোখে-মুখে অবিশ্বাস। আমার ওপরে এই মুহূর্তে ওর কোনও আস্থা নেই। তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আস্থা আমার নিজেরও কি

আছে! মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার ওলটপালট শুরু হল। মণিকার জন্যে। চিকুর জন্যে। আমাদের দু-বছরের ছেলে চিকু।

তিন বছর আগে ঠিক এরকমই একটা ঝড় তুলেছিল স্বপন।

.

স্বপন বক্সী। আমার বন্ধু। একদিন হঠাৎই ও ঝোড়ো বাতাসের মতো এসে হাজির হয়েছিল আমার ঘরে। তখন আমি এ-ফ্ল্যাটে আসিনি। উত্তর কলকাতায় একটা ঘর ভাড়া করে থাকি–যাকে সোজা কথায় বলা যায় ব্যাচেলার্স ডেন। এবং এক ওষুধ কোম্পানিতে সেলসম্যানের চাকরি করি।

অফিসে বেরোব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। দেওয়ালে ঝোলানো ছোট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারার পালিশ শেষবারের মতো শানিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় প্রচণ্ড দড়াম শব্দে দরজা খুলে গেল। কাঠের জীর্ণ পাল্লা দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে কঁপতে লাগল।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে স্বপন।

কাল বিকেলে মণিকার সঙ্গে তুই ঘুরতে গিয়েছিলি?

ওর এই আচমকা অভিযোগমূলক প্রশ্নে আমি বিব্রত-বিচলিত। লক্ষ করলাম, স্বপনের চুল উশকোখুশকো, চোখ লালচে, মুখে না কামানো দাড়ি, পরনে অতি সাধারণ জামা, অতি সাধারণ প্যান্ট। যেমনটি বরাবর থাকে।

ডাক্তার-বাড়ি আর হাসপাতালের দোরে দোরে ওষুধ বেচে বেড়াস সেটাই জানতাম, আজকাল কি প্রেমও ফিরি করছিস? স্বপনের তীব্র শ্লেষ আমার শরীরে যেন কেটে বসল।

মনের রাগ অতি কষ্টে চেপে রেখে আমি বললাম, এখন অফিসে বেরুচ্ছি। তোর কী বলার আছে তাড়াতাড়ি বল।

স্বপন খুঁটিয়ে আমার চেহারা ও বেশবাস দেখল। যেন এই প্রথম দেখছে। আমি টাইয়ের না ঠিক করে নিয়ে বিছানায় বসলাম। অদ্ভুত চাউনি আমার শরীরের ওপরে স্থির রেখে স্বপন ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসল। পাশেই টেবিল। টেবিলে

একটা কাচের গ্লাসে জল ঢাকা ছিল। ও কোনও কথা না বলে গ্লাস থেকে কয়েক ঢোক জল খেয়ে নিল।

তারপর মুখ মুছে নিয়ে বলল, বিজন, সত্যি কথা বল। কাল তুই মণিকার সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলি?

স্বপনের গলার স্বর অনেক শান্ত।

একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিলাম, সেটা মণিকাকেই জিগ্যেস কর না।

না! আমি তোর মুখ থেকে শুনতে চাই!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। সত্যি কথা বলাটা কি ঠিক হবে? এইরকম উত্তেজনার মুহূর্তে আমার জবাবটা শুনে স্বপন একটা কাণ্ডই না করে বসে! মণিকার সঙ্গে স্বপনই আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। প্রায় মাসখানেক আগে ওর দোকানে একটা রেডিয়ো সারাতে এসেছিল মণিকা।

.

স্বপন আমার বহুদিনের বন্ধু। স্কুল পেরিয়ে আমি কলেজের পথে পা বাড়ালেও ওর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কারণ, হায়ার সেকেন্ডারিতে বার দুয়েক ঠেকবার পর ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজনেস করবে। জমানো পুঁজি যে খুব একটা ছিল তা নয়। বাবা-মা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ধার করে ও একটার পর একটা ব্যবসাতে ভাগ্যপরীক্ষা করতে লাগল। এবং ব্যর্থ হতে লাগল ক্রমাগত। তখন ও ঠাট্টা করে বলত, বিজন, জানিস, বাপ-মা অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমার নাম রেখেছিল স্বপন। কিন্তু পদবিটার কথা কেউ খেয়াল করেনি।

তার মানে? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছি আমি।

বক্সী! স্বপন বক্সী! তার মানে আমার সমস্ত স্বপ্ন বাক্সে বন্দি হয়ে থাকবে। বক্সী শব্দটা নির্ঘাত বাক্স থেকেই এসেছে।

ওর ওই ঠাট্টায় আমি প্রাণ খুলে হেসেছি। কিন্তু এটা ছিল ওর কাছে এক নিষ্ঠুর তেতো ঠাট্টা।

যখন আমি কলেজ পেরিয়ে চাকরিতে ঢুকলাম তখনও উপার্জনের সমস্যা সমাধান করতে স্বপনের লাগাতার ভাগ্যপরীক্ষা চলছে। এক পাড়াতেই থাকি। ফলে দেখাও হয় প্রায় রোজই। দেখা হলেই ও হেসে বলে, বাক্সের তালা খোলেনি। আমি অস্বস্তিতে পড়ি ওর কথা শুনে।

হঠাৎ একদিন শুনলাম স্বপন রেডিয়ো মেরামতের দোকান খুলেছে। সুতরাং সেদিন সন্ধেবেলাতেই গেলাম ওর দোকানে। দোকানের নাম আকাশবাণী। মাপে ছোট্ট হলেও সুন্দর করে সাজিয়েছে। বেশ কিছু নতুন ও পুরোনো রেডিয়ো শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন তাকে। ওকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, বক্সীর বাক্সের তালা তা হলে খুলেছে!

ও হেসে জবাব দিয়েছে, মর্তে ঠাই হল না, তাই আকাশে যেতে হয়েছে।

তারপর দুজনে প্রাণভরে গল্প করেছি।

সেদিন থেকে সন্ধে সাতটার পর ওর দোকানে গিয়ে রোজ আড্ডা দেওয়াটা একরকম নিয়মের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেল।

লক্ষ করতাম, রেডিয়ো জিনিসটা স্বপনকে যেন পাগল করে তুলছে। দিনরাত পড়ে থাকে ওই রেডিয়োর পিছনে। নানান রকম অদৃশ্য বেতার তরঙ্গকে রেডিয়োর মাধ্যমে পাকড়াও করে শব্দময় প্রাণবন্ত করে তোলাটাই যেন ওর একমাত্র ব্রত। ছুটির দিনে গেলেও দেখেছি যন্ত্রপাতির গাদার মধ্যে কানে হেডফোন লাগিয়ে কীসব খুটুর খুটুর করছে। ছোট-বড় নব ঘোরাচ্ছে। সেইসঙ্গে কয়েকটা স্পিকারে তীক্ষ্ণ, মিহি, কর্কশ নানান স্বরধ্বনিতে একই কথা বেরিয়ে আসছে। যখনই ওর সঙ্গে গল্প করতে বসতাম, তখনই ওর মুখে থাকত বেতার-তরঙ্গ বিষয়ক মুগ্ধ আলোচনা। ও বলত, বিজন, আমাদের চারপাশে আকাশে-বাতাসে কত শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে জানিস? শুধু একবার তাদের ধরতে পারলেই হল। দেখবি, কত কথা তাদের বলার ছিল। এই তো, কাল রাত দুটো নাগাদ উরুগুয়ের একটা মিউজিক প্রোগ্রাম ধরলাম।

ওর কথা যেন শেষ হতে চায় না। দেখলাম, রেডিয়োর এই কারিগরি খুঁটিনাটি হল একমাত্র বিদ্যে যেটা স্বপন দারুণভাবে আয়ত্ত করেছে। অন্য বিষয়ে পড়াশোনার তেমন কোনও আগ্রহ কিংবা আকর্ষণ না থাকলেও এই একটি বিষয় নিয়ে ও যথেষ্ট চর্চা করে। যন্ত্রপাতি এবং বই একইসঙ্গে ঘাঁটাঘাঁটি করে।

একদিন সন্ধেবেলা ওর দোকানে গিয়ে দেখি দোকান খোলা, কিন্তু দোকানের মালিক তথা কর্মচারী অনুপস্থিত। অথচ ঘরের অসংখ্য রেডিয়োর কোনও একটাতে বেশ উচ্চগ্রামে খবর পড়া হচ্ছে। হঠাত্ খবরের মাঝখানে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অনেকটা খবর পড়ুয়া ঢঙেই কেউ বলছে, নমস্কার, আকাশবাণী থেকে বলছি। বিজন, তুই একটু বোস, আমি এখুনি আসছি।

আমি চমকে উঠলাম। এ তো স্বপনের গলা! চারপাশে তাকালাম ওর খোঁজে। ও নেই। বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করা উচিত, এমন সময় দোকানের পিছনের অংশ থেকে পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল স্বপন। হেসে বলল, কী রে শালা, কেমন চমকে দিয়েছি।

আমি অবাক হয়ে স্বপনকে দেখছি। ও কি জাদু জানে! রেডিয়োতে ওর গলা আমি শুনলাম কেমন করে!

স্বপন আমার অবস্থাটা অনুমান করতে পারল। কাছে এগিয়ে এসে হাসল ও পরদার ফাঁক দিয়ে তোকে দেখে কথাগুলো বললাম।

কিন্তু রেডিয়োর মধ্যে দিয়ে শুনলাম কেমন করে?

এসব তো আমার কাছে ছেলেখেলা রে! বেতার-তরঙ্গ নিয়ে আমি যখন খুশি যা খুশি করতে পারি।

লক্ষ করলাম, স্বপনের চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক করছে। এতদিন যে নিজেকে সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে জানত, আজ যেন সে উপলব্ধি করতে পেরেছে এই একটি বিষয়ে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপরাজেয়।

এর পর থেকে যে-কোনও রেডিয়ো প্রোগ্রামের মাঝে কথা বলাটা স্বপন বক্সীকে নেশার মতো পেয়ে বসল। এবং সবসময়েই ও রেডিয়োতে কথা শুরু করতে ওর দোকানের নাম আকাশবাণী উল্লেখ করে।

দিনে দিনে অচল রেডিয়ো সচল করার ব্যাপারে আকাশবাণীর সুনাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বহু দূর দূর থেকে লোক আসে ওর কাছে রেডিয়ো সারাতে। এইভাবেই একদিন এসে হাজির হল মণিকা সরকার।

দিনটা ছিল শনিবার। তখন প্রায় সন্ধে সাতটা হবে। স্বপন একটা ভাঙা রেডিয়ো মেরামতের কাজে নিবিষ্টমনে ব্যস্ত। আমি দোকানের কাউন্টারের একপাশে বসে চা খাচ্ছি। এমন সময় মেয়েটি এল।

পরনে উজ্জ্বল রানি রং শাড়ি। একই রঙের ব্লাউজ। বড় বড় মর্মস্পর্শী চোখ। তীক্ষ্ণ নাকের পাশে একটা বড় তিল। কপালে টিপ। হাতে বাদামি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।

মেয়েটির উপস্থিতি আমাকে আচ্ছন্ন করল। সুদর্শন এবং সুপুরুষ হওয়ার খাতিরে বহু মেয়ের সংস্পর্শেই আমি এসেছি। ভালোবাসাবাসিও নেহাত কম করিনি। তাদের কেউ কেউ বেশ রূপসিও ছিল। কিন্তু এই মেয়েটির মতো এমন করে কেউ আমাকে নাড়া দেয়নি।

মেয়েটি মাথা তুলে দোকানের সাইনবোর্ডটা একবার পড়ে নিল। তারপর এগিয়ে এসে আমাকে জিগ্যেস করল, আপনিই স্বপনবাবু? ওর কণ্ঠস্বরও মুগ্ধ করার মতো।

স্বপন কাউন্টারের আড়ালে মেঝেতে বসে কাজ করছিল। সম্ভবত মেয়েটির প্রশ্ন শুনতে পেয়েই ও তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়াল : আমি স্বপন বক্সী। বলুন, কী দরকার?

তখন হাতের প্যাকেটটি খুলে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো এগিয়ে দিলে মেয়েটি এই রেডিয়োটা অনেকদিন ধরেই ভীষণ গোলমাল করছে। বহু দোকানে সারানোর চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি। আপনার দোকানের খুব নাম শুনেছি, তাই।

আমাকে ডিঙিয়ে আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল স্বপন ও দিন তো, দেখি–।

তখন আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলেছি, পরদিন সন্ধ্যায় আসব। কেন জানি না, মনে মনে সামান্য আহত বোধ করেছিলাম। হয়তো মেয়েটির মনোযাগ স্বপনের প্রতি নিবিড় হয়েছিল বলেই। অথচ জানি, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ সে রেডিয়ো সারাতে এসেছে। আমার সঙ্গে আলাপ করতে নয়।

স্বপনের আকাশবাণীতে এরপরে যেদিন গেলাম তখন প্রায় এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। একটা হতাশা, ক্ষোভ, আর ব্যর্থতা কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমার মনটাকে চেপে ধরেছে। মেয়েটির মুখ কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না। সুতরাং

সাতদিন পর যেদিন স্বপনের দোকানে গেলাম, তখন তাকে দেখতে পাব এ-জাতীয় একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা মনে যে ছিল না তা নয়। এবং সে-প্রত্যাশা পূর্ণ হল পুরোমাত্রায়।

স্বপন দোকানের ভিতরে বসে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করছিল। আমাকে আসতে দেখে বলল, আয় বিজন, মণিকার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই।

সেইদিনই মণিকার সঙ্গে প্রথম আলাপ। মণিকা সরকার। পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বি.এ. পড়ছে। ফাইনাল ইয়ার।

তিনজনে মিলে আড্ডায় বসলেও আড্ডা তেমন জমল না। বারবারই নিজেকে ভীষণ বাড়তি মনে হল। কারণ ওরা দুজনে নিজেদের গল্পে মশগুল।

একটা সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। মণিকা চলে যেতেই আমিও উঠলাম। কিন্তু স্বপন আমাকে ছাড়ল না। জোর করে আটকে রাখল। চা খাওয়াল। এবং গত সাতদিনে কী করে সে ও মণিকা পরস্পরের প্রেমে পড়েছে তার বিশদ কাহিনি শোনাল। আমার সন্দেহ প্রমাণিত হল। জিভে চায়ের স্বাদ সাপের বিষের মতো ঠেকল।

সে-রাতে ঘরে ফেরার পথে একটা পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করলাম। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝালাম, এর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমার অবুঝ মন জেদ ধরে ফুসতে লাগল। কী আছে স্বপন বক্সীর? অতি সাধারণ রোগা চেহারা। গায়ের রং মিশকালো। বিদ্যে স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। ভালো করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেও জানে না। পোশাক-আশাকে রুচির ছিটেফোঁটাও নেই। ওঃ অসহ্য!

অনেক চিন্তা করে দেখলাম, স্বপনের একটিমাত্র দক্ষতা মণিকাকে আকর্ষণ করেছে। সেটা হল বেতারবিদ্যা। স্বপনের কাছেই শুনেছি রেডিয়ো তৈরি করাটা মণিকার অত্যন্ত প্রিয় শখ। স্বপন যে শুধু ওকে সেই ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা সারিয়ে দিয়েছে তা নয়, নতুন দুটো রেডিয়ো উপহারও দিয়েছে। যে-রেডিয়োতে মণিকার প্রিয় বিদেশি গান শোনা যায়। মণিকা নাকি খুব সুন্দর গান করে। সেই গান একই সঙ্গে তিন-চারটে রেডিয়োতে শুনিয়ে ওকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে স্বপন। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার গায়ের জ্বালা ক্রমশ বাড়ছিল।

কিছুদিন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমি অন্য পন্থা নিলাম। একরকম জোর করেই স্বপন ও মণিকার সঙ্গে মিশতে লাগলাম। সময় ও সুযোগ পেলেই মণিকাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি। ওর মোহভঙ্গের জন্যে তূণের সবকটি শাণিত তির একে একে নির্ভুল লক্ষ্যে নিক্ষেপ করি। একদিন, দুদিন, প্রতিদিন। স্বপন দু-একবার যে সন্দেহ করেনি তা নয়। তবে মুখে কিছু বলেনি।

অনন্ত প্রচেষ্টার পুরস্কার একদিন পেলাম।

মণিকা আমার সঙ্গে বেরোতে রাজি হল। এবং সেইদিনই আমি ওর কাছে আমার উৎকর্ষ অতি সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করলাম। ওকে বোঝালাম, একজন মেকানিকের ভবিষ্যৎ মেকানিকের বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া, রেডিয়োর প্রতি মণিকার এই আকর্ষণটা নেহাতই সাময়িক। সেটা উবে গেলে স্বপনের অস্তিত্বটুকুই কি ওর কাছে মিথ্যে হয়ে পড়বে না?

সে-রাতে বাড়ি ফেরার সময় মনে হল আমার জিত হয়েছে। আমি মণিকাকে সরল বাস্তব বোঝাতে পেরেছি। একটা আত্মপ্রসাদের ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন ভাবিনি, এক আকস্মিক ঝড় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরদিন স্বপন আসবে আমার সঙ্গে বোঝাঁপড়া করতে।

.

চুপ করে থাকিস না! জবাব দে, বিজন! স্বপনের ভারী কণ্ঠস্বর আমাকে চমকে দিল। কাচের গ্লাসটা এখনও ওর হাতে ধরা।

পুরোনো পরাজয়ের লজ্জা ও অপমানের কথা নতুন করে আমার মনে পড়ল। সুতরাং স্বপনকে কঠিন আঘাত দেওয়ার একটা নিষ্ঠুর ইচ্ছে আমাকে হঠাৎই পেয়ে বসল। সরাসরি ওর চোখে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললাম, স্বপন, কাল আমি মণিকাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে ঘুরতে গেছি। ওকে চুমুও খেয়েছি। ও তোকে আর–।

স্বপনের হাতের মুঠোয় কাচের গ্লাসটা মটাস শব্দে ভেঙে গেল। কাচের টুকরো মিহি ঠুনঠুন শব্দে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। জল ও রক্তের মিশ্র ধারা স্বপনের হাতে, প্যান্টে, মেঝেতে। ওর মুখের সেই জেহাদি ভাবটা চুপসে গেছে।

আমি ওকে ধরতে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু ও হাতের ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিল। হাতের যন্ত্রণায় বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার

দিকে। তারপর ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। গড়াতে লাগল গাল বেয়ে। ওর দেহটা কেঁপে উঠল কান্নার দমকে। ভাঙা অস্পষ্ট গলায় ও বলল, বিজন, তোকে আমি দোষ দিই না। আমার কী-ই বা আছে মণিকাকে দেওয়ার মতো। তবে জানিস, এই একটিমাত্র স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে–একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছিল। আমি নিজেও সেটা বিশ্বাস করতে পারিনি। সত্যি সত্যি কি একটা স্বপ্ন আমার বন্ধ বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ে সত্যি হয়ে উঠল? কিন্তু না, বরাবরের মতোই আমি হেরে গেছি।…না, তোর কাছে নয়, নিজের কাছে। বলতে পারিস, এর পরে আমি কী নিয়ে বাঁচব? এ-ঘটনা তো আমার জীবনে দ্বিতীয়বার আর ঘটবে না!

কথাটা শেষ করেই রক্তাক্ত হাতটা মুঠো পাকিয়ে টেবিলে এক প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল স্বপন। তারপর যেমন এসেছিল তেমনই ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাতেই খবর পেলাম ও আত্মহত্যা করেছে।

আকাশবাণীর ঘরে অত্যন্ত বীভৎসভাবে আত্মহত্যা করল স্বপন। মৃতদেহ দেখে ওকে চেনার কোনও উপায় ছিল না। মণিকাকে সঙ্গে নিয়ে যখন ওর দোকানে গেলাম, তখন সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। জনতার গুঞ্জন। পুলিশ কর্ডন করেছে। স্বপনের বাড়ির লোকেরা বুকফাটা কান্নায় হাহাকার তুলছে। দোকানের কাউন্টারটা একপাশে সরানো থাকায় ভিতরের দৃশ্য বেশ স্পষ্টই নজরে পড়ছে। অসংখ্য যন্ত্রপাতির মধ্যে ত্রিভঙ্গ অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্বপনের দেহটা। পুড়ে কালো হয়ে গেছে। হাতে-পায়ে জড়ানো পোড়া কালো তারের অংশ অতি কষ্টে নজরে পড়ে।

শুনলাম, ও নাকি প্রথমে হাতে-পায়ে তার জড়িয়ে নেয়, তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের রক্তবাহী শিরাগুলো কেটে ফেলে। আর সবশেষে চারশো চল্লিশ ভোল্টের বিজলি লাইন অন্ করে দেয়। কী বীভৎস মৃত্যু!

আরও শুনলাম, দোকানের সবকটা রেডিয়ো নাকি ফুল ভলিয়ুমে চলছিল। পুলিশ অফিসাররা স্বপনের এই উদ্ভট খেয়ালের কোনও কারণ বুঝতে পারেননি। তবে ও মরার আগে নিজের হাতে স্পষ্ট চিঠি লিখে রেখে গেছে। আমার মৃত্যুর জন্যে আমি নিজেই দায়ী।

মনে আছে, স্বপনের মৃতদেহ দেখে মণিকা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

এ সবই তিন বছর আগের ঘটনা। কিন্তু আজ, একটু আগেই, আমার ও মণিকার জীবনে নতুন এক ঝড় তুলেছে স্বপন।

গত তিন বছরে ওর স্মৃতি বেশ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। শুধু মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে যেত ওর বীভৎস পোড়া চেহারাটার কথা। ও মারা যাওয়ার পর আকাশবাণী দোকানটাও উঠে গিয়েছিল। আমি এবং মণিকা ওকে নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি। পুলিশি তদন্ত শেষ হওয়ার পর আমরা যথারীতি বিয়ে করেছি। নতুন ফ্ল্যাট নিয়ে পুরোনো পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি আমি। আর তার এক বছর পরেই এসেছে চিকু। স্বভাবতই পরিপূর্ণ সংসারী হয়ে চিকুকে কেন্দ্র করে আমি ও মণিকা দৃঢ়তর এক বন্ধনে নতুন করে পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়েছি।

আজ রবিবার। খাওয়াদাওয়ার পর অফিসের কয়েকটা কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলাম। মণিকা রান্নাঘর গোছগাছ করতে করতে ট্রানজিস্টার রেডিয়োতে নাটক শুনছিল। চিকু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎই রান্নাঘর থেকে মণিকার একটা অস্ফুট চিৎকার শুনতে পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ফেলে আমি উঠে পড়লাম। এবং উদ্ভ্রান্ত মণিকা এসে ঘরে ঢুকল। আটপৌরে শাড়ি ওর সুঠাম শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। আঁচল কোমরে গোঁজা। ও হাঁপাচ্ছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। তিলটা সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে। আমাকে দেখেই ও সোজা এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিজন, বিজন! এইমাত্র রেডিয়োতে স্বপনের গলা শুনলাম!

আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। আমার হাতের বাঁধনে মণিকার শরীর থরথর করে কাঁপছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে অতিকষ্টে সামলে নিলাম। মনে পড়ল, স্বপন আমাকে যে-খেলা দেখাত, সে খেলা মণিকাকেও বহুবার দেখিয়েছে, হয়তো আচমকা সেই স্মৃতিই ওর মনে এসে ঝাপটা মেরেছে।

সেকথা মণিকাকে বলতেই ও বলল, না, বিজন, তা নয়। আমি স্পষ্ট শুনলাম, নাটক থেমে গিয়ে স্বপনের কথা শোনা গেল। ও বলল, মণিকা, মণিকা, আমি আবার তোমার কাছে এসেছি!

চকিতে দু-কাঁধ ধরে মণিকাকে কিছুটা দূরত্বে দাঁড় করিয়ে দিলাম। ভালো করে সব কথা শুনতে চাইলাম।

ও বলল, ওই একটা কথাই নাকি পরপর তিনবার শোনা গেছে রেডিয়োতে। কেমন যেন এক প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠস্বর। প্রথম উচ্চারণের পর ধাপে ধাপে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ও মণিকা, আমি আবার তোমার কাছে এসেছি!

মণিকাকে চিকুর কাছে যেতে বলে আমি ভাবতে বসলাম। কিন্তু রহস্যের কোনও উত্তর পেলাম না। স্বপন বক্সী মারা গেছে আজ তিন বছর। সেইসঙ্গে চিরস্তব্ধ হয়েছে তার কণ্ঠস্বর। তা হলে এই অলৌকিক আকাশবাণী প্রচারিত হয়েছে কোন প্রেতলোক থেকে? কেউ নিষ্ঠুর ঠাট্টা করছে না তো আমাদের সঙ্গে? কিন্তু কী করেই বা করবে?

সারাটা দিন দুশ্চিন্তায় কাটল। আমাদের হাসিখুশি ছুটির দিনটা ওই একটা ভয়ংকর ঘটনায় যেন হয়ে গেল কালরাত্রি। এমনকী চিকুর আধো-আধো কথাও আর হাসির হুল্লোড় তৈরি করতে পারছে না আমাদের অন্তঃস্থল থেকে।

দুপুরের পর থেকে রেডিয়োর ধারেকাছে ঘেঁষল না মণিকা। শেষ পর্যন্ত রাতে খাওয়ার সময় আমিই সাহস করে রেডিয়ো চালালাম। হিন্দি গান হচ্ছে। চিকু ঘুমিয়ে পড়েছে। মণিকা ওর কথাগুলো ভাঁজ করে বিছানায় মাথার কাছে রাখছে। এমন সময় স্বপন দ্বিতীয়বার কথা বলে উঠল।

বিজন, তুই মণিকাকে কেড়ে নিলি! কেড়ে নিলি!

এই একটা প্রশ্ন আমাকে একেবারে কুঁকড়ে দিল। প্রশ্নটা একটানা ক্রমাগত বেজে চলেছে। তার ছমছমে প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে চার দেওয়ালের মধ্যে। যেন বিশাল কোনও খাদের অতল গহ্বর থেকে এই প্রশ্ন আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিচ্ছে স্বপন।

আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মণিকা বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সংবিৎ ফিরে পেয়েই রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলাম। বুঝতে পারছি, স্বপনের মৃত্যুর ভয়াল স্মৃতি কালো ছায়া ফেলেছে আমাদের জীবনে।

দিনের পর দিন এই একই নাটক চলতে লাগল।

এই অলৌকিক ঘটনার কথা কাউকে বলতে পারি না। বলা যায় না। শুধু দুজনে মুখ বুজে সহ্য করি। তা ছাড়া আমার শিক্ষিত যুক্তিবাদী মন এইসব ঘটনা মেনে নিতেও চায় না। আবার আমি স্বপনের কাছে হেরে যাব!

যতই দিন যায় লক্ষ করি মণিকা ক্রমেই নিজেকে গুটিয়ে ফেলছে। বুঝতে পারি, যে-সময়টা আমি বাড়িতে থাকি না, ও প্রাণভরে রেডিয়ো শোনে। শোনে সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর। সম্ভবত মণিকা বুঝতে পারে, তিন বছর আগে স্বপনকে ও ঠকিয়েছিল। সেই কারণেই নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে দিনরাত ও স্বপনের অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে চায়। নিজের অপরাধবোধে ক্রমে ক্রমে ও ডুবতে চলেছে।

একদিন বাড়িতে ফিরে শুনলাম রেডিয়োতে প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠস্বর বাজছে? ... আমি এতদিন অপেক্ষা করেছি, মণিকা। চেয়েছি, সংসারের চরম সুখ বলতে কী সেটা তুমি আগে বোঝো। এখন তুমি সেই চরম সুখের খোঁজ পেয়েছ। ছেলের আধো-আধো কথা, স্বামীর আদর, নিজের তৃপ্তি। মণিকা, এখন তুমি বুঝতে পারবে, আমার কাছ থেকে তুমি কী জিনিস কেড়ে নিয়েছ! আর বিজন, বিজন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

আমি ঘরে ঢুকতেই মণিকা রেডিয়ো বন্ধ করে দিল। তারপর আমার বুকে মুখ রেখে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। একটা যন্ত্রণা আমার কণ্ঠনালীতে জমাট বেঁধে ওঠানামা করছে। মণিকার এই কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না।

আর একদিন স্বপন যখন আমাকে লক্ষ্য করে নানান অভিযোগ করছিল, আমি হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছি, স্বপন, তুই কী চাস?

রেডিয়োতে শোনা ওর কণ্ঠস্বরকে উদ্দেশ্য করে আমি এই প্রথম কথা বললাম। এবং ওর জবাব পেলাম সঙ্গে-সঙ্গেই। যেন ও আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে তীব্র গলায় ও বলে উঠল, জানিস না, শালা? মণিকাকে, মণিকাকে আমার চাই।

তাকিয়ে দেখি মণিকার মুখ রক্তহীন, দুধের সরের মতো সাদা।

সেই মুহূর্তে আমি বুঝেছিলাম, স্বপনের কাছে হয়তো আমাকে হারতেই হবে।

পরদিন সারা সকাল মণিকা খুশিতে একেবারে মেতে উঠল। চিকুকে নিয়ে দুরন্তপনার চূড়ান্ত করল। আমি অবাক হলেও ভীষণ খুশি হলাম। ওর মন থেকে পাষাণের ভারী টুকরোটা বোধহয় গলে বেরিয়ে আসছে বাইরে। অফিসে বেরোনোর মুহূর্তে হঠাৎই আমাকে জাপটে ধরে দুবার চুমু খেল। হাসল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে কেমন ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না, কিছু না। শুধু তুমি খুব ভালো হয়ে থেকো।

দুপুর দুটো নাগাদ অফিসে ফোন পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এলাম বাড়িতে। মানুষজনের ভিড় ঠেলে শোওৰার ঘরে এলাম। সিলিং পাখার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়েছে মণিকা। চিকুকে প্রতিবেশীদের কেউ কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখনও থানায় খবর দেওয়া হয়নি। ঘরে রেডিয়ো চলছে। তাতে একটা বাংলা নাটক শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎই এক প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠস্বর ভেসে এল রেডিয়ো থেকে : কী রে শালা, এসেছিস! তোর বাক্স থেকে একটা স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে গেলাম রে!

উপস্থিত কেউই সেকথার তাৎপর্য বুঝল না। ভাবল রেডিয়ো-নাটকেরই কোনও অংশ। কিন্তু, হে ঈশ্বর, আমি তো জানি!

দু-হাতে মুখ ঢেকে আমি বসে পড়েছি মেঝের ওপর। জীবনে এই প্রথম কান্নার ঢেউ আমাকে বিপর্যস্ত, অসহায় করে দিল।

# সাবধান! সাপ আছে (১)

**সাবধান! সাপ আছে (১)**

চোখ বুজে ঘুরে দাঁড়াও, বিশ্বাস, অনন্ত কর মিঠে সুরে বললেন। সুতরাং আমি চোখ বুজলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম, অনেকটা ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো। শুনলাম, অনন্ত কর সিন্দুক খোলার কম্বিনেশান ডায়াল ঘোরাচ্ছেন।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

ডানদিকে ষোলো ঘর। মনে-মনে হিসেব করলাম।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

বাঁদিকে এগারো ঘর। শয়তানি হাসি হাসলাম।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

ডানদিকে ছাব্বিশ, জোরে বলে উঠলাম আমি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত অনন্ত কর কানে কম শোনেন।

ঠিক আছে, বিশ্বাস বললেন অনন্ত কর, এবার ফিরে দাঁড়াতে পারো।

ফিরে দাঁড়ালাম। লুব্ধ চোখে দেখলাম দশ আর একশোর নোটের বান্ডিলগুলো : দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। আমার শোওয়ার ঘরের তাকে রাখা তাসের প্যাকেটের মতো সুবোধ শিশু হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে বান্ডিলগুলো।

অনন্ত কর আরও একটা একশোর বান্ডিল সযত্নে আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ করলেন।

দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার।

জলতরঙ্গের শব্দ করে সিন্দুকের ভারী দরজাটা বন্ধ করলেন তিনি।

আজকের মতো কাজ শেষ, অনন্ত বললেন, সাড়ে পাঁচটা বাজে। তুমি এবার যেতে পারো। আমাকে আরও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হবে।

আচ্ছা, স্যার, বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকালাম সিন্দুকটার দিকে যেন একটা কালো কোলাব্যাঙ বসে আছে। আর অনন্ত কর–তিনিও কোলাব্যাঙ, তবে সাদা–সোজা হয়ে দাঁড়ালেন নিজের পায়ে। লোকটা সত্যিই দয়ালু, যাকে দেখলে আমার ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে যায়। তা না হলে হয়তো সেই মুহূর্তেই তাঁর দয়ালু মস্তকে এক ঘা বসিয়ে, সিন্দুকের ডায়াল নম্বর অনুযায়ী (আমার জন্ম তারিখের চেয়েও যেটা আমার বেশি মুখস্থ) ঘুরিয়ে নোটের বান্ডিলগুলো আমার টেবিলের ড্রয়ারে লুকোনো পলিথিনের ব্যাগে ভরে (দীর্ঘ কয়েক বছরের চাকরিজীবনে তেতাল্লিশটা ব্যাগ আমি জমিয়ে ফেলেছি টিফিন নিয়ে আসায় অছিলায়–) সোজা রাস্তায় নেমে চম্পট দিতাম। লোকে ভাবত জনৈক নিরপরাধ, নিরীহ, কলিকাতাবাসী কৈকেয়ী-ঘরনির আদেশে ক্রয়কর্ম সমাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। অহো, উহার প্রতি আমাদিগের সমবেদনা রহিল। সুতরাং কাজ শেষ।

কিন্তু সেটা ছিল আমার প্ল্যান নাম্বার ওয়ান। কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানিতে মাসখানেক কেরানি হিসেবে কাজ করার পর ওই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার মন রুখে দাঁড়িয়েছে। এত অবুদ্ধিমানের মতো এ কাজ করাটা সুবিবেচনার পরিচয় নয়। অনন্ত করের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে পরিকল্পনাটা আরও একবার নাকচ করলাম।

কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানির অফিস বলতে একটা এল প্যাটার্নের ঘর, তার সবেধন নীলমণি একটি মাত্র দরজা, কোনও জানলা নেই। অনন্ত করের টেবিল এবং সিন্দুকটা এল-এর ক্ষুদ্রতর বাহুতে অবস্থিত, এবং এল-আকৃতির জন্যে আমার টেবিল থেকে অদৃশ্যমান। আর এল-এর দীর্ঘতর বাহুর প্রথম বাসিন্দা মিসেস রাও, আমাদের দু-হাজার বছরের পুরোনো স্টেনোগ্রাফার, এবং দ্বিতীয় বাসিন্দা আমি। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা আমার চতুষ্কোণ বাসস্থান, তারপর দুটি সোফা অতিথিদের জন্যে। অবশেষে সবশেষে, দরজা। এ ছাড়াও কয়েকটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা জল-শীতল যন্ত্র, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র,

টেলিফোন, কিবোর্ড ইত্যাদি নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং সেই কারণেই অফিসের যে ষাট-সত্তরটা ম্যাপ আমি এঁকেছি তাতে এগুলোর কোনও ছবি নেই।

এককথায় বাড়িটা যেন চুরি-ডাকাতির সুযোগ-সুবিধের দিকে লক্ষ রেখেই তৈরি করা হয়েছে–অর্থাৎ, শুধু আমার জন্যে। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সাহসী, তস্করসম্রাট শ্রীনলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের জন্যে। বেআইনি কুকাজের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী, যার সম্পর্কে সারা পৃথিবী একসুরে বলবে, লোকটা জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারত। কিন্তু কেউ জানবে না সে হল কলকাতার অন্যতম স্নেহাস্পদ বাসিন্দা নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস।

এ পর্যন্ত আমি শুধু ম্যাপ এঁকে এবং তেতাল্লিশটা ব্যাগ জোগাড় করেই ক্ষান্ত হয়েছি। আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রয়োগে সিন্দুকের কম্বিনেশান নম্বরটাও জেনেছি (একবার, আমার কানের হিসেব নির্ভুল কি না পরীক্ষা করতে, আমি চোখ খুলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন স্পষ্টই অনন্ত করকে কম্বিনেশান ঘোরাতে দেখেছি। বলাই বাহুল্য আমার চক্ষু এবং কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়েছে)। অনন্ত করই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই কম্বিনেশান নম্বর জানেন। সুতরাং, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, সিন্দুক লুঠ হওয়ার পর তিনি যেন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন।

অনেক ভাবনাচিন্তার পর কতকগুলো পন্থা আমাকে বর্জন করতে হয়েছে। যেমন, অনন্ত করকে খুন অথবা আঘাত করতে আমি পারব না। তার প্রধান কারণ, আমার মানবিকতা বোধ এবং দয়া এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আর দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী হলেও অনন্ত করকে খুন, অথবা খুনের কাছাকাছি কিছু না করে কীভাবে তাঁর উপস্থিতিতে সিন্দুক খালি করব তা আমি ভেবে পাইনি। ফলে শাস্তি এড়ানোর আশা তখন হয়ে পড়বে দুরাশা। অবশ্য এমন একটা ওষুধ আছে যেটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে চিরকালের মতো স্মৃতিভ্রংশ দেখা দেয়। বাথরুমে বসে সেই ওষুধ নিয়ে কত পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি। কিন্তু সেই সব ধারাবাহিক পরীক্ষার শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ওষুধটার ওপর তেমন ভরসা করা যায় না। আমার কুকুর জিমিকে সেই ওষুধ খানিকটা ইনজেক্ট করে দিয়েছিলাম। ফলে মাত্র ঘণ্টাকয়েক বেচারা লেজ নাড়তে পারেনি। সুতরাং পাকানো বুড়ো করের ওপর সেই ওষুধের প্রভাব (আদৌ যদি কিছু হয়) সহজেই অনুমেয়। অতএব টাকা লুঠ করতে হবে সম্পূর্ণ গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে। একবার যদি অফিস-বাড়িতে একা ঢুকতে পারি, তা হলে সিন্দুক খুলে টাকাগুলো

পলিথিনের ব্যাগে ভরে নেওয়া একমিনিটের কাজ। অবশ্য এখনও অফিসে লুকিয়ে বসে থাকা যায়, কিন্তু তাতে।

যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না, অনন্ত ডেকে বললেন।

অফিস থেকে আর বেরোতে পারব না, কারণ অফিসের দরজাটা ইস্পাতের তৈরি, এমনি বন্ধ করলেই সেটায় তালা লেগে যায়, আর সে-তালার একমাত্র চাবি শুধু করের কাছে।

অবশ্য মোম দিয়ে তালার ছাপ তুলে নকল চাবি বানিয়ে নেওয়া তেমন একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তাতে লুকোনো বিপদঘন্টির তো সুরাহা হবে না। প্রতি রাতে অফিস ছেড়ে বেরোবার সময় মিস্টার কর বিপদঘণ্টিটা চালু করে দিয়ে যান। এরপর যে-ই অফিসের দরজা খুলুক না কেন ওটা ভয়ংকর শব্দ করে বেজে ওঠে। রোজ সকাল দশটায় অফিসের দরজায় এসে মিস্টার কর তিনপ্রস্থ চাবি দিয়ে বিপদঘণ্টিকে অকেজো করেন–অবশ্য অকেজো হওয়ার আগে ওটা তারস্বরে মিনিটপাঁচেক ধরে চেঁচিয়ে (?) রাস্তার লোক জড়ো করে ফ্যালে।

আমার বাড়ি অফিস থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ঘণ্টির চিল-চিৎকার আমিও শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি আবারও আমার অফিসে দেরি হতে চলেছে। ঘণ্টি এভাবে বেজে ওঠার আগে যদি ওটাকে অকেজো করা হয়, তা হলে অফিসের বন্ধ দরজা আর কোনওদিনই খুলবে না।

এই সব ধুরন্ধর মারপ্যাঁচ আমার কাছে, তস্করসম্রাট নলিনী বিশ্বাসের কাছে, এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত গ্রীষ্মটা এই সমস্যা সমাধানের চিন্তাতেই কেটে গেছে। কিন্তু এখন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময়, ঝরাপাতা বৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় বয়ে যাওয়া সময়ের কথা।

মিস্টার করের কাছ থেকে হতাশ মনে বিদায় নিয়ে দরজা বন্ধ করে অফিস থেকে বেরোলাম। শুনতে পেলাম দরজা লক হয়ে যাওয়ার ক্লিক শব্দ। নেমে এলাম রাস্তায়। জনতার ভিড়ে আমি তখন এক অতি-সাধারণ নাগরিক।

অফিস-বাড়ির (লোহা ও কংক্রিট) এক প্রান্তে চিঠি ফেলার গর্ত (সিমেন্টে বসানো ইস্পাতের বাক্স)। গর্তটা ছইঞ্চি চওড়া, মাটি থেকে সাড়ে তিন ফুট ওপরে। সুতরাং একচোখে উঁকি মারার পক্ষে উপযুক্ত। বহু অন্ধকার রাতে একচোখে

অন্ধকার অফিসে উঁকি মেরে নানানরকম মতলব ভেঁজে সময় নষ্ট করেছিলাভ হয়নি। এখন গর্তের লোহার ঢাকনাটা তুলে আর-একবার উঁকি মারলাম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অপরাধের অকুস্থলে। অনন্ত করের টেবিলের আলোয় অফিসটা হালকাভাবে আলোকিত। চুরির পরদিন সকালে পুলিশ এবং সন্ত্রাসিত জনতা যেভাবে বিস্ময় অধ্যুষিত চোখে ঘরটা দেখবে, সেভাবে এখন ওটা দেখতে চেষ্টা করলাম; কোনও ড্রয়ারের হাতলে আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নেই, একটা আলপিন পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয়নি। কীভাবে কোনওরকম স্বাক্ষর না-রেখে তস্করচূড়ামণি ভেতরে ঢুকেছে এবং বেরিয়ে এসেছে, সে কথা ভেবে ওরা কূল পাবে না। অবশ্য এখন, আমার অবস্থাও ওদেরই মতো।

ঢাকনাটা আস্তে নামিয়ে রেখে পা চালালাম। আমার বাতিল করা দু-নম্বর প্ল্যান ছিল অফিস বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্যে কোনও উঁদে চোরের সাহায্য নেওয়া– যদিও তাতে নিজের তরফে ভয়ের ব্যাপার কিছুটা ছিল। প্ল্যানের বুদ্ধি জুগিয়েছি বলে লুঠের সিংহভাগ আমারই নেওয়া উচিত। হয়তো তাই নেব। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার কিংবা গণ্ডগোলটা সেই নির্বোধ দুদে চোরকে নিয়ে। এমনও হতে পারে, সে হয়তো অন্য কোনও স্থূলবুদ্ধির কাজে ফেঁসে গিয়ে ধরা পড়ল, আর চট করে পুলিশে আমার নামটা বলে দিল; এ ছাড়া নিজের ভাবে সন্তুষ্ট না-হলে সে হয়তো আমাকে পরে ব্ল্যাকমেলও করতে পারে; কিংবা পাতি চোর-ছ্যাচোড়রা যেরকম বদমাইশ আর অকৃতজ্ঞ হয়, সেরকমটা হলে সে চুরির সময়েই আমাকে খুন করতে পারে।

এ ছাড়া আরও একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে দাগি চোরদের সঙ্গে মেলামেশা করলে চট করে পুলিশের নজরে পড়বার ভয় থাকে। আমি সাধারণ চোর-ডাকাতদের থেকে আলাদা।

রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে দেখতে পাই ঝকঝকে লাল জাগুয়ারে আমি বসে আছি। আমার ডানহাতের কবজিতে ওমেগার লেটেস্ট মডেল জ্বলজ্বল করছে। আমার ঘরের দেওয়ালে একশো ওয়াট আউটপুটের স্টিরিও সিস্টেম। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। রেফ্রিজারেটর। টিভি। আরও কত কী!

দু-লাখ পঞ্চাশ হাজারে দুনিয়া কেনা যায়।

তখন এই অকিঞ্চিৎকর নলিনী বিশ্বাস টেরিউলের স্যুট পরে সকিঞ্চিৎকর নলিনী বিশ্বাস হয়ে যাবে। নারীজাতির প্রতি তার এতদিনকার অবহেলাজনিত

দোষ সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠবে। এবং তাদের সীমাহীন প্রশ্রয় দেবে বলে সেই মুহূর্ত থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে নিজের কাছে। জেগে উঠবে নলিনীরঞ্জন রমণীমোহন বিশ্বাস।

লুঠের অবশিষ্ট যাবে বিভিন্ন অর্থকরী উদ্যোগের বিনিয়োগ ও লগ্নি হিসেবে। এভাবে আমার টাকা কয়েকবছরেই ফুলে-ফেঁপে উঠবে। হয়তো কুড়ি বছর পরে বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে দু-লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গুনে-গুনে আমি ফেরত পাঠাব অনন্ত করকে। সঙ্গে থাকবে রহস্যময় এক চিঠি। অথবা আমার মনের দয়ালু অংশটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি তৈরি করে দেব অবৈতনিক স্কুল, হাসপাতাল, কিংবা বিশ্বাস ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি।

এসব ভাবনায় কোনও ফাঁক নেই, শুধু একটা জিনিস ছাড়া : যদি কোনও মতলব মাথা থেকে বের করতে হয় তবে তা আজ রাতেই করতে হবে। কারণ, আজ শুক্রবার। কাল সেকেন্ড স্যাটারডে। অতএব শনি-রবি কোম্পানি বন্ধ। আর সোমবার থেকেই শুরু হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ লগ্নির ধারাবাহিক কর্মসূচি। অর্থাৎ, সেদিন থেকে আমার রেফ্রিজারেটর, টিভি, স্টিরিও ইত্যাদির টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিতরণ করা হবে রাজ্যের অভাবী ব্যবসায়ীদের।

সুতরাং এই আড়াই লাখ নিয়ে উধাও হওয়ার আজই শেষ সুযোগ। মিস্টার কর এখনও ঘণ্টাখানেক অফিসে থাকবেন, এবং তারপর অল্পসময়ের জন্যে হলেও অফিস-বাড়িটাকে দখলে পাওয়া যাবে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা না করে এ-সুযোগ আমি ছাড়ছি না।

সুতরাং পায়চারি করতে করতে ঢুকে পড়লাম বুক কর্নার দোকানটায়।

দোকানের মালিক মোহন সরকার।

রহস্য-গোয়েন্দাকাহিনির নেশা আমার বহুকালের। এবং সেই সূত্রেই মোহন সরকারের দোকানে আমার যাতায়াত এবং ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব। বই কিনি আর না কিনি, ঘেঁটে দেখতে আমার ভালো লাগে। আর সেই সুযোগে সন্ধান করি নতুন কোনও রহস্য গল্পের, যেটাকে বাস্তব চেহারা দেওয়া যায়। অর্থাৎ কেতাবি অপরাধে আমার বিরাট আস্থা আছে।

মোহনের বইয়ের দোকানে ঢুকে ম্যাগাজিনের র‍্যাকের কাছে এগিয়ে গেলাম। মোহন কয়েকটা অল্পবয়েসি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল সম্ভবত বই কেনা-বেচার ব্যাপারেই। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল। আমি নতুন রহস্য-গোয়েন্দাজাতীয় পত্রিকাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম।

একটু পরে মোহন আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

কী দেখছিস?

আমি ঠোঁট উলটে কাঁধ কঁকিয়ে এই, কিছু না গোছের একটা ভঙ্গি করলাম। তারপর ওকে বললাম, একগ্লাস জল খাওয়া তো।

একটু পরেই ও একগ্লাস জল নিয়ে এল। বলল, কিনবি-টিনবি না, ফালতু ঘাঁটাঘাঁটি করিস না। বই লাট হয়ে গেলে খদ্দের নিতে চায় না।

আরে গর্দভ, ম্যাগাজিন লাট না হলে মানায় না। হেসে ওকে বললাম।

এগুলো লাট হলে তোকে লাট করে দেব।

এমন সময় দোকানে জনৈক প্রৌঢ় খদ্দের আসতেই মোহন আসছি বলে চলে গেল সেদিকে।

আমার প্রথম দিককার পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে একটা ছিল মোহনের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। অনন্ত করের অফিস থেকে বুক কর্নার বেশি দূরে নয়। অতএব, ক্ষীণ আশা ছিল যে, চিৎকার শুনে মিস্টার কর অন্তত দু-এক আঁজলা জল দিয়ে মোহনের দোকানে ছুটে আসবেন। এবং এই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অফিসের দরজা তিনি হাট করে খুলে রেখে আসবেন। তারপর...। কিন্তু এ-মতলবটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে একটা কারণে : মিস্টার কর কানে শুনতে পান না, অতএব আগুন লাগার চিৎকার-চেঁচামেচি তার কানেই ঢুকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মোহনের প্রতি ঈর্ষায় সে-মতলবটাকে কাজে লাগাতে ইচ্ছে হল। ওর ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক লাগানো নতুন কাউন্টারকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখলে আমার ভালোই লাগবে। সত্যি, অঢেল পয়সার অভাব শরীরে বড় কাটা দেয়! ভাবতে-ভাবতে তেষ্টা পেল। হাতের গ্লাস তুলে মোহনের দেওয়া জলে চুমুক দিলাম। তারপর আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলাম কাচের গ্লাসটার দিকে।

জল, মনে-মনে ভাবলাম। যদি একবার অফিসের নর্দমাগুলো বন্ধ করে জলের কলগুলো সব খুলে দেওয়া যায়? কালা হোক বা না হোক, ব্যাপারটা অনন্ত করের নজরে পড়বেই। তারপরই তিনি দৌড়োবেন কলগুলো বন্ধ করতে। কিন্তু কলের ওয়াশারগুলো আগেই আমাকে কেটে রাখতে হবে। তা হলে কর অফিসের বাইরে ছুটে যাবেন সাহায্যের আশায়। তাড়াহুড়োতে যদি তিনি দরজা খোলা রেখে যান তা হলে তো কথাই নেই। আর দরজা বন্ধ করে গেলেও ওই হইহট্টগোলে, লোকজনের ভিড়ে, আমি ঠিক কাজ হাসিল করে নেব। কিন্তু অফিসের চার-চারটে কল দিয়ে লটঘট করা, নদর্মা বন্ধ করা, এসব অত্যন্ত ঝামেলার কাজ। সুতরাং আনরিয়্যালাইজে।

মোহন সরকারের দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দে আচ্ছন্নতা কাটল। ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট। হাতে আর পঞ্চাশ মিনিট। বড় কম সময়।

আরও কুড়ি মিনিট পরে, ঘড়িতে যখন ছটা বাজল, তখন আমার দু-দুটো নতুন পরিকল্পনা বাতিল করা হয়ে গেছে। প্রথম, ওপরতলার টিভি কোম্পানির মেঝে খুঁড়ে করের অফিসে নেমে আসা। আর দ্বিতীয়টা, অফিস-বাড়ির ছাদ থেকে সটান গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে করের অফিসে হাজির হওয়া। তা হলে কোনও চাবি-টাবির আর দরকার নেই।

মোহনের দিকে ফিরে তাকালাম। ও কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী একটা বই দেখছে।

মোহন, তোকে দরজা-জানলা বন্ধ একটা ঘরে বন্দি করে রাখলে কী করে বেরোবি? বুঝতে পারলাম, নেহাতই সময় কাটাচ্ছি।

বেরোব না। বই থেকে চোখ না-তুলেই মোহন জবাব দিল।

অতএব বেরোতে আমিও পারব না।

আরও একটা মূল্যবান মিনিট নষ্ট হল। একইসঙ্গে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে লাগল চকচকে লাল জাগুয়ার, ওমেগার লেটেস্ট মডেল, একশো ওয়াট আউটপুটের স্টিরিও-সিস্টেম, কাশ্মীরি কার্পেট, রেফ্রিজারেটর, টিভি… স্পষ্ট দেখলাম, লাস্যময়ী ললনার দল আমাকে হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছে। উঠছে গিয়ে মোহন সরকারের গাড়িতে।

ওহে বিশ্বাসবাবু, তুমি বুদ্ধিমান, তস্করকুলশিরোমণি হতে পারো, কিন্তু স্বীকার করে নাও, বুড়ো অনন্ত করের কাছে তুমি হেরে গেছ।

স্বীকার করে নিয়েই আনমনাভাবে হাত বাড়ালাম ম্যাগাজিন র‍্যাকের দিকে। তুলে নিলাম নতুন এক কপি মাসিক ক্রিমিনাল। পাতা উলটেই যে-লেখাটা বেরোল সেটাই পড়তে শুরু করলাম?

বন্ধ ঘরের রহস্য
চিন্তাহরণ চাকলাদার

লালবাজারে ডি.সি সমীর চক্রবর্তী চুপচাপ চেয়ারে বসেছিলেন। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। তিনি ভাবছেন ইন্সপেক্টর যুধাজিৎ সেনের কথা। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন লালবাজারের সেই বিখ্যাত প্রতিভাধর অফিসার যুধাজিৎ সেন। নিজের কর্মদক্ষতার জন্য ডি. সি.-র কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয়। তাঁকে ঢুকতে দেখেই ডি. সি. বললেন, বোসো, সেন। তোমার কথাই ভাবছিলাম। কী অদ্ভুত যোগাযোগ বলো! একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, গত রাতে যশবীর মেহেরা নামে এক কোটিপতির ঘরে প্রায় দু-লাখ টাকা দামের একটা নেকলেস চুরি গেছে। মেহেরার বাড়ির সাদান অ্যাভিনিউ। এই নাও তাঁর বাড়ির ঠিকানা। সেনের দিকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন তিনি, এ কাজে চৌধুরি আর বোস তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে।

এইবার হাসলেন যুধাজিৎ সেন। বললেন, আমি ঠিক এটাই আশা করছিলাম, স্যার। চেয়ারে আর-একটু আরাম করে বসলেন। চোখের সানগ্লাসটা খুলে রাখলেন টেবিলের ওপরে। ডি. সি.-র স্নেহ ও প্রশ্রয়ে যুধাজিৎ সেন যেন তাঁর বন্ধু হয়ে গেছেন। চোখ নাচিয়ে তিনি বললেন কিন্তু আপনাকে আমি একথাই বলতে এসেছি যে, ঠিক দশ মিনিট আগে আমি মেহেরা নেকলেস কেস সল্ভ করে ফেলেছি। নেকলেসটা এখন পুলিশ হেফাজতে। কেস মিটলেই মিসেস মেহেরা ওটা ফেরত পেয়ে যাবেন। আর নেকলেস-চোর এখন লক-আপে বিচারের অপেক্ষায়।

আশ্চর্য। অবাক বিস্ময়ে বললেন সমীর চক্রবর্তী, কী করে ধরলে চোরকে?

বলছি! সুবিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবরের চোখে ঝিলিক মারলে খুশি। পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্নর একটা প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখলেন তিনি।

আনুষ্ঠানিকভাবে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, কেসটা বড় অদ্ভুত, আর একই সঙ্গে বড্ড কমপ্লিকেটেড। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কী বিচিত্র ঘটনাচক্রেই না চোরকে আমি গ্রেপ্তার করেছি। তখন আমি জানিই না মেহেরাদের নেকলেস চুরি গেছে। গতকাল রাত দশটা নাগাদ আমি বাড়িতেই ছিলাম। সোফায় আরাম করে বসে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। হঠাৎই শুনতে পেলাম দরজায় কড়া নড়ার শব্দ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি বেঁটেখাটো রোগা চেহারার একজন যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রথমে সে বিরক্ত করার জন্যে কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইল, তারপর জানাল যে, তার গাড়িটা আমার বাড়ির সামনে হঠাৎই বিগড়ে গেছে। কাছাকাছি কোনও মোটর গ্যারেজ নেই। আর এত রাতে লোকজনের সাহায্য পাওয়াও মুশকিল। সুতরাং আমি যদি আমার ফোনটা ব্যবহারের অনুমতি দিই তা হলে সে বাড়িতে ফোন করে একটা খবর দিতে পারে।

প্রথমটায় আমি তাকে ঠিক চিনে উঠতে পারিনি, কিন্তু তার অতিরিক্ত শৌখিন ভদ্র ব্যবহার আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। ফোন করা হয়ে গেলে আমি তাকে এগিয়ে দিলাম গাড়ি পর্যন্ত। আর তখনই মেহেরার নেকলেসটা আমার নজরে পড়ল–ওটা গাড়ির পেছনের সিটে নিরীহভাবে পড়ে ছিল। তখন নেকলেসটার ঠিকুজি কুষ্ঠি না-জানলেও এটুকু বুঝেছিলাম, ওটার দাম কম করেও আকাশছোঁয়া। সুতরাং লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চেপে ধরলাম এবং খুব সহজেই সে সবকিছু স্বীকার করে বসল। তার নাম প্রশান্ত সরখেল। অসমসাহসী এবং বুদ্ধিমান সিন্দুক-ভাঙিয়ে হিসেবে নীচু মহলে তার নাম-ডাক আছে। গত কয়েকবছরে গোটা ভারত জুড়ে যেসব আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব চুরি-ডাকাতি হয়েছে, সেসব তারই কীর্তি। তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সমস্ত রাজ্যের পুলিশ।

একেই বলে ঘটনাচক্র! সিগারেটটা টেবিলের ওপরে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ডি. সি. বললেন, তোমার তারিফ করতে হয়।

দারুণ, মনে-মনে বলে উঠলাম। তারপর পাতা ওলটালাম।

যুধাজিৎ সেন সামান্য হেসে মাথা ঝোঁকালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, ঘটনাচক্রই বটে। তবে আমার কৌতূহল হচ্ছিল কী করে সরখেল এই অসম্ভব কাজ হাসিল করল। সুতরাং সরখেলের কাছ থেকে মেহেরা ম্যানসনের ঠিকানা নিলাম। নেকলেসটা রাখলাম নিজের হেফাজতে। আর ওকে হাত-পা বেঁধে বন্দি করে রাখলাম বাড়িতে। তারপর রওনা হলাম সাদান অ্যাভিনিউর দিকে।

রাত তখন এগারোটা। কিন্তু মেহেরা ম্যানসন আলোকসজ্জা আর মণ্ডপসজ্জায় ঝলমল। শুনলাম, মিসেস মেহেরার ছোট ছেলের আজ জন্মদিন। তাই এই উৎসব। বাড়ি অতিথি অভ্যাগতে ভরপুর। চারপাশে রংচঙে ব্যস্ত মানুষজনের আনাগোনা। আমি একজন সুন্দরী তরুণীর পথ আটকে জানতে চাইলাম মিস্টার মেহেরাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে। বিশেষ দরকার। তরুণীটি জানাল, মিস্টার মেহেরা দোতলায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলের কাছে আছেন।

সুতরাং দোতলায় উঠলাম। কেউই আমাকে বাধা দিল না। উৎসব-বাড়িতে কে-ই বা কার খবর রাখে। যেমনটা হয়েছিল প্রশান্ত সরখেলের বেলায়। দোতলায় পৌঁছে খোঁজাখুঁজি করতে হল না। দেখলাম একটা ঘরের দরজায় নিওন সাইনে লেখা হ্যাপি বার্থডে এবং সেই ফুলে আলোয় সাজানো ঘর থেকে পাঁচমিশেলি হইহুল্লোড় ভেসে আসছে। সুতরাং সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

বাচ্চা-মেহেরাকে সাজিয়েগুজিয়ে একটা সুন্দর খাটে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে ঘিরে আত্মীয়-পরিজন অতিথিদের সমাবেশ। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই গুঞ্জন নীচু পরদায় নেমে এল। সকলেরই চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। আমি নীরবে পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে তুলে ধরলাম। গম্ভীর গলায় বললাম, অ্যাটেনশান প্লিজ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। মিস্টার মেহেরা কোথায়?

আমার প্রশ্নে বাচ্চাটার পাশ থেকে বছর চল্লিশের জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। চোখে চশমা, পুরুষ্টু গোঁফ। আমার সামনে এসে থামলেন তিনি ও ইয়েস?

আপনার স্ত্রীর একটা দামি নেকলেস চুরি গেছে। শান্ত স্বরে বললাম।

এ-খবরে সব্বাই নির্ঘাত চমকে গেছে। টেবিলে টোকা মারতে-মারতে ডি. সি. চক্রবর্তী বললেন।

সে আর বলতে? সিগারেটে এক সুদীর্ঘ টান দিয়ে যুধাজিৎ সেন বললেন, নেকলেসটা যে ফিরে পাওয়া গেছে সে কথা বলে ওঠবার আগেই একজন সুন্দরী মহিলা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঘরের মাঝখানে। সম্ভবত মিসেস মেহেরা। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, ঘণ্টাদুয়েক আগে নেকলেসটা সবাইকে দেখিয়ে মিসেস মেহেরা একতলার ভল্টে রেখে আসেন। এবং সেই ভল্ট পরির্শনের জন্যে তিনি অতিথিদের আহ্বান জানান। সঙ্গে-সঙ্গেই আমি অনুমান

করলাম, সরখেলও নিমন্ত্রিতদের ছদ্মবেশে সেই ভল্টে সকলের সঙ্গে ঢুকেছিল। অবশ্য এটা নেহাতই সহজ কাজ।

তারপর কী হল? মনে-মনে প্রশ্ন করে পাতা ওলটালাম।

যুধাজিৎ সেনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে উৎসুক চোখে তাকালেন ডি. সি.।

লালবাজারের তীক্ষ্ণধী অফিসার বলে চললেন, ভল্টের ভেতর একটা সিন্দুকে ছিল নেকলেসটা। তার সঙ্গে অন্যান্য গয়নাও ছিল। ভল্টের একটাই মাত্র দরজা– কোনও জানলা নেই। সেই দরজার চাবি সবসময়েই থাকে মিসেস মেহেরার কাছে। যদিও দরজার নকল চাবি তৈরি করতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তাতে উপকার হবে সামান্যই। কারণ, দরজায় লাগানো আছে একটা বিপদঘণ্টি। দরজা খুললেই সেই ঘন্টি বাজতে শুরু করে। বিপদঘন্টিটা বন্ধ করা যায় একমাত্র ভল্টের ভেতর থেকে। এবং সেটা করতে গেলেও তিনটে চাবির দরকার। এ ছাড়া, একটুও না-বাজতে যদি সেই ঘন্টি বন্ধ করা হয়, তাহলে ভল্টের দরজা আর খুলবে না– বাইরে থেকেও না, ভেতর থেকেও না।

এ যে ময়দানবের দুর্গ! অবাক হয়ে বললেন চক্রবর্তী।

মেহেরা দানবের দুর্গ! হেসে বললেন যুধাজিৎ সেন, তবে এ-দুর্গকেও হার মানিয়েছে। প্রশান্ত সরখেল। আমার অনুমান, অন্য সব অতিথির সঙ্গে সে ভল্টে ঢোকে, এবং মিসেস মেহেরার অলক্ষ্যে সিন্দুকের পেছনে লুকিয়ে থাকে। অন্যান্য অতিথিরা ভল্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান। সব শেষে যান মিসেস মেহরা। নেকলেসটা সিন্দুকে বন্ধ করে বিপদঘণ্টি চালু করে তিনি বাইরে থেকে ভল্টে দরজা বন্ধ করে দেন। আমরা জানি প্রশান্ত সরখেল পাকা সিন্দুকবাজ। সুতরাং, সিন্দুক খুলে নেকলেস হাতানো তার কাছে নিতান্তই ছেলেখেলা। কিন্তু ওই বন্ধ ভল্ট থেকে বিপদঘন্টি না-বাজিয়ে সে বেরোল কেমন করে?

যুধাজিৎ সেন সিগারেটের শেষ টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেটটা রাখলেন পকেটে। তারপর টেবিলে রাখা সানগ্লাসটার গায়ে আঁচড় কাটতে লাগলেন। সানগ্লাসের দিকে নজর স্থির রেখেই তিনি বললেন, কেমন করে সরখেল বেরোল সে-কথা জানার জন্যে আমি মিসেস মেহেরাকে

বললাম আমাকে সেই ভল্টে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে। শান্তস্বরে কথা শেষ করলেন যুধাজিৎ সেন।

শাবাশ! বললেন ডি. সি., তোমার তুলনা নেই, সেন। কিন্তু তুমি বেরোলে কেমন করে?

যুধাজিৎ সেন চোখ তুলে তাকালেন। মুখে ধূর্ত হাসি। বললেন, ভেবেই দেখুন না।

দরজা ড্রিল দিয়ে ফুটো করে? সমীর চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন।

উঁহু। মনে রাখবেন, সরখেল ঠিক যে-কায়দায় ওই ঘর থেকে বেরিয়েছে আমাকেও ওই একই কায়দায় বেরোতে হয়েছে। আর, একটা গোটা ড্রিল সঙ্গে করে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া ভল্টের মধ্যে কোনওরকম খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন আমার নজরে পড়েনি।

তা হলে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কেউ তোমাকে বেরোতে হেল্প করেছে। সমীর চক্রবর্তী তাঁর দ্বিতীয় অনুমান উচ্চারণ করলেন।

না।

ফলস দেওয়াল?

উহু

লুকোনো দরজা?

তা-ও নয়।

দে, বইটা দে। হঠাৎ পেছন থেকে মোহনের গলা শুনতে পেলাম–শুনে চমকে উঠলাম।

দাঁড়া, আর-একটু।

কিন্তু তার আগেই মোহন লোমশ হাত বাড়িয়ে বইটা ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে।

যা, কাট। বললাম শালা বইগুলো লাট হয়ে যাবে, তাও–।

এই, মোহন প্লিজ। শুধু ওই গল্পটা শেষ করতে দে।

হ্যাঁ, শেষ করতে দিই, আর পাতা উলটে দেখবি গল্পটার শেষে ক্রমশ লেখা আছে। ব্যস, তখন যে কমাস ওই গল্পটা শেষ না হবে, সে কমাস তুমি আমাকে জ্বালাতে আসবে।

ভগবানকে ডাকলাম, যেন মোহনের ধারণা ভুল হয়। বন্ধ ঘরের রহস্য যেন এই সংখ্যাতেই শেষ হয়। কিন্তু অতীতে মাসিক ক্রিমিনাল যে এরকম করেনি তা নয়। যুধাজিৎ সেন ও সমীর চক্রবর্তীকে মাসের পর মাস একই কাহিনি নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাদের খাওয়া নেই দাওয়া নেই, শুধু সিগারেটের পর সিগারেট উড়িয়ে মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত টেবিলে বসে একটাই রহস্যের সমাধান করে গেছেন। জানি না, অনেক পাঠক হয়তো এই মাসিক উৎকণ্ঠা পছন্দ করেন, কিন্তু আমি করি না। আমি ঝাড়াঝাপটা রহস্য পছন্দ করি। গল্পের রহস্যের কায়দা ও চালাকি মেশানো সমাধান আমার মোটেই ভালো লাগে না।

কিন্তু সে কথা বোঝানোর প্রয়োজন দেখলাম না। শুধু বললাম, শোন, মোহন, ওই গল্পটা যদি এই সংখ্যাতেই শেষ হয়ে থাকে তা হলে ম্যাগাজিনটা আমি কিনব।

কিনবি? তুই? ওর চোখ-মুখে হালকা বিস্ময়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ছটা পনেরো।

বল, রাজি? অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ঠিক আছে। নিমরাজি হয়ে মোহন বলল, তবে আমি দেখব গল্পটার শেষ আছে কি না। তোর কথায় আমি বিশ্বাস করি না।

অপমানটা গায়ে না-মেখে বললাম, আয়, দুজনে মিলেই দেখি।

দেখলাম।

দুজনে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে পাতা উলটে চললাম।

দু-পাতা পরেই গল্পটা শেষ হয়েছে। (যুধাজিৎ সেনকে তা হলে বেশি কষ্ট করতে হয়নি)। দেখলাম, গল্পের নীচে লম্বা ড্যাশ-অর্থাৎ, গল্প শেষ। একই সঙ্গে শেষ দুটো লাইনে চোখ বুলিয়ে নেওয়া লোভ সামলাতে পারলাম না।

ও, তা হলে এই ব্যাপার, বললেন সমীর চক্রবর্তী, শাবাশ, সেন। তোমার জবাব নেই!

মোহন ডানহাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিল–দামের জন্যে।

এই নে– পকেট থেকে পুরোপুরি তিনটে টাকা বের করে ওর হাতে দিলাম। বললাম, কমিশন চাই না। বাড়তি পয়সাটা তোর বই লাট করার ফাইন হিসেবে রেখে দে।

দেওয়াল ঘড়িতে ছটা সতেরো।

আজকের দিনটা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। হেসে বলল মোহন, কারণ, তুই পুরো দাম দিয়ে আমার দোকান থেকে ম্যাগাজিন কিনেছিস।

আমি চট করে ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু ও আরও তৎপর। ঝটিতি ওটা লুকিয়ে ফেলল পেছনে। হাসল দাঁত বের করে– অনেকটা বাঁদরের মতো। ডারউইন হাজির থাকলে এই মুহূর্তে মোহন সরকারকে মিসিং লিংক ভেবে তুলে নিয়ে যেতেন।

ম্যাগাজিনটা তোর ভীষণ দরকার, নারে?

জানিস তো রহস্য গল্প আমার ভালো লাগে।

তাই নাকি? দেখি তো এই বন্ধ ঘরের রহস্যতে কী এমন আছে। তোর ইন্টারেস্ট দেখে মনে হচ্ছে এ-গল্পের নায়ক নির্ঘাত ছুঁড়ি নিয়ে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিয়েছে।

না রে। ওকে বললাম, বিস্ময়কর প্রতিভা যুধাজিৎ সেন শুধু রহস্যই ভালোবাসে, অন্য কিছু নয়।

তা সত্ত্বেও মোহন গল্পটা উলটেপালটে দেখতে শুরু করল। আমি কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছেড়ে র‍্যাকের দিকে ফিরলাম। পয়সা যখন দিয়েছি, তখন দ্বিতীয় এককপি

মাসিক ক্রিমিনাল পড়বার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাকে দ্বিতীয় কোনও কপি দেখলাম না। কলকাতায় মাসিক ক্রিমিনাল ভক্তদের সংখ্যা অস্বাভাবিক। হয়তো মোহন সরকারের হাতের কপিটাই এ-শহরের শেষ কপি। হয়তো পৃথিবীরও শেষ কপি।

ঘড়িতে ছটা কুড়ি।

সুতরাং আবার কাড়াকাড়ি অধ্যায় শুরু করলাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিচ্ছি। মোহন বলল, তবে তুই যা চাইছিস, ফষ্টিনষ্টি, সেসব এ-গল্পে নেই। দাঁড়া, ম্যাগাজিনটা প্যাক করে দিই।

না, না, ওসবের দরকার নেই। আমি গল্পটা পড়তে-পড়তে যাব।

আজ বড় পবিত্র দিন। হেসে বলল মোহন। আমার ডারউইনের কথা আবার মনে পড়ল। তারপর ও তুই আমার দোকান থেকে প্রথম বই কিনলি, সুতরাং এ-বই আমি জন্মদিনের রঙিন মোড়কে না-মুড়ে ছাড়ছি না।

দোকানে অন্য খদ্দের নেই। সুতরাং মোহনের সব নজর এখন আমারই দিকে। বইটা হাতে করে ও অদৃশ্য হয়ে গেল কাউন্টারের পেছনে। আমার উৎকণ্ঠিত চোখের সামনে ঘড়িতে সময় বয়ে যায় ও ছটা বাইশ, ছটা তেইশ, ছটা চব্বিশ।

ছটা পঁচিশে আমাকে ডারউইনের কথা তৃতীয়বার মনে করিয়ে দিয়ে মোহন বেরিয়ে এল কাউন্টারের পেছন থেকে। ম্যাগাজিনটাকে গোলাপি ফুল ছাপা কাগজে মুড়ে ও সোনালি ফিতে দিয়ে বেঁধে এনেছে।

পত্রিকা কেনার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। হেসে বলল মোহন।

ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম দোকান ছেড়ে। মোড়কটা ব্যস্ত হাতে ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চললাম অফিসের দিকে। চঞ্চল বইয়ের পাতায় আমার চোখও চঞ্চল ও

দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও আমাকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন ডি. সি. চক্রবর্তী।

ভাবুন, স্যার। বললেন যুধাজিৎ সেন, আরাম করে ভাবুন। তাঁর চোখে দুষ্টুমির হাসি।

সামনের ডি. সি. এম. শোরুমের দেওয়াল-ঘড়িতে ছটা সাতাশ।

কোনও যন্ত্রপাতি সঙ্গে ছিল না বলছ? প্রশ্ন করলেন সমীর চক্রবর্তী।

আগেই তো সে কথা আপনাকে একশোবার বলা হয়েছে, বিরক্ত হয়ে ভাবলাম।

না। যুধাজিৎ সেন ঠোঁটে হাসলেন–বাচ্চা ছেলের ব্যর্থতায় অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাসি ও সাধারণ কোনও মানুষের কাছে সাধারণ যেসব জিনিস থাকে আমার কাছে তার বেশি কিছু ছিল না। মানিব্যাগ, চিরুনি আর রুমাল।

মানিব্যাগটা নিশ্চয়ই সাধারণ মানিব্যাগ নয়? ধূর্তস্বরে প্রশ্ন করলেন সমীর চক্রবর্তী।

যুধাজিৎ সেন হাসি চেপে বললেন, আপনি ভুল পথে চলেছেন, স্যার। সরখেল আর আমি শুধুমাত্র উপস্থিতবুদ্ধি ভাঙিয়ে ভল্ট থেকে বেরিয়ে এসেছি।

*

দারুণ! তুলনা নেই। মনে-মনে বললাম। ম্যাগাজিনটাকে ঢুকিয়ে নিলাম জামার ভেতর। কারণ, আমি এখন অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু অনন্ত কর ভেতরে আছেন তো?

বেল বাজালাম। কোনও উত্তর নেই।

দরজায় দমাদম ঘুষি মারলাম। উত্তর নেই।

এবার চিৎকার করে উঠলাম, মিস্টার কর, মিস্টার কর?

অরণ্যে রোদন।

রাস্তার ওপারে স্টেট ব্যাংক বিল্ডিংয়ের ঘড়িতে ছটা উনত্রিশ। বুড়ো নির্ঘাত ভেতরেই আছে, মনকে প্রবোধ দিলাম নীরবে। যদি কোনও লোক সাড়ে পাঁচটায়

বলে আমাকে এখনও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হবে, তা হলে ছটা উনত্রিশে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকারই কথা।

আরও মিনিটখানেক দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর আসল রহস্যটা মাথায় ঝিলিক মারল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, অনন্ত কর কানে শুনতে পান না। তা হলে তিনি নিশ্চয়ই ভেতরে আছেন। সাড়া দিচ্ছেন না আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন না বলে। সুতরাং নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে গেলাম চিঠি ফেলার গর্তের কাছে। উঁকি মারলাম। তার টেবিলের আলোয় রেশ অফিসের দেওয়াল থেকে ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু অফিসের এল আকৃতির জন্যে অনন্ত কর আমার নজরের আড়ালে।

মিস্টার কর! আমি চিৎকার করলাম (ছইঞ্চি চওড়া গর্তে যতখানি জোরে চিৎকার করা সম্ভব) মিস্টার কর, আমি বিশ্বাস!

বিশ্বাস? তার কণ্ঠস্বরে উদবেগ, বিস্ময়।

হ্যাঁ, স্যার আমি! ভোক্যাল কর্ডে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে উত্তর দিলাম।

সে কী? আমি তো জানি তুমি অনেকক্ষণ আগে চলে গেছ।

হ্যাঁ, চলে গেছি! এখন আমি অফিসের বাইরে, মিস্টার কর! চিঠি ফেলার গর্তের কাছে!

ও। অনন্ত করের গলায় দিশেহারা সুর, তা কী ব্যাপার, ফিরে এলে যে?

আমার ফাউন্টেন পেনটা ফেলে গেছি! চিৎকার করে বললাম।

মানসচক্ষে দেখতে পেলাম অনন্ত কর গম্ভীরভাবে বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ছেন। সৌভাগ্যবশত আমার পরিকল্পনার একটা প্রথম অংশ ছিল দিনের-পর-দিন অনন্ত করের কাছে নিজেকে গর্ভ প্রতিপন্ন করা। কবে এই ইমেজ কাজে লাগবে, সেকথা না-ভেবেই ফাইল উলটোপালটা জায়গায় রেখেছি, হিসেবে ভুল করেছি, অফিসে সুযোগ পেলেই হোঁচট খেয়ে পড়েছি, বোকার মতো মিসেস রাও এবং মিস্টার করকে প্রশ্ন করেছি, এবং নিজের টুকিটাকি জিনিস প্রায়ই ভুল করে ফেলে গেছি অফিসে। এজন্যে বারদুয়েক আমার চাকরি যেতে-যেতে বেঁচে গেছে।

কিন্তু আজ, দু-মাস পরে, আমার সেই গর্দভ-ইমেজ কাজে লাগছে। বড় আনন্দের কথা।

দাঁড়াও, নলিনী, দরজা খুলছি। মিস্টার কর চেয়ার ঠেলে (শব্দ শুনে অনুমান করলাম) উঠে দাঁড়ালেন।

আমি স্থির চোখে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। কর অফিসের বাঁক ঘুরে আমার নজরবন্দি হলেন, এবং আমিও লেটার বক্স ছেড়ে এগিয়ে গেলাম বন্ধ দরজার কাছে।

দরজাটা সামান্য খুলে তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, এই সেদিন ম্যানিব্যাগ ফেলে গিয়েছিলে, আজকে আবার পেন?

অবাক হতে যাচ্ছি, খেয়াল হল নিজের একটু আগে বলা মিথ্যে কথাটা : অফিসে পেন ফেলে গেছি।

হ্যাঁ, স্যার, সলজ্জ হাসলাম।

আজ রাতটা পেন না-হলে চলছিল না?

মানে, একজনকে চিঠি লিখতে হবে, স্যার। তাই…

অদ্ভুতভাবে হাসলেন কর, বললেন, প্রেমপত্র?

চুপ করে রইলাম। জানি না, এসব প্রশ্নরাশির মহান কারণটা কী। তবে আমার মুখে বোধহয় একটা হতাশ বোকা-বোকা ছাপ স্পষ্ট হয়েছিল। কারণ, কর হঠাৎই সদয় হয়ে বললেন, এসো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। আমাকে ভেতরে ঢুকতে জায়গা দিলেন।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের কাছে। বিভিন্ন ড্রয়ার ফাইলপত্র ঘাঁটতে শুরু করলাম। মিস্টার অনন্ত কর দরজায় দাঁড়িয়ে পেচকজাতীয় চোখে আমাকে লক্ষ করতে লাগলেন। আমার পরিকল্পনার তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল না।

কোথায় যে গেল পেনটা! উচ্চগ্রামে স্বগতোক্তি করলাম, ওটা না-পেলে আজ ভীষণ মুশকিল হবে। আরও একটা ড্রয়ারকে ব্যবচ্ছেদ করতে শুরু করলাম : পেনটা একজন আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। অকারণেই যোগ করলাম।

মিস্টার করের মুখমণ্ডলে এবার যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল অল্প আলোয় সেটাকে বিরক্তি ও করুণার মিশ্রণ বলে চিনে নিতে ভুল হল না। তিনি থপথপ করে অফিসের বাঁক ঘুরে নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে ক্লান্ত স্বরে বললেন, যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না, বিশ্বাস।

বললাম, ভুলব না এবং ড্রয়ার ইত্যাদি নিয়ে আরও মিনিটখানেক খটাখট করার পর চিৎকার করে উঠলাম, এই তো পেয়েছি! আলপিনের বাক্সের পেছনে পড়ে ছিল! গলার স্বর তুঙ্গে রেখেই বললাম, আমি চললাম, মিস্টার কর!

আচ্ছা–তার আনমনা উত্তর শোনা গেল। রেলিংটা একলাফে টপকে দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা খুলে সশব্দে আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর পা টিপেটিপে ফিরে এসে লুকিয়ে রইলাম আমার টেবিলের তলায়। জায়গাটা যেন একটা ছোট্ট গুহা, তবে সামান্য আলোর রেশ রয়েছে। সুতরাং মাসিক ক্রিমিনালটা বের করে পড়তে শুরু করলাম। ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী এখনও হালে পানি পাচ্ছেন না।

আমি হার মানলাম, সেন। ডি. সি. মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বললেন। মুখে তার এখনও কৌতূহলের ছায়া।

কী যে বলেন– হাসলেন যুধাজিৎ সেন ও আমি আর প্রশান্ত সরখেল পারলাম, সেখানে আপনি পারবেন না। বিশেষ করে আপনার এত বছরের পুলিশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। দাঁড়ান, পুরো ব্যাপারটা আর-একবার আপনাকে গুছিয়ে বলি। আপনি একটা ভল্টে বন্দি হয়ে রয়েছেন–

মিস্টার করের আলো নিভে গেল। শুনতে পেলাম তাঁর এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। আমিও শব্দহীন, যদিও জানি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্গো নাচ নাচলেও মিস্টার করের মৃত কর্ণদ্বয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হবে না। চুপিচুপি গিয়ে তার কানের কাছে আচমকা এক চিৎকার করতে ভীষণ ইচ্ছে হল। দেখতাম, বুড়ো কীরকম চমকে ওঠে। কিন্তু এখন বোকামি করার সময় নয়।

রুদ্ধশ্বাসে শুনলাম শীততাপ যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ। শুনলাম বিপদঘণ্টি চালু করার শব্দ। দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। এবং সবশেষে তালায় চাবি ঘোরানোর মিষ্টি আওয়াজ।

আরও একমিনিট ঘাড় গুঁজে টেবিলের তলায় বসে রইলাম–অতিরিক্ত সাবধানতায়। তারপর একলাফে বাইরে এলাম। কলকাতার অন্যতম ধনী নাগরিক হতে আর মাত্র দু-পৃষ্ঠা (মাসিক ক্রিমিনালের) এবং দশমিনিট বাকি।

অফিসের কোনও জানলা নেই। সুতরাং একটা আলো জ্বালতে বাধা নেই। ইচ্ছে হলে সবকটা আলোই জ্বালাতে পারি, কিন্তু সে-আলো শীততাপ যন্ত্রের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকের নজরে পড়তে পারে। এ ছাড়া প্রতিফলিত আলোকেও বিশ্বাস নেই। তার ওপর চিঠি ফেলার গর্ত তো রয়েছেই। হয়তো দেরিতে আসা কোনও দ্বিতীয় বিশ্বাস সেই গর্ত দিয়ে দেখছে এবং টাকা লুঠের মতলব ভাঁজছে। এখন অতিরিক্ত সাবধান হওয়ার সময়। আলিপুর জেল ও কলকাতার মুক্ত বাসিন্দাদের মধ্যে ফারাক শুধু এই অতিরিক্ত সাবধানতাটুকুর। সুতরাং শুধুমাত্র দেশলাই জ্বালানোর ঝুঁকি নেব ঠিক করলাম।

নিজের পকেট ও টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে স্পষ্ট বুঝলাম, সেঝুঁকিও আমাকে আর নিতে হবে না। কারণ দেশলাই কোথাও নেই। এই দুঃখের মুহূর্তে মনে পড়ল, একটা পকেট-টর্চ আমি কিনেছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র সিন্দুক লুঠ করবার তোড়জোড় শুরু করেছি। সযত্নে সংগ্রহ করেছি হিন্দি-সিনেমাজাতীয় পোশাক (কালো প্যান্ট, কালো জামা, কালো মুখোশ–তাতে শুধু চোখের কাছে দুটো ফুটো এবং কালো রবারের জুতো), যাতে কেউ আমাকে অফিস-বাড়ি থেকে বেরুতে দেখলেও আমি বলে সন্দেহ না করে। মনে পড়ছে, টর্চ লাইট ও পোশাকগুলো কিনেছিলাম নাকতলা অঞ্চল থেকে, যাতে কেউ পরে মধ্য কলকাতার অপরাধের দায়ে আমাকে শনাক্ত করতে না-পারে। এখন সেই চুরির সাজপোশাক, টর্চলাইট, সব পড়ে আছে খাটের নীচে।

আমার মতো প্রতিভাধর পুরুষও একমুহূর্তের জন্যে হতাশ হল। সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তার মাঝে শুনতে পাচ্ছি ওপরতলার টিভি কোম্পানির লটঘট কাণ্ড। কোম্পানির মালিক সুরোলিয়াকে সেক্রেটারি পামেলা হয়তো এই নিয়ে তৃতীয়বার অবৈধ সুরোলিয়া, জুনিয়ার উপহার দিতে চেষ্টা করছে। তাই বোধহয় এত গানবাজনার আওয়াজ, খিলখিল হাসির শব্দ।

সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আমার আর প্রশান্ত সরখেলের পরিস্থিতির মধ্যে আর-একটু মিল খুঁজে পেলাম। অন্ধকার ভল্টে সরখেল যখন বন্দি, তখন ওপরতলা থেকে ভেসে আসছে আত্মীয় পরিজনের হইহুল্লোড়ের শব্দ। মিসেস মেহেরা ছেলের জন্মদিন-উৎসব নিয়ে খুশির জাহাজ। আর এখানে সুরোলিয়ার ছেলের আসল জন্মমুহূর্ত স্থির করে উঠতে পামেলা চিন্তা ও হুইস্কিতে মগ্ন। বড় পবিত্র মুহূর্ত।

হঠাৎই মনে পড়ল, অফিসে এসে অনন্ত কর রোজ ধূপ জ্বালান। সিন্দুকের মাথায় রাখেন। তখন আমি কোনও কথা জিগ্যেস করতে গেলে বলেন এখন নয়, বিশ্বাস। এ বড় পবিত্র মুহূর্ত। অতএব এই অফিসে, সম্ভবত পানিকরের ড্রয়ারে, নির্ঘাত কোথাও না-কোথাও দেশলাই আছে।

চার সেকেন্ড পরেই বিশ্বাস-উপপাদ্যের সত্যতা প্রমাণিত হল। আমি বারদুয়েক পা ফেলে এগিয়ে গেলাম সিন্দুকের কাছে হাতে দেশলাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই পিছিয়ে করের টেবিলের কাছে ফিরে এলাম।

কারণ, গ্লাভস আনতে ভুলে গেছি।

কিন্তু আইনস্টাইন নলিনী বিশ্বাস এতে স্তব্ধ হওয়ার কথা নয়। নিপুণ দক্ষতায় রুমাল বের করে বাঁ-হাতে জড়িয়ে নিলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম মিসেস রাওয়ের টেবিলে। দেশলাইটা রাখলাম। তারপর টাইপ করার টিস্যু কাগজ গোটকয়েক জড়িয়ে নিলাম ডানহাতে। কাগজের কোনাগুলো গদ দিয়ে সেঁটে দিলাম হাতে। এবার দেশলাই নিয়ে সুরোলিয়ার বাজনার তালে-তালে হাজির হলাম সিন্দুকের কাছে।

ডানদিকে ষোলো। বাঁদিকে এগারো। ডানদিকে ছাব্বিশ।

ক্লিক।

হাতল ঘুরিয়ে টান মারতেই সিন্দুক খুলে গেল।

ফিরে এসে নিজের টেবিলের ড্রয়ার থেকে তেতাল্লিশটা পলিথিনের ব্যাগ করে করে নিলাম। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানির টাকার তুলনায় আমার ব্যাগের সংখ্যা বেশি। অতএব পনেরোটা ব্যাগ ফিরে গেল তার আগের জায়গায়—আমার ড্রয়ারে। এগুলো সোমবার দিন সরিয়ে ফেলব।

এবং সেইদিনই আমার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছেটা অনন্ত করের কাছে প্রকাশ করব।

মিস্টার কর, মিসেস রাও এবং কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। জানি, কলকাতার বুকে এই অভূতপূর্ব চুরির ঘটনায় আপনারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত, শোকে অভিভূত– আমারই মতো। এই দুঃসময়ে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে, এ জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি ঠিক করেছি আগামী মাসের মধ্যেই এ-কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দেব। কারণ, ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা কোর্সে সামনের মাসেই আমি ভরতি হচ্ছি (কথাটা সত্যি মিথ্যে বলে মনে হলেও)। আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি হৃদয়হীন, আমার বিবেক নেই। কিন্তু তা নয়। মিস্টার কর বরাবরই মানুষের উন্নতির চেষ্টাকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন, আশা করি আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না। এই দুঃখজনক ঘটনায় আমিও আপনাদের সঙ্গে সমব্যথী। সমবেদনার ভাষা…।

রোববার দিন বাকিটা ভেবে তৈরি করে নেব। চাকরিতে আমার তরফ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন হবে না। মিস্টার করই হয়তো কোম্পানির খরচ কমানোর জন্যে নিজে থেকেই আমাকে ছাঁটাই করে দেবেন। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেক।

টাকাগুলো ব্যাগে ভরে নেওয়ার পর সিন্দুক বন্ধ করলাম। কোম্পানির এই আর্থিক ক্ষতিতে শোক প্রকাশের জন্যে একমুহূর্ত নীরবতা পালন করলাম। মিস্টার করের পয়সা আছে। তিনি হয়তো ঠিক দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু মিসেস রাও? সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি পাওয়ার মূলধন ওঁর ফুরিয়ে এসেছে। তবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি এমন কোনও আদম-এর অভাব কলকাতায় নেই। তাকে ওঁর জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ালেই মিসেস রাও চটপট চাকরি পেয়ে যাবেন।

টাকার থলেগুলো পায়ের কাছে রেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। মিস্টার করের দেশলাই থেকে আর-একটা কাঠি জ্বালোম। তারপর এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতিটি ধাপ মুখস্থ করার জন্যে মনে-মনে তৈরি হলাম। মাসিক ক্রিমিনালটা নিয়ে বসলাম।

যুধাজিৎ সেনকে যে-অবস্থায় রেখে এসেছিলাম তিনি এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছেন। অর্থাৎ মেহেরার ভল্টের চরিত্রের পর্যালোচনার পুনরাবৃত্তি করছেন। চর্বিতচর্বণ। সুতরাং পরের প্যারায় আমার চোখ ছিটকে গেল।

সমীর চক্রবর্তী যুজিৎ সেনের প্যাকেট থেকে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, নাঃ, আমার দ্বারা হবে না, সেন। তুমিই বলো, তালাবন্ধ ভল্ট থেকে বেরোলে কী করে?

যুধাজিৎ সেন আন্তরিক হাসলেন, বললেন, ব্যাপারটা খুবই সহজ, স্যার। মানছি, দরজা খোলা অথবা বিপদঘণ্টি নিয়ে কারসাজি করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা পথ আমার হাতে ছিল। সেটা হল…।

পাতাটা সেখানেই শেষ। সুতরাং পরের পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে নজর দিলাম।

সুরজিৎ সেন হাসিমুখে দৃষ্টি মেলে দিলেন শোভনা রায়ের দিকে। বললেন, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, মিস রায়। বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

মোহন সরকার বন্ধ ঘরের রহস্যর শেষ পাতাটা নিখুঁতভাবে ছিঁড়ে নিয়েছে।

কিন্তু আমিও তাতে হার মানার পাত্র নই। মানছি, প্রথমটা একটু হতাশ হয়েছি, কিন্তু পরক্ষণেই অফিসের টেলিফোন ও আমার সাহস আমাকে আশা দিয়েছে। সত্যি, এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা শুধুমাত্র নলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের বুদ্ধিতেই সম্ভব।

প্রথমে পরিচিত বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে ফোন করলাম, যারা এ ধরনের পত্রিকা পড়ে। কেউ কেউ বাড়ি নেই, আর বাকিরা গল্পটা পড়েনি। তাদের বললাম দৌড়ে গিয়ে এককপি পত্রিকা কিনে গল্পটা পড়ে নিতে। মুখে হা বললেও আমি জানি পত্রিকা কিনতে ওরা কেউই যাবে না। তারপর একটা বইয়ের দোকানে ফোন করলাম, কিন্তু ওরা বলল টেলিফোনে গল্প পড়ে শোনানো ওদের ধর্ম নয়।

মোহনকে ফোন করলাম। আমার গলা শুনেই ও হাসল। তারপর ফোন নামিয়ে রাখল। আত্মীয়স্বজন দু-একজনকে ফোন করতেই তারা জিগ্যেস করল, আমি কোথা থেকে ফোন করছি। আমার কোনও বিপদ হয়েছে কি না। পুলিশে কি খবর দিতে হবে?

নীরবে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

এবার ক্রিমিনালটা উলটেপালটে দেখলাম। কোনও ফোন নম্বর দেওয়া নেই। দুটো নাম রয়েছে ও সহদেব সাহা ও স্বপন সাহা। যথাক্রমে প্রধান উপদেষ্টা ও সম্পাদক। ডিরেকটরিতে তাদের নামে কোনও ফোন নম্বর খুঁজে পেলাম না যে ফোন করব। চিন্তাহরণ চাকলাদারের নাম ধরে ফোন নম্বর খোঁজার কোনও চেষ্টা করলাম না। কারণ, ছদ্মনাম দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

স্বীকার করছি, একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে ফোন করলাম লালবাজারে। না, ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী বা ইন্সপেক্টর যুধাজিৎ সেনের নাম তারা কখনও শোনেনি। তবে প্রশান্ত সরখেল বলে একটা লোক বর্তমানে তাদের হাজতে আছে। সে অভিযুক্ত জালিয়াতির অপরাধে, চুরির অপরাধে নয়। এবার ধীরে-ধীরে নিজেকে শান্ত করলাম। পত্রিকার বাকি গল্পগুলো (মোহনের কৃপায় যেগুলো অটুট আছে) পড়ে শেষ করলাম। বেরোনোর ব্যাপারটা নিয়ে আমি মোটেও আর ভাবছি না। সোমবারে সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত আমার হাতে সময় আছে। তার মধ্যে ফোনে এমন কাউকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব যে ওই গল্পটা পুরোটা পড়েছে। শুধু এখন ঈশ্বরকে ডাকছি, যুধাজিৎ সেন শেষ পর্যন্ত আমাকে ধোঁকা না-দেয়। কারণ, গল্পের রহস্যের কায়দা এবং চালাকি মেশানো সমাধান আমি একটুও পছন্দ করি না।

# শেষ লেখা

**শেষ লেখা**

ঘরটা অস্বাভাবিক চুপচাপ। রাত এখন গভীর, কিন্তু গভীর রাতেও কিছু কিছু শব্দ থেকে যায়। কুকুরের চিৎকার, ছুটে যাওয়া কোনও ট্রাকের গর্জন, সিলিং-ফ্যানের শনশন, হাওয়ায় ওড়া দেওয়াল ক্যালেন্ডারের ঘষটানি।

আমার আঙুল তখন দড়িটার গেট নিয়ে ব্যস্ত, আমার চোখ একটু দূরে দাঁড়ানো ত্রস্ত মেয়েটির দিকে। বুক-কেসের সামনে শক্ত কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে। লক্ষ করছে আমার প্রতিটি নড়াচড়া। ওর সুন্দর মিষ্টি মুখটা এখন ফ্যাকাসে, সেখানে প্রাণের কোনও অভিব্যক্তি নেই। ভয় নেই, করুণা নেই, এমন কি ঘৃণাও নেই।

দড়ির ফাসটা গলায় পরে নিলাম। তারপর কাঁপা হাতে সেটা টেনে আঁট করে বসালাম। বড্ড বেশি শক্ত হয়ে গেছে। একটু টেনে আলগা করলাম ফাসটা। মনের মধ্যে নানান ভাবনার ভিড়–একে অপরকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিতে চাইছে।

কুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভয় পেয়ো না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ, বইয়ের থাকের ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি চাই না, সময় হওয়ার আগেই পায়ের নীচে ভরসাটুকু সরে যাক।

কুন্তলাকে আবার বললাম, কী কী করতে হবে সব মনে আছে তো?

এসব করার কী দরকার, রাজীব? কুন্তলার স্বর ওর মুখের মতোই ভাবলেশহীন। যেন পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি হয়ে তৈরি হওয়া শব্দ। ওর জটিল

মনের অন্দরে কী যে আঁকাবাঁকা চিন্তার খেলা চলে তার হদিস কখনও পেলাম না। কুন্তলা অন্য মেয়েদের মতো চিন্তা করে না। ও আলাদা।

না করে উপায় নেই, কুন্তলা।

সবসময় তুমি একই কথা বলো–আমার বিশ্বাস হয় না। এসব শুধু আমাকে কষ্ট দেওয়ার ফন্দি।

ছেলেমানুষী কোরো না, কুন্তলা!

একটা আবছা হাসি ওর মুখের আড়ষ্টতা নরম করল। মিষ্টি হাসি? নরম হাসি? মোনালিসা?

হঠাৎই ওর হাসি মিলিয়ে গেল। চমকে বলে উঠল, দাঁড়াও!

কেন?-আমার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে।

কে যেন আসছে।

বাইরে অন্ধকার বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা একটু ইতস্তত করল, তারপর আবার চলতে শুরু করল। আমি শুধু অপলকে ওকে লক্ষ করছি। ও কি সত্যিই হেসেছে? নাকি কল্পনা?

ওরা চলে গেছে। আমি অস্পষ্ট গলায় বললাম।

কুন্তলা যেন সে কথা শুনতেই পেল না। নিষ্প্রাণ সুরে বলল, এসব কাণ্ড করে কি সত্যিই কোনও লাভ আছে, রাজীব?

এটা ওর অন্তরের কথা কি না টের পাওয়া ভার।

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। আর-একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক। এক মুহূর্ত!

একরাশ বইয়ের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে গলায় ফঁস পরে একটা অতিরিক্ত মুহূর্ত কোন কাজে লাগে কে জানে!

ঢোঁক গিলোম। বেশ কষ্ট হল। দড়িটা কেমন করে যেন বেশি এঁটে বসেছে। ঘামে-ভেজা হাতের তালু ঘষে নিলাম প্যান্টের খসখসে কাপড়ে। একটু আগেই দড়িটা ঢিলে করে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি টাইট হয়ে গেছে। আমার মাথার ভেতরে একটা অংশ যুতসই শব্দ খুঁজে বেড়াল। তারপর শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তৈরি করতে লাগল কথা।

..তার মনটা যেন খাঁচায় বন্দি এক উদভ্রান্ত বুনো পাখি…।

না, এটা ঠিক লাগসই হল না।

..তার মন যেন বুনো হাঁসের ডানায় ভর করে…।

এটা মন্দ নয়। এটাকেই ঘষেমেজে কাল ঠিক করে নেওয়া যাবে। কাল? জীবনের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও একটা মানুষ আগামীকালের কথা ভাবে! সত্যি, স্বপ্ন দেখার কোনও শেষ নেই। এই কথাগুলোও মনে রাখতে হবে। বেশ ভালো। লেখার সময় যেন বাদ না পড়ে।

দড়িটা দেখছি ক্রমশ এঁটে বসছে। ঘামে ভিজে কি দড়ির আঁশগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে? না বোধহয়।

যাক, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই কাজটা শেষ করে ফেলাই ভালো। কারণ, একটা উপন্যাস আমাকে শেষ করতে হবে।

নাও, আমি তৈরি, কুন্তলা। আমার কথাগুলো যেন শুকনো কাঠের খটাখট শব্দ।

এক গ্লাস জলের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। তেষ্টা পেল। কিন্তু না, এখন জল চাইলে সময় নষ্ট হবে। কল্পনায় টের পেলাম, আমি এক গ্লাস ঠান্ডা জল ধীরে-ধীরে চুমুক দিয়ে খাচ্ছি।

ঢোঁক গিলল সে। গলায় এঁটে বসা মোটা দড়িটা যেন হাজার ছুঁচ ফোঁটাচ্ছে। একটা শীতল অনুভূতি গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার অস্থির পাকস্থলীতে…।

না, জল চাই না!

দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে আবার চোখ ফেরালাম। একটা দুয়ে শীতল হাসি ঠোঁটে খেলিয়ে অপেক্ষা করছে। যেন এভাবে অনন্তকাল ও অপেক্ষা করতে পারে।

আমার মন তখন ছুটন্ত ঘোড়া। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ভীষণ স্পষ্ট! কুন্তলার প্রতিটি অভিব্যক্তি, ঘরের প্রতিটি আসবাব, আমার মস্তিষ্কের কোশে-কোশে গেঁথে যাচ্ছে শিলালিপির মতো।

…ফ্রেমে বাঁধানো ছবির কাঁচে মোমবাতির শিখা থরথর করে কাঁপছে। বইয়ের তাকে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটা যেন একটা অসুস্থ ক্ষত।

আমার টেবিলে একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যে-উপন্যাস এখন লিখছি তারই পরিশ্রমের চিহ্ন। আমার মনের অন্য অংশ তখনও খুঁজে চলেছে সুন্দর শব্দ, সুন্দরতর বাক্য…।

…ঘরের একমাত্র খোলা জানলার বাইরে আকাশ অন্ধকার। সেই আঁধারের বুকে এক চিলতে চঁদ। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। ডাকছে এমন জগতে, যেখানে অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু অস্তিত্ব আছে..।

নাঃ, ঠিক হল না। উপমাগুলো বড় পুরোনো। এ চলবে না।

আরও বহু শব্দ উথলে উঠছে মনের ভেতরে। জায়গা করে নিতে চাইছে সবার আগে। জটিল স্তব্ধতা, চিত্রার্পিত প্রতীক্ষা, ইঙ্গিতের ভারে অন্তঃসত্ত্বা চতুর হাসি। সব মিলিয়ে কুন্তলা।

মনের জানলা নিশ্চিত হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলাম নিচ্ছিদ্র করে, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল দরজাটা। সঙ্গে-সঙ্গে আঁপিয়ে এল স্মৃতির স্রোত। আমার চেতনা অচেতন হল। ওর দিকে তাকালাম। ছোট্ট দেহটা দেওয়ালে মিশিয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই নিশ্চল ভঙ্গিতেও কেমন যেন একটা গতির ইশারা ফুটে বেরোচ্ছে। প্রশান্ত সাগরের অতলে অজানা অচেনা গোপন ঢেউ ফুঁসে উঠছে…।

হ্যাঁ, বরাবরই ওর মধ্যে এই গুণটা আমি লক্ষ করেছি। যখন ওকে প্রথম দেখি, সেই মুহূর্তে বুকের ভেতরে বেজে উঠেছিল কামনার দুন্দুভি। তখনই এই চরিত্র আমি চিনতে পেরেছি। ওর বহিরাবরণ সবসময়ই নির্লিপ্ত। কখনও উচ্ছ্বাস নেই,

আবার তেমন বিষণ্ণতাও নেই। যেন সব কিছুকেই মেনে নেয়। এমনকী ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও এই একই ভাব আমি টের পেয়েছি। মনের গভীরে ও কী ভাবে আমি জানি না। আজ পর্যন্ত কখনও কোনওদিন ও রেগে ওঠেনি, বিরক্ত হয়নি, ঘৃণা করেনি, কোনও আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি।

যখন বাচ্চাটা মারা যায় তখনও নয়।

দুঃখ নিশ্চয়ই ও পেয়েছিল। ওর জুলজুলে চোখে আকস্মিক আঘাতের ছায়া পড়েছিল কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু আমার সংশয় তবু থেকে গেছে। তারপর থেকে কেমন অদ্ভুতভাবে ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

প্রথমে ভেবেছি, ও পম্পির মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করে।

আমার শেষ উপন্যাসের প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে সেদিন একেবারে মগ্ন ছিলাম। কুন্তলা কেনাকাটা করতে কোথায় যেন বেরিয়েছিল। যাওয়ার আগে বারবার করে বলে গিয়েছিল, মাঝে-মাঝে যেন উঠে আমি বাচ্চাটার খাটের দিকে নজর দিই। কিন্তু লিখতে বসে একবারও উঠতে পারিনি। যখন লিলি আর অমিতাভর দৃশ্যটা নিয়ে মেতে আছি, তখনই ঘটেছিল সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। খুব অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে...। কিন্তু একজন প্রকৃত শিল্পী যখন সৃষ্টির নেশায় মগ্ন তখন পার্থিব জগতে কী ঘটল না ঘটল তার জন্যে কি তাকে দোষ দেওয়া চলে! আর-কেউ না বুঝলেও কুন্তলা সেটা বুঝেছিল। আর সমালোচকরা আমার উপন্যাসের সেই দৃশ্যটাকে মহৎ, চিরায়ত ইত্যাদি বিশেষণে প্রশংসা করেছিলেন।

কয়েকদিন মনমরা হয়ে থাকার পর কুন্তলা চালচলনে স্বাভাবিক হয়েছিল। শুধু স্বাভাবিক নয়, ও যেন আমার আরও কাছাকাছি চলে এসেছিল। চটপট খুশি করতে পারত আমাকে, কোন জিনিসটা আমার কখন দরকার যেন অলৌকিক ক্ষমতায় বুঝে নিত, সৃষ্টির কাজে যখন হতাশ হয়ে পড়তাম তখন আমাকে উৎসাহ দিত সতেজ উদ্যমে। গুণীজনেরা বলেন, প্রতিটি প্রতিভাধর মানুষের পেছনে রয়েছে কোনও রমণীর প্রেরণা, ত্যাগ। আমার জীবনেও তাই। কুন্তলা। আর সাহিত্যিক হিসেবে আমার খ্যাতির পেছনে কুন্তলার কৃতিত্ব অনেকখানি! ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কখনও আমি করিনি। সীমার সঙ্গে যে নিজেকে কিছুদিনের জন্যে জড়িয়ে ফেলেছিলাম তার কারণ পম্পির আকস্মিক মৃত্যু। পরে কুন্তলাকে সীমার ব্যাপারটা খুলে বলেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম আমার হঠাৎ পদস্খলনের কারণ।

কুন্তলা সে-নিয়ে কখনও কোনও অভিযোগ করেনি। শুধু বলেছে, এইরকমটাই হয়ে থাকে। ওর সহ্যশক্তি, মানিয়ে চলার ক্ষমতা আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

তারপর থেকে আমার লেখার কাজ দিব্যি এগিয়ে চলেছে। শুধু থমকে দাঁড়িয়েছে আজ। একটা ভালো শব্দ, একটাও ভালো লাইন মাথায় আসছে না। মস্তিষ্কের ভাবনা-চিন্তার ভাঁড়ার সব শূন্য, নীরস মরুভূমি। কোন অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে যেন সব সাহিত্য-মনস্কতা চুঁইয়ে-টুইয়ে ঝরে গেছে রুক্ষ মাটিতে। সব চিন্তা জট পাকিয়ে এক ধাঁধা তৈরি করেছে মাথার ভেতরে। পাতার পর পাতা লিখেছি আর ছিঁড়ে ফেলেছি, ছিঁড়ে ফেলেছি আর লিখেছি। কুন্তলা কোনও প্রতিবাদ করেনি, বরং বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন বলেছি, এবারে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে না পড়লে আমার উপায় নেই, একমাত্র তখনই প্রতিবাদ করেছে কুন্তলা।

না, না, রাজীব, সে আমি সইতে পারব না। আমাকে জোর কোরো না!

কুন্তলা একথা বলেছে, কারণ, ও জানে আমি যখন কঁসি দেব তখন ওর ভূমিকা কী হবে।

কিন্তু আমি জেদ ছাড়িনি। ফলে ও বইয়ের পর বই সাজিয়ে তৈরি করেছে আমার দাঁড়ানোর জায়গা, আর আমি লিখতে বসেছি আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি ও আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

কুন্তলা দড়ি জোগাড় করেছে। রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছে ধারালো ছুরি। তারপর বইয়ের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে যখন আমি ফাঁসির গেঁট বেঁধেছি তখন ও আমাকে ধরে রেখেছে সযত্নে, যাতে ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে না যাই…।

.

আমি ঢোঁক গিলোম। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কুন্তলা আবার বলল, এসব করে সত্যিই কোনও লাভ আছে, রাজীব? এক সেকেন্ডের এদিক ওদিক হলেই বিপদ হতে পারে।

কথাগুলো শুনে মনে হল যেন বহুবার মহলা দেওয়া কোনও নাটকের সংলাপ। এর যেন কোনও গভীরতর অর্থ রয়েছে।

ওর নির্লিপ্ততার মুখোশ ভেদ করে আবেগের ছোঁওয়া টের পেলাম। অবশেষে এই আবেগ ভাসতে ভাসতে উঠে আসছে ওপরের স্তরে। আমার মধ্যেও শুরু হয়েছে এক অচেনা আবর্ত, এক শক্তিশালী অনুভূতি। কী লুকোতে চাইছে কুন্তলা? সেটা আমার জানার অধিকার আছে। ইচ্ছে করছে, ওর তন্বী দুপঁধে আমার হাতের শক্ত বাঁধন বসিয়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিই, যাতে ওর লুকোনো চিন্তাগুলো রঙিন কাচের গুলির মতো শব্দ করে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। তখন আমি জানতে পারব কোন সর্বনাশা ধূর্ত কুটিল সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে ওর মনের ভেতরে, কেন আমার মনে জেগে উঠেছে অস্বস্তি, অচেনা সংশয়, সূক্ষ্ম সন্দেহ। এইসব অস্পষ্ট অনুভূতিগুলো আমার ভেতরে এক প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে।

কুন্তলা আমার...? জটিল যন্ত্রণায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম লেখার টেবিলের দিকে। একপাশে সাজানো রয়েছে লেখা পৃষ্ঠাগুলো। কুন্তলা...।

উঁহু, এ অসম্ভব। আমার লেখা কুন্তলা কখনও পড়তে চায় না। পাণ্ডুলিপিও নয়, বইও নয়। ও বলে, তোমার লেখার প্রতিটি বিষয় আমার এত চেনা, এত জানা যে, নতুন করে পড়ার কিছুই নেই। সুতরাং আমি কী করে তোমার লেখা সমালোচকের চোখ দিয়ে পড়ব? আমি তো জানি লেখার আইডিয়াগুলো তুমি কোথা থেকে পেয়েছ...।

কথাটা সত্যি। ফলে আমার অসমাপ্ত লেখার ওই দৃশ্যটা ও পড়েছে বলে মনে হয় না। ওই জায়গাটাই হবে আমার উপন্যাসের সেরা জায়গা, আমার জীবনের সেরা লেখা। জীবন থেকে নিংড়ে নেওয়া সাহিত্যনাঃ, এসব এখন ভেবে লাভ কী? হাতের কাজটুকু শেষ হয়ে যাক, তারপর ভাবব। কুন্তলা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে...কীসের জন্যে?

আমার মৃত্যুর জন্যে।

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নোনতা স্বাদ পেলাম। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এরকম ঘটনা আগেও বার-সাতেক ঘটেছে। জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আমি লেখার রসদ জোগাড় করেছি। আমাকে বাধ্য হয়ে সাহায্য করেছে কুন্তলা। বিষধর কঁকড়াবিছের কামড়। ঘুমের ট্যাবলেট। কবজির ধমনি কেটে দেওয়া। আমার চারনম্বর উপন্যাসের সেই দৃশ্যটা–বাক্সের ভেতরে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু। তারপর পায়ে পাথর বেঁধে জলে ডুবে মৃত্যু–যেখানে কোমরে বাঁধা দড়িটা ধরা রয়েছে তীরে দাঁড়ানো এক যুবতীর হাতে। এই যুবতী ডুবন্ত নায়কের প্রেমে ও

ঘৃণায় পাগল...অপূর্ব! সমালোচকরা একসুরে প্রশংসা করেছেন আমার ভয়ানক বাস্তববোধের। আমার বইয়ের প্রতিটি জীবন্ত মরণ-দৃশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কোনও খাদ নেই তাতে। মৃত্যু–এক রহস্যময়ী রূপসি রমণী!

এইরকম প্রতিটি বিপজ্জনক পরীক্ষায় সময় আমি কুন্তলাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। কখনও ভাবিনি, সেই বিপন্ন মুহূর্তে আমি ওর শক্তির কাছে পরাধীন। তা হলে এবারে এত বিচলিত হয়ে পড়ছি কেন?

কুন্তলা! কুন্তলা! আতঙ্কে আমার স্বর রুদ্ধ বিকৃত হয়ে গেল। শরীরের আকস্মিক আক্ষেপকে সামাল দিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়লাম। অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গেল বইয়ের পাহাড়। আমার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল, পা-জোড়া ছটফট করতে লাগল, হাত দুটো খুঁজতে লাগল যে-কোনও আশ্রয়। তারপর আপ্রাণ শক্তিতে খুলে ফেলতে চাইল গলায় এঁটে বসা ফঁসের দড়ি।

আমার যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে ওকে দেখতে পেলাম। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ করছে, আর হাসছে কুন্তলা হাসছে–এদিকে আমার জীবনীশক্তি ধাপে-ধাপে শেষ হচ্ছে, অথচ ধারালো ছুরিটা ওর নিথর হাতে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ধরা। এবারে ও আমাকে আর বাঁচাবে না। আর খুনের দায়ে দোষীও হবে না ও। আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল ছুটন্ত আলোককণার আলপনা, তারপর একসময় সেটা ঝাপসা হয়ে নেমে এল অন্ধকার–শুধু চোখে নয়, চেতনাতেও।

.

ভারী চোখের পাতা ধীরে-ধীরে মেলে ধরলাম। কুন্তলা আমার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। আমার অবশ কবজি ঘষে ঘষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে তুলেছে। আমার যন্ত্রণাময় শরীর তৃষ্ণার্ত পশুর মতো চেটেপুটে নিচ্ছে শুদ্ধ মিষ্টি বাতাস। দড়ির ফঁস নেই। বইগুলো আবার ফিরে গেছে যথাস্থানে–তাকের ওপরে। কতক্ষণ আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম? পাঁচ মিনিট? দশ মিনিট?

তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে। জমাট বাধা স্বরনালী থেকে জড়ানোভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল অভিযোগের শব্দগুলো।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি। নিরুত্তাপ নির্লিপ্ত উত্তর।

আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো এখনও নিজেদের গুছিয়ে উঠতে পারেনি। আমি জানি, কুন্তলা সত্যি কথা বলছে। তবু যেন সেই সত্যি কথাটা আমার বোধের সীমারেখাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কী করে ও এত শান্ত আবেগহীন?

কিন্তু কেন, কুন্তলা?

সামনের খাটো টেবিল থেকে এক গ্লাস জল নিল কুন্তলা। মাথাটা সামান্য তুলে কিছুটা ঠান্ডা জল খাইয়ে দিল আমাকে। শরীরে যেন প্রাণ এল। জ্বালাও জুড়োল কিছুটা। আমি এখনও বেঁচে আছি। সত্যি, বেঁচে থাকার স্বাদ এত সুন্দর!

রাজীব, ভেবেছিলাম একদিন-না-একদিন তুমি বুঝতে পারবে আমার কষ্ট। কী যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে রেখেছ তুমি। আমার আশা ছিল, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমার কাছে। সে-ভালোবাসার কোনও দাম নেই। তুমি মেতে আছ নিজের লেখা নিয়ে, নিজেকে নিয়ে। এটা বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে। সীমা, সীমার মতো আরও কত মেয়ে, তোমার স্বার্থপরতার শিকার হয়েছে। ওদের নিয়ে তুমি লিখেছ–লোকে তোমার লেখা জীবন্ত বলে প্রশংসা করেছে। তারপর…তারপর নিজের জীবন-মরণকে তুমি ঠেলে দিয়েছ আমার হাতে। ব্যাপারটা তোমার কাছে হয়তো খুব সহজ, কিন্তু আমার কাছে, রাজীব? যদি কঁকড়াবিছের বিষ তাড়ানোর ওষুধ ঠিকমতো কাজ না করে? যদি ঘুমের ওষুধের ধক কাটানোর ইনজেকশান সময়মতো দিতে না পারি? কখনও কি তুমি ভেবেছ। আমার মনের অবস্থাটা কী হয়? তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি, তারপর প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমাকে শোনাই, যাতে তুমি লিখতে পারো তোমার উপন্যাস। এ যে কী কষ্ট তুমি বুঝবে না।

ও রেগে গেছে। হালকা মনেই ভাবলাম।

..ওর দু-গাল ক্রোধে রক্তিম। চোখে জ্বলছে জোনাকি। ওর সপ্রাণ স্তন উত্তেজনায় উঠছে, নামছে। পোশাকের বাঁধন ছিঁড়ে বিদ্রোহ জানাবে এখুনি…।

মন্দ নয়। একটু ঘষামাজা করে নিলে নেহাত মন্দ হবে না। জীবন্ত ছবি।

হঠাৎই একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম পেটে। পরক্ষণেই সেটা কমে গেল। গভীর শ্বাস নিয়ে বললাম, তুমি ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে দিয়েছিলে, তাই না, কুন্তলা? তা হলে তুমি নিশ্চয়ই

এখনও ভালোবাসো আমাকে, ভালোবাসো না?

সত্যিই কি বাসি?—ওর চোখে শীতল বিদ্যুৎ। কণ্ঠস্বরেও। যদি এই মুহূর্তে ওকে স্পর্শ করি তা হলে শরীরেও পাব শীতল স্পর্শ—আমি জানি।

কুন্তলা আবার বলল, ভালোবাসা! ভালোবাসা কতরকম হয় জানো? কিংবা ঘৃণা? কিংবা দুটোই? মাথার যন্ত্রণা, মনের যন্ত্রণা, শরীরে লক্ষ-লক্ষ বিস্ফোরণ, বুকের ভেতর কান্না সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আবার সেই যন্ত্রণার ছুরিটা বিদ্ধ হল পেটে। রোমকূপ থেকে কুলকুল করে বেরিয়ে এল শীতল ঘামের ধারা। জিভটা কেমন বিস্বাদ ঠেকছে…হঠাৎ চমকে উঠলাম।

ওই জলের মধ্যে…।

হ্যাঁ, রাজীব। ওই জলের মধ্যে অ্যাকোনাইট মেশানো ছিল।

অ্যাকোনাইট!—হাত বাড়িয়ে কুন্তলার নাগাল পেতে চাইলাম, কিন্তু যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসা শরীর শক্তি খুঁজে পেল না। অ্যাকোনাইট বিষটা আমার খুব চেনা। শেষ দুটো বইয়ের আগের বইটায় এই বিষটা আমি ব্যবহার করেছি। মরতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। চেতনা কখনও আচ্ছন্ন হয় না। বড় যন্ত্রণাময় মৃত্যু।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুন্তলা হাঁটুগেড়ে বসে আছে। সুডৌল হাত দুটি বুকের কাছে ভাঁজ করা। মুখে রাগ নেই। শুধু আমাকে লক্ষ করছে, ওর সুন্দর সুকুমার মুখে শুধু শূন্যতা।

মৃত্যু—এক রহস্যময়ী রূপসি রমণী।…আমার চোখ জ্বালা করছে। ঠোঁটের কোণে নোনা অশ্রুর স্বাদ। আতঙ্ক, যন্ত্রণা, সবকিছুর মধ্যেও বুঝতে পারছি, সাদা কাগজে আর লেখা হবে না চমৎকার শব্দগুলো ও মৃত্যু—এক রহস্যময়ী রূপসি রমণী।

আমার জন্যে এই নৃশংস নিয়তি কেন বেছে নিল কুন্তলা? ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে কেন শেষ প্রশ্বাস নিতে দিল না আমাকে?

কুন্তলা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল আমার টেবিলের দিকে। লেখা পৃষ্ঠাগুলো তুলে নিল। ও কি পড়েছে লেখাটা? আমি ভেবেছিলাম পড়েনি। ভুল ভেবেছি…।

অন্যমনস্ক হাতে পাতা উলটে একটা বিশেষ পৃষ্ঠায় এসে থামল কুন্তলা। তারপর আবেগহীন শুকনো গলায় পড়তে শুরু করল। আমার দিকে একটিবারের জন্যেও তাকায়নি ও। পড়তে লাগল। জীবন নিংড়ে লেখা আমার শেষ উপন্যাসের একটা অংশ।

..কী সহজ, ভাবল অনিকেত। ছায়াময় ঘরে ছোট খাটটার পাশে দাঁড়িয়ে ওর শরীরে ভয়ের কাঁপুনি খেলে গেল পলকে। ও একা, ওর মুখে কথা নেই। কত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল। এখন আর কোনও প্রতিবাদ নেই। বাচ্চাটার ছোট্ট শরীর এখন স্পন্দনহীন। ঘুম নয়, কালঘুম। ওর সন্তান, ওর আদরের মেয়ে– শরীরে সাড়া নেই, কারণ, অনিকেত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি সংকটের মুহূর্তে। ও জানত, কোন বিপদ ওত পেতে রয়েছে মেয়েটার মাথার কাছে। অনিকেতের কৌতূহলই কি এই মৃত্যুর কারণ? জীবনের সবরকম অনুভূতিকে ও তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে চায়–সে-অনুভুতি যত ভয়ংকর হোক, যত নৃশংস হোক– এটা অনিকেতের একটা খেলা। এ সেই পুরোনো পাপ–জানার কৌতূহল। আদম আর ইভ থেকে যার শুরু। এখন…এখন ও অন্য সবার থেকে আলাদা। এই বীভৎস অভিজ্ঞতা বুকের ভেতরে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে ওকে। এ-অভিজ্ঞতার কথা কেউ জানবে না, কেউ না কেউ জানবে না, অনিকেত পাপী। কারণ, চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটা ও ইচ্ছে করলে রুখতে পারত। কিন্তু তা ও করেনি। অজানাকে জানার তীব্র কৌতূহল ওকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল…। কুন্তলা আমার অসমাপ্ত শেষ উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলল। ওর গলার স্বর অস্ফুট, নির্লিপ্ত রুক্ষতা সেখানে নেই। ও বলল, ফাঁসিতে মরলে তোমার শাস্তি অনেক কম হত, রাজীব।

# নীলবর্ণ বিড়াল

**নীলবর্ণ বিড়াল**

রাকেশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নীলবর্ণ শৃগালের স্বপ্ন দেখছিল।

কাল রাতে সদ্য-সদ্য গল্পটা পড়েছে ও। আচমকা নীলের গামলায় পড়ে গিয়ে নীল রঙের চেহারা হয়ে গিয়েছিল বেচারা শেয়ালটির। তারপর যখন সে জঙ্গলে ফিরে গেল তখন সমস্ত পশু পাখি তাকে জঙ্গলের রাজা বলে মেনে নিল। কারণ, নীল রঙের শেয়াল তো তারা জীবনে কখনও দেখেনি! অতএব সেই অদ্ভুত রঙের প্রাণীটিকেই তারা সকলে মেনে নিয়েছিল বনের রাজা বলে।

রাকেশ দেখছিল, একটা নীল রঙের শেয়াল ওকে এসে ডাকছে, রাকেশবাবু, আমি কিন্তু গল্পের শেয়াল নই। সত্যিকারের নীল রঙের শেয়াল।

রাকেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করল, সত্যি?

শেয়ালটা বলল, সত্যি।

আর তারপরই রাকেশকে হতভম্ব করে দিয়ে মিউমিউ করে ডেকে উঠল।

শেয়াল মিউমিউ করে ডাকছে! রাকেশ চমকে উঠল। আর তক্ষুনি ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙতেই দেখল বিছানায় ওর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা নীল রঙের বিড়াল। মিউমিউ করে ডাকছে। কাচের গুলির মতো নীল চোখজোড়া জুলজুল করে রাকেশেরই দিকে তাকিয়ে। সরু বঁটার কাঠির মতো

নীল রঙের গোঁফ। গায়ের রং গাঢ় নীল। শুধু লেজের ডগায় খানিকটা কালো ছোপ।

রাকেশ ভাবল, ওর স্বপ্নের ঘোর বোধহয় এখনও কাটেনি। ভাবল, চিমটি কেটে একবার দেখি তো! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কিন্তু চিমটি কাটতে গিয়েই আবার অবাক। এ কী! ওর ধবধবে ফরসা গায়ের রং এরকম নীল হয়ে গেল কেমন করে! তারপরই বাকি দুর্ঘটনাগুলো একে একে রাকেশের চোখে পড়ল।

ঘরের দেওয়াল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল-চেয়ার, ফ্যান, ঘরের মেঝে– সর্বত্র শুধু নীল আর নীল। কোনওটার রং উজ্জ্বল নীল, কোনওটা ঘোলাটে নীল, কোনওটার রং কালচে নীল, আবার কোনওটা স্রেফ কুচকুচে কালো।

বিছানার বেড়ালটা তখনও মিউমিউ করে ডেকে চলেছে।

রাকেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। পাশে মা নেই। অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। এখন নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। রাকেশের কান্না পেয়ে গেল। কোনওরকমে চিৎকার করে ও ডেকে উঠল, মা, মা!

মা ছুটে এলেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

মা-কে দেখে রাকেশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল কালচে নীল গায়ের রং। চোখের তারাটুকু শুধু কালো, বাকি অংশটা উজ্জ্বল নীল। ঝকঝকে দাঁতেরও একই দশা। অবশ্য মাথার চুলগুলো কুচকুচে কালো–যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

বিছানা থেকে নেমে একছুটে গিয়ে মা-কে জাপটে ধরল রাকেশ। শাড়ির ভাঁজে মুখ লুকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, এসব কী কাণ্ড, মা? আমি কি ভুল দেখছি?

মা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, না রে, তোর চোখের ভুল নয়, আমরা সব্বাই ওই নীল রঙেরই সবকিছু দেখছি। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি এই দশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। একটু আগেই রেডিয়োতে আর টিভিতে বলেছে, সারা পৃথিবী জুড়েই নাকি একইরকম কাণ্ড হয়েছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মায়ের কথায় রাকেশ বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। ও বিছানার বসা বেড়ালটাকে দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখো।

মা হাসলেন, বললেন, ওটা তো তোর মিনু। রং পালটানোর ধাক্কায় ওর রঙও ওরকম নীল হয়ে গেছে। নে, এবার হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বোস দেখি।

মা-কে রোজকার মতো সহজ স্বাভাবিক দেখে রাকেশের বিস্ময় আর আতঙ্ক ধীরে-ধীরে কাটতে লাগল। মা ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে যেতেই ও টুথব্রাশে খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে নিল। টুথব্রাশের রং এমনিতেই নীল ছিল। অতএব ওটার রঙের তেমন রদবদল হয়নি। কিন্তু সাদা টুথপেস্ট একেবারে গাঢ় নীল রঙের হয়ে গেছে।

মুখ ধুতে বেসিনের কাছে গিয়ে রাকেশ যথারীতি আবিষ্কার করল সাদা ওয়াশ বেসিন ঘন নীল। এতক্ষণে ওর ভয়টা কেটে গিয়ে বেশ একটা মজা টগবগ করে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে ও এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল।

মা রান্না ছেড়ে টানা বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে পাশের বাড়ির টুকির মায়ের সঙ্গে গল্প। করছিলেন। হাসাহাসিও করছিলেন দুজনে।

রাকেশ শুনল, পাশের বাড়ির মাসিমা বলছেন, দিদি, ভাতের আজ যা চেহারা হয়েছে, টুকির বাবা ভাত খেয়ে অফিস গেলে হয়!

সত্যিই তো, নীল রঙের ভাত কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার! রাকেশ ভাবল।

মা তখন বলছেন, আমারও তো একই অবস্থা, ভাই। ভাত, ডাল, হলুদ, লঙ্কা সব যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছে।

টুকির মা-কে বেশ চিন্তিত মনে হল। উনি বললেন, রাতারাতি এ কেমন ভোজবাজি হল বলুন তো, দিদি! আমার তো ব্যাপার-স্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।

মা বললেন, একটু আগেই রেডিয়োতে বলেছে, বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। শিগগিরই এর সমাধান করে দিলেন বলে।

রাকেশ আর দাঁড়াল না। ছুট-পায়ে চলে এল রাস্তার দিকের ঝুলবারান্দায়।

ওমা! এ কী! আকাশে যে-সূর্যটা উঠেছে সেটার রংও যে ঘন নীল আকাশের নীল রঙের সঙ্গে ওটা প্রায় মিশে গেছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নীল রোদ্দুর। যে-কটা গাছপালা দেখা গেল সবই কালচে নীল। শুধু কালো রঙের কাকগুলো নীলরঙা টিভি-অ্যানটেনার ওপরে বসে একইরকমভাবে কা-কা করে ডাকছে।

রাকেশ মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখতে লাগল।

একটু পরেই মা বারান্দায় এসে হাজির। হাতে একগ্লাস দুধ। ওকে ডেকে বললেন, নে রাকা, চটপট খেয়ে নে দেখি। উনুন জ্বলে যাছে।

রাকেশ ব্যাজার মুখে দুধের গ্লাস হাতে নিল। নীল রঙের দুধ! মায়ের দিকে মুখ তুলে আবদারের গলায় বলল, তুমিই বলো না, এরকম দুধ কেউ খেতে পারে?

মা ব্যস্তভাবে বললেন, পারে পারে, খুব পারে। যদি সবকিছুর রং এরকমটাই থেকে যায়, আর আগের মতো ফিরে না আসে, তা হলে অবস্থাটা কী হবে শুনি! নীল রঙের দুধ, ভাত, সবই তো খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, তাই না? মানুষ তো আর না খেয়ে থাকতে পারবে না। নে, তুই চটপট খেয়ে গ্লাসটা বেসিনের কাছে রেখে দিস, আমি যাই।

মা ব্যস্ত পায়ে চলে যাচ্ছিলেন, রাকেশ জিগ্যেস করল, বাবা এখনও আসেনি?

মা বললেন, উঁহু। প্রায় একঘণ্টা তো হয়ে গেল বাজারে গেছে। মনে হয়, বাজারে আজ হইচই পড়ে গেছে। নে, দুধটা জলদি খেয়ে নে।

মা হুউশ করে চলে গেলেন।

রাকেশ অতি সাবধানে দুধের গ্লাসে একটা চুমুক দিল। মাগো! কীরকম গা গুলোচ্ছে। কিন্তু দুধের স্বাদটা একইরকম আছে। শুধু রং পালটে গেলেই খাওয়ার ইচ্ছেটা পালটে যায় কেন কে জানে! নইলে রাকেশ তো দুধ খেতে ভালোই বাসে।

মিনু কখন যেন বিছানা ছেড়ে নেমে এসে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল আর ডাকছিল মিউ মিউ করে। বোধহয় দুধের গন্ধ পেয়েছে। ওকে খানিকটা দুধ দিয়েই দেখা যাক তো, খায় কি না। গ্লাস থেকে কিছুটা দুধ মেঝেতে ঢেলে দিল রাকেশ। ঠিক মিনুর সামনে। কিন্তু দেখল, বেড়ালটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

বাবার কাছেই রাকেশ শুনেছে কুকুর, বেড়াল, গরু, মানুষের মতো বর্ণালির সাত রং দেখতে পায় না। এমনকী লাল কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে স্পেনে যে ষাঁড়ের লড়াই হয়, সেখানে ষাঁড় মোটেই লাল কাপড় দেখে খেপে ওঠে না। সে বেচারা কাপড়টাকে দেখে গাঢ় ছাই রঙের। আসলে কাপড়ের টুকরোটার দ্রুত নড়াচড়াতেই সে খেপে উঠে ওটাকে তাড়া করে।

সুতরাং হিসেবমতো মিনুও নিশ্চয়ই দুধটাকে এখন কালো রঙের দেখছে। কারণ, ওর পক্ষে তো আর নীল রং দেখা সম্ভব নয়। হয়তো সেইজন্যেই ও দুধটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

অবশেষে ঘ্রাণশক্তিরই জিত হল। গন্ধে-গন্ধে জিভ বাড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা দুধের স্বাদ নিল মিনু। তারপর চক-চক শব্দে গোটা দুধটাই চেটেপুটে সাফ।

মিনুর দেখাদেখি চোখ বুজে অতিকষ্টে গ্লাসের দুধ শেষ করল রাকেশ। তারপর একটু জল খেয়ে গ্লাস মায়ের কাছে রেখে এসে পড়ার বই নিয়ে বসল।

ইতিহাস বই খুলেই রাকেশ বুঝল, পড়াশোনা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ বইয়ের গাঢ় নীল রঙের পৃষ্ঠায় খুদে-খুদে কালো অক্ষরগুলো ভালো করে দেখতে পাওয়াই মুশকিল।

রাকেশ মনমরা হয়ে প্রত্যেকটা বই আর খাতার পৃষ্ঠা উলটে-উলটে দেখতে লাগল। দূর ছাই, স্কুলে গিয়ে তা হলে আর কী হবে! বই ছেড়ে উঠে বাবার টেবিল থেকে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা নিয়ে এল ও। সুইচ অন করে নব ঘুরিয়ে কান পাতল। সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল বিশেষ ঘোষণা ও ...সেই কারণেই সবকিছু বিবেচনা করে রঙের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে দ্রুত গবেষণা করছেন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্যে সরকার অনুরোধ জানিয়েছেন...।

সুইচ টিপে রেডিয়ো অফ করে দিল রাকেশ। রঙের সামান্য রকমফেরের জন্যে এ কী কাণ্ড হল!

এমনসময় সে করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। রাকেশকে বললেন, রাকা, তোমার ইস্কুল ছুটি।

রাকেশ দেখল, বাবার পরনে নীল আদ্দির কাপড়ের পাঞ্জাবি, নীল ধুতি। গায়ের রং কালচে নীল।

পাঞ্জাবি খুলে হ্যাঁঙারে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে বাবা আবার বললেন, বাজারে তো একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড। অদ্ভুত-অদ্ভুত রঙের সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে : নীল ফুলকপি, নীল রজনীগন্ধা, আর মাছের বাজারে কালো কালো পোনা মাছের টুকরো।

কেন, কালো রঙের কেন? রাকেশ জানতে চাইল।

বাবা হেসে বললেন, হবে না! রক্তের রঙই যে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। এ ছাড়া বাজারে শুনলাম, গাড়ি-ঘোড়া, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সব নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ থাকবে।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এইমাত্র রেডিয়োতে বলেছে।

কই, দেখি, রেডিয়োটা দে তো।

রাকেশ রেডিয়োটা বাবাকে দিল। তারপর বইপত্র গুছিয়ে রেখে আবার ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

উলটোদিকের বাড়ির ছাদে তিনটে গাঢ় নীল রঙের পায়রা বসেছিল। ও-বাড়ির তপনদা পায়রা পোষে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাকেশ ভাবছিল ও সত্যি, কী অদ্ভুত ব্যাপার! সূর্যের সাত রঙের ছ-ছটা রং উধাও হয়ে যাওয়ার জন্যে কী বিপত্তি! সারা পৃথিবীর জীবনযাত্রা একেবারে অচল। রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। চারদিকে শুধু নীল রং অথবা কালো রং। আর তা নইলে তাদের কমবেশি মিশেল দিয়ে তৈরি কোনও নীলচে রং। এই ধরনের পরিবেশে গাড়ি চালাতে গিয়ে অভ্যেস না থাকায় ড্রাইভাররা হয়তো অ্যাকসিডেন্টই করে বসবে। সেইজন্যেই রেডিয়োতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।

সিনেমা হলগুলোও বন্ধ থাকবে নিশ্চয়ই। নীল ছাড়া বাকি সব রং উধাও হয়ে গেলে রঙিন ছবির আর বাকি থাকল কী! আবার সাদা-কালো সিনেমাতেও একই

বিপদ! সাদা রং বলে কিছু থাকবে না। তার বদলে শুধু নীল আর নীল! ঠিক টিভির মতোই দশা!

যতদিন রংগুলো ছিল ততদিন বোঝা যায়নি সেগুলো কত জরুরি। বোঝা যায়নি, সেগুলো না থাকলে লাগাতার বন্ধ শুরু হয়ে যাবে মানুষের জীবনে। এখন দিনগুলো কাটবে কেমন করে সেই নিয়েই রাকেশের চিন্তা।

বিকেলবেলায় বাবার কাছে শুনল, কলকাতার সমস্ত রং কোম্পানি নতুন কোনও ব্যবসা খোলার কথা ভাবছে। নানান দোকানে তাদের যত রং ছিল সব ভোল পালটে নীল অথবা কালো হয়ে গেছে। এদিকে বুড়ো মানুষদের চুলদাড়ি সব নীল হয়ে গিয়ে তাদের ভারী চমৎকার লাগছে। সেই দেখে কালো চুল যাতে তাড়াতাড়ি পেকে গিয়ে নীল হয়ে যায় তার জন্য মানুষ কৃত্রিম উপায়ে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সেলুনে কালো চুল নীল করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

রাকেশ অবাক হয়ে বাবার কথা শুনছিল। এমনসময় রেডিয়োতে বলল, এ-পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিমালয়ের বরফে ঢাকা চুড়ো আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মোট সাতাশটি এরোপ্লেন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় আছড়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা এই রং বদলের ঘটনায় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

এরকম চমকে দেওয়া আরও কতসব দুর্ঘটনা।

রাকেশের খুব মন খারাপ লাগছিল। ও পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সন্ধে ঘন হয়ে আঁধার নেমে এসেছে। কিন্তু আকাশে চাঁদ-তারা কই? গাঢ় পিচ রং আকাশে ঘোর নীল রঙের চাঁদ। ভালো করে ঠাহর করা যায় না। আর তারা? চোখে প্রায় পড়ে না বললেই চলে। ইস, এরকমভাবেই কাটবে প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত!

রাকেশ ঘরে ফিরে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। টিউব লাইট আর বাব। দুটোর অবস্থাই একরকম। বাবা-মা চুপচাপ বসে। মায়ের মুখে সকালের ঠাট্টার লেশমাত্র নেই এখন। বাবাও যেন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মুখ গম্ভীর। রেডিয়ো সামনে নিয়ে বসে আছেন। রেডিয়ো ছাড়া আর উপায় কী! গল্পের বই পড়া বন্ধ। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ। টিভি দেখা বন্ধ। ঘরে বসে-বসে সকলেই বোধহয় এইরকম হাঁফিয়ে উঠেছে।

রেডিয়োতে গানের অনুষ্ঠান শুনছিলেন বাবা। হঠাৎই রাকেশের দিকে ফিরে বললেন, রাকা, খেয়াল করছিস, যারা খবর পড়ে শোনাচ্ছে তাদের মাঝে-মধ্যে কীরকম আটকে যাচ্ছে! নীল কাগজে কালো লেখা পড়তে গিয়ে খবর-পড়ুয়ারা একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

রাকেশ সামান্য হাসল।

মা বললেন, তবু রেডিয়ো ছাড়া আর উপায় কী বলো—

রাকেশ জিগ্যেস করল, খবরে কিছু বলেছে, বাবা?

হ্যাঁ, বলেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, সূর্যের মধ্যে কোনও একটা গোলমালের জন্যেই এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে তারা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

মিনু রাকেশের পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। রাকেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর একটা কালো বল নিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না।

এমনি করেই একসময় রাত দশটা বাজল। কোনওরকমে খাওয়াদাওয়া সেরে রাকেশ মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল। মিনুও শুয়ে পড়ল ওর কোল ঘেঁষে। বাবা পাশের ঘরে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, রাকা, মন খারাপ করিস না। কাল সকালে উঠেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

বাবার কথাটা যে এরকম হাতেনাতে ফলে যাবে সেটা রাকেশ কল্পনাও করতে পারেনি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ও অবাক। ধবধবে সাদা মিনু মিঁউ-মিউ করছে কালকের মতোই। চোখের ভুল নয়তো! রাকেশ শুয়ে-শুয়েই দেখল চারপাশ। ঘরের দেওয়াল আবার সাদা হয়ে গেছে, ফরসা হয়ে গেছে ওর গায়ের রং, জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে সোনা রঙের ঝকঝকে রোদ। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা নেই। আগেই উঠে পড়েছেন।

রাকেশ লাফিয়ে উঠে বসল। মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল ওর। যাক, সবকিছু আবার তা হলে আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেছে! কিন্তু হল কেমন করে?

রাকেশ বিছানা ছেড়ে ছুটল রান্নাঘরের দিকে মায়ের সন্ধানে।

সেখানে পৌঁছে দ্যাখে বাবা হাত-পা নেড়ে মাকে কীসব যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। একহাতে বাজারের দুটো থলে। থলে দুটো উঁচু করে বাবা মাকে বলছেন, এই দ্যাখো, ধরো এটা হল সূর্য। সূর্য থেকেই তো সাদা আলো আসছে আমাদের পৃথিবীতে।

মা বাধা দিলেন, সাদা আলো কোথায়! ও তো হলদে আলো।

বাবা একটা অদ্ভুত শব্দ করে ধৈর্য হারালেন। তারপর বললেন, দুর ছাই! তোমাকে বলে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং রাকাকে বলি।

রাকেশ খুশি-খুশি মেজাজে বলে উঠল, সব রং আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে, বাবা। কিন্তু ওরকম ওলটপালট হয়েছিল কেমন করে? রেডিয়োতে কিছু বলেছে?

আরে সেটাই তো তোর মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। রেডিয়োতে সংক্ষেপে যা বলল, তা হল এই : গত পরশু রাতে অর্থাৎ, ধরে নে, তিরিশ ঘণ্টা আগে, সূর্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তা এখনও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বলেছেন, সেই বিস্ফোরণের ফলে সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিচিত্র এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। সেই বিকিরণ সূর্যের সাদা আলো থেকে ছ-ছটা রং একেবারে শুষে নিয়েছিল। তারা শুধু গেট-পাস দিয়েছিল নীল রংটাকে। ফলে সব জিনিসকেই নীল রঙের দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া, ওই বিকিরণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের কাছের তিনটে গ্রহে বুধ, শুক্র আর পৃথিবীতে। সেইজন্যে আমাদের এখানকার কৃত্রিম আলোগুলোও–মানে, টিউব লাইট, বা সব–নীল রঙের আলো ছড়াচ্ছিল...।

কিন্তু কালো রংটা? ভাতের হাঁড়িতে হাত নাড়তে নাড়তে মা প্রশ্ন করলেন।

তার জবাব দিল রাকেশ, কালোটা কোনও রং নয়, মা। বরং কোনও রং না থাকলে সেই জিনিসটাকে আমরা কালো দেখি।

মায়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল রাকেশের ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হয়নি।

সেটা অনুমান করে বাবা বললেন, যাই হোক, ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ সূর্যকে ঘিরে-থাকা ওই বিচিত্র বিকিরণ মিলিয়ে গেছে

মহাশূন্যে। ফলে বর্ণালির বাকি ছটা রং আজ সকাল থেকেই আবার ফিরে পাওয়া গেছে। আর পৃথিবীর ওপর থেকেও কেটে গেছে ওই বিকিরণের প্রভাব। সুতরাং রাতের আলোতেও আর কোনও গোলমাল থাকবে না। সিনেমা টিভিও দেখা যাবে আগের মতোই।

বাবা বাজারের থলে দুটো বগলদাবা করে রাকেশকে লক্ষ্য করে গলা নামিয়ে বললেন, রাকা, এবারে রঙের ব্যাপারটা ছোট্ট করে তোর মাকে বুঝিয়ে দিই, কী বলিস?

রাকেশ মজা পেয়ে ঘাড় কাত করল। মা রান্নায় মগ্ন হলেও এদিকে যে কান পেতে আছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

গলাখাঁকারি দিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, শোনো, সূর্যের যে সাদা আলোমানে, তোমার মতে হলদে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ওটাই সাদা আলো–ওই সাদা আলো ভাঙলে দেখা যাবে ওর ভেতরে সাতটা রং মিশে আছে। আকাশে রামধনু উঠলে বর্ণালির সেই সাতটা রং আমরা আলাদা করে দেখতে পাই। দিনেরবেলা সব জিনিসের ওপরেই সাদা আলো পড়ে, কিন্তু তবুও বিভিন্ন জিনিসকে আমরা বিভিন্ন রঙের দেখি। এরকমটা কেন হয়? ধরো, এই যে তুমি লাল রঙের শাড়ি পরে আছ, এই শাড়িটাকে লাল দেখানোর কারণ এটা বর্ণালির লাল রং ছাড়া আর সব কটা রংই শুষে নিয়েছে। শুধু গেট-পাস দিয়েছে লাল রংটাকে। যেমন ওই বিকিরণ নীল রংটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। যে-জিনিস সব রং শুষে নেয় তাকে আমরা কালো দেখি। আর যে-জিনিস বর্ণালির সব কটা রংকেই ফিরিয়ে দেয়–মানে, ছেড়ে দেয়–তাকে আমরা দেখি সাদা রঙের। যেমন আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবি, হাঁড়ির ওই ভাত। এবার তো বুঝলে?

মা হাতা নাড়তে নাড়তে বললেন, ঢের বুঝেছি। এখন চটপট বাজারটা করে আনো দেখি। কাল তো নীল ভাত খেতেই পারোনি, আজ ভালো করে দুটো সাদা ভাত খেয়ে অফিসে যেয়ো।

বাবা চলে গেলেন। যেতে-যেতে বললেন, কাল খবরের কাগজ পড়তে পারিনি। আজ দেখি কোনও টেলিগ্রাম বেরোল কি না–।

মা রাকেশকে বললেন, কী হল, রাকা, যাও, পড়তে বোসো গিয়ে–।

রাকেশ পড়ার টেবিলে ফিরে এল। মিনু টেবিলের নীচে চুপটি করে বসে। জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখতে রাকেশের খুব ভালো লাগছিল। ও উঠে গিয়ে গরাদে মুখ ঠেকিয়ে চোখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। আজ সূর্যটাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে! কই, এতদিন তো এরকম মনে হয়নি! বরং সূর্যটা যেন সকলের কাছে বেশ পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। অথচ আজ একেবারে ঝকঝকে নতুন!

# সংঘর্ষ যদি হয়

**সংঘর্ষ যদি হয়**

কার জন্যে এসব লিখে যাচ্ছি জানি না। জানি না, আমার হাতে আর কত দিন, কত ঘণ্টা, কতটুকু সময় আছে। কে জানে কবে শেষদিন! এই শহরের অলিগলিতে, আনাচেকানাচে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। তাকে দেখতে হুবহু আমারই মতো। তবে মিল শুধু বাইরের চেহারাতেই। ভেতরের চেহারাটা আমার ঠিক উলটো। সেই লোকটার নামও জানি আমি। শরেন। আমার নাম নরেশ-কে উলটে নিয়ে এই নাম রেখেছে প্রভাস। শরেনকে নিয়ে ওর অহঙ্কার কম নয়! ও বলে, শরেনের কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী নাকি চমকে যাবে...।

.

হাতের লেখাটা চিনে ফেলতে শোন্তার কোনও অসুবিধে হল না। বাবার লেখা। কিন্তু এইসব অদ্ভুত কথা বাবা লিখেছেন কেন? বইয়ের তাকে বাবার কয়েকটা দরকারি বইয়ের ফাঁকে খুঁজে রাখা ছিল কাগজগুলো। অবন ঠাকুরের বুড়ো আংলা বইটা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎই কাগজগুলো বেরিয়ে পড়েছে। কাল রাতে শোওয়ার সময়ে বইটা পড়ছিল শোন্তা। পড়তে-পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কে জানে! ব্যস, তারপর আজ সকালে ঘুম ভেঙেই দেখে বই উধাও। মা বইটাকে যথারীতি লুকিয়ে ফেলেছেন। মায়ের ধারণা, একটু-আধটু গল্পের বই পড়লে নাকি পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। সবসময় খালি বলেন, এই গল্পের বই পড়ে-পড়েই ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। ক্লাস টেস্টে কুড়িতে পনেরো পেলেও মা বলেন, রেজাল্ট খারাপ। তারপর কেমন একটা সুর করে বলেন, দ্যাখো তো, অর্পিতা কেমন কুড়িতে আঠেরো পেয়েছে।

অর্পিতা তিনটে সেকশন মিলিয়ে ফার্স্ট হয়। কিন্তু মা তো আর জানেন না, অর্পিতাও গল্পের বই পড়ে। বুড়ো আংলা বইটা ওর কাছ থেকেই শোন্তা নিয়ে এসেছে।

সেই বইটা খুঁজতে গিয়েই কাগজগুলো দেখতে পেয়েছে শোন্তা। তারপর বিছানায় বসে পড়তে শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার। ওর স্কুল ছুটি। কিন্তু বাবা অফিসে গেছেন। আর মা রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। দেওয়ালে টাঙানো কোয়ার্টজ ঘড়ির দিকে তাকাল ও। প্রায় পৌনে বারোটা বাজে। শোন্তা জানে, রান্না শেষ করে মা স্নান করতে ঢুকবেন। তারপর স্নান করে বেরোতে-বেরোতে সাড়ে বারোটা। ততক্ষণ ও একা। ওর সঙ্গী বলতে সামনের ঝুলবারান্দার এক চিলতে মেঘলা রোদ, আর বারান্দার রেলিঙে ছড়ানো কয়েকটা জামাকাপড়। নিস্তব্ধ দুপুরে একটা কাক কোথাও ক্লান্তভাবে ডাকছে। যেন বলতে চাইছে, আমার আর কেউ নেই।

বাবাকেও কদিন ধরে ওর কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়েছে। আর কেমন যেন হয়ে গেছেন ধীরে-ধীরে। সবে ক্লাস সেভেনে উঠলে কী হবে, শোন্তা বুঝতে পারে অনেক কিছু। বরং ও যে বুঝতে পারে, সেটা বাবা-মা-ই বুঝতে পারেন না সবসময়।

যেমন, গত কয়েক মাসে বাবাকে বেশ পালটে যেতে দেখেছে শোন্তা। এমনিতে বাবার মেজাজ ছিল বেশ খিটখিটে, সবসময় দুশ্চিন্তা করতেন, অফিসের কাজের চাপে কাহিল হয়ে পড়তেন, বাড়িতেও কথাবার্তা কম বলতেন, কেমন একটা রাশভারী মুখ করে বসে থাকতেন। ফলে মায়ের মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। আর শোন্তারও ভীষণ খারাপ লাগত। মনে হত, বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যায়। অর্পিতার বাবা-মাকে ও স্কুলে পেরেন্টস ডে-তে দেখেছে। ওঁরা সবসময় কেমন হাসছিলেন। ওদের দেখে অর্পিতাকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয়েছিল। অথচ বেশি নম্বর পাওয়া নিয়ে শোন্তা কখনও অর্পিতাকে হিংসে করেনি।

হঠাৎই একদিন বাবা বদলে গেলেন। কোথায় গেল সেই দুশ্চিন্তামাখা রাশভারী মানুষটা! খিটখিটে মেজাজটাও কোথায় উধাও হয়ে গেল। আর ক্লান্তি? ক্লান্তি শব্দটাই যেন কেউ মুছে দিল বাবার জীবনের ডিকশনারি থেকে। সারাটা দিন বাবা তাজা শক্তি আর স্ফুর্তিতে টগবগ করতে লাগলেন। যেন টাইম মেশিনে

চাপিয়ে কেউ ঝট করে অন্তত পনেরোটা বছর কমিয়ে দিয়েছে বাবার জীবন থেকে।

তারপর থেকে তিনটে মাস কী যে আনন্দে কেটেছে।

অফিস থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়েই বাবা শোন্তার সঙ্গে খেলতে বসে যেতেন। প্রথম দিন শোন্তা তো ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ও ভুল দেখছে না তো! যে-বাবা খেলার কথা বললেই সবসময় বলেন, এখন যাও তো, শুধু-শুধু বিরক্ত কোরো না, সেই বাবা ওকে হাসিমুখে আদর করে ডেকে নিয়ে বলছেন, কীরে, খেলবি নাকি–আয়। তোর ওই মুরগি-খেলনাটা নিয়ে আয় তো–যেটা বোতাম টিপলেই কঁক কঁক করে ডিম পাড়ে।

অবাক ভাবটা কেটে যেতেই শোন্তা মুরগি-খেলনাটা বের করে নিয়ে সোজা বাবার কাছে গিয়ে হাজির। মা রান্নাঘরে চায়ের জোগাড় করছিলেন। শোন্তা লক্ষ করেছে, মায়ের চোখেমুখে আনন্দ, অবাক হয়ে বাবাকে দেখছেন।

সেইদিন থেকেই অবাক হওয়ার শুরু। খেলা, হই-হুঁল্লোড়, গাড়ি চালিয়ে বেড়াতে যাওয়া, আর দরকার মতো বই নিয়ে শোন্তাকে ক্লাসের পড়া বুঝিয়ে দেওয়া– কী না করেছেন বাবা!

দেখতে-দেখতে কেটে গেছে তিনটে মাস। কিন্তু তারপর…শোন্তার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন ও বারান্দায় বসানো টবের ফুলগাছগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল, বাবা হঠাৎই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে দুশ্চিন্তা, ভয়। আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছেন। শোন্তা বাবা বলে ডাকতেই একটা অচেনা মানুষ ওর দিকে তাকিয়েছিল।

দ্যাখো, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে এই গাছটায়! শোন্তা বাবার মন ভালো করার চেষ্টা করছিল।

ফুল… চিন্তার ঘোর কাটিয়ে অস্পষ্টভাবে কী যেন বললেন বাবা। তারপর কথার শেষটুকু আবার শোনা গেল, যদি একটা ফুল জানত অনেকদিন সে ফুটে থাকবে…অথচ একদিন পরেই তাকে টুপ করে ঝরে পড়তে হত, তা হলে ফুলটার খুব কষ্ট হত…না রে?

শোন্তা কী বলবে বুঝতে পারছিল না। আর ঠিক তখনই মা চায়ের কাপ নিয়ে এসেছিলেন বারান্দার।

সেইদিন থেকে ধীরে-ধীরে পালটাতে শুরু করেছিলেন বাবা।

শোন্তা লেখাটা আবার পড়তে শুরু করল।

.

…ও বলে, শরেনের কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী নাকি চমকে যাবে। বলা যায় না, হয়তো নোবেল প্রাইজ-টাইজও জুটে যেতে পারে ওর কপালে।

মাস চারেক আগে প্রভাসের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল অফিসপাড়ায়, পার্ক স্ট্রিটে। অফিসের লাঞ্চের সময় বাইরে বেরিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাতে সিগারেট ছিল। কিন্তু সিগারেটের কথাটা আমার বোধহয় খেয়াল ছিল না। কীসব উলটো পালটা ভাবছিলাম। মাথার ভেতরে ভীষণ টেনশান ছিল। হঠাৎ আঙুলে ছ্যাকা লাগতেই চমকে উঠে সিগারেটটা ফেলে দিলাম, আর তখনই কে যেন আমাকে চেনা গলায় নাম ধরে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, প্রভাস। সেই কোনকালে আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। কসবায় থাকত, বেশ ডানপিটে আর বেপরোয়া ছিল। খেলাধুলো, আড্ডা, সিনেমা–কোনওটাই বাদ দিত না। কিন্তু কী করে যে ভালো রেজাল্ট করত কে জানে। সেই প্রভাস, বাইশ বছর পর, আমার সামনে।

চিনতে পারামাত্রই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম আমি। কোথায় হারিয়ে গেল একটু আগের টেনশান আর ক্লান্তি। তারপর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই শুরু হয়ে গেল আমাদের গল্প। কত পুরোনো কথা, কত ভুলে যাওয়া ঘটনা, কত হারিয়ে যাওয়া সুখের স্মৃতি। কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম আমি। প্রভাস আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ধরে রীতিমতো টানাটানি শুরু করে দিল। ও এমন যে, ওকে কখনও না বলা যায় না। অগত্যা অফিস থেকে ছুটি করিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। অফিসের পার্কিং স্পেসে আমার পুরোনো আমলের ফিয়াট গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল। ওটা আমি নিজেই চালাই। মাঝে-মাঝে নমিতা আর শোন্তাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়ায় বা আউটরাম ঘাটে বেড়াতে যাই। সেটা প্রভাসকে বলতেই ও ওর ড্রাইভারকে বলে দিল ওর মারুতিটা নিয়ে বাড়ি

চলে যাওয়ার জন্যে। আমি একটু হেসে ওকে বললাম, আমার ছ্যাকরাগাড়ি চড়তে তোর কষ্ট হবে না তো? উত্তরে ও যেটা বলল সেটা আর লেখা যাবে না।

সল্ট লেকে প্রভাসের বাড়ি দেখে যেমন তাজ্জব হয়ে গেলাম, তেমনই অবাক হয়ে গেলাম ওর ল্যাবরেটরি দেখে। বড়লোক ওরা বরাবরই, তবে প্রভাস যে-মাপের ল্যাবরেটরি করেছে তার জন্যে লক্ষ-লক্ষ টাকা দরকার। আমাকে ল্যাব দেখাতে-দেখাতে নানা কথা বলছিল প্রভাস। ও সাতটা কোম্পানির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার। গবেষণার জন্যে সরকারি টাকাও পায়, আর সংসার করেনি গবেষণা করবে বলে। কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝেই দরাজ গলায় হেসে উঠছিল ও। একটা সুখী মানুষের প্রাণখোলা হাসি। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওর তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

রাতের খাওয়াদাওয়া প্রভাসের বাড়িতেই করতে হল। তখন আমি নিজের কথা বলছিলাম। শোন্তার কথা, নমিতার কথাও বলেছি। শেষে বলেছি আমার দুশ্চিন্তা, টেনশান আর ক্লান্তির কথা। আমি জানি, অফিসে আড়ালে অনেকেই আমাকে বদমেজাজি, খিটখিটে বলে। না, কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি তো সাধ করে ওরকম হইনি। আমার মাথার ভেতরটা সবসময় যেন কেমন করে।

পরে বুঝেছি, প্রভাসকে ওই কথাগুলো বলেই আমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছি। প্রভাস সিগারেট ধরিয়েছিল। ফুরফুর করে ধোঁয়া ছেড়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, নরেশ, তোর এই প্রবলেম আমি এক্ষুনি সল্ভ করে দিতে পারি–।

আমি অবাক হয়ে বলেছি, সত্যি।

তখন প্রভাস আমাকে বলতে শুরু করল।

যখন আমাদের দুশ্চিন্তা, টেনশান, বদমেজাজ এসব হয়, তখন আমাদের শরীরের ভেতরে কারেন্ট বইতে থাকে। আসলে বায়োকারেন্ট থাকে সবসময়েই, কিন্তু সেটা এত কম যে, হিসেবের মধ্যেই আসে না। দুশ্চিন্তা, টেনশান এসব হলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, হার্ট বিট বেড়ে যায়, পাল্স রেটও যায় বেড়ে। এসবের মূলে হচ্ছে অটোনোমিক নার্ভস আর অটোনোমিক অরগ্যানিক স্টেট। তো এই অবস্থায় এক অদ্ভুত ধরনের বায়োরেডিয়েশান লক্ষ করেছি আমি। সেই রেডিয়েশান আর বায়োকারেন্ট–এই দুটোকে ব্যবহার করে তোর সব প্রবলেম সল্ভ করে দেওয়া যায়।

প্রভাস ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়েছিল। পরে আরও বহু ডিগ্রি কুড়িয়ে খ্যাতি পেয়েছে। ওর কাছেই শুনেছি, গত পাঁচ-সাত বছর ধরে ওর গবেষণা বায়ো-পার্টিকল্স-এর স্ট্রাকচার, ফিল্ড আর রেডিয়েশান নিয়ে। ও আমাকে আরও কীসব বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। বোঝার কথাও নয়। কোনওরকমে পাস কোর্সে বিএসসি পাশ করার পর আমি কস্ট অ্যাকাউনট্যান্সি পড়েছি। এখন বলতে গেলে শুধু জমা-খরচের হিসেব নিয়েই নাড়াচাড়া করি। সুতরাং প্রভাস খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে অনেক কিছু বললেও তার বেশিরভাগটাই বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো। হচ্ছিল।

প্রভাস তখন বলছে, শোন, তোর একটা অ্যান্টি-বায়ো-মডেল তৈরি করে দেব আমি। তার মধ্যে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা থাকবে। অ্যান্টি-বায়োকারেন্ট, অ্যান্টি-বায়োরেডিয়েশান–এইসব। ফলে যখনই তোর কোনও টেনশান বা দুশ্চিন্তা হবে, তখন ওই অ্যান্টি-বায়ো-মডেল তোর সমস্ত রিঅ্যাকশন শান্ত করে দেবে। এক মুহূর্তের জন্যেও তুই অশান্ত হবি না, তোর মেজাজ খারাপ হবে না কখনও। আর বালিশে মাথা ঠেকলেই গভীর ঘুম। তুই বোধহয় আর কখনও স্বপ্নও দেখবি না।

প্রভাস এমনভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাত নেড়ে সব বোঝাচ্ছিল যেন ব্যাপারটা জলের মতোই সহজ। আমি শুনতে-শুনতে একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। বুকের ভেতর থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে যাচ্ছিল ক্রমশ। আর ঠিক তখনই প্রভাস বলল, নরেশ, বুঝতেই পারছিস, এতসব সুবিধে তো একেবারে বিনি পয়সায় পাওয়া যায় না…।

টাকার কথা বলতে চাইছে নাকি প্রভাস? টাকা যে আমার একেবারে নেই তা নয়, তবে যদি ও খুব বেশি কিছু চেয়ে বসে…। সুতরাং ওকে সরাসরি জিগ্যেস করলাম, ঠিক করে বল তো, কত টাকা লাগবে?

প্রভাস হেসে বলল, দূর, টাকার কথা কে বলছে! আমি বলতে চাইছি.মানে… তুই এতসব সুবিধে পাবি ঠিকই, তবে তার জন্যে তোকে ছোট্ট একটু ঝামেলাও ঘাড়ে নিতে হবে।

আমার গলাটা হঠাৎ কেমন শুকিয়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, কী ঝামেলা?

বলছি– বলে প্রভাস হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নতুন আর একটা ধরাল। বলল, মানে…তোকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। নইলে বিপদ

হতে পারে।

বিপদ! প্রভাস বলে কী!

.

ঠিক এমনসময় মায়ের হাতের চুড়ির শব্দ শুনতে পেল শোন্তা। মায়ের স্নান শেষ। মা গুনগুন করে গান করছেন। পায়ে-পায়ে এদিকেই আসছেন বোধহয়। একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। কাগজগুলো আবার আগের মতো ভাঁজ করে রেখে দিল বাবার দরকারি বইয়ের ফাঁকে। তারপর ভূগোল বইটা খুলে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে।

মা ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিগ্যেস করলেন কীরে, কী পড়ছিস?

ভূগোল–শোন্তা বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই জবাব দিল। ওর মাথায় তখন বিপদের কথা ঘুরছিল। কীসের বিপদ হতে পারে বাবার?

প্রায় তিনটে দিন ছটফট করে কেটেছে শোন্তার। ও কিছুতেই বাবার লেখা কাগজগুলো আর পড়তে পারেনি। বাবাকে কিছু বলতেও পারেনি। শুধু চুপচাপ মানুষটাকে লক্ষ করেছে।

অবশেষে সুযোগ এল রবিবার বিকেলে। বাবা বললেন, আজ বেড়াতে বেরোবেন না। গাড়িটা কোনও মিস্ত্রিভাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে ভেতরটা প্লাস্টিক দিয়ে নাকি মুড়ে নেবেন। মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, এ আবার কী খেয়াল?

বাবা অস্পষ্টভাবে কী একটা বলে বেরিয়ে গেলেন।

আর তার একটু পরেই সুযোগ পেল শোন্তা। স্কুলের পড়া তৈরি করতে একগাদা বইখাতা নিয়ে ছড়িয়ে বসল ও। তারপর বাবার লেখা কাগজগুলো খুলে আবার লুকিয়ে পড়তে শুরু করল। মাকে নিয়ে এখন আর ভাবনা নেই। মা টিভির সামনে সিনেমা দেখতে বসে গেছেন।

.

...বিপদ! প্রভাস বলে কী!

আমি সাহস দেখিয়ে বললাম, কীসের বিপদ? খুলে বল তো শুনি–।

প্রভাস আমার কথার জবাব না দিয়ে জোরে হেসে উঠল। ওর বিশাল বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে সে-হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল যেন। একটু পরে হাসি থামলে প্রভাস বলল, নরেশ আমি দেড়বছর ধরে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্যে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এর অঙ্ক-টঙ্ক সব আমার আগেই কষা হয়ে গেছে। এখন শুধু হাতেনাতে পরখ করে দেখা বাকি। এমনই কপাল দ্যাখ, হঠাৎই আজ তোকে পেয়ে গেলাম। চল, ল্যাবে চল–।

প্রভাস উঠে দাঁড়াল। আমাকে একরকম হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ল্যাবের দিকে। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওকে অনুসরণ করলাম। দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের লোভ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আমার ব্যবহারে শোন্তা কিংবা নমিতা এরপর আর কখনও ব্যথা পাবে না। তবুও প্রভাসের বিশাল ল্যাবরেটরিতে পা রাখার সময় কোনওরকমে বললাম, একটু দাঁড়া। তুই যে কী একটা বিপদের কথা বলছিলি…।

প্রভাস আমার কথায় আমল না দিয়ে বলল, ও কিছু নয়। একটু সামলে থাকলেই হবে। আগে চল তো, কাজ শেষ করি–তারপর তোকে সব বুঝিয়ে দেব। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, একদম সিম্পল।

ল্যাবের একটা জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল প্রভাস। নানারকম বোতাম-টোতাম টিপে বেশ কয়েকটা রঙিন আলো জ্বেলে দিল। হঠাৎই দেখি আমাকে ঘিরে মেঝে খুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেল চকচকে চারটে দেওয়াল। দেওয়ালের বাইরে থেকে প্রভাস চেঁচিয়ে বলল, দেওয়ালগুলো নম্যাগনেটিক অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। তারপর ও কয়েকটা পাওয়ার সুইচ অন করে দিল। ফলে হাই পাওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড চালু হয়ে গেল, আরও কী কী যেন হল। ক্রিকেট খেলার কমেন্ট্রির মতো চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সব বলে যাচ্ছিল প্রভাস। ধীরে-ধীরে ওর গলার স্বর যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। তারপর একসময় আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন আবার সব টের পেলাম, তখন প্রভাসের বসবার ঘরে সোফায় বসে আছি। আর প্রভাস আমার পিঠ চাপড়ে বলছে, ..সেরকমভাবেই চলবি। তোর আর কোনও চিন্তা নেই, নরেশ। এবার সত্যিই তুই নরেশমানে, রাজা। এই দুনিয়ায় তুই-ই সবচেয়ে সুখী। তবে ছোট্ট একটা ব্যাপারে তুই একটু খেয়াল রাখিস… প্রভাসের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। একটু থেমে-থেমে ও বলল, তুই নিশ্চয়ই

এটুকু বুঝতে পারছিস যে, তোর অ্যান্টি-বায়ো-মডেলটা অ্যান্টিম্যাটার দিয়ে তৈরি। ম্যাটারে যেমন ইলেকট্রন কণা থাকে, অ্যান্টিম্যাটারে তেমনই থাকে পজিট্রন। আর সাধারণ পদার্থের প্রোটনের জায়গায় অ্যান্টিম্যাটারে থাকে অ্যান্টিপোটন। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরকে স্পর্শ করলেই সর্বনাশ। সাংঘাতিক বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে বিকিরিত হবে অ্যানিহিলেশন রেডিয়েশান। আর তৎক্ষণাৎ ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার–দুটোরই অস্তিত্ব শেষ। মানে তোর আর তোর মডেলের সংঘর্ষ যদি হয় তা হলে তোরা দুজনেই শেষ। তুইও থাকবি না, আর শরেনও থাকবে না।

আশ্চর্য! প্রভাসের কথা শুনে আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা হল না। বরং ওর শেষ কথাটায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, শরেন মানে?

ও হো-হো করে হাসল। তারপর বলল, বুঝলি না? তোর অ্যান্টি-বায়ো-মডেলের আমি নাম রেখেছি শরেননরেশের ঠিক উলটো। শরেনকে দেখতে হুবহু তোর মতো–শুধু ওর দেহটা খানিকটা স্বচ্ছ…মানে অনেকটা ঘষা কাচের মতো। তবে ওর ভেতরটা তোর একেবারে উলটো– ম্যাটার, অ্যান্টিম্যাটার। আবার হেসে উঠল প্রভাস। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ওর চোখেমুখে অহঙ্কার টগবগ করে ফুটে বেরোচ্ছে। ওর ঘরের দেওয়ালে নানা বিজ্ঞানীর ফটোগ্রাফ বাঁধানো। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাকের ফটোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল প্রভাস। আবেগভরা গলায় বলল, অ্যান্টিপার্টিলের ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন পল ডিরাক ১৯৩০ সালে। তখন তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু দু-বছর পরেই মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল ডেভিড অ্যান্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯৩৩-এ ডিরাক নোবেল পুরস্কার পান। আমার দিকে ফিরে তাকাল প্রভাস : আমার পরীক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হল শরেন। ওর কথা সবাই যখন জানবে তখন তাজ্জব হয়ে যাবে– কী বলিস? কে বলতে পারে, হয়তো নোবেল প্রাইজও জুটে যেতে পারে আমার কপালে।

হঠাৎ করেই আমার মনে হল প্রভাসের বোধহয় মাথার ঠিক নেই। বেঁকের মাথায় এ কোন ফাঁদে পা দিলাম আমি! এখন কি আর ফেরার পথ আছে? কিন্তু প্রভাসের পরীক্ষার কোনও ভুল হয়নি। ওর মুখে এরকম বিপদের কথা শুনেও কেমন শান্ত, স্থির রয়েছি আমি। সত্যিই দুশ্চিন্তা আর টেনশান একেবারে নেই। ভীষণ হালকা লাগছে। শুধু মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। প্রভাসকে সেটা বলতেই ও বলেছে, ওটা হাই-ইনটেনসিটি ফিল্ডের জন্যে। একটু পরেই সব ঠিক

হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ওকে জিগ্যেস করলাম, শরেন, মানে, ওই মডেলটা এখন কোথায়? সেই বুঝে আমাকে তো চলাফেরা করতে হবে।

প্রভাস বলল, নরেশ, সত্যি বলছি, শরেন কোথায় আছে আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, যে-মুহূর্তে আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে শরেনের জন্ম হয়েছে। আমার থিয়োরি বলছে, এই অ্যান্টি-বায়োমডেলটা তোর ঠিক দুশো কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থাকবে। আর তোর বায়োফিল্ডের টানে ওটা তোর কাছে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। অন্য কোনও মানুষ বা অন্য কোনও জিনিসের দিকে শরেনের কোনও টান থাকবে না। এক্সপেরিমেন্টের পর ঠিক কোন কো-অর্ডিনেটে শরেন অ্যাপিয়ার করবে, এটা আমার জানা নেই। থিয়োরির ওই জায়গাটা একটু ঝাপসা রয়ে গেছে। সবই স্পেস-টাইম আর ফিল্ড-রেডিয়েশানের ব্যাপার। সে যাকগে, দুশো কিলোমিটার দূরত্ব মানে প্রায় একত্রিশ হাজার চারশো বর্গকিলোমিটার এলাকা শরেনকে খুঁজতে হবে। ফলে ও চট করে তোকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তোর রেডিয়েশনের সিগন্যাল ওর অ্যানটেনায় সবসময় ধরা পড়বে।

শোন্তার কথা মনে পড়ল আমার। নমিতার কথা মনে পড়ল। কেমন একটা ব্যথা টের পেলাম বুকের ভেতরে। শরেন যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পায়! ওকে ঠেকানোর কি কোনও উপায় নেই? সে-কথা প্রভাসকে জিগ্যেস করতেই ও কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে তারপর বলল, একটা জিনিস দিয়ে শরেনকে হয়তো আটকানো যায়–তবে আমি কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি।

কী জিনিস? অনেক আশা নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

আয়োনাইজড পলিমারমানে, আয়োনাইজড প্লাস্টিকও হতে পারে। কিন্তু বললাম যে, ওতে কতটা কাজ হবে ঠিক জানি না।

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেমন একটা নেশার মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। আমার। কোথা থেকে কী হয়ে গেল! দুশ্চিন্তা, টেনশান, ক্লান্তি, খিটখিটে রুক্ষ স্বভাব হয়তো আমার আর থাকবে না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মনের মধ্যে এক অসহায় ভয় বাসা বেঁধেছে। আর বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত কষ্ট। নমিতা যদি এসব জানত! আমার ক্লাস সেভেনে পড়া ছোট্ট মেয়েটা যদি এসব জানত! তা হলে ওরা বোধহয় আগের খিটখিটে মানুষটাকেই মেনে নিত।

প্রভাসের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ও বলল, তোর দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন সুখের হোক।

আমি কোনও জবাব দিলাম না, পেছন ফিরেও তাকালাম না। গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম বাড়ির দিকে।

ফেরার পথে একটা মানুষকে আমার চোখ খুঁজে বেড়াল। শরেন, তুই কোথায়?

.

পড়তে-পড়তে শোন্তা থামল। বাবার লেখা ও সবটা যে বুঝতে পারছে তা নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের জায়গাগুলো বেশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলেও বাবার কষ্ট বুঝতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এখন ও বুঝতে পারছে, কেন বাবা গাড়িটাকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়তে চাইছেন। ওই প্লাস্টিকটা নিশ্চয়ই আয়োনাইজড প্লাস্টিক।

এর পরের লেখাগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া। স্কুলের পড়া ভুলে সেই লেখাগুলো পড়তে লাগল শোন্তা।

.

...শরেনকে আমি দেখতে পেয়েছি! গত পরশু সন্ধেবেলা রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে একটা বস্তিতে ঢোকার মুখে হঠাৎই শরেনকে দেখতে পেলাম। একটা অশথ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্বিকার হবে না কেন? ওর যে শুধু একটাই কাজ আমাকে খুঁজে বের করা।

বাথরুমের কলটা সারানোর জন্যে কলের মিস্ত্রিকে খবর দিতেই ওই বস্তিটায় ঢুকেছিলাম আমি। আর প্রভাসের এক্সপেরিমেন্ট, শরেন, অ্যান্টি-বায়ো-মডেল–এসবের কথা ভাবছিলাম। এমন সময় ওকে দেখতে পেলাম।

প্রভাস ঠিকই বলেছিল, ওকে হুবহু আমারই মতো দেখতে। গায়ে কালো জামা আর কালো প্যান্ট। আধো-অন্ধকারে অন্তত তাই মনে হল। আর সবচেয়ে ভয় পাইয়ে দেয় ওর মুখ। সে-মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। যেন পাথর কেটে তৈরি এক মরা মানুষের মুখ। বরফের মতো ঠান্ডা।

আমাকে দেখতে পেয়েই শরেনের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল বলে মনে হল। ও পা বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল আমার দিকে। লাইটপোস্টের আলোয় ওর হাসিটা ব্যঙ্গের অথবা তাচ্ছিল্যের হাসি বলে চিনতে পারলাম। আর তারপরই আমি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি শরেনও এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওর মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখনও পাথর আর বরফ। আমি ভাবছি…।

…শরেনকে আবার দেখলাম। রবিবার, সন্ধের মুখে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছে। নমিতা আর শোন্তাকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ছুটে যাওয়া গাড়িঘোড়ার মধ্যে দিয়েই রাস্তা পার হয়ে শরেন আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। সামান্য যেটুকু সময় ওর দিকে তাকিয়েছি তাতেই লক্ষ করেছি, প্রভাস মিথ্যে বলেনি। শরেনের শরীর খানিকটা স্বচ্ছ। কারণ, ওর ঠিক পিছনে দাঁড়ানো একটা লোককে আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি চট করে নমিতা আর শোন্তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইলাম। ওরা অবাক হয়ে আমাকে অনেক কথা জিগ্যেস করছিল, কিন্তু আমি কোনও জবাব না দিয়ে সংক্ষেপে শুধু বলেছি, পরে বলব। তারপর তাড়াতাড়ি সরে পড়েছি সেখান থেকে। আমার বুকের ভেতরে হাপর টানার শব্দ হচ্ছিল।

.

শোন্তার স্পষ্ট মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র দু-সপ্তাহ আগে, রবিবারেই হয়েছিল এই ব্যাপারটা। কেনাকাটা শেষ না করে আচমকা চলে আসার জন্য মা কম ঝগড়া করেননি বাবার সঙ্গে। আর শোন্তাও রাগ করে পুরো একটা দিন বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। সোমবার রাতে বিছানায় শুয়ে বাবা বড় একটা শ্বাস ফেলে বলেছিলেন, একদিন তোরা সব বুঝতে পারবি।আজ সেই কারণটা জানতে পেরে শোন্তার কষ্ট হল। আর রাগ হল বাবার বন্ধুর ওপর।

ও খাপছাড়া লেখাগুলো আবার পড়তে শুরু করল।

.

..প্রভাসের কাছে আমি অনেকবার ছুটে গেছি মুক্তির আশায়, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ও শুধু বলেছে, একবার যদি তুই শরেনের চোখে ধুলো দিতে পারিস,

তা হলে ওর পুরোনো স্মৃতি সব মুছে যাবে। ও আবার নতুন করে একতিরিশ হাজার চারশো বর্গকিলোমিটার এলাকায় তোকে খুঁজতে শুরু করবে। তবে চিন্তা করিস না। আমি অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করছি। ওটা সাকসেসফুল হলে বোধহয় তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারব– আমার কেমন মনে হচ্ছিল, প্রভাস আমার কাছে সব সত্যি কথা খুলে বলছে না।

তারপর থেকে আর মিথ্যে আশা নিয়ে প্রভাসের কাছে ছুটে যাইনি। শরেনের দেখা পেলেই ওর চোখে ধুলো দিয়ে শুধু নিজের আয়ু বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এভাবে আর কতদিন! প্রভাস বলেছিল আয়োনাইজড প্লাস্টিকের কথা। সেটা জোগাড় করার জন্যেও কম চেষ্টা করিনি, কিন্তু কোনও খোঁজ পাইনি।

শোন্তাকে, শোন্তার মাকে, আমি এত ভালোবাসি যে, ওদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে…।

.

শোন্তাকে ছোটবেলায় বাবা প্রায়ই জিগ্যেস করতেন, আমাকে তুই কতটা ভালোবাসিস রে?

উত্তরে শোন্তা ওর ছোট-ছোট দুটো হাত দুপাশে টান-টান করে বলত, এই এত্তখানি।এখন, এই মুহূর্তে ওর মনে হল, ওর হাত দুটো খুব ছোট। বাবাকে ও এত ভালোবাসে যে, ওই দুটো হাত টান-টান লম্বা করেও সেই ভালোবাসার এতটুকুও বোঝানো সম্ভব নয়। ওর হাত দুটো যদি ভগবানের হাতের মতো লম্বা হত!

.

অনেক কষ্টে আয়োনাইজড প্লাস্টিকের সন্ধান পেয়েছি। একজন মেকানিককে ধরেছি, সে প্লাস্টিক দিয়ে গাড়ির ভেতরটা মুড়ে দেবে। তারপর কোনও টেলারিং-এর দোকান থেকে ওই প্লাস্টিকের একটা জামা-প্যান্ট তৈরি করে নেব।

দেখি, পারলে কালই গাড়িটা নিয়ে যাব মেকানিকের কাছে…।

.

বাবার লেখা এখানেই শেষ। মানুষটার কষ্ট, মানুষটার বারবার পালটে যাওয়া সবকিছু এখন। বুঝতে পারছিল শোন্তা। কিন্তু কী করবে ও এখন? বলবে মাকে? নাকি…।

ক্রি রি রিং, ক্রি রি রিং…।

টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের ভেতরে।

শোন্তা চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। মা ও-ঘরে টিভি দেখছেন। নিশ্চয়ই ফোনের বাজনা শুনতে পাননি।

হ্যালো—

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর নেই।

তারপর ও-প্রান্ত থেকে ভাঙা-ভাঙা গলায় কেউ জিগ্যেস করল, এটা নরেশ দত্তর বাড়ি?

শোন্তা চটপট জবাব দিল, হ্যাঁ, বলুন—

নরেশবাবু বাড়ি আছেন?

না, উনি একটু বেরিয়েছেন। আপনি কে কথা বলছেন? বাবা বাড়িতে থাকলে শোন্তা কখনও এ-প্রশ্ন করে না। সেটা অভদ্রতা।

তুমি কে বলছ? ও-প্রান্তের আড়ষ্ট গলা পালটা প্রশ্ন করল।

শোন্তার খুব রাগ হল। কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বলল, আমি ওনার মেয়ে। আপনি কে বলছেন?

আবার পালটা প্রশ্ন : তোমার বাবা কখন বাড়ি ফিরবেন?

শোন্তা কোনওরকমে বিরক্তি চেপে বলল, ঘণ্টাখানেক পরে ফিরতে পারেন।

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর যেন আপনমনেই বিড়বিড় করল, তা হলে তো অনেক সময়…।

উনি ফিরলে কি কিছু বলতে হবে? শোন্তা জিগ্যেস করল।

নাঃ, তার দরকার নেই, আমি দেখা করে নেব।

কিন্তু আপনার নাম বললে ভালো হত। বাবা ফিরলেই খবরটা দিতাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর বলল, শুধু বোলো, শরেন দত্ত ফোন করেছিল। এটা বললেই তোমার বাবা সব বুঝতে পারবেন।

ফোনের লাইন কেটে গেল।

শোন্তার হাত কাঁপতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল। লোকটা বলেছে, আমি দেখা করে নেব।

রিসিভার রেখে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগল।

মা ছুটে এলেন টিভি ছেড়ে। শোন্তা মাকে নিয়ে দৌড়ে গেল বারান্দায়। তাকাল রাস্তার মোড়ের দিকে। ওই পথ ধরেই গাড়ি নিয়ে ফিরবেন বাবা। ফিরবেন তো?

কয়েক মিনিট পরেই বিস্ফোরণের ভয়ংকর শব্দটা ওরা বারান্দা থেকেই শুনতে পেল। আগুন আর কালো ধোঁয়ার মেঘও দেখা গেল। ঝুলবারান্দা কেঁপে উঠল থরথর করে। আয়োনাইজড প্লাস্টিক শরেনকে আটকাতে পারেনি।

# মায়াযৌবন

**মায়াযৌবন**

বছর বিশ-বাইশের যুবকটিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, ওর আসল নাম প্রতাপ, কিন্তু আমি ওর নাম রেখেছি মৃত্যুঞ্জয়।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

হাসলেন বৃদ্ধ—মজা পাওয়ার হাসি। তারপর মাথার একরাশ সাদা চুলে আয়েস করে হাত চালিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। খসখসে গলায় বললেন, কারণ, আমি চাই, জরাকে ও জয় করুক। ও কখনও আমার মতো বৃদ্ধ হবে না। ওর চামড়ায় কখনও ভাঁজ পড়বে না। ওর চুলে কখনও পাক ধরবে না। ওর শরীর কখনও আমার মতো অকেজো-অথর্ব হয়ে পড়বে না। আর ওর মনে কখনও বার্ধক্যের ভীমরতি বাসা বাঁধবে না।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। জরাগ্রস্ত এই মানুষটি জরাকে জয় করতে চান! ওঁর মাথার কোনও গোলমাল হয়নি তো!

বৃদ্ধের নাম প্রলয়নাথ আচার্য। বয়েস প্রায় সত্তর-বাহাত্তর। বয়েসের তুলনায় স্বাস্থ্য মন্দ নয়। শক্তপোক্ত লম্বা কাঠামো। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। চশমার পাওয়ার বোধহয় খুব বেশি। কারণ, কাচের দিকে তাকালে সাদা-সাদা রিঙের মতো দাগ দেখা যায়।

প্রলয়নাথের মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। একইরকম ভাঁজ হাতের পিঠেও। বোঝা যায়, জরা বেশ ভালোরকমই থাবা বসিয়েছে।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই মানুষটার বিচিত্র নাম আমাকে অবাক করেছিল। তারপর ওঁর কথাবার্তা যতই শুনছি, ততই যেন অবাক হচ্ছি।

একটা মাঝারি মাপের ঘরে আমরা দুজনে বসেছিলাম। ঘরের সবকটা জানলাই বন্ধ। কারণ, তার ওপিঠেই হাড়কাঁপানো শীত। কিন্তু তবুও আমার শীত করছিল। ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার, ঠিকমতো কাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল না।

আমাদের সামনে কারুকাজ করা শৌখিন চায়ের টেবিল। টেবিলে চায়ের কাপ। কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে প্রলয়নাথ বললেন : জেরাটোলজির নাম শুনেছেন? জরাবিজ্ঞান? মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে, জরাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন তৈরি হবে।

প্রলয়নাথের ঘোলাটে চোখে আলোর ঝিলিক দেখা গেল। ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন তিনি। তারপর আমার চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ব্যাপারটা দারুণ হবে, না?

আমি এই বৃদ্ধের মনে আঘাত দিতে চাই না। তা ছাড়া আজ কয়েকদিন হল উনি জোর করে আমাকে নিয়ে আসছেন ওঁর বাড়িতে। চা-বিস্কুট-জলখাবার খাওয়াচ্ছেন। গল্প-সল্প করছেন। এই আতিথেয়তার প্রতিদান কি ওঁর স্বপ্ন-চুরমার করে দেওয়া বাস্তবের রূঢ় আঘাত!

সুতরাং মিনমিন করে জানালাম, ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ হবে।

প্রলয়নাথের ব্যাপার কিন্তু তখনও পাথরের মূর্তির মতো ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পুরু গোঁফ, ফরসা রং রোদে পুড়ে তামাটে, নিষ্পাপ সরল মুখে প্রাণবন্ত দুটি চোখ যেন কথা বলছে।

প্রতাপের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের কথাবার্তা ও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু প্রলয়নাথ ডেকেছেন বলে ও বাড়ির অন্দর থেকে যান্ত্রিকভাবে এসে হাজির হয়েছে।

প্রলয়নাথ ওকে ডেকেছিলেন পরতাপ বলে। সেই সম্বোধন আর ওর হাবভাব মিলিয়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল, প্রতাপ বোধহয় স্থানীয় লোক-রাজপুত। এখন বৃদ্ধের কথায় বোঝা গেল সন্দেহটা সত্যি ।

মোহনবাবু– খসখসে গলায় আমার নাম উচ্চারণ করলেন প্রলয়নাথ। শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপর ও পাপ-মানে, প্রতাপ–আমার কাছে আছে আজ প্রায় আট বছর। সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি থেকে আজ ও জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছে। তাই আমি ঠিক করেছি, ওকেই দেব চিরযৌবন রিওয়ার্ড হিসেবে।

চা খেতে-খেতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। একটা পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল মাথার ভেতরে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, প্রলয়নাথের বাড়িতে আমার রোজকার সান্ধ্য চায়ের আমন্ত্রণের পাট এবার বোধহয় ফুরোল। তিনি কাকে রিওয়ার্ড দেবেন-না-দেবেন সেটা তার মর্জির ব্যাপার। না, প্রতাপ অথবা মৃত্যুঞ্জয় ভারতরত্ন উপাধি পেলেও আমার মতো ছাপোষা মানুষের কোনও আপত্তি নেই। আর থাকলেই বা পাত্তা দিচ্ছে কে! কিন্তু রোজ যদি চা-জলখাবারের বিনিময়ে জরাবিজ্ঞানের ছদ্মবেশে চিরযৌবন লাভের গল্পগাথা শুনতে হয় তা হলে বড় সমস্যা। কারণ, হাসি পেলেও গম্ভীর প্রাজ্ঞ প্রলয়নাথের সামনে আমি হাসতে পারব না।

চিরযৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা কি আজকের! মনে পড়ে গেল যযাতির কথা। তারপর সাজগোজ, রূপচর্চা, শরীরের যত্ন, মাথার চুল ধরে রাখা, সবকিছুরই আড়ালে রয়েছে চিরকাল যৌবন ধরে রাখার সাধ। মানছি, আমার তেত্রিশ বছর বয়েসটাকে ধরে রাখতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু সাধ আর সাধ্য কি এক ব্যাপার!

এ কদিন প্রলয়নাথ কখনও জরাবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তোলেননি। শুধু আমার সম্পর্কে কৌতূহল দেখিয়ে নানান খোঁজখবর করেছেন। বাড়িতে কে কে আছেন? বিয়ে করেছি কি না? কলকাতা ছেড়ে রাজস্থানের এই শিল্পনগরীতে চাকরি নিয়ে চলে এসেছি কেন? সে কি বাবা-মায়ের ওপরে রাগ করে?

সত্যি কথা বলতে কি, এই বৃদ্ধ মিশুকে মানুষটি ওঁর আন্তরিক ব্যবহারে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। কিন্তু আজ এই জরাবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ আলটপকা শুরু করে তিনি আমাকে বেশ একটা ধাক্কাই দিয়েছেন।

অথচ মানুষটাকে দেখে আমার কখনও পাগল বলে মনে হয়নি।

তা হলে কি তিনি চিরযৌবন পাইয়ে দেওয়ার ফঁাদ পেতে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চান আমার কাছ থেকে?

মোহনবাবু, প্রতাপের মধ্যে আমি ইতিমধ্যেই এমন কিছু-কিছু লক্ষণ দেখতে পেয়েছি যা দেখে বলা যায়, আমার ড্রাগগুলো ঠিকমতো কাজ করছে। ওর বয়েস বাড়ার গতি গত দু-বছরে বেশ কমে গেছে।

আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। হঠাৎ উথলে ওঠা হাসির বেগটা সামাল দিতে গিয়ে বিষম খেলাম। কাশির দমকে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল চায়ের কাপ। ঘরের মেঝেতে বিছানো ফুল পাতা-হরিণের নকশা কাটা জয়পুর কার্পেট তরলটুকু শুষে নিল, আর কারুকাজ করা কাচের কাপটির প্রাণ বাঁচাল।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। চেয়ার থেকে উঠে কাপটা তুলে নিতে ঝুঁকে পড়েছি, প্রলয়নাথ চাপা গলায় বাধা দিলেন আমাকে, থাক, থাক, ছেড়ে দিন। তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে বললেন, পাপ, সাফি মারো–

প্রতাপ যন্ত্রের মতো এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। নীচু হয়ে নীরবে কাজ সারতে লাগল।

আপনাকে আর-এক কাপ চা দিই?

প্রলয়নাথের প্রস্তাব আমি বিনীতভাবে ফিরিয়ে দিলাম। দুঃখপ্রকাশ করলাম দুর্ঘটনার জন্যে। তারপর বললাম, আজ চলি। অনেকটা পথ যেতে হবে…।

যাবেন? আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে খসখসে গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি।

আমি কোনও উত্তর না দেওয়ায় কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, আচ্ছা, যান। কাল সন্ধেবেলা আসছেন তো? আপনাকে আমার ল্যাবরেটরি দেখাব। জেরাটোলজি ভারী ইনটাররেস্টিং সাবজেক্ট…।

আমি বললাম, দেখি।

প্রলয়নাথ আমার কাছে এগিয়ে এলেন। ওঁর জরাজীর্ণ হাতে আমার হাত চেপে ধরলেন ও মোহনবাবু, কাল আপনাকে আসতেই হবে। বিদেশ বিভুঁইয়ে আপনার

মতো একজন আপনজনকে আমি একদিনের জন্যেও খোয়াতে রাজি নই। আপনি এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন একমাস। আর আমি এই কোটা শহরে আছি বাইশ বছর। বাংলা কথা প্রায় ভুলতে বসার জোগাড়। বাড়ির বউ মেয়ের একঘেয়ে কথাবার্তা আর কাহাতক ভালো লাগে? কাল আসবেন কিন্তু। প্লিজ...।

বৃদ্ধের চোখে নীরব মিনতি ছিল। কী যে হল আমার, ঘাড় নেড়ে কথা দিলাম ওঁকে ও আসব। কিন্তু আমি মনে-মনে জানতাম, ওঁর বাড়িতে না এসে আমার উপায় নেই। এমন একজনকে আমি এ-বাড়িতে দেখেছি, যার টানে আমাকে আসতেই হবে।

প্রলয়নাথ আমাকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বসবার ঘরে প্রতাপ, ওরফে মৃত্যুঞ্জয়, তখন কার্পেট পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত।

রাস্তায় বেরোতেই শীত আঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ে। মাফলারটা ভালো করে গলায় আর কানে মুড়ি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম প্ল্যান্টের দিকে।

রাজস্থানের কোটা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে চাকরি নিয়ে আমি এসেছি আজ প্রায় একমাস। চাকরি না পালটালে বাকি জীবনটা বোধহয় এখানেই কাটাতে হবে। কলকাতায় পিছুটান বলতে বাবা মা, ছোট ভাই, আর ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি। হয়তো পুরোনো কথা ভুলতে চাই বলেই একরকম জেদ করে এই চাকরি নিয়ে আমি কলকাতা ছেড়েছি। ছোটভাই ভালোই চাকরি করে। সুতরাং সচ্ছলভাবে মা-বাবার দিন কেটে যাবে।

আমি এই নতুন জায়গায় এসে নতুন মানুষজন আর প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা করছি– যাতে কলকাতার কথা বেশি মনে না পড়ে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে কই! দুঃখ ভুলতে এত কষ্ট হয় কেন কে জানে!

থাকার জন্যে আমাকে আপাতত একটা ছোট কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। দিনের বেলা ক্যান্টিনে খাওয়াদাওয়া সারি, আর রাতে ডিমসেদ্ধ, আলুভাজা, আর দুমুঠো ভাত ফুটিয়ে ম্যানেজ করি। রান্নার অভ্যেস কোনওকালেই ছিল না। সুতরাং সে যে কী মর্মান্তিক অগ্নিপরীক্ষা, তা শুধু আমিই জানি। আমার হাতে-পায়ে নানান ফোস্কার দাগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এক-একদিন বিরক্ত হয়ে মুড়ি, পাঁউরুটি, কিংবা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়ি। সঙ্গে ঢকঢক করে দু-গ্লাস জল। তবে কষ্ট যতই হোক, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, কলকাতায় সহজে ফিরছি না।

ভোরবেলা আমি চম্বল নদীর তীরে বেড়াতে বেরোই।

সময়টা জানুয়ারির শেষ, কিন্তু তাই বলে শীতের ধার কমেনি। তা ছাড়া, আমি বরাবরই বেশ শীতকাতুরে। তাই ডবল সোয়েটার, মাফলার, মাঙ্কি ক্যাপ ইত্যাদি পরে ভোরবেলা চম্বল নদীর তীরে পায়ে হেঁটে শীতের সঙ্গে কুস্তি করি। শরীরের প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা–শুধু চোখ দুটি ভোলা। ঠিক যেন দস্যু মোহন।

এইরকম সাজে রোজ পায়চারি করি, আর রংবেরঙের পাখি দেখি। ওদের পালকগুলো যেন ঈশ্বর এঁকে দিয়েছেন রামধনু-রং তুলি দিয়ে। নদীর জল, আকাশ, আর পাখি আমাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। বুঝতে পারি, প্রকৃতির টান এড়ানো কী কঠিন।

এইরকম এক সকালে, তখন সবে সূর্য উঠেছে, সোনালি রং ঝিলিক মারছে চম্বলের জলে– পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, বাঙালি নাকি?

বেশ অবাক হলাম। শুধুমাত্র চোখ দেখে বাঙালি বলে চিনতে পারে এমন প্রতিভাবান মানুষটি কে।

চোখ ফিরিয়েই দেখি, সুঠাম চেহারার এক বৃদ্ধ। পরে জেনেছি, তার নাম প্রলয়নাথ আচার্য। বিশ বছরের ওপর কোটায় আছেন। কী একটা কসমেটিক্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন রিটায়ার করেছেন প্রায় দশ-এগারো বছর।

আমার অবাক দৃষ্টির উত্তরে সামান্য হেসে লোলচর্ম প্রলয়নাথ খসখসে গলায় বলেছিলেন, আপনার মাফলারের আঁচলে নামের প্রথম অক্ষর ম সুতো দিয়ে সেলাই করা আছে। তা থেকেই আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছি।

আদ্যক্ষর খোদাই করাটা মায়ের কাণ্ড–যাতে আমার আর ভাইয়ের জিনিস ওলটপালট না হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। একটা নগণ্য মকারান্ত ব্যাপার দেখতে পেয়েছেন!

এইভাবে প্রথম আলাপের পর প্রলয়নাথ দেখা হলেই গল্প জুড়ে দিতেন আমার সঙ্গে। আর তার সঙ্গে নানান কৌতূহল মেটাতে চাওয়া প্রশ্ন। এ দেশে বহুবছর থাকার জন্যে ভদ্রলোকের বাংলা কথায় এদিককার রাজস্থানি টান জুড়ে গেছে।

ওঁর কাছেই শুনেছি, সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার মিটার উঁচু এই কোটা শহরটা এক বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা–যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে কোট। কোট থেকেই নাকি এসেছে শহরের নাম–কোটা।

এক-দু-দিন আলাপের পরই বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন। চা খেতে-খেতে প্রলয়নাথ বলেন, জানেন তো, মোহনবাবু, দুজন বাঙালি একজায়গায় জুটলেই চায়ের পেয়ালায় রাজা-উজির মারতে থাকে। সুতরাং আমার বাড়িতে আপনার রোজ চায়ের নেমন্তন্ন রইল। প্রতিদিন সন্ধেবেলা বসে ঘণ্টাখানেক কি ঘন্টাদুয়েক রাজা-উজির মারা যাবেখন।

প্রলয়নাথের বাড়িটা আমার প্ল্যান্ট থেকে হাঁটাপথে মিনিটপনেরো। সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। সামনে-পেছনে খানিকটা করে বাগান। পিচের রাস্তা থেকে রুক্ষ পাথুরে রাস্তা খানিকটা ভেতরদিকে চলে গেছে, একেবারে বাড়ির কাছ পর্যন্ত। বাড়ির পাশে একটা বড়সড়ো খাদ। বোধহয় কেউ একসময় মাটি খুঁড়ে পুকুর তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।

প্রথমদিন বাড়িতে গিয়ে আলাপ হয়েছে প্রলয়নাথের বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে।

মোহনবাবু, আমার বউ অনুরাধা– বসবার ঘরে আমাকে বসিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমার সহধর্মিনী–এটাই হল লিটারাল টুথ। আর অনুরাধা, ইনি মোহন দাশশর্মা। পাওয়ার প্ল্যান্টে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছেন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কী, তাই তো?

শেষ প্রশ্নটা আমাকে লক্ষ করে।

আমি নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, উনি ঠিকই বলেছেন।

অনুরাধাকে দেখছিলাম আমি। ছোটখাটো চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ঠোঁটের ওপরে, ডানদিকে, বেশ বড় একটা কালো রঙের আঁচিল। বয়েসকালে ওটাই বোধহয় বিউটি স্পট ছিল, এখন শুধুই স্পট।

অনুরাধার গাল ভাঙা, মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ। একটা চোখে সাদাটে ভাববোধহয় ছানি পড়েছে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর আর কপালে বড় সিঁদুরের টিপ।

অনুরাধার গায়ে কালচে সবুজ রঙের একটা কম্বলজাতীয় শাল জড়ানো থাকায় ওঁর পরনের শাড়ির নীচটুকু দেখা যাচ্ছিল। যোধপুরী বাঁধনি শাড়ি। তাতে তেরছাভাবে লাল-হলুদ-নীল রঙের খেলা। ওঁর বয়েসের সঙ্গে শাড়ির উজ্জ্বল রং আমার বেশ বেমানান লাগছিল। তবে এমন হতে পারে যে, ওঁর স্বামী হয়তো এরকম উজ্জ্বল রং-ই পছন্দ করেন।

শুধু মুখটুকু ছাড়া অনুরাধার শরীরের আর কোনও অংশ দেখা যাচ্ছিল না। শাড়ির ওপরে শালটা এতই বড় এবং পুরু যে, ওঁকে ফোলানো-ফঁপানো কোলবালিশ বলে মনে হচ্ছিল। এছাড়া পায়ে মোজা আর অর্ধেক পা-ঢাকা রবারের চটি।

ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারী মিষ্টি। চোখ বুজে কথা শুনলে বয়েস ঠাহর করা মুশকিল অনেকটা লতা মঙ্গেশকরের মতো।

তিনি স্নেহমাখানো গলায় আমাকে বললেন, আপনি রোজ হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান?

ওঁর কথায় একেবারে হইহই করে উঠলেন প্রলয়নাথ, আপনি অনায়াসে আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন।

আমি লজ্জা পেয়ে আপত্তি জানালাম।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল, রোজ সন্ধেবেলা চা-জলখাবার খেতে ওঁদের বাড়িতে আমি আসব। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছাড়লেন প্রলয়নাথ।

অনুরাধা চলে যাওয়ার পর আমরা চা খেতে-খেতে গল্প করছিলাম।

মাঝারি মাপের ঘর ছিমছামভাবে সাজানো। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো মিনিয়েচার পেইন্টিং এ জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের শয্যাকক্ষ। মেঝেতে ফুলপাতার নকশা করা কার্পেট। ঘরের একপাশে দুটো খাটো টুল। কাঠের ফ্রেমে চামড়া দিয়ে বাঁধানো। চামড়ায় ওপরে ফুল আর জ্যামিতির নকশা। ঘরের একদিকের দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের ফটো বাঁধানো। সেখানে দুটো ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপের উগ্র গন্ধ ছেয়ে গেছে ঘরের বাতাবরণে।

প্রলয়নাথের অনুমতি নিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

তিনি বললেন, আমি একসময় খুব সিগারেট খেতাম। বুকে কষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া সিগারেট খেলে বয়েসটা তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে চায়। আপনি পারলে এই বদ নেশাটা ছেড়ে দেবেন।

কথায় কথায় প্রলয়নাথ বলেছিলেন, বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ওঁর আগ্রহ আছে। কিন্তু জেরাটোলজির কথা স্পষ্ট করে বলেননি।

মনে পড়ছে, প্রতাপ সম্পর্কে তিনি সেদিন মাত্র একটা-দুটো কথা বলেছিলেন।

পরতাপ চওহান বুন্দির ছেলে। আট বছর আগে দশেরার মেলায় কীভাবে কোটায় চলে আসে। তারপর আত্মীয়স্বজন কাউকে আর খুঁজে পায়নি। সোজা কথায়, একা হয়ে যায়। তখন প্রলয়নাথ ওকে আশ্রয় দেন। সেই থেকে এখানেই বড় হয়েছে। ওঁদের কাছে থেকে-থেকে মোটামুটি বাংলা শিখে গেছে।

প্রতাপ তখন বাড়িতে ছিল না। কীসব জিনিসপত্র কিনতে বাজারে গেছে।

না, তখনও মৃত্যুঞ্জয় বা জেরাটোলজির প্রসঙ্গ ওঠেনি। উঠলে সেদিন থেকেই আমি সতর্ক হতাম।

প্রলয়নাথ চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ মুছে নিলেন। তারপর চশমা চোখে দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, মোহনবাবু, আপনি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন?

আমি সিগারেটে টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়লাম। সর্বনাশ! এই বুঝি শুরু হল কোটার ভূতের গল্প!

মনে যা-ই ভাবি, মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে জিগ্যেস করলাম, ভূত-প্রেতের ব্যাপার?

তিনি ইতস্তত করে বললেন, না, ঠিক সেরকম নয়। এমন ব্যাপার, যেটা সহজে বিশ্বাস হওয়ার নয়–অথচ সত্যি।

আমার মতো অতিথির পক্ষে বেশি তর্ক-বিতর্কে যাওয়াটা অশোভন। তাই মিনমিন করে বলেছি, সত্যি হলে বিশ্বাস না করে উপায় কী!

হুঁ– মাথা নীচু করে ঘাড় নেড়েছিলেন প্রলয়নাথ। তবে ও-বিষয়ে আর কথা বাড়াননি।

পরে টুকিটাকি কাজে অনুরাধা ঘরে এসেছেন। যেমন চুপচাপ এসেছেন তেমনই চুপচাপ চলে গেছেন। কিন্তু প্রলয়নাথের মেয়েকে একটিবারের জন্যেও দেখিনি।

জানি, এই কৌতূহল হয়তো বয়েসের দোষ, কিন্তু স্বীকার করছি, মেয়েটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল।

তাই উঠে আসার আগে বৃদ্ধ মানুষটিকে সেকথা জিগ্যেস করলাম।

সামান্য চমকে উঠে তিনি বলে উঠলেন, কে? সুপ্রিয়া? ও হয়তো ভেতরের ঘরে পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছে। ভীষণ একাচোরা কারও সামনে বেরোতে চায় না।

একটু অবাক হলেও আর কোনও কথা বলিনি। কিন্তু কৌতূহলটা আমার থেকেই গিয়েছিল।

আমি চলে আসার আগে প্রলয়নাথ আরও একবার প্রতাপের কথা তুললেন। এলোমেলোভাবে যা বললেন, তার স্পষ্ট কোনও অর্থ আমার মাথায় ঢুকল না।

ওর কথা শুনলে সবাই একেবারে চমকে যাবে…ভীষণ বাধ্য ছেলে…আমাকে খুব মানে…ওকে নিয়ে আমার অনেক আশা…।

বৃদ্ধের প্রলাপ ভেবে সেদিনকার কথাগুলো আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেদিন প্রলয়নাথ ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন। কী সেই অলৌকিক ব্যাপার। আর, প্রতাপের কথা শুনলে সবাই কেন চমকে যাবে।

অর্থাৎ, জরাবিজ্ঞান। কসমেটিক্স কোম্পানিতে বিজ্ঞানীর চাকরি করা প্রলয়নাথ হয়তো নিজের বার্ধক্যকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই নিজের পছন্দসই গবেষণায় নেমে পড়েছেন। আর হাতের কাছে ভোলাভালা রাজপুত ছেলেটিকে পেয়ে তার ওপরেই যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলাচ্ছেন।

কিন্তু প্রতাপের পর দ্বিতীয় মৃত্যুঞ্জয় হিসেবে তিনি কি আমাকে টারগেট করেছেন না কি! সেইজন্যেই কি খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, আমার বাড়িতে আর কে-কে আছে, কলকাতায় সেরকম কোনও পিছুটান আছে কি না! তারপর রয়েসয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে ভাঙবেন।

কোয়ার্টারে ফেরার পর একটা অদ্ভুত ভয় আমাকে জড়িয়ে ধরল।

জরাকে আমি ভয় পাই ঠিকই। সব মানুষই জরাকে ভয় পায়। কিন্তু জরা কি মোটরগাড়ি না কি যে, যখন খুশি প্রলয়নাথ তার ব্রেক কষে গতি কমিয়ে দেবেন! প্রতাপের বেলায় উনি নাকি সেটা করতে পেরেছেন। কোনওদিন হয়তো বলে বসবেন, তিনি ব্রেক কষে গাড়ি একেবারে থামিয়ে দিয়েছেন। প্রতাপের বয়েস আর বাড়বে না।

রাতটা আমার নানান দুশ্চিন্তায় কাটল। কিন্তু ভয় যেমন আমাকে প্রলয়নাথের বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিল, তেমনই ওঁর মেয়ে সুপ্রিয়া আমাকে পাগলের মতো টানছিল।

কারণ, সুপ্রিয়াকে আমি একদিন দেখতে পেয়েছি। তখন ও বাথরুমে গরমজলে গা ধুচ্ছিল। শীতের সময় সন্ধেবেলা এভাবে কেউ গা ধোয় বলে শুনিনি। কিন্তু আমার তখন শোনা নয়, দেখার সময়।

একতলার বাথরুমের ছোট জানলাটা খোলা ছিল। ভেতরে অন্তত চল্লিশ ওয়াটের আলো জ্বলছিল। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। প্রলয়নাথ তখন সরস্বতী ভাণ্ডার মিউজিয়াম থেকে ওঁর কপি করে আনা একটি দুষ্প্রাপ্য পুথি আমাকে দেখাবেন বলে ভেতরের ঘরে গেছেন। আর অনুরাধা বোধহয় আমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে গেছেন। প্রতাপও ধারে কাছে ছিল না।

আমি সুপ্রিয়ার স্নান দেখছিলাম। আর ওর ঢল নামা শরীর দেখছিলাম। জানলা দিয়ে ওর পিঠ, পিঠের নীচ, আর বুকের পাশটা দেখা যাচ্ছিল। ভেজা শাড়িটা ঠিকমতো গায়ে জড়ানো ছিল না। তাই আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলাম।

এক মিনিট, দু-মিনিট।

তারপরই বাথরুমের আলো নিভে গিয়েছিল।

সুতরাং সারারাত বহু দোনামনা করেও সুপ্রিয়া জিতে গেল। তাই পরদিন সন্ধেবেলা আমি প্রলয়নাথের বাড়িতে গেলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওঁর কোনওরকম উদ্ভট চিন্তাই আমাকে আপাতত ওঁর বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

.

পরদিন সন্ধেবেলা প্রলয়নাথের বাড়িতে যখন গেলাম, তখন বৃদ্ধ মানুষটি আমার জন্যে যেন তৈরিই ছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আপনার আশায় বসে আছি। আসুন, বসুন, আগে চা-টা একটু খেয়ে নিন, তারপর ল্যাবে নিয়ে যাব।

আমি রোজকার মতোই বসলাম।

রাধা কৃষ্ণের ফটোর কাছে ধূপ জ্বলছিল। কিন্তু ধূপের গন্ধ ছাড়াও একটা হালকা পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছিল। অনুরাধা নিশ্চয়ই সত্তর ছুঁই-ছুঁই বয়েসে পারফিউম ব্যবহার করবেন না। তা হলে আর বাকি থাকে সুপ্রিয়া। ও কি একটু আগেই এসেছিল এই ঘরে?

প্রলয়নাথ জরাবিজ্ঞান নিয়ে কিছু-কিছু কথা বলছিলেন, কিন্তু সেগুলো আমার কানে ঠিকমতো ঢুকছিল না। আমার মাথার ভেতরে তখন বাথরুমের ছোট্ট জানলাটা ভাসছিল। একজন ভরাযৌবন তরুণী সেখানে স্নান করছে।

বারবার ঘড়ি দেখছিলাম আমি। এখন ঘড়িতে প্রায় ছটা পঁচিশ। আগের দিন ব্যাপারটা আমি লক্ষ করেছিলাম সাড়ে ছটা-পৌনে সাতটা নাগাদ। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মনটা উসখুস করতে লাগল।

প্রলয়নাথ তখন কপি করে আনা পুথিটার কথা বলছিলেন।

বুঝলেন, মোহনবাবু, পুথিটার নাম স্থিরযৌবন–প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে লেখা। ওটা পড়ে আমার গবেষণায় অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমাদের যখন বয়েস বাড়ে, তখন শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনটাও বুড়ো হতে থাকে। শরীরের

বাইরেটায় যেমন ধীরে-ধীরে বয়েসের ছাপ পড়ে, তেমনই ভেতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বুড়ো হয়। আমাদের চামড়ার বাইরেটা ক্রমশ পুরু হতে থাকে, অথচ ডারমিস, মানে, অন্তঃত্বক, ক্রমাগত কুঁচকে যেতে থাকে। তা ছাড়া, ডারমিসের কলাজেন কনটেন্ট কমতে থাকে–ফলে চামড়ার জোরও কমে। এই দেখুন না, যেমনটা আমার হয়েছে বলে নিজের শিরা ওঠা লোলচর্ম হাতের পিঠ দেখালেন প্রলয়নাথ। একটু দম নিয়ে তারপর বললেন, শুধু চামড়া কেন, হাড়গুলো ক্ষয় ধরে কমজোরি হতে থাকে। তলপেটের সবচেয়ে বড় যে-ধমনি, অ্যাওর্টা, তার ইলাস্টিসিটি কমতে থাকে। রিঅ্যাকশন টাইম বাড়তে থাকে, রিফ্লেক্স ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। চোখের মণির ছোট-বড় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, ব্রেনের ওজনও যায় কমে। আর নার্ভাস সিস্টেমও ধীরে ধীরে তার তেজ হারিয়ে ফেলে। অল্পবয়েসে…।

প্রতাপ ঘরে ঢুকল। হাতে রোজকার মতো চা-জলখাবার। আমাদের সামনের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে প্রতাপ চলে গেল। যাওয়ার আগে অদ্ভুত চোখে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সে দৃষ্টিতে সহমর্মিতার আভাস পেলাম বলে মনে হল। কিন্তু তার কারণ খুঁজে পাইনি–অন্তত তখনও।

প্রতাপ এসে পড়ায় কথা থামিয়ে দিয়েছিলেন প্রলয়নাথ। হয়তো চান না, প্রতাপ আমাদের সব আলোচনা শুনে ফেলুক। ও চলে যেতেই তিনি আগের কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন, অল্পবয়েসে আমাদের ব্রেইনের নিউরোন, মানে, স্নায়ুকোশ, নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন কোশ জন্মায়। কিন্তু বয়েস বাড়তে বাড়তে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ হয়ে গেলে নতুন স্নায়ুকোষ জন্মানোর ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এতে বুদ্ধি সত্যি-সত্যি কমে যায় কি না তা নিয়ে বির্তক আছে, তবে স্মৃতিশক্তি বেশ কমে আসে।

কথা বলতে-বলতে প্রলয়নাথ চায়ের কাপে বড়-বড় চুমুক দিচ্ছিলেন। চা শেষ হয়ে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন : আপনি চা-টা শেষ করুন। আমি গিয়ে ল্যাবটা একটু গুছিয়ে আসি। আপনি ইচ্ছে করলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারেন।

কথা শেষ করেই প্রলয়নাথ চলে গেলেন। কিন্তু শেষ কথাটা তিনি কেন বললেন কে জানে! আমিও মনে-মনে বোধহয় সেটা চাইছিলাম। তিনি চলে যেতেই তাকালাম ঘড়ির দিকে পৌনে সাতটা বাজে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এলাম।

এই বারান্দা থেকে রাতের আকাশ দেখা যায়। একইসঙ্গে দেখা যায় পাকা রাস্তার আলো, আর দুরের দোকানপাট।

বারান্দায় ঠান্ডাটা বেশ জমাট, কিন্তু সেইজন্যেই বোধহয় চায়ের আমেজটা আরও ভালো লাগছিল।

বারান্দায় এসে প্রথমেই আমার চোখ গিয়েছিল একতলার কলঘরের দিকে। কিন্তু দেখলাম, চৌকো ছোট জানলাটা অন্ধকার।

হতাশ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাব, অমনই দেখি আলো জ্বলে উঠেছে সেখানে। একটি সুঠাম শরীর জানলার ফ্রেম বরাবর এসে পোশাক ছাড়তে শুরু করল।

ক্রমশ কোমল ত্বক প্রকাশিত হচ্ছিল, আর আমার কান গরম হয়ে উঠছিল। চায়ের কাপ হাতে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম আমি। আকাশ থেকে হয়তো হিম পড়ছিল, কিন্তু সেদিকে কোনও হুঁশ ছিল না আমার।

একটা ফরসা শরীর বেয়ে জলের রেখা কীভাবে উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা পথে নেমে আসে সেটাই আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, কাজটা অন্যায়, কিন্তু আমার মনের লোভী অংশটা আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে দিচ্ছিল না। সুপ্রিয়া, ওঃ সুপ্রিয়া!

ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎই কারও পায়ের শব্দে চমকে উঠে চোখ ফেরালাম আমি।

প্রলয়নাথ।

ওঁর দু-চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

আমার দিকে কয়েক লহমা স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, মোহনবাবু, চলুন...আমার ল্যাবরেটরি দেখবেন চলুন। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে।

আমি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমি কি ধরা পড়ে গেছি প্রলয়নাথের কাছে? এই বয়েসে উঁকি মারা টম হিসেবে ধরা পড়লে কে না লজ্জা পাবে! কিন্তু কী করব! ওই চৌকো জানলাটা এখন যেন আমার জীবন-মরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনও কথা না বলে প্রলয়নাথকে অনুসরণ করলাম আমি।

ওঁর ল্যাবরেটরিটা দোতলার একেবারে পেছনদিকটায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওঠা-নামা করে সরু একফালি অলিপথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ওর ল্যাবে। যাওয়ার পথে রান্নাঘর থেকে ছ্যাক ছোঁক শব্দ পেলাম। অনুরাধা হয়তো রান্না করছেন।

প্রলয়নাথের ল্যাবরেটরিকে ঠিক প্রথাগত অর্থে ল্যাবরেটরি বলা যায় না। একটা মাঝারি মাপের ঘরে নানান সাজসরঞ্জাম জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়ানো। তবে সবমিলিয়ে তার মধ্যে একটা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান গন্ধ আছে।

ঘরের সবকটা আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ল্যাবরেটরির দৈন্য আরও বেশি প্রকট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রলয়নাথের চোখে তৃপ্তি আর গর্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। আর একইসঙ্গে ভাবছিলাম, বৃদ্ধের মস্তিষ্কের বার্ধক্যের তীব্রতা বোধহয় ওঁর শরীরের বার্ধক্যের তুলনায় বেশি।

একপলক নজর বুলিয়ে ঘরে যা-যা আমার চোখে পড়ল সেগুলো হল : বিশাল কাচের বাক্সে ঢাকা কয়েকটা চারা গাছ–তার মধ্যে বনসাইও আছে, বেশ কয়েকটা শিশি-বোতল আর টেস্টটিউব, একটা কেরোসিন স্টোভ, প্রচুর বইপত্র আর কাগজ কোণের একটা টেবিলে ডাঁই করা, তিনটে ছোট-ছোট খাঁচায় সাদা ইঁদুর আর গিনিপিগ। হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে ওঠায় প্রাণীগুলো কিচকিচ করে ডাকছে।

আসুন, এদিকে আসুন– বলে প্রলয়নাথ আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারাগাছগুলোর কাছে।

লক্ষ করলাম, কাচের বাক্সের দিকে তাক করা আছে দুটো হাই পাওয়ারের স্পটলাইট।

প্রলয়নাথ বললেন, মোহনবাবু, আপনি তো জানেন, গাছও বড় হয়–বুড়ো হয়। তাই প্রথমদিকটায় আমি গাছের এজিং প্রসেস স্টাডি করেছি। এই কাচের বাক্সটা

হল আমার মিনিয়েচার গ্রিনহাউস। আর এই স্পটলাইট দুটো হল সূর্যের আলোর বিকল্প। দিনে আট-দশ ঘণ্টা করে এগুলো আমি জ্বেলে রাখি।

ওদের ব্যাপারটা স্টাডি করে কী দেখলেন? আমার মধ্যে কৌতূহল ধীরে-ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

দেখলাম কী জানেন? সামান্য হাসলেন তিনি। মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঠিকই বলেছেন। গাছের অনেক কিছুই মানুষের মতো। দেখলাম, বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যায়। মানে, ধরুন, আপনাকে কেউ পেছন থেকে টাচ করে ডাকল। সেই স্পর্শ পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই সেদিকে ঘুরে তাকাবেন। এটাই হচ্ছে আপনার রিঅ্যাকশন। বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে স্পর্শের অনুভূতি পেয়ে ঘুরে তাকাতে আমাদের সময় বেশি লাগে। রিফ্লেক্সের ব্যাপারটাও একইরকম। বয়েস বেড়ে গেলে ক্রিকেটার, ফুটবলার বা টেনিস খেলোয়াড় সবারই রিফ্লেক্স ঢিমে হয়ে যায়।

এমনসময় দরজার কাছ থেকে কেউ ডাকল, সাব–।

ফিরে তাকিয়ে দেখি প্রতাপ। হাতে একটা বড় প্লেট, তাতে অনেকগুলো পেঁয়াজি অথবা ফুলকপির বড়া।

অনুরাধার সবদিকে নজর থাকে। জানে যে ল্যাব দেখতে বেশ সময় লাগবে, তাই খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রতাপের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে একটা টেবিলে রাখলেন প্রলয়নাথ। প্রতাপ চলে যেতেই আমাকে বললেন, নিন, মোহনবাবু, খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে।

সত্যিই খিদে পাচ্ছিল। তাই সৌজন্যের লজ্জা না দেখিয়ে একটা বড়া তুলে নিলাম। যা ভেবেছিলাম তাইফুলকপির বড়া। তবে তার মধ্যে নানান মশলা দিয়ে অনুরাধা তাকে আরও সুস্বাদু করে তুলেছেন।

প্রলয়নাথ একটা বড়া মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বললেন, এই বয়েসে এসব বেশি সহ্য হয় না, আবার লোভও ছাড়তে পারি না। অনুরাধা সবসময় আমার খেয়াল রাখে। ও না থাকলে যে আমি কী করতাম... একটু থেমে উদাস গলায় প্রলয়নাথ বললেন, ওর ঋণ আমি জীবনে শোধ। করতে পারব না। ওকে সুখী করার জন্যে আমি চেষ্টার কোনও শেষ রাখি না।

আমি ওঁকে প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইলাম। বললাম, আপনি তখন রিফ্লেক্সের কথা বলছিলেন।

ওহ, হ্যাঁ– সামান্য চমকে যেন চেতনা ফিরে পেলেন বৃদ্ধ ও রিফ্লেক্সের মতোই টেম্পারেচার সেন্স করার ব্যাপারেও ক্ষমতা কমে আসে। যেমন, খুব অল্প ঠান্ডা, বা খুব অল্প গরম কোনও জিনিসের উষ্ণতা ঠাহর করতে অসুবিধে হয়। তারপর ধরুন, যন্ত্রণা। বয়েস বেড়ে গেলে যন্ত্রণা টের পেতে গাছের দেরি হয়। মানুষেরও তাই। এরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে। তা সেগুলো আমি গাছের ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি। তারপর নানারকমভাবে সেগুলোকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেছি।

অ্যারেস্ট মানে? আর-একটা বড়া মুখে দিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

হাসলেন প্রলয়নাথ, বললেন, বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভূতিগুলোর এইসব পরিবর্তনকে আমি থামাতে চেষ্টা করেছি। বহু বছরের পরিশ্রমের পর আমি সাকসেসফুল হয়েছি, মোহনবাবু। তখন আমি গাছ থেকে চলে এসেছি প্রাণীতে উঁদুর আর গিনিপিগে।

গ্রিনহাউসের কাছ থেকে ইঁদুর-গিনিপিগের খাঁচার দিকে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রলয়নাথ। বললেন, সময়ের হিসেবে এই তিনটে ইঁদুর একই বয়েসের, কিন্তু ওদের মধ্যে বয়েস বেড়ে ওঠার লক্ষণগুলো তিনরকমের। কারণ, তিনটে ইঁদুরের বয়েস বেড়ে ওঠার গতি তিন রকমের। বুঝতেই পারছেন, মোহনবাবু, আমার এক্সপেরিমেন্ট কীরকম সাকসেসফুল হয়েছে। এর জন্যে অনেকরকমের সিরাম তৈরি করতে হয়েছে। রাতের-পর-রাত জাগতে হয়েছে। রাসায়নিক সমীকরণের হিসেব কষতে হয়েছে দিনরাত...।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের ফরসা মুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। উত্তেজিতভাবে তিনি হাত নাড়ছিলেন বারবার।

প্রলয়নাথ এরপর বললেন গিনিপিগের ওপরে তাঁর সিরামের সাফল্যের কথা। এবং সব শেষে বললেন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার চরম ধাপের কথা–মানুষের ওপরে তার এক্সপেরিমেন্টের কথা, পরতাপ চওহানের কথা।

একটানা বহুক্ষণ কথা বলে এবং দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। টেবিলের কাছ থেকে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে একটায় নিজে বসলেন, আর অন্যটায় আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন।

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালাম : প্রায় সাড়ে আটটা। আজ কপালে ডিনার বলতে নির্ঘাত বিস্কুট কিংবা পাঁউরুটি আছে।

প্রলয়নাথ বোধহয় আমাকে লক্ষ করছিলেন, এবং ওঁর নজর যে যথেষ্ট ধারালো তার পরিচয় আগেই পেয়েছি। তার প্রমাণ হিসেবেই তিনি বললেন, আজ রাতে আমাদের এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যান, মোহনবাবু।

আমি সৌজন্য দেখিয়ে বললাম, না, না–তা কী করে হয়?

কেন তাতে অসুবিধের কী আছে! কথাটা বলে কাশলেন প্রলয়নাথ। কাশির আওয়াজ শুনে বেশ বোঝা যায়, ওঁর বুকে সর্দি বসে গেছে।

বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে আমার ওঁকে কেমন আনমনা লাগছিল। ওঁর চশমার কাছে আলো পড়ে চকচক করছিল। মনে হচ্ছিল, উনি যেন গভীরভাবে কী ভাবছেন।

একটা দুঃসাহসিক মতলব আমার মনের কোণে উঁকি মারছিল। কিন্তু আমার ভেতরের সৎ মানুষটা তাকে প্রাণপণ রুখে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

প্রলয়নাথ আমাকে রোজ চায়ের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, সন্ধেটা আমার সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটান। এতে আমার দিব্যি কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এই নিত্যকার নিষ্কলঙ্ক রুটিনে বাদ সেধেছে সুপ্রিয়া। ওকে আমি দেখিনি, ওর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগও হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে দেখার জন্যে আমার মনটা কেমন আকুল হয়ে উঠেছে।

বাথরুমের ছোট্ট জানলাটাই কি এই আকর্ষণের কারণ? বোধহয় না। হয়তো কলকাতার মন ভেঙে যাওয়া ব্যাপারটার পর আমার মন যে-কোনওভাবে শূন্যতা পূরণ করতে চাইছে। তা ছাড়া সুপ্রিয়াকে সামনাসামনি দেখার জন্যে, আলাপ করার জন্যে, আমারও কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল।

প্রলয়নাথ-অনুরাধা এত মিশুকে, অথচ তা সত্ত্বেও ওঁরা সুপ্রিয়াকে পরদানশিন করে রাখবেন, এ কেমন ব্যাপার! তা হলে কি প্রতাপের সঙ্গে সুপ্রিয়ার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে?

যতই ভাবছিলাম, মতলবটা ততই বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাই শেষ পর্যন্ত উন্মুখ বৃদ্ধকে বলেই ফেললাম, না, সেরকম অসুবিধের কিছু নেই, তবে খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হয়ে গেলে কোয়ার্টারে ফিরতে পারব কি না তাই ভাবছি।

আমি জানি, রাতের খাওয়া এখানে সারলে খাওয়ার টেবিলে নিশ্চয়ই সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। তা ছাড়া, কে জানে আজকের নিঝুম রাত হয়তো চৌকো জানলার চেয়েও বাড়তি কিছু দিতে পারে আমাকে।

প্রলয়নাথের জেরাটোলজি আমার কাছে যতই একঘেয়ে আর অসহ্য হোক, সুপ্রিয়াকে দেখার জন্যে একটু-আধটু জরাবিজ্ঞান সইতে আমি রাজি আছি।

আমার ভাবনা-চিন্তা যতই ঘূর্ণি তুলতে লাগল সবকিছু ততই যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

ল্যাবরেটরি ছেড়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। প্রলয়নাথ ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিলেন।

আমার ল্যাবরেটরি কেমন দেখলেন? আচমকা জানতে চাইলেন প্রলয়নাথ।

ভালোই…বেশ অ্যাট্রাকটিভ। বৃদ্ধের মন-রাখা জবাব দিলাম আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, এটাই আমার সব। এটার জন্যেই আমি বেঁচে আছি।

আমি নীরবে ঘাড় নাড়লাম।

প্রলয়নাথ এবার বললেন, চলুন, বসবার ঘরে বসবেন চলুন। আমি অনুরাধার সঙ্গে একটু কথা বলে যাচ্ছি।

অলিপথ বরাবর হাতের ইশারা করে আমাকে এগোতে বললেন তিনি। আমি আধো-আঁধারি পথ ধরে রওনা হলাম।

রাতের সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডাও যে বাড়ছে সেটা এখন টের পেলাম। হাতে হাত ঘষে মুখ দিয়ে নিশ্বাস ছাড়লাম আমি। রান্নাঘরের দিক থেকে ঠিকরে আসা আলোয় দেখলাম, নিশ্বাসের বাষ্প জমাট বেঁধে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে।

নানান চিন্তা মাথায় নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিলাম আমি। আমাকে কি রাতে থেকে যেতে বলবেন প্রলয়নাথ? সে কথা বলার আগে কি স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন? কে জানে!

হঠাৎই মিহি ফিসফিসে স্বরে কেউ আমার নাম ধরে ডেকে উঠল–মোহনবাবু।

আমি চমকে ফিরে তাকালাম শব্দের উৎস লক্ষ করে।

অলিপথের বাঁদিকে সিমেন্টের জাফরি বসানো একটা দেওয়াল। তার ওপাশটা অন্ধকার। কিন্তু জাফরির ফঁকফোকর দিয়ে একটা অবয়বের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। অবয়বটা যে কোনও মহিলার সেটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কে এই অবগুণ্ঠিতা?

আমার নীরব প্রশ্ন সে বোধহয় ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে টের পেল। তাই হয়তো মিষ্টি চাপা গলায় সসঙ্কোচে সে বলল, আমি…সুপ্রিয়া…।

বুকের ভেতরে ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেল পলকে। কেন জানি না, আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল।

আপনি…আপনি…সামনে আসুন.. কাঁপা গলায় অনুনয় করে উঠলাম আমি। চেনা পারফিউমের গন্ধ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল।

আমি কারও সামনে যাই না। বলল মায়ারমণী, একটা…একটা অ্যাকসিডেন্টে আমার…আমার মুখ…পুড়ে গেছে। রান্না করার সময়…স্টোভ বার্স্ট করেছিল…।

আশ্চর্য! এই দুর্ঘটনার কথা তো প্রলয়নাথ কখনও বলেননি।

সুপ্রিয়ার কথা শুনে আমার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ওর প্রতি অলৌকিক টানটা ক্রমেই ভয়ংকর চেহারা নিচ্ছে।

আপনাকে আমি…আড়াল থেকে দেখেছি, মোহনবাবু বলল সুপ্রিয়া, আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

আমার হাত-পা তখনও কাঁপছিল। বুঝতে পারছিলাম না, কী বলব, কী বলা উচিত।

সুপ্রিয়া কাঁপা স্বরে ওর নামটা বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে।

আ–আঃ! তৃপ্তির মিষ্টি শব্দ করল অন্ধকারের তরুণী, এই প্রথম কোনও যুবকের মুখে আমার নাম শুনলাম।

আমার মনে হচ্ছিল, এখনই ছুটে যাই জাফরির ওপাশে। তারপর…।

সুপ্রিয়া আবার ওর নাম ধরে ফিসফিসে স্বরে ডেকে উঠলাম আমি।

আজ রাতে থেকে যান, মোহনবাবু। রাতে আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করে যাব। একটু থেমে তারপর ও ভয় নেই, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। বরং লাভ হতে পারে।

কিছুটা দূরে কাশির শব্দ শুনলাম। বোধহয় প্রলয়নাথ আসছেন।

জাফরির ওপাশে সুপ্রিয়ার অবয়ব চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পারফিউমের হালকা গন্ধটা ভারী বাতাসে অলসভাবে ভেসে রইল।

আমি তৎপর হয়ে বসবার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। পেছনে পায়ের শব্দ এবার শোনা যাচ্ছিল। এবং একটু পরেই প্রলয়নাথ ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন, আপনি রাতে খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই থেকে যান, মোহনবাবু। কাল সকালে চা খেয়ে একেবারে কোয়ার্টারে ফিরবেন। তাতে আপনার মর্নিং ওয়াকটাও হয়ে যাবে।

.

কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামের বিছানায় শুয়ে ছিলাম বটে কিন্তু আমার চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। নানান চিন্তা, নানান কল্পনা বেপরোয়াভাবে ঘাই মারছিল

মাথার ভেতরে। সুপ্রিয়া কখন আলাপ করতে আসবে? কতক্ষণ ধরে চলবে সেই আলাপ? আলাপের পর কী হবে?

যতই এসব কথা ভাবছিলাম, ততই মনে পড়ছিল সুপ্রিয়ার কথা। দুর্ঘটনা হয়তো ওর মুখের সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু ওর অন্যান্য সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারেনি।

রাতে খাওয়ার টেবিলে ছিলাম আমরা দুজন–প্রলয়নাথ আর আমি। অনুরাধা আমাদের খেতে দিচ্ছিলেন। প্রতাপ ওঁকে থালা-বাটি-গ্লাস এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল। যথারীতি সুপ্রিয়ার দেখা মেলেনি।

খেতে-খেতেই আমি জিগ্যেস করেছিলাম, সুপ্রিয়া খেতে আসবে না?

অনুরাধা আমাকে ডাল দিচ্ছিলেন, হঠাৎই থেমে গেলেন, তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে। হয়তো ভাবছিলেন, এই বোধহয় সুপ্রিয়ার অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটা প্রলয়নাথ আমাকে বলে দেবেন। কিন্তু প্রলয়নাথ চশমার ভেতর থেকে স্থির শান্ত চোখে অনুরাধাকে একবার দেখলেন, তারপর আমাকে বললেন, আপনাকে তো আগেই বলেছি, সুপ্রিয়া একা-একা থাকতে ভালোবাসে। ওর চোখে একটু প্রবলেম আছে–আলো একেবারে সহ্য করতে পারে না।

আমি বৃদ্ধের কথা এমনভাবে শুনছিলাম যেন টিভিতে খবর শুনছি। সত্যিই অদ্ভুত! একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে প্রলয়নাথকে কত মিথ্যে কথাই না বলতে হচ্ছে! সত্যি-সত্যি কী হয়েছে সুপ্রিয়ার? স্টোভ ফেটে অ্যাকসিডেন্ট? নাকি ওর চোখে সত্যিই কোনও প্রবলেম আছে?

তখনই আমার হঠাৎ সন্দেহ হল, প্রলয়নাথ জেরাটোলজির কোনও বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট চালাননি তো সুপ্রিয়ার ওপরে! তারই প্রকোপে হয়তো মেয়েটার মুখ পুড়ে গেছে। এখন বাবার লজ্জা ঢাকতে অপরিচিত অতিথিকে ও বলে ওর স্টোভ-অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষ করছিলাম, অনুরাধা বারবার চোরাচাউনিতে আমাকে দেখছেন, জরিপ করার চেষ্টা করছেন যেন।

আর প্রতাপ? সেই তখন থেকে দেখছি মৃত্যুঞ্জয় প্রতাপ কেমন অদ্ভুত অপছন্দের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। অথচ একইসঙ্গে মনে হয় ও যেন কিছু বলতে চায় আমাকে। অনেকক্ষণ ধরে ও আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। যেন কিছু বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

খাওয়ার টেবিলে বসে প্রলয়নাথের পরিবারকে আমার কেন জানি না ভীষণ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। অনেক গোপন কথা ওঁরা লুকিয়ে রাখতে চান।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে অনুরাধা আমাকে বৃদ্ধ প্রলয়নাথের একটি লুঙ্গি ধার দিয়েছেন, তারপর আমাকে শোওয়ার ঘর দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরটা একতলায়। বাড়ির পেছনদিকে সরু মাপের একটা সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে ছোট্টমতো উঠোন। উঠোনের একদিকে কলতলা, আর-একদিকে তিনটে ঘর ও একটা সামান্য বড়, অন্য দুটো ছোট-ছোট। বড় ঘরটায় আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরে জেনেছি শেষের ছোট ঘরটায় প্রতাপ থাকে।

ঘরে সব ব্যবস্থাই ছিমছাম। বাঁ-দিকের দেওয়ালে নকশা ছাপা পরদা টাঙানো। ডানদিকে একপাশে ছোট খাটে বিছানা পাতা। বিছানার ওপরে লাল-খয়েরি আর সাদার ছিটে দেওয়া আকোলা প্রিন্টের বেডকভার। বিছানার পাশে মেঝেতে রাখা জলের জগ আর গ্লাস।

আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অনুরাধা নিঃশব্দে চলে গেছেন।

আমি ঘড়ি দেখলাম : প্রায় দশটা বাজে। এখানকার হিসেবে গভীর রাত। সুতরাং জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে পড়েছি। দিনের শেষ সিগারেট আরাম করে শেষ করে তারপর বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। নানান ছবি একের-পর-এক ভেসে উঠতে লাগল মনের পরদায়। একইসঙ্গে জরাবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে রাতের বয়েসও বাড়তে লাগল।

হঠাৎই দরজায় টোকার শব্দ শুনলাম।

আমার বুকের ভেতরে একটা বিশাল পাথর যেন আচমকা টাল খেয়ে গেল।

নিশ্চয়ই সুপ্রিয়া এসেছে! এতক্ষণ পর্যন্ত একমুহূর্তের জন্যেও এই মেয়েটার চিন্তা আমার মন ছেড়ে যায়নি।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চটপট নেমে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

কিন্তু সত্যিই সুপ্রিয়া এসেছে তো?

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

আমি দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, কে?

আমি…সুপ্রিয়া…।

দরজা খুলতেই শাল মুড়ি দেওয়া ছায়ারমণী ঢুকে পড়ল ঘরে। আমি চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম। নেশাগ্রস্তের মতো ওকে ধরতে গেলাম, কিন্তু ও চকিতে সরে গেল অন্ধকারে।

আমি দরজায় খিল তুলে দিলাম। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগলাম। সে এক রোমাঞ্চকর বিচিত্র লুকোচুরি খেলা।

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎই যেন ওর শালের প্রান্ত আমার হাত ছুঁয়ে গেল। কিন্তু তারপরই সব শূন্য।

হঠাৎই ও ডেকে উঠল, মোহন, আমি এখানে…বিছানায়…।

আমার বুকের ভেতরে অন্যরকম আগুন জ্বলে উঠল। একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিছানায় দিকে।

যখন ওকে ছুঁলাম তখন আমার আঙুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া!

কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা দুজনে তখন কাছাকাছি চলে এসেছি। ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম সব মুছে গেছে আমার মন থেকে। সুপ্রিয়াই তখন একমাত্র সত্যি, আর সব মিথ্যে।

শীতের মধ্যে সব পোশাক খুলে ফেলতে বেশ সময় লাগল আমাদের। তারপর আমি পাগলের মতো আঁকড়ে ধরলাম ওর যৌবন। আমার মাথার ভেতরে শিরা দপদপ করছে। রক্তকণিকাদের পাগল করা দৌড় শুরু হয়ে গেছে প্রতিটি ধমনিতে।

সুপ্রিয়ার শরীর যে-কোনও পুরুষকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। মাখনের মতো মোলায়েম, মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ, আর ভরা দিঘির মতো টইটম্বুর।

তবে ভালোবাসার সময় ও মুখটা সরিয়ে রাখছিল আমার দিক থেকে। হয়তো দুর্ঘটনার পর থেকেই ওর মুখ স্পর্শকাতর। সেইজন্যেই ওকে একটিও চুমু খেতে পারছিলাম না। কিন্তু তা ছাড়া আর সবকিছুই করতে পারছিলাম।

আমাদের ঠোঁট চিরে অর্থহীন শব্দের টুকরো বেরোচ্ছিল। শরীরের উদ্দাম ঝড়ে আমরা জগৎসংসার ভুলে গিয়েছিলাম। চরম মুহূর্তে সুপ্রিয়া চাপা চিৎকার করে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে একেবারে শেষ করে দিল। আমার মুখ দিয়েও চাপা গোঙানি বেরিয়ে এসেছিল। আর সেই সময়কার উত্তাল জোয়ারে আমাদের মধ্যে কোনও নিয়ম, কোনও প্রতিরোধ কাজ করছিল না।

হঠাৎই আমার ঠোঁট চলে গেছে সুপ্রিয়ার গালে। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বরফের স্রোত নেমে গেছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। খাটটা দুলে উঠেছে অন্ধকারে। হাত-পা পাথর হয়ে গেছে চোখের পলকে।

আর তখনই, অন্ধকার ঘরে আমি কাশির শব্দ পেলাম।

এই শব্দ আমার খুব চেনা।

হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল বুকের ভেতরে। আর একইসঙ্গে আমার হাত চলে গেল বেডসুইচের দিকে।

দু-একবার দপদপ করে জ্বলে উঠল টিউবলাইট।

তখন আমি প্রলয়নাথকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম অনুরাধাকে। আর একইসঙ্গে সুপ্রিয়াকেও দেখতে পেলাম।

অনুরাধা শুয়ে আছেন আমার বিছানায়। চোখে-মুখে অপরাধবোধের ছাপ। কিন্তু এ কোন অনুরাধা! এ কি স্বপ্ন, নাকি সত্যি!

অন্ধকারে সুপ্রিয়াকে আদর করার সময় আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল অনুরাধার আঁচিল– ওঁর এককালের বিউটি স্পট। আমি অবাক হয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। কারণ, মা ও মেয়ের ঠোঁটের ওপরে একই স্থানাঙ্ক আঁচিল থাকাটা আমার কাছে অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়েছিল।

কিন্তু এখন দেখলাম, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ, অনুরাধা ও সুপ্রিয়ার শরীর একটাই। যে-অনুরাধাকে আমি আগে দেখেছি, এখন ওঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বুঝলাম, আমার এতদিনের দেখাটা অসম্পূর্ণ ছিল।

অনুরাধার জরাগ্রস্ত চেহারা শেষ হয়েছে গলার ঠিক নীচে এসে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে জরাহীন দুরন্ত যৌবন। মুখ-গলা বাদ দিয়ে এই শরীরের দিকে তাকালে এই শরীরের বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ বলেই মনে হয়। এই শরীরকেই আমি বাথরুমের চৌকো জানলা দিয়ে দেখেছি? এই কি তা হলে সুপ্রিয়া? আমার অনুমান অন্তত তাই। বুঝলাম, এই হল প্রলয়নাথের সেই অলৌকিক ব্যাপার।

আমি অবাক হয়ে একই শরীরে জরা আর যৌবনের সহাবস্থান দেখছিলাম। চমক ভাঙল প্রলয়নাথের কথায়।

খসখসে গলায় বৃদ্ধ বললেন, আমাদের মাপ করবেন, মোহনবাবু...।

আমি প্রলয়নাথের দিকে ঘুরে তাকালাম।

বন্ধ ঘরে বৃদ্ধ ঢুকলেন কোথা দিয়ে? খেয়াল করে দেখি, ঘরের সামনের দেওয়ালের পরদা খানিকটা সরানো। আর সেই পরদার পেছনে চোখে পড়ছে একটা ছোট দরজা।

প্রলয়নাথের হাতে চশমাজাতীয় একটা বিদঘুঁটে যন্ত্রও ছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে আমি গোটা ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কূল পাচ্ছিলাম না।

বুঝতে পারছিলাম না, এখন আমার কী করা উচিত। আমি কি প্রাণভরে ভৎর্সনা করব এই দম্পতিকে? কাল সকালে ব্যাপারটা নিয়ে কি শোরগোল তুলব?

প্রলয়নাথ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বিছানার কাছে এসে বসলেন। ওঁর বলিরেখাময় মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

আমি এর মধ্যে পোশাক পরে নিচ্ছিলাম। অনুরাধাও দেখলাম শাড়ি জামাকাপড় শাল গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছেন। ধীরে-ধীরে সুপ্রিয়া ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে পড়ে রইল এক পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের মহিলা, যার মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গাল ভাঙা, মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ, আর একটা চোখে ছানি পড়েছে।

কে বলবে, এই মহিলার শরীরে বাঁধা পড়েছে অবিশ্বাস্য দুকূল ছাপানো যৌবন।

মোহনবাবু তাকিয়ে দেখি প্রলয়নাথ মুখ তুলেছেন। চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওঁর চোখে জল–সুক্ষ্ম ধারায় সেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নাকের পাশ দিয়ে।

মোহনবাবু, আপনার কাছে আর লুকিয়ে লাভ নেই–সব খুলেই বলি। প্রলয়নাথ খসখসে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, সুপ্রিয়া নামে সত্যিই আমাদের একটা মেয়ে ছিল। মাত্র চার বছর বয়েসে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে ও মারা যায়। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল। তবে, তার সঙ্গে আমার জেরাটোলজির এক্সপেরিমেন্টের কোনও সম্পর্ক নেই।

জরাবিজ্ঞান নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট যখন শুরু হয়, তখন গাছপালা আর ইঁদুর গিনিপিগের সঙ্গে-সঙ্গে অনুরাধার শরীরের ওপরেও আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকি। তবে অবশ্যই অনুরাধার অনুমতি নিয়ে। অনুরাধা আমাকে এত ভালোবাসে যে, কখনও আমার কোনও সাধে বাদ সাধেনি। তা ছাড়া বুটুন–মানে, সুপ্রিয়া মারা যাওয়ার পর আমরা দুজনেই বেঁচে থাকার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন জরাবিজ্ঞানের গবেষণা আমাকে বাঁচিয়ে তুলল। আর অনুরাধাও তাতে সায় দিল।

বিছানার এক কোণে বসে থাকা অনুরাধার দিকে কোমল চোখে দেখলেন প্রলয়নাথ। তারপর ধরা গলায় বললেন, ওর ওপর দিয়ে যে কত ঝড়ঝাপটা

গেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঝড় হচ্ছে আমার তৈরি করা কাউন্টার-এজিং সিরাম–এই সিরাম বয়েস বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বাধা দেয়। কিন্তু সিরামে মনের মতো কাজ হল না।

অনুরাধার শরীরের সর্বত্র আমি এই সিরাম নিয়ম করে ইনজেক্ট করতাম। আর সাত-দশ দিন পরপর অনুরাধার শরীর খুটিয়ে লক্ষ করতাম। কিন্তু গোলমালটা একটুও টের পাইনি। সেটা টের পেলাম বছরদশেক পর। দেখলাম, ওর মাথা আর গলা বাদে সিরামটা কাজ করেছে। কিন্তু তখন থামারও উপায় নেই, আর ফেরারও পথ নেই। অনুরাধার শরীরের ভেতরে কোনও কোনও অংশে বয়েস ঠিকমতোই বাড়তে লাগল। কিন্তু শরীরের বাইরে–গলা থেকে পা পর্যন্ত ওর তিরিশের যৌবন অটুট রইল।

এই ব্যাপারটা লক্ষ করার পরই আমরা দুজনে স্রেফ খেলাচ্ছলে সুপ্রিয়ার জন্ম দিলাম আবার। অনুরাধাকে বলতাম, তোমার শরীরে সুপ্রিয়া বেঁচে আছে। আমি ওকে কখনও অনুরাধা, কখনও সুপ্রিয়া বলে ডাকি। জানি না, এ আমার পাগলামোনা মেয়েকে হারানোর শোকে তাড়া খাওয়া বাপের সেন্টিমেন্ট!

অনুরাধা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্না চাপা দিতে মুখে কাপড় গুঁজে দিলেন।

দেখতে-দেখতে আমি বুড়িয়ে গেলাম। অনুরাধার মনের অনেকটাই বুড়িয়ে গেল, আর শরীরের মধ্যে শুধু মাথা, আর গলা। সুতরাং এই বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে অনুরাধার অতৃপ্ত শরীর রাতের পর-রাত কাটাতে লাগল। ওকে পর্যবেক্ষণ করে আমি প্রতি সপ্তাহে পাতার-পর-পাতা নোট নিতাম। আমার অবাক লাগত। যে-শরীরে মা হওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই, সেই শরীরে তৃপ্তির চাহিদা কোথা থেকে আসে! কেমন হতে পারে সেই তৃপ্তির প্রতিক্রিয়া? আমার ভীষণ কৌতূহল হত। আমার গবেষণার সম্পূর্ণ বিবরণ আমি পরের বিজ্ঞানীদের জন্যে রেখে যেতে চাই। তাই আমাকে যে জানতেই হবে! হাত মুঠো করে বিছানার ঠুকলেন প্রলয়নাথ। ওঁর উত্তেজনায় লালচে মুখে সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর জেদ।

মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে প্রলয়নাথ আবার বললেন, অনুরাধার অদ্ভুত শরীরের প্রতিক্রিয়া মানে, সেক্সুয়াল রিঅ্যাকশন্সজানার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেলাম। তখন নানানরকম ফন্দিফিকির করে কোনও যুবককে ডেকে নিয়ে আসতাম বাড়িতে। তাকে সুযোগ বুঝে লোভ দেখানো হত। ওই বাথরুমের জানলা দিয়ে। অথবা, অন্ধকারে জাফরির আড়াল থেকে অনুরাধা ওর মিষ্টি গলায় কথা

বলত অচেনা মানুষটির সঙ্গে। তারপর রাতে থেকে যেত সেই অতিথি। এই ঘরটায় তাকে শুতে দেওয়া হত। গভীর রাতের অন্ধকারে অনুরাধা চলে আসত এই ঘরে। অতিথির সঙ্গে মিলিত হত এক অদ্ভুত রমণী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রলয়নাথ। মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। তারপর চাপা খসখসে গলায় অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বলে চললেন, অন্ধকারে যখন সেই মিলনের খেলা শুরু হত তখন…তখন আমি…এই হতভাগা জেরাটোলজিস্ট নিজের বুকে আঙুল ঠুকলেন তিনি ও ওই লুকোনো দরজা দিয়ে পরদা সরিয়ে ঢুকে পড়তাম এই ঘরে। তারপর অন্ধকারে এই চশমাটা চোখে দিয়ে সব দেখতাম। দুটো শরীরের প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতাম। তারপর সেইসব তথ্য টুকে রাখতাম গবেষণার খাতায়।

হাতের চশমাটা আমাকে দেখালেন প্রলয়নাথ। ক্লান্ত স্বরে বললেন, এটার নাম সুপারস্কোপ অন্ধকারে দেখার চশমা–এটা দিয়ে ইনফ্রারেড আলো দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ছবিগুলো অন্যরকম দেখায়। স্বাভাবিক রঙিন ছবির মতো নয়। কিন্তু তাতে আমার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কোনওরকম অসুবিধে হয় না।

মোহনবাবু, এইসব যা-যা আমরা করতাম, আপনার সঙ্গেও ঠিক তাই করেছি। আপনি…আপনি দয়া করে এই বুড়ো-বুড়িকে মাপ করবেন। বিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে আমরা আপনার কাছে অনেক কিছু গোপন করেছি, আপনাকে ঠকিয়েছি, লজ্জায় ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমাদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

অনুরাধার কান্নার শব্দ আমি টের পাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে অপরাধবোধ আর গ্লানি মিশে ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি প্রতাপের কথা জিগ্যেস করলাম।

প্রলয়নাথ সুপারস্কোপটা চাদরের আড়ালে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, পাপের ওপরে আমি সিরাম ইজেক্ট করে গবেষণা করছি। আমার বিশ্বাস, এবারে আর কোনও ভুল হবে না। অনুরাধার বেলায় যে গণ্ডগোল হয়েছে এবারে যাতে সেরকম না হয় সেদিকে আমি খেয়াল রেখেছি। তা ছাড়া পাপ আমাদের ছেলের মতো… একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ ও একদিন…আমার আর অনুরাধার ব্যাপারটা ও জেনে ফ্যালে। আমাদের বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্টের খবর পেয়ে যায়। তারপর

থেকেই বাড়িতে কোনও তরুণ অতিথি এলে ও সেটা পছন্দ করত না। অথচ আমার মুখের ওপর প্রতিবাদও করতে পারত না। আমি ওর কষ্ট বুঝি, মোহনবাবু। অনুরাধার দুঃখও বুঝি। আর আপনার মনের অবস্থাও বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কী করব বলুন! জরাবিজ্ঞানের স্বার্থে আমাকে যে সব জানতেই হবে।

বৃদ্ধ আবার চোখের জল ফেলছিলেন। ওঁর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎই তিনি উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন দুহাতে। আবেগমথিত গলায় বললেন, মোহনবাবু, আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের এই রিসার্চের কথা আপনি কাউকে বলবেন না। কথা দিন, প্লিজ, কথা দিন…।

আমি কথা দিয়েছিলাম।

সেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা সেদিন আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। এবং সেই বিচিত্র রজনীতে আমি ঈশ্বরের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করেছিলাম, প্রলয়নাথের অলৌকিক গবেষণা সফল হোক। সত্যিই প্রতাপ চওহানের চিরযৌবনের কথা শুনে হতবাক হয়ে যাক সারা পৃথিবী।

পরদিন সকালে চোখের জলে ওঁরা দুজন আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

# চন্দনকাঠের বাক্স

**চন্দনকাঠের বাক্স**

কাল রাতে মা-কে আবার স্বপ্নে দেখল সুমন।

ধূপের ধোঁয়ায় সব আবছা হয়ে গেছে। সাদা চন্দনের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। তারই ভেতর দিয়ে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল মায়ের সুন্দর মুখটা। কপালে সিঁদুরের বড় টিপ, ফরসা মুখে গোলাপি আভা। নাকে নাকছাবি। চোখ আর ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি। কালো, সবুজ আর সাদায় কাজ করা চওড়াপাড় একটা শাড়িতে ঘোমটা দিয়ে রয়েছেন মা। সুমনকে যেন বলছেন, দুষ্টুমি কোরো না, বাবা। মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো। অনেক বড় হতে হবে তোমাকে।

ভোরবেলা কাকের ডাকে ঘুম ভাঙল সুমনের। মাথার কাছে ছোট্ট জানলা দিয়ে ভোরের নরম রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। জানলার পাল্লায় বসে একটা কাক থেকে-থেকে ডাকছে। রোজই এই কাকটা এসে ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আর সুমন জেগে উঠলেই ওটা উড়ে যায়–হয়তো অন্য কারও ঘুম ভাঙাতে।

বিছানায় কিছুক্ষণ চোখ মেলে শুয়ে রইল সুমন। স্বপ্নের ছবিটা ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখনও। এতটুকু ঝাপসা হয়নি। এই একই স্বপ্ন ও যে কতদিন ধরে দেখে আসছে মনে নেই। স্কুলের বন্ধুদের স্বপ্নের কথাটা শোনালে অলক বলেছিল, তোর কথা এতটুকু বিশ্বাস করি না। আমার ছোটকাকু বলে, স্বপ্নে কখনও রং দেখা যায় না। আর তুই কী করে ধূপের গন্ধ পেলি? চন্দনের গন্ধ পেলি? শাড়ির রং দেখলি?

অন্যান্য বন্ধুও একইসঙ্গে অলকের দলে হয়ে সুমনকে কোণঠাসা করতে চেয়েছে। কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করেছে সুমন। তারপর অত বড় দলের সঙ্গে আর পেরে ওঠেনি। ভীষণ কান্না পেয়েছে। ওর। মনে-মনে মা-কে ডেকে বলেছে, মা,

মাগো, তুমি তো একবার এসে ওদের বলতে পারতে আমি সত্যি কথা বলছি! তারপর থেকে আর কোনওদিন ও স্বপ্নের কথা কাউকে বলেনি।

সেদিন থেকে চুপচাপ হয়ে গেছে সুমন। ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা আর বলে না। পড়ার সময় পড়া করে, অন্য সময় মায়ের কথা ভাবে। বুকটা কেমন আনন্দে ভরে যায় ওর।

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সুমন। বাবা আগেই উঠে পড়েছেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে বাবা তৈরি হয়ে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে পড়েন। অপেক্ষা করেন ছাত্রদের জন্য। সকালে অরূপ, বিকাশ আর দেবাশিস–এই তিনজন পড়তে আসে বাবার কাছে। ওদের বাড়ি খুব দূরে নয়। বাবার কাছে ওরা পড়ছে আজ প্রায় তিন বছর ধরে। অরূপ আর দেবাশিস অন্য স্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ে। বিকাশ সুমনের স্কুলেই পড়ে। ক্লাস নাইন-এ। সুমনের চেয়ে এক ক্লাস নীচুতে।

হাত-মুখ ধুয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল সুমন। বাবা পুরু কাচের চশমা চোখে দিয়ে ঝুঁকে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। বাবা চোখে ভীষণ কম দেখেন। তবে এদিকে চোখ না ফেরালেও বাবা জানেন সুমন এখন কী করবে। সেটা সুমনের রোজকার কাজ।

রং-ওঠা নীলচে-সাদা দেওয়ালে ছবিটা টাঙানো রয়েছে। একদিন হয়তো ছবির সবকটা রং উজ্জ্বল ছিল। কারুকাজ করা ফ্রেমের রং ছিল ঝকঝকে সোনার মতো। কিন্তু আজ, সময়ের স্রোতে, কারুকাজ করা ফ্রেম মলিন হয়ে গেছে। ছবির রং হয়ে এসেছে ফ্যাকাসে। তা সত্ত্বেও সুমন যেন রোজ ছবিটাকে নতুনের মতোই দেখতে পায়। জ্ঞান হওয়া থেকেই ও একইরকম দেখে আসছে। স্বপ্নে ঠিক যেরকমটা দেখে।

ছবির কাচটা বাবা রোজ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেন। দুটো চন্দন-ধূপ জ্বেলে গুঁজে দেন ফ্রেমের কোণে। আর নয়নতারা ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দেন। এই ফুল আসে ওদের সদর দরজার পাশে রাখা দুটো টবের নয়নতারা গাছ থেকে। বাবার মুখে সুমন শুনেছে, মা নাকি এই ফুল খুব পছন্দ করতেন। পছন্দের একটা কারণ সুমন বাবার কাছ থেকে জেনেছে ও মায়ের নামের সঙ্গে এই ফুলের নামের মিল আছে।

ছবির নীচেই লেখা মায়ের নাম : শ্রীমতী নয়নকণা রায়। এই নামটা রোজই মনে-মনে গুনগুন করে সুমন। কী সুন্দর নাম! নাম থেকে শুরু করে ছবির প্রতিটি অংশ ওর ভীষণ ভালো লাগে। ইশ, মা যদি বেঁচে থাকতেন। ভাবে সুমন। ওর দু-বছর বয়েসে মা মারা গেছেন। বাবাই বলেছেন। তা হলে মায়ের সত্যিকারের মুখটা কেন সুমনের মনে পড়ে না! ভাবতে গেলেই কেন এই ছবির মুখটা খালি ভেসে ওঠে! বাবাকে প্রশ্ন করলে বাবা হেসে বলেন, দু-বছর বয়েসের কথা কি কারও মনে থাকে রে! তবে তোর মা হুবহু এই ছবিটার মতো ছিল।

বাড়িতে মায়ের আর কোনও ছবি নেই। বাবার কাছেও না। এর কারণ বাবাকে জিগ্যেস করলে বাবা উত্তর দেন না। চুপ করে থাকেন।

ধূপের ভারী ধোঁয়ায় গভীর করে শ্বাস নিল সুমন। ছবির দিকে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে এল। হাত জোড় করে চোখ বুজল ও। তারপর চোখ খুলে ধীরে-ধীরে তাকাল ছবির ঠিক নীচে একটা টুলের ওপরে রাখা জিনিসটার দিকে।

খুব সুন্দর কারুকাজ করা একাট ছোট্ট চন্দনকাঠের বাক্স।

বাক্সটা সেই ছোটবেলা থেকে এই একই জায়গায় দেখে আসছে সুমন। ডালা বন্ধ। তাতে ছোট্ট একটা তালা লাগানো। কৌতূহল ওর প্রথম দিনই হয়েছিল। ফলে বাবাকে সোজা গিয়ে জিগ্যেস করেছিল, বাবা, ওই ছোট্ট বাক্সটায় কী আছে?

তখন সুমন ক্লাস থ্রি-তে পড়ত। ওর বড়সড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে বাবা বলেছিলেন, আগে বড় হও, তারপর জানতে পারবে।

অবাক হলেও আর কিছু বলেনি ও। তবে সুমন মাঝে-মাঝে মায়ের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছে, মা, মা-মণি, এই বাক্সটায় কী আছে?

মায়ের ছবি কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু হেসেছে।

বুকের ভেতর কৌতূহল নিয়ে আরও তিন বছর কাটিয়ে দিয়েছে সুমন। তারপর আর থাকতে পারেনি। একদিন তালাটা ধরে চুপিচুপি টেনে দেখেছে। না, খোলেনি ছোট্ট তালাটা। তখন বাবাকে গিয়ে বলেছে, বাবা, এবার বলো। এখন আমি তো বড় হয়েছি।

বাবা বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঘুরে তাকিয়ে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে ভালো করে দেখলেন সুমনকে। ক্লাস সিক্সের ছেলেটা ঘাড় বাঁকিয়ে সামান্য জেদি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। হাতের কাগজটা নামিয়ে রেখে বাবা ওকে ডাকলেন কাছে। বললেন, আয়, এখানে আয়।

সুমন ধীরে-ধীরে কাছে গেল। বসল বাবার পাশে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা বললেন, খোকা, তুই তো আমার সব। এ-সংসারে আমার আর কেউ নেই।

বাবা কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। শীর্ণ হাতে ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে রূপকথার মতো করে শোনালেন ওই বাক্সের গল্প।

তোর মা বিয়ের সময় পেয়েছিল ওই চন্দনকাঠের বাক্সটা–তোর দিদিমার কাছ থেকে। ওঁদের পরিবারের রীতি ছিল, সবচেয়ে প্রিয় আর দামি জিনিসই ওই বাক্সে রাখা হবে। বিয়ের পর তোর মা সমস্ত গয়নাগাটি রেখেছিল ওই বাক্সে। আমি তখন ইস্কুলে মাস্টারি করি। এরপর তোর জন্ম হল। বেশ কিছুদিন হইহই করে খুশিতে কাটল। তারপরই এক ভয়ংকর ঘটনা বোবা করে দিল আমাকে। তোর মা পেটে ব্যথা নিয়ে ভরতি হল হাসপাতালে। পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল, অপারেশান করা দরকার। অপারেশান করতে গিয়ে দেখা গেল পেটের ভেতরটা ক্যানসারে শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলল, কোনও আশা নেই। এভাবেই যতদিন বাঁচে। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম রে তোর মা-কে বাঁচাতে, কিন্তু পারিনি। তোর মা বুঝতে পেরেছিল যে, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাই একদিন তোকে দেখতে চেয়েছে, বলেছে, সুমনকে নিয়ে এসো। আর চন্দনকাঠের বাক্সটাও নিয়ে আসবে, দরকার আছে…।

বাবা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। হয়তো বৃষ্টি হবে। সুমনের পিঠে হাত রেখে বাবা বললেন, অবাক হলেও তোর মায়ের অনুরোধ আমি রেখেছিলাম। তোকে কোলে নিয়ে শেষ দেখা দেখতে গেলাম তাকে। আমাকে লুকিয়ে বাক্সটা নিয়ে কী যেন করল তোর মা। তারপর সেটা নিয়ে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এটা রেখে দাও। আর, এই নাও চাবি। সুমনের যেদিন পনেরো বছর পূর্ণ হবে, সেদিন চাবিটা দেবে ওর হাতে। তার আগে নয়। তুমি কথা দাও আমাকে।

মন্ত্রমুগ্ধ সুমনের মাথায় হাত বুলিয়ে সুমনের বাবা বললেন, আমি কথা দিয়েছিলাম রে…

সুমন আন্দাজ করে বলল, বাক্সে কি তা হলে গয়না আছে?

দুঃখের হাসি হেসে বাবা বললেন, না রে, বোকা। সেগুলো তোর মা আলাদা করে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, তোর লেখাপড়ার জন্যে, তোকে মানুষ করার জন্যে সেগুলো যেন আমি কাজে লাগাই।

তা হলে কী আছে ওই বাক্সে? সুমন আগ্রহের চোখে তাকাল বাবার মুখের দিকে।

আমি জানি না। সময় হলে চাবিটা তোকে দেব। তখন তুই নিজেই খুলে দেখিস।

সুমন তখন খুশির গলায় বলল, নিশ্চয়ই খুব প্রিয় আর দামি জিনিস আছে, না বাবা? তাই তো রাখার নিয়ম ছিল ওই বাক্সে?

উদাস স্বরে বাবা বললেন, হবে হয়তো।

এরপর আরও বড় হয়ে উঠতে লাগল সুমন। ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। আর একইসঙ্গে মা-কে স্বপ্নে দেখতে শুরু করল–প্রায়ই। তখন একদিন রাতে খেতে বসে হঠাৎই স্বপ্নের কথাটা বাবাকে বলল ও।

বাবা খাওয়া থামিয়ে তাকালেন। বললেন তোর মা তোকে ভীষণ ভালোবাসত। তোকে ছেড়ে মোটেই যেতে চায়নি। কিন্তু কঠিন অসুখ..রাখা গেল না। সেইজন্যেই বোধহয় স্বপ্নে অমন ফিরে ফিরে আসে। তোকে নিয়ে অনেক আশা ছিল তো।

সুমনের মনটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। বাবা অনেকদিন রিটায়ার করেছেন স্কুলের চাকরি থেকে। চোখে ভালো দেখতে পান না, তাই সময়ের আগেই রিটায়ার করতে হয়েছে। সারাদিন বাড়িতে থেকে সব কাজ করেন আর সময় করে সুমনের পড়া দেখিয়ে দেন রোজ। সুমনের লেখাপড়া যে কত কষ্টে চলে তা ও খুব ভালোভাবেই জানে। মায়ের অভাব বাবা যে বুঝতে দিতে চান না।

এই বছর ক্লাস টেন-এ উঠে সুমন আর থাকতে পারেনি। বাবাকে গিয়ে বলেছে, বাবা, আমার বয়েস এখনও পনেরো হয়নি?

দেওয়ালে টাঙানো পুরোনো ক্যালেন্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বাবা। চোখ কুঁচকে তারিখ দেখে বলেছেন, এখনও প্রায় ছমাস বাকি রে।

ওর জন্মদিন কবে সুমন জানে না। বাড়িতে ওর জন্মদিনের উৎসব কিছু হয় না। হয়তো সেই উৎসব শুরু হবে ওর পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পর–যেদিন খোলা হবে ওই চন্দনকাঠের বাক্স। সুমন সেদিন জিগ্যেস করেছে বাবাকে, আমার জন্মদিন কবে, বাবা?

সাতই জুলাই।

উত্তর শুনে সুমনের মনটা একটু দমে গেছে। তবু ভেবেছে, আর তো মাত্র ছটা মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

.

আজ সেই দিন এসেছে। ছয় জুলাই। সুমন যেন সুস্থির হয়ে কোনও কাজ করতে পারছে না। স্নান-পড়া-খাওয়া সবকিছুতেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। বাবা সবকিছু লক্ষ করলেও, নিজের কাজ নিয়মমতো করে গেছেন। মনের বিচলিত ভাব বুঝতে দেননি।

আনমনা হয়ে স্কুল থেকে ফিরে এল সুমন। চুপচাপ বসে রইল বাড়িতে। ইশ, আর একটা মাত্র দিন। তারপরই ওর পনেরো বছর পূর্ণ হবে! ও জানতে পারবে ওই চন্দনকাঠের বাক্সে মা ওর জন্য কী অমূল্য জিনিস রেখে গেছেন। আজকের রাতটা পেরোলেই।

রাতে স্বপ্নে মা আবার এলেন। যেন হাসিমুখে আশীর্বাদ করলেন সুমনকে, অনেক বড় হ, খোকা। তোর বাবা যে তোর মুখ চেয়ে আছে। তারপর ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ও যেন দেখল, একটা ছোট্ট চাবি কোথা থেকে এসে গেছে ওর হাতে। সুমন ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বাক্সটার দিকে। ওটা খুলে এবার দেখবে ও। অপেক্ষা শেষ হবে।

এমন সময় ঘুমটা ভেঙে গেল সুমনের। বাবা ওকে ডাকছেন, সুমন, ওঠ, ভোর হয়ে গেছে।

ঘুম-চোখ মেলে তাকাল সুমন। পুবের আকাশ সবে ফরসা হয়ে এসেছে। কাকটা এখনও আসেনি ওর ঘুম ভাঙাতে। ও ধীরে-ধীরে উঠে পড়ল। বাবা বললেন, যা, স্নান করে আয়। নতুন জামা-প্যান্ট বের করে রাখছি, এসে পরবি। আজ যে তোর জন্মদিন!

আঙুল দিয়ে চোখ ঘষে ও বলল, আমার বয়স আজ পনেরো পুরো হল, তাই না, বাবা?

হ্যাঁ। এখন যা, চটপট স্নান সেরে নে।

নতুন জামা-প্যান্ট বাবা কবে কখন কিনে এনেছেন সুমন টের পায়নি।

স্নান করে এসে দেখল ঘরের গোটা ছবিটাই পালটে গেছে। সারা ঘরময় ঘন ধূপের গন্ধ, মিষ্টি ধোঁয়া। এক ঝক নয়নতারা ফুলের মালা মায়ের গলায় পরানো। চন্দনের ফোঁটা আর সিঁদুরের টিপ দিয়ে কত দরদ দিয়ে বাবা সাজিয়েছেন মা-কে। আর একটা ছোট্ট পিতলের চাবি রাখা হয়েছে টুলের ওপর–চন্দনকাঠের বাক্সটার ঠিক সামনে।

নতুন পোশাকে বাবার হাত ধরে মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়াল সুমন। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বাবা ভারী গলায় বললেন, তোমার চলে যাওয়ার দুঃখ সইতে না পেরে সব ছবি আমি নষ্ট করে ফেলেছিলাম। শুধু এইটা পারিনি খোকার মুখ চেয়ে। তা হলে ও যে আমাকে কোনওদিন ক্ষমা করত না।

বাবার চোখে জল এসে গেছে। শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুরেখা। সুমনের মাথায় হাত রেখে মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, তোমার কথামতো আজ এই বাক্সের চাবি আমি তুলে দিচ্ছি খোকার হাতে। তোমার প্রিয় দামি জিনিস তুমি নিজের হাতে ওকে দাও। সুমনের দিকে ফিরে বাবা বললেন, বাক্স খোল। দ্যাখ, তোর মা তোর জন্যে কী রেখে গেছে।

সুমনের হাত-পা কাঁপছে। বুক দুরুদুরু। গায়ে যেন কাটা দিচ্ছে। ধীরে-ধীরে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল ও। হাতজোড় করে নমস্কার করল–কে। তারপর গুপ্তধনের সিন্দুক খোলার মতো রোমাঞ্চ অনুভব করে বাক্সের তালা খুলে ফেলল।

ধূপের ঘন ধোঁয়া সরে গিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। ও দেখল, সেই বাক্সের ভেতরে নীল মখমলের ওপর একটা বিবর্ণ হলুদ কাগজ। কাঁপা হাতে সেটা তুলে নিল সুমন। তারপর ধীরে-ধীরে ভাঁজ খুলল। কিছু কাগজের টুকরো ভেঙে ঝরে গেল মেঝেতে। অতি সাবধানে কাগজটা মেলে ধরতে বিবর্ণ তামাটে লেখাগুলো নজরে পড়ল সুমনের। সুন্দর অক্ষরগুলো যেন কোনও শিল্পীর হাতে আঁকা। তেরো

বছরেও ওদের সৌন্দর্য এতটুকু নষ্ট হয়নি। সুমনকে লেখা ওর মায়ের চিঠি! এক ও একমাত্র চিঠি! এটা নিঃসন্দেহে সুমনের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে দামি।

সুমনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। থরথর করে ঠোঁট কাঁপছে। ও পড়তে শুরু করল ও

বাবা সুমন, ইচ্ছে না করলেও অনেক কষ্টে তোকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। রে। তোর বাবা রইলেন, ওঁকে দেখিস। লেখাপড়া করবি মন দিয়ে। কারণ, অনেক বড় হতে হবে তোকে, অনেক বড়। এখন তুই বড় হয়েছিস, আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝবি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে তোর বাবা তোকে বড় করেছেন। সেই ত্যাগের মর্যাদা তুই দিস। আমি অকালে চলে গেলাম। তোর জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু অনেক সাধ নিয়ে লেখা এই চিঠিটা ছাড়া। তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে রে। ভালো হয়ে থাকিস, সোনা আমার। আজ তা হলে আসি।

ইতি–মা-মণি।

একটা হলদে বিবর্ণ কাগজে এতখানি স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা থাকতে পারে ভাবতে পারেনি সুমন। ও চোখ তুলে মায়ের ছবির দিকে তাকায়। চোখের জলে ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে। ও টের পেল বাবা ওকে কাছে টেনে নিয়েছেন। মাথায় পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুমন, মা, মা-মণিগো, তোমার কথা আমি রাখব। নিশ্চয়ই রাখব। তুমি দেখে নিয়ে!

সুমন টের পায়, ওর বাবার শরীরটাও ওর মতো থরথর করে কাঁপছে। ওর ছোট্ট মাথা ভিজে ওঠে বাবার চোখের জলে।

# মুদ্রারাক্ষস

**মুদ্রারাক্ষস**

ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত ভীষণ মনোযোগ দিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোটটা দেখছিলেন। নোটটা ভারী অদ্ভুত। আর পাঁচটা নোটের সঙ্গে বিচিত্র দুটো তফাত।

প্রথমত, নোটের যে-দিকে ৫০ সংখ্যাটা ইংরেজিতে লেখা রয়েছে তার ডান পাশে অশোকস্তম্ভের নীচে সত্যমেব জয়তে কথাটা লেখা নেই। আর দ্বিতীয় আশ্চর্য হল, নোটটার উলটোপিঠে পার্লামেন্ট ভবনের যে-ছবি আছে, তার ছাদে শুধু পতাকাদণ্ডটি দাঁড় করানো রয়েছে– জাতীয় পতাকা উধাও।

একটু দূরে দাঁড়ানো বছর পঁয়তাল্লিশের বেঁটেখাটো চেহারার স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক অশোকচন্দ্র গুপ্তের কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, সাধারণত পঞ্চাশ টাকার যেসব নোট বাজারে পাওয়া যায় তাতে সত্যমেব জয়তে কথাটাও পাবেন, আর উলটোদিকে পার্লামেন্ট ভবনের মাথায় ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে ফ্ল্যাগটাও দেখতে পাবেন।

অথচ এই নোটটার ফ্ল্যাগ উধাও! তা ছাড়া নোটটার অশোকস্তম্ভের দিকটার রং কেমন যেন অস্বাভাবিক নীলচে।

অশোকচন্দ্র গুপ্তসংক্ষেপে যাঁর নাম এসিজি–নোটটাকে তুলে ধরলেন ঘরের খোলা জানলার দিকে। আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওটাকে।

এইবার কথা বলল ইনস্পেক্টর রঘুপতি যাদব, না, স্যার, যা ভাবছেন তা নয়। এই নোটটা জাল নয়–একেবারে অলি।

রঘুপতি যাদব একসময়ে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে এসিজির ছাত্র ছিল। এসিজি তখন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করতেন। তারপর জীবনের নানা পথ ঘুরে রঘুপতি যাদব কীভাবে যেন লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াডে ইনস্পেক্টর হয়ে গেছে। আর অশোকচন্দ্র গুপ্ত বয়সে পঁয়ষট্টির ঘর পেরিয়েও তার গোয়েন্দাগিরির শখ ছাড়তে পারেননি।

এসিজি নোটের নম্বরটা দেখলেন : ২ সিবি ৫৪৭৫৪১ গভর্নরের জায়গায় ইংরেজি আর হিন্দিতে সই করেছেন কে. আর. পুরি।

রঘুপতি ঠিকই বলেছে, নোটটা জালনোট নয়। অথচ কী বিচিত্র!

জয়দেববাবু… মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন অশোকচন্দ্র, বললেন, এটাকে কি রেয়ার নোট বলা যায়?

ভদ্রলোকের নাম জয়দেব সরকার। থাকেন টালা পার্কের কাছে। কাগজের ব্যবসা করেন। তবে খুব অল্প বয়েস থেকেই তাঁর রেয়ার কয়েন আর নোটের দিকে ঝোঁক। এ-সম্পর্কে অনেক জানেন। অন্তত রঘুপতি যাদব সেরকমই জানিয়েছে এসিজিকে।

আর যদি তা সত্যি না হত, তা হলে সকাল নটায় জয়দেববাবুকে বাড়ি থেকে তুলে এসিজির বাড়িতে নিশ্চয়ই সে নিয়ে আসত না।

জয়দেব সরকার সামান্য হেসে বললেন, তা যৎসামান্য রেয়ার বইকি। এ নোট আপনি সহজে খুঁজে পাবেন না।

এসিজি নোটটা জয়দেব সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিভে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলেন। ফ্ল্যাটের খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন দু-পাঁচ সেকেন্ড। তারপর রঘুপতিকে লক্ষ্য করে বললেন, মাই ডিয়ার রঘুপতি, জয়দেববাবুর হেল্প পেলে আর কোনও চিন্তা নেই। তোমার মার্ডারার একেবারে সোজা ক্যাচ কট কট।

এসিজি, প্লিজ, মজাক করবেন না। বলরাম চৌধুরীর মার্ডার কেস আর এক উইকের মধ্যে সভ করতে না পারলে আমার পজিশন ঢিলে হয়ে যাবে।

এসিজি একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেটে জম্পেশ করে টান দিয়ে জয়দেব সরকারকে বললেন, আপনারা বসুন–একটু কফি খান। তারপর নিজেই এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

রঘুপতি এসিজিকে কমদিন চেনে না। প্রাক্তন স্যারের শ্যামবাজারের এই ফ্ল্যাটে সে মোটেই নতুন নয়। এসিজির স্ত্রী কিডনির সমস্যায় কাবু হয়ে আকাশের তারা হয়ে গেছেন প্রায় দশ বছর। আর একমাত্র মেয়ে ঊর্মিলার বিয়ে হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে এই সাদা চুল বৃদ্ধ মানুষটি এই ফ্ল্যাটে একা-একা থাকেন। দিনরাত মেতে থাকেন পাখি আর পাখির ডাকের রহস্য নিয়ে। এ ছাড়া রহস্য-গোয়েন্দা কাহিনির পোকা। সেই কবে থেকে ওই রসে ডুব দিয়ে চুপটি করে বসে আছেন–এখনও মাথা তোলেননি।

ফাইফরমাসের একটা বাচ্চা ছেলে বিশু আর রান্নার একজন ঠিকে লোক নিয়ে দিব্যি আছেন এসিজি। মাঝে-মাঝে স্যারের এই জীবনকে হিংসে করে রঘুপতি যাদব। পড়াশোনা, সিগারেট, আর কফির নেশায় বেশ মেতে আছেন রোগা লম্বা মানুষটি।

রঘুপতি যা ভেবেছিল তাই। কফির ফ্লাস্ক আর তিনটে কাপ হাতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এসিজি। রঘুপতিকে বললেন, রঘুপতি, এই নাও, আমাদের জন্যে কফি ঢালো– আর তুমিও নাও।

তিনটে কাপ আর ফ্লাস্ক পড়ার টেবিলের কাছাকাছি একটা টি-টেবিলে রেখে এতক্ষণ ধরে ঠোঁটের কোণে ঝোলানো জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিলেন এসিজি। একটা চেয়ার টেনে বসলেন ওদের কাছাকাছি। তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, রঘুপতি, কাল তোমার টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে আমার মাথা ঘুরছে। কেন জানো?

তোমার যে কয়েকটা স্পেশাল কথা আমার কানে লেগে আছে সেগুলো এইরকম : ফেমাস বিজনেসম্যান বলরাম চৌধুরি মার্ডার হয়েছেন, ওঁর বড় ছেলে বিশাল পলিটিক্যাল লিডার, লক্ষ কোটি টাকা দামের রেয়ার কয়েন, আর সবার ওপরে ক্লোজড রুম প্রবলেম–বন্ধ ঘরের রহস্য। দরাজ গলায় হাসলেন অশোকচন্দ্র ও বলো, মাথা ঘুরবে কি না?

রঘুপতি যাদব হেসে বলল, স্যার, এতেই থিঙ্কিং মেশিন বিগড়ে গেল! তো আমার হালত কীরকম একবার ভেবে দেখুন।

এসিজি কথায় কথায় প্রায়ই নিজেকে থিঙ্কিং মেশিন বলেন। আর ব্যাপারটা বোঝাতে আঙুল দিয়ে সাদা চুলে ঢাকা মাথায় টোকা মারেন।

রঘুপতি কফি ঢালার কাজ শেষ করতেই একটা কাপ তুলে নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে এসিজি বললেন, রঘুপতি, জয়দেববাবুকে নিয়ে আমরা স্পটে যাওয়ার আগে তুমি ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে আমাদের শোনাবে? অবশ্য আজকের আনন্দবাজার আর টেলিগ্রাফ আমি পড়েছি। জয়দেববাবুও খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়ই?

জয়দেব সরকার শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। এসিজির প্রশ্নে তাড়াহুড়ো করে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, হা–পড়েছি। ওই রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা ছিল বলেই একটু ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়েছি।

রঘুপতি ঝটপট চুমুক দিয়ে কফির কাপ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ করে দিল। কাঁচা পাকা গোঁফে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল।

আজ শুক্রবার। বলরাম চৌধুরী মার্ডার হয়েছেন সোমবার দিনদুপুরে। উনি চৌধুরী ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিক ছিলেন। ওঁর ব্যবসার অ্যানুয়াল টার্নওভার প্রায় তিরিশ কোটি টাকা। ব্যবসা ছাড়া ভদ্রলোকের তেমন কোনও শখ ছিল না। লেকিন রিসেন্টলি নাকি পুরোনো নোট আর কয়েনের দিকে ঝোঁক গিয়েছিল।

বলরাম চৌধুরীর বয়েস কবির সত্তর-বাহাত্তর, বিপত্নীক, তবে জানদার আদমি ছিলেন। ওঁর দু-ছেলে। বড়জন তো মোটামুটি নামি পলিটিক্যাল লিডার। লাস্ট ইলেকশানে জেতার পর অল্পের জন্যে মিনিস্টার হতে পারেননি। নাম শুনলে আপনি হয়তো চিনতে পারবেন, স্যার। সতীনাথ চৌধুরী।

এসিজি মন দিয়ে রঘুপতি যাদবের কথা শুনছিলেন আর মাঝে-মাঝে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছিলেন। প্রাক্তন ছাত্রের কথায় হাত বাড়ালেন নিজের বই আর কাগজপত্র-ছড়ানো অগোছালো টেবিলের দিকে। সেখানে একটা রুবিক কিউব পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে লাল-নীল হলদে-সবুজ খুদে কিউবগুলোকে কয়েকটা মোচড় দিলেন। রুবিক কিউবের নকশা বদলে গেল।

ওটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান হাতে ঠোঁটের সিগারেট নামিয়ে টি-টেবিলে রাখা একটা অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লেন। তারপর হেসে বললেন, সরি, রঘুপতি। আমার কাছে যেসব ইনফরমেশান জরুরি নয় সেগুলো আমি মাথায় রাখি না। বলরাম চৌধুরী, চৌধুরী ইন্ডাস্ট্রিজ, সতীনাথ চৌধুরী–এসব নামের চেয়ে কোনান ডয়েলের মিস্টার শার্লক হোমস, কিংবা রুথ রেন্ডেলের ইন্সপেক্টর ওয়েক্সফোর্ড আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট। যাকগে, তুমি বলে যাও

জয়দেব সরকার এই দুটি মানুষকে লক্ষ করছিলেন। ওঁদের কথাবার্তা শুনতে তার খারাপ লাগছিল না। একজন বন্ধুর মারফত ইন্সপেক্টর যাদব গতকাল তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। অনেক আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, কোনও ভয় নেই। একটা মার্ডারের ব্যাপারে রেয়ার কয়েনের বিষয়ে কিছু মতামত দরকার। তাতে তদন্তের কাজে অনেকটাই সাহায্য হবে।

তাই আজকের দিনটা জয়দেব সরকার ছুটি নিয়েছেন ব্যবসা থেকে। খুব কম বয়েস থেকে ব্যবসায় ঢুকেছেন, ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন, বড় করেছেন। সেইসঙ্গে বয়েসটাও একটু-একটু করে বেড়েছে। বিয়ে-থা করা হয়ে ওঠেনি। তবে রেয়ার কয়েন আর নোটের নেশায় ডুবে গেছেন। আর নেশার টানেই আজ এই অদ্ভুত বৃদ্ধের বাড়িতে ছুটে এসেছেন ইন্সপেক্টর যাদবের সঙ্গে। আসার সময় পকেটে করে বেশ কিছু জিনিসও নিয়ে এসেছেন–যদি কোনও কারণে দরকার পড়ে।

রঘুপতি যাদব ঠোঁট উলটে হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যার মানে অনেকটা রামজির লীলা রামজিই জানে গোছের। তারপর আবার বলতে শুরু করল।

বলরাম চৌধুরী মার্ডার হয়েছেন দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে, ওঁর সল্ট লেকের বাড়িতে, একতলায় নিজের বেডরুমে। ওঁর মুখের ওপরে বালিশ চেপে ধরেছিল মার্ডারার। বালিশে থোড়াসা ব্লাডও লেগেছে। কিন্তু খুনির সঙ্গে সেরকম লড়াই হয়নি। মানে, বাড়ির কেউ কোনও শব্দ শুনতে পায়নি। তবে বাড়িটা বেশ বড়সঙ্গে বাগানও আছে। তা ছাড়া বাড়ির সবাই তখন খাওয়াদাওয়া সেরে দুপুরের ঘুম লাগিয়েছে।

বাড়িতে তখন কে-কে ছিল? প্রশ্নটা করে শেষ-হয়ে-যাওয়া সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন এসিজি।

প্রায় সবাই। কারণ, বলরামবাবুর দু-ছেলের কেউই নোকরি করেন না। বড়জনের কথা তো একটু আগেই বলেছি। আর ছোটজন, মণিনাথ চৌধুরী, গানবাজনা-পাগল মানুষ। বাবার ব্যবসা দুজনের কেউই বসেন না। তবে দুজনেই ফ্যামিলি ম্যান। বড়ছেলের একটি ছেলে আছে কুন্তল ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওর পুজোর হলিডে চলছে। তো সেদিন বাড়িতে সবাই ছিল। মণিনাথ গানবাজনা করছিলেন। ওঁর এক গানের ওস্তাদ সেদিন ছিল ওঁর সঙ্গে। ওস্তাদের নাম অশোক জানা। রোগা, কালো, পান চিবোনো চেহারা। ড্রেস দেখে গানের ওস্তাদ বলে মনে হলেও চেহারা দেখে সন্দেহ হয়। মনে হয়, চ্যাংড়া, লাফাঙ্গা, মাওয়ালি। মাঝে-মাঝেই থেকে যায় চৌধুরীদের বাড়িতে।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ওদের বাড়ির ঠিকে কাজের বউ সুখীর মা বাগিচায় রোদে ছড়ানো জামাকাপড় তুলছিল। তখনই সে জানলা দিয়ে দেখতে পায় বড়বাবু কেমন পিকিউলিয়ার স্টাইলে বিস্তরায় শুয়ে আছেন। সুখীর মা গিয়ে চেঁচামেচি করতে সবাই এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। এই হচ্ছে ব্যাপার।

কথা থামিয়ে কিছু একটা শোনার প্রত্যাশায় রঘুপতি স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, বলরামবাবুর ঘরের জানলায় গ্রিল বসানো আছে নিশ্চয়ই?

রঘুপতি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে চাইল। তারপর ও সেইজন্যেই তো ক্লোজড রুম প্রবলেম। আর সতীনাথ চৌধুরী ভীষণ পলিটিক্যাল প্রেশার তৈরি করেছেন। তাই তো লালবাজারকে নাক গলাতে হয়েছে। এখন আপনি যা করার করুন। আই ওয়ান্ট দ্য ব্লাডি মার্ডারার।

রঘুপতি কখনওই খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল না। কিন্তু ভীষণ সৎ আর পরিশ্রমী। তাই এসিজি বরাবরই ওকে পছন্দ করতেন, এখনও করেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এসিজি একটা অসহায় ভাব খুঁজে পেলেন। ওর মুখের বসন্তের দাগ কিংবা ছোট করে ছাঁটা চুল সেই ভাব লুকোতে পারেনি।

আর রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা? এতক্ষণ চুপ করে শোনার পর জয়দেব সরকার আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলেন। জানলা দিয়ে আসা আলো ওঁর কপালের ডান দিকে হাইলাইট তৈরি করেছে।

রঘুপতি অস্পষ্ট একটা শব্দ করে তারপর বলল, ওটা স্পটে গেলেই বুঝতে পারবেন। বডি রিমুভ করে ঘরটা লক করে রাখা হয়েছিল। ঘরের সব জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। আমি চাবি নিয়ে এসেছি। আর লোকাল থানাকেও ইনফর্ম করা আছে যে, আমরা স্পটে আজ সকলে যাব। কিউ, গুপ্তাসাব, অব চলে? শেষ প্রশ্নটা চোখ বুজে সিগারেটে টান দেওয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষটিকে লক্ষ্য করে।

চোখ খুললেন এসিজি। বললেন, চলো, যাওয়া যাক। ব্যাপারটা একটু-একটু বোঝা গেল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে অশোকচন্দ্র বললেন, রঘুপতি, একটা ব্যাপার কেমন মজার দ্যাখো। যে-ঘরে ওরা সবাই গায়ের জোরে দরজা ভেঙে ঢুকেছে, সেই ঘর থেকে খুনি পালিয়েছে বুদ্ধির জোরে। হাসলেন বৃদ্ধ থিঙ্কিং মেশিন।

রঘুপতি পালটা হেসে ডান হাতের মাল ফুলিয়ে বলল, এখন তো আমার গায়ের জোর আর আপনার বুদ্ধির জোরদুটো নিয়েই আমরা যাচ্ছি। অব দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু এ কাতিল মে হ্যায়।

প্রাক্তন ছাত্রের কথা শুনে প্রাক্তন স্যার হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর সেই আচমকা হাসিতে তার ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ে গেল–তিনি চেষ্টা করেও সেটা সামলাতে পারলেন না।

*

সল্টলেক জায়গাটা কলকাতার কত কাছে, অথচ কত দুরের বলে মনে হয়। কলকাতা শহরের যানজট, গাড়ির হর্নের তীব্র শব্দ, কালো ধোঁয়া, ভিড়, চিৎকার, কিছুই এখানে নেই। তা ছাড়া বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই কেমন চোখ জুড়িয়ে যায়।

বলরাম চৌধুরীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এই কথাটাই মনে হচ্ছিল এসিজি-র।

প্রকাণ্ড মাপের বাড়ি। নাম চৌধুরী ভিলা। সাদা আর বাদামি রং। বড় লোহার গেটের ওপাশে বড় উঠোন। তার একপাশে সারি-সারি টবে ফুলগাছ। আর

বাঁদিকে বেশ বড় মাপের বাগান।

বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ফরসা মতন একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল বাগানের পাশ দিয়ে। তার নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় গামছা দিয়ে তৈরি পাগড়ি। গায়ে মেরুন রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে সরু পাজামা, আর কোমরে বেল্ট।

বাচ্চাটা সাবু! সাবু! বলে চিৎকার করছিল। এসিজিদের দেখামাত্রই চিৎকার করে উঠল, সাবু! জলদি এসো। দেখে যাও কারা এসেছে।

রঘুপতি যাদব অশোকচন্দ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, কুন্তল।

এসিজি ইশারায় ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন, জিগ্যেস করলেন, তোমার নাম কী?

কুন্তল বেশ স্মার্টভাবে উত্তর দিল, এখন আমি চাচা চৌধুরী।

এসিজি অবাক হয়ে বললেন, চাচা চৌধুরী মানে?

খিলখিল করে হেসে উঠল কুন্তল ও এ মা, চাচা চৌধুরীর নাম জানে না! চাচা চৌধুরীর কমিক্স বই পড়োনি?

এসিজির অতিকষ্টে মনে পড়ল যে, ম্যাগাজিনের স্টলে এই নামে কমিক্স দেখেছেন, এবং সেই চৌধুরী বানানে কোনও উ-কার ছিল না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। সাত-তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন তিনি।

জানো, চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর!

এসিজি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাগানের দিক থেকে ছুটে এল আর-একটি ছেলে। বয়েস ষোলো-সতেরো। ময়লা রং। পরনে শুধু একটা হাফ প্যান্ট। পাঁজরা গোনা যাচ্ছে।

হুকুম করুন, চাচা চৌধুরি– বলতে-বলতে ছুটে আসছিল ছেলেটা। কিন্তু তিনজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর কথা আটকে গেল মাঝপথেই।

ও হচ্ছে সাবু– নতুন বালকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল কুন্তল।

রঘুপতি বিড়বিড় করে বলল, এর নাম বিলু। এ-বাড়িতে ফাইফরমাশের কাজ করে।

অশোকচন্দ্র কুন্তলকে জিগ্যেস করলেন, সবসময় তোমরা এমনই খেলা করো?

না, না। যখন বিলুদার কোনও কাজ থাকে না তখন খেলি।

চাচা চৌধুরী আর সাবু সেজে কী করো?

সারা বাড়ি আর বাগানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। দেখি কোথাও কোনও বিপদ হচ্ছে কি না। জানো তো, চাচা চৌধুরী সবার খুব উপকার করে। কাউকে ভয় পায় না। আর সাবুর গায়ে এমন জোর যে, উড়ন্ত এরোপ্লেনকে ধরে আছাড় দিতে পারে…।

শেষ কথাটা শুনে বিলু সাদা-সাদা দাঁত বের করে সরল হাসি হাসল।

জয়দেব সরকার একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে ফেলে রেখে বাচ্চাদের সঙ্গে এই গালগল্প! এ-গল্প তো পরেও করা যেত!

অধৈর্য হয়ে পড়েছিল রঘুপতিও। ও চাপা গলায় বলল, স্যার গপসপ পরে হবে। আগে চলুন, বলরাম চৌধুরীর কামরাটা দেখবেন চলুন।

অশোকচন্দ্র শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে কুন্তলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রঘুপতির কথায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ওর দিকে তাকালেন মায়ার চোখে। তারপর হেসে বললেন, মাই ডিয়ার রঘুপতি, কতবার তোমাকে বলেছি যে, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সেরকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফও আমার নেই। এ ছাড়া দেবেন্দ্রবিজয়, হুঁকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধিও নেই আমার। তবে আমি অতি সাধারণ এক হুনুর–মানে, গোয়েন্দা–যে মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোকচন্দ্র কুন্তলের দিকে ফিরে বললেন, এখন চলি, চাচা চৌধুরী। পরে তোমার সঙ্গে আবার গল্প করব। তারপর রঘুপতিকে : চলো, কোথায় নিয়ে যাবে চলো-।

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে পৌঁছে গেলেন একটা সুদৃশ্য কাঠের দরজার সামনে। রঘুপতি যাদব কলিংবেলের বোতাম টিপল। কুন্তল আর বিলু দৌড়ে চলে গেল বাগানের দিকে।

এ-বাড়িতে আসার পথে রঘুপতি আরও অনেক খবর দিয়েছে এসিজিকে। প্রত্যেকের জবানবন্দির সারমর্ম জানিয়েছে। এসিজির কিছু এলোমেলো প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে।

অশোকচন্দ্র বেশ বুঝতে পারছিলেন রঘুপতি টেনশনে ভুগছে। ধৈর্য ব্যাপারটা ওর বরাবরই একটু কম। এখন সেটা বোধহয় আরও কয়েক দাগ কমে গেছে।

বলরাম চৌধুরির শোওয়ার ঘরে এসে রঘুপতির টেনশানটা আরও স্পষ্ট হল। ও হাত-পা নেড়ে খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু বলতে শুরু করল। ওর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল একইসঙ্গে।

গুপ্তাসাব– কখনও কখনও অশোকচন্দ্রকে এই নামেও ডেকে থাকে রঘুপতি : ঘরের সবকিছু সেদিনের মতোই আছে। শুধু ডেডবডি আর রক্তমাখা বালিশটা সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও চিজ ইধার-উধার করা হয়নি।

ঘরে ঢোকার সময় রঘুপতি বলরাম চৌধুরীর দু-ছেলেকেই ডেকে নিয়েছে। সতীনাথ চৌধুরী গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়ালেও মণিনাথ বেশ বিরক্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন। মণিনাথের সঙ্গে তাঁর গানের গুরু অশোক জানাও এসে হাজির।

রঘুপতি চাপা গলায় সকলের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে এসিজিকে।

মণিনাথ ভুরু কুঁচকে হাই-পাওয়ার চশমার কাচ দিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, বড়দা, আমার এখানে হাজির থাকাটা কি খুব জরুরি? নতুন একটা সুর তৈরি করছিলাম…মানে, যা বলার পুলিশকে তো আগেই জানিয়েছি…বাবা তো আর ফিরে আসবেন না…।

সতীনাথ চৌধুরী শুধু স্থির ঠান্ডা চোখে তাকালেন ছোট ভাইয়ের দিকে। সে-দৃষ্টিতে নীরব শাসন ছিল। মণিনাথ তৎক্ষণাৎ কথা থামিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। সেই অবস্থাতেই বন্ধু এবং গুরু অশোক জানার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

গানের মাস্টারমশাইয়ের গলার শিরা কণ্ঠা ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট। কে জানে, প্রতিদিন গানের চর্চা করে এই অবস্থা হয়েছে কি না! আর গলায় দৈর্ঘ্যও নেহাত ফেলনা নয়।

তিনি গুনগুন করে কী একটা সুর ভাঁজছিলেন। কালো ঠোঁট পানের রসে লালচে। বন্ধুর দৃষ্টি লক্ষ করে তার পিঠে হাত রেখে জড়ানো গলায় বললেন, বড়দার কথা অমান্য করতে নেই, মণিভাই। ও-সুর আমি পরে তুলিয়ে দেবখন–।

বলরাম চৌধুরীর ঘরের দরজা যে আবার মেরামত করা হয়েছে সেটা লক্ষ করলেন এসিজি। আর একইসঙ্গে নতুন হাজির হওয়া তিনটি মানুষকে খুঁটিয়ে জরিপ করলেন।

তালা খুলে রঘুপতি যাদব বলরাম চৌধুরীর ঘরে আমন্ত্রণ জানাল এসিজিকে। জয়দেব সরকারকেও ডাকল ও আসুন, জয়দেববাবু।

কিন্তু সতীনাথ ও মণিনাথকে অনুসরণ করে যখন অশোক জানা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন তখন মুখিয়ে দাঁড়াল রঘুপতি ও আপ কিঁউ আ রহে হ্যায়, মাস্টারজি?

অশোক জানা কয়েকবার তেঁাক গিলে ইতস্তত করে বললেন, না, মানে, মণিভাই খুব সেন্টিমেন্টাল তো…হঠাৎ যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায়… পিতৃশোক বলে কথা…।

তার জন্যে আমরা আছি। আপ দফা হো যাইয়ে—

মানে!

মানে আপনি আসতে পারেন– বলেই দরজাটা মাস্টারজির মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে রঘুপতি।

তারপর উত্তেজিতভাবে শুরু করেছে ওর ধারাবিবরণীর রাজধানী এক্সপ্রেস।

এসিজি একহাতে সিগারেটে টান মারছিলেন, আর অন্য হাতে টানছিলেন সাদা চুলের গোছা। চশমার ফাঁক দিয়ে তার অভিজ্ঞ চোখ ঘরের প্রতিটি জিনিস প্রায় গোগ্রাসে গিলছিল।

ঘরে বড়-বড় দুটো জানলা-দুটোই বাগানের দিকে। জানলায় ঘিয়ে রঙের সুদৃশ্য গ্রিল বসানো। গ্রিলের ওপাশে ঘষা কাচের শার্সি বসানো পাল্লা। গ্রিলের লোহাগুলো প্রায় আট মিলিমিটার পুরু। এ-গ্রিল কাটার বা ভাঙার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

জানলা দিয়ে বাগানের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে রোদ আর আলো এসে পড়েছে ঘরে।

একটা জানলায় সোজাসুজি বলরাম চৌধুরির খাট। আর-একটা জানলায় সামনে বসানো রয়েছে একটা বড় টেবিল। টেবিলে প্রচুর ফাইল আর কাগজপত্র। আর তার সামনে একটা গদি আঁটা স্টিলের চেয়ার-টেবিলের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরানো।

এ ছাড়া ঘরে টিভি, আলনা, আলমারি, টেলিফোন, কোয়ার্টজ দেওয়াল-ঘড়ি আর একটা বুককেস রয়েছে।

স্টিলের চেয়ারটা ছাড়া অতিথিদের বসার জন্য ঘরে দুটো লাল রঙের প্লাস্টিকের কিউব রয়েছে। আর তার সঙ্গে মানানসই প্লাস্টিক আর কাঁচে তৈরি একটা শৌখিন টি-টে।

টেবিলের কাছে গিয়ে ডানদিকের ওপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলল রঘুপতি যাদব। জয়দেব সরকারকে ইশারায় ডেকে বলল, মিস্টার সরকার, সেই সকাল থেকে আপনি বোধহয় বোর হয়ে গেছেন। এইবার আপনার সাবজেক্টে এসে গেছি। ইধর আইয়ে। দেখিয়ে বলে খোলা ড্রয়ারের ভেতরে আঙুল দেখাল রঘুপতি ও রেয়ার কয়েন্স। তবে জেনুইনলি রেয়ার কি না আপনি বলতে পারবেন।

ড্রয়ারটার কাছে এসে জয়দেব সরকার মানুষটা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। এতক্ষণ যার কথাবার্তায় চেহারায় তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না এখন সে যেন শিকারি চিতা হয়ে গেল পলকে।

ড্রয়ারে একটা সাদা কাগজের ওপরে অন্তত পনেরো-বিশটা বড় মাপের তামার পয়সা পড়ে আছে। তার বেশিরভাগই বদখত চেহারায়, গায়ে সবুজ কপার সালফেটের দাগ-ধরা।

জয়দেব সরকার গোটা ড্রয়ারটাকে বাইরে বের করে নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর থিঙ্কিং মেশিনকে তাজ্জব করে দিয়ে পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে তামার পয়সাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

রঘুপতি আর এসিজি ভদ্রলোকের দুপাশে দাঁড়িয়ে ওঁর কাজকর্ম লক্ষ করছিলেন।

একটা একটা করে প্রত্যেকটা কয়েন দেখলেন জয়দেব সরকার। একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে পকেট থেকে পেন বের করে কীসব লিখে নিতে লাগলেন মাঝে-মাঝে।

রঘুপতি যাদব আবেগহীন গলায় মন্তব্য করল, আপনি নিশ্চিন্তে কাজ করুন, মিস্টার সরকার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টের টিম তাদের কাজ কমপ্লিট করে গেছে।

অ্যাঁ– জয়দেব সরকার আচমকা মনোযোগ ভেঙে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর বোধহয় রঘুপতির কথার সারমর্ম তাঁর মাথায় ঢুকল। তাই ও, ঠিক আছে বলে আবার মাথা নামিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর জয়দেব সরকার আতসকাচ টেবিলে রেখে মাথা তুলে এসিজি আর রঘুপতিকে দেখলেন। একটু দূরে সতীনাথ আর মণিনাথ চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোক ইতস্তত করে জিগ্যেস করলেন এসিজিকে, ওঁদের সামনেই বলব?

বলুন।

এসিজি হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা হাতে নিয়ে জানলার গ্রিলের দিকে এগোলেন। টুকরোটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার সময় কয়েকটা গাছগাছালির পাশে কুন্তলকে দেখতে পেলেন।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন এসিজি।

কুন্তল ছুটে গ্রিলের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার পাগড়ি তখনও একই ঢঙে বসানো। ওর কয়েক হাত পিছনে সাবু, ওরফে বিলু।

কী করছ, চাচা চৌধুরী?

কুন্তল চোখ বড়-বড় করে বলল, বাড়ির ওপরে ওয়াচ রাখছি…কখন কী বিপদ হয়।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাচ্চাটার সরল চোখ দেখলেন অশোকচন্দ্র। তারপর বললেন, ঠিক আছে, খেলা করো গিয়ে।

এসিজি গ্রিলের নকশাটা বেশ ভালো করে দেখলেন। সত্যি, এ-গ্রিল কারও পক্ষে কাটা বা বেঁকানো বেশ কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া সেরকম কোনও চেষ্টার ছাপ কোনও গ্রিলেই দেখেনি রঘুপতি।

এসিজি টেবিলের কাছে ফিরে এসে নতুন একটা সিগারেট ধরাতেই জয়দেব সরকার গলাখাঁকারি দিলেন, বললেন, স্যার, মিস্টার চৌধুরী ইদানীং বোধহয় রেয়ার কয়েন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন।

কেন? রঘুপতি জিগ্যেস করল।

কারণ, আমি জানি একজন বিদেশি বায়ার–মানে, খদ্দের–এখন বিশেষ কয়েকটা কয়েনের জন্যে হন্যে হয়ে কলকাতা আর তার আশেপাশে চষে বেড়াচ্ছে। একইসঙ্গে প্রচুর দালালও ঘুরছে বাজারে। মিস্টার চৌধুরীর পয়সাগুলোর মধ্যে সেরকম কয়েকটা কয়েন দেখতে পাচ্ছি।

সতীনাথ আর মণিনাথ খুব তাড়াতাড়ি ওঁদের কাছে চলে এলেন। প্রায় হাঁ করে জয়দেব সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওদের নজর ছিটকে যাচ্ছিল কয়েনগুলোর দিকে।

আপনাদের বাবার কাছে কয়েনের খোঁজে কোনও লোকজন আসত? রঘুপতি দু-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

মণিনাথ বললেন, কীসের খোঁজে আসত জানি না, তবে বেশ কিছুদিন ধরে দেখতাম উলটোপালটা ধরনের লোক বাবার কাছে আসত।

বেশ কিছুদিন বলতে? এসিজি জানতে চাইলেন।

এই মাস চার, সাড়ে চার উত্তর দিলেন সতীনাথ। অবশ্য উত্তর দেওয়ার আগে মণিনাথের নীরব সমর্থন খুঁজেছেন।

জয়দেব সরকার বলে উঠলেন, প্রায় মাসছয়েক ধরে এই কয়েন খোঁজার ঢেউ উঠেছে। কলকাতা থেকে ব্যাপারটা এখন গ্রাম-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে।

রেয়ার কয়েনের কথা কী বলছিলেন– সতীনাথ আসল প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন না।

জয়দেববাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এসিজিকে লক্ষ্য করে বললেন, যেসব রেয়ার কয়েনের খোঁজ চলছে তার মধ্যে বেশিরভাগই হল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির হাফ আনা, মানে, আধ আনা। কয়েনগুলো বাজারে ছাড়ার বছরগুলো হল : ১৬১৬, ১৭১৭, ১৮০৬, ১৮১৮, ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪২, ১৮৪৪। এতে যেসব ছবির ছাপ আছে সেগুলো হল : জোড়া ডাব, রাজা রামচন্দ্রের দরবার, হনুমান, জোড়া সাপ এইসব। পয়সাগুলো মেইনলি তামার তৈরি, তার সঙ্গে বোধহয় কিছুটা করে ইরিডিয়াম মেশানো আছে।

ইরিডিয়াম! ওটা তো রেয়ার মেটাল! অশোকচন্দ্র গুপ্ত অবাক হয়ে বললেন।

জয়দেব সরকার মাথা নেড়ে হাসলেন? হয়তো সাধারণ ইরিডিয়াম নয়, তার কোনও রেডিয়োঅ্যাকটিভ আইসোটোপ। মানে ইরিডিয়াম-১৯১ আর ইরিডিয়াম-১৯৩। তেজস্ক্রিয় হলেও ইরিডিয়ামের এই দুটো আইসোটোপ খুব স্টে –মানে, হাফ লাইফ অনেক বেশি।

তা হলে তো সেই কয়েনের রেডিয়োঅ্যাকটিভিটি থাকবে! একটু ভয়ের গলায় বললেন এসিজি।

জয়দেব সরকার জোর দিয়ে বললেন, থাকবেই তো! তবে তার এফেক্ট কী হবে সেটা বলতে পারব না। বাজারের খবর হচ্ছে, এ-ধরনের পয়সা নাকি আতপ চাল টানে। মানে, চুম্বক যেমন লোহা টানে আর কী! তারপর কেউ-কেউ বলছে, তাতে নাকি আতপ চালের দানার রংও পালটে যায়। তবে একটা ধান ভেঙে সঙ্গে-সঙ্গে তার চালের দানাটা দিয়ে টেস্ট করতে হবে–এতে নাকি চালের দানাটায় কোনও ময়েশ্চার জমে না।

বলেন কী, মশাই! মণিনাথ তার হাই-পাওয়ার চশমা নাকের ডগায় ঠিক করে বসাতে বসাতে বললেন।

জয়দেব সরকার মণিনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, বললাম তো, এসব খবর আমার কানে এসেছে। গুজব না সত্যি বলতে পারব না। কারণ, এই চালের দানা টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা আমি স্বচক্ষে দেখিনি।

সতীনাথের গম্ভীর মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। তিনি এসিজির দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবাকে আমি বেশ কয়েকবার ধানের শিস নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখেছি।

বাবা কি চালের দানা নিয়ে কয়েন টেস্ট করছিলেন? মণিনাথ যেন আপনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

হতে পারে। রঘুপতি বলল, তবে ইয়ে সচ হ্যায়, গুপ্তাসাব, আমরা ঘরের মেঝেতে বেশ কয়েকটা চালের দানা দেখেছিলাম। ওগুলোকে আমরা তেমন কোনও ইম্পর্ট্যান্স দিইনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেসটা কী–।

বাবার কালেকশানে কি ওরকম রেয়ার কয়েন সত্যি-সত্যি আছে? সতীনাথ জয়দেব সরকারের কাছে জানতে চাইলেন।

আছে। ১৭১৭, ১৮৩৯, আর ১৮৪০ সালের তিনটে আধ আনা এখানে আছে– আঙুল দিয়ে টেবিলে রাখা কয়েনগুলোর দিকে দেখালেন জয়দেববাবু।

সত্যি? বিস্ময় মেশানো প্রশ্নে যেন ফেটে পড়লেন মণিনাথ আর সতীনাথ।

এসিজি বেশ অবাক হয়ে তাকালেন জয়দেব সরকারের দিকে। রঘুপতির চোয়ালের রেখা শক্ত হল, চোখ ছোট হয়ে এল।

কয়েক সেকেন্ড সবাইকেই উৎকণ্ঠায় রেখে তারপর হাসলেন জয়দেব সরকার ও সাল তারিখ ঠিক থাকলেও এই তিনটে পয়সাই নকল। তা না হলে এগুলোর এক-একটার দাম কম করেও কয়েক লক্ষ টাকা হত।

একথায় কয়েকটা বেলুন যেন চুপসে গেল ঘরের মধ্যে।

এরকম প্রচুর নকল কয়েন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে কিনে ঠকছেও। আবার কেউ কেউ কয়েন হাতে পেয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট

করাচ্ছে। কথা বলতে-বলতে টেবিল থেকে আতসকাচটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন জয়দেব সরকার।

রঘুপতি যাদব সতীনাথ আর মণিনাথের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, আপনারা কয়েনের ব্যাপারে কিছু জানেন না?

দুজনেই মাথা নাড়লেন।

এসিজি সিগারেট হাতে নিয়ে ঘরটা ঘুরে-ফিরে দেখছিলেন। কখনও দরজার কাছে, কখনও বিছানার পাশে, আর কখনও বা জানলায় গ্রিলের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন।

মিস্টার সরকার জয়দেববাবুকে লক্ষ্য করে বলল রঘুপতি, দেখুন তো, টেবিলের এইসব কাগজপত্রে কয়েনের ব্যাপারে আর কিছু পান কি না–।

একটুও ব্যস্ত না হয়ে জয়দেব সরকার টেবিলের কাছে এলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে একটা-একটা করে কাগজ দেখতে লাগলেন।

সতীনাথ চৌধুরী রঘুপতি যাদবকে লক্ষ্য করে সামান্য রুক্ষস্বরে জানতে চাইলেন, কবের মধ্যে আপনি কেসটা সম্ভ করছেন, ইন্সপেক্টর যাদব?

রঘুপতি অশোকচন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন, কোশিশ তো করছি। সেইজন্যেই আজ আমার স্যারকে নিয়ে এসেছি।

তাচ্ছিল্যের চোখে এসিজির দিকে দেখলেন সতীনাথ। তারপর ও বাবা আমাদের পার্টিকে বিরাট ডোনেশান দিতেন। আমার ওপর খুব চাপ আসছে।

মণিনাথ যেন দাদাকে সায় দিতেই বলে উঠলেন, সভ করতে না পারেন, অন্তত কাউকে অ্যারেস্ট তো করুন।

রঘুপতির বসন্তের দাগ-ধরা মুখে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। ও অভদ্র স্বরে জবাব দিল, অ্যারেস্ট তো ম্যায় আভি ইসি বক্ত কর সকতা । লেকিন সে আপনার হেলথের পক্ষে ভালো হবে না।

মণিনাথ স্পষ্ট শিউরে উঠে নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেলেন।

এই কাগজটা দেখুন– জয়দেব সরকার একটা কাগজ দেখিয়ে সকলের মনোযোগ চাইলেন, এটা একটা কয়েনের টেস্ট রিপোর্টের জেরক্স কপি।

রঘুপতি আর এসিজি কাগজটা দেখার জন্য জয়দেববাবুর খুব কাছে এসে ঝুঁকে পড়লেন।

ম্যাড্রাসের জুপিটার নামের কোনও এক কম্পিউটারাইজড এয়ার কন্ডিশন্ড ল্যাবরেটরিতে এই টেস্টটা করা হয়েছে। ১৬১৬ সালের কপার-ইরিডিয়াম হাফ আনা কয়েন। হাতে পাঞ্চ করে তৈরি। ভর ৮২ গ্রাম ৭০০ মিলিগ্রাম। আর কয়েনটা এক সেন্টিমিটার পুরু। রিপোর্টটা আর-একবার দেখে নিয়ে জয়দেব সরকার বললেন, এ ছাড়া রেডিয়োঅ্যাকটিভিটিও বেশ আছে দেখছি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এসিজি প্রশ্ন করলেন, এই জেনুইন কয়েনটা হাতে পেলে তার দাম মোটামুটিভাবে কত হতে পারে, মিস্টার সরকার? লাখ টাকা?

রিপোর্টটা টেবিলে রেখে দিয়ে একটু হেসে জয়দেববাবু বললেন, যে সত্যি-সত্যি অ্যান্টিক কয়েনের কদর বোঝে, তার কাছে এর দাম অনায়াসে কয়েক কোটি টাকা হতে পারে।

ঘরে যেন বাজ পড়ল। অনেকক্ষণ সবাই চুপ। শুধু কোয়ার্টজ ঘড়ির সেকেন্ডের কাটা নড়ার টিকটিক শব্দ।

ওই নোংরা চেহারার কয়েনগুলোর এত দাম! ভাবল রঘুপতি।

অশোকচন্দ্র স্পষ্ট স্বরে বললেন, রঘুপতি, এবার তুমি বোধহয় বলরামবাবুর মার্ডারের জেনুইন মোটিভের হদিস পেয়ে গেছ।

হঠাৎই সতীনাথ ও মণিনাথের দিকে ফিরে এসিজি বিনীতভাবে বললেন, আপনারা যদি একটু বাইরে অপেক্ষা করেন তা হলে ভালো হয়। আমরা একটু আলাদা কথা বলতে চাই।

ওঃ, শিয়োর বলে সতীনাথ দরজার দিকে এগোলেন।

মণিনাথ দাদাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে টেবিলের কয়েনগুলোর দিকে কয়েকবার দেখলেন।

ওঁরা চলে যেতেই রঘুপতি দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। তারপর বলল, গুপ্তাসাব, এবার বলুন, কী বুঝলেন?

একটা ব্যাপার আমি বোধহয় সম্ভ করতে পেরেছি, রঘুপতি।

কোন ব্যাপার?

তোমার ক্লোজড রুম প্রবলেম। বন্ধ ঘর থেকে খুনি কীভাবে পালাল সেটা আমি বোধহয় ধরতে পরেছি।

রঘুপতি প্রত্যাশা-ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল প্রাক্তন স্যারের দিকে।

জানলায় কাছে গিয়ে সিগারেটের শেষ হয়ে আসা টুকরোটা বাইরে ফেলে দিলেন এসিজি। তারপর ঘাড়ের কাছে নেমে আসা সাদা চুলের গোছায় বারকয়েক টান মেরে বললেন, চলো, রঘুপতি। এবারে যাওয়া যাক। তবে যাওয়ার আগে চাচা চৌধুরীর সঙ্গে একবার কথা বলে যাব–খুব জরুরি কথা।

রঘুপতি বেশ অবাক হলেও কিছু বলল না।

ঘরটা শেষবারের মতো দেখে নিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বেরিয়ে এলেন বাইরে। ওঁকে অনুসরণ করে জয়দেব সরকার ও রঘুপতি যাদব।

রঘুপতি, এই রেয়ার কয়েনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে তুমি একটু নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে তদন্ত শুরু করো। আর আমি তোমাকে বাড়তি কিছু ইনফরমেশান দেব। মনে হয়, এ-থেকে তুমি দিনসাতেকের মধ্যেই মার্ডারারকে খাঁচায় পুরতে পারবে। প্রাক্তন ছাত্রের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে এসিজি জিগ্যেস করলেন, কী, খুশি তো?

কথা বলতে-বলতে ওঁরা মোজেইক করা চাতালে বেরিয়ে এসেছিলেন। সতীনাথ আর মণিনাথ কোথা থেকে যেন ওঁদের দেখতে পেয়ে ব্যস্ত পায়ে কাছে চলে এলেন।

রঘুপতি সতীনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের কো-অপারেশানের জন্যে ধন্যবাদ।

সতীনাথ সৌজন্য দেখিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এসিজির কথায় সেটা আর বলে উঠতে পারলেন না।

আপনার ছেলেকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, কয়েকটা কথা বলব–

তার মানে! বাবার মার্ডারের ব্যাপারে ওইটুকু বাচ্চার কী বলার আছে। বেশ বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন সতীনাথ।

মণিনাথ অবাক হয়ে এসিজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চাচা চৌধুরী আর সাবুর গল্প করব। সে আপনি বুঝবেন না। হেসে বললেন এসিজি। তারপর রঘুপতিকে চোখের ইশারা করলেন। যার মানে, কুন্তলকে ডেকে নিয়ে এসো।

রঘুপতি বাড়ির ভেতর দিকে রওনা হতেই সতীনাথ আহত গলায় বললেন, থাক, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সতীনাথ চলে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কুন্তল চলে এল লাফাতে লাফাতে। এখন ওর মাথায় পাগড়ি নেই, কোমরের বেল্টও উধাও।

আমাকে ডেকেছ?

হ্যাঁ, তোমার দাদুর মার্ডারের ব্যাপারে একটু চাচা চৌধুরীর সাহায্য চাই। চলো, বাগানে চলো।

ভ্যাবাচ্যাকা মণিনাথকে চাতালে দাঁড় করিয়ে রেখে এসিজি কুন্তলকে নিয়ে বাগানের গাছপালার মধ্যে চলে এলেন। ওঁকে অনুসরণ করে সঙ্গী হলেন জয়দেব সরকার আর রঘুপতি যাদব।

নানান গাছের ফাঁক দিয়ে বলরাম চৌধুরীর ঘরের জানলা দুটো দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে আঙুল তুলে এসিজি কুন্তলকে জিগ্যেস করলেন, বলো তো, চাচা চৌধুরী, লাস্ট সোমবার দুপুরে তুমি কি কাউকে ওই জানলার কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?

দাঁড়াও, ভেবে বলছি– বাচ্চা ছেলেটা আঙুলে কর গুনতে লাগল আর ধীরে ধীরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ…।

কুন্তলবাবু, চাচা চৌধুরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের মতো প্রখর। চাচা চৌধুরী একবার যা দ্যাখে তা কখনও ভোলে না– অশোকচন্দ্র কুন্তলকে উৎসাহ দিতে চাইলেন।

মনে পড়েছে! মনে পড়েছে! কুন্তল আচমকা লাফিয়ে উঠে বলল, গানকাকু ওই ডানদিকের জানলায় গ্রিলের কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন করছিল।

গানকাকু!

হ্যাঁ। কাকুমণিকে যে গান শেখায়।

এসিজি চকাৎ শব্দে একটা চুমু খেলেন কুন্তলের গালে। তারপর বললেন, থ্যাঙ্ক য়ু, চাচা চৌধুরী। তুমি আমার চেয়েও বড় হুনুর।

হুনুর মানে! অবাক চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকাল কুন্তল।

এটা ফারসি শব্দ–বাংলায় ঢুকে পড়েছে। এর মানে হল, খুব বুদ্ধিমান– এককথায় গোয়েন্দা বলতে পারো। আজ আমরা চলি। পরে একদিন এসে তোমার সঙ্গে খুব গল্প করব।

চৌধুরি ভিলার বাইরে এসে রঘুপতি এসিজিকে জিগ্যেস করল, ব্যাপারটা কী হল, গুপ্তাসাব?

এসিজি নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ড্যাম সিম্পল, রঘুপতি। গানের মাস্টারমশাই অশোক জানা-ই হচ্ছে কালপ্রিট–তোমার রেয়ার বার্ড। তবে সেরকম কোনও প্রমাণ তো নেই। তুমি ওকে খাঁচায় পুরে ছত্রিশ রকম পুলিশি দাওয়াইয়ের সাঁইতিরিশটি ডোজ অ্যাপ্লাই করলেই বোধহয় কনফেশান পেয়ে যাবে।

কিন্তু জানলার কাছে উনি কী করছিলেন? জয়দেব সরকার জানতে চাইলেন।

ওঁরা কথা বলতে বলতে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে এসিজি বললেন, রঘুপতি, রামভক্ত হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে আসার গল্পটা তোমার মনে আছে তো! বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে গোটা পর্বতটাই বয়ে নিয়ে এসেছিল পবন-নন্দন। সিগারেটে পরপর দুটো লম্বা টান দিয়ে তারপর ও এও অনেকটা সেইরকম। জানলার গ্রিলটা কাটতে বা ভাঙতে না পেরে অশোক জানা হনুমানের মতো গোটা গ্রিলটাই খুলে নিয়েছিল জানলার ফ্রেম থেকে। এই কাজের জন্যে খানিকটা নারকোল তেল আর একটা ভারী স্ক্রু-ড্রাইভারই যথেষ্ট। আমার ধারণা, ও আগে থেকেই গ্রিলের বেশ কয়েকটা স্ক্রু খুলে রেখেছিল। ঘটনার দিন শেষ একটা কি দুটো স্ক্রু খুলে গ্রিল সরিয়ে ও বলরামবাবুর ঘরে ঢোকে। তারপর নিজের কুকর্ম আড়াল করতে জানলার ঘষা কাচের পাল্লা ভেজিয়ে দেয়। কাজ সেরে বেরিয়ে এসে যখন ও গ্রিলটা আবার জায়গামতো বসিয়ে স্ক্রু এঁটে দিচ্ছিল, তখনই বোধহয় কুন্তল ওকে দেখতে পায়। ব্যস, এই হল তোমার ক্লোজ্‌ড রুম প্রবলেম।

একটু থেমে এসিজি রঘুপতিকে জিগ্যেস করলেন কী, এবার খুশি তো? এবার পারবে তো জাল গোটাতে?

রঘুপতি চওড়া হেসে বলল, স্যার, ভাগ্যিস আপনি শার্লক হোমসের মতো পাইপ টানতে পারেন না, আর এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফ আপনার নেই!

কেন, তা হলে কী হত? কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

তা হলে আপনি গল্পের বইয়ের পাতায় ঢুকে যেতেন। বলরাম চৌধুরীর মার্ডার কেস আর সভ হত না।

ওঁরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন জোর গলায়।

# যখন কিছুই মনে পড়ছে না

**যখন কিছুই মনে পড়ছে না**

তখন আপনি কী করবেন?

অফিস থেকে ফেরার সময় যদি আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আর আপনি সব ভুলে যান, কিছুই যদি আপনার মনে না পড়ে, তখন আপনি কী করবেন বলুন তো!

আমি নিজে কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না বলে দিশেহারা হয়ে আপনাকে জিগ্যেস করছি।

রোজকার মতো অফিস থেকে ফিরছিলাম। একটু আনমনা ছিলাম বলে ঠিকঠাক বাসে উঠতে পারিনি। টিকিট কাটার সময় কন্ডাক্টর ভাই বলল যে, বাসটা রাজাবাজার থেকে ডানদিকে ঘুরে যাবে। অথচ আমার সোজা রাস্তা ধরে কোথায় একটা যেন যাওয়ার কথা। তাই বাসটা রাজাবাজার স্টপেজে এসে ডানদিকে ঘুরে থামতেই নেমে পড়েছি।

প্রায় সাতটা বাজে। চার রাস্তার মোড়টা গাড়ি-ঘোড়া, অটো আর সাইকেল ভ্যানে জট পাকিয়ে আছে। তার সঙ্গে পিলপিল করছে ব্যস্ত মানুষের দল।

মোড়টা কোনাকুনি পার হয়ে উলটোদিকের বাস স্টপে যেতে হবে। সেখান থেকেই সোজাসুজি যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে।

তো সেই চেষ্টাই করছিলাম। এদিক-সেদিক ছুটে চলা গাড়ির গতিপথ এড়িয়ে কায়দা করে রাস্তাটা পার হচ্ছিলাম। আর ঠিক তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা হল।

একটা ট্যাক্সি আর একটা মিনিবাস তেরছাভাবে বাঁক নিচ্ছিল, আর তাদের ফাঁকফোকর দিয়ে তাড়া খাওয়া নেংটি ইঁদুরের মতো এঁকেবেঁকে ছুটে যাচ্ছিল দুটো অটো। আমি বোধহয় একসেকেন্ডের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম…ঠিক মনে নেই। একটা অটো আমাকে পাশ থেকে এসে ধাক্কা মারল। আমি ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেলাম একটা বাসের গায়ে। মাথাটা কী একটা শক্ত জিনিসে ঠুকে গেল। তারপর পড়ে গেলাম রাস্তায়।

লোকজনের হইহই কানে এল। তার সঙ্গে গাড়ির নানারকম হর্নের শব্দ। ব্যস, তারপর আর কিছু মনে নেই।

একটু পরে চোখ মেলে যখন তাকালাম, তখন আমাকে ঘিরে অনেক ঝুঁকে পড়া মানুষের ভিড়। আমাকে চোখ খুলতে দেখেই চাপা চিৎকার উঠল, জ্ঞান ফিরেছে! জ্ঞান ফিরেছে!

দেখলাম আমি ফুটপাথে পড়ে আছি। চারপাশে গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ। আমার মুখ-চোখ মাথা জলে ভেজা। গায়ে মাথায় ব্যথা। বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছটা জ্বালা করছিল। ওপর ওপর তাকিয়ে জামা-প্যান্টে কোনও রক্তের দাগ খুঁজে পেলাম না।

বেশ কয়েকটা হাত আমাকে ধরাধরি করে দাঁড় করাল। অনেকে একসঙ্গে জিগ্যেস করল, খুব লেগেছে?, হাঁটতে পারবেন তো? ফিট না লাগলে বলুন এন. আর.এস-এ নিয়ে যাই।

হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখলাম, সেরকম কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। মোটামুটি ঠিক আছি।

আশপাশ থেকে লোকজন তখনও মন্তব্য করছে, খুব লাকিলি বেঁচে গেছেন। আর একটু হলেই বাসের তলায় ঢুকে যেতেন–, ওরকম রিস্ক নিয়ে রাস্তা পার হন কেন? বাড়ি ফিরতে পারবেন তো? একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান।

হ্যাঁ, একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। বাড়ি ফিরতে হবে।

ঠিক তখনই খেয়াল করলাম, আমার সঙ্গে সবসময় যে-ফোলিও ব্যাগটা থাকে সেটা দেখতে পাচ্ছি না। ওটা খুঁজতে চারপাশে তাকালাম।

নোংরা ফুটপাথ, তার কোল ঘেঁষে আরও নোংরা নর্দমা। কিন্তু না, আমার ব্যাগটা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

তখনই আরও খেয়াল করলাম, বাঁ-হাতের কবজিতে বাঁধা স্টিল ব্যান্ডের রিস্টওয়াচটাও নেই। কেউ ওটা খুলে নিয়েছে।

ততক্ষণে চারপাশের লোকজনের ভিড় ফিকে হয়ে গেছে। যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আবার।

আমার মাথার বাঁ-দিকটা দপদপ করছিল। ভেজা চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমার জ্ঞান ফেরাতে কেউ হয়তো মাথায় মুখে জল ঢেলেছিল।

কিন্তু কতক্ষণ আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম? বড়জোর পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট। তার মধ্যেই আমার ব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে কেউ চম্পট দিয়েছে!

তখনই মনে হল, বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার।

কিন্তু কাকে? বাড়িতে কে কে আছে আমার?

আশ্চর্য! কিছু তো মনে পড়ছে না!

পাগলের মতো স্মৃতি হাতড়াতে লাগলাম। আমি কি বিয়ে করেছি? আমার কি ছেলেমেয়ে আছে? আমি কে? আমার নাম কী?

আমি হতবুদ্ধি হয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুই মনে পড়ছে না।

অস্থির মন ফুটন্ত দুধের মতো ছটফট করছিল। অসংখ্য প্রশ্ন কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

নাঃ, কাউকে না কাউকে একটা ফোন করা দরকার। নিশ্চয়ই মোবাইল ফোনে আমার চেনা মানুষজনের অনেক ফোন নাম্বার আছে। দেখি তো!

পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল ফোনটা বের করতে গেলাম।

নেই।

মোবাইল ফোন নেই। ওয়ালেট নেই। এমনকী রুমালটা পর্যন্ত নেই।

সামান্য কয়েক মিনিট অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, আর সেই ফাঁকেই সবকটা জিনিসের হাত পা গজিয়ে গেছে! কেউ ওদের চক্ষুদান করেছে।

আমি এখন কী করি!

না, ভয় পেলে চলবে না। মাথা ঠান্ডা করে একটু ভাবতে হবে।

নোংরা ফুটপাথ ধরে আমি পা ফেলতে লাগলাম। একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগলাম।

ফুটপাথের ওপরে একটা ভাতের হোটেল, তার একপাশে তোলা উনুন জ্বলছে। তারপরই দুটো টেলারিং-এর দোকান, একটা পিচবোর্ডের বাক্স তৈরির কারখানা, একটা ওষুধের দোকান।

ওষুধের দোকানের পাশে একটা কোনাচে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বড়-বড় কয়েকটা শ্বাস নিলাম। মনে-মনে এক-দুই-তিন গুনে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারপর খুব খুঁটিয়ে ভাবতে শুরু করলমে।

আমার নাম মনে পড়ছে না। আমি কে তা জানি না। আমি কোথায় যাচ্ছিলাম সেটা মনে করতে পারছি না। আমি অফিস থেকে রওনা হয়েছি সেটা মনে আছে, কিন্তু অফিসটার নাম কী, সেটা কোথায় কিছু মনে নেই।

তা হলে বিজ্ঞানের ভাষায় যেটাকে অ্যামনেজিয়া বলে এটা তাই? বাসে মাথাটা ঠুকে গিয়ে কি এই কাণ্ডটা হয়েছে?

আমার কাছে কোনও টাকাপয়সা নেই, কোনও কাগজপত্র বা আইডেনটিটি প্রুফ নেই। আমি জামা-প্যান্ট পরা একজন ভদ্রলোক–এখন শুধু এইটুকুই আমার পরিচয়।

রাস্তায় প্রচুর লোকের চলাচল। তাদের দেখে আমার হিংসে হচ্ছিল। ওরা জানে নিজেদের পরিচয়। আর..আর ওদের পকেটে কম-বেশি পয়সা আছে।

মাথাটা দপদপ করছিল। আর তার সঙ্গে খিদেও পাচ্ছিল।

শেষ কখন খেয়েছি আমি? নিশ্চয়ই দুটো কি আড়াইটের সময় অফিসে টিফিন-ঠিফিন যা হোক খেয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবার পর মনে হল পুলিশের কাছেই যাই। আমার অদ্ভুত দুরবস্থার কথাটা খুলে বলি। আমার জায়গায় আপনি হলেও হয়তো ঠিক একই কাজ করতেন–পুলিশকে গিয়েই আপনার এই বিচিত্র সমস্যায় কথা বলতেন।

ওই তো, একজন ট্রাফিক পুলিশ চৌরাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছে। মনে পড়ল, ফুটপাথে শোওয়া অবস্থায় যখন আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল তখন আমি একজন ট্রাফিক পুলিশকে ভিড়ের মধ্যে দেখেছিলাম। দুজন একই লোক কি না কে জানে!

দোনামনা পা ফেলে আমি পুলিশটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পুলিশটি আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকাল শুধু। তারপর হাত নেড়ে গাড়ি চলাচল ম্যানেজ করতে লাগল।

পুলিশটিকে দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া। ভুড়ি নেই। গায়ের রং কালো, কিন্তু নাক-মুখ-চোখ সুন্দর–যেন পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য।

আ-আমি…আমি ভীষণ প্রবলেমে পড়েছি…।

পুলিশটি তেরছাভাবে আমাকে একবার দেখল ও কেন? কী প্রবলেম?

প্রশ্ন দুটো করেই আবার হাত নেড়ে ছুটন্ত গাড়ির তদারকিতে মন দিল।

আ-আমি..সবকিছু ভুলে গেছি…।

পুলিশ এবার চমকে উঠল । অ্যাঁ! কী বললেন?

আমার কিছুই মনে পড়ছে না। সবকিছু হঠাৎ ভুলে গেছি।

আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে আমাকে খুঁটিয়ে দেখল।

সব ভুলে গেছেন মানে? আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার ট্র্যাফিক ম্যানেজ করার কাজে ঢুকে গেল। আমাকে ভুলে গেল কি না কে জানে!

আমি ওর আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। বেশ কাতর গলায় বললাম, প্লিজ, আমার কথাটা একবার শুনুন। প্লিজ।

আবার আমার দিকে তাকাল। আচমকা একটা হাই তুলল।

দেখুন, আধঘণ্টা মতন আগে একটা বাসের সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছে। ওই যে–ওই জায়গাটায় জায়গাটা আঙুল তুলে বোঝাতে চেষ্টা করলাম ও মাথায় সামান্য চোট পেয়েছি। কিন্তু তারপর থেকে আমার আর কিছু মনে পড়ছে না। আমি কে, কোথায় আমার বাড়ি, আমার বাড়িতে কে-কে আছে কিচ্ছু না। বিশ্বাস করুন, আমি সব ভুলে গেছি।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল পুলিশটি। তার সঙ্গে খানিকটা বিস্ময় মেশানো ছিল–যেন কোনও আজব প্রাণী দেখছে। একইসঙ্গে আমার ধুলো-ময়লা লাগা ব্র্যান্ডেড শার্ট-প্যান্ট জরিপ করল।

আমি তাতে আরও মরিয়া হয়ে পুলিশ-ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করলাম : প্লিজ, আমাকে একটু হেল্প করুন। আমি এখন কী করব বুঝতে পারছি না…।

সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি তো এখন ডিউটিতে…পুলিশটি ভদ্র গলায় বলল, আপনি বরং থানায় গিয়ে কথা বলুন…।

থানায় যাব? তারপর? ওরা আমাকে কীভাবে সাহায্য করবে? আমার কথা হয়তো বিশ্বাস করবে না। আর যদি বিশ্বাস করে তা হলে হয়তো কোনও মেন্টাল হসপিটাল কি পাগলখানায় আমাকে চালান করে দেবে।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে পুলিশটি বোধহয় আমার সমস্যা বুঝতে পারল। একটু সহানুভূতির গলায় বলল, আপনি এক কাজ করুন। কোথাও একটু বসে চুপচাপ বিশ্রাম নিন। দেখবেন, হয়তো ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে সব মনে পড়ে যাবে।

এরপর আর কিছু করার নেই। লজ্জা আর সঙ্কোচে পুলিশটিকে আমি বলতে পারলাম না যে, আমার খিদে পাচ্ছে এবং আমার পকেটে একটি পয়সাও নেই।

আমার ফুটপাথে ফিরে এলাম। কোথাও চুপচাপ বসে একটু অপেক্ষাই না হয় করি। কে বলতে পারে, যেমন হুট করে আমার মেমারি লস হয়েছে হয়তো তেমন হুট করেই আবার সব স্মৃতি ফিরে আসবে।

কিন্তু এল না। পুরো একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়ির ধাপে বসে কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু কোনও স্মৃতিই ফিরে এল না। শুধু একটা কচি ছেলের গলায় বার তিনেক বাপি ডাকটা মনে-মনে শুনতে পেলাম। আর একটা দশ-বারো বছরের মেয়ের গলায় বাপি ডাকটা মনের মধ্যে বারকয়েক ধাক্কা মারল।

আমার কি তা হলে ছেলে-মেয়ে আছে? বাড়িতে বউও আছে? ওরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা নিয়ে আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় হাঁ করে বসে আছে। আরও ঘণ্টা দুই কি তিন দেখে তারপর পুলিশ হাসপাতাল করব। তারপর আরও এক-দু-দিন কেটে যাওয়ার পর পুলিশ হয়তো আমার খোঁজ পাবে। কিন্তু কী অবস্থায় পাবে কে জানে!

পথচারী লোকদের দাদা, কটা বাজে? জিগ্যেস করে আমি সময়ের খবর রাখছিলাম। পৌনে দু-ঘণ্টা কেটে যেতেই ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠল। ধৈর্যের বাঁধ-ভেঙে তো গেলই, উপরন্তু খিদের চাপটা বেপরোয়া চেহারা নিল।

পেটে অসহ্য কষ্ট। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বারবার। খাবারের দোকান-টোকান বা রাস্তায়-হেঁটে চলা লোকজনকে কিছু খেতে দেখলেই প্রাণটা হ্যাংলার মতো দশহাত জিভ বের করে দোলাচ্ছে, হু-হু করছে।

বেশ কয়েকবার সিঁড়ির ধাপ ছেড়ে উঠে গিয়ে টিউবওয়েল থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে এলাম। কিন্তু জল তো জল! সে কি আর পেটে থাকে!

নাঃ, যদি আমার বউ ছেলে-মেয়ে থাকে, যদি তারা পুলিশে খবর দেয়, তা হলে আগামীকাল পুলিশ নির্ঘাত আমার ডেডবডি খুঁজে পাবে। খিদের যে এত জ্বালা আমি আগে কখনও বুঝিনি।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে আবার ওই ট্রাফিক পুলিশটার কাছে গেলাম।

আমাকে দেখেই সে চিনতে পারল। বলল, কী ব্যাপার? এখনও বাড়ি যাননি?

আমি কাতর গলায় বললাম, কী করে যাব! আমার যে কিছুই মনে পড়ছে ন। বিশ্বাস করুন।

নির্বিকার মুখে সে বলল, আমার তো কিছুই করার নেই–আপনি বরং থানায় যান…।

থানায়? আবার সেই গোরু রচনা!

আর কিছু ভাবার আগেই অসহ্য খিদেয় আমার পেট মুচড়ে উঠল। আর থাকতে পারলাম না। ডানহাতটা পুলিশটার দিকে বাড়িয়ে একেবারে রাস্তার ভিখিরি হয়ে গেলাম : স্যার, আমাকে দশটা টাকা দেবেন? তখন থেকে না খেয়ে আছি। আর সইতে পারছি না…।

পুলিশটার চোখ ছোট হয়ে গেল। সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দুবার। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, হুঁ, বুঝেছি। গালে কয়েকবার আঙুল ঘষল লোকটা। ওর ডানহাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকে গেল। যখন হাতটা বেরিয়ে এল তখন আঙুলে ধরা পঞ্চাশ পয়সার একটা কয়েন : এটা রাখো। ডিউটির সময় আমাদের কাছে টাকাপয়সা থাকে না, জানোই তো!

আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এসেছে পুলিশটা। এখন ওর চোখে আমি পাতি ভিখিরি।

আমি পঞ্চাশ পয়সার কয়েনটা নিলাম। অপমানে কান থেকে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছিল।

আমার মনে হচ্ছিল, এই কাজগুলো আমি নয়, আমার মতো দেখতে অন্য একটা লোক করছে। সেই লোকটা একটা সাধারণ ট্রাফিক কনস্টেবলকে স্যার বলছে, তার কাছে ভিক্ষে চাইছে, পঞ্চাশ পয়সা ভিক্ষে হাত পেতে নিচ্ছে, তারপর লজ্জা আর গ্লানিতে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে যাচ্ছে ফুটপাথের কোণের একটা ছোট্ট স্টেশনারি দোকানে, পঞ্চাশ পয়সায় দুটো সাধারণ বিস্কুট কিনে রাক্ষসের মতো কপকপ করে কামড়াচ্ছে, চিবোচ্ছে, এবং গিলছে।

আমার চোখে জল এসে গেল। সেই অবস্থাতেই রাস্তার ধারে বসানো কল থেকে পেট ভরে জল খেলাম। আঃ, কিছুক্ষণের জন্যে শান্তি।

কিন্তু তারপর? কোথায় যাব? কী করব? জানি না, মাথায় কিছু খেলছে না।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই পেটের মধ্যে আবার খিদের মোচড় শুরু হল। এবার তার চরিত্র আরও ভয়ংকর, পাগলের মতো ক্ষিপ্ত আর হিংস্র।

আমি ট্র্যাফিক পুলিশটার চোখ এড়াতে অন্যদিকে হাঁটা দিলাম।

রাত ক্রমশ বাড়ছিল। আমি যেদিকে হাঁটতে শুরু করেছি সেদিকটা বেশ নির্জন আর অন্ধকার। রাস্তায় তেমন দোকানপাট নেই। লাইটপোস্টের বাতিগুলো মলিন–টিমটিম করে জ্বলছে।

আর একইসঙ্গে আমার মাথার ভেতরে খিদের আগুন লকলক করে জ্বলছে।

ঢং ঢং করে ট্রামের ঘন্টি কানে এল। বাঁ-দিকে একটা ট্রাম ডিপো। সেখান থেকে একটা ট্রাম বেরোচ্ছে।

একটা লোক ট্রামটার সামনে দিয়ে চট করে লাইন পেরিয়ে আমার কাছাকাছি চলে এল। আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না।

দাদা, প্লিজ, একটা কথা শুনবেন?

কী? লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় উত্তর দিল। টের পেলাম ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। আর জামাকাপড় বেশ ময়লা এবং মামুলি। দেখে অভাবী বলেই মনে হচ্ছে।

আমাকে দশটা টাকা দেবেন? আমার…আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

দশ টাকা! এক টাকা দু-টাকায় হবে না! লোকটা চোখ কপালে তুলে কথাগুলো বলল। তারপর আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল ও চেহারা দেখে তো বেশ বড়লোক টরলোক মনে হচ্ছে! হঠাৎ ভিক্ষের লাইন ধরলে কেন, ওস্তাদ?

আমি আমার অদ্ভুত দুর্ঘটনার কথা বললাম। বললাম যে, আমি সবকিছু ভুলে গেছি, আমার সর্বস্ব খোয়া গেছে, আর অসহ্য খিদেয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

ভুরু কপালে তুলল লোকটা। শব্দ করে একটা সেঁকুর তুলল। মদের গন্ধের ঝাপটা ছিটকে এল আমার নাকে। গা গুলিয়ে উঠল।

লোকটা জড়ানা উচ্চারণে বলল, স্টোরিলাইনটা দারুণ কেঁদেছ, ওস্তাদ। মাশাআল্লা! ফিলিম লাইনে গেলে তোমার তরক্কি ঠেকায় কোন শালা! কিন্তু গুরু, আমার পকেট তো ফাঁকা। একেবারে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। সরি, গুরু…।

কথাগুলো বলতে-বলতে লোকটা হাঁটা দিল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে হাত নেড়ে টা-টা করল।

আমি ডানহাতের চেটোটা মুখের ভেতরে পুরে দিয়ে হালকা কামড় বসালাম। ব্যথা লাগছে।

আচ্ছা, এই ব্যথাটা যদি কষ্ট করে সহ্য করতে পারি তা হলে নিজের একটা আঙুলের ডগা কি চিবিয়ে খেয়ে ফেলা যায়?

নাঃ, এটা ভাবা সহজ, কিন্তু কাজে করা কঠিন।

আমি পাগলের দৃষ্টিতে এপাশ-ওপাশ তাকালাম। একটু দূরেই চোখে পড়ল আবর্জনার স্তূপ। ওর মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করলে কি কোনও এঁটো খাবারের টুকরো পাওয়া যাবে?

ব্যাপারটা ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল। আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এই আবর্জনা থেকে খাবার খুঁটে খাব আমি? আমি!

হাঁটতে-হাঁটতে আরও খানিকটা পথ পেরিয়ে গেছি। হঠাৎই চোখে পড়ল একটা রাস্তা বাঁ দিকে ঢুকে গেছে। নির্জন ফাঁকা রাস্তা। এখানে-সেখানে লাইটপোস্টের আলো ছিটকে পড়েছে। রাস্তার মাঝে দুটো নেড়ি কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

কিন্তু দুরে দুটো ছায়াকে দেখা যাচ্ছে না? এদিকেই এগিয়ে আসছে!

আমি বাঁ-দিকের রাস্তাটায় ঢুকে পড়ে ফুটপাথে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আমার ভয়ংকর খিদে আমাকে দিয়ে নানান বাজে চিন্তা করাচ্ছিল। আর সেই চিন্তাগুলোর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল আমার বিবেক। আমাকে বারবার বোঝাচ্ছিল, আমি একজন ভদ্রলোক, এই শহরের একজন আইন-মেনে-চলা নাগরিক, আমার হয়তো বউ আছে, ছেলে-মেয়েও আছে–শুধু দোষের মধ্যে আমার স্মৃতি মুছে গেছে। কিন্তু তা হলেও আমি একজন ভদ্রলোক–এবং ভদ্রলোকই থাকতে চাই।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, লড়াইয়ে বিবেক ক্রমশ কাবু হয়ে পড়ছিল। আর নিঃশব্দ চিৎকারে বাঁচাও! বাঁচাও! বলছিল বারবার।

ওরা খুব কাছে এসে পড়তেই আমি ফুটপাথ থেকে নেমে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। বয়েস আটাশ থেকে তিরিশের মধ্যে। বোধহয় প্রেমিক প্রেমিকা।

ছেলেটার চোখে চশমা, লম্বা, রোগা, তবে মেয়েটা যৌবনময়। পরনে ছাপা চুড়িদার।

আমাকে আচমকা মুখোমুখি আবিষ্কার করে ছেলেটা ভয় পেয়ে গেল। চশমার কাচের পেছনে ওর চোখ বড়-বড় হল।

মেয়েটা ছেলেটার গায়ে লেপটে গিয়ে ওর হাতের ডানা আঁকড়ে ধরল।

আমি ওদের আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, প্লিজ, ভয় পাবেন না। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারেন? দশ-বিশ টাকা হলেও চলবে…।

আমার চোখে ওরা কী দেখল কে জানে! মেয়েটা হাউমাউ করে চিল-চিৎকার শুরু করল। আর ছেলেটা পাগলের মতো ছুট লাগাল বড় রাস্তার দিকে।

আমি কী করব ভেবে না পেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। এই রাস্তাটা কোনদিকে গেছে কে জানে!

পেছন থেকে মেয়েটার চিৎকার শুনতে পেলাম, ওই যে, পালিয়ে যাচ্ছে! ভদ্রভাষায় টাকা ছিনতাই করতে এসেছে।

পেছন ফিরে দেখি কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো একটা মোটা মতন লোক মেয়েটার কাছে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছে।

আমি ভয় পেলাম। আর দেরি না করে ছুট লাগালাম।

অচেনা রাস্তায় ছোটাছুটি করে এ-গলি সে-গলি করে একটা নির্জন রাস্তায় এসে ফুটপাথে বসে পড়লাম। ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে, বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। আর পেট? পেট হিংস্র বাঘের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর ঘাঁও! ঘাঁও! করে গর্জন করছে।

আমার কান্না পেয়ে গেল। এখন আমি কী করি! কী করলে আমি দু-মুঠো খেতে পাব?

কাঁদতে কাঁদতেই এপাশ-ওপাশ তাকালাম।

রাত হয়তো এগারোটা পেরিয়ে গেছে। রাস্তায় হাতে গোনা লোক। আমি ওদের দিকে ঈর্ষাতুর চোখে চেয়ে আছি। ওদের পকেটে পয়সা আছে। ইচ্ছে করলেই ওরা কিছু কিনে খেতে পারে। আমার অসহায় অবস্থার কথা ওরা কেউ ভাবছে না।

একসময় চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালাম। পেটের হিংস্র বাঘটা এখন সারা শরীরে চারিয়ে যাচ্ছিল। খিদের যন্ত্রণা যে এত মারাত্মক হতে পারে তা আমি কোনওদিন কল্পনা করিনি। অসহ্য যন্ত্রণা। পেটটা যেন কেউ কষে নিংড়ে দিচ্ছে। ওঃ!

বিশ্বাস করুন, এ যন্ত্রণা আপনিও সহ্য করতে পারতেন না।

কী করব? জল খাব পেট পুরে? পাতি জল?

কিন্তু তারপরও এখনও সারাটা রাত আমার সামনে পড়ে রয়েছে। সারাটা রাত! ওই হিংস্র বাঘটা তো একটু পরেই আবার ফিরে আসবে।

আপনি এরকম সাংঘাতিক অবস্থায় পড়লে কী করতেন বলুন তো!

হঠাৎই ফুটপাথটার দিকে চোখ গেল আমার। ফুটপাথটা নতুন করে সারানো হচ্ছে। বালির ওপরে বসানো হচ্ছে কংক্রিটের ছোট-ছোট স্ল্যাব। একপাশে কয়েকশো স্ল্যাব থাক দিয়ে সাজানো রয়েছে। আগামীকাল ওগুলো কাজে লাগানো হবে।

আমার জায়গায় আপনি থাকলে যা করতেন আমি ঠিক তাই করলাম। ঝুঁকে পড়ে একটা কংক্রিটের স্ল্যাব হাতে তুলে নিলাম। শক্ত মুঠোয় ওটা আঁকড়ে ধরে একটা লাইটপোস্টের পাশে শরীরটা আড়াল করে দাঁড়ালাম। বারদুয়েক হাত দুলিয়ে স্ল্যাবটার ওজন পরখ করলাম। যথেষ্ট ভারী।

তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই টের পেলাম, খিদের বাঘটা আবার দাপাদাপি করছে। চাপা তর্জন-গর্জন শুরু করে দিয়েছে।

এই রাস্তাটা নির্জন হলেও কেউ না কেউ এ-পথে হেঁটে আসবে। হয় এখনই, নইলে কিছুক্ষণ পর।

লোকটা কাছাকাছি এলেই লাইটপোস্টের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা এই ভুখা মানুষটা আচমকা সেই লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর সমস্ত নীতিকথা ভুলে কংক্রিটের স্ল্যাবটা উঁচিয়ে ধরবে শূন্যে। এবং প্রবল গতিশক্তিতে সেটা আছড়ে দেবে সেই পথচারীর মাথায়। নিরীহ মানুষটা হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে, নয়তো মরেই যাবে। তারপর তার পকেট হাতড়ে...।

ওই তো, দূরে একটা লোক হেঁটে আসছে–একা!

ঠিক কতটা জোরে মাথায় মারলে ওই লোকটা অজ্ঞান হতে পারে আমি জানি না। লোকটা হয়তো মরেও যেতে পারে। কারণ, কংক্রিটের এই স্ল্যাবটা অস্ত্র হিসেবে মারাত্মক। আর এরকম অস্ত্র ব্যবহার করার কোনওরকম অভিজ্ঞতা আমার নেই।

বেশ বুঝতে পারছি, ঈশ্বর চাইছেন, এই সময় একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা এই রাস্তায় ঘটে যাক। কিন্তু তাই বলে একটা সম্পূর্ণ অচেনা নিরীহ লোক এভাবে প্রাণ দেবে?

আমার মনে দোলাচল শুরু হল। আমি কি ঠিক করছি?

একবার মনে হল, ঠিক করছি। এটা একজন ভুখা মানুষের লড়াই। কিন্তু তারপরই মনে হল, না, এটা ঠিক নয়–এটা পাপ।

আপনি হলে কী করতেন বলুন তো?

তাড়াতাড়ি বলুন। লোকটা কাছে এসে গেছে।

আমি কংক্রিটের স্ল্যাবটা মরিয়া ঢঙে আঁকড়ে ধরলাম। তারপর…।

# নীল আলো ভালো নয়

**নীল আলো ভালো নয়**

বুঝলে? বলেই সামনে রাখা প্লেটের দিকে হাত বাড়াল বিনু। দুটো পেঁয়াজের পকোড়া টুক করে তুলে মুখের ভেতর ছুঁড়ে দিল।

ওর কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ আবার কোন দেশি কথা? নীল আলো ভালো নয় মানে?

সে-কথাই জিগ্যেস করলাম বিনুকে।

তাতে ও শব্দ করে হাসল। তারপর বড়া চিবোতে-চিবোতে জড়ানো গলায় বলল, এক এক রঙের আলোর এক-একরকম গুণ আছে কিংবা দোষও বলতে পারো। যেমন, নীল আলো। এই আলোটার ইয়ে…মানে, দোষ আছে।

আমি মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সত্যি, বিনু পারেও বটে! এরকম একটা জমাটি আড্ডার মাঝে সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্যে ও দেখছি একটা নতুন ধাঁচের মতলব ফেঁদেছে।

বিনু বিনোদন অধিকারী আমার স্কুলের বন্ধু। স্কুলের পর কলেজ পেরিয়ে ও কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ওর কাছেই শুনেছিলাম, ও নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়েছে। ভারতের নানান বনাঞ্চলে টইটই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার হাফলঙে ওর কাছে আমি বেড়াতেও গিয়েছিলাম।

শ্রীবিনোদন অধিকারীর গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময়। ও যে কখন কোথায় ঘুরে বেড়ায়, চাকরি রেখেছে না ছেড়েছে, সত্যি-সত্যি বিয়ে করেছে না করেনি–এসব কিছুই আমি ভালো করে জানি না।

তার কারণ, ও যখন যা বলে সবটাই আমি-আমি করে বলে–যেন সবই ওর জীবনের ঘটনা। তারপর, বলা হয়ে গেলে, আবার বলে, এগুলো আমার লাইফের ঘটনা যদি নাও হয়, অন্য কারও তো হতে পারে! আর সত্যি-সত্যি যদি এগুলো নাও ঘটে থাকে তবু ঘটতে কতক্ষণ!

এই হচ্ছে বিনু। ও কখনও ওর বউ এর গল্প শোনায়, কখনও ওর খুন করার গল্প, কখনও আবার ওর জীবনের অলৌকিক ঘটনার কথা শোনায়। হয়তো আসলে সবগুলোই ওর বানানো ঘটনা। কিন্তু সেসব বোঝার উপায় নেই। গল্প শোনাতে-শোনাতে ও সবকিছু কেমন গুলিয়ে দেয়।

আর ও গল্পও বলে ভারী অদ্ভুত ধরনের। হয়তো বলল, শোন, তোদের আজ একটা বাঘের গল্প শোনাব কিন্তু সে-গল্পে কোনও বাঘ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে বাঘের হিংস্রতা থাকবে, মানুষখেকো বাঘের চালাকি থাকবে, কিংবা নৃশংস ঘটনা থাকবে।

বিনুর কাছে এরকম সাপের গল্পও আমি শুনেছি। তাতে কিন্তু সাপ ছিল–আর সাপের মতো ছোবল মারার ঘটনা ছিল, বিষও ছিল।

আজ বিনু হঠাৎ বলেছে, তোমাদের আজ আলোর গল্প শোনাব।

ওর গল্প শোনার জন্যে আমি সবসময় মুখিয়ে থাকি। বেশিরভাগ সময় ও অন্ধকারের গল্পই শোনায়। তো আজ হঠাৎ আলো কেন?

বিনু সবসময় উড়ে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়। আমি ওর বহু পুরোনো বন্ধু হলেও ওর সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানি। ও ভারতের যে-প্রান্তেই থাকুক, মাঝে-মাঝে চিঠি দেয় আমাকে। কখনও কখনও ফোনও করে। তখন যেসব জায়গায় নাম চিঠিতে দেখি বা টেলিফোনে শুনি সেগুলো এতই বিচিত্র যে, এ নামে কোনও জায়গা থাকতে পারে কখনও ভাবিনি।

কদিন আগেই বিনু ফোন করেছিল। বলেছিল, শুক্রবার দিন কলকাতা পৌঁছব। পরদিনই ট্রেন ধরে আবার পালাব। রাতটা তোমাদের কাছে থাকব। কোনও অসুবিধে নেই তো?

অসুবিধে! আমার এই পায়ে সরষে এবং হাতে ডানা লাগানো বন্ধুটিকে তো কাছে পাওয়াই ভার! তার ওপর ওর গল্প কিংবা সত্যি ঘটনা শোনার এ-সুযোগ কে

হাতছাড়া করতে চায়!

ওকে বললাম, কেয়া বাপের বাড়ি গেছে। বাড়ি ফাঁকা। সুতরাং কোনও প্রবলেম নেই।

তবে একটা অসুবিধে ছিল। শুক্রবার সন্ধেটা আমার নিরুপমদের বাড়ি যাওয়ার কথা। সেদিন ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। সেখানে আরও দুজন বন্ধু আসবে। আচ্ছা এবং খাওয়াদাওয়া হবে। সন্ধে থেকেই। সুতরাং ফিরতে তো বেশ রাত হয়ে যাবে!

সেটা শুনে বিনুই সমাধান জোগাল। বলল, দ্যাখো, ভাই। পাক্কা একটি বছর পর কলকাতায় ফিরছি। সুতরাং তোমাকে ছাড়ার কোনও ব্যাপার নেই। আমি তোমার গেস্ট হয়ে ওই নিরুপমবাবুদের বাড়ি যাব–তুমি একটু ম্যানেজ করে নিয়ো।

বিনু এইরকমই–স্ট্রেটকাট। সামাজিকতার সংকোচের ধার ধারে না। ফলে আমার সঙ্গে অতিথি হয়ে ও সরাসরি হাজির হয়ে গেছে নিরুপমদের বাড়িতে।

কদিন ধরেই নিম্নচাপের বৃষ্টি চলছিল। ভিজে শাড়ি মেলে দিলে যেমন টপটপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে অনেকটা সেইরকম। আকাশ আর বৃষ্টির হালচাল দেখে মনে হচ্ছিল না দিন সাতেকের আগে থামার কোনও সিন আছে। আজ সকাল থেকে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আর এখন, নিরুপমদের বাড়িতে বসে, দিব্যি ঝমঝম শুনতে পাচ্ছি।

নিরুপমের বাড়িতে আমাদের আরও দুজন বন্ধু রণজিৎ আর প্রেমতোষ এসেছে সঙ্গে ওদের বউ রুনি আর মানিনী। বিনুর সঙ্গে সকলের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। ও খুব সহজেই আমাদের মধ্যে মিশে গেল। খাওয়াদাওয়া আর জমাটি আড্ডার দিব্যি সময় কাটতে লাগল।

নিরুপমদের বাড়িটা মাপে বড় কিন্তু বয়েসের ভারে কাবু হয়ে পড়েছে। বাড়ির ভেতরে ছড়ানো উঠোন, আর তার সঙ্গে একচিলতে বাগানও রয়েছে। এতবড় বাড়িটায় নিরুপম ওর বউ সরস্বতীকে নিয়ে একা থাকে। আমি হলে বেশ গা-ছমছম করত।

বিনু সে কথা সরস্বতীকে বলল, ম্যাডাম, নিরুপমবাবু অফিসে বেরিয়ে গেলে আপনার একা একা থাকতে ভয় করে না?

সরস্বতী চোখ কপালে তুলে জবাব দিল, একা কোথায় থাকি? সঙ্গে তিন ডজন গোলাপায়রা আছে না!

একথায় আমরা দলবেঁধে হেসে উঠলাম। সত্যি, নিরুপমদের বাড়িতে কিছু গোলাপায়রা আছে বটে!

এরপর সরস্বতী আমাদের বোঝাতে লাগল, নির্জন বাড়িতে থাকার কী কী সুবিধে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, লাগাতার হানিমুন এনজয় করা যায়। এবং নির্জনতার সুযোগে নিরুপম ওর সঙ্গে কী কী ধরনের কেলেঙ্কারি করে বেড়ায় সেসব রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগল।

নিরুপম একবার মিনমিন করে বলল, মাইরি, আমার বউটার সব ভালো–শুধু একটু নির্লজ্জ টাইপের।

সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতী স্বামীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, আর নিজে কী!

ওদের সবে তিনবছর বিয়ে হয়েছে। সেই তুলনায় আমি, রণজিৎ আর প্রেমতোষ বেশ পুরোনো।

রণজিৎ হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি খুব লাকি, নিরুপম, যে একটা নির্লজ্জ বউ পেয়েছ। আমারটা ভাই বড় বেশি লজ্জাবতী।

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে বর-বউদের হুলুস্থুল লেগে গেল। হইহুল্লোড়ের মধ্যে আড্ডা সরগরম হয়ে উঠল।

সরস্বতী আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের সেবা করতে লাগল। ওর সঙ্গে হাত লাগাল রুনি আর মানিনী। কেয়া থাকলে আর-একটু সুবিধে হত।

সরস্বতী স্কুলের মেয়ের মতো টগবগ করে রান্নাঘর আর বসবার ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছিল আর একইসঙ্গে নানান কথার খই ফোঁটাচ্ছিল।

প্রেমতোষ বেশ মোটাসোটা গম্ভীর মানুষ। ও হাত মুঠো করে সিগারেট পাকড়ে ধরে তাতে কড়া টান দিচ্ছিল। হঠাৎ ও বলে উঠল, নাও নিরুভাই, আর দেরি কোরো না–দোকান খোলো। একটু পেট্রল না নিলে গাড়ি তো ভাই আর চলছে না!

মানিনী বেশ খাটো চেহারার। ফরসা সুন্দর গোলগাল মুখ। চোখে চশমা। স্বামীর কথায় চোখ ঘুরিয়ে বলল, ওর এই এক বদ নেশা। মদ না পেলে চলে না।

সেইজন্যেই তো আমার ডাকনাম মদ-অন, মানে মদন। আর যারা মদ দেখলেই না, না বলে তাদের ডাকনাম মদ-না। বলে প্রেমতোষ গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

হেসে উঠলাম আমরাও।

নিরুপম আর সরস্বতী মিলে টেবিলে পেঁয়াজের পকোড়া, বোতল, গ্লাস, ঠান্ডা জল–সব সাজিয়ে দিতে লাগল।

প্রেমতোষ তখন ধোঁয়া ছাড়ছে আর গুনগুন করে গাইছে, ইয়ে লাল রঙ্গ কব মুঝে ছোড়েগা–।

হঠাৎই ডানা ঝটপটিয়ে একটা গোলাপায়রা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

রুনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আমি আর রণজিৎ চেয়ার ছেড়ে চট করে উঠে পড়লাম। নিরুপম বোতল আর গ্লাসগুলো সামলাতে লাগল।

পায়রাটা ঘরের মধ্যে ডানা ঝাঁপটে এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছিল। ওটার ভেজা ডানা থেকে জল ছিটকে পড়ছিল চারিদিকে।

আমরা তাড়াহুড়ো করে ঘরের এক কোণে সরে গেলাম। শুধু বিনু আর নিরুপম জায়গা ছেড়ে উঠল না। রুনি আর মানিনী দূর থেকেই হুস-হুঁস শব্দ করে পায়রাটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েক পাক এলোমেলো ওড়ার পর পায়রাটা রান্নাঘরের কাছে ফ্রিজের ওপরে গিয়ে বসে পড়ল। তখন ভালো করে খেয়াল করলাম, ওটার সারা গা বৃষ্টিতে ভেজা। পালক থেকে জল ঝরছে। বেশ হাঁপাচ্ছে।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সরস্বতী বেরিয়ে এসেছিল রান্নাঘর থেকে। ও খপ করে পায়রাটাকে ধরে ফেলল। ওটার মাথায় চুমু খেয়ে বলল, বোধহয় বেড়ালে তাড়া করেছে। যাই, ওকে উঠোনের খোপে রেখে আসি।

প্রেমতোষ বলল, ভাগ্যিস শালা টেবিলটার ওপরে এসে পড়েনি! সব ভেঙেচুরে কেলো হয়ে যেত!

মানিনী বলল, হুঃ! যে আছে যার চিন্তায়। ফ্যানে ঠোক্কর খেলে পায়রাটা মরেই যেত।

রণজিৎ ফিরে এসে সোফায় বসতে-বসতে বলল, আসলে টিউব লাইটের আলোর বেচারার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

ঠিক তখনই বিনু মন্তব্য করল, এক-একরকম আলোর এক একরকম এফেক্ট আছে।

ব্যস, আমি গল্পের গন্ধ পেয়ে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরলাম বিনুকে–উসকেও দিলাম।

ততক্ষণে আমাদের পানাহার শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা পেঁয়াজের পকোড়া আর চা। আর আমরা চা-এর বদলে প্রেমতোষের ভাষায় পেট্রল।

প্রেমতোষের একটা অভ্যেস হল, মদ খাওয়া শুরু করলেই ও সবাইকে ব্রাদার বলে ডাকে। সুতরাং আমার ওসকানির পর ও বিনুকে একরকম বায়না করেই চেপে ধরল : আর-একটু খুলে বলুন, ব্রাদার, কেসটা কী। বেশ ধীরে-ধীরে রসিয়ে রসিয়ে খুলুন, ব্রাদার–তা হলে হেভি জমবে।

বিনু গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকাল। চাপা দুষ্টুমির হাসি হেসে যেন নীরব অনুমতি চাইল। তারপর ওর নিজস্ব ঢঙে বলতে শুরু করল।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। উত্তরের একটা আধখোলা জানলার বাইরে একটুকরো কালো আকাশ। সেখানে সাদা আলোর রেখা ঝিকিয়ে উঠল। তারপরই বাজ পড়ল বিকট শব্দে। স্পষ্ট দেখলাম, রুনি চমকে উঠল। মানিনী হাত রাখল প্রেমতোষের উরুতে।

মানে, আমি বলতে চাইছি…নানা রঙের আলোর নানান রকম এফেক্ট। তবে তার মধ্যে নীল আলোটা সবচেয়ে বাজে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। বিনু হাতে হাত ঘষল। একটা পেঁয়াজের পকোড়া মুখে দিল। কিছুক্ষণ চোয়াল নাড়ার পর বলল, অনেকদিন আগের কথা। বাবা মারা যাওয়ার পর তখন বছর ছয়েক কেটে গেছে।

আমি তখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেব। বাড়িতে ছোট্ট একটা ঘরে বসে হেভি পড়াশোনা করছি। পাশের ঘরে আমার রুগ্‌ণ মা শুয়ে আছে। মা বহুদিনের গ্যাসট্রিকের রুগি। আমার লেখাপড়া নিয়ে সবসময় ভীষণ চিন্তা করে, আর দিন-রাত বলে পড়, ভালো করে পড়। রেজাল্ট ভালো করতে হবে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এসব কথা মা এত বেশি বলত যে, আমার ভীষণ বিরক্ত লাগত। অনেক সময় মাকে রুক্ষভাবে জবাবও দিতাম। বলতাম, কী হচ্ছে! এসব কথা দিন-রাত ঘ্যানঘ্যান করলে আর পড়া যায়!

সে যা হোক–সেদিন রাতে রাত তখন বারোটা তো হবেইমা পাশের ঘরে শুয়ে-শুয়ে প্র্যাকটিক্যালি প্রলাপ বকছিল। ঘুম আসছে না বলে আপনমনেই বকবক করছিল আর মাঝে-মাঝে আমাকে ভালো করে পড়ার কথা বলছিল। এতে আমার পড়ার ভীষণ ডিসটার্ব হচ্ছিল। কয়েকবার চেঁচিয়ে বললাম, কী হচ্ছে, চুপ করো না! কিন্তু তাতে কাজ হল না। তাই একসময় আর থাকতে না পেরে উঠে গেলাম মায়ের ঘরের দরজায়।

নাটকের আচমকা সিন চেঞ্জ হলে যেমনটা হয়, আমার মনে হল, সেরকমই কিছু একটা হল। একটা ছায়া যেন সড়াৎ করে সরে গেল, আর নীল রঙের একটা আলো মায়ের ঘরটা ভরিয়ে দিল। অথচ চারদিকে তাকিয়েও আমি আলোটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। স্টেজের আলো যেমন আড়ালে লুকিয়ে থাকে বোধহয় সেরকমই কিছু একটা হবে।

বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখি, বিছানায় মা নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। মায়ের শরীরটা ভীষণ ছোট হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, আড়াই ফুট কি তিন ফুট মাপের একটা পুতুল।

আমি মা! মা! করে কয়েকবার ডাকলাম। সুইমিং পুলের জলে ঢিল পড়লে পাশের দেওয়ালে জলের ছায়া যেমন কাপে, নীল আলোটা সেরকমই কঁপতে লাগল। আর আমি হঠাৎই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তবে কেন, তা জানি না।

বিনু একটু থামল। সকলের চোখের দিকে তাকাল। তারপর গ্লাস তুলে হুইস্কিতে আলতো করে চুমুক দিল।

রুনি জিগ্যেস করল, তারপর কী হল?

লক্ষ করলাম, ওর মুখ বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে যেন অল্পস্বল্প আতঙ্কের ছায়া।

বিনু একটু বিষণ্ণ হাসল : তারপর? তারপর নীল আলোটা হঠাৎ সরে গেল। সবকিছু আবার ঠিকঠাক হয়ে গেল–শুধু আমার মা ছাড়া। বারবার ডেকেও আমার প্রলাপ-বকা মায়ের কোনও সাড়া পেলাম না। তখন কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম, মা চলে গেছে।

বিনু থামল। কিছুক্ষণ আমরা সবাই চুপচাপ। শুধু বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ঘরের আবহাওয়াটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।

হঠাৎই স্তব্ধতা ভাঙল প্রেমতোষ। বলল, ধুস! ওসব আপনার মনের ভুল–মানে দেখার ভুল। মাঝে-মাঝে অনেকেরই ওরকম হয়, ব্রাদার। ইংরেজিতে এটাকে বলে হ্যাঁলু কী যেন হাঁ– হ্যালুসিনেশান–। তবে সুপারন্যাচারাল বলে সত্যি-সত্যি একটা মাল আছে।

বিনু ঠোঁটে হাসল : হ্যালুসিনেশান? কে জানে! হতেও পারে। তবে আমি যা দেখেছি সেটাই বললাম।

রুনি কেমন যেন চাপা গলায় বিনুকে জিগ্যেস করল, তখনও আপনার মা কি মাপে ওরকম ছোটই ছিল?

না। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল বিনু, সাইজটা তখন আবার নরমাল হয়ে গিয়েছিল।

লক্ষ করলাম, রণজিৎ কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেছে। স্থির চোখে ও তাকিয়ে আছে বিনুর মুখের দিকে।

সরস্বতী হঠাৎই সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, যতই বলুন বিনুদা, এ থেকে আপনি কখনওই কনফার্ড হতে পারেন না যে, নীল আলো মানেই একটা ইয়ে মানে, অ্যাবনরমাল ব্যাপার।

বিনু আবার হাসল ও অ্যাবনরমাল নয়, বরং প্যারানরমাল বলুন। তা ছাড়া ম্যাডাম, ওই একবার তো নয়…আমার কাকার বেলায়…।

কী হয়েছিল তোমার কাকার বেলায়? আমি জিগ্যেস করলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে বিনু আবার বলতে শুরু করল।

কাকার ঘটনাটা ঘটেছিল মা মারা যাওয়ার বছর ছয়েক পর। আমি তখন কিছুদিনের জন্যে সেসে ঢুকেছিলাম। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাপড় কাঁচার গুঁড়ো সাবান বিক্রি করতাম আর কমবয়েসি একদল ছেলেমেয়েকে এইরকম পুশ সেলের কায়দাকানুন শেখাতাম। আমি রোজ সকাল-সকাল বেরোতাম।

তো একদিন সকাল সাড়ে আটটায় বেরিয়ে সাউথ ক্যালকাটা চষতে শুরু করেছি। এইভাবে কাজ করতে করতে দুপুর হলে আমি রাস্তার কোনও পাইস হোটেল-ফোটেলে ভাত খেয়ে নিতাম। এটাই ছিল বলতে গেলে রোজকার রুটিন। তো সেদিনও তাই হওয়ার কথা কিন্তু হল না।

কাজ করতে করতে এ-পাড়া-ও-পাড়া ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎই একসময় খেয়াল করলাম, আমি শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি।

আপনাদের বলেছি কি না জানি না আমাদের আদিবাড়ি পাইকপাড়ায় টালা পার্কের পেছনটায় একটা গলির ভেতরে। তো শ্যামবাজারের মোড়ে এসে ভাবলাম, এখানে যখন এসেই পড়েছি, তা হলে আমাদের কোম্পানির যে ছোট্ট অফিসটা বৃন্দাবন পাল লেনে আছে, সেখানে একবার দেখা করেই যাই। তারপর আমার সিঁথির মোড়ের দিকে রওনা হওয়ার কথা। কিন্তু খিদেয় পেট এমন চেঁ-চেঁ করে উঠল যে, অফিসে কথা শেষ করার পর হঠাৎ মানে, একেবারে আচমকা–মনে হল, বাড়ির কাছাকাছি যখন চলে এসেছি তখন বাড়িতে গিয়ে কাকিমার হাতের রান্না খেলে কেমন হয়!

আমি যে সেলসের কাজে ঘুরতে-ঘুরতে শ্যামবাজারের দিকে এসে পড়ব এটা আমার আগে জানা ছিল না। তখন যে আমার খিদে পাবে সেটাও জানতাম না। কোম্পানির সেক্স অফিসটায় যেমন আচমকা গিয়ে হাজির হয়েছি ঠিক তেমনই আচমকা আমি বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

বাড়ির গলিতে ঢুকতেই দেখি আমার কাকা খালি গায়ে দোতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাকা আমার বাবার একমাত্র ভাই। বয়েস ছাপ্পান্ন-কি-সাতান্ন

হলেও স্বাস্থ্য ভালোই। একটু আধটু ব্লাড সুগারের প্রবলেম ছাড়া আর কোনও প্রবলেম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও।

হঠাৎই চুপ করল বিনু। গভীর মনোযোগে হুইস্কির গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে দুবার চুমুক দিল।

মানিনী সামনের প্লেট থেকে তিনটে পকোড়া মুঠো করে তুলে নিল। তার একটা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে জিগ্যেস করল, কী হল তারপর?

রুনি সিরিয়াস গলায় বলে উঠল, কাকাও কি আপনার মায়ের মতো চলে গেলেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিনু! বলল, হ্যাঁ–তবে একটু অন্যরকমভাবে। ব্যাপারটা বলছি।

আমি বাড়ির দিকে এগোচ্ছি, কাকা হঠাৎই দোতলা থেকে আমাকে দেখতে পেলেন। দেখেই হাসলেন সামান্য। আর তখনই সার্চলাইটের মতো একটা তীব্র নীল আলো কাকার গায়ে ঠিকরে এসে পড়ল। দিনেদুপুরে কাকা শ্রীকৃষ্ণের মতো নীলে নীল হয়ে গেলেন। কিন্তু সে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই আলোটা ফস করে মিলিয়ে গেল।

আমি বাড়িতে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে সবে খেতে বসব, ঠিক তখনই ধড়াম শব্দটা শুনতে পেলাম। সে এমন বিকট শব্দ যেন ভূমিকম্পে কোনও টাওয়ার ভেঙে পড়েছে।

একছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখি, আমাদের ঝুলবারান্দাটা গলিতে ভেঙে পড়েছে। আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কাকার রক্তাক্ত দেহটা লুটোপুটি খাচ্ছে সারা গা সিমেন্ট-বালি আর ধুলোয় মাখামাখি। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কাকা আর নেই।

থামল বিনু। হাতের গ্লাসটা শব্দ করে টেবিলে রেখে সকলের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর ও এটাকে আপনারা কী বলবেন?

সরস্বতী সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, কেন, কাকতালীয়। এ ছাড়া আর কী!

নিরুপম তেমন তুখোড় নাবিক নয়। তাই জলপথ ছেড়ে স্থলপথে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না, বিনুবাবু–ওই নীল আলোটা

আপনার দেখার ভুল। আর অ্যাক্সিডেন্টটা সিম্প্ল কোইনসিডেন্স। এরকম কেসের কথা অনেক শুনেছি।

বিনু হাসল। বলল, আপনি আপনার মত জাহির করতেই পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। সেদিন দুপুরে আমার শ্যামবাজারে আসা, পেট-চোঁ-ঠোকরা খিদে পাওয়া, বাড়িতে আচমকা ভাত খেতে যাওয়া, কাকার সঙ্গে শেষ দেখা–এবং তারপরই ওই অ্যাক্সিডেন্ট। এতগুলো কাকতালীয় এমনি-এমনি হতে পারে না, নিরুপমবাবু। আসলে কাকা আমাকে টানছিলেন। একবার শেষ দেখা দেখতে চাইছিলেন। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক আদর-যত্নে আমাকে মানুষ করেছিলেন। আমার জন্যে কাকার ভীষণ টান ছিল…।

রুনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রণজিৎ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে এল বউয়ের কাছে। ওর গায়ে-মাথায় বারবার হাত বোলাতে লাগল আর জড়ানো গলায় বলতে লাগল, কী হয়েছে? কঁদছ কেন? কী হয়েছে, বলো না।

আমরাও বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। নিরুপম সিগারেটে টান দিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, মনে হয় ভয় পেয়েছে। তারপর রুনির দিকে তাকিয়ে বলল, ভয়ের কী আছে! আমরা তো আছি!

রুনি চোখ-টোখ মুছে নিজেকে সামলে নিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে বলল, সরি, আপসেট হয়ে পড়েছিলাম।

মানিনী জিগ্যেস করল, কেন বলো তো?

একটু ইতস্তত করে রুনি বলল, আমার মায়ের কথা মনে পড়ছিল। মা গ্রুপ থিয়েটারে অ্যাক্টিং করত। একবার…একবার…জলে ডুবে যাওয়ার একটা সিন দেখানোর সময় মায়ের গায়ে নীল আলো ফেলা হল। সেই নাটকের শো করার সময় মায়ের স্ট্রোক হয়েছিল। তখন…সেই…সেই ডুবে যাওয়ার সিনটা হচ্ছিল। মা স্ট্রোক হয়ে মারা গেল…। আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল রুনি।

রণজিৎ ব্যস্তভাবে বলল, কীসব আলতুফালতু বকচ্ছ! ওটা সিম্পলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট নাথিং এস।

প্রেমতোষ ভারী গলায় মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, নীল আলোর একটা দ্রব্যগুণ থাকলেও থাকতে পারে, ব্রাদার। ওই আলোটা দেখলেই আমার গা-টা কেমন কিরকির করে ওঠে।

সরস্বতী বলে উঠল, থামুন তো! যত্তসব গাঁজাখুরি ব্যাপার! ধরেই নিন না যে, বিনুদা গপ্পো শোনাচ্ছেন! কী বিনুদা, ঠিক বলিনি?

শেষ প্রশ্নটা বিনুকে লক্ষ করে।

উত্তরে বিনু অদ্ভুত হেসে বলল, যদি গপ্পো হয়, ম্যাডাম, তা হলে আমার গপ্পো এখনও শেষ হয়নি।

আমার হঠাৎই মনে হল, এই বর্ষা-ঝমঝম রাতে বিনু আমাদের স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে এসব গল্প বানিয়ে বানিয়ে শোনাচ্ছে না তো! কিন্তু ওর গল্পের ওই এক মুশকিল সত্যি, না মিথ্যে, কিছুতেই বোঝা যায় না।

রণজিৎ মজা করার ঢঙে বলল, বিনুবাবু, আর কী গল্প বাকি আছে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। আমার খিদেটা বেশ চাগিয়ে উঠেছে। আর রান্নাঘর থেকে যা মাংসের গন্ধ আসছে—আর বেশিক্ষণ তর সইছে না।

বিনু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, আর খুব বেশি বলার নেই। শুধু ছোট্ট দুটো ঘটনা বলব।

একদিন বিকেলে শোভাবাজার এলাকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, একটা বাড়ির রোয়াকের দিকে নজর গেল। বাড়িটায় বড় মাপের সদর দরজার দুপাশে পুরোনো দিনের উঁচু লাল রোয়াক। একটা বছর আষ্টেকের ফ্রক-পরা বাচ্চা মেয়ে রোয়াকের একপাশ থেকে লাফিয়ে আর একপাশে যাচ্ছে। আবার লাফিয়ে ফিরে আসছে।

হঠাৎই মেয়েটার হলদে ফ্রকের ওপরে নীল আলো ঢেউ খেলে গেল। হলদে ফ্রকটা ঘোর সবুজ রঙের হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হল, এক্ষুনি মেয়েটা মুখ থুবড়ে পড়বে। আর হলও ঠিক তাই। একপাশ থেকে লাফিয়ে আর-এক পাশে যেতে গিয়ে মেয়েটা মাপে ভুল করল এবং ওর থুতনিটা রোয়াকের কোনায় আছড়ে পড়ল। সে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! তবে আমার মা কিংবা কাকার মতো মেয়েটার মারাত্মক কিছু হয়নি।

আর শেষ ঘটনাটা গত সপ্তাহের। আমি দানাপুরে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার চেনা একজন ভদ্রলোক এক নামকরা ডাক্তারের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুকে খুব ডাকাডাকি করছেন। আমি জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার? উনি বললেন যে, ওঁর স্ত্রী হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

চকিতে কোথা থেকে ছিটকে এল নীল বিদ্যুৎ। গাঢ় নীল রং ভদ্রলোকের শরীর একেবারে ভাসিয়ে দিল। আমার মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল, ডাক্তার ডেকে আর কোনও লাভ নেই। কিন্তু অনেক কষ্টে সেটা থামালাম। ওঁকে শুধু বললাম, আপনি শিগগিরই একবার বাড়ি যান–আপনার স্ত্রীর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করুন, কথা বলুন।

ভদ্রলোক বাড়ি ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিনু। সঙ্গে-সঙ্গে কাছেই কোথাও কড়কড় করে বাজ পড়ল। আমরা অনেকেই চমকে উঠলাম।

বিনু নিচু গলায় বলল, ভদ্রলোক, পরে আমাকে কোনও প্রশ্ন করেননি। বরং হাত দুটো ধরে ভেজা চোখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বারবার বলেছেন, আপনার জন্যেই ওকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম, মুখে জল দিতে পারলাম।

বিশ্বাস করুন, এসবের আমি কোনও ব্যাখ্যা পাইনি। তবে ঘটনাগুলো সব সত্যি–গপ্পো নয়।

বিনুর গল্প শেষ হল। আমরা সব চুপচাপ। যেন শ্মশানে মড়া পোড়াতে এসেছি। বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমেছে। তবে রিমঝিম শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে মেঘের ডাক।

রুনি থমথমে মুখে বিনুর কথা শুনছিল। বিনু থামতেই লক্ষ করলাম, রুনির চোখে জল। ও মুখে আঁচল চাপা দিল। তা সত্ত্বেও একটু-আধটু কান্নার গোঙানি শোনা যাচ্ছিল।

রণজিৎ বউকে প্রায় ধমকে উঠল : কী হচ্ছে কী, রুনি! তোমাকে বলছি না, এসব গাঁজাখুরি গপ্পো। তোমাদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে বিনুবাবু এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছেন–।

নিরুপম হাতের সিগারেটটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি তোমাকে সাপোর্ট করছি, রণজিন্দা। অল বোগাস!

প্রেমতোষ মানিনীর কাঁধে হাত রেখে জড়ানো গলায় বলল, শুনলে তো, মানিনী ব্রাদার। তোমাকে কতবার বলেছি, সুপারন্যাচারালে অবিশ্বাস কোরো না।

রুনি তখনও কান্না চাপতে চেষ্টা করছিল।

ওকে ধমক দিতে দিতে রণজিৎ আচমকাই খেপে গেল। বিনুর দিকে ফিরে টেবিলে দড়াম করে এক কিল বসিয়ে দিয়ে ও পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠল, কাম অন, শ্রীবিনোদন অধিকারী। এবারে সত্যি কথাটা ফস করুন। বলুন, সব আপনার বানানো গাঁজাখুরি ঢপের কীর্তন, বলুনকাম অন!

বুঝতে পারছিলাম, রণজিতের নেশা চড়ে গেছে।

নিরুপম ওকে সামলাতে চেষ্টা করছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, আমাদের নেশার টেবিলটাই না উলটে যায়।

হঠাৎই আমাদের অবাক করে দিয়ে বিনু উঠে দাঁড়াল, বলল, ঠিক আছে। আপনারা যখন অবিশ্বাস করছেন তখন দেখাচ্ছি। দেখে বলুন, কীসের কীর্তন। তবে আমাকে যেন দোষ দেবেন না।

বিনুর চোয়াল শক্ত, চোখ ঠান্ডা। অপলকে রণজিৎকে দেখছে।

রণজিৎ হিংস্র চোখে বিনুর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, শালা, চিট কোথাকার!

রণজিতের হাসিতে নিরুপম আর সরস্বতীও যোগ দিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না।

বিনু ভারী গলায় বলল, আমাকে কিন্তু কেউ দোষ দেবেন না যেন।

তারপর চটপটে পায়ে এগিয়ে গেল আলোর সুইচের দিকে। এবং আলো নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। বৃষ্টির শব্দটা যেন আচমকাই জোরালো শোনাল কানে। আমরা টুকরো-টুকরো কথা বলছিলাম। কে যেন বলল–বোধহয় মানিনী–এ কী! আলো নেভালেন কেন?

বিনু সে-প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, সাবধান!

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের নীল রঙের নাইটল্যাম্পটা জ্বেলে দিল বিনু।

অন্ধকার ঘরে নীল আলোর তরঙ্গ পলকে মায়া ছড়িয়ে দিল। আর আমরা সবাই হুড়োহুড়ি করে আড়াল খুঁজতে লাগলাম–নীল আলো যেন কিছুতেই আমাদের গায়ে না পড়ে।

আবছা আলোর সবাইকে ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছিল। দেখলাম, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকতে চাইছে। কেউ ছুটল ফ্রিজের আড়ালে। কেউ চলে গেল আলনার পাশে। কেউ বা শাড়ির আঁচল মাথায়-মুখে জড়িয়ে নিয়ে নীল আলোর হাত থেকে বাঁচতে চাইল।

ঘরে কোনও শব্দ নেই। শুধু বৃষ্টির ছমছম নুপুর। মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানের সামান্য কিচকিচ ম্যারাকাস। আর আমরা সাতজন যে-যার জায়গায় দমবন্ধ করে লুকিয়ে আছি। থরথর করে কঁপছি।

ঠিক তখনই ডানা ঝাঁপটে একটা ভেজা পায়রা ঢুকে পড়ল ঘরে। ওটার ডানার ঝাঁপটের সঙ্গে-সঙ্গে শান্তির জলের মতো জল ছিটকে পড়ছিল আমাদের গায়ে। নীল আলোর অন্ধকার পাখিটা দু-পাক ওড়ার পরই ফ্যানের ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। পড়েই নিথর হয়ে গেল।

মেয়েদের মধ্যে কে যেন ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

একইসঙ্গে নীল আলোটা নিভে গেল।

# বুকের ভিতরে

**বুকের ভিতরে**

তিরি আমাকে এক ধাক্কা মারল। ওর হাত নাড়া দেখে মনে হবে যেন মাছি তাড়াচ্ছে, কিন্তু যে-প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ধাক্কাটা আমার বুকে এসে লাগল তাতে মনে হল যেন, হাত নয়, ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন।

আমি ছিটকে পড়ে গেলাম পেছনে। পড়তে-পড়তেই শুনলাম, দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো সুমিতা এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠেছে।

একটা ফাইবার গ্লাসের চেয়ার আমার শরীরের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেটা ধরে ওঠার চেষ্টা করতেই তিরির পাশে দাঁড়ানো লোকটা চকিতে ছিটকে এল কাছে। ইস্পাতের পাতে মোড়া বুটের গুঁতো মারল আমার পেটে। চোখের সামনে হাজারটা নক্ষত্র ঝলসে উঠে অলৌকিক সুপারনোভা ঘটে গেল। পাঁচকোনা ঘরের ফাইবার গ্লাসের দেওয়ালগুলো নাগরদোলার মতো বনবন করে ঘুরপাক খেতে লাগল। আর তারই মধ্যে সুমিতা একের পর এক চিৎকার করে চলল। মনে হচ্ছিল, ঘুরপাক খাওয়া নাগরদোলাটা কখনও বুঝি থামবে না। আর সুমিতার চিৎকারও বোধহয় তাই।

এখনও বলে দাও, ওরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে।

তিরির রুক্ষ স্বরের প্রশ্নটা যেন সুদীর্ঘ এক টানেলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেল আমার কানে। অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল বারবার : ..কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? কোথায়…।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে নিলাম কয়েকবার। হঠাৎই সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কারা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? আমি তার কী জানি? সুমিতাই বা এখানে কী

করছে?

আমার বুকে যে-লোকটা গুতো মেরেছিল তার মনে বোধহয় দয়া হল। ঝুঁকে পড়ে অনায়াসে চেপে ধরল আমার বাঁ-হাত। তারপর তার চেয়েও অনায়াসে এক ঝটকায় খাড়া করে দিল আমাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরী, বীরত্ব দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। এই ঘরে তোমাদের অনেক ইয়ার-দোস্ত বহু বীরত্ব দেখিয়ে গেছে। সেসব বীরত্বের এঁটোকাটা এখন যেখান-সেখানে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। একটু থেমে আবার বলল, আমরা কাজ শুরু করলে শেষ না করে থামি না।

তিরি আমার কাছে সরে এল। আলতো ধাক্কায় আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। তারপর আমার মুখের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করল, চৌধুরী, সত্যি করে বলো তো, এইরকম জেদের কোনও মানে হয়? কেন বেকার গোঁ ধরে বসে আছ?

আমি জোর-জোরে শ্বাস নিলাম। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। জিভটা বুলিয়ে নিলাম ঠোঁটের ওপর। সত্যিই কি আমি ছেলেমানুষি গোঁ ধরে বসে আছি? একটু পরেই কি আমার বীরত্বের এঁটোকাটা এই ঘরের মেঝেতে নয়ছয় হয়ে পড়ে থাকবে? সুমিতার দিকে একবার দেখলাম। চিৎকার থেমে গেছে, তবে চোখ-মুখ ফোলা, চোখে জল, শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। ওর সহ্যশক্তি এত কম তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি। ও আমার সঙ্গে সিকিওরিটি কন্ট্রোল ডিভিশনে কাজ করছে আজ প্রায় বারোবছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও নমনীয় রয়ে গেছে।

তিরি সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডাকল, ইকা, চৌধুরীকে একটু জল দাও। ওর এখন জলের দরকার। তারপর হেসে বলল, আর যদি শেষ পর্যন্ত মুখ না-ই খোলে তাহলে শান্তিজলের দরকার পড়বে।

ঘরে আমরা মোট পাঁচজন। পঞ্চম লোকটির নামই বোধহয় ইকা। কারণ তিরির কথায় সে নড়ে উঠল। এতক্ষণ সুমিতার কাছাকাছি একটা টেবিলে ভর দিয়ে বসেছিল। চোখের চাউনি চতুর। বেশ মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ ধরে ঘরের কর্মকাণ্ড দেখেছে, কিন্তু কোনও কথা বলেনি। এখন, ফাইবার গ্লাসের একটা গ্লাস হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, তিরি, এবার ছেলেটাকে ছেড়ে মেয়েটাকে ধরো, মনে হয় তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

তিরি ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল। বলল, কথাটা এমনিতে ঠিকই, তবে এখানে লাভ নেই। ওই টানেলের ম্যাপ শুধু চৌধুরীই জানে। এই লোকটা–এর মাথার ভেতরেই রয়েছে খবরটা আমার মাথায় আঙুলের কয়েকটা টোকা মারল তিরি ও সেটা যে করে হোক আমাদের বের করতে হবে।

আমার পাঁজরায় তীব্র ব্যথা। মাথা ঝিমঝিম করছে–যেন মাথার ভেতরে অসংখ্য উলের বল গুঁজে দিয়েছে কেউ। কতক্ষণ এই অত্যাচার চলবে কে জানে! চলুক। যে করেই হোক মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে আমাকে। কারণ, শুধু আমার ওপরেই নির্ভর করছে একশো শিশুর ভবিষ্যৎ মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

বাড়িয়ে দেওয়া জলের গ্লাসটা কোনওরকমে মুঠোয় ধরে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলাম। খালি গ্লাসটা খসে পড়ল আমার দুর্বল হাত থেকে। ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে ফাইবার গ্লাসের ঠোকাঠুকির শব্দ হল কয়েকবার।

সুমিতা আমার কাছে এগিয়ে এল এবার। তিরি সরে গেল একপাশে। ইকাও পাশ দিল সুমিতাকে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আশার ছোঁয়া দেখতে পেলাম। সুমিতা হয়তো পারবে আমার মুখ খোলাতে। অন্তত ওরা তাই ভাবছে।

শ্যামলা রং। টানা-টানা ভুরু। দীর্ঘ চোখ। ধারালো নাক। চোয়ালের রেখা স্পষ্ট। মাথার ঘন চুল ঢলে পড়েছে গালে, চোয়ালের রেখাকে কিছুটা তরল করে তুলেছে। ওর বাঁ কানের খুব কাছে একটা বড় তিল আছে। এখন চুলের আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না।

এই হল সুমিতা।

প্রায় বারোবছর আমরা কাছাকাছি কাজ করেছি। একসঙ্গে হেঁটেছি অনেক পথ। প্রথমে ও ছিল শুধুই সহকর্মী। তারপর বন্ধু। তারপর...

ওর ঠান্ডা দুটো হাতের চেটো চেপে বসল আমার দুগালে। ওর হাতে আমার আঁজলা করা মুখ। সুমি সুমিতা। ও কান্না চাপতে পারছিল না। তার চেষ্টাও করছিল না।

রুদ্র–।

আমি ওকে দেখলাম ভালো করে। এখন দুর্বল হলে চলবে না। যতটা সম্ভব বেপরোয়া জেদ ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

বলে দাও, রুদ্র। বলে দিলে পরে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে।

কথাটা বলে শত্রু তিনজনের দিকে তাকাল সুমিতা। আশ্বাস চাইল।

তিরি নিষ্ঠুর হেসে মাথা ঝাঁকাল দুবার। হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে আমাদের। এখন অন্তত তাই বলছে।

ঘরের পাঁচ দেওয়ালে পাঁচটা পোলারয়েড জানলা। সূর্যের তেজ বাড়লে জানলার কাচের রং কালচে হতে থাকে। সামনের জানলা দিয়ে দূরে রুক্ষ প্রান্তর চোখে পড়ছে। আর সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা গাছের কঙ্কাল। পাতা নেই, সবুজ নেই, ক্লোরোফিল নেই।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আমার শীত করছিল। অথচ টের পাচ্ছি, কপালে ঘাম।

সামনের মসৃণ টেবিলে পড়ে রয়েছে দুটো লেজার অটোমেটিক। আর তার পাশেই একটা কম্পিউটার টার্মিনাল আর ছোট কন্ট্রোল প্যানেল। কম্পিউটারের মনিটরে সবুজ লেখার হিজিবিজি। প্রকৃতির সব সবুজ কি এখন শুধু কম্পিউটারের পরদাতেই পাওয়া যাবে?

সামনে দাঁড়ানো তিনজন শত্রুকে দেখছিলাম আমি। তিরি, ইকা–তৃতীয়জনের নাম জানি না। জেনে কোনও লাভ নেই। কারণ ওরা তিনজনই সমান হিংস্র, সমান নিষ্ঠুর। আতঙ্ক ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

তিনজনের চেহারার মধ্যেও কি কোনও তফাত আছে? বোধহয় না। সেই একইরকম লম্বাটে মুখ, হনু দুটো বড় বেশি রকমের উঁচু, চোখ দুটো যেন ছুরিতে চেরা গর্ত, ভুরু প্রায় নেই, গোঁফ দাড়িহীন মাকুন্দ মুখ, উঁচু কপালের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে কালো চুলের শুরু–চুলগুলো যেন আঠা দিয়ে মাথার সঙ্গে চেপে সাঁটা। আর সবমিলিয়ে ভাবলেশহীন মুখ কী ভয়ংকর।

ওদের পোশাকও অদ্ভুত। চামড়া আর ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি। গায়ের সঙ্গে এমনভাবে চেপে বসে আছে যে, শরীরের শক্তিশালী পেশি দিব্যি জানান দিচ্ছে।

সুমিতা আমাকে আদর করছিল। ওর নরম হাত পরম আত্মীয়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মুখে, গালে, ঠোঁটে, চোখে, মাথার চুলে। আকুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরব মিনতি জানাচ্ছে ক্রমাগত ও বলে দাও, রুদ্র, বলে দাও।

কী বলে দেব? কিছুই মনে পড়ছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

আমার কিছুই মনে পড়ছে না, সুমি।

নাম-না-জানা তৃতীয় লোকটা যেন বাতাসে ভেসে ছিটকে চলে এল আমাদের কাছে। বাঁ হাতের এক ঝটকায় সুমিতাকে ঠেলে দিল। ও প্রায় পাঁচহাত দূরে গিয়ে পড়ল। চিৎকারও বোধহয় একটা করে থাকবে। সেটা আমি ঠিক শুনতে পাইনি, কারণ পরক্ষণেই উগ্র রাগে লোকটা আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেছে পাগলের মতো মনে পড়ছে না! ন্যাকা।

সল, কী হচ্ছে! তিরি এগিয়ে এসে লোকটাকে বাধা দিল।

সল গজগজ করতে করতে সরে গেল আমার কাছ থেকে। তিরি আলতো করে কয়েকটা থাপ্পড় মারল আমার গালে–যেন আমার চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। তারপর ওর বাঁ হাতটা তুলে ধরল আমার মুখের কাছে। হাতটাকে থাবার মতো করে আঙুলের নখগুলো দেখাল। ছোট্ট তেকোনা তীক্ষ্ণ নখ–ঈগল পাখির চেয়েও ধারালো। কড়ে আঙুলের নখটা আমার গালের ওপরে বসিয়ে টেনে দিল তিরি, বলল, আমি তোমাকে সব মনে করিয়ে দিচ্ছি, চৌধুরী।

গালে জ্বালা, যন্ত্রণা। গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। বুকের ভেতরেও প্রায় একই অবস্থা। কিন্তু তাও আমাকে যে মুখ বন্ধ করে থাকতেই হবে।

তিরি বলতে শুরু করল।

আমার চোখ বুজে আসছিল অবসাদে। মাথা ঢলে পড়তে চাইছে কাঁধের ওপর। আচ্ছন্ন এক অবস্থায় মধ্যে তিরির অলৌকিক ধারাবিবরণী ঢুকে পড়ছিল আমার কানে। অসংখ্য ভোমরা যেন গুনগুন করে চলেছে কানের কাছে।

পৃথিবীতে যে পারমাণবিক যুদ্ধ একটা হবেই সেটা আমরা জানতাম। আমাদের ভয় ছিল, সেই ভয়ংকর মহাযুদ্ধে মানবজাতি হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শুধু

থেকে যাবে প্রাণহীন কলকারখানা, বইপত্র, আর রুক্ষ পৃথিবী। তাই গত সত্তরবছর ধরে ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা। মাটির নীচে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। মেঠো ইঁদুর যেমন মাটির নীচে গর্ত করে বাসা বাঁধে। তারপর সুড়ঙ্গের সঙ্গে সুড়ঙ্গ জুড়ে গিয়ে তৈরি হয়ে যায় জটিল ভুলভুলাইয়া। শুধু ইঁদুররাই পথ চিনে চলতে পারে সেই গলিপথে। বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেছেন এই সুড়ঙ্গবাসী ইঁদুরদের জীবনযাপন নিয়ে। তারপর তারই অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে আমাদের মাটির নীচের জগৎ। সেখানে রাখা হয়েছে একশোজন শিশুকে। পঞ্চাশটি পুরুষ-শিশু, পঞ্চাশটি নারী-শিশু। সুস্থ, সতেজ, সবল। আপাতত তাদের দেখাশোনার কাজে রয়েছে দশজন ধাত্রী-শিক্ষিকা।

সুড়ঙ্গের মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে নিরাপদ আস্তানা। সেখানে মজুত রয়েছে কুড়িবছরের ঘন খাবার। রয়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, বই-খাতা, গবেষণাগার। পারমাণবিক যুদ্ধের কোনওরকম আঁচ পৌঁছোবে না সেখানে।

সুতরাং কোনও মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মানবসভ্যতা–শেষ হয়ে গেলেও মাটির নীচে লুকোনো ওই শিশুরা নতুন করে একদিন গড়ে তুলবে নতুন মানবসভ্যতা। স্তব্ধ কলকারখানাকে ওরা আবার সচল করে তুলবে। আবার সবুজে-সবুজে ভরিয়ে দেবে চারদিক।

মাটির নীচের ওই লুকোনো জগতের খোঁজ পাওয়া নেহাত সহজ নয়। নানা জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে প্রায় একহাজার সুড়ঙ্গের মুখ। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে যদি কেউ নীচে নেমে যায়, তাহলে সে আর ফিরবে না। পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত খিদে-তেষ্টায় প্রাণ দেবে। সুতরাং এরকম ঝুঁকি কেউ নেবে না। তিরিরাও নেয়নি।

মাত্র বছরদুয়েক হল ওই শিশুরা মাটির নীচে জীবনযাপন শুরু করেছে। ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ওরা। আর আমরা সিকিওরিটি কন্ট্রোল থেকে প্রতিটি মুহূর্তে নজর রেখেছি ওদের ওপর। এমনসময়...।

না, পারমাণবিক যুদ্ধ নয়। কোথা থেকে হাজির হল তিরি, সল আর ইকাদের দল। সবাই বলতে লাগল, ওরা এসেছে অন্য কোনও গ্রহ থেকে। কিন্তু ওদের মহাকাশযানটা আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি।

ওরা এসে সব তছনছ করে দিল। ওদের শক্তিশালী মারণাস্ত্র হাজার-হাজার মানুষকে নির্বিচারে খতম করে চলল। ওদের ক্ষমতার কাছে আমাদের সবই অকেজো।

এর মধ্যে যতটুকু জেনেছি, তিরিরা এক অদ্ভুত রাসায়নিক নিষ্কাশন পদ্ধতি নাকি বের করেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে অত্যন্ত কম খরচে ওরা পৃথিবীর মাটি থেকে বের করে নিতে পারছে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, ক্যালশিয়াম, আরও কত কী! গাছের পাতা থেকে ওরা বের করে নিচ্ছে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন। আর পশুপাখির হাড় থেকে পেয়ে যাচ্ছে ক্যালশিয়াম। পশু বলতে তার মধ্যে মানুষও রয়েছে।

নিষ্কাশিত এই সব পদার্থ ব্যবহার করে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির শিল্পের পত্তন করবে ওরা। মানবসভ্যতাকে পিষে গুঁড়িয়ে খতম করে শুরু হবে উন্নয়নের কাজ। এতে বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। বাধা দিতে গিয়ে সিকিওরিটি কন্ট্রোল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের তৈরি বহু যন্ত্রমানব-রোবট ও অ্যান্ড্রয়েড। গত তিনমাস ধরে ক্রমাগত অত্যাচারের পর পৃথিবী এখন আর সবুজ গ্রহ নেই। বরং এখন তার চেহারা বাদামি অথবা লাল।

তিরিদের খতমের খেলা এখনও থামেনি। নানান গোপন তথ্য খুঁচিয়ে বের করার জন্যে কিছু লোককে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন, পরিত্যক্ত এই সিকিওরিটি বিল্ডিং-এ এখন রয়েছি আমি আর সুমিতা।

তিরির কথায় সব মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। সব।

..তোমাদের সিকিওরিটি কন্ট্রোলের চিফ ব্রিগেডিয়ার রাজামানি আমাদের হাতে খতম হওয়ার আগে ওই সুড়ঙ্গের কথা বলে গেছে– দু-আঙুলের চাপে আমার গালের ক্ষতস্থান রগড়ে দিয়ে বলল তিরি, এ-ও বলে গেছে, তার লোকেশান ম্যাপ, কো-অর্ডিনেট, সব তোমার জানা। একমাত্র তুমিই জানো। তিরি হাসল নিষ্ঠুরভাবে। ওর লাল টুকটুকে ঠোঁট সামান্য ফঁক হল। বলল, কোনও লাভ নেই, চৌধুরী। তুমি কানাগলিতে ঢুকে পড়েছ। আর ওই খবর আমাদের জানিয়ে দিলে তোমার লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। বললাম তো, তোমার চেয়ে অনেক বড়-বড় বীর এই ঘরে অনেক বীরত্ব দেখিয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিরি। সেটা সাপের নিশ্বাসের মতো শোনাল। আর পরক্ষণেই কোমরের বেল্টের কোন অদৃশ্য পকেট থেকে বের করে নিল সরু তীক্ষ্ণ ফলার একটা ছুরি। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ছুরি ও তিরির মুখ একইরকম দেখাল–হিংস্র নেকড়ের মতো।

তিরি আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ে সলকে বলল, সল, ভিডিয়োতে সুড়ঙ্গের মুখগুলো একে একে দেখাতে থাকো।

সল টেবিলে রাখা ছোট প্যানেলের বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা দেওয়াল বিশাল ভিডিয়ো পরদা হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল পৃথিবীর রঙিন রুক্ষ জমি, আর সুড়ঙ্গের মুখ। প্রতিটা মুখের নির্দিষ্ট নম্বর রয়েছে। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, তার নম্বর একত্রিশ।

ছুরির তীক্ষ্ণ মুখ আমার রগে চেপে ধরল তিরি। বলল, চৌধুরী, কোথা থেকে খোদাইয়ের কাজ শুরু করব বলো।

সুমিতা কোথা থেকে যেন ছুটে এল আমার কাছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠল। হাঁটুগেড়ে বসে মাথা ঘষতে লাগল আমার কোলে। তারপর অবুঝ মেয়েটা জড়ানো গলায় কিছুক্ষণ ধরে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

অবশেষে মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। চোখে সেই নীরব মিনতি। ওঃ, অসহ্য!

তিরি একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে সুমিতা বলল, রুদ্র, বলে দাও ওদের। তা হলে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে। লক্ষ্মীটি– তারপর গলার স্বর প্রায় ফিসফিসের পর্যায়ে নামিয়ে এনে বলল, রুদ্র, আমরা তখন তৈরি করব নতুন সভ্যতা। তুমি আর আমি।

এত যন্ত্রণার মধ্যেও তেতো হাসি পেল আমার। অবুঝ রমণী! তোমার মা হওয়ার ক্ষমতা আর কতদিন? সাত বছর? আট বছর? তোমার কাছ থেকে মৃত পৃথিবী বড়জোর আটটি শিশু পেতে পারে। যদি তারা সবাই বাঁচে, তা হলে আবার ষোলো থেকে আঠেরোবছর অপেক্ষা। কিন্তু মাটির নীচের ওই শিশুজগৎ? মাত্র পনেরোবছর পরেই ওরা প্রতি বছরে পঁচিশজন করে বাড়বে। এইভাবেই গড়ে

উঠবে নতুন মানবসভ্যতা। তা ছাড়া, এখন তিরিদের গোপন খবর বলে দিলেই যে ওরা আমাদের বাঁচতে দেবে তার কোনও মানে নেই। আর, আমি…আমি…।

না, সত্যি কথাটা এবার বলে দেওয়াই ভালো। মন শক্ত করে সেটাই স্পষ্ট গলায় বললাম সুমিতাকে। আমার কথা তিরি, সল আর ইকাও শুনতে পেল। এবং চারজনই চমকে উঠল ভীষণভাবে।

আমি বললাম, তুমি ভুল করছ, সুমিতা। আমি মানুষ নই–অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রমানব। যার শরীর আর চেহারা হুবহু মানুষের মতো কিন্তু চলে ব্যাটারিতে।

সুমিতা অপার বিস্ময়ে আমাকে দেখতে লাগল। ওর হাত স্পর্শ করল আমার শরীর। পরীক্ষা করতে চাইল আমার রক্ত-মাংস। জানি, পরীক্ষা করে কোনও তফাত টের পাবে না। সেটা ও ভালো করেই জানে। ও অবাক হয়েছে অন্য কারণে। সিকিওরিটি কন্ট্রোলের একজন হোমরাচোমরা কর্তা মানুষ নয়, অ্যান্ড্রয়েড, এই ব্যাপারটাই ও মেনে নিতে পারছে না। আসলে এটাও আমাদের সিকিওরিটির একটা ছক। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছিদ্র করার জন্যেই এই পরিকল্পনা।

আমি সাধারণ রোবট নই, কারণ তার চেহারা যন্ত্রের মতো। বরং লোকঠকানোর কাজে অ্যান্ড্রয়েড অনেক বেশি সুবিধেজনক। তবে রোবটশাস্ত্রের সব সূত্রই আমরা মেনে চলি। সেইভাবেই তৈরি আমরা। সেটাই যে নিয়ম!

ইকা এগিয়ে এসে সুমিতাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল দূরে। তিরি আর সল আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। তিরি ছুরির ফলাটা চেপে ধরল আমার বাঁ-ভুরুর নীচে। জিগ্যেস করল ঠান্ডা গলায়, তুমি তা হলে বলবে না?

এইবার আমি মন খুলে হাসতে পারলাম। এবার তো ওদের বোঝা উচিত, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনও গোপন খবর আমি কখনওই ফাস করতে পারব না। রোবটশাস্ত্রের প্রথম সূত্র আমাকে বাধা দেবে। আমার পজিট্রনিক ব্রেন তখন আর কাজ করবে না। সুতরাং প্রথম সূত্রটা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিলাম ওদের ও রোবট কখনও কোনও মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না, অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনও মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না।

আমি মাথা নাড়লাম আপনমনেই। আমার বাঁ-চোখের ওপরে চামড়া ফুটো হয়ে রক্ত গড়াল। কষ্ট করে তিরির দিকে তাকিয়ে বললাম, তিরি, তুমিই বলো, ওই সুড়ঙ্গের হালহদিস জানিয়ে কী করে আমি আগামীদিনের মানবসভ্যতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিই।

সল রুক্ষ গলায় তিরিকে বলল, এর চামড়া, রক্ত, মাংস সবই তো মানুষের মতো। অথচ বলছে রোবট, মানে অ্যান্ড্রয়েড। লোকটা ব্লাফ দিচ্ছে না তো?

তিরি কী যেন ভাবছিল আপনমনে। অনেক অ্যান্ড্রয়েড ওদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ওরা মানুষ ভেবেই সেগুলোকে ধ্বংস করেছে। এখন আমাকে নিয়ে কী করবে ও?

তিরি বিড়বিড় করে বলল, না, ব্লাফ নয়। অ্যান্ডয়েডরা জীবকোশ দিয়ে তৈরি। ওরা রোবট হলেও হুবহু মানুষের মতো। শুধু ওই ব্যাটারিটা ছাড়া।

আমি বিধ্বস্ত সুমিতাকে দেখছিলাম আর মনে-মনে আওড়াচ্ছিলাম, আমি রোবট, আমি অ্যান্ড্রয়েড, প্রথম সূত্র অমান্য করতে পারি না আমি। যত কষ্টই ওরা আমাকে দিক, যত যন্ত্রণাই হোক। রোবট কখনও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। কখনও না।

ইকা এগিয়ে এল এবার। ওর সঙ্গে সলের চোখাঁচাখি হল। দুজনে প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, তিরি, তা হলে ওই ব্যাটারিটাই খোঁজা যাক–

চোখের পলকে আমাকে শূন্যে তুলে নিল ইকা ও সল। সটান আছড়ে ফেলল ফাইবার গ্লাসের মেঝেতে। তারপর বেপরোয়া হাত চালিয়ে খুলে নিতে লাগল পোশাক-আশাক।

ক্রমশ আমার শীত বাড়তে লাগল। দেওয়ালের পরদায় তখনও রুক্ষ প্রান্তরের ছবি, সুড়ঙ্গের একত্রিশ নম্বর মুখ।

সুমিতার দিকে দেখলাম। ওর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এই বারোবছরে একটা রোবটকে ভালোবেসে ফেলেছিল ও! যার হৃদয় প্লাস্টিকের তৈরি! যার চোখের পলক পড়ে শরীরের গভীরে লুকোনো ব্যাটারির জোরে!

বুকের বাঁ-দিকে ছুরিটা বসিয়ে দিল তিরি। ব্যাটারি খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। ছুরির আঘাতে ছিন্ন হচ্ছে স্নায়ু, ধমনী, শিরা। অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে সইতে চেষ্টা করলাম আমি। আমি মানুষবেশী রোবট। প্রথম সূত্র ডিঙিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। রোবট কখনও মানুষের ক্ষতি করে না। কখনও না! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করছিলাম, হাত-পা ছুঁড়তে চেষ্টা করছিলাম। চোখে আর বুকে অসহ্য জ্বালা।

সুমিতা তখনও অবাক চোখে আমাকে দেখছে। একটা রোবটকে আগে কখনও বোধহয় এমনভাবে শেষ হয়ে যেতে দেখেনি ও।

ইকা, সল আর তিরির ঠোঁট চিরে মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে আসছিল জান্তব গর্জনের টুকরো। আমার বুকের ভেতরে ওরা প্রাণপণে খোঁড়াখুঁড়ি করে চলেছে।

আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল, চোখ বুজে আসতে চাইছে বারবার। কিন্তু আর কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি আমি। কারণ, একবার অজ্ঞান হয়ে গেলেই আর কোনও ভয় নেই। তখন আর কোনওরকম যন্ত্রণা আমি টের পাব না। চোখের সামনে এই অমানুষগুলোকে আর দেখতে পাব না, দেখতে পাব না সুমিকে। আমার সুমিকে।

সুমিতা কোনওদিনই জানতে পারবে না, আমার বুকের ভেতরে সত্যি-সত্যি কোনও ব্যাটারি নেই। আর প্লাস্টিকও নেই ছিটেফোঁটা। প্রথম সূত্র শুধু আমাকে সহ্য করার শক্তি জোগাক, এই আমার প্রার্থনা। আমি যে রোবট, এই মিথ্যে কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে আমি তিরিদের সঙ্গে এই লড়াইয়ে জিততে চাই।

ওরা আমার বুকের ভেতরে খুঁড়ে যাক অনন্তকাল। আমার বুকের গভীরতা ওরা জানে না। ওই অতল গভীর থেকে কখনওই ওরা খুঁজে বের করতে পারবে না ভবিষ্যতের মানবসভ্যতার ঠিকানা।

# আলো নিভে গেলে বুঝবে

**আলো নিভে গেলে বুঝবে**

স্যার, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সবে দেওয়ালঘড়ি রাত দশটা বলছে, সবে আপনার সাদা ঘোড়া মার্কা বোতলের ঘোড়ার কেশর পর্যন্ত খরচা হয়েছে, আর আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময়েই তো আপনাদের মতো বড়সাহেবদের আশনাই আর ফুর্তি জমে ওঠে, মনটা মরা গরু দেখা শকুনের মতো ডানা ঝাপটায়! ভেবেছিলুম, আপনার এই ফুর্তির সময়ে এসে আরও একটা খুশির খবর শোনাব, তা বুঝি আর হয়ে উঠল না। আমি তো স্যার ভয়ে ভয়ে আসছিলুম, বুকটা ধুকুপুকু করছিল, কালকের দিনটা আমার বুঝি আর আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে না!

যতই বলুন স্যার, প্রথমে ঢুকতে গিয়েই সদর দরজাটা খোলা দেখে আমার ভারী আশ্চর্য লেগেছে। আপনি তো দরজা এরকম হাট করে খোলা রাখেন না, তাও আবার রাতে! সোজা তো ঢুকে পড়েছিল, তবে সত্যি করে বলছি, আপনার শোবার ঘরে ঢুকতে কেউই আমায় আটকায়নি। সব চাকরবাকর বোধহয় খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। আর আমাদের মতো, ছোটলোকদের মতো, আপনার তো স্যার আর একটা বউ থুড়ি–মেমসাহেব নেই যে, যখন-তখন আপনার সুখ-শান্তির বিঘ্ন করবে! আপনার মেমসাহেবরা আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকে। ভীষণ ব্যস্ত! সত্যি, আপনি দেবতা স্যার, দো! অতগুলো পাপীতাপী মেয়েমানুষকে একা তুষ্ট রেখেছেন। সেইজন্যেই কি স্যার আপনাকে এখন এত ক্লান্ত লাগছে? আপনি ভীষণ বোকার মতো হাত-পা ছড়িয়ে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে আছেন? বিছানাটা লন্ডভন্ড? না কি কাল রাতের পর ওটা আর পাট করে সাফসুতরো করেননি? আপনার চোখেমুখেও কেমন কালির ছাপ। এ একদম বেমানান! কোথায় আপনাকে হাসিখুশি দেখব ভেবেছিলুম..স্যার, স্যার, উঠুন। দেখুন, আমি কে এসেছি! আমি হীরার সোয়ামি, স্যার, হীরার সোয়ামি! এই তো…

চোখ মেলেছেন…হা হা, এই যে আমি, আপনার বিছানার পাশে, মেঝেতে। আমরা নীচু জাত, নীচে থাকাই ভালো–যাক গে, যা বলছিলুম, আপনার বেশি সময় আর নষ্ট করব না। প্রথমেই স্যার আপনাকে সেলাম জানাই, অন্তত এক রাতের জন্যে হলেও আমার বউকে মেমসাহেব বানিয়ে দেওয়ার জন্যে! স্যার, হীরা হীরুর কপালে এত সুখ জুটেছে! ওই মখমল বিছানায় ও শুয়েছে! আপনার রাজবাড়ির খাবার খেয়েছে। আপনার ধবধবে চকচকে ফরসা বুখে মাথা রেখে শোয়ার সুযোগ পেয়েছে! আপনি কী দয়ালু স্যার, আমাদের মতো নোংরা ছোটলোকদের ঘেন্না করেন না। হীরার গায়ের রং কালো কুচকুচে বলে ওকে ঘেন্না করেননি। উলটে কালো হীরে বলে সোহাগ করেছেন। হ্যাঁ স্যার, ও আমাকে সবই বলেছে। একটুও বাদ দেয়নি। আমাদের মতো গরিবদের জীবনে এ-সুখ কি বারবার আসে? আপনিই বলুন! হীরা তাই কিছু বাদ দেয়নি, গলায় শাড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার আগে স্যার গান করার মতো সুর করে সব বলে গেছে। ও খুব ভালো গাইত, স্যার! কিন্তু আমার মতো আধপেটা খাওয়া সংসারের বউ হয়ে বড়সাহেবদের বাড়ি দিনরাত্তির ঝিগিরি করলে কি আর গানের গলা খোলে? কিন্তু কাল রাতের কথা অন্য, স্যার। কাল যে হীরু ভালোমন্দ খেয়েছিল! গান তো গাইবেই!

হীরার খবরটাই আপনাকে দিতে এসেছিলুম, স্যার। ভেবেছিলুম আপনি বকশিশ দেবেন। কী বলছেন…আপনার মন-মেজাজ ভালো নেই! আগেই আপনি খবরটা পেয়েছেন? তা হলে তো আমার বকশিশটাই মার গেল, স্যার। তা যাক। আপনার দয়া আমি কোনওদিন ভুলব না। আমার বউ সাত জন্মে যে-সুখ পেত না, সেই সুখ ওকে আপনি দিয়েছেন–হ্যাঁেক না কেন এক রাতের জন্যে! আমার আধপেটা সংসারকে সিকি-পেটা হওয়ার হাত থেকেও বাঁচিয়েছেন। কী বলছেন, স্যার? ঠিক বুঝতে পারলেন না? ও, হীরু আপনাকে বলেনি বুঝি ওর পেটে খোকা ছিল! তিন মাসের। বলেনি? হাঃহাঃহাঃ–দেখেছেন, কী বদমায়েশ! বরাবরটা আমার সঙ্গে ওরকম ছেনালি করত। আপনি কি চমকে উঠলেন, স্যার? জানেন, আমিও প্রথম শুনে ওরকম চমকে উঠেছিলুম। কোত্থেকে খাওয়া জোটাব এই নতুন পেটের? আমার দিনমজুরি, আর হীরুর ঝি-গিরি…ওতে কি হয়? আমরা স্যার মুখসুখ মানুষ, জন্মরোধের কায়দাকানুন জানি না। তাই গোলমাল যত আমাদেরই হয়। তবে আপনি খুব বাঁচিয়েছেন, স্যার। এখন হীরাও গেছে, বে-আক্কেলে বাচ্চাটাও গেছে। আপনার আশীর্বাদে আমি এখন বোধহয় পুরো পেট খেতে পাব। এ কী, স্যার! এক ঢোকে বোতলের ঘোড়ার লেজ ছুঁয়ে ফেললেন? আমরা যেরকম ঢোক ঢোক জল খেয়ে পেট ভরাই, আপনিও সেরকম, স্যার? যত দেখছি, সত্যি অবাক হচ্ছি।

ভালো খবর তো শোনালাম, স্যার। এবার খারাপও একটু আছে, সেটাও বলে ফেলি। তবে আমাকে কোনওরকম দোষ দেবেন না, স্যার। আমি আপনার ভালোই চাই, তাই তো এসেছি। একটা কথা কী জানেন স্যার, কাল রাতের ব্যাপারটায় হীরু বোধহয় তেমন খুশি হয়নি। কী করে হবে! ও যে আমার চেয়েও মুখ, বোকা। ও গান করে করে সবই বলল বটে কিন্তু তারপর পেটে দু হাত চেপে এমন পাগলের মতো চিৎকার শুরু করল যে, সারা বস্তির লোক একেবারে ছুট্রে এল। ও খালি চিৎকার করে বলছিল স্যার, আপনাকে ছাড়বে না। কিছুতেই ছাড়বে না–আরও কত কী। কিন্তু, সত্যি বলতে কী স্যার, সব শুনে প্রথমটা আমারও যে একটু রাগ হয়নি তা নয়। কিন্তু আমি কী করতে পারি, স্যার। আমার এই হাড় বের করা শরীরে শক্তি নেই, আমার মামলা করার পয়সা নেই, আমার একগাদা জোয়ান বন্ধু নেই। তার ওপর আপনার কাছে তো আবার বন্দুক আছে! তাই পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ভেবেছিলুম, যা হওয়ার হয়ে গেছে। সবই তো ভগবানের হাত। হাজার হোক, বউটা একবারটি অন্তত মেমসাহেবি ঠাটে থেকেছে। কিন্তু হীরু বোধহয় মানতে পারেনি, স্যার। খালি বলছিল রাত এগারোটায় আমার সব্বোনাশ করেছিস, আমিও রাত এগারোটাতেই তোর সব্বোনাশ করব!…শুনলেও হাসি পায়, স্যার। তবে সকালে উঠে ওর ঝোলানো দেহটা যখন নামাই, তখন ওর মুখটা দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম। চোখ দুটো ভাটার মতো বেরিয়ে আসছে, মাথার চুলগুলো সব এলো, টুকটুকে জিভটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। যেন সাক্ষাত মা কালী! আপনি কপালে হাত ঠেকালেন, স্যার? আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন! সত্যি, আপনি মহান স্যার, আপনি মহা। যাই হোক, সব লোক যখন জানতে চাইল বউটা মলো কেন, তখন আমার জন্যে বসে না থেকে ওরা নিজেরাই জবাব দিয়ে দিলে খিদে, পেটের খিদে। আমি আর মুখ খুলিনি, স্যার। দুনিয়ার সবাই জানে, গরিবরা পেটের জ্বালাতেই মারা যায়।

হীরুকে পুড়িয়ে গঙ্গাচান করে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, স্যার। পোড়ানোর টাকা তো ছিল না। ওকে ফুটপাথে ফেলে লোকের কাছ থেকে ভিক্ষে করে টাকা তুলতে হয়েছে। বেলা যত বেড়েছে ওর শরীরটা তত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি ভনভন করতে শুরু করেছে। কিন্তু কী করব, স্যার..কী বলছেন? আপনার কাছে আসতে পারতাম? না, স্যার, ছিঃ, তা হলে আপনার চরিত্রে যে কালি লাগত! সে কি প্রাণ থাকতে আমি করতে পারি? জানেন, স্যার, এখানে আসার আগে দুটো ঘণ্টা মাঠে-ঘাটে বেড়িয়েছি। বস্তির ঝোঁপড়ায় আর ফিরতে পারিনি। মনটা কেমন হু হু করে উঠেছে। হাজার হলেও বউটা আমার

খারাপ ছিল না, স্যার। কিন্তু আপনিও তো কম ভালো লোক নন। তাই তো হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় ছুটে এলুম আপনার কাছে। আপনাকে সাবধান করতে। এগারোটা বোধহয় বেজে এল স্যার। ওই তো! আপনার বসবার ঘরের দামি দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ শুরু হয়েছে। শুনুন স্যার, শুনুন! এক, দুই, তিন... চার; জানেন, স্যার, হীরু বলেছিল, ঘরের বাতিগুলো দপ করে নিভে গেলে বুঝবে আমি...শুনুন, শুনুনু!..ছয়...সাত...আট– কী হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে, স্যার। জানলা-দরজার পাল্লাগুলো ঠাস ঠাস করে বাড়ি খাচ্ছে ঝড় উঠল বুঝি?নয়– দশ–এগারো–এই যা। কী বলছেন স্যার, লোডশেডিং? আপনি এত বড় লেখাপড়া-জানা লোক হয়ে এই ভুলটা করলেন, স্যার? দেখছেন না, আশপাশের সবকটা বাড়িতেই আলো জ্বলছে! শুধু আপনার বাড়িতেই।

# জিহাদপুরের সেই লোকটা

**জিহাদপুরের সেই লোকটা**

পিকনিকের দিনক্ষণ আয়োজন যখন সব ঠিকঠাক তখন সুনীতকাকু হঠাৎ বলে উঠল, না, আমি গাড়ি চালাতে পারব না। তোমরা ড্রাইভার জোগাড় করো। সে-ই গাড়ি চালিয়ে আমাদের পিকনিক স্পটে নিয়ে যাবে।

সুনীতকাকু খুব ভালো গাড়ি চালায়। সেটা আমরা সব্বাই জানি। এতক্ষণ কাকু গাড়ি চালাতে রাজি ছিল। কিন্তু পিকনিক স্পটের নামটা শোনামাত্রই বেঁকে বসল। অথচ ড্রাইভার নিলে আমাদের খরচের চাপ বাড়বে।

কেন, গাড়ি চালাতে পারবি না কেন?–রীতাপিসি জিগ্যেস করল।

সুনীতকাকু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে ঘোর লাগা গলায় বলল, গড়বেতায় যেতে হলে জিহাদপুরের ওপর দিয়ে যেতে হয়। আর লক্ষ টাকা দিলেও আমি জিহাদপুরের ওপর দিয়ে যেতে পারব না। সে দিনে তোক কি রাতেই হোক।

কেন, জিহাদপুরে কী হয়েছে?–লিলিদি, আমার জ্যাঠতুতো দিদি, জানতে চাইল।

সুনীতকাকু তক্ষুনি কোনও উত্তর দিল না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেট দেখে আমার চার বছরের বোন চন্দনা বায়না করতে লাগল। সুনীতকাকুর হাত ধরে টানতে লাগল আর বলতে লাগল, সাদা লজেন খাব, লম্বা সাদা লজেন খাব।

আমি ওকে কোলে করে সরিয়ে নিয়ে এলাম, কিন্তু জেদ ধরে ও চিৎকার করতে লাগল, আর হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। ওর মুখে সেই এক কথা, লম্বা সাদা লজেন খাব।

অন্যসময় হলে চন্দনাকে আদর করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ তোয়াজ করতাম। কিন্তু এখন সেরকম মনের অবস্থা কোথায়। সুনীতকাকুর জন্যে আমাদের শীতকালের বাঁধা পিকনিকটাই ভেস্তে যেতে বসেছে।

লিলিদি আবার জানতে চাইল, কেন, জিহাদপুরে কী হয়েছে?

মাত্র চার বছর আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল–এইরকমই শীতের সময়ে। তার পর থেকে ঠিক করেছি, জিহাদপুরের ওপর দিয়ে আর কখনও গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছি না।

কথা বলতে বলতে কান ধরার ভঙ্গিতে দু-হাত কানে ঠেকাল সুনীতকাকু। ঠোঁটে সিগারেট ধরা অবস্থাতেই বলল, হনুমানের দিব্যি–ও রাস্তায় আর নয়!

আমি হেসে বললাম, হঠাৎ হনুমানের দিব্যি কেন?

আমাদের আর্লি স্টেজে হনুমান আমাদের ক্লোজ রিলেটিভ ছিল। মানে, লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা বলছি আর কী! তাই সিনিয়ারমোস্ট গুরুজন হিসেবে আমি হনুমানকে খুব রেসপেক্ট করি।

চন্দনা তখনও জেদ দেখিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মনে হল, সুনীতকাকুর হনুমান-থিয়োরিটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে নয়।

রীতাপিসি প্রায় চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, চার বছর আগে মাথামুণ্ডু কী না কী হয়েছে, তার জন্যে পিকনিক পণ্ড! তোর ওসব চালাকি ছাড়, সুনীত! আসলে তুই পিকনিকে যাবি না– তাই নানান ছুতো খুঁজছিস।

আমার খুব মনখারাপ লাগছিল। কারণ, আমার কাছে বছরের ছটা ঋতু হল এইরকম : গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, পিকনিক, বসন্ত। সেই পিকনিকটাই হবে না! খোলা মাঠ আর গাছপালার মধ্যে শীতের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলো, গানবাজনা–সব মাটি!

লিলিদি চন্দনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, সুনুকা, তুমি কি সিরিয়াসলি বলছ, না কি ঠাট্টা করছ?

সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোয়া ছেড়ে সুনীতকাকু বলল, বিশ্বাস কর–সিরিয়াসলি বলছি। তোরা অন্য কোথাও পিকনিক স্পট ঠিক কর–সেটাই ভালো হবে।

কেন, কী হয়েছিল তোর ওই জিহাদপুরে সাতজন্মে নাম শুনিনি! খুলে বল দেখি! রীতাপিসি ভাইকে যেন সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল।

শোন তা হলে!বলল সুনীতকাকু, তবে ছোটরা কিন্তু ভয় পেতে পারে।

আমি বললাম, ভয়! পিকনিক পণ্ড হওয়ার ভয়ে আমি অস্থির! এর চেয়ে বেশি ভয় আর কিছুতে আছে নাকি!

সুনীতকাকু কিন্তু বেশ গম্ভীর গলায় বলল, আছে জিহাদপুরের ভয়। শোন, বলছি…।

.

তোরা তো জানিস, ছোটবেলায় আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে বলতে গেলে জ্যাঠামশায়ের কাছেই আমি মানুষ। জ্যাঠামশায় দারুণ মানুষ ছিলেন। আজকাল এরকম গুরুজন পাওয়াই মুশকিল। আমার ছোটবেলাটা এত দারুণ কেটেছিল যে, এখনও সেসব দিনের কথা মনে পড়লে মনটা কেমন হয়ে যায়।

জ্যাঠামশায় বরাবর মহানগঞ্জে থাকতেন, জমি-জমা দেখাশুনো করতেন। শহর ওঁকে মোটেই টানত না। বছর চারেক আগে তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে ওঁকে দেখতে গেলাম। তখন বুঝতে পারিনি যে, আমি জিহাদপুরের ওপর দিয়ে গেছি।

তিনদিন পর কলকাতার পথে যখন রওনা হলাম তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ, জ্যাঠামশায়ের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। বলতে গেলে এখন-তখন।

সুতরাং গাড়ি চালিয়ে ফেরার পথে মনটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। বারবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। আর ভুলে যাচ্ছিলাম যে, ছুটন্ত গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি।

শীতের সময়। সন্ধে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। সোয়েটার-জ্যাকেট পরে গাড়ির ভেতরে বসে থাকলেও কনকনে শীত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় কুয়াশা ভেদ করে কালো পিচের রাস্তা আবছা দেখা যাচ্ছিল।

দিব্যি গাড়ি চালিয়ে আসছি, হঠাৎই দেখি আমার ঠিক সামনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চাদর মুড়ি দেওয়া একটা লোক কোত্থেকে এসে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটা এত আচমকা গাড়ির সামনে এসে হাজির হল যে, মনে হল সে ঠিক একটা গাছের মতো মাটি খুঁড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে।

ব্যস! যা হওয়ার তাই হল। আমি প্রাণপণে ব্রেক কষলাম বটে, স্টিয়ারিংও কাটালাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না। লোকটা এত কাছে দেখা দিয়েছিল যে, পৃথিবীর কোনও ড্রাইভারই ওকে বাঁচাতে পারত না।

আমার গাড়ি সপাটে লোকটাকে ধাক্কা মারল। বীভৎস একটা শব্দ হল। লোকটা কোথায় কাত হয়ে পড়ল দেখতে পেলাম না।

আরও অন্তত হাত দশেক গিয়ে তবে আমার গাড়ি থামল। স্টিয়ারিং কাটানোর ফলে গাড়িটা পিচের রাস্তা ছেড়ে মাটির ওপরে নেমে এসেছে। আর আমি হতভম্ব হয়ে চুপচাপ বসে আছি। ভাবছি, লোকটা আছে, না খতম হয়ে গেছে!

একটু পরে যখন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দরজার হাতল ঘুরিয়ে গাড়ি থেকে নামতে গেলাম। বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল। এর আগে আমি কখনও মানুষকে ধাক্কা মারিনি। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কোনও লোকজন চোখে পড়ে কি না।

নাঃ, কেউ নেই।

হঠাৎই বন্ধ কাচের জানলায় ঠকঠক শব্দ হল।

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি বাঁ-দিকের দরজার বাইরে চাদর মুড়ি দেওয়া একজন মানুষ সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হেডলাইটের আলো গাছের গুঁড়িতে ঠিকরে পড়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তারই আভায় লোকটির মুখ আবছা চোখে পড়ছিল। তা ছাড়া কপালের ওপরটায় চাদরের আড়াল থাকায় চোখ দুটো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।

তবে লোকটা বোধহয় পান খাচ্ছিল। কারণ, ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ছিল।

লোকটা ইশারায় আমাকে জানলার কাচটা নামাতে বলল।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করলে তারপর যা-যা হয় সেসব মনে পড়ছিল : গণধোলাই, পুলিশের হাতে নাকাল হওয়া, ঘুষ–আরও কী কী আছে কে জানে!

কোনও কথা না বলে কাঁপা হাতে জানলার কাচটা নামালাম।

সঙ্গে-সঙ্গে রুক্ষ কর্কশ গলায় লোকটি বলে উঠল, একটু দেখে চালাতে পারেন না! স্টিয়ারিং হাতে পড়লেই কি জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেন।

আমি সাফাই হিসেবে কিছু একটা বলতে গেলাম। কিন্তু এত অবাক হয়েছিলাম যে, ঠোঁট কেঁপে ওঠাই সার–গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। আশ্চর্য! এইরকম ধাক্কা মারার পরেও লোকটা বেঁচে আছে।

একটা ঠান্ডা ভয় আমাকে ক্রেপ ব্যান্ডেজের মতো জড়িয়ে ধরল। তারপর সেই ভয়টা টুইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে যেতে লাগল আমার শরীরের ভেতরে।

কী যে হল আমার, আচমকা গাড়ি স্টার্ট করে পাগলের মতো ছুটিয়ে দিলাম।

ধুলো উড়ল, ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ হল, ক্ষিপ্র হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি তুলে নিয়ে এলাম রাস্তায়। তারপর শুধু অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে রাখলাম। মনে শুধু একটাই চিন্তা ও এখান থেকে যেভাবে হোক পালাতে হবে।

গাড়ি আমার কথা শুনেছে। দেখলাম, সামনের পিচের রাস্তাটা মরিয়া হয়ে ছুটে যাচ্ছে পেছন দিকে।

খোলা জানলা দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছিল। আমার প্রচণ্ড শীত করার কথা, কিন্তু আতঙ্কে শীতের কামড়টা টের পাচ্ছিলাম না।

এই যে বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছেন–দেখবেন, আবার একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে।

কে বলল কথাটা।

চমকে বাঁ-দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি গাড়ির জানলায় সেই লোকটা। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে ছুটছে। এক হাতে জানলায় নামানো কাচটা চেপে ধরে আছে।

আমি পাথর হয়ে গেলাম।

গাড়ি ঘণ্টায় অন্তত ষাট-সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটছে। লোকটা এই গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে কী করে! এ যে বেন জনসনকে হার মানায়!

সামান্য হেসে লোকটা বলল, আমরা জিহাদপুরের লোক। অন্যায় দেখলেই আমরা প্রতিবাদ করি। আপনি যে আমার বড়ির ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিলেন, এর বিহিত করবে কে!

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। রোবটের মতো গাড়ি ছুটিয়ে চললাম।

লোকটা জানলায় ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্বিকারভাবে ছুটে চলল। আর একনাগাড়ে ওর প্রতিবাদ জানিয়েই চলল।

জিহাদপুরের লোকদের কাছে অন্যায় জুলুম চলবে না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে জানি। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের প্রোটেস্ট থামবে না। এমনকী মরে গেলেও আমরা প্রতিবাদ করতে ছাড়ি না–আমাদের জেদ এমন!

লোকটার শেষ কথাটা আমাকে যেন চাবুকের বাড়ি মারল।

মরে গেলেও আমরা প্রতিবাদ করতে ছাড়ি না...। তার মানে!

আমার হাতের কথা স্টিয়ারিং আর শুনল না। পলকে বেসামাল হয়ে গেল। গাড়ির পথটা এলোমেলো হয়ে গিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত ধাক্কা মারলাম রাস্তার ধারের একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে।

যে-কোনওভাবেই হোক, আমার বাঁ-পা নিতান্ত অভ্যাসবশে চেপে বসেছিল ব্রেকের ওপরে। তাই ধাক্কাটা সেরকম মারাত্মক হয়নি।

তালগোল পাকানো শব্দ হল নানারকম। ব্রেক কষার কাচকাচ আর্তনাদ, আমার ভয়ের চিৎকার, আর সবশেষে সংঘর্ষের শব্দ।

আমি স্টিয়ারিং-এর ওপরে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁপাচ্ছিলাম। একটু সময় নিয়ে ভয়েভয়ে আড়চোখে তাকালাম জানলার দিকে।

ভেবেছিলাম, জানলায় জিহাদপুরের লোকটাকে আর দেখতে পাব না। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল ছিল–এখন সেই অলীক স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু না, লোকটা তখনও জানলায় রয়েছে।

ওর মাথার ঘোমটা সরে গেছে। এখন ওর চোয়াড়ে মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জিনিসটাকে আগে পানের রস ভেবে ভুল করেছিলাম।

এখন বুঝলাম, ওটা রক্তের রেখা।

লোকটার বাঁ-গাল বেয়েও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বোধহয় মাথায় চোট পেয়েছে।

আমার চিন্তাভাবনা সব জট পাকিয়ে শুধু আতঙ্ক মনে বাসা বেঁধেছিল। সেই আতঙ্কের ঠেলায় ডান হাতে আমার দিকের দরজাটা খুলে ফেললাম। পালাতে হবে! যেভাবেই হোক, এই ভয়ংকর লোকটার কাছ থেকে আমাকে পালাতে হবে!

দরজা খুলে সবে একটা পা গাড়ির বাইরে রেখেছি, তক্ষুনি লোকটা বকবক করতে করতে এক হ্যাঁচকায় ওর দিকের দরজাটা হাট করে খুলে ফেলল।

দেখুন! আমার কী হাল করেছেন দেখুন! আর আপনি এখন পালাচ্ছেন।

খোলা দরজা দিয়ে যা দেখলাম তা যেমন ভয়ংকর তেমনই অবিশ্বাস্য।

মাথা থেকে শুরু করে রক্তাক্ত কোমর পর্যন্ত পৌঁছেই লোকটার শরীর শেষ হয়ে গেছে। তারপর শুধু শুন্য!

যেন বাতাসে ভর করে একটা অর্ধেক মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমার দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে গিয়েছিল। চোখ দুটো বোধহয় ভয়ে পাগল হয়ে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। বিশাল হাঁ করে ফেলেছিলাম এক প্রাণান্ত চিৎকার করে ওঠার জন্যে।

ঠিক তখনই লোকটা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, দেখেছেন, আপনার গাড়ি চাপা পড়ে আমার বডিটা একেবারে দু-আধখানা হয়ে গেছে! নীচের অর্ধেকটা সেই অ্যাকসিডেন্টের জায়গাতেই পড়ে আছে। চলুন, দেখবেন চলুন, মিথ্যে বলছি কি না!

লোকটা হাত বাড়াল আমার হাত ধরার জন্যে।

তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

পরদিন জেনেছি, গাড়ির জ্বলন্ত হেডলাইট দেখে স্থানীয় লোকজন আমাকে খুঁজে পেয়েছিল।

তা ছাড়া ওরা কখনও জিহাদপুরের নাম শোনেনি।

.

সুনীতকাকুর গল্প শেষ হওয়ার পর আমরা আর কোনও কথা বলতে পারলাম না।

# সুখের সংসার ডট কম

**সুখের সংসার ডট কম**

ভোরের আলো ফুটেছিল অনেক আগেই, কিন্তু সেটা দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠতে চাননি লাবণ্য। কেমন একটা আলসেমি ওঁকে জড়িয়ে ধরেছিল আজ। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন তার জন্য একটা ঝিমুনিভাব থাকেই, কিন্তু গত রাতে কয়েকটা স্বপ্ন কেমন একটা বাড়তি ঘুমের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। স্বপ্নের গল্পগুলো মনে নেই, তবে তাতে প্রমথনাথকে যে দেখেছেন, সেটা মনে আছে।

স্বামী প্রমথনাথ চলে গেছেন প্রায় আটবছর। একটা অভাব তার জন্য থাকবেই সেটা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু অন্য আরও যেসব অভাবের গল্প নানানজনের কাছে শোনেন…।

মা, উঠে পড়ুন…অনেক বেলা হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে পড়েছে মধুমিতা–এ-বাড়ির একমাত্র বউ। মিষ্টি মুখ, স্বভাবও। রোগা তরতরে চেহারা। সবসময় একাজ সে কাজ নিয়ে ছটফট করছে। এখন পুবের জানলাদুটোর পরদা সরিয়ে দিল। তারপর খুলে দিল পুবের ঝুলবারান্দার দরজা।

সঙ্গে-সঙ্গে কত কী যে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে! পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, হুটোপুটি রোদ্র। প্রমথনাথের এগুলো খুব প্রিয় ছিল। বড় শখ করে পুবের এই বারান্দা তৈরি করেছিলেন। সূর্য উঠলে প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়বে বারান্দায়, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তবের মন্ত্র আওড়াবেন প্রমথনাথ।

তিনবছর চুটিয়ে শখ মিটিয়েছিলেন। তারপর চলে গেলেন। এখন লাবণ্যর এই ঘরের মার্বেল পাথরের মেঝে থেকে আলো ঠিকরে পড়ে দেওয়ালে। সেখানে

টাঙানো আছে প্রমথনাথের রঙিন ফোটো। এভাবেই ভোরের আলোর শখ মিটছে মানুষটার। হয়তো মনে-মনে আওড়াচ্ছেন সূর্যস্তবের মন্ত্র। কে জানে!

মুখটা ধুয়ে নিন, মা, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। লাবণ্য জড়ানো গলায় বললেন। ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন বিছানায়।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ছুটে কাছে চলে এল মধুমিতা। লাবণ্যর কপালে-গালে হাত রাখল : কই, জ্বর তো নেই! ঠিক আছে, ডক্টর মুখার্জিকে একবার কল করে দিচ্ছি। ওঁকে বলছি।

মধুমিতার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল দীপ্তিমান। চুল উশকোখুশকো, পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। ফরসা চেহারা, ভারী গাল, গেঞ্জির গলার বৃত্তচাপের ওপর দিয়ে লোমশ বুক উঁকি মারছে।

ঘরে ঢুকেই সটান মায়ের কাছে চলে এল দীপ্তিমান। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মা-কে। তারপর বিছানায় বসে পড়ল।

দীপ্তিমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন লাবণ্য, বললেন, তোর যে কী এক ছেলেমানুষি স্বভাব। রোজ-রোজ প্রণাম করার কী আছে!

দীপ্তিমান হেসে বলল, ও তুমি বুঝবে না, মাদার। সকালবেলা তোমাকে প্রণাম করে আমি সারাদিনের কাজের এনার্জি পাই।

মধুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে মা-ছেলের কথা শুনছিল। চট করে লাবণ্যকে প্রণাম করে ফেলল ও।

লাবণ্য বললেন, দ্যাখ তো, দিপু, তুই প্রণাম করিস বলে বউমাকেও প্রণাম করতে হয়। তোরা এখনও সেকেলে রয়ে গেলি!

কী যে বলো, মা। তোমার পা ছুঁয়েই কি আধুনিক হওয়া যায়! আধুনিক হওয়া কী এতই সহজ ব্যাপার।

মধুমিতা দীপ্তিমানকে বলল, অ্যাই, ডক্টর মুখার্জিকে একবার কল করে দাও মায়ের শরীরটা ভালো নেই।

সে কী! প্রায় আঁতকে উঠল দীপ্তিমান। লাবণ্যর কপালে হাত দিয়ে উষ্ণতা আঁচ করতে চাইল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, আমি এক্ষুনি ডক্টর মুখার্জিকে রিং করছি। উনি কলে বেরোনোর আগে আমাদের এখানে হয়ে যাবেন। তুমি আয়া-মাসিকে বোলো সবসময় মায়ের কাছে-কাছে থাকতে।

লাবণ্যর ঘর ছেড়ে ড্রইং-ডাইনিং-এ গেল দীপ্তিমান। টেলিফোনটা সে-ঘরে একটা কর্নার টেবিলে রাখা আছে।

রিসিভার তুলে নম্বরের বোতাম টিপতে টিপতে ও চেঁচিয়ে মধুমিতাকে বলল, আজ আমি একটু আর্লি অফিসে বেরোব–অ্যাবাউট সাড়ে আটটায়। আর বাবুনকে ঘুম থেকে তুলে দাও। নইলে ওর স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

মধুমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটল। চায়ের জল বসিয়ে বাবুনকে চটপট ডেকে তুলতে হবে।

আয়া-মাসি সারদা টয়লেটে গেছে। ও লাবণ্যর সবসময়ের সঙ্গী। অল্পবয়েসে স্বামী হারিয়েছে। গরিব হলেও চেহারায় একটা আভিজাত্যের প্রলেপ রয়েছে। ভীষণ কম কথা বলে। আর সেইজন্যই লাবণ্যর ওকে বেশি ভালো লাগে। লাবণ্যর যে-কোনও প্রয়োজন সারদা যেন টেলিপ্যাথিতে টের পায়। ওকে ছাড়া লাবণ্য বেশ অসহায় বোধ করতেন।

মধুমিতা চা দিয়ে গেল লাবণ্যকে। বলল, মা, চুমুক দিয়ে দেখুন তো ঠিক আছে কি না।

লাবণ্য শব্দ করে চুমুক দিলেন। তৃপ্তির একটুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বোঝাই যায় না চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়ে তৈরি। ইকোয়াল না কী নাম যেন। প্রথম-প্রথম বিস্বাদ লাগত ডাক্তারের কথা মানতে ইচ্ছে করত না। এখন সয়ে গেছে।

চা খাওয়ার সময় প্রথমনাথকে মনে পড়ে। পুবের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে দুজনে চা খেতেন। চুমুকে শব্দ হলেই প্রমথনাথ বিরক্ত হয়ে বলতেন, কী যে বিশ্রী শব্দ করে চা খাও! চা খাবে, কোনও শব্দ হবে না–এটা এটিকেট।

লাবণ্য হাসতেন। বলতেন, যতই এটিকেট হোক, চায়ে চুমুকের শব্দটাই হচ্ছে আসল! ও না হলে আমেজ আসে! শব্দ না করে চা খাওয়া মানে মনে-মনে চা খাওয়া।

স্মৃতিবিধুর হাসি লাবণ্যর ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। মধুমিতাকে বললেন, চা-টা দারুণ হয়েছে।

মধুমিতা বলল, সেটা আপনার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। আমি যাইবাবুনকে রেডি করি গিয়ে। পরে এসে জেনে যাচ্ছি আজ আপনার কী-কী রান্না খেতে ইচ্ছে করছে।

মধুমিতা প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

লাবণ্য ওর চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে ভাবলেন, বউমা তো নয়, মেয়ের চেয়েও বেশি! সারাদিন শুধু মা আর মা!

সারদা ঘরে এল। বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারটাকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে দিল। লাবণ্য রোজ এই চেয়ারে বসে চা খাওয়া শেষ করেন। সেই ফাঁকে সারদা বিছানাটা তুলে পরিপাটি করে দেয়।

লাবণ্য ইজিচেয়ারে বসে চা খাওয়া শুরু করতেই দীপ্তিমান মায়ের কাছে এল।

মা, ডক্টর মুখার্জি ঠিক সাড়ে নটায় আসবেন। আমি তো অফিসে বেরিয়ে যাব মিতা থাকবে। তোমার কী কী কষ্ট হচ্ছে ডক্টর মুখার্জিকে ফ্র্যাঙ্কলি বলবে। আমি দশটা নাগাদ অফিস থেকে ফোন করে খবর নেব।

পাকানো লাঠির মতো খবরের কাগজটা বারান্দায় ছিটকে এসে পড়ল।

দীপ্তিমান ওটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে লাবণ্যর হাতে দিল।

লাবণ্য বললেন, তুই আগে চোখ বুলিয়ে নে না–অফিসে বেরোবি…।

না, তুমি আগে পড়ো। আমি পরে সময় পেলে দেখব।

লাবণ্য এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলেন। প্রমথনাথ চলে যাওয়ার পরেও দিপু বা মধুমিতা লাবণ্যর সিংহাসনে এতটুকু চিড় ধরতে দেয়নি।

দীপ্তিমান চলে যাওয়ার সময় সারদাকে বলল, মাসি, আপনি মায়ের কাছে কাছে থাকবেন। ছেড়ে এদিক-ওদিক যাবেন না। শুনলেন তো, মায়ের শরীরটা ভালো নেই।

সারদা ঘাড় নাড়ল।

লাবণ্য আলতো করে বললেন, না, না–সেরকম সিরিয়াস কিছু নয়।

দীপ্তিমান বলল, সিরিয়াস কি না সেটা ডাক্তারবাবু বুঝবেন। কোনও শরীর খারাপকেই হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়।

দীপ্তিমান চলে গেলে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যর ঠোঁটে। এই বয়েসে এরকম সুখী জীবনের কথাই কল্পনা করে সবাই–তবে কেউ পায় কি না কে জানে! লাবণ্য পেয়েছেন। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, মেয়ে, জামাই, নাতনি সব্বাই যেন লাবণ্যকে ঘিরে রয়েছে সূর্যকে ঘিরে পাক খাওয়া গ্রহের মতো। সূর্যকে টুক করে সরিয়ে নিতে যদি কেউ পারে, তা হলে গ্রহগুলো সেই মুহূর্তে ওদের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ছত্রখান হয়ে যাবে। সেইজন্যই ওদের কাছে সূর্যের এত কদর।

লাবণ্যও কি অনেকটা সেইরকম?

মনে-মনে ভগবানকে প্রণাম করলেন লাবণ্য। এ অপরূপ সুখ তারই দান।

একটু পরে চা খাওয়া শেষ হল, খবরের কাগজ পড়াও।

সারদা ঘরে গিয়ে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা নিয়ে এল। ও জানে, লাবণ্য এখন রোজকার মতো এফ. এম. চ্যানেল শুনবেন। বাইরের রাস্তা দেখবেন, দেখবেন গাছের পাতা, ফুল, পাখি। আর একইসঙ্গে বোধহয় পুরোনো কথাও ভাববেন।

একটু পরে দীপ্তিমান বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে বেরোবে। অফিসে যাওয়ার পথে ওর গাড়ি বাবুনকে স্কুলে নামিয়ে দেবে। আর দুপুরে ছুটির সময় মধুমিতা গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে।

সকালে এই সময়টা স্মৃতিচারণ করতে বেশ ভালো লাগে লাবণ্যর। বিয়ের পরপর হঠাৎই প্রমথনাথের চাকরি চলে গিয়েছিল। লোকসান দিয়ে দিয়ে

কোম্পানি ডকে উঠেছিল। তারপর কী কষ্ট, কী কষ্ট! প্রমথনাথ বললেন, আর চাকরি করবেন না ব্যবসা করবেন।

কম করেও বারোটা বছর চলল লড়াই আর লড়াই। দীপ্তিমান আর অনুরিতা বড় হয়ে উঠতে লাগল। দুঃখ-কষ্ট কেটে গিয়ে সচ্ছলতা ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়তে শুরু করল সংসারে। ঠাকুরকে দিনরাত কত ডেকেছেন লাবণ্য! লুকিয়ে লুকিয়ে কত চোখের জল ফেলেছেন।

আজ আর-একবার মনে হল, সেগুলো বৃথা যায়নি। লাবণ্যর জীবন-পাত্র থেকে মাধুরী সত্যিই যেন উথলে পড়ছে।

দীপ্তিমান আর বাবুন কখন এসেছে লাবণ্য টের পাননি। সারদার হঠাৎ ঘোমটা টানা থেকে ব্যাপারটা আঁচ করতে না করতেই বাবুন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। লাবণ্যর দু-গালে টপ-টপ করে চুমু খেয়ে বলল, দিদুন, টা-টা..স্কুলে যাচ্ছি। রাতে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট হলে তোমার কাছে গোস্ট স্টোরি শুনব, ও. কে.?

ওকে চুমু খেয়ে লাবণ্য ইংরেজি ঢঙে বলতে চেষ্টা করলেন, ও. কে.।

ঠিক দীপ্তিমানের মতোই সুন্দর আর দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা।

দীপ্তিমান বলল, মা, অফিসে বেরোলাম। ডক্টর মুখার্জি ঠিক সাড়ে নটায় আসবেন।

লাবণ্য হেসে তাকালেন ছেলের দিকে। সবসময় সবদিকে এত খেয়াল! ঠিক বাবার স্বভাব পেয়েছে।

ওরা চলে যেতেই লাবণ্য উঠে পড়লেন। এখন হাত-মুখ ধোওয়া, বাথরুম ইত্যাদি সেরে নেবেন। তারপর জলখাবার। বাবুন এই শব্দটা শুনলেই বলে, দিদুন, তুমি একটা হোপলেস ব্রেকফাস্ট বলতে পারো না!

মধুমিতা ছেলেকে ডাক দেয় সঙ্গে-সঙ্গে : বড়দের সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে! তা ছাড়া জলখাবার বলো আর ব্রেকফাস্ট বলো, খাবারটা তো একই থাকবে!

বাবুন বলে, সরি, দিদুন…।

মনে-মনে হাসলেন লাবণ্য। সুখের যে কতরকম চেহারা থাকে!

.

ব্রেকফাস্ট শেষ করার কিছুক্ষণ পরেই অনুরিতার ফোন এল।

হাই মাম্মি, হাউ আর য়ু?

ভালো, তুই কেমন আছিস?

ভালো, তবে গুডডুটা দিনকে দিন ভীষণ দস্যি হয়ে উঠছে–সে তুমি ভাবতে পারবে না।

বেশ কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বললেন লাবণ্য। সকলের খোঁজখবর নিলেন। তবে নিজের গা ম্যাজম্যাজ করার কথা বললেন না–বললে অনু ব্যস্ত হয়ে উঠবে। হয়তো এক্ষুনি বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট ছেড়ে ছুটে আসবে এখানে।

এই হাই মাম্মি-টাম্মিগুলো অনুর বিয়ের আগে ছিল না–পরে হয়েছে। লাবণ্য এ নিয়ে ওকে একদিন ঠাট্টাও করেছিলেন। তাতে অনু বলেছিল, কী করব বলো! আমার বরটা যে সাহেব কোম্পানির টপ এক্সিকিউটিভ! তা ছাড়া তিন-চারবার স্টেটু ঘুরে এসে আমারও কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে।

লাবণ্য হেসেছিলেন। ওঁর ছেলে আর মেয়ে বড় হয়েও কেমন ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

অনুরিতা রোজ এ সময়টাতেই ফোন করে। আর প্রতি রবিবার সন্ধের সময় অরুণাভ আর গুডুকে নিয়ে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বলে, উইকে একবার তোমাকে সামনাসামনি না দেখলে ভীষণ মনখারাপ লাগে। আর গুডুও বায়না করে বলে, দিদুনের কাছে যাব।

অনুরিতার ফোন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ডক্টর মুখার্জি এলেন। ভালো করে লাবণ্যকে পরীক্ষা করলেন। মধুমিতা ওঁদের কাছে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত মা-পায়রার মতো ছটফট করছিল।

পরীক্ষা শেষ করে ডক্টর মুখার্জি হেসে বললেন, কিছু হয়নি। আপনারা শুধু-শুধু উয়ারিড হয়ে পড়েছেন। বুকে সামান্য কফ আছে। এই সিরাপ আর ট্যাবলেটটা লিখে দিলাম। ইন্সট্রাকশন মতো খাওয়াবেন। ব্যস নিশ্চিন্ত।

ডক্টর মুখার্জি চলে যাওয়ার পর মধুমিতা হাঁফ ছাড়ল? উঃ, যা চিন্তায় পড়েছিলাম! আপনার কিছু হলেই আমার দুশ্চিন্তা হয়।

কথাটা সত্যি। লাবণ্যর কিছু হলেই দিপু আর মধুমিতা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে লাবণ্যকে ঘিরে ধরে। অনুরি-অরুণাভ জানতে পারলেও সেই একই ব্যাপার।

ঠিক দশটায় দীপ্তিমান ফোন করে লাবণ্যর খবর নিল।

মধুমিতা যখন জানাল, ব্যাপারটা মোটেই সিরিয়াস কিছু নয়, তখন ও বলল, থ্যাংক গড। তুমি ওষুধগুলো এক্ষুনি আনিয়ে নাও।

তারপর আরও দু-চারটে কথা বলে মা-কে ফোন দিতে বলল।

কর্ডলেসের রিসিভারটা লাবণ্যর হাতে তুলে দিল মধুমিতা, বলল, আপনার ছেলে।

মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল দীপ্তিমান। তারপর ফোন রেখে দেওয়ার সময় বলল, ফিরতে ফিরতে আমার সাতটা হবে।

মধুমিতা বলল, যাই, আপনার ওষুধগুলো আনানোর ব্যবস্থা করি।

লাবণ্য এবার টিভি দেখবেন। সারদা সেটা জানে। তাই ও টিভির সুইচটা অন করে দিয়ে রিমোটটা লাবণ্যর হাতে এনে দিল।

বাবুন আর দীপ্তিমান বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িটা বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। লাবণ্যর এটা ভালো লাগে না। তাই সবসময় রবিবারের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। সেদিনটা দারুণ হইহই করে কাটে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দীপ্তিমানের দুটো শার্ট নিয়ে বসলেন লাবণ্য। একটায় বোতাম বসাতে হবে, অন্যটায় দুটো বোতাম-ঘর তৈরি করতে হবে।

রেডিমেড শার্টগুলোর কবজির কাছটা যা ঢিলে থাকে!

নাকের ওপরে সোনালি ফ্রেমের চশমা বসিয়ে উঁচ-সুতো কঁচি নিয়ে কাজ করছিলেন লাবণ্য। সেলাই করতে ওঁর ভালোই লাগে। অল্পবয়েসে সেলাইয়ের শখ ছিল। প্রমথনাথের প্রশংসাও পেয়েছেন বহুবার। তাই এখনও বাড়ির সমস্ত সেলাই-ফেঁড়াইয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে ভালোবাসেন। মধুমিতাও বলে, মায়ের মতো সেলাই আমি জীবনেও করতে পারব না! আচ্ছা-আচ্ছা দরজি মায়ের কাছে হার মেনে যাবে।

কিছুক্ষণ সেলাইয়ের পর চোখে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তাই সেলাই রেখে লাবণ্য বিশ্রাম নিতে চাইলেন। সারদার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ও বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিল।

বিছানায় শরীর গড়িয়ে লাবণ্য বেশ আরাম পেলেন। অথচ একটা সময় ছিল যখন দুপুরে মোটেই ঘুমোতেন না। সময় নিজেও বদলায়, মানুষকেও বদলায়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। সারদাকে বললেন, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, আমাকে ডাকোনি!

সারদা মিনমিন করে বলল, আপনার শরীরটা ভালো নয়…বিশ্রাম দরকার… তাই…।

বিকেলের চা নিয়ে আবার বারান্দায় বসলেন।

মধুমিতা বাবুনকে নিয়ে কাছেই পার্কে গেছে। ছটা নাগাদ ফিরবে।

বিকেলের আকাশের রং দেখতে লাবণ্যর ভালোই লাগছিল। একটা বিকেল মরে যায় পরদিন একটা নতুন সকাল জন্ম নেবে বলে। নতুন একটা দিন এসে আগের দিনটাকে স্মৃতিকোঠায় ঠেলে দেয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার আগেই শুনলেন একতলায় বাবুনের হইচই। পার্কে বেড়ানো সেরে মধুমিতা আর বাবুন ফিরে এসেছে।

লাবণ্য ঘরে চলে এলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দুদ্দাড় করে ঘরে ঢুকল বাবুন। ছুটে এসে লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরল ও দিদুন, দিদুন, বলো তো তোমার জন্যে কী

এনেছি?

ছাড়, ছাড় পড়ে যাব... বলতে-বলতে লাবণ্য কোনওরকমে বিছানায় গিয়ে বসলেন।

বাবুন একটা ক্যাডবেরি চকোলেট বাড়িয়ে দিল লাবণ্যর দিকে ও বলতে পারলে না তো! এই নাও...।

মধুমিতা হেসে বলল, নিজে চকোলেট কেনার বায়না ধরল। তারপর কেনার সময় বলে, দিদুনের জন্যেও একটা কিনতে হবে নইলে আমি চকোলেট খাব না। তখন...।

লাবণ্য বাবুনের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। চকোলেটের মোড়ক ছাড়িয়ে একটুকরো ভেঙে নিলেন। তারপর বাকিটা নাতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, বাবুসোনা। আমি তো বুড়ো মানুষ–তাই বেশি চকোলেট খেতে নেই।

বাবুন চকোলেটটা নিয়ে বলল, তোমাকে চকোলেট দিলাম, থ্যাংক য়ু বলো!

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ–থ্যাংক য়ু, বাবুসোনা।

মধুমিতা বলল, এখন ওকে নিয়ে গিয়ে হোমটাস্কে বসাই। সাড়ে সাতটার সময় আপনাকে চা করে দেব।

দিদুন, হোমটাস্ক হয়ে গেলে গোস্ট স্টোরি–মনে থাকে যেন!

লাবণ্য হেসে মাথা নাড়লেন : হ্যাঁ রে বাবা, মনে আছে।

বাবুন পড়তে চলে যাওয়ার পর লাবণ্য আবার দীপ্তিমানের শার্ট নিয়ে বসলেন। সেলাইয়ের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে।

কিন্তু সেলাই করতে করতে একটা অঘটন ঘটল।

কীভাবে যেন ছুঁচটা ফুটে গেল লাবণ্যর আঙুলে। বাঁ-হাতের তর্জনীর ডগায় রক্তের ফোঁটা দেখা দিল–ঠিক যেন একটা ছোট্ট চুনি।

সারদা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল পরিচর্য্যা করতে। আসার সময় একটা ছোট টেবিলে সামান্য ধাক্কা খেল। একটা স্টিলের বাটি টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝনঝন করে শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে মধুমিতা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

কী হয়েছে, মা! কী পড়ল?

বিছানায় বসে থাকা লাবণ্যর আঙুলের দিকে তাকিয়ে মধুমিতা একেবারে আঁতকে উঠল। লাবণ্যর আঙুলটা চট করে টেনে নিল মুখে। খানিকটা রক্ত চুষে বের করে দিল। তারপর ছুটল স্যাভলন মলম আর ব্যান্ড-এইড নিয়ে আসতে। বারবার বলতে লাগল, সন্ধেবেলা কেন যে সেলাই নিয়ে বসলেন! দেখুন তো, কী সব্বনেশে কাণ্ড হল!

লাবণ্যর আঙুলটা ব্যান্ডেজ করেই দীপ্তিমানকে অফিসে ফোন করল মধুমিতা। সব শুনে। দীপ্তিমান বলল, ও মাই গড! আমি এক্ষুনি বাড়ি আসছি।

তারপর সে এক হইহই কাণ্ড।

ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, সারদা, ডাক্তার! অনুকে ব্যাপারটা জানাতে বারণ করলেন লাবণ্য।

সত্যি, একফোঁটা রক্তের জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত যত্ন, এত ভালোবাসা! না, না, লাবণ্যর আর কিছু চাই না। প্রমথনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বললেন, তুমি সব দেখছ তো! আমার কোনও দুঃখ নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলল হুলস্থূল।

ছেলের কথায় সেলাই-ফোঁড়াই বন্ধ করতে হল লাবণ্যকে। মধুমিতাও ওঁকে কম-বেশি বকুনি দিল।

এই শাসন যে কী মধুর!

রাত দশটায় রাতের খাওয়া শেষ হলে লাবণ্যকে বলে মধুমিতা আর দীপ্তিমান ওদের ঘরে চলে গেল। বাবুন ভূতের গল্প শুনে দিদুনের গালে চুমু দিয়ে গুডনাইট

বলে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে গেল।

সারদা লাবণ্যর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর মেঝেতে নিজের বিছানা পাততে শুরু করল।

একটা দিন শেষ হল।

বিছানায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাবণ্য আচমকা হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। ওঁর বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। শরীরটা বারবার ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

সারদা একবার লাবণ্যর দিকে দেখল, তারপর নিজের মনেই বিছানা করতে লাগল–যেন কিছুই হয়নি। কারণ, এটা রোজকার ব্যাপার-সারদার সয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর কান্না সামলে উঠে দাঁড়ালেন লাবণ্য। চোখের জল মুছে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন।

সারদা হাঁটুগেড়ে বসে বিছানা ঠিক করছিল, আলতো করে জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছেন, মা?

পিছন ফিরে না তাকিয়েই লাবণ্য বললেন, কম্পিউটার রুমে।

সারদা আর কোনও কথা বলল না।

.

লম্বা বারান্দা ধরে হেঁটে দোতলার শেষ প্রান্তের ঘরটায় এসে পৌঁছলেন লাবণ্য।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, সেটা ঠেলে খুললেন। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা চিলতে ছিটকে ঘরে ঢুকে অন্ধকার মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

বাইরে নরম বাতাস বইছিল–তাতে বোধহয় একপশলা বৃষ্টির গন্ধও ছিল। লাবণ্য একটা শ্বাস নিলেন, তারপর মন শক্ত করে ঘরের আলো জ্বাললেন।

কথা-বলা পুতুলগুলো ঘরের একপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

মধুমিতা, দীপ্তিমান, বাবুন, ডক্টর মুখার্জি, অনুরিতা, অরুণাভ, গুড্ডু—সবাই হাজির। চেহারায় মানুষের মতো কথা-বলা এই রোবটগুলো লাবণ্য একটা কম্পিউটার কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। তাদের আচার-ব্যবহার কেমনতরো চান সেটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেই কোম্পানিকে। তারা লাবণ্যর পছন্দসই সফ্টওয়্যার ঢুকিয়ে দিয়েছে এই অ্যানড্রয়েডগুলোর ভেতরে। ফলে সারাটাদিন এই নকল মানুষগুলো প্রোগ্রাম অনুযায়ী কথা বলে, হাঁটা-চলা করে। এই রোবটগুলোর ভেতরে সপ্তাহের সাতটা দিনের জন্য সাতরকম প্রোগ্রাম ভরা আছে। যখন ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে যায় তখন লাবণ্য সেই কোম্পানিকে একটা ই-মেইল করে দেন। যেমন এখন করবেন।

ঘরের দেওয়াল-ঘেঁষে রাখা কম্পিউটার টেবিল। তাতে সাজানো রয়েছে মনিটর, স্পিকার, কিবোর্ড, মাউস, সিস্টেম ইউনিট সব।

কম্পিউটার অন করে চেয়ারে বসলেন লাবণ্য। কোম্পানিকে ই-মেইল করে জানালেন সফ্টওয়্যারগুলো এবার বদলে দিতে হবে নইলে একঘেয়ে লাগছে।

কাজ শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। দরজার কাছে এসে আলো নেভানোর আগে যন্ত্র মানুষগুলোকে আর-একবার দেখলেন। আসল মানুষগুলোর ফটোগ্রাফ দেখে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই মডেলগুলো তৈরি করা হয়েছে। লাবণ্যকে ঘিরে ওরা আসল মানুষের মতো ঘোরাফেরা করে, লাবণ্যর ফাঁকা বুকটা ভরাট করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আসল মানুষগুলো কোথায়? কী করছে ওরা এখন?

আবার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল।

বিয়ের পর-পরই দীপ্তিমান আলাদা হয়ে গেছে। তার দু-বছরের মধ্যেই চলে গেছে আমেরিকায়। কার মুখে যেন খবর পেয়েছিলেন আইওয়াতে আছে। প্রথম-প্রথম দু-চারবার ফোন টোন করেছিল। তারপর…তারপর সব শেষ।

অনুরিতার গল্পটাও অনেকটা একইরকম। বালিগঞ্জে থাকলেও ব্যাপারটা আমেরিকায় আইওয়ার মতন। একটা দিনও খোঁজ নেয় না, মা কেমন আছে। মাসদুয়েক আগে একবার ফোন করে জানতে চেয়েছিল টাকার দরকার আছে কি না।

না, দরকার নেই। প্রমথনাথ মারা যাওয়ার সময় ওই একটা জিনিসের অভাব রেখে যাননি। কিন্তু তা ছাড়া লাবণ্যর জীবনের বাকি দিকগুলো খাঁখাঁ করছে। এই শূন্যতার কথা লাবণ্য আর সারদা ছাড়া আর কেউ তেমন জানে না।

আলো নিভিয়ে পায়ে-পায়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এলেন লাবণ্য।

সারদা ততক্ষণে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে।

লাবণ্যর খাটের পাশে একটা ছোট টেবিলে একটা ট্যাবলেটের পাতা আর এক গ্লাস জল রাখা ছিল। একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিয়ে জল দিয়ে গিলে ফেললেন লাবণ্য। খাওয়ার আগে একবার ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছেন–এখন আর-একটা। তাতে যদি ঘুম আসে!

আলো নেভানোর সময় প্রথমনাথের ছবির দিকে চোখ গেল। ছবি থেকে লাবণ্যর মৃত স্বামী চাপা গলায় জিগ্যেস করল, বউ, কেমন আছ?

লাবণ্যর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। অতি কষ্টে চোখের জল রুখে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ভালো আছি…সুখের সংসার নিয়ে দারুণ আছি…।

তারপর সুইচ টিপে অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন!

# ৩২শে জানুয়ারির রাত

**৩২শে জানুয়ারির রাত**

ভোর হতেই দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে সুকান্ত। চোখ জ্বালা করছে। মাথা অসম্ভব ভার। সামনে ভোরের আকাশ, নারকেল আর পেয়ারা গাছের সবুজ পাতা, কয়েকটা চঞ্চল পাখি। আর ওদের পিছনেই স্নিগ্ধ সূর্য। সদ্য উঠে পড়েছে দিগন্তের আড়াল ছেড়ে।

কিন্তু সুকান্তর মনে হচ্ছিল, এটা পুব নয়, পশ্চিম দিক। লাল সূর্যটা যেন নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে।

সুকান্তও ডুবে যাচ্ছিল লজ্জা আর গ্লানিতে।

গতকাল ছিল ফুলশয্যার রাত। যে-রাতের কথা কোনও পুরুষ কখনও ভোলে না। অথচ সুকান্ত সেই রাতটাকে প্রাণপণে ভুলতে চাইছিল। যেন গতকালের রাতটা ওর জীবনে কখনও আসেনি।

ভুলতে চাইছিল বলেই রাতটার কথা বেশি করে মনে পড়ছিল সুকান্তর। মনে পড়ছিল ওর নতুন বউ চন্দ্রিমার কথা। চন্দ্রিমা এখন ফুল দিয়ে সাজানো নতুন বিছানায় নিষ্পাপ সরল মুখে অসহায়ভাবে ঘুমিয়ে আছে।

রাতটার কথা ভাবতে-ভাবতেই সুকান্তর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। শত চেষ্টাতেও নিজেকে ধরে রাখতে পারল না ও। কান্না পেয়ে গেল। হাতের ওপরে মাথা রেখে ও নীরবে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর কে যেন আলতো করে ভালোবাসার হাত রাখল ওর মাথায়। হাতের স্পর্শে আশ্বাস খুঁজে পেল সুকান্ত, নির্ভরতা খুঁজে পেল। ও হাউহাউ করে

কাঁদতে শুরু করল। আর সোজা সরল মেয়েটা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেন স্বামীর দুঃখকষ্ট ও আন্তরিকভাবে ভাগ করে নিতে চাইছে।

সুকান্ত ভেতরে-ভেতরে ভেসে যাচ্ছিল অকূলপাথারে। ভাসতে ভাসতে পিছিয়ে যাচ্ছিল সেই দিনটাতে যেদিন ওর দিল্লির অফিসের ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছিল মায়ের চিঠি।

চিঠির বক্তব্য ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। বরানগরের একটি মেয়েকে দেখে মায়ের খুব পছন্দ হয়েছে। মা ছোটমামাকে সঙ্গে করে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। মেয়ে বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেনি, তবে দেখতে খুব মিষ্টি, গানও জানে। ওদের ছোট পরিবার। মেয়ের ওপরে এক দাদা আছে। সদাগরি অফিসে চাকরি করে। বোনের বিয়ে দিয়ে তারপর সে বিয়ে করতে চায়। মেয়ের বাবা পি. ডব্লিউ. ডি-তে চাকরি করতেন–দু-বছর হল রিটায়ার করেছেন। ওদের একতলা ছোটবাড়ি–তবে নিজেদের বাড়ি। মেয়ে দেখে, পরিবার দেখে ছোটমামারও খুব পছন্দ হয়েছে। এখন সুকান্ত একবার এসে দেখে গেলেই কথাবার্তা এগোনো যেতে পারে।

সুকান্তর বাবা বহু বছর ধরেই বাতের ব্যথায় কাহিল। তাছাড়া অন্যান্য রোগের উপসর্গও কম নয়। বরাবরই তিনি সব ব্যাপারে সুকান্তর ছোটমামার ওপরে নির্ভর করেন। সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে ছোটমামাই শেষ কথা।

ছোটমামা খুব খুঁতখুঁতে মানুষ। এর আগেও অন্তত জনা দশেক পাত্রী দেখা হয়েছে। তার মধ্যে তিনজনকে মায়ের মনে ধরেছিল। কিন্তু ছোটমামা নাকচ করে দিয়েছেন। মাকে বলেছেন, কী বলো, ছোড়দি! ভাগ্নে আমার হিরের টুকরো ছেলে। ওর জন্যে পণ-টন কিছু তো চাইছি না। শুধু রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী ব্যস।

মাস তিনেক আগে দিল্লি থেকে শ্রীরামপুরের বাড়িতে এসেছিল সুকান্ত। তখন ছোটমামার এই নাকউঁচু সাধের কথা জেনে মনে-মনে বেশ একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ছোটমামার পছন্দসই মেয়ে পাওয়া যাবে তো!

যাই হোক, মাকে আড়ালে পেয়ে ভাববাচ্যে নিজের সাধটা জানিয়ে দিয়েছিল সুকান্ত। বলেছিল, ছোটমামার এতটা কড়াকড়ি না করলেই কি নয়!

সুকান্তর একটি মাত্র ছোটবোন সুধা। দাদার জন্য পাত্রী খোঁজার ব্যাপারে ওর উৎসাহও কম ছিল না। বন্ধুমহলে ও বেশ ঘটা করে জানিয়ে দিয়েছিল ওর দাদার

জন্য মেয়ে দেখা চলছে। সেই কারণে আশপাশের এলাকা থেকেও খোঁজখবর কম আসছিল না।

দিল্লি ফিরে এসে সুকান্ত ফ্ল্যাটের খোঁজ শুরু করে দিয়েছিল। ওর পছন্দের এলাকা ছিল কালকাজী অথবা চিত্তরঞ্জন পার্ক। অফিসের সহকর্মীদের ব্যাপারটা ও জানিয়েছিল। কারণ ও দিল্লিতে আছে মাত্র দু-বছর। অফিসে যারা আরও পুরোনো তারা নিশ্চয়ই দিল্লির আস্তানার ব্যাপারে ওর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।

সুতরাং ওদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট অফিস জুড়ে সে এক রীতিমতো হইচই। ডেপুটি ম্যানেজার সুকান্ত রায়চৌধুরী বিয়ে করতে চলেছে, ফ্ল্যাট খুঁজছে হন্যে হয়ে–একথা জেনে গেল সবাই। লাঞ্চ আওয়ারে ওকে ঘিরেই যত জটলা।

যেমন সিনিয়ার ম্যানেজার দেশমুখ একদিন সিগারেট খেতে-খেতে বললেন, রায়চৌধুরী, তোমার বিয়ের ব্যাপারটা আর কত মিটার এগোল জানতে পারি?

সুকান্ত লজ্জা পেয়ে বলেছে, মিটার নয়, স্যার, সেন্টিমিটার।

কাছাকাছি যারা হাজির ছিল তারা হেসে উঠেছে।

অফিস ক্যান্টিনের রামুদা আগেভাগেই বলে রেখেছেন, স্যার, আপনার বিয়ের পার্টিতে ক্যাটারিং-এর অর্ডারটা যেন আমি পাই। কালীমাতার দিব্যি কেটে বলছি, এক পয়সাও লাভ রাখব না। এমন আইটেম করব না, হোল লাইফ মনে রাখবেন।

সুকান্ত নরম গলায় বলেছে, এখনও সেরকম কিছু ঠিক হয়নি, রামুদা হলে বলব।

ওদের অফিসের সিনিয়ার ড্রাফ্টম্যান সঞ্জীব বোস একদিন লাঞ্চের পর পান চিবোতে চিবোতে বলেছেন, সুকান্তবাবু, শুনলাম আপনি নাকি খোঁয়াড়ে ঢুকছেন?

খোঁয়াড়! সুকান্ত বেশ অবাক হয়েছে।

হ্যাঁ, মানে–গোয়াল বললে খারাপ শোনায় তাই খোঁয়াড় বললাম! বোসদা পানের রসে রাঙানো ঠোঁট টিপে হেসে মন্তব্য করেছেন : ওই যেমন দালাল বললে শুনতে খারাপ লাগে, অথচ ব্রোকার বললে বেশ সাহেবি-সাহেবি ব্যাপার মনে হয়।

সুকান্ত কী জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না।

তখন ওর পাশ থেকে রমেন সান্যাল বলে উঠেছে, কেন বোসদা, বিয়ে করা মানে কি গোয়ালে ঢোকা।

বোসদা চোখ ছোট-ছোট করে পাকা-চুল টাইপিস্ট রমেন সান্যালকে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর বললেন, ব্যাপারটা আসলে তাই। এতদিন আমাদের সুকান্তবাবু ছাড়া ইয়ে ছিলেন, এখন থেকে বাঁধা পড়বেন। তবে এ-বাঁধনের মজা এমন যে, খোঁটাও দেখা যায় না, দড়িও দেখা যায় না। অথচ নাকে দড়ি দিয়ে শুধু ঘুরপাক। অবশ্য প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা বেশ থ্রিলিং।

আবার হাসির রোল।

সুকান্তর অফিসের পরিবেশটা এত ভালো যে, সবাই যেন ওর আপনজন। আর সেই আপনজনদের তদারকিতে মায়ের চিঠি পাওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ওর সবকিছু গোছানো হয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন পার্কে নতুন ফ্ল্যাট, আধুনিক আসবাবপত্র দিয়ে সেটা সাজানো, সংসার করার জিনিসপত্র কেনা, এ-সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে টিভি-ফ্রিজ থেকে শুরু করে বালতি, কাপড় কাঁচার সাবান, এমনকী জামাকাপড় ছড়ানোর ক্লিপ পর্যন্ত কেনা হয়ে গেল।

তারপর শুধু যেন নতুন বউয়ের অপেক্ষা।

নতুন ফ্ল্যাটে থাকতে একা-একা লাগলেও সুকান্ত জানে এই নিঃসঙ্গতা আর বেশিদিন নয়। ওর কলেজ জীবনের বন্ধুদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। সেইজন্যেই কি ও কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে?

বেশ কয়েকটা চিঠিপত্র চালাচালির পর দিল্লি থেকে শ্রীরামপুরে ফিরেছিল সুকান্ত। তারপর এক রবিবারের বিকেলে ছোটমামার সঙ্গে বরানগরে গিয়েছিল রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতীকে দেখতে।

মেয়েটির নাম চন্দ্রিমা। ডাকনাম মিনু।

কথাবার্তা বলার পর সুকান্তর মন হল, মেয়েটি ছোটমামার রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী না হলেও তার প্রায় কাছাকাছি।

মিনু লেখাপড়া খুব বেশি করেনি, তবে প্রাণ ঢেলে গান শিখেছে। সুকান্তর অনুরোধে খালি গলায় গেয়ে শোনাল, রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসার ভোলাব।

সুকান্ত বিস্ময়-মুগ্ধ চোখে মিনুকে দেখছিল। গানের সুরটা অনেকক্ষণ ধরে লেগে ছিল ওর কানে। ও যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল।

ওদের মুখোমুখি বসেছিল মিনু। সুকান্তর প্রশ্নের ছোট-ছোট উত্তর দিচ্ছিল আনত মুখে। মিনুর মা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একটু অপ্রস্তুত হেসে বললেন, ও বরাবরই কথা একটু কম বলে।

মিষ্টি মুখ ও হাসি-ঠাট্টা সেরে ফেরার পথে ছোটমামা সুকান্তকে জিগ্যেস করলেন, কী ভাগ্নে, দিন ঠিক করি?

সুকান্ত বলেছিল, করুন।

৩০ জানুয়ারি বিয়ের দিন ঠিক হল।

দিল্লির সব ব্যবস্থা পাকা করে ২২ জানুয়ারি কলকাতার ট্রেনে চড়ে বসল সুকান্ত। ওর কানে তখনও সঞ্জীব বোসের কড়া রসিকতাগুলো বাজছে।

ট্রেনের জানলা দিয়ে দূরের মাঠ-প্রান্তর দেখতে দেখতে সুকান্তর মনে হল, আর কিছুদিন পরই ও চন্দ্রিমাকে সঙ্গে নিয়ে কু-ঝিকঝিক করে ফিরবে। তারপর মধুচন্দ্রিমা।

খুশি-হুল্লোড় আর সানাইয়ের বাজনায় বিয়ে হয়ে গেল।

পরদিন নতুন বউ নিয়ে শ্রীরামপুর ফিরে এল সুকান্ত। সুধাকে ডেকে বলল, বাড়ির সকলের সঙ্গে তোর বউদির আলাপ করিয়ে দে।

সুধা মহা উৎসাহে ওর কাজে লেগে গেল। প্রথমে গোটা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাল মিনুকে। তারপর বাড়ির পিছনের বাগান।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও মিনুকে নিজের বন্ধু করে নিল। তবে সুধা সারাক্ষণ বকবক করলেও মিনু খুব কম কথা বলছিল।

সন্ধেবেলা মায়ের কাছ থেকে নতুন একজোড়া দুল দিয়ে এল সুধা। এই দুলজোড়া গড়ানো হয়েছে নতুন বউয়ের জন্য।

কিন্তু সেই দুলজোড়া চন্দ্রিমাকে পরাতে যেতেই ও আচমকা ঝটকা মেরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। শক্ত গলায় বলল, আমার কানের দুল খুলবে না।

সুধা একটু থতোমতো খেয়ে গেল প্রথমটা। তারপর সামলে নিয়ে বলল, তোমার বাড়ির দুলজোড়া খুলে তোমার কাছেই রেখে দাও। আর এই নতুন দুলজোড়া পরে নাও তোমার জন্যেই দাদা তৈরি করিয়েছে।

চন্দ্রিমা সুধার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই বসে রইল। আবার বলল, গয়না খুলব না। মা বারণ করে দিয়েছে।

সুধার ফরসা মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল। ওর কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে কান্না চেপে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

সুকান্ত তখন হেঁটে আসছিল এ ঘরের দিকে। সুধাকে ওরকমভাবে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে ও অবাক হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে মিনুকে দেখে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? সুধা ওরকমভাবে চলে গেল কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিনু বলে, কী জানি!

একটু পরে আবার বলল, আপনি আমার কাছে থাকুন। আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

সুকান্ত হেসে মিনুর কাছে এগিয়ে এল। আশপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। তখন ও চট করে মিনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বোকা মেয়ে! আপনি নয়–তুমি।

মিনু বলল, ঠিক আছে। আপনি নয়, তুমি…তুমি।

সুকান্ত একটু হেসে ঘর ছেড়ে বেরোল সুধার খোঁজে। নিজের ছোটবোনটাকে ও কম ভালোবাসে না!

কিন্তু সুধা কিছুই ভাঙল না দাদার কাছে। একদিন দেখেই কাউকে বিচার করা ঠিক নয়। ও জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, সত্যি বলছি, কিছু হয়নি। তবে বউদি দেখছি তোকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে চাইছে না।

শেষের কথাটা সুধা মজা করে বললেও সুকান্ত একটু অস্বস্তিতে পড়ল। কারণ সেই ফেরা থেকেই ও লক্ষ করেছে, চন্দ্রিমা প্রায় সবসময় ওর কাছে কাছে থাকছে। সুকান্তরও যে ইচ্ছেটা কম তা নয়। কিন্তু একটু ধৈর্যের পরীক্ষা তো দিতেই হবে।

সুকান্তর ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হল ফুলশয্যার রাতে।

ফুল দিয়ে সাজানো ঘরে ওরা দুজনে যখন একা হল তখন রাত সাড়ে বারোটা।

ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ। শুধু পুবের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। একটু পরেই সুকান্ত ওটা বন্ধ করে দেবে।

সুকান্ত মিনুর কাছাকাছি এসে বসল। নরম গলায় জিগ্যেস করল, ঠিকমত খেয়েছ তো?

মিনু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাসল।

সুকান্ত এর মানে বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, হাসির কী হল?

মিনু কোনও জবাব দিল না।

সুকান্ত এবার অন্য প্রসঙ্গে গেল।

আমাদের বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে?

মিনু ঘাড় নাড়ল।

আমাকে?

মিনু আবার ঘাড় নাড়ল। শাড়ির ভাজ থেকে একটা চিঠি বের করে সুকান্তর হাতে দিল। তারপর মুখ নামিয়ে বসে রইল।

অবাক হয়ে চিঠিটা নিল সুকান্ত। খুলে পড়লঃ

বৃষ্টি ভালোবাসি,
আকাশ ভালোবাসি,
সংসার ভালোবাসি।
আর তোমাকে ভালোবাসি।
–চন্দ্রিমা।

মুক্তোর মতো সুন্দর হাতের লেখা। তার চেয়েও সুন্দর চন্দ্রিমার মুখ।

ওর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে সুকান্ত বলল, চন্দ্রিমা, তোমার এই চার রকম ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখবে তো?

চন্দ্রিমা মুখ নীচু করেই বলল, হ্যাঁ, রাখব। মা বারবার করে বলে দিয়েছে।

সুকান্ত একটা ধাক্কা গেল। একটা অদ্ভুত চিন্তা কালসর্পের মতো ওকে ঘিরে ধরছিল। ও উঠে গিয়ে বারান্দার দিকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর ফিরে এল বিছানায়।

মিনুর একটা হাত চেপে ধরে চিঠিটা দেখিয়ে বলে, এ চিঠি কেন লিখেছ?

মা লিখিয়েছে। বলেছে ফুল দিয়ে সাজানো বিছানায় বসে তোমার হাতে দিতে।

তারপর কী করতে বলেছে? সুকান্তর বুকের ভেতরে একটা চাপা ঢিপঢিপ শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বলেছে শাড়ি-জামাকাপড় খুলতে। তুমি যা খুশি করো না কেন বাধা না দিতে।

যা খুশি বলতে?

সে আমি জানি না। মা বলেছে, আমায় কিছু করতে হবে না, যা করার তুমিই করবে।

তোমার মা তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে দেয়?

হ্যাঁ।

আর কী শিখিয়ে দিয়েছে?

বলেছে সবসময় তোমার কাছে কাছে থাকতে। তুমি ছাড়া আর কেউ টাকাপয়সা-গয়না চাইলে না দিতে।

সুকান্তর ভেতরে একটা ভাঙচুর চলছিল। ও মিনুর কাঁধ ধরে ওকে নিজের দিকে ফেরাল। জিগ্যেস করল, আজ কী বার?

মিনু সরাসরি ওর চোখে তাকিয়ে হেসে বলল, তিন বার।

আজ কত তারিখ?

মিনু কোনও উত্তর দিল না।

বলো, আজ কত তারিখ?

মিনু গোঁজ হয়ে বলল, জানি না। মা বলেছে কম কথা বলতে। নইলে সবাই ধরে ফেলবে।

সুকান্ত দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওদিকে দেখে বলো। কাল ৩১শে জানুয়ারি ছিল। তাহলে আজ কত তারিখ?

৩২শে জানুয়ারি। একত্রিশের পর বত্রিশ। মিনু সিরিয়াস মুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।

সুকান্ত আর পারল না।

মিনুকে ছেড়ে দিয়ে মুখ ঢাকল দু-হাতে।

ভগবান! কেন আমার এ সর্বনাশ করলে।

এরপর রাত চারটে পর্যন্ত মিনুকে অনেক প্রশ্ন করেছে সুকান্ত। আর মিনুর অদ্ভুত-অদ্ভুত সব উত্তর শুনেছে।

প্রশ্ন-উত্তরের পালা চলছিল আর সুকান্ত ভেতরে-ভেতরে আরও ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। একটা পাগল করা অনুভবের মধ্যে ডুবে যেতে-যেতে সুকান্ত বুঝতে পারছিল ভেসে ওঠার কোনও আশা নেই।

একসময় সুকান্ত জিগ্যেস করেছিল, কবে থেকে তোমার এরকম মাথা খারাপ?

উত্তরে সরল মুখে সুন্দরী মেয়েটা বলেছে, ক্লাস সেভেন থেকে। তবে মা বলেছে, ডাক্তার দেখালে ঠিক হয়ে যাবে।

তোমার কি মনে হয় তুমি সেরে উঠেছ?

মিনু হেসে বলল, এইবার তো সেরে উঠব। মা বলেছে, আর যেটুকু ইয়ে আছে সেটা বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে।

কীভাবে ঠিক হবে? সুকান্ত প্রশ্নটা করেছে কোনও কৌতূহল থেকে নয়। শুধু এটা দেখার জন্য যে, শেখানো তোতাপাখির বুলি মেয়েটা কতক্ষণ আওড়াতে পারে।

মা বলেছে, তুমি আদর করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শেষের কথাটা মিনু ঘুম-জড়ানো গলায় হাই তুলে বলল। তারপর হঠাৎই কাত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, ঘুমিয়ে পড়ল।

আবছা অন্ধকার ঘরে পাথরের মতো বসে রইল সুকান্ত। আর কোনওরকম অনুভূতি ওর ভেতরে কাজ করছিল না।

একসময় চন্দ্রিমার কাছ থেকে খানিকটা দূরে শরীর এলিয়ে দিয়েছিল ও। হাতের উলটো পিঠ মাথায় রেখে এলোমেলো অনেক কথাই ভাবতে চেষ্টা করছিল।

ছোটমামা কি চন্দ্রিমাদের পাড়ায় ভালো করে খোঁজখবর নেননি? সুকান্তও তো বিয়ের আগে ওকে দেখেছে, কথা বলেছে, ওর গান শুনেছে কই কিছু তো বুঝতে

পারেনি। সেই অবশ-করে দেওয়া গান এখনও সুকান্তর কানে লেগে আছে। কী প্রাণ ঢেলেই না গান করেছিল মেয়েটা! তখন ওকে সরস্বতী মনে হচ্ছিল। তা ছাড়া...।

পাখির ডাক কানে যেতেই সুকান্ত বুঝতে পেরেছে ভোর হয়েছে। ও উঠে এসেছে বারান্দায়। গতকাল রাতের কথাটা ও প্রাণপণে ভুলতে চাইছিল। চন্দ্রিমা অজান্তে ঠিকই বলেছে। গতকাল ছিল ৩২ জানুয়ারি। এমন তারিখ যা ক্যালেন্ডারে নেই। ওই দিনটা সুকান্ত নিজের জীবনের ক্যালেন্ডার থেকে মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি মুছে ফেলা যাবে?

এরপর অসম্ভব সময় শুরু হল।

সুকান্ত প্রথমে কথাটা জানাল ছোটমামাকে। ছোটমামার কাছ থেকে মা শোনামাত্রই বাড়িতে কান্নার রোল শুরু হয়ে গেল। তারই সঙ্গে কানাকানি, গুঞ্জন, ফিশফাশ।

সুকান্ত সারাটা দিন গুম হয়ে বসে রইল। সুধা ছলছলে চোখ নিয়ে মায়ের কাছে-কাছে থাকতে চেষ্টা করল। বাড়িতে হাজির আত্মীয়স্বজন নানান মন্ত্রণা আর পরামর্শ দিতে শুরু করল। কিন্তু এ অবস্থায় চন্দ্রিমাকে নিয়ে ঠিক কী যে করা উচিত সেটাই কেউ ঠিকমতো বলতে পারছিল না।

চন্দ্রিমা নিতান্ত উদাসীন হয়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল। ও সুকান্তর কাছ ঘেঁষে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সুকান্ত বিরক্তি দেখানোয় স্বামী-আজ্ঞা শিরোধার্য করে সরে গেছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খবরটা বাড়ি থেকে ছড়িয়ে গেল পাড়ায়। নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে যাওয়া প্রতিবেশীরা রীতিমতো অবাক হল। কেউ কেউ সহানুভূতি দেখাল, কেউ বা সুকান্তর ছোটমামাকে পাত্রী দেখার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলে দোষারোপ করল।

অনেক রাতে সুকান্তর সঙ্গে কয়েক প্রস্ত আলোচনার পর গুরুজনেরা সিদ্ধান্ত নিলেন, চন্দ্রিমাকে ওর বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসা হবে। সুকান্তকে সঙ্গে করে তারা চার-পাঁচজন এই অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে যাবেন।

ছোটমামা এর মধ্যেই পাড়ার উকিলের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে পরামর্শ করেছেন। তিনি বলেছেন, মেয়েটি যে অ্যাবনরম্যাল, তার প্রমাণ চাই। তা না হলে ডিভোর্স পাওয়ার অসুবিধে হতে পারে।

এইসব সমস্যা মাথায় করে পরদিন দুপুরে সুকান্তরা গেল চন্দ্রিমাদের বাড়িতে।

চন্দ্রিমাকে দেখেই ওর মা মুখে আঁচল গুঁজে কেঁদে ফেললেন।

সুকান্তর একটু-একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ওর নিজের ওপর দিয়েও তো ঝড় কম যায়নি!

চন্দ্রিমার মা-কে ওরা প্রায় ঘিরে ধরল। প্রশ্নে-প্রশ্নে ভদ্রমহিলাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলল।

চন্দ্রিমা মাকে আঁকড়ে বসেছিল বিছানায়। ওর বাবা করুণ মুখে ঘরের এক কোণে গদি ছেঁড়া একটা সোফায় চুপচাপ বসে রয়েছেন। চন্দ্রিমার দাদা বাড়িতে ছিল না।

তীব্র প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েও চন্দ্রিমার মা একটুও ভেঙে পড়লেন না। ভদ্রমহিলার স্থৈর্য, ব্যক্তিত্ব সুকান্তকে অবাক করছিল।

তিনি বারবার শুধু বলতে লাগলেন, চিকিৎসা করালে মিনু ঠিক হয়ে যাবে। ওর মাথায় এমন কিছু দোষ নেই।

কথাবার্তা ক্রমেই কথা কাটাকাটির চেহারা নিচ্ছিল। সুকান্ত নাটকের দর্শকের মতো সবকিছু দেখছিল, শুনছিল।

হঠাৎই কী ভেবে ও চন্দ্রিমার মায়ের কাছে এগিয়ে গেল, স্পষ্ট স্বরে বলল, মা, আমারই ভুল হয়েছে। আমি মিনুর ট্রিটমেন্ট করাব। যত যা-ই হোক, ও আমার স্ত্রী।

ছোটমামা স্তম্ভিত হয়ে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন। গুরুজনদের কে একজন যেন বললেন, সুকান্ত, তুমি এসব কী বলছ!

সুকান্ত কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে চন্দ্রিমার মাকে বলল, আপনি মিনুর চিকিৎসার সব কাগজপত্র-প্রেসক্রিপশান আমাকে দিন। আমি দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে বড়-বড় স্পেশালিস্ট দেখাব। দরকার হলে আমেরিকা নিয়ে যাব ওকে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, ও সেরে উঠবেই।

ভদ্রমহিলা হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। সুকান্তকে একেবারে জড়িয়ে ধরে মাথায় বারবার হাত বোলাতে লাগলেন। কান্না-জড়ানো গলায় বললেন, বাবা, তুমি মানুষ নও, দেবতা। তুমি মানুষ নও, দেবতা।

ভদ্রমহিলা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। একটু পরেই দুটো মোটা ফাইল নিয়ে ফিরে এলেন। সুকান্তর হাতে ফাইল দুটো দিয়ে বললেন, এই নাও, বাবা। এতে ওর বারো বছরের সমস্ত ডাক্তারি কাগজপত্র আছে।

কথা শেষ করেই ভদ্রমহিলা সুকান্তর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। কাঁদতে লাগলেন অসহায়ের মতো।

সুকান্ত পা সরিয়ে নিয়ে মেডিক্যাল ফাইল দুটো এগিয়ে দিল ওর ছোটমামার দিকে। আবেগহীন গলায় বলল, এই দুটো নিয়ে গিয়ে আজই ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলুন। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর হয় না।

তারপর অপরিচিতের চোখে চন্দ্রিমার মা ও বাবার দিকে তাকিয়ে সুকান্ত বলল, আপনারা শয়তানি করে আমার লাইফটা শেষ করে দিয়েছেন। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারছি না। যদি ভালোয় ভালোয় মেয়ের ডিভোর্স করিয়ে নেন, ভালো। নইলে কোর্টে দেখা হবে।

সুকান্তর ভেতরটা অদ্ভুত আক্রোশে টগবগ করে ফুটছিল। ওর মাথার শিরা দপদপ করছিল।

চন্দ্রিমার মা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন, বাবা, আমার মেয়েটার কী হবে?

ও এখানেই থাকবে।

ছোটমামা একটা বড় সুটকেস চন্দ্রিমার মায়ের হাতে দিয়ে বললেন, আপনার মেয়ের গয়নাগাঁটি শাড়ি-জামাকাপড়–আপনারা যা যা দিয়েছেন, সব এতে

আছে। ভালো করে দেখে নিয়ে এই কাগজটায় সই করে দিন।

গোটা বাড়িটাকে বিধ্বস্ত শ্মশান করে দিয়ে সুকান্তরা ফিরে এল।

তারপর কদিন ধরে চলল উকিলের কাছে ছুটোছুটি।

ব্যাপারটাকে মোটামুটি একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে সুকান্ত ছন্নছাড়া মন নিয়ে চড়ে বসল দিল্লির ট্রেনে।

ট্রেন গাছপালা-মাঠঘাটের মাঝখান দিয়ে ছুটছিল। সুকান্তর মনে পড়ল চন্দ্রিমার কথা। সবকিছু যদি ঠিকঠাক হত তাহলে এখন ওর পাশে চন্দ্রিমার বসে থাকার কথা ছিল।

সুকান্তর মন খারাপ লাগছিল। আর একইসঙ্গে অস্বস্তি হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে, কী করে ও অফিসের সহকর্মীদের মুখোমুখি হবে। কী করে রামুদাকে দেওয়া ক্যাটারিং-এর অর্ডার ক্যানসেল করবে। আর সাজানো ফ্ল্যাটটা নিয়েই বা ওর এখন কী করা উচিত।

ট্রেনের জানলা দিয়ে সুকান্ত গাছপালা দেখছিল আর এসব কথা ভাবছিল। চন্দ্রিমার মা ওকে বলেছিলেন, তুমি মানুষ নও, দেবতা। সুকান্ত কি সেই কথার মর্যাদা রাখতে পেরেছে? ও কি মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ডাক্তারি কাগজপত্রগুলো হাতিয়ে নেয়নি? কিন্তু ওঁরাও তো লুকিয়ে পাগল মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সুকান্তর সঙ্গে!

মিনুকে ঘিরে সুকান্ত অনেক দূর পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল। এখন ও স্বপ্নের রঙিন টুকরোগুলোকে মনে-মনে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল। ওগুলো শিমুল তুলো হয়ে ভেসে যাচ্ছিল বাতাসে। আর ট্রেন ছুটে চলেছিল অক্লান্তভাবে।

.

রাতে ফ্ল্যাটে পৌঁছে মালপত্র এদিক-ওদিক রেখে সুকান্ত কিছু না-খেয়েই শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। ডবল-বেড বিছানায় খালি অংশটা ওকে বারবার বিব্রত করছিল। অন্ধকারে প্রায় ঘণ্টাখানেক এপাশ-ওপাশ করার পর ও ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতে স্বপ্নের ভেতরে মিনু ওকে গান শোনাল : রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব..

কখনও ওর মনে হল, মিনু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে! এ কী, তুমি কাঁদছ কেন?

সুকান্ত স্বপ্নের মধ্যেই কেঁদে ফেলল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ও এদিক-ওদিক ফেলে রাখা সুটকেসগুলো টেনে নিয়ে এল বিছানার কাছে। ওগুলো খুলে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করল।

খালি ফ্ল্যাটে ছোটখাটো প্রত্যেকটা শব্দ কেমন ফাপা শোনাচ্ছিল। সুকান্তর কিছু ভালো লাগছিল না।

হঠাৎই একটা ধুতির ভাঁজ থেকে একটা কাগজ খসে পড়ল বিছানার। কাগজটা তুলে নিয়ে দেখল সুকান্ত।

মিনুর সেই চিঠি

বৃষ্টি ভালোবাসি,
আকাশ ভালোবাসি,
সংসার ভালোবাসি,
আর তোমাকে ভালোবাসি।
–চন্দ্রিমা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুকান্ত। মিনু বলেছিল, এই চাররকম ভালোবাসা দিয়ে ওকে ঘিরে রাখবে। ঘরের চার দেওয়ালের দিকে তাকাল সুকান্ত। মিনুকে সঙ্গে নিয়ে এলে এই দেওয়ালগুলো ভালোবাসা হয়ে যেত।

সুকান্তর হঠাৎই কেমন জেদ চেপে গেল।

রামুদার অর্ডার ও ক্যানসেল করবে না। মিনুকে ও এখানে নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল ফাইল দুটোও। দিল্লিতে অনেক বড়-বড় ডাক্তার আছে। মিনুকে ভালো করে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখবে সুকান্ত।

মিনুর মায়ের সেই কথাটা ওর মনে পড়ল ও তুমি মানুষ নও, দেবতা।

মানুষ থেকে হয়তো দেবতা হওয়া যায় না, কিন্তু অ-মানুষ থেকে তো মানুষ হওয়া যায়!

সুকান্ত একবার সেই চেষ্টাই করে দেখবে।

# কুয়াশা, অন্ধকার এবং...

**কুয়াশা, অন্ধকার এবং...**

বৃষ্টি। তবে কুয়াশা আর অন্ধকার যতটা ঘন বৃষ্টি ততটা নয়। ঝিরঝিরে মতন। গাড়ির উইন্ডশিল্ডে বৃষ্টির বাচ্চা-বাচ্চা ফোঁটাগুলো যেন খেলার ছলে দস্যিপনা করে ছিটকে পড়ছিল।

শীতের রাতে কুয়াশা আর অন্ধকার থাকাটা স্বাভাবিক। শুধু বৃষ্টিটাই হিসেবের বাইরে।

সামনের কাচের ওপরে ওয়াইপার চলছিল। একইসঙ্গে হেডলাইটের আলো ছিটকে যাচ্ছিল অন্ধকার আর কুয়াশার দিকে।

আমার একহাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাতে সিগারেট। জানি, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা বেশ কিছুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি।

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

অন্ধকার রাত। গাঢ় কুয়াশা। জমাট শীত। হালকা বৃষ্টি। কালো ফিতের মতো রাস্তা। হেডলাইটের হলদে আলো।

সবমিলিয়ে বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই রাস্তা ধরে আজীবন গাড়ি চালাই। এমনকী জীবনের পরেও।

ভাবের ঘোরে বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। সেইজন্যেই মেয়েটাকে প্রথমে দেখতে পাইনি। পাশের গাছপালার ফাঁক থেকে কোন মুহূর্তে যেন আচমকা

ছিটকে চলে এসেছে গাড়ির সামনে।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু-হাত সামনে বাড়ানো। বড়-বড় আয়ত চোখে নিছক ভয়।

কী করে যেন শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষতে পারলাম।

বিশ্রী শব্দ হল। ভেজা রাস্তায় গাড়ির চাকা পিছলে গেল। কপাল ভালো যে, আমার পেছনে কোনও গাড়ি ছিল না। থাকলে সে নির্ঘাত আমার গাড়িতে ধাক্কা মেরে বসত।

মেয়েটি টাল সামলাতে গিয়ে গাড়ির বনেটের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল। হেডলাইটের আলো ওর কোমরের কাছটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। থুতনির নীচে আর গালে আলো পড়ে চোখের কোটর দুটো অন্ধকার গর্তের মতো লাগছিল।

হঠাৎ করেই যেন একটা ঠান্ডা শিরশিরে ভাব আমাকে ছুঁয়ে গেল।

মেয়েটা আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিল। প্রায় ছুটে চলে এল গাড়ির জানলার কাছে। কাচের ওপর শব্দ করে টোকা দিল কয়েকবার।

একমুহূর্ত কী ভেবে আমি ঝুঁকে পড়ে জানলার কাচ সামান্য নামালাম।

মেয়েটি হাত দিয়ে বৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করতে করতে বলল, দরজাটা একটু খুলুন। না–প্লিজ…।

ওর মুখের একপাশে হেডলাইটের আলোর ঠিকরে আসা আভা। বাকিটা ছায়া-ছায়া, অন্ধকার। তারই মধ্যে কয়েকটা জলের ফোঁটা চিকচিক করছে।

কী ভেবে দরজাটা খুলে দিলাম। আমার দিকে জানলার কাচ নামিয়ে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলাম।

ও চট করে উঠে বসল আমার পাশে। দরজা বন্ধ করে ওড়না দিয়ে মুখটা মুছে নিল। তারপর জানলার কাচটা তুলে দিল।

লক্ষ করলাম, মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকটা পথ ছুটে এসেছে। ওড়নার আঁচল দিয়ে নাকের কাছে বাতাস করল। বোধহয় সিগারেটের গন্ধে

অস্বস্তি হচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আড়চোখে মেয়েটাকে দেখলাম।

হলদে আর লাল চুড়িদার। সেইরকমই একটা ওড়না। জামার ওপরে কালচে রঙের একটা স্লিভলেস সোয়েটার। বয়েস আটাশ কি তিরিশ। বেশ সুন্দর দেখতে। প্রসাধন তেমন না থাকলেও শরীর থেকে একটা হালকা গন্ধ বেরোচ্ছে।

হঠাৎই মনে হল, আমি যেন সিনেমার ভেতরে ঢুকে পড়েছি। কারণ, সিনেমা-টিনেমায় এরকম হয়।

চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলাম, এই রাতে হঠাৎ এভাবে কোথা থেকে এলেন?

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে তাকাল আমার দিকে কেন? জিগ্যেস করছেন কেন?

ওর কথার সুরে একটা চাপা ভয় টের পেলাম। সেইসঙ্গে চোখের নজরে দু-চারফোঁটা সন্দেহ।

আমি হাসলাম ও ভয় নেই–আমি পুলিশের লোক নই। যেভাবে এই রাতে কুয়াশা আর বৃষ্টির মধ্যে আপনি হঠাৎ করে আমার গাড়ির সামনে এসে পড়লেন–তাতে প্রশ্নটা করে খুব একটা অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয় না।

কয়েক মুহূর্ত ঠোঁট টিপে বসে রইল। তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এখনও বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। বুক ওঠা-নামা করছে।

আমি আবার কথা বললাম, খুব পার্সোনাল কিছু হলে বলার দরকার নেই। রাস্তার বাঁকে ঝোঁপের গোড়ায় একটা কুকুর চোখে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় জন্তুটার সবুজ চোখ ঝিকিয়ে উঠল। আমি মুখ ফেরালাম মেয়েটার দিকে : যাকগে, আমার নাম রনিত। আপনি কোন দিকে যাবেন?

আপনি যেদিকে যাচ্ছেন। আমি আসলে এখান থেকে পালাতে চাই–যতদূরে পারা যায়। আমার নাম সোনাল।

বাঃ, বেশ অদ্ভুত নাম তো! তারিফ করে বললাম, তা কার কাছ থেকে পালাতে চান? হাজব্যান্ডের কাছ থেকে?

আবার চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকাল : কী করে বুঝলেন?

কেতার হাসি হাসলাম, বললাম, আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। বছর দুয়েক হল এই গুণটা গজিয়ে উঠেছে। তবে কীভাবে হল সেটা এগজ্যাকুলি বলতে পারব না।

আমার হাজব্যান্ডটা একটা জানোয়ার– কথাটা বলার সময় ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে বেঁকাল সোনাল। ওর চোয়াল শক্ত হল ও পারে না এমন কোনও কাজ নেই। মানে, পারত না এমন কোনও কাজ নেই। আপনি অচেনা মানুষ–তাও বলছি। দিন-রাত নেশা করত, হাত তুলত, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করত…।

সোনালের দিকে তাকালাম।

এরকম ফুটফুটে কোমলতা মাখা মেয়ের গায়ে কী করে কেউ হাত তোলে।

..দিন আর রাতগুলো এত বিশ্রীভাবে কাটত যে, মনে হত আমি আর বেঁচে নেই। প্রেতাত্মার মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি…।

আর এখন? কথার পিঠে কথা বলার ছলে প্রশ্নটা করলাম।

এখন তো মুক্ত। মানে টোটাল ফ্রিডম। এখন আমি যা খুশি তাই করতে পারি–।

তাই? জানতে চাইলেন না তো আমি কোথায় যাচ্ছি।

জেনে কী হবে? নতুন জীবন শুরু করার সময় এসব ফালতু প্রশ্নের কোনও দাম নেই…।

আমি অবাক হয়ে সোনালকে দেখলাম। একটু আগে ও ভয়, সন্দেহ, উৎকণ্ঠায় ভাসছিল। আর এখন বেপরোয়া, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত। ও সত্যি, না মায়া? নাকি আমাকে ঘিরে ওর অন্য মতলব আছে? থাকলে থাক। কারণ, এখন আমার ভয়-ডর বলে আর কিছু নেই।

কিন্তু যেভাবে ও আমার গাড়ির সামনে এসে পড়েছে তাতে মনে হয় না ব্যাপারটা সাজানো। তা ছাড়া এ-রাস্তা ধরে আমি প্রায়ই রাতের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাই। আগে কখনও তো ওকে দেখিনি!

আপনার হাজব্যান্ড এখন কোথায়?

নেই।

নেই মানে?

শেষ। দ্য এন্ড।

মেয়েটা কি ওর স্বামীকে খুন করেছে নাকি?

আমার কোঁচকানো ভুরু দেখে কী যেন ভাবল সোনাল। হেসে বলল, আমি নিজেই জানতাম আমার মধ্যে এত শক্তি আছে। কী করে যে পারলাম কে জানে! বোধহয় আমি নয়–আমার ভেতরের আত্মা কিংবা প্রেতাত্মা আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে।

কী কাজ?

বুঝে নিন। এর বেশি বলব না।

আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল। আড়চোখে সোনালকে বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর কথার মধ্যে কতকগুলো শব্দ আমার কানে বাজছিল।

একা মেয়ে। এই শীতের রাতে কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ করে কোথা থেকে এল ও? আর ঠারেঠোরে যা বলতে চাইছে তাতে একটা মারাত্মক কাণ্ড করে এসে এইরকম নির্লিপ্ত আর উদাসী থাকছে কেমন করে?

আমার ভীষণ অবাক লাগল। মনের ভেতরের কাঁটাটা খচখচ করতে লাগল।

আপনি থাকেন কোথায়? ওকে জিগ্যেস করলাম।

প্রশ্নটা অনেকটা পুলিশের মতো শোনাচ্ছে।

আগেই তো বলেছি আমি পুলিশ নই।

আমার দিকে পূর্ণ চোখে তাকাল। তাকিয়ে কী খুঁজল জানি না। তারপর: যেখানে আপনার গাড়িতে প্রায় চাপা পড়ছিলাম, সেখান থেকে বড়জোর দু-আড়াই কিলোমিটার। সেখানে আমাদের সাজানো দোতলা বাড়ি। পুরোটা ছবির মতন। শুধু ওই লোকটাই ছিল কলঙ্ক। একটু চুপ করে রইল। ওড়নার কাপড়ে হিজিবিজি কাটল। তারপরঃ ওই বাড়িতে আমি আর থাকতে পারব না…।

আমি হঠাৎই রেডিয়োটা অন করে দিলাম।

শুরু হয়ে গেল গান আর কথার কচকচি। তৃতীয় কারও গলা আমাকে যেন ভরসা দিল।

এবারে আপনার গল্পটা শুনতে পারি? সোনাল জিগ্যেস করল।

আমি চুপ করে রইলাম। চোখ রাস্তার দিকে।

বৃষ্টি এখন আর নেই–তবে রাস্তায় ভিজে দাগ রয়েছে। ভিজে দাগ থাক বা না থাক, এখন রাস্তাই আমার জীবন।

কী, বলবেন না? আমারটা তো হাঁ করে শুনলেন—

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। পুরোনো স্মৃতি ঝিলিক মেরে গেল মাথার ভেতরে।

সেই চেনা গল্প। ওর দিকে না থাকিয়েই বললাম, বড়লোক বউ। স্বামী গরিব, তবে সৎ পরিশ্রমী মানুষ। দিন-রাত শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। আমি নাকি অপদার্থ। শিক্ষিত হলেও গণ্ডমূর্খ। ফুটোপয়সার মুরোদ নেই।

একদিন রাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমাকে। ওর বাবার দেওয়া বাড়ি–তাই আমাকে গেট আউট বলার অধিকারও ছিল। আমারও যে কী হল! দুঃখে অভিমানে বোকার মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এই গাড়িটা নিয়ে–ওর বাবার দেওয়া গাড়ি। আক্ষেপে স্টিয়ারিং-এ চাপড় মারলাম : আমার লাইফটা একেবারে ইউজলেস ছিল…আর একইসঙ্গে হোপলেস…।

হঠাৎই হেসে উঠল সোনাল।

হাসছেন কেন?

না, একটা কথা মনে হল–তাই।

কী কথা?

মানে…দুজন হোপলেস একজায়গায় হলে একটু-আধটু হোপ তৈরি হতে পারে কি না…।

বেশ বলেছেন। এরকম কথা শুনলে ভালো লাগে নতুন করে আবার বেঁচে উঠতে ইচ্ছে করে। জীবনের জন্যে মায়া জাগে।

সোনাল মাথা নীচু করল। আস্তে আস্তে বলল, আপনি হয়তো ভাবছেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটা সিরিয়াস ক্রাইম করে এসে এত কুলি কী করে কথা বলছি। একটু চুপ করে থেকে বলল, আসলে আমার হাজব্যান্ড আমার চোখে বহুদিন আগেই নেই হয়ে গিয়েছিল। ওর থাকা না থাকায় আমার লাইফের কোনও ডিফারেন্স নেই। তা ছাড়া আমার এখনকার লাইফটাও তো ঠান্ডা বরফ আর পাথরের মতো। মানে, মৃত্যু যেমন হয়…।

দূরে একটা রোড সাইন চোখে পড়ল : কার্ভ অ্যাহেড। তারপরই রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে গেছে।

এসে গেছি। আর কয়েকসেকেন্ড।

সোনালকে বললাম, গাড়ি সাইড করছি। আপনি এখানটায় নেমে পড়ুন।

কেন? কপালে ভাঁজ ফেলে আমার দিকে তাকাল ও।

গাড়ির গতি কমালাম ও এরপর আমার সঙ্গে গেলে আপনার বিপদ হবে–গাড়ি আর থামানো যাবে না–তাই।

কীসের বিপদ?

প্লিজ, আমার কথা শুনুন…নেমে পড়ুন।

না। জেদি গলায় বলল মেয়েটা, আগে বলুনকীসের বিপদ।

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম : সোনাল, বছরদুয়েক আগে…সেই যে আমি রাগ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম… সেই রাতটা ছিল অমাবস্যার রাত। আজও তাই…।

খেয়াল করলাম, স্টিয়ারিং-এর ওপরে আমার বাঁ-হাতের পাতাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডান হাঁটু আর উরু দেখা যাচ্ছে না।

সোনাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। এফ. এম. রেডিয়োতে ঝিম্ফাক মিউজিকের সঙ্গে গান বাজছে।

…সেই শীতের রাতে এই রাস্তায় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ওই যে রোড সাইনটা দেখা যাচ্ছে–ওটা পেরিয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে…তারপর…।

আমার বাঁ-দিকের অনেকটা অংশ আচমকা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ব্যাপারটা সোনালের চোখে পড়ল। না পড়ে উপায়ও ছিল না।

ও চোখ বড় বড় করে ফেলল। ভয়ংকর এক চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই। গাড়ি আর থামানো যাবে না।

একটা লোডেড ট্রাকের সঙ্গে আমার গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সঙ্গে-সঙ্গে সব শেষ। তারপর থেকে…।

সোনাল এখনও চিৎকার করে চলেছে। এফ. এম. রেডিয়ো বাজছে। রোড সাইনটা কাছে এসে গেছে।

তারপর থেকে প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে আমি এ-রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে যাই। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা, শীত পরোয়া না করে ছুটে যাই ওই অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়। মারা যাওয়ার পর থেকে এটাই আমার জীবন, সোনাল…।

কী মনে হওয়ায় গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরারটা আমার দিকে ঘোরালাম।

যা ভেবেছি তাই। আমার মুখের বাঁ-দিক, গলা–সব মিলিয়ে গেছে। শুধু ডানদিকের গাল, দুটো চোখ, কপাল আর চুল সাপের ফণার মতো শূন্যে ভেসে

আছে।

সোনাল ছুটন্ত গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করছে, আর পাগলের মতো চিৎকার করছে।

ডানদিকে বাঁক নিয়ে এগোতেই ছুটে আসা ট্রাকের ঘোলাটে হেডলাইট চোখে পড়ল আমার।

সোনাল তখন হিস্টিরিয়ার রুগির মতো বাঁচাও! বাঁচাও! বলে চিৎকার করছে। গাড়ির উইন্ডশিল্ডের কাঁচে হিংস্রভাবে ঘুসি মারছে।

আশ্চর্য! এই মেয়েটাই না একটু আগে বলছিল, আমি আর বেঁচে নেই। প্রেতাত্মার মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি…।

এখন ওর সামনে সত্যি-সত্যি সেই সুযোগ এসে গেছে। এখন থেকে ও আর আমি একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব।

আমার শরীরের বাকি অংশগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

ট্রাকটা ক্ষিপ্ত গন্ডারের মতো ছুটে আসছে।

আমি অদৃশ্য আঙুলের চাপে গাড়ির হর্নটা বাজাতে শুরু করলাম।

শেষ মুহূর্তটার জন্যে আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

# ছলাবউ কলাবউ

**ছলাবউ কলাবউ**

সত্যি বলছি স্যার, বউটা আমার যাকে বলে একেবারে স্পেশাল ছিল। ছিল মানে পাস্ট টেন্স। আমাদের ভগবান লোকটা বড় মজার। একদিনের মধ্যে আমার ডাগর সোমত্ত বউটাকে প্রেজেন্ট টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স করে দিল। কী বললেন? না, স্যার সত্যি বলছি–আপন গড, ঋতুপর্ণাকে আমি খুন তো দূরের কথা, দুইনি পর্যন্ত। ছুঁইনি মানে ক্ষতি করার জন্যে দুইনি। ওই আদর-টাদর করার সময় ছুঁতে হয়েছে। না ছুঁয়ে আবার আদর করা যায় না কি!

দুঃখের কথা কী জানেন? বউটা স্বর্গলোকে গিয়েও আমাকে রেহাই দিল না। ওর জন্যেই আমাকে আপনাদের এই থানায় আসতে হল–থানা দেখতে হল, আবার শ্মশানও দেখতে হবে। সবই আমার কপাল!

ঋতুপর্ণা ছিল ভারি অদ্ভুত। প্রবল ঋতুমতী। পুরুষগুলো বোধহয় ওর গন্ধ পেত। সবসময় ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করত। তবে ও বেশিরভাগ সময়েই লোকগুলোকে পাত্তা দিত না। অবশ্য ওদের একেবারে বিদেয় করতেও চাইত না। কারণ, ওরা চলে গেলেই তো ঋতুর বাজারদর পড়ে যাবে।

যখন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তখন আমাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাই ভেবেছিল, কোষ্ঠীর ছকের কী দারুণ মিল। বিয়ে তো নয়, যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বিয়ের পরপরেই আমার বিধবা পিসিমা ঋতুকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, আহা, বউ তো নয়, কলাবউ!

শুনে আমি তো স্যার বেশ তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। দুগগাপুজোর সময় কলাবউ দেখে আসছি সেই বাচ্চা-বয়েস থেকে। তা কলাবউ বলতে লালপেড়ে

সাদা শাড়ি আর একহাত ঘোমটা শুধু এইটুকুই বুঝি। কাপড় খুললে তো স্রেফ কলাগাছ! ঋতুর সঙ্গে কলাবউয়ের মিলটা কোথায় কে জানে!

তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি ঋতুপর্ণা কী জিনিস। সত্যি, আমার পিসিমা জ্যোতিষী ছিলেন, স্যার। ঋতু তো শুধু কলাবউ ছিল না–একেবারে ছলাবউ কলাবউ। এত ছলাকলা জানে–মানে, জানত। ওরও সেই আধহাত ঘোমটা দেওয়ার অভ্যেস ছিল–গুরুজন। বা বাইরের লোকের সামনে–ঠিক যেন কলাবউ। কিন্তু ওই ঋতুই আবার আধহাত ঘোমটার নীচে সাতহাত খ্যামটা নাচত। আর কাপড় খুললে কলাবউয়ের মতো শুধু কলাগাছ তো নয়, একজোড়া মোচা তার সঙ্গে ফ্রি।

তবে ওই মোচাই সারকা–টলা কখনও হয়নি। সে ওর জন্যে, না আমার জন্যে, তা জানি না। আমার কলাবউ নামেই কলাবউফলের বেলায় কাচকলা। কিন্তু স্যার তা নিয়ে কোনও দুঃখ ছিল না আমার। শুধু মাথার ভেতরে মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলে উঠত। ঋতুর কাণ্ডকারখানা দেখতাম, একা-একা ঘরময় ঘুরে বেড়াতাম, আর মাথার ভেতর দুনিয়াটা চড়চড় করে জ্বলত, পুড়ত।

এই করে স্যার দশটা বচ্ছর কাটল–দশটা বচ্ছর! আমি অফিস যাই, ফিরে আসি। ঋতু ওর বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকে, আমাকে যেন স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না। শুধু মাঝে-মাঝে মাঝরাতে কলাগাছে জ্বালা ধরলে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আঁচড়ে-কামড়ে দেয়। শাস্ত্র আমাদের মিথ্যে বলেনি, ইনস্পেক্টরসাহেব। ঋতু ছিল একেবারে হস্তিনী টাইপের। আর হাতির সঙ্গে কলাগাছের রিলেশান তো সব্বাই জানে।

তো একদিন–তা কতদিন হবে? বোধহয় বছরখানেক আগে ঋতু বাড়ি ফিরল টিপসি হয়ে। আমি দরজা খুলতেই আমাকে ডার্লিং বলে একেবারে জাপটে ধরে চিকাৎ চকাৎ করে হাফডজন চুমু খেল। আমার ভীষণ ঘেন্না করছিল, গা রি-রি করছিল। আর মাথার ভেতরে ধুনিটা তখনও জুলছিল।

হঠাৎ করে কী যে হয়ে গেল। সেই ধুনিটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের লাল জিভগুলো লকলকিয়ে উঠল। এক ধাক্কা দিয়ে ছিটকে দিলাম ঋতুকে। সত্যি বলছি, ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি গলা টিপে ওকে খতম করে দিই। কিন্তু না। আমি নির্বিরোধী ছাপোষা মানুষ। কাউকে খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যার। যদি আমিই ঋতুকে কাল রাতে খুন করেছি বলে আপনি ভেবে থাকেন, তবে সেদিনই

তো ওকে আমি খতম করে দিতে পারতাম। সত্যি বলছি স্যার, খুনের কথা শুনলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। তাই সেদিন ঋতুকে কিছু বলিনি। বড়লোকের ইংরেজি-জানা ফুরতি-ফারতা করা বাঁজা বউ পার্টি-ফার্টি করে একটু-আধটু মাল খেয়ে ফিরবে এ আর আশ্চর্য কী!

না, ওকে কিছু বলিনি। তবে ওই যে বললাম, মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। তাই সেটা নেভানোর জন্যে অন্য একটা কেলেঙ্কারি করে ফেললাম। তার জন্যে মার্জনা চাইছি, স্যার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি। আমরা মানে, আমি আর ঋতু–দু-জোড়া বদরি পাখি পুষতাম। না, এখন আর একটাও নেই–সবকটা মরে গেছে। শুধু হা-হা খাঁচাটা পড়ে আছে। তো সেদিন রাতে মুরগির মাংস রান্না করেছিল অতসী–আমাদের রান্নার লোক। ডাইনিং-টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ছিল রাতের খাবার। একটা গোলাপি রঙের কারুকাজ করা বড় চিনেমাটির বাটিতে ঢাকা দেওয়া ছিল গরম মুরগির ঝোল। কী বলছেন? মুরগির মাংসের সঙ্গে বরি পাখির কী রিলেশান? আছে, আছে– আর-একটু বললেই বুঝতে পারবেন।

ঋতুর এই কাণ্ডের পর আমার মাথার ভেতর কী যেন একটা হয়ে গেল। টেবিল থেকে গরম মাংসের পাত্রটা তুলে নিয়ে চলে গেলাম একটু দূরে, ঘরের এককোণে রাখা বদূরি পাখির খাঁচার কাছে। মাংসসমেত গরম ঝোল হুড়হুড় করে ঢেলে দিলাম মাখনরঙের পাখিগুলোর গায়ে। তারপর চিনেমাটির পাত্রটা ধরে মেঝেতে এক আছাড়।

পাখিগুলো কিচিরমিচির করে ছটফটিয়ে উঠল। দুটো পাখি গরম মাংসের ঝোলে স্নান করে নেতিয়ে পড়ল। আর ঋতু ওই টিপসি অবস্থাতেই এক চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি কিন্তু ওকে একটি কথাও বলিনি।

ওর চিৎকারে যখন ফ্ল্যাটের বনমালীবাবু আর তার হোঁতকা বউ ছুটে এলেন আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়, তখন আমি বললাম যে, অসাবধানে আমার হাত থেকে মাংসের পাত্রটা পাখির খাঁচার ওপরে পড়ে গেছে। আর ঋতু তো একটু নার্ভাস টাইপের, তাই…।

ওঁরা ভদ্রতা দেখিয়ে দু-চারটে কথা বলে চলে গেলেন।

ব্যস, সেদিন থেকেই আমার প্রতিবাদের শুরু। তবে সবসময় যে ভেবেটেবে কিছু করতাম তা নয়। যেমন একদিন হঠাৎ করে কী খেয়াল চাপল, বাজার থেকে একটা জ্যান্ত মুরগি কিনে নিয়ে এলাম। ওটা দেখে ঋতু ঠাট্টা করে বলল, কী ব্যাপার, বাড়িতে কি পোলট্রি খুলবে নাকি? আমি কোনও জবাব না দিয়ে শুধু হাসলাম।

তারপর, সেদিন রাতে, মুরগিটাকে আমাদের শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলের পায়ার সঙ্গে একটা হাতচারেক লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। ওটা ঘরের মেঝেতে দিব্যি চরে বেড়াতে লাগল। ব্যাপার। স্যাপার দেখে ঋতু তো রেগে আগুন। বলল, এসব কী পাগলামি শুরু করেছ! আমি বললাম, হানি, আসল পাগলামি তো এখনও শুরু হয়নি। দ্যাখো না, কীরকম মজা হবে। ও হ্যাঁ, আজ ডক্টর আহুজার পার্টি কেমন জমল? ঋতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের নীচে কী একটা মোলায়েম মলম মাখতে মাখতে বলল, ইট ওয়াজ আ ফিয়াসকো। একদম গুবলেট।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি যে ঝুঁকে পড়ে খাটের তলা থেকে আমার হকিস্টিকটা বের করে নিয়েছি, সেটা ও প্রথমে ঠিক খেয়াল করেনি। ছেলেবেলায় এই হকিস্টিকটা নিয়ে আমি স্কুলের মাঠে হকি খেলতাম।

তো হকিস্টিকটা আমার হাতে দেখে ঋতু মলম লাগানো বন্ধ করে আয়নার মধ্যে দিয়ে চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আমার হকিস্টিক বাগিয়ে ধরার জঙ্গি ভঙ্গি দেখে ও ভয় পেয়েছে।

না, না ইন্সপেক্টরসাহেব, হকিস্টিক দিয়ে ওকে একটুও মারিনি। আপনিও ঠিক ঋতুর মতোই আমাকে ভুল বুঝলেন। ঋতুকে অবাক করে দিয়ে আমি হকিস্টিক চালাতে শুরু করলাম মুরগিটার ওপরে।

ওটা ডানা ঝাঁপটে কঁক কঁক শব্দ করে এদিক-ওদিক পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পালাবে কোথায়! পায়ে তো দড়ি বাঁধা। প্রথম দুটো হিট আমি মিস করলাম, তবে তিন নম্বরটা সোজা গিয়ে লাগল মুরগিটার পাঁজরে। একটা ওঁক শব্দ করে ওটা ছিটকে গেল শূন্যে, কিন্তু দড়িতে টান পড়তেই মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

আর তখন আমি ঋতুর চোখের সামনেই ওটাকে পাগলের মতো পিটতে শুরু করলাম–যেমন করে ধোপারা মুগুর দিয়ে কাপড় কাঁচে।

ঘরের মেঝেটা একেবারে যা-তা হয়ে গেল। পালক, রক্ত, মাংস, চটচটে নোংরা–সব একেবারে মাখামাখি। আমার মাথার ভেতরে বিকট স্বরে কতকগুলো দাঁড়কাক ডাকছিল। সেইজন্যেই বোধহয় ঋতুর চিৎকার আমি শুনতে পাইনি। আমি ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে লেপটে বসে পড়েছিলাম। অল্প-অল্প হাঁফাচ্ছিলাম। হকিস্টিকটা তখনও হাতে ধরা। সেই অবস্থায় কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আমি ঋতুর দিকে তাকালাম।

ওর মুখচোখ ফ্যাকাসে। বয়েসটা যে ভালো জায়গায় নেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

একটু পরে ও গালিগালাজের তুবড়ি ছোটাল। আমি যে একটা পাগল, জানোয়ার, অমানুষ সে-সব বিস্তারিতভাবে আমাকে জানাল। অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখ চলল। তারপর যখন বলল, আমাকে পুলিশে দেবে, তখন আমি হেসে বললাম, ডার্লিং, মুরগিটার বদলে যদি তোমার এই হাল করতাম, তবে তুমি বা অন্য কেউ পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারতে! মুরগি পিটিয়ে মারলে সেটা দোষের নয়।

আপনিই বলুন, স্যার, আমি কি ভুল বলেছি?

ঋতু সে-রাতে অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিল, যা-নয়-তাই বলে গালিগালাজ করেছিল আমাকে, কিন্তু আমি একটি কথাও বলিনি।

ঘরটা পরিষ্কার করার সময় আঁশটে গন্ধে ঋতু বমি করে ফেলেছিল। আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদ-তারা দেখছি, আর ছেলেবেলার কথা ভাবছি।

এখন তো বুঝতেই পারছেন, ইনস্পেক্টরসাহেব, খুন করার হলে সেদিনই ওকে আমি খুন করে ফেলতাম। কিন্তু আপনাকে তো বারবার বলেছি, ঋতুর গায়ে কোনওদিন একটা আঁচড় পর্যন্ত আমি কাটিনি। যা কিছু আঁচড় কেটেছি সবই নিজের গায়ে।

তো এমনি করেই চলতে লাগল। আমি যখন খুশি নিজের গায়ে আঁচড় কাটি, আর ঋতু দ্যাখে। আর তখন থেকেই একটু-একটু করে ও পালটাতে শুরু করেছিল। না, না–ওর পার্টি-ফার্টি ছাড়েনি। পালটাতে শুরু করেছিল মানে আমার সঙ্গে কম কথা বলত। এমনকী মাঝে-মাঝে যে গলা ছেড়ে গান গাইত, সে-ও বন্ধ হয়ে গেল, স্যার।

কী বলবেন? আমি আর কী করেছিলাম? দাঁড়ান, বলছি। একগ্লাস জল খাওয়াবেন? ওঃ– এবার শুকনো গলাটা একটু জুড়োল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একদিন রাতে–সেদিন ঋতু বাড়ি থেকে বেরোয়নি–ও বিছানায় বসে কী একটা ইংরেজি বই পড়ছিল। ওর কোন এক রীতেনদা আছে– সে নাকি ওকে বইটা পড়তে দিয়েছে। দারুণ বই নাকি। এরকম যে ওর কত দাদা আছে!

আমি ঋতুকে জিগ্যেস করলাম, রাতে কী কী আছে। মানে, অতসী কী কী রান্না করেছে। বিয়ের পর প্রথম-প্রথম এরকম প্রশ্ন করলে ঋতু বলত, তুমি কী কী খাবে বলো। ভাত আছে, ডাল, ইলিশমাছ ভাজা–আর আমি। তখন স্যার আমার রাতের খাওয়াদাওয়ার লিস্টে লাস্ট আইটেম ছিল ঋতু। ওরও তাই। খাওয়াদাওয়ার পর ওরকম খাওয়া-খাওয়ি চলত। তবে ব্যাপারটাকে ওরাল সেক্স ভাববেন না, স্যার। বরং প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল মরাল সেক্স।

তো সেদিন ও কী-কী বলেছিল আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, লাস্ট আইটেমটা বাদ ছিল।

রাতে খেতে বসেছি, এমনসময় একটা ফোন এল। ঋতু উঠে গিয়ে ফোন ধরল। রীতেনদার ফোন। বইটা কেমন লাগছে? হি-হি-হি-হি। বলেছিলাম না, দারুণ। খুব ডিপ ব্যাপার। আপনিও তো খুব ডিপ মানুষ, রীতেনদা। তো দশ মিনিট ধরে দুজনে মিলে হা-হা-হি-হি করে এইরকম ডেস্থ চর্চা চলতে লাগল।

ব্যস। আবার সেই ধুনির আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথায়। দাঁড়কাক ডাকতে লাগল কা কা করে। ঋতু ফোন সেরে খাওয়ার টেবিলে ফিরে আসতেই আমি বললাম, এসব খেতে আর ভালো লাগছে না। ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে? আমি বললাম, মাংস খেতে ইচ্ছে করছে। ঋতু একইরকম চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, এখন মাংস কোথায় পাব।

ব্যস। আমি চোখের পলকে আমার বাঁ-হাতে এক হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলাম। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব, ইনস্পেক্টরসাহেব! কিন্তু আমি কামড় ছাড়িনি। আমার হাতটাকে বোধহয় ঋতুর গলা কিংবা রীতেনের ঘাড় ভেবেছিলাম। আমার মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোচ্ছিল। মাথার সবকটা শিরা ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল বারবার। তবুও আমি কামড় ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত একটুকরো মাংস ছিঁড়ে এল হাত থেকে। আর একেবারে যাচ্ছেতাই রক্তারক্তি কাণ্ড। আমি মেঝেতে পড়ে গলাকাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগলাম আর চিৎকার করতে লাগলাম। ঋতুও চিৎকার করছিল। তারপর ঠিক কী হয়েছে জানি না। আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তাই।

এরপর বেশ কিছুদিন ধরে আমার চিকিৎসা চলল। ঋতু দু-তিনরকম ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল আমার জন্যে। তার মধ্যে একজন ডাক্তার তো স্রেফ ঘুমের ইনজেকশান দিয়ে চলে যেত, আর কড়িকাড়ি প্রশ্ন করত। কিছু মনে করবেন না–ঠিক আপনাদের পুলিশি জেরার মতো। তবে ভীষণ উলটোপালটা প্রশ্ন। যেমন, ছোটবেলায় আমি চুপচাপ থাকতাম কিনা। প্রথম ইয়ে শুরু করেছি কত বছর বয়েসে। লাল রং পছন্দ করি কি না। এক-একা থাকতে ভালো লাগে, না খারাপ লাগে। এইসব ফালতু প্রশ্ন। আপনিই বলুন, কোনও মানে হয়!

ঋতু একটু-একটু করে মনমরা হয়ে যাচ্ছিল। বাইরে বেরোনোটাও বেশ কমিয়ে দিল। আগের চেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে লাগল আমার।

কী বললেন? ঋতুকে ডিভোর্স করিনি কেন? ডিভোর্স করা মানে তো হেরে যাওয়া। আমার মা আমাকে কখনও হারতে শেখায়নি। আর ঋতু আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি কেন? হাসালেন? কী করে যাবে! আমার যে অনেক বিষয়-আশয়। টাকার লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস, স্যার। অনেক মহান মানুষকে দেখেছি টাকার লোভের কাছে কাবু হয়ে যতে। ঘরে তারা চুরি করে, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে পরোপকারী, মহান সেজে ঘুরে বেড়ায়।

যাই হোক, এরপর তিনবার আমি ক্ষুর দিয়ে আমার বুকে-পেটে-পায়ে দাগ টেনেছি। কাটারি দিয়ে বাঁ-হাতের দুটো আঙুলের ডগা উড়িয়ে দিয়েছি। এই তো, দেখুন না। এই যে–এইসব সেলাই আর দাগ দেখছেন, এইগুলো। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এসবই করেছি ঋতুর চোখের সামনে। না, কেন করেছি জানি না। হয়তো নিজেকে কষ্ট দিয়ে ওকে বদলাতে চেয়েছিলাম। নাকি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছি?

না, স্যার, অতশত ভেবে কিছু করিনি। তবে ওই যে বললাম, আমার মাথার ভেতরে একটা ধুনি জ্বলত সবসময়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঋতুকে আমি খুন করিনি। আমার যে কী অবস্থা তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না, স্যার। আমি না-পারি মারতে, না-পারি মরতে। এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ছটফট করেই গেলাম। আমি নিজেই যেন পায়ে দড়ি বাঁধা একটা মুরগি। ভগবানের মুরগি। আড়ালে থেকে কেউ যেন পাগলের মতো আমাকে হকিস্টিক দিয়ে পেটাচ্ছে…পেটাচ্ছে। স্যার…স্যার…ঋতুকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কোথায় রেখেছেন আমার বউকে? আমার কলাবউকে একবারটি দেখান না, স্যার। একটিবার ওর মরামুখ দেখতে না-পেলে আমি পাগল হয়ে যাব, একফোঁটা শান্তি পাব না। বিশ্বাস করুন, স্যার, সত্যি বলছি…।

# চেইন রিয়্যাকশন

**চেইন রিয়্যাকশন**

ইয়োর বুকস কোম্পানিতে আমি লাস্ট এপ্রিলে জয়েন করেছি–ওদের এডিটোরিয়াল গ্রুপে, অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে। সেখানেই রঙ্গিলা শর্মার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

লম্বা, ছিপছিপে, ঝকঝকে মেয়ে রঙ্গিলা। ওর উজ্জ্বল চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি। সে-চোখে নজর পড়লেই মনে হয়, ও সব গোপন কথা জানে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

রঙ্গিলার এমনই টান যে, ওকে দেখলেই সবাই বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। কিন্তু অনেকেই ওর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কারণ, ওর ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধি।

পাবলিশিং ওয়ার্ল্ডে রঙ্গিলা শর্মার নাম সবাই জানে। ও এক অদ্ভুত জাদু জানে–অঙ্কের জাদু। আড়ালে অনেকে বলে, ও সুপারন্যাচারাল ম্যাথমেটিক্যাল জিনিয়াস। তবে ম্যাথ বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। রঙ্গিলার ব্যাপারটা সুপারম্যাথ। এই অঙ্কই বই বিক্রির জাদু ওর হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। সিম্পলি ওর জন্যেই ইয়োর বুকস অন্য সব পাবলিশিং কোম্পানিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। পাবলিশিং-এর দুনিয়ায় রঙ্গিলা শর্মা এককথায় এক ইউনিক আইকন।

ইয়োর বুকস-এ চাকরির সুযোগ পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। অন্তত আমার কাছে। এর আগে ছোটামোটা ফিলিম ম্যাগাজিনে সাব-এডিটরের কাজ করেছি। একটা ক্রাইম ম্যাগে সহ-সম্পাদকও ছিলাম। হঠাৎ করে কী খেয়ালে ইয়োর বুকস-এর ইন্টারভিউটা দিয়েছিলাম–লাক ফ্যাক্টর চাকরিটা গেঁথে

গেল। স্বপ্নের চাকরি। কারণ, কোম্পানিটা মাপে বাড়ছে—ওপরে ওঠার স্কোপ অনেক।

ইয়োর বুকস লাস্ট দশবছরে যেকটা পেপার-ব্যাক সিরিজ বের করেছে তার সবকটাই সুপারহিট। কোনওটা ক্লাসিক, কোনওটা ছোটদের, কোনওটা ক্রাইম থ্রিলার, কোনওটা আবার সায়েন্স ফিকশন অ্যাডভেঞ্চার। এই সবকটা সিরিজ সাকসেসফুল হওয়ার মূলে রঙ্গিলা—আর ওর সুপারম্যাথ। আর তার রেজাল্ট ইয়োর বুকস-এর টার্নওভার অন্যান্য পাবলিশিং হাউসকে ঈর্ষায় নীল করে দেয়—গাঢ় নীল।

ইয়োর বুকস-এ জয়েন করার পর তৃতীয় দিনেই রঙ্গিলার মুখোমুখি হলাম।

মাঝারি একটা কাচের ঘরে ওর অফিস। টেবিলে তিনটে টেলিফোন, একটা ল্যাপটপ, হাফডজন নানা রঙের পেন, আর দু-থাক ফাইল।

একতাড়া কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের ওপরে ঝুঁকে ছিল ও। ওপরের হেডিং দেখে বুঝলাম, ওগুলো সেল্স ফিগার। পরে জেনেছি, সেল্স ফিগারেই রঙ্গিলার একমাত্র ইন্টারেস্ট। কারণ, সেল্স ফিগারই ওর সুপারম্যাথ অ্যাপ্লিকেশানের র ডেটা।

আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেছেন বিক্রম ভট্টাচার্য, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাদের দেখেই ও মুখ তুলে তাকাল। ছোট-ছোট লেন্সের শৌখিন চশমাটা চোখ থেকে নামাল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

আমাদের প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার রঙ্গিলা শর্মা। বিক্রম আলাপ করিয়ে দিলেন মিস শর্মা, আমাদের নতুন অ্যাসোসিয়েট এডিটর প্রীতম চৌধুরী।

চট করে ও হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা হাত আঁকালাম। আমি বললাম, আপনার নাম অনেক শুনেছি....।

তাই? ও হাসল—ছোট্ট চাপা হাসি। অনেকটা পিঠ চাপড়ানো গোছের।

আমি ওকে দেখছিলাম। চাউনি, শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর ঢং, গলার স্বর—সবকিছু থেকেই ক্ষমতার অদৃশ্য তরঙ্গ ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই তিরিশ বছর

বয়েসেই ইয়োর বুকস-এর প্রোডাকশন অ্যান্ড ড্রিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার! হয়তো আর কয়েক বছরের মধ্যেই ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হয়ে ভিপি-তে পৌঁছে যাবে।

বিক্রম তখন মুখে পেশাদার হাসি ফুটিয়ে বলে চলেছেন, রঙ্গিলা আমাদের কোম্পানির সুপারব্রেন। ওর ম্যাজিকে আমাদের সেল্স ফিগার এক্সপোনেশিয়ালি বেড়ে চলেছে...।

কেন জানি না, বারবার সেল্স ফিগার কথাটা শুনতে-শুনতে আমার রঙ্গিলার ফিগারের দিকে নজর গেল। সবুজ ছককাটা চুড়িদারে ওকে সুন্দর মানিয়েছে। গাঢ় সবুজ ওড়নাটা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই–অনেকটা পাশে সরে গেছে। তাই বোঝা গেল, ওর কাঠামো ছিপছিপে হলেও ও বেশ ফলন্ত গাছ। তবে ওর আকর্ষণের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাবধানী শাসন রয়েছে।

সবমিলিয়ে যেটা বুঝলাম, রঙ্গিলা শর্মা আর-পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।

আমার ধারণা যে কতটা সত্যি সেটা বুঝলাম আরও মাস-দেড়েক পর। কারণ, এর মধ্যে রঙ্গিলার সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব হয়েছে। কাজের ফাঁকে সময় পেলেই আমি ওর ঘরে গিয়ে হাজির হই। নতুন-নতুন বইয়ের পাবলিকেশান প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করি। ও চাবুকের মতো সব পরামর্শ দেয়, নানান বুদ্ধি দেয়, ইউনিক সব স্কিমের কথা বলে। তিরিশ বছরের একটা মেয়ের মুখ থেকে এসব শুনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে, ও এক অদ্ভুত টাইপের জিনিয়াস।

ওর এই রহস্য আমাকে টানতে থাকে। কিন্তু ওর ব্যবহার দেখে সেরকম কোনও টান আমি টের পেতাম না।

রঙ্গিলা কোম্পানির প্রোডাকশন আর ডিস্ট্রিবিউশান ছাড়াও সেল্স-এর অনেকটাই দেখাশোনা করে। কোন বই কত প্রিন্ট রান দেওয়া হবে, কোন-কোন বই দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এইসব মেজর সিটির কোথায় কোথায় কত কপি করে পাঠাতে হবে, কোন টাইটেল-এর আনসোল্ড কপি রিটার্ন নেওয়া হবে–কোনটার হবে না সবই রঙ্গিলা শর্মা ঠিক করে দেয়। বলতে গেলে কোম্পানিতে রঙ্গিলাই যেন শেষ কথা।

কানাঘুষোয় শুনলাম, এ নিয়ে বিক্রম ভট্টাচার্যের বেশ ক্ষোভ আছে। কিন্তু ভদ্রলোক কাজপাগল পেশাদার মানুষ। কোম্পানির জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। কোম্পানিকে বড় করে তোলার পেছনে ওঁর অনেক অবদান আছে। পনেরো বছর ইয়োর বুকস-এ আছেন। সেখানে রঙ্গিলা শর্মা মাত্র চারবছর।

কিন্তু মামুলি মেধার মানুষ আর জিনিয়াসের মধ্যে এটাই তো ফারাক!

রঙ্গিলা সারাটা দিন ওর কাচের দেওয়াল ঘেরা অফিসে বসে অঙ্ক কষে, ল্যাপটপে ঠকাঠক করে বোতাম টেপে, চোখের চশমাটাকে বারবার ঠেলে নাকের গোড়ায় তোলে। তারপর…সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাসিমুখে ঘরের বাইরে বেরোয়। সারকুলেশান ম্যানেজার আশুতোষ শিভালকরের কাছে গিয়ে বলে, হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান গোস্ট স্টোরিজ টাইটেলটা মুম্বাই আউটলেটে দু-হাজার কপি পাঠান। আর কবিতা ভার্গবের ফেমাস পিল্ল, ফেমাস ড্রিমস হায়দ্রাবাদে যত আনসোল্ড কপি আছে–আপনি বলছিলেন বারোশো মতন–ওটা ইমিডিয়েটলি বেঙ্গালুরুতে পাঠিয়ে দিন। ও. কে.?

ও. কে.। শিভালকরের মুখ দেখে বোঝা যায় যে, তিনি খুশি হননি। কিন্তু ইয়োর বুকস এ এসব ব্যাপারে রঙ্গিলা শর্মাই শেষ কথা।

আর আমি এটাও জানি, শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলাই জিতবে। খুব কম সময়ের মধ্যেই মুম্বই আর বেঙ্গালুরুর পাঠকরা ওই বই দুটোকে শুষে নেবে।

একদিন আমি শিভালকরের ঘরে ছিলাম। আমাদের নতুন তিনটে টাইটেল কেমন বাজার পাচ্ছে সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। কথা শেষ করে উঠতে যাব হঠাৎই রঙ্গিলা ঘরে এসে ওর চমকে দেওয়া তিনটে সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেল।

শিভালকর ব্যাজার মুখে থ্যাংক য়ু বলল।

রঙ্গিলা ঘরের বাইরে বেরোতেই আমিও বেরিয়ে এলাম। অফিসের করিডরে ওর পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, আপনি কি ম্যাজিক জানেন?

ছোট্ট হেসে একঝলক তাকাল আমার দিকে ও ম্যাজিক নয়। ম্যাথমেটিক্স। ম্যাথমেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান।

ইভেন্ট স্পেকুলেশান?

হ্যাঁ। টাইম অ্যান্ড স্পেসে দুটো ইভেন্টকে একই কো-অর্ডিনেটে রাখতে পারলে আপনি যা চান তাই হবে। মানে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের দেখা হতে পারে। দুটো গাড়ির অ্যাসিডেন্ট হতে পারে। একজন পাঠক একটা বই কিনে ফেলতে পারে..ব্যস…সিম্পল।

এর নাম সিম্পল?

কথা বলতে বলতে আমরা রঙ্গিলার চেম্বারে চলে এলাম।

ও চেয়ারে বসল। আমাকেও বসতে বলল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে সরাসরি তাকাল আমার দিকে : দেখুন, ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে সিল্প নয়, তবে আমাকে লাস্ট পাঁচবছরে অনেক কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশান করতে হয়েছে– তারপর ব্যাপারটা আমার কাছে সিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অন্য কাউকে এক্সপ্লেইন করে বোঝানো বেশ কঠিন। তবে এর এসেন্স হল, ওই যে বললাম, ম্যাথমেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান…।

এসব তো সায়েন্স ফিকশানের মতো শোনাচ্ছে।

মতো কেন? এটা সত্যি সত্যিই সায়েন্স ফিকশান। ও মুচকি হেসে বলল।

বুঝলাম, এর বেশি ও খুলে বলবে না। আর বলবেই বা কেন? এটা তো ওর স্পেশাল সিক্রেট।

কিন্তু আমার কৌতূহল বেড়েই চলল। রঙ্গিলার মন্ত্রগুপ্তিটা কী? এমন নয় যে, সেটা জেনে আমি আমার প্রোমোশানের কাজে লাগাব। তবে কৌতূহলটা সবসময় আমাকে খোঁচাতে লাগল।

কিছুদিন পর আবার একটা ঘটনা ঘটল। রঙ্গিলার সেই সুপারম্যাথের ম্যাজিক। ঠিক জায়গায় ঠিক বইটা ঠিক সময়ে পাঠানো। আমরা প্রায় চারহাজার কপির বোনাস সেল পেলাম। ইয়োর বুকস এর সি অ্যান্ড এম-ডি আমেরিকা থেকে রঙ্গিলাকে স্পেশাল কনগ্রাচুলেশা নোট পাঠালেন। আমরাও ওকে অভিনন্দন জানালাম। ওর ছোট্ট হাসি দেখে বুঝলাম, এসব সাবাশি নেওয়া ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমাদের অফিস বিল্ডিং-এর একতলায় একটা কফি শপ আছে। কাজের ফাঁকে কিছুটা বাড়তি সময় হাতে পেলে আমি ওখানে গিয়ে বসি। সেদিন রঙ্গিলাকে কফি খাওয়াব বলে কফি শপে নিয়ে গেলাম।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে একথা সে কথা বলতে বলতে আমি সেই চারহাজার কপির বোনাস সেলের প্রসঙ্গে গেলাম।

রঙ্গিলা তেরছা চোখে আমার দিকে তাকাল, ঠোঁটে একটুকরো হাসি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিছুই না–সিম্পলি ম্যাথমেটিক্স। আমি জানতাম ওখানে সাতদিনের একটা ন্যাশনাল স্পোর্টস ইভেন্ট আছে। সেটা দেখতে প্রচুর লোক জড়ো হবে তারা বিন্দাস মুডে থাকবে। যদি সেই সাতটা দিন স্টেডিয়ামের নিয়ারেস্ট বুকশপগুলোতে আমাদের স্পোর্টস টাইটেলগুলো রাখতে পারি তা হলে একটা স্ট্যাগারিং সেল পাওয়া যেতে পারে। তো তাই করলাম। সিম্পল।

এরপর আরও কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলাম বটে কিন্তু আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। ওর সুপারম্যাথ আরও কী কী করতে পারে ভেবে আমার অবাক লাগছিল।

কয়েকমাসের মধ্যেই অন্যান্যদের মতো রঙ্গিলার ম্যাজিক আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ওর সঙ্গে গল্প-টল্প করলেও এ-নিয়ে আর কোনও কথা জিগ্যেস করতাম না। বরং মন দিয়ে নিজের কাজটা করতাম। কোন বই ছাপতে হবে, কোন বই রিপ্রিন্টে পাঠাতে হবে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ইয়োর বুকস দিনকেদিন আরও ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল।

চাকরিটা আমার ভালোই চলতে লাগল–শুধু বিক্রম ভট্টাচার্যের খবরদারি ছাড়া। আমাদের কোম্পানির মালিক বলবিন্দার নারুলা সারাটা বছর বলতে গেলে আমেরিকাতেই থাকেন। লোকটা যে ঠিক কত টাকার মালিক তা ও নিজেও জানে না। ওর অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে ইয়োর বুকস এর তুলনা করলে হাতির পাশে মাছিকে রাখতে হবে। তো এই মাছির খবরদারি করার দায়িত্বে রয়েছেন বিগ বস বিক্রম ভট্টাচার্য।

আমাদের অফিসটা পার্ক স্ট্রিটের একটা পুরোনো বিল্ডিং-এর ফোর্থ ফ্লোরে। প্রায় পাঁচহাজার স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে মোটামুটিভাবে সাজানো। রিসেপশানের এনক্লেভটা বড়, আমাদের পাবলিকেশানের নানান বইয়ের কভার

দিয়ে সাজানো। তারপর রয়েছে অ্যাকাউন্ট্র ডিপার্টমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশান সেল, এডিটোরিয়াল গ্রুপ, স্টোর এইসব। এ ছাড়া কোম্পানির কয়েকজন হোমরাচোমরা –যেমন, এডিটর মনোজ বর্মন, সারকুলেশান ম্যানেজার আশুতোষ শিভালকর, রঙ্গিলা শর্মা, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কৃপাল সিং আর ভি পি বিক্রম ভট্টাচার্য–যার-যার ঘরে বসেন।

বিক্রম ভট্টাচার্য লোকটা কেমন যেন। চেহারায় বেঁটেখাটো। ময়লা রং। কপালে সবসময় ভাঁজ পড়েই আছে। সুট-টাই পরে অফিসে আসেন। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হয় সুট টাই ওঁকে একদম মানায় না।

বিক্রমের সঙ্গে কারও তেমন সদ্ভাব নেই। কিন্তু তিনি সবসময় গা-জোয়ারি ব্যক্তিত্ব ফলাতে চেষ্টা করেন। লোকে ভয়ে বা ভক্তিতে ওঁর কথা শোনে। রঙ্গিলার সঙ্গে বিক্রমের প্রায়ই খটাখটি লাগে। কিন্তু রঙ্গিলা কোম্পানির কাছে যতই ইমপরট্যান্ট হোক বিক্রম ভট্টাচার্য বলবিন্দারের ব্লু আইড বয়। কারণ, কোম্পানির ছোট অবস্থা থেকে অনেক কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে বিক্রম ইয়োর বুকস-কে ন্যাশনাল ম্যাপে এস্টাবলিশ করেছেন। অ্যানুয়াল অ্যাড্রেসে মিস্টার নারুলা সবসময় বিক্রমের স্যাক্রিফাইসের কথা বলেন। বলেন যে, মিস্টার ভট্টাচার্য ছাড়া ইয়োর বুকসক্স কে ভাবা যায় না। হি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দিস ফ্লোটিং ভেসেল মাই ডিয়ারেস্ট ভেসেল ফর দ্যাট ম্যাটার।

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কৃপাল সিং-এর বয়েস প্রায় সাতষট্টি। প্রায়ই ওঁর অসুখবিসুখ লেগে আছে। মাঝে-মাঝেই ওঁর রিটায়ারমেন্টের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সবাই জানে, কৃপাল সিং-এর জায়গায় রঙ্গিলা যখন-তখন যেতে পারে। তারপরই আর বাকি থাকবে মাত্র একটা ধাপ। বিক্রম ভট্টাচার্যের ভিপি-র চেয়ার। সেই চেয়ারের জন্যে রঙ্গিলার যে আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা ওর কথায় মাঝে-মাঝে টের পেতাম। আর বিক্রম ভট্টাচার্য যে বুক পাবলিশিং-এর ব্যাপারটা ভালো বোঝেন না সেটা নিয়েও ও কমেন্ট করত। বলত, মিস্টার ভট্টাচার্য হলেন এসটিডি এমপ্লয়ি।

তার মানে?

মানে হল, সার্ভিস টিল ডেথ। হেসে বলত রঙ্গিলা, কবে কে কোম্পানির জন্যে কী স্যাক্রিফাইস করেছে সেটা ভাঙিয়ে দশ-পনেরো বছর চালিয়ে যাওয়াটা বড় বাড়াবাড়ি।

আমি তখন রঙ্গিলাকে লক্ষ করতাম। ওর চোখ ছোট হয়ে এসেছে। দু-ভুরুর মাঝে দু-একটা সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে। ঠোঁটের কোণে অপছন্দের ছাপ।

দু-সপ্তাহ পরপরই বিক্রম স্ট্র্যাটেজি মিটিং ডাকতেন। তখন আমরা সবাই ওঁর চেম্বারে গিয়ে হাজির হতাম। ভিজিটরদের জন্যে সাজানো চারটে চেয়ারে মনোজ বর্মন, আশুতোষ শিভালকর, কৃপাল সিং আর রঙ্গিলা বসে। আর আমরা স্মল ফ্রাইরা ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকি।

বিক্রম ওঁর মতো করে পাবলিশিং প্ল্যান, কোম্পানি পলিসি, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এসব নিয়ে কথা বলেন। আমরা বাধ্য ছাত্রের মতো শুনি। তারই মধ্যে খেয়াল করি, রঙ্গিলা ওর চেয়ারে বসে উশখুশ করছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কখনও-বা হাই তুলছে।

বিক্রম ভট্টাচার্য কথা বলতে বলতে এই সিমটমগুলো লক্ষ করতেন। বুঝতেন, রঙ্গিলা ওঁর গুরুগম্ভীর কথাবার্তাগুলোকে একফোঁটাও আমল দিচ্ছে না। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে রাগ হলেও বিক্রম সে-রাগ চেপে রাখতেন। কারণ, তিনি জানেন, তিনি কোম্পানির যতই ব্লু আইড বয় হোন না কেন, রঙ্গিলার চোখের মণিও কম নীল নয়। রঙ্গিলাকে তাড়ানোর ক্ষমতা বিক্রমের নেই। কারণ, কোম্পানিতে রঙ্গিলার যে-কোনও কথাই বেদবাক্য। ওর কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কারও নেই।

আমরা সবাই জানতাম, বিক্রম রঙ্গিলার কোনও একটা ভুলের জন্যে তক্কেতক্কে আছেন। ছোট বা বড়–যে-কোনও একটা ভুল। তা হলেই বিক্রম ওকে ছেটে ফেলতে পারবেন। কিন্তু ওঁর কপাল খারাপ। কোম্পানির সেলস ফিগার দিন দিন বেড়েই চলেছে আর রঙ্গিলাও কাগজ-পেন নিয়ে ল্যাপটপে খটাখট বোতাম টিপে ওর ম্যাথমেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান-এর ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আমাদের কোনও টাইটেল দশহাজার কপি বিক্রি হওয়ার মানে হল আমাদের চোখে সেটা অ্যাভারেজ সেল।

রঙ্গিলা আচমকা তিনটে কি চারটে হার্ড কভার বই সিলেক্ট করে কৃপাল সিং আর বিক্রম ভট্টাচার্যকে বলত সেই বইগুলোর পেপারব্যাক এডিশান বের করতে। আমরা এডিটোরিয়াল গ্রুপ থেকে স্টাডি করে দেখতাম যে, বইগুলোর তেমন পোটেনশিয়াল নেই। কিন্তু রঙ্গিলা সেগুলো ছাপার জন্যে ঝুলোঝুলি করত। বিক্রম ভট্টাচার্য যখন ওকে বোঝাতেন যে, বইগুলো হার্ড কভারে খুব কম বিক্রি

হয়েছে তখন রঙ্গিলা বলত, তার মানেই তো, স্যার, বইগুলো বেশি লোক পড়েনি। পেপারব্যাক এডিশান বেরোলে পড়বে। এগুলোর পেপারব্যাক এডিশান রাইট আমাদের ইমিডিয়েটলি কেনা উচিত। আই হোপ নাউ য়ু এগ্রি, স্যার…।

আমরা পেপারব্যাক এডিশান বের করার পর বইগুলো মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হত। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলার সুপারম্যাথই জিতত।

চাকরির স্তরবিচারে আমার আর রঙ্গিলার মধ্যে দূরত্ব থাকলেও আমরা একবছরের মধ্যেই ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। আর কৃপাল সিং-ও বয়েস আর অসুখের চাপে রিটায়ার করলেন। আমরা সবাই ভাবলাম, এইবার রঙ্গিলা শর্মাকে নিশ্চয়ই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর করা হবে। কিন্তু আমাদের হিসেব মিলল না। কৃপাল সিং-এর স্লটটা বলবিন্দার নারুলা খালিই রেখে দিলেন। তখন নতুন একটা কানাঘুষো শুরু হল। নিজেদের মধ্যে অনেকে বলাবলি করতে লাগল যে, বিক্রম ভট্টাচার্যের চেয়ারটা খালি হলেই রঙ্গিলা এ-কোম্পানির ভিপি হয়ে বসবে। কিন্তু বিক্রম ভট্টাচার্যের চেয়ারটা কীভাবে খালি হবে সেটা কেউ বলতে পারল না।

একদিন সন্ধের পর একতলার কফি শপে বসে আমি আর রঙ্গিলা স্যান্ডউইচ আর কফি খাচ্ছিলাম। কথায় কথায় আবার ওর সুপারম্যাথের কথা উঠল।

এখন রঙ্গিলার সঙ্গে আমার রিলেশানটা এমনই যে, আপনি-আপনি-র বদলে আমরা তুমি তুমি করে কথা বলি। তা ছাড়া ইয়োর বুকস-এ আমার চাকরিও বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। তাই পুরোনো কৌতূহলটা আবার মাথাচাড়া দিল। ফস্ করে বলে ফেললাম, রঙ্গিলা, একটা সত্যি কথা বলব?

কী, বলো? কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে ও চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

তোমার সিক্রেটটা আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

ও হাসল। বলল, প্রীতম, এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছে, আমাদের অফিসে শকুন বেশি, মুনিয়া কম। য়ু আর ডিফরেন্ট–তাই আজ তোমাকে বলছি। বাট য়ু শুড কিপ ইট আ সিক্রেট।

প্রমিস।

ওয়েল, অঙ্কটা হচ্ছে নানান ইভেন্টের পারসেন্টেজের খেলা। লাস্ট পাঁচবছর ধরে এই অঙ্কটা নিয়েই আমি লড়ে গেছি। স্রেফ অঙ্ক কষে দুটো জিনিসকে এক জায়গায় মিট করানো যায়। মানে, একটা পারটিকুলার টাইমে একটা পারটিকুলার জায়গায় দুটো অবজেক্ট এসে মিট করবে। এটা করতে হলে সেই অবজেক্ট দুটো সম্পর্কে প্রচুর ডেটা থাকতে হবে–আর যে-কোনও একটার ওপর তোমার ইনাফ কন্ট্রোল থাকতে হবে। আই মিন, টু সাম এক্সটেন্ট তুমি তার মুভমেন্ট, অ্যাক্টিভিটি–এসব কন্ট্রোল করতে পারবে। অঙ্ক কষে আমি যেটা করি, ইভেন্ট স্পেকুলেশান। দুটো সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট্রকে দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে স্টাডি করে একই জায়গায় নিয়ে এসে স্রেফ মিট করিয়ে দেওয়া। ব্যস–।

ব্যাপারটা আমার ম্যাজিকের চেয়েও বেশি কিছু বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ওকে কিছু বললাম না।

ও বলে চলল, আর বই বিক্রির ব্যাপারে আমি যেটা করি সেটা হল, সাপ্লাই আর ডিমান্ডকে মিট করিয়ে দেওয়া। ঠিক যে-জায়গায় ডিমান্ড ডেভেলাপ করেছে আমি ঠিক সেই স্পটে বই পাঠিয়ে দিই। ব্যস–লোকে বই কেনে। ইট দ্যাট সি ।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ধুস, আরও গুলিয়ে গেল। তারপর শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিলাম। স্যান্ডউইচে একটা কামড় বসালাম।

রঙ্গিলা আমাকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল ও লুক, সাপোজ মুম্বইতে আমাদের হরার সিরিজের তিনটে টাইটেল নেক্সট থার্সডেতে তিনশোজন পাঠক কিনতে চাইবে। তখন আমি সেই বইটা মঙ্গলবারের মধ্যে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। তখন সাপ্লাই আর ডিমান্ড মিট করে যায়। আমার ইকুয়েশানগুলো সল্ভ করেই সব উত্তর আমি পেয়ে যাই। যখন কোনও খদ্দেরের একটা বই কেনার ইচ্ছে চাগিয়ে ওঠে ঠিক তখনই সেই পারটিকুলার বইটা আমি তার হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে ও কফি শপের কাচের জানলার দিকে তাকাল। একটু আনমনা গলায় বলল, শুধু বই কেন, যে-কোনও দুটো অবজেক্ট নিয়ে আমি এরকম করতে পারি–অবশ্য, তাদের প্রচুর ডেটা আমার হাতে থাকা দরকার।

তো তুমি হঠাৎ বইয়ের লাইনে এলে কেন? পাবলিশিং ইজ নট দ্যাট অ্যাট্রাকটিভ।

টু মি, ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাট্রাকটিভ। হেসে বলল রঙ্গিলা, আমি পাবলিশিং ট্রেডকে ইনডাস্ট্রিতে কনভার্ট করতে চাই। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। পাবলিশিং বিজনেসের মেইন ড্রব্যাকটা কোথায় জানো? যখন একজন পাঠকের একটা বই কেনার ঝোঁক চাপছে তখন সেই বইটা সে হাতের কাছে পায় না। পরে যখন বইটা সে হাতের নাগালে পাচ্ছে তখন কিন্তু বইটা কেনার বেঁক কমে গেছে। অ্যাজ আ রেজাল্ট বইটা সে আর কিনছে না। সো য়ু গেট নো সেল। কিন্তু...। আমার দিকে তাকিয়ে কয়েকসেকেন্ড সময় নিল রঙ্গিলা। কফিতে ঠোঁট ছোঁয়াল। তারপর বলল, কিন্তু যদি সেই পাঠকের বই কিনতে চাওয়ার ইমপালসের মোমেন্টে তুমি বইটা তার হাতের কাছে পৌঁছে দিতে পারো তো কেল্লা ফতেয়ু গেট আ সেল।

আমি ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম। রঙ্গিলা এসব বলছে কী! আজ ও খুব ক্যান্ডিড মুডে আছে। ওর সিক্রেট রুমের দরজা খুলে দিচ্ছে ধীরে-ধীরে। আর আমিও অন্ধকার ঘরটার ভেতরে উঁকি ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছি।

বই ছাড়াও অন্য ইভেন্ট নিয়ে এরকম অঙ্ক তুমি করতে পারো?

কফি শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। তারপর নীচু গলায় বলল, অন্য ইভেন্ট নিয়ে এরকম করতে পারি কিনা? হ্যাঁ, পারি। কখনও ভেবে দেখেছ, যখন কোনও লোক গাড়িতে ধাক্কা খায় তখন একই জায়গায় ঠিক একই সময়ে দুটো অবজেক্ট এসে মিট করে? এই অবজেক্ট দুটো কিন্তু নানান চেইন অফ ইভে-এর মধ্যে দিয়ে এসে ওই পারটিকুলার মোমেন্টে মিট করেছে– যাকে আমরা বলি অ্যাক্সিডেন্ট। তা হলে ভেবে দ্যাখো, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ঘটনা–যাদের একটার সঙ্গে আর-একটার কোনও কানেকশান নেই কীভাবে এসে মিট করে! একটা ইভেন্ট চেইন কীভাবে আর-একটা ইভেন্ট চেইনকে ইন্টারসেক্ট করে!

এরকম কোনও ইভেন্ট চেইনকে তুমি কি সত্যিই কন্ট্রোল করতে পারো?

কিছু কিছু পারি। ঠোঁট টিপে হাসল রঙ্গিলা : আমি ক্যালকুলেট করতে পারি। ইভেন্ট স্পেকুলেশানের ম্যাথ অ্যাপ্লাই করতে পারি। সেসব করে ইভেন্ট চেইনের কয়েকটা টুকরোকে ম্যানিপুলেট করতে পারি। একজন পাঠক আর একটা বইকে একজায়গায় নিয়ে আসতে পারি। একটা গাড়ি আর একজন রাস্তা-পার-হওয়া মানুষকে ধাক্কা লাগাতে পারি। ইয়েস আই ক্যান।

ওর মুখের সিরিয়াস ভাব দেখে আমি হেসে ফেললাম : রঙ্গিলা, এবার ব্যাপারটা সায়েন্স ফিকশানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে কিন্তু! তার মানে, তুমি বলছ বহু ঘটনার ফাইনাল ডেস্টিনেশান তোমার হাতে?

ডেস্টিনেশান মানে? রঙ্গিলা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল।

ডেসটিনি। আই মিন, য়ু থিংক য়ু ক্যান কন্ট্রোল ডেটিনি?

আমার প্রশ্নটায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকলেও রঙ্গিলা সেটাকে আমল দিল না। ও সিরিয়াস মুখে বলল, হ্যাঁ, প্রীতম, ডেসটিনি আমি কন্ট্রোল করতে পারি–খানিকটা অন্তত পারি।

এ নিয়ে কথাবার্তা সেখানেই শেষ হয়েছিল। তারপর কাজের চাপে ব্যাপারটা মন থেকে সরে গেল। নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ লঞ্চ করার প্ল্যানিং নিয়ে আমাদের এডিটোরিয়াল গ্রুপ মেতে উঠল। আমি আর মনোজ বর্মন ঘনঘন মিটিং করতে লাগলাম। কলকাতা বুক ফেয়ার কাছাকাছি এসে গেল। প্রতি বছরের মতো ইয়োর বুকস-এ সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

সেইসময় একদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রঙ্গিলা আর বিক্রম ভট্টাচার্যের তুমুল খটাখটি লাগল। রঙ্গিলা চারটে আউট অফ প্রিন্ট পেপারব্যাক রিপ্রিন্টের জন্যে প্রোডাকশনের পাইপলাইনে দিয়েছিল, কিন্তু বিক্রম সেগুলো নাকচ করে দিয়েছেন।

রঙ্গিলা বেশ জোরালো গলায় বলল, আমার সিক্সথ সেন্স বলছে বুক ফেয়ারে এই বইগুলোর এক-একটা দুহাজার করে বিক্রি হবে। সেইজন্যেই আমি পাইপলাইনে ওগুলো দিয়েছি।

সরি, রঙ্গিলা। দিস টাইম আই উড গো বাই মাই সিক্সথ সেন্স। বইমেলায় নতুন টাইটেল হল টপ প্রায়োরিটি। অন্তত আমার কাছে। সো–।

এই চারটে টাইটেল হল হাই পোটেনশিয়াল মেটিরিয়াল–নতুন টাইটেলের চেয়ে কিছু কম নয়।

সো য়ু থিঙ্ক। বিক্রম ভট্টাচার্যের গলা সামান্য উঁচু হল।

ওঁর ঘরের বাইরে তখন আমাদের কয়েকজনের ভিড়। আমরা ভাবছি, জল কোনদিকে গড়ায়।

আমি তা হলে সি অ্যান্ড এম-ডি-কে ব্যাপারটা জানাচ্ছি। থমথমে গলায় বলল রঙ্গিলা।

অফ কোর্স জানান। আই উড লাভ দ্যাট। অ্যাজ পার দ্য রুস্ অফ দ্য কোম্পানি এক্সক্লুডিং সি অ্যান্ড এম-ডি দ্য ভিপি অলওয়েজ হ্যাজ দ্য ফাইনাল সে। এক্সক্লুডিং সি অ্যান্ড এম-ডি অ্যান্ড আই অ্যাম স্টিল দ্য ভিপি হিয়ার। য়ু হ্যাভন্ট গট মাই জব ইয়েট। আমি আটমোস্ট ট্রাই করব যাতে এই কোম্পানিতে আপনি সবসময় ভিপি-র চেয়ারের নীচেই থাকেন। ও. কে., নাউ য়ু ক্যান। বেগ ইয়োর লিভ, ম্যাম। এই কথা বলে বিক্রম ওঁর চেম্বারের কাচের দরজা খুলে ধরলেন।

গলা ধাক্কা দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

রঙ্গিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখে এক অদ্ভূত নির্লিপ্ত ভাব। দেখে বোঝাই যায় না, একটু আগেই বিক্রম ভট্টাচার্য ওর ইগোতে হিংস্র কামড় বসিয়েছেন।

আমি ভাবলাম, এইবার বোধহয় কোম্পানিতে উথালপাতাল শুরু হবে, কলকাতা বইমেলার আগে একটা বোম-টোম কিছু ফাটবে।

কিন্তু কিছুই হল না।

এতে আমি যেমন অবাক হলাম, অফিসের আরও অনেকে অবাক হল। রঙ্গিলার বন্ধু হওয়ায় অনেকে আমার কাছে গোপন খবর শুনতে চাইল। কিন্তু আমি ছাই কিছু জানলে তো বলব।

বিক্রম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ক্ল্যাশের দশ-বারোদিন পর একদিন অফিসের কাজে রঙ্গিলার চেম্বারে ঢুকেছি, দেখি ও ঘরের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ওর হাতে একটা ছোট নোটবই আর পেন। মাঝে-মাঝে কীসব লিখছে।

কী করছ? আমি জিগ্যেস করলাম।

রঙ্গিলা ওর কাজে এতই বিভোর যে, কোনও উত্তর দিল না।

কিন্তু ততক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি, ও কী করছে।

রঙ্গিলা পার্ক স্ট্রিট আর মিলটন স্ট্রিটের ক্রসিং-এর ট্র্যাফিক খুঁটিয়ে দেখছে। কটা গাড়ি যাতায়াত করছে তার হিসেব টুকে নিচ্ছে।

এরপর আরও কয়েকদিন ওকে একই অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। জানলা দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের গাড়ি চলাচল দেখছে, নোট নিচ্ছে, আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। তারপর সেই নোটবই থেকে প্রচুর ডেটা নিয়ে ল্যাপটপে যে বোতাম টিপে ঢোকাচ্ছে সেটাও লক্ষ করলাম।

বিক্রমের ওপরেও রঙ্গিলা নজর রাখতে লাগল। কখন তিনি অফিসে আসেন, কখন বেরোন, কখন লাঞ্চ সারেন, সবই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বিক্রম ভট্টাচার্য এমনিতে খুব ডিসিপ্লিন্ড আর পাংচুয়াল মানুষ। রোজ ঠিক পাঁচটায় তিনি অফিস থেকে বেরোন। এলিভেটরের জন্য লাইনে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। তারপর অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট ক্রস করেন। তারপর মিডলটন স্ট্রিটে বাঁক নিয়ে নিজের লাল রঙের ইন্ডিকা গাড়িতে ওঠেন। গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়ি যান।

আমার মাথার মধ্যে ম্যাথমেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান-এর গল্প ঘোরাফেরা করতে লাগল। আমি জোর করে ওইসব আজগুবি রাবিশকে মাথা থেকে তাড়ালাম। ধুস, যতসব ফালতু ব্যাপার!

একদিন–সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার–পাঁচটা বাজতে পাঁচমিনিট নাগাদ বিক্রম যখন ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে চটপটে পা ফেলে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন রঙ্গিলা ওঁকে ডাকল।

স্যার।

বিক্রম থমকে দাঁড়ালেন। চোখে প্রশ্ন।

রঙ্গিলা তড়িঘড়ি ওঁর কাছে এগিয়ে গেল। তারপর নর্থ ইন্ডিয়া রিজিয়ানে আমাদের হোলসেল বিজনেস নিয়ে এলোমেলো কথা বলতে লাগল।

বিক্রম ভুরু কুঁচকে একবার নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন। তারপর শুধুমাত্র রঙ্গিলা শর্মা বলেই ওর কথা শুনতে লাগলেন।

আমি অফিসের ওয়াল ক্লকের দিকে নজর দিলাম। ওঁরা তখনও কথা বলছে। লক্ষ করলাম, রঙ্গিলাও আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পার হওয়ামাত্রই রঙ্গিলা হঠাৎ করে থ্যাংক য়ু, স্যার বলে কথাবার্তায় আচমকা ইতি টানল। তারপর অনেকটা অশোভনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের চেম্বারের দিকে রওনা দিল।

বিক্রম ভট্টাচার্যও তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

আমি কী ভেবে রাস্তার দিকের একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীচে ব্যস্ত পার্ক স্ট্রিট।

একটা ঠান্ডা চোরা স্রোত আমার শরীরের ভেতরে বইতে শুরু করল। ভাবলাম, বিক্রমকে ডেকে সাবধান করি। কিন্তু কীসের জন্যে সাবধান করব? আমাকে পালটা ওঁর ধমক খেতে হবে।

দেখলাম, বিক্রম ভট্টাচার্য অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর প্রথম সুযোগেই রাস্তা পার হতে শুরু করলেন।

রাস্তার মাঝবরাবর আসতেই একটা ট্যাক্সি পাগলের মতো ছুটে এসে বিক্রমকে ধাক্কা মারল। ওঁর শরীরটা শূন্যে ছিটকে গেল। তারপর…।

.

এরপর একমাস কেটে গেলেও আমার মন থেকে চোরা অস্বস্তিটা গেল না। বিক্রম অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর রঙ্গিলা শর্মা এখন আমাদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভিপির চেয়ারে গেলেও আমার সঙ্গে ও তুমি-তুমি-র বন্ধুত্বই বজায় রেখেছে। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দেখে অনেক সহকর্মীই আমাকে এখন পিঠ চাপড়ায়, আওয়াজ দেয়। আমিও বুঝতে পারি, রঙ্গিলার সঙ্গে আমার রিলেশানটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। এরপর যদি একদিন আমাদের বিয়ে হয়, তারপর…।

তারপর আমাকে এই ভেবে সারাটা জীবন কাটাতে হবে যে, কবে ও আমাকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে আমার সঙ্গে ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কথা বলবে, দেরি করিয়ে দেবে। তারপর…।

ওই পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের ভয়েই আমি ইয়োর বুকস-এর চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

# অপারেশন দাঁড়কাক

**অপারেশন দাঁড়কাক**

কথায় বলে কাক কাকের মাংস খায় না।

আমিও এতদিন তাই-ই জানতাম। কিন্তু একটা ০.৪৫৭ লুগার অটোমেটিক নিয়ে মহিন রায়ের আবির্ভাবের পর থেকে ওপরের প্রবাদ-বাক্যটা এই অধম ভুলতে বসেছে। লোকটা এমন এলোপাতাড়িভাবে ডাইনে-বাঁয়ে খুন করে যাচ্ছে যে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমার ক্লায়েন্ট কমে যাওয়ায় আমি যত না আঘাত পেয়েছি, তার চেয়েও বেশি পেয়েছি ওই খুন শব্দটাকে মহিন রায় যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করছে বলে।

অর্থাৎ মোদ্দা কথা, এতদিনের পর সতীশ দেবনাথ–অথবা শার্প দেবনাথ একজন উন্মাদ প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছে।

আমি সাধারণত এইসব মোক্ষলাভ করানোর (খুন শব্দটাকে আমি আবার ঠিক পছন্দ করি না) ব্যাপারে শিল্পীসুলভ মন নিয়ে কাজ করি। ডিটেলের দিকে দিই অখণ্ড গভীর মনোযোগর জন্যে পুলিশ চিরকালই মুখোমুখি হয়েছে এক অদ্ভুত সমস্যার : সেটা হল, খুনের পদ্ধতি তারা কোনওদিনই খুঁজে পায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে প্রফেশনাল কিলার হিসেবে আমার নামডাক বেড়েছে বই কমেনি।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, একটা নিখুঁত খুনের পেছনে দরকার সময়, অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং সবার ওপরে বুদ্ধি। অন্য সবকিছুতে আমার চেয়ে ছোট হলেও একটা ব্যাপারে মহিন রায় আমাকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়েছে।

সে জিনিসটা হল সময়।

একটা নিখুঁত খুনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সময়। মহিন সময়ের ধার ধারে না–যার ফলে ওর খুনগুলো ঠিক নিখুঁত নয়। যেমন কোনও পাঁচিলের আড়ালে বা ঝোঁপের ফাঁকে লুকিয়ে থেকে ভিকটিমকে গুলি করে স্রেফ চম্পট দেওয়া–এই টাইপের। না, মহিনকে প্রথম শ্রেণির খুনি বলতে আমি একেবারেই নারাজ। সুতরাং, এই অপরাধের জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম নিখুঁত প্রফেশনাল কিলার সতীশ দেবনাথ যেমন চিরকাল দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে এসেছে, তেমনি আজও করবে। সেখানে মহিন রায়ের মতো একটা থার্ড গ্রেড কিলারের কোনও জায়গা নেই। কারণ সবকিছু সহ্য করলেও খুন-শিল্পের অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

মহিনকে সরানোর প্ল্যান আমার তৈরিই ছিল। শুধু লাগসই জায়গা দেখতে দেখতে কেটে গেল একটি মাস। মঞ্চসজ্জার কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে নাটকের প্রথম দৃশ্যের জন্যে তৈরি হলাম। কিন্তু তখনও জানি না মহিন রায় আমার বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত করে চলেছে।

*

রোজ রাতের মতো চৌরঙ্গি এলাকার একটি বিশেষ ল্যাম্পপোস্টের নীচে অলসভাবে দাঁড়িয়ে ছিল মহিন রায়।

মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো। মেয়েদের মতো মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা। চওড়া কপালের ডানদিকে একটা আঁকাবাঁকা নীলচে শিরার আভাস। ঘন ভুরুর নীচে ছোট-ছোট হায়েনা-চোখ। ভোতা নাকের নীচে গোঁফ। ক্ষুর দিয়ে চেরা কাটা দাগের মতো পাতলা ঠোঁট। গলায় রঙিন মাফলার। গায়ে কালো শার্ট, কালো প্যান্ট। কোমরে চওড়া বেট–তার গায়ে মনোগ্রাম করা এম. আর। অর্থাৎ, মহিন রায়।

রায় তার লোমশ ফরসা হাত দুটো পকেটে ভরে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখজোড়া বেজির মতো চঞ্চল। কিন্তু ওর চোখে পড়েনি, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা, রোগাসোগা চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছে। হঠাৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটা রাস্তা পার হতে লাগল। তার হাঁটার ভঙ্গিতে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব মহিনের নজর এড়াল না। লোকটা চকিতে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর ধীরে-ধীরে

মহিনের কাছে এগিয়ে এল। একটা নিওন সাইনকে তীক্ষ্ণ মনোযোগে লক্ষ করতে করতে কটা শব্দ ছুঁড়ে দিল, এম. আর.? পি. কে.?

মহিন জানে, এর অর্থ মহিন রায়? প্রফেশনাল কিলার? তাই ও ছোট্ট করে জবাব দিল, এল ৪৫৭। যার অর্থ, লুগার ৪৫৭।

রায়ের সম্মতি পেয়ে ভদ্রলোক ওর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালেন ও আমার নাম কাকু শর্মা। আপনার সঙ্গে কয়েকটা প্রাইভেট কথা আছে।

শর্মা চট করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন? প্লিজ কাম উইথ মি। একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে দাঁড় করালেন শর্মা। তারপর মহিনের দিকে ফিরে বললেন, লেটস গো।

ট্যাক্সিতে উঠে শর্মা হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, মিস্টার রায়, আপনাকে একটা লোককে।

শাট আপ, প্লিজ। ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে শর্মাকে থামতে বলল মহিন।

ভদ্রলোক বারকয়েক ঢোক গিলে চুপ করে গেলেন। তাকে দেখে ভীষণ চিন্তিত মনে হল। মুখময় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। অনিদ্রায় চোখজোড়া করমচার মতো লাল। চুল উশকোখুশকো–চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ডান গালে একটা ছোট্ট তিল। সারা মুখে কেমন একটা হিংস্র, রুক্ষ ভাব।

মহিনের ইশারা কাকু শর্মা বুঝতে পারলেন। তাই চুপচাপ বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

শর্মার নির্দেশে একসময় ট্যাক্সি এসে থামল পার্ক সার্কাসের একটা ফ্ল্যাটের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে দুজনে পা বাড়ালেন অটোমেটিক এলিভেটরের দিকে।

চারতলায় পৌঁছে কাকু শর্মা পকেট থেকে চাবির গোছা বের করলেন। তাতে কম করেও প্রায় একডজন চাবি। মহিন পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সবই লক্ষ করতে লাগল। দরজা খুলে মহিনকে ভেতরে ডাকলেন শর্মা, আসুন–ভেতরে আসুন।

মহিন ঢুকতেই অতি সাবধানে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন রহস্যময় ভদ্রলোক। কিন্তু দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই এক চরম বিস্ময়ের মুখোমুখি হলেন। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। কোনওরকমে তোতলা স্বরে বলে উঠলেন, মি মিস্টার রায়! এ–এ কী?

মহিন তখন দাঁত বের করে হিংস্রভাবে হাসছে। ওর ডানহাতের অভ্যস্ত মুঠোয় এক বিচিত্র ভারসাম্য নিয়ে কঁপছে একটা ০.৪৫৭ লুগার অটোমেটিক। তার নলটা কাকুর চোখে যেন বড় বেশি কুৎসিত মনে হল।

শর্মার দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে এল রায়। পেটে রিভলভার দিয়ে এক খোঁচা মারল? চলুন– ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন।

শর্মা বিনা প্রতিবাদে মহিনের আদেশ পালন করলেন। মহিন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শর্মার জামাকাপড় সার্চ করতে শুরু করল। কিন্তু কিছু না পেয়ে একটু দূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল : মিস্টার শর্মা, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। এসবই হল প্রফেশনাল ব্যাপার। যাকগে, এবার আপনার দরকারটা খুলে বলুন।

নির্বিকার ভঙ্গিতে রিভলভারটা জামার খাপে চালান করে দিল রায়। কাকু শর্মাকে এবার অনেকটা সহজ মনে হল। তিনি কাষ্ঠহাসি হাসলেন। মুখের চিন্তার ভাবটা আরও গম্ভীর হল। তিনি থেমে-থেমে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন, মিস্টার রায়, আমি একটা লোককে খুন করাতে চাই।

দু-হাজার লাগবে। মহিন শান্তভাবে জবাব দিল।

জানি। আমার চেনা একজনের কাছ থেকে আমি আপনার সব খবর পেয়েছি। কিন্তু এই ব্যাপারটা একটু কমপ্লেক্স।

মহিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল : তার মানে?

মানে–এই খুনটায় আপনি রিভলভার ব্যবহারের চান্স পাবেন না। তাই আমার সাজেশান অনুযায়ী আপনাকে খুনটা করতে হবে।

কারণ?

কারণ আমার ভিকটিম বাড়ি ছেড়ে খুব একটা বেরোয় না। আর যখনই বেরোয় আমর্স নিয়ে বেরোয়। অর্থাৎ সেও আপনারই মতো একজন প্রফেশনাল কিলার!

কী বলছেন আপনি? প্রফেশনাল কিলার?

হ্যাঁ–তার নাম সতীশ দেবনাথ। তবে শার্প ব্রেনের জন্যে সকলে তাকে শার্প দেবনাথ বলে ডাকে।

মহিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে ফুটে উঠল আবেগহীন হাসি। শূন্য দৃষ্টিতে ও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দেওয়ালের দিকে। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করল, মিস্টার শর্মা, আমার উত্তর শুনলে আপনি হয়তো খুব অবাক হবেন।

শর্মা জিজ্ঞাসার চোখে মহিনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এ-খুনটার জন্যে একটা পয়সাও আমি আপনার কাছ থেকে নেব না। কারণ, সতীশ দেবনাথ আমার একনম্বর রাইভাল।

ডোন্ট গেট এক্সাইটেড, মিস্টার রায়। হাত তুলে মহিনকে বসতে অনুরোধ করলেন কাকু শর্মা ও পুরো ঘটনাটা আগে আপনার শোনা দরকার।

মহিন রায় ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল। কিন্তু ওর ডান হাত বুকের কাছে লাগানো রিভলভারে খামচি মেরে রইল।

মিস্টার রায়, রিমা কাশ্যপকে আপনি চেনেন? হঠাৎই প্রশ্ন করলেন শর্মা।

উঁহু। মাথা নাড়ল মহিন।

রিমা কাশ্যপ ছিল একজন ক্যাবারে ড্যান্সার–অশোক বারে ও নাচত। ওর ক্যারেকটার খুব একটা ভালো ছিল না, কিন্তু তবুও আমি ওকে ভালোবাসতাম। হ্যাঁ, শুনে আপনার হয়তো অবাক লাগছে, মিস্টার রায় বাট ইট ওয়াজ আ ফ্যাক্ট। বিয়ে-শাদি আমি করিনি। একা থাকি, দুহাতে পয়সা খরচ করি। তাই জীবনের একমাত্র শখ হিসেবে পুষেছিলাম রিমাকে। কিন্তু তার বছরখানেক পরে, এই গত জুলাইয়ে, একটা ঘটনা ঘটল। এক ভদ্রলোক একটা ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটে

রিমাকে জড়িয়ে ফেললেন। রিমা নিজে জানতেও পারল না, কখন ও এক ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যখন জানল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সেই সময়েই এক ক্লায়েন্টের কথায় সতীশ দেবনাথ ওকে খুন করে। সতীশ রিমার জুতোর তলায় দুটো ছোট-ছোট স্টিলের বল লাগিয়ে দেয়। তাতে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় পা পিছলে রিমা এক প্যাথেটিক অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। পুলিশ ঘটনাটাকে নিছক অ্যাকসিডেন্ট হিসেবে দেখেছিল, কারণ, পরে রিমার জুতোর নীচে সেই স্টিলের বলদুটো আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মিস্টার রায়, রিমা ছিল আমার সব। একজন তিনকুলে-একা পুরুষকে ও লোনলিনেস ভুলিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং সামবডি মাস্ট পে ফর রিমাজ অ্যাকসিডেন্ট। এবং সেই সামবডি সতীশ দেবনাথ ছাড়া আর কেউ নয়। মানি ইজ নো প্রবলেম, মিস্টার রায়–তাই সতীশকে সরানোর দায়িত্ব আমি আপনাকেই দিতে চাই। এবং ইট মাস্ট লুক লাইক অ্যান অ্যাকসিডেন্ট নট মারডার। যেমনটা হয়েছিল রিমার বেলায়।

মহিন একমনে কাকু শর্মার কথা শুনছিল। শর্মা থামতেই ও নীচু গলায় বলে উঠল, আমার ৪৫৭ ছাড়া আমি এক পাও চলি না–সেটাই আমার শেষ কথা।

আমি তা জানি, মিস্টার রায়। আপনার মেশিন আপনি ইচ্ছে করলে সঙ্গে রাখতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই সেটা ইউজ করতে পারবেন না। আশা করি সেরকম দরকারও হবে না। উঁহু, ব্যস্ত হবেন না। আগে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, সতীশ দেবনাথ বাড়িতে সবসময় রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না। নাম্বার টু, আপনি যখন ওকে ধাক্কা দিয়ে চারতলার ওই বারান্দা থেকে নীচে ফেলে দেবেন, তখনও ওর কাছে আর্স থাকবে না। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে এ কাজটা হাতে নিতে পারেন। রিমার মৃত্যুর বদলা নিতে যত টাকা লাগে, আমি খরচ করব। না, নাটাকা নিতে আপনার আপত্তি থাকলেও আমি শুনব না। কাজ শেষ হয়ে গেলে দু-হাজার টাকা আপনাকে আমি গিফ্ট হিসেবে দিতে চাই।

মহিন নীরব। একদৃষ্টে ও চেয়ে রইল শর্মার মুখের দিকে।

আপনার যদি এ-কাজে আপত্তি না থাকে তো বলুন– শর্মা বলে চললেন, কালই প্রিলিমিনারি ইনস্পেকশানটি সেরে ফেলি।

প্রিলিমিনারি ইনস্পেকশান? ভীষণ অবাক হল রায় : তার মানে?

সেটা আপনাকে জানাব–যদি কাজটা আপনি হাতে নেন। তার আগে নয়।

ভালো। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সম্মতি জানাল মহিন।

ধন্যবাদ। পকেট থেকে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান আর দেশলাই বের করে মহিনের দিকে এগিয়ে দিলেন শর্মা। মহিন মাথা নেড়ে না বলল। তখন নিজেই একটা ধরিয়ে প্যাকেট এবং দেশলাই আবার পকেটে চালান করলেন।

অলসভাবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, মিস্টার রায়, আমার একটা আশ্চর্য গুণ আছে। তা হল, পৃথিবীর যে-কোনও তালাই আমি মিনিটদুয়েকের মধ্যে খুলে ফেলতে পারি।

কিন্তু এর সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না? শর্মাকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল মহিন।

আছে, মিস্টার রায়, আছে। বহু কষ্টে আমি সতীশ দেবনাথের ফ্ল্যাটের ঠিকানা খুঁজে বের করেছি। কাল সতীশ যখন থাকবে না, তখন আপনাকে নিয়ে আমি একবার সতীশের ফ্ল্যাট ইনস্পেকশানে যেতে চাই। স্পটটা আগে থেকে দেখা থাকলে আপনার অনেক সুবিধে হবে, তাই না?

হয়তো তাই। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল মহিন। ওর মন তখন চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ঠিক আছে। তা হলে কাল সন্ধে সাতটায় আপনি আমার এখানে আসুন। তারপর এখান থেকে একসঙ্গেই বেরোনো যাবে। ইন দ্য মিন টাইম আমি ফোন করে জেনে নেব সতীশ কখন বাইরে বেরোবে। ব্যস, তারপর আর কোনও চিন্তা নেই। হিংস্র উল্লাস খেলা করল কাকু শর্মার মুখে। আনমনে তিনি বলে চললেন, রিমার আত্মা এবার শান্তি পাবে।

তা হলে কাল সন্ধে সাতটা। মহিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

কাকু শর্মা তখন টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে ফেললেন। ড্রয়ারে থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিল। আর তার পাশেই পড়ে রয়েছে একটা ০.৩৮ পুলিশ স্পেশাল। রিভলভারের গায়ে একটা হাত রাখলেন কাকু। দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করলেন, মিস্টার দেবনাথ, এবার তোমার পালা।

.

পরদিন রাত আটটায় কাকু শর্মা আর মহিন রায় এসে দাঁড়াল সতীশ দেবনাথের বাড়ির সামনে। অন্ধকার এলাকায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার কোনও স্পষ্ট আদল পাওয়া গেল না। নীরবে দুজনে এগিয়ে চলল লিফটের দিকে।

লিফটে উঠে তিননম্বর বোতাম টিপলেন কাকু শর্মা। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করলে লোহার খাঁচা। মহিনকে দেখে একটু উত্তেজিত মনে হল শর্মার। ওর হাত পোশাকের আড়ালে বোধহয় রিভলভারের ওপরে। শর্মা ওর কাঁধে হাত রাখলেন ও টেক ইট ইজি। আমি এখানে আসার আগেই ফোন করে জেনে নিয়েছি সতীশ দেবনাথ ওর ফ্ল্যাটে নেই। অতএব রিল্যাক্স।

এটা জাস্ট প্রিকশন। বরফশীতল স্বরে জবাব দিল রায়।

মৃদু হেসে ঘাড় ঝাঁকালেন কাকু।

লিফট থামতেই সন্তর্পণে করিডরে পা দিলেন তিনি। মহিন রায়কে ইশারায় আহ্বান জানালেন। সামনেই একটা ফ্ল্যাটের দরজা। মহিন লক্ষ করল ফ্ল্যাটের নম্বর ১২। দরজার ডান পাশে একটা কলিংবেল। শর্মা বারকয়েক কলিংবেলে চাপ দিলেন। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না ভেতর থেকে।

শর্মা ঘাড় ফিরিয়ে মহিনের দিকে একপলক তাকালেন। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন চাবিভরতি রিংটা।

রায় চুপচাপ লক্ষ করে চলল শর্মার কার্যকলাপ।

মিনিটদুয়েক ধরে চাবির গোছা নিয়ে কীসব খুটখাট করলেন তিনি। তারপরই হাতল ঘুরিয়ে একটু-একটু করে খুলে ফেললেন ফ্ল্যাটের দরজা।

অভ্যাসবশে মহিন নিমেষের মধ্যে হোলস্টার থেকে বের করে নিল ওর লুগার অটোমেটিক। শর্মা কিন্তু ফিরেও তাকালেন না। আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকে পড়লেন। অতি সাবধানে তাকে অনুসরণ করল মহিন রায়।

শর্মা আলোর সুইচ অন করে অল্প পাওয়ারের একটা আলো জ্বেলে দিলেন।

একইসঙ্গে মহিনও ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল ফ্ল্যাটের দরজা।

মিস্টার রায়, এই হল সতীশের ঘর। ভালো করে দেখে রাখুন।

মহিন পেশাদার চোখে ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল।

দরজার ডান পাশে একটা ছোট টেবিল। তার ওপর অগোছালোভাবে পড়ে রয়েছে খানকতক ক্রিমিনোলজির বই। টেবিল থেকে হাততিনেক দূরে একটা স্টিলের আলমারি। ডানদিকের দেওয়ালে ঝুলছে তিনটে ক্যালেন্ডার। ছবিগুলো নেহাতই ঠাকুর-দেবতার। দরজার মুখোমুখি একটা ছোট বারান্দা।

বারান্দার দু-দিকের দেওয়ালে দুটো জানলা। অত্যন্ত ছোট মাপের–গরাদ দেওয়া।

বাঁ-দিকের জানলার পাশে একটা বড় ওয়াল ক্লক। তার রেডিয়াম দেওয়া কাটা এই অল্প আলোতেও জুলজুল করছে। ঘড়ির দিকে নীচেই একটা টিপয়। তার ওপরে একটা টেলিফোন : সাদা রঙের।

ঘরের বাঁদিকে একটা লম্বা-চওড়া খাট। বিছানার সাদা চাদর বহু ব্যবহারে ময়লা হয়ে গেছে। একজোড়া বালিশ খাটের ও-মাথায় পড়ে রয়েছে। তার পাশে কিছু জামাকাপড়। আর এ-মাথায় পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা ভাজ করা চাদর। খাটের নীচ থেকে উঁকি মারছে একটা স্যুটকেস, একটা ট্রাঙ্ক। দরজার বাঁদিকে একটা বড় কাঠের বাক্স ও তালাবন্ধ। তার পাশে একটা কুঁজো কাচের গ্লাস দিয়ে ঢাকা দেওয়া। আর চোখে পড়ছে একটা ছোট দরজা। সম্ভবত বাথরুম।

প্রতিটি জিনিসের ওপরে চোখ বুলিয়ে মহিন রায়ের চোখ এসে স্থির হল কাকু শর্মার চোখে। কাকু বুঝতে পারলেন মহিনের নীরব প্রশ্ন। তাই জবাব দিলেন, এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখার ভীষণ দরকার আছে, মিস্টার রায়। এই ঘরের

প্রতিটি ফার্নিচার এবং তাদের পজিশান আপনাকে এমনভাবে মনে রাখতে হবে, যাতে কেউ এ-বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করলে আপনি তার কারেক্ট আনসার দিতে পারেন।

কিন্তু কেন? মহিন জিগ্যেস করল।

কারণ, অপারেশন সতীশ এক্সিকিউট করতে হবে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সুতরাং ওই অন্ধকারে আপনার নিজের পজিশান সঠিক রাখার জন্যে অন্যান্য আসবাবপত্রের পজিশান আপনাকে মেমোরাইজ করতেই হবে।

তারপর?

এবার আমি খুনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই।

মহিন সোজা গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল। রিভলভারটা আবার হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর উৎসুক চোখ মেলে তাকাল কাকুর দিকে।

রাত ঠিক বারোটার সময় আমি আপনাকে এই ফ্ল্যাটের কাছে পৌঁছে দেব। আর সঙ্গে দিয়ে দেব এই ফ্ল্যাটের দরজার চাবি। তারপর, আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, আপনি এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনবেন। কারণ ওই সময়ের মধ্যেই আমি রাস্তার ওপারে যে-ডাক্তারখানা আছে, সেখান থেকে সতীশকে ফোন করব। তখন আপনি ফোনের শব্দ শুনতে পাবেন। তারপর কথাবার্তায় যখনই বুঝবেন সতীশ রিসিভার টেবিলে রেখে বারান্দার কাছে যাচ্ছে, তখনই আপনি নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওর ঘরে ঢুকে পড়বেন।

কিন্তু আপনি কী করে শিয়োর হচ্ছেন যে, মিস্টার দেবনাথ বারান্দার কাছে যাবেন?

অধৈর্য হবেন না, মিস্টার রায়। বাইরের করিডর পুরো অন্ধকার থাকবে। অতএব সতীশ আপনাকে দেখতে পাবে না। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তবে সতীশ রিসিভার তুলে কথা বলার পর নিশ্চয়ই বারান্দার কাছে যাবে। কারণ, আমি তাকে ফোনে বলব, একটা লোক পাইপ বেয়ে তার বারান্দার ওঠার চেষ্টা করছে? সম্ভবত লোকটার মতলব ভালো নয়।

ও। তা হলে দেবনাথ তখন বারান্দার যাবেই। দেখতে চেষ্টা করবে, পাইপ বেয়ে সত্যিই কেউ ওঠার চেষ্টা করছে কি না। আর তখনই আমি…।

ছুটে গিয়ে ওকে বাইরে পড়তে সাহায্য করবেন। ক্লিয়ার?

অ্যাবসলিউটলি! দাঁতে দাঁত ঘষে জবাব দিল মহিন।

তা হলে নেক্সট উইকে, এই একই দিনে, আমরা এখানে আসব, আর সেটাই হবে সতীশ দেবনাথের শেষ রাত।

কাকুর কথা শেষ হতে না-হতেই একটা সামান্য শব্দে ওরা দুজনেই তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠল। কাকু তীরবেগে ছুটে গেলেন আলোর সুইচের দিকে। আর একইসঙ্গে রিভলভারটা বের করে মহিন দৌড়ল আলমারি লক্ষ করে।

রায় আলমারির আড়ালে লুকিয়ে পড়ামাত্রই নিভে গেল ঘরের আলো। অন্ধকারে ও কাকুকে দেখতে পেল না।

এদিকে বাইরের পায়ের শব্দ এসে থেমেছে দরজার কাছে। তারপর শোনা গেল দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ।

একটু পরেই সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে দরজার পাল্লা ফাঁক হতে শুরু করল।

বাইরের আলোর পটভূমি দেখা গেল দরজায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক ছায়ামূর্তি।

হঠাৎ রায় অনুভব করল কার হাতের স্পর্শ। ও চমকে উঠতেই কানে এল কাকুর ফিসফিসে চাপা গলা, সতীশ দেবনাথ!

ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গেল আলোর সুইচের দিকে। আর সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই মুহূর্তে ঝনঝন করে বেজে উঠল ঘরের টেলিফোন। ছায়ামূর্তি আলো না জ্বেলে ফোনের দিকে পা বাড়াতেই বিদ্যুঝলকের মতো দরজা লক্ষ করে ছুটে গেল মহিন আর কাকু। পলকের মধ্যে দরজা খুলে ওরা করিডরে পা দিল।

মহিন কাকুর আগে আগে ছুটছিল। ও দৌড়ে লিফটে উঠতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ভীষণভাবে নিজেকে সামলে নিল।

লিফটের জায়গায় লিফট নেই। অথচ কোলাপসি গেটটা হাট করে খোলা। উঁকি মেরে দেখল, লিফট দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই একতলায়।

তা হলে কোলাপসিবল গেটটা খুলল কী করে? কে-ইবা খুলল?

মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি লক্ষ করে দৌড়তে শুরু করল মহিন। ওর পিছনে-পিছনে কাকু। তার পিছনে কি কারও পায়ের শব্দ ভেসে আসছে?

কীভাবে যে ওরা শেষ পর্যন্ত রাস্তায় এসে পৌঁছোল, তা ওদের মনে নেই। সতীশের বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। আজ খুব জোর বেঁচে গেছে!

চলে যাওয়ার আগে কাকু মহিনের কাঁধে টোকা মেরে মনে করিয়ে দিলেন, আগামী শুক্রবার রাত এগারোটায় আমরা বেরোব। আপনি আমার বাড়িতে সময়মত আসবেন, মিস্টার রায়। কারণ, পাংচুয়ালিটি আমি পছন্দ করি।

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল মহিন রায়। লুগার অটোমেটিক তখন ওর হোলস্টারে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। কিন্তু ওর কপালে জমে ওঠা ঘামের ফোঁটা রাস্তার আলোয় চকচক করছিল।

.

শুক্রবার। রাত সাড়ে এগারোটা।

সতীশ দেবনাথের ফ্ল্যাট থেকে কিছুটা দূরে একটা লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাকু। তার পাশে মহিন। ওর পরনের পোশাকে কোনও পরিবর্তন হয়নি। বুকের বাঁপাশটা সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে। না, অটোমেটিক লুগারকে মহিন রায় কোনও অবস্থাতেই কাছ ছাড়া করতে রাজি নয়।

দুজনের নজরই চারতলার অন্ধকার জানলার দিকে।

এই নিন। সতীশের ফ্ল্যাটের চাবি।

চুপচাপ কাকুর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে ডান পকেটে ভরে ফেলল রায়। এই উৎকণ্ঠাময় অপেক্ষা ও একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, ঘড়ির কাঁটা কখন গিয়ে ঠেকবে বারোটার ঘরে।

মিস্টার রায়, বিরক্তিকর মনে হলেও ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আরও একবার আপনাকে মনে করিয়ে দিই। কেশে গলা ঝাড়লেন কাকু?

ঠিক বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় আমি আপনাকে সতীশের ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে দেব। করিডর অন্ধকার থাকবে। আশা করি আপনার চলাফেরায় কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আপনি এক থেকে একশো পর্যন্ত মনে-মনে গুনবেন। তারপর চাবি নিয়ে ঘরে ঢোকার জন্যে তৈরি হবেন। ঠিক সেই সময়ে আপনি শুনতে পারেন টেলিফোনের শব্দ। টেলিফোনের কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ঠিক তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করে আপনি দরজা খুলবেন। আর আমার অঙ্কে যদি ভুল না হয় তবে দরজা খুলেই আপনি দেখবেন বারান্দায় দাঁড়ানো অসতর্ক সতীশকে। ব্যস, বাকি কাজটুকু এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই আপনাকে সারতে হবে। তারপর পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোটের বান্ডিল বের করে মহিনের চোখের সামনে নাচালেন কাকু : আপনি নিন বা না নিন, আমার ডিউটি আমি করব।

ক'টা বাজে এখন? নিরুত্তাপ গলায় জানতে চাইল মহিন।

পৌনে বারোটা। আর মাত্র দশ মিনিট।

ধীরে-ধীরে সময় গড়িয়ে চলল।

জিরো আওয়ার। চলুন যাওয়া যাক। কাকু শর্মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন। মহিনের ডানহাতের পাঁচ আঙুল অনুভব করল লুগারের অস্তিত্ব। তারপর চুপচাপ ও কাকুকে অনুসরণ করল।

নিঝুম বাড়ি। সদর দরজার তালা খুলতে কাকুর লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ভেতরটা একেবারে অন্ধকার।

আন্দাজে ভর করে দুজনেই এগিয়ে চলল।

হাতড়ে-হাতড়ে লিফটের দরজা হাতে ঠেকল কাকুর।

এদিকে চাপাস্বরে হতভম্ব মহিনকে আহ্বান জানালেন তিনি।

লিফটে ঢুকেই সুইচ অন করে অল্প পাওয়ারের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন কাকু। তারপর চারনম্বর বোতাম টিপলেন।

ওপরের দিকে নিঃশব্দে ছুটে চলল লোহার খাঁচা।

লিফট থামতেই সুইচ অফ করে কাকু আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে দরজা খুলে মহিনকে এগোতে ইশারা করলেন ও যান–দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনবেন। তারপর–।

আপনি আপনার কাজ করুন। মৃদু খসখস শব্দ করে অন্ধকার করিডরে পা রাখল মহিন।

কাকু লিফটের দরজা বন্ধ করে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপলেন।

লিফট নামতে শুরু করল।

নিঃশব্দে সতীশের ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মহিন। লুগার অটোমেটিক হোলস্টার থেকে বের করে দু-হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ও। তারপর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে গুনতে শুরু করল, এক–দুই-তিন–।

.

রাস্তায় লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে হাতঘড়ি দেখলেন কাকু। তার হাতঘড়িতে কাটায়-কাঁটায় বারোটা বাজতেই এগিয়ে গেলেন কাছেই এক ডাক্তারখানার দিকে। তার কঠিন মুখে সিদ্ধান্তের আভাস।

ডাক্তারখানায় ঢুকে কাউন্টারের ওপর একটা আধুলি ছুঁড়ে দিলেন তিনি। কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের বাঁ-পাশে রাখা টেলিফোনের দিকে।

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন। ডাক্তারখানার শীর্ণ চেহারার কর্মচারীটি জুলজুল করে কাকুকে দেখতে লাগল।

.

ঠিক বারোটা বাজতেই দরজার বাইরে দাঁড়ানো মহিনের কানে এল দেওয়ালঘড়ির স্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ। ঢং-ঢং-ঢং-।

রাত্রির নিটোল নিস্তব্ধতা চুরমার করে বারোবার বাজার পর থামল সেই দেওয়ালঘড়ির শব্দ।

তারপরই মহিনের কানে এল ভেতরে কারও নড়াচড়ার শব্দ। লুগার আঁকড়ে ধরে ওঁত পাতা জাগুয়ারের মতো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এল মহিন। অস্পষ্টভাবে ওর নজরে পড়ল কলিংবেলের সুইচ, রুম নম্বরের ঝাপসা সাদা অক্ষর দুটো ও ১২। কিন্তু ওর কান সজাগ। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি টান-টান।

হঠাৎই টেলিফোনের কর্কশ বেসুরো ঝনঝন শব্দে মহিন ভীষণভাবে চমকে উঠল। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে পকেট থেকে বের করল সতীশের ফ্ল্যাটের চাবি। ঘরের ভেতর কেউ রিসিভার তুলে নিল।

হ্যালো—

…

কে কথা বলছেন? এ-প্রান্তে দেবনাথের স্বর উত্তেজিত।

…

অসম্ভব। বাইরের পাইপ বেয়ে ওঠা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়!

…

হতেই পারে না। ঠিক আছে, তবু একবার দেখছি। হ্যালো? হ্যালো? হ্যাঁ।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ। মহিন একমনে দেওয়ালে কান পেতে সব শুনছিল। সতীশের দ্বিতীয় কথা শোনামাত্রই চাবি ঢুকিয়ে দিয়েছিল দরজার ফুটোয়।

সতীশ রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে মহিনের পেশাদার হাতের নিখুঁত চাপে নিঃশব্দে দরজা খুলতে শুরু করল।

দরজা পুরোটা খুলতেই মহিন একপলক থমকাল। লুগারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। দেখল…।

.

সামনের রাস্তায় অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছেন কাকু শর্মা। বারোটা পাঁচ বাজতেই তিনি সতীশের বাড়ির দিকে হেঁটে চললেন। পকেট থেকে বের করে নিলেন একটা পেনসিল টর্চ। তার আলোর পথ দেখে তিনি খোলা সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন লিফটের দিকে। লিফটে উঠে চারনম্বর বোতাম টিপলেন। লিফট নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল।

.

মহিনের প্রথম নজর গেল বারান্দার। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি। দেখা যাচ্ছে বাইরের খোলা আকাশ। তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তিকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঠিক জমাট পাথরের মতো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে একই জায়গায়। ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে।

বাঁ-পাশে চোখ সরাতেই নজরে পড়ল ছোট্ট জানলা। পাল্লা দুটো না দেখা গেলেও, গরাদের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাইরের কালো আকাশ। তার সামান্য পাশেই দেওয়ালে চকচক করছে দেওয়ালঘড়ির কাটা। ছোট কাটা আর বড় কাঁটা দেখে বোঝা যায় রাত বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটের কিছু বেশি। তার নীচেই আবছাভাবে চোখে পড়ছে টিপয়ের ওপরে বসানো টেলিফোন। ছোট জানলার সঙ্গে বারান্দার ডানদিকের জানলার তেমন কোনও তফাত নেই। ওটাও হাট করে খোলা। বাইরের সামান্য আলোর খাট, বালিশ, বিছানাও মহিনের চোখ এড়াল না।

এইসব চোখ বুলিয়ে দেখতে মহিনের লাগল ঠিক ছসেকেন্ড। পরমুহূর্তেই ও জীবনপণ করে ছুটল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। দুজনের মধ্যেকার দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে কমতে লাগল।

হঠাৎই মহিন আবিষ্কার করল ও ঠিক সতীশের পিছনে দাঁড়িয়ে। সর্বশক্তি দিয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে ও ঝুঁকে পড়া সতীশকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই কী যেন হয়ে গেল। দুলে উঠল বারান্দা, জানলা, ঘড়ি–এমনকী গোটা দেওয়ালটা। মহিন হঠাৎ যেন অনুভব করল ও শূন্যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপরে আকাশ। চারিদিকে ঠান্ডা বাতাস। জ্বলজ্বলে নক্ষত্ররা প্রতিফলিত হল মহিনের চোখের তারায়।

সমস্ত পৃথিবীটা মহিনের চোখের সামনে ঘুরপাক খেয়ে হঠাৎই উলটে গেল। দুটো ডিগবাজি খেয়ে জ্যাক নাইফ ডাইভিং-এর মতো ও সোজা এসে পড়ল বাইরের বাঁধানো রাস্তায়। তখনও পুরো ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতা, বিস্ময় ওর মনকে ছুঁয়ে রেখেছে।

মহিনের কালো পোশাক পরা চেহারাটা ঠিক মরা দাঁড়কাকের মতো হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল। ঘাড় মটকে মাথাটা এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় পিছনদিকে চেয়ে রয়েছে। হাঁ করা মুখের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে এসেছে। রক্তাক্ত মুখে নিষ্প্রাণ চোখজোড়ায় শুধুই বিস্ময়। মরে গিয়েও মহিন যেন এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

.

লিফট পাঁচতলায় এসে থামতেই কাকু শর্মা করিডরে পা দিলেন। পেনসিল টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে গেলেন ফ্ল্যাটের খোলা দরজার দিকে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর পেনসিল টর্চ পকেটে রেখে দেশলাই বের করলেন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের এক কোনায় রাখা একটা হ্যারিকেন নিয়ে এলেন। বোঝা গেল, এ-ঘরের সঙ্গে তিনি ভীষণভাবে পরিচিত। হ্যারিকেনের আলো জ্বালতেই কতকগুলো জিনিস চোখে পড়ল।

খাট, বিছানা, বালিশ ও টিপয়ের ওপরে রাখা টেলিফোন ছাড়া পুরো ঘরটাই ফাঁকা। ঘরে আর কোনও আসবাবপত্র নেই। ঘরের সিলিং ঢালাই করা সিমেন্টের নয়–প্লাইউডের তৈরি বারান্দার দিকের দেওয়ালও দেওয়াল নয় কালো রং করা প্লাইবোর্ড। বারান্দার জায়গাটা প্লাই কেটে তৈরি করায় বাইরের আকাশ চোখে পড়ছে। বারান্দার দুপাশের জানালাও একইভাবে প্লাইউড কেটে গরাদের মতো করা। জানলায় কোনও পাল্লা নেই। দেওয়ালঘড়ির জায়গায় কালো প্লাইয়ের

ওপরে লুমিনাস পেইন্ট দিয়ে মিনিটের কাঁটা আর ঘণ্টার কাঁটা আঁকা রয়েছে–এমনভাবে, যাতে অন্ধকারে বারোটা বেজে পাঁচ-সাত মিনিট বলে মনে হয়।

জিনিস গুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে কাকু মুচকি হাসলেন। এগিয়ে গিয়ে বালিশের নীচ থেকে টাইম অ্যান্ড ক্লক ডিভাইস অটোমেটিক টেপ রেকর্ডার বের করলেন। রেকর্ডারের টেপ তখনও ঘুরে চলেছে। কাকু উলটোদিকে ঘুরিয়ে দিলেন টেপের গতি। তারপর একসময় সুইচ টিপে প্রথম থেকে চালাতেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ ঢং-ঢং-ঢং। দেওয়ালঘড়ির ঘণ্টার শব্দ। ঠিক বারোবার বাজল। তারপর শোনা গেল কারও চলাফেরায় শব্দ। তারও কিছু পরে টেলিফোনের ক্রিং রিং–রিং ক্রিং রিং– রিং, এবং সবশেষে মহিনের শোনা কথাবার্তা আবার হুবহু শোনা গেল। এমনকী রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দও বাদ গেল না।

কাকুর তৈরি এই নাটুকে ঘরের একদিকে দরজা, তার দুপাশে দেওয়াল, কিন্তু আর-একটা দিকে এখনও দেওয়াল গাঁথা হয়নি–যেদিক দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েছে মহিন রায় এবং বারান্দার দাঁড় করানো কার্ডবোর্ডের মূর্তিটা।

এবার ক্লান্তভাবে খাটের ওপরে বসলেন কাকু। বহুদিনের প্রতীক্ষার পর তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস।

*

ঠিকই আন্দাজ করেছেন আপনারা। সতীশ দেবনাথ এবং কাকু শর্মা এক ও অভিন্ন। আগেই তো বলেছিলাম, এই শার্প দেবনাথের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে কেউ পেরে ওঠেনিপারবেও না।

মহিনের মোক্ষলাভের ব্যাপারে কতকগুলো ব্যাপারে হয়তো আপনাদের ধন্দ লাগছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, একটা বড় সূত্র অনেক আগেই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। আজ যখন মহিনকে নিয়ে আমি লিফটে উঠলাম, তখন কত নম্বর বোতাম টিপেছি বলতে পারেন? চার নম্বর। অথচ প্রথমদিন ওকে যখন আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসি, তখন টিপেছিলাম তিননম্বর। তা হলে? ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে না আপনাদের কাছে?

তা হলে প্রথম থেকেই বলি।

আপনাদের হয়তো মনে আছে, মহিনকে সরানোর ব্যাপারে লোকেশান ঠিক করতে আমার সময় লেগেছিল একটি মাস। কারণ, তৈরি হচ্ছে এইরকম একটা ফ্ল্যাট বাড়ি আমার প্রয়োজন ছিল। এবং প্ল্যানমতো পাঁচতলার একটা আধা-তৈরি ঘরের ঠিক নীচে, চারতলার ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। আসবাবপত্রে সাজিয়ে ফেললাম ঘরটা। আর ওপরতলার মরণ-ফ্ল্যাটের সেট তৈরির সরঞ্জাম জোগাড় করে ফেললাম।

প্রথমে পরদাটাকে কাঁচি দিয়ে এমনভাবে কাটলাম, যাতে অন্ধকারে টাঙিয়ে রাখলে মনে হয় একটা বারান্দার দুপাশে দুটো জানলা (ঠিক আমার ফ্ল্যাটের মতো)। ব্যস, প্রাথমিক কাজ শেষ হল।

সুতরাং, তারপরই আমি দেখা করলাম মহিনের সঙ্গে। ও এই কিলিং বিজনেস-এ নামার পর থেকেই মোটামুটি ওই একই জায়গায় ঘোরাফেরা করে। তাই ওকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না। তারপর কায়দামতো সাজিয়ে গুছিয়ে একটা ভুয়ো গল্প ফেঁদে বসলাম। আর সেই ফাঁদেই মহিন পা দিল।

প্রথম দিন ওকে নিয়ে গেলাম সেই মরণ-ফ্ল্যাট পরিদর্শনে। এমনভাবে ঘরের প্রতিটি জিনিস ওর মনে গেঁথে দিলাম, যাতে অন্ধকারেও ওর কোনও অসুবিধে না হয়। আমি যে সতীশ নই, সেটা প্রমাণের জন্যে একজন পেশাদার অভিনেতাকে ওই সময়ে আমার ফ্ল্যাটে আসার জন্যে বলে রেখেছিলাম। তা ছাড়া কী কী করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে যে কীরকম কাজ হয়েছে তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। আজ অন্ধকারে মহিন যখন দেখল খাট, বিছানা, বালিশ, টেলিফোন, জানলা, বারান্দা, ঘড়ি–সবই ঠিক জায়গায় ঠিকমতোই রয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওর অবচেতন মন ধরে নিল, সেই একই ঘরে ও এসেছে। যে-যে ফার্নিচার ঘরে নেই, সেগুলোও আছে বলে ওর মন কল্পনা করে নিল। একে বলে সাইকোলজিক্যাল ইলিউশান, অথবা, সাইকোলজিক্যাল ইমপ্লিকেশান।

ঠিক একইভাবে অন্ধকারে প্লাইয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো একটা কার্ডবোর্ডের মূর্তিকে ও আসল মানুষ বলে ভুল করল। কারণ, আমার শোনানো সেই টেলিফোন করার গল্প। তার ওপর সাইকোলজিক্যাল কনভিকশানের জন্যে সামান্য টেপরেকর্ডারের ব্যবস্থা। ব্যস। আমার বলে যাওয়া গল্প আর আপাতদৃষ্টিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা যোগ করে ও ধরে নিল, ও সেই একই ঘরে এসেছে, এবং সেই ফ্ল্যাটের বারান্দার দাঁড়িয়ে আছে সত্যিই একটি জলজ্যান্ত মানুষ।

তারপর যা হওয়ার তাই হল। ছুটে গিয়ে ওই মূর্তিটাকে ধাক্কা দিতেই ও পলকা প্লাইয়ের বাঁধন ছাড়িয়ে শূন্যে পা দিল।

ও যদি অন্ধকার ঘরে একটু ঘুরে-ফিরে দেখত, তা হলে বুঝত–ওই খাট, টেলিফোন ছাড়া আর কোনও ফার্নিচারই ঘরে নেই। আর ঘড়ির কাঁটার জায়গায় রয়েছে লুমিনাস পেইন্ট দিয়ে আঁকা দুটো সরলরেখা। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করায় রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি বলে ভুল হয়। কিন্তু টেপরেকর্ডারের বারোটা বাজার ঘণ্টা, আর দেওয়ালের বারোটা পাঁচের লুমিনাস পেইন্টের দাগ দেখে ও ধরে নিল ওটা সত্যিই একটা দেওয়াল-ঘড়ি।

সুতরাং আপনারাই বলুন, এইরকম একটা বুদ্ধিদীপ্ত সাইকোলজিক্যাল মার্ডার আমি ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব?

তবে মহিনকে একটা সূত্র দিয়েছিলাম লিফটের বোতাম টেপার সময়। আমার ফ্ল্যাট যদি চারতলায় হয়, তবে আমাকে তিন নম্বর বোতাম টিপতে হবে। কিন্তু মহিন বোঝেনি, চার নম্বর বোতাম টেপার পর যে-তলায় গিয়ে লিফট থেমেছে, সেটা আমার ফ্ল্যাট নয়। সেটা পাঁচতলার সেই অসম্পূর্ণ মরণ-ফ্ল্যাট। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ দরজায় লাগিয়ে দিলাম প্লাস্টিকের ১২ নম্বর ও একটা কলিংবেলের ক্যাপ কারণ, ডিটেলের প্রতি আমি গভীর মনোযোগ দিই।

.

অতএব মনে রাখবেন বন্ধুগণ, প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম শার্প দেবনাথ। এই কিলিং মার্কেটে যিনি মনোপলি বিজনেস করে চলেছেন। সুতরাং তার সঙ্গে দুশমনির কথা ভুলেও মনে আনবেন না। তা হলে আপনাদেরও অবস্থা হবে ওই মহিন রায়ের মতো। কাউকে মোক্ষলাভ করানোর পর আমি মনে-মনে ভীষণ দুঃখ পাই, বিশ্বাস করুন। কিন্তু কী করব, আমি নিরুপায়। আফটার অল, আই অ্যাম দ্য কিং অফ প্রফেশনাল কিলার্স। দ্য গ্রেট শার্প। সুতরাং—।

# সাবধান! সাপ আছে (২)

**সাবধান! সাপ আছে (২)**

চায়ের কাপে লম্বা এক চুমুক দিয়ে বিনু বলল, আজ তোকে একটা সাপের গল্প শোনাব...। ওর কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একইসঙ্গে মনে হল, ছোট্ট খোলা জানলাটা দিয়ে কুলকুল করে ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল স্যাঁতসেঁতে ঘরটায়।

বিনুর কাণ্ডই এইরকম। হুটহাট করে উদ্ভট সব মন্তব্য করে বসে। সবসময় বলে ওর গল্পগুলো নাকি সত্যি। কে জানে! তবে ওর গল্পগুলো বেশিরভাগ সময়েই অস্বস্তিকর। অথচ শুনতেও মন চায়।

সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে নিশাচর সরীসৃপের মতো শীতেরও তেজ বেড়েছে। বিনুদের পুরোনো ধাঁচের বাড়িতে দুজনে বসে আড্ডা মারছিলাম। ও দিন দশেকের জন্য কলকাতায় এসেছে। এসেই আমাকে টেলিফোন : ডে অ্যান্ড নাইট আড্ডা মারবি তো চলে আয়...।

আমি জিগ্যেস করলাম, অ্যাদ্দিন কলকাতা ছেড়ে কোথায় ছিলি?

ভুবনবটুয়া ও হেসে জবাব দিল।

ও যে দেশের কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় সে ও-ই জানে! যেমন নাম-না-শোনা ওই ভুবনবটুয়া থেকে দশদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছে, দশদিন পর তেমনই কোনও নাম-না-শোনা জায়গার দিকে রওনা হয়ে যাবে। ও ভারি বিচিত্র। মাঝে-মাঝে মনে হয়, ওর ভিতরে বোধহয় কোনও গোলমাল আছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও আমার এই উড়ে বেড়ানো, ঘুরে বেড়ানো বন্ধুকে আমার চমৎকার লাগে। আবার ওকে আমি ভয়ও পাই–ওর অদ্ভুত সব গল্পের জন্যে।

গোটা বাড়িতে আমরা একা। বিনুই একটু আগে চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করেছে। বলেছে, যদি এখানে রাতটা থেকে যাস তাহলে রসেবশে থাকার ব্যবস্থা করব।

আমি হাতজোড় করে হেসে বলেছি, মাফ করো, ভাই, আমি তোমার মতো রসিক নই। তারপর হাতঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে আরও বলেছি, রাত বাড়ছে, তুমি তাড়াতাড়ি তোমার গপ্পোটা শুরু করো।

বিনু সেদিন যে-গল্পটা আমাকে বলেছিল সেটা শোনার পর থেকে আমি একেবারে বদলে গেছি। আমার বুকের ভিতরে কেমন একটা ভয় ঢুকে গেছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠি, সারা শরীরের কুলকুল করে ঘাম দেয়। কেন জানি না, বিনুর কথাগুলো আমি আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি বিশেষ করে ওর শেষ কথাগুলো।

বিনু ওর গল্পটা বলতে শুরু করল।

.

কৃষ্ণা প্রথম যেদিন ব্যাপারটা দ্যাখে সেদিন ও দিশেহারা পাগল হয়ে গিয়েছিল। নিজের চোখকে ও বিশ্বাস করতে পারেনি। সারা গা শিউরে উঠেছিল আতঙ্কে ঘৃণায়। গলা শুকিয়ে কাঠ, আর একইসঙ্গে দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুখের ভিতরে জিভটা মনে হচ্ছিল নেহাতই খসখসে শুকনো চামড়ার একটা টুকরো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের এই যে, বিয়ের চার বছরে কোনওদিন ব্যাপারটা ওর নজরে পড়েনি। অথবা অংশুমান কখনও ওকে এ-বিষয়ে কিছু বলেনি।

কৃষ্ণা বরফে গড়া মূর্তির মতো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অংশুমানকে দেখছিল। অংশুমান টেলিফোনে কথা বলছে, আর মাঝে মাঝেই গলা ছেড়ে হেসে উঠছে।

একটু আগেই যখন ফোনটা বেজে উঠেছিল তখন কৃষ্ণাই ফোন ধরেছিল। তারপর অংশুমানের দিকে রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলেছে, তোমার ফোন।

আজ রবিবার ছুটির দিন। তাই ওরা দুজনেই বেলা করে উঠেছে। তারপর রোজকার কাজ সেরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসতে বসতে সাড়ে নটা বেজে গেছে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিল অংশুমান। সেই সময়েই টেলিফোনটা বেজে উঠেছে।

অংশুমানের ডান কানের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণা। এইরকম একটা অসম্ভব দৃশ্য ওর চোখ অথবা মস্তিষ্ক বাস্তব বলে মেনে নিতে পারছিল না। আতঙ্কে ও কয়েক পা পিছিয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল অতিপরিচিত সেই দুঃস্বপ্নের মতো যখন লোকে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে চায়, অথচ পারে না।

রিসিভারটা অংশুমান বাঁকানে চেপে ধরেছিল। তখনই ওর ডান কানের ফুটো দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে লালায় ভেজা হিলহিলে চকচকে একটা সরীসৃপের লেজ।

লেজটার রং উজ্জ্বল সবুজ–তার ওপরে হলুদ আর কালো বুটি। কৃষ্ণার কড়ে আঙুলের মতো সরু লিকলিকে তার শরীর।

এই রঙের কোনও সাপ সত্যি-সত্যি আছে কি না কৃষ্ণা জানে না। তবে লেজটাকে দেখে প্রথমে ওর সাপের কথাই মনে হয়েছে–অন্য কোনও সরীসৃপের কথা মাথায় আসেনি।

লেজটা অংশুমানের কানের ফুটো দিয়ে প্রায় চার-পাঁচ ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে। সেই অবস্থায় ছুঁচোলো লেজের ডগাটা এপাশ-ওপাশ মোচড় দিয়ে নড়ছে, শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অংশুমান কিন্তু একইরকম নির্বিকার ভঙ্গিতে ফোনে কথা বলে যাচ্ছিল। ফুর্তির গলায় হাসছিল। বোধহয় ওর কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলছিল।

কৃষ্ণা পাথর হয়ে গিয়ে স্বামীকে দেখছিল, আর সেইসঙ্গে ভয়ংকর হিলহিলে সবুজ সাপটা দেখছিল। সাপের লেজটা যেন কোন এক অলৌকিক উপায়ে ওকে বশ করে ফেলেছিল।

একটা প্রাণান্তকর চিৎকার বহুক্ষণ ধরেই কৃষ্ণার নাভির কাছ থেকে উঠে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অংশুমান কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখার পরই সেটা বাইরে বেরিয়ে এল।

অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুবে থাকার পর মানুষ যেভাবে ভেসে ওঠে, ঠিক সেভাবেই তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারটা বেরিয়ে এল কৃষ্ণার ঠোঁট চিরে।

সাপ! সাপ! সাপ।

কোথায়? প্রশ্নটা করে অংশুমান অবাক হয়ে তাকাল কৃষ্ণার দিকে।

কৃষ্ণা হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনওরকমে বলল, তোমার কানে তোমার ওই কানটায়…।

হতভম্ব অংশুমান হাত বাড়াল ওর ডান কানের দিকে।

কিন্তু কৃষ্ণা অবাক হয়ে দেখল, অংশুমানের ছোঁয়া এড়িয়ে সাপের লেজটা সড়সড় করে ঢুকে গেল কানের ভিতরে। ফলে অংশুমান কিছুই টের পেল না। বরং ও কৃষ্ণাকে আশ্বস্ত করতে ডান কানের ভিতরে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে কয়েকবার মোচড় দিল। তারপর দরাজ গলায় হেসে উঠে বলল, লাইব্রেরি থেকে উলটোপালটা সব বই এনে পড়ছ বুঝি?

কৃষ্ণা অবাক চোখে ওর সুপুরুষ স্বামীকে দেখছিল। ভালোবেসে বিয়ে করা এই মানুষটার মানে আজ থেকে কি তা হলে পালটে গেল! এই চার বছরে ও একটুও বুঝতে পারেনি এই মানুষটার ভিতরে একটা সাপ আছে!

অংশুমান খাওয়ার টেবিলে ফিরে এসে আবার খবরের কাগজ নিয়ে বসল। তারপর হালকা গলায় বলল, আমার এই কানটা ভীষণ চুলকোচ্ছে। রান্নার ঝামেলা মিটলে একটু কানখোঁচানি দিয়ে দেখে দিয়ো তো।

অংশুমানের কানে ময়লা জমলে কৃষ্ণাই সবসময় পরিষ্কার করে দেয়। এই একটা ব্যাপারে অংশুমান এখনও বাচ্চা ছেলে রয়ে গেছে।

কিন্তু এখন অংশুমান ওর ডান কানটা দেখিয়েছে–যে কানে একটু আগেই ওই সাপটা ঢুকে পড়ে আস্তানা গেড়েছে।

কল্পনায় কান পরিষ্কার করার দৃশ্যটা কৃষ্ণা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ও অংশুমানের কানের সুড়ঙ্গ বরাবর দেখতে চেষ্টা করছে। তারপর তামার তৈরি কানখোঁচানিটা ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সুড়ঙ্গের ভিতরে, এদিক-ওদিক

নাড়াচ্ছে। ঠিক তখনই সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে হিংস্র ফোঁস-ফোঁস শব্দ ভেসে এল। তারপর কানখোঁচানিটা ভিতর থেকে কেউ টেনে ধরল। কৃষ্ণা প্রাণপণে টেনেও ওটাকে বের করে নিতে পারছে না। টানাপোড়েনের সে এক অদ্ভুত লড়াই!

কৃষ্ণার গায়ে কাঁটা দিল। ও শিউরে উঠে বলল, তুমি নিজে দেখে নিয়ো। আমার ভয় করছে, আমি পারব না।

অংশুমান হেসে বলল, তোমার এই মিছিমিছি ভয়ের কোনও মানে হয় না…

ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষ্ণার নজর গেল অংশুমানের ডান কানের দিকে। সবুজ লেজের ডগাটা আবার বেরিয়ে এসে উঁকি মেরে ওকে দেখছে, আর থেকে থেকেই সামান্য ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অনেকটা যেন কোনও বাচ্চা ছেলের টুকি দেওয়ার মতো।

কৃষ্ণা এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠতেই লেজের ডগাটা টুক করে ঢুকে পড়ল কানের ভিতরে।

এই ঘটনার পর থেকেই কৃষ্ণা অংশুমানকে ভয় পেতে শুরু করল। অংশুমান টেলিফোনে কথা বলার সময় ও কিছুতেই সেদিকে তাকাত না। অন্য ঘরে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করল। স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময় ও বারবারই তাকাত তার কানের দিকে। আর ভাবত, সবুজ রঙের ঠান্ডা শরীর নিয়ে লালায় ভেজা সাপটা কখন আবার বাইরে বেরিয়ে আসবে। এইরকম অদ্ভুত একটা ভয় ওকে পাগল করে তুলল।

এরপর আর একদিন কৃষ্ণা সাপটাকে দেখতে পেয়েছিল।

শীতের দুপুরে অংশুমান নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। মাথার কাছের জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে দেওয়ালে।

ঘুমোলে অংশুমানের সামান্য নাক ডাকে। এখনও তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কৃষ্ণা ঘরে এসেছিল আলনা থেকে ওর একটা শাড়ি নিতে। তখনই ও দেখতে পেল সাপটাকে।

ধবধবে সাদা বালিশের ওপরে সাপটা ঘুরে বেড়াচ্ছে!

অংশুমান চিত হয়ে শুয়ে ছিল। ফলে অতি সহজেই সবুজ লিকলিকে সাপটা বেরিয়ে এসেছে ওর কানের ফুটো দিয়ে। ওটার শরীরের প্রায় ফুটখানেক বালিশের ওপরে দিব্যি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তবে এবারেও সেই লেজের দিকটা। বাকি অংশটা লুকিয়ে রয়েছে অংশুমানের শরীরের ভিতরে।

কৃষ্ণার মনে হল, সাপটা যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু লেজের দিক দিয়ে কোনও সরীসৃপ কি কখনও কিছু খুঁজে বেড়ায়।

কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা। ওর বুকের ভিতরে কেউ যেন নুন আর বরফের হিমমিশ্রণ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ওর চোখের নজর ঝাপসা হয়ে গেল। গোটা ঘরটা উজ্জ্বল সবুজ রঙে ভরে গেল, তার মাঝে-মাঝে হলুদ আর কালো বুটি।

তারপর যে-চিৎকার কৃষ্ণার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল তাকে মানুষের চিৎকার বলা যায় না। সে-চিৎকার কোনও পশু, অথবা পিশাচের।

পরক্ষণেই কৃষ্ণা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল।

অংশুমান চমকে জেগে উঠেছিল। ওর চেষ্টায় মিনিটদশেকের মধ্যেই কৃষ্ণার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু এরপর একটি মুহূর্তও ও অংশুমানের ফ্ল্যাটে থাকতে চায়নি।

অংশুমান ওকে অনেক বুঝিয়েছে, অনেক কান্নাকাটি করেছে, কিন্তু কৃষ্ণাকে ও ধরে রাখতে পারেনি। কৃষ্ণা সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে ওর মায়ের কাছে।

অংশুমানের মনে হয়েছিল কৃষ্ণার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই ও সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর কথাও বলেছিল, কিন্তু কৃষ্ণা তাতে আগুনের শিখার মতো ফুঁসে উঠেছিল।

লুকিয়ে থাকা একটা সাপ শেষ পর্যন্ত ওদের ভালোবাসার বিয়েটাকে তছনছ করে দিল।

.

গল্প শেষ করে থামল বিনু। ওর মুখে কেমন যেন এক মলিন বিষণ্ণ ছাপ। টিউব লাইটের আলো তেরছাভাবে ওর মুখে এসে পড়েছে। ও এমন এক শূন্য দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন কৃষ্ণা-অংশুমানের ঘটনাটা এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

একটা থমথমে অস্বস্তি ঘরের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছিল। সেটা হালকা করার চেষ্টায় আমি বললাম, তোর এই গল্প বিশ্বাস করা যায় না। একেবারে আজগুবি। কারও কান দিয়ে কখনও সাপের লেজ বেরোতে পারে!

বিনু মলিনভাবে হাসল, বলল, বিশ্বাস কর, যা বললাম তার এক ফোঁটাও মিথ্যে নয়। ওই সময়ে কৃষ্ণাকে আমি দেখেছি...ওর চেহারা আধখানা হয়ে গিয়েছিল... ওর দিকে তাকানো যেত না...।

ঠিক তখনই বিনুর কানের দিকে আমার নজর গেল।

ওর বা কোন দিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এসেছে একটা সরীসৃপের লেজ। লালায় ভেজা কালো হলুদ ডোরাকাটা চকচকে তার দেহ। ওটা কখনও সড়সড় করে বেরিয়ে এসে লম্বায় বাড়ছে, কখনও আবার ঢুকে পড়ছে বিনুর কানের ভিতরে। অথচ বিনু কিছুই টের পাচ্ছে না। আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

আমি ভিতু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-ভয়ংকর চিৎকার আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল তাকে মানুষের চিৎকার বলে চিনে নেওয়া খুব শক্ত। আমি আঙুল তুলে বিনুর কানের দিকে দেখালাম। একটা জান্তব গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। জড়ানো গলায় কোনওরকমে বললাম, বিনু! সাপ! সাপ!

বিনু নরমভাবে হেসে হাত বাড়াল নিজের বাঁ কানের দিকে। কিন্তু সাপটার লেজের দিকে কি চোখ আছে? ওটা বিনুর হাতের নাগালকে একচুলের জন্যে ফাঁকি দিয়ে নিঃশব্দে সড়সড় করে ঢুকে গেল কানের ভিতরে।

আমি ভয়ার্ত চোখে বিনুর দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে বসে রইলাম। আমার বুকের ভিতরে এক অস্থির কঁপুনি শুরু হল। মাথার ভিতরে যুক্তি-তর্ক-বিজ্ঞান সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

বিনু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তুইও সাপ দেখছিস! আসল ব্যাপারটা কী জানিস? আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে একটা করে সাপ আছে। কারও কারও

বেলায় সেটা দেখা যায়, আর অন্যদের বেলায় দেখা যায় না…।

# আসুন, এদিকেই নরকের দরজা

**আসুন, এদিকেই নরকের দরজা**

এবার এদিকে আসুন..দেখবেন, মাথার দিকে খেয়াল রাখবেন, নইলে ঝুলে থাকা পাথরে যে কোনও সময় চোট পাবেন। বুঝতেই তো পারছেন, ১৭০০ সালের দুর্গ এর চেয়ে আর কত ভদ্র হবে! সিঁড়ির ধাপগুলো নড়বড়ে হলেও তেমন ভয় নেই, কাঠগুলো দিব্যি মজবুত আছে। আমার আটবছরের চাকরিতে এ-সিঁড়ি ভেঙে কেউ কখনও পড়ে যায়নি। আসুন–ধীরে-ধীরে নেমে আসুন আপনারা। হ্যাঁ, এই যে–এটাই শেষ কুয়ো, যেখানে বিশ্বাসঘাতিনী নাফিসা বেগমকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ্। না, না, পুরো ইতিহাস আমি কী করে জানব? সবই আমাদের শোনা কথা। লোকমুখে যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। আর, এই যে বিশাল পাথরে বাঁধানো উঠোনটা দেখছেন, এখানেই বিকেলে বেড়াতেন বেগমরা। যাতে বাইরের কেউ তাদের দেখতে না-পায়, সেইজন্যে চারধারে রয়েছে পনেরো ফুট উঁচু পাথরের পাঁচিল। কী বলছেন, হারেম? উঁহু, এটাকে আপনারা দুর্গও বলতে পারেন, আবার ফষ্টিনষ্টির কারখানাও বলতে পারেন। ব্যস, এই সব–আর দেখানোর কিছু নেই। কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে বলুন। নেই? তা হলে আপনারা এবার আস্তে-আস্তে ফিরে যান। যান, যান, কোনও ভয় নেই; যে-পথ দিয়ে এসেছেন, সেই পথ ধরেই ফিরে যান। এটা তো আর নবাব বাদশাদের ভুলভুলাইয়া নয়, বেরোতে কোনও অসুবিধেই হবে না।

এ কী স্যার, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে? কী বলছেন, আমি সবকিছু আপনাদের দেখাইনি? তাই কি কখনও হয়? এই দেখানোটাই যে আমার চাকরি! আপনারা যদি স্যাটিসফায়েড না হন, তা হলে কালই মিস্টার সেনগুপ্ত আমার চাকরি খেয়ে দেবেন। এ-দুর্গের দেখাশোনার ভার ওঁর ওপরেই আছে কিনা। কুয়ো? কুয়োটা তো আপনারা দেখলেন, ওই তো! কী বলছেন? ওটা নয়? অন্য

আর-একটা কুয়ো? যেখানে–যেখান তিতু সরকার, মানে তিতির সরকার নামে কচি মেয়েটা সুইসাইড করেছিল?

শ-শ-শ-শ! আস্তে, স্যার, আস্তে বলুন। দেখছেন তো, এখনও জনাকয়েক ট্যুরিস্ট ওপাশটায় ঘোরাফেরা করছে। তা ছাড়া, মিস্টার সেনগুপ্ত যদি একবার এসব কথা শুনতে পান, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। তিনি চান না, দশবছর আগেকার ওই কেস নিয়ে কেউ আর কোনওরকম ঘাঁটাঘাঁটি করুক।

হ্যাঁ, কুয়োটা আমি চিনি। কিন্তু ওই যে বললাম, মিস্টার সেনগুপ্তের বারণ আছে। না, স্যার, তা আমি পারি না। তা হলে আমার চাকরিটাই চলে যাবে।... আচ্ছা আপনি যখন এত করে বলছেন– তা ছাড়া আপনার কাছ থেকে বকশিশ নেওয়ার পর তো আর আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না। কুয়োটা আপনি সত্যিই দেখতে চান? কিন্তু হঠাৎ একুয়ো দেখার সাধ হল কেন বলুন তো? ও, মেয়েটা মারা যাওয়ার পর যেসব রিপোর্টার এসেছিল, আপনি তাদের মধ্যে ছিলেন? তাই বলুন! কী যেন নাম বললেন মেয়েটার, তিতির সরকার?

না, তখন এ-চাকরি আমি করতাম না। কিন্তু আর-সবাইয়ের মতো খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। তা হলে স্যার আপনি একমিনিট ওয়েট করুন, আমি অন্য ট্যুরিস্টদের বেরোনোর রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। তা ছাড়া পাঁচটা প্রায় বাজে, বন্ধ করার সময়ও হয়ে গেছে...।

নিন, এবার বলুন–এখন আর কোনও ভয় নেই। ওঃ, সারাটা দিন যা ধকল গেছে! শেষ দলটাকে বের করে দিয়ে এবার নিশ্চিন্তি! না, আর কেউ এখান আসবে না। বাইরের জং ধরা ভারী দরজাটায় আমি খিল এঁটে দিয়ে এসেছি। না, না, বাইরের কোনও শব্দই এখানে শোনা যায় না, আর সেইজন্যেই আমাদের কথাও বাইরের কোনও প্রাণীর কানে যাবে না–অবশ্য নিশাচর পাচাঁদের কথা আলাদা। এই অন্ধকার ঠাসা দুর্গেই ওদের রাজত্ব। তা ছাড়া সন্ধেও তো হয়ে এল।

আপনি ওই কুয়োটা তা হলে দেখতে চান? যেখানে তিতির সরকার নামে মেয়েটা ডুবে মারা গিয়েছিল? কিন্তু কাজটা করা আমার ঠিক হচ্ছে না। মিস্টার সেনগুপ্ত যদি একবার জানতে পারেন, তাহলে ভীষণ রেগে যাবেন। না, আপনি ঠিকই বলেছেন, তাঁকে জানানোরই-বা দরকার কী? হাঃহাঃহাঃ...।

আসুন স্যার, এদিক দিয়ে আসুন। এই বড় হলঘরটা পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। আমাকে আপনার পেছন-পেছন আসতে বলছেন? আমার কিন্তু অবাক লাগছে, না বলতেই ঠিক রাস্তাটা আপনি চিনলেন কী করে! দেখবেন, সাবধান, এখানকার পাথুরে মেঝেটা ভীষণ এবড়োখেবড়ো।

দশ বছর আগেকার ওই ইতিহাস নিয়ে কেউ আবার নতুন করে কথা তুলুক, সেটা মিস্টার সেনগুপ্ত পছন্দ করেন না। কেন জানেন? কারণ, ওই ঘটনা ওঁর মান-ইজ্জৎ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। মিস্টার সেনগুপ্তকেই গ্রামের সবাই তিতিরের লাভার বলে সন্দেহ করেছিল। ওই লাভারই মেয়েটাকে ধীরে-ধীরে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে। সন্দেহ করার কারণও অবশ্য ছিল। মানে, মেয়েটা ছিল মিস্টার সেনগুপ্তের কারখানার ফোরম্যানের বউ। ওরা ওঁর বাড়ির কাছাকাছিই থাকত। ফলে সরকারদের সঙ্গে ওঁর বেশ মেলামেশা ছিল। আর চুপিচুপি বলি স্যার, তিতির সরকারকেও সেনগুপ্তসাহেবের মনে ধরেছিল। বলতে গেলে তিনি ওদের পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে মেয়েটা ওভাবে মারা যাওয়ার পর ওঁকেই যে লোকে সন্দেহ করবে এ আর বেশি কথা কী! উনি যদি একবার জানতে পারতেন কারা ওঁর নামে এইসব বাজে কথা রটাচ্ছে, তা হলে আর দেখতে হত না–তাদের কোর্ট পর্যন্ত দৌড় করিয়ে ছাড়তেন। একবছর ধরে তো ওঁর সংসারে অশান্তি লেগে ছিল। বউয়ের সঙ্গে দিনরাত উনি ঝগড়া করে গেছেন। বারবার বলেছেন, ওঁর কোনও দোষ নেই। আমরা ভেবেছিলাম, মিসেস বোধহয় ওঁকে ছেড়েই চলে যাবেন..যাক সে কথা, এখন ওঁরা বেশ সুখে আছেন, তা ছাড়া দশবছর সময়টাও তো নেহাত কম নয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখন যদি আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি নিয়ে জিভ চালাচালি হয়, তা হলে আমার অবস্থাটা কী হবে! না স্যার, আপনার কথা আমি বলছি না, আপনি সেরকম লোকই নন। তাই যদি ভাবতাম, তা হলে আপনাকে এত সব কথা বলতামও না, আর ওই কুয়োটাও দেখাতাম না।

লোকে বলে, মেয়েটা নাকি দারুণ সুন্দরী ছিল। বয়েসও ছিল খুব কম–মাত্র একুশ। গায়ের রং ছিল যেন দুধে-আলতা। খবরের কাগজে মেয়েটার যে-ছবি ছাপা হয়েছিল, তার চেয়ে অন্তত একশো গুণ সুন্দরী ছিল ও। চোখ ছিল কালো হিরের মতো ঝকঝকে, চকচকে। কী বলছেন, কালো নয়? একটু কটা চোখ? কী জানি, হবে হয়তো। কারণ সবই আমার শোনা কথা। আর আপনি নিজে তো রিপোর্টার–স্পটে হাজির ছিলেন। দেখবেন, সিঁড়ির শেষ ধাপটা খেয়াল রাখবেন–ওটা খানিকটা ভাঙা আছে। কিন্তু...কটা চোখ বলছেন? না, স্যার, এ নিয়ে আমি

আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। শুধু ভাবছি আপনার মনে রাখার ক্ষমতা তো দারুণ!

যাকগে, মোটের ওপর মেয়েটা ছিল অল্পবয়েসি, অসম্ভবরকম সুন্দরী, নিষ্পাপ, আর কিছুটা সরল টাইপের সাধারণত গ্রামের মেয়েরা যা হয়ে থাকে। ওর বাবা মিস্টার সেনগুপ্তের বাগানেই মালির কাজ করত। আপনি হয়তো ওকে কখনও দেখেননি। না, না, খবরের কাগজওলাদের দেওয়ার মতো নতুন কোনও খবর ওর কাছে ছিল না। তবে লোকটা ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিল। তারপরই তো ওর স্ট্রোক মতন হল। তখন মিস্টার সেনগুপ্ত ওকে টাকাকড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা চাকরিতে লাগিয়ে দেন। তারপর...দেখবেন, চৌকাঠে হোঁচট খাবেন না যেন। এইখান থেকেই শুরু হল অন্দরমহল। একটু দাঁড়ান, হ্যারিকেনটা জ্বেলে নিই। মাঝে-মাঝে সন্ধের পর আমি এদিকটায় আসি, তাই একটা হ্যারিকেন সবসময়েই এই দরজার পাশটায় রাখা থাকে। কী বললেন? কেন আসি? –সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন! কেমন যেন নেশার মতো হয়ে গেছে।...দেশলাই আছে আপনার কাছে? আমারটা দেখছি একেবারে খালি! হ্যাঁ, এই ইব্যস! নিন, এবার চলুন।

আরে, ভয় পেলেন নাকি? হ্যাঁ, তা ভয় পাওয়ারই কথা। যেভাবে মূর্তিটা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে একেবারে জ্যান্ত বলে মনে হয়। বর্শার ফলাটা দেখেছেন? একটু বাঁকানো। কেমন যেন অদ্ভুতরকমের, তাই না? কেন বানানো হয়েছিল মুর্তিটা? কী করে জানব বলুন! সবই রাজা বাদশাদের খেয়াল। তবে মনে হয়, অন্দরমহলে যাদের ঢোকার হুকুম নেই, তাদের সাবধান করে দেওয়ার জন্যই এটাকে তৈরি করা হয়েছিল। তা যে জন্যেই তৈরি হয়ে থাকুক, বাচ্চারা কিন্তু এটা দেখে ভীষণ মজা পায়। সত্যি কথা বলতে কী, যখন সব ট্যুরিস্টদের ফোর্ট দেখানো শেষ করে আমি সন্ধের পর জায়গাটা টহল দিতে বেরোই, তখন এই বর্শাটা আমি সঙ্গে নিই। ওটাকে আমার বন্ধু বলে ভাবতে ভালো লাগে। এক হাতে হ্যারিকেন, এক হাতে বর্শা নিয়ে যখন মহল থেকে মহলে ঘুরে বেড়াই, তখন আমার নিজেকেই ১৭০০ সালের ভূত বলে মনে হয়। অন্ধকারে এই জায়গাটা যেন ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, স্যার, তা হলে বর্শাটা আমি সঙ্গে নিচ্ছি। দেখেছেন তো, এতদিনের জিনিস হলেও এখনও কেমন ঝকঝক করছে! আসলে আমিই এটাকে শান দিয়ে পালিশ করে নতুনের মতো করে রেখেছি–এইজন্যেই মূর্তিটার টান বাচ্চাদের কাছে অনেক বেড়ে গেছে।

...হ্যাঁ, এটাই সেই অভিশপ্ত কুয়ো। সেই ঘটনার পরই এই লোহার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে করছে? কী বলছেন, আমার আপত্তি না থাকলে? না, না, আমার আবার আপত্তি কীসের! দেখানোটাই তো আমার কাজ। এই তো, ঢাকনাটা সহজেই খুলে যাবে। তা ছাড়া এটা ভোলা আমার অভ্যেস আছে...এই নিন, দেখুন...।

দেখেছেন, কুয়োর ভেতরের গা বেয়ে জং ধরা লোহার সিঁড়ি কেমন খাড়া নেমে গেছে? আগেকার দিনে এইরকম সিঁড়ি খুব ব্যবহার হত।...এই সিঁড়ি বেয়েই তো ভেতরে নেমে গিয়েছিল তিতিরের স্বামী। তুলে এনেছিল কচি বউয়ের ডেডবডি। ভাবা যায় না, তাই না? কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরেছিল, ওর জন্যেই ওর বউ সুইসাইড করেছে। সেইজন্যেই হয়তো ওইরকম সাহসের কাজ করতে পেরেছিল।

তিতিরের স্বামীর খবর জিগ্যেস করছেন? কেন, শোনেননি আপনি? ওই ঘটনার পর লোকটা পাগল হয়ে যায়। তখন তাকে পাঠানো হয় পাগলা-গারদে। এখনও সে সেইখানেই খাঁচায় বসে আছে।

যদ্দুর আমি শুনেছি, মেয়েটা অনেকদিন ধরেই স্বামীর আড়ালে ওইসব লটরপটর চালিয়ে যাচ্ছিল–বুঝতেই তো পারছেন...। তারপর একদিন যখন মেয়েটা বুঝল, ওর পেটে বাচ্চা এসেছে, তখন ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এত খোলামেলা ভালোবাসার জন্যে নিজেকেই শাপশাপান্ত করতে লাগল। তারপর একদিন ও গেল ওর ভালোবাসার লোকের কাছে। জানতে চাইল, এখন ও কী করবে।

লোকটা ওকে বোকার মতো কথা বলতে মানা করল। বলল, এর মধ্যে করাকরির কী আছে? ওর তো জলজ্যান্ত স্বামীদেবতা রয়েছে একটা; তা হলে আবার ভয় কীসের! শুধু ওকে যা করতে হবে, তা হল মুখে কুলুপ এঁটে চুপচাপ বসে থাকা। ব্যস!

কিন্তু সে বুঝল, তার প্রস্তাবটা তিতিরের পছন্দ হয়নি। নিজের স্বামীকে ঠকিয়ে বাচ্চার দায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না। তিতির চেয়েছিল, সেই বিপদের সময় সে এসে ওর পাশে দাঁড়াক। চেয়েছিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। চেয়েছিল, নিজের স্বামীকে আবার আগের মতো ফিরে পেতে। কারণ, আমার মনে হয়, মেয়েটা ওর স্বামীকে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। শুধু

ওই লোকটার চটকের কাছে ওর ভালো-মন্দ জ্ঞান কদিনের জন্যে গুলিয়ে গিয়েছিল…।

যাকগে, সেকথা থাক, আসল কথায় ফিরে আসি। তারপর সেই লাভার ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। বলল, কিছুদিন তাকে ভাবার সময় দেওয়া হোক। তারপর তারা এ নিয়ে আবার আলোচনা করবে। দেখবে, কী করা যায়। কিন্তু পরদিন তিতিরকে ফেলে রেখে সে গ্রাম ছেড়ে সটকে পড়ল–জানি না কোথায়।

না, স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তো তখন এখানে ছিলাম না, তাই সব কিছু ঠিক ঠিক জানাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু কল্পনার রং মিশিয়ে গল্পটা আপনাকে বলছিলাম। হয়তো আসলে ঘটনাটাই ছিল অন্যরকম। না, আপনার কথামতন, মিস্টার সেনগুপ্তই যদি সেই লোক হন, তা হলে তিনি পালাননি–গ্রামেই ছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যথারীতি জঘন্য কাদা ছোঁড়াছুড়িও হয়েছিল। কিন্তু এখন শুধু আমি নয়, গ্রামের আরও অনেক লোকের ধারণা, মিস্টার সেনগুপ্ত হয়তো সত্যিই কোনও দোষ করেননি।

যাই হোক, মেয়েটা ওর স্বামীর কাছে গিয়ে সরাসরি সব খুলে বলল–শুধু তার নামটুকু ছাড়া–সে-নাম ও কাউকেই বলেনি। সব শুনে স্বামী লোকটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তা হওয়ারই কথা। কারণ, লোকে বলে, সে নাকি বউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করত, ভীষণ ভালোবাসত ওকে। শুনেছি, তিতিরকে সে কোনওরকম বকাঝকা করেনি। শুধু শান্ত চুপচাপ থেকে মেয়েটার অবাক চোখের সামনে ঘর থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন জলভরা চোখ নিয়ে মেয়েটা তাকে অনুসরণ করল, পা জড়িয়ে ধরল, তখন সে আর সইতে পারেনি–ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা চড় মেরেছিল বউয়ের গালে। নিজের কষ্ট-পাওয়া মনের অবস্থাটা সে আর চাপতে পারেনি। বলেছিল, শেষ পর্যন্ত এই আমার পাওনা ছিল।

হ্যাঁ, স্যার, আপনার কথা আমি মানছি। আমি একটু সিনেমা-টিনেমা দেখতে ভালোবাসি। নইলে বানিয়ে বানিয়ে ছবির মতো সব বলছি কী করে! আপনি তো জানেন, গাইডদের একটু আধটু গল্প বানানোর ক্ষমতা না-থাকলে চলে না। তা ছাড়া, আপনি যদি আমার মতো দিনের পর-দিন, একা, এই নির্জন নিঝঝুম দুর্গে ঘুরে বেড়াতেন, তা হলে আপনিও সমস্ত কিছু ছবির মতো দেখতে পেতেন।

জানেন, মাঝে-মাঝে রাতের দিকে আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাই! হয়তো আমার মনের ভুল। আর কিছু না হোক, বয়েস তো হয়েছে।

জানেন, আমার মনে হয়, এটুকুও সেই অবুঝ মেয়েটার বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে, কত দুঃখে, কত হতাশায়, ওর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলেছে। ও ভাবল, এই বোধহয় ওদের সম্পর্কের শেষ। আর সে যদি ওকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে জীবনের আর রইল কী! তাই তিতির পারল

অপেক্ষা করতে, পারল না সে আঘাত সইতে, পারল না আশায় বুক বাঁধতে। ও দিশেহারা হয়ে ছুটে এল এই পোড়ো দুর্গে..বুক-ভরা কান্না নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োর ভেতরে।

তারপর মাত্র পাঁচমিনিট–তার বেশি নয়। সে ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। পাগলের মতো ডাকতে লাগল বউয়ের নাম ধরে–কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। যখন সে তিতিরকে কুয়োর ভেতর থেকে তুলে আনল, তখন ও মারা গেছে। ওর কালো চুল ভিজে লেপটে রয়েছে মুখের ওপর, সুন্দর উজ্জ্বল চোখজোড়ায় জমে রয়েছে কাদা। তিতিরের বডিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওর স্বামী কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

..ঠিক এইখানটায়, যেখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তারপর থেকেই এই ভারী লোহার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হল কুয়োর মুখে। যাতে সহজে কেউ এটাকে খুলতে না-পারে–শুধু আমি ছাড়া।

কেউ জানে না, একুয়ো কত গভীর। দাঁড়ান, আলোটা আর-একটু তুলে ধরি। নিন, এবার ভালো করে দেখুন। সহ্যের শেষ সীমায়–পৌঁছোলে কোনও মেয়ে কখনও এভাবে প্রাণ দিতে পারে? আপনিই বলুন?

(তিতু–আমার তিতু, সোনামণি, তুই কোথায়?)

না, স্যার, আমি তো কিছু বলিনি। বরং আমার মনে হল, আপনি বোধহয় কিছু বলতে চাইছেন। দাঁড়ান, একমিনিট…।

কী করছি জিগ্যেস করছেন? চাবিটা ঘুরিয়ে দেখছি, তালাটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না। এখন তো সব মহলের দরজাতেই চাবি লাগাতে হবে, তাই একবার দেখে নিলাম, যাতে পরে ভুল না-হয়। জানেনই তো, মিস্টার সেনগুপ্ত এই ঘরটা সবসময় বন্ধ করে রাখারই পক্ষপাতী। গত পাঁচ সাত বছরে এ-ঘরে আমি ছাড়া

আর কেউ কখনও আসেনি–অন্তত আজ রাতের আগে। আর আমার মনে হয়, আগামী পাঁচ-সাত বছরেও এ-ঘরে কেউ আসবে না। আর যদিও-বা আসে, কুয়োর ঢাকনাটা নিশ্চয়ই কেউ খুলে দেখবে না, কী বলেন? এই সমস্ত মহলের দেখাশোনা আমি নিজেই করি। এ ছাড়া সবকিছু ঝকঝকে তকতকে রাখতে আমি ভীষণ ভালোবাসি–দেখুন না, এই বর্শাটাই দেখুন! কেমন নতুনের মতো ঝকঝক করছে! ফলাটা দেখেছেন, কীরকম ধারালো!

ওঃ, কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনার লাগল নাকি?

পাগল বলছেন, স্যার? না, স্যার, আমি পাগল নই। পাগল তো ছিল তিতিরের স্বামী, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? সে তো এখন বন্দি রয়েছে পাগলাগারদে। আমার শুধু সামান্য স্ট্রোকমতন হয়েছিল–তা-ও বছরদশেক আগে। তাতে আমার শরীরের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। মিস্টার সেনগুপ্ত কিছু টাকা দিয়ে আমাকে হালকা কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও আমার গায়ের জোর দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সেইজন্যেই বলছি, আমি হলে এই মুহূর্তে এই বর্শাটাকে ঠেকানোর কথা চিন্তাও করতাম না, স্যার। তাতে আপনার ভালোর চেয়ে খারাপই হবে।

জানেন স্যার, বেশি জানাটাই অনেক সময় মানুষের বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তিতু সরকার, তাই না? ওই নামটাই তো প্রথমে বলেছেন আপনি? কিন্তু, স্যার, আপনি কি জানেন, মেয়েটার নাম ছিল সুবর্ণা। ওই নামটাই ছাপা হয়েছিল সব খবরের কাগজে। তিতির ছিল ওর ডাক নাম। তবে চেনাশোনা লোক আর রিলেটিভরা ওকে তিতির নামেই ডাকত। আর আমার কাছে, হয়তো ওর স্বামীর কাছে, হয়তো আরও একজনের কাছে ওর আদরের নাম ছিল তিতু। আর তা ছাড়া, আপনি কী করে জানলেন যে, ওর চোখ ছিল একটু কটা কালো নয়? রিপোর্টাররা যখন এখানে আসে, তখন ওর চোখজোড়া বোজাই ছিল। কিন্তু ওর সেই ভালোবাসার লোক জানত।

হ্যাঁ, স্যার, এখন আমি আপনাকে বেশ চিনতে পারছি। সেই সময় আপনি মিস্টার সেনগুপ্তের কাছে প্রায়ই আসতেন দরকার ছাড়াও আসতেন। হয়তো তিতুর জন্যেই আসতেন। তিতিরের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাঁপড়া বাকি আছে। ওর স্বামী এখানে থাকলে ভালোই হত–তা হলে আসরটা বেশ জমত, হয়তো বেচারার পাগলামো কিছুটা সারত। যাক, সে যখন নেই, তখন মিছিমিছি তার কথা ভেবে লাভ কী! আসুন, এবার কাজের কথায় আসা যাক…।

ভাবতে অবাক লাগে, তাই না? ভালোভাবে চিন্তা করতে গেলে একে নিয়তির খেলা অথবা ঈশ্বরের লীলা ছাড়া আর কীই-বা বলবেন? কে জানত, আপনি এইভাবে, একা পায়ে হেঁটে এখানে আসবেন! এবং এই বর্শা আর চাবিটা আমি বাজি রাখতে পারি যে,–এ দুটো জিনিস আমার কাছে যে কত দামি, তা কি এখনও আপনাকে খুলে বলতে হবে, স্যার?–আপনি কোথায় যাচ্ছেন সে কথা কাকপক্ষীকেও বলে আসেননি। অথচ এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতেও আপনি পারেননি। হয়তো তিতু আপনাকে দিনের-পর-দিন নিশির ডাকের মতো টেনেছে। আপনি বা আমি হয়তো কোনওদিনই বুঝতে পারব না, এখানে আসার পেছনে আপনার আসল কারণটা কী।

আপনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, তিতুর বুড়ো বাপ আজ দশটা বছর ধরে শুধু আপনারই অপেক্ষা করেছে? সুতরাং, আমার বিশ্বাস, আমার ইচ্ছেই আজ আপনাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই নরকের দরজায়…।

উঁহু, আমি হলে কিন্তু এরকম করে মোটেই চিৎকার করতাম না, স্যার। তাতে শুধু-শুধু আপনার গলারই ক্ষতি হবে। কারণ জানেনই তো, এখানে আপনার চিৎকার শোনার লোক এক আমি ছাড়া আর কেউই নেই। আর আগেই তো আপনাকে বলেছি, এখানকার দেওয়ালগুলো ভীষণ মোটা।

বিশ্বাস করুন, সত্যিকারের পাথরের তৈরি একটুও বাড়িয়ে বলছি না…।

# শুয়োর বিষয়ক একটি অসম্পূর্ণ গবেষণাপত্র

**শুয়োর বিষয়ক একটি অসম্পূর্ণ গবেষণাপত্র**

প্রথমে বন্দনা করি বাহ-নন্দন
অতঃপর বন্দি আমি কোটি দেবগণ।
ধরিত্রী আকুল যবে প্রলয় সলিলে
তোমা রূপ ধরি বিষ্ণু রক্ষে প্রাণিকুলে।
পশু মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি শক্তিমান
পাপীরে পবিত্র কর তুমি পুণ্যবান।

(আদিকাণ্ড, বরাহ বন্দনা কাব্য, কবিকুলতিলক অখিলবন্ধু দেবশর্ম্মণ প্রণীত, ১২৩১ সন)

শুয়োর বিষয়ক গবেষণায় কৌশিকের প্রথম আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল একটি অকিঞ্চিৎকর ছেঁড়া ঠোঙা।

জিলিপি বরাবরই কৌশিকের প্রিয়। বস্তুটির আড়াই প্যাঁচের রহস্য এবং মহিমা কৌশিককে বরাবরই বিস্মিত করেছে। কিন্তু একদিন জিলিপির বদলে তার ছেঁড়া ঠোঙা ওর তীব্র বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ঠোঙার শেষ জিলিপিটির সদগতি করে কৌশিক যখন সামান্য ছেঁড়া ঠোঙাটিকে ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই পয়ার ছন্দে লেখা কয়েকটি লাইন ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঠোঙাটি সম্ভবত কোনও ফোটোকপি করা কাগজ থেকে তৈরি হয়েছিল। তার ফলেই কৌশিক প্রথম কবিকুলতিলক অখিলবন্ধু দেবশর্মণের নাম জানতে পারে এবং শুয়োরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বছর চব্বিশের একজন সুপুরুষ যুবকের যখন টিভি, ভিডিও, ত্রিভঙ্গ নৃত্য (যার প্রচলিত নাম ব্রেক ডান্স) এবং তরুণীতে আকৃষ্ট হওয়ার কথা, তখন কৌশিক প্রথাগত পথ ছেড়ে হঠাৎই শুয়োরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কৌশিক বরাবর মাঝারি। ও জন্মসূত্রেও মাঝারি পিতামাতার সন্তান। ওঁদের বিত্ত এবং সামাজিক গুরুত্বও ছিল মাঝারি। পড়াশোনা ও আচরণে কৌশিক প্রত্যাশা মতোই মাঝারি-রেখাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে। ওর পড়াশোনার বিষয় ছিল বাংলা এবং লক্ষ্য ছিল যথারীতি স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা।

বাংলায় এম. এ. মাঝারিভাবে পাশ করার পর ও নিয়মমাফিক অ্যাপ্লিকেশান, ইন্টারভিউ ইত্যাদি দিয়ে চলেছে। এবং নিয়মমতো বরাবরই ওর নাম প্যানেলে থেকেছে, চ্যানেলে যায়নি।

ক্রমাগত এইসব প্রচেষ্টায় যখন কৌশিকের একেবারে মাখামাখি অবস্থা, তখন ওর মাঝারি জীবন এক তরুণীর ভালোবাসায় কিছুটা ডগমগ হয়ে ওঠে। কিন্তু এবারেও ওর প্যানেলে নাম থেকে যায়, তরুণীর অন্যত্র বিয়ে হয়, কৌশিক বিয়ের নেমন্তন্ন পায় এবং কেঁদে আকুল হয়।

এইভাবে কৌশিক আদর্শ মাঝারি বাঙালি তরুণ হয়ে ওঠে। শুরুতে ও যে প্রচ্ছন্ন বেকার ছিল, ক্রমে তা অপ্রচ্ছন্ন হয়ে উঠতে থাকে। তবে জিলিপির প্রতি ওর দুর্বলতায় কখনও কোনওরকম ভাটা পড়েনি।

সুতরাং অপ্রচ্ছন্ন বেকার কৌশিক শুয়োর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার পর একজন একনিষ্ঠ গবেষকের মতো এই অদ্ভুত চতুষ্পদটি সম্পর্কে তত্ত্বগত ও বাস্তবসম্মত অনুসন্ধান শুরু করে দিল।

## শুয়োর এবং মানুষের সম্পর্ক

কৌশিক ঘুণাক্ষরেও জানত না, এই চতুষ্পদটির সঙ্গেই মানুষের সম্পর্ক প্রাচীনতম। এই তথ্য ওকে জানাল বালক-বালিকার জন্য প্রকাশিত ব্রিটানিকা

জুনিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া। সুইডা পরিবারের সদস্য এই প্রাণীটি মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিম মানুষ প্রথম যেসব প্রাণীকে পোষ মানিয়েছিল, তার মধ্যে শুয়োর ছিল প্রধান। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ২৯০০ বছর আগে এশিয়াটিক সোয়াইনকে মানুষ পোষ মানায়। আর তাদের ইয়োরোপিয়ান জাতভাইয়েরা মানুষের কাছে পোষ মানে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ। কিন্তু অনেক চেষ্টা এবং খোঁজাখুঁজি করেও কৌশিক ভারতীয় শুয়োর অথবা পশ্চিমবঙ্গের শুয়োর সম্পর্কে সেরকম কোনও ঐতিহাসিক তথ্য জোগাড় করতে পারেনি। তবে ও মোটামুটি ধরে নিল, মানুষের (সম্ভবত) প্রাচীনতম গৃহপালিত পশুর নাম শুয়োর।

এ-থেকে কৌশিক দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় :

১) শুয়োর মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২) শুয়োরের ঐতিহ্য মানুষের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি তথ্য কৌশিককে বিচলিত করে ও শুয়োর মানুষের মতোই স্তন্যপায়ী। এবং মানুষের মধ্যে যেমন সাদা-কালো ভেদ আছে, শুয়োরের মধ্যেও সাদা-কালো ভাগ আছে। তবে কিছু শুয়োর আছে, যাদের রং সাদা কালো মেশানো। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত যে-শুয়োর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তার রং কালো।

সদ্য আবিষ্কৃত এই বৈশিষ্ট্যগুলো কৌশিককে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। এবং একইসঙ্গে শুয়োর বিষয়ে ওর আগ্রহকে পাঁচ গুণ করে দেয়।

## শুয়োরের আচরণ ও গতিবিধি

শুয়োরের আচরণ একটু-একটু কৌশিকের জানাই ছিল। কিন্তু গবেষণার তীব্রতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও শুয়োর সম্পর্কে বহুগুণ বেশি মনোযোগী হয়ে উঠল।

কৌশিকের বাড়ির কাছাকাছি একটি প্রায়-মজে-যাওয়া দুর্দশাগ্রস্ত খাল আছে। এককালে নাকি এই খালে বজরা ভাসত। এখন যা ভাসে তা শুধুই কচুরিপানা এবং মানুষের বর্জ্য পদার্থ।

এই খালের পাড়ে অসংখ্য ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলো আবর্জনা ও মানুষে একেবারে উপচে পড়ছে। এই সব নিম্নবর্গের জনগণের কেউ-কেউ শুয়োর পালন করে

থাকেন। শুয়োর পালনের কাজে খালের দুর্গন্ধময় ভয়ংকর নারকীয় পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল। খালের জলে থিকথিক করা পাঁক কালো কালো শুয়োরগুলোর গরম শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। শুয়োরের খাদ্য যা বাস্তবে অখাদ্য এবং কুখাদ্য–এখানে পাওয়া যায় অঢেল। সুতরাং অনায়াসে শুয়োরের পাল এখানে লালিতপালিত হয় এবং নির্বিঘ্নে দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে।

কৌশিক লক্ষ করেছে, আবর্জনার প্রতি আকর্ষণ শুয়োরের মৌলিক প্রবণতা। অক্লান্তভাবে নোংরা ঘেঁটে দেখা তাদের প্রিয় নেশা। পরিবেশ কোনও কারণে সাফসুতরো হয়ে উঠলেই শুয়োরের দঙ্গলে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। কারণ, নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকেই তারা জিইয়ে রাখতে চায়। কোনও শুয়োরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে নিয়ে গেলে সে হয় নোংরা পরিবেশে ফিরে আসে, অথবা সেই পরিষ্কার পরিবেশকে দ্রুত দূষিত করে নিজের বাসযোগ্য করে তোলে।

এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার কৌশিক লক্ষ করেছে : শুয়োর যখন নিজের খেয়ালে চরে বেড়ায় তখন কোনওদিকেই সে ভ্রুক্ষেপ করে না–শুধুমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ, নিজের স্বার্থটুকু বাদ দিলে শুয়োরকে মোটামুটিভাবে আত্মভোলা বলা যায়।

শেষ লাইনটায় প্রচ্ছন্ন পরস্পরবিরোধী ভাব লক্ষ করে কৌশিক নিজের স্বার্থটুকু বাদ দিলে কথাগুলো কেটে দেয়।

কৌশিক যতই ওর পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিয়ে চিন্তা করছিল ততই দুটো সিদ্ধান্ত ওর মগজে স্পষ্ট চেহারা নিচ্ছিল?

১) নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শুয়োরের ভীষণ প্রিয়। ২) নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শুয়োর যারপরনাই অন্যমনস্ক।

**শুয়োরের চাষঃ নানা দেশে**

ব্রিটানিকা জুনিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া-র ১৯৮০ সালের সংস্করণ কৌশিককে শুয়োরের চাষ সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য জোগান দিল।

শুয়োরের চাষের ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে চিন। সেখানে গড়ে দুশো মিলিয়ান শুয়োর প্রতিপালন করা হয়।

চিনের পরেই রয়েছে ব্রাজিল। সে-দেশে গড় শুয়োরের সংখ্যা ষাট মিলিয়ান। ব্রাজিলের পর জায়গা পেয়েছে আমেরিকা ও রাশিয়া। এবং তালিকায় দশ নম্বর স্থানে রয়েছে ডেনমার্ক।

বেশ কয়েকমাস যাবৎ শুয়োর-চর্চার ফলে কৌশিকের মনে এইরকম ধারণা জন্মেছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে শুয়োরের সংখ্যা মোটেই অবহেলা করার মতো নয়। ফলে, বিদেশি বইয়ের শুয়োর-তালিকায় ভারতের নাম না দেখে ও একটা ছোটখাটো অথচ উল্লেখযোগ্য ধাক্কা গেল।

একইসঙ্গে ওর মনে হল ও ভারতে শুয়োর সম্ভবত প্রচ্ছন্নভাবে লালিতপালিত হয়। বিদেশের পরিসংখ্যানবিদরা এইসব প্রচ্ছন্ন শুয়োরকে সহজে চিহ্নিত করতে পারেন না।

শুয়োরের চাষ যে বেশ লাভজনক তা কৌশিক পড়াশোনা করে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। চাষের শুয়োর প্রধানত দু-রকমের : চর্বিপ্রধান ও মাংসপ্রধান। তবে আশির দশক থেকেই চর্বিপ্রধান শুয়োরের তুলনায় মাংসপ্রধান শুয়োরের চাহিদা বেড়েছে।

একটা শুয়োর স্রেফ চোখে দেখে তার ওজন আঁচ করা শক্ত। যেমন, সবচেয়ে বড় জাতের পুরুষ-শুয়োরের ওজন প্রায় ৪৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। আর স্ত্রী-শুয়োরের সর্বোচ্চ ওজন ৩৬০ কেজি ছুঁই-ছুঁই।

এই তথ্য জানার পর কৌশিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে, প্রাণীদের মধ্যে শুয়োরের আপেক্ষিক গুরুত্বই বোধহয় সবচেয়ে বেশি।

বন্ধুমহলে কৌশিকের শুয়োর বিষয়ক গবেষণা যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছিল। তা ছাড়া ওকে দেখলেই বন্ধুরা নানা ধরনের লঘু মন্তব্য করে ওঠে। এমনকী আদিরসের রসিকতা করতেও ছাড়ে না।

একদিন এ-জাতীয় রসিকতায় নাস্তানাবুদ হয়ে কৌশিক যখন প্রায় কোণঠাসা এবং পর্যদস্ত, তখন সে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করে, ভারতে প্রচ্ছন্ন শুয়োরের সংখ্যা কম নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

কৌশিকের এই মন্তব্যের ফলে, কী জানি কী কারণে, ওর বন্ধুরা বেশ আহত হয়েছিল।

কৌশিক তাতে খানিকটা মজা পেয়ে বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গের জমিতে শুয়োরের চারা লাগালে তা দেখতে দেখতে লকলকিয়ে বেড়ে উঠবে।

সে-রাতে কৌশিক শুয়োরের চারা শব্দজুটি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গভীরভাবে ভেবেছিল।

**শুয়োর টুপি পরে, না কি পরে না**

এই ভাবনা কৌশিকের মাথায় উদয় হয় মহাকবি সুকুমার রায়ের একটি কবিতা পড়ে।

কবিতাটি নামহীন এবং আবোল তাবোল গ্রন্থে পাদপূরণ হিসেবে সঙ্কলিত। কিন্তু কৌশিক অনায়াসে সেই কবিতার মোক্ষম চারটি লাইন মুখস্থ করে ফেলেছে?

বলব কি ভাই হুগলি গেলুম
বলছি তোমায় চুপি-চুপি
দেখতে পেলাম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি।

সুকুমার রায়ের কবিতা বরাবরই কৌশিককে ভাবায়। যেমন, তার হুঁকোমুখো হ্যাংলা কবিতার শ্যামাদাস মামা তার । আফিঙের থানাদার লাইনটির মধ্যে কৌশিক বর্তমানে বহুল প্রচলিত এবং প্রায় সর্বজনস্বীকৃত মামাতন্ত্রের আভাস পায়। কিংবা, ছায়াবাজি-র ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা লাইনটির মধ্যে ও বর্তমানের যাবতীয় তদন্ত কমিশন গঠন ও তাদের হাস্যকর প্রচেষ্টার

স্পষ্ট ইঙ্গিত পায়। এবং এ-জাতীয় তদন্ত কমিশন যে তদন্তের চেয়ে কমিশনের ওপরেই বেশি জোর দিয়ে থাকে, সেই তাৎপর্যও যেন রায়সাহেবের কবিতার এই লাইনটির অন্তরাল থেকে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে ব্যঙ্গের হাসি হাসে।

ঠিক একইভাবে কিম্ভুত কবিতার মধ্যে কৌশিক নিজেকে শনাক্ত করার চেষ্টা অথবা আত্মানুসন্ধানের ইঙ্গিত পায়। আর খুড়োর কল তো খুড়োর কল! পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই বস্তুটিকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

সুতরাং, সুকুমার রায় যিনি কৌশিকের মতে মহাকবি যখন লেখেন টুপিহীন শুয়োর একটি আশ্চর্য ঘটনা, তখন এটা কি ধরে নেওয়া যায় না যে, টুপি পরা শুয়োরের সংখ্যাই সাধারণত বেশি! অথবা, একটু ঘুরিয়ে কি বলা যায়, টুপি পরা শুয়োর বেশি প্রচলিত?

আবোল তাবোল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। সুতরাং, এটা আশা করা খুবই অযৌক্তিক যে, এখনও একমাত্র হুগলিতেই টুপি পরা শুয়োরের আধিপত্য। যদি একসময় তারা হুগলিতে থেকেও থাকে, এই ৭০ বছরে তারা নিশ্চয়ই নিয়মিত হারে বংশবৃদ্ধি করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, হুগলি শব্দটা রায়সাহেব শুধুমাত্র ল বর্ণের অনুপ্রাসের জন্যও ওই কবিতায় ব্যবহার করে থাকতে পারেন।

এইরকম বহুমুখী চিন্তার পর কৌশিক মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়ঃ

১) টুপি পরা এবং টুপিহীন–দু-রকম শুয়োরই এখানে পাওয়া যায়।

২) টুপিহীন শুয়োরকে টুপি পরানোর জন্য টুপি পরা শুয়োররা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে থাকে।

## কৌশিকের বিক্ষিপ্ত চিন্তা এবং সমস্যা

শুয়োর গবেষণায় কৌশিক যতই নিমগ্ন হয়, ওর মাথায় ততই বিক্ষিপ্ত চিন্তা জায়গা করে নিতে থাকে। যেমন, ওর মনে হয়, শুয়োরের দুধ মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষ কবে প্রথম পান করেছিল। সেই দুধের অণুর কোনওরকম রাসায়নিক প্রভাব কি অধস্তন অথবা উত্তরপুরুষে প্রবাহিত হয়েছে? শুয়োরের মারাত্মক অসুখ কলেরা। এই কলেরা সংক্রামক। মানুষের কলেরার সঙ্গে শুয়োর কলেরার কী সম্পর্ক, বা আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সে-বিষয়ে কৌশিক অনুসন্ধান করতে বদ্ধপরিকর।

বস্তুত, শুয়োরের ভাবনায় কৌশিক এতই আচ্ছন্ন হয়ে উঠল যে, ও শুয়োর বিষয়ক স্বপ্ন অনায়াসে দেখতে লাগল। শুয়োরের ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ এবং দেড় প্যাঁচওয়ালা লেজও ওর গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

ইদানীং কৌশিক নানারকম মানুষ দ্যাখে আর অবাক হয়ে ভাবে, এককালে আমাদের হাতদুটো ছিল সামনের পা। পায়ে খুর ছিল না বটে, তবে গায়ে বড়-বড়

লোম ছিল।

এইসব ভাবনায় নিমজ্জিত অবস্থায় কৌশিক একদিন ময়দানের একটি জনসভায় হাজির ছিল। ওর উদ্দেশ্য ছিল, শুয়োর বিষয়ে আরও নতুন নতুন তথ্যসংগ্রহ। আর টুপি পরা শুয়োর টুপিহীন শুয়োরকে কীভাবে টুপি পরাতে চেষ্টা করে তাও হাতে-নাতে দেখা।

মঞ্চে এক প্রখ্যাত এবং ঘোড়েল রাজনীতিবিদ জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের সারমর্ম বিপক্ষের রাজনৈতিক দলের গায়ে কাদা ছোঁড়া। আজকাল এটাই সহজ পথ হয়ে উঠেছে? আমি যে কত ভালো তা প্রমাণ করার একমাত্র উপায়, তুমি কত খারাপ সেটা সবাইকে সহজে বুঝিয়ে দেওয়া। এ-জাতীয় কাদাঘাটার মধ্যে কৌশিক যথারীতি শুয়োর-প্রবণতার লক্ষণ দেখতে পেল।

বক্তৃতার শেষে সেই নেতা যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছেন তখন কৌশিক তার মুখোমুখি হাজির হয়ে নিষ্পাপভাবে প্রশ্ন করে, আপনার ও-দুটো হাত, না সামনের পা?

পরিণামে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, ক্যাডাররা কৌশিককে তুলোধোনা করে।

মার খেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কৌশিক যখন অন্ধকার খোলা মাঠে পড়ে থাকে তখন ওর নিজেকে টুপিহীন শুয়োর মনে হয়। কিন্তু যারা ওকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করেছিল, তারাও কি একই শ্রেণির? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে কৌশিক জ্ঞান হারায়। আকাশের চাঁদ ও তারা ওর অচেতন দেহ পাহারা দিতে থাকে।

কৌশিক সুস্থ হয়ে ওঠে সতেরো দিন পরে।

ময়দানে সেই পশুর মতো আক্রমণ ওকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। বরং ও বুঝতে পারে, টুপিহীন শুয়োরদের বেশিরভাগই হয় অন্ধ, নয়তো আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর।

কৌশিক বুঝতে পার, ওর সামনে এখন অনেক কাজ। শুয়োর বিষয়ে আরও অনেক গবেষণা ওকে করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে কৌশিক জিলিপির কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

# আর-একজন কোকিল

**আর-একজন কোকিল**

নমোসকার। এখোন যেটা লিখবো সেটা বড়দের জননো নয় কিনতু। মানে শুধু ছোটদের জনননা। আমাদের বাংলা বইয়ে পড়েচি–বড়োরা লিখেচে আর ছোটরা–মানে আমরা পড়ছি। বুটু কিনতু অনেক ছোট। আমার চেয়েও ছোট। তাই ওর জননো কে লিখবে। কেউ তো লিখছে না। তাই আমি লিখছি। বুটুর জননো বাংলা বই। ওর পড়ার বই।

অনেকদিন ভেবেছি কি করে বই লেখা যায়। লিখে-লিখে আর ভেবে পারি না। কী যে মুসকিল এই বই লেখা। একটু কঠিন করে লিখতে হবে কিনতু। গলপের বই তো নয় আর। পড়ার বই। সব্বাই বলে গলপের বইয়ের চেয়ে পড়ার বই কঠিন হয় তাই।

আমি গোটা বইটা একা লিখবো না কিনতু। সব বইতে দেখি একেকজন একেকটা পড়ার কঠিন গলপো (ওটাকে কি বলে ঠিক জানি না) লিখেছে। আমিও তাই। সেইরকোম আমি একটা লিখবো। অননোগুলো পাপিয়া, সুমি, কণিকে দিয়ে লেখাবো। তারপর একসংগে বই করে বুটুকে দেবো। আর না পড়তে পারলে বাবার বেতটা নিয়ে মারবো। বাবার মতোন জোরে মারবো না, কিনতু অলপো আস্তে মারবো যাতে ব্যথা লাগবে না মোটেই, কিনতু ভয় পাবে।

নমিতাকে দিয়েও বই লেখাতাম। কিনতু না। ওর সংগে আমার দারুণ ঝগড়া হয়ে গ্যাচে। ঝগড়া হোত না, কিনতু ও-ই আমাকে কালো বলেচে। আর কেউ কিনতু বলেনি। আমাকে মা বলেছিল, যে যাই তাকে তাই বললে খারাপ হোলে রেগে যায়। যেমান ভিকু খোঁড়াকে ল্যাংড়া বললে রেগে গিয়ে আমাদের মারতে আসে। বাবাকে একদিন মা মাতাল বলেছিল। তাই শুনে বাবার কি রাগ। মারতে

আসে আর কি মাকে। আমি শুয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করে দেখছিলুম। ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলুম। মাতাল মানে আমি জানি, বুটু জানে না। জানবে কি, ও বাবাকে শুধু বা বলে। আর কাঠের যে ঘোড়াটা মামু দিয়েচিল ওটাকে বলে ঘোরা। আমি ঘোড়া বলি কিনতু। বুটু তো বলবেই। বাচচা তো।

মাতাল মানে আমি পাপিয়াকে জিগগেস করেছিলাম। ও জানে না। আমার মনে হয় বেতাল বলে যে ছোটদের বই আচে (গলপের বই কিনতু) মাতাল মনে হয় তাই। শুধু ব এর জায়গায় ম। মানে বেটাছেলের জায়গায় মেয়েছেলে। তাই বোধহয় ব এর জায়গায় ম। মাতাল মানে বোধহয় তাহোলে মেয়ে বেতাল। কিনতু মা যে বাবাকে মাতাল বোললো বাবা কি মেয়ে? কে জানে!

তাই রাগ হোয়েচিলো আমার যখন নমিতা আমাকে কালো বলেছিল খেলবার সময় মাঠে। ওদের মসতো গাড়ি আছে। ভালো জামা পরা লোক চালায়। কিরকম সব মেশিন লাগিয়েছে আবার গাড়ির ভেতরে। তাতে গান হয়, পাখা ঘোরে। নমিতা ঐ গাড়ি চোড়ে ইসকুলে আসে। আমাদের সংগে খেললে ওর মা বকে, কিনতু তবু ও খেলে। দারুণ স্টাইল করে থাকে সবসময় সিনেমার পোসটারে দেখা সব মেয়েদের মতোন। আমি কিনতু বেশি সাজি না মা মারবে বলে।

যাগগে, যেকথা বলছিলুম। নীলাদি বোলতো যার মা ফরসা, বাবা ফরসা হয় সেও ফরসা হয়। নমিতার বাবা সবাই ফরসা, আমার কিনতু নয়। বাবা ফরসা খালি, মা কিনতু কালো, ফরসা নয়। মাঝে মাঝে তাই ভাবি ইশ মাও যদি ফরসা হোতো। নমিতা সবসময় আমাকে কালি বলে ডাকে, তাতে কিনতু আমি রাগি না। কালি তো ঠাকুরের নাম। কিনতু আমায় কালো বলেছিলো বলেই রাগ হয়েছিলো আমার।

আমি কি ইচ্ছে করে কালো হয়েছি? আমি মাকে জিগগেস করেছিলুম, আমি কালো কেন, ফরসা নই কেন। মা হেসে বলেছিলো, ভগোবান যে রং দেন সে রংই ভালো।

মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক সাবান মেখেচি কিনতু ফরসা হইনি। শুধু শীতকালে একটু অল্প ফরসা হই কারণ সাবান মাখলে গাটা কিরকম সাদা সাদা খড়ির মতোন হয়। পাপিয়া সুমি, কণি–ওরা খড়ি উঠলে জল দিয়ে ধুয়ে দেয় কিনতু আমি দিই না। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ রেখে দিই। মাকে ডেকে দেখাই। আয়নায় বার বার দেখি। আসলে আমার গায়ের রংটাই কালো।

কিনতু একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। আমাদের অমলকাকুর কথা। অমলকাকু আমার মতোন কালো ছিল কিনতু একদিন দেখি অমলকাকুর ঠোঁট দুটো সাহেবদের মতোন সাদা। আর সব কিনতু তেমনি কালো, সাদা নয়। মাকে আমি জিগগেস করেছিলুম, মা বলেচে ওটা একটা অসুখ। কিনতু অনেকদিনের মধ্যেই অমলকাকুর হাত পা সব সাদা হয়ে গেল। সাহেবদের মতোন। আমার কিনতু ইচ্ছে করছিলো ওরকম হয়ে যেতে। ঠিক মেমদের মতোন। কিনতু আমার হোলো না।

বুটু কিনতু আমার চেয়ে ফরসা, কিনতু বাবার চেয়ে কালো। মা বলে বড়ো হলে ও নাকি আমার মতোই কালো হয়ে যাবে। পাপিয়া, সুমি, কণি, ওরা ফরসা নয় কিনতু অলপো কালো। আমাকে একদিন কণি বলেছিলো ইস, তুই অলপের জননো ফরসা হতে পারলি না। তোর মা যদি ফরসা হোতো তবে তুইও ফরসা হোতি। তাহোলে আর তোর বিয়ের জননো কষ্টো হোতো না।–তখোন থেকেই আমি ভাবচি কি করে ফরসা হওয়া যায়। আবার ভাবি এখোন মা যদি ফরসা হয় তবে কি আমিও হবো। মনে হয় হবো। তাহোলে প্রথমে মাকে ফরসা করা দরকার কিনতু কি করে হবে। মাকে রোজ বলি সাবান মাখতে, মা হাসে। ভেবে ভেবে বুঝতে পারি না কি করে উপায় হবে। ধুর ছাই।

*

পড়ার বইতে যেমন চ্যাপটা (এক, দুই এমনি) থাকে আমার লেখারও তেমনি থাকবে কিনতু এক দুই নমবোর না দিয়ে তারার ছোবি দেবো। বুটু তারা ভালোবাসে।

কণিকে, সুমিকে আর পাপিয়াকে বলেছি পড়ার বই লেখার কথা। ওরা তো হেসেই খুন। লিখবে কি, খালি হাসছে। কিন্তু বলেছে লিখবে। সবগুলো হোলে চাদুমিয়াকে দিয়ে একসঙ্গে বাঁধিয়ে বই করে বুটুকে দেবো।

কাল রাতে বোতল ভেঙে বাবার হাত কেটে গেছে। তাই বাবা কি অসোব্য সব কথা বলছিলো মাকে। আমি ছুটে গিয়ে বুটুর কান চেপে ধরেছিলুম। যদি ও শোনে তাই। আমি তো বড় হয়েছি, সব বুঝি, বুটু ছোট তো তাই। বাবার হাত দিয়ে দরদর কোরে রকতো পড়চিলো। কিরকম করে যেন বাবার ফরসা হাতটা আরো অনেক ফরসা হয়ে যাচচিলো। ঘরে রকতো আর বিচচিরি গনধো ভরতি। বোতলের মধ্যে

জল ছিলো, সব পড়ে গ্যাচে মাটিতে, তার গন্ধ বোধহয়। বাবা কি তাহলে নরদমার জল খায় যে ওতে এমোন বাজে গনধো।

তখখুনি কিনতু মাথায় এলো ফনদিটা। মানে ফরসা হওয়ার কায়দাটা। কাউকে এখোন বলবো না। কিনতু মাকে বোলতেই হবে, কারণ মাকে আগে ফরসা করতে হবে।

*

বেশী চ্যাপটা করলে বাচচাদের ভালো লাগে তাই আরো একটা চ্যাপটা কোরলুম। বুটুর ভাল লাগবে। কিনতু আর একটু কঠিন কোরতে হবে লেখাটাকে। বেশি কোঠিন হচছে না। পাপিয়া লিখতে সুরু করেছে। ও আমাদের খেলার কথা আর ভিকু খোঁড়ার কথা লিখছে। সুমি নীলাদি কবে ওকে লজেনস দিয়েচিলো সেকথা লিখছে। কণি কিনতু ওদের কুকুর আর বেড়ালটার কথা লিখেছে খালি। একদিকে ভালোই হয়েছে। সব রকমের লেখা থাকা ভালো। আজ সককালে মার হাত কেটে গেচিল তরকারি কুটতে গিয়ে। ঠিক বাবার মতোন রকতো পড়চিলো খুব। কিনতু একই রকতো ঠিক বাবার মতোন। যারা ফরসা তাদের রকতো আর যারা কালো তাদের রকতো কি একই রকোম হয়। তাই হবে বোধহয়। তাই মা আর বাবার রকতো একইরকম লাল। রকতো পড়ে পড়ে মার হাতটা সাদা হয়ে গেলো। ব্যানডেজ বেঁধেও রকতো বনধো হচছে না। শেষে অনেক পরে বনধো হলো রকতোটা। মা যনতোনায় মুখ কুচকে রইলো। এটটু পরেই মাকে বললাম ফনদিটা। শুনে মা এতো বকলো যে কি বলবো। মাকে বলেচিলুম মা আমার হাতটা তুমি অমনি করে কেটে দাও তবে আমার হাতটাও সাদা ফরসা হয়ে যাবে। বকুনি খেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। বুটুকে নিয়ে বাইরে চলে এলাম। এখন আর তাহোলে লিখবো না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি তাই ঘুম ভেঙে গেল চিৎকারে। আমি রোজ মার পাশে বুটুকে নিয়ে শুই। আজও তাই। ঘরে শুধু একটা পিদিম জ্বলচে। সেই আলোয় দেখি মা বিছানায় বসে কাঁদছে আর বাবা ঘরময় ঘুরে বেড়াচে ঠিক যেন কণিদের এলসিয়ান কুকুরটা। বুটুর কানে হাত চাপা দিলাম যাতে ওর ঘুম না ভেঙে যায়, উঠে পড়ে। বাবা চেঁচিয়ে বলচিলো–রোজ রোজ আমি সঝঝে কোরবো না। আজ আমার চাই। কোথায় আছে বলো শিগগিরি। মা কাঁদচিলো, মুখ তুলে বললো আমার যা আছে সবই তোমার পিণ্ডি গিলতে (বেঁচে থাকলে পিণ্ডি হয় নাকি। পাপিয়ার দাদু তো মারা গেছে। তাই ওরা পিণ্ডি দিয়েচে। পিণ্ডিটা বোধহয় খাবারটাবার কিছু হবে।) যাচছে। আর কত চাও। ছেলেমেয়ের মুখটা একবার দেখবে না। বাবা কণিদের পুসির মতোন দাঁত খিঁচিয়ে

বললো–চুপ কর মাগী, কথা বলবি তো জিব টেনে ছিঁড়ে নেবো। কোথায় আছে বের কর। মা একবার পেছন দিকে চেয়ে দেখল আমরা শুয়ে আছি কিনা। আমি চুপ করে শুয়ে চোখ বেশী নয়। অলপো ফাঁক করে দেখছিলুম। তাই মা বুঝতে পারলো না। বাবাকে বললো–ওগো, তোমার পায়ে পোরচি, রাত বিরেতে এখন চেঁচামেচি কোর না। ওরা উঠে পোড়বে। একটু থেমে মা আবার বললো– সবই তো তোমাকে দিয়েছি। যা অলপো সনচয় রেখেছি তা মেয়েটা আর ছোট ছেলেটার জন্য। তাও তুমি ওসব অখাদটো জিনিসের পেছোনে ওড়াবে। আমি বেঁচে থাকতে তা হোতে দেবো না। তুমি নিজে তো একটা অমানুষ, এখন ছেলেমেয়েগুলোকেও অমানুষ করবে। বাবা হঠাৎ এগিয়ে এল। এক হ্যাঁচকায় টেনে তুললো আমাকে আর বুটুকে। টেনে নিয়ে চললো রাননাঘরে। ওখানে মেঝেতে দড়াম করে ফেলে দিয়ে দরজা বনধো করে দিল। তারপর দুপদুপ করে চলে গেল।

এদিকে বুটু ঘুম ভেঙে গিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। আমি তাড়াতাড়ি ওকে ঘুম পাড়াতে লাগলাম। অলপো পরেই ও আবার ঘুমিয়ে পড়লো। আমি বসে রইলুম। কিনতু কিছুই শুনতে পেলাম না।

এইরে, বুটুর জননো লেখা বইয়ে বুটুর কথাই অনেক লিখে ফেলেছি। তবে কোন ভয় নেই। বাঁধাবার আগে যখন পুফ (সুমিদের পেরেস আচে। ওরা পেসে পুফ দেখে, ঠিক তেমন করে আমিও পুফ দেখবো) দেখবো তখন কেটে বাদ দিয়ে দেবো। নয়তো বুটু হাসবে। এখন আর লিখবো না। ভীষণ ঘুম পাচে। (এখোন কিনতু ঘুম পাঁচচে না। যখোনকার কথা লিখছি তখোন ঘুম পাঁচচিলো তাই লিখলুম। বড়োরাও এমনি লেখে।)

*

সককালে উঠে যা দেখলাম কি বোলবো। এতো মজা আননদো আর খুশি হোল যে আমার নাচতে ইচচে কোরছিলো। সকালে উঠে দেখি রাননাঘরে পড়ে আছি। দরজা তো বাইরে থেকে বনধো। কেমনি করে বেরই। বুটু কিনতু ঘুমোচচে। বাচচা তো। তখনই দেখলুম বেড়ার তলার ফাঁকটা, যেখান দিয়ে ভুলু রাননাঘরে ঢোকে মাংসের হাড় খাবার জননো। চটপট সেখান দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অমলকাকু যে ফ্রকটা দিয়েছিলো ওটা পরেছিলাম। একটু ছিঁড়ে গেলো। ছুটটে গিয়ে সদর দিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। তারপর রাননাঘরে গিয়ে দরজা খুলে বুটুকে বের করে আনলাম। তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়েই আননদোটা হোল। তাড়াতাড়ি বুটুকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম তারপর ছুটটে গেলাম মার কাছে। মা শুয়েচিলো আর–

আর কি ফরসা। অনেক-অনেক ফরসা। আগের বারের মতোন শুধু হাত নয়, এবার পুরোটা ফরসা।

হটাৎ দেখি একটু দুরে মার আঁচলের চাবিটা পড়ে আচে আর এটটু রকতো। তাহলে বোধহয় মারামারির সময় বাবার হাত থেকে, মার হাত থেকে কাটা থেকে রকতো পড়েছে। বাবা দেখলুম রোজকার মতোনই বাড়িতে নেই। মাকে অনেক ডাকাডাকি কোরলুম–মা, দেখো, তুমি ফরসা হোয়ে গেচো। মা–ওমা। কি মজা এবার। তাহোলে আমিও ফরসা হবো। নীলাদি বোলেছিলো যে তোর মা যদি ফরসা হোত তবে তুইও ফরসা হোতিস। তাহোলে মা তো হয়েই গেছে, এবার আমি হব। বুটুর হওয়ার কোনো দরকার নেই–ও তো ছেলে। যতোককন মা ঘুমোচছে ততক্ষণ এটা লিখে ফেলছি। শেষদিকটা ইচচে করে একটু কঠিন দিলুম। পড়ার বই তো, গলপের বই তো নয় আর। আজ গিয়ে নমিতাকে কোষে বকুনি লাগাবো আমাকে কালি বলার জননো। রোজ রোজ ইয়ারকি ভালো লাগে না। ওকে বোলবো–এত বড় ধেড়ে মেয়ে হোয়ে মিতথে কথা বলিস কেমন করে রে। চোখের ওপর দেখছিস আমি ফরসা তবু কালি বোলচিস, বানচো তোদের কুকুরটার নাম কালি রাখিস। নাঃ, বড়ডো খিদে পেয়ে যাচে। কতোকখন যে বসে থাকতে হবে কে জানে। বাইরে মনে হয় কারা আসছে। একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। তারপরই গসগস গসগস করে বুটের শবদো। বোধহয় হরিশ কাকুরা বেড়াতে এল। সোততি, কি অবাকই না ওরা হয়ে যাবে মাকে দেখে। কিনতু আর এটটু দেরি কোরে আসতে পারলো না ওরা! ততোকখনে আমিও ফরসা হোয়ে যেতুম। একেই বলে কানডোজ্ঞানহীন এর মতো কাজ করা। মরণ…!

# পাখির রাজা

**পাখির রাজা**

লাল, নীল, হলদে, সবুজ, গোলাপি। নানারকম রঙের খেলা। রামধনুর সাত রঙের ছোট বড় টুকরোগুলো লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে খাঁচাগুলোর ভেতরে। সেই খাঁচা বাঁকে বেঁধে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে বুধন পাখিওলা। মুখে তার দেহাতি স্বরে সুরেলা ডাক, টিয়া, ময়না, বুলবুলি, বদ্রী, মুনিয়া পাখি চাই বাবু, পাখি রং-বেরঙের পাখি–

সকালের রোদ্দুর সবে দেখা দিয়েছে। শীতের কুয়াশা ভয়েভয়ে সরে পড়েছে চোখের আড়ালে। মফস্সল শহরে নতুন একটা দিনের শুরু হয়েছে। আর সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে বুধন পাখিওলার নতুন একটা দিন। কাঁচাপাকা এবড়োখেবড়ো নানান সড়ক ধরে শুরু হয়েছে তার পথ চলা।

অন্যদিন বাঁক কাঁধে নিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বুধন যখন পথে নামে, তখন মনে থাকে অনেক চিন্তা। কটা পাখি বিক্রি হবে আজ। কটাকাতেই বা বিক্রি হবে। তারপর সেই টাকা কীভাবে খরচ করবে সে। দেশে মানি-অর্ডার করে তা কতটুকু বুধন পাঠাবে।

কিন্তু আজ তার মনে এসব চিন্তা নেই। বরং সে ভীষণ খুশি। কারণ গত পরশু ঠিক সন্ধের মুখে একটা দারুণ জিনিস পেয়ে গেছেন বুধন। কোনওদিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি, এরকমভাবে তার কপাল খুলে যাবে।

এই শহরে সাত-সাতটা লম্বা বছর কেটে গেছে বুধনের। সেই কোন যুগে দেশ ছেড়ে এখানে পাড়ি জমিয়েছিল সে। প্রথমে মোট বওয়া শুরু করেছিল হাট-বাজারের এলাকায়। পরে তার পাখির নেশা লাগে। ঝোপে-জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে

একটা-দুটো করে পাখি ধরতে শুরু করে সে। তারপর দেখতে দেখতে একদিন তার নাম হয়ে গেল বুধন পাখিওলা। সেই যে খাঁচাসমেত বাঁক একবার কাঁধে তুলে নিয়েছে, আর নামানোর ফুরসত পায়নি।

পাখিদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে তাদের হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা, সবই যেন বুঝতে পারে বুধন। কখন ওদের খিদে পায়, কখন তেষ্টা পায়, কখন ঘুম পায়, সবকিছু বুধন পাখিওলার নখদর্পণে। সে থাকে আধা-শহরের এক প্রান্তে, দেহাতি মানুষদের বস্তিতে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক থাকে এই বস্তিতে। যেন একটা একান্নবর্তী পরিবার। প্রত্যেকেই ওরা দেশছাড়া। এখানে খাটে, খায়, দেশে টাকা পাঠায়, আর মাঝে-মাঝে অক্ষর-পরিচয় আছে এমন কোন মুরুব্বিকে ধরে চিঠি লিখিয়ে নেয়। দেশ থেকে কোনও চিঠি এলে সেই এক ব্যাপার। মুরুব্বি এসে পড়ে দেয়। শেষ যে-চিঠিটা বুধন দেশ থেকে পেয়েছে, সেটা এসেছে তিনদিন আগে। আর বেশ খারাপ খবরই বয়ে নিয়ে এসেছে সেই চিঠি। তার একমাত্র ছেলে মুন্নার খুব অসুখ।

মুন্নার কথা খুব আবছাভাবে মনে পড়ে বুধন পাখিওলার।

সাত বছর আগে যখন সে মুলুক ছেড়ে আসে, তখন মুন্নার বয়েস মাত্র দেড় বছর। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সে তিন মাস পরপর টাকা পাঠায় বউয়ের কাছে, আর মুন্নার খবর নেয় চিঠিতে। উত্তরও আসে ঠিকমতো। বছরে-বছরে একটু-একটু করে বড় হচ্ছে মুন্না। বুধন কল্পনাতে দ্যাখে, ছোট্ট মুন্না হাঁটতে শিখেছে, দৌড়োতে শিখেছে। সে ছুটে-খেলে বেড়াচ্ছে ভুট্টা-জওয়ার-এর খেতে।

এই বছরেরই গোড়ার দিকে ইস্কুলে ভরতি হয়েছে মুন্না। খবরটা পেয়ে বুধনের খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু তিনদিন আগে পাওয়া চিঠিটায় খারাপ খবরটুকু পেয়ে সে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে।

প্রথমটা সে বিশ্বাসই করতে চায়নি। মুরুব্বিকে বলেছে বারবার চিঠিটা পড়তে। কিন্তু তাতে খবরটা পালটায়নি। মুন্নার চিকিৎসার জন্য এখুনি বেশ কিছু টাকা পাঠানো দরকার।

এতগুলো বছর দেশছাড়া হয়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে বুধনের। মাঝে-মাঝেই ইচ্ছে হয়েছে। দেশে পাড়ি জমাতে। কিন্তু অনেকগুলো টাকা গাড়িভাড়ার কথা ভেবে সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। মুন্নার ভালোর জন্যেই তো সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে জান দিয়ে খেটে চলেছে!

বুধন একবার ভাবল, দেশোয়ালি ভাইদের কাছে হাত পাতে। কিন্তু তাদের অবস্থাও তো বুধনের চেয়ে কিছু ভালো নয়। তারা বড় জোর দু-পাঁচ টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তাতে তো মুন্নার চিকিৎসার কোনও সুরাহা হবে না। সুতরাং আনমনাভাবে একটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে বুধন। সেদিন সে আর পাখি নিয়ে টহলে বেরোয়নি। তখন কি জানত সে, পরদিনই নেহাত কপালজোরে তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

রোজকার মতো সেদিনও খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে বুধনের। ঘুম না ভেঙে উপায় নেই। কারণ, ভোরের আলো ফুটে ওঠামাত্রই কাপড়ে ঢাকা খাঁচার পাখিগুলো কিচিরমিচির শব্দে কলরোল জুড়ে দেয়। যেন বলতে চায়, ওঠো, বুধনভাই, আমাদের খেতে দাও। জল দাও। তারপর কাঁধে করে বেড়াতে নিয়ে চলো।

সুতরাং বুধন উঠে পড়ে। একটা ছোট্ট ঘরে তারা দুজন শোয়। সে এবং তার এক সঙ্গী শিবুয়া। শিবুয়া ফুচকা বিক্রি করে। ফলে তার ভোরে ওঠার দরকার হয় না। সে বেরোয় বিকেলে। সারাদিন ঘরে থেকে সেই দুজনের খানা পাকায়। বদলে বুধনের কাছ থেকে টুকিটাকি জিনিস উপহার পায়–তেল, সাবান ইত্যাদি।

ঘুম থেকে উঠে গায়ের ছেঁড়া কম্বলটা চাদরের মতো শরীরে জড়িয়ে নেয় বুধন। তারপর চটের বিছানাটা গোল করে গুটিয়ে তুলে রাখে ঘরের কোণে। শিবুয়া গুটিসুটি মেরে এখনও ঘুমে অচেতন। নিমের দাঁতন আর অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে বুধন। এখানে ওখানে উনুনে আঁচ ধরানো হয়েছে। ঘন ধোঁয়া এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে আকাশে। কাছেই মিউনিসিপ্যালিটির কলে জল পড়ছে। সেখানে বস্তির অন্যান্য বাসিন্দার ভিড়। তারা হাত-মুখ ধুয়ে নিচ্ছে। কেউ বা স্নান সারতে এসেছে। কারও মুখে শোনা যায় ভোজপুরী গানের কলি। দাঁতন করতে করতে সেদিকে এগোয় বুধন।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে বুধন পাখির খাঁচার ঢাকনা খুলল। পাখিরা ছটফট করতে লাগল চঞ্চল হয়ে। ওরা জানে, এখন খেতে দেওয়া হবে।

ছোলা, কাঙনিদানা, ছাতুর ডেলা, গুঁড়ো আটা, যার যা বরাদ্দ সবাইকে সেইমতো খেতে দিল বুধন। বাখারি দিয়ে খাঁচার তারে আটকানো ভাড়ে জলও ঢেলে দিল প্রয়োজন মতো। তারপর গতকালের একজোড়া বাসি রুটি দিয়ে নিজেও খাওয়া সেরে নিল। আর একজোড়া রুটি কোমরে গুঁজে নিল বেলায় খাবে বলে।

গায়ের কম্বল নামিয়ে রেখে দড়িতে ঝোলানো কালো রঙের ময়লা সোয়েটারটা টেনে নিল সে। গেঞ্জির ওপরে পরে নিল। তারপর একটা পাতলা লিনেনের চাদর তার ওপরে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের কোণে দাঁড় করানো তামাটে রঙের বাঁকটা তুলে নিল। সেটাকে মাটিতে বার-দুয়েক ঠুকে এগিয়ে গেল খাঁচাগুলোর কাছে। পাখিরা তখন খাওয়াদাওয়া সেরে ভোরের গান ধরেছে। যেন সমস্বরে বলছে, বেড়াতে চলো, বুধনভাই, বেড়াতে চলো।

বাইরে এসে হিমে ভেজা পথ-চলতে শুরু করল বুধন। ভোরের কুয়াশার জন্য সূর্যের আলো এখনও তেমন তেজি হয়নি। দূর থেকে ভেসে এল কু-ঝিকঝিক ট্রেনের শব্দ। সঙ্গে তিরবেগে ছুটে চলা লোহার চাকার ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ। সেই শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতেই বুধন পাখিওলা সুর তুলে প্রথম হাঁক দিল, পাখি চাই বাবু, পাখি রংবেরঙের পাখি।

পাড়া-বেপাড়া ঘুরে এগিয়ে চলে বুধন। আজ একটা সবুজ টিয়া আর একজোড়া মুনিয়া বিক্রি করতে পেরেছে। এখানে বেশি দামের পাখি খুব একটা বিক্রি হতে চায় না। সেগুলো বিক্রি করার জন্য রয়েছে সাহেবপাড়া। ইস্টিশানের কাছে নতুন-নতুন সব বাড়ি উঠছে, কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছে। সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে বড়-বড় অফিসারের দল। তাদের কয়েকজনের তো আবার মোটরগাড়ি আছে। ময়না কিংবা বদ্রী বেশিরভাগ বিক্রি হয় ওই সাহেবপাড়াতেই। তবে সেখানে ছুটির দিন দেখে যেতে হয়। তখন বাবুরা সব বাড়িতে থাকেন। আজ ছুটির দিন নয়, তাই সাহেবপাড়ার দিকে আর যায়নি বুধন।

সূর্যের তাপ ক্রমে বাড়ছে। শীত কেটে গিয়ে এক অদ্ভুত আমেজ তৈরি হচ্ছে। বাঁক কাঁধে নিয়ে পায়ে-পায়ে প্রাইমারি স্কুলের কাছে পৌঁছে গেল বুধন। এখনও এগারোটা বাজেনি। ফলে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরের মাঠে-সড়কে জটলা করছে, ছুটোছুটি করছে। এই সময়টাতে রোজ এখানে চলে আসে বুধন। একটা শিমুল গাছের নীচে বাঁক নামিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে। শুকনো রুটি দুটো কোমরের গেঁজে থেকে বের করে ধীরে-ধীরে খেতে থাকে। প্রাণচঞ্চল প্রজাপতির

মতো রংবেরঙের শীতের পোশাক পরা ছেলেমেয়েদের দু-চোখ ভরে দ্যাখে। তার মনে পড়ে যায় মুন্নার কথা। আনমনা হয়ে ওদের কলরোল শোনে বুধন। সেই সঙ্গে খাঁচার পাখিদের কলরোলও তার কানে আসে। কয়েক টুকরো রুটি ছিঁড়ে সঙ্গে খাঁচার মধ্যে গুঁজে দেয়। পাখিরা ব্যস্তভাবে ঠোকরায় সেগুলো।

কাছাকাছি টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে ফিরে আসে বুধন। দেখে ইতিমধ্যেই বাচ্চারা তার খাঁচা ঘিরে ভিড় করে ফেলেছে। রোজই ওরা স্কুলের ঘণ্টা বাজার আগে এইভাবে পাখির খাঁচাগুলো ছেকে ধরে। পাখিদের সঙ্গে কথা বলে, খেলা করে, কেউ বা খোঁচায়। বুধন গিয়ে বসে খাঁচার পাশটিতে।

ও পাখিওলা, পাখিওলা, এই পাখিটার নাম কী?

ছেলেটির মুখের দিকে তাকায় বুধন। মাজা রং, গোলগাল চেহারা, মুখটা ভারি মিষ্টি। বয়েস কতই বা হবে! আট কি নয়। গায়ে লাল কালো উলের সোয়েটার। মাথার চুল কপালে নেমে এসেছে।

মুন্নার কথা আবার মনে পড়ে বুধনের। এখন দেখতে কীরকম হয়েছে ও? এইরকম কি?

বুধন ছেলেটিকে জিগ্যেস করে, কোন পাখিটা, খোকাবাবু?

এই যে, এইটা। ঘাড় গুঁজে বসে আছে। একদম খাচ্ছে না। আঙুল দিয়ে একটা ফুলটুসি পাখিকে দেখায় ছেলেটি। বুধন সেটার নাম দিয়েছে বড়াসাব। কারণ, পাখিটা সারাদিন আপনমনে বসে থাকে। শুধু খাওয়ার সময় নড়াচড়া করে জায়গা ছেড়ে।

এটা খুব রাশভারী পাখি, খোকাবাবু। কারও সঙ্গে কথা বলে না। চুপচাপ থাকে। ওর নাম বড়াসাব।

বুধনের কথায় খিলখিল করে হেসে ওঠে ছেলেমেয়ের দল। ঈশ্বর যেন জলতরঙ্গ বাজাচ্ছেন। বুধন মুগ্ধ হয়ে শোনে। একটি মেয়ে বলে ওঠে, তোমার সব পাখির নাম আছে?

হ্যাঁ, দিদিমণি, ঠিক তোমাদের মতো। এটার নাম ঘুরঘুটিয়া, এটার নাম খিলাড়ি, এই পাখিটার নাম শরবতী– একে-একে পাখিগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখায়

বুধন। তার কথায় হইহই করে হাসির রোল পড়ে যায়। ওরা নামগুলো আওড়ে ডাকাডাকি করতে থাকে পাখিগুলোকে। বুধন লাল সোয়েটার পরা ছেলেটিকে দেখতে থাকে। খুশিতে মুখ-চোখ যেন টগবগ করছে।

এমন সময় স্কুল বসার ঘণ্টা বাজল। ছেলেমেয়েরা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল স্কুলের দিকে। যেন বসন্তের অস্থির বাতাস। ওরা চলে গেলে বুধন পাখিওলা একা পড়ে রইল। তার পাখি তখন অল্প-স্বল্প ডাকছে।

ফাঁকা জায়গাটার চারপাশে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিল বুধন। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বাঁক কাঁধে তুলে আবার সে রওনা হল। মুন্নার অসুখ সারবে কী করে সে-কথাই শুধু ভাবতে লাগল।

বিকেল-বিকেল সময়েই ঘটনাটা ঘটল।

কোনও চিঠিপত্র এসেছে কি না সে-খোঁজ নিতে পোস্ট অফিসের দিকে গিয়েছিল বুধন।, নতুন কোনও চিঠি আসেনি। তাই স্টেশনের লাগোয়া সরু পথ ধরে তখনই সে ফিরে আসছিল।

কাঁচা সড়ক। দু-পাশে আকন্দ, ধুতরো আর ভেরেণ্ডা গাছের ঝোঁপ।

হঠাৎই আনমনা বুধনের কানে এল একটা মিষ্টি টুই-টুই শব্দ।

পাখির ডাক! ভীষণ সুরেলা এবং মিষ্টি।

কী পাখি এটা! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বুধন। অতি সাবধানে চারপাশে তাকাল। পাখি ধরা তার অনেকদিনের অভ্যেসলাঠির মাথায় শিরীষের আঠা মাখিয়ে বা অন্যভাবে ফাঁদ পেতে। কিন্তু এখন, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়, সে কি পারবে এই লুকোনো পাখিটাকে বন্দি করতে?

তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে পাখিটাকে একসময় আবিষ্কার করল বুধন পাখিওলা।

টুকটুকে গোলাপি তার গায়ের রং। ডানায় ফিকে রঙের দাগ। মাপে চড়ুই পাখির চেয়ে একটু বড়। ছোট্ট কোনাচে ঠোঁট। জলপাই সবুজ ও বাদামি রঙে মেশানো লেজটা দু-ভাগে ভাগ সরেলা শিস সেবটা খুলে ফেলতে সময় নিয়ে নিন করা। ছটফটে পাখিটা একটা বুনো ফুলে মুখ ডুবিয়ে মধু খাচ্ছে। আর থেকে-

থেকেই টুই-টুই করে সুরেলা শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে ডাকছে। যেন প্রশ্ন করার সুরে বলছে, তুই? তুই?

গায়ের চাদরটা খুলে ফেলল বুধন। তারপর আড়ালে-আড়ালে পা টিপে টিপে বিভোর পাখিটার খুব কাছে পৌঁছে গেল। এক মুহূর্ত সময় নিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিল। তারপর চাদর বাগিয়ে ধরেই ঝপাৎ। চাদরের ফঁদে ধরা পড়ল নাম-না-জানা অচিন পাখি। বুধনের বুকটা আনন্দে নেচে উঠল। না জানি কত দামে বিক্রি হবে এই পাখি। সে মনে-মনে বলে উঠেছে, রাজা পাখি, তুই আমার মুন্নাকে বাঁচাবি।

চাদরে বন্দি পাখিটাকে বুকে করে ঘরে নিয়ে এসেছে বুধন। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে।

এ-সবই গত পরশুর ঘটনা।

তারপর নতুন পাখিটাকে আলাদা একটা খাঁচায় রেখেছে সে। খেতেও দিয়েছে। অন্য পাখিগুলো নতুন পাখিটাকে ঘিরে জটলা করে শুরু করে দিয়েছে কিচিরমিচির। কিন্তু নতুন পাখিটা একেবারে চুপচাপ। মাঝে-মাঝে শুধু ডানা ঝাঁপটে উড়ে বেড়াচ্ছে খাঁচার ভেতরে। এরকম প্রথম-প্রথম হয়। পরে সব ঠিক হয়ে যায়। বুধন তা ভালো করেই জানে।

কিন্তু সেদিন রাতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনায় রীতিমতো অবাক হয়ে গেল সে। কারণ সাত বছরের পাখি-বেচার জীবনে এরকমটা কখনও বুধন দেখেনি।

রাত তখন কত হবে? বারোটা, একটা, না দুটো, তা বুধন বলতে পারবে না। তবে এটুকু জানে, পাখিদের খেতে দিয়ে, খাঁচা ঢাকা দিয়ে, লণ্ঠন নিভিয়ে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙল অদ্ভুত সুরেলা শিসের শব্দে। রাজা পাখি রাত্তিরে শিস দিয়ে ডাকছে। কান খাড়া করে শুয়ে রইল বুধন। অদ্ভুত মিষ্টি ডাক।

তার একটু পরেই ঘটে গেল আরও অবাক করা ঘটনা। অন্য পাখিগুলোও একে-একে ডাকতে শুরু করল। রাজা পাখির ডাকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরা ডাকছে। এদের মুখে এত মিষ্টি ডাক বুধন কখনও শোনেনি। সে যেন স্বপ্নের মধ্যে চলে গেছে স্বর্গের কোনও বাগিচায়। সেখানে লাল নীল-হলদে-সবুজ পাখিরা সব

ডাকছে। এক অপূর্ব খুশিতে বুধনের মনটা ভরে উঠল। ওদের ডাক শুনতে-শুনতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালেও তার ঘুম ভেঙেছে সেই রাজা পাখির ডাকে।

ওদের খাবার দিতে গিয়ে কেমন একটা খুশি-খুশি ভাব লক্ষ করল বুধন। এই একটা নাম না-জানা পাখি যেন সবাইকে খুশিতে মাতিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বুধনের খুশির আকাশে মুন্নার অসুখের খবরটা যেন দুঃখের কালো মেঘের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে।

রোজকার মতো ওদের খাঁচা বাঁকে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল বুধন। ভগবান যেন তার বেশ কয়েকটা পাখি আজ বিক্রি করিয়ে দেন। কিন্তু রাজা পাখিকে যদি কেউ কিনতে চায়? কত দাম চাইবে বুধন? দশ-কুড়ি, না পঞ্চাশ টাকা?

বেলায় যখন স্কুলের সামনে সে হাজির হল তখন সত্যিই সাড়া পড়ে গেল রাজা পাখিকে ঘিরে।

ছেলেমেয়েরা মুখ দিয়ে নানান শব্দ করছে, আর পাখিগুলোও যেন সাড়া দিচ্ছে সেই তালে। টুই-টুই ডাকে মধু ছড়িয়ে রাজা পাখি নাচছে তারের দোলনায়।

এই নতুন পাখিটার নাম কী গো পাখিওলা? গোলগাল মিষ্টি ছেলেটি খাঁচার ওপর ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল।

আসল নাম তো জানি না, খোকাবাবু। তবে আমি ওর নাম দিয়েছি রাজা পাখি।

ব্যস, নাম শুনেই ওদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল।

কী মজা, পাখির রাজা! কী মজা, পাখির রাজা! ওরা সমস্বরে ছড়া কেটে বলতে লাগল। কেউ-কেউ আবার হাততালিও দিচ্ছে।

বাচ্ছা ছেলেটি বুধনকে লক্ষ করে বলল, তোমার রাজা পাখি কী সুন্দর!

এ খুব মাহাঙ্গী পাখি, খুকি। অনেক দাম এর।

একসময় স্কুলের ঘণ্টা পড়ে। ছেলেমেয়েদের ভিড় কঁকা হয়ে যায়। বুধন আবার পথ চলতে শুরু করে।

আজও যখন পাখি নিয়ে ইস্কুলে সে পৌঁছোল তখন গতকালের মতোই হল্লোড় পড়ে গেল রাজা পাখিকে নিয়ে। কত আবদার, কত প্রশ্ন, কত খেলা! বুধনের খুব ভালো লাগে ওদের এই চপলতা। যেন এক ঝাঁক রং-বেরঙের পাখি।

আবার রাতে ঘরে ফিরেও সেই একই ব্যাপার। মাঝরাতে রাজা পাখির সুরেলা শিস, আর তাকে অনুসরণ করে অন্য পাখিগুলোর মিষ্টি গান। আবার ভোরবেলা শুরু হয় ওদের সূর্যস্তবের মন্ত্র। বুধন যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে ওদের আশ্চর্য ভাষা।

এইভাবে দিন কাটছিল বুধন পাখিওলার। কিন্তু একদিন বিক্রি হয়ে গেল রাজা পাখি।

দিনটা ছিল রবিবার। ছুটির দিন। তাই পাখি নিয়ে সাহেবপাড়ায় টহল দিতে বেরিয়েছিল বুধন। তখন সবে সকালের শুরু।

কোয়ার্টারগুলোর পাশ দিয়ে হাঁক পেড়ে সে এগিয়ে চলেছে, পাখি চাই, বাবু, পাখি–লাল নীল হরেক রঙের পাখি।

হঠাৎই একটা বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে একটা ছোট মেয়ে ডাকল তাকে, এই পাখিওলা, ওপরে এসো।

সবুজ রঙের ছিটকাপড়ের ফ্রক পরা বছর দশেকের একটি মেয়ে। লাল ফিতে বাঁধা ছোট্ট বিনুনি দুটো কানের পাশ দিয়ে ঝুলে রয়েছে নীচের দিকে। মেয়েটি রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে বুধনকে ডাকছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার উঠে গেল বুধন। ওদের দরজার সামনে খাঁচাগুলো নামিয়ে বসল মেঝেতে। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দরজায় ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট পরা এক ভদ্রলোক। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, কাঁচাপাকা চুল, ফরসা চেহারা। তাঁর হাত ধরে দাঁড়িয়ে বারান্দায় দেখা ছোট্ট মেয়েটি। সে হাত-পা নেড়ে বুধনকে সব পাখির দাম জিগ্যেস করতে লাগল।

মেয়েটির কথার উত্তর দিলেও বুধনের চোখ কিন্তু ভদ্রলোকের দিকে। কারণ তিনি তখন একদৃষ্টে রাজা পাখিকে দেখছেন।

হঠাৎই তিনি বুধনকে জিগ্যেস করলেন, এ-পাখি তুমি কোথায় পেলে?

থতোমতো খেয়ে গেলেও বুধন বলল, ইস্টিশানের কাছে ঝোঁপ থেকে ধরেছি বাবু।

ভদ্রলোক মেয়েটিকে লক্ষ করে বললেন, টুনি, এই পাখিটা নাও। এ-পাখি চট করে পাওয়া যায় না। এগুলো কাশ্মীর আর পশ্চিম হিমালয়ে পাওয়া যায়। শীতকালে যাযাবর পাখি হয়ে নীচে নেমে আসে। খুব মিষ্টি গান গায় এরা।

ভদ্রলোকের কথার প্রমাণ দিতেই যেন রাজা পাখি মিহি সুরেলা কণ্ঠে বারকয়েক ডেকে উঠল।

বুধনের বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে চলেছে। ইশ, যদি সত্যি পাখিটা ওরা কিনে নেয়, তা হলে বড় ভালো হয়। কিন্তু কত দাম চাইবে বুধন?

পাখিটার নাম কী, বাবা? মেয়েটি জানতে চাইল কৌতূহলী গলায়।

লালটুটি। কেউ কেউ শুধু টুটিও বলে। তারপর বুধনকে লক্ষ করে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কত দাম পাখিটার?

তিরিশ টাকা বলবে? নাকি চল্লিশ? মুন্নার অসুখের কথাটা মনে পড়তেই বুধনের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, পঞ্চাশ টাকা।

দামটা কি বেশি বলা হয়ে গেল?

কিন্তু বুধনকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে, তবে খাঁচাসমেত দিতে হবে। টুনি, যাও, মায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে নিয়ে এসো।

মেয়েটি চলে গেল। তবে একটু পরেই ফিরে এল। হাতে চকচকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট। সেটা দেখে খুশিতে বুধনের বুকের ভেতরটা যেন নাচছে।

রাজা পাখিকে খাঁচাসমেত ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিল বুধন। তারপর পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিয়ে কোমরে গুঁজল। সেলাম জানিয়ে অন্য খাঁচাগুলো বাঁকে ঝুলিয়ে সে নামতে লাগল নীচে। তার পা দুটো যেন তাড়াতাড়ি চলার জন্য ছটফট করছে। কতক্ষণে টাকাটা সে মানি-অর্ডার করবে দেশে। তা ছাড়া দেরি করলে যদি সাহেব-বাবুর মত পালটে যায়? যদি পাখি ফেরত দিয়ে ফেরত চান টাকাটা?

সুতরাং, রাস্তায় এসে বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিল বুধন। আজ আর টহল দেওয়ার দরকার নেই। রাজা পাখি বেচে সে রাজা-টাকা পেয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করার জন্য হয়তো খেয়াল করল না, খাঁচার অন্য পাখিগুলো হঠাৎই যেন একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে।

সেদিন রাতে ঘুম ভেঙে অন্ধকারে চোখ মেলে উত্তর্ণ হয়ে রয়েছে সে। আশ্চর্য! চারদিকে নিঝুম। থমথমে। একটা পাখিও ডাকছে না। কোথায় গেল ওদের কিচিরমিচির কলতান! অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে এক সময় সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোর হল রোজকার মতো। সূর্যও উঠল। কিন্তু রোজকার মতো পাখিরা আর ডাকল না। ফলে বেশ বেলাতেই বুধনের ঘুম ভাঙল। পাখিদের সে খেতে দিল, কিন্তু ওদের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। খাবার নিয়ে রোজকার মতো আর কাড়াকাড়ি করল না ওরা।

বুধন ঠিক করল, পাখি নিয়ে ফেরি করার টহল সেরে দুপুরে টাকাটা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পোস্ট-অফিসে যাবে। শিবুয়াকে সেইরকম বলে বেরিয়ে পড়ল সে।

এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেলাবেলি আবার সেই প্রাইমারি স্কুলের সামনে। রোজকার মতো হইচই করে ছুটে এল কচি ছেলেমেয়ের দল। কিন্তু খাঁচাগুলোর কাছে এসেই ওরা থমকে দাঁড়াল। যেন একটা ধাক্কা খেয়েছে।

রাজা পাখি কোথায় গেল?

ছোট্ট ছেলেটির প্রশ্ন যেন বুধনের দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করল।

ওদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, রাজা পাখি নেই, রাজা পাখি নেই। তারপর ওরা একই প্রশ্নে বুধনকে ছেকে ধরল, রাজা পাখি কোথায় গেল?

কেন যেন নিজেকে অপরাধীর মতো মনে হতে লাগল বুধনের। সে ছোট্ট করে জবাব দিল, রাজা পাখি বিক্রি হয়ে গেছে গো। পঞ্চাশ টাকায়।

পঞ্চাশ টাকায় কথাটা যতটা গর্বের সঙ্গে বলা উচিত ছিল ততটা গর্বের সঙ্গে বলতে পারল না বুধন। সে দেখল, লাল কালো সোয়েটার পরা গোলগাল মিষ্টি

ছেলেটি মনমরা হয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। সে হঠাৎ বুধনকে লক্ষ করে অভিমানী গলায় বলে ওঠে, তুমি বাজে পাখিওলা। রাজা পাখি বিক্রি করে দেয়!

অন্য সবাই যেন মনের কথাটি খুঁজে পেয়ে সুর মেলায়, বাজে পাখিওলা! তোমার সব পাখি বাজে!

তারপর স্কুলের ঘণ্টা না-পড়তেই ওরা সবাই ছুটে চলে যায় বুধনকে ফেলে। রংবেরঙের অন্য পাখিগুলো ওদের যেন ধরে রাখতে পারে না।

ধীরে-ধীরে উঠে পড়ে বুধন। খাঁচাসমেত বাঁক কাঁধে তুলে নেয়। শরীরে এক অদ্ভুত ক্লান্তি। পাখিগুলোও সব চুপচাপ। দু-একবার শিস দিয়ে সে ওদের খুশি করার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও লাভ হল না। কেউ যেন বাণ মেরে ওদের বোবা করে দিয়েছে।

ক্লান্ত পায়ে বুধন ফিরে চলে ঘরের পথে। তার মনে তখনও অভিমানী ছেলেটির মুখ ভাসছে আর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তার অভিযোগ, তুমি বাজে পাখিওলা! রাজা পাখি বিক্রি করে দেয়।

নানান দোটানায় বুধন পাখিওলার দুপুরটা কেটে গেল। পঞ্চাশ টাকার নোটটা এখনও তার কোমরে খচখচ করছে। মুন্নার অসুখ কি এখন বেড়েছে না কমেছে?

ডাগদারসাব পারবে তো এ-অসুখ সারিয়ে তুলতে? এত চিন্তা সত্ত্বেও টাকাটা সে মানি-অর্ডার করতে পারেনি। কোথায় যেন একটা বাধা পেয়েছে।

এইরকম ভাবনায়-ভাবনায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়। সন্ধে গড়িয়ে রাত। পাখিগুলোকে খেতে দিয়েছে বুধন, কিন্তু ওরা খায়নি। সেই সকালের খাবারই জমিয়ে রেখেছে। খাঁচার ওপরে কাপড় ঢাকা দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দিল বুধন। শুয়ে পড়ল। কিন্তু সহজে তার ঘুম এল না।

সারাটা রাত ছটফট করে জেগে কাটাল বুধন। তারপর ভোরের আলো ফাঁক-ফোকর দিয়ে নজরে পড়তেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। সোয়েটার পরে চাদর মুড়ি দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে এল রাস্তায়। তারপর হনহন করে হাঁটা দিল সাহেবপাড়ার দিকে। একবার শুধু কোমরের গেজেটা অনুভব করে দেখল।

সেই বাড়ির দোতলায় উঠে যখন সে কড়া নাড়ল তখন লাল থালার মতো সূর্য উঁকি দিয়েছে। দিগন্তে। ঘুমচোখে দরজা খুল তাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন কাঁচাপাকা চুলওলা সেই ফরসা ভদ্রলোক। এখন তার চোখে চশমা নেই। তার ঠিক পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন ফরসা মোটাসোটা এক মহিলা। সম্ভবত ভদ্রলোকের স্ত্রী। বাচ্চা মেয়েটি নিশ্চয়ই এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

কী ব্যাপার, কী চাই?

রুক্ষ প্রশ্নটা শুনেই বুধন বুঝল, ভদ্রলোক তাকে চিনতে পারেননি। সে তাড়াতাড়ি বলল, আমি সেই পাখিওলা, বাবু।

ভদ্রলোক এবার চিনতে পারলেন বুধনকে। বললেন, তা এই সাত-সক্কালে কী চাই তোমার?

কোমর হাতড়ে লুঙির ভাঁজ খুলে পঞ্চাশ টাকার নোটটা বের করল বুধন। ভদ্রলোকের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে কঁপা গলায় বলে উঠল, আমার রাজা পাখিকে ফিরিয়ে দিন আমার রাজা পাখিকে ফিরিয়ে দিন, বাবু।

টাকাটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন বুধনের দিকে। যেন এই আকুলভাবে চেয়ে থাকা দেহাতি পাখিওলাটাকে বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর পিছন ফিরে স্ত্রীকে বললেন, পাখিটা এনে দাও।

একটু পরেই খাঁচাসমেত রাজা পাখিকে হাতে পেল বুধন। তাকে দেখে রাজা পাখি শিস দিচ্ছে, টুই-টুই।

ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীকে অনর্থক বারবার সেলাম করল বুধন। তারা তখনও অবুঝ চোখে বুধনের দিকে তাকিয়ে।

খুশিতে ডগমগ পায়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে এল বুধন পাখিওলা। রাজা পাখি এখনও সুরেলা গান গেয়ে চলেছে। সকালের সোনালি রোদে কেটে যাচ্ছে ভোরের কুয়াশা। বুধন যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, তার সাধের মুন্না সোনালি ধানখেতে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। ওর অসুখ আর নেই। একেবারে সেরে গেছে।

# একটু-একটু দেখা যায়

**একটু-একটু দেখা যায়**

নীল শাড়ি পরা মেয়েটি রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই মলিন রেস্তোরাঁয় পরিবেশটাই যেন বদলে গেল। কোনও সুন্দরীর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল যদি না থাকে তা হলে ওর দিকে আমি একবারের বেশি তাকাব না এটা ঠিক নয়। তাই চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে আমি রূপসি মেয়েটির দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি হঠাৎই একচিলতে হাসল–তারপর আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমারই টেবিলের দিকে।

রেস্তোরাঁর নাম বিভূতি কেবিন–হাতিবাগান অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলের রেস্তোরাঁ। চা, টোস্ট, মাংসের সিঙাড়া, চপ-কাটলেট, মোগলাই ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় দুশো ছত্রিশবার হাতবদল হওয়া রোজকার খবরের কাগজ, নানান মাপ ও রঙের আরশোলা এবং হাফডজন টিকটিকি।

এখানে আমি প্রায়ই আসি, তবে এই সুন্দরীকে কখনও দেখিনি। এই মুহূর্তে ওকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

মেয়েটির বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল নেই কিন্তু সেটা ও লুকিয়ে রাখার কোনওরকম চেষ্টাই করছে না। ডানহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ আর বাঁ-হাতে হালকা নীল সিনথেটিক শাড়ির মনোরম ভাজগুলো ধরে রেখেছে।

আজ আমি এখানে আচমকা ঢুকে পড়েছি একটু দম নেওয়ার জন্যে। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ মাথায় নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে কাদা প্যাঁচপেচে রাস্তায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। তারই মধ্যে হঠাৎ খেয়াল করেছি, কালো জামা-প্যান্ট পরা একটা লোক আমাকে বিচ্ছিরিভাবে ফলো করছে।

লোকটাকে আমি দিনচারেক ধরে লক্ষ করছি। ভাবলেশহীন মুখ যেন পাথর কেটে তৈরি। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। আর পরনে আধুনিক ঢঙের কালো ফুলশার্ট আর কালো জিন্স।

আমি একা মানুষ, নিজেকে নিয়েই সময় কাটিয়ে দিই। আমার কোনও শত্রু আছে বলে মনে হয় না। অথচ আমাকে ওই লোকটা কদিন ধরে ফলো করছে।

শ্যামবাজারে ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে আমি কঁকি দিতে পেরেছিলাম। তারপর বৃষ্টির মধ্যেই ঢুকে পড়েছি হকার্স কর্নারের সরু একচিলতে গলির মধ্যে। সেখান থেকে এ-গলি ও-গলি করে অবশেষে এই বিভূতি কেবিন। এবং বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা স্পেশাল চায়ের কাপে তৃপ্তির চুমুক।

মেয়েটি সোজা এসে আমার মুখোমুখি বসে পড়ল। হাসল। অর্থপূর্ণ চোখে দেখল আমার দিকে।

মেয়েটিকে যা ভাবা উচিত, বুঝতে পারছিলাম মেয়েটি তা নয়। ওর ফরসা মুখে, নিপুণ সাজগোজে, কোথায় যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে।

আমাদের মাঝে শুধু একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের ফাঁক। সেই ফাঁক কিছুটা কমিয়ে দিতে মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। দুটো সুন্দর হাতের পাখনা মেলে ধরল সাদা পাথরের বুকে। তারপর আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, আপনি তো ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রজিৎ সেন…।

আমি চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলাম।

সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে একবার আলাপ হলে আমি কখনও ভুলি না। এই মেয়েটিকে আমি আগে কখনও দেখিনি–কিন্তু ও আমার নাম জানল কী করে!

আপনি–আপনি আমার কথা বারবার আটকে যেতে লাগল।

আবার হাসল রূপসি। বলল, আমার নাম অনামিকা…আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায়? আমি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। ডানহাতটা ধীরে-ধীরে টেবিল থেকে নামিয়ে পাশের চেয়ারে রাখা ব্রিফকেসের ওপর নিয়ে গেলাম। তারপর

কাকড়াবিছের মতো হামাগুড়ি দিয়ে আমার ডানহাত পৌঁছে গেল ব্রিফকেসের হাতলে।

যে-কোনও অবস্থার জন্যে আমি এখন তৈরি। দরকার হলে বিফ্রকেন্স আমাকে খুলতে হবে।

অনামিকা আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। বোধহয় বুঝতে পারল, আমি ভয় পেয়েছি। আমার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামও হয়তো ওর নজর এড়াল না।

ও হেসে বলল, ইন্দ্রজিৎ, শুধু-শুধু সিন ক্রিয়েট করে কোনও লাভ নেই। চলুন, সময় হয়ে গেছে–আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

আমি বাচ্চাদের মতো জেদ করে বললাম, না, আমি কোথাও যাব না। এখানেই চুপচাপ বসে থাকব।

অনামিকা হাসল–অবুঝ শিশুর জেদি কথায় সুন্দরী মা যেমন হাসে।

কিন্তু আমি পাগলের মতো ভাবছিলাম। অনামিকা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? কীসের সময় হয়ে গেছে?

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় আমি আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। চা জুড়িয়ে জল, কিন্তু তা-ই সই। যেভাবেই হোক আমাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা ওকে বুঝতে দেব না।

আমি ওকে বললাম, চা খাবেন? সঙ্গে টোস্ট?

অনামিকা হেসে মাথা নাড়ল। যার মানে, চা-টোস্ট কিছু চাই না–শুধু তোমাকে চাই।

এবার একটু রূঢ় স্বরে বললাম, মাপ করবেন, ম্যাডাম–আপনাকে আমি চিনি না। একজন অচেনা মহিলার সঙ্গে কোথাও যেতে আমি রাজি নই।

আবার হাসল অনামিকা। ওর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে গোল বলের মতো কী একটা বের করে আমার মুখের সামনে ধরল।

বলটা চকচকে ধাতুর তৈরি। তার ওপরে কয়েকটা রঙের রহস্যময় ছায়া।

এবার কি কিছু মনে পড়ছে? প্রশ্ন করল অনামিকা।

আমি পাগলের মতো মাথা আঁকালাম। বললাম, না, না কিছু মনে পড়ছে না।

অনামিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলটা আবার ঢুকিয়ে রাখল ওর ব্যাগের ভেতরে। তারপর চোয়ালের রেখা শক্ত করে বলল, থ্রি এক্স ওয়ান বি ওয়ান। কিছুক্ষণ আমাকে ভাবার সময় দিয়ে তারপরঃ এবার কিছু মনে পড়ছে?

আমি আবার মাথা নাড়লাম পাগলা ঘোড়ার মতো।

একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠল অনামিকার মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, ইন্দ্রজিৎ, সত্যি, তোমার মাথার ভেতরে বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে।

ওর আপনি থেকে তুমি-তে যাওয়া ওর শরীরের বাঁকগুলোর মতোই কী স্বাভাবিক!

আমি পালটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে চমকে দিল।

বিভূতি কেবিন-এর জীর্ণ মলিন রান্নাঘরে একটিমাত্র দরজা ও একটি বড় মাপের গরাদহীন জানলা। কিচেন থেকে চপ-কাটলেট ইত্যাদি জানলা দিয়েই বেয়ারাদের হাতে আসে। সেই জানলা এবং দরজার মাথায় বড় বড় দুটো কাচের সাইনবোর্ড। তাতে প্রকাণ্ড মাপের লাল হরফে লেখা বিভূতি কেবিন এবং মোগলাই পরোটা। আমি যখনই এখানে আসি তখন এই লেখাগুলোর দিকে মুখ করে বসি। আজও তাই।

হঠাৎই দেখি বিভূতি কেবিন লেখাটার কিছু কিছু জায়গা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুধু পড়া যাচ্ছে ভূত কেবিন। আর দ্বিতীয় সাইনবোর্ডের মোগলাই পরোটা হয়ে গেছে গলা রাটা।

আমার অবাক ভাবটা অনামিকার নজরে পড়েছিল। ও পেছন ফিরে তাকাল একবার। তারপর জিগ্যেস করল, কী হল! কী দেখে অমন চমকে উঠলে?

আমি ওকে ব্যাপারটা বললাম।

তাতে ও ঝরনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া একরাশ রঙিন কাচের চুড়ির মতো রিনরিন করে হেসে উঠল। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

রেস্তোরাঁয় অন্যান্য আড্ডাবাজ পরচর্চা-ভক্ত লোকগুলো ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখতে লাগল।

আমি চাপা গলায় বললাম, কী হচ্ছে! সবাই দেখছে!

অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে অনামিকা বলল, এবার তো মানবে যে, সময় হয়ে গেছে। কোনও লেখারই সঠিক মানে তোমার চোখে আর ধরা পড়বে না। আচ্ছা, আমার এই কড়ে আঙুলটা ধরো তো! বলে ও টেবিলের ওপরে রাখা বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিল আমার কাছে।

অন্য সময় হলে ওর হাতের ছোঁয়া পাওয়ার আশায় আমার মন আবেগে উথালপাতাল হয়ে যেত, রক্তকণিকা-রক্তকণিকায় বেধে যেত মরণপণ লড়াই।

কিন্তু এখন ওর কড়ে আঙুলহীন বাঁ-হাতটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে উঠল। একটা পরদেশি ভয় ঠান্ডা শিরদাঁড়া বেয়ে কুলকুল করে নামতে লাগল।

আমি অনামিকার কথা অমান্য করতে পারলাম না।

চায়ের কাপটা আলতো করে সরিয়ে দিলাম একপাশে। তারপর আমার বাঁ-হাত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগল ওর বাঁ-হাতের দিকে কড়ে আঙুলের শূন্যস্থান লক্ষ্য করে।

শূন্যস্থানে পৌঁছেই আমি অবাক!

আমার ছোঁয়ায় ওর কড়ে আঙুল আমি দিব্যি টের পেলাম। অথচ সেই কড়ে আঙুলটা আমি একফেঁটাও দেখতে পাচ্ছি না!

আমি হতবাক হয়ে অনামিকার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, ইন্দ্রজিৎ সেন, এবার বুঝতে পারছ, তোমার গল্প শেষ!

আমি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সে কথাই জানালাম ওকে। তারপর বললাম, এসব কাণ্ডকারখানা আমার কাছে ভূতুড়ে ঠেকছে। বরং চলো, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে একটু নিরালায় বসে গল্প করি। তোমাকে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

অনামিকা ওর বাঁ-হাতটা টেনে সরিয়ে নিল। তারপর শক্ত গলায় বলল, তুমি দেখছি ভালো কথার মানুষ নও! তা হলে খারাপভাবেই কিছু করা যাক।

কথাটা বলেই ও ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আবার সেই ধাতব বলটা বের করল। ওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী একটা করতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে দেখি রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো ফুলশার্ট কালো জিন্স পরা ছিপছিপে লম্বা চেহারার লোকটা। মুখে অভিব্যক্তির কোনও লেশমাত্র নেই।

একটা নাম-না-জানা আতঙ্ক আমাকে পাগল করে দিল।

আমার ডানহাতটা ব্রিফকেসের ওপরেই ঘোরাফেরা করছিল। এক ঝটকায় ব্রিফকেসটা খুলে ফেললাম। চোখের পলকে জেনারেটার গান বের করে অনামিকাকে লক্ষ্য করে ফায়ার করলাম।

ও হাতের বলটা নিয়ে কী একটা করল। দেখলাম, জেনারেটার গানের তীব্রশক্তির কণার স্রোত ওকে মোটেই কাবু করতে পারল না। ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে শ্বেতপাথরের টেবিলটাকে উলটে দিল আমার ঘাড়ের ওপর। আর একইসঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল।

রেস্তোরাঁয় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। চেয়ার উলটে টেবিল কাত করে যে যেদিকে পারে ছুটছে। সেইসঙ্গে কানে আসছে আতঙ্কের চিৎকার।

কালো পোশাক পরা লোকটা এসবে ভ্রূক্ষেপও করল না। হরিণের মতো সাবলীল তিনটে লাফ দিয়ে ও চলে এল আমার কাছে।

আমি তখন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। একইসঙ্গে জেনারেটার গানটাকে নিয়ে আসতে চাইছি শত্রুর মুখোমুখি।

কালো পোশাক পরা লোকটা ঝুঁকে পড়ে ডানহাতে আমার টুটি টিপে ধরল। আর বাঁ-হাতে জেনারেটার গানসমেত আমার ডানহাত চেপে ধরল।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই লোকটার শক্তির সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ নেই। লোকটার হাতগুলো কি ইস্পাতের তৈরি?

এক হ্যাঁচকায় সে আমাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিল। তার পর এক ভয়ংকর মোচড় দিল আমার ডানহাতে। আমার কবজির জোড় যেন খুলে গেল। ব্যথার বিদ্যুৎ হাত বেয়ে ছিটকে গেল মাথায়। জেনারেটার গানটা খসে পড়ল হাত থেকে। মেঝেতে পড়ে রইল অনাথের মতো।

রেস্তোরাঁর লোকজন সব ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু মালিক চোখ ছানাবড়া করে জরাজীর্ণ ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছে। আর তিনজন বেয়ারা আতঙ্কে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে রাঁধুনিদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

অনামিকা ওদের সবাইকে উদ্দেশ করে গলা তুলে বলল, আপনাদের কোনও ভয় নেই। আমরা শুধু একে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা সিক্রেট পুলিশের লোক।

কথাটা বলে সুন্দর করে হাসল ও।

তারপর এগিয়ে এল আমার কাছে।

আমি তখন কালো পোশাক পরা লোকটার হাতে বন্দি হয়ে যোবা চোখে ওদের দেখছি।

অনামিকা এবার হেসে জিগ্যেস করল, ইন্দ্রজিৎ, তুমি কি এখন সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ?

আমি চারপাশে তাকালাম।

ভূত কেবিনটা এখন ভূত কেন হয়ে গেছে। আর গলা রাটা হয়ে গেছে গলা টা। এ ছাড়া সবকিছুই আমি অসম্পূর্ণভাবে একটু-একটু দেখতে পাচ্ছি।

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। এ আবার কোনদেশি চোখের অসুখ!

আমি যে কিছু বলতে চাই সেটা বুঝতে পেরে অনামিকা লোকটাকে ইশারা করল। লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি গলায় হাত বুলিয়ে কয়েকবার কাশলাম। তারপর কোনওরকমে বললাম, আমার চোখে কোনও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আমি সবকিছুই কেমন খাপছাড়া দেখছি। তোমার ডানহাতের খানিকটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওই চেয়ারটার মাত্র দুটো পায়া দেখতে পাচ্ছি। আর তার দিয়ে ঝোলানো ওই ল্যাম্পটার তারের মাঝখানটুকুই নেই।

আমার কেমন অসহায় লাগছিল। চারপাশটা কেন এমন খাপছাড়াভাবে মুছে যাচ্ছে?

অনামিকা আমার থুতনি ধরে আদর করে নেড়ে দিল, বলল, ইন্দ্রজিৎ, সেই তখন থেকেই তো তোমাকে বলছি যে, সময় হয়ে গেছে। তোমার মাথার ভেতরে গোলমাল হতে শুরু করেছে।

আমার বয়েস আটাশ, স্বাস্থ্য ভালো, শরীরে কোনও অসুখ নেই। তা হলে হঠাৎই আমার এসব কী শুরু হল!

অনামিকা এবার গলা নামিয়ে সমবেদনার সুরে বলল, আসলে পৃথিবীতে তোমার থাকার পালা শেষ। তাই তোমার ভেতরকার সফটওয়্যার ধীরে-ধীরে মুছে যাচ্ছে। কোনও প্রোগ্রামই আর ঠিকঠাক কাজ করছে না…তাই তুমি একটু-একটু দেখতে পাচ্ছ…।

আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। ওর কোনও কথাই আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছিলাম না। নাকি বুঝতে চাইছিলাম না?

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসল অনামিকা, বলল, তুমি আসলে একটা রোবট, ইন্দ্রজিৎ। রোবট নাম্বার থ্রি এক্স ওয়ান বি ওয়ান। হুবহু মানুষের মতো দেখতে রোবট যাকে অ্যানড্রয়েড বলে। অ্যানড্রয়েডদের শরীরে ছুরি বসালে রক্ত পড়ে—মানুষের মতো। ওদের সবকিছুই মানুষের মতো—শুধু ভেতরে ব্যাটারি থাকে, মাইক্রোচিপ থাকে, মোটর থাকে। তোমাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনযাপন সম্পর্কে ডেটা কালেক্ট করতে। দু-বছর ধরে তুমি সেসব জোগাড় করেছ। তোমার শরীরের ভেতরে সেগুলো

অটোমেটিকভাবে স্টোন্ড হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনামিকা? কিন্তু গোলমাল হল, তুমি এখানকার লোয়ার মিডল ক্লাস লাইফটাকে ভালোবেসে ফেললে। ভুলে যেতে চাইলে যে, তুমি অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা রোবট। তাই তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের আসতে হয়েছে।

অনামিকার মুখটা আমার চোখের সামনে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিল। কালো পোশাক পরা লোকটার বাঁ-হাত আর মাথার অর্ধেকটা নেই। চারপাশের মানুষজন, চেয়ার-টেবিল, সাইনবোর্ডের লেখা, সবই ধীরে-ধীরে অসম্পূর্ণ থেকে আরও অসম্পূর্ণ হচ্ছে। আমার চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে আমার নিম্নমধ্যবিত্ত নিঃসঙ্গ জীবন–যে-জীবনকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, এই নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, এই নিম্নমধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁ ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

অনামিকা ওর সঙ্গীকে বলল, ওকে ওই আয়নাটার কাছে নিয়ে চলো।

লোকটা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল বেসিনের কাছে। সেখানে বড় মাপের একটা আয়না লাগানো আছে বয়েসের ভারে মলিন অথচ অভিজাত আয়না।

আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলাম। আমার শরীরের অনেকটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছায়া দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অসহায়ভাবে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

আমি তা হলে শুধুই হার্ডওয়্যার আর সফ্টওয়্যার! নিছকই একটা রোবট!

কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই! যাকে আমি ভালোবাসি তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই!

আমার কান্নার মাঝেই অনামিকার গলা পেলাম। কালো পোশাক পরা লোকটাকে ও বলল, ইন্দ্রজিতের ব্যাটারিটা শর্ট সার্কিট করে দাও। নইলে ফেরার সময় ঝামেলা হবে।

আয়নায় আমার ছায়া তখন অসম্পূর্ণ থেকে আরও অসম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

# আগে বোঝা যায় না

**আগে বোঝা যায় না**

কথাটা শুনে সুনন্দর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ সরু করে তিনি তাকালেন বিপিন চ্যাটার্জির দিকে। অবাক হয়ে তার কথাটাই আবার উচ্চারণ করলেন, আগে বোঝা যায় না! তার মানে?

বিপিন চ্যাটার্জি সিগারেটে টান দিয়ে সবজান্তা হাসি হেসে বললেন, মানে অতি সহজ। তুমি যে ভূত দেখেছ সেটা তুমি আগে কিছুতেই বুঝতে পারবে না। একটু দম নিয়ে আরও যোগ করলেন, বুঝতে পারবে–তবে অনেক পরে। এটাই সরকারদের ভূতুড়ে বাড়ির স্পেশালিটি।

সুনন্দর স্ত্রী কল্যাণী মিষ্টি করে হেসে ঠাট্টার সুরে বললেন, তবে তো দারুণ ভালো। ভূতের ভয় পাওয়ার কোনও চান্সই নেই! কারণ, ভূত দেখার সময় ভূত বলে বুঝতে পারব না। যেমন, আপনি এখন গল্প করছেন, চা-বিস্কুট খাচ্ছেন–ব্যাপারটা এইরকমই মনে হবে। তারপর…আপনি যেমন বললেন…অনেক পরে–মানে, দু-চারদিন পরেও হতে পারে বুঝতে পারব যে, সেদিন আসলে ভূতের সঙ্গে কথা বলেছি, গল্প করেছি। তখন ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। সুতরাং আপনার ওই ভূত কাউকে ভয় দেখাতে পারবে না। এরকম দয়ালু বিবেচনা-বুদ্ধিওয়ালা ভূত সত্যিই খুব রেয়ার।

কল্যাণী বেশ কষ্ট করে হাসি থামিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, তোমার কী ওপিনিয়ান?

সুনন্দ হাতে হাত ঘষলেন। টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তারপর বন্ধুর দিকে তাকালেন। হাসি চেপে রাখতে

ওঁরও বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

বিপিন চ্যাটার্জি একটু আহত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে টেক্ল-ক্লথের নকশাটাকে জরিপ করছিলেন। সুনন্দ ছোট্ট করে কাশির শব্দ করায় ওঁর দিকে চোখ ফেরালেন। দেখলেন, সুনন্দও রীতিমতো হাসি চাপতে চেষ্টা করছেন।

বিপিন পাছে রাগ করেন, তাই সুনন্দ হাসির ঝোঁকটা সামলে নেওয়ার সময় দিলেন। তারপর বেশ সিরিয়াস মুখ করে বললেন, দ্যাখো, বিপিন…কল্যাণী মজা পেয়ে হাসছে বলে তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না। তুমি তো জানোই, কল্যাণী বা আমি কোনওদিনই ভূতে বিশ্বাস করিনি। আমাদের যত লেনদেন শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। তবে ভূত আছে এই কারণে তোমার ওই ইয়েদের বাড়িটার যদি দাম কম হয়, তা হলে আমাদের তো লাভ বই লোকসান নেই! সুতরাং তুমি এগোতে পারো…।

বিপিন তক্ষুনি কোনও জবাব দিলেন না। সিগারেটে বারকয়েক টান দিয়ে তারপর চাপা গম্ভীর গলায় বললেন, তোমরা যে ভুতে বিশ্বাস করো না সেটা জানি। আর জানি বলেই সরকারদের শোভাবাজারের বাড়িটা ভূতুড়ে জেনেও কথাবার্তা এগিয়েছি। ও-বাড়িতে বছর দশেক ধরে কেউ থাকে না। সরকার ফ্যামিলির সবাই আমেরিকায় সেন্ড। শুধু একজন, বামদেব সরকার, হরি ঘোষ স্ট্রিটে থাকেন। ওঁর বয়েস হয়েছে, বিয়ে-থা করেননি। বদনামী বাড়িটা কেউ কিনতে চাইলে তিনি রীতিমতো বর্তে যান। সেইজন্যেই মাত্র সাড়ে তিনলাখ টাকা চেয়েছেন। বাড়ির পেপারস তিনি সব ক্লিয়ার করে রেখেছেন। বাড়ি বিক্রি করার রেজিস্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও ওঁর কাছে আছে….।

বাড়িটা কেনার পর রিপেয়ার খরচ কীরকম পড়বে?

তা ধরো প্রায় লাখখানেক। তবে ফার্নিচারপত্র যা আছে সবই তুমি ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছ। বামদেববাবু ওসব কিছু নেবেন না বলেছেন।

কেন, ওগুলো কি অভিশপ্ত? কল্যাণী জানতে চাইলেন। ওঁর কথায় একটু ব্যঙ্গের খোঁচা ছিল।

বিপিন চ্যাটার্জি উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন। ছোট-ছোট টান দিয়ে সিগারেটটা শেষ করলেন। তারপর মুখ তুলে ঘরের খোলা জানলার দিকে

তাকিয়ে রইলেন।

জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা আলোয় ওঁর খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি চকচক করছিল। চশমার কাঁচেও খানিকটা আলো ছিটকে পড়েছিল।

সবাই চুপচাপ থাকায় কেমন একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল ঘরের মধ্যে।

কী বললেন? অভিশপ্ত? ঠোঁটের কোণে আচমকাই হাসলেন বিপিন হয়তো হবে–আমি ঠিক জানি না। তবে একজনের কাছে যেটা অভিশাপ আর একজনের কাছে সেটা আশীর্বাদও হতে পারে। আমি দুর্বল, ভীতু মানুষজমি-বাড়ির দালালি করে পেট চালাই। বামদেব সরকারের বাড়িটা বিক্রি করিয়ে আমি সাতহাজার টাকা পাব ঠিকই, কিন্তু জোর করে কাউকে ওটা গছিয়ে দিতে চাই না..আপনাদের তো নয়ই! সুনন্দ আমার ছোটবেলার বন্ধু–একপাড়ায় থাকি। সেইজন্যেই আগে সবকিছু খোলসা করে জানিয়ে দিচ্ছি। সরকারদের বাড়িটার বেশ বদনাম আছে। তবে পিকিউলারিটি হচ্ছে, ভূতের ব্যাপারটা আগে বোঝা যায় না।

সুনন্দ মিত্র বামপন্থী মানুষ। যুক্তি দিয়ে সব খতিয়ে দেখেন। আধুনিক খোলা মন নিয়ে প্রগতির কথা ভাবেন। অফিসে ইউনিয়নের একজন হর্তাকর্তা। ওঁর স্ত্রী কল্যাণী হাই স্কুলের শিক্ষিকা। সাহিত্য, সিনেমা, সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামান। বিয়ের আগে নাটকের দল চালাতেন। পরে সময় কমে আসায় সরে এসেছেন।

বিপিন জানতেন, এই বাড়িটা নিতে ওঁরা আপত্তি করবেন না। অন্য দু-একটা বাড়ির খোঁজও বিপিন দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো সুনন্দর বাজেট ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর-একটু সময় পেলে বিপিন হয়তো একটু বেশি খোঁজখবর করতে পারতেন…সুনন্দর বাজেটের মধ্যেই কিছু হয়তো জুটে যেত, কিন্তু সুনন্দ আর কল্যাণী এমন তাড়াহুড়ো করছেন যে, সে-সময় আর মেলেনি। সুনন্দ বলেছেন, এ-মাসের মধ্যেই আমার বাড়ি চাই…যেভাবে হোক…।

ওঁদের তাড়াহুড়োর কারণ বিপিন জানেন না। দু-একবার বন্ধুকে জিগ্যেস করেছেন, কিন্তু সুনন্দ এড়িয়ে গেছেন। কল্যাণীও কিছু ভাঙেননি। শুধু বলেছেন, ফ্ল্যাটবাড়িতে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না।

এখন ওঁরা সি. আই. টি. রোডের যে-ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন সেটা এমনিতে খারাপ নয়। কিন্তু হঠাৎ করে কী যে হল, ফ্ল্যাটে ওঁদের আর মন বসছে না।

আরও কিছুক্ষণ ভূত, ভুতুড়ে বাড়ি, এইসব নিয়ে আলোচনার পর বেশ হালকা মেজাজেই বিপিন চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বামদেববাবুর সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে রেজিস্ট্রির দিন ঠিক করছি। আর তুমি যখন পাকা কথা দিলে তখন আমার চেনা এক কন্ট্রাকটরকে রিপেয়ারের ব্যাপারটা আগাম জানিয়ে রাখছি...যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে...।

আপত্তি! কেউ উপকার করতে চাইলে মানুষ কখনও আপত্তি করে! সুনন্দ বিপিনের হাত চেপে ধরলেন কৃতজ্ঞতায়। মনে-মনে ভাবলেন, বিপিন জানে না বিপিন আমাদের কী বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চলেছে।

বিপিন চলে যাওয়ামাত্রই ঘরের আবহাওয়াটা কেমন যেন বদলে গেল। হাসি-খুশির ছবিটাও মুছে গেল। সুনন্দ আর কল্যাণী বুক-চাপা অস্বস্তি নিয়ে বসে রইলেন। চুপচাপ–যেন ট্রেনের কামরায় অচেনা দুই সহযাত্রী।

সুনন্দ চোখের চশমাটা অকারণেই ঠিক করলেন। তারপর টেবিলের একপাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়ার ভান করলেন। সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, কী, এবার তুমি খুশি তো?

কল্যাণী স্বামীর দিকে তাকালেন : কেন, তুমি খুশি না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুনন্দ, বললেন, হুঁ খুশি। আশা করি এই এলাকা ছেড়ে চলে গেলে সমস্যাটা মিটে যাবে, কিন্তু তুমি ওকে রাজি করাতে পারবে তো?

করাতেই হবে। ওকে বোঝাতে হবে। মনে হয় ও বুঝতে পারবে।

বাইরে সন্ধে গাঢ় হয়েছিল অনেকক্ষণ। কল্যাণী উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন। সুনন্দ টিভি অন করে রিমোট হাতে চ্যানেল সার্ফিং করতে লাগলেন।

এমন সময় ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

সুনন্দ চেয়ার ছেড়ে ওঠার আগেই কল্যাণী ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন।

ঘরে ঢুকল অনুপম।

রোগাটে ফরসা চেহারা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। ঘন ভুরুর নীচে সামান্য টানা চোখ। চোয়ালের উঁচু হয়ে থাকা হাড় কুড়ি বছরের নবীন মুখে রুক্ষতার তুলি চালিয়েছে।

কী ব্যাপার! এত তাড়াতাড়ি চলে এলি? কল্যাণী জিগ্যেস করলেন।

কল্যাণীকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় অনুপম জবাব দিল, কোচিং হল না। স্যারের শরীর খারাপ।

নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুনন্দর দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল অনুপম। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুনন্দ কল্যাণীর অসহায় মুখের দিকে তাকাল। তারপর আবার টিভির দিকে।

কল্যাণী পায়ে-পায়ে সুনন্দর কাছে এগিয়ে এলেন।

সুনন্দ টিভির দিকে চোখ রেখেই চাপা গলায় বললেন, এখন কিছু বোলো না। আমি যখন বাড়ি থাকব না তখন মুড বুঝে নতুন বাড়ির ব্যাপারটা বোলো।

কল্যাণী যেন অচেতনভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। টিভির রঙিন ছবির দিকে তাকিয়ে অনুপমের কথা ভাবতে লাগলেন।

যখন সন্তান আসবে না এই সত্যিটা একরকম মেনে নিয়েছিলেন তখন চিকিৎসাশাস্ত্রের কী এক কারিকুরিতে অনুপম এসে পড়েছিল। তারপরই জীবনটা কী সুন্দর হয়ে গেল। হাসি, খুশি, আর ফুর্তি ছাড়া কিছু ছিল না সংসারে। কোনওরকম দুঃখ-কষ্ট গায়ে আঁচড় কাটতে পারত না।

এইভাবে আঠেরোটা বছর কীভাবে গড়িয়ে গেল কে জানে! আঠেরোটা বছরের হিসেব সেইদিন মনে পড়ল যেদিন কল্যাণী ছেলের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলেন।

এলাকাটা যে খুব ভালো নয় এটা ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আঁচ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে ওঁদের জীবনে আঁচ লাগাবে তা বুঝতে পারেননি।

এরপর যতই দিন যেতে লাগল ব্যাপারটা তত খারাপের দিকে গড়াতে শুরু করল।

সুনন্দকে কল্যাণী যখন জানালেন তিনি বললেন, বয়েসের ঝোঁক–পরে ঠিক সামলে নেবে।

মুখে এ কথা বললেও ভেতরে-ভেতরে সুনন্দ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।

একদিন সন্ধেবেলা অনুপমের বই-খাতা হাতড়ে কল্যাণী কতকগুলো বাজে ছবি পেয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দর কথাটা মনে পড়েছিল : বয়েসের ঝোঁক। কিন্তু যেদিন ছেলের টেবিলের ড্রয়ার থেকে কল্যাণী সাড়ে দশহাজার টাকা পেলেন সেদিন তিনি কেঁপে গিয়েছিলেন।

পাঁচশো টাকার নোটগুলো ওঁর হাতে কিলবিল করছিল।

কোথা থেকে এত টাকা পেল অনুপম!

সুনন্দ সত্যনিষ্ঠ মানুষ। কল্যাণীও তাই। অনুপমকে সেই মূল্যবোধের ওপরে দাঁড় করিয়ে অত্যন্ত যত্নে ওঁরা মানুষ করতে চেয়েছেন। এত কষ্টের ফল এই!

কল্যাণীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটু সময় নিয়ে নিজেকে শক্ত করলেন তিনি। তারপর অনেক রাতে ছেলের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন।

আলো জ্বেলে ঘুম-চোখে দরজা খুলল অনুপম। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে পাজামা।

কী ব্যাপার? ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল।

তোর সঙ্গে কথা আছে। কল্যাণী ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে বসলেন ছেলের বিছানায়। অপলকে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কী কেস বলো তো?

তোর কথাবার্তাগুলো বদলে যাচ্ছে।

এই কথা বলার জন্যে এত রাতে ঘুম ভাঙালে? অনুপম হাই তুলল। মুখের সামনে বারকয়েক টুসকি দিল।

সাড়ে দশহাজার টাকা তুই কোথায় পেলি?

অনুপম বেশ অবাক এবং বিরক্ত হয়ে তাকাল মায়ের দিকে ও আজকাল লুকিয়ে আমার ঘর সার্চ করছ নাকি?

টাকাটা কোথায় পেয়েছিস? আমার কাছে লুকোবি না।

ও বিজনেসের টাকা।

বিজনেস! তুই বিজনেস করছিস নাকি?

হ্যাঁ।

কীসের বিজনেস?

জমি-বাড়ি কেনাবেচার বিজনেস।

কল্যাণী পাথর হয়ে গেলেন। আর সাত-আটমাস পরে যার বি. এসসি. অনার্সের পার্ট ওয়ান পরীক্ষা সে বিজনেস করছে! জমি-বাড়ির দালালির বিজনেস!

তুই কি পাগল হয়ে গেছিস! সামনে তোর পার্ট ওয়ান পরীক্ষা…তুই…তুই…।

এবার ধৈর্য হারাল অনুপম। বেশ রুক্ষভাবে বলল, বি. এসসি. পাশ করার পর কী করব বলতে পারো? চাকরি-বাকরির ব্যাপক ক্রাইসিস। এখন থেকে টুকটাক বিজনেসের লাইন ধরতে পারলে পরে আর চিন্তা থাকবে না। পালোদা বলেছে বিজনেস পার্টনার করে নেবে।

পাবলো!

শিউরে উঠলেন কল্যাণী। এই এলাকার কুখ্যাত মাস্তান এবং প্রমোটার পাবলো শিকদার। পুলিশের খাতায় ওর নাম উঠতে-উঠতে খাতার পাতা ফুরিয়ে গেছে।

লোকটাকে সুনন্দ বা কল্যাণী কখনও চোখে দেখেননি, তবে তার অনেক গল্প শুনেছেন।

ছেলের দিকে তাকিয়ে কল্যাণী চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এঁদের একমাত্র সন্তান কখন যে বড় হয়ে গেল, কখন যে এরকম হয়ে গেল, ওঁরা টের পাননি। এই তো সেদিন ও টলোমলো পায়ে মাম, মাম বলতে-বলতে কল্যাণীর কোলে ঝাঁপিয়ে আসত। টেলিফোনে কথা বলার জন্য বায়না করত। হ্যালো বলতে পারত। আর থ্যাংক য়ু-কে বলত খ্যাংকু। হইহই করে গোটা বাড়ি মাতিয়ে রাখত। সুনন্দ বাজার থেকে মাগুর মাছ নিয়ে এলে জুজুমাছ বলে থাবা মারতে চাইত।

সকলের আদরের বুবুসোনা কী তাড়াতাড়ি অনুপম হয়ে গেল। নার্সারি, প্রাইমারি, মাধ্যমিক, এইচ, এস, তারপর কলেজ। ছুটে যাওয়া ট্রেনের জানলা দিয়ে যেন সিনেমা দেখছিলেন কল্যাণী। ফ্ল্যাশব্যাক। বুবু থেকে অনুপম পর্যন্ত।

তারপর পাবলো শিকদার!

কল্যাণীর ভেতরটা ভাঙচুর হয়ে গেল। চোখে মেঘ-বৃষ্টি। মুখে হাত চাপা দিয়ে ছেলের কাছ থেকে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। ভেতরে-ভেতরে একটা তরাস কাজ করছিল। যে করে তোক অনুপমকে বাঁচাতে হবে। যে করে হোক!

সে-রাতেই সুনন্দর সঙ্গে কথা বললেন। এতক্ষণ গলা টিপে রাখা কান্নাটা উথলে বেরিয়ে এল বাইরে। স্বামীকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় কী যে বললেন বোঝা গেল না। মুখের বাক্য না বুঝলেও অন্তরের কথা শুনতে পেয়েছিলেন সুনন্দ। অনুভব করেছিলেন, একজন মা কথা বলছে।

আর তারপর থেকেই সুনন্দ আর কল্যাণী নতুন বাড়ির খোঁজে পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন। তবে বাড়ি খোঁজার আসল কারণটা কাউকে বলেননি। কখনও বলা যায়!

টিভিতে একটা জোরালো মিউজিক বাজিয়ে বিজ্ঞাপন শুরু হতেই কল্যাণী স্মৃতিপথ থেকে ফিরে এলেন। তখনই দেখলেন, অনুপম জিনসের পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা পরে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে-গোটাতে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগোল অনুপম। চটি পায়ে গলাতে গলাতে দেওয়ালকে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি।

কল্যাণী বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

কিন্তু ততক্ষণে শব্দ করে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

.

বাড়ি বদলের তোড়জোড় চলতে লাগল। বিপিন চ্যাটার্জি সাধ্যমতো দৌড়ঝাঁপ করতে লাগলেন। আর কল্যাণী অনুপমকে ব্যাপারটা জানানোর জন্য একটা সুবর্ণ মুহূর্তের খোঁজে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন রাতে মরিয়া হয়ে অনুপমের মুখোমুখি হলেন কল্যাণী।

বুবু, আমরা এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

অনুপম টেবিলে বসে কীসব হিসেবপত্র করছিল। টেব্ল-ল্যাম্পের আলো ছিটকে পড়েছে। ওর মুখে। কল্যাণী আলোর ছটার বাইরে আঁধারি উপচ্ছায়া অঞ্চলে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মায়ের কথায় অনুপম মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। আলো পড়ে ওর মাথার চুল চকচক করতে লাগল, তবে মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। তাই বিরক্তির ছাপটা কল্যাণী দেখতে পেলেন না।

এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি মানে!

এই ভাড়ার ফ্ল্যাটে আমাদের…খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমাদের বয়েসও বাড়ছে। তা ছাড়া নতুন যে-বাড়িটার খোঁজ পেয়েছি সেটা বেশ খোলামেলা। ওখানে গেলে আমার অ্যাজমার টানটা কমবে।

হাতে ধরা পেনটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিল অনুপম, চাপা গলায় বলল, হোপলেস!

কল্যাণী বেপরোয়া হয়ে ছেলের কাছাকাছি চলে গেলেন। বহু বছর যা করেননি তাই করলেন, সাহস করে ওর মাথায় আদরের হাত রাখলেন!

আমাদের ভালো তুই চাস না?

অনুপম চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর কল্যাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর মলিন গলায় বললেন, আমরা প্রতিমুহূর্তে তোর ভালো চাই।

অনুপমের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা বুবুটা অল্প-অল্প জেগে উঠল। মায়ের দিকে সামান্য চোখ তুলে আলতো করে জিগ্যেস করল, বাড়িটা কোথায়?

শোভাবাজারে। ভুতুড়ে বাড়ি বদনাম নিয়ে বাড়িটা বহুবছর পড়ে ছিল। বিপিনকাকা ওটার খবর দিয়েছে। ভূতের ভয় আছে বলে দারুণ সস্তায় পাওয়া গেছে।

ভূতের ব্যাপারটা শুনে অনুপম মজা পেল। বলল, ভূত! আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না কি? তাও আবার সস্তায়!

কল্যাণী ওর কাছ থেকে সরে এসে বিছানার ওপরে বসলেন। অনুপম বোধহয় একটু-একটু করে সহজ হচ্ছে। যেহেতু ভূতে ওর কোনওকালেই ভয়-ডর নেই, তাই একটা মজা মেশানো চ্যালেঞ্জ হয়তো তৈরি হচ্ছে।

আমি তোর বাবাকে বলেছি, ও-বাড়িতে ভূতের ছিটেফোঁটা যদি থাকেও বুবু তাকে উদ্বাস্তু করে ছাড়বে। তোমার কোনও চিন্তা নেই। তুই একদিন বাড়িটা দেখতে চল।

অনুপম হাসল ও বাড়িটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে...।

তা ছাড়া শোভাবাজার তো কাছেই। ইচ্ছে করলে তুই রোজই এ-পাড়ায় আসতে পারবি। পাতাল রেলে এসপ্ল্যানেডে নেমে বাসে এইটুকু পথকতক্ষণ আর লাগবে!

আরও কিছুক্ষণ একথা সে কথা বলার পর ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন কল্যাণী। ওঁর মনে হচ্ছিল, বরফ গলতে শুরু করেছে।

বাড়িটা রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পর প্যাঁচ রিপেয়ারের কাজে হাত দিয়েছিলেন বিপিন। সেটা শেষ হতে প্রায় মাসদেড়েক লাগল। তারপর একটা লাগসই ছুটির দিন খুঁজছিলেন সুনন্দ। অফিসের নানান ঝামেলা। ইউনিয়নের মিটিং, ফ্ল্যাটবাড়ির বাড়িওয়ালার কাছ থেকে অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত নেওয়া, এইসব মিলিয়ে সময় কাটতে লাগল।

তারই মধ্যে একদিন রাত দশটা নাগাদ অনুপম বাড়ি ফিরল উদভ্রান্তের মতো।

কল্যাণী রান্নাঘরে ছিলেন। অনুপম সেখানে উঁকি মেরে চাপা গলায় বলল, মা, একবার শুনবে।

ওর গলায় এমন একটা টেনশান ছিল যে, কল্যাণীর খুন্তি-ধরা হাত কেঁপে গেল। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

কী হয়েছে রে?

কেউ আমাকে ডাকতে এলে বলে দেবে বাড়ি নেই।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণী ওর ভেতরটা পড়ে ফেলতে চাইলেন। মনে হল যেন একটা অচেনা ভয় অনুপমের ভেতরে তিরতির করে কাঁপছে।

কী ব্যাপার? কোনও গোলমাল হয়েছে না কি?

কল্যাণীকে কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল অনুপম। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, নাঃ, কিচ্ছু হয়নি। তারপর চটপট চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

কল্যাণী নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা বিষধর সাপ মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে খুব ধীরে-ধীরে যেন ওঁর দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু সাপটা ঠিক কোথায় ছোবল মারবে সেটা কল্যাণী আঁচ করতে পারছিলেন না।

পরদিন থেকেই সুনন্দ আর কল্যাণীকে অবাক করে দিয়ে অনুপম নতুন বাড়িতে যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠল। বাড়িটা একদিন দেখেও এল ও। তারপর বলতে গেলে একরকম ওর তাড়াতেই এক রবিবার দুপুরে নতুন বাড়িতে চলে এল ওরা।

কৌতূহলের তাড়নায় সুযোগ বুঝে অনুপমকে বারকয়েক বিরক্ত করেছেন কল্যাণী। জানতে চেয়েছেন, অনুপম হঠাৎ ভয় পেয়েছে কেন। মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও শেষ পর্যন্ত অনুপম এইটুকু বলেছে, পালোদা খুব ডেঞ্জারাস টাইপের লোক। ওঁর সঙ্গে আর বিজনেস করব না।

এরপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহু প্রশ্ন করেও অনুপমের কাছ থেকে আর কোনও কথা কল্যাণী বের করতে পারেননি।

অনুপম শুধু একই কথা বারবার বলেছে, নতুন বাড়ির ঠিকানা এ-পাড়ার কাউকে দেবে না। ওখানে ফোন এলে ফোন নাম্বারও কাউকে দেবে না।

কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়লেও কল্যাণী ছেলের কথায় সায় দিয়ে বলেছেন, না–দেব না।

রবিবার সকালে ওঁরা যখন লরিতে মাল লোড করে সঙ্গে প্রাইভেট কার নিয়ে রওনা হবেন, ঠিক তখনই শ্রীকান্তকে দেখতে পেলেন কল্যাণী।

চোখে চশমা, কদমছাট চুল, পড়ুয়াগোছের দেখতে এই ছেলেটি স্কুলে বুবুর সঙ্গে পড়ত। এখন কলেজেও। মাঝে-মাঝেই বাড়িতে আসে। আজ ওঁরা চলে যাবেন শুনে দেখা করতে এসেছে।

প্রাইভেট কারের জানলা দিয়ে বুবুর সঙ্গে কথা বলার পর সুনন্দ আর কল্যাণীর সঙ্গে সৌজন্যের দু-চারকথা বলে চলে যাচ্ছিল শ্রীকান্ত। কল্যাণী ওকে লরির আড়ালে ডাকলেন। অনুপমের অনেক খবর রাখে শ্রীকান্ত। হয়তো ওর কাছে অনুপমের আতঙ্কের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীকান্ত, শোনো।

কী, কাকিমা? কল্যাণীর কাছে এগিয়ে এল শ্রীকান্ত।

পাবলো শিকদারের সঙ্গে বুবুর কি কিছু হয়েছে? চাপা গলায় জানতে চাইলেন কল্যাণী। ওঁর বুকের ভেতরে একটা পাথর এপাশ-ওপাশ গড়াচ্ছিল।

না তো! কেন?

তখন কল্যাণী অনুপমের ভয় পাওয়ার কথা বললেন। বললেন, বুবু বলেছে, পালেদা খুব ডেঞ্জারাস টাইপের লোক। ওঁর সঙ্গে বুবু আর বিজনেস করবে না।

দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে চারপাশে একবার দেখে নিল শ্রীকান্ত। তারপর নিচু গলায় বলল, আমি বুবুকে বহুবার বারণ করেছি, কাকিমা। আপনারা এখান

থেকে চলে যাচ্ছেন, খুব ভালো হয়েছে। আসলে লাস্ট উইকে সোমবার রাতে রেললাইনের ধারে শর্মাদের সিমেন্ট গোডাউনের একজন নাইটগার্ড মার্ডার হয়েছে। রিভলভারের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে গেছে…।

কল্যাণীর ভয়ে বুক কাঁপছিল। শ্রীকান্তর কথা আর শুনতে চাইছিলেন না তিনি। কিন্তু শ্রীকান্তকে বারণ করার শক্তি ছিল না এতটুকু।

….পাড়ার অনেকেই খবরটা জানে। তবে কাগজে কিছু আসেনি। একটু দম নিয়ে শ্রীকান্ত বলল, নাইটগার্ডটাকে পাবলো শিকদার মার্ডার করেছে। তাতেই বুবু মনে হয় ভয় পেয়ে গেছে।

বুকের ভেতরটা কেমন করছিল। শ্রীকান্তকে কোনওরকমে আসি বলে প্রায় টলতে টলতে প্রাইভেট কারের কাছে গেলেন কল্যাণী। ওঁকে দেখে সুনন্দ দুবার জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে? কিন্তু দুবারই কল্যাণী মাথা নেড়ে বোঝালেন কিছু হয়নি।

অনুপম মাকে দেখছিল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইছিল।

দুটো গাড়ি রওনা হতেই স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কল্যাণী। মনে-মনে ভাবলেন, উৎকণ্ঠা আর দুঃস্বপ্ন চিরতরে পিছনে পড়ে থাক।

নতুনের পথ চেয়ে ওঁরা তিনজন অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হাজার পোশাক বদল করেও আভিজাত্যকে লুকোনো যায় না। ঠিক তেমনই রং-চং বা রিপেয়ার করে বাড়িটার প্রাচীন সৌন্দর্য চাপা পড়েনি। এক অদ্ভুত গর্ব এবং দীপ্তি নিয়ে দোতলা বাড়িটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় পাঁচ কাঠা জায়গার ওপরে দুকাঠা জুড়ে বাড়ি। জানলাগুলোর ওপরে ঢালাই লোহার নকশা–তাতে রংবেরঙের কাচ লাগানো। দোতলার বারান্দার রেলিংও ব্রিটিশ আমলের ঢালাই লোহার জাফরি দিয়ে তৈরি। কার্নিশে সিমেন্টের কারুকাজ। যেকটা থাম চোখে পড়ে সবই যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা।

বিশাল লোহার গেট পেরোলেই দু-পাশে ছোট-বড় গাছের দল এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে। অনেকটা যেন না-আঁচড়ানো চুলের মতো। তারই ফাঁকফোকর থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

গেট থেকেই সাদা রঙের বাড়িটা দেখা যায়। গেট দিয়ে কেউ ঢুকলে দোতলার বারান্দা কিংবা তেতলার ছাদ থেকে তাকে স্পষ্ট চোখে পড়বে। বাড়ি আর গাছপালা মিলে জায়গাটা এমন যে, ভূতের যদি সত্যি-সত্যি কোনও অস্তিত্ব থাকত তা হলে এই আস্তানা তাদের বিলক্ষণ পছন্দ হত।

গোটাপাঁচেক বড়-বড় ঘর। মার্বেল পাথর বসানো মেঝে, বারান্দা, অলিন্দ। যদিও পাথরে লম্বা-চওড়া ফাটল ধরেছে।

ইশ, মেঝেগুলো কী ঠান্ডা! কল্যাণী খালি পায়ে মেঝেতে পা দিয়েই মন্তব্য করলেন।

স্রেফ ভূতের কল্যাণে বাড়িটা এমন সস্তায় পেয়ে গেলাম। সুনন্দ খুশির সুরে বললেন।

তাও আবার এমন ভূত যে, আগে বোঝা যায় না।

মায়ের কথা শুনে অনুপম অবাক হয়ে গেল, বলল, তার মানে?

কল্যাণী তখন বিপিন চ্যাটার্জির কথাগুলো ছেলেকে মজা করে শোনালেন। মনে হল, বহুদিন পর কল্যাণী আর সুনন্দ ছেলেকে কাছে ফিরে পেয়েছেন। কল্যাণীর বুকের পাথরটা কখন যেন অণু পরমাণু হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অনুপম বলল, মা, আমি দোতলার বারান্দাওলা ঘরটায় থাকলে তোমাদের প্রবলেম হবে?

প্রবলেম? কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন সুনন্দ? আমরা তো মনে-মনে ওই ঘরটাই তোর জন্যে ঠিক করেছি!

দু-চারদিনের মধ্যেই নতুন বাড়িতে ওঁরা গুছিয়ে বসলেন।

প্রথম-প্রথম টেলিফোন ছাড়া বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। টেলিফোন ট্রান্সফারের অ্যাপ্লিকেশান সুনন্দ অনেক আগেই করে দিয়েছিলেন। ফলে কুড়ি-বাইশ দিনের মাথায় টেলিফোন চলে আসামাত্রই ওঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নতুন বাড়িতে আর কোনও অসুবিধে রইল না।

সুনন্দর অফিস, কল্যাণীর স্কুল আর অনুপমের কলেজ নতুন বাড়ির সঙ্গে ছন্দে মানিয়ে গেল। এ ছাড়া পাড়াটাও বেশ নিরিবিলি আর নির্জন। পাবলো শিকদারের মতো উৎপাত এখানে নেই।

কল্যাণীর মনে হল, এখানকার বাতাসে অক্সিজেন বোধহয় বেশি। অ্যাজমার টানটা কমে গেছে। ভেতরটা সবসময় কেমন চঞ্চল উদ্দাম হয়ে উঠতে চায়। ছাদের খোলা হাওয়ায় বেড়ানো, বাগানে শুকনো পাতা মাড়িয়ে পায়চারি, পাখির ডাক…ওঃ ভাবা যায় না!

সুনন্দ কিন্তু প্রথম দিন থেকেই বাড়ির আনাচেকানাচে ভূত খুঁজে চলেছেন। তা নিয়ে বউ কিংবা ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা-মজাও কম করছেন না। রাত দশটার পর বাড়ির অন্ধকার ঘর, বারান্দা, কি অলিন্দে হঠাৎ করে পায়চারি শুরু করে দেন। চেঁচিয়ে কল্যাণীকে বলেন, শোনো, আমি এখন চিরুনি তল্লাশি করে ভূত খুঁজছি। আমাকে এখন ডিসটার্ব করবে না।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি, তার সঙ্গে আবৃত্তি : পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে, / পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে…ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর গেলা কোঁকা রে, / অন্ধবনের গন্ধগোকুল, ওরে আমার হোঁকারে! আয়, আয়–দেখা দে বাবা, দেখা দে…।

জীবনের ছন্দ যখন বেশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে এল তখন একদিন কল্যাণী ছেলেকে একা পেয়ে শ্রীকান্তর কথাটা বললেন।

পাবলো শিকদার মার্ডার করেছে শুনে তুই খুব আপসেট হয়ে গেছিস। আসলে ওইসব লোক তো এই টাইপেরই হয়। ওখান থেকে সরে এসে কত ভালো হয়েছে বল তো!

বুবু মায়ের দিকে একবার তাকাল। তারপর দাঁত দিয়ে বাঁ-হাতের নখ কাটতে লাগল।

বাইরে বেলা চড়ে এসেছে। গাছগুলো খসখসে আওয়াজ তুলে হাওয়ায় দুলছে। ঘুঘু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বারান্দার মার্বেলের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। রোদ পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

বুবু হঠাৎ এক অদ্ভুত চোখে মায়ের দিকে তাকাল। কয়েক লহমা চুপ করে থাকার পর বলল, শ্রীকান্ত পুরোটা জানে না। তোমাকে সত্যি কথাটা বলে দেব? ভয় পাবে না তো?

কল্যাণীর মুখ পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চেরা গলা দিয়ে ভালো করে আওয়াজ বেরোল না। বেশ কষ্ট করে বললেন, নাবল।

পাবলোদা যখন ওই নাইটগার্ডটাকে মার্ডার করে তখন আমি দেখে ফেলেছি। পালোদাও আমাকে দেখে ফেলেছিল। পরদিন একথা আমার কাছ থেকে শোনার পর স্যান্টো আর অভিরূপ...ওরা আমার খুব বন্ধু...আমাকে বলেছিল, পালোদা মার্ডারের কোনও সাক্ষী রাখে না। আমি যখন বললাম, পালোদা আমাকে ছোটভাইয়ের মতো ভালোবাসে, খুব লাইক করে–তখন স্যান্টো বলে, বাইরে থেকে দেখে তুই পালোদার ভেতরটা কিছু বুঝতে পারবি না। আর...আর অভিরূপ আমার দিকে আঙুল তুলে হাতটা রিভলভারের মতো এইরকম করে মুখে স করে গুলি করার শব্দ করেছিল...।

কল্যাণী অনুপমের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ছেলের মুখটা কী করুণ আর মলিন দেখাচ্ছে! তা হলে সেই সময়ে ও মৃত্যুভয়ে পাগল ছিল!

এখানে আর কোনও ভয় নেই, বলো, মা– কল্যাণীর দিকে চেয়ে হাসল অনুপম ও তা ছাড়া আমি তো আর পুলিশকে কিছু বলিনি!

ধীরে-ধীরে হাত বাড়িয়ে ছেলের ডানহাতটা আলতো করে চেপে ধরলেন কল্যাণী। অনুপমের হাতটা কেমন ঠান্ডা মনে হচ্ছিল।

বিড়বিড় করে কল্যাণী বললেন, তোর কোনও ভয় নেই...আমরা তো আছি...।

জানলার বাইরে থেকে বুলবুলি পাখির ডাক শোনা গেল।

ওরাও আমার পাশে আছে। ভাবলেন কল্যাণী।

আর-একটা কথা তোমাকে বলব,? আচমকা কথা বলল অনুপম।

কী, বল–

গতকাল রাতে আমার একটা ফোন এসেছিল। বাবা ধরে আমাকে ডেকে দিয়েছিল। আমি যখন ফোনটা ধরে হ্যালো বললাম তখন ওপাশ থেকে কোনও সাড়া পেলাম না। অনেকক্ষণ ধরে হ্যালো হ্যালো করেও যখন সাড়াশব্দ না পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছি তখন চাপা গলায় কে যেন বলল, অনু তো? তারপরই লাইন কেটে গেল।

অনুপমের মুখে কালো ছায়া নেমে এল হঠাৎ। নিচু গলায় অস্পষ্টভাবে ও বলল, পালোদা আমাকে অনু বলে ডাকত। আমাদের ফোন নাম্বার পাবলোদা জেনে গেছে, মা।

কল্যাণী ভয় পাচ্ছিলেন, তবে প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা ছেলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেন। ওর হাতে চাপ দিয়ে পুরোনো কথাটাই আবার বললেন, আমরা তো আছি…।

বুবু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মলিন হাসল।

কিন্তু সন্ধেবেলাতেই অনুপম সবকিছু ভুলে হুল্লোড়ে মেতে উঠল। ওর কলেজের তিন বন্ধু সুমিত, কিশোর আর সুবর্ণা এল ওদের বাড়িতে। ঘণ্টাখানেক পড়াশোনা চলার পর টেপ রেকর্ডার চালিয়ে গানবাজনা শুরু হল। সঙ্গে কল্যাণীর হাতে তৈরি চিংড়ির পকোড়া, ফিঙ্গার চিত্‌স, আর কফি।

আরও ঘণ্টাখানেক হইহই করে আড্ডা দিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর সুনন্দ বুবুকে বললেন, তোর বন্ধুবান্ধবদের মাঝে-মাঝেই আসতে বলিস। তা হলে অন্তত ভালো-মন্দ খাবার কিছু কপালে জুটবে। আড়চোখে কল্যাণীর দিকে তাকালেন তিনি।

কল্যাণী রাগ দেখিয়ে বললেন, তুমি ছেলের সামনে মিথ্যে কথা বললে! কেন, তোমাকে প্রন পকোড়া কি ফিঙ্গার চিত্‌স কখনও করে খাওয়াইনি?

হাসলেন সুনন্দ : খাইয়েছ। তখন বুবু ছোট ছিল হামাগুড়ি দিত।

বুবু মজার চোখে মা-কে দেখছিল।

কল্যাণী ওকে জিগ্যেস করলেন, কী রে, তোর মনে নেই?

কী করে মনে থাকবে। আমি তো তখন হামাগুড়ি দিতাম।

বাবা আর ছেলে একসঙ্গে হেসে উঠল। কল্যাণী কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, আমিও শোধ নেব। তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

সেদিন রাতে আবার সেই ফোনটা এল। সুনন্দ ফোনটা ধরে বুবুকে দোতলা থেকে ডাকলেন।

বুবু ফোন ধরে অনেকবার হ্যালো বলেও ও-প্রান্ত থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেল না। ও বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিল। তারপর যেভাবে সিঁড়ি লাফিয়ে দোতলায় উঠল তাতে মনে হল ভয়টা এবার ওকে কামড় বসাতে পারেনি।

পরদিন বুবু কলেজে বেরিয়ে গেল, সুনন্দও অফিসে রওনা হলেন, কিন্তু কল্যাণীর ছুটি থাকায় অলসভাবে একা-একা দিনটা কাটালেন। বিকেলে ছাদে উঠে আনমনাভাবে পায়চারি করতে করতে নানান পুরোনো কথা ভাবছিলেন। এইভাবে কখন যেন ছাদের আলসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বড়-বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সদরের লোহার গেটটা দেখা যাচ্ছিল। গেটটা সবসময় ফুটদুয়েক ফাঁক করে চেন-তালা দিয়ে বাঁধা থাকে। গেট থেকে যে-পথটা বাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছে সেটা গাছের সবুজ পাতায় খানিকটা আড়াল হয়ে গেছে। পথের এখানে-ওখানে শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে। কাল সকালে কাজের মাসি আবার আঁট দেবে।

কখন ফিরবে বুবু? বলেছিল সন্ধের আগেই ফিরবে।

হঠাৎই কল্যাণী দেখলেন, একটি ছেলে গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটার রোগা চেহারা অনেকটা অনুপমের মতোই। তবে একটু বেশি লম্বা মনে হল। মাথাটা সামান্য ঝুঁকে থাকায় কল্যাণী মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না।

ছেলেটা এগিয়ে আসতে-আসতে দোতলার বারান্দার নীচে আড়াল হয়ে গেল। এইবারই বোধহয় কলিংবেল বাজাবে!

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন কল্যাণী। দরজার কাছে যেতে-যেতে কলিংবেলের শব্দ আশা করছিলেন, কিন্তু কোনও শব্দ হল না।

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলেন।

কেউ নেই!

এলোমেলো শুকনো পাতা ছড়ানো পথটা চুপচাপ একা-একা লোহার গেট পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আর কেউ নেই!

রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ির শব্দ, গাছের মাথায় পাখিদের শেষ বিকেলের কিচিরমিচির, বাতাসে দোল-খাওয়া পাতার খসখসানি শুনতে পাচ্ছিলেন কল্যাণী। কিন্তু কারও পায়ের শব্দ নেই।

বাইরে বেরিয়ে বাড়িটার চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। না, কেউ নেই।

তখন কল্যাণী বাইরের লোহার গেটের কাছে গেলেন। রাস্তায় পা দিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখলেন। নাঃ, ওরকম চেহারার কোনও ছেলেকে চোখে পড়ছে না।

গেট থেকে খানিকটা দূরে একটা ঝুপড়ি-দোকান। চা-ঘুগনি রুটি বিক্রি করে। ওই দোকানদারকে কি জিগ্যেস করা যায়? না, জিগ্যেস করলে লোকটা ভাববে কল্যাণী ভূতের ভয় পেয়েছেন।

কল্যাণী বাড়িতে ঢুকে পড়লেন আবার। মনে হয়, তিনি যখন নীচে নামছিলেন, ছেলেটা তখন গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। বোধহয় ভুল করে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।

সুনন্দ আর অনুপম বাড়িতে ঢোকামাত্রই ব্যাপারটা ওদের জানালেন। দুজনেই আহ্বাদে একেবারে লাফিয়ে উঠল : এতদিনে তা হলে ভূতের দেখা পাওয়া গেছে।

সুনন্দ ঠাট্টা করে বললেন, বিপিন দেখছি ঠিকই বলেছিল? আগে বোঝা যায় না। তবে মানতেই হবে, এ নিতান্ত নিরিমিষ ভূত। এল আর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল!

বুবু চাপা গলায় বলল, বাবা, মা কিন্তু এবার রেগে যাবে।

কল্যাণী গম্ভীরভাবে বললেন, আমি ভূতের কথা কিছু বলিনি–মানুষের কথাই বলেছি। আমি ভেবেছি তোমাকে বা বুবুকে কেউ খুঁজতে এসেছে।

দেখতে কেমন, মা? বুবু জিগ্যেস করল।

ওপর থেকে মুখটা ভালো করে দেখা যায়নি।

বোধহয় ভুল করে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সুনন্দ মন্তব্য করলেন, আমি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ মজা করছিলাম। এবার কি একটু চা খাওয়াবে?

কল্যাণী হেসে বললেন, অত তোয়াজের দরকার নেই–এমনিতেই চা খাওয়াতাম।

ঠোঁটে একচিলতে হাসি নিয়ে মায়ের চলে যাওয়া দেখল বুবু। সত্যি, এ-বাড়িতে এসে ওদের জীবনটাই যেন বদলে গেছে! চারপাশটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনটাও কেমন সবুজ আর খোলামেলা হয়ে গেছে।

সেদিন রাতে ও অনেক সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখল।

.

পরদিন সকালে সুনন্দ একটু বেলা করেই বাজারে বেরোচ্ছিলেন, গেটের কাছে একটি লোকের সঙ্গে ওঁর দেখা হল।

বয়েস আঠাশ কি তিরিশ হবে। চোখে সাধারণ ফ্রেমের চশমা। ফরসা সৌম্য মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব। নাকের বাঁ-পাশে একটা বড় তিল। চুলগুলো সামান্য উশকোখুশকো–যেন দু-চারদিন তেল কি চিরুনি পড়েনি। গায়ে রঙিন চেক শার্ট, পায়ে জিন্স।

কাকু, অনুপম আছে? হাসিমুখে জিগ্যেস করল ছেলেটি।

মুখটা চেনা-চেনা লাগছে কি? সুনন্দ ঠিক ঠাহর করতে পারছিলেন না। ওঁর কপালে কয়েকটা ভাজ পড়ল।

চিনতে পারছেন না! আমি অভ্র। অনুপম কি পড়ছে এখন?

কী জানি, পড়ছে বোধহয়। তুমি যাও না, ও দোতলার ঘরে আছে।

অভ্র হেসে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। সুনন্দ চলে এলেন গেটের বাইরে। হঠাৎই ওঁর মনে হল, অভ্রর জামার ফাঁক দিয়ে তিনি যেন একটু ব্যান্ডেজমতো দেখতে পেয়েছেন। কে জানে, ফুটবল খেলতে গিয়ে হয়তো পাঁজরে চোট পেয়েছে।

বাজার করে ফিরতে ফিরতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল।

সদরের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কল্যাণীকে দেখতে পেলেন। একটা গাছের আড়াল থেকে এমন উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলেন যেন কাউকে খুঁজছেন।

সুনন্দকে দেখেই কাছে এগিয়ে এলেন কল্যাণী। হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলেন, বুবুকে বাইরে কোথাও দেখলে?

না তো! কী হয়েছে? সুনন্দ কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

তুমি বাজারে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ওকে আর দেখতে পাচ্ছি না। ঘরে ব্রেকফাস্ট দিতে গিয়ে দেখি নেই। তারপর এখানে-ওখানে সবজায়গায় খুঁজলাম… যন্ত্রের মতো মাথা নাড়লেন কল্যাণী ও কোথাও নেই…।

অভ্র নামে ওর এক বন্ধু যে ওকে খুঁজতে এল…আমি বললাম, তুমি যাও, ও দোতলায় আছে…সেই ছেলেটা কোথায়?

অভ্র? দেখা করতে এসেছিল? আমি তো টের পাইনি!

তুমি হয়তো রান্নাঘরে কি টয়লেটে ছিলে–টের পাওনি। দ্যাখো, ওর সঙ্গেই কোথায় বেরিয়েছে। এক্ষুনি চলে আসবে।

সুনন্দ কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, তাড়াহুড়ো করতে হবে, নইলে অফিসে দেরি হয়ে যাবে।

কল্যাণীর মন মানছিল না। যেতে-যেতে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। স্কুলে যাওয়া তখন ওঁর মাথায় উঠেছে।

সুনন্দর কাছে অভ্রর চেহারার বর্ণনা শুনে কল্যাণী বললেন, মনে হচ্ছে, কাল বিকেলে এই ছেলেটাই গেট দিয়ে ঢুকেছিল। পরে কী ভেবে চলে গেছে।

সুনন্দ চুপ করে রইলেন। সাড়ে দশটায় তিনি যখন অফিসে বেরোলেন তখনও বুবু ফিরল না।

রাস্তায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক দোকানদারদের কাছে খোঁজখবর করে জানতে পারলেন, অনুপমকে তারা একটি ছেলের সঙ্গে হেঁটে যেতে দেখেছে। এর বেশি আর কেউ কিছু জানে না।

সুনন্দর অফিসে বারবার ফোন যেতে লাগল ও বুবু এখনও ফেরেনি। সুনন্দ বাধ্য হয়ে অফিস থেকে বাড়ি চলে এলেন। তারপর শুধু একে-তাকে ফোন করা, বুবুর খোঁজ করা।

বুবুর ঘর সার্চ করে ওর একটা ছোট্ট ডায়েরি পাওয়া গেল। তাতে বেশ কিছু ফোন নম্বর পাওয়া গেল। তারপর আবার ফোন। ফোনের পরে ফোন।

কিন্তু কোনও লাভ হল না। বুবু কোথাও নেই।

রাত দশটার সময় স্বামী-স্ত্রীতে মিলে এলাকার থানায় মিসিং ডায়েরি করলেন। ছেলের একটা ফটো জমা দিয়ে সব খুলে বললেন। অভ্র নামের ছেলেটির চেহারার বর্ণনাও দিলেন।

থানার অফিসার-ইন-চার্জ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো ওঁদের আশ্বাস দিলেন আপনারা বাড়ি যান। আমরা কাজ শুরু করে দিচ্ছি। হসপিটাল, নার্সিংহোম সব খোঁজ করে দেখছি কোনও অ্যাক্সিডেন্টের কেস গেছে কি না। আর অভ্র ছেলেটাকেও আমরা ট্রেস করার জন্যে লেভেল বেস্ট চেষ্টা করছি। দরকার হলে আপনাদের পুরোনো পাড়াতেও এনকোয়ারি করব। ওর যেসব বন্ধুদের নামধাম দিলেন তাদেরও ইন্টারোগেট করে দেখব। মোদ্দা কথা, উই আর পুটিং ইন আওয়ার বেস্ট

এফার্টর্স। কোনও লিডই আমরা বাদ দেব না।

রাতের নির্জন পথ ধরে ওঁরা বাড়ি ফিরে এলেন। এতক্ষণ কল্যাণী বারবার চোখ মুছছিলেন। বাড়িতে এসে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে

শুরু করলেন। আর সুনন্দর বুকের ভেতরটা থেকে-থেকেই মুচড়ে উঠছিল।

ওঁরা দুজনেই বুঝতে পারছিলেন বুবুকে ওঁরা কত ভালোবাসেন।

*

চুলচেরা তদন্ত করেও পুলিশ অনুপমের কোনও হদিশ পেল না।

প্রতিদিন থানায় খবর নিয়ে নিয়ে সুনন্দ আর কল্যাণী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ওঁদের ওপরে অভিমান করে বুবু কি চিরদিনের জন্য ওঁদের ছেড়ে চলে গেল? কিন্তু কেন যাবে! আর অভ্রকেই বা কেন সঙ্গে নেবে!

দশদিনের দিন ও. সি. একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে করে সুনন্দদের বাড়িতে এলেন।

রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা।

মুখটাকে পাথরের মতো করে সুনন্দ টিভি দেখছিলেন। কল্যাণী ভেতরের ঘরে গোছগাছের কাজ করে নিজেকে ব্যস্ত রাখছিলেন। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে অফিসার ইন-চার্জকে দেখেই সুনন্দর মুখ শুকিয়ে গেল। ও. সি.-কে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কোনও খারাপ খবর নিয়ে এসেছেন। ওঁর মুখ গম্ভীর। হাতে একটা ফাইল।

ওঁকে বসতে দিয়ে কল্যাণীকে চেঁচিয়ে ডাকলেন সুনন্দ। টের পেলেন, গলা কেমন যেন চিরে গেল।

ও. সি. বললেন, সরি, মিস্টার চৌধুরী, আপনার ছেলেকে এখনও আমরা ট্রেস করতে পারিনি। আমরা যা-যা করার সব করেছি…বাট য়ু নো…মানে, এখন লালবাজারের মিসিং পারসন্স স্কোয়াডের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে হবে।

কল্যাণী কখন যেন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নিথরভাবে অফিসারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সুনন্দ ইতস্তত করে বললেন, এখন….এখন আমাদের কী করার আছে?

সেটাই তো ভাবছি... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোয়ালে হাত বোলালেন অফিসার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎই বললেন, ও হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছি। ইনভেস্টিগেট করে একটা ব্যাপার আমরা কনফার্ম করতে পেরেছি। আপনাদের ছেলের কিডন্যাপিং-এর পেছনে মানে, যদি কেসটাকে আমরা কিডন্যাপিং বলে ভাবি–ওই পাবলো শিকদারের কোনও হাত নেই। কারণ, অনুপম মিসিং হয় এগারো তারিখ সকালে আর ওই অ্যান্টিসোশ্যালটা দশ তারিখে দুটো গ্যাং-এর এনকাউন্টারে গুলি খেয়ে সিরিয়াস ইনজুরি নিয়ে হসপিটালাইজড হয়। আর তার পরের দিনই মারা যায়...।

ও যদি কোনও শাগরেদকে পাঠিয়ে থাকে। মানে, ওই অভ্র নামের আনোন ছেলেটা যদি ওর গ্যাং-এর হয়... সুনন্দ আর কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

এই দেখুন না, ওখানকার লোকাল থানা থেকে আমরা পাবলোর ফাইলের কপি আনিয়েছি। তাতে ওর দলের লিস্টে অ নামটা পাইনি। হাতের ফাইলটা খুলে ও. সি. পাতা ওলটাচ্ছিলেন।

ফাইলের দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দ চমকে উঠলেন। এ কী! ওই ছবিটা কার?

আচমকা ফাইলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে একটা পৃষ্ঠা চেপে ধরলেন সুনন্দ। সেই পৃষ্ঠায় আঁটা একটা পাসপোর্ট ফটো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কঁপা গলায় চেঁচিয়ে বললেন, এই তো! এই তো অভ্র! এই..এই ছেলেটাই সেদিন বুবুকে খুঁজতে এসেছিল!

কল্যাণী প্রায় ছুটে চলে এলেন সুনন্দর পাশে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আঁচ করতে চাইলেন, এই ছেলেটিকেই তিনি দশ তারিখে ছাদ থেকে দেখেছিলেন কি না।

অফিসার অবাক হয়ে তাকালেন স্বামী-স্ত্রীর দিকে।

কী বলছেন আপনি! অভ্র কেন হবে! এটা তো ওই গ্যাংস্টার পাবলো শিকদারের ছবি!

সঙ্গে-সঙ্গে যেন শীত নেমে এল ঘরের মধ্যে। প্রাচীন বাড়িটা অন্তর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সুনন্দ ঘামতে শুরু করলেন। কল্যাণী বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগলেন। অ্যাজমার টানটা ওঁকে কষ্ট দিচ্ছিল।

দশ তারিখে পাবলো শিকদার কখন গুলি খেয়েছে? জানতে চাইলেন কল্যাণী। ওঁর কঁপা গলা উত্তেজনায় টান-টান।

সুনন্দর হাতটা সরিয়ে দিয়ে ফাইলের পাতা ওলটালেন ও. সি.। পকেট থেকে রিডিং গ্লাস বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, রিপোর্টে আছে সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

সুনন্দ অবাক চোখে কল্যাণীর দিকে তাকালেন। কী বলতে চাইছেন কল্যাণী ছেলের শোকে ওঁর কি মাথার গোলমাল হয়ে গেল!

পরদিন পাবলো শিকদার কটার সময় মারা গেছে? ভাঙাচোরা গলায় কল্যাণী আবার প্রশ্ন করলেন।

ফাইলের পাতায় তর্জনীর দাগ টানতে টানতে উত্তরটা খুঁজে পেলেন অফিসার।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ…।

সবাইকে চমকে দিয়ে কান্নায় ভাঙচুর হয়ে গেলেন কল্যাণী। সুনন্দর হাত আঁকড়ে ধরে বুকফাটা গলায় হাহাকার করে উঠলেনঃ বুবু আর কোনওদিন ফিরে আসবে না গো, আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। ও…মাগো..মা…।

কী হল তোমার! পাগলের মতো এসব কী বলছ! সুনন্দ কল্যাণীর দুকাঁধ ধরে জোরে আঁকুনি দিলেন : তুমি শান্ত হও। প্লিজ…।

মুখে আঁচল গুঁজে কান্না বন্ধ করতে চাইলেন কল্যাণী। জড়ানো গলায় স্বামীকে বললেন, এখনও তুমি বুঝতে পারোনি! তোমার বন্ধু ঠিকই বলেছিল ও আগে বোঝা যাবে না। পরে, অনেক পরে, যখন বুঝবে…তখন…তখন আর কিছু করার থাকবে না। অনেক দেরি হয়ে যাবে…অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সুনন্দ এবার বোধহয় একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন। বিপিন চ্যাটার্জি তা হলে একবর্ণও মিথ্যে বলেননি।

ও. সি. কল্যাণীর কথার কোনও মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি সুনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারায় প্রশ্ন করলেন? কী ব্যাপার?

কল্যাণী তখন জল-ভরা শূন্য দৃষ্টি মেলে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বিড়বিড় করে বলে চলেছেন : ...দশ তারিখ বিকেলে পালো শিকদার গুলি খেয়ে মরতে-মরতেও মরেনি। তাই ও আসতে-আসতেও আসেনি। ওর প্রেতাত্মা আমাকে আবছাভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। পরদিন সকালে পাবলো শিকদার মারা যেতেই ওর প্রেতাত্মা সটান এসে হাজির হয়েছে। নিশির ডাকে ভুলিয়ে আমার ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। বুবু আমাকে বলেছিল, পাবলো শিকদার মার্ডারের কোনও সাক্ষী রাখে না। ওঃ মাগো...।

সুনন্দ মাথা ঝুঁকিয়ে দু-হাতে কপাল চেপে ধরলেন। চাপা কান্নায় ওঁর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছিল।

ও. সি. কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কল্যাণী ফিসফিস করে নিজের মনেই কীসব বলছিলেন।

তবে ওঁরা তিনজনেই বুঝতে পারছিলেন, অনুপম আর কোনওদিনও ফিরে আসবে না।

# চিকুর স্বপ্ন

**চিকুর স্বপ্ন**

ভোরবেলা বুড়ো লোকটাকে দেখতে পেল চিকু।

গোলাপ বাগানের ভেতরে জবুথবু হয়ে বসেছিল সে। পরনে একটা পুরোনো আলখাল্লা। তাতে লাল, নীল, হলদে, সবুজ হরেক রঙের তালি মারা। আর হাতে সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা লাঠি।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চিকু বাগানে বেড়াতে আসে। মা-বাবা তখন ঘুমিয়ে থাকেন। বাড়ির লাগোয়া বিরাট এলাকা জুড়ে বাগান। বাগানে নানা ফুলের গাছ, নানা ফলের গাছ। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় মৌমাছি। গাছের ডালে-ডালে পাখি খেলা করে। সুরেলা শিস দেয়। চিকু দ্যাখে। চিকুর খুব ভালো লাগে। ও বাগানে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করেই হঠাৎ বুড়ো মানুষটার মুখোমুখি হয়ে পড়ল চিকু। গোলাপ বাগানের লাল, হলদে, বেগুনি, নানারকম গোলাপের মাঝে আলখাল্লার লাল, নীল, হলদে রং যেন মিশে গিয়েছিল। তাই হঠাৎ সামনা-সামনি পড়ে গিয়ে চিকু চমকে উঠেছিল। মাথায় ধবধবে সাদা চুলের জঙ্গল। একইরকম গোঁফ-দাড়িতে মুখের অনেকটাই ঢেকে গেছে। চোখ কুঁচকে ছোট। তার চারিদিকে বলিরেখার আঁকিবুকি। গোটা মুখে একইরকম অসংখ্য দাগ। আলখাল্লার বাইরে বেরিয়ে থাকা হাত দুটোরও একই দশা। লাঠি আঁকড়ে ধরা ডানহাতটা অল্প-অল্প কাঁপছিল।

চিকু অবাক হয়ে গেল। এরকম বুড়োমানুষ সে কখনও দেখেনি। আর লোকটা বাগানে এলই বা কোথা থেকে!

কাছে এগিয়ে গেল চিকু। জিগ্যেস করল, তুমি কে?

বুড়ো লোকটা চমকে উঠল। চোখ আরও ছোট করে চিকুকে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। আলখাল্লা মোড়া শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

চিকু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। কেন ভয় পাচ্ছে মানুষটা! ও আরও কাছে এগিয়ে গেল। একটা হাত রাখল বুড়ো লোকটার হাতের ওপর। চামড়া কোঁচকানো। পার্চমেন্ট কাগজের মতো খসখসে। চিকু আবার বলল, বলো না, তুমি কে?

বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে চিকুকে দেখল। ভয় কেটে গিয়ে ভরসা ফিরে এল মুখে। সামান্য হাসতে চেষ্টা করল। তারপর পালটা প্রশ্ন করল ঘড়ঘড়ে গলায়, তুমি কে, খোকাবাবু?

আমি চিকু। ওই বাড়িতে থাকি। চিকু আঙুল তুলে ওদের বাড়িটা দেখাল। তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করল, তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?

বুড়ো মানুষটা কী একটা বলতে গিয়ে কাশতে শুরু করল। দম ফেটে যাওয়ার মতো কাশি। হিজিবিজি দাগকাটা ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। কাশি থামলে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলল, আমি এখানে লুকিয়ে আছি প্রাণের ভয়ে, খোকাবাবু। এই কদিন হল এসেছি। তুমি কাউকে আমার কথা বোলো না যেন।

চিকুর অদ্ভুত লাগল। প্রাণভয়ে এই বুড়ো মানুষটা লুকিয়ে রয়েছে কেন! কে ভয় দেখাচ্ছে। ওকে!

বাগানে নানা পাখি মিষ্টি সুরে ডাকছিল। মাঝে-মাঝেই অমন ডাক শোনা যায়। শোনা যায় সুরেলা শিসের শব্দ। চিকুর ভালো লাগছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষটা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আক্ষেপের গলায় বলল, নকল! সব নকল গো, খোকাবাবু! চেহারা আছে, নড়নচড়ন আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।

চিকু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ও অবাক চোখে বুড়ো লোকটার রংবেরঙের আলখাল্লা দেখছিল। দেখছিল আঁকাবাঁকা লাঠি, আর ধবধবে সাদা চুল-দাড়ি।

বুড়ো চিকুকে ডেকে তার পাশে বসাল। কাঁপা গলায় বলল, চিরটাকাল এমন ছিল না, খোকাবাবু। আমাদের সময়ে সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খেত সত্যিকারের মৌমাছি।

একটা মৌমাছি একটা হলদে গোলাপের আশেপাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। গুনগুন শব্দ উঠছিল বাতাসে। চিকু সেদিকে দেখিয়ে বলল, ওই তো মৌমাছি!

নকল মৌমাছি। হতাশ সুরে বলল বুড়ো, এই যে বাগানের গাছপালা, ফুল, ফল, পাখি, কীটপতঙ্গ, স-ব নকল। সবই মানুষের তৈরি, ভগবানের নয়। ভগবানকে মানুষ ছুটি দিয়েছে। একটু আগে ওই যে পাখির শিস শোনা গেল, রোজ সকালে একই সময়ে হুবহু ওই একই সুরে শিস দেবে নকল পাখিটা। এই যে মৌমাছি ফুলকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে, রোজ একই ভঙ্গিতে ওই ফুলটাকে ঘিরেই সে উড়ে বেড়াবে।

কেন?–চিকু বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটার কথাগুলো। কই, চিকুর মা কিংবা বাবা তো কোনওদিনও এ-সব কথা ওকে বলেননি!

লোকটা আবার কাশল। পাতলা ধোঁয়াশা বেড়াচ্ছে চারদিকে। রোজই এইরকম থাকে। কেমন মেঘলা ঘোলাটে পরিবেশ।

খোকাবাবু, এই পাখি, মৌমাছি, সবই তোমাদের বিজ্ঞানীদের তৈরি। ওদের শরীরের কলকবজায় ঠিক যেরকম-যেরকম নির্দেশ দেওয়া আছে, ঠিক সেরকমভাবেই ওরা গুনগুন করে, শিস দেয়, উড়ে বেড়ায়। এই যে সব ফুল–এগুলো বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো ফোটে আর ঝরে পড়ে। ফুলের গন্ধও তৈরি হয়েছে তোমাদের ল্যাবরেটরিতে। তারপর সেই নকল সুগন্ধি ভরে দেওয়া হয়েছে ফুলের ভেতরে। ওই যে গাছের ফল, ওগুলো তোমরা কি কখনও খেয়ে দেখেছ? দেখোনি নিশ্চয়ই!

না, মা-বাবা বারণ করেছেন। আমরা তো শুধু ভিটামিন খাই চামচে করে, আর কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন মেশানো ফুড ট্যাবলেট।

হাসল বুড়ো। মাথা নাড়ল হতাশায়। লাঠিটা নামিয়ে রাখল পাশে। তারপর চিকুর পিঠে হাত রেখে বলল, খোকাবাবু, ওই ফল শুধু দেখবার জন্যে। আর নকল পাখিগুলো বিজ্ঞানীদের তৈরি করে দেওয়া রুটিনমাফিক ওই ফলগুলো

মাঝে-মাঝে ঠোকরায়। এমনকী খাওয়ার ভানও করে। হায় রে! কী দিনকালই না এল!

বুড়ো আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মুখ তুলে ওপরে আকাশের দিকে তাকাল। ভুরুর ওপরে হাত রেখে নজর করে দেখতে চেষ্টা করল আকাশটা। ঘোলাটে মেঘলা আকাশে অনেক আলো জ্বলছে। শক্তিশালী আকাশ-প্রদীপের মতো সাদা উজ্জ্বল আলোক-পিণ্ডগুলো আকাশে ভাসছে। আলো ছড়াতে চেষ্টা করছে আবছায়া পৃথিবীর বুকে।

চিকুর দিকে তাকিয়ে বুড়ো প্রশ্ন করল, তুমি কোনওদিন সূর্য দেখেছ, খোকাবাবু? সূয্যিমামা?

না। মাথা নাড়ল চিকু। তবে সূর্যের কথা ও শুনেছে মা-বাবার কাছে। বছর কুড়ি আগেও নাকি সূর্য দেখা যেত পৃথিবীর আকাশে। পুবে উঠত, পশ্চিমে অস্ত যেত। দিন ছিল উজ্জ্বল আলোময়, রাত ছিল ঘন অন্ধকার। এখন দিন আর রাতের তফাত বেশ কমে এসেছে। পরিবেশ গাঢ় হয়ে, ঘন হয়ে, সূর্য ঢেকে গেছে। বুদ্ধিমান মানুষ এখন নতুন ধরনের আলোর উৎস তৈরি করেছে। হাউইয়ের মতো আলোক-পিণ্ড ছুঁড়ে দিয়েছে আকাশে। সেগুলো ভারী বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে। আলো ছড়ায়। মাসখানেক পরে সেগুলোর জ্যোতি কমে আসে। নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন নতুন-নতুন আলোক পিণ্ড ছুঁড়ে দেয় মানুষ। আবার আলো হয়।

বিশাল আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা কাপড়ের ঝোলা বের করল বুড়ো। ঝোলাতেও আলখাল্লার মতো রংবেরঙের অজস্র তালি। হাতড়ে হাতড়ে তার ভেতর থেকে একটা বিবর্ণ প্যাকেট বের করল। হলদেটে কাগজে মোড়া। কাগজ বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। চিকু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। কঁপা হাতে প্যাকেট থেকে কয়েকটা রঙিন ফটো বের করল সে। বহুদিনের হাওয়ায় ফটোগুলোর রঙের জৌলুস অনেক ফিকে হয়ে গেছে। চিকুর বেশ কৌতূহল হল। এরকম ফটোগ্রাফের ব্যবহার আজকাল প্রায় নেই বললেই চলে। এখন শুধু মাইক্রোফিম, মাইক্রো-ভিডিয়ো, মাইক্রো টিভি ক্যামেরা–এসবের যুগ।

প্রথম ছবিটা চিকুকে দেখাল বুড়ো। সূর্য উঠছে পূর্ব দিক থেকে। লাল। গোল বলের মতো। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। মেঘের কিনারে লাল রেখা। একপাশে কিছু সবুজ গাছপালা। তার পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। খালি গা। হাতে লিকলিকে খাটো বেত।

রাখাল ভোরবেলায় যাচ্ছে গরু চরাতে। বুড়ো বিড়বিড় করে বলল। চিকু ছবিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। গরু শুধু ও মিউজিয়ামের ছবিতেই দেখেছে। গরু দেখতে সুন্দর নয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাই তাঁরা নকল গরু তৈরি করে নকল তৃণভূমিতে নিশ্চয়ই রাখেননি। তা ছাড়া বইতেও পড়েছে, একসময়ে মানুষ গরুর দুধ খেত। গরু ছিল গৃহপালিত পশু। কিন্তু এখন তো ওসব খাদ্য বা পানীয় দূষিত। চিকু কখনও দুধ দেখেনি।

ছবিটা দেখতে-দেখতে ওর নাকে ধুলো উড়ে আসছিল। কী সুন্দর!

তারপর দ্বিতীয় ছবিটা দেখাল বুড়ো। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। নদীর বুকে কালো ছায়ার মতো নৌকো ভেসে যাচ্ছে। ওপারে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য। আকাশে নানা রঙের মেঘ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাসছে। অপূর্ব!

নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আবার বিড়বিড় করল বুড়ো। তারপর বাকি ছবিগুলোও একে-একে দেখাল সে। ছেলেমেয়েরা পার্কে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাগানে রংবেরঙের ফুলের উৎসব! দীপাবলির আলোকসজ্জা। কত চিত্র-বিচিত্র পাখি…।

ছবিগুলো দেখানো শেষ হলে সেগুলো আবার প্যাকেটে ভরে রাখতে লাগল বুড়ো। বলল, এখন সূর্যও নেই, আর এসব কিছুও নেই, খোকাবাবু। আরও অনেক ফটো ছিল আমার কাছে…নষ্ট হয়ে গেছে। এই বুড়ো শরীরে পালিয়ে বেড়ানো কি কম ধকলের কাজ! খকখক করে কাশতে শুরু করল সে। কিছুক্ষণ পর কাশি থামলে জড়ানো গলায় বলল, এই নোংরা বাতাসে আমি শ্বাস নিতে পারি না। চারদিকে সব কেমন ধোঁয়াটে মেঘলা। অক্সিজেন কত কমে গেছে। চারদিকে শুধু বিষ বাতাস। কথা আটকে গিয়ে বুড়ো আবার কাশতে লাগল।

শ্বাস নিতে চিকুর কোনওরকম কষ্ট হচ্ছিল না। ও জানে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এখন অক্সিজেন শতকরা আট ভাগ। বাকি অংশে নাইট্রোজেন ছাড়াও রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড। গত পঞ্চাশ বছরে ক্ষতিকর গ্যাসগুলো পরিমাণে অনেক বেড়ে গেছে। কলকারখানা-যানবাহনের ধোঁয়া বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়াই গেছে পালটে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশ-বাতাস মেঘলা, ঘোলাটে। সেইজন্যেই কি আসল পশু-পাখিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? মরে গেছে আসল ফুল, ফল, গাছ? তাই যদি হয়, তা হলে মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে রইল কেমন করে! সবকিছুই কেমন দুর্বোধ্য

আর রহস্যময় ঠেকছিল চিকুর কাছে। ওর কোনও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না, অথচ এই বুড়ো মানুষটার কাশতে কাশতে প্রাণ বেরুবার জোগাড়।

সেই কথাই ও জিগ্যেস করল লোকটাকে।

লোকটা কাশি থামিয়ে আলখাল্লার হাতায় মুখ মুছছিল। বারদুয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, আমি পুরোনো দিনের মানুষ, খোকাবাবু। জানি না, আমার মতো আর কজন এখনও লুকিয়ে চুরিয়ে প্রাণে বেঁচে আছে। আর তোমরা হলে গিয়ে নতুন বিজ্ঞানের যুগের নতুন জাতের মানুষ। তোমাদের কাছে এই নোংরা বিষ-বাতাসই প্রিয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো। তারপর ঝোলার ভেতরে হাতড়ে হাতড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। আপনমনেই নীচু গলায় বলল, বাতাস পরিষ্কার করতে আমরা বহু চেষ্টা করেছিলাম গো, খোকাবাবু। পরিষ্কারও হয়েছিল। ফলে মানুষের আয়ু গিয়েছিল বেড়ে।

চিকুর দিকে তাকাল সে ও এই আমাকেই দ্যাখো না। কত বুড়োটি হয়েও বেঁচে আছি। যাই হোক…তারপর যুদ্ধ বাধল। ভয়ানক যুদ্ধ। বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিনের পর দিন। মানুষ বিষে মরতে লাগল। বাতাস পরিষ্কার করার চেষ্টাও গেল থেমে। কলকারখানা, গাড়িঘোড়ার ধোঁয়া আকাশে-বাতাসে জমতে লাগল। ওঃ, সে কি আজকের কথা! আমরা কিছু মানুষ গোপন জায়গায় অক্সিজেন সঞ্চয় করে বেঁচে রইলাম। দূষিত বাতাস পরিষ্কার করার জন্যে লড়াই করে চললাম গোপনে। কিন্তু পারলাম না। বাতাস আরও বিষিয়ে যেতে লাগল, আমরাও বুড়ো হয়ে গেলাম ধীরে-ধীরে, আর অক্সিজেনও এল ফুরিয়ে। তখন নিরুপায় হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাঠে-ঘাটে-পথে দূষিত পরিবেশে। একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলাম বাঁচার লড়াই।

বুড়ো আবার কাশতে শুরু করল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় লাঠিটা আঁকড়ে ধরতে গেল। চিকুর কেমন ভয়-ভয় করছিল। কী করবে, কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এমনসময় দূর থেকে ওর নাম ধরে কেউ ডাকল, চিকুউ!

ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বুড়োকে বলল, যাচ্ছি। মা ডাকছেন।

আমার কথা কাউকে বোলো না, খোকাবাবু। তুমি বরং কাল আবার এসো। তোমাকে পুরোনো দিনের অনেক গল্প শোনাব, কেমন! কী করে ফুল ফুটত, পাখি ডাকত, মৌমাছি মধু খেতসব।

আচ্ছা, আসব। বলে গোলাপ বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ি লক্ষ করে ছুটে চলল চিকু। ওর নাকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। শুনতে পাচ্ছিল গাছের ডালে বসে পাখি ডাকছে সুরেলা গলায়। চিকু ছুটতে ছুটতেই মনে-মনে বলল, নকল গন্ধ। নকল পাখি। বিচ্ছিরি।

বুড়োর দেখানো বিবর্ণ ফটোগ্রাফের ছবিগুলো ওর মনে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছিল বারবার।

কম্পিউটার শিক্ষকের সামনে বসে লেখাপড়া করছিল চিকু। কিন্তু বারেবারেই ও আনমনা হয়ে পড়ছিল আর কম্পিউটার শিক্ষকের ধমক টেলিভিশন পরদায় ফুটে উঠছিল, তুমি অমনোযোগী হয়ে পড়ছ। তোমার নম্বর কাটা যাচ্ছে।

প্রতিদিন লেখাপড়ার জন্যে আলাদা নম্বর আছে। সারাদিন পড়াশোনার শেষে বাবা কিংবা মা কম্পিউটারের বোতাম টিপলেই নম্বর ফুটে ওঠে পরদায়, তাতে অন্যমনস্কতার জন্য কত নম্বর কাটা গেছে তাও লেখা থাকে। সেটা দেখলেই মা-বাবা বকাবকি করবেন।

চিকুর একটুও ভালো লাগছিল না। তবুও কোনওরকমে পড়া শেষ করে মা-র কাছে গেল। বলল, মা, মা, জানো, আমাদের বাগানের পাখিগুলো সব নকল বিজ্ঞানীদের তৈরি।

মা মাইক্রো-টিভি হাতে নিয়ে খবর শুনছিলেন, হাত থেকে টিভি পড়ে গেল। অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকালেন।

চিকু এক নিশ্বাসে বলে গেল পুরোনো দিনের কথা। আসল ফুলের কথা, আসল পাখির কথা, আসল মৌমাছির কথা। একদিন সূর্য ছিল আকাশে। দিনে থাকত উজ্জ্বল আলো, আর রাতে গাঢ় অন্ধকার।

মা কাছে এগিয়ে এলেন। হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন ছেলের সামনে। ওর দুধে হাত রাখলেন, তুই এসব কার কাছে শুনেছিস?

চিকু হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল। মনে পড়ল, বুড়ো লোকটা ওকে বারবার করে বারণ করেছিল, তার কথা কাউকে না বলতে। বললে সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে।

সুতরাং মা-র কথার জবাব না দিয়ে চিকু বলল, বলো না মা, এসব সত্যি?

মা-র কপালে ভাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর বললেন, সব সত্যি। কিন্তু কে তোকে এসব কথা বলল! তোর বাবা জানতে পারলে…।

বাবা ঘরে ছিলেন না। অফিসে গেছেন। অফিস বলতে বাড়ির লাগোয়া একটা ছোট ঘর। সেখানে নানারকম সব কম্পিউটার বসানো আছে। আর আছে চার-চারটে রঙিন টিভি। বাবা রোজ সেই ঘরে যান। সারাদিন বসে-বসে শুধু ছোট-বড় বোতাম টেপেন। টিভির পরদা খুঁটিয়ে লক্ষ করেন। কম্পিউটার থেকে যেসব ছাপা কাগজ বেরিয়ে আসে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন। বাবা বলেন, সারা দেশ জুড়েই নাকি এরকম শক্তিশালী কম্পিউটার যোগাযোগ রয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণের গোপন খবরাখবর আদানপ্রদান হয় হাজার-হাজার কম্পিউটারের মাধ্যমে।

তোর বাবা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবেন। এসব কথা তোর বাবাকে বলিস না যেন। মা অবাক চোখে ছেলেকে দেখছিলেন। চিকু যেন কোনও স্বপ্নের দেশে মগ্ন হয়ে গেছে। ওকে বুকে টেনে নিয়ে মা বললেন, তুই খুব সাবধানে থাকিস। তোর জন্যে আমার ভয় করছে।

চিকু মা-র ভয়ের কারণ বুঝতে পারল না। ও শুধু বিস্ময়ে ভাবছিল, সমস্ত নকল জিনিসের মধ্যে থেকেও মা-বাবা কেমন নিশ্চিন্ত হাসিখুশি রয়েছেন। অথচ এই ভয়ংকর রহস্যটা ফাঁস হয়ে যেতেই চিকুর বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছে।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে চিকু শুনতে পেল বাবা-মা চাপা গলায় কথা বলছেন। কী কথা তা স্পষ্ট না বুঝতে পারলেও চিকুর আন্দাজে মনে হল আলোচনাটা ওকে নিয়েই।

কিছুক্ষণ পরে বাবার একটা কথা কানে এল ওর, ঠিক আছে। কাল ওকে আমার সঙ্গে অফিসে নিয়ে যাব। সব বুঝিয়ে বলব। ও এখন বড় হয়েছে। সব ওর

জানা দরকার।

তারপরই চিকু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সত্যিকারের ফুল, পাখি, লতাপাতা, মেঘ, সূর্য, স-ব এসে ভিড় করল ওর চোখের সামনে। ও দেখল, সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাচ্ছে সত্যিকারের মৌমাছি।

.

পরদিন আরও ভোরে উঠে পড়ল চিকু। পা টিপেটিপে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল বাগানে।

চারদিক মেঘলা, ধোঁয়াটে। আবছা আলোয় বাগানের গাছপালা চোখে পড়ছে। চিকু গোলাপ বাগানের দিকে এগোল। লক্ষ করল, ফোঁটা-ফোঁটা শিশির জমে আছে রঙিন গোলাপের পাপড়ির ওপরে। এই শিশিরের ফোঁটাও কি নকল! ভাবল চিকু। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, গোলাপ বাগানের ভেতরে মাটির ওপরে শুয়ে আছে আলখাল্লা পরা বুড়ো লোকটা। চিকু ঝুঁকে পড়ল নীচু হয়ে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল তার কাছে।

বুড়ো মানুষটার দু-চোখ বোজা। হাঁফাচ্ছে। লাল-নীল তালি মারা আলখাল্লা নিশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে। পুঁটলি আর লাঠি পড়ে রয়েছে পাশেই।

হয়তো কেউ এসেছে টের পেয়েই বুড়ো মানুষটা চোখ খুলল। প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু চিকুকে দেখেই ভয় কেটে গেল। ধবধবে সাদা দাড়ির ফাঁকে মলিন হাসল বুড়ো। ঘড়ঘড়ে স্বরে কোনওরকমে বলল, এসেছ, খোকাবাবু?

সঙ্গে-সঙ্গে কাশির দমক শুরু হল। সাদা মাথাটা কঁকিয়ে উঠল বারবার। চোখ-মুখ লালচে হয়ে গেল।

চিকু বুঝল, মানুষটার খুব কষ্ট হচ্ছে। ও তার বুকে হাত রাখল। কাশি থামলে লোকটা হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। তারপর হাতড়ে পুঁটলিটা টেনে নিল। অতিকষ্টে ভেতর থেকে বের করল একটা পলিথিনের স্বচ্ছ প্যাকেট। তার মধ্যে রয়েছে একটা শুকনো বিবর্ণ ফুল। গোলাপ।

বুড়ো মানুষটা অস্পষ্ট গলায় বলল, সত্যিকারের গোলাপ, খোকাবাবু। কতদিন ধরে আগলে আগলে রেখেছি, আর পারব না। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

চিকুর হাতে তাপ লাগছিল। ও লোকটার চুল সরিয়ে কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

তুমি আমাদের বাড়িতে চলো। বাবা ওষুধ দিলেই তুমি সেরে উঠবে।

চিকুর উদ্বেগে বুড়ো যেন মজা পেল। বলল, কোনও ওষুধেই আমি আর সেরে উঠব না গো। এ-যুগের ওষুধ আমার সইবে না। তা ছাড়া, তোমার বাবা-মা জানতে পারলে আমাকে..নাঃ, থাক খোকাবাবু, খোলা আকাশের নীচেই আমি থাকব।

আবার কাশি। চিকুর খুব খারাপ লাগছিল বুড়ো মানুষটার জন্যে। আজ আর কোনও গল্প শোনা হল না ওর। তবে ওই সত্যিকারের গোলাপটা দেখা গেল। মুগ্ধ চোখে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ ফুলটা দেখছিল চিকু। হাজারটা টাটকা নকল ফুলের চেয়ে একটা শুকিয়ে যাওয়া আসল ফুল অনেক বেশি দামি।

এমন সময় বাবার ডাক শোনা গেল, চিকু! চিকু!

বুড়ো মানুষটা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। শুকনো গোলাপটা বুকের ওপরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে বুকটা উঠছে নামছে।

পরে আবার আসব। বলে চিকু উঠে এল বুড়োর পাশ থেকে। কিন্তু মানুষটার কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

.

রঙিন টেলিভিশনের পরদাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল চিকু। বাবা ওকে বাঁ-হাতে আলতো করে জড়িয়ে রেখেছেন, আর ডানহাতে বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নানান বোতাম টিপছেন। একইসঙ্গে কথা বলছিলেন বাবা।

চিকু, তুমি কি জানো, কেন আমরা নকল গাছপালা, নকল ফুল, নকল পাখি–এসব তৈরি করেছি?

টেলিভিশন-পরদায় বিভিন্ন জটিল অঙ্ক আর নকশা দেখতে-দেখতে চিকু জবাব দিল, জানি বাবা, জানি।

অসুস্থ বুড়ো মানুষটার ছবি ওর চোখের সামনে ভাসছিল।

বাবা নরম গলায় বললেন, অনেক দিন আগে আমার জন্মেরও আগে–নানান কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছিল। সেই বিষাক্ত বাতাসে একে-একে মরতে শুরু করল গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল, পশু-পাখি–এমনকী মানুষও। তখন প্রাণে বাঁচার জন্যে বিজ্ঞানীরা মরিয়া হয়ে পথ খুঁজতে লাগলেন। সারা পৃথিবী জুড়েই চলল বেঁচে থাকার লড়াই। মানুষের সামান্য যা ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে ওই ভয়ংকর দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ করার কোনও পথ ছিল না। ফলে বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, মানুষকেই যেমন করে তোক ওই বিষাক্ত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। চলল বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বেশিরভাগই সদ্যোজাত শিশুদের নিয়ে। কারণ বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন, আগামী দিনের মানুষের যেন দূষিত পরিবেশে কোনওরকম অসুবিধে না হয়। শিশুদের ফুসফুঁসে, শ্বাসনালীতে, নানারকম অস্ত্রোপচার করা হল। দূষিত বাতাসের চেম্বারে রেখে ওদের আচার-আচরণ লক্ষ করা হল। এ ছাড়া আরও কত কী! তারপর একদিন বিজ্ঞানীরা সফল হলেন।

বাবা কয়েকটা বোতাম টিপলেন। একটা মাইক্রোফোনে সাঙ্কেতিক কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন। কম্পিউটার থেকে বেরিয়ে আসা একটা ছাপা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, এইভাবে মানুষ টিকে গেল। আমরা দূষিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম। অবশ্য তখন মানুষের গড় আয়ু অনেক কমে গেল। কারণ পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি খাপ খেয়ে গেলেও মানুষের শরীরের কলকবজাগুলো তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে পড়তে লাগল...।

চিকু বুঝল, কেন ও আগে কখনও বাগানের লোকটার মতো বুড়ো মানুষ দেখেনি। ও ঘুরে বাবার দিকে তাকাল। বাবা কত সহজভাবে শুনিয়ে যাচ্ছেন পুরোনো ইতিহাস। বাগানের বুড়ো লোকটার মতো বাবার চোখে স্বপ্ন নেই, গলা কেঁপে উঠছে না আবেগে। বাবা শুধু বিজ্ঞানের কথা শোনাচ্ছেন, বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কথা শোনাচ্ছেন।

অবশ্য যতই নতুন-নতুন জেনারেশান আসবে গড় আয়ু ধীরে ধীরে ততই বাড়বে। কারণ মানুষ ক্রমশ আরও বেশি করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে পরিবেশের সঙ্গে।

কিন্তু বাবা, গাছপালা, পাখি, এসব...।

ও, হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিলেন বটে, কিন্তু গাছপালা, ফুল-ফল, পাখি, কীটপতঙ্গ, এসব বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। একে-একে সব মরুভূমি হয়ে যেতে লাগল। মুছে যেতে লাগল প্রকৃতির সৌন্দর্য।

চিকু পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া শুকনো গোলাপটার কথা ভাবছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবে মুছে গেছে কে জানে! শুধু স্মৃতি রয়ে গেছে। ও বলল, সেইজন্যেই নকল গাছপালা-পাখি তৈরি করে দিলেন বিজ্ঞানীরা?

হ্যাঁ। না তৈরি করলে আমাদের অসুবিধে হচ্ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য না থাকায় মানুষের মন খারাপ হচ্ছিল, মনটা খিটখিটে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল, ফলে মানুষের কাজ করার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছিল। তাই মনোবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিলেন, মানুষের মন ভালো রাখতে, মনে আনন্দ-ফুর্তি বজায় রাখতে, নকল প্রকৃতি তৈরি করা হোক। নইলে দেশের উন্নতির কোনও আশা নেই। তখন হাজার-হাজার বিজ্ঞানী বছরের পর বছর পরিশ্রম করে তৈরি করলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । পরিবেশ ক্রমশ গাঢ় ঘোলাটে হয়ে ওঠায় সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল সূর্যকে তো আর দেখাই যেত না। তখন বিকল্প হিসেবে তৈরি হল ভাসমান আলোকপিণ্ড। তুমি তো সবই দেখেছ।

বাবাকে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। যেন একটা অচেনা লোক বসে আছে চিকুর সামনে। লোকটা বিষাক্ত বাতাসে দিব্যি শ্বাস নিচ্ছে। প্রকৃতি আসল না নকল তা নিয়ে লোকটার কোনও মাথাব্যথা নেই। শুধু বাইরের চেহারাটা ঠিক থাকলেই সে খুশি। আজ যদি চিকু মানুষ না হয়ে একটা রোবট হত তা হলে বাবার বোধহয় কোনও অসুবিধে হত না। শুধু রোবটের চেহারাটা আসল চিকুর মতো হলেই হল!

বাবা এবার ওকে কাছে টেনে নিলেন। আদরের গলায় বললেন, চিকু, এখন বলো তো, তোমাকে পুরোনো দিনের সমস্ত কথা কে বলেছে? তোমার মা বলছিলেন, তুমি নাকি কারও কাছে ওসব কথা শুনে এসেছ? কে বলেছে তোমাকে?

চিকুর শরীরটা কেমন কাঠ হয়ে গেল। একথার উত্তর দিলেই অসুস্থ বুড়ো লোকটা হয়তো বিপদে পড়বে। কিন্তু কেন? ও পালটা প্রশ্ন করল, বাবা যখন সবকিছু আসল ছিল তখনকার মানুষেরা কেউ বেঁচে নেই?

বাবার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাবা ধীরে-ধীরে বললেন, বেঁচে থাকা উচিত নয়। এই দূষিত পরিবেশে বেঁচে থাকতে তাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু তবুও যে কেউ-কেউ বেঁচে নেই তা নয়। তাদের খুঁজে পেলে বর্তমান সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। তা নইলে তারা পুরোনো দিনের সব গালগল্প শুনিয়ে এখনকার মানুষের মন অকারণে দুর্বল করে তুলবে। সেইজন্যেই তো তোমাকে বলছি, যার কাছে ওসব আজেবাজে কথা শুনেছ সে কে?

চিকু কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, গতকাল সামনের রাস্তায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কথাগুলো আমাকে বলেই ছুটে পালিয়ে গেল।

বাবার সামনে এই প্রথম মিথ্যে বলল চিকু। ওর মনে হল, ভালো কাজের জন্য মিথ্যে বললে কোনও পাপ নেই।

বাবার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। আনমনাভাবে বললেন, হু, ওরা বেছে-বেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই এসব আজগুবি গল্প শোনাচ্ছে।

ডানহাত বাড়িয়ে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় বাবা কতকগুলো বোতাম টিপলেন। কী সব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করলেন মাইক্রোফোনে। তারপর ঠান্ডা গলায় ছেলেকে বললেন, ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। কারও আজেবাজে কথায় কান দিয়ো না।

চিকু থমথমে মুখে অফিস-ঘর ছেড়ে চলে এল। বুড়ো মানুষটা এখন কেমন আছে সে কথা জানতে ওর মন ছটফট করছিল।

.

সারাদিনে আর মা-বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাগানে বেরোতে পারেনি চিকু। সুযোগ এল পরদিন ভোরে।

গোলাপ বাগানে এসেই চিকু যেন একটা ধাক্কা খেল। রঙিন আলখাল্লা পরা শরীরটা টান টান হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে কোনওরকম ওঠানামা নেই। মানুষটার বুকের ওপরে পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া একটা শুকনো গোলাপ আর কয়েকটা মলিন ফটো। দেখামাত্রই জিনিসগুলো চিনতে পারল চিকু। ও ছুটে আরও কাছে এগিয়ে গেল। বুড়ো মানুষটার হাতে হাত

রাখল। কপাল ছুঁয়ে দেখল। বরফের মতো ঠান্ডা। চোখ বোজা। তবু যেন এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে মুখে। সাদা দাড়ি-গোঁফে হিমের ফোঁটা। হিমকণা রয়েছে ফটোগুলোর ওপরে, পলিথিন প্যাকেটের ওপরে। আঁকাবাঁকা লাঠি আর তালি মারা রঙিন পুঁটলি পড়ে আছে একপাশে।

চিকুর গলার ভেতরে ব্যথা করতে লাগল। বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত কষ্ট। বাগানে পাখিরা শিস দিচ্ছিল। মৌমাছি ফুলকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছিল। কতশত রঙের গোলাপ ফুটে রয়েছে বাগানে। কিন্তু সবকিছুর চেয়ে সুন্দর যেন ওই শুকনো গোলাপ আর পুরোনো ফটোগুলো। তা ছাড়া, বুড়ো মানুষটার আলখাল্লার রংবেরঙের তালিগুলো যেন এক-একটা তাজা ফুল। সেই ফুলের বিছানায় ফুটে রয়েছে পুরোনো দিনের আসল প্রকৃতির সজীব ছবি। রাখাল ভোরবেলা যাচ্ছে গরু চরাতে। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে নানা রঙের মেঘ। ছেলেমেয়েরা পার্কে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাগানে রংবেরঙের ফুলের উৎসব। চিত্র-বিচিত্র কত পাখি।

চিকু মানুষটার বুকের ওপর থেকে শুকনো ফুল আর ফটোগুলো তুলে নিল। সেগুলো ছেঁড়া কাগজে জড়িয়ে লুকিয়ে নিল পকেটে। এগুলো ও চোখের মণির মতো আগলে রাখবে। বিষ-বাতাসের সঙ্গে ও লড়াই করবে। ওর বয়েসি সব ছেলেমেয়েদের ডেকে শোনাবে সত্যিকারের দিনগুলোর আশ্চর্য নানান ঘটনা। দেখাবে এই মলিন ছবি আর গোলাপ। তারপর চিকুরা দল বেঁধে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে আসল প্রকৃতিকে। তখন আবার সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাবে সত্যিকারের মৌমাছি। পৃথিবী আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে।

এমনসময় বাবা-মা দুজনের ডাক শুনতে পেল চিকু। ওর নাম ধরে দুজনে ডাকছেন। ও শেষবারের মতো তাকাল বুড়ো মানুষটার দিকে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলল অস্ফুট স্বরে, তোমার জিনিসগুলো আমি নিলাম।

তারপর ছুট লাগাল বাড়ির দিকে। ওর ছোট্ট মনের ভেতরে ধীরে-ধীরে একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাচ্ছে সত্যিকারের মৌমাছি।

# নির্মল বেকারির বাস্তুভূত

**নির্মল বেকারির বাস্তুভূত**

আমি ঘরে ঢুকেই দেখি হরপার্বতী একটা ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে মাথা নেড়ে নেড়ে প্রণাম করছে। আর মুখ দিয়ে চি-চিঁ গোছের পিকিউলিয়ার একটা শব্দ করছে।

হরপার্বতী আমার অনেক বছরের বন্ধু। এ ছাড়া ওর সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক লেনদেনও আছে। ওর নাম নিয়ে একদিন প্রশ্ন করায় ও বলেছিল, সনাতন, আমার নামটা উভলিঙ্গ টাইপের। ছেলে হবে না মেয়ে হবে বুঝতে না পারায় বাবা এইরকম নাম রেখেছিলেন। পুরোনো দিনের ধর্মনিষ্ঠ মানুষ…বুঝতেই তো পারছ…।

হরপার্বতীর বসবার ঘরের এই ফটোটা ভারি রহস্যময়। ওটা কীসের যে ফটো সেটা ঠিকঠাক বোঝাই যায় না। নীচের দিকে কালোমতন কী একটা পড়ে আছে–আর বাকিটা আঁকাবাঁকা ধোঁয়ার রেখায় ভরা।

হরপার্বতীকে বহুবার এই ছবিটার কথা জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও খোলসা করে কিছু বলেনি। শুধু বিড়বিড় করে জবাব দিয়েছে, ওটা একটা রেসপেক্টেব্ল সিচুয়েশানের ছবি।

রেসপেক্টেব্ল সিচুয়েশান মানে?

শ্রদ্ধেয় পরিস্থিতি। অবশ্য শ্রদ্ধেয় মুহূর্তও বলতে পারো। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।

আজ সেই ফটোয় ভক্তিসিঞ্চিত প্রণাম আর তার সঙ্গে কিচিরমিচির করে পাঁচালি পাঠ– নাঃ, ব্যাপারটা লিমিটের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কটকট করে রেগুলেটর ঘুরিয়ে সাবেক আমলের পাখাটাকে জোর করে দিলাম। তারপর একটা চেয়ারে গা এলিয়ে হরপার্বতীর প্রণাম ইত্যাদি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

ঝাড়া সাতমিনিট পর ও চোখ খুলল এবং আমাকে চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখে রীতিমতো চমকে উঠল : কী ব্যাপার, এত সকালে তুমি!

এত সকাল কোথায়! আটটা বেজে গেছে। আর চমকেই বা উঠছ কেন? রেগুলেটর ঘোরানোর শব্দ শোনোনি?

শুনেছি। তবে ভেবেছি আমাদের নিত্যপদ। আমার কষ্ট দেখে ইয়ে…মানে…।

নিত্যপদ ওদের বাড়ির কাজের লোক। তবুও আমি ওর কথায় রাগ করলাম না। বললাম, নিত্যপদকে একটু চায়ের জোগাড় করতে বলো। আর এই চেকটা রাখে–এটা দিতেই সকালবেলা এসেছি। গতকাল দেওয়ার কথা ছিল…আসতে পারিনি।

হরপার্বতী বিব্রত হয়ে বলল, এত তাড়াহুড়োর কী দরকার ছিল…।

চেকটা নিয়ে পাশের একটা টেবিলে রাখল ও। একটা বই চাপা দিল তার ওপরে।

তারপর মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, বলো, কী খবর–।

আগে তুমি বলো, ওই ফটোর ব্যাপারটা কী। যখনই জিগ্যেস করি তুমি অ্যাভয়েড করো। আজ তোমাকে বলতেই হবে। কী তোমার ওই রেসপেক্টে সিচুয়েশান, আর তুমি সেটাকে গদগদ হয়ে প্রণাম করছই বা কেন?

মাথা নিচু করে হাতের নখ খুঁটতে লাগল হরপার্বতী। যেন বিরাট এক ধন্দে পড়েছে। ভাবছে, বলবে কি বলবে না।

আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, বেশ..বলছি। আশা করি এতে আমার ওপরে কোনও অভিশাপ নেমে আসবে না।

হরপার্বতী উঠে বাড়ির ভেতরদিকে গেল। নিত্যপদকে চেঁচিয়ে ডেকে বলল দুকাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে আসতে। তারপর আবার চেয়ারে এসে বসল। পরপর দুবার হাই তুলল। চোখ বুজে মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে ঠোঁট নেড়ে কীসব বিড়বিড় করতে লাগল।

আমি হরপার্বতীর গোল-গোল নাদুসনুদুস চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলাম। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, বুকের কাছে একখাবলা চুল, মাথায় চুল দিয়ে ঘেরা ব-দ্বীপ ধাঁচের ইন্দ্রলুপ্ত, চোখে কার্বন ফ্রেমের চশমা।

হঠাৎই শ্বাস টানার শব্দ করে চোখ খুলল হরপার্বতী। বলল, ঘটনাটা আমাদের ফ্যামিলির অভিশপ্ত পিরিয়ডের। তুমি যেন আর কাউকে বোলো না।

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম। না, কাউকে বলব না।

হরপার্বতী বলতে শুরু করল।

বহুবছর আগের কথা। আমি তখন এইটুকু। কথাটা বলে হাতের আঙুলের কায়দায় যে সাইজ হরপার্বতী দেখাল তাতে মনে হল ছোটবেলায় ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি ছিল।

তুমি তো জানো, আমাদের বাড়ির নাম নির্মল নিকেতন। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল নির্মলশোভা–তার নামেই বাড়ির নাম।

ওর ঠাকুরদার নামটাও দেখছি উভলিঙ্গ টাইপের!

হরপার্বতী বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পারল। বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ, সনাতন, আমার বাবার নামও একই টাইপের ছিল–যামিনীপূর্ণিমা। তো আমাদের বাড়ির নাম নির্মল নিকেতন হলেও পাড়ার লোকে বলত নির্মল বেকারি। প্রথমটায় আড়ালে বলত, পরে রাখঢাক না রেখে সামনেই। কারণ, সেসময়ে আমাদের বাড়ির সব্বাই বেকার ছিল। ঠাকুরদার বয়েস ছিল বাহাত্তর–তার চাকরি বা ব্যাবসা করার কোনও কোশ্চেন ছিল না। তাঁকে বাদ দিয়ে আমার বাবা, কাকা, জ্যাঠা, জেঠতুতো দুই দাদা, খুড়তুতো এক ভাই, আমি, আমার ছোটভাই

সব্বাই বিশুদ্ধ বেকার ছিলাম। ফলে এতবড় দু-মহলা বাড়িটা সারাটা দিন বেকারে-বেকারে কিলবিল করত। আমাদের, মানে ভাইদের, বয়েস ছিল আঠেরো থেকে চব্বিশ। আর বাবা-কাকা-জ্যাঠাদের বয়েস কত হবে–এই বিয়াল্লিশ থেকে বাহান্ন।

বেকার হলে তোমাদের চলত কী করে? আমি প্রশ্নটা করতে না করতেই নিত্যপদ চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিত্যপদর চেহারা সরু, পাকানো–অনেকটা লোহার রডের তৈরি শৌখিন টেব্ল ল্যাম্পের মতো। আর মাথাটা পাঁচশো পাওয়ারের বাব। সেখান থেকে অসংখ্য চুলের গোছা চারিদিকে নেমে এসেছে–মুখটা কোনদিকে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।

আমি হেসে বললাম, নিত্যপদ, তোমার হাতে চায়ের ট্রে না থাকলে বোঝাই মুশকিল হত কোন্টা তোমার সামনের দিক।

নিত্যপদ চুলের আড়ালে হাসল। তারপর চায়ের ট্রে টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

চায়ের কাপে সুড়ুৎ করে চুমুক দিয়ে হরপার্বতী বলল, ঠিক বলেছ, সনাতন–সামনের দিক, পেছনের দিক নিয়ে সবসময় দারুণ প্রবলেম। আমাদের বাড়ির একটা বেড়ালের এই প্রবলেম ছিল। বেড়ালটার নাম ছিল কমলকামিনী। ওটা সবসময় পেছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকেই হাঁটত। মানে, ও ভাবত ও সামনের দিকেই হাঁটছে। তাই হোল লাইফ ধরে ও সামনে এগোল, না পেছোল, আমরা আজও জানি না। একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলল হরপার্বতী। বলল, আর কোনওদিন জানাও যাবে না।

কেন? বিস্কুটে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করি আমি।

বছর চারেক আগে ও সাইকেল ভ্যান চাপা পড়ে মারা গেছে। রাস্তা পার হওয়ার সময় সামনের দিক পেছনের দিক গুলিয়ে ফেলেছিল। ফলে রাস্তা পার হয়ে গিয়েও আবার মাথাটা পেছনদিকে ঘুরিয়ে ব্যাকগিয়ার দিয়ে চলে এসেছে... তারপর যা হওয়ার তাই হয়েছে। নির্মল বেকারিতে আমাদের অবস্থাও তখন দিগভ্রান্ত কমলকামিনীর মতো।

তোমাদের চলত কী করে? চায়ে বড় চুমুক দিয়ে আমি আবার জানতে চাইলাম।

মুখটা কাঁচুমাচু করে হরপার্বতী বলল, জমানো টাকার সামান্য সুদ পাওয়া যেত। আর মাঝেমধ্যে মা-কাকিমা-জেঠিমার সোনাদানা বিক্রি করতে হত। সে খুব করুণ অবস্থা ছিল, ভাই।

ঠাকুরদা দিনরাত পুজো-আচ্চা করতেন আর বলতেন আমাদের বাড়িতে নাকি অভিশাপ লেগেছে। বাবা বলত, কেউ বোধহয় বাণ মেরেছে। কাকা বলত, কুবাতাস লেগেছে। আর জ্যাঠামশাই বলত, সবই নাকি গতজন্মের ফল।

তো আমরা ভাইয়েরা মিলে দিস্তে-দিস্তে চাকরির অ্যাপ্লিকেশান ছাড়ি। জেঠতুতো বোন প্রমীলা আর খুড়তুতো বোন রোমিলা আমাদের সবাইকে উৎসাহ জোগায়। একবার তো বাবা-কাকা-জ্যাঠাকে না জানিয়ে আমরা ভাইবোনের দল অভিশাপ কাটানোর জন্যে ছাদে গোলাপায়রা ধরে বলি দিয়েছিলাম। পায়রাটাকে আচ্ছা করে সিন্টুর মাখানোও হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি।

একইভাবে বেকার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আমাদের এই সাবেকি বাড়ির আনাচেকানাচে আমরা বেকার পুরুষের দল চুপচাপ ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। আর নিজেদের মধ্যে কারও সঙ্গে কারও দেখা হয়ে গেলে ভীষণ লজ্জা করত। মনে হত, দল বেঁধে সবাই সুইসাইড করি।

বোধহয় শেষ পর্যন্ত সেটাই করতাম যদি না এক অ্যাক্সিমেট কাকা তিব্বত থেকে আমাদের বাড়িতে এসে আচমকা হাজির হতেন।

অ্যাপ্রক্সিমেট কাকা মানে? অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল হরপার্বতী। আঙুলের ডগায় আঙুল ঠেকিয়ে ইলিবিলি খেলতে লাগল। তারপর আমার দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে বলল, অ্যাক্সিমেট কাকা মানে হল কাকার মতো। আমাদের বাড়ির গুরুজনরা কেউই তাকে চিনতে পারলেন না। অবশ্য চেনার ব্যাপারটাও বেশ কষ্টকর ছিল। ওঁর সারা মুখে এমন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল যে, যেদিক থেকেই দেখি না কেন রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ লাগে। বাবা-কাকা-জ্যাঠা কেউ ওঁকে চিনতে না পারলেও

উনি কিন্তু দেশের বাড়ির কথা, বাবা-কাকাদের ছেলেবেলার কথা দিব্যি বলছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ওঁকে আমরা কোনওরকম কাকা বলে মেনে নিয়েছিলাম। রোমিলাটা একটু বিজ্ঞানপ্রবণ মেয়ে। ও সেই কাকার নাম দিল পাইকাকা।

পাইকাকা! চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে তুলে আমি শেষ চুমুকটা দিতে যাচ্ছিলাম, ওর পাইকাকা শুনে থমকে গেলাম।

পাইকাকা মানে?

এও জানো না! ব্যঙ্গ করে বলল হরপার্বতী, পাই হল বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক। তবে এর সঠিক মান আজও বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেনি। পাই-এর যেসব মান আমরা ব্যবহার করি সবই অ্যাক্সিমেট। তাই ওই নাম–পাইকাকা।

হরপার্বতী ওর কাহিনি বলে চলল।

.

ছোটবেলায় পাইকাকা ঘরছাড়া হয়ে বিবাগী হয়ে যান। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে-ঘুরতে একসময় পৌঁছে যান তিব্বতে। সেখানে নেপাল আর তিব্বতের জাংশানে কোন এক গুম্ফা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক অদ্ভুত বিষয়ে এম. এ., পিএইচ. ডি. করেন। তার আগে কীভাবে কী করেছেন সেটা ঝাপসা। বাবা সে-ব্যাপারে জিগ্যেস করাতে বললেন, সেসব কি আর মনে আছে গো! নতুন নতুন লেখাপড়ার চাপে পুরোনো লেখাপড়ার হিস্ট্রি কি আর মনে থাকে!

আমাদের বাড়িতে একটা দিন কাটাতে-না-কাটাতেই পাইকাকা এক অদ্ভুত কথা বললেন।

বাবা তখন ভেতরের উঠোনে জলচৌকিতে বসে মশা মারার মতো শব্দ করে তেল মাখছে। ছোট্ট চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে-আঁচড়াতে পাইকাকা সেখানে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, তোমাদের বাড়ির গন্ধটা বড় উৎকট–অনেকটা কলকাতা কর্পোরেশনের মতো। তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই অপদেবতার অভিশাপ আছে।

যেই না একথা বলা, বাবা একেবারে আঁতকে উঠল? তুমি কেমন করে গন্ধ পেলে? কই, আমি তো পাচ্ছি না!

এর জন্যে স্পেশাল নাকের দরকার, বুঝলে!

আমি লক্ষ করে দেখলাম, পাইকাকার নাকটা সত্যিই বেশ প্রকাণ্ড।

পাইকাকা দাড়ি আঁচড়ানো শেষ করে গলাখাঁকারি দিলেন। তারপর অট্টহেসে বললেন, শুধু নাক নয়, প্রশিক্ষণও দরকার। আমি তিব্বতে গিয়ে কাঁপালিকতায় এম. এ. এবং পিএইচ. ডি. করেছি। তার সঙ্গে প্রেত-পিশাচ-অপদেবতা নিয়েও স্টাডি করতে হয়েছে। আমার অনুমান কখনও ভ্রান্ত হতে পারে না। এ-বাড়িতে অপদেবতার উপস্থিতি আছে।

জেঠিমা সেইসময়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। পাইকাকার কথা শুনতে পেয়েই তরকারির বাটি হাতে উঠোনে নেমে এল। তারপর সামনে এসে হাত-পা নেড়ে একেবারে কেঁদে পড়ল। বলল, এ-বাড়ির সব পুরুষগুলো বেকার। ওদের লজ্জাশরম আছে কিনা জানি না, তবে আমাদের তো আছে! তুমি যেভাবেই হোক অপদেবতাটিকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করো। তুমি যা চাও তাই দেব।

বলেই তরকারির বাটিসমেত হাতটা বাড়িয়ে দিল পাইকাকার দিকে।

পাইকাকা ভাবলেন জেঠিমা বোধহয় এখনই একবাটি তরকারি দিতে চাইছে। তাড়াতাড়ি পেছিয়ে গিয়ে বললেন, তরকারি-টরকারি লাগবে না–এমনিই অপদেবতা তাড়িয়ে দেব। আপনারা এই বিপদের কথা আমাকে আগে জানাতে পারতেন–আমি সব সাধনা-টাধনা ফেলে ছুটে আসতাম।

না, ঠাকুরপো, অপদেবতা আছে, তা-ই তো আমরা জানতাম না। তা ছাড়া তোমাকে খবর দিয়ে বিব্রত করে সেই তিব্বত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে আসা…।

পাইকাকা অট্টহেসে বললেন, না, না, সত্যি কি আর আসতাম–ওটা এমনি কথার কথা বললাম।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে উঠোনে ভিড় জমে গেল। মুখরা জেঠিমা সবাইকে সমস্যাটা বোঝাল। জ্যাঠামশাইও জেঠিমার কথায় বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় নেড়ে

গেল। পাইকাকা বললেন, একটাই মোক্ষম উপায় আছে। অপদেবতা বিনাশক যজ্ঞ। পরশুদিন শনিবার, অমাবস্যা। সেদিন সূর্যাস্তের পর যজ্ঞ শুরু হবে।

আমাদের বাড়ির চৌকো উঠোনটার ওপরে–অনেকটা উঁচুতে–জাল লাগানো। সেই জালের ওপর দিন-রাত অসংখ্য গোলাপায়রা ঘুরে বেড়ায়।

এক্সাইটেড হয়ে যজ্ঞের কথা বলতে-বলতে পাইকাকা ওপর দিকে তাকালেন। কয়েকটা গোলাপায়রাকে লক্ষ্য করে পদ্যে বলতে লাগলেন, তব শক্তি মম প্রাণে/ নব-নব বিশ্বাস আনে/তব পবিত্র প্রসাদে আমি প্রীত/তব প্রসাদ মম অমৃত।

পাইকাকা যে কথাগুলো ভগবানকে উদ্দেশ করে বলছেন, সেটা বুঝতে আমাদের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তা ছাড়া পাঁচালি আওড়াতে-আওড়াতে তিনি চোখ বুজেও ফেলেছিলেন– তবে মুখ চলছিল। ফলে আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

একটি দুষ্কৃতী পায়রা নিঃশব্দে প্রসাদ ত্যাগ করল এবং সেটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মেনে সরাসরি ঢুকে গেল পাইকাকার মুখে। ফলে পদ্যের শেষ অমৃত শব্দটা অমৃহ-হো-হো-থু-থুঃ হয়ে দাঁড়াল।

মা কাকিমা-জেঠিমা সব জল আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমরা ভাইবোনেরা অতিকষ্টে দমবন্ধ করে হাসি চেপে আছি। পাইকাকা এতটুকুও বিচলিত না হয়ে বারদুয়েক কুলকুচো করে বললেন, এসব আমার অভ্যেস আছে। তা হলে যজ্ঞ শনিবার দিনই হচ্ছে। আমি ফর্দ লিখে দিচ্ছি।

আমরা বুঝলাম, এইরকম লড়াকু মানুষের হাত থেকে অপদেবতার আর রক্ষে নেই।

পাইকাকার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল বিকেল থেকেই।

সাড়ে তিন কিলোমিটার লম্বা এক ফর্দ তৈরি করে সেটাকে পটপট করে ছিঁড়ে গোটাপাঁচেক ঘুড়ির লেজ তৈরি করে নিলেন। তারপর সেগুলো আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, শনিবার মর্নিং-এর মধ্যে সব চাই। জোগাড়যন্ত্র শেষ করে সন্ধে থেকে কাজ শুরু হবে।

আমরা গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম দশকর্ম ভাণ্ডারের দিকে।

পরদিন পাইকাকা তার কাঁপালিক নাক দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। থার্টি পারসেন্ট ডোবারম্যান, টুয়েন্টি পারসেন্ট অ্যালসেশিয়ান আর ফিফটি পারসেন্ট নেড়ি কুকুরের দক্ষতার মিশ্রণ ঘটিয়ে আমাদের বাড়ির নানান জায়গার গন্ধ শুঁকতে লাগলেন। আমরা সবাই দলবেঁধে তার পেছু পেছু ঘুরতে লাগলাম।

অবশেষে দোতলার একটা কোনার ঘরে ঢুকে পাইকাকা বললেন, হুম! এই ঘরেই অপদেবতাটি আস্তানা গেড়েছে। মহাযজ্ঞ এই ঘরেই হবে।

বাবা বলল, এ-ঘরে আছে বুঝলে কেমন করে?

কাপালিকের অট্টহাসি হাসলেন পাইকাকা, বললেন, কর্পোরেশনের গন্ধটা এই ঘরেই সবচেয়ে উৎকট অনেকটা পাবলিক টয়লেটের মতো। ওসব আমার ওপরে ছেড়ে দাও, দাদা।

জ্যাঠামশাই তিনবার কপালে প্রণাম ঠুকল।

পাইকাকা জ্যাঠামশাইয়ের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, আমাকে প্রণাম করছ কেন, বড়দা? আমি কারও প্রণাম নিই না। এমনকী গুরুজনের প্রণামও নিই না।

রোগাসোগা জ্যাঠামশাই কেমন যেন ভড়কে গিয়ে বলল, না, না, তোমাকে প্রণাম করছি না।

তা হলে কাকে প্রণাম করছ?

ঠ-ঠিক জানি না। আমার ইয়ে, স্ত্রী, ইশারা করে বলল তিনবার প্রণাম ঠুকতে, তাই ঠুকলাম।

ও, স্ত্রৈণ প্রণাম! ঠিক আছে কাল তা হলে এ-ঘরেই যজ্ঞ হবে।

এ-ঘরটায় কেউ থাকে না। অযত্নে প্রচুর ধুলো-ময়লা জমেছে। ঘরের চটা ওঠা সিলিং-এ ঝুলকালি। কড়িবরগায় উই ধরেছে। একটা জানলার পাল্লা কবজা খুলে হেলে পড়েছে। ঘুলঘুলিতে পাখির বাসা।

পাইকাকার নির্দেশে মা কাকিমা-জেঠিমা ঘরটা সাফ করার কাজে লেগে গেল। আর আমরা ভাইবোনেরা জীবনে প্রথম ভূত দেখব এই আনন্দে টগবগ করতে লাগলাম।

.

পরদিন সন্ধে সাড়ে ছটায় অপদেবতা বিনাশক মহাযজ্ঞ শুরু হল।

হোমাগ্নিতে কী যেন সব ফোড়ন দিলেন পাইকাকা–সে একেবারে শুকনো লঙ্কা তেজপাতা পাঁচফোড়নের বাবা।

ধোঁয়ায় ঘর ভরতি হয়ে গেল। যজ্ঞের আগুন থেকে চড়বড়-চড়বড় শব্দ হতে লাগল। আর আমরা শুরু করে দিলাম হাঁচির লড়াই।

পাইকাকা তখন হুঙ্কার দিয়ে কীসব মন্ত্র পড়ছেন। ভাষা তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি । শুধু বুঝতে পারছি, মন্ত্রের মধ্যে ঘন-ঘন খণ্ড ৩, অনুস্বার, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দু রয়েছে।

পাইকাকার পরনে ঘোর লাল রঙের চাদর। কপালে লাল টিপ। দাড়ি-গোঁফওয়ালা জঙ্গুলে মুখে কাপালিকের মতো এক্সপ্রেশান–যদিও এক্সপ্রেশানটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যজ্ঞের আগুন ঘিরে গুরুজনরা শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁদের শরীরের ফাঁকফোকর দিয়ে আমরা উঁকি মারছি। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে। চোখ বেশ জ্বালা করছে।

কাকিমা আলতো করে মায়ের কানে কানে বলল, খুব কড়া তিব্বতি মশলা, মেজদি। খানিকটা চেয়ে রেখে দিলে হয়–দারুণ ঝুঁজালো রান্না হবে।

মা বলল, খবরদার না। এটা ভূতের মশলা। এখন ভূতের চচ্চড়ি রান্না হচ্ছে।

জেঠিমা ধোঁয়ার ঝাঁজে নাজেহাল হয়ে চোখের জল মুছে বলল, না ভাই, ভূত বলে অভক্তি কোরো না। ভূত আছে বলেই না তাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছ।

প্রমীলা হঠাৎই ফোড়ন কাটল, ভূত কি পাকা তাল যে, ধোঁয়ার ঠেলায় হঠাৎ করে বোঁটা ছিঁড়ে খসে পড়বে!

প্রমীলার কথা শেষ হতে-না-হতেই চিঁ-চিঁ স্বরে এক মিহি চিৎকার শোনা গেল? খসে পড়েছি, মা জননী, খসে পড়েছি!

কে চিৎকার করল? কাকা ধোঁয়ার মধ্যেই চারপাশে নজর চালাতে চেষ্টা করল।

আমি গো আমি! তোমাদের চামচিকে ভূত।

আর যায় কোথায়! পাইকাকা খলখল করে অট্টহাসি হেসে দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, নিস্তারং অসম্ভবৎ মম তীব্রং যজ্ঞঃ হতে। বল, কে তুই?

পাইকাকা প্রশ্নটা করলেন বটে, কিন্তু যাকে কোশ্চেন করলেন, তাকে তখনও খুঁজে চলেছেন। আবার হুঙ্কার দিয়ে জানতে চাইলেন, ধূম্রজালং মহামিত্র, কুত্র তুই, কুত্র কুত্র?

এই তো! যজ্ঞের বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে।

একটা তালপাতার পাখা নিয়ে পাইকাকা জোরে-জোরে বাতাস করতেই ধোঁয়া খানিকটা ফিকে হল। কয়েকটা থানইট দিয়ে হোমের আগুনটা ঘেরা ছিল। ভালো করে চেয়ে দেখি তার ঠিক পাশে পাইকাকার ডানদিকে–একটা চারইঞ্চি লম্বা চামচিকে চিত হয়ে পড়ে আছে। তার কালো বডি ঘিরে ধোঁয়ার রেখা ঘুরপাক খাচ্ছে। আর মুখ থেকেও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

তাই দেখে পাইকাকা বেজায় রেগে গিয়ে বললেন, তুই সিগারেট খাচ্ছিলি? এখনও মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে! এত বড় আস্পর্ধা!

না, না–সিগারেটের ধোঁয়া নয়। কাতর গলায় চামচিকেটা বলল, ওটা আমার প্রাণবায়ু ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু করে দিলাম। চামচিকে ভূত দেখা তো দূর অস্ত্র আমরা কখনও গল্পেও পড়িনি।

পাইকাকা যজ্ঞের আগুনে আর-একদফা তিব্বতি ফোড়ন ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, বল, কে তুই?

আ-আমি বাস্তুভূত।

বাস্তুভূত মানে?

আমি বহুবছর ধরে এ-বাড়িতে আছি–মানে, ছিলাম। বেশ কয়েকবার আমাকে বডি পালটাতে হয়েছে। এর আগে ছিলাম তোমাদের বেড়াল কমলকামিনীর বডিতে। তাই ওর কিছু কিছু ব্যাপার বেড়াল-বেড়াল ছিল না। ও সাইকেল ভ্যানের তলায় ইহলীলা সাঙ্গ করতেই আমি ফ্রি হয়ে যাই। তারপর একটা চঞ্চল চামচিকের খোলে শেলটার নিয়ে ওপরের ওই ঘুলঘুলিতে আস্তানা গেড়েছিলাম। ওই এক স্কোয়ারফুট ফ্ল্যাটে আমি দিব্যি ছিলাম। তারপর ওই তিব্বতি মশলার ঝুঁজে খসে পড়লাম।

তোর অভিশাপে এ-বাড়ির সব কটা পুরুষ বেকার। তোকে এ-বাড়ি ছেড়ে বিদায় নিতে হবে।

চিঁ-চিঁ করে জবাব ভেসে এল । আমার অভিশাপে নয়, তোমাদের এক ফোরফাদারের অভিশাপে। সেই ফোরফাদারের সঙ্গে আমার এক ফোরফাদারের ফ্রেন্ডশিপ ছিল। তাই আমি চলে যাওয়ার আগে সে-অভিশাপ খণ্ডন করে যাব।

তুই তো আবার কার-না-কার দেহে আশ্রয় নিবি–তখন? এ চলে যাওয়ার মানে কী?

না, না–আর কোথাও আমি শেলটার নেব না। ভূতের লাইফে আমার আর ইন্টারেস্ট নেই। চার-চারবার আমি বডি পালটেছি। ফলে ভূত থেকে ভূতের বর্গমূল, ঘনমূল হয়ে আমি এখন চৌকোমূল।

আমার খুড়তুতো ভাই ছোটন আমাকে জিগ্যেস করল, অ্যাই দাদাভাই, চৌকোমূল মানে কি ফোর্থ রুট?

হতে পারে। এখন অঙ্কের কথা তুলে বিরক্ত করিস না। যা হচ্ছে দেখে যা।

পাইকাকা এক জটিল ভাষায় হিংস্র চিৎকার করে আবার খানিকটা তিব্বতি মশলা ছুঁড়ে দিলেন হোমের আগুনে।

চামচিকে ভূত প্রাণান্তকর চিৎকার করে উঠল। তারপর ব্যস্তভাবে বলে উঠল, বলছি, বলছি– সব বলছি। বারবার এইরকম ভূতের ভূত, তার ভূত হতে আমার ইচ্ছে করে না। একদিন হয়তো আমার আর মনেই পড়বে না ওরিজিন্যালি আমি কী টাইপের ভূত ছিলাম। যাক, তোমাদের সমস্যার সমাধানের কথা বলি। তোমাদের বাড়িটাকে পাড়ার লোক যে নামে ডাকে সবাই বিশুদ্ধ বেকার বলে নির্মল বেকারি –সেই নামের মধ্যেই তোমাদের প্রবলেমের সলিউশান লুকিয়ে আছে। তোমরা বেকারি খোলো। কেক-পাঁউরুটি তৈরি করো–দেখবে তোমাদের লাউডগার মতো নেতিয়ে পড়া ফ্যামিলি লাউডগা সাপের মতো তেজীয়ান হয়ে উঠবে।

আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। এই সহজ ব্যাপারটা এতদিন আমাদের মাথায় আসেনি! শেষকালে এই বুদ্ধি নিতে হল একটা চামচিকের কাছে!

আমার কাজ শেষ। সময়ও হাতে বেশি নেই। তোমরা আমাকে একটা পটল এনে দিতে পারো? চামচিকেটা অনুরোধ করল।

পটল! আমরা ঠিক শুনছি তো?

এই রিকোয়েস্টে পাইকাকাও কেমন ভেবড়ে গেলেন। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ওর শেষ ইচ্ছে বাধা দিয়ো না। বড়বউদি, মেজবউদি– তোমরা একটা পটল এনে দাও।

তখন এ ওকে ফরমাশ করে, আর ও তাকে। এই জমজমাট সিন ছেড়ে কেউই নড়তে চায় না। শেষ পর্যন্ত বয়েসে ছোট হওয়ায় দায় বর্তাল রোমিলার ঘাড়ে। ও আদেশ পেয়েই ছুট লাগাল রান্নাঘরের দিকে।

রোমিলা পটল নিয়ে আসতে-না-আসতেই পাইকাকা বাবাকে লক্ষ করে বললেন, মেজদা, একটা ক্যামেরা নিয়ে এসো। লাস্ট মোমেন্টটার ছবি তুলে রাখবে।

বাবা আমাকে বলল, আগফা কোম্পানির বক্স ক্যামেরাটা নিয়ে আসতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি ক্যামেরাটা নিয়ে ফিরে এলাম।

চামচিকেটা বেশ ক্ষীণ গলায় বলল, পটলটা আমার পাশে রাখো।

পাইকাকা পটলটা রোমিলার হাত থেকে নিয়ে চামচিকেটার পাশে রাখলেন। লক্ষ করে দেখি ওটার মুখ দিয়ে বেশ ভালোমতন ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

যজ্ঞের আগুনে মশলাপাতি ছুঁড়ে দিয়ে পাইকাকা হুঙ্কার দিয়ে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। ঘরের ধোঁয়া বাড়তে লাগল।

হঠাৎ তিনি আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তোল!

সঙ্গে-সঙ্গে চামচিকেটার দিকে ক্যামেরা তাক করে আমি শাটার টিপলাম। আর সেই মুহূর্তে চামচিকেটাও অদ্ভুত কায়দায় ওর পাশে রাখা পটলটা বুকে তুলে নিয়ে কোলবালিশের মতো আঁকড়ে রইল।

জেঠিমা তিব্বতি ঝাঁজে সজল হয়ে ওঠা চোখ মুছে বলল, এতক্ষণে বেচারা পটল তুলল। ওইজন্যেই ও পটলটা চেয়েছিল। দ্যাখো, ওর মুখ দিয়ে আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে না।

পুঁচকে প্রাণীটার নড়াচড়া স্থির হয়ে গিয়েছিল। অপদেবতার বিনাশে কোথায় আমরা খুশি হব, তার বদলে কেমন যেন মুষড়ে পড়লাম।

আরও মিনিট দশেক পর পাইকাকার যজ্ঞ শেষ হল। সে-রাত্তিরটা আমাদের বাড়িতে থেকে পরদিনই তিনি আবার নিরুদ্দেশের পথে রওনা হয়ে গেলেন। হয়তো তিব্বতের দিকেই চলে গেলেন…কে জানে!

.

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল হরপার্বতী। তারপর বলল, এটা সেই রেসপেক্টেব্ল সিচুয়েশানের ছবি, সনাতন–যদিও প্রচুর ধোঁয়া থাকায় ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের আজকের রমরমা ব্যবসার গোড়াপত্তন হয়েছিল এইভাবে। তাই এই ছবিকে প্রণাম করে আমি দিন শুরু করি।

ওর ভাবগদগদ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে ঠিক করলাম, আজ থেকে চামচিকেকে আর অবহেলা করব না। কারণ, আমার বেকারির ব্যবসাও বড় করতে হবে।

# ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে

**ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে**

চলমান ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে ফানল্যান্ড-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল স্নিগ্ধপ্রভাত। এই এলাকায় ফানল্যান্ড সাইবার ক্যাসিনোর জুড়ি নেই। ইন্টারনেটে হরেকরকম জুয়াখেলার ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই আছে হালকা-চড়া নেশার ব্যাপক আয়োজন।

পকেট থেকে একটা লাভ মি টফি বের করে মুখে পুরে দিল স্নিগ্ধপ্রভাত। এই টফিটায় ঝিমঝিমে নেশা হয়। আসল নেশার আগে এটা গৌরচন্দ্রিকার কাজ করে। যার ফলে খুব অল্পদিনেই এই টফিটা বাজার মাত করে দিয়েছে।

লাভ মি-র দৌলতে স্নিগ্ধপ্রভাতের মুখের ভেতরটা ঠান্ডা আর মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর মাথার ভেতরটা হালকা উলের বলের মতো লাগছিল। ও মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশে অনেকগুলো আলোর বিন্দু উল্কার মতো ছুটোছুটি করছিল। ওগুলো ফ্লোট্যাক্সি। হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বেলে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আকাশপথে ছুটে যাচ্ছে। হেডলাইটের আভা কালো আকাশে সোনার তরোয়াল বলে মনে হচ্ছিল।

সোনা থেকেই স্বর্ণদ্যুতির কথা মনে পড়ে গেল। স্বর্ণদা। কতদিন স্বর্ণার সঙ্গে দেখা নেই! প্রায় পাঁচবছর। কিন্তু ইদানীং রোজই কোনও-না-কোনও ছলছুতোয় স্বর্ণদ্যুতির কথা স্নিগ্ধপ্রভাতের মনে পড়ে যায়। বছর ছ-সাত আগে ওই মাতাল মানুষটা যা-যা বলেছিল সেগুলো কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় স্নিগ্ধপ্রভাতের জীবনে সত্যি হতে শুরু করেছে।

সেসময়ে স্নিগ্ধপ্রভাত বি-ইলেভেন সিটিতে ছিল। মনের সুখে চাকরি করত আর জীবনটাকে দু-হাতে লোফালুফি করত। সন্ধে হলেই সাইবার ক্যাসিনো। নেশার ট্যাবলেট, মদ, ইন্টারনেট জুয়া, আর হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজ।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। এখন সেইসব দিনের কথা মনে পড়লেই ডানা ঝাপটাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওই ইচ্ছে পর্যন্তই। এখন স্নিগ্ধপ্রভাতের ডানা ভারী হয়ে গেছে।

স্বর্ণদ্যুতি ওর চেয়ে অন্তত দশবছরের বড়। কিন্তু সাইবার ক্যাসিনোর আলাপ হওয়ার পরই কেমন করে যেন আলাপটা খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতার দিকে বাঁক নিয়েছিল। স্বর্ণদ্যুতি রাতারাতি স্বর্ণদা হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে ক্যাসিনো-ট্যাসিনোয় আলাপ-টালাপ হলে নাকি এইরকমই হয়।

স্বর্ণদ্যুতিকে সবসময় কেমন মনমরা দেখাত। নেশা করতে করতে বিড়বিড় করে বলত, লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং শ্যাডো…।

স্বর্ণদ্যুতি বিয়ে করেছে প্রায় পঁচিশ বছর। তাই নানারকম আবেগের উথালপাতাল বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন বোধহয় অবশেষটুকু আঁকড়ে ধরে ও বেঁচে আছে।

একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচতে স্বর্ণদ্যুতি জুয়াড়ি হয়েছে। আর স্নিগ্ধপ্রভাত চিরকাল একা থাকবে, স্বাধীন থাকবে, খামখেয়ালি জীবন কাটাবে–এই উদ্দাম ভাবনা থেকে জুয়ার নেশায় জড়িয়েছে।

স্বর্ণদ্যুতি প্রায়ই বলত, তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে একদিন নিয়ে যাব। অথচ নিয়ে যেত না।

শহরের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার এলাকায় স্বর্ণদ্যুতির ফ্ল্যাট। স্নিগ্ধপ্রভাতের সে-ফ্ল্যাট দেখার কৌতূহলও ছিল। সুতরাং ও অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ মনে পড়ে, একদিন একফেঁটা হুইস্কি কনসেনট্রেট খেয়ে স্বর্ণদ্যুতির বেশ টালমাটাল অবস্থা–তখন হঠাৎই ও স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত ধরে টান মেরেছে চলো, আজ তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাব। আজই সুবিধে…।

কীসের সুবিধে কে জানে! স্নিগ্ধপ্রভাত আর আপত্তি করেনি।

সাইবার ক্যাসিনো থেকে ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

পকেট থেকে ছোট্ট রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে সিগন্যাল দিল স্বর্ণদ্যুতি। একটা ফ্লোটাক্সি কোথা থেকে এসে ঝুপ করে নেমে পড়ল ওদের পায়ের কাছে।

গাড়িতে উঠে স্বর্ণদ্যুতি ফ্ল্যাটের কো-অর্ডিনেট বলল। ফ্লোটাক্সিটা আবার ভেসে পড়ল আকাশে।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই স্বর্ণদ্যুতি জড়ানো গলায় বলল, এই হল আমার ফ্ল্যাট।

স্নিগ্ধপ্রভাত মুগ্ধ হয়ে ফ্ল্যাটটা দেখছিল।

স্বর্ণদ্যুতি বড়লোক ও জানত–তবে এরকম জঘন্য বড়লোক সেটা আগে বুঝতে পারেনি।

স্বর্ণদ্যুতির এক ছেলে, এক মেয়ে। বয়েস বাইশ আর উনিশ। ওর কাছেই শুনেছিল ছেলেমেয়ে দুজনেই খুব চৌকশ। এখন ওরা পড়াশোনা করছে। তবে ভবিষ্যতের ভাবনা-চিন্তা ওরা আগেভাগেই সব ছকে রেখেছে।

সাইবার ক্যাসিনোয় বসে কম্পিউটারের পরদার দিকে আনমনে তাকিয়ে স্বর্ণদ্যুতি বলেছিল, বুঝলে, আমার ওয়াইফ রত্নমঞ্জুষা বলে ওরও একটা ফিউচার আছে। তেতো হাসল স্বর্ণদ্যুতি ও ওদের তিনজনেরই ফিউচার আছে। আমার নেই। আমার শুধু পাস্ট। এইভাবেই কোনদিন পাস্ট টেন্স হয়ে যাব। নাকি শালা এর মধ্যেই হয়ে গেছি!

চোখধাঁধানো ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণদ্যুতির কথাগুলো ভাবছিল স্নিগ্ধপ্রভাত।

বসবার ঘরে ঢুকে স্বর্ণদ্যুতি বলল, এখন ওরা কেউ নেই। ওরা যার-যার দারুণ সব জরুরি কাজে বেরিয়েছে। সব পাখি রাতে ফ্ল্যাটে ফিরবে। সেইজন্যেই তোমাকে এ সময়ে নিয়ে এসেছি।

স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হলেও কিছু বলল না। ভাবছিল, আজ কি সাইবার-বার-এ বসে স্বর্ণদ্যুতি একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে।

এবার তোমাকে একটা টপ সিক্রেট খবর দিই।

কী, স্বর্ণদা?

এই ফ্ল্যাটের ভেতরে আরও চারটে ফ্ল্যাট আছে।

মানে! স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হয়ে ফ্ল্যাটের চারপাশে তাকায়। অন্যান্য ঘরের দরজার দিকে দ্যাখে।

হ্যাঁ, চারটে ফ্ল্যাট।

স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত ধরে টানতে টানতে একটা ঘরের দরজার কাছে নিয়ে যায় স্বর্ণদ্যুতি।

এ-ঘরটায় আমার ছেলে থাকে। এটা একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।

সামান্য ভুলভাল পা ফেলে স্বর্ণদ্যুতি আর-একটা ঘরের দরজার গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, এ-ঘরটায় আমার মেয়ে থাকে। এটা একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।

তারপর স্বর্ণদ্যুতি এগিয়ে গেল সবচেয়ে বড় ঘরটার দিকে। মাতাল আঙুলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে স্নিগ্ধপ্রভাতকেও টেনে নিয়ে চলল।

ঘরের দরজায় এসে কেমন করে যেন হাসল স্বর্ণদ্যুতি। ডাল বেড খাটের দিকে আঙুল তুলে জড়ানো ভাঙা গলায় বলল, ওই খাটটায় দুটো ওয়ান রুম ফ্ল্যাট আছে। রোজ রাতে দুটো ফ্ল্যাট চুপচাপ পাশাপাশি শুয়ে থাকে–আমি আর রত্নমঞ্জু।

স্নিগ্ধপ্রভাতকে টেনে এনে ড্রইংরুমের সোফায় বসাল স্বর্ণদ্যুতি। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওর দীর্ঘ শরীরটা সামান্য এপাশ-ওপাশ দুলছিল।

ফ্ল্যাট বাড়ির ডিফারেন্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে রিলেশানটা কেমন হয় জানো?

মোটামুটি জানলেও স্নিগ্ধপ্রভাত চুপ করে রইল। কারণ, স্বর্ণদ্যুতি এখন বলতে চাইছে– হয়তো নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

আমাদের মধ্যে রিলেশানটা এখন সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমরা যেন এক-একটা ফ্ল্যাট। পাশাপাশি আছি অথচ মাঝে মরুভূমির মতো বিস্তর ফাঁক। মানে, ধরো একটা মুক্তোর মালা– কিন্তু পাশাপাশি বসানো পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে যে-সুতোটা যায়, সেটাই নেই। বাইরে থেকে দেখে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না। মনে হবে মুক্তোর মালাটা ঠিকঠাকই আছে। তাই আমরা এখন ফ্ল্যাট…নাকি ত্রিশঙ্কু মুক্তো?..কে জানে!

শেষদিকটায় স্বর্ণদ্যুতির গলা আবেগে ধরে গিয়েছিল। তারপর আচমকা ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাতের পায়ের কাছে। ওর কোলে মাথা রেখে কান্না-জড়ানো গলায় বলতে লাগল, সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে রে, সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে…।

শেষদিকে ওর কথা জড়িয়ে গেল। স্নিগ্ধপ্রভাতকে আঁকড়ে ধরে ও বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ওকে কী বিপন্ন, কী অসহায় লাগছিল!

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

ফুটপাথ ফানল্যান্ডের কাছে এসে পড়তেই নেমে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাত। কাচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের সিটিজেন কোড বলার সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

ফানল্যান্ডের ভেতরটা খুব ঠান্ডা আর চুপচাপ। শুধু হালকা মিউজিকের শব্দতরঙ্গ কোমলভাবে খেলে বেড়াচ্ছে।

সেন্টার স্টেজে হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজ চলছিল। দুটো মেয়ে অথবা মেয়ের ছায়া শরীর বেঁকিয়েচুরিয়ে এমনভাবে নাচছিল যেন ওরা রবারের তৈরি।

হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজের সুবিধে হচ্ছে উত্তেজিত দর্শক হামলে পড়ে নাচিয়েদের বিরক্ত করতে পারে না। ফলে হইচই গোলমালের কোনও ভয় নেই।

একটা টেবিলে বসে হুইস্কির অর্ডার দিল স্নিগ্ধপ্রভাত। আর তাতে প্রথম চুমুক দিতেই সুপর্ণলতিকার কথা মনে পড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা কেমন বিস্বাদ ঠেকল।

স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে সুপর্ণলতিকার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে।

গ্লাসে আবার চুমুক দিল স্নিগ্ধপ্রভাত।

ও যখন সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করে তখন স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ ছিল না। মোটামুটি চুপচাপই বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। শহরের সেন্ট্রাল ডেটা ব্যাঙ্কে যখন ওদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশানটা স্টোর হয় তখনই একটা নিয়ম ওদের বেঁধে ফ্যালে : অন্তত আট বছরের জন্যে ওদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে হবে।

গত শতকে আকছার ডিভোর্সের ব্যাপারটা এত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সরকার নতুন ম্যারেজ অ্যাক্ট চালু করতে বাধ্য হয়। সেসময়ে গড়ে এক-একজন নাগরিকের বিয়ের সংখ্যা ৩.৪ এ পৌঁছে গিয়েছিল। এত ডিভোর্স আর বিয়ের রেকর্ড রাখতে গিয়ে সরকারি দপ্তরের কাজের পরিমাণ যেমন বেড়েছিল, তেমনই বেড়েছিল হরেকরকম মামলা-মোকদ্দমা। এ ছাড়া সেন্ট্রাল ডেটা ব্যাঙ্কের মেমোরিও লাগছিল প্রচুর।

সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করার সময় আট বছরের নিয়মটা আটশো বছরের হলেও স্নিগ্ধপ্রভাতের কোনওরকম আপত্তি ছিল না। তীব্র ভালোবেসে ও সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করেছিল। ওকে ভালোবেসে স্নিগ্ধপ্রভাত বুঝতে পেরেছিল, এই ভয়ংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও ভালোবাসার ব্যাপারটা একইরকম রয়ে গেছে। এই প্রবল টানকে বিজ্ঞান এখনও ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলোকেও স্নিগ্ধপ্রভাত ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বিয়ের দু-আড়াই বছর উদ্দাম মাতামাতির পর সবকিছু কেমন ধীরে-ধীরে বদলে গেল। বিকেল থেকে আকাশের রং পালটে ধীরে-ধীরে যেমন গোধূলি এবং সন্ধে হয়, ব্যাপারটা অনেকটা যেন সেইরকম।

তার পরের কয়েকটা বছরে একটা টাটকা ছটফটে মাছ ডিপ ফ্রিজের ভেতরে ঠান্ডা হিম হয়ে গেল। আর এখনও তাই।

কেন, কে জানে!

সুপর্ণলতিকা কি বড্ড বেশি কথা বলে? সবসময় কি ওর ঠোঁট নড়ে?

ঠোঁট। এই ঠোঁটের জন্য একদিন স্নিগ্ধপ্রভাতের ঠোঁট পাগল ছিল। কিন্তু দু-আড়াই বছরের মধ্যেই সে-পাগলামি স্তিমিত হয়ে গেছে। এখন ওর মনে হয় ধীরে-ধীরে ও আর সুপর্ণলতিকা দুটো ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। রাতে সেই দুটো ফ্ল্যাট পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকে। যেমন করে শুয়ে থাকত স্বর্ণদ্যুতি আর রত্নমঞ্জু।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

নিভে যাওয়া সম্পর্ককে কি আবার দপ করে জ্বেলে দিতে পারে বিজ্ঞান? বোধহয় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার শরীরে আগুন ধরাতে পারে–মনে নয়।

একজন হলোগ্রাম-স্ট্রিপার নাচতে নাচতে স্টেজ থেকে নেমে এসেছিল। মেয়েটা যেমন খুশি টেবিল-চেয়ার-মানুষকে ভেদ করে নাচের ভঙ্গিতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। একজন বেসামাল খদ্দের ওকে জাপটে ধরতে গিয়ে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

মেয়েটা যখন সিগ্ধপ্রভাতকে ভেদ করে চলে গেল তখন ও যেন সামান্য উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। মনটা ক্ষণিকের জন্য চনমনে হয়ে উঠল।

আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল জীবন কত ক্লান্তিকর, কত দীর্ঘ।

রাতে বাড়ি ফেরার সময় স্নিগ্ধপ্রভাত ভাবতে চেষ্টা করছিল ফানল্যান্ডটাই যেন ওর বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও সুপর্ণলতিকা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবনাটা তেমন জমছিল না।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে ও সুপর্ণলতিকার মুখোমুখি হল।

সুপর্ণলতিকা কোনও কথা বলল না। ঠান্ডা চোখে স্বামীর দিকে একপলক তাকিয়ে পামটপ কম্পিউটারে সেলাইয়ের গ্রাফিক্স দেখতে লাগল।

স্নিগ্ধপ্রভাত স্ত্রীকে দেখছিল।

সেই একইরকম মনোরম সৌন্দর্য মাখানো মুখ। সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি সেখানে। অথচ স্নিগ্ধপ্রভাত পলকের জন্যও কোনও টান অনুভব করল না।

ওর ভেতরে-ভেতরে কান্না পাচ্ছিল। রোজই এমন কান্না পায়।

একটা ঠান্ডা সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটানো যায় না কিছুতেই। অথচ ও চেষ্টা করেও ভেতর থেকে কোনও উষ্ণতা খুঁজে পায় না। ওর ভালোবাসা নির্ঘাত মরে গেছে। আর সেই মৃত শিশুটিকে কোলে নিয়ে ও বোকার মতো বোতল থেকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করছে।

স্নিগ্ধপ্রভাতের নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল। সুপর্ণলতিকার টান ও টের পায়। অথচ সেই টানের উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা ওর নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাত। ভাবতে চেষ্টা করল, ঠিক কবে থেকে ওরা ফ্ল্যাটে বদলে যেতে শুরু করেছে।

চোখ বুজে ডানহাত এলিয়ে দিল চোখের ওপরে।

ইশ, কোনও ম্যাজিশিয়ান যদি পারত ওর ফুরিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিতে!

.

মাথার ভেতরে কেমন যেন দপদপ করছিল। কেউ যেন সেখানে পুঁচকে একটা হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠুক করে পেরেক ঠুকছিল। স্নিগ্ধপ্রভাতের মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন গোলাপের গন্ধ ওর নাকে এসে ঢুকছিল–এবং ওর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

দুটো ইচ্ছের লড়াই চলতে-চলতে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

সম্পূর্ণ অচেনা একটা ঘরে অচেনা একটা বিছানায় জেগে উঠল স্নিগ্ধপ্রভাত।

অবাক চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই রক্তের মতো টুকটুকে লাল একগুচ্ছ গোলাপ ওর নজরে পড়ল। বিছানার পাশেই স্বচ্ছ টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ ফুলদানি। বোধহয় অ্যাক্রিলিকের তৈরি। ফুলদানির ওপরটা গোলাপের পাপড়িতে ঢাকা।

ওঃ..আপনার ঘুম ভেঙেছে!

গোলাপের দিক থেকে চোখ তুলল স্নিগ্ধপ্রভাত। চোখ পড়ল আর-এক গোলাপের দিকে।

সুন্দর লম্বাটে মুখ। ফরসা কপালে উজ্জ্বল টিপ। পরনে হালকা গোলাপি শাড়ি। পাতলা ঠোঁটে একচিলতে দুষ্টুমির হাসি। সেইসঙ্গে আবছা পারফিউমের ঘ্রাণ যেন টের পেল স্নিগ্ধপ্রভাত।

আমি কোথায়? প্রশ্নটা ওর নিজের কানেই কেমন বোকা-বোকা শোনাল।

কোথায় আবার! আমার ফ্ল্যাটে! কী সহজ স্বাভাবিক উত্তর দিল তরুণী!

আপনি কে?

খিলখিল করে হেসে উঠল। স্নিগ্ধপ্রভাতের শরীরের ভেতর দিয়ে ঝরনা বয়ে গেল।

আমার নাম অঙ্গলাবণি।

নামটা ঝংকার তুলল কানে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল ঠোঁটে। উচ্চারণ না করে স্নিগ্ধপ্রভাত সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল অঙ্গলাবণির মুখে।

এখানে ও কেমন করে এল!

জটপাকানো স্মৃতি হাতড়ে এই রহস্যের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করল।

ঝাপসাভাবে যেটুকু ও মনে করতে পারল সেটা হল, কাল রাতে ও ফানল্যান্ডে ছিল। ছোট ছোট চুমুকে হুইস্কি খাচ্ছিল আর হলোগ্রাফিক ক্যাবারে দেখছিল। একটি রোগা মেয়ে সাপের মতো শরীরটা খেলিয়ে সিলিকোন-যৌবনের নগ্ন হাতছানি দিয়ে নাচছিল।

স্নিগ্ধপ্রভাত যখন পুরো বুঁদ হয়ে গেছে ঠিক তখনই একজন অচেনা লোক ওকে ডেকে নিয়ে গেছে ক্যাসিনোর বাইরে। বলেছে, কে একজন যেন একটা ইমার্জেন্সি খবর এনেছে মিগ্ধপ্রভাতের জন্য।

বাইরে বেরিয়ে একটা আলো-আঁধারি জায়গায় ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকটা হঠাৎই স্নিগ্ধপ্রভাতের নাক লক্ষ্য করে ফুঁ দিয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র কটু গন্ধ স্নিগ্ধপ্রভাতের নাকে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

আমি এখানে কেমন করে এলাম? অনেকক্ষণ পর ভেতরের প্রশ্নটা বাইরে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় আপনি সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলেন। আমি তুলে নিয়ে এসেছি। আপনার পকেটের জিনিসপত্র সব ওই টেবিলটার ড্রয়ারে আছে।

আঙুল তুলে একটা টেবিলের দিকে দেখাল অঙ্গলাবণি। তার পাশেই একটা ভোলা জানলা। তার কাচের শার্সিতে ভোরের রোদ। আর জানলার বাইরে কঁকড়া গাছে দুটো বুলবুলি। অকারণেই ডাকছে।

বুলবুলি দুটোকে কেমন যেন চেনা মনে হল।

কোথায় পড়ে ছিলাম আমি?

চার নম্বর সুপারওয়ের ওপরে।ফানল্যান্ড সাইবার ক্যাসিনোর পাশের একটা অন্ধকার জায়গায়...।

একটু সময় নিল স্নিগ্ধপ্রভাত। তারপর আলতো গলায় কাল রাতের ব্যাপারটা যেটুকু মনে ছিল বলল।

আপনি খুব জোর বেঁচে গেছেন। এই কায়দায় লুঠপাট করাটা এখন ভীষণ বেড়ে গেছে।

আপনার জন্যেই বেঁচে গেছি..। কৃতজ্ঞতার সুরে বলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

হাসল অঙ্গলাবণি। কিছু বলল না। আয়ত চোখ মেলে স্নিগ্ধপ্রভাতকে দেখতে লাগল।

আপনি ছাড়া এ-ফ্ল্যাটে আর কে-কে থাকে?

আবার হাসল : কেউ না। আমি একা। তারপর কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, চলুন, হাত-মুখ ধোবেন চলুন–

অঙ্গলাবণির কথাবার্তায় কেমন যেন অধিকারের ভাব। কিন্তু স্নিগ্ধপ্রভাতের ভালো লাগল। ওর ভেতরে-ভেতরে বোধহয় বহুদিনের একটা আর্তি ছিল যে, কেউ ওকে অধিকার করুক। বাইরে থেকে নয়–ভেতর থেকে।

স্নিগ্ধপ্রভাত অঙ্গলাবণির মুখের রেখাগুলো পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

অচেনা এক পুরুষকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের ছাপ নেই। বরং কোথায় যেন একটা কৌতুক ও কৌতূহল কাজ করছে।

হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল মিগ্ধপ্রভাত। অঙ্গলাবণির দেওয়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, আপনি খুব পরোপকারী...।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অঙ্গলাবণি : আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম নয়। নেহাত চাকরি ছাড়া আর কোনও কাজ নেই, তাই...। এই যেমন আপনার জন্যে কদিন অফিস ছুটি নিয়েছি...।

নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিনটা কাটতে লাগল। কোনও কাজ নেই– শুধু বিশ্রাম আর আরাম। সেইসঙ্গে অঙ্গলাবণির মধুর শাসন, দু-একটা এলোমেলো কথা। স্নিগ্ধপ্রভাতের বেশ লাগছিল।

ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে ওদের কথা হচ্ছিল।

কাচের জানলায় রোদ এখন চড়া হয়েছে। আকাশ সকালের নীল থেকে চোখ-ধাঁধানো সাদাটে হয়ে গেছে।

মিউজিক সিস্টেমে হালকা সুর বাজছিল। তাতে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

একা-একা এতবড় ফ্ল্যাটে থাকেন...ভয় করে না?

যত না ভয় তার চেয়ে বেশি মনখারাপ লাগত।

আপনি কি সারাজীবন একা না কি? কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আছে...।

জীবনের শুরুতে মা-বাবা-ভাই-বোন ছিল। তারপর স্বামী। আর তারপর...একা আমি।

আপনার হাজব্যান্ড এখন কোথায়?

এ-থ্রি সিটিতে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। বছরখানেক হল আমাদের কাটাকুটি হয়ে গেছে।

কাটাকুটি! শব্দটা কেমন যেন কানে বাজল।

স্নিগ্ধপ্রভাতের কপালে বোধহয় প্রশ্নের ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে অঙ্গলাবণি বলল, না–ডিভোর্স হয়নি। অফিসিয়ালি ডিভোর্স পেতে এখনও বছরদুয়েক বাকি।

কথাটা বলে তেতো হাসল। স্নিগ্ধপ্রভাতের পাতে আরও একটু তরকারি দিল।

মুখে ভাত নিয়ে জড়ানো গলায় স্নিগ্ধপ্রভাত জিগ্যেস করল, আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?

ও ভীষণ বোর হয়ে গিয়েছিল। বলত, আমাদের ভালোবাসা নাকি ফুরিয়ে গেছে। এর পর তো আর একসঙ্গে থাকার কোনও মানে হয় না!

দারুণ!

অঙ্গলাবণি অবাক হয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের চোখে তাকাল।

স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, রান্নাটা দারুণ হয়েছে। তারপর ও কী নাম আপনার হাজব্যান্ডের?

জেনে কী হবে!

তবু…জানতে ইচ্ছে করছে।

শোভনসুন্দর…।

নামটা চমৎকার–তবে মানুষটা নয়।

কী করে বুঝলেন?

আপনাকে ভালোবাসতে চায়নি, তাই।

হাসল অঙ্গলাবণি : আমারও তো অনেক দোষ থাকতে পারে! চট করে কারও সাইড নেওয়া ঠিক নয়।

আপনার সাইড নিতে আমার ভালো লাগছে। এটা কিন্তু খোশামোদ নয়। আসলে প্রত্যেকের মনের ভেতরে ভালো লাগার একটা সুইচ আছে। ওটা যখন-তখন কোনও লজিক ছাড়াই অন-অফ হয়। আপনার বেলায় অন হয়ে গেছে।

খেতে-খেতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল অঙ্গলাবণি। হাসি থামলে পর বলল, সত্যি, আপনি এক অদ্ভুত মানুষ!

শোভনসুন্দর। নামটা মনে-মনে বিড়বিড় করল স্নিগ্ধপ্রভাত। অঙ্গলাবণি আর শোভনসুন্দরের জীবনে ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে।

স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হয়ে যাচ্ছিল। অঙ্গলাবণির জীবনের সঙ্গে ওর এত মিল! কোন বিচিত্র এক দুর্ঘটনা দুজন সমান্তরাল মানুষকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ স্নিগ্ধপ্রভাতকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল অঙ্গলাবণি। তারপর আলতো করে ছুঁড়ে দিল একটি প্রশ্ন : আপনার বাড়িতে কে কে আছে?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নিগ্ধপ্রভাতের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বুকের ভেতরের প্রবল চাপটা শূন্য হয়ে গেল। মুখ সামান্য নীচু করে ও বলল, সুপর্ণলতিকা–আমার ওয়াইফ।

ও অবাক হয়ে খেয়াল করল, এতক্ষণে এই প্রথম ওর সুপর্ণলতিকার কথা মনে পড়ল। বাড়ি ফেরার জন্য ওর এতটুকুও মন টানল না।

আপনার বউয়ের কথা বলুন। সুপর্ণলতিকা নামটা কিন্তু দারুণ! অঙ্গলাবণিকে খুশি-খুশি দেখাল।

হ্যাঁ, দারুণ নাম–তবে অঙ্গলাবণির কাছে কিছু নয়।

ওঁর কথা বলুন। কেমন মানুষ আপনার ওয়াইফ?

ভালো। কিছুক্ষণ চুপচাপ খেতে লাগল স্নিগ্ধপ্রভাত। তারপর অনেকটা বোধহয় শোভনসুন্দরের মতো।

অঙ্গলাবণি মুখ নামাল।

আপনাকে আর-একটুকরো মাছ দিই…।

দিন।

স্নিগ্ধপ্রভাতের কেমন অদ্ভুত লাগছিল। ঘরে ফেরার কোনও তাড়া নেই। ফিরতে ইচ্ছেও করছে না। বরং মনে-মনে ও একটা অ্যাডভেঞ্চার চাইছে। আর নিজেকে বেশ স্বাধীন মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, সুপর্ণলতিকাকে কেমন দেখতে? কাল বিকেলে ও কী যেন বলেছিল? দুটো ফ্লোট্যাক্সির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে…কোন স্পেস কো-অর্ডিনেটে যেন…?

নাঃ, ভালো করে কিছু মনে পড়ছে না।

মাথার ভেতরে টিপটিপ করে যন্ত্রণার একটা ধারা অবিরাম বয়ে চলেছিল। মাঝে-মাঝে অস্থির হয়ে ব্যথাটা জানান দিচ্ছিল।

.

একদিন দু-দিন করে তিনটে দিন পেরিয়ে গেল। শুয়ে-বসে অলস গল্প করে ওদের সময় কাটতে লাগল।

তিনদিনে স্নিগ্ধপ্রভাত পুরোপুরি সেরে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর এখানে থেকে যেতে মন চাইছিল। অথচ লজ্জায় সংকোচে অঙ্গলাবণিকে সেকথাও বলতে পারছিল না।

চারদিনের দিন অঙ্গলাবণি ওকে বলল, আপনি এখন ভালোই আছেন। আজ থেকে আমার অফিস যাওয়া শুরু। আপনি এই ফ্ল্যাটের পাহারায় রইলেন। কী, কোনও আপত্তি নেই তো!

না, আপত্তি নেই। তবে একা-একা থাকতে বোর লাগবে।

সেকী? শোভনসুন্দর তো উলটো কথা বলেছিল আমাকে। আমার সঙ্গে দোকা থাকতে থাকতে ও বোর হয়ে গিয়েছিল। হাসল অঙ্গলাবণি।

আমি আমার কথা জানি–অন্যেরটা জানি না। তাই আমারটাই বললাম। নাকি আপনি বোর হয়ে যাচ্ছেন?

না, না ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ শেষ করছিল অঙ্গলাবণি। আয়নার মধ্যে দিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে তাকিয়ে বলল, জানেন, আমার অফিস-বসটা একটা রোবট। কাজ ছাড়া আর কোনও নেশা নেই। এমনকী আমার দিকে মুখ তুলে একপলক তাকায় না। মানে, যখন তাকায় তখন শুধু কাজের কথাই বলে।

আমি কিন্তু সেরকম না। বরং বেশ দুর্বল মানুষ।

অঙ্গলাবণি আয়নায় হাসল।

আয়নাটা অ্যান্টিক। সুন্দর কারুকাজ করা।

সেদিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, দারুণ!

সাজতে-সাজতে ভুরু তুলল অঙ্গলাবণি : আয়নাটা?

–আয়নার ছায়াটা। আপনার ইমেজটা।

এটা কিন্তু ভারচুয়াল ইমেজ। একে আঙুলে ছোঁয়া যায় না। হাসল ঠোঁটের কোণে।

ভারচুয়াল ইমেজ থেকেই একদিন রিয়েল ইমেজে পৌঁছে যাব। তারপর সেখান থেকে অবজেক্টে। তখন ছুঁতে কোনও অসুবিধে হবে না।

ভারচুয়াল রিয়েলিটি কিন্তু সত্যি নয়।

সত্যি না হোক সত্যির কাছাকাছি তো বটে! তাতেই আমার সাধ মিটবে।

এত অল্পেতেই আপনি খুশি?

হ্যাঁ। ঘাড় কাত করে বলল মিগ্ধপ্রভাত, আসলে চেয়েছিলামই তো অল্প! তাই অল্প পেলেই খুশি। কিন্তু পেলাম কই!

দাঁড়ান, অফিস থেকে ফিরে এসে আপনার এই ফিলিংটা অ্যানালিসিস করতে হবে।

ঠিক তখনই কথা-বলা-টেলিফোন মিষ্টি ধাতব গলায় বলে উঠল, ফোন এসেছে–ফোন ধরো।

অঙ্গলাবণি ধরছি বলতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল একজন প্রৌঢ়ের রঙিন মুখ।

চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। গালে ধপধপে সাদা চাপদাড়ি। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। নাকের নীচে সাদা পুরু গোঁফ। তারই আড়ালে একচিলতে হাসি।

কেমন আছ, অঙ্গলাবণি?

এখনও পর্যন্ত ভালোই, ডক্টর–।

কোনও কমপ্লেন নেই?

না–একটুও না।

দ্যাখো, পেশেন্টকে আমি কিন্তু পুরোপুরি তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। হি ইজ অল ইয়োর। কোনও প্রবলেম হলে বলবে। আর কদিন যাক–তারপর তোমার বাড়িতে একদিন চা খেতে যাব।

ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, ডক্টর।

ও.কে., সি ইউ দেন...।

পরদার ছবি মিলিয়ে গেল।

অঙ্গলাবণি বলল, টেলিফোন শেষ হয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে পরদাটাও মিলিয়ে গেল। দেওয়ালটা আবার দেওয়ালের মতো হয়ে গেল। কথা বলা-টেলিফোন বলল, ধন্যবাদ।

এবার স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে ফিরে তাকাল অঙ্গলাবণি? উনি ডক্টর নীতিনপ্রকাশ। তোমার চিকিৎসা করছেন…।

স্নিগ্ধপ্রভাত হাসল ও ভুল বললে। আমি এখন তোমার চিকিৎসায় আছি।

অনেক পরে, অঙ্গলাবণি টা-টা করে অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর, স্নিগ্ধপ্রভাতের খেয়াল হল ওরা হঠাৎই আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এসেছে। কিন্তু এরকম হঠাৎ নেমে এলেও ওরা কেউই কোনও হোঁচট খায়নি।

আচ্ছা, এটা কি নামা, না ওঠা?

অঙ্গলাবণি চলে যাওয়ার পর স্নিগ্ধপ্রভাতের মনখারাপ লাগছিল। এত বড় শৌখিন ফ্ল্যাটে ভীষণ একা-একা লাগছিল।

সুপর্ণলতিকাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়! কী করছে ও এখন?

সুতরাং ডাইনিং হলে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ও বলল, একটা ফোন করব।

বলামাত্রই টেলিফোন জবাব দিল, কত নাম্বার বলো…।

নম্বরটা ঠিকমতো মনে পড়ছিল না। কেমন যেন ঝাপসা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মিগ্ধপ্রভাতের মাথা টিপটিপ করছিল।

শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে একটা নম্বর বলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

নম্বরটা বলা শেষ হতে-না-হতেই ও-প্রান্তে রিং বাজতে শুরু করল।

রিং হয়েই চলল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কেউ ফোন ধরল না। নিশ্চয়ই সুপর্ণলতিকা বাড়িতে নেই কোথাও বেরিয়েছে। অথবা নম্বরটাই ভুলভাল হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, লাইন ছেড়ে দাও।

কথা-বলা-টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

*

দু-সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্গলাবণি স্নিগ্ধপ্রভাতের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। ও চোখের আড়াল হলেই স্নিগ্ধপ্রভাতের অন্তরে অসহায় পিপাসা জেগে ওঠে। এক অদ্ভুত টান ওকে অঙ্গলাবণির পরাধীন করে তোলে। সে-কথা একদিন, এক দুর্বল মুহূর্তে অঙ্গলাবণিকে বলেও ফ্যালে।

ইলেকট্রনিক অরগ্যানের মতো মিষ্টি শব্দের ঢেউ খেলিয়ে হেসে ওঠে অঙ্গলাবণি। তারপর বলে, এ কী ছেলেমানুষি! ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে তোমার এই ইলিউশানের কথা বলতে হবে।

ইলিউশান! মায়া! তোমাকে মনে-মনে চাওয়াটা স্রেফ মায়া! সত্যি নয়?

কী জানি! ডক্টর হয়তো তা-ই বলবেন।

এই যে তোমাকে ছুঁতে না পেলে আমার মন কষ্ট পাচ্ছে–এটাও মায়া?

হতেও তো পারে।

আচমকা স্নিগ্ধপ্রভাত অঙ্গলাবণির দিকে ঝুঁকে পড়ল। আকুলভাবে জড়িয়ে ধরল ওকে। এবং ঠোঁটে চুমু খেল।

এক আশ্চর্য উত্তাপ এক শরীর থেকে অন্য শরীরে বয়ে গেল। উত্তাপ না হয়ে সেটা বিদ্যুৎ তরঙ্গও হতে পারে।

দুটো শরীর গলতে শুরু করল। কেউই আর নিজের আয়ত্বে ছিল না। মন যা-যা চাইছিল শরীর তা-ই করতে শুরু করল।

এতদিন ধরে যে-সংযম দুজনে মেনে চলছিল একটি মুহূর্তে সেটা মিথ্যে হয়ে গেল।

একসময়, খানিকটা শান্ত হওয়ার পর, স্নিগ্ধপ্রভাত বলে ফেলল, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

সুপর্ণলতিকা?

অসম্ভব।

হাসল অঙ্গলাবণি। বলল, আমার অবস্থাটাও একইরকম। এখন বুঝলাম তোমার মধ্যে কতরকম অস্থির পাগলামি লুকিয়ে আছে। শোভনসুন্দর কখনও আমাকে এরকম পাগলের মতো আদর করেনি।

স্নিগ্ধপ্রভাতের কাছ থেকে সরে এল অঙ্গলাবণি। বলল, ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে একটা ফোন করি।

সেকথা শুনতে পেয়ে কথা-বলা-টেলিফোন বলে উঠল, নাম্বার বলো–।

নম্বর বলল অঙ্গলাবণি। এবং ও-প্রান্তে ফোন বাজতে শুরু করল।

ডক্টর ফোন ধরতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গেল। সেখানে ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে দেখা গেল।

হাউ আর য়ু, মাই লেডি?

ফাইন। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনাকে এখুনি একবার আমার ফ্ল্যাটে আসতে হবে।

কেন, কী হয়েছে?

খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আপনি এলে পর বলব।

নীতিনপ্রকাশ হাসলেন কী, আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে?

জানি না। আপনি এলে সব বলব।

টেলিফোন শেষ হয়েছে বলে ফোন ছেড়ে দিল অঙ্গলাবণি। টেলিফোন ওকে যথারীতি ধন্যবাদ জানাল।

টেলিফোনের কথাবার্তা শুনে স্নিগ্ধপ্রভাত একটু অবাক হয়েছিল।

ওর যেন মনে হচ্ছিল, ডক্টর নীতিনপ্রকাশ আর অঙ্গলাবণির মধ্যে কী এক গোপন খেলা চলছে। আর সে-খেলাটা ওকে নিয়েই।

তা হলে কি নীতিনপ্রকাশই শোভনসুন্দর? আড়ালে থেকে পরকীয়া সহবাসের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন? যদি তাই হয়, তা হলে মানতেই হবে, এ বড় নিষ্ঠুর পরীক্ষা।

নিজেকে গিনিপিগ ভাবতে স্নিগ্ধপ্রভাতের বেশ খারাপ লাগল।

কীসের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে, অঙ্গলাবণি?

উত্তর না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, ডক্টর এলেই সব জানতে পারবে।

.

ডক্টর নীতিনপ্রকাশ চেয়ারে বসে কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে ছিলেন স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে। ওঁকে ঠিক টিভি-পরদার রঙিন ছবির মতোই লাগছিল।

অঙ্গলাবণি তিনজনের জন্য কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওঁদের সামনের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে ইশারায় চুমুক দিতে বলল। তারপর নিজে একটা কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল। সেই ঠোঁট, যেখানে স্নিগ্ধপ্রভাতের ঠোঁটের ছোঁয়া লেগে আছে।

কফিটা কেমন হয়েছে? ডক্টর স্নিগ্ধপ্রভাতকে জিগ্যেস করলেন।

দারুণ! মুখে তৃপ্তির শব্দ করল স্নিগ্ধপ্রভাত।

আপনি কেমন আছেন?

বেশ অবাক হয়ে নীতিনপ্রকাশের চোখে তাকাল স্নিগ্ধপ্রভাত : কেন, ভালোই তো আছি!

আমরাও তা-ই চাই। হাসলেন ডক্টর।

তারপর চশমাটা চোখ থেকে খুলে কাচদুটোয় মুখের ভাপ দিলেন। জামার আস্তিনে ঘষে কাচদুটো পরিষ্কার করলেন।

চশমা না থাকায় নীতিনপ্রকাশের চোখদুটো ছোট-ছোট দেখাচ্ছিল।

স্নিগ্ধপ্রভাত, আপনাকে আজ আমি একটা নতুন টেকনোলজির কথা শোনাব– এম. এম. টেকনোলজি। যার পুরো নাম হল মেমোরি ম্যাপিং টেকনোলজি। এই টেকনোলজি দিয়ে আমাদের মেমোরিকে–মানে, স্মৃতিকে বদলে দেওয়া যায়।

তার মানে!

তার মানে আর কিছুই না... চশমাটা নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে চোখে বসালেন নীতিনপ্রকাশ : আমাদের স্মৃতি হচ্ছে অনেকটা সাদা কাগজে পেনসিলের দাগের মতো। ব্রেনের কোটি কোটি নিউরোনের মধ্যে স্মৃতি বাসা বেঁধে থাকে। আমাদের এই নতুন টেকনোলজি কাগজে আঁকা পেনসিলের দাগ সহজেই মুছে ফেলতে পারে, এবং এঁকে দিতে পারে নতুন পেনসিলের দাগ। আই মিন, টোটাল মেমোরির নানান অংশ আমরা খুশিমতো মুছে দিতে পারি। আবার আমাদের পছন্দমতো তৈরি করা মেমোরি–মানে, ফ্যাব্রিকেটেড মেমোরি প্রিন্ট করে দিতে পারি আপনার মগজে। হাসলেন নীতিনপ্রকাশ : ইন ফ্যাক্ট আমি তাই করেছি। আপনার ওয়াইফ সুপর্ণলতিকার চেহারা আর আচরণের যে-স্মৃতি আপনার মেমোরিতে ছিল সেটা আমি টোটালি ইরেজ করে দিয়েছি। সেইজন্যেই নতুন এক লোকালিটির নতুন এই ফ্ল্যাটে ওকে দেখে আপনি চিনতে পারেননি। ওকে আপনি অন্য কারও স্ত্রী অঙ্গলাবণি বলে মেনে নিয়েছেন...।

স্টপ ইট, ডক্টর! চিৎকার করে উঠল স্নিগ্ধপ্রভাত, প্লিজ ডোন্ট টক রাবিশ!

ডক্টর নীতিনপ্রকাশ মুচকি মুচকি হাসছিলেন। আর অঙ্গলাবণি নাকি সুপর্ণলতিকা?– আড়চোখে মিগ্ধপ্রভাতকে দেখছিল।

আপনি এই নতুন পরিচয়কে বিশ্বাস করেছেন। আমি ফ্ল্যাটে আসামাত্রই অঙ্গলাবণি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বলেছে। কয়েক ঘণ্টা আগেই আপনি ওকে বলেছেন : তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। যে-মুহূর্তে আপনি একথা বলেছেন সেই মুহূর্তেই আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে। আপনাদের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার বেঁচে উঠেছে। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, আই হ্যাভ রিপেয়ারড আ শ্যাটার রিলেশনশিপ। নীতিনপ্রকাশ কৌতুকের চোখে তাকালেন সুপর্ণলতিকার দিকে কী বলো, অঙ্গলাবণি?

স্নিগ্ধপ্রভাতের সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ওই তো বসে রয়েছে অঙ্গলাবণি! কী সুন্দর ওর বসার ভঙ্গি! কী সুন্দর শান্ত ওর ভালোবাসা মাখানো মুখ! ও যে আসলে সুপর্ণলতিকা সেটা জানার পরেও স্নিগ্ধপ্রভাতের টানটা কমছে না কেন? এম. এম. টেকনোলজি কি এতই অদ্ভুত!

সুপর্ণলতিকার দিকে ফিরে হাসলেন নীতিনপ্রকাশ ও কী, এবারে তুমি খুশি তো! এবারে শুরু হোক তোমাদের মোস্ট হ্যাপি কনজুগাল লাইফ। যদি আবার কখনও বোর হয়ে যাও আমাকে শুধু একটা ফোন করে দিয়ো। তোমার মাথা থেকে হাজব্যান্ডের মেমোরি ম্যাপ বদলে দিয়ে ভালোবাসায় টইটম্বুর নতুন এক হাজব্যান্ড ফিরিয়ে দেব। আমার রিসার্চ টিমের লোকজন ওঁকে ফুঁ দিয়ে অ্যানেসথেসিয়া করে আবার তুলে নিয়ে আসবে আমার ল্যাবে। তারপর একটু এম. এম. টেকনোলজি–ব্যস, তার পরই পুরোনো মানুষটা একেবারে নতুন হয়ে যাবে।

স্নিগ্ধপ্রভাতের ঘোর তখনও কাটেনি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল নীতিনপ্রকাশের দিকে।

নীতিনপ্রকাশ হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত চেপে ধরলেন। হেসে বললেন, ঘাবড়াবেন, স্নিগ্ধপ্রভাত। যদি সুপর্ণলতিকা মানে, এই অঙ্গলাবণি– আঙুল তুলে অঙ্গলাবণিকে দেখালেন তিনিঃ বোর হয়ে যায়, তা হলে আপনিও আমাকে কনট্যাক্ট করতে পারেন। তখন স্নিগ্ধপ্রভাতকে পালটে রাজসম্রাট করে ওর কাছে আমি হাজির করব। হাসলেন ডক্টর ও সমাজের যে-কোনও স্বামী-স্ত্রীর প্রবলেম সম্ভ করার জন্যে আমি এবং আমার এম. এম. টেকনোলজি সবসময় হাজির। অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। আমার ফোন নাম্বার আর ফিজের ব্যাপারটা আপনি পরে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নেবেন। তবে মনে হয়, তার আর দরকার হবে না। নীতিনপ্রকাশকে স্নিগ্ধপ্রভাতের দেবতা বলে মনে হচ্ছিল।

# চিত্রার অদৃশ্য মৃতদেহ

## চিত্রার অদৃশ্য মৃতদেহ

আসুন, আমার বউ চিত্রার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ওই যে, সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ জোরালো গলায় গান গাইছে। গানে সুর নেই বটে, কিন্তু কথা তো আছে! কথা হল চিত্রার সবচেয়ে প্রিয়। দিনে কম করে আড়াই লক্ষ শব্দ উচ্চারণ করে এই রমণী। বোধহয় আগের জন্মে শালিখ কিংবা চড়ুই ছিল।

চিত্রার শরীরের যৌবন আছে। বড় বেশিরকম যৌবন। গায়ের রং মাজা। মুখের শ্রী মাঝারি। যখন, প্রায় এক যুগে আগে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তখনও ওর চেহারা একইরকম ছিল। না, ভুল ভেবেছেন–ভালোবেসে আমাদের বিয়ে হয়নি। বরং বলা যায়, ওই ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজন থেকেই।

আমরা দুজনে সরকারি আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখতাম। তখন চিত্রা একটু বেশি আহ্লাদি আর গায়ে-পড়া ছিল। ওকে দেখে আমার সবসময়েই মনে হত, সন্তান উৎপাদনের কযন্ত্র। কথাটার আদৌ কোনও মানে হয় কিনা জানি না, কিন্তু মনে যে হত সেটা সত্যি। অথচ বিয়ের পরে জেনেছিলাম চিত্রা বন্ধ্যা বসুন্ধরা।

দারুণ নম্বর পেয়ে পাশ-টাশ করার পর বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ পেলাম। এরকম স্বপ্ন আমার একটু-আধটু ছিল। কিন্তু যাতায়াতের প্লেনভাড়া জোটানোর ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। কোত্থেকে টাকা পাই? ঠিক তখনই সহপাঠী অতনু একটা মতলব শোনাল। বলল, চিত্রার বাবা নাকি জামাই খুঁজছেন।

প্রথমটা আমার লজ্জা করেছিল। অনেক নীতি-ফিতি ছিল ছোটবেলা থেকে। কিন্তু বেশ মনে আছে, কয়েকটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। মনের মধ্যে রোজই চলত লড়াই। উচ্চাশা আর নীতির দাঁত-নখ লড়াই। আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত কে জিতবে। উচ্চাশাই জিতল। চিত্রার বাবার কাছে। মাথা জমা দিয়ে বিদেশে গেলাম। না, আমি একা নয়, সঙ্গে ছিল আমার নতুন বউ চিত্রা।

কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর পর থেকেই চিত্রার ছবি আঁকার শখ মিটে গিয়েছিল। তার বদলে ওর নিত্যনতুন শখ গজাতে লাগল। দেশ বেড়ানো, সেলাই, মডেলিং, হাতের কাজ, আরও সব কতরকম কিম্ভুত শখ। আমি যখন মনপ্রাণ দিয়ে ছবি আঁকতাম তখন চিত্রা কানের কাছে ওর নতুন শখের বৃত্তান্ত বকবক করে যেত। আমার তুলির টান ভ্রষ্ট হত। নিবিড় মনোযোগ নষ্ট হত। কিন্তু ক্রীতদাস আমি কী-ইবা করতে পারি। সহ্য করাটাই যে আমার একমাত্র গুণ।

বিদেশ থেকে দেশে ফিরে বছর গড়াতে লাগল, আর চিত্রার কথাও বাড়তে লাগল সমানুপাতিক হারে। এ ছাড়া আমার প্রতিটি ছবির প্রথম সমালোচক হল চিত্রা। সাদা ক্যানভাসে তুলির প্রথম আঁচড়ের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কানের কাছে শুরু হয়ে যেত ওর সমালোচনার ধারাবিবরণী। এ যে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এমনও হয়েছে, আমার অজান্তে আমার অসমাপ্ত ছবিতে নিজের খুশিমতো বেশ কিছু রদবদল করে দিয়েছে চিত্রা। তারপর ভোরবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বুক অসভ্যভাবে উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বলেছে, এবার ছবিটা অনেক বেটার দেখাচ্ছে না। আমি ছোট্ট করে হুঁ বলে চুপ করে থেকেছি। কিন্তু মাথার ভেতর তখন টগবগ করে রক্ত ফুটছে।

গত বারোবছর তিনমাস সময়ের মধ্যে চিত্রার অন্তত সতেরোটা ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছি। আমি। কখনও ওর পরনে চটুল পোশাক, কখনও-বা পোশাকহীন নিরাবরণ। কিন্তু একটা ছবিও ওর পছন্দ হয়নি। কারণ, ওর মতে ছবিগুলোতে হয় ওর ব্যক্তিত্ব ফোটেনি, কিংবা ওর চোখের অতলান্ত গভীরতা ধরা পড়েনি, নয়তো ওর সুললিত যৌবনের কোমলতা অনুপস্থিত।

হ্যাঁ, আমি জানি, ছবিগুলো ওর মতো হয়নি। কারণ, তুলির প্রথম টান শুরু করার পর থেকেই আমার বুকের ভেতরে দাস-মনোবৃত্তি তোলপাড় করত। মনে হত, একটা শেকল বাঁধা জানোয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। তখন ওই বিকৃত মনের অবস্থায় যে-ছবি আমি আঁকতাম তাতে চিত্রার

ঠোঁটজোড়া হত বিশাল, চোখে থাকত শয়তানি, আর শরীরে ঝরে পড়ত পাশবিক কামনা।

এখন আমার ছবি বেশ ভালোই বিক্রি হয়। শিল্পী হিসেবেও আমার নাম-ডাক হয়েছে। ইচ্ছে করলে এবং চেষ্টা করলে চিত্রার বাবার দেওয়া সেই প্লেনের টিকিটের দাম এখন আমি সুদসমেত শোধ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। চিত্রা তো থাকবে আমার কাছেই, শোবে আমার সঙ্গে, আমার প্রতিটি তুলির টানের কুৎসিত সমালোচনা করবে, নিজের বীভৎস সব শখ নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাবে, আর আমার কানের পরদা কেঁপে যাবে অবিরাম। এইভাবে চিত্রার শব্দদূষণে ক্রমাগত ডুবে যাব আমি। শেষ পর্যন্ত হয়তো পাগল হয়ে যাব।

সুতরাং এইরকম একটা মনের অবস্থায় যদি আমি চিত্রাকে খুন করার কথা ভেবে থাকি তা হলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না। এও জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, অ্যাদ্দিন কী করছিলেন, মশাই? বারোবছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। অনেক অগেই আপনার ওকে খতম করে দেওয়া উচিত ছিল।

মানছি, উচিত ছিল। বহুবার ভেবেছি ওকে খুন করার কথা, কিন্তু ক্রীতদাসের সাহসে কুলোয়নি। তা ছাড়া, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ও ছিল। আর ধরা পড়লেই তো ছবি আঁকা শেষ। যে ছবি আঁকার চর্চার জন্যে এত কাণ্ড, সেই ছবিই যদি না আঁকতে পারি, তা হলে চিত্রাকে খুন করে আর লাভ কী।

কিন্তু নিয়তি বোধহয় আমার নিঃশব্দ হাহাকার শুনতে পেয়েছিল। তাই একদিন ধর্মতলার মোড়ে দেখা হয়ে গেল অনুতোষের সঙ্গে।

অনুতোষ আমার সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়ত। এখন বিশাল বিজ্ঞানী। সবসময়েই লন্ডন আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া অনুতোষ ছবিরও সমঝদার। ফলে আমার নাম জানত। শুধু জানত না, আমিই ওর স্কুলের সেই মুখচোরা সহপাঠী।

অনুতোষ আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। ওর নানান আবিষ্কার দেখাল। তার মধ্যে একটা যন্ত্র আমাকে অবাক করে দিল। যন্ত্রটা নিয়ে অনুতোষ এখনও গবেষণা করছে। তবে তার গুণাগুণ শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। আর তখনই চিত্রাকে খুন করার ইচ্ছেটা বাস্তব চেহারা নিতে চাইল

আমার মনে। নাঃ, চিত্রাকে দেওয়ালে ঝোলানো ফটো করে দিতে আর কোনও বাধা নেই।

গত পাঁচ-সাত বছর ধরে প্রচুর খুনজখমের গল্প আমি পড়েছি। তার মধ্যে বউকে খুন করার গল্পগুলো বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। তাতে দেখেছি, এক-একটা গল্পে খুনের পদ্ধতি এক-একরকম। আবার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার চেষ্টাও নানারকমের। যেমন, একজন সাহেব তার বউয়ের মৃতদেহটা ছোট-ছোট টুকরো করে পুড়িয়ে ফেলেছে ফায়ার প্লেসে। কাজটা এতই ভয়াবহ যে, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ফায়ার প্লেস হাতের কাছে পাবই বা কোথায়? বড়জোর মৃতদেহের টুকরোগুলোকে গ্যাসের উনুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমার প্রতিবেশীরা অবশ্যই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এমনিতেই তারা সবসময় পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, সুতরাং তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া বউ নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যাও তো খাড়া করতে হবে আমাকে।

আর-একটা গল্পে নায়ক তার বউয়ের মৃতদেহ পাতালঘরের দেওয়ালের ফঁপা অংশে লুকিয়ে দেওয়ালটা নতুন করে গেঁথে দিয়েছিল। পুলিশ তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশ চালিয়েও সেই মৃতদেহের হদিস পায়নি। কিন্তু অহঙ্কারী নায়ক পুলিশের সামনেই যখন পাতালঘরের দেওয়ালের গায়ে লাঠি ঠুকে গাঁথুনির প্রশংসা করতে থাকে, তখনই কোথা থেকে যেন শোনা যায় অপার্থিব এক কান্নার সুর। গাঁথুনির ভেতর থেকেই যেন ভেসে আসছে সেই কান্না। তৎপর পুলিশের দল সন্দিহান হয়ে গাঁথুনি ভেঙে ফেলে। তখনই দেখা যায়, নায়কের বউয়ের বিকৃত মৃতদেহের মাথার ওপরে বসে আছে তারই পোষা কালো বেড়াল। ভুল করে বউয়ের মৃতদেহের সঙ্গে সে এই কালো বেড়ালটিকেও জীবন্ত কবর দিয়েছিল। ফলে, একটা বেড়াল চোখের পলকে যেন ফাঁসির দড়ি হয়ে গেল।

গল্পগুলোর মধ্যে উদ্ভট গল্পও বেশ কয়েকটা ছিল। একটা লোক তো তার বউয়ের মৃতদেহ দু-বোতল চাটনি দিয়ে স্রেফ খেয়েই ফেলেছিল। এই জঘন্য কাজ করার সময় খিদে বাড়ানোর জন্যে লোকটা কুড়ুল দিয়ে তার বাগানের সবকটা গাছ কেটে ফেলেছিল। নাঃ, পড়লে বিশ্বাস হতে চায় না। এটা শুধু গল্পেই মানায়।

তারপর চোখে পড়েছে খুব জনপ্রিয় পদ্ধতির গল্প—যেখানে বউয়ের মৃতদেহ বড় ট্রাঙ্ক কিংবা সুটকেসে ভরে পাচার করা হচ্ছে, ফেলে রেখে আসা হচ্ছে ট্রেনের কামরায়, অথবা নির্জন কোনও রাস্তার ধারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখেছি পুলিশ

মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই বিপদের শুরু। কী করে যেন গন্ধ পেয়ে ওরা ঠিক খুঁজে পায় খুনিকে। তা ছাড়া নাকগলানে পাড়াপড়শিরা যদি ট্রাঙ্ক বা সুটকেস নিয়ে রওনা হতে দ্যাখে তা হলেই চিত্তির।

আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বউ যখন খুন হয় তখন সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটি সবসময়েই তার স্বামীর। সুতরাং, চিত্রা খুন হলে আমার নামই থাকবে সবার আগে। তা ছাড়া ওর বাবা, আমার ডার্লিং শ্বশুরমশায়, বিকট বড়লোক। আদরের মেয়ের খুন হওয়াটা বা নিরুদ্দেশ হওয়াটা উনি কিছুতেই চুপচাপ মেনে নেবেন না।

দিনের পর দিন ভেবে-ভেবে মাথার চুল ছিঁড়েছি আমি। চিত্রার মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা কিংবা দুর্ঘটনা হিসেবে চালানো যায় কি না তাও ভেবেছি। কিন্তু মনের মতো কোনও প্ল্যান আসেনি মাথায়। বহু ভেবে-ভেবে সার কথা যা বুঝেছি তা হল, চিত্রাকে খুন করতে হবে, মৃতদেহ লোপাট করতে হবে, এবং সবশেষে ওর উধাও হয়ে যাওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যা খাড়া করতে হবে।

তবে গল্পে হোক আর সত্যি হোক, একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করে দেখেছি : মৃতদেহ যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তা হলে কিছুতেই পুলিশ জুতসই কোনও কেস দাঁড় করাতে পারে না। সুতরাং কী করে চিত্রাকে খুন করব, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে ওর মৃতদেহ লোপাট করব।

এই প্রশ্নের উত্তরই আমি খুঁজে চলেছি গত পাঁচ-সাত বছর ধরে।

না, মনের মতো কোনও উত্তর পাইনি। মনে-মনে যে কত লক্ষ গল্প আমি লিখে ফেলেছি! কিন্তু সবকটা গল্পেই শেষ পর্যন্ত স্বামী বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আর তারপরই ইলেকট্রিক চেয়ার কিংবা ফাঁসির দড়ি।

সুতরাং অনুতোষের যন্ত্র আমাকে হাতে চঁাদ পেড়ে দিল। আমার এতদিনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেল যেন।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম আর গভীর টান মারছিলাম হাতের সিগারেটে। চোখ-কান মন সবই অনুতোষের দিকে। ও আমাকে তখন যন্ত্রটার কথা বলছিল।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি টাইম লকার, বুঝেছিস?

আমি অবাক হয়ে বললাম, টাইম লকার? তার মানে?

যন্ত্রটা আমাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে। চেহারায় দুশো লিটার মাপের একটা রেফ্রিজারেটরের মতো। রং হালকা নীল। চকচকে ধাতুর হাতল লাগানো দরজায়। আর পাশের দিকটায় ছোট্ট একটা ডায়ালের মতো কী যেন, তার পাশেই লাল রঙের একটা বোতাম।

অনুতোষ কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে গেল টাইম লকারটার দিকে। হাতলে টান মেরে দরজাটা খুলে দিল।

ভেতরে অনেকটা জায়গা। দুটো তাকও রয়েছে। সবটাই ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি।

বুঝতেই পারছেন, যন্ত্রটার মধ্যে এমনিতে কোনও বিশেষত্ব নেই। নেহাতই সাদামাটা শৌখিন একটা আলমারি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুতোষ কী বলল জানেন?

টাইম লকার। হাসল অনুতোষ ও এর মধ্যে কোনও জিনিস ঢুকিয়ে যদি পাশের দেওয়ালের ডায়ালটা এইদিকে কুড়ি ডিগ্রি ঘুরিয়ে বোতামটা টিপে দিস, তা হলে দরজা খুলে দেখবি ভেতরে কিছুই আর নেই। সব ফাঁকা।

যাঃ, অসম্ভব! আমি সিগারেট গুঁজে দিয়েছি অ্যাশট্রেতে। কফির কাপ হাতে চলে গেছি। বিজ্ঞানী অনুতোষের কাছে। বলেছি, না, ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনুতোষ একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎই আমার হাত থেকে কফির কাপ প্লেট একরকম কেড়ে নিল। সেটা রেখে দিল টাইম লকারের ওপরের তাকে। এবং দরজা বন্ধ করে ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিল।

অনুতোষ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নে, এবার দরজা খুলে দেখ–।

আমি অবাক চোখে আমার স্কুলজীবনের বন্ধুকে দেখতে-দেখতে টাইম লকারের হাতল ধরে টান মারলাম। এবং হতবাক হয়ে গেলাম।

টাইম লকার সেই আগের মতোই খালি।

আমার ফ্যালফ্যালে চাউনি দেখে অনুকম্পার হাসি হাসল অনুতোষ। বলল, ওই কাপ আর প্লেট এখন হাইপারস্পেসে চলে গেছে। আমাদের স্পেস-টাইম ছেড়ে চলে গেছে ফোর্থ ডায়মেনশনে।

আমার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। হাইপারস্পেস! ফোর্থ ডায়মেনশন। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য গুলিয়ে যাক, ক্ষতি নেই–শুধু টাইম লকার ঠিকমতো কাজ করলেই আমি খুশি।

অনুতোষের ভেতরে বিজ্ঞানী সত্তা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ও আপনমনেই বকবক করে বলে চলেছে ওর টাইম লকার তৈরির ইতিহাস। আমি ওর কথাগুলো শুনছিলাম, কিন্তু মনে মনে গলা টিপে খতম করছিলাম চিত্রাকে। আমার বিষধর চিত্রসমালোচককে।

অনুতোষ বলছিল, সুপারকন্ডাক্টর দিয়ে কয়েকটা কয়েল তৈরি করে তাতে কারেন্ট পাঠিয়ে তৈরি করেছি সুপার-ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তার ওপরে চালিয়েছি নকল মহাকর্ষ। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু করেছি, তুই সেসব বুঝবি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেরকমটা চাইছিলাম সেরকম হল না। দেখি, এরপর আর কী কারিকুরি করা যায়…।

নিকুচি করেছে অনুতোষের বৈজ্ঞানিক কচকচির। আমি তখন মনে-মনে পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে… গাইছি।

আমার মুখচোখে বোধহয় খুশি আর উত্তেজনার ছাপ পড়েছিল। সেটা দেখে অনুতোষ একটু অবাক হয়ে গেল। টাইম লকারের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, কী ব্যাপার বল তো?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে মজা করে বলেছি, না, ভাই, এখন বলব না। আমার মতো ছবি আঁকিয়েদের এমনিতেই পাগল বলে বদনাম আছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তোর এই যন্ত্রটা দেখে আমার একটা আইডিয়া এসেছে।

না, না, ভুলেও ভাববেন না চিত্রাকে নেই করে দেওয়ার আইডিয়াটা আমি অনুতোষকে বলতে চাইছি। ও আমার স্কুলের বন্ধু তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং

রহস্যময় হাসি হেসে বললাম, তোর এই যন্ত্রটা কদিনের জন্যে আমাকে ধার দিতেই হবে।

কেন বল তো? অনুতোষ অবাক চোখে তাকায় আমার দিকে।

আমি তখন চাপা গলায় বললাম, তোকে বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা একদম ফস করবি না। আমি হাইপারস্পেস নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করব। সুররিয়েলিস্টিক ঢঙে একটা সিরিজই এঁকে ফেলব। বুঝতেই তো পারছিস, এই দারুণ আইডিয়ার ব্যাপারটা যদি অন্য কোনও আর্টিস্ট টের পেয়ে যায় তা হলে আমারই ক্ষতি। আর্টিস্টদের মধ্যে কীরকম বাজে টাইপের রেষারেষি জানিস তো!

না, অনুতোষ যে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে তা বলব না। তবে আমি যেভাবে নাছোড়বান্দার মতো ওকে ধরেছি তাতে ওর ঠুনকো আপত্তি টিকল না। তা ছাড়া ওর গবেষণার জন্যে বিশহাজার টাকা ডোনেশান দিতেও রাজি হয়ে গেলাম আমি। আরও বললাম, বন্ধুত্বের খাতিরেই ওর একটা অয়েল পোর্ট্রেট করে দেব–একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে।

অনুতোষের মুখ দেখেই বুঝলাম, আমার এক-একটা অয়েল পেইন্টিং কী দামে বিক্রি হয় সে সম্পর্কে বেশ ভালোরকম ধারণাই ওর আছে। ওর মুখে প্রত্যাশা ফুটে উঠল। সেটা দেখে আমার হাসি পেল। অনুতোষ জানে না, চিত্রার জোয়াল থেকে মুক্তি পেতে আমি একটা কেন, একহাজার অয়েল পেইন্টিং ফ্রি-তে বিলোতে পারি।

সুতরাং এইভাবে, অনেক অনুনয় ও মেহনতের পর, অনুতোষের টাইম লকার পরদিনই চলে এল আমার বাড়িতে। এবং এবার যে-গল্প আমি লিখতে চলেছি সারা দুনিয়া খুঁজেও যে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না সেটা আমি জানি।

চিত্রা যে বাক্সটা মানে, টাইম লকারটা–দেখে একশো আটটা প্রশ্ন করবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন। ও প্রথমেই জানতে চাইল, এই অকেজো ফ্রিজটা আমি কোন জাহান্নম থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

আমিও মিনমিন করে জবাব দিয়েছি, সস্তায় পেয়ে গেলাম, তাই–মানে…।

ও ঠোঁট-মুখ বেঁকিয়ে বলল, ওঃ, সেই বিয়ের আগে থেকেই তোমার এইরকম ভিখিরি মেন্টালিটি। সবসময়েই হাত পেতে ঘুরঘুর করছ।

বুঝলাম, ও সেই একযুগ আগের প্লেনভাড়ার ব্যাপারটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই চিত্রা–অথবা, বলা ভালো চিত্রার মৃতদেহ রওনা দেবে হাইপারস্পেস না কী যেন সেই জাহান্নমের পথে। যেখানে মা কালীর কোলে আমার বউ চিত্রা ডাকিনী-যোগিনী সেজে বসে থাকবে।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই চিত্রার কথা বলার হার মারাত্মক রকমের বেড়ে গেল। আমি বেশ শান্তভাবেই ওকে বললাম যে, এই আলমারিতে আমার ছবি আঁকার সরঞ্জাম থাকবে, আর টুকটাক জিনিস থাকবে। তারপর মনে-মনে বললাম, আর থাকবে তোমার মৃতদেহ।

দেরি করতে চাইনি আমি। তাই সেদিন রাতেই চিত্রা যখন অচেতন ঘুমে নিঃঝুম তখন ওর গলা টিপে ধরলাম। বিশ্বাস করুন, গলা টেপার সময়ে হাসি পাচ্ছিল আমার। এই কি সেই গলা, যে-পথ বেয়ে গত বারোবছর তিন মাসে অন্তত সাড়ে সতেরো কোটি কথা বেরিয়ে এসেছে! কী ভয়ংকর অপশক্তিই না লুকিয়ে রয়েছে এই দানবীর ভোকাল কর্ডে! আমার হাত শিল্পীর হাত। কিন্তু খুনও বোধহয় এক শিল্পকলা। নইলে কী করে অমন শক্তি দিয়ে আমি চেপে ধরতে পারলাম চিত্রার গলা!

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল ও। চোখ খুলে নাইট ল্যাম্পের আলোয় বোধহয় চিনতে পারল ওর আততায়ীকে। ওর পায়ের ঝাপটায় মশারির একটা কোণের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই সব ছটফটানি শেষ। খেল খতম।

মনে হল আমি যেন পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে পড়েছি আকাশে। আমার স্বাধীন ডানায় কারও শাসনের ছাপ নেই। ক্রীতদাসের শেকল ছিঁড়ে গেছে চিরতরে।

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বাকি কাজগুলো সেরে ফেললাম আমি। চিত্রার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেলাম টাইম লকারের কাছে। তারপর কোনওরকমে ঠেলেঠুলে গুঁজে দিলাম ভেতরে। ওর দ হয়ে বসে থাকা দেহটা দেখে মনে হল ওটা আমার গত বারোবছর তিনমাস বিবাহিত জীবনের প্রতীক। তবে ওর মুখের কঠিন রেখাগুলো এখন ততটা স্পষ্ট নয়। বরং চিত্রাকে এখন অনেক নিরীহ মনে হচ্ছে। শুধু মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। হবেই তো। আচমকা গলা টিপে ধরেছিলাম যে!

আলমারি খুঁজে বের করে নিলাম ওর গোটাপাঁচেক প্রিয় শাড়ি-ব্লাউজ। তার সঙ্গে যোগ হল একজোড়া শৌখিন জুতো, টুথব্রাশ, স্নো-পাউডার, লিপস্টিক, ময়েশ্চারাইজার, আর কিছু মেয়েলি জিনিস। সেগুলো একে-একে ভরে দিলাম টাইম লকারে। তারপর অনুতোষের নির্দেশ মতো ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিলাম।

এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ফ্ল্যাট থেকে শুধু চিত্রা উধাও হয়ে গেলেই তো হবে না। তার সঙ্গে এই শাড়ি, জামাকাপড়, প্রসাধনের জিনিসও উধাও হওয়া দরকার। কারণ, কাল সকালেই আমি আমার সুইট ডার্লিং শ্বশুরমশায়কে টেলিফোনে জানিয়ে দেব যে, চিত্রা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে জানি না।

এই একই কথা বলব পাড়াপড়শিকে এবং পুলিশকে। তার পরই পুলিশ শুরু করে দেবে তাদের চুলচেরা অনুসন্ধানের কাজ।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। শ্বশুরমশায় এবং পুলিশ–এই দু-তরফের জেরায়-জেরায় জেরবার হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু একটুও ভেঙে পড়লাম না। কারণ, গতকাল রাতেই টাইম লকারের বোতাম টিপে দরজা খুলে দেখে নিয়েছি লকার খালি। সেখানে চিত্রার মৃতদেহ নেই, শাড়ি-ব্লাউজ নেই, স্নো পাউডার নেই, কিচ্ছু নেই। অনুতোষ আমাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছিল টাইম লকারের মাহাত্ম্য। কিন্তু তবুও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অনেকবার হাত বোলালাম টাইম লকারের ভেতরে। আঙুলের ডগায় শুধু ঠান্ডা ধাতুর পাতের ছোঁওয়া। চিত্রা ইত্যাদি সত্যিই মিলিয়ে গেছে হাইপারস্পেসে।

সুতরাং একটুও ভেঙে পড়িনি আমি। পুলিশি জেরা চলল সারাদিন ধরে। সম্ভব-অসম্ভব নানান প্রশ্ন করল ওরা। সব প্রশ্নের উত্তরই যে ঠিকঠাক দিতে পারছিলাম তা নয়। বেশ কয়েক জায়গায় ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। আমার শ্বশুর পাইপ টানতে-টানতে পায়চারি করছিলেন ঘরে। যেন খুব কঠিন কোনও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানের পথ খুঁজছেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার। আর সাদা পোশাকের দুজন অফিসার তন্নতন্ন করে সার্চ করছিল আমার ফ্ল্যাট। ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল ফ্ল্যাটের দরজায় পাহারায় দাঁড়িয়ে।

চিত্রার মৃতদেহ উধাও হওয়ার পর টাইম লকারের ভেতরে টুকিটাকি কিছু জিনিস সাজিয়ে রেখেছিলাম কাল রাতেই কয়েকটা তুলি, প্যালেট, বোর্ডপিন,

আর কাপ-প্লেট। পুলিশ অফিসাররা সেগুলোও খুঁটিয়ে দেখল। লকারের গায়ের ছোট ডায়াল আর বোতামটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল আমাকে, এগুলো কী?

আমি নির্বিকারভাবে জবাব দিলাম, কী জানি না। মান্ধাতার আমলের পুরোনো ফ্রিজ। আমি স্রেফ আলমারি হিসেবে ব্যবহার করব বলে জলের দরে কিনেছি। তারপর রংচং করে নিয়েছি।

সুতরাং পুলিশের যাবতীয় তৎপরতার ফলাফল অশ্বডিম্ব। কিন্তু চলে যাওয়ার সময় আমার ডার্লিং শ্বশুর যেভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে বুঝলাম, উনি সহজে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। কারণ, আর কেউ না জানুক উনি জানেন, চিত্রা কখনও অন্য কোনও পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেনি। স্বামী হিসেবে আমাকে ওর খুব পছন্দ ছিল। এরকম ক্রীতদাস স্বামী যে সহজে পাওয়া যায় না!

আমার শ্বশুরের টাকাপয়সা অঢেল। ফলে নিষ্ফল তদন্ত করে করে পুলিশ যদি ঝিমিয়ে পড়ে তা হলে তাদের চাঙ্গা করে তোলার দাওয়াই তার জানা আছে। তাই মনে হয়, পুলিশ খুব সহজে চিত্রা অন্তর্ধান রহস্যের তদন্তে ক্ষান্তি দেবে না।

দেখা গেল, আমার কথাই ঠিক। দিনের পর দিন পুলিশ আমাকে বিরক্ত করে চলল। দু চার দিন বাদেদেই তারা নতুন-নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে লাগল। আর আমার হাসি পাচ্ছিল। একটা মৃতদেহের এত দাম! মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া গেলে পুলিশ সত্যি কত অসহায়!

যতই দিন যেতে লাগল পুলিশের প্রশ্নের সংখ্যা কমে আসতে লাগল। আমার শ্বশুরের কপালে এখন দুশ্চিন্তার বলিরেখা। মুখের সেই প্রতিজ্ঞার ছাপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। দুনিয়ার আত্মীয়স্বজনের কাছে খোঁজ করেও চিত্রার হদিস পাননি উনি। এমন কী চিত্রা বিদেশে পাড়ি দিতে পারে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে চিত্রার ফটো নিয়ে এয়ারপোর্টেও খোঁজ করেছে পুলিশ। কিন্তু সেখানেও হতাশা।

এইভাবে, বুঝলেন, যখন প্রায় একমাস কেটে গেছে, তখন একদিন সন্ধেবেলা আমার ডার্লিং এল আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে সাদা পোশাকের স্বাস্থ্যবান একজন লোক। লোকটাকে আগে দেখিনি, তবে তার চোখের চাউনি আর চোয়ালের রেখা স্পষ্ট বলে দিল, সে পুলিশের লোক।

আমরা সোফায় বসে কথা বলছিলাম। পুলিশের লোকটা আমার হাত ধরে দুঃখপ্রকাশ করল। বলল, এতদিন ধরে আমরা অকারণে আপনাকে ট্রাল দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না।

শ্বশুরমশায়ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। ও বড় জেদি মেয়ে। কে জানে অভিমান করে কোথায় চলে গেছে। দেখো, আমার মন বলছে, ও আবার একদিন তোমার কাছে ফিরে আসবে। তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে কিছু মনে কোরো না।

ওদের অনুতাপ আমাকে খুশি করল। এতদিনের শত্রুতার ভাবটা সরে গেল মন থেকে। আমার চোখের সামনে এখন একজন অসহায় পিতা আর একজন ব্যর্থ পুলিশ অফিসার। এতদিন ওদের জন্যে আতিথেয়তার ছিটেফোঁটাও করিনি। আজ, এখন, চায়ের অনুরোধ করলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সাধারণ কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি আমার চিত্রাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলছিলাম। আমার শ্বশুরমশায় মাঝে-মাঝেই সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন।

হঠাৎই যে আমার কী হল কে জানে! সোফা ছেড়ে সটান উঠে চলে গেলাম টাইম লকারের কাছে। ওটার গায়ে চাপড় মেরে বললাম, এই পুরোনো বাচ্চা আলমারিটা চিত্রার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, জানেন। ও বলছিল, যদি ও সারাটা জীবন এতটুকু পুঁচকে একটা আলমারির ভেতরে কাটাতে পারত তা হলে বেশ হত।

বুঝতেই পারছেন, অহঙ্কার, স্রেফ অহঙ্কার। খুন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মেডেল গলায় ঝুলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা তো কম কথা নয়। সুতরাং সেই অহঙ্কারের বশেই লকারের দরজাটা একটানে খুলে ফেললাম আমি। টুকিটাকি জিনিসে সাজানো ছিমছাম ভেতরটা দেখিয়ে ওদের বললাম, কী সুন্দর, না!

আর তখনই বেখাপ্পা ব্যাপারটা নজরে পড়ল আমার। এটা এল কোথা থেকে? একটা চিনেমাটির প্লেট, তার ওপরে একটা কাপ। কাপে লালচে মতন তলানি রয়েছে খানিকটা। আর সেই কাপ-প্লেটের পাশে রাখা একটা কাপ কাত হয়ে পড়ে গেছে।

বুঝতে পেরেছেন কি ব্যাপারটা? পারেননি? কী করে পারবেন! আমারই যে বুঝে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তারপর বুঝতে পারলাম, এটা হল অনুতোষের সেই কাপ-প্লেটটাইম লকারের মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্যে যে-কাপ-প্লেট লকারের ভেতরে রেখে উধাও করে দিয়েছিল অনুতোষ। এতদিন পর আচমকাই সেই কাপ-প্লেট ফিরে এসেছে হাইপারস্পেস থেকে। এখন মনে পড়ছে, অনুতোষ বলেছিল, ওর যন্ত্রটা এখনও গবেষণা স্তরে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেরকম চেয়েছিল সেরকমটা হয়নি। সেইজন্যেই কি টাইম লকারে রেখে উধাও করে দেওয়া জিনিস কিছুদিন পর খেয়ালখুশি মতো ফিরে আসে হাইপারস্পেস থেকে!

আমার কপালে ঘামের ফোঁটা, মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে কি ঝাপসা দেখছি সবকিছু? কোনওরকমে টাইম লকারের দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমার শ্বশুরমশায় আর অফিসার ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে পড়ছে না কেন? ওদের চা খাওয়া কি এখনও শেষ হয়নি?

ঠিক তখনই টুকিটাকি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল লকারের ভেতরে। আর-একটা বীভৎস উৎকট দুর্গন্ধে ভরে উঠল গোটা ঘরটা। একমাসের বাসী মৃতদেহের দুর্গন্ধ!

সঙ্গে-সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে দু-জোড়া তীব্র চোখ তাকাল টাইম লকারের দিকে। পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। এগিয়ে গেল লকারের দিকে।

আমি জানি, টাইম লকারের দরজা খুললে এখন কী চোখে পড়বে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে আমার মনে হল, চিত্রাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। আমাকে শায়েস্তা করতে ও হাইপারস্পেস থেকেও ফিরে এসেছে।

# যারা গাড়ি জোরে চালায়

**যারা গাড়ি জোরে চালায়**

তাদের আমি ভীষণ ভয় পাই। সুকল্যাণদা হাত মুঠো করে সিগারেটটা পাকড়ে ছিলেন।

কথাটা বলেই শোঁ-শোঁ শব্দে দুটো ভীম টান দিলেন। তারপর ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ফুরফুর করে ধোঁয়া বের করলেন অনেকক্ষণ ধরে। ছোট করে বারতিনেক কেশে নিয়ে আমাদের তিনজনের দিকে চোখ নাচিয়ে তাকালেন। যার অর্থ হল : তোরা কি ভয় পাস?

হ্যাঁ, আমি ভয় পাই। তাতে কেউ আমাকে কাপুরুষ ভাবলেও কোনও ক্ষতি নেই। যারা গাড়ি জোরে চালায় তাদের আমি সত্যিই ভীষণ ভয় পাই। ওই সুকল্যাণদার মতোই।

হাড় কাঁপানো শীতে চাদর মুড়ি দিয়ে আমাদের আড্ডাটা দারুণ জমে উঠেছিল। চা কফি আর ফিঙ্গার চিত্স খেতে-খেতে হাজার কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছিলাম আমরা। মনেই হচ্ছিল না, কলকাতা থেকে বহুদূরে হীরাপুরের গেস্টহাউসে বসে আছি।

কথায় আছে, পৃথিবীর যে-কোনও শহরে তিনটে বাঙালি কোনওরকমে একজোট হলেই সেটাকে কলকাতা বানিয়ে দেয়। এখানেও যেন তাই। কিন্তু আজ আমাদের আড্ডার শেষ দিন। আর ঘণ্টাখানেক পরেই রওনা হতে হবে কলকাতার ট্রেন ধরার জন্যে।

সুকল্যাণদার অফিস হীরাপুরে। ওঁদের কোম্পানি খনির কীসব যন্ত্রপাতি যেন তৈরি করে। বেশ বাঘা কোম্পানি। সুকল্যাণদাকে অনেক টাকার অফার দিয়ে

কলকাতার এক ঘ্যাম কোম্পানি থেকে ছিনিয়ে এনেছে। আর আমাদের তাস খেলার টিমটার বারোটা বেজে গেছে। কারণ, আমরা চারজন ছিলাম যাকে বলে তাসতুতো ভাই।

এবারে শীতের শুরুতে সুকল্যাণদা আমাদের তিন মক্কেলকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ফোন করে তিনজনকেই বলেছিলেন, বুঝলে ভাই, কবে আছি কবে নেই তার কোনও ঠিক নেই। একটু খোঁজও তো নাও না, দাদা কেমন আছে! এখানে চলে এসো। দিব্যি আড্ডা দেবে, চিকেন কোর্মা কি মাটন কষা খাবে–আর চারজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্রিজ খেলব। আসা চাই কিন্তু! তোমাদের ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

তো আমরা তিনজনেই গিয়ে হাজির হয়েছি রামগিরি, তেজেন আর আমি।

আমরা তিন মক্কেল উত্তর কলকাতার কাছাকাছি থাকি। একই ব্যাচে মর্নিং কলেজে পড়েছি। পরে ছোটখাটো চাকরিবাকরিতে ঢুকলেও তাসের আড্ডায় হাজিরা দেওয়াটা বন্ধ করিনি। সেখানে সুকল্যাণদা ছিলেন আমাদের মধ্যমণি।

কথায় কথায় কী করে যেন আড্ডায় মোড় ঘুরে গিয়েছিল গাড়ি আর ড্রাইভারের দিকে। তখনই সুকল্যাণদা ওপরের মন্তব্যটি করেছেন। এখন তারই জের ধরে আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন, নো-ট্রাম্প, তোর সুখদেওকে মনে আছে? সেই যে, আমরা একবার ইডেনে ওয়ান ডে দেখতে গিয়েছিলাম…।

ওরে ব্বাবা! মনে নেই আবার!

আমার নাম শোভন। কিন্তু ব্রিজ খেলতে বসলেই সবসময় আমার নো-ট্রাম্প কল করার ঝোঁক চাপে। তাই সুকল্যাণদা আমার নাম দিয়েছেন নো-ট্রাম্প।

আমার কথায় রামগিরি আর তেজেন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?

রামগিরি অবশ্য ব্যাপার বলতে পারে না বলে বেপার। অথচ ওর ধারণা কলকাতায় বহুদিন কাটিয়ে ও বাংলায় একদম চোস্ত হয়ে গেছে।

সিনেমার মতো সুখদেওর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। মনের কোন কোণে লুকিয়ে ছিল কে জানে! চট করে ভেসে উঠল।

সুকল্যাণদা সবসময় অফিসের গাড়ি পেতেন। সেই গাড়ি চালাত সুখদেও। বছর তিনেক আগে আমি আর সুকল্যাণদা ইডেনে ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান ডে দেখতে গিয়েছিলাম। তৈরি হয়ে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। যদি ইন্ডিয়া টসে জিতে ব্যাট নেয় তা হলে শচীনের ব্যাট শুরু থেকে দেখা যাবে না।

গাড়িতে বসে সে কথাটাই বোধহয় দুজনে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎই গাড়িটা এক হ্যাঁচকা মেরে গা ঝাড়া দিয়ে বনবন করে ছুটতে শুরু করল।

সে ছোটা কাকে বলে!

পরপর গাড়ি ওভারটেক করে, বাস-ট্রামের ফাঁকফোকর দিয়ে গলে, সাইকেল ভ্যান আর অটোকে কিস করে সুখদেও যেন বুলেটের বেগে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল।

পেছনের সিটে লেপটে শুয়ে সুকল্যাণদা সুখদেও! সুখদেও! বলে মিহি চিৎকার করছিলেন। কিন্তু ওইটুকুই! তার পরে তিনি সুখদেওকে ঠিক কী যে বলতে চাইছিলেন সেটা আমি জানি না। কারণ, ওঁর মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোচ্ছিল না।

আমার অবস্থাও তখন হয়েছিল সুকল্যাণদার মতোই। পেছনের সিটে কাত হয়ে পড়ে গিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সির পেশেন্টের মতো ইষ্টনাম জপছি। চোখ-কান খোলা, কিন্তু বডিটা ডেডবডির মতন।

অন্যান্য বাস-গাড়ির ড্রাইভারদের মুখ খিচুনি দেখে বুঝতে পারছিলাম ওরা প্রাণভরে সুখদেওকে গালিগালাজ করছে, ওর পিণ্ডি চটকাচ্ছে।

কিন্তু সুখদেও যেন হিমালয়ের সন্ন্যাসী। হাজার গালাগালের ঊর্ধ্বে। ওর আর কোনও দিকে ধেয়ান নেই মনে শুধু একটিই চিন্তা ও আমাদের যেন লেট না হয়।

না, সেবার ইডেনে আমাদের লেট হয়নি।

দুটো গাড়ির হেডলাইট, একটা অটোর ব্যাকলাইট, আর আমাদের গাড়ির ডানদিকের হেডলাইট ভেঙে সুখদেও আমাদের পৌঁছে দিল ইডেনে। গাড়িটা জায়গামতো পার্ক করে দু-হাতে তালি দিয়ে হাত ঝাড়ল, বলল, লিন, স্যার,

একদম টাইমে পৌঁছে দিয়েছি। শচীনের ব্যাট একেবারে স্টার্টিং থেকে দেখতে পাবেন।

আর শচীনের ব্যাট! আমি আর সুকল্যাণদা তখন সরষে ফুল দেখছি। সমস্ত গাঁটের খিল খুলে যাওয়া হাত-পাগুলোকে কোনওরকমে জড়ো করে গাড়ি থেকে নেমেছি। সুকল্যাণদা ভয় পাওয়া চোখে সুখদেওর পাকানো গোঁফের দিকে তাকিয়ে সরু গলায় বললেন, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও– আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরব।

সুখদেও অবাক হলেও কোনও কথা না বলে সেলাম ঠুকে চলে গিয়েছিল।

আমার মুখে সুখদেওর কাহিনি শুনে তেজেন তো হেসেই কাহিল! রামগিরি বিড়িতে দু তিনটে টান দিয়ে বলল, ও কি আর অ্যায়সেই গাড়ি তেজ চালিয়েসে! তোমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে শুনতে পেয়ে তোমাদের ভালোর জন্যে একটু স্পিড় দিয়েছে।

একটু স্পিড! রামগিরি তো ও কথা বলবেই। দেশোয়ালি ভাই যে! তা ছাড়া রামগিরি সাহসী ছেলে। আমাদের মতো হাইস্পিডে গাড়ি চড়তে ভয় পায় না। ওর বাবা মিলিটারিতে ছিলেন।

সুকল্যাণদা বললেন, ওঃ, সুখদেওকে নিয়ে আমার যা প্রবলেম গেছে! অফিসের কোনও মিটিং-এ রওনা হওয়ার সময় ভুলেও কখনও বলতাম না যে, দেরি হয়ে যাবে। কারণ, ও একবার শুনতে পেলেই সর্বনাশ। বরং বানিয়ে বানিয়ে বলতাম : ওঃ, আজ বড্ড তাড়াতাড়ি রওনা হলাম। অত আগে মিটিং-এ পৌঁছে কী করব!

সে কথা শুনে সুখদেও গুনগুন করে গান ভাঁজত আর আরামে গাড়ি চালাত। আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে আমাকে বলত, স্যার, আপকো লেট তো নহি হোগা? আমি বলতাম, না রে, বাবা, না। তুই আরামে চালা…।

সুখদেওর চেহারাটা মনে পড়ে গেল আমার।

বেশ রোগা, তামাটে রং, ইয়া গোঁফ, মুখটা লম্বাটে। খইনি খেয়ে সামনের দাঁতে ছোপ পড়ে গেছে। মাথায় কদমছাঁট চুল। তার ভেতর থেকে উঁকি মারছে মিডিয়াম টিকি।

তবে সুখদেও যত জোরেই গাড়ি চালাক, ওর হাসিটা ছিল ভীষণ সরল, সুন্দর। ও কথায় কথায় সবাইকে সেলাম ঠুকত, আর গাড়ির প্রতিটি সওয়ারিকেই স্যার অথবা ম্যাডাম বলত।

সুখদেওর কাহিনি শুনে তেজেন গম্ভীরভাবে গলাখাঁকারি দিল। তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলল, যাই বলুন, সুকল্যাণদা–ড্রাইভিং মোটেই সহজ নয়।

তেজেনের কথা বলার ঢঙে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গোছের ভাব আছে। ও যে আড়ালে আবডালে সঙ্গীত সাধনা করে সেটা আমরা জানি। আর রবীন্দ্রনাথকে সবসময় ও গুরুদেব বলে।

তেজেন বলল, আমি একসময় ড্রাইভিং শিখতাম…শোভন জানে। তখন ভেবেছিলাম, ট্যাক্সি ম্যাক্সি চালাব–পরে সেটা আর হয়নি। যাই হোক, শিখতাম যার কাছে, তার নাম ছিল বৃন্দাবন। খুব শান্ত টাইপের, ধার্মিক মানুষ, টকটকে ফরসা গায়ের রং। তো গাড়িতে ওকে পাশে বসিয়ে ভোরবেলা ভি. আই. পি. রোডে গিয়ে প্র্যাকটিস করছি…প্রথম দিন। রাস্তা ফাঁকা ছিল বলে হেভি স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছি…জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে। হঠাৎই পাশ থেকে বৃন্দাবন খুব শান্ত গলায় বলে উঠল : ভাইয়া, ওতনাহি জোরসে গাড়ি চালাবেন যেটা রুকতে পারবেন। ব্যস, ভুস করে গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিলাম। তারপর থেকে জোরে কখনও গাড়ি চালালেই আমার বৃন্দাবনের কথাটা মনে পড়ে যায়। সুতরাং, যত জোরেই গাড়ি চালাও, থামাতে জানা চাই…।

রামগিরি মাথা নেড়ে তেজেনকে সায় দিল ও তেজেন কারেক্ট কথা বলেছে, সুকল্যাণদা। যত স্পিডেই চালাও রুকতে জানা চাই। আমাদের লাইফও তাই যত স্পিডেই চালাও থামতে জানা চাই।

সর্বনাশ করেছে। সুযোগ পেলেই রামগিরির একটু-আধটু দর্শন-বাতিক আছে–যদিও ও পড়াশোনা করেছে কেমিস্ট্রি নিয়ে। এই আড্ডার মাঝে জ্ঞানের বুলি আর ভাল্লাগে না।

তাই রামগিরির দর্শনকে ঠেকা দিতে তড়িঘড়ি বলে উঠলাম, সুকল্যাণদা, গাড়ি চালানো শেখানোর সময় আমাকেও একজন ড্রাইভার দারুণ একটা কথা বলেছিল। তখন বাবা বেঁচে ছিল। আমাদের একটা কালো রঙের ফিয়াট ছিল। কিষাণ সেই গাড়িটা চালাত। বাবাকে ও জান দিয়ে ভালোবাসত।

তো যেদিন আমি গাড়ি শেখার জন্যে প্রথম স্টিয়ারিং-এ বসেছি–পাশে কিষাণ–গাড়ি স্টার্ট দিতে যাব–হঠাৎই কিষাণ হাত তুলে আমাকে থামতে ইশারা করল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল, একটা কথা বলি, ছোটবাবু। আমার গুরু প্রথমদিন একথাটা আমায় বলেছিল। আর আমার গুরুকে বলেছিল তার গুরু। কথাটা হল : স্টিয়ারিং-এ বসে সবসময় মনে রাখবেন, কলকাতা শহরে সবাই অন্ধ–শুধু আপনি দেখতে পান। তা হলে আপনার গাড়ি চালাতে সুবিধে হবে।

সুকল্যাণদা হেসে বললেন, দারুণ বলেছে! তবে ভাই যাই বলো, যতই বৃন্দাবন কি কিষাণের কাহিনি বলো, সুখদেও জিনিয়াস। ও যেখানে-যেখানে চাকরি করেছে সেখানকার সবাই ওকে রীতিমতো ভয় পায়–এবং শ্রদ্ধা করে।

তারপর সুকল্যাণদা সুখদেওর আরও কয়েকটা এপিসোড শোনালেন। কবে একবার গাড়ির পেছনের চাকা পাংচার হয়ে যাওয়ার পরেও সুখদেও গাড়িটা প্রায় এক কিলোমিটার টেনে গিয়েছিল। কোন এক ডেপুটি ম্যানেজারকে ঝড়ের বেগে মধ্যমগ্রাম পৌঁছে দেওয়ার পর দ্যাখে ভদ্রলোক সিটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। এইসব বিপজ্জনক কীর্তি আর কী!

আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। লক্ষ করলাম, তারই ফাঁকে ফাঁকে সুকল্যাণদা দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। কারণ, আটটা বাজলেই আমাদের রওনা হওয়ার কথা। এই গেস্টহাউস থেকে স্টেশন প্রায় একটি ঘণ্টার পথ। তারপর কলকাতার ট্রেন।

মিনিট-পনেরো সময় তখনও হাতে ছিল। সুকল্যাণদা কেয়ারটেকার ছেলেটিকে বলে আর এক রাউন্ড কফির ব্যবস্থা করলেন। বললেন, নে, সব মেন্টালি রেডি হয়ে নে। তোরা এসে তিনটে দিন আমার দারুণ জমিয়ে দিলি।

আমি জিগ্যেস করলাম, দাদা, এখন যে স্টেশনে রওনা হব, তো গাড়ি চালাবে কে?

সুকল্যাণদা বুঝলেন যে, সুখদেওর ভূত এখনও আমার মাথা থেকে যায়নি। তাই হেসে বললেন, কোনও চিন্তা করিস না, বাপ। তোদের জন্যে একজন দারুণ ড্রাইভার ফিট করেছি। একেবারে স্লো-মোশানে গাড়ি চালায়। দারুণ হাত। চেষ্টা করলেও ওকে দিয়ে কোনও অ্যাকসিডেন্ট করাতে পারবি না। নাম ব্রিজলাল।

রামগিরি নতুন একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, স্লো গাড়ি চললে আমার থোড়া বোরিং লাগে। লেকিন ঠিক আছে, আর সোকোলের সোয়ার্থে সহ্য করে নেবে।

আহা! কী দয়ালু! আর কী বাংলা!

আমি ওকে বাংলার জন্যে বাহবা দিলাম। ব্যাটা আওয়াজটা বুঝতেই পারল না–হেঁ-হেঁ করে হেসে কমপ্লিমেন্টটা নিল।

সুকল্যাণদা তাড়া দিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে থেকে গাড়ির প্যা-প্যা হর্ন শোনা গেল।

আমরা তৈরিই ছিলাম। যার-যার মালপত্র, গাঁটরি, পুঁটলি নিয়ে গেস্টহাউসের বাইরে এলাম।

বাব্বা! কী শীত! সেইসঙ্গে ব্যাপক কুয়াশা আর ঝিঁঝির ডাক।

একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডর নুড়ি-ঢালা চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঘোলাটে হেডলাইট জ্বলছে। স্টিয়ারিং-এ যে কেউ একজন বসে আছে সেটুকু বোঝা যাচ্ছে।

আমরা তাড়াতাড়ি পায়ে শীত ডিঙিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। রামগিরি সামনে বসল। আর পেছনে একটা জানলার ধারে সুকল্যাণদা, ওঁর পাশে আমি, তারপর তেজেন।

শীত ঠেকাতে আমরা তিনজন সোয়েটার, কোট, মাফলার, চাদর জড়িয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে গেছি। দেখলাম, ড্রাইভার ব্রিজলালও মোটামুটি মাফলার কম্বলের স্তূপ। মাথায় মাংকি ক্যাপটা এতটাই কপালে নামানো যে, একটা ভাল্লুক-ভাল্লুক ভাব এসে গেছে।

সুকল্যাণদা রোগা চেহারার মানুষ। তা ছাড়া এখানে কয়েক বছর থেকে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছেন। তাই ওঁর গায়ে শীতের আয়োজন আমাদের চেয়ে অনেক হালকা।

শীতের জন্যে গাড়ির কাচ-টাচ সব তোলা ছিল। সুকল্যাণদাকে বললাম, এই একঘণ্টা সিগারেট ছাড়া আপনার তো অসুবিধে হবে।

তাতে সুকল্যাণদা হেসে বললেন, না রে, নো-ট্রাম্প, নো প্রবলেম। এখন সবই কমবেশি মানিয়ে নিয়েছি।

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছিল। চাকার নীচে নুড়ির খড়মড়-খড়মড় শব্দ হচ্ছিল। তারপর গেস্টহাউসের কম্পাউন্ড পেরিয়ে যেতেই মসৃণ পিচের রাস্তা।

আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। হঠাৎই সুকল্যাণদা গাড়ির মধ্যে একটা বোমা ফাটাল। বললেন, তোদের আগে বলিনি সুখদের সঙ্গে আমার হীরাপুরে দেখা হয়েছিল।

সে কী! আঁতকে উঠলাম আমি।

হ্যাঁ রে। দেখি ছেঁড়া জামাকাপড়, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আমাকে দেখেই স্যার, কেমোন আছেন? বলে সেলাম ঠুকল। সুকল্যাণদা কয়েকবার কাশলেন। তারপর ও আমি ওকে বললাম, কীরে, তোর এ অবস্থা কেন? তাতে ও বলল…।

জোরে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর দোষে সুখদেও নাকি কোথাও টিকতে পারেনি। শেষ যে কোম্পানিটায় চাকরি করত তার এক এক্সিকিউটিভ নাকি একদিন গাড়িতে বসে ভুল করে বলে ফেলেছিলেন, এই রে, ফাইলটা বোধহয় বাড়িতে ফেলে এসেছি। ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে সুখদের রাজধানী এক্সপ্রেস শুরু হয়ে গেছে। সুখদেও যখন সাড়ে সাত মিনিটে আট কিলোমিটার পথ পেরিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছোয় ততক্ষণে ভদ্রলোকের বেশ বড় রকমের একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর তারপরই সুখদেওর চাকরি নট। সুতরাং ও তল্পিতল্পা নিয়ে দেশে চলে এসেছে। ওর দেশ মোতিহারি। কদিন হল দেশ থেকে এখানে হীরাপুরে এক চাচার কাছে নোকরির সন্ধানে এসেছে।

আমাকে দেখে সুখদেও তো মহা খুশি। ওর সেলাম আর থামতেই চায় না। তো ওকে দেখে আমার কেমন যেন মায়া হল। ফলে নিয়ে নিলাম।

নিয়ে নিলেন মানে! রামগিরি সামনে থেকে অবাক মন্তব্য ছুঁড়ে দিল পেছনে।

সুকল্যাণদা হাসলেন, বললেন, পুরোনো চেনা লোক…তাই ওকে আমার গাড়ির পাইলট করে নিলাম।

আমি তখন বললাম, এই যে তখন বললেন, যারা গাড়ি জোরে চালায় তাদের আপনি ভীষণ ভয় পান!

হ্যাঁ, ভয় পাই..মানে, পেতাম। কারণ, সুখদেও এখন পালটে গেছে–নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। বললে পরে কথা শোনে।

কথা আর গল্পে মত্ত ছিলাম বলে খেয়াল করিনি গাড়িটা কখন যেন স্পিড নিয়েছে। জানলার কাচ দিয়ে বাইরের আঁধারে যে-বাতিগুলো দেখা যাচ্ছিল সেগুলো সা-সাঁ করে পেছনে ছুটে যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরটা হঠাৎই যেন বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে।

তেজেন ভারী গলায় মন্তব্য করল, এ যে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের মতো ঠান্ডা পড়ে গেল রে।

সুকল্যাণদা হাসতে গিয়ে খকখক করে কাশতে শুরু করলেন। একেবারে ঠান্ডা লাগা কাশি।

আমি জানলার কাচগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কোথাও ফাঁক-টাক নেই তো!

গাড়ির স্পিড আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমি ভয় পেয়ে সুকল্যাণদাকে বললাম, এ কী ব্যাপার দাদা! ব্রিজলাল যে স্লো মোশানে গাড়ি চালায় বললেন!

আগে তো তাই চালাত! পেছন থেকে একটা হেভি ট্রাক ওকে ধাক্কা মারার পর…।

আমি চমকে ব্রিজলালের দিকে তাকালাম। ওর মুখটা ঠাহর করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমাদের গাড়ি তখন উড়ছে। বাইরের সব আলো অন্ধকারে হলদে রেখা এঁকে চলেছে। আর গাড়ির ভেতরটা আরও ঠান্ডা হয়ে গেছে। স্পিড বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডাটাও যেন বাড়ছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ব্রিজলাল!

আমার দিকে যে ফিরে তাকাল সে সুখদেও।

অবাক হয়ে বললাম, এ কী! সুখদেও, তুমি!

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। রামগিরি ভয় পেয়ে হায় রাম! বলে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে সুখদেও সেলাম ঠুকে বলে উঠল, রাম নাম সত্য হ্যায়।

আমার পাশে তেজেন ভয়ে কাঠ হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে গুরুদেব! গুরুদেব! করছিল।

সুকল্যাণদা আমার উরুতে আলতো চাপড় মেরে হেসে বললেন, ভয় পাস না, নো-ট্রাম্প। ব্রিজলালও যা সুখদেও-ও তাই। মরার পরে রামে-রহিমে কি আর তফাত থাকে রে! ব্রিজলাল মারা গেল ট্রাক চাপা পড়ে, আর সুখদেও..আমাকে নিয়ে বেদম স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল…ব্রিজ থেকে আমরা সোজা ছিটকে গেলাম বরাকরের জলে। সব শেষ। তারপর থেকে সুখদেও আমার সবকথা শোনে, আর কেউ জোরে গাড়ি চালালেও আমার আর ভয়-টয় কিছু করে না। মরার পরে আবার ভয় কীসের বল! শুধু ওই বরাকরের জলে থেকে-থেকে ঠান্ডা লেগে এই বিচ্ছিরি কাশিটা হয়েছে।

আমরা তিনজন তখন পাথর। নড়াচড়ার কোনও ক্ষমতা নেই।

সুকল্যাণদা কাশলেন আবার। তারপর হেসে বললেন, শোন, ওই অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ার পর থেকে শুধু তেনারাই পালা করে আমার গাড়ি চালায়। ব্রিজলাল, সুখদেও, পরাশর, নরেশ…ওরা সবাই।

কথা শেষ করে হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন সুকল্যাণদা। কিন্তু সে-হাসির সবটা আমার শোনা হয়নি। কারণ, বোধহয় ওই হাসির মাঝখানেই সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলাম।

# মাননীয় বিচারকমণ্ডলী

**মাননীয় বিচারকমণ্ডলী**

এখন হরিহর তলাপাত্রের মামলাটার আদ্যোপান্ত বিবরণ আমি আপনাদের সামনে পেশ করব। আপনারা তো জানেন, হরিহরবাবু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়েছে কি না তা এখনও অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কারণ কাঠগড়ার পাশে শোয়ানো অসাড় দেহটা দেহ না মৃতদেহ সেটা নিশ্চিতভাবে কোনও ডাক্তারের পক্ষেই বোধহয় বলা সম্ভব নয়। এখানে ডাক্তার আছেন? ভালো কথা। ও, আপনিই ডাক্তারবাবু? কী দেখলেন? বেঁচে আছে! আশ্চর্য! যাক, তা হলে মামলার শুনানি চলতে পারে।

হুজুরগণ, এই হরিহর তলাপাত্রের মতো মানুষগুলো সত্যিই আশ্চর্য! কারণ, অনেক রকম সঙ্কটকে ফাঁকি দিয়ে এরা দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। এরা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, বন্যা অথবা খরা এদের শেষ করতে পারে না, দুর্ভিক্ষে কিছু হয় না, এমনকী দিনের পর দিন না খেয়েও এরা দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের দেশের সবরকম অনশন ধর্মঘটের জন্য এরাই সবচেয়ে উপযুক্ত। সত্যি বলতে কি, এদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বোধহয় ভগবানকেও ভাবিয়ে তোলে। অবশ্য জানি না, সত্যি-সত্যি তিনি এসব ভাবার অবসর পান কি না।

এখন কথা হল, এরকম সাংঘাতিক যার সহ্যক্ষমতা সেই লোক এরকম অবস্থায় পড়ল কেমন করে? আর পড়ল বলেই না আজ তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যার জঘন্য চেষ্টার সরকারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মি লর্ডস, আত্মহত্যার আসল কারণটা জানতে গেলে আমাদের আর-একটা জিনিস আগে জেনে নিতে হবে। সেটা হল, হরিহর তলাপাত্রের জীবন, তাঁর

জীবনযাত্রার ধাঁচ। যদি অনুমতি করেন, তাহলে খুব সংক্ষেপে সেটা আপনাদের শুনিয়ে দিতে পারি।

তলাপাত্রের শক্ত ভাঙা চোয়াল, কপালের ভাজ, আঙুলের গঠন আর খসখসে শুকনো চামড়া দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন উনি একটা ছাপোষা চাকরি করতেন। বিয়ে? হ্যাঁ, বিয়েও করেছেন। ওই যে, এক কোণে সাদা শাড়ি পরে বসে রয়েছে ওঁর বিধবা না, মানে সধবা স্ত্রী। পাশেই বসে আছে ওঁদের অবিবাহিতা মেয়ে রুমু। আর কেষ্ট নামে একটি ছেলেও আছে, তবে সে আদালতে আসেনি, আসতে পারেনি। কারণ সবাই চলে এলে ঘর পাহারা দেবে কে? তা ছাড়া কেষ্ট অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। মাসে-মাসে ওর শরীরে দু-তিন বোতল রক্ত দিতে হয়। হ্যাঁ, সরকারি হাসপাতাল থেকে বেশ সস্তায়ই রক্তের ব্যবস্থাটা হয়ে যায়।

তো যা বলছিলাম। হরিহর তলাপাত্র মোটামুটি মাইনে পেতেন। তাতে মাসের গোটা কুড়ি দিন কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে দেওয়া যেত। অবশ্য এতে তার বউয়েরও কিছু অবদান ছিল। সেকেন্ডহ্যান্ড সেলাইকল ঘড়ঘড় করে চালিয়ে রেডিমেডের সেলাই করত সে। তাতে ওদের সংসারের জং-ধরা চাকায় কিছুটা তেল-মোবিল পড়ত আর কি। না, রুমু সেলাই-টেলাই করত না। ও পাড়ার লোকের ফাইফরমাশ খাটত। যেমন, কারও দোকানপাট করে দেওয়া, কারও বাচ্চাকে ইস্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, কাউকে চাল গুঁড়ো করতে সাহায্য করা। স্বামী-স্ত্রী সিনেমায় গেলে তাদের ঘরদোর পাহারা দেওয়া, কিংবা একবেলার জন্যে কোনও বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন পেলে দু-বেলার রান্নাটাই সেরে দিয়ে আসা। এসব উপকারের জন্যে খুশি হয়ে পাড়াপড়শিরা রুমুকে শাড়ি-ব্লাউজ, কখনও সিনেমা দেখার টাকা, কখনও বাড়তি খাবারদাবার দিত। না-না, রুমুকে কাজের লোক ভাববেন না। কথাটা খুব খারাপ শোনায়। বরং বলতে পারেন, ও পাড়ার সবাইকে ভালোবাসত, আর পড়শিরাও ভালোবাসত ওকে।

হ্যাঁ, তো সেলাইকল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তলাপাত্রবাবুর বউয়ের চোখে চশমা উঠল। রুমুর বয়েস বাড়তে লাগল। কেষ্টর শরীরের রক্ত কমতে লাগল। আর এদিকে হরিহর তলাপাত্র রোজ সকালে ওঠেন, বাজার করেন, দাড়ি কামান, অফিস যান, সেখানে দাবড়ানি খান, বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে বাড়ি ফেরেন, এক কাপ চা খান, ধারকরা খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, খাটে শুয়ে থাকা কেষ্টর মাথায় হাত বোলান, বউয়ের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করেন, রাতের খাওয়া সারেন, কেষ্টর পাশে শুয়ে পড়েন, রুমু মায়ের সঙ্গে মেঝেতে চাদর পেতে শুয়ে পড়ে সেটা

দেখেন, আলো নিভিয়ে মনে মনে তিনবার ইষ্টনাম জপ করে ঘুমিয়ে পড়েন। আবার পরদিন সকালে ওঠেন, বাজার করেন, দাড়ি কামান, অফিস যান, সেখানে…।

মোটমাট ধরে নিন, মি লর্ডস, সকালে ওঠেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন, হরিহরবাবুর এই দুটো কাজের ওপরে কেউ যেন দুটো পৌনঃপুনিক ফুটকি বসিয়ে দিয়েছে। বউয়ের রেডিমেডের সেলাইয়ের মতো ওর যেন এক রেডিমেড জীবনযাত্রা। অর্থাৎ, রোজ সেই একই চক্র। বিষচক্র। কোনও সাপ যেন নিজের লেজ গিলে ফেলতে চাইছে।

ও, হ্যাঁ। মাসের দশ দিনের হিসেব এখনও আপনাদের দেওয়া হয়নি। ওই দশটা দিন চলত পাড়াপড়শির থেকে ধার করে। অবশ্য শুধু এইটুকু বললেই সবটা বলা হয় না। কারণ, গত বছর কয়েক ধরে হরিহর তলাপাত্রের এক অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছিল। তিনি দেখলেন, তার প্রত্যেকটা দিনই কাটছে নাভিশ্বাসের মধ্যে। টাকা রোজগার করছেন, সংসারের বোঝা ঠেলছেন, ওভারটাইম করে প্রতিবেশীদের ধার মেটাচ্ছেন, আর সারাটা মাস হাতে গড়া রুটি, আলু-পোস্তর চচ্চড়ি, ডাল আর লঙ্কাভাজা–অথবা ওইরকম কিছু দিয়ে পেট ভরাচ্ছেন।

ইলিশ মাছ হরিহরবাবু চোখে দেখেছেন। এক-আধবার নেমন্তন্ন বাড়ির দৌলতে চেখেও দেখেছেন। মাংসও তাই। এরকম আরও অনেক খাবারও তাই। সুতরাং নিজের লেজ গিলতে-গিলতে সাপটা যখন ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে, তখনই মরিয়া হরিহর তলাপাত্র জীবনযাত্রায় একটা মোচড় দিলেন। তার বউ চমকে গেল, রুমু ভয় পেল, আর কেষ্ট বাবাকে আরও ভালোবাসতে শিখল, শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আরও। কারণ নিতান্ত দুঃসাহসী না হলে কেউ এরকম ঝুঁকি নিতে পারে!

না, হুজুরগণ, চুরি-চামারি, খুন বা ডাকাতির পথে পা বাড়াননি হরিহর তলাপাত্র। উনি শুধু মাসের প্রথম পাঁচটা দিন বড়লোক হয়ে গেলেন। বাড়িতে আসতে লাগল চর্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয়। কিন্তু ছনম্বর দিন থেকেই ডাল রুটি কাঁচালঙ্কা। কখনও ধার, আবার প্রাণান্ত করে ধার শোধ। বউ আর মেয়ে তাকে অনেক বুঝিয়েছিল, বারণ করেছিল; বলেছিল, এসব পাগলামি কোরো না। কিন্তু হরিহর তলাপাত্র তখন মরিয়া। তিনি হেসে বউকে বলেছিলেন, এমনিতেই তো বেঁচে মরে আছি। সারাটা জীবন এইভাবেই কাটাতে হবে। তা হলে কি কোনদিনও তোমার বা ছেলেমেয়ের মুখে দুটো ভালো খাবার তুলে দিতে পারব? তার চেয়ে এখন মন্দ কী! কষ্ট তো এমনিতেই আছে, থাকবেও। বরং পাঁচটা দিন সুখের স্বাদ

নিতে পারলাম, মানুষের মতো বাঁচলাম। বাকি পঁচিশটা দিন তো আবার সেই ছারপোকার জীবন–আগে যেটা তিরিশ দিন ছিল। দু-আঙুলের চাপের মাঝে থেকেও শরীরটা যতদূর সম্ভব চ্যাপটা করে পাতলা করে জীবিত থাকা। মরেও বেঁচে থাকা।

ব্যস, এইভাবে চলতে লাগল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। প্রথম পাঁচদিন ফুর্তিতে থেকে ভালো-মন্দ খাওয়া, জামাকাপড় কেচে ইস্তিরি করে পরা, তারপর আবার ছারপোকার জীবনে অধঃপতন। মাঝে মাঝে দুর্বল কেষ্ট চলাফেরা করতে গিয়ে পড়ে যায়। হাত-পা ভাঙে, হাড়-মাংস দেখা যায়, কিন্তু রক্ত পড়ে না। বউয়ের চোখ ব্যথা হলে রেডিমেড সেলাই দু-একদিন বন্ধ থাকে। রুমুও ফাইফরমাস খাটে। ওর বিয়ের বয়েস পা টিপেটিপে পেরিয়ে যায়। মায়ের হা-হুঁতাশ সত্ত্বেও কোনও ছেলে-বন্ধু জোটাতে পারেনি রুমু। পারবেই বা কেমন করে! ওর ওই রূপ নিয়ে খারাপ মেয়ে হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাও বেশ শক্ত। সুতরাং সংসারটা নতুন ছকে গড়িয়ে চলতে লাগল। এবং হরিহরবাবুর অজান্তেই নিজের লেজ গেলা সাপটা একটা থেকে দুটো হয়ে দাঁড়াল। দুটো সাপ একে অপরের লেজ গিলতে শুরু করল। জন্ম নিল নতুন এক বিষচক্র।

জোড়া সাপের বৃত্ত আকারে ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগল। একটা ফাঁসির দড়ি যেন এঁটে বসতে লাগল হরিহর তলাপাত্রের শীর্ণ গলায়। কারণ, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলেন। মানুষের মতো বাঁচার স্বাদ কাকে বলে তা বুঝতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু, মি লির্ডস্‌, আরশোলা কখনও পাখি হয় না, ছারপোকা কখনও মানুষ হতে পারে না। সুতরাং সংসারের চাকায় আবার কাচকোঁচ শব্দ শুরু হল। টাল খেয়ে গেল গাড়িটা। গতি কমে গেল, টলমল করতে লাগল। সাপ দুটোর মাথা পরস্পরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আর তখনই...।

তখনই বিষ খেলেন হরিহর তলাপাত্র। ছারপোকা মারার বিষ। মরার বিষ। এক শিশি বিষ গিলে ফেললেন ঢকঢক করে। সেদিনটা ছিল মাসের ছতারিখ। ভোরবেলা বাথরুম থেকে তার গোঙানি শোনা গিয়েছিল। বউয়ের চিৎকার, রুমুর চিৎকার, কেষ্টর চিৎকার পাড়ার লোকদের ডেকে এনেছিল। তারাই দরজা ভেঙে উদ্ধার করে হরিহর তলাপাত্রকে।

না, চিকিৎসায় বিশেষ সুবিধে হয়নি। গত তিনদিন ধরেই অসাড় হয়ে পড়ে আছেন হরিহরবাবু। প্রাণটা যে আছে তা শুধু কোনওরকমে টের পাওয়া যায়। তা-ও কখনও কখনও নাড়ির স্পন্দন উবে যায়, বুকের ধুকপুকুনি ডুবে যায়। একেই কি বলে জীবন্ত অবস্থা? তাই যদি হয়, মি লর্ডস্, তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় হরিহর তলাপাত্রের জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন আসেনি। আগেও তিনি বেঁচে মরে ছিলেন, কিংবা মরে বেঁচে ছিলেন–আর এখনও তাই। এইরকম একটা মানুষকে কী-ই বা শাস্তি দেবেন আপনারা? এই মানুষটার বেলায় আত্মহত্যার জঘন্য অপচেষ্টার একমাত্র কঠিন শাস্তি হতে পারে মানুষটাকে বাঁচিয়ে তোলা। তারপর তাকে আগের জীবনধারার ছকে দাবার খুঁটির মতো সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া। তখন সাপ দুটো আবার পরস্পরের শরীর গিলে খেতে শুরু করবে। বিষচক্রের বৃত্ত ক্রমশ ছোট হবে মাপে। আবার শুরু হবে পাঁচদিন আর পঁচিশ দিনের লুকোচুরি খেলা। সে যে সহ্য করা যায় না, মি লর্ডস্। আমাদের জীবনটা যে খুব কষ্টের। ভীষণ কষ্টের।

তাই আমার একান্ত অনুরোধ, হরিহর তলাপাত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক সপরিবারে। কারণ তার আত্মহত্যার চেষ্টার কিছু না কিছু দায়ভাগ পরিবারের প্রত্যেকেরই রয়েছে। তা ছাড়া, ওই মানুষটাকে একা দণ্ড দেওয়ার অর্থও তো সেই একই। পরিবারের বাকিগুলোর মৃত্যুদণ্ড তিলে তিলে মৃত্যু। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা, হুজুরগণ, হরিহর তলাপাত্রকে সপরিবারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। মৃত্যুদণ্ড! একটুও বেশি নয়, একটুও কম নয়। তাতেই আমি সবচেয়ে বেশি শান্তি পাব। আর আদালতে দর্শক হিসেবে যারা হাজির রয়েছে তারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

কী বলছেন? একথা কেন বলছি? হুহ! সেটুকুও যদি আপনারা বুঝতেন! মি লর্ডস, আমাকে বা আদালতে হাজির দর্শকদের দেখে আপনারা কি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না? দেখতে পাচ্ছেন না, কী উদগ্রীব আগ্রহে আমরা আপনাদের সিদ্ধান্ত শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি? তার কারণ, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন নিজের লেজ গেলা সাপের মতো। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা দিনই হুবহু একরকম। একই মাপের রেডিমেড জীবনযাত্রা আমাদের। আমরা প্রত্যেকেই অ্যানিমিয়ার রুগি নিয়ে, বিয়ের বয়েস পেরোনো মেয়ে নিয়ে, চাল-ডাল-নুন-তেলের দামের সঙ্গে প্রতিদিনই লড়াই করি। আমরা মরে বেঁচে আছি। কিংবা বেঁচে মরে আছি। আমাদের প্রত্যেকেরই চোয়াল ভাঙা, শক্ত। আমাদের কপালে অসংখ্য ভাঁজ। চামড়া শুকনো, খসখসে। তবে হ্যাঁ, নামগুলো

শুধু আলাদা। অবশ্য এক হলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি ছিল না। তা ছাড়া, এই দেখুন, আমাদের প্রত্যেকেরই পকেটে রয়েছে এক শিশি করে ছারপোকা মারার বিষ। মরার বিষ।

সুতরাং, বুঝতেই পারছেন মি লর্ডস্, আপনাদের রায় আমাদের সবার পক্ষে কত জরুরি। সেই জন্যেই তো উৎকর্ণ হয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনতা–আপনাদের সিদ্ধান্ত শোনার অপেক্ষা করছি। আদালতের ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনছি, আর অপেক্ষা করছি…। আপনারা বলুন…।

# বিদায় সংবর্ধনা

**বিদায় সংবর্ধনা**

সত্যসুন্দরের চোখের কোণে ধীরে-ধীরে বাষ্প জমছিল।

ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, ছমছমে ধূপের গন্ধ, সবকিছু ক্রমশ তাকে অভিভূত করে ফেলছিল। নিজের অবাক চোখ দুটোকে বড় হলঘরটার চারপাশে বুলিয়ে নিলেন সত্যসুন্দর। কলেজে এই ঘরটাই সবচেয়ে বড় ক্লাস-ঘর। এখানে পাসকোর্সের ছেলেমেয়েদের ক্লাস হয়। কিন্তু এখন সেই ছেলেমেয়েদের নির্ধারিত বেঞ্চিগুলিতে মাননীয় প্রিন্সিপালসাহেব থেকে শুরু করে দশ-বারোজন অধ্যাপক, জনা বিশ সত্যসুন্দরের সহকর্মী, এবং পাঁচ-ছজন ছাত্র-ছাত্রী বসে আছে। সকলেই প্রগাঢ় ভালোবাসা মাখা আতুর চোখে সত্যসুন্দরকে দেখছে। কারণ আজ কলেজ ল্যাবরেটারির মেকানিক সত্যসুন্দর দাসের বিদায় সংবর্ধনা।

খাটো পাটাতনের ওপরে দাঁড় করানো লম্বা টেবিল। টেবিলের পিছনে তিনটে চেয়ার। বাঁ দিকের চেয়ারে সঙ্কুচিতভাবে বসে রয়েছেন সত্যসুন্দর। বাকি দুটি চেয়ার এখনও খালি। ও-দুটো নির্দিষ্ট রয়েছে সভাপতি এবং বিশেষ অতিথির জন্য।

চেয়ারের সারির পিছনেই কুচকুচে কালো বিশাল ব্ল্যাকবোর্ড। তাতে চকখড়ি দিয়ে নানান অঙ্ক কষা ছিল, কিন্তু মাঝামাঝি অংশটা ডাস্টার দিয়ে মুছে গোটা-গোটা হরফে কেউ লিখে দিয়েছে : ১৭ই নভেম্বর বেলা দুটোয় শ্রীসত্যসুন্দর দাসের ফেয়ারওয়েল।

চেয়ার-টেবিল-পাটাতন ইত্যাদি থেকে কিছুটা তফাতে আরও দুটি চেয়ার দাঁড় করানো রয়েছে। তার একটিতে সযত্নে রাখা আছে দুটি ফুলের তোড়া, একটি

রজনীগন্ধার গোড়ে মালা এবং একগুচ্ছ জ্বলন্ত সুগন্ধি ধূপ। বাকি চেয়ারটিতে একটি কাচে বাঁধানো তৈলচিত্র ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে। চিত্রের ব্যক্তি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-প্রিন্সিপাল ডক্টর এস. কে. মিত্র। চোদ্দো বছর হল উনি মারা গেছেন। কিন্তু তারপর থেকে কলেজের লঘুগুরু যে-কোনও অনুষ্ঠানে ডক্টর মিত্রের আবক্ষ চিত্রটি সর্বদাই উপস্থিত থেকেছে। এ ঘটনায় অনুমান হতে পারে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। এবং এ-অনুমান পুরোপুরি সত্যি।

ডক্টর মিত্রের ছবিতে আন্তরিকতার সঙ্গে মালা পরিয়ে দিচ্ছিলেন শচীদুলাল কর্মকার। লম্বা শক্ত দেহের কাঠামো। মাথার চুল ও গোঁফের রং ধবধবে সাদা। বাষট্টি বসন্ত পেরিয়ে গেছেন। শচীদুলাল, কিন্তু তার মধ্যে যে-কোনও একটি বসন্ত তার মাঝারি ফরসা মুখে স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে। শচীদুলাল দু-বছর আগেই রিটায়ার করেছেন, কিন্তু কলেজে এখনও নিয়মিত আসেন, অফিসের কাজকর্ম দেখেন। বাড়িতে তার নাকি সময় কাটতে চায় না। হেসে বলেন, ঘানির বলদের কাধ থেকে যদি জোয়াল খুলে ছেড়ে দেন, দেখবেন তখনও ব্যাটা গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা হলুম গে সেইরকম। রিটায়ার্ড হয়েও টায়ার্ড হই না।

ডক্টর মিত্রের ছবিতে মালা পরানো শেষ করে আরও কয়েকটা ধূপকাঠি জ্বেলে দিলেন শচীদুলাল। তার মনে পড়ছিল নিজের ফেয়ারওয়েলের দিনটা। তারপর থেকে রোজই কলেজে আসেন অথচ কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে। ফেয়ারওয়েলের দিনটা শাসনের চোখে তার দিকে তাকায়। নিত্য অফিসসংক্রান্ত যেসব কাজগুলো তিনি করেন, মনে হয় সেগুলো সবই অনধিকার চর্চা। কিন্তু তা হলেও ভালো লাগে। এ কলেজ থেকে রিটায়ার অনেকেই করেছেন, কিন্তু শচীদুলালের মতো হাজিরার ধারাবাহিকতা কেউ রাখেননি। হয়তো এই কারণেই প্রত্যেক বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে শচীদুলালের ওপরেই দায়িত্ব পড়ে আয়োজনের প্রধান কর্মকর্তার ভূমিকার। এবং শচীদুলাল তা পালনও করেন সাগ্রহে। যেমন এখন করছেন।

ক্লাস-ঘরের প্রথম সারির বেঞ্চিগুলিতে কলেজের অন্যান্য অশিক্ষক কর্মচারী বসেছেন। তাদের নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন চলেছে। কেউ-কেউ বা সত্যসুন্দরের কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার স্মৃতিচারণ করছেন। যেসব ছাত্রছাত্রী সত্যসুন্দরকে মাত্র কয়েকবছর দেখেছে তারা পিছনের সারিতে বসে আগ্রহ নিয়ে প্রথম সারির আলোচনা শুনতে চেষ্টা করছিল। ঘড়িতে দুটো বেজে কুড়ি মিনিট,

অথচ অনুষ্ঠান এখনও শুরুই হল না, এই অভিযোগও করছিল উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের দু-একজন।

ধূপের সাদা ধোঁয়া ক্রমে হলঘরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সকলেই তৈরি হচ্ছিলেন শোকতাপসমৃদ্ধ একটি বিদায় সংবর্ধনাসভা প্রত্যক্ষ করার জন্য। চেয়ারে একা বসে থাকা সত্যসুন্দরকে মনে হচ্ছিল পার্ট ভুলে যাওয়া কোনও অসহায় অভিনেতা। এবং পরিচালক এই সঙ্কট-মুহূর্তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না তার দিকে।

সামনের সারি থেকে ছোকরা লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হরিশঙ্কর বলে উঠল, শচীদা, শুরু করে দিন।

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট নরপতি পাশে বসে থাকা লাইব্রেরিয়ান অরুণ সামন্তকে জিগ্যেস করলো, সামন্তদা, প্রেজেন্টেশানের প্যাকেটটা কার কাছে?

অরুণ সামন্ত বললেন, ওই ফুলের তোড়ার পাশে রাখা আছে।

প্রিন্সিপাল ডক্টর নবীন সরকার ও অন্যান্য অধ্যাপক পিছনের দু-সারি বেঞ্চিতে ঘন হয়ে বসেছেন। আজকের অনুষ্ঠান মূলত অশিক্ষক কর্মচারীদের, তাই ওরাই অগ্রণী। অধ্যাপকরা চাঁদা ও উৎসাহ দিয়ে অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করেছেন। সুতরাং অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিত থাকাটাও জরুরি ছিল। তাদের অনেকেই এসেছেন এবং সচেতনভাবেই গৌণভূমিকা নিয়েছেন।

ব্যবস্থাপনার কাজ সেরে শচীদুলালের দীর্ঘ দেহ এগিয়ে এল পিছনের বেঞ্চির দিকে। তার চোখ অধ্যক্ষ নবীন সরকারের চোখে। দু-দিকের বেঞ্চির সারির মাঝের অলিপথ ধরে ডক্টর সরকারের কাছে এসে দাঁড়ালেন শচীদুলাল। সাদা শার্ট, কালো জহরকোট ও ধুতি পরা শরীরটাকে অনেকটা ঝুঁকিয়ে সরকার সাহেবের খুব কাছাকাছি মুখ এনে বললেন, স্যার, তা হলে শুরু করে দিচ্ছি।

নীরব সম্মতি জানালেন ডক্টর সরকার। উনি সাধারণত খুব কম কথা বলেন, তাঁর দু-পাশে বসে থাকা দুই অধ্যাপক, সুরেন পাত্র আর রমেশ সমাদ্দার, হলঘরে হাজির হওয়া ইস্তক ডক্টর সরকারকে নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সরকার সাহেবের তরফ থেকে বিশেষ উচ্চবাচ্য শোনায় তারা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, সরকার সাহেব খুশি হয়েছেন কি না। খুশি হলে সুরেন পাত্রের

পাওনা ইনক্রিমেন্টটা যথাশীঘ্র কার্যকরী হবে, এবং রমেশ সমাদ্দার যে দীর্ঘদিন বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছেন সে-চেষ্টাও সফল হবে কারণ বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই নবীন সরকারের যথেষ্ট পরিচিতি এবং ওজন আছে।

অশিক্ষক কর্মচারীদের ইউনিয়ন নেতা অনঙ্গ নস্কর প্রথম সারিতে বসেছিলেন। শচীদুলালের সঙ্গে কীসব পরামর্শের পর তিনি বেঞ্চির আসন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সোজা গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পাটাতনের ওপরে, চেয়ার-টেবিলের ঠিক পাশটিতে। তার মঞ্চে ওঠার সহজ সাবলীল ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় এ-জাতীয় অভ্যাস তার ভালোরকম আছে। ঘরের সিলিং-এর দিকে একপলক তাকিয়ে বাঁ-হাতটি পিছনে রেখে অনঙ্গ নস্কর বলতে শুরু করলেন, সমবেত অধ্যাপকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও সহকর্মী কমরেডগণ! আজ আমাদের অত্যন্ত দুঃখের দিন। আমাদের প্রিয় কমরেড শ্রীসত্যসুন্দর দাস রিটায়ার করছেন।

ঘরের সর্বশেষ সারিতে বসা বয়স্ক অধ্যাপক মানব মজুমদার পাশে বসা তরুণ অধ্যাপক দীপক রায়চৌধুরিকে চাপা গলায় বললেন, আজ প্রিয় কমরেড সত্যসুন্দর দাস! যদ্দিন ছিল তদ্দিন তো ওর সঙ্গেও অনঙ্গ বখরা নিয়ে খেয়োখেয়ি করে মরেছে!

দীপক বলল, আর সত্যদাই বা দেবে কেন? অনঙ্গ তো দিনরাত্তির ইউনিয়নের নাম করে ফাঁকি মারে, কাজটা করে আর কখন? আরে বাবা, কাজ না করলে কখনও বখরা পাওয়া যায়। বখরাও যে কষ্ট করে আয় করার জিনিস।

মানব মজুমদার হাসলেন। তাঁর নাকের দুপাশে ভাঁজ প্রকট হল। তিনি এখন সোজা অনঙ্গর দিকে তাকিয়ে। অনঙ্গ তখন বলছেন, এই প্রিয় সতুদাকে নিয়ে আজ যে-অনুষ্ঠান, আমি সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নবীন সরকারের নাম প্রস্তাব করছি।

প্রথম সারি থেকে কয়েকটি স্বর মিলিতভাবে বলে উঠল, আমরা এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

আর বিশেষ অতিথি হিসেবে আমি আমাদেরই প্রাক্তন সহকর্মী কমরেড শ্রীশচীদুলাল কর্মকারের নাম প্রস্তাব করছি।

আবার একইরকম সর্বান্তঃকরণ-সমর্থন পাওয়া গেল প্রথম সারি থেকে। সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাততালিও।

একটু পরেই অনঙ্গ নেমে এলেন। শচীদুলালকে সঙ্গী করে এগিয়ে এলেন সরকার সাহেবের দিকে। সরকার সাহেব সভাপতি হওয়ার জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং, ওঁরা কাছাকাছি এসে পড়ার আগেই বেঞ্চির আসন ছেড়ে উনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাকে পথ ছেড়ে দিতে সমাদ্দারকেও বাইরে বেরোতে হয়েছিল। ডক্টর সরকার মঞ্চের দিকে এগোতেই সমাদ্দার ফিরে এসে বসলেন পাত্রের পাশে। পরস্পরের চোখাচোখি হল ক্ষণিকের জন্য।

মঞ্চে উঠে সত্যসুন্দরের পাশের চেয়ারটিতে বসলেন ডক্টর সরকার। তার পাশে খালি চেয়ারটিতে বসিয়ে দেওয়া হল শচীদুলালকে। তারপর অনঙ্গ বললেন, সভাপতি হিসেবে মাননীয় ডক্টর সরকারকে আমি কিছু বলতে অনুরোধ করছি

অনঙ্গ নস্কর এবার নিজের আসনে ফিরে গেলেন। সভাপতির ভাষণ শুরু হল।

হলঘরের তিনটে কাচের জানলা। সেগুলো বন্ধ ছিল। কিন্তু দুটো শার্সি ভাঙা থাকায় শীতের হাওয়া ঢুকে পড়ছিল ঘরের মধ্যে। তা ছাড়া একটা কাক এসে বসে পড়েছে ভাঙা জানলার ফ্রেমে। এই কাকটি কলেজ এলাকার বাসিন্দা এবং বিশেষ করে এই ভাঙা জানলাটার প্রতি তার আশ্চর্য টান আছে। ছাত্রছাত্রীরা জানে, ক্লাস চলাকালীনও কাকটি প্রায়শই এসে বসে থাকে। ফলে তারা ঠাট্টা করে বলে, কাকটা হায়ার সেকেন্ডারি পাস। বিএসসি-র ক্লাস করতে এসেছে। সুখের ও স্বস্তির ব্যাপার, কাকটি জানলার বসে মোটেও ডাকাডাকি করে না। চুপটি করে মানুষের কথা শোনে।

নবীন সরকারের চশমা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তখন বলতে শুরু করলেন ।

সত্যসুন্দরবাবুর পরিচয় আজ আর নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। শুধু বলতে পারি, কলেজের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একটি খুঁটি সরে গেল। আমাদের ল্যাবরেটরির সমস্ত যন্ত্রপাতি সত্যবাবুর তত্ত্বাবধানে যেরকম সুস্থ ও সবল ছিল তা নিছক নজির হয়ে থাকবে এখন থেকে। তার মতো দক্ষ মেকানিক আমি এর আগে কখনও দেখিনি। তা ছাড়া এই কলেজকে উনি নিজের সংসারের মতো আন্তরিক চোখে দেখতেন। সবসময় বলতেন…।

অশিক্ষক কর্মচারীরা অভিভূত হয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন।

তাদের পিছনের সারিতে বসা ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী চোখে প্রিন্সিপালের দিকে তাকিয়ে। ওরা অল্প-চেনা সত্যদা সম্পর্কে অনেক নতুন-নতুন ঘটনা আজ জানতে পারছে। শ্রদ্ধায় দ্রব হয়ে আসছে। ওদের সুকুমার মন।

কিন্তু একেবারে পিছনের সারিতে ছবিটা অন্যরকম ছিল।

সমাদ্দার চাপা হাসলেন। তাতে অধ্যাপক পাত্র প্রশ্ন করলেন, হাসলেন কেন?

জানেন না, কেন হাসছি! সত্যকে বেলা দুটোর পর কদিন কলেজ চত্বরে পাওয়া গেছে। বলতে পারেন? আমাদের ল্যাবরেটরি থেকেই মাল ঝেড়ে-ঝেড়ে ও নিজের বাড়িতে একটা ইনমেন্ট ওয়ার্কশপ খুলেছেনাকি এ-খবরও রাখেন না?

পাত্র কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, সে কী! ল্যাবরেটরির মালপত্রের কোনও হিসেব নেই? যদি সত্য ধরা পড়ত, তা হলে তো ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি হত!

সমাদ্দার ধূর্ত হাসলেন। বললেন, আচ্ছা ভালোমানুষ মশাই আপনি! সরকারি কলেজে আবার মালপত্রের হিসেব থাকে না কী? আর এখানে কে-ই বা ধরা পড়ে, কে-ই বা কার চাকরি খায়। কিছুই বোঝেন না! ওই জন্যেই আপনার ইনক্রিমেন্ট অ্যাদ্দিন ধরে ঝুলে রয়েছে।

নিজের অজ্ঞতায় পাত্র লজ্জা পেলেন। কেমন একটা ভক্ত-ভক্ত ভাব করে তাকালেন প্রভু সমাদ্দারের দিকে। বললেন, সত্যি, আপনি বেশ খবর-টবর রাখেন।

সমাদ্দার হাসলেন। তার পোকায় খাওয়া একজোড়া কষদাঁত দেখা গেল। অবশেষে গলার স্বর নামিয়ে এনে বললেন, সত্যর একটা কালো তাপ্পিমারা ফোলিও ব্যাগ ছিল দেখেননি? ওর ভেতরে থাকত যন্ত্র সারানোর যন্ত্রপাতি। দুটোর পরই ব্যাগ নিয়ে সত্য বেরিয়ে পড়ত। ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় ইনস্ট্রুমেন্ট সারাত, নয়তো সারানোর কন্ট্রাক্ট ধরত। ওঃ, প্রচণ্ড ধড়িবাজ!

…সত্যবাবুর আর একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট হল, উনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই চাকরিতে যোগ দেন, এবং আজ ষাট বছর বয়েসে অবসর নিচ্ছেন। আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-প্রিন্সিপাল ডক্টর এস. কে. মিত্র নিজে সত্যবাবুকে

এই কলেজে নিয়ে আসেন, নিজের হাতে তাকে কাজ শিখিয়েছেন। সত্যবাবুর কাছ থেকেই এসব কথা আমি শুনেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডক্টর সরকার আবার বললেন, খুব খারাপ লাগছে যে আজ উনি অবসর নিচ্ছেন। ফেয়ারওয়েল কথাটা শুনলেই মনে হয় সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান। কিন্তু আমি সে-অর্থকে সত্যি বলে মনে করি না। সত্যবাবুকে আমি বলতে চাই, একলেজ তার নিজের কলেজ। উনি যেন কোনওমতেই কলেজের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন না করেন। আমরা আশা করব, শচীবাবুর মতো উনিও আমাদের আপনার জন মনে করে বরাবর পাশে-পাশে থাকবেন। সত্যবাবুকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শচীদুলাল মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিলেন। সত্যর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে ভেদাভেদের পাঁচিল তোলা শুরু হল। তবে এরপর সত্য তাঁর মতো কলেজে আসবে না। শচীদুলাল কদিন আগে ওকে জিগ্যেস করেছিলেন। ও বলেছিল, কী করে আসব, শচীদা! আমার কারখানা রয়েছে, নাতি-নাতনি রয়েছে, বড় মেয়েটার বাচ্চা হবে, বাড়ি এয়েছে। না, আমার আসা হবে না।

শচীদুলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার কারখানা নেই। ছেলেরা ভিন্ন হয়ে গেছে, অতএব নাতি-নাতনিও কাছে নেই। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন জব্বলপুরে। সে শুধু চিঠি লেখে। শচীদুলালের স্ত্রী আছে, পেনশনের টাকা আছে, আর কলেজ আছে। কলেজটাই বেশি করে আছে।

ডক্টর সরকার বক্তৃতা শেষ করে বসতে যাচ্ছিলেন, তক্ষুনি একটা গোড়ে মালা হাতে অনঙ্গ প্রায় ছুটে এলেন তাঁর কাছে। চাপা গলায় কী যেন বললেন। তারপর মালাটা সরকার সাহেবের হাতে ধরিয়ে অনঙ্গ নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। সরকার সাহেব মালাটা নিয়ে সত্যসুন্দরের গলায় পরিয়ে দিলেন। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন সত্যসুন্দর। সরকার সাহেব তাঁকে কাঁধে হাত রেখে বসতে বললেন। হলঘরে হাততালির বন্যা বয়ে গেল। ডক্টর সমাদ্দারও হাসিমুখে হাততালি দিলেন।

সত্যসুন্দরের চোখের কোল ভিজে উঠেছে। রুদ্ধস্বরে কোনওরকমে উচ্চারণ করলেন, স্যার, আমি কয়টা কথা বলতে চাই।

ডক্টর সরকার কাঁধে হাত চাপড়ে নরম গলায় বললেন, বলবেন, আগে শচীবাবুর বলা হোক, তারপর।

অনঙ্গ নস্কর উঠে এসে দুটো ফুলের তোড়া নিয়ে তুলে দিলেন শচীদুলালের হাতে।

শচীদুলাল তোড়া দুটো সত্যসুন্দরের হাতে দিলেন। সত্যসুন্দর উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য ঝুঁকে সে-দুটো গ্রহণ করলেন। নামিয়ে রাখলেন সামনে, টেবিলের ওপরে। গলার মালাটাও খুলে ফেললেন, রাখলেন তোড়ার পাশে।

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট নরপতি আর লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হরিশঙ্কর আসন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। একজন নতুন ধূপের গোছা সতর্ক হাতে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, আর অন্যজন নানান তদারকিতে মনোযোগ দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কমবয়েসি এই দুটি ছেলে কম দৌড়ঝাঁপ করেনি। অনঙ্গ নস্কর কাছে আসতেই হরিশঙ্কর চাপাগলায় জিগ্যেস করল, অনঙ্গদা, প্রেজেন্টেশানটা কখন দেবেন?

শচীদার বলা শেষ হলেই দেওয়া হবে।

সত্যকে আমি তেইশ বছর ধরে দেখছি..শচীদুলালের ভরাট কণ্ঠ হলঘরের আনাচে-কানাচে বিদ্ধ হয়ে গেল অনায়াসে। ভাঙা জানলায় নিশ্চুপ কাকটি হঠাৎই নড়েচড়ে বসল। একজন ছাত্র হাত বাড়িয়ে দুবার হুস-হুঁস করল, কিন্তু কাকটি সে তাড়ানিকে কোনও আমলই দিল না।

…সতুর মতো বিনয়ী, সৎ, কর্মঠ মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। গ্যাসট্রিকের গোলমালে মরো-মরো অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়। তখন এই সতু সত্যসুন্দরের দিকে আঙুল দেখালেন শচীদুলাল, এই সতু তিন-তিনটে রাত আমার বেডের পাশে জেগে বসেছিল। তাতে আমার মনের জোর এত বেড়ে গিয়েছিল যে নিশ্চিত জানতাম আমি বেঁচে উঠব। ওর সেই ঋণ আমি কোনদিনও শুধতে পারব না। না, শুধতে চাইও না। কারণ, কারও কারও কাছে ঋণী থাকার এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমার মনে পড়ে…।

সত্যসুন্দর মাথা নীচু করে শুনতে লাগলেন। তার বুকের ভেতরে হঠাৎই নির্মম কষ্ট হচ্ছিল। শ্বাসনালীটা যেন আগাপাশতলা ভরতি হয়ে গেছে নোনা জলে।

শচীদুলালের আন্তরিক কথাগুলো এক অপূর্ব সম্মোহনপাশে বেঁধে ফেলতে লাগল ঘরের প্রতিটি শ্রোতাকে। সত্যসুন্দরও যেন নতুন করে জানতে পারছেন নিজেকে। কেমন এক সঙ্কোচ, লজ্জা ও পাপবোধ তাঁকে অনুক্ষণ বিব্রত করতে শুরু করল। শচীদা বড় বাড়াবাড়ি করছে। ধূপের সুতীব্র গন্ধ সত্যসুন্দরের সর্দিরা নাকেও ঢুকে পড়ছিল। শীতের হাওয়া কখনও কখনও আঁচড় কাটছে তাঁর রুক্ষ ত্বকে। সত্যসুন্দরের ঝিমুনি আসছিল ক্রমশ।

পিছনের সারিতে অধ্যাপক মানব মজুমদার দীপকের উরুতে টোকা মারলেন। দীপক একমনে শচীদুলালের বক্তব্য শুনছিল, টোকার স্পর্শে ফিরে তাকাল। চোখে নীরব প্রশ্ন। মানব মজুমদার প্রায় ফিসফিসে গলায় বললেন, শচীর অসুখের সময় ওকে দেখতে যাওয়ার নাম করে সতু পাঁচ-ছ দিন সই করেই কেটে পড়েছিল। আর এখন তো শুনলে, ব্যাটা মাত্র তিন রাত্তির জেগেছিল।

আশপাশের আরও কয়েকজন মাস্টারমশাই কৌতূহলী হয়ে মানব মজুমদারের কথা শুনছিলেন। তাঁরা সকলেই মুচকি হেসে উঠলেন।

পিছনের সারির চাঞ্চল্য অনেকক্ষণ ধরেই শচীদুলালের নজরে পড়ছিল। ফলে এক অচেনা অস্বস্তি তার মনের ভেতরে জন্ম নিচ্ছিল। ওই চাঞ্চল্যের কারণ কি শচীদুলাল আঁচ করতে পারছেন না? ব্যাপারটা সত্যসুন্দরের নজরও এড়িয়েছে বলে মনে হয় না। এরকম একটা মানবিক অনুষ্ঠানে এ-ধরনের অমনোযোগ বেশ দৃষ্টিকটু। শচীদুলাল নিজের বক্তব্যের শেষ অংশটুকু গুছিয়ে নিচ্ছিলেন মনে-মনে। অস্বস্তিটুকু ঝেড়ে ফেলে সেটাই বলতে লাগলেন তিনি।

..সত্যর অভাব কোনওদিন পূরণ হওয়ার নয়। ওকে ভুলে যাওয়া আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ওর সুস্থ জীবন কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি।

শচীদুলাল বসে পড়লেন চেয়ারে। বুকের ভেতরে হাঁফ ধরে গেছে তার। পেটে চিনচিন ব্যথা। অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটটা সময়মতো খেতে ভুলে গেছেন।

সরবে হাততালি শুরু হয়েছিল শচীদুলাল বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই। এখন অনঙ্গ নস্কর মঞ্চে এসে হাতের ইশারা করতেই হাততালি ও কলগুঞ্জন স্তব্ধ হল।

অনঙ্গ গলার স্বরকে সামান্য খাদে নামিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, এখন কমরেড সত্যসুন্দর দাসকে আমাদের সকলের তরফ থেকে একটি ক্ষুদ্র উপহার দেওয়া হবে। উপহার তার হাতে তুলে দেবেন কমরেড শচীদুলাল কর্মকার।

লাইব্রেরিয়ান অরুণ সামন্ত তাঁর পাশে বসা টাইপিস্ট দ্বিজেন ঘোষকে বিরক্তির স্বরে বললেন, কথায় কথায় কমরেড জুড়ে দেওয়াটা অনঙ্গর রোগে দাঁড়িয়ে গেছে।

দ্বিজেন ঘোষ অনঙ্গকে একদম দেখতে পারে না। তা ছাড়া সে একটু ফিচেল স্বভাবের। সুতরাং অরুণবাবুর কথায় সে বলে উঠল, আচ্ছা অরুণদা, অনঙ্গটা ওর বউকে কী বলে ডাকে জানেন? সেখানেও কি কমরেড জুড়ে দেয়? চোখে সামান্য অর্থপূর্ণ ইশারা করে দ্বিজেন আরও বলল, মানে ওর বউও তো ওর সহকর্মী কিনা।

দ্বিজেনের পাশে বসা অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক হীরেন মণ্ডল পানের ছোপধরা দাঁত বের করে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। অরুণ সামন্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই অনঙ্গ রঙিন কাগজে মোড়া লাল ফিতে বাঁধা একটা ছোট প্যাকেট শচীদুলালের হাতে তুলে দিলেন। শচীদুলাল সেটা সত্যসুন্দরের হাতে দিলেন। সত্যসুন্দর উপহার হাতে নিয়ে যথাক্রমে শচীদুলাল, ডক্টর নবীন সরকার এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে মাথা অবনত করে নমস্কার জানালেন। তারপর শ্লেষ্মধরা খসখসে গলায় বললেন, আমার সহকর্মীরা কয়েকদিন আগে আমাকে জিগ্যেস করতে গিয়েছিল আমার কোন উপহার পছন্দ। তা আমি বলেছিলাম কিছুই আমার চাই না। ভগবানের আশীর্বাদে কোনওকিছুরই তো অভাব নেই। যাই হোক, তবু তারা যখন আমাকে ভালোবেসে এই উপহার দিল তখন আমি সেটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি। আমার জীবনে...।

অনঙ্গ মঞ্চের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। চাপা স্বরে সত্যসুন্দরকে বললেন, আঃ, সতুদা, আপনার বক্তৃতা পরে, সবার শেষে। এখন বসুন তো!

সত্যসুন্দর কেমন থতথত খেয়ে বসে গেলেন। ডক্টর সরকার অনঙ্গকে কী একটা বলে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। অনঙ্গ দর্শকদের লক্ষ করে বললেন, এখন সত্যদা সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কারও যদি কিছু বলার থাকে একে-একে এসে বলতে পারেন...।

সঙ্গে-সঙ্গে অশিক্ষক কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেল। চারজন পালা করে উঠে গিয়ে সহকর্মী সত্যসুন্দর দাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন। চরিত্রে বক্তৃতাগুলো প্রায় একইরকম। কিছু-কিছু পুরোনো ঘটনার স্মৃতিচারণ, প্রতিষ্ঠাতা-প্রিন্সিপাল ডক্টর মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং ফাঁকে-ফাঁকে বক্তার চারিত্রিক গুণাবলীর কিছু কিছু প্রকাশ করা। কারও কণ্ঠস্বর অতি মৃদু, কেউ বা বারবার যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছিলেন, কেউ আবার আবেগ ঝরিয়ে একাকার করে দিলেন।

বিচিত্র তথা বিচিত্রতর বক্তৃতাগুলো শুনতে-শুনতে অধ্যাপকবৃন্দ যথেচ্ছ টিপ্পনী কাটছিলেন। দীপক শুধু একবার বলল, মানবদা, যাই বলুক যেভাবেই বলুক, ওদের কথাগুলো কিন্তু খুব আন্তরিক। তাতে দু-তিনজন সঙ্গে-সঙ্গে ঝঝিয়ে উঠলেন, ওসব আন্তরিক-ফান্তরিক নয়। আসলে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেলে কে ছাড়!

এ কথা শুনেই দীপক কী একটা বলতে গেল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই অশিক্ষক কর্মচারীদের কয়েকজন পিছনের দিকে এসে অধ্যাপকদের অনুরোধ করতে লাগলেন কিছু বলার জন্য। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর পাশের লোককে কিছু বলার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। সুরেন পাত্র কলেজের সকল মহলেই বেশ জনপ্রিয়। সুতরাং বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ চাপ তার ওপরেই আসতে লাগল সবচেয়ে বেশি। অগত্যা তিনি রাজি হয়ে ডায়াসের দিকে গেলেন।

ক্লাসে লেকচার দেওয়ার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পাত্র কথা শুরু করলেন। টেবিলের ওপর একহাতের ভর রেখে তিনি জোরালো অথচ হিসেবি গলায় বললেন, আমি শুধু একটা ঘটনার কথাই বলব, যে-ঘটনার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক পাত্র তাকালেন সত্যসুন্দরের দিকে। সত্যসুন্দর মাথা নামিয়ে বসে আছেন। পাত্র আবার বলতে শুরু করলেন, ঘটনাটা সত্যবাবুর কাছে খুবই তুচ্ছ হয়তো তার মনেও নেই। তবু আমার তরফ থেকে সেটা খুবই দামি। আজকের দিনে সবাইকে সেটা জানাতে পারলে আমার ভালো লাগবে…

তিনি বললেন, কীভাবে সত্যসুন্দর তার গবেষণায় একটি যন্ত্র তৈরি করে দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছিলেন। কথা শেষ করে পাত্র দ্রুত পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে ফিরে এলেন নিজের আসনে।

হলঘরে এখন গুঞ্জন চলছে। সম্ভবত আরও কোনও বক্তা আছেন কি না তারই খোঁজ-খবর অনুরোধ-উপরোধ ইত্যাদির চেষ্টা হচ্ছে। অনঙ্গ নস্কর ব্যস্ত পায়ে এপাশ-ওপাশ ঘুরছেন। অধ্যাপকেরা উশখুশ করছেন। নরপতি আবার একগোছা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল ডক্টর মিত্রের ছবির সামনে।

হঠাৎই করতালির শব্দে সকলে চোখ তুলে মঞ্চের দিকে তাকালেন। অনঙ্গ নস্কর সত্যসুন্দরের পাশে গিয়ে তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, যাঁকে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান তিনিই আমাদের আসরের শেষ বক্তা।

সত্যসুন্দর বেঁটেখাটো মানুষ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, তার ওপরে একটা তুষের চাদর। মাথার চুল ধবধবে সাদা এবং কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। কপালে, গালে, থুতনিতে, গলায়, সর্বত্রই ছেয়ে আছে বয়েসের বলিরেখা। গত কয়েকটা ঘণ্টা যেন তাকে আরও বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

অনঙ্গ মঞ্চ ছেড়ে নেমে যেতেই শচীদুলালও চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। সতুর বক্তব্য মুখোমুখি বসে শুনবেন বলে প্রথম সারির বেঞ্চিতে জায়গা করে নিলেন তিনি। নিজের ফেয়ারওয়েলের দিনটা আবার তার মনে লম্বা ছায়া ফেলছিল।

একঝলক শীতের বাতাস ঘরে ঢুকতেই জানলার বসা কাকটা চাপা গলায় কাকা করে দুবার ডেকে উঠল। সেটা সকলকে চুপ করতে বলার নির্দেশ কিনা বোঝা গেল না।

থমথমে নিস্তব্ধ হলঘরে সমবেদনা ও সহানুভূতির অনুকণা ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল ঘন ধূপের গন্ধ। সকলে অপেক্ষা করছিলেন। সেই অপেক্ষাকাতর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে সত্যসুন্দরের গলার কাছটা জ্বালা করতে লাগল। উপহারের ছোট বাক্সটা গাঁটসর্বস্ব আঙুলের প্রাণান্ত বাঁধনে আঁকড়ে ধরে সত্যসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনদিকে ফিরে তিনবার নমস্কার করলেন। তারপর মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন ডক্টর মিত্রের ছবির কাছে। মাথা ঝুঁকিয়ে দীর্ঘ প্রণাম জানিয়ে সোজা হলেন। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ছবির দিকে ইশারা করে ভাঙা উচ্চারণে বললেন, আমার বাবা!

বাষ্প জমাট বেঁধে সত্যসুন্দরের চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে অশ্রু মোছার চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর আবার ফিরে

গেলেন মঞ্চে, নিজের চেয়ারের সামনে।

ঘরে উপস্থিত সকলের ওপরে একবার ঝাপসা চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর খসখসে গলায় বললেন, ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। ডক্টর মিত্রের পাড়ার ইলেকট্রিকের দোকানে কাজ করতাম। তখন বয়েস কত হবে, পনেরো। মিত্র সাহেব একদিন আমাকে বললেন, সতু, নতুন কলেজ হচ্ছে। তোমাকে সেখানে চাকরি করতে হবে। তুমি হবে ইনস্ট্রমেন্ট মেকানিক। ডক্টর মিত্রকে আমি বাবার মতো দেখতাম। বুঝলাম, তিনি যা করবেন তাতে আমার ভালোই হবে। তাই ওই দেবতার কথায় রাজি হয়েছিলাম। পনেরো বছর বয়েসে ঢুকে পড়লাম এই কলেজে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর চাকরির পর বিদায় নিচ্ছি।

মানব মজুমদার মন্তব্য করলেন, বাঁচা গেল! নইলে ল্যাবরেটরির মালপত্রের হিসেব রাখতে রাখতে আমার জান কয়লা হয়ে যেত, দীপক।

দীপক বোধহয় অন্যমনস্ক ছিল। তাই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠলো, সত্যদা পঁয়তাল্লিশ বছর চাকরি করেছে। শুনলে বিশ্বাসই হতে চায় না।

তাতে বিরক্ত হয়ে মানব মজুমদার বললেন, কথায় কথায় অবাক হওয়াটা আজকের যুবকদের একটা রোগ। তুমি জানো, সতুর আসল বয়েস কত? চৌষট্টি বছর। সে আমলে তো আর বার্থ সার্টিফিকেটের চল ছিল না। যে বয়েস কলেজের খাতায় লেখাবে সেটাই থেকে যাবে। তা এই চার বছর এক্সট্রা চাকরি করে লোকটা কত টাকা সরকারকে ঠকাল বলো তো? প্রায় সত্তর হাজার টাকা! একি মুখের কথা।

দীপক প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করে গেল। কারণ ওর মনে পড়ে গেছে, ওর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সার্টিফিকেটে যে বয়েস লেখা আছে সেটা আসল বয়েসের চেয়ে দেড় বছর কমানো। তার মানে রিটায়ারমেন্টের সময় ও সরকারকে হাজার তিরিশেক টাকা ঠকাবে? কথাটা ভাবতেই কেমন খারাপ লাগল। পাশে বসা মানব মজুমদারকে ও দেখতে লাগল। ওঁর সার্টিফিকেটে কত বছর কমানো আছে কে জানে!

সরকারকে ঠকিয়ে সত্তর হাজার টাকা আত্মসাৎ করা লোকটা তখন বলে চলেছে, এই কলেজের জন্যে আমি রক্ত দিয়েছি। কথার কথা নয়, সত্যিকারের রক্ত। কারণ কলেজের সমস্ত ওয়্যারিং আমি নিজেই করেছিলাম। তখন হাতে তার

ফুটে গিয়ে দু-দিন রক্ত বেরিয়েছিল। ওই মহাপুরুষ ডক্টর মিত্র বলতেন, সতু, এ তোমার নিজের ঘর-বাড়ি। এর কোথাও যেন কোনও কিছুর খামতি না থাকে লক্ষ রেখো। দিন-রাত তিনি থাকতেন আমার পাশে পাশে। সবসময় উৎসাহ দিতেন। তখন তো কলেজে এত লোকজন ছিল না। সব মিলিয়ে আমরা ছিলাম সাতজন।

সমাদ্দার যেন সত্যসুন্দরের কথাগুলো আর সহ্য করতে পারছিলেন না। চাপা গলায় বিষ ঢাললেন, দু-ফোঁটা রক্ত দিয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে কলেজের রক্ত চুষে গেছে। এস. কে. মিত্তিরকে মা-বাপ করেই যা পেরেছে লুটেপুটে খেয়েছে।

নবীন সরকার সামান্য মুখ ঘুরিয়ে সমাদ্দারকে একবার দেখলেন শুধু। কিছু বললেন না। তাতে সমাদ্দার কিছুটা সাফাইয়ের সুরে বললেন, না স্যার, প্রতিষ্ঠাতা-প্রিন্সিপালকে দেবতা বানিয়ে অন্যান্য প্রিন্সিপালদের ছোট করার চেষ্টা ঠিক নয়।

নবীন সরকারকে তা সত্ত্বেও নীরব দেখে সমাদ্দার চুপ করে গেলেন। ওপাশ থেকে পাত্র চকিতে দুজনকেই দেখে নিলেন।

আজ আমার জীবনে কোনও অভাব নেই। নিজের কারখানা আছে, কলকাতার বুকে ছোট্ট একটা বাড়িও করেছি। ভালো-ভালো ঘরে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি–আর কী চাই? তবে এসবই মহাপুরুষ ডক্টর মিত্র ছবির দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকালেন সত্যসুন্দর আর আপনাদের সকলকার আশীর্বাদে। পঁয়তাল্লিশ বছরে আমার সহকর্মীদের যে-ভালোবাসা পেয়েছি তা ভোলবার নয়। আমি অশিক্ষক কর্মচারী–অশিক্ষিতও বটে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়েরা কখনও আমার সঙ্গে ওপরওয়ালা হয়ে ব্যবহার করেননি। আমার পিতা মিত্রসাহেবের কাছেই আমি যা কিছু শিখেছি। উনি বলতেন, সতু, সব কিছুর পিছনে একটা কেন আছে। সেটাকে জানতে শেখ। যন্ত্রপাতি খারাপ করে ফেললে উনি কখনও রাগ করতেন না। বলতেন, খারাপ কেন হল সেটা আগে জানো, বোঝো– তারপর নিজেই যন্ত্রটা সারাও। তা হলে আর কখনও খারাপ হলেই সর্বনাশ এ-ভয় মনে থাকবে না। দক্ষ কারিগর বলে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা আমরণ মাথায় করে রাখব…

কপালে হাত ঠেকালেন সত্যসুন্দর। তার প্রকট কণ্ঠা তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো চঞ্চল হয়ে ওঠানামা করছিল। মনের ভেতরের খচখচানির কাঁটাটা ক্রমাগত বিধছে। পিছনের সারিগুলোয় কিছু উশখুশুনি, চাপা হাসি, সবই তার নজরে

পড়ছিল। কথা বলতে বলতে তিনি যেই থেমেছেন অমনি হলঘরে করতালির ফোয়ারা ছুটল। অর্থাৎ সবাই ভেবেছেন সত্যসুন্দরের বলা শেষ। অনুষ্ঠানও শেষ। সত্যসুন্দরের মনে হল করতালির শব্দগুলো যেন তাঁর বলিরেখামাখানো ভাঙা গালে অবিরত চড় মারার শব্দ। মনের ভেতরের ঘুণপোকাগুলো সেই মুহূর্তে তার হৃদয়ে কামড় বসাল।

দীপক রায়চৌধুরী তার সামনের সারির অধ্যাপকদের সঙ্গে তখন আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। আলোচনায় বিষয় হল, ইনস্ট্রমেন্ট মেকানিকের চাকরি করে কলকাতার বাড়ি করা সম্ভব কি না। হঠাৎই সত্যসুন্দরের কথায় ওরা চমকে উঠল।

আমার বলা এখনও শেষ হয়নি!–খসখসে ধরা গলায় চিৎকার করে বললেন সত্যসুন্দর। হাত তুলে সবাইকে বসতে ইশারা করলেন। চাদরটাকে ঠিক করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে। তার গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, হলঘরের প্রতিটি মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেল। এত স্তব্ধ যে ধূপকাঠি পুড়ে যাওয়ার শব্দও বুঝি স্পষ্ট শোনা যাবে।

শচীদুলালের ভুরু কুঁচকে উঠল। অনঙ্গর চোখেও সংশয়। সত্যসুন্দর হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। হাতের পিঠ দিয়ে অযথাই চোখ মোছার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনঙ্গ উঠে এগিয়ে যেতে চাইছিলেন, শচীদুলাল ইশারায় তাকে বারণ করলেন।

সকলেরই মন ভারী হয়ে উঠছিল এই বৃদ্ধের কান্নায়। জানলায় বসা কাকটা ঘাড় বেঁকিয়ে অবাক চোখে সত্যসুন্দরকে দেখছিল।

কান্নার আবেগ সামলে সত্যসুন্দর জড়ানো ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, আপনারা অনেকেই আজ আমার সম্পর্কে অনেক ভালো-ভালো কথা বললেন। যেসব ঘটনার কথা শচীদা, অধ্যাপক পাত্র বা প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছেন সেগুলো মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনাদের এত শ্রদ্ধা-ভালোবাসার যুগ্যি মানুষ নই আমি।

সত্যসুন্দরের গলার শিরা ফুলে উঠছিল। ছানিপড়া ঘোলাটে চোখ এখন দু-টুকরো কয়লার মতো দপদপ করে জ্বলছে। নাকের দুপাশে বহতা অশ্রুর দাগ।

আবার বলতে লাগলেন, কলেজের কাজে আমি অনেক ফাঁকি দিয়েছি। কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে…।

সত্যসুন্দর ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বলে চললেন অনর্গল। সকলে শুনতে লাগল তার অন্যায়-অবিচার আর পাপের কাহিনি। সামনের সারি থেকে শুরু করে শেষ সারি পর্যন্ত কোথাও কোনও শব্দ নেই, কোনও চাপা হাসি নেই, কোনও সন্দিহান কুটিল নজর নেই। সত্যসুন্দরের কথাগুলো জ্বলন্ত লাভাস্রোত হয়ে প্রত্যেকের কানে ও মরমে ঢুকে যেতে লাগল নিষ্ঠুরভাবে।

…এত মিথ্যা প্রশংসা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখনও যদি আমি প্রতিবাদ না করি, সত্যি কথা না বলি তা হলে বাবার কাছে আমি ছোট হয়ে যাব।– ডক্টর মিত্রের ছবিটাকে ইশারায় দেখালেন উদভ্রান্ত সত্যসুন্দর। বললেন, আজ এখানে আমার শেষ দিন। শেষ দিনে সত্যি কথা বলতে কাকে আমার ভয়! আমার সহকর্মীরা, শ্রদ্ধেয় মহান মাস্টারমশাইরা, প্রত্যেকে ভালো করেই, জানেন কত পাপ আমি করেছি…।

ঘরের প্রতিটি মানুষ পরস্পরের দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছিল। সত্যসুন্দরের মুখোমুখি বসে তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছিল তারা কত অসহায়। শচীদুলালের পেটের চিনচিনে ব্যথাটা ক্রমে বুকের কাছে উঠে আসছিল। সতুটা কি পাগল হয়ে গেল? কীসব যা তা বকছে! কিন্তু কই, শচীদুলাল তো উঠে গিয়ে ওর মুখ চেপে ধরতে পারছেন না।

সত্যসুন্দরের কষ্টটা ক্রমশ হালকা হচ্ছিল, এবং একইসঙ্গে গলে যাওয়া ব্যথা অশ্রুধারা হয়ে তার আঁকিবুকি কাটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। গলার স্বরে কান্না মিশে গিয়ে কথাগুলো অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে। ছোট নাতনিটার কথা মনে পড়ছিল তাঁর। বাড়ি থেকে আসার সময়ে জিগ্যেস করছিল, দাদু আজ তোমার ফেয়ারওয়েল ফেয়ারওয়েল মানে কী?

সত্যিই তো, ফেয়ারওয়েল মানে কী? ফেয়ারওয়েলের দিনটাই কি কোনও মানুষের চরম অপমানের দিন? একটা বৃদ্ধ মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে হরেকরকম মিথ্যের ফাঁস এঁটে দেওয়া হয় তার গলায়, সঙ্গে থাকে উপহারের বোঝা। বৃদ্ধের সাধ্য কি ফাসবদ্ধ গলা দিয়ে কোনও স্বর বের করে। সুতরাং হাজারো মিথ্যে মুখ বুজে সয়ে যায় সে। মন ভারী হয়, চোখ ভিজে যায়, কিন্তু বুকের ভেতরের মানুষটা? সে যে দমবন্ধ হয়ে ছটফট করে মরে।

সত্যসুন্দর বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন। ধূপের গন্ধ এখন আরও মোহনীয় হয়ে উঠেছে। সঙ্গে মিশে গেছে টাটকা রজনীগন্ধার সুবাস। পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন সত্যসুন্দর। ঘরের সবকটা মানুষ পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ। ওরা সবাই কি যার-যার ফেয়ারওয়েলের দিনটার কথা ভাবছে?

…যা সত্যি তাই আপনাদের এতক্ষণ ধরে আমি বললাম। যদি কোনও অন্যায় করে থাকি মার্জনা করবেন।-খাটো শরীরটা ঝুঁকিয়ে আবার সবাইকে নমস্কার জানালেন সত্যসুন্দর। শরীরটা কেমন ঝরঝরে লাগছে! মনটাও খুশি-খুশি!

বাইরে শীতের বিকেল পড়ে আসছে। বাতাসে ঠান্ডা বেড়ে উঠছে ক্রমশ। জানলায় বসা কাকটা গলা ছেড়ে ডেকে উঠল, কাকা।

সত্যসুন্দর চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, জানলায় একটা অপরূপ লালমোহন পাখি বসে আছে। মিষ্টি সুরে ডাকছে। চকচকে চোখে দেখছে তাকে। ছোট নাতনিটার কথা মনে পড়ছিল সত্যসুন্দরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। মেয়েটা তার দাদুর জন্য রোজই পথ চেয়ে বসে থাকে। আজ ওকে গিয়ে বলতে পারবেন, ফেয়ারওয়েলের মানে কী। নিজের মুখোমুখি বসে এক নিষ্ঠুর অথচ সহজ হিসেবনিকেশের পালা।

সত্যসুন্দর মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। হলঘরের একটা মানুষও এখন তার দিকে তাকাতে পারছে না। যেন তার চোখে চোখ পড়লেই ওরা ভস্ম হয়ে যাবে।

ওরা যদি তাকাত তা হলে দেখতে পেত সত্যসুন্দরকে তখন কত সুন্দর দেখাচ্ছিল।

# হারান স্যারের ভূত

**হারান স্যারের ভূত**

ঠিক সক্কালবেলাতেই বিশ্বকাকু হইহই করে বাড়িতে ঢুকলেন। চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, বাবান-মউ! শিগগির আয়! কোথায় গেলি তোরা সব? বউদি! শুনে যাও শিগগির! জবর খবর আছে তোমাদের জন্যে।

আমি সবে বই নিয়ে পড়তে বসেছি। আর মউ হাত-মুখ ধুয়ে আয়নায় মুখ দেখছে। বিশ্বকাকুর চিৎকারে দুজনেই একছুটে দরজায় গিয়ে হাজির।

বিশ্বকাকু আমাদের দেখেই চোখ গোল-গোল করে বললেন, জানিস, আজ ইস্টিশানের রাস্তায় হারান মাস্টার সুইসাইড করেছেন?

শুনে তো আমরা দুজনেই অবাক।

কাকু দু-হাতে আমাদের কাঁধ খামচে ধরে বললে, চ, ঘরে চ। তোদের মা কই?

সুতরাং আমি আর মউ চিৎকারে গলা ফাটিয়ে মা-কে ডাকতে শুরু করলাম। বাবা বাজারে গেছেন। সেইজন্যেই আমরা এতটা গলা চড়াতে পারছি। নইলে বকুনি বাঁধা ছিল।

বিশ্বকাকু গায়ের চাদরটা জম্পেশ করে গায়ে জড়িয়ে বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন। চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লেন, বউদি, জলদি এসো। সঙ্গে এক কাপ গরম চা। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তার ওপরে এই বাঘের সর্দিধরা ঠান্ডা।

হারান মাস্টারমশাইকে আমরা সবাই চিনি। অবশ্য এই আধা-শহুরে জায়গায় প্রায় সব্বাই সব্বাইকে চেনে। হারান মাস্টারমশাই আমাদের জেলা হাই স্কুলে

পড়ান। মানে পড়াতেন। রোগা পাকাটির মতো চেহারা। গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে তেলচিটে চাদর। নাকে চশমা মাথায় কাঁচাপাকা চুল। তিনকুলে তাঁর কেউ ছিল না। তবে তার পড়ানোর খুব শখ ছিল। পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। এ-অঞ্চলে হারান মাস্টারের কোচিং ক্লাস যাকে বলে খুব বিখ্যাত। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, আমি সেই কোচিংয়ে রোজ সন্ধেবেলা পড়তে যাই। ক্লাস ফাইভে উঠলে মউকেও ওখানে ভরতি করা হত। অন্তত মা-বাবা সেইরকমই ঠিক করে রেখেছিলেন।

বিশ্বকাকু আমার বাবার পিসতুতো ভাই। লোকে বলে ওঁর নাকি অনেক অভিজ্ঞতা। অন্তত পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ রকম ব্যবসা করেছেন। দু-হাজার নশো তিয়াত্তরটা ইংরিজি বই পড়েছেন। আর হায়ার সেকেন্ডারিতে ছ-ছবার ফেল করেছেন। এককালে খুব ব্যায়াম করতেন, কিন্তু সে-অনুপাতে চেহারা ফেরেনি। বাবা একদিন জিগ্যেস করেছিলেন, হ্যাঁ রে বিশু, এত যে এক্সারসাইজ করলি, তা তোর চেহারা ফেরে না কেন?

উত্তরে বিশ্বকাকু হাতের গুলি ফোলানোর চেষ্টা করে বলেছিলেন, দাদা, শুধু মাংসপেশি ফোলালেই কি চেহারা ভালো হয়। আমার ব্যায়ামের এমনই কায়দা যে, শুধু হাড়গুলো মজবুত হবে। বাইরে থেকে দেখে কিচ্ছুটি বোঝা যাবে না। তবেই না হল গিয়ে রিয়েল এক্সাইজ!

বাবা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, এক্সাইজ নয় বিশু, এক্সারসাইজ।

বিশ্বকাকু গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছেন, ওই একই হল। হনলুলুর লোকেরা সংক্ষেপে এক্সাইজ বলে। আমি যেবার হনলুলু গিয়েছিলুম...!

থাক। তুমি এখন কাজে যাও।

বিশ্বকাকু জানতেন, বাবা রেগে গেলে আর তুই বলেন না, বলেন, তুমি। সুতরাং চুপচাপ কেটে পড়েছিলেন সঙ্গে-সঙ্গেই।

হারান মাস্টারমশাই কীভাবে আত্মহত্যা করলেন, কাকু? আমি প্রথম সুযোগ পেয়েই প্রশ্ন করলাম।

একেবারে গলায় চাদর দিয়ে সটান ঝুলে পড়েছেন দেবদারু গাছের ডাল থেকে। চোখ উলটে জিভ বের করে মরে যাওয়ার অভিনয় করলেন বিশ্বকাকু।

মউ চেঁচিয়ে উঠল, মা, কাকু ভয় দেখাচ্ছে।

মা ইতিমধ্যে গরম চায়ের কাপ নিয়ে হাজির।

কী ছোড়দা, যা বলছ সব সত্যি নাকি? মা বিশ্বকাকুকে ছোড়দা বলে ডাকেন।

বউদি, সত্যি আর কাকে বলে! কী যে দুঃখ ছিল হারান মাস্টারের মনে, তা কে জানে! চায়ের কাপ নিয়ে আরাম করে চুমুক দিলেন কাকু–জানো তো, ইস্টিশানের পথটা কীরকম অন্ধকার। দুপাশে সারি-সারি ঝাকড়া গাছ। তার ওপর এবড়োখেবড়ো মাটির পথ। এমনিতেই রাত্তিরে ও রাস্তা দিয়ে হাঁটা মুশকিল, তার ওপর এখন বোঝো! হারান মাস্টার নির্ঘাত ভূত হয়ে ও-পথে পায়চারি করবেন, আর কোচিং ক্লাসের জন্যে ছাত্র-ছাত্রী খুঁজে বেড়াবেন। বলবেন, আঁই, আঁমার কোচিংয়ে ভঁরতি হবি?

মউ আবার নাকি সুরে বলে উঠল, মা, আবার ভয় দেখাচ্ছে বলে সোজা মায়ের শাড়ির ভঁজে ঢুকে পড়তে চাইল।

বিশ্বকাকু দু-চার চুমুকে চায়ের কাপ খালি করে বললেন, বউদি, তোমার মেয়েটা রামভিতু। আমার নাম ডোবাবে। তবে এই বাবানটা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন বিশ্বকাকু?

এ দারুণ সাহসী। বড় হয়ে ঠিক আমারই মতো দুর্দম, দুর্জয়, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, আর অসমসাহসী বীর হবে। তুমি দেখে নিয়ো।

বিশ্বকাকুর কথায় আমার বুকটা একটু যে ফুলে উঠল না তা নয়। কিন্তু আবার ভয়ও করতে লাগল। কারণ, আজ সন্ধেবেলাতেই কোচিংয়ে যাওয়ার কথা। বিশেষ করে হারানস্যার যখন মারা গেছেন তখন তো আরও যাওয়া উচিত। অন্তত খোঁজখবরটা তো নিতে হয়। কিন্তু যেতে হবে ওই বিপজ্জনক পথ দিয়েই। মনে-মনে ঠিক করলাম, কাকুর মতো বীর হয়ে আমার কাজ নেই। স্কুলে না গিয়ে বিকেল-বিকেল বরং কোচিংয়ে যাব। সুসান, বিলু আর মৃণালের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে একসঙ্গে দল বেঁধে বাড়ি ফিরব। কিন্তু হারান স্যার তো ভালো লোক ছিলেন। তিনি কি মরে ভূত হবেন!

কথাটা বিশ্বকাকুকে জিগ্যেস করতেই তিনি হো-হো করে হসে উঠলেন। বললেন, আরে বোকা, মরে গেলেই কি তার এতদিনের একটা অভ্যেস চলে যাবে!

ছাত্র ঠেঙানো ভুলে যাবেন একেবারে! যাক বউদি, আমি চলি। সকালেই খবরটা পেলুম, তাই ভাবলুম দিয়ে যাই। বাবানের সাহসটাও একবার পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমি তো ইচ্ছে করেই ওই কাঁচা রাস্তা ধরে আজ থেকে দিনে সতেরোবার করে যাতায়াত করব। হারান মাস্টামশাই আমাকে অনেকবার কান মুলে দিয়েছিলেন, তার শোধ নেব।

এ কথা বলেই বিশ্বকাকু সঙ্গে-সঙ্গে পগারপার। যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনই হঠাৎ চলে গেলেন।

মা সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বাবান, আজ সন্ধেবেলা তোর কোচিংয়ে গিয়ে কাজ নেই।

মউ শাড়ির আড়াল থেকে উঁকি মেরে বলল, যাক না, সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় ধরে মটা।

আমি কোনও প্রতিবাদ করার আগেই বাবা বাজার থেকে ফিরলেন। বাজারের থলে দুটো মায়ের হাতে তুলে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, শুনেছ, হাই ইস্কুলের হারানবাবু আত্মহত্যা করেছেন?

মা ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ শুনেছেন।

.

সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু আকাশের দিকে তাকালে মিটিমিটি তারা চোখে পড়ে। তা ও আবার মাঝে-মাঝে ঢেকে যাচ্ছে কঁকড়া-মাথা গাছের উশকোখুশকো চুলের আড়ালে। ঝিঁঝি পোকা কোথায় যেন একটানা ডেকে চলেছে। সব মিলিয়ে রোজকার চেনা রাস্তাটা যেন অচেনা লাগছে। মনে সাহস জোগানোর চেষ্টা করলাম। ভাবতে লাগলাম বিশ্বকাকুর দুর্জয় সাহসের কথা–অন্তত তার মুখে যেরকম শুনেছি। কিন্তু তাতেও ভরসা পাচ্ছি কই! তা ছাড়া এ তো সবে সেই ভয়ংকর কাঁচা রাস্তার শুরু।

ঢিপঢিপে বুকে ধীরে-ধীরে এগোলাম। দু-পাশে সারি-সারি বিশাল গাছ। বট-অশ্ব-দেবদারু জাম আরও কত কী। এ-রাস্তা দিয়ে কত যাওয়া-আসা করেছি, কিন্তু ভয় কখনও পাইনি। এখন শুধু হারান স্যারের কথা মনে পড়ছে। কীভাবে তিনি চলতেন, কীভাবে হাসতেন, কীভাবে কথা বলতেন–সব।

আজ কোচিংয়ে গিয়ে কোনও লাভ হয়নি, উলটে বিপদে পড়েছি। সুসান, মৃণাল ওরা কেউ আসেনি। ভূতের ভয়ে কি না কে জানে! ফলে আমি একেবারে একা পড়ে গেছি। মাস্টারমশায়ের ভাইয়ের সঙ্গে কথায় কথায় কখন যে শীতের বেলা পড়ে গেছে টেরই পাইনি। বাড়ি ফেরার সময় উনি একবার জিগ্যেস করেছিলেন, এগিয়ে দিতে হবে কি না। আমি লজ্জায় বারণ করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এগিয়ে দিলেই ছিল ভালো।

হঠাৎই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। বেশ ব্যথা লাগলেও চটপট উঠে হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে নিলাম। কোন দিকে চলেছি সেটাই কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোথাও একটা শেয়াল ডেকে উঠল, হুক্কা-হুঁয়া। ব্যস, আমার তো হাত-পায়ে কঁপুনি ধরে আর কি! শুনেছি অনেকে জোরে-জোরে গান গেয়ে ভূতের ভয় তাড়ায়। কেউ বা রাম-নাম করে। আমি তো গান বলতে শুধু জনগণমনঅধি–ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর রাম-নাম?রাম-রাম বলতে বলতে যদি মরা-মরা হয়ে যায়! তা হলেই সর্বনাশ! হারান স্যার সঙ্গে-সঙ্গে তার ভূতুড়ে কোচিংয়ের প্রথম ছাত্রটি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, জোরে-জোরে চিৎকার করলে কেমন হয়? উঁহু, লোকে ভাববে আমি ভয় পেয়েছি। তার চেয়ে হো-হো করে অট্টহাসি হাসাই ভালো। তাতে ভয়টা কেটে যাবে। আর যে শুনবে সে ভাববে আমি একটুও ভয় পাইনি।

এইসব নানান কথা ভাবছি, হঠাৎই কোথা থেকে ভেসে এল ডানা ঝাপটানোর ঝটপট শব্দ। তারপরই হুতুম পাচার চিৎকার। আর সব শেষে একদল শেয়ালের কান্না।

আর দেরি করলাম না। আধো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে টেনে ছুট মারলাম। আর হা-হা-হি হি-হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলাম। ওঃ, মনে যেন কিছুটা ভরসা পাচ্ছি। বই-খাতা হাতে নিয়ে কোনওরকমে ছুটে চলেছি, আর যত কষ্টই হোক না কেন হাসি থামাচ্ছি না। দুপাশে ঘন কালো ছায়ার মতো গাছের গুঁড়িগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। কোনটা তার মধ্যে হারান স্যারের আস্তানা কে জানে। এখুনি হয়তো পেছন থেকে আমার হাফ-শার্টের কলার চেপে ধরে বলে উঠবেন, কী রে, পালাচ্ছিস কেন?

ছুটতে ছুটতে বুকে আমার হাঁফ ধরে গেল। চিত্তারের চোটে গলা ব্যথা করছে। এদিকে রাস্তাও প্রায় শেষ হয়ে আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ দেখি দূরে মাটির ওপরে একটা সাদা মূর্তি টান-টান হয়ে পড়ে আছে।

বুকটা আমার ছাত করে উঠল। পারাবার পার হয়ে এসে শেষকালে– হারান স্যার নয় ত! পুলিশ কি মৃতদেহটা রাস্তার ওপরেই ফেলে রেখে গেছে! কই, যাওয়ার পথে এ-রকম তো কিছু দেখিনি!

ততক্ষণে হাসি আমার বন্ধ হয়ে গেছে। চলার গতিও আপনা থেকেই কমে এসেছে। সাদা মূর্তিটা যেন নড়ছে।

আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা লোক। চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। আর গো গোঁ করে বিচিত্র শব্দ করে চলেছে। না, এ তো তাহলে ভূত নয়। এ যে সত্যিকারের মানুষ।

কে আপনি? কী হয়েছে? ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্নটা করতেই চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটা উঠে বসল।

চাদর সরিয়ে উঁকি মারতেই চিনতে পারলাম বিশ্বকাকু! চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, বাবান রে, তুই আজ তোর এই কাকুটার লাইফ বাঁচালি! নইলে হারান মাস্টারের গোস্ট আমাকে দিয়েছিল অলমোস্ট শেষ করে!

আমি এবার অনেকটা সাহস পেয়েছি। বিশ্বকাকুর পাশে বসে পড়ে বললাম, কী হয়েছিল, কাকু? ভয় পেয়েছ কেন?

আর বলিস কেন! সতেরোবার টহল মারব বলে বারবার এ-রাস্তার এ-মাথা ও-মাথা করছি, ঠিক তেরোবারের মাথায় একটা রক্ত হিম করা অট্টহাসি কানে এল। আমি ভাবলুম, কে? মানুষ, না প্রেত? তারপরই আর সন্দেহ রইল না, এ হারান মাস্টারের অট্টহাসি। তুই বিশ্বাস করবি না বাবান, আমার মতো দুর্দম, দুর্জয়, অপরাজেয়, অসমসাহসীও এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আমি তোদের বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে! শুনতে পেলাম, প্রেতটা সেই হাড় কাঁপানো অট্টহাসি হাসতে হাসতে আমাকে তাড়া করে আসছে, হা-হা-হি-হি-হো-হো! ওঃ, ভয়ে আমার তো গায়ে কাঁটা দিয়েছে। দরদর করে এই শীতেও

ঘামছি। তারপর ছুটতে ছুটতে এখানটায় এসে মুখ থুবড়ে পড়লাম। চাদর মুড়ি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি, এমন সময় তুই এলি–

বিশ্বকাকু এখনও বড়-বড় শ্বাস নিয়ে হাঁফাচ্ছেন।

আমি বললাম, কাকু, বাড়ি চলো। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।

চল চল, তাই চল। বিশ্বকাকু কোনওরকমে বললেন, তবে এ-ঘটনার কথা কাউকে বলিস রে। আমার প্রেস্টিজ আকুপাংচার হয়ে যাবে।

আমরা দুজনে বাড়ির পথে এগোলাম। আমার তো হাসি চাপতে গিয়ে পেট ফাটার জোগাড়।

কী করে বুঝব, অট্টহাসি হেসে নিজের ভয় তাড়াতে গিয়ে আমি একজন দুর্দম, দুর্জয়, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, অসমসাহসী বীরপুরুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বসে আছি!

# বনবনিয়া

**বনবনিয়া**

আমরা যখন খুব সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি ঠিক তখনই বম্বনিয়া ঢুকে পড়ল আমাদের জীবনে। আর ওইটুকু পুঁচকে দশ-বারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলের কাছে আমরা সবাই যেন নতুন করে শিখলাম : বিপদে ভয় করতে নেই।

কয়লাখনি এলাকায় আমরা থাকি। আমরা বলতে বাপি, মা, আমার দিদি মহুয়া, আর আমি। বাপি কোল ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্র ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। বহু বছর আগে আমরা যখন কলকাতার আলমবাজারে থাকতাম তখন মা একটা প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন। এখন চাকরি করেন না, তবে লেখালিখি করেন–সেসব লেখা কলকাতার নানান ম্যাগাজিনে বেরোয়। এ অঞ্চলের লোকেরা মায়ের লেখালিখির কথা জানে।

অফিস থেকে আমাদের কোয়ার্টার অনেকটা দূরে ছিল বলে বাপির যাতায়াতে বেশ কষ্ট হত। তা ছাড়া আমার স্কুলটাও বেশ ঘুরপথ ধরে যেতে হত। দিদি কলেজে যেত দুটো বাস পালটে, দুবার সাইকেল রিকশা চড়ে। এইসব অসুবিধের কথা ভেবে আমরা জামতলা এলাকা ছেড়ে সাহেবপাড়ায় চলে এসেছি। সাহেবপাড়ায় এক কালে নাকি সাহেবসুবোরা থাকত। এখনও সে-আমলের কয়েকটা বাড়ি-ঘর দেখলে কথাটা যে সত্যি সেটা বোঝা যায়।

সাহেবপাড়ায় ছোট জমি কিনে বাপি সুন্দর একটা বাড়ি করেছেন। কলকাতার আমাদের আত্মীয়স্বজন খুব একটা নেই। তা ছাড়া এ-জায়গাটা মা-বাপি দুজনেরই বেশ ভালো লেগে গেছে। তাই ওঁরা চেয়েছেন বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিতে। আর আমার বা দিদির বন্ধুবান্ধবও তো এখানে কম নেই।

গণ্ডগোলটা শুরু হল নতুন বাড়িতে আমরা চলে আসার পর।

একদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে বাপি চায়ের কাপ হাতে বাইরের উঠোনে বসে আছেন, তিনটে সাইকেল আমাদের সদরে এসে থামল।

তিনটে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল চারজন। জিনসের প্যান্ট, মাথায় কঁকড়া চুল, কোমরে বড় বকলস লাগানো বেল্ট, দুজনের আবার এক কানে একটা করে মাকড়ি।

ওদের মধ্যে একজন সুপুরি বা জর্দা গোছের কিছু একটা চিবাচ্ছিল। শব্দ করে একদলা লাল থুতু ফেলে বাপির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, অ্যাই, আপনি রাসমোহন মিত্তির?

বিকেল মরে এলেও সন্ধের আঁধার তখনও নামেনি। আমি বাগানে ফুলগাছগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছিলাম। সেখানে কয়েকটা ফড়িং উড়ছিল। আমি ওদের ওড়া দেখছিলাম। স্কুলের সায়েন্স টিচার প্রসাদবাবু বলেছেন, ফড়িং-এর দু-জোড়া ডানা সমান তালে নড়ে না–একজোড়া খুব ধীরে নড়ে, আর একজোড়া খুব তাড়াতাড়ি। একজোড়া ওড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, অন্য জোড়া ওড়ার দিক। ঠিক যেন নৌকোর দাঁড় আর হাল।

ছেলেগুলোকে প্রথমটা আমি তেমন নজর করে দেখিনি। কিন্তু ওই নোংরা ভঙ্গিতে বাপিকে প্রশ্ন করামাত্রই আমি ফড়িং ছেড়ে ওদের দিকে তাকালাম।

বাপি কেমন যেন থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমিই রাসমোহন মিত্র। কী ব্যাপার বলুন?

লাথি মেরে সদর দরজা খুলে ফেলল ছেলেটা। ইট-পাতা পথ ধরে চার-পা এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল, এখানে জমি পারচেজ করে বাড়ি বানালেন, আর আমাদের পারচেজ ট্যাক্সটা দেবেন না!

চায়ের কাপ-প্লেট বাপির হাতে ঠকঠক করে নড়ছিল। বাপি সেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন।

কীসের পারচেজ ট্যাক্স?

ন্যাকা ষষ্ঠী আমার! পেছন থেকে কানে মাকড়িওয়াল একজন মন্তব্য করল, পারচেজ ট্যাক্স জানেন না!

বাড়ির নাম রেখেছেন কেকা নিকেতন! ওটা পালটি করে ন্যাকা নিকেতন করে দিন। তিন নম্বর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মন্তব্য করল।

কেকা আমার ঠাকুমার নাম। গতবছর ঠাকুমা মারা গেছেন।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে মা বারান্দায় চলে এসেছিলেন। দিদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছিল হারমোনিয়াম ফেলে চলে এসেছে জানলায়। পরদা সরিয়ে অসভ্য ছোটলোকগুলোকে দেখছে।

বাপি উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বলতে চাইলেন, আপনাদের সঙ্গে কোনও কথা আমি বলতে চাই না। অসভ্যতার একটা সীমা আছে। আমি…।

সামনের ছেলেটা, যে বোধহয় পান পরাগ জাতীয় কিছু একটা চিবাচ্ছিল, শব্দ করে থুতু ছুঁড়ে দিল বাপির পায়ের কাছে। অল্পের জন্যে বাপির গায়ে লাগল না। তারপর বিচ্ছিরিরকম হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমার নাম নেকড়ে। আপনি বহুত আনপড় আদমি আছেন–কোনও খবর রাখেন না। এই সাহেবপাড়া এরিয়াটা আমার। আমার সঙ্গে যারা আছে– বলে ঘুরে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে তাদের পরিচয় দিতে লাগল : এ হল নগা। এ হীরালাল। আর ওই যে পেছনে দাঁড়িয়ে–ওর নাম টার্গেট। ও মেশিন চালালে গুলি সবসময় টার্গেটে গিয়ে লাগে।

বাপি ফ্যালফ্যাল করে চরিত্রগুলোকে দেখতে লাগলেন। মা এর মধ্যে কখন যেন বাপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নেকড়ে, টার্গেট কীসব অদ্ভুত নাম!

ওরা যে কারা সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু জামতলায় এ ধরনের উপদ্রব ছিল না। বোধহয় অনেক কোয়ার্টার নিয়ে ছোটখাটো টাউনশিপ ছিল বলেই।

শুনুন, মিত্তিরবাবু– নেকড়ে ঠান্ডা চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে বলল, তিরিশ হাজার টাকা দিলেই আপনার কেস সালটে যাবে। হীরালাল কাল সন্ধেবেলা

আপনার কাছে নোট নিতে আসবে। মাল রেডি রাখবেন।

এবারে মা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। নেকড়েকে লক্ষ করে বললেন, এ কি মগের মুল্লুক না কি! হঠাৎ আপনাদের টাকা দিতে যাব কেন?

জেন্টসের কথায় লেডিজ নাক গলালে কেস আরও ক্যাচাল হয়ে যাবে। নেকড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, হীরালাল কাল আসবে। নোট না দিলে.. কথা থামিয়ে টার্গেটের দিকে তাকাল নেকড়ে। চোখের ইশারা করে বলল, টার্গেট, একটু স্যাম্পেল শো করে দাও।

সঙ্গে-সঙ্গে জামার নীচে হাত ঢুকিয়ে কোমরের কাছ থেকে কী একটা নিয়ে হাত বের করল টার্গেট।

একটা কালো রিভলভার। রাস্তার আলো ওটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে।

রিভলভারটা সামনে উঁচিয়ে বাপির খুব কাছে এগিয়ে এল টার্গেট।

বাপি ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলেন। মা একটা চিৎকার করে বাপিকে জাপটে ধরলেন, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওঁকে কিছু কোরো না। ওঁকে কিছু কোরো না। তোমরা টাকা পেয়ে যাবে।

অব আয়া হ্যায় লাইন মে। দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে মন্তব্য করল হীরালাল।

টার্গেট রিভলভারটা বাপির একেবারে কপালে ঠেকিয়ে ধরে বলল, আঙুলে একটু চাপ দিলেই আপনি কোল ইন্ডিয়া কেন, হোল ইন্ডিয়া থেকে রিটায়ার হয়ে যাবেন।

বাপি হঠাৎই খসে পড়ে গেলেন মাটিতে। মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এল বারান্দায়। আমিও ছুটে গেলাম বাপির কাছে। আমার গলার ভেতরটা কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

বাপি পড়ে যেতেই টার্গেট কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে হাসল। নেকড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, বস, এ তো আমুল বাটার দেখছি। শাটার টেপার আগেই ছবি হয়ে গেল।

ওরা চারজন সদর দরজার দিকে হাঁটা দিল।

গেট পেরিয়ে বেরোনোর সময় নগা বলল, কাল সাতটায় আমি আর হীরু আসব, মাল রেডি রাখবেন। থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই।

চারটে অপচ্ছায়া তিনটে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

আমরা ততক্ষণে মাথায়-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাপির জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি। নতুন বাড়িতে আসার আনন্দ আমাদের মন থেকে সেই মুহূর্তেই মুছে গেল।

.

এরপর বিপদ বাড়তেই থাকল।

বাড়ি তৈরি করার সময় বাপি কীরকম খোঁজখবর নিয়েছিলেন কে জানে! তখন বোধহয় নেকড়েদের কথা জানা যায়নি। এখন টাকা জোগাড় করার চেষ্টায় বাপি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বাপি আর মা মিলে কতজনকে যে ফোন করলেন তার কোনও হিসেব নেই। আমি আর দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম।

পরদিন ওরা এল। হীরালাল আর নগা।

বাপি ওদের হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়ে করুণভাবে বললেন, এক দিনে এর বেশি জোগাড় করতে পারিনি। আমাকে আপনারা দয়া করে কটা দিন সময় দিন।

উত্তরে ওরা বাপিকে এক ধাক্কা দিয়ে যেসব ভাষা ব্যবহার করল তাতে আমার মনে হচ্ছিল দুটো শয়তানের টুটি টিপে ধরে বেধড়ক পেটাই। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তব তো এক নয়!

ওরা যা-তা ভাষায় ওয়ার্নিং দিয়ে চলে গেল। বলে গেল সাতদিনের মধ্যে বাকি টাকা চাই। মেয়ে-বউয়ের সোনাদানা বেচে হলেও টাকাটা বাপিকে জোগাড় করতেই হবে। নইলে ওদের বস খেপে যাবে। তখন টার্গেট...।

বাপির দিকে রিভলভারের মতো করে আঙুল দেখিয়ে মুখে দুবার গুলি ছোঁড়ার নকল আওয়াজ করল হীরালাল। হেসে বলল, কেন বেফালতু খরচা হয়ে যাবেন, মশাই।

ওরা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও বাপি বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিলেন। আর মা সারাক্ষণ কোনও ভয় নেই! কোনও ভয় নেই! বলে কান্না চাপতে লাগলেন।

এলাকায় সামান্য খোঁজখবর নিতেই আমরা নেকড়ে সম্পর্কে যা জানার জেনে গেছি। অথচ আগে এসব খোঁজ পাইনি।

যখন আমি স্কুলে যাই, ওদের বাজারের মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে।

একদিন নগা আমাকে ডেকে বলল, অ্যাই ছোঁড়া, শোন। তোর বাপ আর নোট জোগাড় করতে পারল?

এর মধ্যে মায়ের গয়না বিক্রি করে বাপি ওদের আরও ছহাজার টাকা দিয়েছেন। তারপর কাকুতি-মিনতি করে আরও একমাস সময় পেয়েছেন।

আমি মাথা নেড়ে কোনওরকমে না বলেছি। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেছি– যত তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে দুরে চলে যাওয়া যায়।

বাজারের মোড়ের কাছে ওদের দলটা সবসময় আড্ডা মারে। কাউকে ওরা ভয় পায় না, কিন্তু ওদের সবাই ভয় পায়। ওই মোড় দিয়ে যারা যাতায়াত করে তাদের সবাইকেই দেখেছি ওদের কেমন সমীহ করে।

আর-একদিন টার্গেট আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকল, বলল, তোর দিদির নাম যেন কী?

আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। কোনওরকমে বললাম, মহুয়া।

ওরা দল বেঁধে হাসল। তারপর নেকড়ে বলল, মহুয়া বড় মিষ্টি।

আমি অন্ধ রাগে নেকড়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নেকড়ে সঙ্গে-সঙ্গে ক্যারাটের ভঙ্গিতে আমাকে সপাটে এক লাথি কষাল।

লাথিটা পেটে এসে লাগতেই আমি ওঁক শব্দ করে ছিটকে পড়ে গেলাম রাস্তায়। মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল, শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। সেই অবস্থায় ঝাপসা চোখে দেখলাম, নেকড়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল নেকড়ে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, মহুয়া বড় মিষ্টি।

তারপর বুট পরা পায়ে পাগলের মতো এলোপাতাড়ি লাথি মারতে শুরু করল আমাকে।

অনেকক্ষণ পর কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ির পথ ধরলাম।

রাস্তার বহু লোক ঘটনাটা দেখেও কোনও ভ্রূক্ষেপ করেনি। আমার ক্ষতবিক্ষত আহত শরীরটাকে রাস্তা থেকে তোলার ব্যাপারেও কেউ সাহায্য করেনি। পথে একজন চেনা রিকশাওয়ালা তার সাইকেল রিকশা করে আমাকে বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে দিল। একবার শুধু বিড়বিড় করে লোকটা বলল, তুমি ওইটুকু ছেলে, তুমি কখনও ওদের সঙ্গে পারো! জোয়ান মানুষগুলোই সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করছে...।

আমাকে দেখার পর বাড়িতে চিৎকার-চেঁচামেচি কান্না শুরু হল। দিদি তখন কাঁদতে কাঁদতে জানাল কলেজে যাওয়ার পথে লুম্পেনগুলো প্রায়ই নাকি ওকে নোংরা কথা বলে, অপমান করে।

মা দিশেহারা হয়ে গেলেন, বাপি কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। বাড়ি করে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। ওদের টাকা তিনি কেমন করে মেটাবেন!

বাপিকে কখনও আমি এভাবে কাঁদতে দেখিনি।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা চারটে প্রাণী ঘর অন্ধকার করে সর্বস্বান্তের মতো বসে রইলাম। আমাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিছু করার নেই।

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে বনবনিয়া আমাদের বাড়িতে এল।

একদিন সন্ধের মুখে বাপির হাত ধরে ও এসে হাজির হল।

বয়েস দশ-বারো বছর। গোলগাল শ্যামবর্ণ চেহারা। মুখটা দারুণ মিষ্টি। মাথা ন্যাড়া। ন্যাড়া মাথার পেছন দিকে মোটাসোটা একটা টিকি। ছানাবড়া চোখের কোলে কাজল। গায়ে লাল-সবুজ কাপড়ের তাপ্পি মারা একটা ঢোলা জামা ঠিক যেন ফুটবল প্লেয়ারের জার্সি। জামার নীচে কালো হাফ প্যান্টের খুব সামান্যই উঁকি মারছে। ওটুকু উঁকি না মারলে মনে হত ও প্যান্ট পরেনি।

বনবনিয়ার কপালে কাজলের টিপ, মাথায় একটা লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। আর হাতে। গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের একটা বাঁশি।

বাপি মাকে বললেন, তুমি বহুদিন ধরে ফাঁই ফরমাশ খাটার জন্যে একটা বাচ্চা ছেলের কথা বলছিলে–তাই ওকে নিয়ে এলাম। ওর নাম বনবনিয়া। তারপর বনবনিয়ার দিকে ফিরে : এই তোর মাইজি।

ছেলেটা এক গাল হেসে লাফিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে। ন্যাড়া মাথা হেঁট করে মায়ের পা ছুঁয়ে বলল, পায় লাগু, মাজি।

মা খানিকটা অবাক হয়ে বাপিকে বললেন, ও বাংলা বলতে পারে না?

পারে–অল্প-অল্প।

বাপি, ওকে পেলে কোথায়? দিদি জিগ্যেস করল।

বাপি বনবনিয়াকে বললেন, তুই যা–এখন বাগানে গিয়ে খেলা কর।

ছেলেটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে ছুটে গেল বাগানের দিকে। বাগানে পৌঁছে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিল আমাকে লক্ষ করে, ওর দেশোয়ালি ভাষায় চেঁচিয়ে ডাকল, আও না, ছোটে মালিক, একসাথ খেলো…।

কেন জানি না, ওর হাতছানি আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওর সঙ্গে খেলার জন্যে ছুটে গেলাম বাগানে।

রাতে দিদির কাছে শুনলাম বনবনিয়াকে খুঁজে পাওয়ার কাহিনি।

জামতলার পশ্চিম দিকে দুটো পুরোনো কয়লা খনি আছে। বহু বছর আগেই ওই খনি দুটো থেকে কয়লা তোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সেই জোড়া খনি আর তার লাগোয়া বড়সড় মাঠটা জুড়ে বছরের এসময়টায় একটা মেলা বসে। তাতে নানান জিনিস বিক্রি হয়। লাল-নীল কাপড়ে ম্যারাপ বেঁধে হরেকরকম খাবারের দোকান তৈরি হয়। কখনও কখনও নাগরদোলাও বসে।

মেলার মাঠ পেরিয়ে গেলে কুলি-কামিনদের বস্তি, তারও ওপাশে বড়-বড় গাছের জঙ্গল।

বাপি নেকড়েদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টায় এক কুলি সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কথাবার্তা বলে হতাশ হয়ে মেলার মাঠ পেরিয়ে ফিরে আসছিলেন।

পড়ন্ত বিকেলে আনমনা পায়ে উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে হেঁটে আসছিলেন বাপি। মেলার কলরোল দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, তবে বাপির কানে ঢুকছিল না। একটা খনির পিটের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত এক কান্নার আওয়াজ বাপির কানে আসে। বোধহয় খানির ভেতরে হাওয়া ঢুকে শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে কান পাততে গিয়ে বাপি পড়ে যান মাটিতে। তাঁর মাথাটা কেমন ঘুরে যায়। হাতের ছাতাটা ছিটকে পড়ে দূরে। গরম হাওয়ার তাপ তখনও চোখে-মুখে বেশ টের পাচ্ছিলেন তিনি। নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে বাপির প্রায় কান্না পেয়ে যায়। এই বিপদে তাকে বাঁচানোর কেউ নেই! ছাতাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ক্ষোভে হতাশায় সেটা পাগলের মতো মাটিতে পিটতে থাকেন বাপি।

ঠিক তখনই কোথা থেকে এক ঝলক ঠান্ডা মিষ্টি বাতাস উড়ে এসে বাপিকে ঘিরে নেয়। বুকের জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গিয়ে ভেতরটা কেমন শান্ত হয়ে যায়। বাপি উঠে দাঁড়াতেই কে যেন তার জামা ধরে টানে, আর হিন্দিতে বলে, এ বাবু, পইসা দেও না।

ঘুরে তাকিয়েই দেখেন ন্যাড়া মাথা একটা মিষ্টি ছেলে।

কেন, পয়সা নিয়ে কী করবি?

ছেলেটা হেসে বলে, মাখখন খায়গা।

এ কী অদ্ভুত বায়না! পয়সা নিয়ে মাখন খাবে! নাকি মাখন-রুটি বলতে চাইছে?

বাপি ওকে দুটো টাকা দিতেই বাচ্চাটা সেলাম ঠুকে বাপির সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করে। আর হাতের প্লাস্টিকের বাঁশিটা পোঁ-পোঁ করে বাজাতে থাকে।

কথায় কথায় জানা গেল ওর নাম বনবনিয়া। মা-বাবা কেউ নেই। কুলিদের বস্তিতে একজনের কাছে আশ্রয় নিয়ে আছে। সে খুব খাটায়, আর মদ খেয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে।

এইরকম নানা কথা বলতে বলতে বনবনিয়া হঠাৎ বাপির জামা খামচে ধরে বায়না করে বসে : এ বাবু, আমি তোহার সঙ্গে যাবে। তোহার সঙ্গে থাকবে।

বাচ্চা ছেলেটার এই অনুরোধ বাপিকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। বাপি আর না বলতে পারেননি।

বাড়িতে ওর একটা দিন কাটতে না কাটতেই আমরা সকলেই বুঝে গেলাম বম্বনিয়া দারুণ কাজের ছেলে। সব কাজই করে হাসি মুখে। লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে, গুনগুন করে দেশোয়ালি ভাষায় গান করে। আমাকে ডাকে ছোটে মালিক, দিদিকে ছোটে মালকিন, বাপিকে বাবু আর মা-কে মাজি।

নতুন জামাকাপড় ওকে পরানো গেল বটে কিন্তু মাথার ফেট্টি কিছুতেই ও খুলল না। আর কাজল লাগানোর অভ্যেস ছাড়ানো গেল না। মা কখনও কখনও কপট রাগে ওকে বলেন, গেঁয়ো ভূত।

উত্তরে বনবনিয়া খিলখিল করে হাসে।

এর মধ্যে একদিন দুপুরে নেকড়ের দল টাকা চাইতে বাড়িতে এসে হাজির হল।

দিনটা ছিল রবিবার। আমরা সবাই বাড়িতেই ছিলাম। ওদের ডাকে বাপি বাইরে বেরোতেই লোফারগুলো অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল।

বনবনিয়া আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের কাণ্ড দেখে চাপা গলায় আমাকে জিগ্যেস করল, এসব কী ব্যাপার, ছোটে মালিক?

আমি এতদিন কোনও কথা ওকে জানাইনি–চাকরবাকরকে জানানোর কোনও মানে হয় না তাই। কিন্তু ওর প্রশ্নটা শোনামাত্রই আমার মনটা কীরকম যেন হয়ে

গেল। ওকে সবকিছু খুলে বলতে ইচ্ছে করল।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল বনবনিয়া। এবং পরমুহূর্তেই বারান্দা ছেড়ে এক ছুটে চলে গেল উঠোনে–বাপির কাছে।

টার্গেট তখন অশ্লীল ভাষায় বাপিকে হুমকি দিচ্ছিল। আর বাপি অসহায়ভাবে মুখ বুজে অপমানগুলো সহ্য করছিলেন।

নেকড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল। ওর কাছাকাছি অচেনা দুজন শাগরেদ নোংরাভাবে হাসছিল।

টার্গেট হঠাৎই বাপির গলার কাছটা খামচে চেপে ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে বনবনিয়া চিৎকার করে উঠল, এ কোম্পানি, বাবুকো ছোড় দে! নেহি তো সব কুছু গড়বড় হয়ে যাবে।

নেকড়ে পাশ থেকে বনবনিয়াকে জোরালো এক লাথি কষাল।

আশ্চর্য! ওইটুকু পুঁচকে ছেলেটা ছিটকে পড়ে গেল না। ও সামান্য কাত হয়ে খর চোখে তাকাল নেকড়ের দিকে। ওর কাজল-টানা চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছিল। ছোট-ছোট দু-হাত মাথার ওপরে তুলে অদ্ভুত কয়েকটা মুদ্রা দেখাল ছেলেটা। তারপর কোম্পানি হোশিয়ার! বলে চিৎকার করেই বাপিকে ঘিরে বনবন করে ঘুরপাক খেতে লাগল। ওর ধাক্কায় টার্গেট ছিটকে গেল, আর ছেলেটা ঘুরতেই লাগল।

ওর গতিবেগ বাড়তে বাড়তে এমন হল যে, শেষ পর্যন্ত একটা ঝাপসা কুয়াশার পিণ্ড বাপিকে ঘিরে পাক খাচ্ছিল। ভর দুপুরের কড়া রোদ তার ওপরে ঠিকরে পড়ে রামধনু তৈরি করে ফেলল।

আমরা অবাক হয়ে এসব কাণ্ড দেখতে লাগলাম।

নেকড়ের দল কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে গেল।

ওরা সদর দরজা পেরিয়ে চলে যেতেই বনবনিয়া থামল। আমাদের সবার দিকে পালা করে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, বদমাশ লোগ ভাগ গয়া।

বাপি থতমত খেয়ে জিগ্যেস করলেন, এসব তুই কী কাণ্ড করলি রে, বনবনিয়া!

বনবনিয়া হাত উলটে বলল, হম কুছু করেনি, বাবু। হম কুছু নেহি করতা। সব হো যাতা হ্যায়।

এ আবার কী ধরনের কথা! ও কিছু করে না, সব হয়ে যায়!

মা আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুই গেঁয়ো ভূত, না ভগবান!

সেদিন আমরা বনবনিয়াকে ধরে কষে আদর করলাম। মা ওকে দুটো রসগোল্লা খাওয়ালেন। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ভিডিয়ো গেম খেলনাটা ওকে দিয়ে দিলাম।

বাপি দুশ্চিন্তার সুরে বললেন, কাজটা বোধহয় তুই ঠিক করলি না রে, বনবনিয়া। ওরা আবার আসবে। ওরা খুব সাংঘাতিক লোক।

পাকা-পাকা কথায় দিব্যি জবাব দিল ছেলেটা, কোই চিন্তা নাই, বাবু। খতরনাক আদমির সঙ্গে খেলা করতে হামার দারুণ লাগে। আও, ছোটে মালিক, লিখাই-পঢ়াই-কা টাইম হো গয়া।

শেষ কথাটা আমাকে লক্ষ করে। যত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি বনবনিয়া আমাকে আর দিদিকে যখন-তখন জ্ঞান দিচ্ছে। এখন যে আমার পড়তে বসার সময় সেটা আমি ভালো করেই জানি।

.

একদিন রাতে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম।

বনবনিয়া আমার ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শোয়। সেদিন রাতে ঘুমের ঘোরে আমি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎই ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। একইসঙ্গে কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। তাই ভরসা খুঁজতে পাশ ফিরে মেঝের দিকে তাকালাম–যেখানটায় বনবনিয়া শোয়।

দেখি বিছানায় ও নেই।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম বিছানায়। আর তখনই বাঁশির সুর শুনতে পেলাম। কেউ যেন ফিসফিস করে বাঁশি বাজাচ্ছে। সেই অস্পষ্ট মিহি সুর যেন কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যাচ্ছে।

বনবনিয়া এত মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাতে পারে তা তো জানতাম না! কিন্তু ও গেল কোথায়!

অন্ধকারে এপাশ-ওপাশ চোখ চালিয়ে ওকে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে না পেয়ে যখন ভাবছি বিছানা ছেড়ে উঠে দেখব দরজার ছিটকিনি খোলা কি না, ঠিক তখনই খোলা জানলা দিয়ে বাইরে নজর গেল আমার।

আকাশে প্রায়-পূর্ণিমার চাঁদ। তাকে ঘিরে কয়েক টুকরো মেঘ। আমাদের বাগানের একটা বড় জাম গাছ চাঁদের আলো আড়াল করায় উঠোনের একটা দিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সেই গাঢ় ছায়ার পাশেই ঠিকরে পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। বনবনিয়াকে সেই আলো-ছায়ার মধ্যে দেখতে পেলাম।

পরনে শুধু একটা হাফপ্যান্ট। মাথায় ফেট্টি বাঁধা। হাতে প্লাস্টিকের বাঁশি। ছেলেটা অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে একবার আলো থেকে ছায়ায় ঢুকছে, আর-একবার ছায়া থেকে আলোয়।

কেমন এক বিচিত্র আভা ছেলেটাকে জড়িয়ে ছিল। ফলে ও গাছের ছায়ার অন্ধকারে ঢুকে পড়লেও ওকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি হতবাক হয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই দেখি ও নাচ থামিয়ে জানলায় দিকে ফিরে আসছে।

আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম।

শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলাম, বনবনিয়া জানলা লক্ষ করে আসছে কেন। আমার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে তো ওকে বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে তারপর আসতে হবে। আর সেই দরজাটা তো অন্য দিকে! বনবনিয়া তো সেদিকে গেল না!

একটু পরেই নাকে সুন্দর একটা গন্ধ টের পেলাম ধূপ-ধুনোর গাঢ় গন্ধ। এ-গন্ধে নেশা ধরে যায়।

সামান্য চোখ খুলে দেখি বনবনিয়া এসে গেছে ঘরের ভেতরে। অদ্ভুত আভাটা তখনও ওর গায়ে জড়িয়ে আছে। আর সুন্দর গন্ধটাও।

আমি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। বনবনিয়ার এইসব উদ্ভট কাণ্ড দেখে আমার তো ভয় পাওয়ার কথা। কিন্তু কেন জানি না, একটুও ভয় করছিল না। বরং ও ঘরে ফিরে আসায় যেন বেশ ভরসা পেলাম। হঠাৎই ভীষণ ঘুম পেয়ে গেল আমার। তারপরই কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি।

এ-ঘটনার কথা আমি কাউকে বলিনি। পাছে বনবনিয়া আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেই ভয়ে।

কিন্তু কয়েকদিন পর রাতে শোওয়ার সময় ওকে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম।

ও কাজল-মাখা চোখে নিষ্পাপভাবে তাকাল আমার দিকে। মিষ্টি করে হেসে বলল, কা জানে, ছোটে মালিক। হম কুছু নেহি করতা। সব হো যাতা হ্যায়।

আমি হতবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। সেই মুহূর্তে হঠাৎই কেমন মনে হল, বনবনিয়া আমাদের বাড়িতে বেশিদিন থাকবে না।

.

চরম দিনটা এসে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

বনবনিয়া সন্ধে সাতটা নাগাদ আমাকে বলল, ছোটে মালিক, হামার সাথ চলো। পতঙ্গ লানে যায়েঙ্গে।

অনেক চেষ্টায় জানলাম পতঙ্গ মানে ঘুড়ি। এখন ও ঘুড়ি কিনতে যাবে! ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা আমারও আছে। কিন্তু এখন ঘুড়ি কিনতে যাওয়ার কথা শুনলে বাপি নির্ঘাত বকবেন। আর মাও নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা বলবেন না।

সেই আশঙ্কার কথা বনবনিয়াকে বলতেই ও ছুটে গেল পাশের ঘরে–বাপি আর মায়ের কাছে। আমিও তাড়াতাড়ি বইপত্র গুছিয়ে উঠে পড়লাম পড়ার টেবিল

ছেড়ে।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি বনবনিয়া বাপি আর মায়ের একেবারে হাতে-পায়ে ধরাধরি। ও ইনিয়েবিনিয়ে ঘুড়ি কিনতে যাওয়ার কথা বলছে, আর বারবার বলছে ওর হাতে আর সময় নেই। ওকে যাওয়ার অনুমতি দিতেই হবে। বিনা অনুমতিতে ও যেতে পারবে না।

সময় নেই মানে! কী বলতে চায় বনবনিয়া!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনুমতি পাওয়া গেল। কী ভেবে দিদি সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বনবনিয়া বারণ করল : নেহি, ছোটে মালকিন, তোহার যানা ঠিক নেহি হ্যায়।

একটু পরেই আমরা পথে বেরোলাম। আকাশ মেঘলা। চাঁদের আলোর ছিটেফোঁটাও নেই।

রাস্তার আলোর হঠাৎই খেয়াল করলাম, বনবনিয়া কোন ফাঁকে যেন পোশাক পালটে নিয়েছে। ওর গায়ে প্রথম দিনের সেই লাল-সবুজ ঢোলা জামা, সঙ্গে কালো হাফ-প্যান্ট। আর হাতে প্লাস্টিকের বাঁশি তো আছেই।

এবড়োখেবড়ো পিচ-খোঁড়া রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বনবনিয়া বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ও লোগ বহুত বদমাশ হ্যায়। বহুত আদমির সর্বনাশ করেছে।

বুঝলাম, ও নেকড়েদের কথা বলছে।

বনবনিয়ার সেদিনকার প্রতিবাদের পর নেকড়ের দল আরও দুবার এসেছে আমাদের বাড়িতে। হাবভাবে বুঝেছি, ওরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়েই এসেছে। তবে আগের তুলনায় অনেক ভদ্রভাবে ওরা বাকি টাকার দাবি করেছে বাপির কাছে। বনবনিয়াকে মা তখন আগলে রেখেছিল–পাছে ও আগের দিনের মতো কিছু করে বসে।

ওরা চলে যাওয়ার পর বনবনিয়া আমার কাছে বসে গজগজ করছিল : পাপ কা ডালা ভর গিয়া। পাপ কা ডালা ভর গিয়া।

কাদের পাপের ডালা ভরে গেছে? ও কি নেকড়েদের কথা বলছে?

আনমনা হয়ে এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে খেয়াল করিনি কখন যেন বাজারের মোড়ে পৌঁছে গেছি। অথচ ঘুড়ির দোকানে যেতে হলে এদিকে আসার কথা নয়। এদিক দিয়ে গেলে অনেকটা ঘুরপথ হয়।

চোখে পড়ল নেকড়ে তার পাঁচজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে যথারীতি হাজির। কী একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে।

আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে বনবনিয়া সোজা এগিয়ে গেল ওদের দিকে। আমি ওকে ডেকে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বনবনিয়া নেকড়েকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠল, এ কোম্পানি, তোহার পাপ কা ডালা ভর গিয়া।

নেকড়ের দল সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের খেয়াল করল। কানে-শোনা-যায়-না এমন ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে ওরা তেড়ে এল আমাদের দিকে। ছজনকে ওইভাবে তেড়ে আসতে দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, বনবনিয়া, পালিয়ে এসো।

বনবনিয়া আমার দিকে ফিরে হাসল, তারপর ওর প্লাস্টিকের বাঁশিতে ফুঁ দিল।

বাজারের মোড়ে লোকজন কম যাতায়াত করে না। তা ছাড়া ছোট-বড় দোকানপাটও অনেক। কিছু দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও বেশ কিছু এখনও ভোলা।

গণ্ডগোলটা শুরু হতেই আমাদের ঘিরে লোকজনের ভিড় জমে গেছে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে সবাই।

বনবনিয়ার বাঁশিতে সুর উঠতেই একটা চেনা সুগন্ধ আমার নাকে এল। বনবনিয়াকে ঘিরে একটা আবছা আভাও যেন লক্ষ করলাম।

নেকড়ের দল ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সংঘর্ষের বিশ্রী শব্দ আমার কানে এল। দেখি নেকড়েরা তিনজন হাত-বুক-মুখ চেপে রাস্তায় বসে পড়েছে। একজনের নাক ফেটে রক্ত পড়ছে। ওরা যেন কোনও পাথরের মূর্তির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারণ বনবনিয়া নিশ্চলভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

নেকড়ে ততটা আহত হয়নি। ও এক ছুটে একটা দরমা ঘেরা দোকানে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই একটা লম্বা ধারালো তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। রাস্তা আর দোকানের আলো পড়ে তরোয়ালটা ঝিকিয়ে উঠল।

তরোয়ালটা বাগিয়ে ধরে ধীরে-ধীরে পা ফেলে বনবনিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল নেকড়ে। নোংরা গালাগাল দিয়ে বলল, তোর ন্যাড়া মাথা এক কোপে দু-ফাঁক করে দেব।

তরোয়ালটা শূন্যে ঘুরিয়ে নেকড়ে বসিয়ে দিল বস্তুনিয়ার মাথায়।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। দর্শকদের কেউ-কেউ অজান্তে আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু নেকড়ের তরোয়ালটা স্রেফ বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ন্যাড়া মাথা বাচ্চা ছেলেটা একইভাবে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে।

হতভম্ব নেকড়ে অন্ধ রাগে ওকে লক্ষ করে পাগলের মতো তরোয়াল চালাতে লাগল। কিন্তু তার ফল হল একই।

শেষ পর্যন্ত ও তরোয়ালে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

টার্গেট আর হীরালাল বস্তুনিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল, বম্বনিয়া ওদের দিকে তাকিয়ে খলখল করে হেসে উঠল। ওর চোখ হঠাৎই লাল টুনি বাতি হয়ে জ্বলে উঠল। বম্বনিয়া চিৎকার করে বলে উঠল, হম কুছু নেহি করতা। সব হো যাতা হ্যায়।

টার্গেট বনবনিয়ার বুক তাক করে গুলি চালাল।

গুলিটা বোধহয় বনবনিয়ার গায়ে ঠিকরে আবার টার্গেটের দিকেই ফিরে গেছে। কারণ টার্গেট রিভলভার ফেলে দিয়ে তলপেট চেপে বসে পড়ল। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল।

আমাদের চারপাশে ততক্ষণে শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। হীরালাল দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল। আহত নগাও ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বনবনিয়া বাঁশিতে সুর তুলতেই ওরা পলকে পাথর হয়ে গেল। যেন কেউ ওদের মন্ত্রবলে অবশ করে দিয়েছে।

বনবনিয়া আমার কাছে এসে মিষ্টি করে হেসে বলল, হম যাতা হ্যায়, ছোটে মালিক। এদেরকেও নিয়ে যাচ্ছি। এরা আর কখনও ফিরে আসবে না। আর

কারও সর্বনাশ করবে না।

আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ন্যাড়া মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা বাচ্চা ছেলেটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে রওনা হল অন্ধকারের দিকে। আর নেকড়েরা ছজন কোন অলৌকিক নির্দেশে ওকে অনুসরণ করল। ঠিক যেন হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা ইঁদুরের পালকে মন্ত্রমুগ্ধ করে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে বম্বনিয়া চেঁচিয়ে বলে গেল, যব কিসিকা পাপ কা ডালা ভর যাতা হ্যায়, তব হম আতা হ্যায়।

কারও পাপের ডালা পূর্ণ হলেই বনবনিয়া আসে! বিপদ থেকে সবাইকে বাঁচায়।

বনবনিয়াকে তারপর আমি আর কখনও দেখিনি।

যদি কখনও তোমরা ভীষণ বিপদে পড়ো, অসহায় দিশেহারা হয়ে যাও, আঁকড়ে ধরার জন্যে কোনও খড়কুটোও না থাকে তখন যদি মাথায় ফেট্টি বাঁধা ন্যাড়া মাথা টিকিওয়ালা কোনও বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পাও, চোখে কাজল, কপালে কাজলের টিপ, হাতে বাঁশি, তোমার কাছে এসে মাখন খাওয়ার পয়সা চাইছে–তো বুঝবে ও-ই হল বনবনিয়া। তবে ওর আসল নাম বোধহয় বিপত্তারণ।

# চোর ধরল ঝামেলা

**চোর ধরল ঝামেলা**

কোনও রোবটের পুজোর জামা কেনা যে কীরকম ঝকমারি সেটা এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ছোটকা। তার ওপর যদি সেই রোবট বাচ্চা খোকা হয়, আর তার নাম হয় ঝামেলা, তা হলে তো কথাই নেই।

যমজ দুই ভাইপো, চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে পুজোর জামা-প্যান্ট কিনে দেবে বলে ছোটকা ওদের নিয়ে রওনা হচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে হেলে দুলে হাঁটতে-হাঁটতে সামনে এসে হাজির হল তিনফুট মাপের বাচ্চা রোবট ঝামেলা। রিনরিনে মেয়েলি গলায় বলল, টুইন দুই ব্রাদারের সহিত আমিও পূজার জামা কিনিতে যাব…কিনিতে যাব..কিনিতে যাব…।

ঝামেলার কিনিতে যাব… ব্যাপারটা আর থামছিল না বলে ছোটকা ওর ন্যাড়া ধাতব মাথায় মারল এক চাটি। তারপর বলল, ওর ভেতরের সার্কিটে বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। পরে দেখে দেব, বুঝলি, ঝালাপালা।

শেষ কথাগুলো ছোটকা বলেছে চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে লক্ষ করে। ছোটবেলায় এই যমজ জুটি কান্নাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচি করে বাড়িসুদ্ধ সবার কান ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা ওদের নাম রেখেছিল ঝালাপালা। তবে এ-নামে আর কেউ ওদের ডাকলে দু-ভাই ভীষণ খেপে যায়।

ঝামেলার ঝকঝকে মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। তবে আঙুলগুলো খুব নিখুঁতভাবে তৈরি। সবসময় ও জামা-প্যান্ট পরে থাকে। ছুটতে পারে না, হেলে দুলে হাঁটতে পারে। ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারে, কিন্তু গলার স্বরটা মিহি মেয়েলি।

সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা কথা-বলা পুতুল।

পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই বাচ্চা রোবটটা ছোটকাই তৈরি করে দু-ভাইকে উপহার দিয়েছে।

ছোটকার চঁটি খেয়ে ঝামেলা চুপ করে গিয়েছিল–তবে সে মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য।

ঝালাপালা যখন পুজোর জামা কিনতে যাওয়ার আনন্দে হইহুল্লোড় শুরু করে দিয়েছে তখন ঝামেলা গম্ভীরভাবে বলে উঠেছে, এত লম্ফঝম্পপূর্ণ উল্লাসের কী হইয়াছে? সেই কোন আদিম যুগে পড়ে আছ। বিবর্তন হয়ে আমার জায়গায় পৌঁছেলে বুঝতে সভ্যতার আর এক নাম সংযম। আমাকেই অবলোকন করো না। আনন্দ কি আমারও হইতেছে না? কিন্তু আমি কি শাখামৃগের ন্যায় জাম্প দিচ্ছি?

ঝামেলার এই একটাই গোলমাল। এখনও শুদ্ধ বাংলা বলতে শেখেনি। সাধু-চলিত আর ইংরেজির জগাখিচুড়ি তৈরি করে যা প্রাণ চায় বলে বেড়ায়। যদিও অবশ্য ওর প্রাণ বলতে ঘাড়ের কাছে লুকিয়ে রাখা ব্যাটারি।

ছোটকা বলে, ঝালাপালার কাছে ঝামেলার এখন ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে লক্ষ করে বলল, ঝামেলা, স্টপ!

ওর নির্দেশে ঝামেলা নীরব স্ট্যাচু হয়ে গেল।

ছোটকা হেসে বলল, ঝামেলা তোদের পোষা রোবট, না গার্জেন!

ঝালা-পালা কোনও কথা না বলে ছুটল মায়ের কাছে। মাকে খুশির খবরটা বলে ঝটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ছোটকা সেই ফাঁকে ঝামেলার নানান পার্টস চেক করে নিতে লাগল।

ঝালাপালা তৈরি হয়ে আসতেই ওরা চারজন রওনা হয়ে পড়ল।

ইন্দ্রকান্ত বলল, ঝামেলা, স্টার্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলার কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙের ছোট ছোট বাতিগুলো জ্বলে উঠল। তারপর দপদপ করে জ্বলতে আর নিভতে লাগল। ঝামেলা খুশি হলে বা উত্তেজিত হলে এই বাতিগুলো এইরকম জ্বলে-নেভে।

ঝামেলা চেঁচিয়ে বলে উঠল, তাই-তাই-তাই, পুজোর জামা চাই।

ছোটকা একটা ট্যাক্সি ডাকতেই সবাই তাতে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটে চলল ধর্মতলার দিকে।

রাস্তায় অনেক লোকজন, যানবাহন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে শরতের রোদ্দুর। মাথার ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশ।

এপাশ-ওপাশ মাথা ঘুরিয়ে সবকিছু দেখতে-দেখতে ঝামেলা মন্তব্য করল, বাতাসে কেমন একটা পূজা-পূজা স্মেল। তোমরা টের পাইতেছ?

ছোটকা হেসে বলল, হ্যাঁ পাইতেছি। কিন্তু তুমি দয়া করে একটু চুপ করবে? নইলে তোমার পুজোর জামা কিনে দেব না।

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলা চুপ।

কিন্তু ঝামেলাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হল রেডিমেড জামাকাপড়ের বিশাল মাপের দোকানটায় ঢুকতেই।

না, ঝামেলা রোবট বলে নয়। কারণ আজকাল অনেকেই নানা মাপের নানা ঢঙের রোবট সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোয়। বহু কোম্পানি রোবট তৈরি করে, টিভিতে তারা ইনস্টলমেন্টে রোবট বিক্রির বিজ্ঞাপনও দেয়।

দোকানে ঢুকে জামাকাপড় পছন্দ করার সময় ঝামেলা হঠাৎ ছোটকার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আমি একজন তস্করকে দেখিতে পেয়েছি।

ছোটকা এবং ঝালাপালা তিনজনেই অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকাল। কারণ, ঝামেলার দেখা ও শোনার ব্যাপারটা যে মোটেই সাধারণ নয় সেটা ওরা জানে। ঝামেলার টেনিসবল সাইজের কাচের গুলির মতো চোখ দুটো পুঞ্জাক্ষি অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি। এই চোখ দিয়ে ঝামেলা একমাইল দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়–ঠিক টেলিস্কোপের মতো। আর ওর কানের জায়গায় রয়েছে

স্রেফ দুটো ফুটো। কিন্তু তার ভেতরে এমন সব কলকবজা আছে যে, ও আলট্রাসনিক মানে, শব্দোত্তর তরঙ্গ–পর্যন্ত শুনতে পায়।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, কী দেখতে পেয়েছ?

তস্কর, তস্কর। সাদা বাংলায় থিফ মানে, চোর।

কথা বলার সময় ঝামেলার কপালের বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলে উঠতে লাগল। ঝালা পালা বুঝল ঝামেলা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

ছোটকা ঝামেলার কথা মোটেই উড়িয়ে দিতে পারল না। কারণ, রোবটটা ওর নিজের হাতে তৈরি। তা ছাড়া রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না। অবশ্য কোনও ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করাটা রোবটের পক্ষে অসম্ভব নয়।

ছোটকা দোকানের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানটায় জামাকাপড়ের যেমন স্টক তেমনই খদ্দেরের ভিড়ে একেবারে গিজগিজ করছে। প্রচুর সেল্সম্যান ও সেল্সগার্ল এদিক-ওদিক নানান কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। স্টিরিও স্পিকারে গমগম করে মিউজিক বাজছে। দোকানের বিশাল বিশাল দেওয়ালে নানা রঙের ইলেকট্রনিক রোলিং ডিসপ্লে। তাতে নামি কোম্পানির জামা-প্যান্টের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে পুজোর স্পেশাল ডিসকাউন্টের ঘোষণা পর্যন্ত রয়েছে। দোকানের দরজার পাশে এক কোণ ঘেঁষে দশ বাই দশ মাপের একটা কাচের ঘর। সেখানে তিনটে কম্পিউটার নিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই ছোটকা ঝামেলাকে একপাশে ডেকে নিল। তারপর চাপা গলায় বলল, ঝামেলা, ঝটপট বলো, কোথায় তুমি চোর দেখলে।

ঝামেলা বলল, আমার সঙ্গে ওদিকটায় চলো, মেয়েটাকে দেখাইয়া দিতেছি। আমার পু…পু…

ছোটকা ঝামেলার মাথায় এক চাটি মারতেই ও বলল, পু…পুঞ্জাক্ষিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, তোরা এই কাউন্টারেই থাক–জামা-প্যান্ট পছন্দ কর–আমি এক্ষুনি আসছি…।

ঝালা-পালাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছোটকা ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভিড় ঠেলে একটা কোণের দিকে পৌঁছেই ঝামেলা ছোটকাকে ইশারায় থামতে বলল। তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, তোমার পশ্চাৎদিকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কেয়ারফুলি তাকাও। হলুদ টপ এবং কালো স্কার্ট পরা ফরসা মেয়েটিকে লক্ষ করিতেছ? উনিই হলেন শ্রীমতী তস্কর।

ঝামেলার কথা মতো ধীরে-ধীরে পিছনে ফিরল ছোটকা। তারপর মোটামুটি তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নজরটা ঘোরাতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল।

মেয়েটির গড়ন সুন্দর ছিপছিপে। বয়েস বড়জোর ষোলো কি সতেরো হবে। ওর হাতে একটা ছোট মাপের সাইডব্যাগ। ব্যাগটার রং নীল আর কালোয় তৈরি দাবার ছক–তবে বেশ মলিন। বিশেষ করে মেয়েটির চেহারা ও পোশাকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

ঝালাপালা কিন্তু ছোটকার পিছু ছাড়তে চায়নি। বিশেষ করে ঝামেলার তস্কর দর্শন রহস্য ওদের কৌতূহলী করে তুলল।

সুতরাং ভিড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে যমজ জুটি সামান্য চেষ্টাতেই পৌঁছে গেল ছোটকার কাছে। দোকানের বেশ কয়েকজন ক্রেতা অবিকল একই চেহারার একই পোশাক পরা দুই ভাইকে বারবার অবাক নজরে দেখেছিল। কিন্তু ঝালাপালার সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না। ওরা শুধু ঝামেলাকে দেখছিল।

ঝালা-পালাকে দেখে ছোটকা শাসনের সুরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝামেলা ওর শক্ত হাতে ছোটকার পেটে চোরা চিমটি কাটল, আর একইসঙ্গে মিহি গলায় বলল, লুক! লুক! অপহরণ করছে।

ছোটকা এবং ঝালাপালা তিনজনেই স্পষ্ট দেখতে পেল ব্যাপারটা।

প্রমাণ মাপের একটা জিন্‌সের প্যান্ট কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে ছোট সাইডব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল মেয়েটি। এবং ওদের সবাইকে অবাক

করে দিয়ে প্যান্টটা অনায়াসেই ঢুকে গেল ব্যাগের ভেতরে।

বড়সড়ো ব্যাগ বা ঝোলা নিয়ে দোকানে ঢোকা নিষেধ। তাই দরজার কাছেই রয়েছে ব্যাগ জমা দেওয়ার কাউন্টার। কিন্তু পার্স বা ছোট সাইডব্যাগ জমা রাখার কোনও দরকার নেই। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে সবাই ঢুকতে পারে দোকানের ভেতরে–যেমন এই মেয়েটি ঢুকেছে।

পার্স বা ছোট সাইডব্যাগে জামাকাপড় লুকিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সে কথা মাথায় রেখেই দোকানের নিরাপত্তাকর্মীরা মেয়েটিকে ওই ছোট ব্যাগসমেত দোকানে ঢুকতে দিয়েছে। কিন্তু ছোটকারা চোখের সামনে যে-ঘটনা দেখল তা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

ছোটকা কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝামেলা বলে উঠল, এইরূপ জামাকাপড় প্রচুর লইয়াছে এবং ওই ব্যাগের ভেতরেই সব ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ঝালাপালা প্রায় একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে বলল, ছোটকা, ঝামেলার সার্কিটে মনে হয় বেশ বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। তাই ও উলটোপালটা দেখছে আর ভুলভাল বকছে। ওইটুকু ব্যাগে কখনও এত জামাকাপড় ঢোকে!

ঝামেলা রেগে গিয়ে বলল, তোমরা কী করে বুঝিবে! বানর থেকে মানুষ হওয়ার পর সেই কোন আদিমকালে পড়ে রয়েছ! যদি আমাদের মতো রোবট হতে তা হলে বুঝিতে!

ঝামেলার বিশ্বাস, মানুষ থেকে বহু বিবর্তনের পর এসেছে রোবট। তাই ও মাঝে-মাঝেই ঝালা-পালাকে আদিমযুগের মানুষ বলে খোঁটা দেয়।

হঠাৎই ছোটকা ঠোঁটে আঙুল তুলে ওদের চুপ করতে ইশারা করল। তারপর চাপা গলায় বলল, ওই দ্যাখ মেয়েটা আবার চুরি করছে!

তারপর ওদের চোখের সামনেই রীতিমতো অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগল।

মেয়েটি বেশ কয়েকটি জামাকাপড় সেলসম্যান-সেল্সগার্লদের চোখ এড়িয়ে পটাপট ঢুকিয়ে ফেলল ওর ব্যাগে।

ছোটকা আপনমনেই বলল, মেয়েটা ক্লেপটোম্যানিয়াক নয় তো?

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, ক্লেপটোম্যানিয়াক মানে?

ইন্দ্রকান্তও বলে উঠল, সেটা আবার কী?

ছোটকা বলল, ক্লেপটোম্যানিয়া মানে হল চুরি করার অসুখ। মেয়েটার সেরকম কোনও অসুখ নেই তো!

ঝামেলা বলল, ব্যাপার বড়ই বিপত্তারিণী।

ঝালাপালা ভুরু কুঁচকে ঝামেলার দিকে তাকাতেই ছোটকা বলল, ও বোধহয় বলতে চাইছে, ব্যাপার বড়ই বিপজ্জনক।

আরও দু-এক মিনিট মেয়েটিকে লক্ষ করার পর ছোটকা বলল, দাঁড়া, আমি ওর কাছে। গিয়ে ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি। তোরা এখানেই থাক, কোথাও যাস না কিন্তু।

ছোটকা ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে চাকরি করে। সুতরাং গোয়েন্দাগিরির অভ্যেস তো ওর আছেই, সেইসঙ্গে নানা অস্ত্রশস্ত্রও নাড়াচাড়া করতে পারে। ওরা দেখল, ছোটকা দিব্যি ভালোমানুষ-ভালোমানুষ মুখ করে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে মেয়েটির ঠিক পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটির ব্যাগের মুখটা খোলাই ছিল। উঁকি মেরে ব্যাগের ভেতরে তাকিয়ে ছোটকার তো চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগের ভেতরটা শূন্য! কোনও জামাকাপড়ই সেখানে নেই!

তা হলে এতক্ষণ ধরে মেয়েটি যে জামাকাপড়গুলো ব্যাগের মধ্যে ঢোকাল সেগুলো গেল কোথায়।

ছোটকা আর থাকতে পারল না। পকেট থেকে অফিসের আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে শক্ত গলায় মেয়েটিকে বলল, তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ। আমতা আমতা করে ও বলল, আমি…আমি… মানে…।

ছোটকা ওর কথায় কান না দিয়ে একজন সেল্‌সম্যানকে ডেকে জিগ্যেস করল দোকানের মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না।

উত্তরে সেল্‌সম্যানটি আঙুল তুলে ক্যাশিয়ারদের কাচের ঘরটা দেখিয়ে বলল, আমাদের মালিক মিস্টার আস্থানা ওই ঘরে আছেন।

ছোটকা তখন মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, তোমার সঙ্গে আর কে আছে?

মেয়েটি হোঁচট খেয়ে কোনওরকমে জবাব দিল, আমার দু-বন্ধু। ওরা এসব কিছু জানে না। ওরা ওইদিকটায় জিনসের শার্ট দেখছে। প্লিজ, ওদের কিছু বলবেন না।

ছোটকা দু-চার সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি ওই কাচের ঘরটায় যাচ্ছি। তুমি বন্ধুদের যা-হোক কিছু একটা বলে ওখানে চলে এসো। ভুলেও পালানোর চেষ্টা কোরো না। আর এই সাইডব্যাগটা আমাকে দিয়ে যাও।

মেয়েটি শুকনো মুখে ছোটকার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করল। বন্ধুদের খবর দিয়ে একমিনিটের মধ্যেই ও চলে এল কাচের ঘরের সামনে।

ছোটকা মিস্টার আস্থানার সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ওকে ভেতরে আসতে বলল।

অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ছোটকার কথাবার্তা ঝামেলা সবই শুনতে পাচ্ছিল। আর সেগুলো ও মিহি চাপা গলায় রিলে করে শোনাচ্ছিল যমজ দু-ভাইকে। মেয়েটি কাচের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তেই ঝামেলা বলে উঠল, এবার গ্লাসঘরের নিকটে চলো। নহিলে কিছু শুনতে পাইব না। আমার ভেরি কিউরিয়োসিটি হইতেছে, তৎসহ উত্তেজনা। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!

ঝামেলার কপালের রঙিন বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে নিভতে লাগল। অনেক সময় আনন্দে বা উত্তেজনায় ঝামেলা ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা! বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর আনন্দ বা উত্তেজনায় সঙ্গে জাপানের এই আগ্নেয়গিরিটির যে ঠিক কী ধরনের সম্পর্ক সেটা ঝালাপালা বা ছোটকা এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি।

ওরা তিনজনে কাচের ঘরের খুব কাছটিতে এসে দাঁড়াল। ঝালাপালা সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। আর ওদের শোনার সমস্যার সমাধান করে দিল আলট্রাসনিক কানের মালিক ঝামেলা।

দোকানের মালিক মিস্টার আস্থানা মোটাসোটা প্রৌঢ় মানুষ। মাথায় টাক। ঘাড়ের কাছে কয়েক গোছা সাদা চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলল ছোটকা।

ব্যাপার-স্যাপার শুনে ভদ্রলোক খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ছোটকা ব্যাগটা খুলে আগেই দেখেছিল, এখন মিস্টার আস্থানাকে দেখাল।

ব্যাগের ভেতরটা কালো, অন্ধকার-জামাকাপড়ের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই।

ছোটকা ব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকাল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ছোটকার হাত ব্যাগের কোনও তল খুঁজে পেল না!

ব্যাগের মুখটায় নিকেল করা ধাতুর পটি লাগানো ছিল। সেটার উষ্ণতা স্বাভাবিক মনে হলেও ছোটকা টের পেল যে, ব্যাগের ভেতরটা ভীষণ ঠান্ডা। ঠিক যেন দার্জিলিং।

মিস্টার আস্থানা হতভম্ব হয়ে ছোটকাকে দেখছিলেন। আর মেয়েটিও মুখ কঁদো-কঁদো করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছিল।

মিস্টার আস্থানার টেবিল থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিল ছোটকা। সেটা টুপ করে ফেলে দিল ব্যাগের ভেতরে। পেনটা যথারীতি অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাগের ভেতরে হাতড়ে ওটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ বাইরে থেকে ব্যাগটার গভীরতা সাত-আট ইঞ্চির বেশি মনে হয় না।

ছোটকা একজন ক্যাশিয়ারের টেবিল থেকে একটা মেটাল স্কেল তুলে নিল। স্কেলটার দৈর্ঘ্য একফুট। অথচ সেটা খাড়াভাবে ব্যাগে ঢোকাতেই স্কেলটা বিনা বাধায় তলিয়ে গেল ব্যাগের অতলে।

মিস্টার আস্থানা অবাক হয়ে ছোটকাকে জিগ্যেস করলেন, এ তো ভারী পিকিউলিয়ার মিস্টিরিয়াস ব্যাপার! আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন?

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। ব্যাগটার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ও গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। কিছুক্ষণ পর বারকয়েক মাথা নেড়ে ছোটকা জবাব দিল, একটু একটু আঁচ করতে পারছি।

তারপর ছোটকা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে উত্তর দিল, আমার নাম রূপালি-রূপালি চ্যাটার্জি। সল্টলেকে বিডি মার্কেটের কাছে থাকি।

এই ব্যাগটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

সল্টলেকে বাস স্টপেজের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি।

রূপালির কথা থেকে জানা গেল, ব্যাগটা যখন ও কুড়িয়ে পায় তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। তাই ও ব্যাগটা নিয়ে বাসে উঠে পড়ে। কঁকুড়গাছির কাছে ওর বন্ধু রীতার বাড়ি। সেখানে ওদের আর-এক বন্ধু রঙ্গনার আসার কথা। তারপর তিন বন্ধুতে মিলে ধর্মতলার পুজোর ড্রেস কিনতে রওনা হবে এইরকমই ঠিক করা ছিল।

বাস থেকে নেমে রীতার বাড়ি যাওয়ার সময় ও কী ভেবে ওর ছোট্ট পার্স আর রুমালটা এই ব্যাগটায় রাখে। কিন্তু তারপরই দ্যাখে যে ওগুলোর আর কোনও হদিস নেই। তখন ও অবাক হয়ে ঢিল-পাটকেল, গাছের পাতা, চায়ের ভঁড়, অনেক কিছুই ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং দ্যাখে যে, সেগুলোও বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমটায় ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই ওর মনে হয়, ব্যাপারটা খুব মজার। তাই রীতা আর রঙ্গনাকে ও কিছুই জানায়নি। শুধু বলেছে, বাস থেকে নামার পর ওর পার্সটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তারপর এই দোকানে ঢুকে ও স্রেফ মজা করার জন্যই বেশ কিছু জামাকাপড় ব্যাগটায় ঢুকিয়ে অদৃশ্য করে দেয়। কিন্তু ওগুলো যে কোথায় গেছে ও তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

কথা শেষ করে রূপালি কেঁদে ফেলল। ছোটকাকে বারবার করে অনুরোধ করল ওর বাড়িতে যেন কিছু না জানানো হয়।

ছোটকা মালিকের কাছ থেকে একটা প্যাডের কাগজ নিয়ে খসখস করে একটা রিপোর্ট লিখে সই করে দিল। তারপর তিন জায়গায় ফোন করে মিনিটকয়েক ধরে কথাবার্তা বলল।

কথাবার্তা শেষ হলে ছোটকা রূপালিকে বলল, তোমার আর কোনও চিন্তা নেই–তুমি যাও। শুধু জেনে রেখো, আজ তুমি সাংঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। কারণ এই ব্যাগটা আসলে ব্যাগ নয়…একটা টানেল।

রূপালি কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছতে মুছতে বন্ধুদের খোঁজে চলে গেল।

মিস্টার আস্থানার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ব্যাগটা নিয়ে ছোটকাও বেরিয়ে এল কাচের ঘর থেকে।

ছোটকা বেরিয়ে আসতেই ঝামেলা জিগ্যেস করল, কী হল, সলভ হইল?

ছোটকা হেসে বলল, হ্যাঁ, হইল। তারপর ঝালা-পালাকে লক্ষ করে বলল, এখন চটপট তোদের প্যান্ট-জামা পছন্দ কর তো।

চন্দ্রকান্ত আবদারের সুরে বলল, ব্যাগটার মিস্ট্রিটা আমাদের খুলে বলো, ছোটকা।

আগে কেনাকাটা সেরে নে, তারপর যেতে-যেতে বলছি।

কেনাকাটা সেরে রাস্তায় বেরোনোর সময় একটা লম্বা রোবট ঝামেলাকে লক্ষ করে মন্তব্য করল, ন্যাড়া খোকা।

সেটা শুনে ঝামেলা তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে উঠে তেড়ে গেল লম্বা রোবটটার দিকে। বলল, টুডে তোর ওয়ান ডে কি আমার ওয়ান ডে!

ঝালাপালা কোনওরকমে ঝামেলাকে টেনে ধরে সামাল দিল।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, ও কী বলল একটু ঝুঝিয়ে দে তো!

চন্দ্র বলল, ঝামেলা বলল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

ইন্দ্র বলল, ওসব বাদ দাও। তুমি আগে ব্যাগের মিস্ট্রিটা বলো দেখি।

ছোটকা বলল, শোন তা হলে বলছি। ব্যাপারটা বিজ্ঞানের খুব জটপাকানো ব্যাপার, তোরা সহজে বুঝবি না–তবুও সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি সেটা হল ত্রিমাত্রিক দুনিয়া বা থ্রি ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ড। সেইজন্যেই আমাদের তিনটে মাপ আছে–দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। এইবার কল্পনা কর যে, একটা দ্বিমাত্রিক দুনিয়া, মানে টু ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ড আছে। সেখানকার প্রাণীদের শুধু দুটো মাপ থাকবে– দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ। অর্থাৎ, প্রাণীগুলো হবে চিঁড়েচ্যাপটা চেহারার, আর ওরা দ্বিমাত্রিক কোনও সমতলে লেপটে চলাফেরা করবে। শুধু কি তাই! ওদের দেখার কাজটাও হবে ওই দ্বিমাত্রিক সমতল বরাবর। ফলে ওদের জগতে–মানে, ওই সমতলে–যদি একটা ফুটো করে দেওয়া যায় তা হলে ওরা সেটাকে একটা অন্ধকার গর্ত হিসেবে দেখবে। কারণ, ওদের দেখার অভ্যেসটা সমতল বরাবর –তাই ওরা ফুটো দিয়ে কিছু দেখতে পাবে না। আর দেখতে না পাওয়া মানেই অন্ধকার। একটা কাগজের পৃষ্ঠা নিয়ে তাতে একটা ফুটো করে ব্যাপারটা ভাবলে অনেক সহজে বোঝা যাবে।

তা হলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? ওই ফুটোটা হল দ্বিমাত্রিক জগৎ আর ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে যাতায়াতের একটা পথ–মানে, টানেল। দ্বিমাত্রিক জগৎ থেকে যা কিছু ওই ফুটো দিয়ে ঢুকবে তা সরাসরি চলে যাবে ত্রিমাত্রিক দুনিয়ায়। ফলে দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণীরা দেখবে জিনিসগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কাগজের পৃষ্ঠায় একটা ব্যাগের ছবি এঁকে তার মধ্যে একটা ফুটো করে নিলে ব্যাপারটা আরও সহজে বোঝা যাবে। দ্বিমাত্রিক প্রাণীরা ভাববে ব্যাগটার কোনও শেষ নেই। ঠিক আমার হাতের ব্যাগটার মতো। কথাটা বলে রূপালির কাছ থেকে নেওয়া ব্যাগটা ছোটকা ওদের দেখাল। তারপর বলল, এইবার ত্রিমাত্রিক আর চতুর্মাত্রিক দুনিয়ার মধ্যে ঠিক একইরকম জিনিস কল্পনা করে দ্যাখ। রূপালির ব্যাগটার মধ্যে কেউ হয়তো এমন একটা ফুটো করে দিয়েছে যাতে ব্যাগের মুখটা ত্রিমাত্রিক আর চতুর্মাত্রিক দুনিয়ার মধ্যে একটা টানেল তৈরি করে ফেলেছে। ওই ফুটো দিয়ে যা কিছু ঢোকানো হচ্ছে তা সরাসরি চলে যাচ্ছে ফোর ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ডে।

কিন্তু ফুটোটা তৈরি হল কীভাবে? চন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

হাতের ব্যাগটার দিকে একবার তাকিয়ে চিন্তিত মুখে ছোটকা বলল, সেটাই তো তখন থেকে ভাবছি। দেখি, অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা জানাই। তারপর আমাদের রিলেটিভিটি ল্যাবরেটরিতে ব্যাগটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে।

ঝামেলা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, সবই সম্পূর্ণরূপে বুঝিলাম। তবে কিছু সামথিং ঝাপসা রয়ে গেল।

ঝালাপালা হেসে জবাব দিল, তোমার কাছে ঝাপসা থাকাই ভালো। তুমি বেশি বুঝে গেলে আর এক বিপদ হবে। এখন চুপচাপ বাড়ি চলো, নইলে তোমাকে ওই টানেলে ঢুকিয়ে ফোর ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ডে পাচার করে দেব।

ঝামেলা মাথা নেড়ে বলল, সে যা-ই বলো, আজ আমার জন্যেই তস্করং ধৃতং

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, শেষের কথাগুলোর মানে?

ঝামেলা বলল, ওগুলো হল মডার্ন সংস্কৃত–তোমরা বুঝবে না। সেই কোন আদিম যুগে পড়ে আছ! তস্করং ধৃতং মানে চোর ধরা পড়ল।

আর হস্তনস্ত মানে? ইন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।

ছোটকা হেসে জবাব দিল, হস্তনস্ত মানে বোধহয় হাতেনাতে। কী রে, ঝামেলা, ঠিক বলিনি?

ঝামেলা মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা! সেই সঙ্গে ওর কপালের লাল নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

# রাত ফুরোল, কথা ফুরোল

**রাত ফুরোল, কথা ফুরোল**

কোনও মেয়েকে একান্তে চুমু খেতে যাওয়ার মুহূর্তে যদি দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে তা হলে কে না বিরক্ত হয়!

সুতরাং আমিও বিরক্ত হলাম।

সুচরিতার প্রস্ফুটিত ঠোঁট আমার চোখের সামনে ক্লোজ আপে ভাসছিল। ঝিম ধরিয়ে দেওয়া কেমন একটা গন্ধ ওর শরীর থেকে বিকিরিত হয়ে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। কিন্তু কলিংবেলের শব্দে আমার চোয়াল শক্ত হতেই সুচরিতা সেটা টের পেল। আলতো গলায় ও বলে উঠল, এই ফ্ল্যাটে নয়–ওদিকের ফ্ল্যাটে কেউ বেল বাজাচ্ছে।

ওর অবস্থা আমি বুঝতে পারছিলাম..ঠিক আমার মতোই।

কলিংবেল অধৈর্য সুরে আবার বেজে উঠল। কোনও ভুল নেই আমার ফ্ল্যাটেই।

এরপর আর বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না। সুতরাং বিরক্তির একটা শব্দ করে উঠে পড়লাম। ছোট্ট করে তীক্ষ্ণ শিস দিতেই অটোমেটিক অডিয়ো কন্ট্রোল ঘরের আবছা আলো ধীরে-ধীরে জোরালো করে দিল। ধবধবে সাদা বিছানায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে শুয়ে থাকা ধবধবে ফরসা সুচরিতাকে একপলক দেখলাম। তারপর মনে-মনে নিজের পছন্দের তারিফ করলাম।

আমি বাইরের ঘরের দিকে রওনা হতেই সুচরিতা অস্পষ্ট গলায় পিছন থেকে বলল, ম্যানেজ করে জলদি চলে এসো।

আমি হাতঘড়ির বোতাম টিপতেই টকিং ওয়াচ মিষ্টি মেয়েলি গলায় বলে উঠল, এখন রাত দশটা বেজে আটাশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

এত রাতে কে এল আমাকে ডাকতে!

একথা ভাবতে-ভাবতে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাশের স্ট্যান্ড থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা তুলে নিয়ে দরজা লক্ষ করে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার একটা অংশ চৌকো জানলার মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। এর মধ্যে দিয়ে ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় না।

বাইরে দাঁড়ানো দুজন লোককে আমি দেখতে পেলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এদের ম্যানেজ করে জলদি সুচরিতার কাছে ফিরে যাওয়া যাবে না। জানলাটাকে আবার অস্বচ্ছ করে দিলাম।

লোক দুজন বোধহয় হোমিসাইড স্কোয়াডের সাদা পোশাকের অপারেটর। ওদের পোড় খাওয়া চেহারা, ঠান্ডা চোখ অন্তত সে কথাই বলছে। ওরা কি তা হলে শ্রাবন্তীকে খুঁজে পেয়েছে? কিন্তু তার সঙ্গে আমাকে জড়াল কেমন করে। সেরকম কোনও চিহ্ন তো আমি ফেলে আসিনি!

রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের অন্য একটা বোতাম টিপতেই বন্ধ দরজা নিঃশব্দে পাশে সরে গেল। আমি এবার ওদের মুখোমুখি।

ওদের সাজপোশাক প্রায় একই ধাঁচের–চেহারাও অনেকটা তাই।

চাপা জিনসের প্যান্ট, ঢোলা সুতির জামা, চোখে কালো সানগ্লাস। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কপালে ভাঁজ, চোয়ালের হাড় উঁচু। একজনের বাঁকানের লতিতে একটা সোনার রিং চকচক করছে।

আপনিই অমিত মজুমদার? দুজনের একজন জানতে চাইল।

আমি শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

আমরা হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে আসছি লেজারে হলোগ্রাম করা একটা ছোট্ট কার্ড আমার চোখের সামনে তুলে ধরল প্রথমজন : এত রাতে আপনাকে

ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত। আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

কেন? কী ব্যাপার?

মার্ডার কেস। শ্রাবন্তী সেন নামে একটা ইয়াং মেয়ের লাশ আমরা কাল সকালে পেয়েছি। গঙ্গায় পাওয়া গেছে। গলা টিপে মার্ডার করে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। বডিটা জেটির নীচে আটকে গিয়েছিল, তাই ভেসে যায়নি।

আমি ভেতরে-ভেতরে নিজেকে সামলে নিলাম। বিব্রতভাবে বললাম, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

প্রথমজন ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, বসার টাইম নেই। চলুন, হেডকোয়ার্টারে গিয়ে কথা হবে।

এক মিনিট। আমি চট করে রেডি হয়ে আসছি।

মেক ইট কুইক।

ওদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমি সুচরিতার কাছে চলে গেলাম। ওর খোলা পিঠে একটা চুমু খেয়ে পোশাক ঠিকঠাক করে নিলাম। মাথা আঁচড়ে গায়ে বিদেশি কোলোন স্প্রে করে নিলাম। তারপর আয়নায় নিজের চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললাম, সাবধান, যেন কোনও ভুল না হয়। সিরিয়াল কিলারদের ভুল করলে চলে না।

একবার সুচরিতার দিকে তাকালাম। ও একইভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। বোধহয় আমার কথাটা শুনতে পায়নি। অবশ্য পেলেও তার মানে বুঝতে পারবে না। যখন বুঝবে তখন আর কিছু করার থাকবে না–অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সুচরিতাকে বললাম, লাভ, আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আসছি। পুলিশ একটা মার্ডার কেসে ভুল করে আমাকে হ্যারাস করতে এসেছে। তুমি চিন্তা কোরো না নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।

সুচরিতা শরীরটাকে আধপাক ঘুরিয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে আমার দিকে তাকাল।

–আমি এসে তোমার ঘুম ভাঙাব। ওর দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলাম আমি।

ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দরজার পাশে দেওয়ালে বসানো অটোমেটিক ভয়েস লক সিস্টেমের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, ফ্ল্যাট লক করে দাও।

যন্ত্র তার সূক্ষ্ম বিচারে মালিকের কণ্ঠস্বর নিখুঁতভাবে চিনতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমার গলায় খোলার নির্দেশ না পেলে এই দরজার লক আর খুলবে না।

ওরা দুজন পাথরের মূর্তির মতো অপেক্ষা করছিল। আমি চলুন বলতেই রোবট দুটো যেন সাড় ফিরে পেল। নিঃশব্দে দুজন আমার দুপাশে চলে এল। আমরা এলিভেটরের দিকে রওনা হলাম।

বাইরের রাস্তায় এসে গাড়িতে ওঠার সময় ওদের একজন আমাকে জিগ্যেস করল, মিস্টার মজুমদার, শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চিনতেন?

আমি শ্রাবন্তীকে চিনতাম–বেশ অন্তরঙ্গভাবেই চিনতাম। তাই নির্লিপ্ত গলায় বললাম, না–।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তার পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে সঙ্গীর হাতে তুলে দিল, বলল, বর্ধন, তুমিই জিতলে–আমি হেরে গেলাম।

আমাকে অবাক হতে দেখে বর্ধন হেসে বলল, মিস্টার মজুমদার, আপনার এখানে আসার সময় বিশ্বাসকে আমি বলেছিলাম, শ্রাবন্তী সেনকে চেনার ব্যাপারটা আপনি ডিনাই করবেন। ও আমার কথা মানতে চায়নি, তাই আমার সঙ্গে একশো টাকা বাজি ধরেছিল– জিভে দুঃখের চুকচুক শব্দ করে আবার হাসল বর্ধন ও বিশ্বাস, বেকার তোমার একশোটা টাকা গেল।

গাড়ির পেছনের সিটে আমাকে মাঝখানে রেখে বর্ধন আর বিশ্বাস দুপাশে বসল। ওদের লুকোনো ব্লাস্টার গান আমার কোমরে খোঁচা দিচ্ছিল। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগোতেই বর্ধন চাপা গলায় বলল, মিস্টার মজুমদার, শ্রাবন্তীকে আপনি চিনতেন…আমাদের হাতে মারাত্মক প্রমাণ রয়েছে।

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বর্ধনের দিকে তাকাতেই বাঁ-পাশ থেকে বিশ্বাস বলে উঠল, অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে খুন করলেন কেন বলুন তো!

আমি অসহায়ভাবে বলে উঠলাম, আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে শ্রাবন্তীকে আমি চিনি না।

হেডকোয়ার্টারে গিয়ে দাওয়াই দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে। দাঁতে দাঁত চেপে বর্ধন মন্তব্য করল।

আমি নিরুপায় হয়ে গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা আমার মুখে দক্ষ হাতে তুলির আঁচড় কাটছিল। আর আমার মনে পড়ছিল ফুটফুটে মেয়েগুলোর কথা।

গত চারমাসে কলকাতার নানা জায়গায় এগারোজন তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওদের প্রত্যেককেই গলা টিপে খুন করা হয়েছে। খুন করেছি আমি। না, আসলে ঠিক আমি না–আমার ভেতর থেকে একটা অচেনা খুন-পাগল লোক এই জঘন্য কাজগুলো করে। চারমাস আগে আমার মাথার ভেতরে ওই পাগলটা প্রথম জেগে ওঠে। খুন করে রত্নাকে। তারপর একে একে মাধুরী, সুজাতা, নয়না, সুন্দরী, প্রথমা, সাগরিকা...সব নাম আমার মনে নেই। সংখ্যাটা যে মনে আছে তার কারণ ইন্টারনেট নিউজে প্রায় প্রতিদিনই এ-নিয়ে খবর বেরোয়–তাতে বারবার করে ওরা সংখ্যাটা আমাকে জানিয়ে দেয়–পাছে আমি ভুলে যাই। ওরা আমার নাম দিয়েছে–মানে, আমার ভেতরের ওই পাগলটার নাম দিয়েছে সিরিয়াল কিলার ধারাবাহিক খুনি। একজন রসিক সাংবাদিক এমন মন্তব্যও করেছে, এই সিরিয়ালের সবে এগারোটা এপিসোড হয়েছে, কত এপিসোডে শেষ হবে কে জানে!

আমার হাসি পেল। কটা এপিসোডে এই সিরিয়াল যে শেষ হবে তা আমিও জানি না। জানে আমার মাথার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ওই পাগলটা। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, আজ কিংবা কাল রাতে সুচরিতাকে নিয়ে পাগলটার বারো নম্বর এপিসোড শেষ করার কথা।

শ্রাবন্তীর কথা মনে পড়ল আমার। শ্রাবন্তীকে আমি যে ভালো করেই চিনতাম তার কী মারাত্মক প্রমাণ পেয়েছে ওরা? এর আগের খুনগুলোর বেলায় পুলিশ আমাকে কোনও সন্দেহ করেনি, কোনওদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও আসেনি। কিন্তু এইবার যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই ওদের হাতে কোনও-না-কোনও সূত্র আছে। অর্থাৎ, কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। কিন্তু কী সেই ভুল?

লালবাজারে হোমিসাইড স্কোয়াডের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছোতেই আমার ভাবনায় বাধা পড়ল। মনে-মনে নিজেকে তৈরি করে নিলাম। সতর্কতা বাড়িয়ে দিলাম দশ গুণ।

গাড়িতে অটোমেটিক প্রোগ্রাম করাই ছিল। তাই ড্রাইভার হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও গাড়িটা হিসেবমতো নিখুঁত বাঁক নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেসে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম বলে উঠলঃ আমরা গন্তব্যে এসে গেছি।

ড্রাইভার কী-একটা বোতাম টিপতেই হাইড্রলিক কন্ট্রোল নিঃশব্দে দুটো দরজা খুলে দিল। আমরা তিনজন নেমে পড়লাম।

এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে আমি চারপাশটা দেখতে লাগলাম।

লালবাজারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আগে কখনও আমি আসিনি। এর সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বহুবার গেলেও ভেতরে এই প্রথম। কেন জানি না, আমার বুকের ভেতরে একটা অচেনা পেন্ডুলাম ঢং-ঢং করে বাজছিল।

পাথর বাঁধানো বিশাল পার্কিং স্পেসে প্রায় দেড়-দু-ডজন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জায়গায়। জায়গায় লাগানো হ্যালোজেন বাতি সুন্দর আলোর বৃত্ত তৈরি করেছে। বৃত্তের বাইরেটা আবছা অন্ধকার।

উঠোনের মাঝে একটা লাস্যময়ী নাচিয়ে ফোয়ারা। তার নাচের তালে-তালে লুকোনো বাজনা নীচু গ্রামে বাজছে। বাজনার সঙ্গে তাল রেখে চলছে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলোর খেলা।

উঠোনকে ঘিরে প্রায় বিশতলা উঁচু চারটে বিশাল বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলো যেন সানগ্লাসের কাচ দিয়ে তৈরি। বাড়ি লক্ষ করে অনেকগুলো হ্যালোজেন ফোকাস লাগানো রয়েছে। বাড়ির কাচের দেওয়াল সেই আলো আয়নার মতো ঠিকরে দিচ্ছে।

এই সুন্দর-সুন্দর বাড়ির ভেতরেই চলে অপরাধীকে শায়েস্তা করার নোংরা কাজ।

রাত বেড়েছে, তাই লোকজন কম চোখে পড়ল। আমি বর্ধনের দিকে তাকাতেই সে বলল, আমাদের সঙ্গে আসুন।

বিশ্বাস ওর বাঁ কানের সোনার রিংটা নাড়াচড়া করছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই বাঁকা হাসল।

আমরা তিনজনে দ্বিতীয় বাড়িটার দিকে এগোলাম। শানবাঁধানো চাতালে আমাদের জুতোর শব্দ ফোয়ারার বাজনার সঙ্গে মিশে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দুটো ভয়েস লক দরজা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম অটোমেটিক এলিভেটরের কাছে। এলিভেটর আমাদের নিয়ে গেল এগারোতলায়। সেখানে আধুনিক ছাঁদে তৈরি গোলকধাঁধার মতো গোটাপাঁচেক অলিন্দ পেরিয়ে পৌঁছোলাম একটা ঘরে। ঘরের দরজায় লাগানো লাল রঙের ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে জানিয়ে দিচ্ছে ঘরটার নাম : ইন্টারোগেশান রুম।

ঘরের চারদিকে অসংখ্য অচেনা যন্ত্রপাতি। তার মাঝে ন্যাড়া মাথা, পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, কুতকুতে চোখ, আর ফরসা চেহারার যে-মানুষটি বসে আছে, তাকেও প্রথমটায় যন্ত্র বলে ভুল হল আমার।

আসুন, মিস্টার মজুমদার...বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না। শঙ্খচূড় সাপ যদি কথা বলতে পারত তা হলে সে বোধহয় এইভাবেই কথা বলত। কথাটা বলে যন্ত্রের চেহারার মানুষটি হাসল। হাসি মানে তার ঠোঁটের রেখা সামান্য চওড়া হল, দু-একটা ভাঁজ পড়ল ঠোঁটের কোণে।

বিশ্বাস আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, এখন আপনি জোয়ারদারসাহেবের প্রপার্টি। এ-ঘরে ঢোকার আগে আর পরে মানুষ একরকম থাকে না। আমরা দুজন স্রেফ সাক্ষীগোপাল হয়ে ওঁর গান অনুযায়ী তাল দেব।

ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উষ্ণতাকে বোধহয় দশ-বারো ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে থাকবে, কারণ আমার বেশ শীত করছিল।

জোয়ারদার তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে জরিপ করতে করতে বলল, বসুন।

একটা আধুনিক টেবিলকে মাঝখানে রেখে আমি জোয়ারদারের মুখোমুখি বসলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলাম, বিশ্বাস আর বর্ধন আমার ঠিক পেছনে

অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে।

জোয়ারদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ডানদিক ঘেঁষে রাখা একটা কম্পিউটারের কয়েকটা বোতাম টিপল। চোখ সরু করে মনিটরে কী দেখল কে জানে! তারপর সাপের মতো কেবল লাগানো একটা মাউথপিসের মতো যন্ত্র কম্পিউটারের পাশ থেকে তুলে নিয়ে বলল, বর্ধন, ওঁকে স্ক্যান করো।

বর্ধন চট করে চলে গেল জোয়ারদারের পাশে। ওর হাত থেকে মাউথপিসটা নিয়ে আমার কাছে এল। তারপর আমার বাঁ-হাতের কবজির ওপর যন্ত্রটা না ছুঁইয়ে বুলিয়ে নিল। জোয়ারদার তখনও ঠান্ডা চোখে কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে।

এখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের বাঁ-হাতের কবজিতে একটা করে পারসোনাল ইনফরমেশান মাইক্রোচিপ বসানো থাকে। সেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলে তার যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারের পরদায় ফুটে ওঠে। আমারও উঠল।

জোয়ারদার যেন একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, মিস্টার মজুমদার, কিড স্ট্রিট ব্রাঞ্চের স্পার্ম ব্যাঙ্কে সেভেন্টি এইটে আপনার জন্ম?

আমার জন্মতারিখ ২২ জানুয়ারি ২০৭৮ সাল। আর স্পার্ম ব্যাঙ্কে, মানে, ল্যাবরেটরিতে জন্ম হওয়াটা প্রায় ষাট বছর হল স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সুতরাং জোয়ারদারের প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলাম না। তবুও শান্তভাবে জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

ইন্টারেস্টিং। থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল জোয়ারদার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল আমি কোনও কথা বললাম না তখন টিভিতে খবর পড়ার মতো নিপ্রাণ ভঙ্গিতে বলল, সেভেন্টি এইটে কিড স্ট্রিটের ব্রাঞ্চে একটা ইনফেকশানের ব্যাপার হয়েছিল। ফলে সে-বছর ওই ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অ্যাবনরমাল বেবির জন্ম হয়েছিল।

আপনি কি বলতে চান আমি অ্যাবনরম্যাল?

জোয়ারদার ঘাড় কাত করে ভুরু উঁচিয়ে আমাকে দেখল, তারপর চেয়ারে বসে পড়ল ও না, না–আপনি অ্যাবনরমাল হবেন কেন! কিন্তু গত চারমাস ধরে যে-সিরিয়াল কিলার কলকাতার আনাচেকানাচ ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যে অ্যাবনরমাল সেটা তো মানবেন।

একটা খুন-পাগল মানুষ অস্বাভাবিক হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মধ্যে তো সেরকম কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই। শুধু মাঝে-মাঝে যা একটু ওই মেয়েগুলোকে খতম করতে ইচ্ছে করে।

সিরিয়াল কিলারের অ্যাবনরমাল হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। জোয়ারদারের কথার উত্তর দিলাম।

হাসল জোয়ারদার, বলল, তা হলে তার জন্ম আটাত্তর সালে হতেও পারে। যখন কিড স্ট্রিটের স্পার্ম ব্যাঙ্কে ওই ইনফেকশানের ব্যাপারটা হয়েছিল…।

আপনি কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন জোয়ারদারের হাসির ধরনটা আমার মাথার ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেটা বোধহয় জোয়ারদার বুঝতে পারল। তাই আরও নোংরাভাবে হেসে শক্ত গলায় বলল, আমি যা বলতে চাই বেশ স্পষ্ট করেই বলেছি। অন্তত আপনার না বোঝার কথা নয়। এখন আপনার স্পষ্ট উত্তর দেওয়ার পালা। আপনি শুধু স্বীকার করুন যে, শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চিনতেন।

আমি বিদ্রোহী ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বর্ধন আর বিশ্বাসের দিকে একপলক তাকিয়ে জোয়ারদারকে বললাম, আমি শ্রাবন্তী সেনকে চিনি না। একটু আগেই ওঁদের সে কথা বলেছি। আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

বসুন, মিস্টার মজুমদার, অযথা উত্তেজিত হবেন না। হম্বিতম্বি করে একটু-আধটু রাগ দেখালেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আপনি যে মিস সেনকে চিনতেন তার মারাত্মক প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। কলকাতার সিরিয়াল কিলারকে ধরার চেষ্টাটা আমি সেখান থেকেই শুরু করতে চাই। আপনি নিজে থেকে সবকিছু বলে আমাকে সাহায্য করলে আপনারও সুবিধে হবে।

কীসের সুবিধে?

হাত নেড়ে ঘরের আধুনিক সব যন্ত্রগুলোর দিকে ইশারা করে জোয়ারদার বলল, সুবিধে হবে এটাই যে, এইসব খারাপ-খারাপ যন্ত্রগুলো আপনার ওপরে আমাকে ব্যবহার করতে হবে না।

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম আবার। হাত-পায়ের জোর যেন হঠাৎই কমে গেছে বলে মনে হল।

জোয়ারদার বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে বলল, বিশ্বাস, আমাদের তৈরি কমপ্যাক্ট ডিস্কটা মজুমদারবাবুকে দেখাও।

ওর কথার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ছুরি যেন আমার শরীরে সত্যি-সত্যিই কেটে বসল।

বিশ্বাস ঘরের একটা যন্ত্রের কাছে গেল। সেখানে কয়েকটা বোতাম টিপতেই ঘরের সামনের দেওয়ালের একটা চৌকো মাপের অংশ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে শুরু হল এগারো এপিসোডের টিভি সিরিয়াল। রত্না, মাধুরী, সুজাতাকে দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হল শ্রাবন্তীকে দিয়ে। জীবন্ত ছবির সঙ্গে সেখানে তাল মিলিয়ে চলল পেশাদারি হাতে তোলা সাউন্ডট্র্যাক।

সিডি-তে জীবন্ত ছায়াছবি দেখতে-দেখতে আমার ভেতরে একটা কষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এগারোজন তরুণীকে খুন করেছি আমি! এ আমি কী সাংঘাতিক পাপ করেছি। ছিঃ ছিঃ!

আমি রুমাল বের করে চোখের কোণ মুছে নিলাম। দেওয়ালের পরদায় তখন শ্রাবন্তীকে দেখা যাচ্ছে। ওর গলায় আঙুলের দাগ : ফরসা ত্বকে কালচে ছোপ।

সিনেমা চলার সময় জোয়ারদার নিজের মতো করে বাড়তি ধারাবিবরণী দিচ্ছিল। আর একইসঙ্গে অদ্ভুত-অদ্ভুত নজরে আমাকে লক্ষ করছিল।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর সিরিয়াল শেষ হলে জোয়ারদার বিশ্বাসকে সিডি প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিতে বলল। তারপর আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বলুন, মিস্টার মজুমদার…কী ঠিক করলেন?

আপনি আসল খুনিকে ধরতে না পেরে শুধু-শুধু আমার মতো একজন ইনোসেন্ট সিটিজেনকে হ্যারাস করছেন। আমি হোমিসাইড স্কোয়াডের চিফের

কাছে ব্যাপারটা রিপোর্ট করব।

কথা বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত তুলে জোয়ারদারকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বর্ধন আমার বুকে সপাটে এক ধাক্কা দিয়ে আমাকে ছিটকে চেয়ারে ফেলে দিল।

অসহ্য ব্যথা, তার সঙ্গে দম আটকানো অবস্থা টের পেলাম। যন্ত্রণায় আমার মুখ কুঁচকে গেল। কাত হয়ে চেয়ারে পড়ে রইলাম আমি।

জোয়ারদার মিহি শব্দ করে হেসে বলল, আপনি আমাকে রূঢ় ব্যবহার করতে বাধ্য করছেন, মিস্টার মজুমদার। আমি নরমালি পেশেন্ট অনুযায়ী মেডিসিন দিই। ডোন্ট ফোর্স মি টু অ্যাডমিনিস্টার রাফ মেডিসিন। এখনও বলছি, আমার কথামতো কাজ করুন। তাতে আপনারই ভালো হবে...।

আমি দ্রুত ভাবতে শুরু করলাম। কী অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে ওরা? কী করে ওরা বুঝতে পারল আমিই সেই সিরিয়াল কিলার?

মিস্টার মজুমদার, লুকোচুরি করে আর লাভ নেই। এতদিন ধরে তদন্ত করেও আমরা এই খুনগুলোর কোনও কিনারা করতে পারিনি। কারণ সেরকম সলিড কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। এই সিরিয়াল কিলিং নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছিল। তারপর...ফরচুনেটলি...শ্রাবন্তী সেনের মার্ডারের ইনভেস্টিগেশানের সময় আমরা এই প্রথম আলো দেখতে পেলাম। আর সে-আলো গিয়ে পড়েছে আপনার দিকে...। কথা বলতে-বলতে মুচকি মুচকি হাসছিল জোয়ারদার।

আমি জোয়ারদারের কথা খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম না। বাঁ-হাতে মাথার ঝাঁকড়া চুলের ভেতরে আঙুল চালাচ্ছিলাম। একটু পরেই আঙুলের ডগায় লুকোনো ধাতব প্লেটটা খুঁজে পেলাম। সামান্য চাপ দিয়ে প্লেটটা একপাশে সরাতেই ইলেকট্রনিক্স প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল। এর ভেতরে আছে বেশ কয়েকটা মাইক্রোচিপ। এই চিপগুলো আমার মস্তিষ্কের একটা অংশ। সতেরো বছর বয়েসে আমার মাথার গোলমাল দেখা দেয়–হয়তো ওই স্পার্ম ব্যাঙ্কের ইনফেকশানের জন্যে। তখন ডাক্তার বলেছিল, আমার মাথার গোলমালের ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত। ওটা সরীসৃপের মতো শীতঘুম দেয়। তারপর হঠাৎ করে

জেগে উঠে বিনা নোটিশে মাথাচাড়া দেয়। সেটা ঠিকঠাক করতেই আমার ব্রেনে অপারেশন হয়েছিল। বসাতে হয়েছিল একমুঠো মাইক্রোচিপ।

তখন আমি ইলেকট্রনিক্স জানতাম না।

কিন্তু পরে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর, হার্ডওয়্যারে ডক্টরেট করার পর, নিজের মাথা নিয়ে আমি নিজেই মাথা ঘামিয়েছি। মাইক্রোচিপগুলোয় কিছু রদবদল করেছি। কিন্তু তাতেও যে আমি পুরোপুরি সুস্থ হইনি তার প্রমাণ শ্রাবন্তীরা।

কিন্তু শ্রাবন্তীর ব্যাপারে কী প্রমাণ পেয়েছে জোয়ারদার?

অনেক ভেবেও কোনও কূল পাচ্ছিলাম না আমি। মাঝে-মাঝে অনেক ব্যাপার আমি ভুলে যাই। তারপর হঠাৎ করেই সেগুলো আবার মনে পড়ে যায়। শ্রাবন্তীর বেলায়ও হয়তো তাই হয়েছে।

কিন্তু আমাকে কষ্ট করে সেটা আর মনে করতে হল না। জোয়ারদার আমাকে সাহায্য করল। ও ইশারা করতেই বিশ্বাস কোথা থেকে একটা পলিথিনের প্যাকেট বের করে ছুঁড়ে দিল আমার সামনে।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। মাথার ধাতব দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

এই হল সেই প্রমাণ। মন্তব্য করল জোয়ারদার, অ্যাবসোলিউট প্রুফ। নিন, প্যাকেটটা খুলুন–খুলে দেখুন।

আমি কাঁপা হাতে প্যাকেটটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। ওটা ধীরে-ধীরে খুলতে শুরু করলাম। কী আছে এর ভেতরে? আমার হাত এত কঁপছে কেন?

প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এল একগোছা চিঠি।

সেগুলো হাতে নিয়ে হতভম্বভাবে আমি জোয়ারদারের দিকে তাকালাম। হোঁচট খাওয়া গলায় কোনওরকমে বললাম, এ…এগুলো..কী?

জোয়ারদার হেসে বলল, প্রেমপত্র। শ্রাবন্তীকে লেখা আপনার প্রেমপত্র। অথচ আপনি বারবার বলছেন শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চেনেন না।

মনে পড়েছে।

শ্রাবন্তীকে আমি বহু চিঠি লিখেছি। এর আগে কাউকে আমি কোনও প্রেমপত্র লিখিনি। কারণ আমি চাইনি পুলিশের হাতে কোনও সূত্র পৌঁছে যাক। তবে শ্রাবন্তীর বেলা আমার ভেতরে কী একটা যেন হয়ে গিয়েছিল। ওকে চিঠি না লিখে আমি পারিনি। ওকে একদিন না দেখলেই আমি চোখে অন্ধকার দেখতাম। ওকে আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু…।

কিন্তু একদিন আমার ভেতরের অসুখটা শীতঘুম ভেঙে বেরিয়ে এল। শ্রাবন্তীর দিন ফুরোল। বেশ মনে আছে, অন্ধকার মাঠে ওর মৃতদেহ সামনে নিয়ে আমি পাগলের মতো কেঁদেছিলাম। আমার অসুখটাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম বারবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

চিঠিগুলো আমি একে-একে দেখতে শুরু করলাম। আমার সুন্দর হাতের লেখায় আঁকা এক একটি চিঠি–ভালোবাসার চিঠি। চিঠির শেষে আমার নাম লেখা। চিঠিগুলোর কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

ওরা তা হলে শুরু থেকেই এগুলোর কথা বলতে চাইছিল। মারাত্মক প্রমাণ! অকাট্য প্রমাণ। অ্যাবসোলিউট প্রুফ!

হাসি পেয়ে গেল আমার। হোমিসাইড স্কোয়াড এখনও আমাকে ততটা চিনতে পারেনি। চিনতে পারলে জোয়ারদারবাবু একেবারে তাজ্জব হয়ে যাবে।

আমার ঠোঁটের এক চিলতে হাসি বোধহয় জোয়ারদারের নজরে পড়েছিল। ও খানিকটা বাঁকা সুরে জিগ্যেস করল, কী, এবার শ্রাবন্তী সেনকে মনে পড়েছে তো! নাকি এখনও বলবেন এই চিঠিগুলো আপনার লেখা নয়?

অতিচালাক গোয়েন্দার চোখে সরাসরি তাকিয়ে আমি হেসে বললাম, ঠিকই ধরেছেন। শ্রাবন্তী সেনকে আমি চিনি না। আর এই চিঠিগুলোও আমার লেখা নয়।

চিঠির শেষে আপনার নাম আছে।

কলকাতা শহরে আমি একাই অমিত নই। ভালো করে খোঁজ নিন, শ্রাবন্তী কোন্ অমিতের সঙ্গে প্রেম করত।

আমার আত্মবিশ্বাস জোয়ারদারকে একটা ধাক্কা দিল। কিন্তু পেশাদার হওয়ার জন্যেই কয়েক লহমায় সেটা সামলে নিয়ে ও বলল, ঠিক আছে, সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না তখন আঙুল একটু-আধটু বাঁকাতেই হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জোয়ারদার ও এর মধ্যে যে-কোনও একটা চিঠি আপনি বেছে নিন, মিস্টার মজুমদার।

আমি কথা না বাড়িয়ে দু-পৃষ্ঠার একটা চিঠি বেছে নিলাম। বাকি চিঠিগুলো রেখে দিলাম টেবিলের ওপরে।

সামনে আঙুল তুলে আমার পিছনে দাঁড়ানো বর্ধনকে নির্দেশ দিল জোয়ারদার, বর্ধন, ওঁকে কাগজ-কলম দাও।

বর্ধন যন্ত্রের মতো নিঃশব্দে এবং ক্ষিপ্রতায় কাগজ-কলম আমার সামনে এনে দিল।

টেবিলের ওপাশে পায়চারি করতে করতে জোয়ারদার বলল, মিস্টার মজুমদার, ওই চিঠিটা আপনি চারমিনিটের মধ্যে কপি করে দিন। তারপর প্যাটার্ন কমপেয়ারেটরে চিঠি দুটো দিয়ে আমরা দেখে নেব দুটো হাতের লেখায় শতকরা কতটা মিল, আর কতটাই বা গরমিল।

আমি ভয় পেলাম। এখনই এখানে বসে চিঠিটা কপি করতে হবে এটা আঁচ করতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, ওরা পরে কোনওসময় আমার ফ্ল্যাট সার্চ করে আমার হাতের লেখার স্যাল নিয়ে এসে এই চিঠির সঙ্গে তুলনা করে দেখবে।

জোয়ারদারকে বললাম, আমার আঙুলে ব্যথা আছে। এখন লিখতে আমার অসুবিধে আছে।

পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল জোয়ারদার, হিসহিস করে হেসে উঠে বলল, আই গট য়ু, ম্যান। আমাকে চালাকিতে ফঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। এখনও বলছি, মিস্টার মজুমদার, আপনি কনফেস করুন, তা হলে শুধু-শুধু আপনাকে আর টরচার করব না। নাউ, কাম অন–।

আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি, মিস্টার জোয়ারদার– আমি একরোখা গলায় জবাব দিলাম, আমি বলেছি, আজ এখন আমার লিখতে অসুবিধে আছে। আশা করি কাল-পরশুর মধ্যে আমার আঙুলের ব্যথা সেরে যাবে–তখন আপনি যা বলবেন তা-ই লিখে দেব–নো প্রবলেম।

জোয়ারদার গুম হয়ে গেল। একটু আগেই ওর চোখে-মুখে যে-হিংস্র উল্লাস ফুটে উঠেছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল পলকে।

আমি জানি, আমার জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিটি মুহূর্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে নেওয়া হচ্ছে। হাতের লেখা মিলিয়ে দেখার বর্তমান আইন অনুসারে জোয়ারদার আমাকে এখনই লেখার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। আমি লিখতে গররাজি হলে অন্য কথা। কিন্তু আমি শুধু দু একদিন সময় চেয়েছি।

আসলে দু-একদিন নয়, আড়ালে দশমিনিট সময় পেলেই আমার কাজ হয়ে যাবে। আমারই ভুল। চিঠিগুলোর কথা আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বিকল্প পথ জানা আছে বলেই বোধহয় ব্যাপারটা আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি।

আপনি তা হলে এখন লিখবেন না?

না–আমার আঙুলে ব্যথা।

কাল সন্ধেবেলা কি আপনার অসুবিধে হবে?

মোটেই না। কখন আসতে হবে বলুন।

রাত আটটার সময় বিশ্বাস আর বর্ধন আপনাকে নিয়ে আসবে। বাট ডোন্ট ট্রাই এনি মাঙ্কি ট্রিক। চালাকি ধরে ফেলা আমার হবি, মিস্টার মজুমদার।

আমি হাসলাম, বললাম, আপনি মিছিমিছি আমাকে সন্দেহ করছেন, জোয়ারদারবাবু। তা ছাড়া আমি জানি, চালাকি করে আপনার সঙ্গে পারব না।

জোয়ারদারের চোখ ছোট হল, চোয়ালের রেখা স্পষ্ট হল। বুঝতে পারলাম, আমার জোয়ারদারবাবু বলার ঢঙটা ওর পছন্দ হয়নি।

এরপর ঘরে ফেরার পালা।

বিশ্বাস আর বর্ধন যত্ন করে আমাকে বাড়ির সামনের রাস্তায় ছেড়ে দিল।

আমি আবার ফিরে গেলাম সুচরিতার কাছে।

আমার ফেরার শব্দ পেয়ে ও জেগে উঠল। আমাকে হাত ধরে টেনে নিতে চাইল বিছানায়। উ-উ-ম-ম করে আদুরে শব্দ করল আলতো গলায়।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, একমিনিট, সুইটি–একটু টয়লেট থেকে আসছি।

টয়লেটে গিয়ে অটোমেটিক কোলোন স্পেয়ারের সামনে দাঁড়ালাম। সুগন্ধী ঠান্ডা বাতাস আমাকে ভাসিয়ে দিল। আমি চোখ বুজে শ্রাবন্তীর কথা ভাবতে লাগলাম।

একমাত্র ওকেই আমি ভালোবাসার চিঠি লিখেছি–আর কাউকে না। আমার ভেতরের পাগলটা শুধু ওকেই ভালোবেসে ফেলেছিল। আর সবাই ছিল ওর কাছে একরাত বা কয়েক রাতের সঙ্গিনী। রাত ফুরোলেই সব ভালোবাসা শেষ। সুচরিতাও তাই। আর কাউকে আমি ভালোবাসার চিঠি লিখব না।

যদিও বা লিখি, শ্রাবন্তীকে লেখা চিঠির মতো হাতের লেখায় লিখব না। লিখব অন্য কোনও নতুন হাতের লেখায়।

কোলোন স্পেয়ার বন্ধ করে দেওয়ালে লুকোনো একটা ক্যাবিনেটের দরজা খুললাম। আমার সামনের তাকে এখন অনেকগুলো মেগা স্কেল ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রোচিপ। মাথার চুলের ভেতরে হাত চালিয়ে ছোট্ট ধাতব প্লেটটা সরিয়ে দিলাম। মাথার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে খুব সতর্কভাবে একটা চিপ বেস থেকে খুলে নিলাম। সেটা তাকে রেখে দিয়ে নতুন একটা চিপ তুলে নিলাম। তার নম্বরটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে সাবধানে সেটা বসিয়ে দিলাম মাথার ভেতরে। তারপর ধাতব ঢাকনা টেনে বন্ধ করে দিলাম।

ব্যস, আর কোনও চিন্তা নেই। আমার হাতের লেখা এবার বদলে যাবে।

আমাদের হাতের লেখার ধরন মস্তিষ্কের যে-অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই চিপটা অনেকটা যেন তারই বিকল্প। সতেরো বছর বয়েসে অপারেশানের সময় আমার মাথার ভেতরে একগাদা চিপ বসানো হয়েছিল। তার কয়েকবছর পর হার্ডওয়্যারে গবেষণা করার সময় এ ধরনের মাইক্রোচিপ আমি হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম। আর তারই একটা দিয়ে বিশেষ ধরনের সার্কিট তৈরি করে বসিয়ে দিয়েছিলাম আমার মাথার ভেতরে।

বিভিন্ন হাতের লেখার ধরনের জন্যে সারকিট ডিজাইন করার বিভিন্ন চিপ পাওয়া যায়। সেই চিপটা পালটে নিলেই আমার হাতের লেখার ধরন পালটে যায়।

সুতরাং আর আমি জোয়ারদার অ্যান্ড কোম্পানিকে ভয় পাই না।

আমার সিরিয়ালের বারো নম্বর এপিসোডের জন্যে মনে-মনে তৈরি হয়ে আমি টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলাম।

# দাগের বাইরে যাবেন না

**দাগের বাইরে যাবেন না**

ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

রাজরীতা টিভিতে ক্রাইম ডট কম প্রোগ্রামটা দেখছিল। রিমোটটা হাতে নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

ফ্ল্যাটের দরজার অন্তত বারো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রিমোটের বোতাম টিপল রাজরীতা। স্পেশাল মেটাল ফাইবারের তৈরি দরজার মাঝখানের অংশটা পলকে স্বচ্ছ হয়ে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে দেখতে পেল রাজরীতা। কিন্তু ও জানে, বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যায় না। কারণ, দরজার এই স্বচ্ছতা একমুখী।

লোকদুটোর পরনে নীল রঙের ইউনিফর্ম। নামি কোম্পানির সার্ভিস বা মেইনটিন্যান্সের লোকজনদের যেমন পোশাক হয়। ওদের একজনের হাতে একটা মাঝারি মাপের পেটমোটা ব্যাগও আছে।

রাজরীতা দোটানায় পড়ল : দরজা খুলবে, কি খুলবে না?

এখন কলকাতায় খুন-জখম-চুরি-ডাকাতি ভীষণরকম বেড়ে গেছে। এইসব খবর নিয়েই ক্রাইম ডট কম প্রোগ্রাম। তাতে রোজ আধঘণ্টা ধরে পশ্চিমবঙ্গের যত ক্রাইমের খবর দেখানো হয়। সিকিওরিটি পুলিশ যেসব ক্রিমিনালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের ছবিও দেখানো হয়। একটু আগে রাজরীতা সেইসব ছবিই দেখছিল।

দুজন লোকেরই চোখে চশমা, ঠোঁটের ওপরে পুরু গোঁফ। বয়েস খুব বেশি হলে তিরিশ বত্রিশ। একজনের মাথায় টুপি, আর-একজনের মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কাজের একঘেয়েমিতে মানুষের মুখে যে-বিরক্তির ছাপ পড়ে ওদের দুজনের মুখেই সেই ছাপের জেরক্স কপি।

দরজার কাছে গিয়ে ভয়েস সিস্টেম অন করল রাজরীতা। তারপর জিগ্যেস করল, কী চাই?

উত্তরে একজন বলল, ম্যাডাম, আমরা বিটা রেফ্রিজারেশান কোম্পানি থেকে আসছি। এই ফ্ল্যাট থেকে... পকেট থেকে একটা কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট বের করে দেখল সে ও মিস্টার শত্রুজিৎ সোম আমাদের সার্ভিস কল দিয়েছিলেন। কল নাম্বার আর ডেট হল...।

শেষ কথাগুলো আর মন দিয়ে শুনল না রাজরীতা। ওর চট করে মনে পড়ে গেল। ওদের ফ্রিজটা কিছুদিন ধরেই গণ্ডগোল করছে। ফ্রিজের বাইরের পাইপ মেট্রিক্সে বরফ জমে যাচ্ছে। শত্রুজিৎ গত সপ্তাহে কোম্পানিতে খবর দিয়েছিল। নিশ্চয়ই তারাই লোক পাঠিয়েছে।

তা সত্ত্বেও লোকদুটোকে যাচাই করার জন্য রাজরীতা প্রশ্ন করল, বলুন তো, আমাদের ফ্রিজের রং কী? মডেল নাম্বার কত?

কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট হাতে লোকটি দরজার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল। রাজরীতাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, তাই মুখে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ছাপ।

আপনার ফ্রিজটা ব্লু রঙের, ম্যাডাম—অবশ্য যদি না আপনি ওটা এর মধ্যে প্রাইভেটলি অন্য রং করিয়ে থাকেন। আর মডেল নাম্বার বিটা-টু ওয়ান ফাইভ জিরো-এম। প্রিন্ট-আউটটা দেখতে দেখতে লোকটা আরও যোগ করল? আপনার ফ্রিজের সিরিয়াল নাম্বার হল...।

রাজরীতা সিরিয়াল নম্বরের জন্য আর অপেক্ষা করল না। কারণ, অন্য দুটো প্রশ্নের উত্তরে ওরা ফুল মার্কস পেয়েছে।

রিমোটের একটা বোতাম টিপে ও বলল, আসুন—ভেতরে আসুন।

দরজার পাল্লা একপাশে সরে যেতেই মুখে সৌজন্যের হাসি নিয়ে দুজন কর্মী মসৃণ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে পড়ল।

দরজার পাল্লা আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। তারপর নিজে থেকেই লক হয়ে গেল।

বিশাল ড্রইং-ডাইনিং স্পেসের ওপরে একপলক চোখ বুলিয়ে নিল দুজনে। ওদের চাহনিতে সতর্কভাবে জরিপ করার দৃষ্টি। রাজরীতার কেমন যেন খটকা লাগল।

ঘরের একপাশে সাজানো টি-টেলের কাছে গিয়ে ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল একজন। তারপর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে কী যেন কথা হল। এবং দুজনেই আয়েসি ভঙ্গিতে সোফায় বসে পড়ল।

ব্যাপারটা রাজরীতার কাছে নেহাতই অসভ্যতা বলে মনে হল। তবুও ও ভাবল, হয়তো ওরা সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত–তাই সৌজন্য না দেখিয়েই সোফায় বসে পড়েছে।

ঘরের পুবদিকের দেওয়ালে টিভিতে ক্রাইম ডট কম চলছিল। ওদের একজন ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে দেখছিল। আর অন্যজন রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে অশালীন ঢঙে হাসছিল।

হঠাৎই হাসি থামিয়ে টিভি-দেখা সঙ্গীর কাঁধে বাঁ-হাতে চাপড় দিল সে। বলল, অত কী দেখছিস! আজ নয় কাল আমাদের পিকচার ক্রাইম ডট কম-এ দেখাবে।

রাজরীতার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ল।

ও কাঁপা গলায় বলল, আপনাদের আইডি কার্ড দেখি।

দেখাচ্ছি। বলে একজন টেবিলে রাখা ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে অদ্ভুত চেহারার একটা বন্দুক বের করল।

খট করে একটা বোতাম টিপতেই বন্দুকের মাথায় লাগানো একটা চাকতির ভেতরে উজ্জ্বল লাল আলোর একটা বিন্দু জ্বলে উঠল।

রাজরীতা চিনতে পারল? লেজার পয়েন্টার।

আলোর বিন্দুটা রাজরীতার কপালের ঠিক মাঝখানে তাক করল সে।

রাজরীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন কপালে আগুনের টিপ পরেছে। ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরে ভারী লোহার বল পরপর গড়িয়ে দিচ্ছে কেউ।

বন্দুক-হাতে ধরা লোকটি ঠান্ডা গলায় বলল, ম্যাডাম, আমাদের বাধা না দিলে কোনও প্রবলেম হবে না। তারপর টিভি-দেখা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, নিকি, চটপট কাজ শুরু কর।

নিকি তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা ব্যাগটা খুলে দুটো জিনিস বের করে নিল। তার একটার চেহারা সফ্ট ড্রিঙ্ক এর ক্যানের মতো। তবে তার গায়ে কতকগুলো বোতাম আর বাতি রয়েছে। আর অন্যটা একটা লম্বাটে কালো বাক্স।

ক্যানের মতো যন্ত্রটা ঘরের এক কোণে বসিয়ে অন করে দিল নিকি। তারপর পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপল। ওটার গায়ে একটা ছোট্ট এলইডি বাতি লাল চোখের মতো দপদপ করে জ্বলতে নিভতে লাগল।

নিকি রাজরীতার দিকে তাকিয়ে হাসল এখন আর কোনও রেডিয়ো সিগনাল এ-ঘরে কাজ করবে না। সব সিগনাল জ্যাম করে দিলাম।

নিকির সঙ্গী টেবিলে আঙুল ঠুকতে-ঠুকতে বলল, একদম চেঁচামেচি করবেন না, ম্যাডাম। করলে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না, ডাক্তারদেরও আর কিছু করার থাকবে না। আপনি হয়তো ভাবছেন, এ-ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় লুকোনো ভিডিয়ো ক্যামেরায় আমাদের ছবি উঠে গেছে। পরে সেই ছবি দেখে সিকিওরিটি পুলিশ আমাদের খুঁজে বের করবে– বিচ্ছিরিভাবে হাসল : ওসব কিছুই হবে না। যদিও কাল ক্রাইম ডট কম-এ আপনি আমাদের এই ছবিই দেখতে পাবেন। একটু থামল। তারপর তার কারণ কী জানেন? কারণ, আসলে আমরা অন্যরকম দেখতে।

কথা বলতে-বলতেই মাথার টুপি খুলে ফেলল সে। তারপর একে একে পরচুল, চশমা এবং নকল গোঁফ টেবিলে নামিয়ে রাখল।

ন্যাড়া মাথা লোকটিকে এখন সত্যি-সত্যিই একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

নিকি তখন ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কালো বাক্সটা হাতে নিয়ে কীসব খুটখাট করছিল। রাজরীতাদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ভিকি, আমাকেও কি উইগ-টুইগ সব খুলতে হবে নাকি?

ভিকি বলল, না, না, আর দরকার নেই। ম্যাডাম, বুঝতে পারছেন।

কালো বাক্সটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে তালি দিয়ে হাত ঝাড়ল নিকি? ভিকি, এদিককার কাজ শেষ। এখন দরজার লকটাকে কেউ হাজার চেষ্টা করেও বাইরে থেকে আর খুলতে পারবে না। এবার এ-ফ্ল্যাটে আমাদের রাজ চলবে। দেওয়ালের টিভি পরদার দিকে একপলক তাকিয়ে তারপর ও ওখানে ক্রাইম ডট কম চলুক, আর এখানে আমাদের ফুর্তি ডট কম শুরু হোক। কী বলো, গুরু!

না, না! ফুর্তি ডট কম নয়–ফুর্তি ডট বেশি! ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে মুচকি হাসল ভিকি। তারপর রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, ম্যাডাম, আপনার হাজব্যান্ড নিশ্চয়ই এখন অফিসে?

হ-হ্যাঁ। কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল রাজরীতা। ওর মুখের ভেতরে গিরগিটির চামড়ার তৈরি জিভটা জলের অভাবে ধুকছে।

আমরা অবশ্য কদিন ধরেই আপনার এই একশো তিনতলার ফ্ল্যাটের ওপরে ওয়াচ রেখেছিলাম। এই মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এ আমরা আগেও কাজ করেছি। তবে তখন অন্যরকম মেকাপ নিয়েছিলাম। আপনাকে একদিন সিঁড়িতে দেখার পর থেকেই আমাদের দুজনেরই মাথা ঘুরে গেছে। আপনি যেমন সুইট তেমনই বিউটিফুল। বাগানে গোলাপফুলের জায়গায় আপনাকে দিব্যি সাজিয়ে রাখা যায়।

বিউটিফুল ডট কম! নিকি বলল, রাজরীতার কাছে এসে দাঁড়াল।

না, না, বিউটিফুল ডট বেশি! বলেই হো-হো করে হেসে উঠল ভিকি।

ওদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই নিকি আর ভিকিকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

আপনার ছেলে?

প্রশ্নটা কে করল রাজরীতা ঠিক খেয়াল করল না। শুধু কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে ও জানাল, হ্যাঁ।

ওর বুকের ভেতরে তুমুল হুলস্থুল চলছিল। একটু আগেই কেমন নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছিল ও! আর এখন, মাত্র পনেরো কুড়ি মিনিটেই, চরম বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে!

একটু আগে যখন ও এ-ঘরে টিভি দেখতে এসেছিল তখন ওর মনে শুধু স্বপ্ন ছিল–কোনও দুঃস্বপ্ন ছিল না। ও রিমোটের বোতাম টিপতেই ঘরের পুবদিকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গিয়েছিল। রঙিন ছবিতে একজন সুন্দরী মেয়ে নানান অনুষ্ঠানের খবর বলছিল, আর এককোণে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়ি রিয়েল টাইম জানিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তিনটে বাজতেই শুরু হল ক্রাইম ডট কম মানে, পশ্চিমবঙ্গের যত খুন-জখম রাহাজানির খবর। রাজরীতা প্রতিদিন নিয়ম করে এই প্রোগ্রামটা দ্যাখে। এই প্রোগ্রামটা প্রতিদিন বিকেল তিনটেয় দেখানো হয়–যাতে ঘরে থাকা মানুষজন সতর্ক হতে পারে, নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে।

২০২০ সাল নাগাদ ভারতে সাইবারস্পেস বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্স, আরও কত কী! তারপর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি যতই লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা আর খুন-জখম-রাহাজানি। এইভাবে দেড়শো বছর পেরোতে-না পেরোতেই পুলিশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। ক্রাইম ডট কম প্রোগ্রামে রোজই দু-চারটে পুলিশ খুনের ঘটনা কিংবা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার ঘটনা থাকে। তাই ব্যাঙের ছাতার মতো যত রাজ্যের সিকিওরিটি কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে। তাদের ব্যবসা দিনকেদিন বেড়েই চলেছে। আধুনিক থেকে আরও আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

এখন রাস্তায় বেরোলে সবাইকে সিকিওরিটি ভ্যানে করে যাতায়াত করতে হয়। ওগুলোই হল বাসের বিকল্প। এ ছাড়া ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার মানেই আর্মার্ড কার–সবসময় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি। সন্ধের অন্ধকার নেমে এলেই

লোকজন যার-যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন শুরু হয় বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল ক্রিমিনালদের দিন।

ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এই একই অবস্থা। রোজ কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক নিউজপেপার দেখলেই বোঝা যায় আইন-শৃঙ্খলা কী বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে।

ক্রাইম ডট কম দেখতে-দেখতে এসব কথাই ভাবছিল রাজরীতা।

শত্রুজিৎ অফিসে গেছে। ও ক্যালকাটা স্পেস রিসার্চ সেন্টার-এ অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ার। ওদের একমাত্র ছেলে মনোরম পাশের ঘরে কম্পিউটার টার্মিনালে বসে স্কুলের ক্লাস করছে। ওদের লার্নিং নেটওয়ার্ক-এ একসঙ্গে প্রায় দুশো ছেলে বাড়িতে বসেই ক্লাস করতে পারে। মাঝে-মাঝে শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য ওদের স্কুলে যেতে হয়।

ফুটবল-মাঠের মতো এই বিশাল ফ্ল্যাটে রাজরীতার সময় কাটে টিভি দেখে, কম্পিউটার গেমস খেলে, অথবা সেলফোনে শত্রুজিতের সঙ্গে কথা বলে। বিকেলবেলা ও মনোরমকে নিয়ে কাছেই মিলেনিয়াম পার্ক-এ বেড়াতে যায়। তার জন্য ওর আর্মার্ড কার রয়েছে। আর রয়েছে ঝুমকি ওদের প্রাইভেট সিকিওরিটি গার্ড। গতমাসেই ওকে আলটিমেট সিকিওরিটি কোম্পানি থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে শত্রুজিৎ। পরিস্থিতি ক্রমশ যেদিকে যাচ্ছে তাতে কোনওরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থাই আর যথেষ্ট নয়।

টিভিতে খবর থামিয়ে বিজ্ঞাপন চলছিল।

আলফা ট্যুর নামে একটা কোম্পানি মাত্র এক লক্ষ টাকায় চাঁদে দু-দিনের জন্য বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। এনার্জি পাউডার রোজ এক চামচ খেলেই ক্লান্তি আর অবসাদ ভয়ে পালাবে। স্পিড শু মের মোটর লাগানো জুতো পায়ে দিলে বিনা পরিশ্রমে গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটা যাবে। শনির উপগ্রহ টাইটানে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা...।

হঠাৎই ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠেছে। তারপর...।

কী হয়েছে, মাম্মি? অচেনা লোকদুটোকে একপলক দেখে নিয়ে মনোরম অবাক হয়ে মা কে জিগ্যেস করল।

কিচ্ছু হয়নি, খোকা। তোমার মায়ের সঙ্গে আমরা একটু জরুরি কথা বলছি। তুমি যাও– তোমার ঘরে চলে যাও।

কথাগুলো বলতে-বলতে ভিকি মনোরমের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। কখন যে ও বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলেছে রাজরীতা খেয়াল করেনি।

আলতো করে মনোরমের পিঠে হাত দিয়ে ওকে ওর পড়ার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল ভিকি।

কী করছিলে তুমি?

কম্পিউটারে ইন্টারঅ্যাকটিভ লার্নিং সেশানে বসেছিলাম।

বাঃ, চমৎকার। গুড বয়। যাও, পড়াশোনা করো গিয়ে। এক্ষুনি আমাদের কথা শেষ হয়ে যাবে।

মনোরমকে পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে ওর ঘরের দরজাটা লক করে দিল ভিকি।

আর সঙ্গে-সঙ্গে নিকি চটপট পরচুল, চশমা আর গোঁফ খুলে রেখে রাজরীতাকে পিছন থেকে হ্যাংলার মতো জড়িয়ে ধরল। ওর ঘাড়ে গলায় মুখ ঘষতে লাগল পাগলের মতো।

রাজরীতা ধস্তাধস্তি করছিল। ভয় আর ঘেন্না ওকে কাবু করে দিতে চাইছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াই করতে পারছিল।

ভিকি ছুটে এল ওদের কাছে। দুপাশে দু-হাত ছড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, তুমি একা শেষ কোরো না/আমার জন্যে একটু রেখো। সোনা-দানা আর যা আছে/ তন্নতন্ন খুঁজে দেখো।

ছড়া কাটতে কাটতেই রাজরীতাকে টপ করে চুমু খেল ভিকি। তারপর ওকে দু-হাতের দশ আঙুলে আদর করতে শুরু করল।

রাজরীতার পিছনে দাঁড়িয়ে নিকি ওর পিঠে-কোমরে যত্রতত্র মুখ ঘষছিল। ওর দু-হাত বেপরোয়াভাবে যেখানে-সেখানে হামলে বেড়াচ্ছিল।

ভিকির ছড়া কাটার উত্তরে ও কোনওরকমে জড়ানো গলায় বলল, আগে মাম্মি-সোনাকে তন্নতন্ন করে সার্চ করি, পরে মেটাল-সোনা খুঁজে দেখব।

নিকি আর ভিকি জানে, এখানকার সব ফ্ল্যাটের দেওয়াল সাউন্ডপ্রুফ। সুতরাং রাজরীতা চিৎকার করলেও কোনও ক্ষতি নেই। পাশের ঘরে ওর ছেলেও সে চিৎকার শুনতে পাবে না। এর নাম প্রাইভেসি!

টিভিতে একটা গানবাজনার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাজনার বাজখাঁই জগঝম্পে কানে তালা লাগার জোগাড়। কিন্তু নিকি আর ভিকির তাতে সুবিধেই হচ্ছিল।

মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বশে এবার চিৎকার করে উঠল রাজরীতা।

ওর পরনের পোশাক এর মধ্যেই ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো। বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। চোখে শুধুই আতঙ্ক।

ওর চিৎকার কেউ শুনতে পেল বলে মনে হল না।

হঠাৎই ওর ঝুমকির কথা মনে পড়ল।

মহাশূন্যে ভেসে যেতে-যেতে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ও ঝুমকির নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠল।

তার দু-চার সেকেন্ডের মধ্যেই একটা বেডরুমের দরজা খুলে ঝুমকি এ-ঘরে উঁকি মারল।

বছর আঠারো কুড়ির মিষ্টি মেয়ে। রোগা, ফরসা। যৌবন চোখে পড়ার মতো। খোলা চুল কী এক শ্যাম্পুর কল্যাণে লম্বা টান-টান হয়ে ঝুলছে। কপালের ওপরেও চুলের পরদা নেমে এসেছে। পরনে আকাশ-নীল চুড়িদার।

আঙুল দিয়ে চোখ ঘষছিল ঝুমকি। বোধহয় ঘুমোচ্ছিল রাজরীতার ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। সাউন্ডপ্রুফ দেওয়াল ওর শোনার ক্ষমতাকে কাবু করতে পারেনি। ওকে ভাড়া দেওয়ার সময় আলটিমেট সিকিওরিটি কোম্পানি ওর এই দারুণ ক্ষমতার কথা জানিয়েছিল। সেইসঙ্গে জানিয়েছিল ওর আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতার কথা।

এই হল প্রাইভেট সিকিওরিটি গার্ডের দশা! একে ভাড়া করে নিয়ে এসে দিনের-পর-দিন টাকা গুনে গেছে শত্রুজিৎ! গত একমাস ধরে তো মেয়েটার খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া কোনও কাজ নেই! আজ যখন বিপদ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়েছে, তখনও সে দিব্যি ঘুমোচ্ছে!

এইজন্যই ঝুমকির কথা রাজরীতার প্রথমে মনে পড়েনি।

ঝুমকি হর্স নেবুলার কে-২০৪ গ্রহের মানুষ। আলটিমেট সিকিওরিটি অন্তত সেরকমই জানিয়েছিল। শত্রুজিৎকে ওরা বলেছিল, স্যার, আসলে এরা মানুষ নয়, হিউম্যানয়েড–মানে, সাইবারম্যানও বলতে পারেন। ওদের শরীরে আমাদের মতো রক্ত-মাংস আছে বটে, তবে ওদের হার্ট ধুকপুক করে ব্যাটারির জোরে। ওদের এমন সব আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যা আমাদের সিকিওরিটির ব্যাপারে মোক্ষম। তবে সত্যি-সত্যি দরকার না হলে ওরা সেইসব স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করে না। আপনি ওকে ভাড়া নিন–তা হলে সেফটি নিয়ে আপনার আর কোনও চিন্তা থাকবে না। ও আপনার বাড়িতে বাড়িরই একজন হয়ে থাকতে পারবে। কেউ ওকে সিকিওরিটি গার্ড বলে সন্দেহ করবে না।

আপনাদের চার্জটা বড় বেশি। শত্রুজিৎ অনুযোগ করে বলেছিল।

তখন আলটিমেট সিকিওরিটি-র অফিসারটি হেসে বলেছে, উই আর বেস্ট ইন দ্য গেম। কে-২০৪-এর সঙ্গে শুধু আমাদের কোম্পানিরই ইমপোর্ট এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সুতরাং আপনি যা পাচ্ছেন তা হল সেরা নিরাপত্তা–আলটিমেট সিকিওরিটি। তারপর গলায় বাঁধা টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে সামান্য ইতস্তত করে অফিসারটি বলেছে, শুধু একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে..।

কী প্রবলেম? কৌতূহলে শত্রুজিতের ভুরু কুঁচকে গেছে।

মানে, ঝুমকির গলার স্বরটা মেটালিক..যেটাকে পরিভাষায় ধাতব কণ্ঠস্বর বলে–মানে, আদ্যিকালের সিনেমাগুলোর রোবটের গলা যেমন শোনায় আর কী!

হাসল শত্রুজিৎ ও গলার স্বর মেটালিক হোক বা পেটালিক হোক, আমার কাজ নিয়ে কথা!

শত্রুজিতের বলা কথাগুলো রাজরীতার মনে পড়ছিল। তবে ওই কোম্পানি থেকে এটা বলে দেয়নি যে, ঝুমকি ঘুমোতে ভীষণ ভালোবাসে। একটু ফাঁক

পেলেই চট করে একপ্রস্ত ঘুমিয়ে নেয়।

ঝুমকিকে দেখেই নিকি আর ভিকি থমকে গেল। কিন্তু সে এক লহমার জন্য। তারপরই অশ্লীল উল্লাসে ওদের হাসি চওড়া হল।

নিকি, আমাদের লাক দারুণ! ম্যাডামকে আর শেয়ার করতে হবে না।

নিকি তখন রাজরীতার শরীরের উত্তর গোলার্ধে ব্যস্ত ছিল। হাসতে হাসতে ও জবাব দিল, তুই ওকে নে। ম্যাডামকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

শেষ কথাটা ন্যাকা-ন্যাকা সুরে বলেই রাজরীতার দিকে দ্বিগুণ মনোযোগ দিল নিকি। আর ভিকি অ্যাথলিটের ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে গেল ঝুমকির দিকে। এবং কেউ কিছু আঁচ করে ওঠার আগেই এক হ্যাঁচকায় ঝুমকিকে কোলে তুলে নিল।

ভিকি মরশুম-খ্যাপা কুকুরের মতো ঝুমকিকে আদর করছিল। আর হিউম্যানয়েড ঝুমকি অবাক হয়ে লোকটার পাগলামো দেখছিল।

এদিকে রাজরীতা নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিকির সঙ্গে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছিল। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে। রেপ, নাকি রেপ অ্যান্ড মার্ডার? কিন্তু ঝুমকির বেলায় কী হবে? ও তো মানুষ নয়! যদিও বাইরে থেকে ওর সবকিছুই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো।

আমাকে ছেড়ে দিন। আমি হিউম্যানয়েড। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি হিউম্যানয়েড। আমাকে...। অবাক চোখে ভিকির দিকে তাকিয়ে থেকে একঘেয়ে ধাতব সুরে বলে চলল ঝুমকি।

ওর গলার স্বরে চমকে উঠল ভিকি। এক ঝটকায় ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিল।

নিকিও তখন নিজের জরুরি কাজ ছেড়ে হাঁ করে রোগা ফরসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমকি তখন বলছে, আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমি এই ফ্ল্যাটের সিকিওরিটি গার্ড। আপনারা দয়া করে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান, নইলে আপনাদের বিপদ হবে। সে-বিপদ থেকে আর ফেরা যায় না। আশা করি

আপনারা আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার অনুরোধ…।

রাজরীতাও অবাক হয়ে ঝুমকির কাণ্ড দেখছিল। ভয়ংকর দুজন ক্রিমিনালকে ও যেন নিশ্চিন্তে গীতা পাঠ করে শোনাচ্ছে।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা ভিকি সামলে নিয়েছিল। ঝুমকির কথা শুনে ও ব্যঙ্গ করে বলল, আমরা দয়া করে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাব। তার আগে চটপট আমাদের কাজটা সেরে নিতে দাও। এসো, কাছে এসো–।

আমি মানুষ নই হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। ঝুমকি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ার মতো করে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

আরে বাইরে তো কোনও ফারাক নেই–ওতেই আমার কাজ মিটে যাবে! অধৈর্যভাবে বলল ভিকি।

আমার ভেতরে ব্যাটারি আছে। আমি মানুষ নই হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড..।

এসো, ব্যাটারির সুইচটা একটু খুঁজে দেখি। ঝুমকির দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলল ভিকি, এবং ঝুমকিকে আবার জাপটে ধরল।

ওর গায়ে মুখ ঘষতে-ঘষতে ভিকি বলল, কই, সবই তো দেখছি মানুষের মতো। এতেই আমার কাজ চলে যাবে। দেখি তো, তোমার ব্যাটারির সুইচটা কোথায়!

ঝুমকি যান্ত্রিকভাবে আগের কথাগুলোই বারবার বলছিল, কিন্তু ভিকি ওর কথায় কোনওরকম আমল দিচ্ছিল না। একমনে নিজের কাজ করছিল।

নিকি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বিপদের জন্য আগাম সতর্ক হয়ে টেবিলে রাখা ব্যাগের দিকে দু-পা এগিয়েও গিয়েছিল–যাতে দরকার হলেই ব্যাগ থেকে একটা অস্ত্র বের করে নেওয়া যায়।

এখন ভিকিকে নিজের কাজে মত্ত হতে দেখে নিকির শরীরের টান-টান ভাবটা ঢিলে হল। ও আবার পা বাড়াল রাজরীতার দিকে।

কিন্তু ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

নির্লিপ্ত ঝুমকি ওর বাঁ-হাতের তালুটা বইয়ের পাতার মতো চোখের সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে তালুটা গনগনে আঁচের মতো লাল হয়ে গেল। ওর হাতের পাতায় ফুটে উঠল কয়েকসারি বোতাম–অনেকটা ক্যালকুলেটরের মতো। ডানহাতের তর্জনী দিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল ঝুমকি।

ভিকি মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে ঝুমকিকে আঁতিপাঁতি করে আদর করছিল। হঠাৎই ও যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুমকি হাওয়ায় শিস তুলে চোখের পলকে পৌঁছে গেল সিগনাল জ্যামিং-এর যন্ত্রটার কাছে। ভিকির কাছ থেকে যন্ত্রটার কাছে পৌঁছোনোর সময় রাজরীতা ওকে একটা ঝাপসা নীল ঝিলিকের মতো দেখতে পেল।

ঝুমকি ক্যানটা হাতে তুলে নিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল। ওর বাঁ-হাতের তালু তখনও লাল ফ্লুওরেসেন্ট বাতির মতো জ্বলছিল। ক্যানটা রেখে দিয়ে ও এবার হাতের তালুর কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যানের গায়ে দপদপ করতে থাকা এলইডি বাতিটা নিভে গেল।

ঝুমকি রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ধাতব গলায় বলল, বউদি, সিগনাল জ্যামিংটা অকেজো করে দিলাম। অকেজো করে দিলাম। অকেজো করে...।

ঝুমকির কাণ্ড দেখে নিকি হতভম্ব হয়ে আবার থেমে গিয়েছিল। এইবার হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলে রাখা ব্যাগটার ওপরে। হাঁপাঁক করে কোনওরকমে ব্যাগ থেকে একটা খাটো বন্দুক বের করে নিল। ব্যাগটা উলটে পড়ে গেল টেবিল থেকে। নিকি বন্দুকের লেসার পয়েন্টারটা ঝুমকির দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল।

ঝুমকি এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ওর শরীরটা উলটোদিকে বাঁকিয়ে দিল। ওর ঝুলে পড়া রেশমি চুল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বন্দুকের চাপা শব্দে রাজরীতা কেঁপে উঠল। ওর সিকিওরিটি গার্ডের এইসব অদ্ভুত কাণ্ড ওকে অবশ করে দিচ্ছিল। ও ক্লান্ত শরীরে মেঝেতে বসে পড়ল। কপালের পাশটায় হঠাৎই দপদপ করে একটা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ঝুমকির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

নিকি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলি করল। ঝুমকি অপার্থিব ঢঙে অনায়াসে সেগুলো এড়িয়ে গেল। তারপর বাঁ-হাতের জ্বলন্ত তালু তুলে ধরল নিকিকে লক্ষ করে।

যেন ভীষণ গরম একটা কিছু ধরে হাতে ছ্যাঁকা লেগে গেছে এইরকম ভঙ্গি করে বন্দুকটা ছেড়ে দিল নিকি। তারপর ডানহাতের কবজি চেপে ধরে ছটফট করতে লাগল।

ঝুমকি তখন বাঁ-হাতের তর্জনী মেঝেতে ঠেকিয়ে চক দিয়ে গণ্ডি টানার মতো দাগ টানতে শুরু করল।

ভিকি ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। অবাক হয়ে ঝুমকির কাণ্ড দেখছে।

ঝুমকির তর্জনীর টান মেঝেতে একটা উজ্জ্বল নীল রঙের দাগ তৈরি করেছিল। বাজির সলতে পোড়ার মতো হিসহিস শব্দ হচ্ছিল একইসঙ্গে। যেন ওর আঙুলের ছোঁয়ায় ঘরের মেঝে পুড়ে যাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিকি আর ভিকিকে ঘিরে একটা আঁকাবাঁকা গণ্ডি সম্পূর্ণ করল ঝুমকি। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ-হাতের তালুর কয়েকটা বোতাম চটপট টিপে হাসিমুখে তাকাল রাজরীতার দিকে।

আরও কোনও ভয় নেই, বউদি। টাইম লাইন দিয়ে ওদের ঘিরে দিয়েছি। ওরা এখন বন্দি। আপনি ইচ্ছে করলে সিকিওরিটি পুলিশকে খবর দিতে পারেন। খবর দিতে পারেন। খবর দিতে…।

টাইম লাইন মানে! হতভম্ব রাজরীতা কোনওরকমে বলতে পারল।

ঝুমকি ধাতব গলায় জবাব দিল, থ্রি ডায়মেনশন থেকে ফোর্থ ডায়মেনশনে যাওয়ার বরডার। মানে, কেউ এটা পেরোলেই আমাদের এই জগৎ থেকে সোজা ফোর্থ ডায়মেনশনে চলে যাবে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া…।

ভিকি চিৎকার করে উঠল : রাবিশ! অল বুলশিট! নিকি, এই হুঁড়িটার একটা কথাও বিশ্বাস করবি না! সব ব্লাফ! মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

ঝুমকি ভিকির দিকে ঘুরে তাকিয়ে নিপ্রাণ ধাতব গলায় বলল, আপনারা কেউ দাগের বাইরে যাবেন না। দাগের বাইরে যাবেন না। দাগের বাইরে…।

ওর কথার প্রতিধ্বনি শেষ হওয়ার আগেই নিকি আর ভিকি দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে গেল ঝুমকির দিকে।

এবং দাগ পেরোনোমাত্রই ওরা দুজন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

রাজরীতা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

ওরা কোথায় গেল! ওরা কোথায় গেল!

ঝুমকি বাঁ-হাতের তালুর বোতাম টিপতে টিপতে জবাব দিল, ওরা ফোর্থ ডায়মেনশনে চলে গেছে। হয়তো মহাকাশের কোনও নির্জন জায়গায় ওরা অন্ধকারে ঠান্ডায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে…।

এবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল ঝুমকি। একটু পরেই বলল, দরজার লকটাকে ঠিক করে দিলাম। ঠিক করে দিলাম। ঠিক করে…।

ততক্ষণে ঘরের মেঝেতে আঁকা নীল দাগটাও মিলিয়ে গেছে।

দেওয়ালের টিভির প্রোগ্রাম এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। কিন্তু এতক্ষণ রাজরীতার সে খেয়াল ছিল না। এখন ও হঠাৎ করে যেন টিভির শব্দ শুনতে পেল, দেখতে পেল ছবি। ওর মনে পড়ল মনোরমের কথা, শত্রুজিতের কথা। শত্রুজিতকে এক্ষুনি একটা ফোন করতে হবে। কিন্তু তার আগে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত এই রোগা ফরসা মেয়েটাকে–থুড়ি, হিউম্যানয়েডটাকে।

ঝুমকি!

ঝুমকি রাজরীতার দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজরীতা ছুটে গিয়ে ওকে একেবারে জাপটে ধরল। ওর গালে ভালোবাসার চুমু খেয়ে বলল, তোমার জবাব নেই।

ঝুমকি চোখ পিটপিট করল কয়েকবার। তারপর রাজরীতার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি যাই। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম

পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে…।

# রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল

**রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল**

আপনি সুনন্দা পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই আপনাকেই শোনাব এই বিচিত্র কাহিনি। তারপর আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব? যদি পারেন আমাকে একটু সাহায্য করবেন, কারণ আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে। শুধু আমি কেন, আপনার কাছ থেকে সামান্য একটু সাহায্য পেলে প্রায় দেড়শোটা পরিবার বেঁচে যাবে। ওদের সকলের সমস্যা মাথায় নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি উদভ্রান্তের মতো। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোয় এলোমেলোভাবে উঠে পড়ছি, নেমেও পড়ছি একইভাবে। যে-কোনও স্টেশন থেকে ট্রেন ধরছি, নেমে পড়ছি যে-কোনও স্টেশনে। ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি একজনকে। রাতের ট্রেনেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

ঘটনাটা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে যা বলব তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।

আমি একটি পত্রিকা অফিসে কাজ করি। সেই হাউসের চারটি ম্যাগাজিন আছে। তিনটি ইংরেজি, একটি বাংলা। বাংলা পত্রিকাটি পাক্ষিক। নাম চারুলতা। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পত্রিকাটির চরিত্র সুনন্দার মতোই। আমি এই পত্রিকার সারকুলেশানের দায়িত্বে রয়েছি।

তিন বছর ধরে চারুলতা প্রকাশিত হচ্ছে। নামী লেখকরা নিয়মিত এই পত্রিকায় লেখেন। অনেক খরচ করে যত্ন নিয়ে এই রঙিন পাক্ষিকটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিন বছর এই পত্রিকার সারকুলেশান পনেরো হাজারেও পৌঁছোয়নি।

আমাদের হাউসের মালিক সর্বেশ্বর নাগ অনেক আশা নিয়ে ম্যাগাজিনটি বের করেছিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার আগে চুলচেরা মার্কেট সার্ভে করা হয়েছিল। তার পজিটিভ আউটকাম দেখেই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

তিন বছর ধরে আমি মুখে রক্ত তুলে চারুলতা-র বিক্রি বাড়াতে চেষ্টা করেছি। ইস্টান রিজিওনের বাঙালি অঞ্চলে ঘন-ঘন ট্যুর করেছি। কিন্তু চারুলতা-র বিক্রি সুনন্দা-র ধারে কাছে পৌঁছোতে পারেনি। আমি দুটো পত্রিকা হাতে নিয়ে লক্ষবার তুলনামূলক বিচার করেছি। কিন্তু কিছুতেই চারুলতা-র মাইনাস পয়েন্ট বের করতে পারিনি।

গত কয়েকমাসে মিস্টার নাগ আমাকে ডেকে বেশ কয়েকবার প্রচ্ছন্ন ধমক দিয়েছেন। যার অর্থ হল, যদি আগামী ছ-আট মাসে ম্যাগাজিনের বিক্রি বাড়াতে না পারি, তা হলে উনি ম্যাগাজিন বন্ধ করে দেবেন। আর যদি শুধু ইংরেজি পত্রিকাই বের করতে হয়, তা হলে কোনও অবাঙালি বিজনেস পার্টনার নিয়ে দিল্লি বা মুম্বাই থেকে তিনি সেগুলো বের করবেন। অর্থাৎ, কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেবেন। যার বাংলা মানে হল, প্রায় দেড়শো স্টাফ বেকার হবে। সেইসঙ্গে দেড়শো পরিবার এক চরম অবস্থায় মুখোমুখি দাঁড়াবে।

এইরকম একটা বিপন্ন অবস্থায় আমি পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর কাজে আসাম আর উত্তরবঙ্গ টুরে গিয়েছিলাম। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো সপ্তাহ মরিয়া হয়ে কাজ করেছি। তারপর নিতান্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে উঠে পড়েছি হাওড়া ফেরার ট্রেনে।

নভেম্বরের শেষ। এ-সময়ে কলকাতায় শীত তেমন জাঁকিয়ে না-বসলেও এ-দিকটায় ঠান্ডা আছে।

আমার ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে দূরপাল্লায় যাত্রী কেউ ছিল না। তাই কারও সঙ্গেই তেমন করে আলাপ জমেনি। কিন্তু সন্ধের পর একটা বড়সড় ব্রিফকেস হাতে এমন একজন যাত্রী কেবিনে ঢুকলেন, যাঁর চেহারা রীতিমতো নজর কেড়ে নেয়।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে। ফরসা স্বাস্থ্যবান শরীর। পরনে গাঢ় রঙের স্যুট, টাই। মাথার মাঝখানটা টাক পড়লেও পিছন দিকে ঘন কাঁচাপাকা বাবরি

চুল। কপালে সমান্তরাল কয়েকটা ভাঁজ। চোখে কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচ এতই পুরু যে, কয়েকটা সাদা রিঙের মতো দাগ চোখে পড়ছে।

ভদ্রলোকের পুরুষ্টু গোঁফ আর জুলপি দেখে মনে হয় এককালে মিলিটারিতে ছিলেন। মুখেও সেই ধাঁচের একটা রাশভারী ভাব। আর তীব্র চোখের নজর যেন তির বেঁধানো।

কামরায় উঠেই ভদ্রলোক একটা চুরুট ধরালেন। তারপর ব্রিফকেস খুলে একটা বই বের করে নিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। বইটার নামটা অদ্ভুত বলেই আমার মনে আছে?

হেটেরোসাইক্লিক কেমিস্ট্রি।

আমি সুনন্দার নতুন সংখ্যাটা নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আজই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশান থেকে ওটা কিনেছি। পত্রিকাটা কী ম্যাজিক জানে আমি বলতে পারব না। তবে লক্ষ করেছি, ম্যাগাজিনটা হাতে নিলে আমার আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ঘণ্টাখানেক পরেই কেবিনের অন্য দুজন যাত্রী নেমে গেল। ফলে কামরায় শুধু আমরা দুজন। আমার সহযাত্রী এইবার বোধহয় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলেন।

হাওড়া পর্যন্ত যাবেন বুঝি? ওঁর গলার স্বর বেশ ভারী। ঠোঁটের কোণে সামান্য একচিলতে হাসি।

এইভাবেই আলাপ শুরু।

কথায় কথায় আমার ম্যাগাজিনের কথা বললাম। ব্যাগ থেকে এককপি চারুলতা দেখিয়ে বললাম, আমি এই ম্যাগাজিনের সারকুলেশান ডিভিশনের চিফ।

ভদ্রলোক কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, ম্যাগাজিনটা খুব একটা বিক্রি হচ্ছে না তো–।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ভেতরের খবরটা উনি কী করে জানতে পারলেন?

ভদ্রলোক সবজান্তা হাসি হাসলেন চাপা গলায়। তারপর বললেন, না, না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি চারুলতা-র লোক হয়ে সুনন্দা পড়ছেন, তাই বললাম চুরুটের ঘন ধোঁয়ায় নিজেকে ঝাপসা করে দিয়ে বললেন, তা ছাড়া ম্যাগাজিন লাইনে আমারও একটু-আধটু ইন্টারেস্ট আছে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। হাউসের সিক্রেট যাকে-তাকে বলা ঠিক নয়। তবে ভদ্রলোকের কথায় একটা ঠান্ডা অস্বস্তি আমার শিরদাঁড়ায় কাকড়াবিছের মতো হেঁটে বেড়াতে লাগল।

প্রশ্ন করে জানলাম, ভদ্রলোক পেশায় কনসালট্যান্ট। তবে ঠিক কীসের কনসালট্যান্ট তা উনি স্পষ্ট করে বললেন না। ওঁর কথায়, আচরণে, আর হাসিতে কোথায় যেন একটা রহস্য জড়িয়ে রইল। উনি আবার ওঁর কেমিস্ট্রি বইটায় মন দিলেন। আমিও সুনন্দা-র পাতার ফিরে গেলাম।

সুনন্দা-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা গল্পে আমার চোখ আটকে গেল। আমি ভুল দেখছি না তো! গল্পের নামটা একটু রহস্যময়। কিন্তু তার প্রথম লাইন দুটো আমাকে পাথর করে দিল।

রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল
সোমদত্ত সেনচৌধুরী

আপনি সুনন্দা পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই আপনাকেই শোনাব এই বিচিত্র কাহিনি। তারপর আপনাকে একটা..

.

গল্পটা পড়তে-পড়তে আমি অন্য কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিলাম। হুবহু আমার কথা লিখেছেন লেখক। আমাদের হাউসের গোপন খবর কেউ কি বেনামে গল্প লিখে ফাঁস করে দিচ্ছে? সোমদত্ত সেনচৌধুরী নামটা বেশ অদ্ভুত। চারটে পদবি দিয়ে তৈরি নাম। নিশ্চয়ই কারও ছদ্মনাম। কিন্তু এই ছদ্মনামের আড়ালে কে লুকিয়ে রয়েছে?

গল্পটায় ঘটনা হুবহু একইভাবে এগিয়েছে। অন্তত সহযাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত। তবে লেখকের পত্রিকার নাম চারুলতা নয়, কাজললতা। এ ছাড়া সবকিছুতেই আশ্চর্য মিল। এমনকী হেটোরোসাইক্লিক কেমিস্ট্রি পর্যন্ত।

আমি নিশি-পাওয়া মানুষের মতো গল্পটা পড়তে শুরু করলামঃ

.

…সুনন্দা-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কী মনে হওয়ায় ব্যাগ থেকে কাজললতা-র নতুন সংখ্যাটা বের করলাম। সুনন্দায় এমন কী আছে যা আমার পত্রিকার নেই? এবারের ট্যুরে পরের মাস থেকে সারকুলেশান কতটা বাড়বে কে জানে! যে করে হোক, আগামী ছমাসের মধ্যে সারকুলেশান আমাকে বাড়াতেই হবে। তা না-হলে মালিকের কাছ থেকে হে বন্ধু বিদায়।

সারকুলেশান কিছুতেই বাড়াতে পারছেন না, তাই না? ভদ্রলোকের গম্ভীর গলা মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

আমি চমকে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মিলিটারি গোঁফের কোণে দুয়ে হাসি। হাতের চুরুট মাপে ছোট হয়ে এলেও তার ধোঁয়ার তেজ কমেনি।

ভদ্রলোক আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বেশ মজা পেলেন। বারকয়েক মাথা নেড়ে বাবরি চুলে হাত চালিয়ে বললেন, ওপর-ওপর দেখলে মনে হবে সুনন্দা-য় যা-যা আছে সবই আপনার ম্যাগাজিনে আছে। নামি-দামি লেখক, সুন্দর-সুন্দর ছবি, দামি কাগজ, ভালো ছাপা বলতে গেলে তেমন কোনও তফাত নেই।

আমি চটপট বারতিনেক ঘাড় নাড়লাম। কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছেন। কিন্তু কিছু বলতে গিয়ে টের পেলাম, আমার মুখের ভেতরে জিভটা যেন গিরগিটির খসখসে লেজ। একইসঙ্গে গলা শুকিয়ে কাঠ।

ভদ্রলোক তার হাতের বইটা ব্রিফকেসের ওপরে নামিয়ে রাখলেন। চুরুটে আয়েস করে ঘন ঘন দুটো টান দিলেন। হাত নেড়ে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে নিছকই ট্রেনে আলাপ। এ-বিষয়ে বেশি কথা বলা

ঠিক হবে কি না জানি না। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছেন…তাই বলছি…।

আমি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাতের ট্রেন কোনও একটা স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ট্রেনের খটাখট শব্দ হঠাৎ যেন কয়েক ধাপ বেড়ে গেল। বন্ধ কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস ঢুকছিল। কিন্তু আমি শীত গ্রাহ্য না করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর চশমার ডান কাচে কেবিনের একটা আলোর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওঁর বাঁ-চোখ লেন্সের ভেতর দিয়ে আমাকেই দেখছিল।

ভদ্রলোক সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সুনন্দা-র বিক্রি আড়াই লাখের বেশি। শুধুমাত্র ভালো লেখা, ছাপা, রংচং বা দামি কাগজ দিয়ে এই সারকুলেশানে পৌঁছোনো যায় না। এর জন্য একটা সিক্রেট আছে…।

কী সিক্রেট? আমি চাপা গলায় প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়লাম।

ভদ্রলোক চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে সামান্য হাসলেন : সিক্রেটটা হল হিউম্যান কেমিষ্ট্রি। আমি জানি, আপনি এর নাম শোনেননি–শোনার কথাও নয়। কারণ ব্যাপারটা সতেরো শতকের অ্যালকেমির মতোই খুব গোপনে চর্চা করা হয়…।

হিউম্যান কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রির এরকম কোনও শাখা আছে বলে কখনও শুনিনি। তা ছাড়া সেই ছোটবেলা থেকেই কেমিস্ত্রিকে ভয় পেয়ে বড় হয়েছি। প্রায় রোজই করুণাময় ঈশ্বরকে প্রাণপণে ডেকেছি, কবে কেমিষ্ট্রি আমার নগণ্য জীবন থেকে অদৃশ্য হবে। আর শেষকালে ম্যাগাজিনের রেকর্ড সারকুলেশানের সিক্রেট কিনা ইয়ে কেমিস্ট্রি!

বুঝতে পারছি, রসায়নশাস্ত্র ব্যাপারটার প্রতি আপনার খুব একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। অ্যালকেমি সম্পর্কেও বেশিরভাগ মানুষের এইরকমই ধারণা ছিল। অ্যালকেমি শব্দটার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে অপরসায়ন। কিন্তু যারা জানেন

তারা ঠিকই জানেন কোন-কোন ধাতু থেকে কীভাবে সোনা তৈরি করা যায়। সুতরাং, অ্যালকেমি একেবারে অলীক ব্যাপার নয়।

প্রসঙ্গ পালটে যাচ্ছে দেখে আমি অধৈর্য হয়ে ভদ্রলোককে খেই ধরিয়ে দিতে চাইলামঃ কিন্তু সারকুলেশানের সঙ্গে হিউম্যান কেমিস্ট্রির কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে খুব গভীর সম্পর্ক। অ্যালকেমির মতো হিউম্যান কেমিস্ট্রিও খুব গোপনে চর্চা করা হয়। সারা পৃথিবীতে এই বিষয় নিয়ে এখন গবেষণা করছে বড়জোর শ-দুয়েক বিজ্ঞানী। আমি এই লাইনে গবেষণা করছি প্রায় ৪০ বছর…।

আপনি যে বললেন, আপনি…ইয়ে…মানে, কনসালট্যান্ট?

ভদ্রলোক ভরাট গলায় নীচু পরদায় হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, ম্যাগাজিনের সারকুলেশান কনসালট্যান্ট–যদিও আসলে ব্যাপারটা পুরোপুরি হিউম্যান কেমিস্ট্রি।

আমি আর থাকতে না পেরে একটু খোঁচা দিয়েই বললাম, আপনার ওই হিউম্যান কেমিস্ট্রি দিয়ে সারকুলেশান বাড়ানো যায় নাকি?

ভদ্রলোক বিন্দুমাত্রও আহত না হয়ে জবাব দিলেন, একমাত্র হিউম্যান কেমিস্ট্রি দিয়েই কোনও ম্যাগাজিনের সারকুলেশান ফিনোমিনাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব–ঠিক যেমনটা সুনন্দা করেছে। দাঁড়ান, ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি…।

আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকশন বা রিঅ্যাকশনর জন্যে আমাদের শরীরের ভেতরে নানারকম জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যায়। যেমন ধরুন, আপনি হঠাৎ রেগে গেলেন, কিংবা ভয় পেলেন, অথবা উত্তেজিত হলেন–এইরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার শরীরের ভেতরে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে। এই বিক্রিয়াগুলো এতই জটিল যে, এর অনেকটাই এখনও বিজ্ঞানীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। আমাদের শরীরে কতরকম অ্যামিনো অ্যাসিড আর প্রোটিন মলিকিউল রয়েছে। এরা আবার নানারকম কেমিক্যাল চেইন তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে সে এক মিরাকিউলাস ব্যাপার। সেইজন্যেই এর বেশিরভাগটাই রহস্য থেকে গেছে। একটু থেমে নতুন একটা চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক। তারপর চুরুটে বারকয়েক টান দিয়ে জড়ানো গলায় বললেন,

তবে আমি এই মিস্ত্রির কিছুটা সম্ভ করেছি। কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে যে আমাদের শরীরের ভেতর কী করতে পারে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। হেসে কথা শেষ করলেন তিনি। ধোঁয়া ছাড়লেন আয়েস করে।

ভদ্রলোকের কেমিস্ত্রির কচকচি আর চুরুটের ধোঁয়ার কটু গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক কয়েকবার কেশে উঠলেন। তারপর মাথা নেড়ে ঠোঁটের কোণে হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, এবারে আসি ট্যাক্টাইল ফিডব্যাকের কথায়...।

ট্যাক্টাইল ফিডব্যাক? নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করে ফেললাম শব্দ দুটো।

হ্যাঁ, ট্যাক্টাইল ফিডব্যাক। মানে, আমাদের স্পর্শ অনুভূতির যে-খবর মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তাকেই বলে ট্যাক্টাইল ফিডব্যাক। এই খবর পৌঁছোনোমাত্রই আমাদের শরীরের ভেতরে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়...।

আমি উৎসাহ নিয়ে বলে উঠলাম, হিউম্যান কেমিস্ট্রি।

ভদ্রলোক বেশ জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ঠিকই ধরেছেন। আচ্ছা, বলুন তো, কোনও কিছু টাচ করলে কী করে আপনি সেটা টের পান?

কেন, চোখে দেখে। সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলাম আমি।

উঁহু, হল না। চোখ বুজে টাচ করলে বুঝি টের পান না?

একটু ইতস্তত করে বললাম, হ্যাঁ, পাই।

শুধু তাই নয়, চোখ বুজে কোনও জিনিস ছুঁয়ে আপনি অনেক সময় এটাও বলে দিতে পারেন, জিনিসটা কী। যেমন, লোহা ছুঁলে যেরকম অনুভূতি হবে কাঠ ছুঁলে সেরকম হবে না। তেমনই কাচ, কাপড়, কিংবা কোনও মেয়ের নগ্ন শরীর–এসবের স্পর্শ অনুভূতিও একরকম নয়। এক একরকম স্পর্শ অনুভূতির জন্যে আমাদের শরীরের ভেতরে এক-একরকম বিক্রিয়া হয়। একটা বিক্রিয়ার সঙ্গে আর একটা বিক্রিয়ার কোনও মিল নেই। দাঁড়ান, আপনাকে ব্যাপারটা একটু দেখাই... বলে ভদ্রলোক চুরুটে জোরালো টান দিয়ে বাঁ-হাতে নিজের ব্রিফকেসটা

খুলে ফেললেন। একটা মোটাসোটা ডায়েরি বের করলেন ভেতর থেকে। অতি ব্যবহারে পাতাগুলো সেলাই কেটে খানিকটা করে বেরিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক ডায়েরিটা খুলে সাবধানে তার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

আমি অদ্ভুত মানুষটিকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত পাগলের পাল্লায় পড়লাম নাকি! হিউম্যান কেমিস্ট্রি, ট্যাক্টাইল ফিডব্যাক..আমার কপালের পাশটা দপদপ করছিল।

এই দেখুন– বলে ভদ্রলোক খোলা ডায়েরিটা আমার সামনে এগিয়ে দিলেন।

ডায়েরির দুটো পৃষ্ঠা জুড়েই নানারকম রাসায়নিক সংকেত আর সমীকরণ। তবে একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত মনে হল। কেমিস্ট্রিতে আমার যেটুকু জ্ঞান, তাতে দেখেছি সবরকম রাসায়নিক সমীকরণেই শুধুমাত্র যোগচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের ডায়েরির খোলা পাতায় যে-সব সমীকরণ লেখা রয়েছে সেগুলোতে উনি অকাতরে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন– ঠিক সরল অঙ্কের মতো। এ আবার কী ধরনের রাসায়নিক সমীকরণ।

ভদ্রলোক শব্দ করে ডায়েরিটা বন্ধ করে রেখে দিলেন ব্রিফকেসের ভেতরে। চুরুটে টান দিয়ে কেবিনের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব কেমিক্যাল ইকুয়েশান আপনি কিছুই বুঝবেন না। কারণ প্রথাগত বিজ্ঞান এখনও এই বিচিত্র বিজ্ঞানের খবর পায়নি। হিউম্যান কেমিস্ট্রির এই বিক্রিয়াগুলো আমার গত ১৮ বছরের গবেষণার ফল।

যাই হোক, যা বলছিলাম– ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসে আমার দিকে সরাসরি তাকালেনঃ একটা বিশেষ ধরনের ট্যাক্টাইল ফিডব্যাকের জন্যে শরীরের ভেতরে একটা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবার যদি এমন করা যায়, আপনি ছোঁবেন একটা জিনিস অথচ শরীরের ভেতরে তার জন্যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হবে না হবে অন্য কোনও বিক্রিয়া। যার ফলে আপনার ব্রেন আপনাকে অন্যরকম অনুভূতির খবর দেবে। তা হলে কী হবে বলুন তো?

স্পর্শ অনুভূতির ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাবে।

ঠিক তাই। এবার ধরুন, আপনি একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছেন বা ম্যাগাজিনটা স্রেফ ছুঁয়ে আছেন। অথচ যে-স্পর্শ অনুভূতি আপনার মস্তিষ্কে

পৌঁছোচ্ছে সেটা কাগজ ছোঁওয়ার নয়–আপনার যেন মনে হচ্ছে, আপনি আপনার প্রিয়তম নারীর নগ্ন শরীর ছুঁয়ে আছেন। তখন কী হবে?

সারকুলেশান বাড়ানোর সঙ্গে হিউম্যান কেমিস্ট্রির সম্পর্কটা এবারে যেন আমি আঁচ করতে পারছি। তাই ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, কিন্তু আমার চোখ তো দেখবে আমি একটা ম্যাগাজিন ছুঁয়ে আছি! তা হলে।

আমাকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঠিকই বলেছেন। চোখ যে-ইনফরমেশান ব্রেনে পাঠাবে তার সঙ্গে ট্যাক্টাইল ফিডব্যাকের ইনফরমেশান মিলবে না। তখন এই দুটো পরস্পরবিরোধী খবরের মধ্যে যেটা আপনার প্রিয় সেটাই আপনি মেনে নেবেন। এই কারণেই সুনন্দা পত্রিকাটা আপনি কখনও কাছছাড়া করতে চান না। ওটা সবসময় আপনার হাতের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বিমূঢ় চোখে আমার কোলের ওপর রাখা সুনন্দা পত্রিকাটার দিকে তাকালাম। এটাই তা হলে ম্যাগাজিনটার গোপন ম্যাজিক!

সুনন্দা-র ব্যাপারটা আমি ভালো করেই জানি, ভদ্রলোক তখনও বলে যাচ্ছেন, আমি ওদের কনসালট্যান্ট। অবশ্য এটা ওরা সিক্রেট রেখেছে।

সুনন্দা-র ট্যাক্টাইল ফিডব্যাকের রাসায়নিক বিক্রিয়া পালটে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার হিউম্যান কেমিস্ট্রির কারিকুরি। জানি, আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যা সত্যি তাই আপনাকে বললাম…বিশ্বাস করা-না করাটা আপনার ব্যাপার।

একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে… একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, ট্যাক্টাইল ফিডব্যাকের ইনফরমেশানটা আপনি পালটাচ্ছেন কেমন করে?

ভদ্রলোক আমার দিকে সরাসরি চোখ রেখে মুচকি হাসলেন। চুরুটে গভীর টান দিলেন। চুরুটের ডগার আগুনটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, ট্যাক্টাইল ফিডব্যাক আমি চেঞ্জ করেছি পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন দিয়ে।

পাইরোনিকি...।।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, হ্যাঁ, পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন। প্রথাগত রসায়নশাস্ত্র কখনও এই কেমিক্যালটার নাম শোনেনি। এটা হিউম্যান কেমিস্ট্রির ব্যাপার...আমার ল্যাবরেটারিতে অনেক ঝাট করে তৈরি। সুনন্দা যে কাগজে ছাপা হয় তার মধ্যে এই কেমিক্যাল নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে দেওয়া আছে। এ ব্যাপারে পেপার মিলের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। আর যেকালিটা ওরা ছাপার জন্যে ব্যবহার করে তার মধ্যেও মেশানো আছে ওই পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন। এটাই হল সুনন্দার গোপন ম্যাজিক। তাই আপনাকে বলছিলাম, শুধুমাত্র ভালো লেখা, ছাপা, রংচং বা দামি কাগজ দিয়ে আড়াই লাখ প্লাস সারকুলেশানে পৌঁছানো যায় না–এর অন্য একটা সিক্রেট আছে। এবার তো সেই সিক্রেট আপনি জেনে গেলেন।

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। কৌতুকের নজরে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

শীতের মধ্যেও আমার কপালে বোধহয় ঘাম জমছিল। ভদ্রলোকের এই অবিশ্বাস্য কাহিনি কি বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু কাজললতা-র সারকুলেশানের যা অবস্থা তাতে মরিয়া হয়ে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। আগামী ছ-আট মাসের মধ্যে সারকুলেশান বাড়ানোর কোনও ব্যবস্থা না করতে পারলে মালিক কলকাতার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবেন দিল্লি অথবা মুম্বাইতে। সুতরাং ডুবে যাওয়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো আমি ভদ্রলোককে অনুনয়ের সুরে বললাম, আমাদের ম্যাগাজিনটার একটা হিল্লে করে দিন না! আর কয়েক মাসের মধ্যে যদি ওটার সারকুলেশান না বাড়াতে পারি...।

ভদ্রলোককে আমার দুরবস্থার কথা খুলে বললাম।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, আপনার পজিশনটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবে আমারও একটা অসুবিধে আছে। সুনন্দা-র সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সেই কন্ট্রাক্ট পিরিয়ড শেষ হতে এখনও একটা বছর বাকি। আমি একটা ম্যাগাজিনের হয়ে কখনও পাঁচ বছরের বেশি কাজ করি না। কারণ, একটা ম্যাগাজিন চিরকাল সারকুলেশানের টপে থাকতে পারে না–অন্তত থাকা উচিত নয়–সেটাই ন্যাচারাল। সেই অর্থে আমি কখনও নেচারের বিরুদ্ধে যেতে চাই না। সুতরাং আপনার ম্যাগাজিনের সারকুলেশান কনসালট্যান্ট হতে

আমার কোনও অসুবিধে নেই–শুধু ওই কন্ট্রাক্টের ব্যাপারটা ছাড়া। একটা বছর আপনাকে ওয়েট করতেই হবে।

এ–ক বছর!

আমার হতাশা দেখে ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়ে বললেন, একটা বছর মানে ৩৬৫ দিন। ও দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। তা ছাড়া আমার ফিজের ব্যাপারটা নিয়েও আপনার মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। আপনি যেভাবে তোক একটা বছর ম্যানেজ করে নিন। তারপর আমি এসে গেলেই দেখবেন ম্যাজিক। তখন আপনার ম্যাগাজিন সোয়াহিলি ভাষাতে ছাপা হলেও ওই পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের কৃপায় রমরম করে বিক্রি হবে।

খেয়াল করিনি কখন ট্রেনের গতি কমে এসেছিল। আর ভদ্রলোকও কাচের জানলা দিয়ে। হঠাৎ একবার উঁকি মেরে আপনমনেই বললেন, ও, এসে গেছে। তারপর চট করে ব্রিফকেস গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, চলি। যা বললাম, ওই একটা বছর কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিন।

কেবিনের দরজা ঠেলে তিনি করিডরে পা রাখতেই আমি পিছু ডেকে বললাম, আপনার অ্যাড্রেসটা?

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন আমার দিকে। মুচকি হেসে বললেন, অ্যাড্রেসের দরকার নেই। এক বছর পর আমিই আপনার অফিসে ফোন করে কনট্যাক্ট করে নেব। কাজললতা তো, আমার মনে থাকবে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে আমি একা বসে রইলাম।

কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে স্টেশানের নামটা পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কুয়াশা আর টিমটিমে মলিন আলো আমার চেষ্টায় বাদ সাধল।

ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করল। আমি সুনন্দা পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলাম। তারপর চোখ বুজে সুনন্দার-র পাতায় হাত বোলাতে লাগলাম। মনে হল, একটা অদ্ভুত আমেজ যেন টের পাচ্ছি। পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন তা হলে মিথ্যে নয়!

একটা বছর সত্যিই দেখতে-দেখতে কেটে গেল। কিন্তু কোনও টেলিফোন এল না আমার অফিসে। তারপর আরও দশটা দিন কেটে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক আমাকে ফোন করেননি।

মালিককে অনেক বলে কয়ে হাতে-পায়ে ধরে আমি পত্রিকাটা এখনও চালু রেখেছি। ওঁকে বলেছি ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা, পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের কথা। তাতে উনি খুব হেসে ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাতে একটুকুও টলেনি। তাই আমি এখনও মরিয়া হয়ে একটা টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমি জানি ফোন আসবেই। কারণ, সেই ফোনটার ওপরে প্রায় দেড়শো পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আর সুনন্দা-র পাঠক হিসেবে আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব। যদি কখনও সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পান, দয়া করে আমাকে টেলিফোন করার কথাটা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, আমরা সবাই ওঁর মুখ চেয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছি।

আমিও অবশ্য একেবারে হাত গুটিয়ে বসে নেই। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে বিশেষ করে রাতের ট্রেনে–খেয়ালখুশি মতো উঠে পড়ছি। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই ভদ্রলোককে।

আমি জানি, একদিন-না-একদিন ওঁকে খুঁজে পাবই। যে করে তোক খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।

.

গল্পটা শেষ করে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। হাত-পা কঁপতে লাগল। কপালের কাছটায় অদ্ভুত ব্যথা শুরু হয়ে গেল।

এমন সময় চমকে উঠে খেয়াল করলাম, ট্রেনের গতি কমতে শুরু করেছে। বোধহয় সামনে কোনও স্টেশান আসছে।

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক ব্রিফকেস গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাচের জানলা দিয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে বললেন, চলি, আমার স্টেশন এসে গেছে।

আমি তখন মরিয়া হয়ে ওঁকে বললাম আমার ম্যাগাজিনের কথা।

তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে অনেক কথা জড়িয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে মসৃণ হেসে হাত নেড়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই। সব বুঝতে পেরেছি। পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের ব্যাপার তো! আসলে আমার সঙ্গে সুনন্দার কন্ট্রাক্ট শেষ হতে এখনও এক বছর বাকি। এই একটা বছর কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিন, তারপর…।

আপনার অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার যদি দেন।

ভদ্রলোক কেবিনের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। মুচকি হেসে বললেন, ওসবের দরকার নেই। এক বছর পর আমিই আপনার অফিসে ফোন করে কনট্যাক্ট করে নেব। চারুলতা তো, আমার মনে থাকবে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে শুধু চুরুটের গন্ধ ভেসে রইল।

তারপর এক বছর কেটে গেছে, কিন্তু আমার অফিসে কোনও ফোন আসেনি। বছর পেরিয়ে আরও দশদিন কেটে গেছে, কিন্তু ওই কনসালট্যান্ট আমার সঙ্গে কোনও যোগযোগ করেননি।

তবে আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। মরিয়া হয়ে একটা টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। আর দুরপাল্লার ট্রেনগুলোতে বিশেষ করে রাতের ট্রেনে–খেয়ালখুশি মতো উঠে পড়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই ভদ্রলোককে।

আমি জানি, একদিন-না-একদিন ওঁকে আমি খুঁজে পাবই। যে করে তোক খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।

আর সুনন্দা-র পাঠক হিসেবে আপনাকেও একান্ত অনুরোধ, যদি কখনও সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পান, দয়া করে আমাকে টেলিফোন করার কথাটা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, দেড়শোটা পরিবার ওঁর মুখ চেয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে।

# ভূতনাথের ডায়েরি : ভয় পাওয়া মানুষ

**ভূতনাথের ডায়েরি : ভয় পাওয়া মানুষ**

চিৎকারটা শুনেই প্রিয়নাথ জোয়ারদার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিৎকারটার মধ্যে যেন হিম বরফকুচি মেশানো ছিল। চিৎকারটা যতক্ষণ ধরে চলছিল ততক্ষণের জন্য করিডরের আলোটা যেন মলিন হয়ে গেল হঠাৎ ভোল্টেজ কমে গেলে যেমন হয়। তারপর, সেই ভয়-পাইয়ে-দেওয়া চিল্কারের রেশ শেষ হলে, বাটা আবার তেজ ফিরে পেল।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের সামনে দু-এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। মুখে আলতো করে হাত বুলিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললেন, সুনীত। ওর কথাই আপনাকে বলছিলাম। তেতলায় পেছনের দিকটায় ও থাকে।

প্রিয়নাথ চিৎকারটার কথাই ভাবছিলেন। এমন চিৎকার বুকের ভেতর পর্যন্ত আঁচড় টেনে দেয়। খুব নীচু পরদায় শুরু হয়ে ধাপে-ধাপে ওপরে উঠছে। যেন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে কেউ আইফেল টাওয়ারের মাথায় পৌঁছোতে চাইছে। আর যতই ওপরে উঠছে, গলার স্বর ততই চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কেউ হয়তো এরকম চিৎকার করে। হয়তো ভাবে, এই চিৎকারটা তাকে বাঁচিয়ে দেবে। যত উঁচু পরদায় চিৎকার করতে পারবে, তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

চিৎকারটা শেষ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড যেন আলপিন-নিস্তব্ধতা। তারপর বিনোদনারায়ণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথের কানে ভয়ংকর চিৎকারটার

রেশ তখনও বাজছিল। পুরোনো যত চিৎকার বা আর্তচিৎকার প্রিয়নাথ শুনেছেন সুনীতের চিৎকার এক পলকে সব মুছে দিয়েছে।

বিনোদবাবু বলেছিলেন, ওঁর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ মাঝে-মাঝে অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে ওঠে। সেই সঙ্গে আরও কিছু কিছু বিচিত্র কাজ করে। প্রিয়নাথ যদি এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন তা হলে ভালো হয়। কারণ, ডাক্তার বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের খোঁজ পেয়েছেন লতায়-পাতায়। তারপর একদিন বিকেলবেলা ওঁর নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। প্রিয়নাথকে খুলে বলেছেন নিজের সমস্যার কথা। তারপর কাতরভাবে অনুনয় করে বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন।

কী করে আপনি বুঝলেন আপনার ভাইয়ের প্রবলেমটা কোনও ভূতুড়ে ব্যাপার? সিগারেটে কড়া টান দিয়ে জানতে চাইলেন ভূতনাথ।

কেমন যেন সংকুচিত হয়ে ইতস্তত করে বিনোদনারায়ণ বললেন, লোকমুখে শুনেছি, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেইখান থেকে আপনার এলাকা শুরু। সুনীতের জন্যে ডাক্তার-সাইকিয়াট্রিস্ট করে করে আমি বিজ্ঞানের পুঁজি শেষ করে বসে আছি। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসে হাত পেতেছি। আমার ছোট ভাইটাকে যে করে তোক বাঁচান। ওর কষ্ট আর সইতে পারছি না। এত হাসিখুশি টগবগে জোয়ান ছেলেটার এই প্যাথেটিক অবস্থা ভাবা যায় না…।

কথা বলতে বলতে বিনোদনারায়ণের চোখে জল এসে গিয়েছিল। প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, ছোট ভাইয়ের কথা বলার সময় বড় ভাইয়ের মুখে-চোখে পিতৃস্নেহ ফুটে উঠেছিল–যা আজকের দিনে প্রায় দেখাই যায় না।

প্রিয়নাথ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে রইলেন। একমনে সিগারেটে টান দিয়ে গেলেন। তারপর ছোট্ট করে বললেন, ঠিক আছে। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। কবে আপনাদের বাড়ি যাওয়া যায় বলুন…।

যেদিন আপনি বলবেন।

বিনোদনারায়ণদের বাড়ি বসিরহাটে। ওঁদের পিতৃপুরুষ জমিদার ছিলেন। তাই জমিজমা-পুকুর দিঘির কোনও হিসেব ছিল না। এখনও নয়-নয় করে যা অবশিষ্ট

আছে তা-ও অনেক। পুরোনো আমলের বিশাল বাড়িতে ওঁরা তিন ভাই থাকেন। বিনোদনারায়ণ, প্রমোদনারায়ণ, আর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ।

বিনোদনারায়ণ যখন সবে কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠছেন তখন ওঁদের বাবা সাপের কামড়ে মারা যান। শ্রাদ্ধ-শান্তি ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি মিটে গেলে হঠাৎই একজন সন্ন্যাসী ওঁদের বাড়িতে আসেন। সকলের হাত দেখে ভাগ্যচর্চা করে তিনি বলে যান, এ-বংশের পুরুষদের অপঘাতে অকালমৃত্যু হবে। এটা নিয়তির অভিশাপ।

তার পরই সুনীতের জন্ম হয়।

এর কয়েক বছর পর বিনোদনারায়ণের মা ম্যালেরিয়ায় মারা যান। প্রমোদ আর সুনীত তখন খুবই ছোট। বিনোদনারায়ণ ওঁদের কোলে-পিঠে করে আগলে রেখে বড় করেন। অভিশাপের ভয়ে তিনি বিয়ে করেননি। সারাটা জীবন সম্পত্তি দেখাশোনা আর ধর্মকর্ম নিয়ে থেকেছেন। মনে মনে ভেবেছেন নিশিদিন ঈশ্বর-সাধনায় মগ্ন থাকলে অভিশাপ ধীরে-ধীরে কেটে যাবে। কালো ছায়া সরে গিয়ে আবার আলো দেখা দেবে।

..কিন্তু এমনই ভবিতব্য দেখুন, সুনীত এই অদ্ভুত বিপদে পড়ল। মলিন মুখে বললেন বিনোদনারায়ণ, জানি না, এটা সেই অভিশাপের কোনও ছায়া কি না।

আপনার কি মনে হয় কোনও প্রেতাত্মা সুনীতের শরীরে বাসা বেঁধেছে? প্রিয়নাথ প্রশ্ন করলেন।

কী করে বলব! হতাশভাবে জবাব দিলেন বিনোদবাবু, প্রমোদ তো বলছিল সেটাই হয়েছে। ওর চেনা একজন কাঁপালিক আছে। তাকে নিয়ে এসে কীসব তন্ত্র-মন্ত্র করলেই নাকি সুনীত ঠিক হয়ে যাবে। তা আমি রাজি হইনি।

কেন?

প্রমোদ বহুকাল ধরেই কেমন বাউণ্ডুলে গোছের। বাড়ির দিকে মন নেই। সুযোগ পেলেই সাধু-সন্ত-তান্ত্রিকদের পেছনে ছুটে বেড়াত–এখনও তাই। মাঝে-মাঝেই রাতে বাড়ি ফেরে না। যখন তখন ছাইপাঁশ গিলে বসে থাকে। ওকে ভাই বলে পরিচয় দিতে আমার খুব লজ্জা করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিনোদনারায়ণ : আসলে দোষ আমারই, প্রিয়নাথবাবু–ওকে আমি শত চেষ্টা করেও মানুষ করতে

পারিনি। তাই ওর প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং ওর মুখোমুখি হলেই আমি কেমন একটা অপরাধবোধে ভুগি। নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে যায়। এটা আমার....।

বিনোদনারায়ণের গলার স্বর কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মাথা নীচু করে তিনি নিজেকে আড়াল করতে চাইছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্লিজ, আপনি আপসেট হবেন না। আমরা যা চাই সবসময় কি তা হয়!...আচ্ছা, প্রমোদবাবু বিয়ে করেননি?

না। একটু থেমে তারপর? ও যদি নিজে কখনও বিয়ে করে করবে–আমি বড় ভাই হিসেবে কখনও কোনও ইনিশিয়েটিভ নিতে পারব না।

ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে প্রমোদবাবু দুঃখ পাননি?

পেয়েছে। ওকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি। ও আমাদের গর্ব। এলাকার সবাই ওকে পছন্দ করে। লেখাপড়ায় জুয়েল ছেলে। খেলাধুলোতেও দারুণ; ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব। সবাই মিলে হইহই করে ট্যুরে যায়, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের কাজ করে মানে, করত। সুনীতকে সবাই একডাকে চেনে। আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই তখন যদি কেউ বলে, ওই যে, সুনীতের বড়দা যাচ্ছে, তখন আমার খুব আনন্দ হয়।

সাদা শার্টের পাশপকেট থেকে রুমাল বের করে চোখে বুলিয়ে নিলেন বিনোদবাবু। একটু কেশে গলাটা স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, আপনি একবার চলুন। নিজের চোখে সব দেখুন। তারপর...আপনি আমাদের শেষ ভরসা।

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, আমি প্রেসিদ্ধ বা ওঝা নই। তবে ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো আমার নেশা। চেষ্টা করে দেখি আপনাকে কোনওরকম হেল্প করা যায় কি না। আচ্ছা, সুনীত যে চিৎকার করে সেটা ঠিক কী ধরনের?

বলে বোঝাতে পারব না, প্রিয়নাথবাবু। আপনি বরং নিজের কানে শুনেই বিচার করবেন।

প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, কথাগুলো বলার সময় বিনোদনারায়ণের মুখে কেমন যেন অসহায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

এখন, সুনীতের চিৎকার নিজের কানে শোনার পর, প্রিয়নাথ সেই ভয়ের কারণ বুঝতে পারলেন। এই অপার্থিব চিৎকারে বুকের রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে যায়।

চলুন–ওপরে চলুন।

বিনোদনারায়ণের কথায় প্রিয়নাথ সংবিৎ ফিরে পেলেন। ভাঙা, ক্ষয় ধরা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির বাঁকের মুখে দেওয়ালে বসানো কারুকাজ করা জাফরি। জাফরির ওপরের দিকে তিনটে ছোট-ছোট হরিণ। সময়ের প্রকোপে জায়গায়-জায়গায় রং চটে গেছে।

জাফরির ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছিল। বাতাসে নদীর ঘ্রাণ প্রিয়নাথ টের পাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে শীতের কামড়।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই উষ্ণতা ওঠা-নামা করছিল। শীত যেন লাজুকভাবে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর উষ্ণতা নামতে শুরু করেছে। শীতও আনুষ্ঠানিকভাবে জাঁকিয়ে বসেছে।

গায়ে উলিকটের গেঞ্জি ও সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও প্রিয়নাথ সামান্য কেঁপে উঠলেন।

ঘন-ঘন বাঁক নেওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠছিলেন। প্রিয়নাথ লক্ষ করছিলেন, সরু চওড়া নানান ধরনের অলিন্দ বাড়িটার নানান দিকে চলে গেছে–অনেকটা ভুলভুলাইয়ার মতন। আলোর ব্যবস্থা বলতে বেশিরভাগই বা। দু-এক জায়গায় টিউব লাইট যে চোখে পড়ছে সেসব নতুন সংযোজন।

দেওয়ালে-দেওয়ালে ড্যাম্পের ছাপ চোখে পড়ছিল। সেইজন্যই হয়তো শীতের সঙ্গে একটা বাড়তি ঠান্ডা যোগ হয়ে গিয়েছিল।

তিনতলায় উঠে দুটো তালাবন্ধ দরজা পেরিয়ে সুনীতের ঘরের দিকে এগোলেন ওঁরা দুজন। বিনোদনারায়ণ দরজা দুটো পেরোনোর সময় বললেন, এত বড়

বাড়িতে তিনটে মাত্র প্রাণী। একতলায় আমি, দোতলায় প্রমোদ, আর তেতলায় সুনীত। তাই বাড়তি ঘরগুলো তালাবন্ধই পড়ে থাকে। প্রায় বিশ বছর ওগুলোর দরজা খোলা হয়নি। খুললে হয়তো দেখব ইঁদুর, বাদুড় আর চামচিকে আস্তানা গেড়েছে।

প্রিয়নাথ কিছু বললেন না।

.

সুনীতের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। বিনোদবাবু সামান্য ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরের আলো প্রিয়নাথের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, অলিন্দের আলো মুছে দিল। আর একইসঙ্গে ঘরের দৃশ্য প্রিয়নাথকে ধাক্কা দিল।

ঘরের এক কোণে সুন্দর ধপধপে বিছানা। সেখানে শুয়ে আছে বছর চব্বিশ-পঁচিশের এক যুবক। ফরসা রোগা চেহারা। বুকের কাছ পর্যন্ত লেপ টানা। একটা হাত লেপের বাইরে বলেই রোগা চেহারাটা স্পষ্ট করে আন্দাজ করা গেছে।

সুনীতের মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। নাক ঠোঁট সুন্দর। ঠোঁটের ওপরে চওড়া গোঁফ। চোয়ালে দু-একদিনের দাড়ি।

সুনীতের চোখজোড়া প্রিয়নাথ দেখতে পেলেন না কারণ, সাদা কাপড়ের পটি দিয়ে ওর চোখ ঢাকা।

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইশারায় ওঁকে অপেক্ষা করতে বললেন।

সুনীতের খাটের কাছে টুলে একজন বয়স্কা মহিলা বসে ছিলেন। রোগা ময়লা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি। দেখে আয়া বলে মনে হয়।

বিনোদনারায়ণ তাঁকে বললেন, মাসি, আপনি একটু নীচে গিয়ে বসুন। ডাক্তারবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন–ছোড়দাকে দেখবেন।

ভদ্রমহিলা উঠে চলে যাচ্ছিলেন, বিনোদনারায়ণ জিগ্যেস করলেন, ওকে ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন?

ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে মহিলা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন, সুনীতের চোখ বাঁধা কেন?

উত্তর দিল সুনীত, অন্ধকারে ঘুমোতে আমার ভয় করে। তাই ঘরের আলো জ্বেলে রেখে চোখ বেঁধে ঘুমোতে চেষ্টা করি।

চোখ ফিরিয়ে সুনীতের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। ও গায়ের লেপ সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে। বাঁ-হাতে টান মেরে সরিয়ে দিয়েছে চোখের পটি।

ওর নিষ্পাপ সুন্দর চোখজোড়া প্রিয়নাথকে মুগ্ধ করল।

বিনোদনারায়ণ ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর ছোট ভাইকে লক্ষ করে বললেন, লেপটা গায়ে দে–ঠান্ডা লেগে যাবে।

বসা অবস্থাতেই সুনীত লেপটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর কৌতূহলী গলায় ভূতনাথকে প্রশ্ন করল, আপনি কীসের ডাক্তারবডির, না মাইন্ডের?

ওর প্রশ্নের ধরনে প্রিয়নাথ বেশ মজা পেলেন। বিনোদনারায়ণ একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটায় না বসে আয়া-মাসির ছেড়ে যাওয়া টুলটায় গিয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য নেড়েচেড়ে মজার সুরে পালটা প্রশ্ন করলেন, তোমার অসুখটা কীসের বডির, না মাইন্ডের? তুমি করে বললাম–কিছু মাইন্ড কোরো না।

বিনোদনারায়ণ সুনীতের পায়ের দিকটায় খাটের এক কোণে বসে পড়লেন। বললেন, সুনীত, ইনি হলেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। অনেক রিকোয়েস্ট করে কলকাতা থেকে ওঁকে ধরে এনেছি। আমাদের বাড়িতে কদিন থাকবেন…তোকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন। তোর সব কথা তুই ওঁকে খুলে বলতে পারিস।

সুনীত বারদুয়েক কাশল। লেপটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। তারপর মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিনোদনারায়ণের সঙ্গে প্রিয়নাথের চোখাচোখি হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ আগের প্রশ্নটাই আবার করলেন? তোমার অসুখটা কীসের–বডির, না মাইন্ডের?

আচমকা মুখ তুলে তাকাল সুনীত। বলল, বডিরও না, মাইন্ডেরও না। অন্য কিছু…।

বিনোদনারায়ণকে অবাক করে দিয়ে সিরিয়াস গলায় ভূতনাথ বললেন, আমি সেই অন্য কিছুর ডাক্তার।

পলকে ঘরের আবহাওয়া যেন পালটে গেল। বিনোদনারায়ণ উশখুশ করতে লাগলেন। সুনীত কেমন চোরাচাউনিতে ভূতনাথকে দেখতে লাগল।

প্রিয়নাথ অফিসের ওপরওয়ালার সুরে বললেন, শোনো, সুনীত,–তোমার কী হয়েছে আমি বলছি। তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ। কেমন করে তা জানি না। তবে সেই ভয় তোমাকে ধীরে-ধীরে শেষ করে দিচ্ছে। তুমি যদি আমাকে সব খুলে বলল, তা হলে আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা করে করে তোমার বড়দা-মেজদাও তো শেষ হয়ে যাচ্ছেন।

সুনীত হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, কী করে বলব! সে কথা তো কাউকে বলা বারণ। কাউকে বলামাত্রই সর্বনাশ নেমে আসবে। একটু থেমে তারপর ও .তবে যদি কেউ নিজে গিয়ে দেখে আসে তা হলে আলাদা কথা…।

প্রিয়নাথ বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইতস্তত করে বললেন, সুনীতের ফটোগ্রাফির শখ আছে। মাঝে-মাঝেই ও ফটো তোলার ঝেকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। মাসদুয়েক আগে ও সমস্তিপুরের দিকে গিয়েছিল। সঙ্গে ওর এক বন্ধু–পরেশ ছিল। কিন্তু রওনা হওয়ার পাঁচদিন পর পরেশ বাড়ি ফিরে আসে। কারণ, বাড়িতে এস. টি. ডি করে জানতে পেরেছিল ওর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুনীত ফিরে আসে তার ছদিন পরে। তারপর থেকেই ওর এই অসুখ। আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি–অথবা, বলতে চায়নি। শুধু নেহা আর সদরিয়া–এই দুটো শব্দ ওর ঘুম থেকে বারবার শুনতে পেয়েছি তার বেশি কিছু নয়।

বিনোদবাবু থামলেন।

সুনীত তখনও মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে বিনোদনারায়ণ উঠে ছোট ভাইয়ের কাছে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সুনীত মুখ তুলে তাকাল বড়দার দিকে। করুণ গলায় বলল, সেই ফটোটার কথা বললে না!

ওহ-হ্যাঁ। ওর তুলে আনা দুরিল ফটোগ্রাফের মধ্যে আটটি ছবি ব্ল্যাঙ্ক। মানে, ডেভেলাপ করে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে একটা ফটো উঠেছে ভারি অদ্ভুত। সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি...। বলে বিনোদনারায়ণ ঘরের একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেদিকে তাকালেন প্রিয়নাথ।

সুনীতের ঘরটা বেশ আধুনিক ধাঁচে শৌখিনভাবে সাজানো। দেওয়ালে সুন্দর তাক তৈরি করে টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, বই সুচারুভাবে রাখা। দুটো বইয়ের ফাঁক থেকে একটা খাম বের করে নিলেন বিনোদনারায়ণ। তারপর প্রিয়নাথের কাছে এগিয়ে এসে খামটা প্রিয়নাথের হাতে দিলেন।

খামের ভেতর থেকে একটা ফটো টেনে বের করলেন প্রিয়নাথ।

ফটোর সবটাই ঘোর কালো এবং নীল মেশানো একটা অন্ধকার। তারই মাঝে সরষের মাপের অনেকগুলো লাল ফুটকি এলোমেলো ভাবে ছড়ানো।

এই সাদামাঠা ফটোগ্রাফের কী মানে থাকতে পারে প্রিয়নাথ ভেবে পেলেন না।

বিনোদনারায়ণ বললেন, এই ছবিটার মধ্যে যে কী আছে কে জানে! এটা দেখলেই সুনীত ভীষণ ভয় পেয়ে আপসেট হয়ে যায়। ও কোথাও গিয়ে কোনও কিছুর নটা ছবি তুলেছিল। তার মধ্যে আটটা ব্ল্যাঙ্ক, আর ন নম্বরটা এই..।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথ সুনীতকে জিগ্যেস করলেন, এসব ছবি তুমি কোথায় গিয়ে তুলেছিলে?

সুনীতের বোধহয় ঘুম পাচ্ছিল। ও ঝিম ধরা চোখে প্রিয়নাথকে জরিপ করছিল। বোধহয় দেখতে চাইছিল ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথের কীরকম

প্রতিক্রিয়া হয়। সেরকম কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে একটু যেন হতাশই হল।

প্রিয়নাথের প্রশ্নে ও অস্পষ্ট গলায় বলল, সদরিয়া…নেহা…।

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ সিগারেটে টান দিয়ে গেলেন।

বিনোদনারায়ণ চুপচাপ খাটের কোণে বসে পড়লেন, প্রিয়নাথকে লক্ষ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রিয়নাথ মুখ খুললেন। গম্ভীর গলায় বললেন, সুনীত, তুমি বোধহয় বাঁচতে চাও না। নইলে সব কথা আমাকে অন্তত খুলে বলতে। আমি কথা দিচ্ছি–কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

সুনীত করুণ গলায় বলল, ওরা কাউকে বলতে বারণ করেছে। কাউকে বলা যাবে না। কাউকে না। কেউ যদি নিজে দেখে আসে…।

আমি যাব! জোরালো গলায় বললেন প্রিয়নাথ, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। ওদের কাউকে আমি ভয় পাই না।

আমি ভয় পাই…।

তুমি বলো কী করে সেখানে যেতে হয়।

জানি না। ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত, সদরিয়া…নেহা…।

প্রিয়নাথ হাতের ফটোটা সুনীতের চোখের সামনে মেলে ধরলেন : বলো, কী আছে এই ছবিতে? বলো!

চোখের পলকে সুনীতের মুখ আতঙ্কে ভেঙেচুরে গেল। ও বিশাল হাঁ করে ঘণ্টাদেড়েক আগের সেই হিমেল চিৎকার শুরু করল।

প্রিয়নাথদের কানে তালা লেগে গেল। ঘরের জানলার শার্সি ঝনঝন করে কাঁপতে লাগল। এক ভয়ংকর অনুনাদ ঘরের আবহাওয়াকে পাগল করে দিল।

বিনোদনারায়ণ লাফিয়ে উঠে ছোট ভাইকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তার তীব্র চোখ সারাক্ষণ সুনীতকে লক্ষ করছিল।

আয়ামাসি ভেজানো দরজা ঠেলে তাড়াহুড়ো করে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখে-চোখে উবেগ।

সুনীত হাঁফাচ্ছিল। ওর চোখ আধবোজা মতন হয়ে গেছে। বিনোদনারায়ণ ওকে ধীরে-ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মাসিকে লক্ষ করে বললেন, মাসি, আপনি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। আমরা যাচ্ছি।

প্রিয়নাথ আর বিনোদনারায়ণ সুনীতের ঘর ছেড়ে অলিন্দে বেরিয়ে এলেন। উজ্জ্বল আলো থেকে স্তিমিত আলোয় আসায় প্রিয়নাথের দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তিনি বিনোদনারায়ণকে। বললেন, ফটোগ্রাফটা আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি সুনীতের সঙ্গে কথা বলব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?

আপত্তি! মলিন আলোয় বিনোদনারায়ণের হাসিটা কেমন যেন দেখাল। নরম গলায় তিনি বললেন, সুনীতকে সুস্থ করে তোলার জন্যে কোনও কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

ওঁরা সিঁড়ি ঘুরে দোতলায় নেমে এসেছিলেন। তখনই কানে এল জড়ানো গলায় গান ও .কারণ সেবায় বারণ করো, জানতে পারি কারণটা কী…?

প্রমোদ। চাপা গলায় বললেন বিনোদবাবু, এসব নাকি ওর তন্ত্র সাধনার অঙ্গ। হুঁ!

প্রিয়নাথ কোনও কথা বললেন না।

রাত অনেক হল। চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।

প্রিয়নাথকে একতলার খাওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে চললেন বিনোদনারায়ণ।

জাফরির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, বাইরে অন্ধকার আর শীতের রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে।

.

টিনের বাক্স লাগানো সাইকেল-ভ্যান নিয়ে যারা পাঁউরুটি আর বিস্কুট দোকানে-দোকানে জোগান দেয় তাদের কথা মনে পড়ল প্রিয়নাথের। পাঁউরুটি আর বিস্কুটের বদলে যদি বেশ কিছু কাচের মার্বেল সেই বাক্সে ভরে ভ্যানটাকে সদ্য-ধান কাটা কোনও চাষ-জমির ওপর দিয়ে চালানো হয়, তা হলে যেরকম ঝাঁকুনি ও শব্দ হবে তার সঙ্গে এই বাসটার চলার দারুণ মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন তিনি।

সমস্তিপুরে নেমে সরু লাইনের ট্রেনে চড়ে পাঁচ ঘণ্টা পথ চলার পর তিনি নেমেছিলেন কানিতাল স্টেশনে। সেখান থেকে বাস ধরেছেন–তবে বাসটাকে দোমড়ানো-তোবড়ানো ক্যানেস্তারা বলাই ভালো। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ছুটে চলা বাসের শব্দ আর ঝাঁকুনি প্রিয়নাথকে প্রায় কাহিল করে দিচ্ছিল। যদিও বাসের নাম উড়ান খটোলা।

আশার কথা একটাই। এই বাস তাকে সদরিয়া নিয়ে যাবে। তারপর…সেখানে নেমে..খুঁজে বের করতে হবে নেহাকে।

জানলার বাইরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেছে। স্তিমিত রোদে ছুটে চলা গম-ভুট্টা জওয়ারের খেত আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সামান্য খোলা কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে ছুটে আসা বাতাস ক্রমে আরও ঠান্ডা হচ্ছিল। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন, মাফলারটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

ভিড়ে ঠাসা বাসের ভেতরে অনেক যাত্রীই বিড়ির নেশায় ব্যস্ত। বোধহয় নো স্মোকিং কথার নো-টা বাসের দেওয়াল থেকে মুছে গেছে বলে।

খানিক ইতস্তত করে অস্বস্তি কাটিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সুনীতনারায়ণের সমস্যার দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাৎই তার মাথার ভেতরে সুনীত হাড় কাঁপানো ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল।

আর প্রিয়নাথের সাতদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বসিরহাটের কথা। ঘোরালো প্যাঁচালো অলিন্দ আর সিঁড়িতে জট পাকানো প্রকাণ্ড বাড়িটার কথা।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রিয়নাথের চোখে ঘুম আসেনি।

দোতলায় একটা ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিছানায় বসে নোটবই আর পেন নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানান মন্তব্য লিখেছেন প্রিয়নাথ। সুনীতের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, বিনোদনারায়ণের কাছ থেকে শোনা কিছু জরুরি কথা, আর নিজের মতামত। সেইসঙ্গে লিখে নিয়েছেন, এরপর কী কী কাজ করতে হবে।

লেখা-টেখার কাজ শেষ হলে পর প্রিয়নাথ ঘর অন্ধকার করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে শুলে তার কেমন যেন দম আটকে আসে। তাই পায়ের দিকের একটা জানলার পাল্লা অর্ধেকটা খুলে রেখেছিলেন। সেটা নিশ্চয়ই পুব দিক কারণ, চাঁদের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছিল।

বহু চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না। বিছানায় উশখুশ করছিলেন। হঠাৎই জড়ানো গলায় গানের কলি শুনতে পেলেন নৃমুণ্ডমালিনী তারা / মুণ্ডমালা কোথায় পেলি..।

প্রমোদনারায়ণ। দোতলায় বাসিন্দা–প্রিয়নাথের প্রতিবেশী।

রাতের খাওয়ার সময় প্রমোদনারায়ণের দেখা পায়নি প্রিয়নাথ। এখন ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নিলে কেমন হয়!

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন চওড়া বারান্দার শেষ প্রান্তে, খানিকটা চাতাল মতো জায়গায়, একজন ছায়া-মানুষ বসে আছে। তার শরীর অন্ধকার আর চাঁদের আলোয় মাখামাখি।

পায়ে-পায়ে কাছে এগিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ। আলতো করে ডাকলেন, প্রমোদবাবু।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ।

একমুখ দাড়ি, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, কপালে লাল তিলক চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে। আর গভীর চোখদুটো নিশাচর প্রাণীর মতো অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরদিকে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ : ও, ভূতনাথবাবু! আসুন… বসুন। মায়ের চরণ ধোওয়া চাঁদের আলো…এর কোনও জবাব নেই।

চাতালে সতরঞ্জি পাতা ছিল। ভূতনাথ তার ওপরে বসে পড়লেন। খোলা জায়গায় বেশ শীত করছিল। গায়ের শাল আরও ঘন করে জড়িয়ে নিলেন।

অন্ধকারে বেশ কিছু গাছের মাথা আর দু-একটা বাড়ি চোখে পড়ছে। একটা প্যাচা নিঃশব্দে উড়ে গেল। কয়েকটা জোনাকি আলোর ফুটকি জ্বেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে পড়ে গেল সুনীতের ফটোটার কথা।

শীতের বাতাস যেমন-তেমন বইছিল। প্রিয়নাথের নাকে মদের গন্ধ ভেসে আসছিল।

শুনেছি, আপনি সুনুকে সারিয়ে তোলার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছেন। প্রমোদনারায়ণ কথা বললেন, আমিও ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু দাদা এমন ঝামেলা করে। কিছুতেই বোঝে না ধর্মকর্ম এক জিনিস আর তন্ত্র আর-এক জিনিস। আমার সাধনায় বারবার বিঘ্ন ঘটায়…। বেশ বিরক্তভাবে কথা শেষ করলেন প্রমোদবাবু।

প্রিয়নাথের কৌতূহল হল। ওঁকে জিগ্যেস করলেন, আপনি কীভাবে সুনীতকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন একটু বলবেন?

বললাম যে—তন্ত্র দিয়ে। সবাই জানে, তন্ত্রশাস্ত্র চিরন্তন—প্রত্যক্ষ ফল দেয়। তন্ত্র স্বয়ং মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। একে কেউ কখনও অবজ্ঞা করে! একটু থেমে প্রমোদনারায়ণ বললেন, সুনীতের জন্যে আমি ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র প্রয়োগ করেছি।

সেটা কী জিনিস?

চলুন—আমার ঘরে চলুন—দেখাচ্ছি।

প্রমোদনারায়ণ চাতাল ছেড়ে উঠে পড়লেন। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে-ভজতে ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে অনুসরণ করলেন।

ঘরটা যথেষ্ট প্রাচীন, আর মাপে বেশ বড়। মেঝে পর্যন্ত লম্বা-লম্বা জানলা। ঘরের সিলিং এ কড়ি-বরগা।

ঘরের দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আর ছক আঁকা। শিব ও কালীর বড়-বড় দুটো ফটো মালা দিয়ে সাজানো। ঘরের মেঝের এককোণে বইয়ের গাদা। তার পাশে চারটে তাকও বইয়ে ঠাসা।

ঘরের ডানদিক ঘেঁষে অগোছালো ময়লা বিছানা। বিছানার পাশে টেবিলে মদের বোতাল, গ্লাস, আর চশমা।

সব মিলিয়ে ঘরটায় কেমন যেন অগোছালো উজ্জ্বল ছাপ।

হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে প্রিয়নাথকে বসতে বললেন প্রমোদনারায়ণ। তারপর টেবিল থেকে চশমাটা চোখে দিয়ে খাটের তলায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

অবশেষে খুঁজে পেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার হাতে লাঠির মতো গোল করে পাকানো একটা কাগজ। সেটা ভূতনাথের সামনে মেলে ধরে বললেন, এই দেখুন–ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র।

ভূতনাথ দেখলেন, একটা ভূর্জপত্রে ছক কেটে কয়েকটা সংখ্যা লেখা।

প্রমোদনারায়ণ বললেন, দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে অষ্টগন্ধ দিয়ে লিখে রেখেছি। দাদাকে লুকিয়ে সুনীতের ঘরের দেওয়ালে খাটের নীচে সিঁদুর দিয়ে এই যন্ত্র লেখা আছে। এ ছাড়া শ্মশানে গিয়ে কিছু ক্রিয়াকর্ম করার চেষ্টা করছি। একটু-একটু কাজ হচ্ছে…আরও হবে। আসলে সুনু যে কোনওরকম হেল্প করছে না!

প্রমোদনারায়ণের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে প্রিয়নাথ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সেটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, আচ্ছা, সুনীত যে বারবার সদরিয়া আর

নেহা শব্দ দুটো বলছে, তার অর্থ কী?

প্রমোদবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল। ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে বললেন, আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি। তাতে আমার যা মনে হয়েছে, সদরিয়া কোনও জায়গার নামসমস্তিপুর থেকে যাওয়া যায়। আর নেহার ব্যাপারে জিগ্যেস করলে সুনু বলছে সেটা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে...বলা যাবে না।

রাতের আকাশে কুকুরের কাতর চিৎকার শোনা গেল।

প্রিয়নাথ চুপ করে ছিলেন। প্রমোদনারায়ণকে দেখছিলেন।

প্রমোদনারায়ণ বললেন, আপনি কাল সকালে ওকে একবার জিগ্যেস করে দেখুন। যদি নতুন কোনও তথ্য পান...। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না...।

শেষ কথাটা বলার সময় তন্ত্রসাধক মানুষটার গলা ভারী হয়ে এল। প্রিয়নাথ টের পেলেন, লোকে যা-ই বলুক না কেন, মানুষটার ভেতরে এখনও একটা স্নেহশীল মেজদা অবশিষ্ট আছে।

ওঁকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এলেন ভূতনাথ। বিছানার গা ঢেলে দিতেই ঘুম দু-চোখে আসন পেতে বসল। ঘুমের ঘোরে সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটাকে স্বপ্ন দেখলেন। তবে ফটোর লাল ফুটকিগুলো জোনাকির মতো জ্বলছিল-নিভছিল।

বাসের প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি প্রিয়নাথের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে দিল। কন্ডাক্টার দেহাতি ঢঙে হাঁক পাড়ল ও সদরিয়া! সদরিয়া!

সিট ছেয়ে উঠে বাঙ্ক থেকে সুটকেসটা নিলেন প্রিয়নাথ। প্রায় ধস্তাধস্তি করে ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে পড়লেন রুক্ষ রাস্তায়।

এটা যে সদরিয়া নয় সেটা প্রিয়নাথ খোঁজখবর করে অনেক আগেই জেনেছেন। তবে এখান থেকে টাঙ্গা পাওয়া যায়। টাঙ্গা নিয়ে যায় গণ্ডক নদীর পাড়ে। সেখান থেকে খেয়া পার হয়ে আবার টাঙ্গায় চড়ে বেশ খানিকটা গেলে তবে সদরিয়ার দেখা পাওয়া যাবে।

এতসব কাণ্ড করে প্রিয়নাথ যখন সদরিয়ার পা রাখলেন তখন অন্ধকার এবং শীত জাঁকিয়ে বসে পড়েছে। কুয়াশা ঠেলে একটা চায়ের দোকানে এসে

দাঁড়ালেন।

দোকানে ঢুকে উনুনের কাছাকাছি একটা ভাঙা কাঠের বেঞ্চে বসলেন প্রিয়নাথ। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে এক গ্লাস চা আর দুটো বিস্কুট দিতে বললেন।

প্রিয়নাথ দোকানে ঢোকামাত্রই দোকানের লোকজন কথাবার্তা থামিয়ে চুপ করে ওঁকে দেখছিল। প্রিয়নাথের চেহারা ও পোশাকে ভিনদেশি ভাব কটকট করছে। প্রিয়নাথের মনে হল, ওরা কেমন সতর্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। কোনও কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করছে।

ঠিক এইরকম সতর্ক দৃষ্টি সুনীতনারায়ণের চোখেও দেখেছেন প্রিয়নাথ। প্রমোদনারায়ণের সঙ্গে কথা বলার পরদিন সকালে সুনীতের ঘরে গিয়ে আর-এক দফা চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিরাট কিছু লাভ হয়নি। সদরিয়া আর নেহা শব্দ দুটো আলোচনায় এসে পড়তেই প্রিয়নাথ

জানতে চেয়েছেন, তুমি সদরিয়ায় গিয়েছিলে না?

হ-হ্যাঁ..মানে…।

কী করতে গিয়েছিলে? তীব্র স্বরে আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন ভূতনাথ।

ফ..ফটো তুলতে…ঘুরতে…। কেমন যেন ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত।

সমস্তিপুর থেকে সদরিয়া কেমন করে যেতে হয়?

হঠাৎই ভয় পেয়ে গেল সুনীত। ওর মুখটা চোখের পলকে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কাঁপা গলায় ও বলল, না, না–ওখানে যাইনি। ওখানে কেউ যায় না। আসল জায়গাটা আরও ভেতরে…কেউ সেখানে যায় না..আমাকে যেতে বারণ করেছে।

কে বারণ করেছে?

ভূতে পাওয়া মানুষের মতো কেঁপে উঠল সুনীত। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ওরা…ওরা বারণ করেছে। নেহা…নেহা…।

নেহা মানে কী? সুনীতের হাত চেপে ধরে ওর মুখের ওপরে একরকম ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ, কে নেহা? কী নেহা?

সুনীত মাথা নীচু করল। ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। গোঙানির স্বরে বলল, জানি না। আর কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন...প্লিজ...প্লিজ...।

প্রিয়নাথ ওর অনুনয় আর কান্নাকে পাত্তা দেননি। নাছোড়বান্দার মতো বলেছেন, তুমি কাকে ভয় পাচ্ছ? এখন তো দিনের অলো...এখন কীসের ভয়!

সুনীত কান্না থামিয়ে ভূতনাথের দিকে সরাসরি তাকিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বলেছে, না, এখন ভয় নেই। কিন্তু দিনের পর তো রাত আসবেই...তখন? তখন ওরাই সব...ওদের গোপন কথা আমি ফাস করতে পারব না। কেউ যদি নিজে থেকে জানতে পারে তা হলে ঠিক আছে। আমি কিছু বলতে পারব না।

এরপর সুনীত মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

এখন এই কুপির আলোয় বসে থাকা শীতে ঘেরা মানুষগুলোও যেন সুনীতের মতো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অপেক্ষা করছে।

ধোঁয়া ওঠা চায়ের গ্লাস প্রিয়নাথের হাতে এগিয়ে দিল দোকানদার সঙ্গে দুটো বিস্কুট। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দোকানদারের সঙ্গে একরকম জোর করেই আলাপ জুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ। এই শীতের রাতে একটা আশ্রয় না পেলে তিনি থাকবেন কোথায়!

বহু চেষ্টা করে যেটুকু জানা গেল তা হল ও রাতে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল। অচেনা মানুষকে কেউ এখানে আশ্রয় দেয় না। সেইজন্যই সন্ধের সময় বাঙালিবাবুকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। তবে এখনও সময় আছে। টাঙ্গা নিয়ে বাস-রাস্তায় গেলে সাতটার লাস্ট বাসটা ধরা যাবে। সেটাই বাবুজির ভালো হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পথে নামলেন প্রিয়নাথ। সুনীত কি এখানে সত্যিই এসেছিল? রাতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল ও? যদি রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পাওয়া যায়...।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রিয়নাথ কাঁচা সড়ক ধরে টাঙ্গা-স্ট্যান্ডের দিকে এগোচ্ছিলেন, হঠাৎই কানে এল মলের ছমছম শব্দ।

ঘুরে তাকালেন প্রিয়নাথ।

বছর তেরো-চোদ্দর একটি ফুটফুটে কিশোরী। পরনে ঘাগরা, চোলি, চাদর, ওড়না। পোশাক মলিন। তবে রূপ আছে। রাস্তার আলো কম কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটির রূপ আড়াল করা যায়নি।

প্রিয়নাথ নানা জটিল ভাবনায় ব্যস্ত ছিলেন। মেয়েটি ওঁর চোখে তাকিয়ে এমন সরল সুন্দরভাবে হাসল যে, সব দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

মেয়েটির বাঁ হাতে ঝুলছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বেড়ানো ক্যান। আর ডান হাতের মুঠোয় বোধহয় পয়সা।

ওর হাসিতে কেমন একটা ভরসা ছিল, প্রচ্ছন্ন আবাহনও ছিল যেন। হয়তো সেই কারণেই প্রিয়নাথ ওকে জিগ্যেস করে বসলেন এখানে রাতে থাকার কোনও জায়গা পাওয়া যাবে কি না।

প্রিয়নাথের জোড়াতালি দেওয়া ভাষা মেয়েটি দিব্যি বুঝতে পারল। মিষ্টি হেসে জবাব দিল, কিউ নহী! জরুর মিলবে। হামার ঘর হ্যায় উধর– আঙুল তুলে পশ্চিমদিকের অন্ধকার দেখাল মেয়েটি।

দুশ্চিন্তা নিমেষে মুছে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। ভ্রমণের ধকল তাঁকে মুহূর্তে যেন কাবু করে দিল।

মেয়েটি তাঁকে ডাকতেই প্রিয়নাথ ওর পিছু নিলেন।

মলিন আলোয় এবড়োখেবড়ো পথ ধরে শীত আর কুয়াশা ভেদ করে দুটি প্রাণী এগিয়ে চলল।

একটু এগোতেই রাস্তার আলো আর চোখে পড়ল না। ভাঙা চাঁদের ঘোলাটে আলোই একমাত্র ভরসা।

গোলকধাঁধার মত পথ ঘুরে-ঘুরে অবশেষে একটা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। আবছা আলো-আঁধারিতে বাড়িটাকে ভূতুড়ে অবয়ব বলে মনে হচ্ছিল।

যতটুকু বোঝা যায়, টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। বাড়ি ঘিরে উঠোন। উঠোনে বেশ কয়েকটা কলা গাছ, পেঁপে গাছ আর সুপুরি গাছ। উঠোনের একপাশে ধুনির আগুন ধিকধিক জ্বলছে। কুয়াশার স্তর ভেদ করে আগুনটাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

সামান্য বাতাস বইছিল। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে সরসর শব্দ হচ্ছিল।

প্রিয়নাথের মনে হল, ঘুমিয়ে নিথর একটা গাঁয়ের শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বাড়িটার চারপাশে অনেকটা করে কঁকা জমি। আর আলো বলতে মাথার ওপরে চাঁদ, আর বাড়ির একটা জানলা দিয়ে ভেসে আসা লণ্ঠনের আলো।

প্রিয়নাথের শীত করছিল। মাফলারটা আরও ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিলেন।

এই আমাদের ঘর, বাবুজি। মেয়েটি আলতো গলায় বলল।

প্রিয়নাথের হঠাৎই মনে হল, ওদের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন অথচ এখনও ঠিকমতো আলাপ করা হয়নি। মানে, মেয়েটির নামও জিগ্যেস করা হয়নি।

তোমার নাম কী? প্রিয়নাথ জানতে চাইলেন।

তার দিকে ঘাড় তুলে তাকিয়ে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, নেহা–নেহাকুমারী।

প্রিয়নাথ ওই শীতার্ত আঁধারে দাঁড়িয়ে সুনীতনারায়ণের ভয়ংকর চিৎকার শুনতে পেলেন। তার পা ফেলার ছন্দে গরমিল হয়ে গেল। সুটকেসটাও হাত থেকে পড়ে যেতে চাইছিল। সময়মতো সতর্ক না হলে সেটাকে সামাল দেওয়া যেত না।

কাঁচা উঠোন পেরিয়ে সামনের ঘরটায় ঢুকতেই উষ্ণতার ওম পেলেন প্রিয়নাথ। ঘরের হ্যারিকেনের আলোয় নেহাকে ভালো করে দেখলেন। এই মিষ্টি মেয়েটা কি সুনীতের ভয়ের কোনও হদিস দিতে পারবে।

ঘরে একটা ভাঙা চেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন। চাদর মুড়ি দেওয়া শরীরে শুধু মাথার সাদা চুল, সাদা গোঁফ, আর ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখ নজর টানে।

নেহা পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, ওর বাপুজি। তারপর দেহাতি ভাষায় ওর বাবাকে কী যেন বলল। উত্তরে বৃদ্ধ মানুষটি আলতো করে বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন।

নেহা প্রিয়নাথকে বসিয়ে ছুটে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরেই একজন বৃদ্ধা ও একজন তরুণকে একরকম হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। নেহার মা ও দাদা।

বৃদ্ধার মুখের চামড়ায় অকালে বড় বেশি ভাজ পড়েছে। তবে চোখ দুটোয় মায়ের মমতা মাখানো। নাকে রুপোর নোলক, কানে দুল। মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে।

নেহার দাদার রোগা কালো চেহারা। চোখ দুটো কেমন যেন শূন্য, দৃষ্টিহীন। কপালে লম্বা একটা কাটা দাগ। মাঝে-মাঝেই কেশে উঠছে–বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে।

একটা অদ্ভুত গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল। অনেকটা বুনো ফুলের গন্ধের মতো।

আলাপের পালা শেষ হলে নেহা প্রিয়নাথকে ভেতরদিকের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। বলল, এ-ঘরেই আপনি থাকবেন। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।

নেহা হাত-পা নেড়ে কথা বলছিল। ওর ভাষা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ওর অঙ্গভঙ্গি ভূতনাথকে বুঝতে সাহায্য করছিল। নেহার সঙ্গে আলাদা কথা বলার জন্য ভূতনাথের আর তর সইছিল না।

সুটকেস খুলে দরকারি জিনিসপত্র বের করে খাঁটিয়ার ওপরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসলেন ভূতনাথ। নেহার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই নেহা চা নিয়ে এল। প্রিয়নাথের হাতে চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে মেঝেতে চাটাই পেতে বসে পড়ল। বুনো ফুলের গন্ধটা আবার প্রিয়নাথের নাকে

এল।

বাবুজি এখানে কী কাজে এসেছেন?

এই একটু-আধটু ঘুরে বেড়াতে…ফটো তুলতে। একটু থেমে আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন প্রিয়নাথ, আচ্ছা, মাস দেড়-দুই আগে কোনও ছোকরা বাবু তোমাদের বাড়িতে এসেছিল? বাবুর খুব ফটো তোলার শখ ছিল…।

নেহা সরলভাবে জবাব দিল, হা, এসেছিল। বড় রাস্তায় এদিক-ওদিক ঘুরছিল, আমিই ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে দু-চারদিন ছিল। এখানে আনজান আদমিকে কেউ বাড়িতে থাকতে দেয় না। কিন্তু আমরা কোনও মেহমানকে কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে মেহমান আসে। আমি ডেকে নিয়ে আসি।

সেই ছেলেটির নাম কী ছিল? সুনীত? প্রিয়নাথ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাঢ় টান দিলেন।

নাম তো জানি না, বাবুজি। নেহা হাসল ফিক করে, বলল আপনার নামও কি জানি?

প্রিয়নাথ নিজের নাম বললেন। বললেন ফটো তোলার শখের কথা। তারপর শহরের টুকটাক গল্প শোনাতে লাগলেন। চা-সিগারেট শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎই গল্পের মাঝে লাফিয়ে উঠে পড়ল নেহা। বলল এখন যাই, বাবুজি। দেরি হয়ে গেছে।

ফুটফুটে প্রাণবন্ত কিশোরীটির মুখের দিকে তাকালেন প্রিয়নাথ। কীসের দেরি হয়ে গেছে। প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়ল।

নেহা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

একটু পরে থালা আর বাটিতে নিয়ে এল রুটি ও সব্জি। প্রিয়নাথের ডিনার।

মেঝেতে থালা-বাটি সাজিয়ে কসার গ্লাসে জল দিয়ে গেল নেহা। সঙ্গে একটা বাড়তি হ্যারিকেন। কিন্তু সেই আলোয় মলিন ঘরটা যেন আরও মলিন হয়ে উঠল।

প্রিয়নাথের অন্তত তাই মনে হল।

নেহা যাওয়ার আগে বলে গেল, খাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো দরজার বাইরে রেখে দিতে। আর বাবুজি যেন বাইরের উঠোনে গিয়ে হাত ধুয়ে নেন।

নেহা খুব ব্যস্তভাবে চলে গেল। বলল, এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন–আবার কাল দেখা হবে।

ঘড়িতে এখনও আটটা বাজেনি, অথচ শীত, অন্ধকার, আর নির্জনতা ঘড়ির কাঁটা যেন তিন-চার ঘণ্টা এগিয়ে দিয়েছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় এসে জুত করে বসলেন প্রিয়নাথ। একটা সিগারেট ধরালেন। হ্যারিকেন দুটো নিভু নিভু করে দিয়েছেন। ফলে সিগারেটের আগুনটাই বেশ জোরালো মনে হচ্ছে।

আষ্টেপৃষ্টে কম্বল মুড়ি দিয়ে নানান কথা ভাবছিলেন। দু-মাস আগে এখানে এসে সুনীত ঠিক কী কী করেছিল? প্রিয়নাথ কি এখন সেই ভূমিকায় হুবহু অভিনয় করে যাচ্ছেন? টিভিতে দেখা অ্যাকশন রিপ্লের মতো?

নেহাদের চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। ওরা কি এখনও শোয়নি? নেহা তা হলে অমন ব্যস্তভাবে চলে গেল কেন?

একটু পরে সিগারেট শেষ করে শুয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। ওঁর ক্লান্ত শরীর খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

.

ভোরবেলা বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল প্রিয়নাথের।

আড়মোড়া ভেঙে দিন শুরু করতে গিয়েই বেশ অবাক হয়ে গেলেন। নেহারা কেউ বাড়ি নেই।

ওরা চারজন এই সক্কালবেলায় গেল কোথায়!

গোটা বাড়িটাই চক্কর মেরে দেখলেন প্রিয়নাথ। কেউ কোথাও নেই! সব কটা দরজাই হাট করে খোলা। অথচ আসবাবপত্র, রান্নার জায়গা ইত্যাদি দেখলে মনে

হয় ওরা আবার যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে।

একাকাপ চায়ের জন্য মনটা আনচান করছিল। তাই মোটামুটি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রিয়নাথ। সঙ্গে নিলেন ক্যামেরা আর কম্পাস।

কুয়াশা কম থাকায় সূর্যের দাপট নেহাত মন্দ নয়। সামান্য ঘোলাটে দিনের আলোয় এলাকাটা আরও ভালো করে দেখলেন।

নেহাদের বাড়িটা বলতে গেলে একেবারে কঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে। চাষজমি আর পুকুর পেরিয়ে আরও যে-দু-চারটে বাড়ি চোখ পড়ে সেগুলোতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। আর দুরে তাকালে শুধু ধু-ধু মাঠ আর বড়-বড় গাছপালার দল। মনে হয় যেন নেহাদের বাড়িটাই লোকবসতির শেষ সীমানা।

প্রিয়নাথ আন্দাজে ভর করে এগোলেন। খানিক দূর গেলে হয়তো কাল রাতের ঘর-বাড়ি দোকানপাট চোখে পড়তে পারে।

পথে বেশ কয়েকটা ছবি তুললেন। পকেট থেকে কম্পাস বের করে মাঝে-মাঝেই উত্তরদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন। হঠাৎই দেখলেন, বেশ দূরে মেঠো পথ ধরে তিনজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করলেন। একটু পরেই ওদের ধরে ফেললেন। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। তার মধ্যে একজনের বয়েস এত কম যে, অনায়াসে মেয়ে বলা যায়। আর পুরুষটির হাতে একটা সুটকেস।

প্রিয়নাথ হাঁফাতে-হাঁফাতে পুরুষটিকে জিগ্যেস করলেন, কোনদিকে গেলে খাবার-দাবারের দোকানপাট পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

লোকটি প্রিয়নাথের পোশাক-আশাক চেহারা খুঁটিয়ে মেপে নিল। তারপর বলল, চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা টাঙ্গা-স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি–পথে দোকানপাট পড়বে!

মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে লোকটির সঙ্গে আলাপ করলেন প্রিয়নাথ।

ওর নাম মহাবীর সাউ। সঙ্গে ওর বউ অলাদেবী, আর ছোট মেয়ে হীরাকুমারী। ও দ্বারভাঙ্গার সিধৌলি গাঁয়ে থাকে। সদরিয়ায় এসেছিল বউয়ের জড়িবুটি

চিকিৎসার জন্য। এদিকে একজন ধন্বন্তরি সাধুবাবা বসেন, তার কাছে। ফেরার পথে লরিয়াসরাই-এ একটু কাজ সেরে ফিরবে–তাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছে।

মহাবীরের কাছ থেকে এদিকটার খুব একটা বিশদ খবর পাওয়া গেল না। তবে ও প্রিয়নাথকে একটা চায়ের দোকানে পৌঁছে দিল। প্রিয়নাথ ওদের তিনজনের ফটো তুললেন। ওরা হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

প্রিয়নাথ চায়ের দোকানে ঢুকে এক গ্লাস চা নিয়ে বসলেন। ঠিক করলেন, আজ সারাটা দিন নেহাদের সম্পর্কে, সুনীতের ব্যাপারে খোঁজ নেবেন। এখানকার মানুষজন কথাবার্তায় এত সহজ সরল, অথচ অচেনা মুসাফিরকে কিছুতেই আশ্রয় দেয় না। কেন? সে কি ভয়ে? তা হলে সবাই যে-ভয় পায় নেহারা সেই ভয় পায় না কেন! বরং নেহার কথা অনুযায়ী আমরা কোনও মেহমানকে। কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে…।

সারাটা বেলা নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছবি তুলে কাটালেন প্রিয়নাথ। কিন্তু তার অনুসন্ধান এতটুকুও এগোল না। নেহাদের কেউ চিনতেই পারল না। ওদের বাড়িটা কোন দিকে সেটা আন্দাজ করে বলা সত্ত্বেও কোনও লাভ হল না। সবাই ঠোঁট উলটে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, আর প্রিয়নাথকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

সুতরাং, একরকম ব্যর্থ হয়েই, বেলা দেড়টা নাগাদ নেহাদের বাড়িতে ফিরলেন প্রিয়নাথ। তবে ফেরার কাজটা মোটেও সহজ হয়নি। বহু লোককে জিগ্যেস করে নানান গাছ আর বাড়ির নিশানা দেখে অবশেষে ফিরতে পেরেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য! নেহাদের বাড়িটা সেই সকালের মতোই একা-একা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা প্রিয়নাথ পথেই সেরে এসেছিলেন। এখন কোনওমতে স্নান সেরে নিয়ে নিজের ঘরে আস্তানা গাড়লেন। নোটবই বের করে তাতে আধঘণ্টা ধরে নানারকম মন্তব্য লিখলেন।

প্রিয়নাথ যখনই কোনও অভিযানে বেরোন তখনই সঙ্গে নেন তার বিশেষ সরঞ্জামের থলে। এবারও সেটা সঙ্গে এনেছেন। তাতে আছে ক্যামেরা, টর্চ, প্রচুর

ব্যাটারি, মোমবাতি, মার্কার, থার্মোমিটার, কম্পাস আর পেন্ডুলাম।

হঠাৎ কী মনে হওয়াতে সুটকেস খুলে থলে থেকে পেন্ডুলামটা বের করে নিলেন। সুতো ধরে ঝুলিয়ে ওটাকে দোলাতে লাগলেন। দুলুনিটা সামান্য এলোমেলো হচ্ছে বলে প্রিয়নাথের মনে হল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল। ঠান্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল।

প্রিয়নাথ পেন্ডুলামটা রেখে দিলেন। দরজা বন্ধ করে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন খাঁটিয়ায়। মনে-মনে ঠিক করলেন, এখানে দু-একদিনের বেশি আর থাকবেন না। সুনীতের ভয় পাওয়ার রহস্যের কাছে হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হবে।

.

সন্ধের আঁধার নেমে আসতেই প্রিয়নাথ হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়েছেন। মনে-মনে ভেবেছেন, নেহারা যদি নিতান্তই আর না ফেরে তা হলে ওদের রান্নার জায়গা হাতড়ে যা পাবেন তাই দুটো মুখে গুঁজে দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। তারপর ভোর হলেই মহাবীরের চিনিয়ে দেওয়া পথ ধরে সোজা চম্পট।

কিন্তু তার আর দরকার হল না।

সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ নেহাদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

বেশ অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবেন, তার আগেই চঞ্চল পায়ে নেহা ঘরে এসে ঢুকল।

বাবুজি, ভালো আছেন। ওর মুখে সেই একই নিষ্পাপ হাসি।

তোমরা হুট করে কোথায় চলে গিয়েছিলে!

মাথা নীচু করল নেহা। তারপর অপরাধীর চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবুজি, রাগ করবেন না। রোজ আমাদের ওরকম চলে যেতে হয়। রাত পেরোনোর আগেই আমরা চলে যাই…আবার অন্ধেরা নেমে এলে ফিরে আসি।

কোথায় যাও? কী দরকার সেখানে, যে রোজ যেতে হয়! প্রিয়নাথ একটু যেন বিরক্তই হলেন।

আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি। এসে সব বলছি–। বেণী দুলিয়ে নেহা চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরেই নেহা ফিরে এল। হাতে গরম চায়ের গ্লাস।

প্রিয়নাথের হাতে গ্লাসটা দিয়ে কাল রাতের মতোই মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর খানিকটা যেন বিষণ্ণ গলায় বলল, রোজ আমাদের যেতে হয়, বাবুজি। কেন যেতে হয় সেটা..আপনি আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন?

নেহার প্রস্তাবটা এত আচমকা এল যে, প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

নেহা আপনমনে বিড়বিড় করে বলে চলল, আমাদের বাড়িতে যেসব মেহমান আসে তাদের আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই। আমরা…ওখানে গেলে আপনি ফোটো খিচতে পারবেন। শেষ কথাটা নেহা বেশ উৎফুল্ল ঢঙে বলল। উৎসাহ নিয়ে তাকাল ভূতনাথের দিকে।

প্রিয়নাথের মধ্যে কেমন একটা মরিয়া ভাব জেগে উঠেছিল। তিনি ঠান্ডা গলায় বললেন,

সুনীতবাবু তোমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন…ছবি তুলতে…।

হ্যাঁ, গিয়েছিলেন। ঘাড় নেড়ে বলল নেহা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, ওই বাবুর নাম তো জানি না।

আমি আজ তোমাদের সঙ্গে যাব।

চাটাই ছেড়ে উঠে পড়ল নেহা। খুশির গলায় বলল, যাই, মা আর পিতাজিকে বলে আসি। রাতে আপনার খাওয়া হলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে গাঢ় আঁধার ও শীতের মধ্যে প্রিয়নাথ যখন ওদের সঙ্গে বেরোলেন তখন রাত সাড়ে নটা।

শীতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রিয়নাথের চেহারা মাপে প্রায় সুমো যোদ্ধাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। সঙ্গের ঝোলা ব্যাগে ক্যামেরা ছাড়াও নিয়েছেন, টর্চ, টর্চের ব্যাটারি, কম্পাস, থার্মোমিটার আর পেন্ডুলাম।

অন্ধকারে কুয়াশা ভেদ করে আরও অন্ধকার পাঁচটা ছায়া এগোচ্ছিল। সকলের আগে প্রিয়নাথ আর নেহা। পিছনে বাকি তিনজন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। যেন শবানুগমনে চলেছে সবাই।

প্রিয়নাথ হঠাৎই হোঁচট খেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে টর্চ জ্বাললেন। নেহা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আলো নিভিয়ে দিন, বাবুজি। আমি আপনার হাত ধরছি।

অন্ধকারে প্রিয়নাথের হাত ধরল নেহা।

স্পর্শে সম্মোহন করা যায় কি না প্রিয়নাথ জানেন না। আর প্রিয়নাথের যেরকম মন এবং বয়েস তাতে কিশোরী নেহাকে নিয়ে কোনওরকম অন্যায় কল্পনা তাঁর কাছে নেহাতই হাস্যকর। কিন্তু তবুও কোনও এক রহস্যময় কারণে নেহার হাত ছুঁতেই প্রিয়নাথ কেমন এক অলৌকিক ভরসা পেলেন।

আকাশ মেঘলা, চঁদ দেখা যাচ্ছে না। প্রিয়নাথদের ঘিরে রেখেছে গাঢ় কুয়াশার স্তর। বেশি দূর নজর চলে না। ঠান্ডা বাতাস যেন বাতাস নয় বরফ। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের ওপরে শাল জড়িয়েছেন। সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন শরীরে। আড়ষ্টভাবে সাবধানে পা ফেলছেন। অথচ নেহার চলা কত সহজ-স্বাভাবিক! এ-পথ নিশ্চয়ই ওর অনেক চেনা।

বেশ কিছুক্ষণ পথ হাঁটার পর প্রিয়নাথের সময়, দিক, সবই গুলিয়ে গেল। অকারণেই একটা ভয় তার মনের ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইল। তিনি লড়াই করে সেটাকে চৌকাঠের বাইরে আটকে রাখলেন।

সেইরকম একটা মনের অবস্থাতেই তিনি চাপা গলায় নেহাকে জিগ্যেস করলেন, নেহা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

একটু পরেই দেখতে পাবেন নেহা এত অস্পষ্ট গলায় কথাটা বলল যে, বেশ চেষ্টা করে ওর কথা শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর নেহা আবার কথা বলল।

যেখান দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, বহত দিন পহেলে এখানে একটা গ্রাম ছিল। সে-গাঁয়ের নাম ছিল তিনকাহানি। তিনকাহানির শেষে ছিল বড় বড় মাঠ, খেত। তারপরে সদরিয়া। তিনকাহানি আর সদরিয়ার বর্ডারে আমরা থাকতাম…।

থাকতাম! তার মানে!

নেহা! প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন। নেহার হাতটা হঠাৎই শীতের চেয়েও ঠান্ডা মনে হল।

ভয় পাবেন না, বাবুজি। বলেই নেহা প্রিয়নাথের হাতটা ছেড়ে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওর ছায়া-শরীরটা কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

নেহা! প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন আবার। পিছন ফিরে তাকালেন।

যে-তিনজন এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে ওঁদের অনুসরণ করছিল তারা কেউ নেই। সেখানে শুধুই কুয়াশা।

প্রিয়নাথ টর্চ জ্বাললেন। সেই আলোয় কম্পাসটা বের করে দেখলেন। উত্তরমুখী কাটা দক্ষিণদিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে!

আলোটা নিভিয়ে দিন, বাবুজি।

নেহার গলা!

হতবুদ্ধি প্রিয়নাথ টর্চ নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু চারপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না।

টর্চ আর কম্পাস ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতেই নেহা আবার কথা বলল।

দাঁড়াবেন না, বাবুজি, চলুন–আমি আপনার পাশে-পাশেই আছি।

তোমার পিতাজি-মাজি ওঁরা কোথায় গেলেন?

অন্ধকার ভেদ করে নেহার গলা ভেসে এলঃ ওঁরা এগিয়ে গেলেন। একটু পরে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব।

আন্দাজে ভর করে পা ফেলতে লাগলেন প্রিয়নাথ। তিনি পোড়খাওয়া মানুষ। তা সত্ত্বেও বেশ নাড়া খেয়ে গেছেন। সুনীতনারায়ণের বয়েস অনেক কম। ওর অবস্থাটা কী হয়েছিল তিনি সেটা মনে-মনে আঁচ করার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎই শীতটা যেন বেড়ে গেল। সামনেই দেখা গেল একটা বিশাল পুকুর। এই গাঢ় আঁধারেও জলের কোথাও কোথাও প্রতিফলন চোখে পড়ছে। বাকি অংশটা এক অদ্ভুত কুয়াশার ঢাকা।

পুকুরটা পেরোতেই কুয়াশা যেন ফিকে হয়ে এল। কয়েকটা ছোট-বড় গাছ চোখে পড়ল প্রিয়নাথের। গাছগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছে। অথচ বাতাস তেমন জোরে বইছে না। আর তখনই গাছের ওপরে গাঢ় আকাশে একটা নীল আভা দেখতে পেলেন প্রিয়নাথ। অনেকটা মা কালীর গায়ের গাঢ় নীল রঙের মতো।

নেহা! ডেকে উঠলেন প্রিয়নাথ।

আমি আপনার পাশে আছি, বাবুজি। কেমন যেন ব্যথা পাওয়া গলায় নেহা বলল। মনে হল, ওর ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময় একটা গুনগুন শব্দ শোনা গেল। যেন অনেকে মিলে চাপা গলায় সুর করে গান গাইছে।

খুব নীচু পরদায় শুরু হয়ে সেই সমবেত গান উঁচু পরদায় উঠতে শুরু করল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও প্রিয়নাথ সেই অদ্ভুত ভাষার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তবে সেই কোরাস ক্রমশ আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলছিল।

হঠাৎই সামনে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ।

দূরের মাঝারি গাছের মাঝে কোথা থেকে এসে যেন হাজির হয়েছে প্রকাণ্ড এক মহীরুহ। তার ঝাকড়া মাথা থেকে অসংখ্য ঝুরি নেমে এসেছে মাটিতে। কেমন অদ্ভুতভাবে হেলে গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর গাছের অন্ধকার শরীরে জোনাকির মতো জ্বলছে অসংখ্য লাল আলো বিন্দু।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করলেন প্রিয়নাথ। অদ্ভুত গাছটা তাক করে শাটার টিপলেন। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটার কথা। এই সেই ফটোর রহস্য! কিন্তু এই গাছ দেখে ভয় পাওয়ার কী আছে!

ক্যামেরা ব্যাগে রাখতেই অদৃশ্য নেহার গলা শোনা গেল : ছবি দেখে সবকুছ মালুম হবে না, বাবুজি। আরও নজদিক চলুন।

সম্মোহিতের মতো এগোতে লাগলেন প্রিয়নাথ। হঠাৎই একটা বাতাসের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেলেন যেন। বরফের মতো বাতাস তাকে ঘিরে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল। প্রিয়নাথের হাত-পা ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যেন বুঝতে পারলেন, এখানে কম্পাস বা পেন্ডুলাম বের করে কোনও লাভ নেই। তিনি এক অন্য ঠিকানায় পা রেখেছেন।

কোরাস গান এখনও বেশ জোরালো ঢঙে শোনা যাচ্ছিল। উঠছে, নামছে। যেন কয়েকশো মানুষ প্রাণপণে গলা মিলিয়ে সুর ধরেছে। সঙ্গে কোনও যন্ত্র-অনুষঙ্গ নেই।

হঠাৎই আকাশের নীল আভাটা নেমে এল সেই অলৌকিক গাছের গায়ে। আর তখনই প্রিয়নাথ–এতক্ষণ যা দেখতে পাননি তাই দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথের হাত-পা অবশ হয়ে এল। ভয়ংকর শীতেও কুলকুল করে ঘেমে গেলেন। ভয়ে চিৎকার করার জন্য হাঁ করলেন, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না।

অসংখ্য মানুষ জড়াজড়ি করে গাছটা তৈরি করেছে। গাছের ডালপালা নিছকই ওদের হাত পা। নেমে আসা ঝুরি ওদের হাত, হাতের বাঁকানো আঙুল, মহিলাদের লম্বা ঝুলে পড়া চুল। উল দিয়ে বোনা সেয়েটারের মতো ওরা নিজেদের শরীর দিয়ে বুনে ফেলেছে এই প্রকাণ্ড গাছ। ওদের সমবেত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে গাছটা ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে। আর হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাসের ঝড় উঠছে। সেই ঝড়ে প্রিয়নাথের চাদর উড়ছে, চুল উড়ছে।

মানুষগুলোর চোখের কোটরে ভয়ংকর তীব্র এক লাল আলো জ্বলছে–যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। এই চোখগুলোকেই দূর থেকে লাল আলোর বিন্দু বলে মনে হচ্ছিল। সুনীতের তোলা ফটোয় যেমন উঠেছে।

প্রিয়নাথ কখনও ভয়ের এত কাছাকাছি আসেননি। তার শরীরের ভেতরটা কেমন করছিল। মাথা টলে যেতে চাইছিল বারবার।

কোরাস আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে গাঢ় নীল আলোর আভা, আর তার মাঝে উজ্জ্বল লাল বিন্দুর ঝাঁক যেন

অলৌকিক এক সম্মোহন।

বহুদূর থেকে ভেসে এল নেহার গলা : গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল, বাবুজি। তাতে তিনকাহানির সবাই খতম হয়ে গেল। সব কাহানি খতম হয়ে গেল। সে বহত সাল পহেলে কি বাত। তারপর থেকে আমরা…ওই গাছেই একজোট হয়ে থাকি। রোজ রাতে এসে এই গাছটা আমরা তৈরি করি। দিনের বেলা আমাদের কেউ দেখতে পায় না। আর, রাতে আমরা ইচ্ছেমতন কাউকে দেখা দিই, কাউকে দিই না। মেহমানদের সেবা করতে আমরা ভালোবাসি। তাই পরদেশিবাবুদের মদদ করি, দেখা দিই। আমরা যে রাতে এখানে এসে এমন করে থাকি সেকথা কাউকে বোলো না, বাবুজি। কিসিকো নহি বাতানা…।

সমবেত কণ্ঠস্বর নেহার কথার সুর মিলিয়ে ফিশফিশে গলায় বলে উঠল, কিসিকো নহি বাতানা…কিসিকো নহি বাতানা…।

সে কথায় অলৌকিক শব্দের ঝড় বয়ে গেল যেন।

আমি এবার ওখানে যাই, বাবুজি? আমার মাজি, পিতাজি, বড়ে ভাইয়া, সবাই ওখানে ডালপালা হয়ে আছে। আমি যাই? ফির কভি মিলেঙ্গে…ফির কভি মিলেঙ্গে…।

ফিশফিশে কোরাস আকাশ-বাতাস মাতিয়ে বলে উঠল, ফির কভি মিলেঙ্গে..ফির কভি মিলেঙ্গে…।

প্রিয়নাথ আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর দমবন্ধ হয়ে যেতে চাইছিল, কোনও ইন্দ্রিয়ই যেন আর কাজ করছিল না। সেই অবস্থায় তিনি যে কেমন করে ছুটতে শুরু করলেন কে জানে!

দিগভ্রান্ত অবস্থায় পাগলের মতো ছুটছিলেন। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন। কখনও ধাক্কা খাচ্ছিলেন গাছের গুঁড়িতে। চশমা ছিটকে পড়ল কোথায়। হাতঘড়িটাও বোধহয় ভেঙে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন সদরিয়ায়।

সমস্তিপুর থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফেরার সময় প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, এবার সুনীতনারায়ণকে সারিয়ে তোলার কাজ অনেক সহজ হবে।

# ভূতনাথের ডায়েরি : অন্ধকারে, হাতে হাত রেখে

আমার নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার। বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেইখান থেকে আমার কৌতূহল ও আগ্রহের শুরু। ছোটবেলা থেকেই ভূতে আমার ভীষণ ভয়। অশরীরী, অলৌকিক, ভূত, প্রেত, পিশাচ আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিত। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যখনই এ-জাতীয় কোনও কাহিনি শুনতাম তখনই খুব ভয় পেতাম। পরে, বড় হয়ে, কাঠমাণ্ডুর এক সন্ন্যাসীর পরামর্শে আমি ভুত-প্রেতের ভয় কাটানোর জন্য অভিনব এক পথ ধরি : ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়াননা।

সুতরাং সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস থেকেই আমার ভুতচর্চার কাজ শুরু হয়েছে। আজ, এই পরিণত বয়েসে এসেও সে-কাজ থামেনি। এই তিন যুগ সময়ে কখন যেন আমার নাম প্রিয়নাথ এর বদলে ভুতনাথ হয়ে গেছে। সমবয়েসি বা গুরুজনরা সামনেই ভুতনাথ বলে ডাকেন। আর, ছোট যারা, তারা সাধারণত বলে আড়ালে। তাতে আমি কিছু মনে করি না। বরং বেশ মজা পাই।

প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ধরে ভুত-প্রেত, অশরীরী-অলৌকিক নিয়ে আমার কম অভিজ্ঞতা হল না। তা ছাড়া ভুত-প্রেতের বহু কাহিনিও আমি শুনেছি। সেইসব অভিজ্ঞতা ও কাহিনি আমি যত্ন করে লিখে রেখেছি বারোটা মোটা মোটা বাঁধানো খাতায়–অনেকটা ডায়েরির মতন। মাঝে মাঝে সেই খাতাগুলোর পাতা উলটে স্মৃতিচারণ করি।

সম্প্রতি আমার আলাপ হয় এক কলমচির সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, তিনি নাকি বানিয়ে বানিয়ে ভুতের গল্প লেখেন। তখন আমি হেসে আমার খাতাগুলোর কথা তাঁকে বলি। শুনে তাঁর উৎসাহ দ্যাখে কে! আমার মিনমিনে ওজর-আপত্তি

অগ্রাহ্য করে তিনি খাতাগুলো নিয়ে যান। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ডায়েরির লেখাগুলো ঘষে-মেজে কল্পনার প্রলেপ দিয়ে সামান্য রদবদল করে একে-একে আমি লিখব। আপনার কোনও আপত্তি শুনব না।

ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তাই একরকম স্নেহের বশেই তাঁকে আমি অনুমতি দিয়েছি। আমার ডায়েরির পৃষ্ঠায় কাহিনিগুলোকে বন্দি না রেখে সকলের সামনে প্রকাশ করলে ক্ষতি কী!

.

## ভূতনাথের ডায়েরি : অন্ধকারে, হাতে হাত রেখে

প্ল্যানচেট শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল জানি না, তবে তাকে আমি দোষ দিতে চাই না। কারণ সে-রাতে শেষ পর্যন্ত যা হয়েছিল তার জন্যে আমরা কেউই দায়ী ছিলাম না। দায়ী ছিল একমাত্র নিয়তি।

ঘটনার শুরু সায়েন্স কলেজের ক্যান্টিনের আড্ডা থেকে।

পি-কে-সি-র ক্লাস কেটে আমরা পাঁচজন চায়ের কাপ সামনে রেখে টাইটানিক নিয়ে তুমুল তর্ক করছিলাম। বিষয় ছিল কেট উইনস্লেট বেশি সুন্দর দেখতে, না মাধুরী দীক্ষিত।

হঠাৎই রমেশ তিওয়ারি বলে উঠল, পরশু আমি জুমেলিয়াকে স্বপ্নে দেখেছি।

আমাদের আড্ডা ঝুপ করে থেমে গেল। সবাই চুপ।

কারণ জুমেলিয়া তিনমাস আগে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

ও আমাদের সঙ্গেই পড়ত। মাস তিনেক আগে আমরা, মানে বি. টেক, থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা, শৌনকদের মাইকেলনগরের বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। দলে আমরা মোট সতেরোজন ছিলাম। পিকনিকটা ছিল একেবারেই আমাদের নিজেদের ব্যাপারফলে কোনও স্যার-ট্যার সঙ্গে যাননি। শীতের ছুটির দিনটা আমাদের দারুণ কেটেছিল।

তা ছাড়া শৌনকদের বাগানবাড়িটাও ছিল চমৎকার। বিশাল গাছ-গাছালির বাগান, আর তার সঙ্গে প্রকাণ্ড মাপের দোতলা বাড়ি। কলকাতার যে-নির্জনতার দেখা পাওয়াই ভার, এখানে তাকে দ্যাখে কে! তাই হারিয়ে যাওয়ার কোনও মানা ছিল না। জোড়ায় জোড়ায় অনেকে হারিয়েও গেছি।

দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে দুটি কারণে।

সেদিন আমি সুছন্দাকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম।

আর, ফেরার সময় যশোর রোডের ওপর জুমেলিয়া অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়।

সেদিন ওর সিগারেট খাওয়ার ঝোঁক চেপেছিল। একে তো পিকনিকে হুল্লোড় করে এক দু-পেগ খেয়ে একটু টিপসি ছিল, তার ওপর জেদি–তাই ফেরার পথে জেদ ধরল এক্ষুনি ওর ক্লাসিক সিগারেট চাই।

আমাদের কারও সঙ্গে ক্লাসিক ছিল না। আমরা অন্য ব্র্যান্ড ওকে দিতে চাইলাম। কিন্তু ওর সেই এক কথা, আমার বাপি ক্লাসিক ছাড়া খায় না–আমারও ওই চাই–রাইট নাউ। সো স্টপ দ্য ব্লাডি বাস।

বাস থামিয়ে জুমেলিয়া একা-একাই নেমে পড়েছিল। রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল একটা পান সিগারেটের দোকানে। তারপর ফেরার সময় একটা ট্রাক ওর সিগারেট খাওয়ার সাধ চিরজীবনের মতো শেষ করে দিল।

জুমেলিয়ার সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বাপ্পাদিত্যর ইয়ে আছে। কিন্তু বাপ্পা নিজেও সেদিন একটু আধটু আউট ছিল। তার ওপরে জুমেলিয়া হল বড়লোক বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে–আদুরে এবং জেদি। সুতরাং ওর ভবিতব্য কেউ বদলাতে পারেনি।

নির্জন শীতের রাস্তায় সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের সাঙ্ঘাতিক এক ধাক্কা দিয়েছিল। আমরা পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

বাপ্পাদিত্য প্রায় দুমাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনওরকমে সামলে উঠেছে। এখনও ও প্রায়ই আনমনা হয়ে পড়ে, ক্লাসের পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। সবকিছু ভীষণ ভুলে যায়। অথচ ও পড়াশোনায় দারুণ ছিল। বি.

টেক. পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু মিলিয়ে ওর র‍্যাঙ্ক সেকেন্ড। জানি না, ফাইনাল ইয়ারে কীরকম রেজাল্ট করবে।

জুমেলিয়ার থেঁতলানো দেহটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। ওর ফরসা সুন্দর মুখটা অটুট ছিল। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওর মুখ দেখে মনেই হয়নি ও আর নেই। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। অপলক দু-চোখে অনেক সাধ ও স্বপ্ন। আর ঠোঁটের বাঁদিকে ছোট্ট কালো জড়ুলটা বরাবরের মতোই সুন্দর। বাপ্পা ওই জড়ুলটার জন্যে পাগল ছিল।

আমরা পাঁচজনই সেই পিকনিকে ছিলাম। আমি, বাপ্পা, রমেশ তিওয়ারি, শৌনক, আর ঐন্দ্রিলা।

রমেশের কাণ্ডজ্ঞান বেশ কম। যখন যা মনে হয় হুটহাট করে বলে দেয়। যেমন, এখন। বাপ্পার অবস্থা জেনেশুনেও ও ফস করে জুমেলিয়ার কথা তুলে বসল। তা ছাড়া, আমরা অনেকেই জানি, জুমেলিয়ার ব্যাপারে তিওয়ারির ইন্টারেস্ট ছিল। ভালো করে বাংলা শেখার জন্যে ও আমাকে আড়ালে বহুবার ধরেছে। বলেছে, রঙ্গন, ইয়ার আমাকে দো-তিন বাংলা লাভ ডায়লগ শিখিয়ে দে।

আমি হেসে জানতে চেয়েছি, কেন? কোথায় অ্যাপ্লাই করবি?

জুমেলিয়ার কথা তিওয়ারি আর বলতে পারেনি। কারণ ও জানত, বাপ্পাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। এমনকী ঐন্দ্রিলাও বাপ্পাকে মনে-মনে চাইত। পরে শৌনকের সঙ্গে রিলেশান হয়।

তিওয়ারি জুমেলিয়ার কথা বলামাত্রই আমাদের আলোচনার বিষয় পালটে গেল। আলোচনা শুরু হল পিকনিক আর জুমিকে নিয়ে।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে-মনে চাইছিলাম এ-আলোচনা বন্ধ হোক, কিন্তু তা হয়নি। ধাপে-ধাপে আলোচনা পৌঁছে গেল আত্মা, প্রেতাত্মা, প্ল্যানচেট, সিয়াস, প্রেতচক্র, এইসবের দিকে। তবে প্ল্যানচেট শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল তা আমার মনে নেই।

ঐন্দ্রিলা এক চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে বলল, আমার বড়জেঠু ছোটবেলায় খুব প্ল্যানচেট করতেন। নামকরা লোকদের নাকি ডেকে আনতেন।

একবার নাথুরাম গড়সে-কে ডেকেছিলেন। তখন অন্ধকার ঘরের মধ্যে গুলির শব্দ শুনেছিলাম।

শৌনক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, যত্ত সব লাটাই-ঘুড়ি! আর-একটু তোল্লাই দিলেই বলবি মহাত্মা গান্ধীর হা রাম! কথাটাও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।

ঐন্দ্রিলা রীতিমতো খেপে গিয়ে বলে উঠল, প্ল্যানচেটের তুই কী বুঝবি! তোর কাছে তো সবকিছু ট্যান হয়ে বেরিয়ে যায়।

আমি ওদের শান্ত করার জন্যে বললাম, তোরা যা-ই বল, প্ল্যানচেট ব্যাপারটা বোধহয় একেবারে বোগাস নয়। আমি একজনকে জানি...। ।

বাপ্পা আমাকে বাধা দিল? আমি জুমিকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। কিছুতেই ওকে ভুলতে পারছি না।

কথা বলতে বলতেই বাপ্পা মাথা নীচু করল, চোখ বুজে চোখের কোণ আঙুলে টিপে ধরল। ওর পিঠটা বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না যে, বাপ্পা কাঁদছে।

ঐন্দ্রিলা বাপ্পার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, বিষণ্ণ গলায় বলল, অন্য কথা ভাবার চেষ্টা কর। জুমি তো আর নেই। ওর কথা ভেবে শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছিস।

আমি আর শৌনক বাপ্পাকে বোঝাতে লাগলাম। ওর মনটা বড় নরম আর সাদাসিধে– ঠিক কচি কলাপাতার মতো–অল্পেতেই আঁচড় পড়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর বাপ্পা নিজেকে সামলে নিয়ে ভারী গলায় বলল, আমার কপালটাই খারাপ। জুমিকে যদি একটিবার দেখতে পেতাম!

শৌনক আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎই ও ক্যান্টিনের বেঞ্চি ছেড়ে উঠে এল বাপ্পার খুব কাছে। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

বাপ্পা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। আমরাও খানিকটা বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম শৌনকের চোখে।

শৌনক আবার বলল, একটা কথা তোকে জিগ্যেস করব?

কী কথা? বাপ্পা জানতে চাইল।

জুমেলিয়াকে একবার দেখতে পেলেই তোর সাধ মিটবে?

বাপ্পা অস্বাভাবিক ঝটকায় মাথা কঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রমেশ এতক্ষণ গোবেচারাভাবে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, এইবার বলে উঠল, ক্যায়সে দেখা যাবে?

আমি আর ঐন্দ্রিলাও মুখে-চোখে একই প্রশ্ন ফুটিয়ে চেয়ে রইলাম শৌনকের দিকে।

শৌনক বাপ্পাকে আড়াল করে ঐন্দ্রিলার দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রের হাসি হাসল। তারপর বলল, আমরা পাঁচজন মিলে প্ল্যানচেটে বসব। ঐন্দ্রিলা মিডিয়াম হবে। জুমেলিয়ার সঙ্গে ওর ভালোরকম দোস্তি ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, প্ল্যানচেটে জুমেলিয়া দেখা দেবে।

আমি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু আগেই যে প্রেতচক্র নিয়ে ঐন্দ্রিলাকে ঠাট্টা তামাসা করে নাজেহাল করছিল সে হঠাৎ সিরিয়াসলি প্রেতচক্রের কথা ভাবছে! আর শুধু তাই নয়, জুমেলিয়া যে দেখা দেবে সে-কথাও প্রায় নিশ্চিতভাবে বলছে!

আমি ইতস্তত করে বললাম, আমি ওতে নেই। প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার ফান্ডা নেই।

তিওয়ারি বলল, রঙ্গন, তুই বেকার ঘাবড়াচ্ছিস। ভূতে আমার জবরদস্ত ফান্ডা আছে।

পৃথিবীতে হেন কোনও বিষয় নেই যাতে রমেশ তিওয়ারির ফান্ডা নেই। সাধে কি আমরা ওকে ফান্ডামেন্টাল তিওয়ারি বলে খ্যাপাই!

ঐন্দ্রিলা বলল, তিওয়ারির ফান্ডার ওপর ঠিক রিলাই করা যাবে না। রঙ্গন, তুই ব্যাপারটা নিয়ে একটু পড়াশোনা কর। আমি তোকে প্রচুর বইপত্র দেব। তোর

হোমটাস্ক হয়ে গেলে আমরা কাজে নামব।

আমি বাপ্পাকে দেখছিলাম। ওর মুখচোখে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছে। জুমেলিয়াকে একটিবার দেখার জন্যে ও সত্যিই পাগল হয়ে গেছে।

তিওয়ারি বলল, রঙ্গন পড়াশোনা করে করুক, হামি ভি থোড়াবহৎ স্টাডি করে আসব। কিন্তু কোথায় বসে প্ল্যানচেট করবি?

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতেই শৌনক বলল, মাইকেলনগরে আমাদের বাগানবাড়িতে হবে। জায়গাটা জুমির হেভি পছন্দ ছিল।

আমি বললাম, প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা রাতে হলেই ভালো হয় বলে শুনেছি। যদি সেটাই হয়, তা হলে সে-রাতে আমরা ফিরতে পারব না। ঐন্দ্রিলা কি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে? কাকিমা কি পারমিশান দেবেন?

শৌনক অন্যরকম করে হাসল, বলল, আমি যখন আছি তখন পারমিশান পাওয়া যাবে। আমরা তো পরীক্ষার পরই সেক্স করব। কী বল, মিতি?

মিতি ঐন্দ্রিলার ডাকনাম। শৌনক মাঝে-মাঝে ওকে এই নামে ডাকে। মজা করে বলে, ওর ডাকনামটা জ্যামিতি থেকে এসেছে।

ঐন্দ্রিলা বলল, মাম্মির প্ল্যানচেটের ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। তা ছাড়া জুমিকে চিনত। জুমি আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিল। জুমিকে প্ল্যানচেট করা হবে শুনলে মাম্মি হয়তো আমার সঙ্গে যেতে চাইবে।

শৌনক একেবারে হাততালি দিয়ে উঠল : তা হলে তো দারুণ হবে! কাকিমার হাতের রান্না খাওয়া যাবে–ঠিক পিকনিকের মতন...।

বাপ্পাদিত্য বিড়বিড় করে বলল, জুমেলিয়াকে যদি দেখাতে পারিস, তোদের কাছে আমি এভার গ্রেটফুল থাকব।

ঐন্দ্রিলা আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, রঙ্গন, কাল থেকে তোমার প্ল্যানচেটের প্রজেক্ট শুরু কালই আমি বড়জেঠুর কাছ থেকে একগাদা বইপত্র চেয়ে নিয়ে আসব।

ব্যাপারটা সেদিন পিকনিক গোছের শুনিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোটেই সেরকম হয়নি।

.

ঐন্দ্রিলার দেওয়া বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ঘটনার দিন ঐন্দ্রিলা ওর মায়ের সঙ্গে মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হল।

মাইকেলনগর যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার–ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আগ্রহের সীমা নেই। প্রেতাত্মাচর্চায় একেবারে ওস্তাদ মানুষ। ঐন্দ্রিলার বড়জেঠুর খুব বন্ধু। আমাদের প্ল্যানচেটের মতলবের কথা জানতে পেরে নিজেই আগ বাড়িয়ে সঙ্গী হতে চেয়েছেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের মাথায় কপাল থেকে শুরু করে বেশ বড় মাপের টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দীর্ঘ সৌম্যকান্তি ফরসা চেহারা। পরনে গাঢ় রঙের প্যান্ট আর নীল-সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। পুরু ঠোঁটে সিগারেট।

ওঁকে দেখে সিনেমা বা নাটকের লোক বলে মনে হয়। ভূত-প্রেতের সঙ্গে ওঁর যে-কোনওরকম সম্পর্ক থাকতে পারে তা অনুমান করা এককথায় অসম্ভব।

এরকম একজন বিচিত্র সঙ্গী পেয়ে মাইকেলনগর যাওয়ার পথে সময়টা দারুণ কাটল।

প্রিয়নাথের ভরাট গলা, আর কথাও বলেন ভারি চমৎকার। আমরা জুমির ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়েছিলাম। এখন জুমিকে ঘিরে নানা ঘটনার কথা বলছিলাম। শুধু বাপ্পা চুপচাপ বসে ছিল, আর ঐন্দ্রিলাও ওর মায়ের পাশে বসে কেমন যেন আনমনা, উদাস–দেখে মনে হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে জটিল কোনও অঙ্ক কষছে।

প্রিয়নাথ তখন বলছিলেন, জানো তো, ভূতচর্চা করি বলে সবাই আমার নাম দিয়েছে ভূতনাথ। তবে ওতে আমি কিছু মাইন্ড করি না। কোনও কিছু নিয়ে গবেষণা করাটা তো আর খারাপ না। এই ধরো না, এ-লাইনে না এলে আমি মাইকেল ফ্যারাডের ভূতের কথা জানতেই পারতাম না…।

মাইকেল ফ্যারাডের ভূত! তিওয়ারি আর আমি অবাক হয়ে বললাম।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও মাইকেল ফ্যারাডের ভূত। ব্যাপারটা প্রথম রিপোর্টেড হয় ১৯৬২ সালে। রিপোর্ট করেছিলেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের হেভি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর এরিক লেইথওয়েট। লন্ডনের রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে তিনি হঠাৎ টের পেলেন তার কাছে ফ্যারাডের ছায়া-শরীর দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যারাডের প্রেত তাকে যেন বলল, নাউ ই অলরাইট, ল্যাড। য়ু আর ডুয়িং ফাইন। লেইথওয়েট যখন অন্য বিজ্ঞানীদের একথা জানালেন, তখন অনেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁদেরও একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ১৮১৩ সালে রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে ফ্যারাডে স্যার হামফ্রি ডেভির ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরে, ১৮৩৩ সালে, তিনি ডেভির জায়গায় প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি হয়েছিলেন।

হাতের সিগারেটে বেশ কয়েকবার টান দিয়ে প্রিয়নাথ সেটা গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, লেইথওয়েটের ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি। ১৯৬৪ সালে ক্রিসমাসের ছুটিতে লেইথওয়েট আবার রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে যান। উদ্দেশ্য ছিল, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া। এ-ধরনের বক্তৃতামালার ব্যাপারটা ফ্যারাডে নিজেই একসময় শুরু করেছিলেন। তো বক্তৃতার মাঝে একদিন লেইথওয়েট দর্শকদের সামনে একটা পরীক্ষা সরাসরি করে দেখাতে চাইলেন। দুটো তারের কয়েল নিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকঠাক হলে কয়েলে কারেন্ট পাঠানোমাত্রই একটা প্লেট থেকে একটা বল ছিটকে লাফিয়ে উঠবে। আর যদি ঠিক সময়ে কারেন্ট পাঠানো না হয় তা হলে বলটা প্লেটের ওপরে এপাশ-ওপাশ ঠকঠক করে কাপবেলাফিয়ে উঠবে না।

তো লেইথওয়েট দু-বার পরীক্ষাটা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাকসেসফুল হলেন না। এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার না কারণ, লেইথওয়েট অঙ্ক কষে দেখেছিলেন এক্সপেরিমেন্টটা ৬৯৬ বার চেষ্টা করলে একবার মাত্র সফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি আবার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার তোড়জোড় করতে লাগলেন। ঠিক তখনই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। লেইথওয়েটের কানে কে যেন ফিসফিস করে বলল, তৃতীয়বারে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হবে। ইচ্ছে করলে লেইথওয়েট আগেভাগেই সেটা দর্শকদের জানিয়ে দিতে পারেন।

লেইথওয়েট ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কী ভেবে তিনি সত্যি-সত্যিই দর্শকদের আগাম জানিয়ে দিলেন যে, এইবার পরীক্ষাটা সফল হবেই।

একটু থামলেন প্রিয়নাথ। তারপর ছোট্ট করে হেসে বললেন, সত্যি-সত্যিই থার্ডবারে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হয়েছিল।

কাকিমা মানে, মিতির মা–জিগ্যেস করে বসলেন, কানে-কানে কে ওইরকম কথা বলেছিল?

প্রিয়নাথ এবার শব্দ করে হাসলেনঃ সেটাও কি আর বলতে হবে!

আমি মাইকেল ফ্যারাডের কথা ভাবছিলাম, কোথা থেকে জুমি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম জুমেলিয়া আমাকে বলছে, চটপট কর তোদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি যে ছটফট করছি।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যশোর রোড থেকে বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে আমাদের গাড়ি মাইকেলনগরে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার কখন যেন পা টিপেটিপে নেমে এসেছে। রাস্তার সামান্য আলো কিংবা ছোটখাটো দোকানপাটের আলো তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হল, অন্ধকার যেন শিকারি বাঘের মতো গাছ-গাছালির মাথায় ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সব গ্রাস করবে।

প্রিয়নাথ বললেন, তোমরা সবাই জুমেলিয়ার কথা ভাবো। প্ল্যানচেট সাকসেসফুল হওয়ার জন্যে এটা খুব জরুরি।

শৌনক বলল, আমরা তো রাত দশটায় বসব। তা হলে এখন থেকেই ভাবার কী দরকার?

মিতি ওকে প্রায় বকুনি দিয়ে বলল, এসব ব্যাপারে আঙ্কল এক্সপার্ট। আঙ্কল যা বলেন তা-ই শুনবি।

তিওয়ারি বলল, আমি কিন্তু শুরুসেই তনুমন দিয়ে জুমির কথাই ভাবছি। খেয়াল করেছিস, আমরা ওর অ্যাক্সিডেন্টের স্পটের ওপর দিয়েই এলাম।

ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে কথা আর মুখে উচ্চারণ করিনি। কিন্তু রমেশটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই! দেখলাম, বাপ্পা দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

শৌনকদের বাগানবাড়ির পাশের মাঠে গাড়ি রেখে আমরা লোহার সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শৌনকের ডাকে বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার মতিলাল এসে তালা খুলে দিল। দরজার পাল্লা ঠেলতেই গা শিউরে-ওঠা কাচকাচ শব্দ হল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মাত্র তিনমাস আগে এই বাগানবাড়িতে এসে আমরা কত হইহুল্লোড় করে গেছি। তখন জায়গাটাকে দারুণ লেগেছিল। অথচ আজ এখানে ঢুকতেই কীরকম যেন গা ছমছম করছে।

বাগানের গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে এগোতে-এগোতে শৌনক প্রিয়নাথকে লক্ষ করে বলল, আঙ্কল, আজ আমাদের মিশন সাকসেসফুল হবেই। তারপর ঐন্দ্রিলার দিয়ে তাকিয়ে কী বল, মিতি?

ঐন্দ্রিলা আনমনাভাবে বলল, হ্যাঁ, হতেও পারে।

প্রিয়নাথ শৌনককে জিগ্যেস করলেন, তুমি কী করে এত শিওর হচ্ছ বলো তো? তুমি কি কিছু ফিল করছ? অনেক সময় প্রেতাত্মারা আসার আগে মনের ওপর ছাপ ফেলে জানান দেয়।

শৌনক খানিকটা বিব্রতভাবে বলল, না, সেরকম কিছু না–এমনি মনে হচ্ছে।

প্রিয়নাথ আর কোনও কথা বললেন না। তবে ওঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ যেন চোখে পড়ল।

আমরা শৌনকদের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

প্রায় দেড়কাঠা জুড়ে দোতলা বাড়ি। শৌনকের দাদুর নামে বাড়ির নাম রাখা হয়েছে ভুজঙ্গ নিবাস। বাড়িটার বয়েস তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে। বাড়িতে ঢুকেই কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। প্রথমে আমাদের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা, তারপর রাতের আয়োজন। আমরা সাতজন যে আজ এখানে আসব, থাকব, সে কথা মতিলালকে আগেই টেলিফোনে বলা ছিল। তাই

সব ব্যবস্থা ও আগেই করে রেখেছিল। কিন্তু কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হতেই প্রিয়নাথ ওদের ডাকলেনঃ মিসেস ঘোষ, এক মিনিট–একটু দাঁড়িয়ে যান।

প্রিয়নাথ আঙ্কলকে ঘিরে আমরা ছজন দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁর কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বালবের আলোয় বিশাল হলঘরে আমাদের লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েছে।

প্রিয়নাথ কখন যেন আমাদের দলপতি হয়ে পড়েছেন। একটু কেশে নিয়ে হাতঘড়ি দেখে তিনি বললেন, এখন ছটা বাজে। ঠিক নটায় আমরা খেতে বসব। সেই বুঝে রান্নাবান্না করবেন। আর ঠিক দশটায় আমরা প্রেতচক্র শুরু করব। এ ছাড়া আর-একটা কথা–এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা জুমেলিয়ার কথা ভাবব, ওকে নিয়ে অলোচনা করব। তা হলে ও বুঝতে পারবে, ওকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আগে গোটা বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিই, তারপর ঠিক করব কোন ঘরে বসলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে। ব্যস, এবার আপনারা রান্নাঘরে যান। তবে সময়টা মনে রাখবেন–রাত ঠিক দশটায়, কাঁটায়-কাঁটায়।

কাকিমা আর মিতি চলে যেতেই প্রিয়নাথ আমাদের বললেন, তোমরা বাড়িটার ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারো, বই-টই পড়তে পারো, এ-ঘরে টিভি দেখতে পারো–শুধু বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না–এমনকী বাগানেও না। আর শৌনক, তুমি আমার সঙ্গে একটু থাকো, আমাকে হেল্প করো।

প্রিয়নাথ সঙ্গে করে মাঝারি মাপের একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন। সেটা দেখে মিতি কী জিগ্যেস করতেই তিনি হেসে বললেন, ওতে ভূত নামানোর সরঞ্জাম আছে। আবার অনেক সময় ভূত তাড়ানোর জিনিসপত্তরও থাকে।

ব্রিফকেসটা হলঘরের একপাশে রাখা ছিল। সেটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ শৌনকের সঙ্গে বাড়ি পরিদর্শনের কাজে এগোলেন।

ঠিক তখনই এরোপ্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

শৌনকদের বাগানবাড়িটা এয়ারপোর্টের এত কাছে যে, সবসময়েই এরোপ্লেন ওঠা-নামার বিকট শব্দ শোনা যায়।

বাপ্পাদিত্য হলঘরের একটা খোলা জানলার সামনে বসে ছিল। লক্ষ করলাম, জানলার বাইরেটা এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপ্পা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

তিওয়ারি হলঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। হঠাৎই আমার কাছে এসে বলল, অ্যাই, রঙ্গনকুছ টের পাচ্ছে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো!

ও চাপা গলায় বলল, আমি টের পাচ্ছে। আমি ঘরের ওই কোণটায় গিয়েছিল– ওই আলমারিটার পাশে। তো শুনলাম, কে যেন খুব সলি বলল, রমেশ, আমি তোকে ফোন করব। কী বলব তোকে...একদম স্পষ্ট জুমেলিয়ার গলা। রঙ্গন, ইয়ার, মেরা ডর লগ রহা হ্যায়।

আমি তিওয়ারিকে ইশারায় চুপ করতে বললাম। আমার ভয় হচ্ছিল, বাপ্পা একথা শুনতে পেলে আপসেট হয়ে পড়বে। কিন্তু তিওয়ারি কি ভুল বকছে? আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, ভয়ের কিছু নেই। প্রিয়নাথ আঙ্কল আমাদের সঙ্গে আছেন।

তিওয়ারিকে দেখে মনে হল না খুব একটা ভরসা পেল। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে টিভির সুইচ অন করে দিল। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল টিভির সামনে।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। শৌনকদের বাড়িটা আজ কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। এ বাড়ির সব ঘরেই সাধারণ বা –কোনও টিউব লাইট নেই। পিকনিকের দিন তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আজ বাবের আলো কেমন মলিন রহস্যময় লাগছে। আর সেইসঙ্গে অদ্ভুত দীর্ঘ মাপের বিকৃত সব ছায়া। আমাদের চেনা জিনিসের ছায়া, অথচ কেমন অচেনা লাগছে।

আবার একটা প্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে পড়ে গেল, জুমিরা গত বছর প্লেনে করে আন্দামান বেড়াতে গিয়েছিল।

কী আশ্চর্য! আমরা দেখছি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যে-কোনও প্রসঙ্গে জুমেলিয়াকে জড়িয়ে ফেলছি। তিওয়ারি কি তা হলে টেলিফোনের কথা ভাবছিল? ফার্স্ট ইয়ারে

পড়ার সময় ও প্রায়ই জুমিকে ফোন করত।

এমন সময় টেলিফোনের রিং শুনতে পেলাম। দোতলায় ফোন বাজছে। তিওয়ারি আর বাপ্পাকে বলে আমি দোতলায় রওনা হলাম। রাত যত ঘন হচ্ছে, ততই যেন শীত-শীত ভাবটা বাড়ছে। অথচ পথে আসার সময় শীত খুব একটা টের পাওয়া যায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা ছোট মাপের ঘর। সে-ঘরেই টেলিফোনটা রাখা আছে। ঘরে পা দিয়েই দেখি শৌনক রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই চোখ টিপে বলল, নে, তোর ফোন। সুছন্দা।

সুছন্দা এখানে ফোন করবে জানতাম। তাই টেলিফোনের শব্দ পেয়েই ওপরে রওনা হয়েছিলাম। ফোনে কথা বলতে বলতেই নজরে পড়ল, পাশের ঘরে প্রিয়নাথ ব্যস্তভাবে চলাফেরা করে কীসব করছেন। শৌনকের দিকে তাকাতেই ও ইশারা করে বলল, ওই ঘরটাকেই প্রিয়নাথ প্ল্যানচেটের জন্যে পছন্দ করেছেন।

আমি জানি, ওই ঘরটার পরেই আছে লম্বা বারান্দা। আর তার পাশেই কাদের যেন বিশাল বাগান। সেই বাগানে গাছ আর আগাছা সমান দাপটে রাজত্ব করে।

সুছন্দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। অন্ধকারে জোনাকি পোকার আলো চোখে পড়ছিল। আর কেন জানি না, জুমেলিয়ার কথা খুব মনে পড়ছিল।

বালবের আলোয় দেওয়ালে আমার ছায়া নড়ছিল। সেই বিচিত্র ছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার মন হঠাৎই বলে উঠল, আজ রাতে জুমির সঙ্গে দেখা হবে।

.

অন্ধকারে, হাতে হাত ধরে আমরা জুমেলিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একটা টেবিলকে ঘিরে আমরা ছজন চুপচাপ বসেছিলাম, আর প্রিয়নাথের নির্দেশ মতো জুমেলিয়ার কথা ভাবছিলাম।

ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ। এক কোণে একটা কাঠের বাক্সের আড়ালে একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো দেওয়ালে পড়ে আবছা একটা আলোর আভা তৈরি করেছে। আলোটা যাতে মলিন হয় সেজন্যে প্রিয়নাথ

আড়ালের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সামনে টেবিলে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার আর কম্পাস রয়েছে। মাঝে-মাঝে পেনসিল-টর্চ জ্বেলে প্রিয়নাথ সে-দুটোর রিডিং দেখছেন। প্রিয়নাথের পাশেই বসেছে বাপ্পাদিত্য—ওর সামনে একটা বড় সাদা কাগজ আর পেনসিল।

প্রিয়নাথ ফিসফিস করে বললেন, বাপ্পা, আমি বললেই তুমি পেনসিলটা হাতে তুলে নেবে, আলতো করে ধরে রাখবে কাগজের ওপরে—যাতে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কেউ তোমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে পারে।

বাপ্পা চাপা গলায় বলল, ঠিক আছে। কিন্তু পেনসিল ধরতে গেলে তো আমাকে রঙ্গনের হাত ছেড়ে দিতে হবে!

ছেড়ে দেবে। প্রিয়নাথ তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, রঙ্গন, তুমি তখন বাপ্পাকে টাচ করে থাকবে।

বাপ্পার ডানপাশ থেকে আমি জবাব দিলাম, ও.কে.।

ব্যস, আর কোনও কথা নয়।

শৌনক জিগ্যেস করল, আমিও কি কাগজ-পেনসিল নেব?

প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, না। একটু থেমে তারপর ও আমি নাম ধরে না ডাকলে কেউ সাড়া দিয়ো না। মিসেস ঘোষ, আপনিও না।

আবার সব চুপচাপ।

একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লাগছে। যে-শৌনক কখনও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না, সবসময় প্ল্যানচেট ইত্যাদি নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে, সে যেন এই প্ল্যানচেটের ব্যাপারে এসে থেকেই অতি-আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর বারবার বলছে, আমাদের মিশন সাকসেসফুল হবেই।

ঐন্দ্রিলা আমাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে নেই। কারণ, ও মিডিয়াম হয়েছে। প্রিয়নাথ ওকেই মিডিয়াম বেছে নিয়েছেন। কাকিমা এ-ব্যাপারে সামান্য খুঁতখুঁত করলেও শৌনক আর ঐন্দ্রিলার উৎসাহের কাছে তার অনিচ্ছা ভেসে

গেছে। তা ছাড়া প্রিয়নাথ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ঐন্দ্রিলাই সবচেয়ে ভালো মিডিয়াম হবে কারণ, ও জুমেলিয়ার সমবয়েসি মেয়ে।

ঘরের সবচেয়ে গাঢ় অন্ধকার অংশে মিতি স্থির হয়ে বসে আছে। ওকে দেখতে না পেলেও ওকে আমরা অনুভব করতে পারছি। ওর হাত দুটো সাদা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন প্রিয়নাথ। বাঁধার সময় তিওয়ারি বলেছে, এ কাচ্চে ধাগে তো স্যার টান মারলেই ছিঁড়ে যাবে!

প্রিয়নাথ উত্তরে বলেছেন, ঐন্দ্রিলা তো আর নিজে নিজে সুতো ছিঁড়বে না। যাকে আমরা ডাকছি সে যদি চায় তবেই সুতো ছিঁড়বে।

আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে এরোপ্লেনের শব্দ। তবে বুকের ভেতর একটা টিপটিপ শব্দও যেন টের পাচ্ছিলাম।

হঠাৎই জোরে শ্বাস ফেলার মতো ফোঁস করে একটা শব্দ হল। আর তারপরই আমাদের টেবিলটা সামান্য নড়ে উঠল।

প্রিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস ও থার্মোমিটার দেখলেন। আমিও সেদিকে চোখ রাখলাম। কম্পাসের কাটা উত্তর দিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে, আর থার্মোমিটারে উষ্ণতা ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-প্রেতচক্রে বসার আগে যা ছিল প্রায় তাই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার বলেছিলেন, কোনও প্রেতাত্মার উপস্থিতিতে কম্পাসের কাটা যে-কোনও দিকে মুখ করে অস্থিরভাবে ছটফট করতে থাকে। অনেক সময় বনবন করে পাক খায়। আর উষ্ণতা নামতে থাকে নীচের দিকে।

ফলে আমি একটু স্বস্তি পেলাম।

প্রিয়নাথ চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, কেউ কি এসেছেন?

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে মনে হল যেন, আচমকা শ্বাস টানার একটা শব্দ পেলাম। তারপর সব চুপচাপ।

বাপ্পা বোধহয় টেনশান আর সইতে পারছিল না। প্রিয়নাথের নিষেধ না মেনে ও ফিসফিস স্বরে প্রশ্ন করল, কে, জুমি?

আমাদের পাথর করে দিয়ে ফিশফিশ করে কেউ জবাব দিল, হ্যাঁ।

শব্দটা একটানা সুরে দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল। যেন বিশাল কোনও বেলুন থেকে ধীরে-ধীরে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ উত্তেজিতভাবে ধমক দিয়ে বললেন, বাপ্পা, কী হচ্ছে। তারপর অন্ধকার লক্ষ করে আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, কেউ কি এসেছেন?

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

কিন্তু পরক্ষণেই যা দেখলাম তাতে আমার চেতনায় কেউ যেন ভারী একটা হাতুড়ি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল।

মিতি কখন যেন ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। মোমবাতির আলোর সামান্য আভায় ওকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ কোন মিতি!

ও কালচে রঙের একটা চুড়িদার পরেছিল—সেটা এখন ভৌতিক আলখাল্লার মতো লাগছে। ওর মুখে মূকাভিনেতাদের মতো সাদা রং মাখা। কেউ কি রং মাখিয়েছে, নাকি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ওর মুখের এই চেহারা দাঁড়িয়েছে। ওর মুখের সাদা রঙের জন্যেই ওর ঠোঁটের বাঁ দিকে একটা কালো জজুল নজরে পড়ল—ঠিক জুমেলিয়ার মতো। কিন্তু মিতির মুখে তো কোনও জড়ুল নেই! হঠাৎ করে এ-জড়ুল এল কোথা থেকে!

হাত দুটো বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তুলে মিতি এপাশ-ওপাশ দুলছিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে-ফেলতে ও বাপ্পাদিত্যর নাম ধরে ফিশফিশ করে দুবার ডেকে উঠল।

প্রিয়নাথ চাপা গলায় আদেশের সুরে বললেন, বাপ্পা, পেনসিল নিয়ে রেডি হও।

বাপ্পার হাত যে কাঁপছিল সেটা আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম। ও আমার হাত ছেড়ে পেনসিল নিয়ে তৈরি হল। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করে ওর কাঁধ ছুঁয়ে বসে রইলাম।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস আর থার্মোমিটার দেখলেন। সেখানে কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ল না। তিনি উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন, কেউ কি এসেছেন?

উত্তরে ঐন্দ্রিলা খলখল করে হেসে উঠল।

কাকিমা একটা ভয়ের চিৎকার দিয়ে উঠলেন। টেবিলে খটখট করে কয়েকবার শব্দ হল। আমার বুকের ভেতরে একটা পাগল তখন দুরমুশ পিটছিল।

এমন সময় একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

শৌনকদের বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া প্রতিটি প্লেনের শব্দ ঠিক একইভাবে ক্ষীণ থেকে শুরু হয়ে জোরালো হয়, তারপর গোঁ-গোঁ শব্দটা কমজোরি হয়ে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু এইবারের শব্দটা মাঝপথে থেমে গেল। কেউ যেন গলা টিপে একটা কথা-বলা পুতুলকে থামিয়ে দিল।

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। প্লেনটা আকাশ থেকে গেল কোথায়! কিন্তু ভাবার আর সময় পেলাম না। কারণ, ঠিক তক্ষুনি ঐন্দ্রিলা পাগলের মতো দিগবিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

সে কী মাথা ঝাঁকানি! যেন একটা মাথা-নাড়া বুড়ো পুতুলের পা ধরে কেউ পাগলের মতো আঁকাচ্ছে।

ওই অবস্থাহে মিতি বাপ্পার নামটা ফিশফিশ করে বলছিল।

বাপ্পা ডুকরে কেঁদে উঠল। কাগজের ওপরে ওর পেনসিল ধরা হাত খসখস শব্দে চলতে লাগল।

আর স্পষ্ট টের পেলাম ঘরের উষ্ণতা কমছে। ভীষণ শীত করছে আমাদের।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে থার্মোমিটার আর কম্পাস দেখলেন। ঘরের উষ্ণতা প্রায় ১০ ডিগ্রি, আর কম্পাসের কাটাটা বনবন করে ঘুরছে।

প্রিয়নাথ একরকম চিৎকার করেই জিগ্যেস করলেন, কেউ কি এসেছেন?

উত্তরে মিতি আবার খলখল করে হেসে উঠে অদ্ভুত চেরা গলায় বলল, এখনও তুই বুঝিসনি?

পাশের ঘরের টেলিফোনটা হঠাৎই পাগলা-ঘণ্টির মতো বাজতে শুরু করল। এরকম দ্রুত কখনও আমি টেলিফোন বাজতে শুনিনি।

একটা জানলা দড়াম করে খুলে গেল। ঠান্ডা বাতাস সাপের মতো পাক খেয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপর প্রলয়নৃত্য নাচতে শুরু করল।

আমাদের অবাক করে দিয়ে বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকে পড়ল অসংখ্য জোনাকি। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জোনাকি। অন্ধকার ঘরে আগুনের ফুলকি হয়ে ওরা আঁক বেঁধে ভেসে বেড়াতে লাগল। ওদের এলোমেলো ভেসে বেড়ানো দেখে বাতাসের স্রোত বোঝা যাচ্ছিল।

তিওয়ারি আর্তনাদের মতো একটা শব্দ করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, ভাগজোগনি! ভাগজোগনি! জুগনু! জুগনু!

ততক্ষণে ঠান্ডায় আমরা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি। আর কাকিমা মিতি! মিতি! বলে ডেকে-ডেকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছেন।

মিতি পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। হঠাৎই ও শক খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। টেলিফোনের ঘন্টি তখনও কিন্তু থামেনি।

প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে বললেন, শৌনক, লাইট জ্বেলে দাও। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ছুটে গেলেন মোমবাতির কাছে। ওটা তুলে নিয়ে ঐন্দ্রিলার কাছে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঠিক কী যে হচ্ছিল মনে করে বলতে পারব না। শুধু মনে আছে এলোমেলো ভয়ের চিৎকার, কথাবার্তা, আর টেলিফোনের পাগলা-ঘণ্টি।

শৌনক ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, এক মিনিট। সবাই শোনো। এসবে ভয়ের কিছু নেই। এই ব্যাপারটা পুরোটাই সাজানো নাটক।

মুহূর্তে সব চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেল। শৌনক ফোন ধরার জন্যে এগোতেই ফোনের ঘন্টিও আচমকা চুপ করে গেল।

আমরা সবাই তখন মিতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। ও চোখ বুজে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে মিতির!

ওর সারা মুখে সাদা রং। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। ঠোঁটের বাঁ-দিকে একটা কালো জজুল আঁকা রয়েছে।

প্রিয়নাথ মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন। শৌনক ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, আপনি উঠে পড়ুন। মিতির কিস্যু হয়নি। বাপ্পাকে একটু সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে আমি আর মিতি নকল ভূত নামানোর প্ল্যান করেছিলাম। ওর হাতব্যাগে মেকাপের জিনিস ছিল। অন্ধকারে লুকিয়ে মুখে মেখে নিয়েছে। আর জুমেলিয়ার এফেক্ট আনার জন্যে ভুরু আঁকার পেনসিল দিয়ে জড়ুলটা এঁকে নিয়েছে। কথা শেষ করেই শৌনক হো হো করে হেসে উঠল : তবে সবাই যে এরকম ব্যাপক ভয় পেয়ে যাবে ভাবিনি।

রমেশ তিওয়ারি হতভম্ভ মুখে দাঁড়িয়েছিল। জোনাকিগুলোর দিকে দেখিয়ে আমতা-আমতা করে শৌনককে জিগ্যেস করল, তা হলে এই ভাগজোনিগুলো কোথা থেকে এল?

জোনাকিগুলো তখনও ঘরের ভেতরে উড়ছিল। তবে ঘরের আলোর ওদের অনেক নিষ্প্রভ লাগছিল।

শৌনক থতমত খেয়ে বলল, জানি না

প্রিয়নাথ কপালে হাত চেপে মিতির পাশে উবু হয়ে বসেছিলেন। শৌনকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, টেলিফোনটা অমন পাগলের মতো বাজছিল কেন? প্লেনের গর্জনটাই অমন মাঝপথে অমন থেমে গেল কেন? আর ঐন্দ্রিলা যেভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল মানুষ কি অমনভাবে মাথা আঁকাতে পারে?

শৌনক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বিব্রত অপরাধী মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কাকিমা মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিলেন, প্রিয়নাথ চিৎকার করে ওঁকে বাধা দিলেন : খবরদার, এখন ওর কাছে এগোবেন না!

আমি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, শৌনক আর ঐন্দ্রিলা মিলে এসব কারসাজি করেছে? তা হলে টেম্পারেচার এরকম কমে গেল কেমন করে! বেশ শীত করছে…তা ছাড়া কম্পাসের নিড়টাই বা অমন বনবন করে ঘুরছিল কেন?

শৌনক বলল, টেবিলের শব্দগুলো আমি করেছিলাম। আর কথা ছিল, মিতি বাপ্পার নাম ধরে কয়েকবার ডাকবে। ও আর কিছু করেছে কি না আমি জানি না। ওকে ডাকুন–ও বলতে পারবে।

ঐন্দ্রিলার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শৌনক ডেকে উঠল, মিতি! মিতি! ওঠ, সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে।

চিত হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ঐন্দ্রিলা কোনও সাড়া দিল না।

প্রিয়নাথ ওর কবজি ধরে বসেছিলেন। আমাদের ভয় পাওয়া মুখগুলোর দিকে একপলক নজর বুলিয়ে তিনি ভারী গলায় বললেন, ও আর উঠবে না। শি ইজ ডেড। আমি এতক্ষণ ধরে ওর পা খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। যদি পারো তো কেউ একজন ডাক্তার ডেকে আনেনা।

প্রিয়নাথের কথায় আকুল ঝড় বয়ে গেল ঘরে।

শৌনক মিতির নাম ধরে পাগলের মতো ডেকে উঠে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কাকিমার বুকফাটা কান্না শুরু হয়ে গেল একইসঙ্গে। কিন্তু আবেগের ঝড় বেড়ে ওঠার আগেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল, টেলিফোনটাও আগের অদ্ভুত ঢঙে হঠাৎই বাজতে শুরু করল। মোমবাতির আলোটা একবার কেঁপে উঠেই নিভে গেল। কিন্তু বাবের আলোয় আমাদের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

মিতির মৃতদেহের মুখটা ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে যেতে লাগল। দেখতে-দেখতে ওর টুকটুকে লাল ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গোল গর্তের চেহারা নিল। একটা অপার্থিব হাসি শোনা গেল ওর মৃতদেহের ভেতর থেকে। আর তারপরই একটা সবুজ রঙের মুখ দেখা গেল ওর মুখের গহ্বরে। ওর ঠোঁট চিরে মুখের গর্ত দিয়ে প্রাণপণ চাপে ঠেলে বেরিয়ে এল মাথাটা। গোটা মাথায় কেমন এক চকচকে লালা জড়ানো।

মাথাটা মাপে ছোট ফুটবলের মতো। চোখ দুটো টানা-টানা ঢুলুঢুলু। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। আর ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালো জড়ুল।

মাথাটা নেশাগ্রস্থ চোখে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে আমাদের একবার দেখল। তারপর ফিশফিশে হিমেল স্বরে বলল, বাপ্পা, এবার যাই।

প্রিয়নাথ একলাফে ছিটকে চলে গেলেন ওঁর ব্রিফকেসের কাছে। কিন্তু তার বেশি কিছু করে ওঠার আগেই ঐন্দ্রিলার মৃতদেহ আচমকা চোখ খুলে তাকাল। এবং একটা ফট শব্দ করে ঘরের বাটা কেটে গেল।

ঘরের মধ্যে ভয়ার্ত চিৎকারের ঝড় উঠল আবার। আরও দুটো জানলা দড়াম করে খুলে গেল। জানলার পাল্লাগুলো দেওয়ালে এলোপাতাড়ি বাড়ি খেতে লাগল। আর অসংখ্য জোনাকির স্রোত ঘরে হাউবাজির মতো পাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

আমাদের ভীষণ শীত করছিল। ভয় আর ঠান্ডায় আমরা সকলে ঠকঠক করে কঁপছিলাম। অন্ধকারে নজর চলছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে দেখলাম, একরাশ কালো ধোঁয়া ঘরের আঁধার থেকে ভেসে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর জোনাকিগুলো যেন এক পৈশাচিক উল্লাসে ঘরের বাতাসে মাতালের মতো নাচছে…নাচছে…নাচছে।

তারই মধ্যে কাকিমার সর্বহারা মর্মান্তিক কান্না আমার কানে আসছিল।

আমরা সবাই অসহায়ের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম।

# ভূতনাথের ডায়েরি : নগ্ন নির্জন রাত

**ভূতনাথের ডায়েরি : নগ্ন নির্জন রাত**

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনওদিন দেখিনি..

এ-গল্প আমি শুনেছি রিমকির কাছে। ডাক নাম রিমকি, আর পোশাকী নাম রূপশ্রী। আমার বড়দার মেয়ে সোনালির সঙ্গে রিমিক কলেজে পড়ত। এরকম সবুজ মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি– সবসময় টগবগ করে ফুটছে। যদি কখনও জিগ্যেস করতাম, এত এনার্জি তুই পাস কোথা থেকে? তাতে হেসে গড়িয়ে পড়ত মেয়েটা। বলত, মহাকাশ থেকে, কাকু, মহাকাশ থেকে!

সূর্যের ভেতরে যেমনটা হয়, ওর ভেতরেও বোধহয় ক্রমাগত নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া হয়ে টন-টন হাইড্রোজেন বদলে যাচ্ছে হিলিয়ামে, আর তৈরি হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

একটা সময়ে আমি বড়দার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতাম। তখন রিমকি প্রায়ই আসত সোনালির কাছে। আর আমার ভূতচর্চার কথা শুনে এক-একদিন এসে ভূতের গল্প শোনার আবদার ধরত।

ভূত-প্রেতের গল্প ও শুনতে চাইত কেন সেটা আমি প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। গল্প শেষ হলেই ও বলে উঠত, কী দারুণ বোগাস টু-স্টোরি! কাকু, সত্যি করে বলুন না, মিথ্যেকে সত্যিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করে আপনার কী লাভ? এবং তারপরই খিলখিল করে হাসি।

এইসব হাসি আর গল্পের মাঝেই চলত সরষের তেল দিয়ে মুড়ি-বাদাম-পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা মেখে খাওয়া, আর বউদির তৈরি করে দেওয়া চা।

রিমকির সেই বয়েসের মুখটা বেশ মনে পড়ে। ফরসা লম্বাটে মুখ। টানা-টানা চোখ। বাঁ কানের নীচে একটা বড় তিল। কপালে কালো টিপ। পরনে উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে চুড়িদার।

আমার বয়েসটা যদি বছর পনেরো-ষোলো কম হত তা হলে অবশ্যই আমি রিমকির প্রেমিক হতে চাইতাম। ও পাত্তা না দিলেও ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সত্যিই এরকমটা ভাবতাম। বেশ বুঝতাম, রিমকির মধ্যে এমন একটা টান আছে যে, যে-কোনও পুরুষই ওকে ভালোবাসতে চাইবে।

ভূত যে নেই, একথা প্রমাণ করতে রিমকি প্রায়ই মহাতর্ক জুড়ে দিত আমার সঙ্গে। অনেক সময় বউদি আর সোনালিও ওর দলে যোগ দিত।

আমি ওকে শুধু বলতাম, রূপশ্রী, যেদিন তোমার হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা হবে, সেদিন বুঝবে আমার গল্পগুলো বোগাস-টু-স্টোরি, না শুধু টু-স্টোরি।

সত্যি, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কত ধ্যানধারণা বদলে যায়। যাকে চিরকাল, নেই বলে ভেবে এসেছি তাকে আছে বলে মেনে নিই। যেসব ঘটনা একসময় হয় না, হতে পারে না বলে বিশ্বাস করতাম, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিশ্বাস কেমন বদলে যায়–তখন মনে হয়, হয়, হতেও পারে।

কিন্তু আমি কখনওই চাইনি, মর্মান্তিক কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রিমকির বিশ্বাস বদলে যাক।

অথচ তাই হয়েছিল।

প্রায় বারো বছর পর একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যেতেই বদলে যাওয়া রিমকিকে আমি চিনতে পারলাম। ওর টগবগে সবুজের ওপরে যেন সন্ধ্যার শান্ত ছায়া নেমে এসেছে।

একপাশে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর একটু সহজ হয়েছিল রিমকি। নরম গলায় বলেছিল, কাকু, শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন।

তারপর ওর গল্পটা আমাকে বলেছিল রিমকি–পুরোনো রিমকির ভাষায় বোগাস টু-স্টোরি। আর নতুন রিমকির ভাষায়? কী জানি!

শুরুর কবিতার লাইন দুটোও ওরই মুখে শোনা–গল্প বলার সময় গুনগুন করে আবৃত্তি করেছিল ও। শুনে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের সব কথা যেন ওই মারাত্মক দুটো লাইনের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে।

রিমকি আমাকে বলেছিল…।

.

আমি বাড়িতে পা দেওয়ামাত্রই একেবারে হইহই শুরু হয়ে গেল।

সুকান্তি একেবারে চেঁচিয়েই উঠল, মা, মা, মঙ্গলগ্রহ থেকে রূপশ্রী এসেছে! শিগগির নেমে এসো!

দোতলা থেকে নামতে নামতে পিসিমা বলে উঠলেন, রূপশ্রী আবার কে!

রূপশ্রী মানে রিমকি। ভুলেও তো আমাদের বাড়িতে আসে না, তাই বললাম মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। ও এখন কথায় কথায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে বিগ বস। আমাদের আর পাত্তা দেবে কেন! দেখলে না, অত করে আসতে বললে, ছোড়দির বিয়েতেও এল না!

আমি সুকান্তিকে ধমকে উঠলাম, তুই থামবি! নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজে নেনইলে বকবক করে হাঁফিয়ে পড়বি।

পিসিমা ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন।

পরনে সাদা থান, গলায় সরু চেন, হাতে দু-গাছা চুড়ি, চোখে চশমা। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। বয়েস কত হবে এখন? মনে-মনে হিসেব করলাম। ষাট পেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। অথচ টকটকে ফরসা রং এতটুকু মলিন হয়নি। এখনও দারুণ সুন্দরী। ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা। শুনেছি, পিসেমশাই পিসিমার রূপ দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সে কথা বুড়ো বয়েসেও বারবার বলতেন। আরও বলতেন, পিসিমা আগে চলে গেলে সেকষ্ট তিনি সইতে পারবেন না। ভগবান বোধহয় পিসেমশায়ের মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তাই সময় হওয়ার অনেক আগেই ওঁকে ডেকে নিয়েছেন।

রিমকিকে রূপশ্রী বললে কখনও চিনতে পারি! পিসিমা হেসে বললেন। তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, কী রে, ইতির বিয়েতে এলি না কেন?

আমি কাঁধের ব্যাগটা বাঁ-হাতে সামলে ঝুঁকে পড়ে ঢিপ করে পিসিমাকে একটা প্রণাম করলাম।

পিসিমা আমার চিবুক ছুঁয়ে ঠোঁটে সে-আঙুল ছোঁয়ালেন : ইতি বারবার তোর কথা বলছিল…।

কী করব, পিসিমা। একটা কনফারেন্সে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়েছিল।

সুকান্তির দুই দিদি ও বড়দি শ্রুতি, আর ছোড়দি ইতি। তিদি নাকি অনেকদিন আগেই পিসিমাকে জানিয়ে দিয়েছে ও বিয়ে করবে না। কেন তা খুলে বলেনি। পিসিমাই আমাকে এ কথা বলেছিলেন। তখন পিসিমার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল পিসিমা সবই জানেন, কিন্তু আমাকে বলতে চাইছেন না। পরে অবশ্য কানাঘুষোয় আমি অনেকটাই জেনেছি।

ইতি আমার চেয়ে বছরতিনেকের বড়। আর সুকান্তি আমার পিঠোপিঠি। তাই সুকান্তির সঙ্গেই আমার আড্ডা বেশি জমে। পিসিমা সবসময় সবাইকে বলেন, রিমকি আর সুকান্তি এক জায়গায় হলেই সেখানে হইহই করে হাট বসে যায়। কী করে যে ওরা এত বকবক করতে পারে সে ওরাই জানে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সুকান্তি আর পিসিমা দোতলায় উঠল।

উঠেই দেখি, বাঁ-দিকের বড় বেডরুমটায় তিদি বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা এলোমেলো বাতাস খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে পাগল করে দিচ্ছিল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিদির চুল উড়ছিল। তিদি কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাকে দেখে কাগজ থেকে মুখ তুলে সামান্য হাসল তিদি : কী রে, রিমকি, কেমন আছিস?

ওকে দেখে মনে হল ভোরবেলাতেই স্নান সেরে নিয়েছে।

শ্রুতিদি পিসিমার মুখ পেয়েছে। ফরসা, রোগা। দেখলে একটু অসুস্থ বলে মনে হয়। আগে এরকম ছিল না। বোধহয় কানাঘুষোয় শোনা সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার পর এরকম হয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই কীরকম যেন ঠান্ডা–উৎসাহ উদ্দীপনার ছিটেফেঁটা নেই কোথাও।

আমি বললাম, তুমি কেমন আছ?

আবার সামান্য হাসি। তারপর ইতির বিয়েতে না আসা নিয়ে আর-এক প্রস্থ অনুযোগ।

ঘরে ঢুকে সবে একটা চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়েছি, পিসিমা বললেন, এবার তোকে ছাড়ছি না–দু-চারদিন থেকে যেতেই হবে। সুকান্তি রথীনকে আর শোভাকে ফোন করে খবর দিয়ে দেবে।

আমি হেসে বললাম, আমার উত্তর শুনলে তোমরা ফ্ল্যাবারগাস্টেড হয়ে যাবে।

ফ্ল্যাবারগাস্টেড মানে কী রে? সুকান্তি জিগ্যেস করল।

এ-ও জানিস না! হতবাক, হতভম্ব।

পিসিমা বললেন, তা হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো উত্তরটা শুনি।

আমি তোমাদের এখানে দু-চারদিন থাকতেই এসেছি। দেখছ না, ব্যাগটা কী ভারী!

উত্তর শুনে সুকান্তি আর পিসিমা একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। হওয়ারই কথা। কারণ, আমার ছোটবেলা-বড়বেলার অনেকটা সময় শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়িতেই কেটেছে। আজ বুঝতে পারি, আমি যে আমি হয়ে উঠেছি, তার জন্যে পিসিমা-পিসেমশাইয়ের কাছে অনেক ঋণ রয়ে গেছে আমার।

তাই ওদের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

শ্রুতিদি একটু অবাক হয়ে তিনটে পাগলকে দেখছিল।

হঠাৎই একটা গ্যালপিং ট্রেন ছুটে গেল সামনের রেল-লাইন দিয়ে। পিসিমাদের পুরোনো বাড়ির জানলা-দরজা মিহি শব্দ তুলে কঁপতে লাগল।

ট্রেনের এই কু-ঝিকঝিক শব্দ আমার বালিকা বয়েসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তখন পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটি মানেই শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়ি। আর ট্রেনের কু-ঝিকঝিক।

পিসিমাদের বাড়িটা রাইল্যান্ড রোডের ধারে। বোধহয় একশো কি দেড়শো বছর পুরোনো। পিসেমশাই এটা কেনার পর জোড়াতালি দিয়ে সারিয়ে-টারিয়ে নিয়েছেন। একতলায় একটা ঘর আর কলতলা-বাথরুম। দোতলায় দুটো ঘর আর পশ্চিমে রেললাইনের দিকে একটা বারান্দা। আর একেবারে কোণের দিকে একটা আধুনিক ছাঁদের বাথরুম পিসেমশাই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে এলাম।

পিসিমা চা করে দিলেন। তারপর ইতিদির বিয়ের গল্প শুরু হল। কোন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার মেনু কীরকম হয়েছিল, বাসি-বিয়ের দিন কী কী মজা হয়েছিল, শয্যা তোলার সময় ভালোমানুষ বরের কাছ থেকে কীভাবে চাপ দিয়ে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা আদায় করা হয়েছিল, এইসব।

এর কিছু-কিছু আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি। কারণ, ওরা বিয়েতে এসেছিল। তবুও আর-একবার শুনতে খারাপ লাগছিল না।

আমাদের কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টায় তিদি ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল। ছোট বোনের বিয়ে নিয়ে নানান কথা বলছিল। তারপর একসময় আমাকে বিয়ের ফটো দেখাতে বসল।

এসেছিলাম সেই সকাল আটটায়। কখন বেলা বারোটা বেজে গেছে কারও খেয়ালই নেই।

পিসিমা একবার সুকান্তিকে বলেছিলেন, তুই আজ অফিসে বেরোবি না?

সুকান্তি হেসে উঠে বলল, পাগল হয়েছ, মা! অ্যাদ্দিন পর রিমকি এসেছে আর আমি অফিস যাব! প্রণয়কে বলে দেব, ও খবর দিয়ে দেবে। আমার যা ছুটি পাওনা আছে তাতে-দু-চারদিন ডুব মারাটা কোনও ব্যাপার না।

পিসিমা আমাকে স্নান করতে যাওয়ার তাড়া দিতেই সুকান্তি বলল, না, মা। খাওয়ার দেরি আছে। তোমরা বসে গল্প করো–আমি মাংস কিনে নিয়ে আসি।

বটতলায় গেলে পেয়ে যাব। আমি তো জানি, রিমকি ছোটবেলা থেকেই মাংসাশী প্রাণী।

সুকান্তি চলে যেতেই পিসিমা আমার অফিসের কথা শুনতে চাইলেন। বিজ্ঞাপন কোম্পানির ধরন-ধারণ পিসিমার একেবারেই অচেনা। তাই বাচ্চা ছেলেকে বোঝানোর মতো করে আমি সব বোঝাতে লাগলাম। বললাম, বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলোর মধ্যে কী কম্পিটিশান। কেন আমাকে কলকাতা ছেড়ে বারবার বাইরে দৌড়াতে হয়।

শ্রুতিদি আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। শোনার পর বলল, তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি। তোর মতো লাইফ আমার খুব পছন্দ।

পিসিমা একবার অদ্ভুত চোখে বড় মেয়ের দিকে তাকালেন।

আমি শ্রুতিদিকে বললাম, তিদি, সবই নদীর এ পার কহে...। সত্যিকারের সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায় সেটা কারওর নেই। ওটা শুধু খুঁজে বেড়ানোর জিনিস কখনও পাওয়া যায় না।

শ্রুতিদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার হঠাৎই বেশ খারাপ লাগছিল।

খটাখট শব্দে একটা লোকাল ট্রেন চলে গেল।

খোলা জানলা দিয়ে লাইনের ধারের গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। কাছেই ইলেকট্রিকের তারে দুটো শালিক বসে রয়েছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছিল। জোরালো রোদে কয়েকটা পাতা আয়নার মতো চকচক করছিল।

পিসিমা বললেন, শ্রুতিকে কত বলি, টিউশানি কর–ও করতে চায় না।

টিউশানি আমার ভাল্লেগে না। শ্রুতিদি বলল।

আমি ওকে বললাম, তোমার তো আঁকার হাত ভালো ছিল। হাতের কাজটাজ কিছু করতে পারো...বাটিকের কাজ...।

তিদিন মলিন হাসল। ছোট্ট করে হুঃ... শব্দ করল।

এরপর গল্প আর তেমন জমল না। আমি স্নান করার তোড়জোড় শুরু করলাম। পিসিমাও রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখতে চলে গেলেন।

.

রাতে সবাই মিলে একসঙ্গে যখন খেতে বসেছি, তখন পিসিমা সুকান্তিকে বললেন, কীরে, কী ঠিক করলি? তুই কি তা হলে একতলার ঘরে শুবি? আর রিমকি তোর ঘরে শোবে?

সুকান্তি খেতে-খেতে মায়ের দিকে তাকাল। জড়ানো গলায় বলল, আমাকে সব লটবহর নিয়ে তাহলে নীচে নামতে হবে। তা ছাড়া আর ব্যাচিলার্স ডেন কি রিমকির ভালো লাগবে? একটু হাসল সুকান্তি।

আমি সাত-তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, একতলায় শুতে আমার কোনও প্রবলেম নেই, পিসিমা।

না, তা না…যদি ভয়-টয় পাস…।

আমি হাসলাম ও চোর-ডাকাত হলে পেতেও পারি। তা ছাড়া আবার ভয় কীসের। আমার একা-একা শোওয়ার অভ্যাস আছে।

সুকান্তি খাওয়া থামিয়ে বলল, রিমকির আই. কিউ. দিন-দিন কমে যাচ্ছে। মা চোর-ডাকাতের ভয়ের কথা বলছে না–বলছে ঘোস্ট প্রবলেমের কথা।

ভূতের ভয়! আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না? পিসিমা, সত্যি…ভূত বলে কিছু থাকলে তবে না তাকে ভয় পাব! ভূত হচ্ছে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্যে বড়দের তৈরি একটা মিথ– মিথ্যেও বলতে পারো। আমি তো আর বাচ্চা নই!

শ্রুতিদি কেমন অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছিল। ওর বলা সকালের কথাটা মনে পড়ল : তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি।

সুকান্তি পিসিমাকে বলল, রিমকি একটুও বদলায়নি। সেই ছোটবেলার মতোই ঝাসি কি রানি। কী বল, রিমকি!

আমি বললাম, তুই ছোটবেলা থেকে যা কুঁড়ে! তুই কখনও নিজের আস্তানা ছাড়বি! বিছানায় পাশ ফিরতে হলেও তো মাকে ডাকিস পাশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

সুকান্তির সঙ্গে লাঠালাঠি করতে করতেই খাওয়া শেষ হল।

এরপর শুতে যাওয়ার পালা। সুকান্তি বলল, দাঁড়া, তোর জন্যে কটা ম্যাগাজিন নিয়ে আসি।

আমি বললাম, দরকার নেই–আমার সঙ্গে বই আছে, কিন্তু ও শুনল না। ওর ঘরে গেল ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে আসতে।

দোতলায় বড় ঘরটায় পিসিমা আর শ্রুতিদি শোয়। তার পাশে ছোট ঘরটায় সুকান্তি। ওর ঠিক নীচেই আমার জন্যে বরাদ্দ করা ঘরটা। এমনিতে ওটা বন্ধই থাকে ইতিও ওখানে শুত না। পিসেমশাই বেঁচে থাকতে ঘরটা ব্যবহার হত। এতকালে ছিল বৈঠকখানা–পরে পিসেমশাইয়ের শোওয়ার ঘর। ঘর ছাড়া বাকিটা পুরোনো ধাঁচের বারান্দা, কলতলা আর বাথরুম।

খাওয়াদাওয়ার পর পিসিমাদের সঙ্গে বসে আর-এক প্রস্থ গল্প, আর কিছুটা সময় টিভি দেখলাম। তারপর হাই উঠতে লাগল।

পিসিমা বললেন, আজকের মতো ঢের হয়েছে। এবার শুতে যা–।

সুকান্তি ম্যাগাজিনগুলো হাতে নিয়ে আমাকে খোঁচা দিল? চল, তোকে সি অফ করে আসি।

একতলার ঘরের দরজায় এসে ও বলল, ঢুকেই বাঁদিকে সুইচবোর্ড–তুই তো জানিস। আর বাথরুম...।

আমি ম্যাগাজিনগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম, মায়ের কাছে মাসির গল্প করিস না। গুডনাইট। কাল সকাল-সকাল উঠবি–আমাকে এসকর্ট করে মর্নিং ওয়াকে নিয়ে যাবি, সানরাইজ দেখাবি।

ও ভুরু উঁচিয়ে বলল, এটা কি পুরী নাকি! এখানে সানরাইজ রান্নাঘরের তাকে পলিপ্যাকে পাওয়া যায়। হাসল সুকান্তি। তারপর গলাটা সিরিয়াস করে বলল,

সত্যি তুই ভয় পাবি না তো!

আমি হালকা গলায় বললাম, পেলে তোকে ডাকব।

তা হলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবি…জানিস তো আমার স্লিপ খুব ডিপ!

ও চলে গেল।

আমি ঘরের আলো জ্বেলে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। সাবধানের মার নেই ভেবে খিল আর ছিটকিনি দুটোই এঁটে দিলাম। তারপর ম্যাগাজিনগুলো বিছানায় রেখে ঘরের এক কোণে গিয়ে শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে নিলাম।

ঘরের আলো বলতে একটিমাত্র টিউব লাইট। আর আসবাবপত্র বলতে একটা ছোট কাঠের আলমারি, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা বুককেস, আর একটা ছোট খাট। আলমারির মাথায় পুরোনো আমলের টুকিটাকি জিনিস–তার মধ্যে একটা পেতলের দোয়াত আর একটা পেতলের ফুলদানি। তবে এত ময়লা হয়ে গেছে যে, পেতলের বলে আর বোঝা যায় না।

ঘরে তিনটে জানলা ও একটা ভেতরের কলতলার দিকে, আর দুটো রেললাইনের দিকে। তিনটে জানলাতেই শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো।

বিছানায় গা ঢেলে দিতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলাম–যেন কেউ আমার জন্যে পালকের কোল পেতে দিয়েছে। অথচ বিছানাটা নিতান্তই মামুলি।

সামান্য আড়মোড়া ভেঙে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিলাম। ব্যাগে আরভিং ওয়ালেসের সি অভ ফিলিপ ফ্লেমিং রয়েছে, কিন্তু সেটা আর বের করতে ইচ্ছে করল না।

রাতে বই পড়া আমার বহুদিনের অভ্যেস। তাই ক্লান্ত লাগলেও ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাতে লাগলাম। বহুদিন সিনেমার খবর নেওয়া হয় না। তাই ম্যাগাজিনটা পড়তে খারাপ লাগছিল না।

মাঝে-মাঝে ট্রেন ছুটে যাওয়ার শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই, একটা ট্রেন চলে যাওয়ার পর, কে যেন আলতো করে আমার নাম ধরে ডাকল।

রূপশ্রী…।

আমি চমকে উঠলাম। চোখ ফেরালাম দরজার দিকে। দরজায় ছিটকিনি, খিল সব ঠিকঠাকই আছে।

সুকান্তি কি দরজার বাইরে থেকে আমাকে ডাকল। কিন্তু ডাকটার ধরন যেন কেমন অদ্ভুত। কেউ যেন ভীষণ আহ্লাদ করে আমার নামটা উচ্চারণ করেছে।

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত একটা বাজতে মিনিট পাঁচ-সাতেক বাকি। এ-সময়ে সুকান্তি কেন আমাকে ডাকতে আসবে! নাকি ও আঁসির রানির সাহস পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

ম্যাগাজিনটা মাথার কাছে রেখে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। একটু সতর্কভাবে দরজার কাছে গেলাম। দরজার পাল্লার জোড়ের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, কে? সুকান্তি?

উত্তরে কোনও সাড়া পেলাম না। তবে মনে হল যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার প্রশ্ন করলাম আমি, কে? কে?

কোনও উত্তর নেই।

পিসিমাদের সদরে গ্রিলের দরজা বসানো। তার ঠিক পরেই একটা ভারী কাঠের দরজা। দরজারগুলো তালা-খিল-টিল দিয়ে ঠিকঠাক বন্ধ থাকে। এ ছাড়া বাইরে থেকে উটকো লোক ঢুকে পড়ার কোনও পথ নেই। তিনতলার ছাদের দরজাতেও বরাবর রাতে খিল এঁটে দেওয়া হয়।

সুতরাং, কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভীষণ বোকা-বোকা লাগল। মনে হয় আমার নাম ধরে কেউ ডাকেনি। ম্যাগাজিনের দিকে মনোযোগ থাকায় আমি হয়তো ভুল শুনেছি। সামান্য এই কারণে যদি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করি তা হলে সুকান্তি টিটকিরি দিয়ে আর টিকতে দেবে না।

চুপচাপ বিছানায় ফিরে এলাম। ছোট টেবিলটায় জলের জগ আর গ্লাস রাখা ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই পলকে তেষ্টা পেয়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে চলে গেলাম টেবিলের কাছে। গ্লাসে জল ঢেলে প্রাণভরে তেষ্টা মেটাতে গিয়েও থেমে

গেলাম। বেশি জল খাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, রাতে আর বাথরুমে বেরোতে চাই না।

গলাটা সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে। আন্দাজে ভর করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরের ঝোঁপঝাড় থেকে রাত-পোকার ডাক কানে আসছিল।

চোখটা একটু সয়ে আসতেই রেললাইনের দিকে খোলা জানলা দুটোর দিকে নজর পড়ল। ঘরের তুলনায় অন্ধকার সেখানে খানিকটা যেন কম। কালো আকাশ, দু-একটা তারা, আর গাছ গাছালির কয়েকটা ডালপালা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

আর-একটা ট্রেন ঝমঝম করে ছুটে গেল। তারপরই যেন চারদিক চুপচাপ হয়ে গেল। বাতাসে নড়ে ওঠা পাতার খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

হঠাৎই ডাকটা শোনা গেল আবার।

রূ–প–শ্রী…।

আবেগ থরথর গলায় ভীষণ চাপা ফিশফিশ স্বরে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল কেউ।

না, এবারে শুনতে আমার কোনওরকম ভুল হয়নি। তিনটে অক্ষরকে আলাদাভাবে টেনে টেনে উচ্চারণ করেছে সে। ভালোবাসার জুরে বেপথু কোনও রোমান্টিক কণ্ঠস্বর।

পিসেমশাইয়ের গলা এটা নয়। তা ছাড়া তিনি অপঘাতে মারা যাননি যে, ভূত-প্রেত হয়ে উপোসি ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন।

তা হলে এমন করে কে ডাকছে আমায়!

আমি বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে রইলাম। যেন সামান্য নড়াচাড়া করলেই অতল খাদে পড়ে চিরকালের মতো তলিয়ে যাব।

এইভাবে কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর ভাবতে শুরু করলাম, ঘরের আলোটা জ্বেলে দেব কি না। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই–বেশ ভয়-ভয় করছিল। অথচ আমার মনের একটা অংশ ভেতর থেকে বারবার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ভূত বলে কিছু নেই। যারা ভূতের ভয় পায় ভূতেরা তাদের দেখা দেয়। কিন্তু আমার মনের বাকি অংশ কিছুতেই সেসব যুক্তি মানতে চাইছিল না।

ঠিক তখনই খুট করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ ঘরের দরজা খুলল। অন্ধকারে বাইরে থেকে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটাও টের পেলাম আমি। অথচ একটু আগেই দেখেছি দরজায় খিল ছিটকিনি ভালো করেই আঁটা রয়েছে।

আমি শুয়ে-শুয়েই ঘামতে শুরু করলাম। অথচ মাথার ওপরে সিলিং পাখা একই তালে ঘুরে চলেছে। এরপর কি আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!

দরজার শব্দ হল আবার। তারপর অতি সাবধানে খিল লাগানোর শব্দ, ছিটকিনি আঁটার শব্দ।

তার মানে! কেউ কি ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করছে! অসম্ভব।

নিজেকে বারবার বললাম, এ-সময় মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। অযথা ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। কিচ্ছু নেই।

যুক্তি দিয়ে সবই বুঝতে পারছিলাম, অথচ ভীষণ ভয় করছিল।

আমার খুব কাছে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর পা ফেলে হেঁটে বেড়ানোর অস্পষ্ট শব্দ পেলাম।

আমার চোখ খুব একটা কাজ করছিল না। তবে নাক আর কান দ্বিগুণ সজাগ ছিল। হয়তো সেইজন্যেই পারফিউমের হালকা গন্ধটা টের পেলাম।

এই পারফিউম আমি ব্যবহার করি না। কিন্তু কেন জানি না মনে হল, এটা পুরুষদের পারফিউম। আর গন্ধটা আমাকে যেন টানছিল, নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই একটা জমাট ছায়া জানলার চৌকো ফ্রেমে দেখতে পেলাম–তবে মাত্র একপলকের জন্যে। তারপরই ওটা আলমারির দিকে সরে গেল।

এবার আমি চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু ভোকাল কর্ড স্ট্রাইক করে বসল।

আশ্চর্য! যখন আমি চিৎকার করতে পারতাম তখন লজ্জায় সঙ্কোচে চিৎকার করতে চাইনি। আর এখন প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইছি অথচ পারছি না।

হঠাৎই মনে হল আমার বিছানায় খুব কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ঝুঁকে পড়েছে আমার শরীরের ওপরে। পারফিউম ছাড়া আমি যেন একটা উগ্র পুরুষালি গন্ধ পাচ্ছি। একই সঙ্গে পায়রার বুকের পালকের মতো নরম আলতো একটা ছোঁয়া আমাকে অবশ করে দিল। হাতে, পায়ে, গলায়, বুকে। টিভি চালিয়ে তার স্ক্রিনের খুব কাছে হাত নিয়ে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়, এ-ছোঁয়া ঠিক সেইরকম।

আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র হুইস্ল দিয়ে ঝমঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে তাল কেটে গিয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। পলকে পারফিউমের গন্ধ, অলৌকিক ছোঁয়া সব উধাও। আমার ঘুমের ঘোরও কেটে গেল। গলা পর্যন্ত যে-ভয় উথলে উঠেছিল সেটা থার্মোমিটারের পারার মতো দ্রুত নামতে লাগল।

প্রচণ্ড এক চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি। হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় আলোর সুইচ জ্বেলে দিলাম।

ঘরে কেউ নেই।

ঘরটা শেষ যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।

হঠাৎই আমার চোখ গেল ঘরের দরজার দিকে।

দরজার খিল-ছিটকিনি দুটোই ভোলা। দরজার পাল্লা দুটো ইঞ্চিদুয়েক ফাঁক হয়ে আছে।

তা হলে কি ঘরে চোর ঢুকেছিল! কিন্তু বাইরে থেকে তো খিল-ছিটকিনি খোলা অসম্ভব।

দরজা আবার ভালো করে বন্ধ করে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিলাম। পাল্লা দুটো বারকয়েক টেনেটুনে দেখলাম ঠিক আছে কি না। তারপর বিছানায় ফিরে এলাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সওয়া তিনটে।

শরীর আর বইছিল না। আলো জ্বেলে রেখেই শুয়ে পড়লাম। কারণ, আলো নিভিয়ে দিলে আমার আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।

.

দুমদুম করে দরজার কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জানলার দিকে তাকিয়েও বোঝা যাচ্ছে বেলা অনেক হয়ে গেছে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল। সেইসঙ্গে সুকান্তি আমার নাম ধরে ডাকল ও রিমকি! রিমকি! ওঠ, ওঠ–নটা বাজে! তুই বলে মর্নিংওয়াকে যাবি, সানরাইজ দেখবি!

আমি সাড়া দিলাম : খুলছি, খুলছি! এক মিনিট…।

এক মিনিটের কম সময়েই পোশাক পালটে টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিসনি নাকি!

আমি জড়ানো গলায় বললাম, না।

তখনই ও দরজার কাছ থেকে জ্বলন্ত টিউব লাইটটা দেখতে পেল।

কী রে, সারা রাত আলো জ্বেলে ঘুমিয়েছিলি নাকি!

হ্যাঁ। আলো পাখা অফ করে দে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলছি। পিসিমাকে বল চা করতে।

ওপরে গিয়ে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়েই আমি বললাম, পিসিমা, কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমাদের ওই একতলার ঘরটা কিন্তু হন্টেড।

হন্টেড মানে! ঠিক কী বলতে চাইছিস? সুকান্তি জিগ্যেস করল।

আমি চায়ের কাপে আর-একটা লম্বা চুমুক দিয়ে নির্বিকারভাবে বললাম, হন্টেড মানে হন্টেড। ওই ঘরটায় ভূতের উপদ্রব আছে। আমাকে আগে বলিসনি কেন?

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

পিসিমা, শ্রুতিদি, সুকান্তি–সবাই বেশ ফ্যালফেলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পিসিমা আর তিদি তো মনে হল আমার কথায় বেশ ভয় পেয়ে গেছে। আর সুকান্তি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। বুঝতে চাইছিল আমি সত্যি-সত্যি ভূতের কথা বলছি, নাকি ঠাট্টা করছি।

কিছুক্ষণ পর সুকান্তি মুখ নীচু করে মিনমিন করে বলল, না…মানে…ভাবিনি যে, এখনও ও-ঘরটায় কোনও প্রবলেম হতে পারে। মুখ তুলে পিসিমার দিকে তাকাল ও মা, তুমি তো জানো, ছোড়দির বন্ধু ঈশিতা তো এসে রাতে ও-ঘরে ছিল। তখন তো কিছু হয়নি! তারপর…।

লক্ষ করলাম, শ্রুতিদির চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। আর পিসিমাও কেমন যেন অস্বস্তি পেয়ে এর মুখে ওর মুখে চাইছেন।

সুকান্তি আমার কাছে ঝুঁকে এসে জানতে চাইল, তুই ঠিক কী দেখেছিস বল তো! কী হয়েছে কাল রাতে?

কী আবার হবে! একটা লোক ঢুকে পড়েছিল আমার ঘরের ভেতরে। অথচ রাত্তিরে শোওয়ার আগে খিল-ছিটকিনি ঠিকমতো এঁটে দিয়েছিলাম।

আমি চা খেতে-খেতে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম।

জানলা দিয়ে রোদ-ঝলমলে দিন দেখা যাচ্ছে। চারপাশে কোথাও অশরীরী-অলৌকিকের ছায়ামাত্র নেই। এই পরিবেশে কাল রাতের ব্যাপার-স্যাপারগুলো বলতে গিয়ে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। মনে হল, এমন তো নয় যে, বাইরে থেকে কায়দা করে একতলার ঘরটার খিল-ছিটকিনি খোলা যায়! তা হলে কোনও বদমাস লোক চুরি বা অন্য কোনও বদ মতলবে বাইরে থেকে খিল ছিটকিনি খুলে মাঝরাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর ট্রেনের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে পালিয়েছে।

সে কথাই সুকান্তিকে বললাম।

সুকান্তি মানতে চাইল না। বলল, না রে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ঘরটা বোধহয় সত্যি সত্যিই হন্টেড। তোর আগে আরও দুটো এরকম কেস হয়েছে।

কীরকম, শুনি।

এবার পিসিমা মুখ খুললেন : জয়তাঁকে তুই চিনবি না। আমার ননদের বড় মেয়ে। বছরপাঁচেক আগে ও ওয়াশ হসপিটালে ওর এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিল। কী একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল যেন। তখন ও আমাদের বাড়িতে এসে থেকেছিল। রাতে নীচের ওই ঘরটায় শুয়েছিল। ও কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছিল।

কী দেখেছিল রাতে? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল।

পিসিমা শাড়ির আঁচলে হাত মুছলেন। তারপর বললেন, দাঁড়া, ভাতটা একবার দেখে আসি। আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আসি।

পিসিমা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

একটু পরেই ফিরে এসে বলতে শুরু করলেন।

রাত কত হয়েছিল জয়তীর খেয়াল নেই। তবে খুব গভীর রাত নিশ্চয়ই। হঠাৎই ও দেখল রেললাইনের দিকে একটা জানলার গ্রিলের বাইরে একটা ছায়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ওকে লক্ষ করছে।

জয়তী প্রথমটায় ভেবেছে চোর-ছ্যাচড় হবে। ও চিৎকার করতে যাবে, ঠিক তখনই দ্যাখে ছায়াটা গ্রিল ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ল–ঠিক একতাল মাখনের

মতো। জয়তী আর চিৎকার করতে পারেনি। ও কাঠ হয়ে শুয়ে ছায়াটাকে লক্ষ করতে চেষ্টা করছিল।

তখন শুক্লপক্ষ ছিল। তাই আবছা হলেও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল জয়তী। লোকটাও ওর বিছানার ধার ঘেঁষে পায়চারি করছিল। জয়তী ওর নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়েছিল। একটা সেন্টের গন্ধ পেয়েছিল। তারপর...তারপর...।

সুকান্তি আচমকা উঠে দাঁড়াল। বলল, মা, আমি একটু বাজারে বেরুচ্ছি। আচ্ছা, কাঁচালঙ্কা কি ফুরিয়ে গেছে, না আছে?

একশো নিয়ে আসিস।

সুকান্তি একটা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে বেরিয়ে গেল।

আমি পিসিমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সুকান্তির সামনে পরের কথাগুলো বলতে অসুবিধে হত...। পিসিমা বললেন, ও অবশ্য জানে–তাই আমার অসুবিধেটা বুঝতে পেরে চলে গেল। তোরা মেয়ে, তোদের সামনে বলা যায়...।

এরপর লোকটা জয়তীর গায়ে হাত দিয়েছিল। ওর..ওর...এত...এত ভালো লেগেছিল যে, ও মুখ ফুটে বারণ করতে পারেনি। পিসিমা চোখ নামালেন। ওঁর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল।

শ্রুতিদিরও দেখলাম কান-টান লাল হয়ে গেছে। অনধিকারী ভালোবাসায় তৃপ্তি পাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু শরীর যে সবসময় মনের কথা মানতে চায় না!

এইসব করতে করতেই লোকটা বিড়বিড় করে কবিতার মতো কী একটা আবৃত্তি করছিল। জয়তী দু-চারটে লাইন মনে করে আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না। শুরুটা এইরকম ছিলঃ যে আমাকে চিরদিন..., তারপর কী যেন।

শ্রুতিদি হঠাৎ বলে উঠল, যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে / অথচ যার মুখে আমি কোনওদিন দেখিনি, / সেই নারীর মতো...তারপর খানিকটা ঝাপসা, মনে

পড়ছে না…তারপর আবার আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, / আর তুমি নারী/ এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

আমি অবাক হয়ে শ্রুতিদিকে দেখছিলাম। ও থামতেই বলে উঠলাম, নামটা তোমার শ্রুতির বদলে শ্রুতিধর হলে মানানসই হত।

শ্রুতিদি হাসল।

পিসিমা আবার বলতে শুরু করলেন।

তারপর ছায়াটা আলমারির কাছে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কীসব করতে থাকে। তারপর চলে আসে টেবিলের কাছে। সেখানে ঝুঁকে পড়ে খানিক সময় কাটিয়ে দেয়। জয়তী ভেবেছিল, লোকটা বোধহয় টেবিলের ড্রয়ারটা খোলার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এরপর ছায়াটা চলে যায় আলমারির পেছনে। একদিক দিয়ে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর আবার ফিরে আসে জয়তীর কাছে। আবার ওইসব শুরু করে দেয়। জয়তী যখন নেশার ঘোরে প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের লাইন দিয়ে কানফাটানো শব্দ করে একটা ট্রেন ছুটে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে জয়তীর সেন্স ফিরে আসে। ও চেঁচিয়ে ওঠে। তখন অন্ধকার ছায়াটা যেন হাওয়ায় ভেসে জানলার গ্রিল ভেদ করে পলকে পালিয়ে যায়।

পিসিমার গল্প শেষ হতেই আমি হেসে বললাম, ভূত নয়, পিসিমা–চোর। খুব বদ টাইপের চোর। তোমাদের থানায় ইনফর্ম করা উচিত ছিল। লোকটা আলমারি খোলার চেষ্টা করে পারেনি। টেবিলের ড্রয়ারটাও খুলতে পারেনি। তখন তোমার ঘুমন্ত রিলেটিভকে নিয়ে অসভ্যতা করার চেষ্টা করেছে। ইশ, আমি যদি কাল সময়মতো চেঁচিয়ে উঠতে পারতাম! তা হলে সুকান্তি লোকটাকে পাকড়াও করে কষে ধোলাই দিতে পারত।

পিসিমা মাথা নাড়লেন : না রে, চোর-টোর নয়। পাঁচ-সাত বছর ধরে লোকটা একই বাড়িতে একই ঘরে একই কাজ করে চলেছে–এ কখনও হয়! কই, পাড়ার আর কারও বাড়িতে তো কখনও এরকম শুনিনি! তা ছাড়া জানলার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে লোকটা ঘরে ঢুকল কেমন করে, আবার পালালই বা কেমন করে! আর কাল রাতে বাইরে থেকে তোর ঘরের দরজার খিল-ছিটকিনি খুলল কেমন করে, বল!

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জেদি গলায় বললাম, তুমি যে এত জোর দিয়ে বলছ, তুমি নিজে কখনও ভূতটাকে চোখে দেখেছ!

পিসিমা পলকে কেমন উদাস হয়ে গেলেন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কেমন এক অদ্ভুত গলায় বললেন, না, আমি দেখিনি। প্রথমবার এরকম ঘটনা শোনার পর আমি একা ও-ঘরে অনেক রাত কাটিয়েছি, কিন্তু কেউ আসেনি। আমাদের অনেক রিলেটিভ ও-ঘরে রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কোনও প্রবলেম হয়নি। অবশ্য তারা বেশিরভাগই পুরুষ ছিল–আর দু-একজন বয়স্কা মহিলা। তাদের বেলা ওই নিশিকুটুম্ব দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়বার সে দেখা দিল জয়তীর বেলায়। তখন জয়তী তোর মতোই দেখতে-শুনতে সুন্দর, অল্প বয়েস। আমার মনে হয়, অল্পবয়েসি সুন্দরী মেয়েদের দিকে এই ভূতটার আলাদা কোনও টান আছে। ওদের প্রাণপণে ভালোবাসতে চায়। নইলে কেউ ওরকম করে! ওরকম কবিতা বলে!

আমি ঠোঁট টিপে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। তারপর মাথা নেড়ে বললাম, তুমি যতই বলো, পিসিমা, আমি ঠিক যেন ফুলি কনভিঙড হতে পারছি না।

এবার শ্রুতিদি জবাব দিল, তুই তখন থেকে এরকম জেদ ধরে আছিস কেন, রিমকি। শুরুতে তুই-ই তো বললি ঘরটা হন্টেড। তা ছাড়া মা এই যে বলল, ছায়াটা আলমারির পেছনে ঢুকে গেল– একদিক দিয়ে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে এল–এটা কি কোনও মানুষের পক্ষে ইম্পসিবল নয়?

কেন, ইম্পসিবল কেন!

আলমারির পেছনেই তো দেওয়াল! সেখানে দুইঞ্চিও ফাঁক নেই! তা হলে একটা গোটা মানুষ ঢুকবে কেমন করে?

আমি দমে গেলাম।

শ্রুতিদি বলেই চলল, তোকে তো লোকটা টাচ করেছিল। ওটা কোনও মানুষের ছোঁয়া? তুই বল! তখন তোর মন-শরীর অবশ হয়ে যায়নি? একটু চুপ করে থেকে শ্রুতিদি আবার নীচু গলায় বলল, ভাগ্যিস ট্রেনটা এসে গিয়েছিল…নইলে আরও বাজে কিছু হতে পারত!

তার মানে! আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কাল রাতে ঝমঝম শব্দে ট্রেন ছুটে গেছে বলে আমি বাজে কিছু হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি! পিসিমাদের ওই রিলেটিভ-জয়তী–সে-ও একইরকম ভাবে বেঁচে গেছে।

শ্রুতিদি এত সব জানল কেমন করে! কী করে মনে রাখতে পারল কবিতার ওই রোম্যান্টিক লাইনগুলো!

শ্রুতিদির মুখ থমথম করছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি এত জানলে কেমন করে?

শ্রুতিদির চোখে জল এসে গেল পলকে। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলতে গেলে ছুট-পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে পিসিমার দিকে তাকালাম।

পিসিমা মাথা নীচু করে বসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, শ্রুতিকে নিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়। তার আগে কখনও কিছু হয়নি। সে-রাতে ও একা শুয়েছিল ওই ঘরে। সেদিনটা আবার বাংলা বন্ধ ছিল। তাই কোনও ট্রেন চলেনি। অশরীরী সেই প্রেতটা সেদিন আর মাঝপথে থামেনি। ওর…ওর..সাধ মিটিয়ে তারপর উধাও হয়ে গেছে…।

আমি পাথর হয়ে গেলাম। আমি এসব কী শুনছি!

পিসিমা কেঁদে ফেললেন : সেদিন থেকে শ্রুতি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। পরে…পরে..ওকে মানসিকভাবে সুস্থ করার জন্যে মিছিমিছি অ্যাবরশন করাতে হয়। তোকে আমি লজ্জায় একথা আগে বলিনি। তা ছাড়া কেউই তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না। সবই আমাদের কপাল…

জয়তীর ব্যাপারটার পর এতবছর পার হয়ে গেছে…তাই ভেবেছিলাম ঘরটার দোষ কেটে গেছে। এখন দেখছি যায়নি! আমাদের হয়তো বাড়িটাই ছেড়ে দিতে হবে…।

শ্রুতিদির বিয়ে না করার কারণ হিসেবে কানাঘুষোয় কিছু-কিছু শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, আর-পাঁচটা ঘটনার মতোই ওর লাভার ওকে বিপদে ফেলে

পালিয়েছে। কিন্তু এখন পিসিমার মুখে এসব কথা শোনার পর সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

আমি কল্পনায় এক অতৃপ্ত প্রেমিককে দেখতে পাচ্ছিলাম–যার বয়েস একশো, দুশো, তিনশো, কি চারশো বছর। যার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আজও মেটেনি। এককালে সে হয়তো এইখানেই থাকত। পাগলের মতো আকুল ভালোবাসা নিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করত।

আমি চোখ বুজে ফেললাম। পায়রার বুকের নরম পালক আমার শরীরে বিলি কাটতে লাগল। আমি একটা চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

ঠিক তখনই পশ্চিমের রেল-লাইন ধরে ঝমঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল। তার হুইলের শব্দটা আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

# তিরিশ বছর পর চব্বিশজন

**তিরিশ বছর পর চব্বিশজন**

জানলার বাইরে ঝোড়ো বাতাস ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল খেলছিল। শোঁ-শোঁ শব্দ আর জানলার পাল্লার খটখট। বাইরে পাঁচিলের ওপরে কালো আকাশ, আর দু-পাশে বনেদি বাড়ির টুকরো। সেইসঙ্গে কয়েকটা গাছের ডালপালা আর চঞ্চল সবুজ পাতার আন্দোলন।

আদিত্য চেয়ারে বসে আনমনা হয়ে বাইরের ঝড় দেখছিল, আর বুকের ভেতরে ঝড়টা অনুভব করছিল।

প্রায় তিরিশ বছর পর পুরোনো স্কুলের ক্লাস-ঘরে বসেছে আদিত্য। ওকে ঘিরে রয়েছে তেইশজন সহপাঠী। ১৯৬৭-তে এই ক্লাস-ঘরে ওরা শেষ বসেছিল। তারপর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা পাস-টাস করে যে-যার জীবনরেখা ধরে চলতে শুরু করেছে। সেই রেখাগুলোয় কখনও কাটাকুটি হয়নি। অর্থাৎ, ঠিক তেমনভা, পুরোনো পরিচয়ের সূত্র দানা বাঁধেনি।

এই ক্লাস-ঘরটাই বোধহয় ছিল ইলেভেন-বি, সায়েন্স সেকশন। না কি পাশের ঘরটা?

এখন এই ক্লাস-ঘরে তিনটে টেবিল গায়ে গায়ে লাগিয়ে একটা বড় টেবিলের চেহারা দেওয়া হয়েছে। আর সেই টেবিল ঘিরে অনেকগুলো কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার। এছাড়া কয়েকটা খাটো বেঞ্চি রয়েছে পিছনের সারিতে। আর দেওয়াল ঘেঁষে দু-তিনটে ছোট টেবিল এলোমেলোভাবে রাখা।

তিরিশ বছর পর পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে বের করে স্কুলের ক্লাস-ঘরে এনে জড়ো করার পুরো কৃতিত্বই উৎপল, সুজিত আর কমলের। ওরা তিনজন কী করে

যেন যোগাযোগ বজায় রেখেছিল নিজেদের মধ্যে। তারপর তিনজনের মাথায় ঝোঁক চেপে যায়–পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে বের করতেই হবে। তিনজনের নামের অক্ষর জুড়ে ওরা তৈরি করে উৎসুক। এবং তিন সদস্যের উৎসুক কাজে নেমে পড়ে।

আদিত্য আরও কী সব ভাবছিল, হঠাৎই সুজিতের চিৎকারে ওর খোয়ারি ভাঙল।

অ্যাই, আদিত্য–তুই প্রথম শুরু কর। উৎপল, টেপটা চালু করে দে—

টেপের সামনে বন্ধুদের প্রত্যেককে দু-চার কথা বলতে হবে। এটা সুজিতের আইডিয়া।

উৎপল এক্সটেনশন বোর্ডের সঙ্গে ওর ছোট টেপ রেকর্ডারটা জুড়ে দিয়ে সুইচ অন করে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত ওপরে তুলে চেঁচিয়ে বলল, অ্যাই–চুপচুপ! আদিত্য শুরু করছে।

কমল ফোড়ন কেটে বলল, আমাদের রমেনবাবু হলে বলত, অ্যাই–সুপ–সুপ, এত হট্টগোল কীসের!

রমেনবাবু অঙ্কের স্যার ছিলেন। অঙ্কে তুখোড় বললে কম বলা হয়। আদিত্যদের ব্যাচে দু চারজন ছাড়া সবাই অঙ্কে লেটার পেয়েছিল।

আদিত্য উঠে দাঁড়াতেই হইহই একটু কমল।

একটা অদ্ভুত ঢেউ আদিত্যর বুকের ভেতরে ছেলেখেলা করছিল। ঢেউটা বারবার আছড়ে পড়তে গিয়েও ফিরে যাচ্ছিল পিছন দিকে। আবার এগিয়ে আসছিল।

আজকের দিনটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না– আদিত্য বলতে শুরু করল, আজকের দিনটা স্বপ্ন, নাকি সত্যি? আজ ১লা মে, নাকি ৩১শে এপ্রিল? এরকম একটা দিন আমার জীবনে উপহার দেবার জন্য উৎপল, সুজিত আর কমলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আজ এখানে এসে পুরোনো দিনের কথা…

আদিত্য কথা বলছিল, আর পুরোনো বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিরিশ বছর আগেকার পুরোনো মুখগুলো খুঁজছিল।

অশোকের মাথায় প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগই টাক। ফরসা মুখ বয়েসের ভারে ভারী হয়েছে। চোখে চশমা ওর বরাবরই। এখন বোধহয় পাওয়ার বেড়েছে,।

শশাঙ্ককে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। ছাত্রজীবনে একমাথা কোকড়া চুল ছিল ওর। এখন তার অবস্থা হেমন্তের অরণ্য। ফরসা চামড়া বৃদ্ধ হয়েছে। গাল বসে গেছে। শুধু হাসলে চেনা যায়। মুখটা পলকে তিরিশ বছর পিছিয়ে যায়। এখন শশাঙ্ক জাদুকর, অভিনেতা, আবৃত্তিকার। চাকরি করে পাবলিক সারভিস কমিশনে।

তিনজন পার্থকে নজরে পড়ল অদিত্যর। একজন ভট্টাচার্য, একজন ব্যানার্জি, আর একজন চক্রবর্তী। বয়েস তিনজনেরই মুখে থাবা বসিয়েছে। তবে সামান্য চেষ্টা করলেই পুরোনো মুখগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

বরং আদিত্যকেই অনেকে চিনতে পারেনি।

কারণ ৬৭-র সেই রোগা কালো শান্তশিষ্ট ছেলেটা অনেক পালটে গেছে। বাইরেও, ভেতরেও।

উৎসুক জানিয়েছিল, ১ মে ঠিক সাড়ে তিনটেয় স্কুলের একতলার একটা ঘরে পুনর্মিলনের আসর বসবে। এব্যাপারে কথাবার্তা বলে হেডমাস্টারমশাইয়ের অনুমতির ব্যবস্থা করে রেখেছিল উৎপল। সবাইকে চিঠি দিয়ে সেইমতো খবরও দিয়েছিল। এ ছাড়া প্রত্যেককে অনুরোধ করেছিল এক পৃষ্ঠায় নিজের জীবন সম্পর্কে লিখে জানাতে। এবং স্কুলের রচনার মতো কয়েকটা পয়েন্ট-ও দিয়ে দিয়েছিল সেই একপৃষ্ঠার জীবনীর জন্য : এখন কী করছ?, ঠিকানা (সম্ভব হলে ফোনসহ), পরিবারের সকলের খবর, অবসর কীভাবে কাটাও?, ভবিষ্যতের ভাবনা, ইত্যাদি।

চিঠিতে উৎসুক আরও জানিয়েছিল, প্রত্যেকের এই একপৃষ্ঠার জীবনী ফটোকপি করে একসঙ্গে বাঁধিয়ে বইয়ের মতো করা হবে। ১ মে এই বই প্রত্যেকের হাতে এককপি করে তুলে দেওয়া হবে। ভাবতে দারুণ লাগছে না?

নিজের জীবনী লিখতে বসে আদিত্য বিষণ্ণ হেসেছিল। উৎসুক যা জানতে চেয়েছে সে সবই হল জীবনের মেকানিক্যাল ডেটা–যান্ত্রিক তথ্য। তা থেকে কি আসল জীবনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাবে? বোঝা যাবে, আদিত্য ভালোবাসাহীন একটা মরুভূমির ওপর দিয়ে বহুদিন ধরে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে? সারাদিনের ক্লান্তিকর কাজের শেষে আদিত্য রোজ বাড়ি ফেরে, ঘরে ফেরে না। ওর নিঃসঙ্গতার সঙ্গী আকাশের চাঁদ, আর কয়েকটি তারা। আকাশে চাঁদ না থাকলে কত মানুষ যে অসহায় হয়ে যেত!

জীবনের যান্ত্রিক তথ্য যথাসময়ে উৎসুক-কে জানিয়ে দিয়েছিল আদিত্য। তারপর, আজ, তিনটে বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে এসে ঢুকে পড়েছে টাইম-মেশিনের দরজা দিয়ে পুরোনো সেই ক্লাস ঘরের মধ্যে।

ঘরে ঢোকামাত্র হইহই ও আদিত্য-এসেছে, দিতু এসেছে! আয়, আয়–

বেশ বড় ঘর। ঘরের মাঝখানে তিনটে টেবিল লম্বালম্বি জোড়া দেওয়া। সেই টেবিল-ত্রয়ী ঘিরে অনেকগুলো হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার।

ঘরের মেঝেতে রঙিন আলপনা, তবে ধুলোমলিন। এ ঘরটায় সরস্বতী পুজো হত–এখনও হয়।

ডানদিকের দেওয়াল সিমেন্টের ব্ল্যাকবোর্ড। এ ছাড়া কয়েকজন মনীষীর ফটো। বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে তিনটে কাঠের আলমারি–বেশ পুরোনো। আর মেঝেতে একপাশে গোটানো রয়েছে বিশাল এক নারকোল-দড়ির ম্যাট।

ঘরে দুটো বালব জ্বলছে। তা সত্ত্বেও ঘরটা যেন আধো-আঁধারি মনে হল আদিত্যর। তা ছাড়া মেঘের দৌলতে বিকেলের আকাশ এখনই ছাই-রঙা।

টাইম-মেশিনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তেই একটা পুরোনো বাতাস ঝাপটা মারল আদিত্যর নাকে। সেই সঙ্গে কেমন একটা পুরোনো গন্ধ।

পুরোনো ব্যাপারটা এই স্কুলের কাছে কিছু নতুন নয়। আদিত্যরা যখন এইচ. এস. পাশ করে বেরোয় এই স্কুলের বয়েস দেড়শো বছর। আর আজ এক কুড়ি কম দুশো।

হইচইয়ের মধ্যেই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা মধ্যবয়েসি একজন বেঁটেখাটো মানুষ প্রশ্ন করল, বিল তো, আমি কে?

আদিত্য প্রশ্নকর্তার ভারি মুখটা কয়েক সেকেন্ড ধরে দেখল। গাল-গলা-চোখের নীচ তিরিশ বছরে অনেক ভরে উঠেছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। আদিত্য শিক্ষানবিশ প্রতিমা শিল্পীর মতো ভারিক্কি মুখটার মাংস-চর্বি কমাতে লাগল। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল তিরিশটা বছর। মাথার সাদা চুলগুলো কালো রঙ করতে লাগল।

তারপরঃ কমল!

কমল হেসে ফেলল, বলল, বাঃ, পরীক্ষায় পাশ! যা বোস। অ্যাই, ওকে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ দে—

আদিত্য একটা চেয়ার নিয়ে বসল। পুরোনো বন্ধুদের একজন ঠান্ডা বোতল এগিয়ে দিল ওর সামনে। তাতে সামান্য চুমুক দিয়ে আদিত্য টাইম-মেশিনের অন্যান্য যাত্রীর মুখে চোখ বোলাতে লাগল। তুই কে? কী ছিল তোর নাম? কোন বেঞ্চে বসতিস তুই?

কাউকে কাউকে অস্পষ্ট ভাবে চিনতে পারছিল আদিত্য।

সুজিতের চেহারা সেই বালক বয়েসের মতোই আছে। শুধু ভারিক্কি হয়েছে আর কপালের দুপাশে বয়েসের রাজপথ চুলের অরণ্যে নগরায়ণ শুরু করেছে।

ক্লাস সেভেন থেকেই সুজিত ওদের ক্লাসে মনিটর ছিল। সাহেবদের মতো টকটকে ফরসা গায়ের রং, গম্ভীর গলা। ভাসা ভাসা মনে পড়ে, বড় ঘেরওয়ালা হাফপ্যান্ট পরে আসত স্কুলে। সেই সুজিত এখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

পার্থ ব্যানার্জির নাম ধরে কে যেন ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল কার সঙ্গে। তখনই আদিত্য চিনতে পারল ওকে…নাকি পারল না? গায়ের রং অনেক ময়লা হয়ে গেছে। চোখে রিমলেস চশমা, গাল সামান্য ভাঙা। এই হল অতীতের প্রথম পার্থ-র বর্তমান চেহারা।

ঘরের অস্পষ্ট আলোয় পুরোনো সতীর্থদের চিনে নিচ্ছিল আদিত্য।

উৎপল, উদয়ন, রূপক, শুভেন্দু, নরোত্তম, কমলেশ, শান্তনু, আরও সবাই।

এমন সময় আর একজন এসে ঘরে ঢুকল।

আদিত্য তাকে চিনতে পারল সহজেই : চঞ্চল। ওর পাশেই বসত। পড়াশোনায় তেমন দক্ষ না হলেও ভীষণ ভালো ছেলে ছিল। চুয়াল্লিশ পেরোনো কালো ছেলেটার মুখে আজও সেই একইরকম অপ্রস্তুত মিষ্টি হাসি।

ঘরে যে এসে ঢুকছে তাকেই হইহই করে স্বাগত জানাচ্ছে শান্তনু, কমল, উৎপল, সুজিত। তারপরইঃ অ্যাই, আগে পরীক্ষা দে। এক এক করে সবার নাম বল। বল, এটা কে বসে আছে?

উত্তর ঠিক হলে পর একপ্রস্ত হইচই, আর না হলে পরে বকুনি। তবে পরীক্ষায় পাস বা ফেল যা-ই হোক না কেন, হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে সামনে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কস।

সুব্রতর কথা মনে পড়ছিল আদিত্যর। ওর সামনের বেঞ্চে বসত। লেখাপড়ায় দারুণ ছিল। দুরন্তপনাতেও। আদিত্যকে কখনও দিতু কখন তু-তু বলে খেপাত। আদিত্য অন্যমনস্ক হলেই মাথায় চঁটি মেরে অন্য দিকে তাকিয়ে ভিজে বেড়ালের মতো বসে থাকত। ছোট গোলগাল মুখ, মাথার চুলগুলো খাড়া-খাড়া।

সুব্রত খুব প্রাণবন্ত ছিল, ছটফটে ছিল। একটুখানি ডাকাবুকোও।

আদিত্যর মনে পড়ছিল, একবার ট্রামে ওর সঙ্গে কী নিয়ে যেন ঝগড়া হয়েছিল। আদিত্য সুব্রতকে এক ধাক্কা মেরেছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে কেন! সুব্রত এক টানে ওর ব্যাগের ফিতে ছিঁড়ে ব্যাগটা ফেলে দিয়েছিল মেঝেতে।

কিন্তু শুধুই কি ঝগড়া! সুব্রত ওকে ভালোও বাসত। টিফিনে ছোলাভাজা, কুল বা হজমি কিনলে আদিত্যকে ভাগ দিত, আর বলত, জানিস দিতু, স্কুলের টিফিনে আমার পেট ভরে না।

এই ছোলাভাজাটা খেয়ে দ্যাখ। কী দারুণ, না? ফ্যানটাসটিক!

কথায় কথায় কী দারুণ, না? ফ্যানটাসটিক! বলাটা সুব্রতর যেন মুদ্রাদোষ ছিল।

এতদিন সুব্রতর স্মৃতিটা কীরকম ঝাপসা ছিল। সংসারের নানান সমস্যার মাঝে ওকে মনেই পড়ত না। অথচ আজ এই টাইম-মেশিনে ঢুকে সুব্রত স্মৃতির পিছনের সারি থেকে একেবারে সামনে চলে এসেছে।

সুব্রত আজ আসেনি। এলে ওকে সঙ্গে-সঙ্গেই চিনতে পারত আদিত্য। ওকে ভোলা যায় না। ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হত, কিন্তু সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশত, মজা করত। গরমের ছুটি পড়ার দিন স্যারদের আপ্যায়নের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সুব্রত যেমন উৎসাহী ছিল, তেমনটাই ছিল সরস্বতী পুজোর ব্যাপারে।

একবার স্কুল ছুটির সময়ে পেয়ারা কিনতে গিয়ে দুটো ছেলের সঙ্গে আদিত্যর প্রায় হাতাহাতি হয়। ছেলে দুটো ওকে একা পেলে মারবে বলে ভয় দেখায়। আদিত্য খুব ভয় পেয়ে গিয়ে সুব্রতকে ব্যাপারটা বলেছিল। শুনে বেপরোয়া সুব্রত গালাগাল দিয়ে বলেছিল, কোন শালা তোকে মারবে বলেছে! দেখি কার হিম্মত তোর গায়ে হাত দেয়–

সুব্রত সেদিন আদিত্যকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

হঠাৎই আদিত্য চমকে উঠল।

ওই তো সুব্রত! ঘরের পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে একটা টেবিলের ওপরে বসে আছে। বসার ভঙ্গিটা রকে আড্ডা মারার মতো, কিন্তু আবছায়া মুখে বিষণ্ণ ছাপ। আধো-আঁধারিতে চুপচাপ বসে আছে–যেন সম্প্রতি কোনও মানসিক আঘাত পেয়েছে।

ঘরের মধ্যে নানান কথার কলরোল। তাকে ছাপিয়ে মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছিল মেঘের ডাক।

টেপ রেকর্ডারের সামনে নিজেদের অনুভবের কথা এক এক করে বলছিল সকলে। পুরোনো দিনের কথা, স্যারদের কথা, স্কুল স্পোর্স-এর কথা, সরস্বতী পুজোর কথা।

উৎপল হঠাৎই হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল। তারপর একটা জীর্ণ মলিন বই তুলে দেখাল সকলকে।

এটা আমাদের ক্লাস এইটের বাংলা বই

আদিত্য হাতে নিয়ে দেখল বইটা। নাম সাহিত্য মুকুল। সেলাই ছিঁড়ে গেছে, পৃষ্ঠাগুলো ক্ষয় ধরা হলদে। অতীতের চিহ্ন অতি সহজেই চলে এসেছে বর্তমানে। তারপর ওদের সবাইকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে অতীতে।

বইটা হাতে নিয়ে অদ্ভুত লাগছিল আদিত্যর। অতীত, না বর্তমান কোনটা বেশি সত্যি? বর্তমানের জন্মের বীজ লুকিয়ে থাকে অতীতে। অতীত কায়া, বর্তমান তার ছায়া।

বইটা সবাই হাতে-হাতে দেখতে লাগল।

বাইরে মেঘের ডাক বাড়ছিল। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগের বাতাস স্কুলের ভোলা উঠোনে পাক খেয়ে ঢুকে পড়ছিল ঘরের ভেতরে।

উৎপল আর একটা খাতা তুলে দেখাতে চাইল সবাইকে।

এই খাতায় আমাদের কয়েকজনের লেখা কবিতা আর গদ্য রয়েছে। ক্লাস সিক্সে এগুলো আমি লিখিয়ে নিয়েছিলাম। জিতেনবাবু মনে আছে, আমাদের বাংলা পড়াতেন? উনি একদিন বলেছিলেন, কে জানে, তোদের মধ্যে কেউ হয়তো একদিন নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে–

একথা শুনে অনেকে হেসে উঠল।

উৎপল একটু চুপ করে থেকে বলল, ক্লাস সিক্সে ব্যাপারটা আমি ঠাট্টা বলে ভাবিনি। তাই যারা নোবেল প্রাইজ-টাইজ পেতে পারে বলে আমার মনে হয়েছিল, তাদের দিয়ে এই খাতাটায় কিছু লিখিয়ে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে শান্তনুর একটা লেখা ছিল আমার প্রিয় বই। ও আরণ্যক-এর কথা লিখেছিল। সেই লেখার প্রথম কয়েকটা লাইন আজকের দিনটার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিশে গেছে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি–

শান্তনু নোবেল প্রাইজ পায়নি। জামশেদপুরে টিসকোয় ম্যানেজার। সেই ছোটবেলা থেকেই বাংলায় মাস্তান ছিল। নানা জায়গায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেত।

উৎপল পড়তে শুরু করল, স্মৃতি সততই সুখের। স্মৃতি যেন অধরা মাধুরী। ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে বলেই স্মৃতি এত আকাঙ্ক্ষার। এমন কোনও জীবন নেই যে-জীবনে কোনও পিছুটান নেই। স্মৃতির পথ আমাদের পৌঁছে দেয় অতীতের নানা সুখের দিনে, ভালোবাসার দিনে।

পথের পাঁচালি র লেখকের স্মৃতিপথের পাঁচালি আরণ্যক।

উৎপল থামল।

আদিত্য মুগ্ধ হয়ে শুনল। ক্লাস সিক্সের এক বালক এইরকম লেখা লিখেছে! শান্তনুর দিকে দেখল আদিত্য। ওকে তখন বাহবা দিচ্ছে কয়েকজন সহপাঠী।

সুজিত আর কমল কখন যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই ওরা হইহই করে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা একটি ছেলে। তার কাঁধের ঝুড়িতে ছোট ছোট মিষ্টির বাক্স।

সুজিত চেঁচিয়ে বলল, বন্ধুগণ, আমাদের ছেলেবেলায় সেই পুঁটিরামের প্যাকেট। মনে পড়ছে, পুঁটিরামের মিষ্টির দোকান?

মনে পড়ছে না আবার! সুতরাং ঘর জুড়ে তুমুল হাতহালি।

হাতে-হাতে সবার কাছে পৌঁছে গেল মিষ্টির বাক্স। খাওয়া শুরু হল। উৎপল সেই ফাঁকে টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটটা উলটে দিল।

আদিত্য বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। শশাঙ্ক মাঝে মাঝে দু-চার লাইন করে কবিতা আবৃত্তি করছিল। আবার কখনও ছোটখাটো ম্যাজিক দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই কমল চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, চুপ কর সবাই। অরিন্দম এবার বলবে।

অরিন্দমের স্বাস্থ্যবান চেহারা, চাপদাড়ি, মুখে একটা ব্যবসায়ী ভাব। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকের দিনটার কোনও মানে হয় না। এই স্কুলে একসঙ্গে

পড়েছি তো কী হয়েছে? স্কুল শেষ হয়েছে, স্কুল-লাইফও শেষ হয়ে গেছে। যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে নাচানাচি করে লাভ কী? এখন লাইফে অনেক প্রবলেম। সব কিছু লাভ-ক্ষতি দিয়ে বিচার করতে হয়।

আচমকা কথা শেষ করে অরিন্দম বসে পড়ল।

আদিত্যর ওকে কসাই মনে হচ্ছিল। জীবনের সব অঙ্কই কি লাভ-ক্ষতির অঙ্ক? ওর দেবিকার কথা মনে পড়ল। বিয়ের পর থেকেই দেবিকার এক অভিযোগ ও আদিত্য মোটেই প্র্যাকটিক্যাল নয়। সেন্টিমেন্টাল ফুল। আবেগপ্রবণ গণ্ডমূর্খ। হয়তো কথাটা সত্যি। সেইজন্যই বোধহয় আদিত্য নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়েছে। আগে ও অনেক কথা বলত, যার মধ্যে বেশিরভাগটাই বাজে কথা। আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠলে কি অপরূপ ঘন মেঘ করলে ও আর দেবিকাকে ডাকে না, দেবিকা তখন হয়তো কোনও কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

আদিত্যর ছেলে সুমিত ক্লাস এইটে পড়ে। কিন্তু এরই মধ্যে সে মায়ের জীবনতত্ত্বে দীক্ষা নিয়েছে। আদিত্য বুঝতে পারে।

সুমিত আদিত্যকে ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যেও ওর প্রয়োজনটা জানাতে কখনও ভুল হয় না। একটা বাচ্চা ছেলে তার প্রয়োজনের কথাটা কখনও ভুলবে না? কখনও বাজে খরচ করতে চাইবে না? অপচয়ের মধ্যেই যদি মানুষকে চেনা যায় তাহলে ছেলেকে আদিত্য আলাদা করে চিনবে কেমন করে!

শুভেন্দুর কথায় আদিত্য জেগে উঠল। ও তখন টেপ রেকর্ডারের সামনে কথা বলছে। বালক বয়েসের মতোই রোগা-সোগা চেহারা, চোখে রিমলেস শৌখিন চশমা, মাথায় কয়েক গাছা পাকা চুল। ক্লাসে শুভেন্দু বেশ মজা করে কথা বলত।

আমি একটা ছোটখাটো ব্যবসা করি। লাভ-ক্ষতির হিসেব আমাকেও করতে হয়। অরিন্দমের মতো। সোজা কথায়, রাত-দিন টুপি পরানোই আমার কাজ। কখনও ব্যাঙ্ককে টুপি পরাচ্ছি। কখনও সাপ্লায়ারকে টুপি পরাচ্ছি। আর কখনও কাস্টমারকে। সেইজন্যেই আজকের সন্ধেটা আমার দারুণ লাগছে। আমি মনে প্রাণে এই ভেবে খুশি যে, এখন আমাকে কাউকে টুপি পরাতে হবে না। সোজা কথা ভাই, রোজকার জীবনে টুপি পরাতে-পরাতে আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি।

শুভেন্দুর পর দীপক। ময়লা রং, সরু গোঁফ, চঞ্চল চোখ। একটা সদাগরি অফিসে সামান্য কেরানির চাকরি করে। ঘরে ঢোকার পর দীপক প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্ট ছিল। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে।

দীপক বলতে শুরু করল, এখানে আসার কথায় আমার একটু কিন্তু কিন্তু লাগছিল। তোরা সব বিরাট পোস্টে চাকরি করিস, কেউ বা বিশাল বিজনেসম্যান। আর আমি বারোশো টাকা মাইনের কেরানি। যে-কোনও দিন চলে যেতে পারে এমন একটা চাকরি। তাই এখানে আজ এসে মনে হচ্ছিল আমার অবস্থা অনেকটা হংস মধ্যে বকো যথা। কিন্তু টেরই পাইনি কখন যেন আমি বক থেকে হাঁস হয়ে গেছি। তোদের মাঝে একাকার হয়ে গেছি।

দীপকের পর কমলেশ। ও এখন সাহা ইন্সটিটিউটে বিশাল বিজ্ঞানী থিয়োরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট।

আমি নতুন কথা কী আর বলব! বরং স্কুলে আমার প্রথম দিনটার কথা বলি। আমি হুগলির এক গ্রামের স্কুল থেকে এসে এই স্কুলে ভরতি হয়েছিলাম। বাবা বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তাই আমাকেও স্কুল বদল করে এখানে এসে ক্লাস সেভেনে ভরতি হতে হয়েছিল। প্রথম দিন স্কুলে এসে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড বিল্ডিং, সারি সারি অসংখ্য ক্লাস-ঘর। তো আমি ভুল করে ক্লাস এইটের বি সেকশানে ঢুকে পড়েছিলাম। ভুল যে করেছি সেটা পরে বুঝেছিলাম। যাই হোক, ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় না তৃতীয় বেঞ্চে বসেছি–দেখি, ক্লাসে যে-টিচার ছিলেন তিনি প্রথম বেঞ্চ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ছেলেকে একে-একে কাছে ডাকছেন। তারপর জম্পেশ করে তার কর্ণমর্দন করে ঘাড়ে একটি রদ্দা বসিয়ে দিচ্ছেন। তার এই অমানুষিক আক্রমণ থেকে কেউই বাদ যাচ্ছে না। ব্যাপারটা ক্রমশই আমার কাছে এগিয়ে আসছিল। ভয়ে আমার তখন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এমন সময়ে একজন বেয়ারা একটা নোটিস নিয়ে ক্লাসে আসে। সেই সুযোগে আমি ক্লাস রুমের পেছনের দরজা দিয়ে চম্পট দিই। একটু থামল কমলেশ। তারপর বলল, আর-একটা ব্যাপার মনে পড়ছে। দোতলায় ক্লাস সেভেন এ-র ঘরে পাশের পার্ক থেকে একটা গাছের ডাল ঢুকে পড়েছিল একটা জানলা দিয়ে। টিফিনের সময় কেউ-কেউ ওই ডাল বেয়ে পালিয়ে গিয়ে মুনলাইট হলে সিনেমা দেখত। জানি না, ওই ডালটা এখনও আছে কি না।

কমলেশ বসে পড়তেই শান্তনু-উদয়ন-রূপক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, গাছটা এখনও আছে। ইচ্ছে করলে ওটার মহানুভবতায় এখনও সিনেমা দেখা যায়।

সুজিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটা দুঃখের খবর দিই। কমলেশ যার কথা বলল, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। বছর ছয়েক আগে সুকুমারবাবু সুইসাইড করেছেন।

সুকুমারবাবুর চাপড়, কানমলা আর রদ্দা বিখ্যাত ছিল। জর্দা-পান খেতেন। গলা ফাটিয়ে হাসতেন। দেখে মনে হত, কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই। সেই মানুষটা আত্মহত্যা করতে গেল কেন? সুকুমারবাবুকে হিংসে হল অদিত্যর। ওর যদি ওরকম সাহস থাকত।

সুব্রত দূরে একটা চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল। ওর মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। গায়ের রং কেমন কালচে নীল দেখাচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মেঘের ডাকও শোনা যাচ্ছে ঘন-ঘন। ভোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ঢুকে পড়ছে ঘরে। সুব্রতর মাথার কাছেই জানলাটা। ওর গায়ে জল লাগছে। কিন্তু ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ও চুপচাপ দোল খাচ্ছে।

এক-একজনের কথা শেষ হওয়ার পর তুমুল হাততালির মধ্যে সুব্রতর কথা শুনতে পাচ্ছিল আদিত্য। অন্তত ওর তাই মনে হচ্ছিল।

কী দারুণ, না? ফ্যানটাটিক!

উৎপল বলল, আমাদের প্রত্যেকের লেখাগুলো নিয়ে জেরক্স করে একটা বই তৈরি করে আমি নিয়ে এসেছি। সব বই এখনও তৈরি হয়নি। তা ছাড়া কভারটা এখনও কমপ্লিট হয়নি। নরোত্তম কভার আঁকছে।

নরোত্তমের হাতের লেখা ছিল অপূর্ব, আর ছবিও আঁকত খুব সুন্দর। যাক, এই তিরিশ বছরে ও তাহলে আঁকার অভ্যেসটা ছেড়ে দেয়নি। ভাবতে ভালো লাগল আদিত্যর। কারণ, এই তিরিশ বছরে ওকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে।

উৎপলের দেওয়া বইটা সবাই একে-একে নিয়ে দেখতে লাগল।

উৎপল বলল, এরপর আর একদিন আমরা মিট করব। সেদিন বইটা সবাইকে দিতে পারব।

আদিত্য প্রত্যেকের জীবনী উলটেপালটে পড়ছিল। পড়তে-পড়তে ওর মনে হল, দীপক খুব একটা মিথ্যে বলেনি। ওদের বেশিরভাগই প্রতিষ্ঠিত, সফল। কিন্তু এটাই তো একমাত্র ছবি নয়। এটা প্রত্যেকের জীবনের মলাট। মলাটের ওপিঠেই রয়েছে আসল জীবন। সেটার খবর কে রাখে!

তৃতীয় পার্থ, পার্থসারথি চক্রবর্তী, তখন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের কথা বলছিল। ওর চোখে চশমা। মাথার সব চুল প্রায় সাদা করে ফেলেছে। ও এখন সরকারি-আমলা, জিওলজিতে ডক্টরেট।

অরিন্দম বলছিল, এসব করে কী লাভ। প্রথমে বুঝতে পারিনি কী লাভ…কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। অসম্পূর্ণ কখনও পূর্ণের স্বরূপ বুঝতে পারে না। ময়ুর কখনও জানতে পারবে না আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার কী স্বাদ। তাই সে বলবে, উড়ে লাভ কী। যাই হোক, আমি বরাবরই ভাই কলকাতায় আছি। প্রত্যেক বছর সরস্বতী পুজোর দিন আমি স্কুলে আসি…।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ রিমঝিম করে বাড়ছে। সেই সঙ্গে শনশন হাওয়া। একটা অদ্ভুত আমেজ অদিত্যকে জড়িয়ে ধরছিল।

আমাদের সময়েও এই ঘরটাতেই সরস্বতী পুজো হত। তখন সরস্বতীর দুপাশে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা দুটি বালকের মূর্তি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন আর সেই মূর্তি দুটো থাকে না। আমি প্রত্যেক বছর সরস্বতী পুজোর দিন এখানে এসেছি…কিন্তু কেন এসেছি জানি না। একটু হাসল পার্থ ও এসে কী লাভ হয়েছে তা-ও বুঝিয়ে বলব? ধরা যাক, একটা ঘরের একটা জানলা বহুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। হঠাৎই যদি সেই জানলাটা খুলে দেওয়া হয় তা হলে প্রথম যে-বাতাসটা ঘরে ঢোকে তার একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ আছে। তার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণ থাকে। সেটা ঠিক ভাষায় বুঝিয়ে বলা যায় না। আজকের সন্ধেটা আমার কাছে ঠিক সেইরকম…।

সকলে হাততালি দিয়ে হইহই করে উঠল।

আদিত্য দেখল, ঘরের এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে সুব্রত ঠোঁট নাড়ল। বোধহয় ফ্যানটাটিক বলল। তারপর আলতো হাততালি দিল। অথচ ওর চোখমুখে কোনও খুশির ভাব নেই।

আদিত্য ইশারা করে ওকে কাছে ডাকল।

সুব্রত মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। ওর নীলচে মুখে কেমন অভিমানের ছাপ।

দীপক চেঁচিয়ে পার্থসারথিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, তুই এত ভালো বাংলা শিখলি কোত্থেকে!

পার্থ দূরের একটা টেবিলে চড়ে বসেছিল। হেসে জবাব দিল, জানো না, আমার ফাদার বাংলার টিচার ছিল!

ঘরের মধ্যে এলোমেলো হইচই হচ্ছিল। একটা বাচ্চা ছেলে কোথা থেকে এসে কেটলি আর ভঁড় নিয়ে ঢুকে পড়ল। ঘরের মাঝবয়েসি বাচ্চাগুলোকে একে-একে চা দিতে লাগল।

না, উৎসুক আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখেনি।

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, অ্যাই সুজিত, আমাদের মধ্যে আজ কারা কারা আসেনি, কে কোথায় আছে একটু পড়ে শোনা তো। জেরক্স করা বইটা যখন হাতে পাব তখন ধীরেসুস্থে পড়ে দেখব।

উৎপল চেঁচিয়ে সবাইকে থামাতে চেষ্টা করল।

সুজিত একগোছা কাগজ নিয়ে মনিটরের ভঙ্গিতে পড়তে লাগল ও এই লিস্টটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। পরে সবাইকে এটার একটা কপি দিয়ে দেব...।

সুজিতের লিস্ট পড়া শেষ হল। ক্লাস ইলেভেনে ওরা একচল্লিশ জন ছিল। আজ সতেরোজন আসতে পারেনি। কেউ কলকাতার বাইরে, কেউ বিদেশে, আর কেউ-বা খুব জরুরি কাজে আটকে গেছে।

আদিত্য চব্বিশজনকে গুনছিল, খুঁটিয়ে দেখছিল আবার।

ঠিক তখনই কে যেন বলল, সুব্রত চার বছর আগে মারা গেছে। সিমলিপালে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনদিনের জ্বরে মারা যায়। অসুখের কারণটা ডাক্তাররা ধরতে পারেননি।

আদিত্যর বুকের ভেতরটা ঠান্ডা পাথর হয়ে গেল। হাত-পাগুলো যেন জেলির তৈরি। ওর মাথা টলে গেল, চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ঘরের কোণে সুব্রতকে দেখতে পাচ্ছিল। ওর শরীর বৃষ্টিতে ভেজা, নীলে নীল।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে সকলের বলা শেষ হল। তারপর শান্তনুর প্রস্তাবে সবাই মিলে গান ধরল : পুরানো সেই দিনের কথা…।

আদিত্য লক্ষ করল, সুব্রত ঠোঁট নাড়তে নাড়তে ওর কাছে এগিয়ে আসছে। ওর নীল গাল বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

আদিত্যর খুব কাছে এসে দাঁড়াল সুব্রত।

গান শেষ হলে পর ঝুঁকে পড়ে আদিত্যর কানে কানে ফিশফিশ করে বলল, ফ্যানটাসটিক!

আদিত্যর কান্না পেয়ে গেল। এই টাইম-মেশিন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে কিছুতেই ওর মন চাইছিল না।

# বিড়াল

## বিড়াল

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঠিক সাতটা বেজে সতেরো মিনিট। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ ঠিক তেরো মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠেছেন অতীশ সেন। অর্থাৎ, গত দু-বছর ধরে তিনি ঠিক সাতটা তিরিশ মিনিটে ঘুম থেকে উঠেছেন। এই তেরো মিনিটে তাকে কতকগুলো কাজ সারতে হবে–জরুরি কাজ।

এক নম্বর, বালিশের তলা থেকে ০.২২ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করা–এবং তিনি তাই করলেন।

দু-নম্বর, রিভলভারের চেম্বার চেক করা…(এবং করলেন)।

এবার ললাডেড রিভলভারটা ডানহাতে নিয়ে বাঁ-হাতে একটা বালিশ টেনে নিলেন অতীশ। এগিয়ে গেলেন রুবির বিছানার দিকে। প্রায় একইসঙ্গে ঘটে গেল দুটো ঘটনা। প্রথম, বালিশ দিয়ে ঘুমন্ত রুবির মুখ চাপা দেওয়া এবং দ্বিতীয়, তৎক্ষণাৎ বালিশের ওপর গুলি করা। ঘড়ির দিকে তাকালেন অতীশ সাতটা বাইশ।

এমনভাবে তাঁকে কাজগুলো সারতে হবে, যাতে এক সেকেন্ডেরও হেরফের না হয়। রুবির মৃতদেহটা একপাশে ঠেলে দিয়ে ওর তোশকের নীচে হাত ঢোকালেন অতীশ। হ্যাঁ, ঠিক যা ভেবেছেন তাই–থরেথরে টাকা সাজানো ওর তোশকের নীচে।

রুবিকে বিয়ে করার পর গত দু-বছর ধরে অতীশ শুধু ভেবেছেন এই টাকাগুলোর কথা। নয়তো একথা কে বিশ্বাস করবে যে, শুধুমাত্র প্রেমতাড়িত হয়ে

তিনি (অতীশ সেন সুপুরুষ) একটা মোটকা, পঞ্চাশ বছরের বুড়িকে বিয়ে করেছেন?

রুবি সেন খুবই অদ্ভুতভাবে বিয়ের দিনপনেরো পর থেকেই পক্ষাঘাতে কাহিল হয়ে পড়েছেন এবং নিজের বিছানা ছেড়ে আর নড়তেন না–অন্তত যতক্ষণ অতীশ বাড়িতে থাকতেন। প্রথম প্রথম অতীশ সন্দেহ করেননি, কিন্তু একদিন লক্ষ করলেন যে, রেফ্রিজারেটরে রাখা ডিমগুলো থেকে দুটো ডিম হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে। এ বিষয়ে রুবিকে প্রশ্ন করামাত্রই ওর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেছিল। তখনই অতীশ সন্দেহ করেছিলেন রুবি পক্ষাঘাতে মোটেই কাবু নয়।

তবে কেন এই অভিনয়?

এর উত্তর একটাই হতে পারে। তা হল, ওই বিছানার নীচেই রয়েছে রুবির সমস্ত টাকা– যে-টাকার খবর অতীশ কানাঘুষোয় শুনেছেন।

রুবি কোনওদিনই অতীশকে জানতে দেননি যে, তার টাকা আছে। এবং অতীশও কোনওদিন তাকে জানতে দেননি যে, তার টাকার কথা তিনি জানেন। রুবি সেন অতীশের নকল ভালোবাসার কথা বিয়ের কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সবসময় নিজের টাকাকে আগলে রেখেছেন– যখের মতো।

সাতটা সাতাশ।

আর তিন মিনিট। চট করে বাথরুমে গিয়ে শেভ করার সেফটি রেজার, সাবান, ব্রাশ, টুথব্রাশ নিয়ে এলেন অতীশ। একটা ব্রিফকেসে ভরে ফেললেন। তারপর ব্যাগটা বোঝাই করলেন টাকায়– রুবির টাকায়। একশো, দশ, পাঁচ, একটাকার নোটের মোটা-মোটা বান্ডিলগুলো (উত্তরাধিকার সূত্রে রুবি যার মালিক হয়েছে) দেখে অতীশ সন্তুষ্ট হলেন।

সাতটা উনতিরিশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ড।

রিভলভারটা ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে ব্রিফকেস লক করে দিলেন তিনি। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললেন বারান্দার দিকে। নীচু হয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। তারই ফাঁকে ঘড়ির দিকে তাকালেন সাতটা তিরিশ মিনিট এক সেকেন্ড। যাক, ঠিকই আছে সময়টা। সময়ের গণ্ডগোল হলেই বিপদ।

এই যে, মিস্টার সেন! সামনের খোলা বাগান থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

এই ডাকটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন অতীশ। কারণ গত দু-বছর ধরেই সাতটা তিরিশমিনিট পাঁচ সেকেন্ডের সময় তিনি বারান্দার কাগজ হাতে হাজির থাকেন। এবং পাশের বাড়ির বাগান থেকে মিসেস সরকার তাঁকে ঠিক এইভাবেই ডাকেন।

মিসেস সরকারের দিকে চেয়ে হাসলেন অতীশ। মিসেস সরকার বাগানে জল দিচ্ছিলেন, পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর বছরসাতেকের বাচ্চা ছেলেটা।

হয় আপনি আজ দু-মিনিট আগে উঠেছেন, নয়তো আমার ঘড়ি দুমিনিট স্লো আছে। হাসতে হাসতে বললেন মিসেস সরকার।

ভীষণভাবে চমকে উঠলেন অতীশ। খবরের কাগজটা আর-একটু হলেই হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। নাঃ, এই সময়ের ব্যাপারটায় আমাকে খুব সাবধান হতে হবে। কিন্তু দু মিনিট আগে এলাম কেমন করে? তা হলে কি আমার ঘড়ি ভুল?

না মিসেস সরকার, আপনার ঘড়িই স্লো আছে দু-মিনিট।

সে কি আর আমি জানি না! একগাল হাসলেন তিনি ও আপনাকে দেখেই তো আমার ঘড়ি মেলাই আমি।

হঠাৎই সুর পালটে প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা, একটু আগে কি আপনার বাড়িতে চেয়ার টেবিল উলটে পড়েছিল?

না তো! কেন?

না, কেমন যেন একটা শব্দ শুনলাম। তাই–।

মাই গড! আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছিল? ইশ, বালিশটা যদি রুবির মুখে না চেপে, রিভলভারের নলে চাপতাম।

ও, ওটা বাথরুমের দরজার শব্দ। দরজাটা কেমন যেন আটকে গেছিল। তাই জোরে খুলতে গিয়ে।

হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়ল অতীশেরসাতটা আটতিরিশ। খবরের কাগজ ভাঁজ করে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। ঘরে ঢোকার সময় শুনলেন মিসেস সরকারের ছেলে বাচ্চু ওর মা কে বলছে, মা, এখন ঠিক সাতটা বেজে আটতিরিশ মিনিট।

মনে মনে খুশি হলেন অতীশ। ঠিক এইভাবেই তাকে চলতে হবে সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

গত একবছর ধরেই অতীশ সন্দেহ করছেন যে, তার অনুপস্থিতিতে (সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধে সাড়ে ছটা পর্যন্ত) রুবি চলাফেরা করে বেড়াতেন। প্রায়ই দেখতেন, অফিসে যাওয়ার সময় যেটা যেরকম দেখে গেছেন, ফিরে আসার পর ঠিক সেইরকমটি আর নেই। একটু যেন অদলবদল হয়েছে। অথচ রুবি সেই একইভাবে বিছানার শুয়ে আছেন। বাড়িতে যখন আর কেউ নেই, তা হলে ওগুলো সরাল কে? নিশ্চয়ই রুবি। রুবির চিন্তাকে মগজ থেকে সরিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে গেলেন অতীশ।

সাতটা চল্লিশ।

তিনটে স্যান্ডউইচ বের করলেন ফ্রিজ থেকে। ওঃ, আবার সেই ভুল! মনে মনে নিজেকে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন অতীশ সেন। তাকে ভীষণ সাবধান হতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা স্যান্ডউইচ ঢুকিয়ে রাখলেন ফ্রিজে। রোজ এই সময় তিনি দুটো স্যান্ডউইচই খান এবং তৃতীয় একটা নেন রুবির জন্য। গত দু-বছর ধরে তাই করেছেন। সুতরাং অভ্যাসবশে তিনটে স্যান্ডউইচ নিয়ে ফেলেছিলেন।

স্যান্ডউইচ দুটো শেষ করে অত্যন্ত সাবধানে ফ্রিজ থেকে নিজের জন্য একটা (দুটো নয়) ডিম বের করলেন। হিটারে জল চাপিয়ে তার মধ্যে ডিমটা ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ তার খেয়াল হল, তাড়াতাড়িতে শেভ করতেই ভুলে গেছেন। সর্বনাশ! এরকম উলটোপালটা হলেই মহা বিপদ!

তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে ব্রিফকেসটা ঘর থেকে বের করে আনলেন (রুবির মৃতদেহের দিকে তাকালেন না অতীশ)। ওটা খুলে টাকার বান্ডিলের নীচ থেকে শেভ করার সাজ-সরঞ্জাম বের করে বাথরুমে ছুটলেন।

শেভ করে ব্রিফকেস আবার গুছিয়ে যখন ডাইনিং রুমে ফিরে এলেন, তখন সাতটা সাতান্ন।

চটপট ডিমটা প্রায় গিলে ফেললেন অতীশ। এরকম ভুল করলে কারও খুন করাই উচিত নয়। এক সেকেন্ডেরও গণ্ডগোল তিনি হতে দেবেন না। ঠিক আটটায় পুপুকে সদর দরজা খুলে ঢোকাতে হবে বাড়িতে। রোজকার মতো।

আটটা বেজে এক সেকেন্ড।

তাড়াহুড়ো করে সদর দরজা খুললেন অতীশ। ঠিক পায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে বেড়ালটা। দরজা খোলা পেয়ে ওটা ঘরে এসে ঢুকল। অতীশের পায়ে গা ঘষতে লাগল। পুপুকে গত দু-বছর ধরেই আটটায় দরজা খুলে ঘরে ঢোকান অতীশ। ধবধবে লোমের পুঁটলি যেন বেড়ালটা। সুন্দর দেখতে। অথচ রুবি একেবারেই দেখতে পারতেন না ওটাকে। পুপু ছিল ওঁর দু-চক্ষের বিষ! এখন আর কোনও ভয় নেই পুপুর। আপনমনেই হাসলেন অতীশ।

আটটা তিন।

বেড়ালটাকে রোজকার মতো গত রাতের এঁটো খাবারগুলো খেতে দিলেন অতীশ। তারপর ড্রয়িংরুমের চেয়ারে বসে জামা-প্যান্ট, জুতো চটপট পরে ফেললেন। এবার খবরের কাগজটা খুলে দেখতে লাগলেন।

আটটা বেজে ন মিনিট।

ক্রিরি-ং—রি রিং– । একটুও চমকালেন না অতীশ। তিনি যেন এতক্ষণ ধরে এই ফোনটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আয়েশি পায়ে এগিয়ে গেলেন ক্র্যাডলের কাছে। তুলে নিলেন রিসিভারটা।

হ্যালো গম্ভীর স্বর ভেসে এল ও-প্রান্ত থেকে।

অতীশ সেন স্পিকিং খুব ঠান্ডা মাথায় কথা বলতে হবে। ভাবলেন অতীশ।

আরে, অতীশ..আমি বড়ুয়া বলছি।

কী, বল।

কী ঠিক করলি? কোথায় যাবি ছুটিতে?

ভাবছি এই দু সপ্তাহ একটু আশপাশ থেকে ঘুরে আসা যাবে। অতীশ দুসপ্তাহ ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে এবং ছুটির মেয়াদ আজ থেকেই শুরু।

মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে, না একা? বড়ুয়া হেসে জানতে চাইল।

তোর তাতে কী দরকার? ঠাট্টার সুরে বললেন অতীশ।

আচ্ছা–হ্যাভ আ গুড টাইম– ফোন রাখার শব্দ শোনা গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অতীশ সেন। তিনি যে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন, তা পাড়াপড়শিরা কেউই জানে না। ফলে আজও তিনি ঠিক সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরোবেন। আশপাশের সবাই তাকে দেখে ঘড়ি মেলাবে। গত দু-বছর ধরে তাই হয়ে আসছে। বাসে করে তিনি অফিসের দিকেই প্রথমে যাবেন। তারপর সেখান থেকে বাসে চড়ে সোজা এয়ারপোর্ট। দশটা একুশে বম্বে যাওয়ার একটা প্লেন আছে। তাতে চেপে সোজা বম্বে। সেখান থেকে পাঁচটা পঁয়তিরিশের প্লেনটা তাকে ধরতে হবে। গন্তব্যস্থল মাদ্রাজ। বম্বে থেকে যখন তিনি প্লেনে উঠবেন, তখন নাম এবং চেহারা তাঁকে পালটাতে হবে। মাদ্রাজে নেমে নিজেকে লোকের ভিড়ে মিশিয়ে ফেলতে তার এতটুকু অসুবিধে হবে না। তখন কাজে লাগবে রুবির টাকাগুলো। আপনমনেই হাসলেন তিনি।

আটটা সতেরো মিনিট ছসেকেন্ড।

আর দু-মিনিট চুয়ান্ন সেকেন্ড পর তাকে রোজের মতো রেডিয়ো চালাতে হবে।

ক্রিরিরিরিং–।

একটু অবাক হয়ে অতীশ এগিয়ে গেলেন ফোনের দিকে। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েই তিনি যেন একটা শক খেলেন। হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা দিয়ে। না–ফোন নয়!

বাজছে দরজার কলিংবেল!

কে এল এই সময়ে (অথবা অসময়ে!)?

দুরুদুরু বুকে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন অতীশ। দরজা খুললেন।

সামনে দাঁড়িয়ে একজন সুবেশধারী যুবক। পরনে কোট, প্যান্ট, টাই–ফিটফাট।

কী চাই? দরজা আগলে দাঁড়িলে রইলেন অতীশ। যাই হোক না কেন, দরজা থেকে কিছুতেই সরব না। ভাবলেন তিনি।

এটাই তো আটাশ নম্বর বাড়ি?

হ্যাঁ।

অতীশ হঠাৎ খেয়াল করলেন, যুবকের পায়ের কাছে দাঁড় করানো একটা বড় প্যাকেট।

মিস্টার সেন তো আপনিই?

হ্যাঁ।

আমি নাহাটা ডিস্ট্রিবিউটার থেকে আসছি। আপনার ওয়াইফ একটা অটোমেটিক প্রেশার। কুকারের অর্ডার দিয়েছিলেন, তাই–

না, না, ওসব কুকার-ফুকার লাগবে না আমাদের। দরজা বন্ধ করতে গেলেন অতীশ।

মিস্টার সেন, যিনি অর্ডার দিয়েছিলেন, তিনি ক্যান্সেল করলেই আমরা অর্ডারটা ক্যান্সেল্ড বলে মনে করব, নয়তো নয়। আপনি কাইন্ডলি একবার মিসেস সেনকে খবর পাঠান। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

উঃ–যত জ্বালা। এখন কী করবেন অতীশ?

হঠাৎ খেয়াল হতেই দরজা ছেড়ে ভেতরে এসে রেডিয়োটা অন করে দিলেন তিনি। আবার ফিরে গেলেন দরজায়।

আটটা একুশ।

মিসেস সেন এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, উঠেছেন–মানে এখন ব্রেকফাস্টে বসেছেন।

আমি একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ঘরের ভেতর পা বাড়াল যুবক।

দাঁড়ান মশাই! আপনি ভেতরে ঢুকছেন কার হুকুমে? উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অতীশ। নাঃ, রাগলে চলবে না। মনে-মনে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। লোকটা সন্দেহ করতে পারে।

আমার স্ত্রী কি নিজে আপনাকে অর্ডার দিয়েছিলেন? এবার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট মোলায়েম।

হ্যাঁ।

তা হলে অতীশ এতদিন যা সন্দেহ করেছেন তাই। তিনি অফিসে চলে গেলে রুবি হেঁটে বেড়াতেন।...না, আর ঝামেলা করা ঠিক হবে না। অফিস (?) যাওয়ার সময় হয়ে এল। সময়ের এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই তার কল্পনার স্বর্গ ধুলোয় মিশে যাবে।

কত হয়েছে আপনার বিল?

দু-শো আট টাকা ষাট পয়সা।

একমুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না অতীশ। ছুটলেন শোওয়ার ঘরে। ব্রিফকেস খুলে হাতড়ে বের করলেন একশো টাকার বান্ডিলটা। তিনটে নোট টেনে নিয়ে ব্রিফকেস বন্ধ করে দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে নোট তিনটে তুলে দিলেন যুবকটির হাতে।

আটটা বাইশ।

আমার কাছে ভাঙানি নেই। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আসুন–ওই মোড়ের দোকানটা থেকে ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

অতীশের কানে কেউ যেন গরম সীসে ঢেলে দিল। এ তো দেখছি মহা ঝামেলায় পড়া গেল। আর মাত্র আটমিনিট বাকি!

ঠিক আছে, এটা দিন। একটা নোট ছিনিয়ে নিলেন অতীশ : আমার কাছে অন্য আরও নোট আছে– অবাধ্য জিভকে শাসন করে আবার বললেন, মানে, দশটাকার নোটও আছে।

মুহূর্ত্তে মধ্যে অদৃশ্য হলেন অতীশ। শোওয়ার ঘরে গিয়ে আবার ব্রিফকেস খুলে পাগলের মতো নোটের গাদা হাতড়াতে লাগলেন। কোথায় গেল দশটাকার বান্ডিলগুলো? এই তো! একটা নোট টেনে নিয়ে প্রায় দৌড়েই ফিরে এলেন দরজায়।

আটটা তেইশ।

প্যাকিং আর ডেলিভারি মিলিয়ে পড়ল এক টাকা সাঁইতিরিশ পয়সা। তা হলে মোট হল দু-শো নটাকা পচানব্বই পয়সা। আপনমনেই হিসেব করতে শুরু করল যুবক : তা হলে আপনি পাবেন পাঁচ পয়সা।

ওটা আপনি রেখেই দিন…আমার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন অতীশ।

আটটা চব্বিশ।

না, না,…এই তো, আমার কাছে একটা পাঁচ পয়সা আছে। জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করল যুবক : কোথায় গেল? একটু আগেই তো ছিল পকেটে।

আমার কোনও দরকার নেই। কোন ভিখিরিকে দিয়ে দেবেন। দরজা বন্ধ করতে গেলেন অতীশ। রাগে তাঁর চোখ-মুখ লাল।

হাত দিয়ে বাধা দিল যুবক।

আটটা পঁচিশ।

এই তো–এই যে পেয়েছি। নিন।

হাত বাড়িয়ে পাঁচ পয়সা নিলেন অতীশ। দরজা বন্ধ করলেন। উঃ!

আবার বেল বেজে উঠল! দরজা খুলতেই চোখে পড়ল সেই যুবকের হাসিমুখ।

আটটা ছাব্বিশ।

কুকারটা নিতেই আপনি ভুলে গেছেন, মিস্টার সেন। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল যুবক।

ওঃ কী ভুলো মন আমার। ধন্যবাদ।

দরজা বন্ধ করে হাঁফ ছাড়লেন অতীশ। খুব জোর বেঁচে গেছেন! মরে গিয়েও রুবি তাঁকে জ্বালাতে ছাড়ছেন না। এই কুকারের অর্ডার দেওয়ার কী দরকার ছিল?

আটটা সাতাশ।

ঠক ঠক্ ঠক্।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠলেন অতীশ। কে? কে এল আবার?

দরজা খুলে দাঁড়াতেই রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে সেই যুবক। মুখে কান এঁটো করা হাসি।

বিলটা দেওয়ার কথা ভুলেই গেছিলাম। তাই আবার ফিরে এলাম। এই নিন।

হাত বাড়িয়ে বিলটা নিলেন তিনি। কষ্টকৃত হাসি হেসে দরজা বন্ধ করলেন। কুকারের প্যাকেটের মধ্যে বিলটা খুঁজে দিলেন। তারপর এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে গেলেন দোতলায়। ব্রিফকেসে চাবি এঁটে ওটাকে হাতে নিলেন। রুবির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেমে এলেন ড্রইংরুমে। একটুর জন্য আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন।

আটটা উনতিরিশ।

আয়নায় চেহারাটা একবার দেখে তৈরি হলেন। ব্রিফকেস নিয়ে যখন তিনি বাইরের লনে পা দিলেন, তখন ঠিক সাড়ে আটটা বাজতে পনেরো সেকেন্ড বাকি (গত দু-বছরের মতোই)।

মিসেস সরকার তখনও বাগানে দাঁড়িয়ে গাছের পরিচর্য্যা করছিলেন।

মিস্টার সেন, মিসেস আজ কেমন আছেন?

মিষ্টি হাসি হাসলেন অতীশ : ভালোই আছেন। আজ একটা ওষুধ দিয়েছি ওঁকে সেই ব্যথাটার জন্যে।

ওই ব্যথাটার জন্যেই তো ভীষণ কষ্ট পান আপনার মিসেস। সহানুভূতির গলায় বললেন মিসেস সরকার।

আর কখনও কষ্ট পাবেন না উনি। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন : আচ্ছা চলি।

মা, বাচ্চু সরকার বলল ওর মা-কে, এখন ঠিক সাড়ে আটটা বাজে।

.

বৃথা বিলম্বে কালাতিপাত করিও না। টাইপের পদক্ষেপে হনহন করে বাস-স্টপের দিকে হাঁটছিলেন অতীশ সেন। আশপাশের পাড়াপড়শিরা তাঁকে দেখে নিজেদের ছেলেমেয়েদের যে সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছেন, তা তিনি রোজকার মতোই (গত দু-বছর ধরে) বুঝতে পারলেন।

সাড়ে ছটায় যখন তিনি ফিরবেন না (গত দু-বছরে এই প্রথম ঘটবে) তখন সবাই সেটাকে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করবে।

সাড়ে সাতটা বাজলে সবাই চিন্তিত হয়ে উঠবে।

সাড়ে আটটায় তার বাড়িতে খোঁজ করতে যাবে এবং থানায় ফোন করলে পর সাড়ে নটায় পুলিশ এসে পৌঁছোবে। ততক্ষণে তিনি হাজার-হাজার মাইল দূরে–পুলিশের নাগালের বাইরে।

এয়ারপোর্টে সিকিওরিটি চেকের জন্য এগোতে যাবেন, এমন সময় পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল কেউ। চমকে ফিরে তাকালেন অতীশ।

কঠিন চৌকো চোয়াল। সরু গোঁফ। গালে একটা কাটা দাগ। জোড়া ভুরু। কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

অতীশ আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে বোর্ডিং পাসটি ভদ্রলোকের দিকে সাততাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরলেন।

উত্তরে ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা আইডেন্টিটি কার্ড বের করলেন। লাউঞ্জের আলোয় কার্ডটা ঝলসে উঠল।

মিস্টার সেন, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে। আপনার স্ত্রীর মিস্টিরিয়াস ডেথের ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করার আছে।

অতীশ সেনের হঠাৎ মনে হল, তার পা দুটো যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলছিলেন, কিন্তু অতীশের সেসব বোধগম্য হল না। অবশ দেহে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। ইনস্পেক্টর এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেললেন।

খানিকটা স্বাভাবিক হওয়ার পর অতীশ প্রশ্ন করলেন, এত–এত– তাঁর গলা দিয়ে কাসরঘণ্টার ফাসফেঁসে আওয়াজ বেরিয়ে এল, এত তাড়াতাড়ি কী করে জানতে পারলেন আপনারা? আর কোনও কথা খুঁজে পেলেন না তিনি।

ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর হাসলেন? মিস্টার সেন, আপনি এবং আপনার স্ত্রী– আপনারা দুজনেই পাংচুয়ালিটির সিম্বল ছিলেন। ডেইলি রুটিনে কখনো এক সেকেন্ডেরও হেরফের হত না আপনাদের।

আমাদের ডেইলি রুটিনে? বিড়বিড় করলেন অতীশ, রুবির ডেইলি রুটিনে?

কেন, আপনি জানেন না? ভীষণ মজার হাসি হাসলেন অফিসার ও আপনার ওয়াইফ ঘড়ি মেপে সব কাজ করতেন। আমরা সব জানতে পেরেছি ওই পুপুর জন্যে!

অতীশ হাঁ করে চেয়ে রইলেন অফিসারের দিকে। ব্যাপারটার কিছুই তখনও তার মাথায় ঢোকেনি।

অফিসার একটু হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, মিস্টার সেন, পাড়াপড়শিরা আপনাকে দেখে যে ঘড়ি মেলাত, একথা ঠিক। তবে সেটা শুধুমাত্র সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত। তারপর থেকে তাদের কাছে পাংচুয়ালিটির আইডল ছিলেন রুবি সেন। গত দু-বছর ধরে আপনি যেমন ঠিক আটটায় পুপুকে বাড়িতে ঢোকান তেমনি আপনি বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক দশমিনিট পর–অর্থাৎ, কাঁটায়-

কাঁটায় সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে মিসেস সেন পুপুকে ছুঁড়ে দিতেন বাইরের লনে–গত দু-বছর ধরেই।

এই মজার দৃশ্য দেখে বাচ্চু মিসেস সরকারের ছেলে–ঠিক আটটা চল্লিশের সময় মজা করে বলে উঠত, মা, দ্য ক্যাট ইজ আউট অফ দ্য ব্যাগ।?

আজ আটটা পঞ্চাশেও যখন বেড়ালটা বাইরে এল না, তখন ও অবাক হয়ে মা-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে। মিসেস সরকার খুবই কৌতূহলী মহিলা। তা ছাড়া তিনি জানতেন, রুবি সেন অসুস্থ। তাই সন্দেহের বশে মিসেস সরকার আপনার বাড়িতে খোঁজ করতে যান। তারপর– হেসে ফেললেন অফিসার ও মিস্টার সেন, দ্য ক্যাট ইজ নাউ রিয়্যালি আউট অফ দ্য ব্যাগ।

হতভম্ব অতীশ সেন হাত দুটো এগিয়ে দিলেন ইনস্পেক্টরের দিকে।

# মনে ভয় আছে

**মনে ভয় আছে**

কফির কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়ে বিনু বলে উঠল, তোদের আজ একটা অদ্ভুত গল্প শোনাব।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেয়ার দিকে তাকিয়ে মুখের একটা ভঙ্গি করলাম–যার অর্থ হল, তোমাকে বলেছিলাম না! এবার শোনো বিনুর গল্প!

বিনু আমার অনেকদিনের বন্ধু। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হয় এলোমেলোভাবে, কয়েক বছর পরপর। ও ফোন করে, নয়তো চিঠি দেয়, কিন্তু সবই একতরফা। কারণ ওর ঠিকানার কোনও ঠিক নেই। সুতরাং ইচ্ছে হলেও ওকে ফোন করার বা চিঠি দেওয়ার কোনও উপায় নেই।

এবারও হঠাৎই ওর চিঠি পেয়েছিলাম। খুব ছোট্ট চিঠিঃ

বিয়ে করেছি। বউ নিয়ে সাতদিনের জন্যে কলকাতা যাচ্ছি। ২৭ তারিখ কলকাতা ছাড়ব। ২৬ তারিখ, শনিবার, কেয়াকে নিয়ে চলে আয়। চায়ের নেমন্তন্ন রইল। আর খুব মজার গল্প শোনাব।

চিঠির শেষে ওর কলকাতার আস্তানার ঠিকানা এবং কীভাবে সেখানে পৌঁছোতে হবে তার নির্দেশ।

বিনুর ব্যাপারটাই এইরকম। ছন্নছাড়া, খামখেয়ালি। আর যত উদ্ভট বিষয় নিয়ে চর্চা। ওর সবকিছুই রহস্যময়।

বিনুর বউয়ের নাম সুচরিতা। রাজস্থানের কোথায় গিয়ে যেন আলাপ, তারপর দিল্লিতে বিয়ে। বিনুর ব্যাপারে যদি এরপর কাশ্মীরে গিয়ে বউভাত হয়ে থাকে, তা হলেও আমি অবাক হব না।

কেয়াকে বিনুর অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপারের কথা বলেছিলাম। বিনুকে ও আগে দেখেনি। আমার কাছে ওর কথা শুনেছে, আর দু-একবার ফোনে কথা বলেছে।

ওর নতুন বউয়ের জন্যে একটা শাড়ি কিনে অনেক অলিগলি পেরিয়ে অবশেষে বিনুর আস্তানার পৌঁছোলাম। জরাজীর্ণ তিনতলা বাড়ির ফ্ল্যাট। যদিও ফ্ল্যাট শব্দটা এই বাড়ির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। এ-বাড়ির কথা ও আগে কখনও আমাকে বলেনি।

আমাকে দেখতে পেয়েই বিনু একেবারে জড়িয়ে ধরল। বউদের আলাপ করিয়ে দিল। বেশ খানিকক্ষণ ধরে হইহই করল সবাইকে নিয়ে। স্কুলজীবনের কয়েকটা সত্যি-মিথ্যে ঘটনা বলে সুচরিতা আর কেয়ার সামনে আমাকে সে হেনস্থা করল। তারপর চায়ের নেমন্তন্ন উপলক্ষ্যে সুচরিতা কফি, সিঙাড়া, কাজুবাদাম আর পাঁপড়ভাজা নিয়ে এসে সাজিয়ে দিল সামনে।

কফির কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে বিনু যে কথাটা বলল তারই জের টেনে মন্তব্য করল, আমাদের প্রত্যেকের মনেই ভয় আছে।

সুচরিতা বেশ কথাটথা বলতে পারে। ওর মিষ্টি মুখের মধ্যে কোথায় যেন একটা সপ্রতিভ জেদি ভাব রয়েছে! ও সঙ্গে-সঙ্গে পালটা প্রশ্ন করল বিনুকে, কীসের ভয়?

বিনু নির্বিকারভাবে সিঙাড়ায় একটা কামড় দিয়ে বলল, মৃত্যুভয়। তারপর কফির কাপে শব্দ করে পরপর দুটো চুমুক দিয়ে আরও বলল, অনেক সময়, ধরো, আমরা জানি যে, আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না, তা সত্ত্বেও আমরা ভয় পাই। মানুষের মনের এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

আমি দিব্যি তৃপ্তি করে কাজুবাদাম খাচ্ছিলাম, বিনুর কথায় থেমে গেলাম। ও কী বলতে চাইছে? এ যেন অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো শোনাচ্ছে! তো হেসে সেই কথাটাই বললাম ওকে।

ও একটা হাত নাড়ল শূন্যে। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, দাঁড়া, একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছোটবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম মনে আছে, প্রশ্ন-উত্তরের খেলা? একজন বন্ধু আর-একজনকে জিগ্যেস করত, আমার সঙ্গে জঙ্গলে যাবি? তখন দ্বিতীয়জন জানতে চাইত, কী করতে? উত্তরে প্রথমজন বলত, বাঘ মারতে। দ্বিতীয় বন্ধু তো রাজি, হ্যাঁ যাব। সেটা শুনে প্রথমজন সতর্ক করে দেওয়ার ভঙ্গিতে জিগ্যেস করত, ভয় পাবি না তো? দ্বিতীয়জন বুক ফুলিয়ে বলত, না। আর তক্ষুনি প্রথমজন দ্বিতীয়জনের চোখের সামনে আচমকা হাত নেড়ে ভয় দেখাত, এবং নির্ভীক সাহসী বন্ধুটির চোখের পাতা পড়ে যেত। তুই তো জানিস, ব্যাপারটা স্রেফ রিফ্লেক্স মানে, প্রতিবর্তী ক্রিয়া। সাহসী বন্ধুটি বেশ ভালো করেই জানে যে, বন্ধু কিছুতেই তার চোখে মারবে না কিন্তু সব জেনেশুনেও তার চোখের পাতা পড়ে যায় আত্মরক্ষার তাগিদে। এ ব্যাপারটাকে তুই কী বলবি?

প্রশ্নটা বিনু আমাকে লক্ষ্য করে করলেও উত্তর দিল কেয়া। বলল, বিনুদা, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে একেবারে অকারণে কি কেউ ভয় পায়?

বিনু পাঁপড়ভাজা আর কফি আরাম করে শেষ করল, তারপর বলল, আচ্ছা, ওই দরজাটার কথাই ধরা যাক।

আঙুল তুলে ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে লাগানো একটা বন্ধ দরজার দিকে দেখিয়েছে বিনু। দেখেই বোঝা যায়, দরজাটা বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। যে-ই ওটা বন্ধ করে থাকুন না কেন, সে ওটা বরাবরের মতো বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। খিল-ছিটকিনি ছাড়াও আড়াআড়ি দুটো কাঠ পেরেক ঠুকে আটকে দেওয়া রয়েছে বন্ধ পাল্লার ওপরে। আর তার সামনে দুটো ট্রাঙ্ক আর সুটকেস ওপর-ওপর সাজানো।

বিনুর ঘরটা মাপে বেশ বড় এবং বেশ পুরোনো। দেওয়ালের হালকা নীল রঙের ওপরে ড্যাম্প আর সময়ের ছাপ পড়েছে। সিলিং-এ কাঠের কড়ি। সেখান থেকে ঝুলছে মান্ধাতার আমলের ডি. সি. পাখা। তা থেকে কিচকিচ আওয়াজ বেরোচ্ছে। ঘরের উত্তরের দেওয়ালে একটাই জানলা। সেটা দিয়ে প্রথম শীতের মোলায়েম ঠান্ডা বাতাস ঢুকে পড়ছে ঘরে।

একটা টিউব লাইটের আলোয় ঘরটা তেমন স্পষ্ট ফুটে ওঠেনি। বিনু আর কেয়া বসেছিল বিছানার ওপরে। আমি টিভির সামনে একটা চেয়ারে, আর

সুচরিতা অন্দরে যাওয়ার দরজার সামনে একটা মোড়ায় বসে।

বিনু বলল, এই বাড়িটা প্রায় সত্তর বছরের পুরোনো। ওই দরজাটার ওপাশে কী আছে। আমি জানি না। এখন মনে করো, রাতের অন্ধকারে ওই দরজায় যদি কেউ নক করে তখন আমার অবস্থাটা কী হবে! আমি ভয় পাব। অথচ আমাদের সদর দরজায় কেউ নক করলে আমরা দিব্যি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিই–মোটেই ভয় পাই না। তো বহুদিন ধরে বন্ধ ওই দরজাটার যদি রাতের অন্ধকারে ঠকঠক করে কেউ শব্দ করে তখন আমরা ভয় পাই কেন?

সুচরিতা বোগাস! বলে খালি কাপ-প্লেটগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল অন্দরের দিকে।

আমি কেয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, বুঝলে, এই হল বিনু।

আর কথাটা শেষ হতে না হতেই ওই বন্ধ দরজার ওপিঠে কেউ বেশ জোরে নক করল।

কেয়ার ঠোঁট চিরে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল। ওর চোখ বড় হল। একবার আমার দিকে, একবার বিনুর দিকে, আর একবার দরজাটার দিকে দেখতে লাগল ও। বিনুও দেখলাম অবাক হয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি থেমে-থেমে বললাম, কী রে, কী ব্যাপার?

বিনু কিছু বলে ওঠার আগেই আবার ঠকঠক শব্দ। তারপর আরও জোরে আবার। বারবার। যেন কেউ পাগল হয়ে নক করে চলেছে দরজার ওপাশে।

বিনু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, দাঁড়া, দরজাটা খুলে দেখি–। তার পর এগোল সেই রহস্যময় দরজার দিকে।

কেয়া এবার তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল–ভয় পাওয়া চিৎকার।

আমি উঠে একলাফে চলে গেলাম কেয়ার পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরলাম। বিনু ফিরে তাকাল আমাদের দিকে। নক করার শব্দ তখন থেমে গেছে।

আর ঠিক তখনই সুচরিতা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল। অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে।

কেয়া হাঁপাতে হাঁপাতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিনু ওকে লক্ষ্য করে হেসে বলল, সুচরিতা, তুমি ওদের দরজার সিক্রেটটা বলে দাও।

সুচরিতা কেয়ার কাছে এসে ওর দুধে হাত রেখে বলল, মিছিমিছি ভয় পেয়েছ, ভাই। ও-দরজাটার ওপাশে আমাদের বাথরুম। আমিই গিয়ে ওখানে নক করছিলাম–তোমাদের সঙ্গে মজা করার জন্যে। ও আমাকে আগে থাকতেই শিখিয়ে রেখেছিল।

আমি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। কেয়ার চিৎকারে দোতলা তিনতলা থেকে কেউ যে নেমে আসেনি এই রক্ষে। তবে মনে পড়ল, বাড়িতে ঢোকার সময়ে দোতলা বা তিনতলার জানলায় আলো জ্বলতে দেখিনি।

কেয়া রুমালে চোখ মুছছিল, মুখ মুছছিল। বিনুর এই রসিকতা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। সুচরিতা হাসি-ঠাট্টা করে ব্যাপারটা হালকা করতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা পুরোপুরি সহজ হতে পারছিলাম না। কোথায় যেন তাল কেটে গেল।

বিনু বিছানায় গিয়ে বসল আবার। বেডকভারে কয়েকবার আঁচড় কেটে বলল, এইজন্যেই আমি বলেছিলাম, আমাদের সবার মনেই ভয় আছে। সেটা যে সবসময় ঠিক মৃত্যুভয় তা নয়– তবে ভয়।

সুচরিতা শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলল, না মশাই, সবাই এত সহজে ভয় পায় না। দরজার আওয়াজ করাতে কেয়া হয়তো ভয় পেয়েছে, কিন্তু তোমার বন্ধু অত কাবু হয়নি। আর আমার কথা তো বাদই দাও। আমার বাবা জঙ্গলে, পাহাড়ে, মরুভূমিতে সার্ভের কাজ করতেন। আমি ছোটবেলা থেকেই বেপরোয়া নানা খানাখন্দে, পোড়ো জায়গায় রাতবিরেতে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভূত-টুতে কোনও আস্থা নেই আমার।

বিনু সুচরিতাকে দেখল একবার। তারপর আমাকে লক্ষ করে বলল, সুচরিতাকে এই সহজ ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে,

ভূত নেই, কিন্তু ভয় আছে। সুস্থ মানুষ তো বটেই–এমনকী পাগল পর্যন্ত ভয় পায়। আচ্ছা বলো তো, বিছানার ওপাশটায় ওটা কী?

আমি বিছানার খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু বিনু বলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপারটা খেয়াল করিনি।

বিছানার কালো আর গোলাপি ফুলকাটা একটা চাদর ঢাকা ছিল। লক্ষ করলাম, বালিশের কাছটায় চাদরের নীচে লম্বা দড়ির মতো কী একটা এঁকেবেঁকে পড়ে আছে। তার ওপরে চাদর থাকা সত্ত্বেও জিনিসটা সড়সড় করে অল্প-অল্প এগোচ্ছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মুখ দিয়ে আতঙ্কের চিৎকার বেরিয়ে এল, সাপ সাপ!

ততক্ষণে সুচরিতা আর কেয়াও বস্তুটি দেখতে পেয়েছে। কেয়া হোঁচট খাওয়া এক আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু সুচরিতা শক্ত ধাতের মেয়ে। ও দরজার পাশে দাঁড় করানো কাঠের খিলটা তুলে নিয়ে সপাটে বসিয়ে দিল চলমান সরীসৃপটির ওপরে। ওই সঙ্কটের মধ্যেও লক্ষ করলাম, সুচরিতার চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া।

কিন্তু সরীসৃপটি তখনও দিব্যি নড়ছে চাদরের তলায়। সুচরিতার প্রথম আঘাত তাকে বিন্দুমাত্রও কাবু করতে পারেনি। সুচরিতা উত্তেজিত হয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত করল। কিন্তু তাতেও লাভ হল ন।

এইরকম একটা বিপন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি যখন কিছু একটা করার কথা ভাবছি, ঠিক তখনই বিনু হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর একটানে বেডকভারটা সরিয়ে দিল একপাশে।

সবুজ রঙের একটা মোটা নাইলনের দড়ি এঁকেবেঁকে পড়ে আছে বিছানায়। তার একপ্রান্ত থেকে একটা সরু সুতো চলে গেছে বিনুর কাছে। ওটায় টান মেরেই বিনু রজ্জুতে সর্পভ্রমের ব্যবস্থা করেছিল। সবটাই বিনুর চালাকি আর হাতের কাজ।

সুচরিতার মুখ দেখে বোঝা গেল, এই সাপের ভয় দেখানোর ব্যাপারটা ওর আগে থেকে জানা ছিল না। ও কিছুক্ষণ চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিনু তখনও হাসছে। কোনওরকমে হাসি থামিয়ে ও বলল, ঝাসির রানি, এবার কাষ্ঠদণ্ডটিকে যথাস্থানে রেখে দাও।

সুচরিতা কেমন বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল। বিনুর কথায় ও যেন সংবিৎ ফিরে পেল। খিলটা রেখে দিয়ে এল দরজার পাশে।

আমার বেশ রাগ হচ্ছিল বিনুর ওপর। ওর নতুন বিয়ে করা বউয়ের সামনে এ-ধরনের বদ-রসিকতা না করলেই কি চলছিল না!

বিনু সুচরিতাকে উদ্দেশ করে বলল, ডার্লিং, এইবার তো মানবে যে, আমার বন্ধুটি সাপের ভয়ে কাবু হয়েছে। তুমিও কিন্তু বেশ ভয় পেয়েছিলে। যদি তুমি আগে থেকে দড়ি আর সুতোর ব্যাপারটা জানতে তা হলে মোটেই ভয় পেতে না। এটাই হচ্ছে ভয় পাওয়ার মজা। একই ঘটনায় কেউ ভয় পায়, আবার কেউ পায় না। তা ছাড়া ভয় পাওয়ার মধ্যে কেমন বেশ একটা থ্রিল আছে। এই যেমন ধরো, বড় নাগরদোলা, কিংবা নিক্কো পার্কের ওয়াটার শুট বা রোলার কোস্টার। এসব খেলাতে ভয় করলেও আমরা চড়ে মজা পাই। কেন জানো? কারণ, আগে থেকেই আমাদের জানা আছে, ভয়টা মিথ্যে সত্যিকারের কোনও বিপদ আমাদের হবে না। এটাই হচ্ছে ভয় পাওয়ার মজা...।

কেয়া আমার হাতে ছোট্ট করে চিমটি কাটছিল? অর্থাৎ, এবার মানে-মানে বাড়ি চলো। আমারও কেমন অস্বস্তি লাগছিল। সুতরাং বিনুকে বলে উঠতে যাব, তখনই সুচরিতা পাথরের মতো গলায় বলে উঠল, আমি কিন্তু ভয় পাইনি।

বিনু হাসল আবার। বলল, তোমারও মনে ভয় আছে, সুচরিতা–সে তুমি স্বীকার করো আর না-ই করো। যেমন ধরো, ওই আলমারির লকারটা–ওটার কথা তোমাকে একটু বলি...।

ওঃ, বিনুর রসিকতা কি আর শেষ হবে না! ও তখন আঙুল তুলে দেখিয়েছে ঘরের এক কোণে দাঁড় করানো একটা সাড়ে ছফুট স্টিলের আলমারির দিকে। আলমারিটা একটু পুরোনো, রং ময়লা হয়ে গেছে। এ ছাড়া ওটার আর কোনও বিশেষত্ব নেই।

বিনু আমাদের মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নেশা ধরানো গলায় নাটকীয়ভাবে বলে চলল, ঘটাং করে শব্দ করে স্টিলের আলমারির দরজা খুলি

আমরা, তারপর ছোট মাপের একটা চাবি দিয়ে লকার খুলি। সাধারণত আমাদের যা হাইট তাতে লকারের ভিতর পর্যন্ত সরাসরি নজর যায় না–পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে দেখতে হয়। কী সুচরিতা, এরকম করেই তো লকার ব্যবহার করো তুমি?

সুচরিতা কোনও জবাব দিল না। কিন্তু ওর চোখের নজর আর চোয়ালের রেখায় জেদের ছোঁয়া টের পেতে কষ্ট হল না আমার। এ ছাড়া একটা অদ্ভুত সতর্ক ভাবও লক্ষ করলাম। যেন বুঝতে চাইছে, বিনু ঠিক কোন পথ ধরে কোন লক্ষ্যে পৌঁছোতে চাইছে।

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে যখন আমরা লকারের ভিতরে নজর চালাই তখনও। ভিতর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাই না। কারণ, ঘরের আলোটা সবসময় তেরছাভাবে এসে পড়ে, আর লকারটাও সুড়ঙ্গের মতো গভীর। সুতরাং, কোনও জিনিস–মানে, গয়নাগাটি বা অন্য কিছু খুঁজতে গিয়ে আমরা হাত ঢুকিয়ে দিই ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার গহ্বরে। তারপর অন্ধকারেই হাতড়াতে থাকি।

একটু থেমে বিনু মাথার চুলে হাত বোলাল। সুচরিতাকে লক্ষ করে হেসে বলল, ডার্লিং, এইবার আসল মজা। ধরো তুমি প্রায় কাঁধ পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকারে লকারের ভিতরটা হাতড়াচ্ছ, এমন সময় একটা হাত খপ করে তোমার হাতটা চেপে ধরল। তুমি প্রথমেই একটা মানসিক ধাক্কা খাবে, তার পর ভয়ে চিৎকার করে উঠে তোমার হাতটা টেনে বের করে নিতে চেষ্টা করবে। তুমি বেশ টের পাচ্ছ, হাতটা ঠান্ডা, পিছল, আর তার শক্তিও অনেক। সুতরাং তোমাদের টানাটানি চলছে। তুমি হয়তো বেশ খানিকটা টেনে নিতে পারলে তোমার হাত। তারপর আতঙ্কে উঁকি মারলে লকারের ভিতরে। তখন তোমার হাত লকারের অন্ধকার জায়গা থেকে খানিকটা আলোর দিকে চলে এসেছে। ফলে লকারের ভিতরের হাতটাকে তুমি দেখতে পেলে। তোমার ফরসা হাত আঁকড়ে ধরে আছে আলকাতরার মতো কালো চকচকে একটা হাত। তার ওপরে ছাতা ধরার দাগ। তুমি একটা পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধও পেলে নাকে। আর অবাক হয়ে দেখলে, সাপের মতো সাতটা আঙুল প্রাণপণে তোমার ফরসা হাতটা আঁকড়ে ধরেছে। আঙুলগুলো অল্প-অল্প নড়ছে। হাতের বাকি অংশটা মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে...। থামল বিনু। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে সুচরিতাকে বলল, এইরকম যদি হয়, তা হলে আমার ধারণা, তখন তুমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো চিৎকার

করতে থাকবে। আর তার ওপর ঠিক তক্ষুনি যদি লোডশেডিং হয়ে যায়, তা হলে তো আর–।

বিনু, আজ আমরা উঠি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঢের রসিকতা সহ্য করা গেছে।

দেখাদেখি কেয়াও উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুচি ঠিকঠাক করতে লাগল। ও বিনুর দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে হেসে বলল, চলি, বিনুদা। সুচরিতাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন কিন্তু।

বিনু কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে, বলল, তোমরা কি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছ নাকি? সবে তো নটা বাজে।

সুচরিতা হঠাৎ কেমন শক্ত গলায় বলে উঠল, আপনারা যাবেন না, বসুন। আমি এখনই ওই আলমারিটা খুলে ওর লকারের ভিতরে হাত ঢোকাব। দেখি, আমি ভয় পাই কি না।

আমি আর কেয়া অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

বিনু সুচরিতাকে বলল, কী পাগলামো করছ, সুচরিতা! ওই লকারে তোমার হাত ঢোকানোর দরকার নেই। আলমারিটা পনেরো বছর ধরে বন্ধ আছে, বন্ধই থাক। পনেরো বছর ধরে আমরা কেউ ওটা খুলিনি। এখন ডিসটার্ব করার কী দরকার?

আমি অবাক হলাম। পনেরো বছর ধরে আলমারিটা খোলা হয়নি কেন? আর কাকেই বা ডিসটার্ব করার কথা বলছে বিনু?

সুচরিতা খিলখিল করে হাসল, বলল, পনেরো বছর ধরে আলমারিটা কেউ খোলেনি, আজ আমি খুলব বলে। তারপর চোয়াল শক্ত করে হনহন করে এগিয়ে গেল আলমারিটার কাছে। তার পাশেই দাঁড় করানো একটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চাবি বের করে নিয়ে ঘটাং শব্দ করে খুলে ফেলল স্টিলের আলমারির দরজা।

আলমারির ভিতর থেকে ধুলো উড়ল কি না বোঝা গেল না, তবে একটা বিশ্রী পুরোনো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

বিনু একটু জোরেই বলে উঠল, সুচরিতা, লকার খুলো না বলছি! প্লিজ, আমার কথাটা শোনো, সুচরিতা, প্লিজ…লকার খুলো না!

কিন্তু সুচরিতা কোনও কথাই শুনল না।

আলমারির একটা পাল্লা ওকে অনেকটা আড়াল করে দিয়েছে। টিউব লাইটের আলোও আড়াল হয়ে গেছে সেইসঙ্গে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুচরিতার নড়াচড়া দেখে আমরা বেশ আঁচ করতে পারছিলাম ও কী করছে।

আলমারির লকার খুলে তার ভিতরে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে পাল্লার পাশ থেকে আমাদের দিকে তাকাল সুচরিতা। হেসে বলল, এর ভিতরে কোনও কালো হাত নেই।

আমি আর কেয়া ঠিক বুঝতে পারছিলাম না এটা নতুন কোনও খেলা কি না। বিনু কি আগে থেকেই বউয়ের সঙ্গে যোগসাজশ করে রেখে আমাকে আর কেয়াকে ভয় দেখাতে চাইছে?

কিন্তু আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই সুচরিতা এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকারে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। এক ঝটকায় কেউ ওকে টেনে ধরল লকারের দিকে, কারণ ওর মুখটা বিশ্রী শব্দে আলমারির দরজার পাল্লায় বাড়ি খেয়ে চলে গেল আড়ালে। তারপর শুরু হল প্রাণান্তকর টানা-হ্যাঁচড়ার লড়াই।

বিনু তখনও নির্বিকারভাবে বসে আপনমনে বলে চলেছে, এত করে বারণ করলাম, তবুও তুমি শুনলে না। এত জেদ তোমার! সাহসের এত অহঙ্কার! তোমাকে বারবার করে বললাম, প্রত্যেক মানুষের মনেই ভয় আছে, কিন্তু তুমি আমার কথায় আমল দিলে না। এখন তো আর কিছু করার নেই….।

আমি আর কেয়া পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি। সারা শরীর ভয়ে কাঠ, নড়বার এতটুকু ক্ষমতা নেই। আর আলমারির কাছ থেকে সুচরিতা পাগলের মতো চিৎকার করে চলেছে। ওর মুখ বিকৃত, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গাল কেটে রক্ত পড়ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোডশেডিং হয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

কিন্তু তখনও সুচরিতার কানফাটানো আর্ত চিৎকার থামেনি।

# দৃশ্য-শেষ

## দৃশ্য-শেষ

যেন দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের চিৎকার কমলেশের কানে এল। আর ঠিক তার পনেরো সেকেন্ড পরেই শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা কোনও এরোপ্লেনের গুঞ্জন। সেই গুঞ্জন ধীরে-ধীরে পালটে গেল গর্জনে। কানফাটানো বিকট শব্দ তুলে প্লেনটা বাড়িটার ঠিক ওপর দিয়ে চলে গেল।

ঘরে একটা অল্প পাওয়ারের বালব জ্বলছে। তারই আলোয় কমলেশ ঘড়ি দেখল। রাত দুটো বেজে বত্রিশ মিনিট পনেরো সেকেন্ড।

এবার ও খাটের ওপর উঠে বসল। চোখ বুলিয়ে ঘরটাকে আর-একবার দেখতে লাগল : চোদ্দো ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া বড় সাইজের ঘর। ঘরে জানলার কোনও বালাই নেই। একটামাত্র দরজা : পুরু শাল কাঠের তৈরি। ঘরের চার দেওয়াল নিরেট কংক্রিটের। সেটা ডিঙিয়ে যখন আওয়াজ আসছে তা হলে কুকুরটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে চিৎকার করছিল। কিন্তু এই পুরু দেওয়ালের জন্য মনে হয়েছে চিৎকারটা দূর থেকে ভেসে আসছে।

কমলেশের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। সে বন্দি! এই ছোট্ট ঘরটায় অসহায় পাখির মতোই ডানা ঝাঁপটে তাকে শেষ হয়ে যেতে হবে। কেউ খোঁজও পাবে না…।

কিন্তু কতক্ষণ ধরে ও এখানে রয়েছে? একদিন? দু-দিন? উঁহু, মাত্র আট ঘণ্টা। কিন্তু একা একা এতক্ষণ কাটানোর ফলে মনে হচ্ছে, হয়তো আট ঘণ্টা নয়–আটদিন।

ঘটনায় আবর্ত শুরু হয়েছে এখন থেকে আট ঘণ্টা আগে। সেই সন্ধে ছটা থেকে। ভগবান জানেন, এর শেষ কোথায়।

কমলেশ সন্ধের মুখে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। গ্যারেজে গাড়িটা রেখে সুরকিঢালা পথ ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুই ছায়ামূর্তি : দুজনের মুখেই কালো মুখোশ এবং হাতে অটোমেটিক কোল্ট।

ভীষণভাবে চমকে উঠেছে কমলেশ। কিন্তু ভয় পেলেও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি। তাই সঙ্গে-সঙ্গেই মাথার ওপর দু-হাত তুলে ধরেছে এবং বলে উঠেছে, টাকাটা নেওয়া হয়ে গেলে ব্যাগটা আবার ফেরত দিয়ো। কারণ, ওর পকেটে ক্যাশ টাকা ছাড়াও ছিল গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স, আইডেনটিটি কার্ড, তা ছাড়া কিছু দরকারি কাগজপত্র। কিন্তু ওদের কেউই পকেটের ব্যাগের দিকে হাত বাড়ায়নি। অর্থাৎ, ব্যাগের ওই সামান্য টাকার লোভে ওরা আসেনি। লম্বা, দোহারা চেহারার লোকটি রিভলভার নাচিয়ে কমলেশকে এগোতে নির্দেশ করেছে, এবং কমলেশ বুদ্ধিমানের মতো সেই নির্দেশ অমান্য করেনি।

বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াতেই কোথা থেকে হুউস করে এগিয়ে এসেছিল একটা কালো ডেমলার গাড়ি। হাত-পা, চোখ বেঁধে, কমলেশকে পিছনের সিটে ফেলে ওরা গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথম-প্রথম কমলেশ মনে-মনে হিসেব রেখেছে, গাড়িটা কখন কোনদিকে মোড় নিচ্ছে– কিন্তু একটু পরেই সেটা অনর্থক বুঝে ও আর চেষ্টা করেনি।

ঘণ্টাখানেক একটানা চলার পর গাড়ি থেমেছে। গাড়ি থামামাত্রই কমলেশের হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর কমলেশের কানে এসেছে একটা দরজা খোলার শব্দ। তারপর দরজা পেরিয়ে, ওই চোখ বাঁধা অবস্থাতেই, ওকে উঠতে হয়েছে গোটা বিশেক সিঁড়ির ধাপ–অবশেষে ও এই কংক্রিটের ঘরে এসে পৌঁছেছে।

চোখের বাঁধন খুলে দিতেই কমলেশের চোখে পড়েছে ঘরের এককোনায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা খাটের দিকে। এ ছাড়া কাছেই, খাটের বিপরীতদিকে, রাখা হয়েছে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। ভালো করে তাকাতেই কমলেশ লক্ষ করল, টেবিলের ওপর কিছু কাগজ এবং একটা কলমও রয়েছে। তা হলে কি…?

ঠিক তাই! কমলেশের উপলব্ধির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিশাল চেহারার লোকটি কর্কশ স্বরে আদেশ করেছে, বসুন। আপনাকে একটা চিঠি লিখতে হবে, আপনার ওয়াইফের কাছে। দু-লাখ টাকা আমাদের চাই।

কমলেশ এর উত্তরে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেছে মুখোশধারী লোকটার দিকে : আপনমনেই বিড়বিড় করেছে, দু-লাখ টাকা!

লোকটির কালো মুখোশের আড়ালে যেন ভেসে উঠেছে একটুকরো বাঁকা হাসি : ঠিক ধরেছেন স্যার, দু-লাখ টাকা। আশা করি এবারে বুঝেছেন, আপনাকে কেন আমরা তুলে এনেছি?

কমলেশ জিভটাকে শুকনো ঠোঁটজোড়ার ওপরে বুলিয়ে উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ বুঝেছি। আমার ওয়াইফের কাছ থেকে আপনারা টাকাটা আদায় করতে চান। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, লাস্ট উইকে আমার বউ ওর মা-কে নিয়ে দিল্লি রওনা হয়ে গেছে।

এই অভাবনীয় উত্তরে মুখোশধারী লোক দুজন একে অপরের দিকে চেয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে। ওদের একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়েছে কমলেশের। অবশেষে বিশাল চেহারার লোকটি তার অটোমেটিক কোল্ট উঁচিয়ে ধরেছে, বলেছে, বুঝেছ বাবু, দু-লাখ টাকা আমাদের চাই-ই চাই। কোনওরকম কায়দায় আমরা ভুলছি না। তুমি কীভাবে টাকার জোগাড় করবে সে আমাদের জানার দরকার নেই। আমাদের শুধু মালটা পেলেই হল।

লোকটির নির্দেশে কমলেশ সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল, অমিতাভ রায় আমার ল-ইয়ার। সে-ই আমার সবকিছু দেখাশোনা করে। একমাত্র ওকে লেখা ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না।

লোকটির হাতের বন্দুক আরও একবার নেচে উঠেছে, এবং সেইসঙ্গে শোনা গেছে তার আদেশ, তা হলে তাই লেখো। পেন নিয়ে রেডি হও।

এরপর কমলেশের তলিপি লেখা যখন শেষ হয়েছে তখন দোহারা চেহারার লোকটি সেটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়েছে :

প্রিয় অমিতাভ,

যে করে হোক দু-লাখ টাকা আমার চাই। দেখিস, পঞ্চাশটাকার নোটের চেয়ে বড় নোট যেন না থাকে। টাকাটা জোগাড় করার পর কী করতে হবে সেটা পরে জানাব। পুলিশে যোগাযোগ করার কোনও চেষ্টা করিস না। তা যদি করিস, তবে আমাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবি না।

ইতি– কমলেশ (সেন)

পুনশ্চ : ভীষণ বিপদে পড়ে তোকে এ-চিঠি লিখলাম। তোর ওপর আমার বাঁচা মরা নির্ভর করছে।–ক।

চিঠিটা পড়ার পর সন্তুষ্ট হয়ে দুজনেই ঘাড় নেড়েছে। তারপর কমলেশকে ঘরে একা রেখে ওরা চলে গেছে। যাওয়ার আগে ঘরের একমাত্র দরজার তালা দিয়ে গেছে।

কমলেশ আবার খাটে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল নিজের জটিল অবস্থার কথা।

টাকাটা পেয়ে গেলে ওরা কি কমলেশকে খুন করবে? কিন্তু তাই যদি ওদের ইচ্ছে হয় তা হলে মুখোশ-টুখোশ পরে পরিচয় গোপনের এত চেষ্টা কেন? হঠাৎ নিষ্ঠুর বাস্তবের মতোই কমলেশ বুঝতে পারল, যতক্ষণ ওরা মুখোশ পরে থাকবে, ততক্ষণই কোনও ভয় নেই। কমলেশ পরে ওদের আর চিনতে পারবে না।

হঠাৎ দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দে কমলেশ চমকে খাটের ওপর উঠে বসল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সকাল আটটা পঁচিশ। তার মানে শেষদিকে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল? রুদ্ধশ্বাসে ও খুলে যাওয়া দরজাটাকে লক্ষ করতে লাগল– নতুন কোনও বিপদের অপেক্ষা করতে লাগল।

পরক্ষণেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটি। আশার কথা বলতে হবে, তার মুখে এখনও মুখোশটা রয়েছে। তার হাতে একটা খাবারের ট্রে। সেটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে সে বলল, তোমার ব্রেকফাস্ট।

কমলেশের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত লোকটি অপেক্ষা করল। তারপর পকেট থেকে একটা চওড়া মোটা কাপড়ের টুকরো বের করে কমলেশের চোখ বাঁধতে শুরু করল : তুমি এখন তোমার অফিসে ফোন করবে। ফোন করে তোমার

সেক্রেটারিকে বলবে যে, একটা উইক তুমি অফিসে যাচ্ছ না…ওই কদিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ…।

কথা শেষ করে লোকটি কমলেশকে ঠেলে নিয়ে চলল। কমলেশ আন্দাজে বুঝল, ওর কয়েদখানার দরজার ঠিক বাইরে কোনও এক জায়গায় ওরা এসে দাঁড়িয়েছে।

তোমার ফোন নম্বর কত? লোকটি প্রশ্ন করল।

কমলেশ ফোন নম্বর বলার পর টেলিফোনের ডায়াল ঘোরানোর শব্দ পেল। একটু পরেই টেলিফোনের রিসিভারটা ওর হাতে কেউ জোর করে ধরিয়ে দিল।

ও-প্রান্ত থেকে ওর সেক্রেটারি মলিনা চৌধুরীর গলা ভেসে এল, হ্যালো?

সাততাড়াতাড়ি জবাব দিল কমলেশ, কে, মলিনা? আমি কমলেশ বলছি। শোনো, এই উইকটা আমি বোধহয় অফিসে যেতে পারব না। ভাবছি, এ কদিন ছুটি নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসব।

কিন্তু স্যার, যদি খুব দরকার পড়ে, তবে কোথায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব?

সেসব ঝামেলা করার কোনও দরকার নেই, মলিনা। আমার সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দাও। আর, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সমস্ত চিঠিপত্র আমার ড্রয়ারে রেখে দিয়ো, কেমন?

ঠিক আছে, স্যার।

অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটি কমলেশের হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে নামিয়ে রাখল। তারপর কমলেশকে লক্ষ করে বলল, তোমার আর কাউকে ফোন করার থাকলে করতে পারো। ভালো করে ভেবে দ্যাখো। নয়তো কেউ যদি তোমার ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্ট নিয়ে পুলিশে খবর দেয়, তবে তোমাকে খালাস করে দেব। লোকটা নৃশংসভাবে টেনে-টেনে হাসল।

একমিনিট ভেবেই মনস্থির করল কমলেশ, বলল, আমার বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার। ও ফোন নম্বর বলার সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা মুখোশধারী লোকটি ডায়াল

করতে শুরু করল। একটু পরেই সে রিসিভারটা তুলে দিল কমলেশের হাতে।

কমলেশের কানে এল ওর শ্যালক অবিনাশ দত্তর গলা, হ্যালো।

অবিনাশ নাকি?

কে, কমলেশদা? কী ব্যাপার? কাল রাত থেকে–।

শোনো অবিনাশ, আমার ফিরতে হয়তো দিনসাতেক দেরি হবে।

তার মানে আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন, কমলেশদা? আজ সকালেও যখন আপনি ফিরলেন না, তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে দাশুকে খোঁজ করতে পাঠালাম। খোঁজাখুঁজি সেরে ও ফিরে এসে বলল, গাড়িটা নাকি গ্যারেজেই রয়েছে। মানে, কাল আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু তারপর আবার যে কখন বেরোলেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।

হ্যাঁ, আজ খুব সকালে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি। আমার এক বন্ধু ওর গাড়ি করে আমার বাড়ির কাছ থেকে আমাকে তুলে নেয়। তাই তাড়াতাড়িতে বলে যেতে পারিনি। কমলেশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কে জানে, অবিনাশের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে কি না।

এই সাতদিন কী করবেন? কোনও জরুরি কাজ, না অন্য–?

না, কোনও কাজ-টাজ নয়। এই একটু বেড়াব-টেড়াব ঠিক করেছি।

কিন্তু কাল সন্ধের সময় দিল্লি থেকে দিদির একটা চিঠি এসেছে। আপনি বোধহয় চিঠিটা পাননি?

না, পাইনি। তুমি বরং চিঠিটা রেখে দিয়ো, আমি ফিরে এসে দেখবখন?

তার কী দরকার? যাওয়ার আগে বাড়িতে নেমে চিঠিটা নিয়ে গেলেই তো পারেন?

না, তা সম্ভব নয়।

ও-প্রান্তে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার অবিনাশের গলা ভেসে এল, তা হলে আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন, আমি চিঠিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

উঁহু, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব। তা ছাড়া পজিটিভ কোনও অ্যাড্রেস দেওয়া অসম্ভব। আমি দিনসাতেক পর ফিরলে চিঠিটা দিয়ো। কেউ যদি আমার কথা জিগ্যেস করে তা হলে বোলো, আমি ছুটি নিয়ে সপ্তাহখানেকের জন্যে বেড়াতে গেছি।

ফোন করা শেষ হলে লম্বা লোকটি কমলেশকে আবার সেই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপর ওর চোখ থেকে কাপড়ের পটিটা খুলে নিল। কমলেশ আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে-দুলতে খাটে গিয়ে বসল। এখন ওর শেষ ভরসা অমিতাভ রায়।

.

রাত প্রায় দশটার সময় লম্বা লোকটির সঙ্গী বেঁটেটা কমলেশের খাবার নিয়ে এল। সম্ভবত রাত্তিরে এই লোকটাই দরজার বাইরে পাহারা দেবে।

খেতে-খেতে কমলেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল, অমিতাভ রায়ের কাছ থেকে কোনও খবর পেয়েছেন?

বেঁটে লোকটা মাথা নাড়ল। অধৈর্যভাবে কমলেশের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। কমলেশ লক্ষ করল, লোকটা অন্যমনস্কভাবে ডানহাত দিয়ে ওর বাঁ-হাতের নখ খুঁটছে। মুদ্রাদোষ? আপনমনেই হাসল কমলেশ।

.

পরদিন সকালে মুখোশপরা লম্বা লোকটা আবার কমলেশের ঘরে এল। হাতের ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, খেয়ে নাও।

কমলেশ একটুকরো পাঁউরুটি নিয়ে দাঁত বসাল। নাঃ, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে লোকদুটো খুব একটা অভদ্র নয় দেখছি। খেতে-খেতে হঠাৎই ওর মনে পড়ল অমিতাভর কথা। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে ও জিগ্যেস করল, অমিতাভ কি টাকার ব্যবস্থা করেছে?

উঁহু, জবাব দিল লম্বা মুখোশধারী, তোমার ওই হারামজাদা উকিল এখনও গাঁইগুই করছে। আজ তুমি ওকে ফোন করবে। যদি পরিষ্কার করে ওই দু-লাখ টাকার ব্যাপারটা বোঝাতে পারো

তো ভালো, নয়তো বউকে চিঠি লিখে খাঁটিয়া কেনার ব্যবস্থা করতে বলো।

কমলেশ এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল। না, না–যে করে হোক অমিতাভকে ও রাজি করাবেই।

খাওয়া শেষ হতে লোকটি পকেট থেকে কাপড়ের পটি বের করে কমলেশের চোখ বেঁধে দিল। তারপর আগের দিনের মতোই ওকে নিয়ে চলল টেলিফোনের কাছে।

কমলেশ অমিতাভর ফোন নম্বর বলার পর লোকটা ডায়াল করে কমলেশের হাতে রিসিভার তুলে দিল, নাও, এবার তোমার পেয়ারের দোস্তকে ভালো করে বোঝাও।

রিসিভারটা সজোরে আঁকড়ে ধরে কানে চেপে ধরল কমলেশ। উত্তেজিত চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, কে?

কমলেশ নাকি? আমি রায় বলছি। কী রে, ব্যাপার কী তোর?

আমার চিঠি পেয়েছিস? ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল কমলেশ।

হ্যাঁ, কিন্তু অত টাকা এই কদিনে কী করে যে জোগাড় করব বুঝে উঠতে পারছি না।

দরকার হলে আমার সমস্ত প্রপার্টি বেচে দে। দিয়ে যে করে হোক দু-লাখ টাকা আমার চাই। যদি দিন-দুয়েকের মধ্যে জোগাড় করতে পারিস তো ভালো। আর সেটা না পারলে তোকে আর টাকা জোগাড় করতে হবে না। আমার শ্রাদ্ধে টাকাটা খরচা করিস। অমিতাভকে জবাব দেওয়ার কোনও সময় না দিয়েই ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কমলেশ। ওর কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

লম্বা লোকটি ওকে আবার ঘরে ফিরিয়ে এনে চোখের বাঁধন খুলে দিল। যাওয়ার আগে বলে গেল, আর মাত্র তিনদিন আমরা ওয়েট করব।

.

সেদিন রাতে কমলেশের ঘুম এল না। হাজার চিন্তা যেন ওর মাথায় ছুঁচের মতো বিঁধছে। হঠাৎ ওর কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা কোনও কুকুরের চিৎকার। আর ঠিক তার পনেরো সেকেন্ড পরেই ও শুনতে পেল এরোপ্লেনের গর্জন।

গত কয়েকদিন ধরেই ২-৩২ মিনিটের সময় একটা কুকুরের চিৎকার আর তার পনেরো সেকেন্ড পরেই একটা প্লেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কমলেশ। বাইরের জগৎ থেকে ওকে যে এভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছে তা কি কেউ জানে? এখন অমিতাভ যদি টাকাটা জোগাড় না করতে পারে।

ভাবতে-ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল কমলেশ।

.

কারও ধাক্কায় কমলেশের ঘুম ভাঙল। ধড়মড়িয়ে খাটে উঠে বসল ও। দেখল, ওর সামনে। দাঁড়িয়ে দুই মুখোশধারী।

কমলেশ হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল। তা হলে কি ওর জীবনের লাস্ট চ্যাপ্টার কাছে এসে গেছে?

লম্বা লোকটি পকেট থেকে অটোমেটিক কোল্টটা বের করে কমলেশের কপালে ঠেকাল।

কমলেশ চোখ বুজল। ওর কান যে-কোনও মুহূর্তে আশা করতে লাগল একটা বিরাট গর্জন। ওর মস্তিষ্ক এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রইল।

কিন্তু না, সেরকম কিছুই ঘটল না। তার বদলে কর্কশস্বরে কথা বলে উঠল লোকটা, এই যে, এখন আমরা অমিতাভ রায়কে ফোন লাগাচ্ছি–আর ওয়েট করতে পারছি না। তুমি এখানে বসে-বসে এক-দুই গুনতে থাকো। আমরা ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরব।

কমলেশ যখন চোখ খুলল তখন ওরা দুজনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। কমলেশের শুধু মনে হতে লাগল, একঘণ্টা–একঘণ্টা–আর মাত্র একঘণ্টা!

.

কতক্ষণ যে ওইরকম আচ্ছন্নভাবে ও বসেছিল, মনে নেই। দরজা খোলার শব্দে ওর চমক ভাঙল। লম্বু এবং বেঁটে ঘরে ঢুকল।

ঈশ্বরকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল কমলেশ, কারণ, ওরা এখনও মুখোশ পরে রয়েছে।

অমিতাভ কি টাকাটা জোগাড় করতে পেরেছে? কৌতূহলে জানতে চাইল কমলেশ।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর লম্বা লোকটা জবাব দিল, হা, জোগাড় তো করেছে বলছে। কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে সেটা জানতে পারব রাত আটটায়। সন্ধে সাতটায় ফোন করে টাকাটা নিয়ে কোথায় দেখা করবে তার আইডিয়া রায়সাহেবকে দেব। তারপর আটটায় সময় টাকাটা পেয়ে গেলেই ভালো। আর যদি দেখি লোকটা পুলিশে খবর দিয়েছে, অথবা প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করছে, তবে তোমাকে প্যাক করে পার্সেল করে দিল্লিতে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

বেঁটে লোকটা অন্যমনস্কভাবে ডানহাত দিয়ে ওর বাঁ-হাতের নখ খুঁটছিল, হঠাৎ বলে উঠল, টাকা পেয়ে গেলে তোমাকে রাত দশটায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

*

রাত ঠিক দশটায় ওর ঘরের দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পেল কমলেশ। সঙ্গে সঙ্গে ও থরথর করে কেঁপে উঠল। এই কি তা হলে কৃতান্তের নিমন্ত্রণ?

দরজা খুলে ঢুকল ওরা দুজন। মুখোশের আড়ালে কি চোখে পড়ছে একটুকরো বাঁকা হাসি? কে জানে।

অমিতাভ-অমিতাভ কমলেশের গলা বন্ধ হয়ে এল। লম্বা লোকটা পকেটে হাত ঢোকাল। মুহূর্তের মধ্যে কমলেশের মনে পড়ল ওর সুন্দরী স্ত্রীর কথা–অমিতাভর কথা–এই সবুজ পৃথিবীর কথা–।

লোকটা পকেট থেকে কাপড়ের পটিটা বের করল। তা হলে অমিতাভ টাকা দিয়েছে! আনন্দে কমলেশের কাঁদতে ইচ্ছে করল।

ওর চোখ বাঁধা হয়ে গেলে লম্বা লোকটা বলল, তোমার কপাল ভালো। তোমার দোস্ত টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। কোনও ছকবাজির চেষ্টা করেনি। তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার পর তুমি আবার পুলিশের দালালি কোরো না যেন।

তারপর আবার সেই চলন্ত কালো ডেমলার। গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় ভাবতে লাগল কমলেশ। ওরা কি সত্যিই ছেড়ে দেবে ওকে? নাকি।

যখন একটা ফাঁকা অন্ধকার মাঠে ওরা কমলেশকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে ফেলে দিল, তখন ও নড়ার চেষ্টা করেনি। মড়ার মতো নিশ্চল হয়ে একটা বুলেটের অপেক্ষা করেছে।

কিন্তু ওরা কিছু না করে স্রেফ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

অন্ধকারে বেশ কষ্ট করে হাতঘড়ি দেখল কমলেশ। রাত বারোটা।

টলতে-টলতে ও উঠে দাঁড়াল। চোখে পড়ল, বহু দূরে কয়েকটা আলোয় বিন্দু। ক্লান্ত পায়ে ও সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। অমিতাভকে ফোন করে খবর দিতে হবে। তারপর চলবে পুলিশের কাছে জবাবদিহির পালা।

.

রাত দুটোর সময় পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পেল কমলেশ।

থানা থেকে বেরোতেই দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে অমিতাভ। ওকে দেখেই হাসল, তোকে তা হলে ছাড়ল। ওঃ, আমাকেও কি কম হ্যারাস করেছে। এখন বাড়ি যাবি তো?

হ্যাঁ, কিন্তু আর চলতে পারছি না, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। অবসন্ন স্বরে জবাব দিল কমলেশ।

তা হলে আমার বাড়িতেই চল। ওখান থেকে তোর বাড়িতে একটা ফোন করে দিবি যে, তুই কাল সকালে বাড়ি ফিরবি, তা হলেই হবে।

অমিতাভর কথায় রাজি হয়ে ওর গাড়িতে গিয়ে উঠল কমলেশ।

কিছুক্ষণ পরেই অমিতাভর বাড়ির দরজায় ওদের গাড়ি এসে থামল। কমলেশ গাড়িতে বসে ঝিমোচ্ছিল, অমিতাভর ধাক্কায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে গাড়ি থেকে নামল।

বসবার ঘরে দুজনে আরাম করে সোফায় বসে কথা বলছিল। হঠাৎই অমিতাভ বলল, কীরে, একটু ইয়ে চলবে নাকি? তা হলে এই ম্যাজম্যাজে ভাবটা কেটে যেত।

কমলেশ আপত্তি করল না।

অমিতাভ পাশের ঘরে গেল গেলাস আনতে। কমলেশ এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। চোদ্দো ফুট বাই বারো ফুট বসবার ঘর। প্রচুর টাকা খরচ করে এটাকে মনের মতো করে সাজিয়েছে অমিতাভ। একা মানুষ, বেশ সুখেই আছে।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল কমলেশ। দেওয়াল-ঘড়ির ঢং-ঢং শব্দে ওর চমক ভাঙল। রাত আড়াইটা বাজে। ঠিক তখুনি দুটো ভরতি গেলাস নিয়ে ফিরে এল অমিতাভ। সোফায় বসে সামনের টেবিলের ওপরে গেলাস দুটো নামিয়ে রাখল ও নে, শুরু কর।

একটা গেলাস হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কমলেশ।

অমিতাভ ওর গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটা টেবিলে রাখল, বলল, তোর কী মনে হয়? পুলিশ কি ওই লোকদুটোর কোনও হদিস পাবে?

কমলেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল। অমিতাভর কথায় ওর দিকে ফিরে তাকাল। বেঁটেখাটো অমিতাভ রায় তখন ডানহাত দিয়ে নিজের বাঁ-হাতের নখ খুঁটছে।

কমলেশ অবাক হল। এক-দু-সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর হাসল । তুই কি সত্যি জানতে চাস?

তার মানে? অবাক হল অমিতাভ।

এমন সময় কমলেশের কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা কোনও কুকুরের চিৎকার। যে চিৎকার ও বন্দি অবস্থায় প্রতিদিন রাত দুটো বত্রিশে শুনে এসেছে।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল কমলেশ। ঠিক ২-৩২ মিনিট।

তুই কি সত্যি-সত্যি জানতে চাস? আবার একই প্রশ্ন করল কমলেশ।

হ্যাঁ, চাই। অমিতাভ অবাক হয়ে জবাব দিল।

তা হলে তোকে আর মাত্র পনেরো সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে। বলতে বলতে হুইস্কির গেলাস হাতে উঠে দাঁড়াল কমলেশ। একদৃষ্টে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে এরোপ্লেনের শব্দটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ওর হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরে চলল। কমলেশ দেখতে লাগল–একসেকেন্ড দু-সেকেন্ড–তিনসেকেন্ড–চারসেকেন্ড–পাঁচসেকেন্ড–ছ-সেকেন্ড টিক টিক টিক টিক– টিক।

# অপারেশন ভারচুরিয়্যালিটি

## অপারেশন ভারচুরিয়্যালিটি

অনেকক্ষণ ধরে ফোন করব কি করব না ভেবে শেষ পর্যন্ত নম্বরটা ডায়াল করেই ফেলল অভিলাষ।

কয়েক সেকেন্ড পার হতে না হতেই ও-প্রান্তে রিং বাজতে শুরু করল। অভিলাষের বুকের ভেতরে ধকুপুক শুরু হয়ে গিয়েছিল। লাইনটা কি এখনই কেটে দেবে? নাকি…।

না, না–লাইন কাটার কী দরকার! একটু কথাবার্তা বললে খোঁজখবর করলে ক্ষতি কী? আসল কাজে না এগোলেই হল।

হ্যালো একটি মেয়ের গলা।

এটা কি এন্ড গেম-এর অফিস? প্রশ্নটা করতে গিয়ে অভিলাষের গলা কেঁপে গেল।

হ্যাঁ–বলুন…। রোবটের মতো গলায় মেয়েটি বলল।

আ-আমি কয়েকটা ইনফরমেশান চা-চাই..। ।

এর জন্যে আপনাকে আমাদের অফিসে এসে কোনও একজন এক্সিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাদের অফিসটা হল থারটি ফাইভ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। দ্য টাওয়ার্স বিল্ডিং এর সেভেনটিন্থ ফ্লোর। উই আর ওপেন টুয়েন্টিফোর ইনটু সেভেন। একটু দম নিয়ে মিষ্টি গলার মেয়েটি জিগ্যেস করল, মে আই নো হু ইজ মেকিং দিস কল?

কয়েকবার ঢোঁক গিলে অভিলাষ বলল, মানে…আপনাদের একটা এসএমএস দেখে আ আমি কল করেছি। আই মিন…।

ইটস ও. কে., স্যার। ইমপরট্যান্ট পারসন্সদের মোবাইল ফোনে কনট্যাক্ট করাটা আমাদের অ্যাড ক্যামপেইনের একটা পার্ট। এ ছাড়া স্যাটিসফায়েড ক্লায়েন্টদের হুইসপারিং ক্যামপেইনও আমাদের খুব হেল্প করে। আর আমাদের কোম্পানির মরাল হচ্ছে, আ ক্লায়েন্স সিক্রেট ইজ অলওয়েজ আ সিক্রেট। ক্লায়েন্টদের সব ব্যাপার আমরা গোপন রাখি। ফর এক্সাম্পল, এই যে আপনি আমাদের ফোন করেছেন, এটা কেউ জানতে পারবে না। ইভন দ্য পুলিস ক্যান নট ট্রেস দিস কল। বিকজ মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে আমাদের স্পেশাল এগ্রিমেন্ট আছে। উই পে দেম বিগ মানি। সো এভরিথিং ইজ হাশ-হাশ। একটু থামল মেয়েটি। বোধহয় অভিলাষকে সাহস জোগানোর সময় দিল। তারপর ও আই হোপ য়ু আর স্যাটিসফায়েড, স্যার। নাউ মে আই নো হু ইজ কলিং?

অভিলাষ ঘামতে শুরু করেছিল। ওর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ও তাড়াতাড়ি লাইনটা কেটে দিল।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে কাল সকাল থেকে। ঘুম থেকে উঠেই চায়ের টেবিলে রঙ্গনার সঙ্গে প্রবল খটাখটি হয়ে গেল। ইস্যুটা খুবই সামান্য : অভিলাষের একটা নীলচে ফুলহাতার শার্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা রঙ্গনাকে জিগ্যেস করতেই ও ঠোঁট উলটে বলে বসল, তো আমাকে কী করতে হবে?

তাতে বিরক্ত হয়ে অভিলাষ বলেছে, কেন, তোমাকে জিগ্যেস করাটা কি অন্যায় হয়েছে?

অন্যায় না হলেও ন্যায়ের বেসিসটাও তো খুব একটা খুঁজে পাচ্ছি না। শার্টটা নিয়ে কি আমি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি? ভুরু উঁচিয়ে একটু তেরছা হাসি ছুঁড়ে দিয়েছে রঙ্গনা। তারপর : তুমি তো জানো, আমার ভাইয়েরা এত কম দামি শার্ট পরে না। দে অলওয়েজ গো ফর সুপারব্র্যান্ডস…।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল।

ওদের বিয়েটা প্রেম করে হয়েছিল ঠিকই, তবে রঙ্গনা একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না ওরা ব্যাপক বড়লোক। বিয়ের প্রথম তিন-চার বছরে সেরকম

কোনও সমস্যা হয়নি। সমস্যা শুরু হয়েছে পাঁচে পা দেওয়ার পর। ওদের মধ্যে কোনওরকম ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হলেই দু-চার লাইন কথা চালাচালির পর রঙ্গনা ওর সেই গরু রচনায় ফিরে আসে। অভিলাষকে মনে করিয়ে দেয় যে, ওরা টগবগে বড়লোক।

তো সকালের ঝগড়ার প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা পর অভিলাষের মোবাইলে এসএমএস-টা আসে।

অভিলাষ তখন অফিসে। ল্যাপটপ কম্পিউটারের কিবোর্ডে ওর আঙুল চলছিল। মোবাইল ফোনটা রাখা ছিল একটা পেন ড্রাইভের পাশে। হঠাৎই এসএমএস-এর রিং বেজে ওঠায় কাজ থামিয়ে ও মেসেজটা দ্যাখে। অচেনা নম্বর থেকে আসা এক অদ্ভুত এসএমএস :

Harassed with any nagging problem? Call us, the PROBLEM SOLVER. Were the best.–END GAME (9832100051)

এসএমএস-টার মানে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি অভিলাষ। যে-কোনও ঘ্যাপচানো সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হলে এন্ড গেম সব সমস্যায় সমাধান করে দেবে? যে-কোনও সমস্যা বলতে…ওদের সমস্যায় এলাকাটা ঠিক কতটা বড়? গ্যাসট্রিক আলসার থেকে কিডন্যাপিং বা মার্ডার পর্যন্ত কি?

বলতে গেলে ঠিক তখনই রঙ্গনাকে খুন করার ব্যাপারটা প্রথম ওর মাথায় আসে।

ওদের বিয়েটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এখন যে-জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে অনায়াসেই বলা যায়, সম্পর্কটা উচ্ছে, পলতা পাতা, চিরতা, কালমেঘ, কি নিমপাতা সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছে।

অভিলাষ মুখে তেতো স্বাদ পেল। এইভাবেই কি কাটবে বাকি দিনগুলো? নাকি…।

হঠাৎই দেখল সুমিতি ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

সুমিতির সঙ্গে জ্যামিতির যে একটা গাঢ় সম্পর্ক আছে সেটা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। শরীরের ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক মাপের বৃত্ত, উপবৃত্ত

আর ত্রিভুজ বসানো রয়েছে।

সুমিতির পরনে হালকা গোলাপি শাড়ি। তার সঙ্গে হালকা ছাই রঙের ব্লাউজ। গলায় একটা সাধারণ কালো পুতির মালা কিন্তু অসাধারণ লাগছে। ওর লম্বা কাঠামোর সঙ্গে বিদেশিনী মডেলদের মিল। গায়ের রংও সেইরকম। এমনভাবে অভিলাষের দিকে হেঁটে আসছে যেন মাটিতে পা পড়ছে না–ভেসে আসছে।

সুমিতি সিস্টেমস রিসার্চ ডিভিশনের প্রজেক্ট লিডার–এবং কোম্পানির অ্যাসেট। ওকে মনে মনে অনেকেই চায়, কিন্তু মুখে বলার সাহস নেই। কারণ, ওর ব্যক্তিত্ব সহজে ভেদ করা যায় না।

অভিলাষের সঙ্গে কাজের কথা বলতেই এসেছিল সুমিতি। আলতো নরম গলায় ও কথা বলছিল। হালকা পারফিউমের গন্ধ অভিলাষকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

কাজের কথা শেষ করে চলে যাওয়ার ঠিক আগে সুমিতি বলল, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব…?

কী?

মুখটাকে এরকম পাচার মতো করে রাখবেন না। যদিও এত হ্যান্ডসাম প্যাচা আমি আগে কখনও দেখিনি।

সুমিতি ঠোঁটের কোণে হেসে চলে গেল।

অভিলাষের সঙ্গে মাঝে-মাঝে এরকম হালকা মজা করে সুমিতি। হয়তো অভিলাষকে ও কিছুটা পছন্দও করে। কিন্তু শত সাধ থাকলেও অভিলাষ কখনও পা বাড়ায়নি, নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেনি।

কারণ রঙ্গনা। অভিলাষ জানে, ওকে ডিভোর্সের কোনও প্রস্তাব দিলে ও সেটাকে এ-পাড়া থেকে শুরু করে বাপের বাড়ি পর্যন্ত রাষ্ট্র করে ছাড়বে। কথার খোঁচায় অভিলাষকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। কিন্তু ডিভোর্স দেবে না।

রঙ্গনা এইরকম। কারণ, ওর লোভঅর্থ আর শাসনের। অভিলাষের যা-কিছু আছে তার ওপরে দখল রাখতে রঙ্গনা ভালোবাসে, আর অভিলাষের ওপরে দখল রাখতে তার চেয়েও আরও অনেক বেশি ভালোবাসে।

এই দখলদারির বেড়া ভাঙতে চাইছিল অভিলাষ। তা হলেই ও অনেক স্বপ্ন দেখতে পারবে। এমনকী সুমিতিকে নিয়েও।

আরও আধঘণ্টা চিন্তাভাবনার পর অভিলাষ ঠিক করল ৯৮৩২১০০০৫১ নম্বরটায় ও ফোন করবে।

অভিলাষ ফোনটা করেছিল এসটিডি বুথ থেকে, যাতে কলার আইডি দেখে এন্ড গেম ওকে ট্রেস করতে না পারে। কিন্তু সেই নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও অভিলাষ যেভাবে ঘেমে নেয়ে উঠল তা রীতিমতো লজ্জা পাওয়ার মতন। রঙ্গনা এ-দৃশ্য দেখলে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ত। আর সেই হাসির এক-একটা কণা ধারালো ছুঁচের ডগা হয়ে ওকে রক্তাক্ত করত।

রঙ্গনা আপাদমস্তক আকাঙ্ক্ষাময় যুবতী। অভিলাষ ওকে কখনওই ঠিকমতো সন্তুষ্ট করতে পারেনিনা দিনে, না রাতে। ওর ছোটখাটো চেহারা আর ছোটখাটো প্রত্যঙ্গ নিয়ে কম খোঁটা দেয়নি রঙ্গনা। অতৃপ্ত অবস্থায় স্বামীর কাছ থেকে বিযুক্ত হওয়ার পর রঙ্গনা প্রায়ই ওকে খোকা মেশিন বলে ব্যঙ্গ করত। বলত, ...একে তোমার খোকা মেশিন, তাতে আবার আধখানা গুলি ভরা আছে!

অভিলাষের বুকের ভেতরটা জ্বলতে লাগল। ও ধীরে-ধীরে বুঝতে পারল, ওর ভেতরে একটা খুনি জন্ম নিচ্ছে।

মোবাইল ফোনের এসএমএস-টা বারবার দেখতে লাগল অভিলাষ। আচ্ছা, ন্যাগিং প্রবলেম সভ করতে এন্ড গেম ঠিক কত টাকা নেয়?

.

টুয়েন্টি সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে এ ধরনের একটা অফিস ঠিক যতটা আধুনিক হওয়া সম্ভব এন্ড গেম-এর অফিস ঠিক ততটাই আধুনিক।

মোলায়েম ঠান্ডা পরিবেশ। চারিদিকে ধবধবে সাদা আলো–তবে লুকোনো লুমিনেয়ারগুলো চোখে পড়ছে না। মসৃণ আলোর দীপ্তি থাকলেও বিরক্তিকর চোখধাঁধানো ব্যাপার নেই। গোটা অফিসটাই কাচ আর আয়না দিয়ে সাজানো। ফলে অবজেক্ট আর ইমেজ মিলেমিশে এক অদ্ভুত ইলিউশান তৈরি হয়েছে।

রিসেপশান থেকে প্রায় পুরো অফিসটাকেই দেখতে পাচ্ছিল অভিলাষ। টেবিল, চেয়ার, ফাইলিং ক্যাবিনেট, ল্যাপটপ কম্পিউটার, হলোগ্রাম ক্যালেন্ডার, আরও কত কী!

কাচ আর আয়না ঘেরা সরু-সরু অলিপথ ধরে তরুণ-তরুণীরা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। তবে কে যে অফিসের স্টাফ আর কে যে ক্লায়েন্ট সেটা একটুও বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎই অভিলাষের মনে হল, এন্ড গেম-এর যা ব্যবসা তাতে এই ব্যাপারটা যত গুলিয়ে যায় ততই ভালো। ক্লায়েন্টদের সেফটি আরও জোরালো হবে। তা ছাড়া নানান জায়গায় নানান অ্যাঙ্গেলে দাঁড় করানো আয়নার জন্য সব মানুষের চলাফেরার গতিপথ ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না। কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল রাতে আরও দুবার এন্ড গেম-এর অফিসে ফোন করেছিল অভিলাষ। দুবার-ই ও মাঝপথে ফোন কেটে দিয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বারে সাহস করে মেয়েটির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চালাতে পেরেছে।

অভিলাষকে একজন এক্সিকিউটিভের নাম আর মোবাইল নম্বর দিয়েছে মেয়েটি। বলেছে, এখন থেকে হি উইল বি ইয়োর ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড। য়ু মাস্ট ডিপেন্ড অন হিম। উই উইল গিভ য়ু ভ্যালু ফর মানি…।

এন্ড গেম-এর অফিসে ঢুকে সেই এফপিজি–মানে, ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইডকে ফোন করল অভিলাষ। সঙ্গে-সঙ্গে আশ্বাসের হাসি, সুপ্রভাত, আর কোনও চিন্তা নেই-এর বন্যা বয়ে গেল। একইসঙ্গে গাইড্যান্সও পাওয়া গেল।

মোবাইল ফোনে পরের পর নির্দেশ দিয়ে অভিলাষকে গাইড করতে লাগলেন তিনি। আয়না আর কাচের গোলকধাঁধায় অভিলাষ অন্ধের মতো পথ খুঁজতে লাগল। বারবার ধাক্কা খেতে লাগল কাচে অথবা আয়নায়। নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে ধাক্কা এড়াতে গিয়ে বেশ কয়েকবার নাকাল হল। তারপর, বহু ধস্তাধস্তির পর ও কিউব-১১০১১-এ পৌঁছতে পারল।

তখনই ও ওর এফপিজি-কে প্রথম দেখতে পেল।

বেঁটে চেহারার মোটাসোটা মানুষ। ফরসা, গালে সাহেবদের মতো লালচে আভা। মাথার প্রায় পুরোটাই টাক। চোখে চৌকো কাচের শৌখিন চশমা। চোখজোড়া গোল-গোল। তাতে সবসময়েই একটা অবাক ভাব। নাকের নীচে ছোট চওড়া গোঁফ। আর থুতনির নীচে গলকম্বল।

গোটা অফিসটা এসি হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোকের কপালে আর টাকে বিনবিনে ঘাম। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে ঘন-ঘন ঘাম মুছছেন।

এফপিজির চেহারা অভিলাষকে হতাশ করল। এ যে দেখছি বোকা বোকা একটা জোকার! যার সঙ্গে বুদ্ধি বা আই. কিউ.-র কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভিলাষ। ভদ্রলোককে কয়েকবার জরিপ করল।

না, ভদ্রলোকের পোশাক বেশ স্মার্ট। ঘিয়ে রঙের ফুলশার্ট। গাঢ় নীল রঙের টাই। আর গাঢ় নীল টেরিউলের প্যান্টের ওপরে সরু-সরু সাদা স্ট্রাইপ।

এফপিজির নাম কমলপাণি। অভিলাষের সঙ্গে হাতমেলানোর সময় শুধু প্রথম নামটাই বললেন তিনি। তারপর ওকে নিয়ে কাচ আর আয়নার ঘেরা একটা কিউবিক্স-এ বসলেন।

অভিলাষ আগেই লক্ষ করেছিল, কিউবিগুলোর নম্বর ডেসিম্যাল নাম্বারে না লিখে বাইনারিতে লেখা। ও যখন এর কারণ ভাবছিল তখন কমলপাণি হাতে হাত ঘষে একটু খসখসে গলায় ওকে জিগ্যেস করলেন, বলুন, স্যার, আপনার ন্যাগিং প্রবলেমটা কী? আপনাকে এটুকু অ্যাশিয়োর করছি, নেচার অফ প্রবলেম যা-ই হোক না কেন, উই উইল সম্ভ ইট ফর গুড।

অভিলাষ আর দেরি করল না। সমস্যাটা ও বলতে গেলে কমলপাণির মুখের ওপরে উগরে দিল।

সমস্যাটা আমার ওয়াইফ। আই ওয়ান্ট টু বাম্প হার অফ–ওকে একেবারে খতম করতে চাই...।

গুড! কমলপাণি চাপা হেসে মাথা নাড়লেন ও আপনার ওয়ে অফ এক্সপ্রেশান আমার ভালো লেগেছে, স্যার। বি ডায়রেক্ট অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট। সেক্স টাইম।

কাচের টেবিলে আলতো করে আঙুলের টোকা মারতে শুরু করলেন কমলপাণি। সাদা সিলিং-এর দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলেন। আস্তে-আস্তে বললেন, ওয়াইফকে…খুন…করতে…চান। তাই তো? চোখ নামালেন অভিলাষের দিকে : মোস্ট কমন প্রবলেম। হ্যাঁ, সভ হয়ে যাবে। তবে মার্ডার করতে চান কোন মোড়ে– ভারচুয়াল মোড, না রিয়েল মোড়?

তার মানে?

দেখুন, আমরা মার্ডার করি দু-ভাবে ইন ভারচুয়ালিটি, অ্যান্ড ইন রিয়েলিটি…।

অভিলাষ ফ্যালফ্যাল করে কমলপাণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মাথায় তখনও ভালো করে কিছু ঢুকছিল না। ভারচুয়াল রিয়েল? এসব কী বলছে ওর এফপিজি! তাছাড়া মানুষটা মার্ডার করার ব্যাপারটা এমন মামুলিভাবে উচ্চারণ করেছে যে, অভিলাষের স্পাইনাল কর্ড বেয়ে বরফজলের হিমস্রোত নেমে গেল।

কমলপাণি যতই কথা বলছিলেন অভিলাষ ততই বুঝতে পারছিল বোকা-বোকা জোকার জোকার ভাবটা ওঁর ছদ্মবেশ। ক্ষুরধার বুদ্ধি না থাকলে এন্ড গেম-এর এক্সিকিউটিভ হওয়া যায় না।

..ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিই, স্যার… দু-হাত নেড়ে বললেন কমলপাণি, ধরুন, আপনাদের কনজুগাল লাইফ একদম ঘেঁটে গেছে। মানে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা একেবারে বিষিয়ে গেছে মিউঁচুয়াল হেট্রেড ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। তখন, ধরুন, আপনি ডিসাইড করলেন যে, আপনার ওয়াইফকে মার্ডার করবেন– এই যেমন আপনি ডিসাইড করেছেন।

আমাদের সাইকোলজি ডিভিশান স্টাডি করে দেখেছে যে, এরকম কেস-এ প্রায় এইটিথ্রি পারসেন্ট মানুষের বেলায় রিয়েল মার্ডারের দরকার হয় না। ভারচুয়াল মার্ডার করলেই কাজ হয়ে যায়। মানে, য়ু গেট ইয়োর হেট্রেড আউট অফ ইয়োর সিস্টেম। তখন স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর রিলেশানটা আবার রিপেয়ার হয়ে যায়। এভরিথিং এস ওয়েল। ঠিক আছে?

ভারচুয়াল মার্ডার মানে? হতবাক অভিলাষ জিগ্যেস করল।

কমলপাণি হাসলেন, ওঁর হুঁড়ি হাসির দমকে কেঁপে উঠল। আঙুলের ডগা খুঁটতে-খুঁটতে তিনি বললেন, ভারচুয়াল মার্ডার মানে নকল খুন। কিন্তু আপনি ভাববেন আসল খুনই হয়েছে। ব্যাপারটা আমাদের কোম্পানির ইনভেনশান ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্টও নেওয়া আছে। এর ডিটেইএ এখন যাচ্ছি না–পরে আপনি দেখতেই পাবেন–যদি অবশ্য আপনি ভারচুয়াল মোড়ে যান।

আমাদের কোম্পানির নিয়ম হল, ভারচুয়াল মার্ডার হলে সেটা অবশ্যই ক্লায়েন্টকে নিজের হাতে করতে হবে। আর...ইফ এনিবডি গোজ ফর রিয়েল মোড, এন্ড গেম টেক্স কেয়ার অফ এভরিথিং। ক্লায়েন্টকে কোনও ঝামেলা ঘাড়ে নিতে হবে না। বরং আমরা ক্লায়েন্টকে জবরদস্ত অ্যালিবাই তৈরি করে দেব–পুলিশের বাবাও তাকে সেই মার্ডারের সঙ্গে জড়াতে পারবে না। তা ছাড়া মার্ডারটা আমরা এমনভাবে কমিট করব যে, সেটা একটা পারফেক্ট অ্যাক্সিডেন্টের মতো দেখাবে। এই ধরুন কার অ্যাক্সিডেন্ট, কিংবা মালটিস্টোরিড বিল্ডিং থেকে পড়ে যাওয়া–এই টাইপের। অ্যাবসোলিউটলি নো উয়ারিজ ফর দ্য ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টকে শুধু আমাদের প্রপার ফি-টা ক্রেডিট কার্ডে জমা করতে হবে। ব্যস...।।

ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে অভিলাষকে সব বুঝিয়ে দিলেন কমলপাণি। তারপর ওকে একপৃষ্ঠার একটা ফর্ম ফিল-আপ করতে দিলেন। বললেন, শুনুন, স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আপনাকে করব। তাড়াহুড়ো করে কোনও ডিসিশান নেবেন না। গো হোম। রিল্যাক্স। আপনার স্ত্রী যখন আপনার প্রেমিকা ছিল–আই হোপ শি ওয়াজ–সেইসব মিষ্টি দিনগুলোর কথা ভাবুন। ভাবুন আরও মিষ্টি রাতগুলোর কথা। ওহ্! দৌজ ওয়ান্ডারফুল নাইটক্স!...এমন তো হতেই পারে, ওসব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আপনার মনে হবে, য়ু ডোন্ট নিড আস অ্যাট অল।

একটা কথা আপনাকে বলি, স্যার–উই ডোন্ট বেগ ফর বিজনেস। যদি আপনি আমাদের হেল্প না নেন, তা হলে আমরাই সবচেয়ে বেশি খুশি হব। কিন্তু যদি তিনদিন পর আপনি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসেন তা হলে বুঝতে হবে আপনার ডিসিশানটা জেনুইন। তখন আপনিই ঠিক করবেন কোন মোডে আপনি কাজটা করতে চান-ভারচুয়াল, না রিয়েল। যদি ভারচুয়াল অপারেশানে যান, তা হলে ওয়াইফকে আবার ফিরে পাবেন। আর যদি রিয়েল অপারেশানই আপনার ডিমান্ড হয়, তা হলে..ওয়েল শি উইল বি গন ফর গুড। একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন

কমলপাণি : তা হলে বাড়ি যান…ভাবুন…তিনদিন পর আমাদের দেখা হবে। সি য়ু…।

.

ফর্মটা ফিল-আপ করার সময় মোডের জায়গায় ভারচুয়াল লিখল অভিলাষ।

গত তিনদিন ধরে অনেক ভেবেছে ও। কমলপাণির কথাগুলো ওকে বেশ নাড়া দিয়েছে। কমলপাণি বলেছেন মিষ্টি দিনগুলোর কথা ভাবতে–যখন রঙ্গনা ওর প্রেমিকা ছিল। মিষ্টি দিন। আরও মিষ্টি রাত।

প্রথম যেদিন ওরা সবচেয়ে কাছাকাছি আসে সেদিন রঙ্গনা কী বলেছিল আজও অভিলাষের মনে আছে।

অভিলাষের ফ্ল্যাটে ওরা দুজনে সন্ধেটা কাটাচ্ছিল। অভিলাষ একটা সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। একটু আগেই ওর তৃতীয় পেগ শেষ হয়েছে। মাথায় ঝিমঝিম ভাব, মনের মধ্যে নানান রঙের স্বপ্নের ওড়াউড়ি। মিউজিক সিস্টেমে রঙ্গনার ফেবারিট জিমি এক্স-এর ক্লোজ টু ইয়োর হার্ট বাজছিল। আর রঙ্গনা বসেছিল অভিলাষের হাতের নাগালে।

সুতরাং হাত হাতের কাজ করছিল, মন মনের।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রঙ্গনা এসে গিয়েছিল অভিলাষের বুকের ওপরে। তারপর, দু-চার প্রস্ত আদরের পর, রঙ্গনা অভিলাষের বুকে মুখ গুঁজে মিনমিনে জড়ানো স্বরে বলেছিল, তোমার নামের মানে জানো?

হ্যাঁ–জানি। নীচু গলায় জবাব দিয়েছিল অভিলাষ।

তা হলে আর দেরি করছ কেন?

না আর দেরি করেনি অভিলাষ।

সেইদিন, আর তার পরের দিনগুলো–নাম অনুযায়ী কাজ করে চলেছিল।

ভাবতে-ভাবতে নরম হয়ে যাচ্ছিল অভিলাষ। আচ্ছা, রঙ্গনা কি নিজেকে একটু বদলে নিতে পারে না? দরকার হয় অভিলাষও নিজেকে একটু-আধটু বদলাবে।

সুতরাং, রঙ্গনার সঙ্গে কথাবার্তায় বা ব্যবহারে সচেতন হয়ে উঠল অভিলাষ। ওর সঙ্গে অতিরিক্ত মোলায়েম সুরে কথা বলতে লাগল, সংঘর্ষ এড়াতে নিজে হার মানল বহুবার।

রঙ্গনা বেশ অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগল। একসময় তো বলেই বসল, কী ব্যাপার বলো তো? কোনও ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট খেয়েছ নাকি? তোমাকে ভারী পিকিউলিয়ার লাগছে….।

অভিলাষ তাও চেষ্টা চালিয়ে গেছে। আর ওর মনটা ধীরে-ধীরে পালটাতে শুরু করেছে। মনে হয়েছে, রঙ্গনাকে আর-একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। দেখাই যাক না!

তাই কমলপাণির কাছে এসে ফর্মে মোডের জায়গায় ও লিখেছে, ভারচুয়াল।

খুব তাড়াতাড়ি সবরকম ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করে দিলেন কমলপাণি। চোখ তুলে দেখলেন অভিলাষের দিকে, বললেন, ইট ওয়াজ আ গুড ডিসিশান, স্যার। য়ু উইল ফাইন্ড দ্য ভারচুয়াল মোড় নো লেস এফেকটিভ দ্যান দ্য রিয়েল মোড…।

অভিলাষ শুনল, কিন্তু কোনও কথা বলল না। শুধু মনে-মনে ও ভারচুয়াল মার্ডারের এফেকটিভনেসটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল।

কমলপাণি অভিলাষের ফ্ল্যাটের ঠিকানা এবং মোটামুটি লোকেশান জেনে নিলেন। তারপর হাতঘড়ির ডায়ালে তারিখ দেখে অভিলাষকে সাতদিন পরের একটা তারিখ আর সময় জানালেন, বললেন, আরও সাতদিন সময় হাতে পেলেন। কিপ ইয়োর কুল। ওইদিন ঘড়ি ধরে চলে আসুন। কমিট দ্য ক্রাইম অ্যান্ড বি হ্যাপি। ও. কে.?

ও. কে.– বলল অভিলাষ।

.

অন্ধকার ঠান্ডা ঘরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে রঙ্গনাকে দেখছিল অভিলাষ।

ওর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এফপিজি কমলপাণি।

ওদের সামনে একটা বিশাল কাচের জানলা। জানলার ওপাশেই একটা আলো-ঝলমলে বেডরুম–অভিলাষের বেডরুম।

সুন্দর করে সাজানো বেডরুমের মোলায়েম বিছানায় আলুথালুভাবে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে রঙ্গনা। একহাতে ধরা একটা ইংরেজি পেপারব্যাক।

রঙ্গনার গায়ে লেসের কাজ করা গোলাপি রঙের একটা নাইটি। পোশাকটা ঠিকঠাক ওর গায়ে নেই। একটা পা ভাঁজ করা পোশাকটা উঠে গিয়ে হাঁটু এবং ঊরুর খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল বালিশের ওপরে ছড়ানো। বাঁ হাতে কোমরের কাছটা চুলকোচ্ছে।

কমলপাণি ফিশফিশ করে বললেন, স্যার, এটা আপনার বেডরুমের হলোগ্রাফিক লাইভ টেলিকাস্ট। আপনি যা দেখছেন সবটাই হলোগ্রাফিক ইমেজ মানে মায়া। আমাদের ক্যামেরা এখন থেকে প্রতিমুহূর্তে আপনার ওয়াইফকে ফলো করবে। এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রী ফ্ল্যাটে যা-যা করবেন তার প্রতিটি কণা আমাদের থ্রি-ডি ক্যামেরা সিস্টেম লাইভ টেলিকাস্ট করে আপনাকে দেখাবে...।

অভিলাষের তাজ্জব লাগছিল। কারণ, ওরা ওর ফ্ল্যাট থেকে অনেক দূরে এন্ড গেম-এর অফিসে একটা স্পেশাল রুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কমলপাণি বোধহয় অভিজ্ঞতা থেকেই অভিলাষের অবাক হওয়াটা টের পেলেন। চাপা গলায় বললেন, আপনি যা দেখছেন, পুরোটাই ভারচুয়াল রিয়্যালিটি। কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে, আপনার স্ত্রীকে আপনি যেন সত্যি-সত্যি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছেন। আসলে যে-কোঅর্ডিনেটে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এগজ্যাকুলি সেই কোঅর্ডিনেটে আপনার ফ্ল্যাটের বেডরুমে একটা জানলা আছে ফ্রস্টেড গ্লাস লাগানো জানলা। আমরা যেন সেই জানলার কাচ সরিয়ে আপনার ওয়াইফের প্রাইভেসিতে ইনভেড করছি। ইটস সো-ও-ও রিয়েল! হঠাৎই কথা থামিয়ে অন্ধকারে অভিলাষকে ছুঁলেন কমলপাণি। চাপা গলায় বললেন, নিন– এটা ধরুন....।

জিনিসটা কমলপাণির হাত থেকে নিল অভিলাষ।

একটা রিভলভার।

আন্দাজে বুঝল, অস্ত্রটার ওজন প্রায় কেজিখানেক হবে।

এটা আপনার মার্ডার ওয়েপন। মডার্ন। ইমপোরটেড। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, মডেল ফোর জিরো জিরো সিক্স। জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ক্যালিবার। ডাল অ্যাকশান। এর ম্যাগাজিনে এগারো রাউন্ড বুলেট আছে। এই হ্যান্ডগানটার নল-টল সব স্টেইনলেস স্টিলের–আর গ্রিপটা ব্ল্যাক, সিনথিটিক। প্রথম কয়েকটা শটে আপনার স্ত্রী-কে মিস করলেও এগারোবার তো আর মিস করবেন না! নিন, এবার রেডি হোন…।

অভিলাষ রিভলভারটা উঁচিয়ে রঙ্গনার দিকে তাক করল। ও অ্যামেচার হলেও এত ক্লোজ রেঞ্জে রঙ্গনাকে মিস করা প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব।

রঙ্গনার সমস্ত খোঁচা, উপহাস আর ব্যঙ্গগুলো মনে পড়ল ওর। খোকা মেশিন… আধখানা গুলি ভরা…। আর এখন। অভিলাষের হাতে একটি পূর্ণাঙ্গ মেশিন–তাতে এগারোখানা গুলি ভরা আছে।

কাচ সরিয়ে দিলাম কিন্তু! গেট রেডি! কমলপাণির গলা।

অভিলাষের হাত কাঁপছিল। ও মুঠো শক্ত করল বাঁটের ওপর।

সড়সড় শব্দ করে কাচের প্যানেল সরে গেল।

অভিলাষের মাথার মধ্যে খতমের সুর বাজছে।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কমলপাণি বললেন, ওয়ান, টু, থ্রি–ফায়ার!

অভিলাষ ট্রিগার টিপতে শুরু করল। ফায়ারিং-এর শব্দে ওর কানে তালা লেগে গেল।

প্রথম বুলেটটা রঙ্গনার কোমরে গিয়ে লাগল। ওর হাতের বইটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ও চমকে ফিরে তাকাল জানলার দিকে..অভিলাষের দিকে। ওর অবাক হওয়া মুখটা পলকে ব্যথায় কুঁচকে গেল। কোমর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। গোলাপি নাইটি লাল হতে লাগল। বিছানায় চাদরও।

অভিলাষ কিন্তু থামেনি। চোখ বুজে পাগলের মতো ফায়ার করেই চলল। রঙ্গনার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত দেখে ওর খুনে মেজাজ যেন আরও চড়ে গেল। ও ভুলে গেল, এটা ভারচুয়াল মার্ডার।

বুলেটের ধাক্কায় রঙ্গনা বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল। মেঝেতে পড়ে থাকা ওর চিতপাত শরীর আর রক্ত দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ও আর বেঁচে নেই।

অভিলাষের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। ও হঠাৎই টলে পড়ে গেল মেঝেতে। কমলপাণি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লেন ওর ওপরে। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলেন, নাড়ি দেখলেন। তারপর পকেট থেকে নিমপাতার মতো ছোট্ট আর পাতলা একটা মোবাইল ফোন বের করে কথা বললেন, আমি ক্লায়েন্ট নাম্বার ট্রিপল ওয়ান ট্রিপল জিরো ডাল ওয়ানকে নিয়ে ভারচুয়াল মার্ডার এক্সিকিউশান রুমে আছি। ভদ্রলোক সাডেন ট্রমায় সেন্সলেস হয়ে গেছেন। হেল্পলাইনকে অ্যাটিভ হতে রিকোয়েস্ট করছি।

.

অভিলাষ সুস্থ হয়ে উঠল আধঘণ্টার মধ্যেই। ও শুধু রঙ্গনার কথা ভাবছিল। জ্ঞান ফেরার পর কমলপাণি ওকে বারবার আশ্বাস দিয়েছেন যে, রঙ্গনার কোনও ক্ষতি হয়নি। ইট ওয়াজ ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট আ ভারচুয়াল মার্ডার।

শি ইজ পারফেক্টলি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। অভিলাষ ইচ্ছে করলে এখনই ওর স্ত্রীকে ফোন করতে পারে।

কিন্তু তবুও অভিলাষের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তাই রঙ্গনাকে ফোনই করল অভিলাষ।

রঙ্গনা—

হু ইজ দিস?

আমি –অভি। তুমি ঠিক আছ তো?

ক পেগ খেয়েছ?

আহ! একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল অভিলাষ। এটাই তো রঙ্গনার ক্যারেক্টারিস্টিক আনসার! দিস প্রুভ্স শি ইজ অ্যালাইভ অ্যান্ড ও. কে.।

রঙ্গনা, আই লাভ য়ু, বেবি।

কখন বাড়ি ফিরছ?

ঘড়ি দেখল অভিলাষ, বলল, এই ধরো সাড়ে দশটা নাগাদ।

সাড়ে দশটাই কোরো। তার চেয়ে বেশি দেরি যেন না হয়…।

এই কথায় প্রেমিকা রঙ্গনার ছায়া দেখল অভিলাষ। কমলপাণিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। কারণ, তিনিই প্রথম ভারচুয়াল মার্ডারের সাজেশান দিয়েছিলেন।

রাস্তায় নেমে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসল অভিলাষ। গাড়ি ছুটিয়ে দিল। রাতের বাতাস ওর গালে কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

রাতটা কী সুন্দর! আকাশের চাঁদটাও।

অভিলাষ যখন ওদের বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় এসে পড়ল তখনই একটা মালবোঝাই ফুল পাঞ্জাব ট্রাক পাগলাঘোড়ার মতো ছুটে এল ওর দিকে।

প্রবল সংঘর্ষের শব্দে নিঃস্তব্ধ রাত থরথর করে কেঁপে উঠল।

ট্রাকটা একটুও না থেমে উদ্দামগতিতে ছুটে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

অভিলাষের গাড়িতে আগুন ধরে গেল। তার একটু পরেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ।

অ্যাকশন ছবির দৃশ্যের মতো অভিলাষের গাড়িটা শূন্যে ছিটকে উঠল, আবার আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

রঙ্গনা টেনশানে পায়চারি করছিল। হঠাৎই ওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল রঙ্গনা। দশটা চল্লিশ।

তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে হ্যালো বলতেই ও-প্রান্ত থেকে রোবটের গলায় একজন মহিলা বলে উঠল, ম্যাডাম, এন্ড গেম থেকে বলছি। আপনার কাজটা হয়ে গেছে। যেমন বলেছিলাম, ইট ওয়াজ আ পারফেক্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট…। একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায়…।

# সুন্দরী

## সুন্দরী

রিঙ্কু বিছানায় বসে বই পড়ছিল। কমলেশ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিগ্যেস করল, অ্যাই, খুব সুন্দর একটা কবিতার লাইন শুনবি?

রিঙ্কু আয়নার মধ্যে দিয়ে বাবার দিকে তাকাল। বলল, কী, শুনি?

কমলেশ মুচকি হেসে বলল, পদার্থবিদ্যা পড়ছে একটি অপদার্থ মেয়ে।

রিঙ্কু গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতায় মনোযোগ দিয়ে মন্তব্য করল, বুঝেছি, আমাকে অপদার্থ বললে। আমি তো ভৌতবিজ্ঞান পড়ছি, তাই।

কমলেশ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, নাঃ, তোর দেখছি বুদ্ধি আছে। আমি তোর বুদ্ধি পরীক্ষা করছিলাম।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রোমি ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছিল। রুক্ষ গলায় বলল, তোমার আয়নার কাজ হয়েছে? তা হলে এ পাশে এসে মেয়ের সঙ্গে কবির লড়াই করো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কমলেশ বউয়ের দিকে তাকাল। সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোচ্ছে! বিউটি পারলার, কিংবা হ্যান্ডিক্র্যাফট-এর স্কুল, অথবা কুকিং রেসিপি-র স্পেশাল কোর্স অ্যাটেন্ড করতে। নয়তো অন্য কিছু। কমলেশ ঠিক জানে না। জানার তেমন একটা ইচ্ছেও আর নেই।

কমলেশ কোনও কথা না বলে আয়না ছেড়ে দিল। রোমি চটপট পা ফেলে আয়নার সামনে এসে সাজগোজের শেষ ধাপটুকু মন দিয়ে শেষ করতে লাগল।

কমলেশ আড়চোখে বউকে একবার দেখল।

রোমি দারুণ সুন্দরী। এত সাজগোজের কোনও দরকার নেই ওর। কিন্তু তবুও সাজে। রূপ নিয়ে ঠিক দেমাক না হলেও ওর একধরনের আত্মতুষ্টি আছে। মাঝে-মাঝে কমলেশকে আড়ালে কথা শোনায়, রিঙ্কু তেমন সুন্দর দেখতে হয়নি বলে।

আয়নার মধ্যে দিয়ে রোমিকে দেখতে দেখতেই হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। আয়নার ছায়াটা ঢেউয়ের মতো কাঁপতে লাগল, তারপর সেখানে একটা অদ্ভুত বেঢপ চেহারা দেখা গেল। ধাতুর পাতে তৈরি হাত-পা-ওয়ালা একটা মানুষ যেন!

কমলেশ বুঝতে পারল, ও এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কারণ এই ঘরে রোমি বা রিঙ্কু থাকতে পারে না। অন্তত এখন।

তো চোখ খুলে ভালো করে তাকাল চারপাশে।

মাথা ঝিমঝিম করছে। ঘরের দেওয়ালগুলো দোল খাচ্ছে। বুকের ভেতর কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে। আয়নাটা মনে হল দুলছে। এমনকী আয়নার সামনে দাঁড়ানো বেঢপ চেহারার বস্তুটাও সামান্য টলছে।

ওইরকম আচ্ছন্ন অবস্থাতেও কমলেশ মোটামুটি শুনতে পাচ্ছিল। ওর কানে এল, বিচিত্র ধাতব গলায় কে যেন সুর করে গাইছে?

ভোর হইল, জগৎ জাগিল
চেতনে চাহিল নারী-নর–।

আর তার ঠিক পরেই সেই ধাতব কণ্ঠ হাঁফ ছাড়ার ভঙ্গিতে বলল, যাক, তোমার ঘুম ভেঙেছে তা হলে! ওঠো দ্যাখো, ভোর হয়ে গেছে। আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল। প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আঁধারে। প্রভাত পাখির গান–

থামো, থামো, থামো! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কমলেশ। বিছানায় উঠে বসে ও হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ঘষতে লাগল। তারপর মুখের সামনে ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা ভি অক্ষরের মতো করে বারকয়েক নাড়ল। না, দুটো আঙুলই দেখতে

পাচ্ছে কমলেশ–চারটে নয়। এমনকী পাশের ছোট টেবিলে রাখা ভ্যাট সিক্সটিনাইনের বোতলের গায়ের লেখাটাও বাংলায় নির্ভুলভাবে ভ্যাট উনসত্তর বলে পড়তে পারল। নাঃ, নেশার ঘোর তা হলে আর নেই। শুধু এই হতচ্ছাড়া মস্তক বেদনাটি ছাড়া।

কিন্তু তবুও আয়নার সামনে দাঁড়ানো বিচিত্র রোবটটাকে কমলেশ কিছুতেই বাস্তব বলে মেনে নিতে পারছিল না। একে তো রোবট, তায় আবার নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ আওড়াচ্ছে!

রোবটটা আহত গলায় বলল, জানি, আমার পাংচুয়েশানে একটু-আধটু ডিফেক্ট আছে, তা বলে অমন মুখ করে থামিয়ে দেওয়ার কী ছিল! ভোরের রূপ দেখে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম!

কমলেশ হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। আয়নার সামনে দাঁড়ানো রোবটটাকে দেখে ওর মনে ঠিক পাঁচটি মৌলিক প্রশ্ন জাগল : কে, কী, কেন, কবে, কোথায়?

এলোমেলো বিছানা থেকে নেমে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল কমলেশ। বিরক্ত গলায় পাঁচটি প্রশ্নের প্রথমটা ছুঁড়ে দিল রোবটটার দিকে।

কে তুমি?

ও মা! বিস্ময়ে ডানহাত তুলে গালে ঠেকাল রোবটটা। খনখনে গলায় বলল, আমার জন্মদাতা হয়ে আমাকেই ভুলে গেলে!

জন্মদাতা!

হ্যাঁ, কাল রাতে তুমিই তো আমাকে তৈরি করলে! ঠিক রাত বারোটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে আমাকে কমপ্লিট করে সুইচ অন করে দিয়েছ তুমি।

কমলেশ এই যন্ত্রপাতিটাকে তৈরি করেছে! হতে পারে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গত ছমাস ধরে যা কিছু ও আবিষ্কার করেছে তার শতকরা নব্বই ভাগই মাতাল অবস্থায়, নেশার ঘোরে। তা ছাড়া, রোবটটার চেহারার মধ্যেও কমলেশের পেটেন্ট ধাঁচ রয়েছে।

কমলেশ বেশিরভাগ সময়েই বাতিল করে দেওয়া জিনিসপত্র ব্যবহার করে নতুন-নতুন আবিষ্কার করে ফেলে। ফলে অল্প খরচে তৈরি করা অভিনব সব মেশিনপত্তর জনগণের কাছে চটজলদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, নিমের ডাল, জামাকাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ আর পুঁচকে একটা মোটর দিয়ে ও তৈরি করেছে দন্তধাবন যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে দাঁত মাজার সময়ে মাথা একটুও নাড়াতে হয় না। শুধু যন্ত্রে দাঁত ঠেকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে থাকলেই কাজ হয়। যন্ত্র নিমেষে বাকি কাজটুকু সেরে দেয়। তা ছাড়া এতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিমের দাঁতনের আয়ুর্বেদিক গুণ। আর দাম মাত্র পঁচাত্তর টাকা। শুধু মাঝে-মাঝে নিমের দাঁতনের একটা নতুন টুকরো ক্লিপের মধ্যে ফিট করে দিতে হয়।

তা এই রোবটটাও সেইরকম। ভাঙা টিনের পাত্রতার মধ্যে মোটর গাড়ির বডি থেকে শুরু করে আমুল স্প্রে-র খালি টিন পর্যন্ত রয়েছে, পুরোনো গিয়ার, সাইকেলের চেন, কয়েকটা টুনি বা, খানিকটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক, কয়েকটা মোটর আর আই. সি. চিপ দিয়েই ব্যাপারটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। মেশিনটার বুকের কাছটায় একটা নব লাগানো দরজা রয়েছে। বোধহয় ব্যাটারি ভরার জন্য আর কানেকশান রিপেয়ার করার জন্য।

স্বাভাবিকভাবেই রোবটটা দেখতে তেমন একটা আহামরি কিছু হয়নি। চোখের বা দুটো মাঝে-মাঝেই জ্বলে উঠছে, আর তালপাতার সেপাইয়ের মতো ল্যাকপ্যাক করে টিনের হাত-পা নাড়ছে।

কিন্তু এই মালটাকে কমলেশ তৈরি করল কেন?

ওর এখন বেশ মনে পড়ছে, রোবটটা তৈরির জন্য গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুবই পরিশ্রম করেছে। তারপর গতকালই ফিনিশিং টাচ দিয়ে রোবটটাকে চালু করেছে। কিন্তু কেন?

কমলেশ সেই কথাটাই জিগ্যেস করল, তোমাকে হঠাৎ তৈরি করতে গেলাম কেন বলো তো?

রোবটটা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল কমলেশের দিকে। বলল, কী করে জানব! হয়তো তোমার একা-একা লাগছিল, সেইজন্যে।

কমলেশ বিরক্তির একটা শব্দ করে ঘরের চারপাশটা দেখল। ছন্নছাড়া বলতে যা বোঝায় ঘরটার অবস্থা এককথায় তাই। একসময় এই ঘরটার নাম বেডরুম ছিল—যখন রোমি-রিঙ্কু ছিল। তারপর, গত আটমাস ধরে এই ঘরটা ধীরে-ধীরে পালটে গেছে। এখন এটা বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, ল্যাবরেটরি সবকিছু।

বিছানার পায়ের দিকটায় ড্রেসিং টেবিল, আয়না লাগানো। আর ওদিকের কোণটায় জামাকাপড়ের দুটো স্টিলের আলমারি। একটায় কমলেশের জামাকাপড় ডঁই করা। অন্যটায় রোমি আর রিঙ্কুর পোশাক-আশাক। রোমি বলে গেছে, ওর নতুন ফ্ল্যাটে সবকিছু সাজানো-টাজানো হয়ে গেলে তখন এটা নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলেই ভালো। নইলে সবসময় পুরোনো কথাগুলো বড় বেশি করে মনে পড়ে। তখন খারাপ লাগে। একা-একা লাগে। কষ্ট হয়।

কমলেশ আয়নার পাশে দেওয়ালে ঝোলানো টুথব্রাশ কিপার থেকে ব্রাশ নিল। নানা রঙের রেক্সিন দিয়ে তৈরি জোকারের হাসি-হাসি মুখ। তার টুপিতে গুড মর্নিং লেখা। রিঙ্কু পছন্দ করে এই টুথব্রাশ কিপারটা কিনেছিল। কমলেশের গোলাপি ব্রাশের পাশেই সবুজ ও নীল রঙের দুটো ব্রাশ। রোমির আর রিঙ্কুর। ওরা কখনও এলে যদি দরকার হয়, তাই ও-দুটো এখনও ফেলে দেয়নি কমলেশ।

মাঝে-মাঝে রোমি আসে, কখনও কখনও সঙ্গে নিয়ে আসে রিঙ্কুকে। তবে এলেও বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। একমাত্র সুতপন এলে তেমন একটা তাড়াহুড়ো করে না।

সুতপন বোধহয় কমলেশকে পছন্দই করে। ও কমলেশের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্প করে। ওর টিভি সিরিয়াল তোলার কোম্পানি আছে। তার ব্যাপারে অনেক সময় কথা বলে। টিভি দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কমলেশ অভিনব কিছু আবিষ্কার করতে পারে কি না, তা জিগ্যেস করে।

রিঙ্কুর পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করে সুতপন। কিন্তু রোমির কথা কখনও তোলে না। রোমির সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে বোধহয় মনে-মনে একটা অস্বস্তি আছে।

কমলেশ সাধারণত নিজের আবিষ্কার নিজে ব্যবহার করে না। তাই সাবেকি পদ্ধতিতে দাঁত মেজে মুখ টুখ ধুয়ে ও চলে গেল রান্নাঘরে। ফ্রিজ খুলে দুটো মিষ্টি আর একটা স্যান্ডউইচ বের করে নিল।

ফ্রিজ খুলতেই সুন্দর একটা মিউজিক বেজে উঠল। এটা কমলেশের বৈজ্ঞানিক কীর্তি। আর ফ্রিজের ভেতরটা যে যেমন-তেমন অগোছালো, সেটাও কমলেশের কীর্তি। ফ্রিজের ভেতরে উলটোপালটা খাবার-দাবারের সঙ্গে এখানে ওখানে আই. সি. চিপ, ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টও খুশিমতো রাখা আছে।

গত সাত-আটমাস ধরে এই ফ্রিজটা কমলেশের তত্ত্বাবধানে আছে। আর রান্নাঘরটা রয়েছে। ছুটির মায়ের তত্ত্বাবধানে। ছুটির মা এখনও আসেনি। দশটা-সাড়ে দশটায় আসবে।

কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল কমলেশ। গা ম্যাজম্যাজ করছে, মাথা দপদপ করেছে। অবশ্য এ ঝামেলাগুলো আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।

শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই দেখল, রোবটটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা বেঁকিয়েচুরিয়ে দেখছে আর বারবার বলে উঠছে, অপূর্ব! মারভেলাস! বিউটিফুল!

কমলেশ হাই তুলল। বিছানায় গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসল। তারপর আর থাকতে না পেরে মুখ তুলে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার? কী দেখে অমন বারবার অপূর্ব, মারভেলাস আর বিউটিফুল বলছ?

রোবটটা ঢং করে বলল, আ-হা, বোঝে না যেন! নিজের রূপ দেখেই বলছি! এমন সুন্দর একটা রোবট তৈরি করতে পারবে কখনও ভেবেছিলে? এটা তোমার জীবনের সেরা কীর্তি।

কমলেশ এবার সত্যি-সত্যি হো-হো করে হেসে উঠল। সেরা কীর্তি! গত ছসাত মাস ধরে কমলেশের খুব টানাটানি চলছে। রোমি স্কুলে চাকরি করে। সেই আয় তো গেছেই, উপরন্তু নিজের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছে কমলেশ।

এখন এটা-ওটা আবিষ্কার করে সেগুলো বিক্রি করে দিন চালাচ্ছে।

সুপারটয় করপোরেশন-এর সিনিয়ার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার ছিল কমলেশ। কিন্তু ওর মাথায় প্রতি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেসব চমৎকার আবিষ্কারের আইডিয়া আসে তার জন্য কোম্পানি কোনওরকম টাকা ঢালতে রাজি নয়। ঝগড়াঝাঁটি অনেকদিন ধরেই চলছিল। রোমি রিঙ্কুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কমলেশ কেমন দিশেহারা

আর রগচটা হয়ে পড়েছিল। সেইসময়েই একদিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। তখন কমলেশ বুকে আঙুল ঠুকে বলেছিল, সারাজীবন আপনার কোম্পানিতে চাকরি করার জন্যে আমার জন্ম হয়নি। এ-চাকরি আমি করব না। আমি বাড়িতে বসেই কাজ করব। একদিন আপনাকে এসে আমার জীবনের সেরা আবিষ্কার দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব।

তা এই সেই তাক লাগানোর বস্তু! যেটার কোনদিক সোজা আর কোনদিক উলটো সেটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না!

কমলেশের চিন্তায় বাধা দিয়ে রোবটটা বলে উঠল, আস্তে, আস্তে! তুমি যে হাসির চোটে আমার কান ফাটিয়ে দিলে!

কমলেশ খানিকটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, তোমার কান খুব সেনসিটিভ বুঝি?

হ্যাঁ। আমি সাবসনিক থেকে সুপারসনিক–সবরকম শব্দ শুনতে পাই। দ্যাখো না, তোমার ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ির কাছটায় একটা বেড়াল ঘুরঘুর করছে, আমি তার পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

কমলেশের কী যেন হল। ও একছুটে শোওয়ার ঘর পেরিয়ে ঢুকে পড়ল একফালি ড্রইংরুমে। ড্রইংরুমের নানা জায়গায় কমলেশের নানা আবিষ্কারের চেষ্টার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। এ ছাড়া মোটর, ট্রান্সফর্মার, পিসিবি, লোহার টুকরো, কাঠের ফ্রেম, আরও কত কী! সেগুলো ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতেই দেখল, একটা হুলো বেড়াল লেজ উঁচিয়ে ওর দিকে সবুজ চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ সদর দরজা বন্ধ করে ফিরে এল রোবটটার কাছে। সে তখন গুনগুন করে তোমার মুখটা কী সুন্দর, আমি বলবই বলব গানটা গাইছে, আর গালে-কপালে আঙুল ঘষে মেকাপে পালিশ দিচ্ছে।

কমলেশের গোল-গোল চোখের দিকে তাকিয়ে রোবটটা বলল, কী মশাই, এবারে বিশ্বাস হল তো!

কমলেশ কোনও উত্তর দিতে পারল না। কে জানে, মদের নেশার ঘোরে কমলেশের অবচেতন বিজ্ঞান প্রতিভা কোন-কোন আশ্চর্য গুণ আর কোন-কোন

জটিল প্রোগ্রাম গুঁজে দিয়েছে এই যন্ত্রদাসের মধ্যে!

রোবটটা এবার ঘুরে দাঁড়াল কমলেশের দিকে। ধাতব শব্দ তুলে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, আমাকে তুমি সুন্দরী বলে ডেকো। অনেক ভেবে দেখলাম, নামের সঙ্গে মিল থাকাটাই ভালো। নইলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো দশা হবে।

কমলেশ সুন্দরীকে দেখছিল।

টিন-লোহা-নাটবল্টু সারাটা শরীর জুড়ে দাঁতখিঁচিয়ে আছে। চোখজোড়া একেবারে বেমানান। কান দুটোও তাই। মাথা প্রায় ন্যাড়া। শুধু পিছনদিকটায় একগোছা পরচুলা। রোমির বাতিল করে দেওয়া নকল কেশরাশি। হাত-পায়ের আঙুলগুলো বেঢপ মাপের। হাঁটু আর কনুইয়ের জোড় কাজের চেয়ে শব্দ করে বেশি। আর এখানে-ওখানে কিছু বৈদ্যুতিক তার চোখে পড়ছে।

শুধু পরচুলাটুকু ছাড়া সুন্দরীর জেন্ডার কনফার্ম করার আর কোনও উপকরণ নেই। ওটা কি কমলেশই নেশার ঘোরে কাল রাতে জুড়ে দিয়েছে? কে জানে! কমলেশের মনে নেই। গত কয়েকমাসে ওর অবচেতন মনের যা হাল হয়েছে তাতে ওটাকে দিব্যি অপারেশন করে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়!

কমলেশ সুন্দরীর খুব কাছে এগিয়ে গেল। আর তক্ষুনি রোবটটা এক পা পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, কী হচ্ছে! হুট করে কে কখন দেখে ফেলবে। প্লিজ, কমলেশ–

কমলেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। শয়তান মেশিনটা বলে কী! ওর মাথার দপদপানিটা হঠাৎ সাত ডিগ্রি বেড়ে গেল। মাথার ওপরে ঢিমে তালে ফ্যান ঘুরছে, আর ফ্যানের সঙ্গে তালে-তালে লাল নীল-হলদে বাতি জ্বলছে কমলেশের সায়েন্টিফিক মডিফিকেশান। সেই পাখার হাওয়া কমলেশের মাথায় লাগছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এসব স্বপ্ন, না সত্যি! কমলেশ জেনুইন জেগে আছে তো!

সামনের রংচটা দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। ১৯৯৪ সাল। কোনও ভুল নেই। বড় মাপের জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। পাশের বাড়ির টিভি অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় বাংলাদেশ-টিভি প্রোগ্রাম দেখার

জন্য মাছের কাঁটার মতো ছোট অ্যান্টেনা। তাতে একজোড়া পাতিকাক বসে আছে।

কোনওটাই স্বপ্ন নয়। ঘোর বাস্তব।

এমনকী ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো কমলেশ, রোমি আর রিঙ্কুর রঙিন ফটোটাও যে সত্যি!

কমলেশ তাকাল সুন্দরীর চোখে।

সে তখনও বলছে, না, কমলেশ, না–এখন না। তুমি নিজেকে একটু কন্ট্রোল করো, লক্ষ্মীটি।

কমলেশ আর সহ্য করতে পারল না। একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, কীসব আবোলতাবোল বকছ!

না গো, তোমার চোখ দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কী দোষ বলো। সব দোষ আমার। আমার রূপই আমার কাল হয়েছে।

কমলেশ বোধহয় মাথার চুল ছিঁড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। ঠিক আড়াইবার। দুটো লম্বা টোন, আর তারপরই একটা হাফটোন।

এরকম বিশেষ স্টাইলে কলিংবেলে সুর তোলেন একমাত্র গুরুপদবাবু। গুরুপদ সরকার। এ ফ্ল্যাটবাড়ির বাড়িওয়ালা। একেবারে ওপরতলার ফ্ল্যাটে থাকেন।

সুন্দরীর দিকে কটমট করে একবার দেখল কমলেশ। তারপর চটপটে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই তাঁকে দেখা গেল।

দশাসই চেহারা। পরনে পাজামা আর গেঞ্জি। হাতে কালচে রঙের শক্তপোক্ত পাচালো লাঠি। মাথার চুল সাদা। দু-ভুরু আর দুকানে যেন একখাবলা করে গ্লাসউল বসানো। মুখের চামড়ায় অনেক ভাজ। চোখ কুতকুতে। কানে একটু কম শোনেন। স্ত্রী গত হয়েছেন অন্তত একযুগ। তবে যাওয়ার আগে অকালকুষ্মাণ্ড

একটি পুত্র রেখে গেছেন। গত পাঁচবছর ধরে ভদ্রলোকের একমাত্র খাদ্য বোধহয় চ্যবনপ্রাশ। কারণ, পরিচিত সকলকেই তিনি নিয়মিত এই বস্তুটি সেবনের উপদেশ দেন।

কমলেশকে দেখেই গুরুপদবাবু চেঁচিয়ে বললেন, বাবা কমলেশ, তোমার ভাড়াটা

কমলেশ একটু অবাক হয়ে বলল, এখন তো সবে বিশ তারিখ…।

গুরুপদ সরকার হেসে বললেন, না বাবা, আমি গতমাসের ভাড়াটার কথা বলছি। তুমি যে চেক দিয়েছিলে সেটা বাউন্স করেছে। এই ভাড়া কালেকশান যে কী ঝামেলার! নেহাত ছেলেটা অপোগণ্ড, তাই আমাকেই কালেকশানে বেরোতে হয়।

আমার চেক বাউন্স করেছে? কমলেশ বেশ অবাক হল যেন।

হ্যাঁ বাবা, তুমি যখনই চেক দাও তখনই বাউন্স করে, বারবার বাউন্স করে। কেন বলো তো?

বোধহয় রবারের তৈরি তাই। একটু থেমে আবার বলল, তা ছাড়া ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ব্যাপারটা সবসময় আমার খেয়াল থাকে না।

শুধু ব্যাঙ্কে কেন, ব্যালেন্স বোধহয় কোথাও ঠিক নেই কমলেশের। সামান্য এই ষোলোশো টাকা মাসে-মাসে দিতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে ওর। যখনই কোনও আবিষ্কার বিক্রি করতে পারে তখনই রাজার জীবনযাত্রা শুরু করে দেয়। মনপ্রাণ ঢেলে নেশা করে। এমনকী লাগামছাড়া দাম দিয়ে ভ্যাট সিক্সটিনাইন কিংবা জনি ওয়াকার কিনে ফ্যালে। কিন্তু এখন এই ভদ্রলোককে ঠেকানো যায় কী করে? আচ্ছা, রোবটটা এঁকে বেচে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

মেসোমশাই, কিছু মনে করবেন না, ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার ছেলের মতো।

না! গুরুপদ সরকার চেঁচিয়ে বললেন, তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো। ও ব্যাটা একটা–।

সন্তান সম্পর্কে নামাবলী শুরু হওয়ার আগেই বাধা দিল কমলেশ, কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন, ভেতরে আসুন, আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব। একটু সাবধানে আসবেন।

কমলেশকে অনুসরণ করে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধ।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেই গুরুপদবাবুর নাক কুঁচকে গেল। আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করলেন, কীসের একটা গন্ধ পাচ্ছি।

চকিতে কমলেশের চোখ চলে গেল টেবিলে রাখা মদের বোতলের দিকে। একটু আগেই যিনি বলেছেন, তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো তাঁকে এখন কী বলবে কমলেশ!

সুন্দরী বোধহয় কমলেশকে লক্ষ করছিল। ফস করে বলে উঠল, ও কিছু নয়, ওষুধের গন্ধ। আপনার তো দেখছি ঘ্রাণশক্তি বেশ প্রবল।

সুন্দরীর আচমকা কণ্ঠস্বরে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন গুরুপদ সরকার। হাতের লাঠিটা দুবার ঠুকলেন মেঝেতে। তারপর কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন সুন্দরীকে। ওঁর মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল না তেমন একটা খুশি হয়েছেন।

আপনি এই রোবটটা নিয়ে নিন, মেসোমশাই। কাজে লাগবে। বদলে শুধু আমার চারমাসের ভাড়া ইয়ে করে দেবেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়লেন গুরুপদবাবু? না, বাবা, ওসব ইয়েটিয়ের মধ্যে আমি নেই। আমি বরং ও-সপ্তাহে তোমার কাছে আসব।

সুন্দরীর মুখ দিয়ে হুঃ গোছের একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কমলেশ গুরুপদবাবুর নজরের আড়ালে হাতজোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গি করল। সুন্দরী চাপা গলায় বলল, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম।

ছন্নছাড়া ঘরটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে গুরুপদবাবু জিগ্যেস করলেন, তোমার ওয়াইফের ট্রেনিং এখনও শেষ হয়নি?

ট্রেনিং? কমলেশ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারপরই ওর মনে পড়ল, রোমি ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কমলেশ এই ট্রেনিং-এর গল্পটা তৈরি করেছিল। যারাই ভুরু ওপরে তুলেছে তাদেরই বলেছে, রোমিকে ওর স্কুল থেকে একটা স্পেশাল ট্রেনিং-এর জন্য বাঁকুড়া পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রায় আটমাস হয়ে গেল, ট্রেনিংটা এখনও শেষ করতে পারছে না কমলেশ।

ও মিনমিন করে বলল, না, মেসোমশাই, এখনও তো শেষ হয়নি দেখছি...।

এরকম লম্বা ট্রেনিং-এ ভরতি করলে কেন বউমাকে? একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না–।

কমলেশের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময় বৃদ্ধ বিড়বিড় করে অনেকটা যেন আপনমনেই বলে উঠলেন, মেয়েসমেত এ বড় অদ্ভুত ট্রেনিং!

দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল কমলেশ। সত্যি, এ বড় অদ্ভুত ট্রেনিং! স্বামীকে ছেড়ে থাকার প্রশিক্ষণ, বাবাকে ছেড়ে থাকার প্রশিক্ষণ–আর সেইসঙ্গে কমলেশেরও বউ-মেয়েকে ছেড়ে নির্জন বসবাসের প্রশিক্ষণ।

কিন্তু এখনও কমলেশ যে এই নতুন ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না! দেওয়ালে ছবিটার দিকে চোখ গেল ওর। রোমির ছবির দিকে তাকালেই ওর বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে এখনও। আর রিঙ্কু! ও যে সবচেয়ে বেশি মিষ্টি।

রোমি-রিঙ্কুর ট্রেনিং ধীরে-ধীরে শেষ হয়ে আসছে। তারপর...তারপর ফেরার আর পথ থাকবে না। ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিল কমলেশ। বিছানায় বসে ভাবতে লাগল।

আজ বোধহয় মঙ্গলবার। আজই কিশোর আহুজার আসার কথা। বিশাল চেহারার এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বেশি বয়েসে বিপত্নীক হয়েছেন। ছেলেমেয়ে নেই কিন্তু অঢেল টাকা আছে। তাঁর খুব শখ একটা প্রমাণ মাপের মেয়ে পুতুলের। পুতুলটায় কলকবজা তেমন একটা না থাকলেও চলবে, তবে বডিটা পাঁউরুটির মতো নরম হওয়া চাই। কমলেশ বহুবার ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, এরকম খেলনা আমি তৈরি করি না। কিন্তু আহুজা নাছোড়বান্দা। বারবার শুধু বলেন, আপনি রিফিউজ করলে আমার জিন্দেগিটা একদোম বরবাদ হয়ে যাবে,

সায়েন্টিসবাবু। আমি যে কী লোনলি সে আপনাকে আর কী বলব! ভেরি-ভেরি লোনলি–মনে হোয় কি চারপাশে কুছু নাই–সির বিরানি আর তনহাই…।

কমলেশের হাসি পেয়েছিল। যার চারপাশে কুছু নাই, একটা খেলার পুতুল ধরে দিলেই তার কিছু নাই মিছে হয়ে যাবে! আজ যদি কিশোর আহুজা আসেন তা হলে স্পষ্ট দুকথা শুনিয়ে দেবে কমলেশ।

ঠিক এমনসময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মদের বোতল আর গেলাসের পাশেই টেলিফোন। কমলেশ টেলিফোন ধরতে উঠে দাঁড়াল। কার ফোন হতে পারে? সুপারটয় করপোরেশন-এর এম. ডি.? কমলেশকে আবার চাকরিতে জয়েন করার জন্য সাধাসাধি করতে চাইছেন? উঁহু, কমলেশ কিছুতেই রাজি হবে না। আবিষ্কারের স্বাধীনতা বলে একটা ব্যাপার আছে।

সুন্দরী যথারীতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপচর্চায় মশগুল। আপনমনে গুনগুন করে কী একটা গানের সুর ভাঁজছিল। ও ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে কমলেশকে একবার দেখল। তার পর গুনগুন করা থামিয়ে বলল, ডার্লিং, যদি আমার ফোন হয় তা হলে বলে দিয়ে আমি বাড়ি নেই।

কমলেশ থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সুন্দরীকে দেখল। মাত্র কয়েকঘণ্টাতেই এই বকযন্ত্রটা ডার্লিং এ পৌঁছে গেছে! সত্যি, আজকের রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটলে হয়! শোওয়ার আগে এটার সুইচ অফ করতে ভুলে গেলে চলবে না।

ও কাটাকাটা সুরে বলল, তোমাকে আবার কে ফোন করতে যাবে! তুমি যে আমার ফ্ল্যাটে জন্ম নিয়েছ তাই-ই তো কেউ জানে না!

সুন্দরী প্রায় মুখঝামটা দিয়ে কমলেশকে দাবড়ে দিল :! তুমি ওই আনন্দেই থাকো। আজকালকার জোয়ান ছোঁড়াগুলোকে কিছু বিশ্বাস নেই। ওরা রূপের গন্ধ পায়।

কথা শেষ করেই আবার গুনগুন, আবার প্রতিবিম্বের সামনে দাঁড়িয়ে রূপচর্চা।

কমলেশের ইচ্ছে হল টেনে-টেনে নিজের মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফ্যালে।

কিন্তু টেলিফোন তখনও বাজছিল।

ও তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, হ্যালো।

সুপারটয় করপোরেশন-এর এম. ডি. নয়, ওপাশ থেকে রোমির তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল? আজকাল কি কানেও কম শুনছ নাকি?

রোমি, রোমি...কমলেশের মাথা ঝিমঝিম ভাবটা পলকে কেটে গেল। গলার ভেতরে সুপুরির একটা কুচি আটকে গেছে বলে মনে হল।

শোনো, কাল সন্ধেবেলা সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি যাব। তুমি ঘরে থেকো। ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে হুট করে কোথাও চলে যেয়ো না।

না, না, থাকব। একটু থেমে তারপর, রিঙ্কুকে নিয়ে আসবে তো?

রোমি ঠান্ডা গলায় বলল, ওর সামনে পরীক্ষা। আজেবাজে সময় নষ্ট করলে পড়ার ক্ষতি হবে।

এক-দেড়ঘণ্টার জন্যে এলে কী আর এমন ক্ষতি হত! অনেকদিন ওকে দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, বিশ্বাস করো।

দেখি, পরীক্ষার পর যদি একদিন নিয়ে যেতে পারি।

কমলেশ মনে-মনে রিঙ্কুর মুখটা ভাবল। ও যদি আসত তা হলে কমলেশ আইসক্রিম, ক্যাডবেরি চকোলেট, ঘুগনি, ফুচকা–আরও কত কী নিয়ে আসত কে জানে! এগুলো সবই রিঙ্কুর ফেবারিট ডিশ।

কমলেশ বলল, কাল সন্ধেবেলা তোমার জন্যে ফুরিজ-এর চিকেন প্যাটিস আর থার্স আপ এনে রাখব।

এগুলো রোমির ফেবারিট, কমলেশ জানে। ফুরিজ-এ ওরা একবারই খেতে গিয়েছিল। তবে কমলেশ মাঝেমধ্যে চিকেন প্যাটিস কিনে নিয়ে আসত।

রোমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, ওসব ঝামেলা করতে যেয়ো না। আমি তো যাব আর কয়েকটা শাড়ি-জামাকাপড়, ব্যাঙ্কের চেকবই-পাশবই, আর মিক্সিটা

নিয়েই চলে আসব। মনে আছে, কবছর আগে আমাদের অ্যানিভারসারিতে ওটা বড়দি আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল?

মনে আছে। রোমির বড়দি জামশেদপুরে থাকে। স্বামী টাটার বিশাল অফিসার। এইট্টি নাইনে ওদের বিবাহবার্ষিকীর সময়ে ওরা কলকাতায় ছিল। তখনই মিক্সিটা প্রেজেন্ট করেছিল।

রোমি মিক্সি নিতে আসবে। পাশবই-চেকবই, আর শাড়ি-জামাকাপড় নিতে আসবে। মাঝেমাঝেই ও এরকম আসে। দরকারি জিনিসগুলো নিয়ে যায়। পাশবইটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হলেও ওতে রোমিরই টাকা থাকত। আর মিক্সি দিয়ে কমলেশ এখন কী করবে! কিছুই আর মেশানোর নেই। বরং রিঙ্কু ম্যাংগো জুস খেতে খুব ভালোবাসত। রোমি নিয়ে গেলে মেয়েটা খুশি হবে।

রোমি…রোমি…।

রোমি ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, একটু অধৈর্য হয়ে বলল, বলল, কী? আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কমলেশের পুরোনো কথা মনে পড়ছিল। ও প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

কমলেশ থেমে-থেমে বলল, রোমি–আবার সবকিছু ঠিকঠাক করে নেওয়া যায় না? আগের মতো।

অন্য কোনও কথা থাকলে বলো।

তোমার পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না?

পড়ে–তাতে কী?

তাতে কী! কমলেশ যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের আগে রোমির সঙ্গে দু-বছরের দুরন্ত ভালোবাসা; মাঠ-ময়দান, ভিক্টোরিয়া, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, বকখালি বেড়িয়ে আসা; পাগলের মতো চুমু খাওয়া, আদর করা–সব এখন তাতে কী!

একদিন শীতের পড়ন্ত বেলায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরপাড়ে কাঠের বেঞ্চে বসে ছিল ওরা। সূর্য ঢলে পড়ছিল ডানদিকের আকাশে, আর সামনে শান্ত জলের আয়নায় শ্বেতপাথরের স্মৃতিসৌধটির ছায়া পড়েছিল। রোমির নরম চিকন হাতের পাতা কমলেশের হাতে ধরা ছিল। কমলেশ ওর কররেখা দেখতে-দেখতে বলেছিল, স্মৃতির ছায়া পড়েছিল শীতল জলতলে, প্রতিশ্রুতি আঁকা ছিল তোমার করতলে।

রোমি ওর হাতটা মুঠো করে আঁকড়ে ধরেছিল।

সেই প্রতিশ্রুতিও এখন তাতে কী হয়ে গেছে।

এর আগেও রোমি কয়েকবার ফোন করেছে, এই ফ্ল্যাটেও এসেছে কোনও না-কোনও দরকারে। কিন্তু তখন কমলেশের সংযম ছিল, আহত অভিমান ছিল, আর ভেবেছিল রোমি আবার নিজে থেকেই ফিরে আসবে। সেটা হয়নি।

ইদানীং কমলেশের কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। এখনও করছিল।

রোমি, আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি তা হলে।

কমলেশ, কী হচ্ছে! এসব বলে বোর কোরো না। যাকগে, তোমার ইনভেনশান আর ডিসকভারি কীরকম চলছে বলো।

কমলেশ সুন্দরীর দিকে একবার তাকাল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তখন সেজে চলেছে। পাউডার, ক্লিনজিং মিল্ক, ময়েশ্চারাইজার, পারফিউম–রোমির উপকরণ যা কিছু আছে একের পর এক মেখে চলেছে। আর ড্রয়ার থেকে রিঙ্কুর একটা লাল রঙের বো বের করে নিয়ে মাথার একখাবলা পরচুলায় আটকে দিয়েছে। এদিক ওদিক ঘাড় বেঁকিয়ে রোবটটা আয়নার নিজেকে দেখছে আর গুনগুন করে গাইছে, আমি তোমায় বড় ভালোবাসি, তোমায় বড় ভালোবাসি।

টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে কমলেশের গলা ভেঙে গেল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কয়েকবার টোক গিলে ও বলল, কালই একটা নতুন রোবট তৈরি করেছি। খুব সুন্দর দেখতে।

আমার চেয়েও? রোমি ঠাট্টার সুরে বলল।

তোমার চেয়ে সুন্দর আমার কাছে আর কেউ নেই, রোমি। কমলেশের গলা ধরে যাচ্ছিল।

ওরা রাস্তায় বেরোলে সবাই হাঁ করে রোমিকে দেখত–যেন তাজমহল দেখছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। রোমি যে আপাদমস্তক সুন্দর! কতজন যে ওকে সিনেমায় নামার অফার দিয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। তবে ফিমের ব্যাপারে কমলেশের বরাবরই কেমন একটু অ্যালার্জি আছে। তাই রোমি উৎসাহ দেখালেও কমলেশ আপত্তি করেছে। রোমি বলেছে, তুমি চাও না, টিভি-সিনেমায় সবাই আমাকে দেখুক? সবাই জানুক তোমার বউ কত রূপসি! কমলেশ ওর ছেলেমানুষি গোঁয়ারতুমির সুরে বলেছে, না, চাই না। তোমার সুন্দরটুকু শুধু আমার জন্যে। সবাই তোমাকে ওভাবে দেখলে আমি হিংসেয় মরে যাব। আমার ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে, হিংসেয় আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। কথাটা বলে কমলেশ হেসেছে। রোমিও হেসেছে। কিন্তু সেটাই ছিল বোধহয় শুরু। তারপর একই কথা অনেকবার উঠেছে। ধীরে-ধীরে সুর কেটে গেছে। আর তখনই সুতপন এসেছে রোমির কাছাকাছি।

টেলিফোনের ও-প্রান্তে রোমি হাসল, বলল, তবে যে বললে খুব সুন্দর দেখতে!

কমলেশ নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিল। তারপর বলল, না, না, রোবটটা নিজেই নিজেকে বিশ্বসুন্দরী খেতাব দিয়ে বসে আছে–তাই ও কথা বলেছি।

তা হলে আর কী, বিউটি কনটেস্টে নামিয়ে দাও। হাসল রোমি।

কমলেশ যেন হঠাৎ পুরোনো হাসির ছোঁয়া খুঁজে পেল। কিন্তু তাতে কী!

কাল সন্ধেবেলা যাচ্ছি তা হলে। বলে লাইন কেটে দিল রোমি।

কমলেশ রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্রই সুন্দরী বলে উঠল, কী, বাবুর প্রেমালাপ শেষ হল?

কোনও উত্তর না দিয়ে কমলেশ বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল। সামনের ঝুলবারান্দার মেঝেতে রোদ নেমে এসে শুয়ে পড়েছে। আগেকার সময় হলে

বারান্দার রেলিঙে এখন রোমির ভিজে শাড়ি শুকোত।

কমলেশের মাথার দপদপানিটা বেশ কয়েক ধাপ চাড়া দিয়েছে। একইসঙ্গে মাথার ভেতরে অসংখ্য স্মৃতিকোষে পুরোনো দিনের জলছবিগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

কমলেশ, আমার কথায় দুঃখ পেলে?

কমলেশ মাথা তুলে আয়নার দিকে দেখল। আমুল স্প্রে-র ভাঙা টিন ইত্যাদি এখন ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগের কথাটা বলার সময় গলার ধাতব স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করার চেষ্টা করেছে।

না, কমলেশ মোটেই দুঃখ পায়নি। একটা হতকুচ্ছিত যন্ত্রের মন্তব্যে কে-ই বা দুঃখ পায়! তা ছাড়া কমলেশের এখন কোনওদিকে মন ছিল না। শুধু ভাবছিল, কাল রোমি এলে ওকে কী বলবে। নিজেকে কি বড় বেশি ভিখারি মনে হচ্ছে?

কমলেশ উঠে আয়নার কাছে যেতে চাইল। রোবটটা ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এটাকে বিকল করে ভেঙেচুরে শেষ করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু কাল রোমি যে এটা দেখবে। কমলেশের নতুন আবিষ্কার।

কমলেশ সুন্দরীকে পাশ কাটিয়ে আয়নার দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই রোবটটা আগের মতো ঢং করে আঁতকে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, আবার দুষ্টুমি! না, কমলেশ, না প্লিজ, ওসব আমার ভালো লাগে না। ওঃ, রূপই হয়েছে আমার যত জ্বালা!

কমলেশ কী করবে ভেবে পেল না। শুধু বিরক্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ভয় নেই, তোমার সঙ্গে ফুলশয্যা করার কোনও বাসনা আমার নেই।

কামনা-বাসনাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুন্দরী।

হায় রে আবিষ্কার! কমলেশ আসলে নেশার ঘোরে নিজের জন্য একটি বাঁশ আবিষ্কার করেছে।

তখনই কমলেশ টের পেল, বেশ খিদে পেয়েছে। ও দেওয়ালে টাঙানো ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকাল। লাল-হলদে-সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলজ্বল

করে জানান দিচ্ছে এখন প্রায় পৌনে এগারোটা। ছুটির মা কখন আসবে?

কমলেশের ভালো লাগছিল না। ও রাস্তায় বেরোনোর জন্য তৈরি হতে লাগল। শেভ করে, জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে যাচ্ছে, তখন ও খেয়াল করল, সুন্দরী বেশ মনোযোগ দিয়ে ওর প্রতিটি কাজ লক্ষ করছে।

কমলেশের কেমন যেন অস্বস্তি হল। ও নেহাত কথা বলার জন্যই বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি। তুমি ফ্ল্যাটে একা থাকতে যেন ভয় পেয়ো না। এখুনি অবশ্য ছুটির মা এসে পড়বে।

সুন্দরীর চোখে আলো জ্বলছিল। ও বলল, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, বেশি দেরি কোরো না যেন।

সুন্দরীর কথার মধ্যে এমন একটা আপন ভাব ছিল যে, কমলেশ চুল আঁচড়াতে- আঁচড়াতে থেমে গেল। রোবটটাকে দেখল। ওটা সত্যি-সত্যি লোহালক্কড়, আই. সি. চিপ আর তার-টার দিয়ে তৈরি তো!

কমলেশ আলতো গলায় বলল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারতাম, কিন্তু…।

না, না, দরকার নেই। সুন্দরী ঝটপট বলে উঠল, রাস্তায় বেরোলেই আবার ছেলে-বুড়োর দল আমার ওপর একেবারে হামলে পড়বে। রোবটটা আয়নায় দিকে এক পা এগিয়ে গেল : নাও, সরো, এবার একটু আয়নাটা দেখি।

কমলেশ আর দেরি করল না। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ছুটির মা এলে কোনও অসুবিধে নেই। তার কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

একতলার সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই গুরুপদবাবুর সঙ্গে দেখা। ফ্ল্যাটবাড়ির লাগোয়া বাগানের পাশে ভদ্রলোক ছোট-ছোট পায়ে ঘুরঘুর করছেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। পরনে একই পোশাক এবং হাতে পাচালো লাঠি।

বাতাসে নতুন শীত শীত ভাব, আকাশ মেঘলা।

কমলেশ আকাশের দিকে একবার দেখল। তারপর বলতে হয় তাই বলল, মেসোমশাই, রোদ চড়া হলে আপনার বেশ আরাম লাগত।

গুরুপদ সরকার পায়চারি থামিয়ে কমলেশের খুব কাছে এসে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বাবা, জানি, রোজ ভাড়া পেলে আমার বেশ আরাম লাগত। কিন্তু তোমরাই তো ভাড়া বাকি ফেলে-ফেলে–

কমলেশের হঠাৎই খেয়াল হল, ভদ্রলোক কানে কম শোনেন। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ঠিক আছে, মেসোমশাই, এ নিয়ে পরে কথা হবে এবং হনহন করে হাঁটা দিল। নাঃ, ভদ্রলোকের জন্য একটা ফার্স্ট ক্লাস হিয়ারিং এইড তৈরি করে দিতে হবে।

.

সবকিছু আবার যেন আগের মতো লাগছিল।

রান্নাঘরে কাপ-প্লেট-চামচের টুংটাং শব্দ। রোমি চা তৈরি করছে। কমলেশ কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছোট-ছোট শব্দগুলো শুনছিল। শব্দগুলো ওকে রান্নাঘরের দিকে টানছিল। কিন্তু সামনেই চেয়ারে সুতপন বসে আছে। তাই কমলেশ আবার এলোমেলো কথা শুরু করল ওর সঙ্গে।

তোমার নতুন টিভি সিরিয়ালের কাজ কেমন চলছে?

আচ্ছা, ঠিক কতদিন পর রোমির হাতে চা খাবে কমলেশ? ও মনে-মনে একটা হিসেব কষতে শুরু করল।

সুতপন বেশ উৎসাহ নিয়ে ওর সিরিয়ালের কথা বলতে লাগল। তেরোটা এপিসোডের মধ্যে চারটে এপিসোডের শুটিং শেষ। তারপর…।

রোমি ওদের চা নিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে ঢুকল। ছোট টেবিল থেকে বোতল আর গেলাস আগেই সরিয়ে ফেলেছিল কমলেশ। সেটার ওপরেই চায়ের কাপ-প্লেট রাখল রোমি। টেবিলটা টেনে দিল কমলেশ আর সুতপনের মাঝে। তারপর আবার রান্নাঘরের দিকে গেল নিজের চায়ের কাপ নিয়ে আসতে।

একটু আগেই প্যাটিস খাওয়া শেষ হয়েছে। কমলেশ রোমির বারণ শোনেনি। বিকেলে বেরিয়ে ফ্লুরিজ-এর প্যাটিস নিয়ে এসেছিল।

কথা বলতে বলতে সুতপন হাসছিল। বেশ সুন্দর চেহারা ছেলেটির। ও নিজেই তো সিরিয়ালে অভিনয় করতে পারে!

রোমি চা নিয়ে এসে বিছানায় বসল। কমলেশের কাছ থেকে একটু দূরে।

সুতপন চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, কমলেশদা, আপনার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

কমলেশ কৌতূহলী চোখে সুতপনের দিকে তাকাল। সুতপন রোমিকে একবার দেখল। চোখে হাসল। তারপর বলল, এখনই যে-সিরিয়ালটার কথা আপনাকে বললাম, মানে, জীবনের সুখ দুঃখ, ওটাতে রোমি অভিনয় করছে–হিরোইন।

কমলেশ চা খাওয়া থামিয়ে রোমিকে দেখল। মুখে তৃপ্তি আর প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। রোমির সৌন্দর্য এবার সকলে দেখবে, তারিফ করবে। কমলেশের সেই কাল্পনিক ডেথ সার্টিফিকেটের কথা মনে পড়ল। তবে তার বেশি কিছু নয়।

রোমির কাছে কমলেশ নিতান্তই সাধারণ। একটু চটাচটি হলেই ও বলত, তুমি নেহাতই একটা সেকেলে ছাপোষা মানুষ–শুধু একটু বিজ্ঞান জানো।

শত চেষ্টা করেও কমলেশ রোমির ওই ডেফিনেশান পালটাতে পারেনি। আর নিজেকেও পালটাতে পারেনি। তবে ছোট্ট রিঙ্কু সবসময় ওকে আশা জোগাত। মনে হত, এই বুঝি সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

কী হল, তুমি কিছু বলছ না যে!

রোমির কথায় সামান্য অবজ্ঞার রেশ যেন টের পেল কমলেশ। ওর পরনের গোলাপি সাদা সিল্কের শাড়ি চকচক করছে। বড় চোখে লাগছে।

কমলেশ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, এ তো খুব ভালো খবর।

রোমি সুতপনের দিকে তাকিয়ে বলল, সুতপন, দ্যাখো না, এই সিরিয়ালটায় কমলেশের কোনও টেকনিক্যাল হেল্প নেওয়া যায় কি না।

আমি তো কমলেশদাকে ওপেন অফার দিয়েই রেখেছি।

কমলেশ বলল, না, না, আমি এখন নতুন একটা মেশিন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ওটার পেছনে তিন-চারমাস লেগে যাবে।

কমলেশ রোমির চোখে তাকিয়েই বুঝতে পারল, ওর মিছে কথা রোমির কাছে ধরা পড়ে গেছে।

রোমি সহজ গলায় বলল, কালই তো তুমি ফোনে বললে কী একটা বিউটি কুইন রোবট তৈরি করেছ।

সত্যি, কমলেশদা! সুতপনের গলায় আগ্রহ।

কমলেশের ভালো লাগল। ও চাইছিল, রোমিই সুন্দরীর প্রসঙ্গ তুলুক, কমলেশের নতুন আবিষ্কার নিয়ে প্রশ্ন করুক।

যাক, ব্যস্ত হওয়ার মতো একটা কাজ পাওয়া গেল। চায়ের কাপ রেখে কমলেশ উঠে এগিয়ে গেল আয়নার কাছে। খবরের কাগজে মুড়ে সুন্দরীকে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিল ও। কাগজের মোড়ক খুলে রোবটটাকে দাঁড় করাল। তারপর সুইচ অন করে দিয়ে বলল, এই হল আমার নিউ ইনভেনশান–।

সজ্ঞান হওয়ামাত্রই সুন্দরী আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সাজগোজ শুরু করল। আর সেইসঙ্গে গুনগুন করে গান ধরল, আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল পাগলপারা হাসি। রোমি খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে। শরীর বেঁকিয়েচুরিয়ে মুখ তুলে হাসছে তো হাসছেই।

সুতপনও হাসছিল, তবে অতটা শব্দ করে নয়।

কমলেশ কেমন বোকার মতো সুন্দরীর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

রোমি হাসির দমক কমিয়ে চোখের জল মুছে বলল, এই তোমার বিউটি কুইন! তারপর আবার হাসি।

সুন্দরী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রোমির দিকে। তারপর বলল, কমলেশ, ওকে থামতে বলো। আমার কানে লাগছে।

রোমি অনেক কষ্টে থামল। বলল, সত্যি, কী সুন্দর! যেমন চেহারা, তেমনই গলা–কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি!

কমলেশ বিছানার কাছে এগিয়ে এল। রোমি উঠে দাঁড়াল। সুতপনও।

রোমির যা-যা নেওয়ার সবকিছু আগেই বড় একটা শপিং ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই সুতপন ঝুঁকে পড়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। হাসতে হাসতে বলল, কমলেশদা, আজ একটা দারুণ জিনিস দেখালেন। আপনার হাত খালি হলে আমাদের টেকনিক্যাল হেল্প করার ব্যাপারে একটু ভাববেন কিন্তু।

কমলেশ ঘাড় নাড়ল।

রোমি হেসে বলল, তোমার এই কিম্ভুতকিমাকার বস্তুটিকে বিউটি কনটেস্টে নামিয়ে দাও।

সুন্দরী জোরালো গলায় জবাব দিল, ধন্যবাদ, আমার কনফারমেশনের দরকার নেই। আমি

জানি আমাকে তোমার চেয়েও সুন্দর দেখতে কথা শেষ করেই আবার গুনগুন গান।

রোমির ফরসা মুখ লাল হল। ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আমি যাচ্ছি। তুমি তা হলে লিভ টুগেদারের ভালোই সঙ্গী পেয়েছ।

কমলেশ চাইছিল না রোমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাক। ও বলল, তুমি এই রোবটটার কথায় কিছু মনে কোরো না। এটা ভীষণ উলটোপালটা বকে। বড্ড খামখেয়ালি।

রোমি বিরক্তভাবে বলল, তবে তো একেবারে রাজযোটক!

রোমি দরজার দিকে এক-পা বাড়াতেই কমলেশ প্রায় পথ আগলে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করল, রিঙ্কু কেমন আছে? ওকে অনেকদিন দেখিনি।

এখানকার চেয়ে অনেক ভালো আছে।

কমলেশ সুতপনের দিকে একবার দেখল। তারপর বলল, সুতপন, আমি রোমির সঙ্গে কয়েকটা পারসোনাল কথা বলতে চাই।

সুতপন ভদ্র ছেলে। রোমি কিছু বলার আগেই ও বলল, আমি বাইরের ঘরে আছি– তারপর সহজ পা ফেলে বেরিয়ে গেল শোওয়ার ঘর থেকে।

ঝুলবারান্দার দরজার দিকে চোখ গেল কমলেশের। বাইরের রাত কুচকুচে কালো। সেই কালো রাত নতুন শীতের হিমেল বাতাস পাঠিয়ে দিচ্ছিল ঘরের ভেতরে।

রোমি–।

বলো।

কী বলবে কমলেশ! নিজেকে ভীষণ খাটো মনে হচ্ছে। অথচ ও তো কোনও অন্যায় করেনি! এই অপদার্থ বেঁচে-থাকা তো সাধ করে বেছে নেয়নি!

রোমি, এভাবে আমি আর পারছি না। তোমার সব কথা আমি মেনে নেব, কিন্তু এভাবে আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না..প্লিজ… কমলেশের কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

রোমি কোনও জবাব দিল না।

রোমি, তুমি…রিঙ্কু…তোমরা…হয় এখানে চলে এস, নয়তো আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও। এভাবে আমি…আমি… কমলেশের গলায় বুকে কষ্ট হচ্ছিল।

রোমি এবার কথা বলল, এইজন্যেই তোমার সঙ্গে কোনওরকম রিলেশান রাখা প্রবলেম। আমাদের বনিবনা হয়নি, আলাদা আছি, ঠিক আছে। কিন্তু হ্যালো-হাই রিলেশান রাখতে তো কোনও ক্ষতি নেই! সেটা দেখছি তোমার এই বস্তাপচা

সেন্টিমেন্টের জন্যেই রাখা যাবে না। এমন ছেলেমানুষি করো না! এরপর থেকে দরকারি জিনিসপত্র যা কিছু নেওয়ার সুতপনই এসে নিয়ে যাবে।

কমলেশ পাথরের মতো হয়ে গেল। আর কী বলবে ভেবে পেল না। সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই! সেটাও তাতে কী হয়ে গেছে! কমলেশের চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

কমলেশ–।

রোমি নয়, সুন্দরী ওর নাম ধরে ডেকেছে। আয়না ছেড়ে এক-পা এগিয়েও এসেছে ওদের দিকে।

কাকে কী বলছ, কমলেশ! তোমার কথা ও বুঝবে না। ওর…ওর শুধু বাইরেটা সুন্দর। আমার সঙ্গে ওর কোনও তুলনাই হয় না। হোপলেস বেচারি হতভাগিনী।

আগুন জ্বলে গেল।

রোমি চিৎকার করে উঠল, তুমি যেমন, ঠিক সেরকম রোবটই তৈরি করেছ। এসব তোমার শয়তানি কারিকুরি। অভদ্র, ছোটলোক! আমাকে ডেকে এনে…।

রোমি, প্লিজ। রোমি– কমলেশ আকুলভাবে কিছু একটা বলতে চাইল।

সুতপন হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকল ঘরে।

রোমি ধারালো চোখে একবার সুন্দরীকে দেখল, তারপর সুতপনকে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ এ-ঘর থেকেই স্পষ্ট শুনতে পেল কমলেশ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শীতের হাওয়া অনুভব করল। তারপর রবারের পা নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। ওর ভেতরে কিছু একটা হচ্ছিল। একটা বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কমলেশ বোকার মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

আর সুন্দরী শুধু অবাক হয়ে কমলেশকে দেখছিল।

.

অনেক…অনেকক্ষণ পর কমলেশ যেন কারও ডাক শুনতে পেল। চোখ খুলতেই দেখল, ঘর অন্ধকার। কখন লোডশেডিং হয়েছে টের পায়নি। বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে বাইরের রাত আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আর কিছুই কমলেশ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার।

কমলেশ—

খুব কাছ থেকে নরম গলায় সুন্দরী ওর নাম ধরে ডাকছে।

অন্ধকারে বাঁ-হাতের কাছটায় ধাতব ছোঁয়া টের পেল কমলেশ।

সুন্দরী আবার ডাকল, কমলেশ–।

একটা সুন্দর গন্ধ কমলেশের নাকে এল। ও বড় করে শ্বাস নিল। হাত বাড়াতেই এবড়োখেবড়ো শীতল ধাতুর ছোঁয়া লাগল। কমলেশের হাত আলতো করে ছুঁয়ে যেতে লাগল রোবটটার শরীর। গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়েছে। কমলেশের নেশা ধরে যাচ্ছিল। ডানহাতটা সুন্দরীর বুকের কাছটায় যেতেই ছোট্ট দরজার নবটা টের পেল।

গন্ধটা কি ওর ভেতর থেকেই আসছে?

কমলেশের মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। চোখ জ্বালা করছিল, মাথা দপদপ করছিল।

নব টেনে দরজাটা খুলে ফেলল কমলেশ।

মনে হল, গন্ধটা আরও বেড়ে গেছে। কমলেশকে নিশির মতো টানছে।

রোবটটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে উঠে বসল কমলেশ। অনুমানে ভর করে মুখটা নিয়ে গেল খোলা দরজার খুব কাছে। বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই চোখ মেলে সুন্দরীর ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল।

কমলেশ–।

দরজার ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন কমলেশ নরম গলায় ডেকে উঠল, সুন্দরী–। তোমার ভেতরটা কী সুন্দর…!

# ভূতের গন্ধ

**ভূতের গন্ধ**

প্রথমেই বলে রাখি, আমি কুকুর। আমার জীবন হল ঘেউঘেউ জীবন। মানে যতই কথা বলি না কেন সবই আমার মালিকের কাছে ঘেউঘেউ। কিছুতেই আমার কথা লোকটা বুঝতে চায়, শুনতেও চায় না। অথচ আমি মালিকের সব কথা শুনি বসতে বললে বসি, হাঁটতে বললে হাঁটি, লাফাতে বললে লাফাই। এমনকী ভোরবেলা মালিকের দোতলার বারান্দায় যখন ধপ করে খবরের কাগজ এসে পড়ে, তখন ছুট্টে গিয়ে সেটা মুখে করে নিয়ে এসে মালিককে দিই।

মালিক আমাকে আদর করে, যত্ন করে, রোজ ভালো-ভালো খেতেও দেয়। এসব না করে উপায় কী! মালিকের যে আর কেউ নেই! শুনেছি মালকিন একজন ছিল। সে কী একটা অসুখে বছর পাছ-ছয় আগে মারা গেছে। তখনও আমি এ-বাড়িতে আসিনি।

আমার মালিক একটু মেয়ে-ঘেঁষা। সাধু বাংলায় বলতে গেলে নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করে। তবে শ্রদ্ধার পরিমাণটা বড্ড বেশি। ওর সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই এই শ্রদ্ধার প্রবলেমটা আমাকে ফেস করতে হয়।

কেন ফেস করতে হয় সেটা বলি।

ভোরবেলা গঙ্গার ধারে হাঁটতে কার না ভালো লাগে! আবার সন্ধেবেলাও সেই একই রুটিন। সেই বেড়ানোর সময় কোনও সুন্দরী লেডিজ দেখতে পেলেই হল! মালিক আমাকে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে সেই মেয়েটিকে বলবে, দেখেছেন, আপনাকে দেখে পম কেমন লেজ নাড়ছে। আসলে এ হল একেবারে খাঁটি জাতের পমিরেনিয়ান। তাই

ওর নাম রেখেছি পম। দেখুন, লোমগুলো কী সুন্দর–সফট আর ফ্লাফি। ওর সেন্স এত…।

এই চলল মালিকের কুকুর রচনা। কী যে বোরিং!

আমি চেঁচিয়ে বললাম, তুমি এত মেয়ে হ্যাংলা কেন? হ্যাংলামি ছেড়ে কাউকে একটা বিয়ে করে ফেললেই পারো!

আঃ, এত চেঁচানোর কী আছে, পম! আমাকে ধমক দিয়ে কোল থেকে নামিয়ে দিল মালিক। তারপর মেয়েটিকে বলল, আপনাকে ঘেউঘেউ করে হ্যালো বলছে। ওর যা বুদ্ধি না!

আমি আবার বললাম, একটু মানুষের মতো হও না! একটা বউ নিয়ে সুখে থাকো। আমাদের ডগ সোসাইটিতে বিয়ে করার সিস্টেম নেই–এর ওর কাছে গিয়ে ছোঁকছোঁক করার সিস্টেম। তোমার যদি সেটাই পছন্দ তো তাই করো। তার সঙ্গে আমাদের অন্য স্বভাবগুলোও রপ্ত করে নাও। আবর্জনা দেখলেই নাক ঠেকাও, অপোজিট সেক্স দেখলেই জিভ বের করে লালসার হাঁপানি শুরু করো, আর ল্যাম্পপোস্ট দেখলেই দৌড়ে গিয়ে এক ঠ্যাং তুলে কাত হয়ে ছোট বাইরে সেরে নাও।

কিন্তু আমার কথা শুনলে তো! মুগ্ধ ভেড়ার চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মালিক তখন বলছে, আপনাকে পমের দারুণ পছন্দ হয়েছে। আপনি কি রোজ এই সময়ে বেড়াতে আসেন?

তো এই চলতে থাকে। শেষে মেয়েটা যখন আচ্ছা, আসি বলে পট করে চলে যায় তখন মালিকের বুক ঠেলে বড় একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

দেখলি পম, চলে গেল!

আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ, ততক্ষণে গঙ্গার পাড়ের রেলিং-এর পাশে বাদামি রঙের একজন অপোজিট সেক্সকে আমি দেখতে পেয়েছি। লেজটা রিং-এর মতো বাঁকানো। কী সুন্দর নাক, মুখ, চোখ! আর বডিটা দারুণ সেক্সি।

আমি জিভ বের করে সেদিকে এগোতেই মালিক খেপে গিয়ে হাঁক পাড়ল, কী হচ্ছে, পম! কুত্তা কি আর সাধে বলে! ব্যাটা ভাদুরে কুকুর! মেয়েছেলে দেখলেই

হল! আয়, এদিকে আয়…।

চমৎকার। নিজের বেলায় দোষ নেই। যত দোষ আমার বেলায়। অথচ এটাই আমাদের জাতীয় ধর্ম! এটাই আমাদের লাইফ স্টাইল।

তো একদিন সন্ধেবেলা আমরা দুজনে গঙ্গার ধারটায় বেড়াচ্ছি। মালিকের এক হাতে একটা রঙিন ম্যাগাজিন–একটু আগেই একটা বুকস্টল থেকে কিনেছে। আর অন্য হাতে আমার গলায় বাঁধার শেকলটা। আমার গলায় বেল্ট আছে বটে, কিন্তু শেকল ছাড়া পেয়ে আমি এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করতে করতে মালিকের সঙ্গে-সঙ্গে এগোচ্ছি। বাঁশি বাজিয়ে চক্ররেলের লাইনে একটা ট্রেন চলে গেল। রেল লাইনের ওপাশ থেকে কী সুন্দর জঞ্জালের গন্ধ পাচ্ছি। আমি আনচান করতে লাগলাম। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম লুচির গন্ধে মালিককে এরকম আনচান করতে দেখেছি।

রেল লাইনের দিকটা যেমন নোংরা তেমন অন্ধকার। আর শীতকাল বলে পথে লোকজনও বেশি নেই। গঙ্গার দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। গঙ্গার গভীর জল টলটল করছে। তাতে ভাঙা ভাঙা চাঁদের ছায়া। দূরের জল এমনিতেই ভালো করে দেখা যায় না। তার ওপরে এখন আবার দুধের সরের মতো কুয়াশা।

মালিক উদাস হয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে গঙ্গার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। আর মাঝে মাঝেই দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। হঠাৎই বলল, জীবনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল রে, পম।

আমি তখন এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিলাম–কোনও লেডিজ কুকুর খুঁজছিলাম। নাঃ, একটাও চোখে পড়ছে না। তাই হতাশ হয়ে বললাম, হ্যাঁ, মালিক, জীবনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

মালিক পম, কাম, কাম– বলে আমাকে কাছে ডাকল। তারপর নীচু হয়ে আমার মাথা চাপড়ে দিল : তোর ডাক শুনেই বুঝতে পারছি তুই আমার মনের কথাটা ধরতে পেরেছিস। তোর…।

হঠাৎই মালিক যেন চমকে উঠল। চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল নির্জন পথের দিকে।

আমি চোখ বুজে আদর খাচ্ছিলাম। মালিকের আদর বন্ধ হতেই চোখ খুলে তাকিয়েছি। তারপর মালিকের নজর ফলো করে দেখি…ও, এই ব্যাপার!

পারফিউমের গন্ধটা আগেই পেয়েছিলাম, এবার চুড়ির রিনরিন শুনতে পেলাম।

হালকা রঙের শাড়ি পরে ছিপছিপে ফরসা বিউটিফুল একজন লেডিজ পথ ধরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আশ্চর্য, এই শীতেও ওর গায়ে সোয়েটার বা শাল-টাল কিছু নেই।

ব্যস! মালিক আমাকে চাপা গলায় বলল, পম, কাছে-কাছে থাকিস। যার মানে হল, আবার সেই কুকুর রচনা।

একটু আগেই যে-লোকটা উদাস কবি কবি ভাব নিয়ে মনমরা ছিল, সে এখন একপায়ে খাড়া তেজি ঘোড়া।

মেয়েটি আমাদের কাছে এগিয়ে আসতেই আমি অন্যরকম একটা গন্ধ পেলাম।

আরে, এ কে? এ কী? এ তো মানুষ নয়! ওইজন্যেই গায়ে শীতের পোশাক নেই!

নিমতলা ঘাটটা কোনদিকে একটু বলতে পারবেন?

কী সুন্দর দেখতে! কী মিষ্টি গলার স্বর! ল্যাম্পপোস্টের ঘষা আলোয় মেয়েটিকে সুপারন্যাচারাল মনে হচ্ছে।

আমি গন্ধ পেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই চিৎকার করে বললাম, মালিক, চলে এসো। ওর বডির ভেতরে অসংখ্য সাপ, কেন্নো আর কাঁকড়াবিছে কিলবিল করছে। ওর বুকের ভেতরটা বরফ দিয়ে ঠাসা। গঙ্গার জলের তলা থেকে এই ভয়ংকর প্রেতিনী উঠে এসেছে। ও তোমার মতো একজন টগবগে শিকার খুঁজছে–যার রক্ত দিয়ে তেষ্টা মেটাবে। চলে এসো, মালিক–চলে এসো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মালিক গদগদ হয়ে মেয়েটিকে বলল, নিমতলা ঘাট? ওই তো সামনে…পাঁচমিনিট হাঁটলেই…। দেখেছেন, পম আপনাকে হ্যালো বলছে। ও আপনাকে পছন্দ করে ফেলেছে।

হুঁ! নিজে পছন্দ করে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে!

না, না! প্রায় আঁতকে উঠে সরে গেল মেয়েটি? ওকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখুন। কুকুর আমি খুব ভয় পাই।

এই তো, চেন লাগিয়ে দিচ্ছি– চাকরের মতো মেয়েটির কথা শুনল মালিক।

আমি মেয়েটির চোখে তাকালাম। ওর চোখের তারায় নীল আলো ধকধক করে জ্বলছে। ও বুঝতে পেরেছে, আমি ওকে চিনে ফেলেছি।

মালিক মেয়েটিকে বলল, এই ঠান্ডার মধ্যে এই নির্জন রাস্তায় আপনি একা-একা…মানে…।

হাসল মেয়েটি। হাসির সঙ্গে-সঙ্গে ওর ফঁপা শরীর থেকে ঠান্ডা জমাট বাতাসের হলকা বেরিয়ে এল। বলল, আমি তো একাই–দোকা আর কোথায় পাব!

জানেন, আমিও ভীষণ একা। মালিক কাতর গলায় বলল, কী সাংঘাতিক একা আপনি ভাবতে পারবেন না।

মালিক, ওর কথাটা ভালো করে বোঝো। ওরা সবসময় একা-একা ঘোরে মরণফঁদ পাতে–তোমাদের মতো বোকা হাঁদা ল্যাবাকান্তদের জন্যে। মালিক, প্লিজ, বাড়ি চলো।

কিন্তু মালিক আমার কথা শুনবে কি! হাঁ করে মেয়েটাকে গিলছে।

বাব্বা! আপনার কুকুরটা কী ঘেউঘেউ করছে! আপনি ওকে আড়াল করে রাখুন।

ব্যস, অমনি আমাদের মাঝে পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে নিমতলা ঘাটের দিকে এগোল।

মালিকের দুপাশে আমরা দুজন। তবুও চলার সময় এগিয়ে-পিছিয়ে আমি মেয়েটাকে দেখছিলাম। ঠিকই বলেছে মেয়েটা। নিমতলা ঘাটই ওর আসল ঠিকানা। ওর শিরায়-শিরায় রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই–আছে ঠান্ডা শুকনো

বাতাস। আর হাড়ের বদলে রয়েছে গঙ্গার পলিমাটি, শ্যাওলা আর মরা গাছের ডালপালা।

আমার নাকে পচা শ্যাওলার গন্ধ আসছিল। তার সঙ্গে পারফিউমের গন্ধ। হঠাৎই বুঝলাম, পারফিউমের গন্ধটা অগুরু সেন্টের। ওঃ, মালিক যে কেন বুঝতে পারছে না মেয়েটা আর বেঁচে নেই!

জানেন, এই কুকুরটা আমার একমাত্র সঙ্গী। ফাঁকা বাড়িতে আমি একা-একা থাকি। বুকটা একেবারে খাঁ-খাঁ করে।

তাই? ঘাড় বেঁকিয়ে সুন্দর করে তাকাল মেয়েটা। কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

নিমতলা ঘাটে আপনার কী দরকার?

মাঝে-মাঝে ওখানে যাই–মন ভালো করার জন্যে। অন্ধকারে, নির্জন জায়গায় একা-একা থাকতে আমার বেশ লাগে।

মাঝে-মাঝে ওখানে যান..অথচ আমাকে জিগ্যেস করলেন…। মালিকের কপালে ভাঁজ পড়ল। চোখে ফুটল সন্দেহের ছায়া।

খিলখিল করে হাসল মেয়েটি। হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কী!

না, না, ভয় পাবেন না। আমার অ্যামনেজিয়া গোছের অসুখ আছে। হঠাৎ-হঠাৎ সব ভুলে যাই….আবার হঠাৎ-হঠাৎ সব মনে পড়ে যায়।

আমি চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করলাম, মিথ্যে কথা! এটা ওর ছল, মালিক। এখনও সময় আছে– ফিরে চলো।

মালিক আমাকে ধমক দিল ও চুপ কর! চুপ কর বলছি! স্টপ বার্কিং, পম।

জানেন, রাস্তা হঠাৎ ভুলে গেলে পর কাউকে জিগ্যেস করতেও ভয় লাগে। আজকালকার লোকগুলো যা গায়ে পড়া। হাসল রূপসি। তারপর গলা নামিয়ে বলল, অবশ্য আপনি সেরকম নন।

এ-কথায় মালিক তো আটখানা।

হঠাৎই একঝলক ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা ছুটে এল। মালিক শিউরে উঠল। হাতে-হাত ঘষে ম্যাগাজিনটা বুকের কাছে আঁকড়ে বলল, কী শীত! উঃজ্যাকেটটা পরে এলে হত। তারপর, এতক্ষণ পর, যেন এইমাত্র খেয়াল করেছে এমনভাবে বলল, আপনার শীত করছে না?

মেয়েটা হাসল। উড়ে যাওয়া শাড়ির আঁচল টেনে ধরে বলল, শীতে আমার কিছু হয় না। আমি শীত ভালোবাসি। আপনি?

আমিও–আমিও শীত ভালোবাসি। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার বোকা-হাঁদা মালিকটা বলল।

দূরে কয়েকটা দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার ধারে কতকগুলো বড়-বড় লরি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাঁ-দিকে পুরোনো আমলের বিশাল মাপের সব গোডাউন। তার গা-ঘেঁষে কয়েকটা ঝুপড়ি–সেখানে কেরোসিনের আলো জ্বলছে।

আপনি কি রাতে বেড়াতে বেরোন? মালিক ওকে জিগ্যেস করল, আসলে জায়গাটা তো ভালো নয়–একেবারে কঁকা-ফাঁকা…।

একা-একা থাকার এটাই সমস্যা। তা ছাড়া বিকেল-বিকেল বেরোলে রাস্তায় লোকজন বড় বিরক্ত করে।

চলুন, তা হলে আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি…।

মালিকের হ্যাংলা-উৎসাহ কুকুরকেও হার মানাল।

কিন্তু দেখলাম, যা ভেবেছি তাই। মালিকের প্রস্তাবে মেয়েটা একেবারে আঁতকে উঠল, না, না, বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। কে কী বলবে তার ঠিক আছে!

ওর বাড়ি হল জলের তলায়, মালিক। ও বহু বছর ধরে সেখানে থেকে-থেকে পচে গলে শেষ হয়ে গেছে। ওর গা থেকে তুমি পচা গন্ধ পাচ্ছ না? অবশ্য কী করে পাবে! তোমার তো আর আমাদের মতো ঘ্রাণশক্তি নেই!

মেয়েটা আবার বলল, এই ঠান্ডায় আপনার সঙ্গে বসে এক কাপ চা কিংবা কফি খেলে বেশ হত। আপনি আমাকে হেল্প করলেন। মানে…অথচ…এদিকে সেরকম দোকান বা রেস্টুরেন্ট নেই…।

আমার বাড়িতে গেলে আমি কিন্তু আপনাকে কফি খাওয়াতে পারি। হেসে বলল মালিক, তা ছাড়া আমি ভালোই রান্না করতে পারি। যদি বলেন…।

তাকিয়ে দেখি মালিকের প্রস্তাবে মেয়েটার চোখ চকচক করে উঠল। ও জিভ বুলিয়ে নিল ঠোঁটের ওপর। বলল, সত্যি, এটা তো ভেবে দেখিনি! চলুন, এই ঠান্ডায় কফি দারুণ জমবে! কত দূরে আপনার বাড়ি?

এই তো কাছেই। ননী ঘোষ লেন। শোভাবাজার ঘাট থেকে ডানদিকে হেঁটে সাত কি আট মিনিট।

চলুন, আপনার সঙ্গে হাঁটতে আমার ভালোই লাগবে।

সর্বনাশ করেছে! কী হবে এবার?

নিমতলা ঘাটে আপনি যাবেন না? মালিক জিগ্যেস করল।

নাঃ, আজ আর যাব না। সেখানে যাওয়ার চেয়ে আপনার কম্প্যানি অনেক বেটার, অনেক অ্যাট্রাকটিভ।

ব্যস! আমরা উলটো দিকে ঘুরলাম। হাঁটতে শুরু করলাম শোভাবাজার ঘাটের দিকে।

আমি তো চিন্তায়-চিন্তায় পাগল হয়ে গেলাম। কী করি এখন? কী করে এই পিশাচীর হাত থেকে বাঁচাই আমার হ্যাংলা মালিককে?

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, থামো, মালিক থামো! এই রক্তপিশাচকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেয়ো না–তোমার সর্বনাশ হবে।

আপনার কুকুরটা খেপে গেছে। বড্ড ঘেউঘেউ করছে।

আমার চেন ধরে টান মারল মালিক। বলল, পম, স্টপ বার্কিং। তারপর মেয়েটার দিকে। ফিরে বলল, আপনার কোনও চিন্তা নেই। বাড়িতে ঢুকে পমকে সিঁড়ির নীচের ঘরে বন্ধ করে রাখব। তারপর শুধু আপনি, আমি, আর কফি। কথা বলতে বলতে মালিক চোখ দিয়ে মেয়েটাকে চেটে নিল।

নাঃ, আর চুপ করে থাকা যায় না। আমি এক হ্যাঁচকা টানে মালিকের হাত থেকে চেন ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর বিদ্যুঝলকের মতো মালিককে পাশ কাটিয়ে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেয়েটার ওপরে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! হাওয়া, শুধু হাওয়া!

শাড়িটায় নাক ঠেকতেই বিশ্রী কটু গন্ধ পেলাম। বাতাসে দুলে উঠল শাড়িটা। আর কী ঠান্ডা, কী ঠান্ডা! যেন এভারেস্টের চুড়োয় নাক ঘষছি।

আমাদের অবাক করে শাড়িটায় আমার বডি জড়িয়ে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তায়। আর মেয়েটির পোশাক–শাড়ি, ব্লাউজ সবখসে পড়ল মাটিতে। তবে মেয়েটা কোথাও নেই– পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

গঙ্গার দিক থেকে বাতাস ছুটে এল। কালো জল খলখল করে হেসে উঠল। আকাশে উড়ে যাওয়া একটা ধূসর পাচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল হঠাৎই।

মালিক থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। ম্যাগাজিনটা হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল। এবার মৃগী রুগির মতো হাত-পা ঠকঠক করে বসে পড়ল রাস্তায়। কঁদো-কঁদো স্বরে ডেকে উঠল, পম! পম! তুই আমাকে বাঁচালি!

আমি মালিকের কাছে গিয়ে ওর গায়ে গা ঘষলাম, বললাম, তোমাকে তো কখন থেকে সাবধান করছি! তুমি তো আমার কথা কানেই তুলছ না!

আমার ঘেউ-ঘেউ শুনে মালিক আমার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগল। বারবার আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল।

হঠাৎই চোখ ফিরিয়ে দেখি মেয়েটার পড়ে থাকা জামাকাপড়গুলোও আর নেই। সেগুলোও কোন জাদুমন্ত্রে কখন যেন উধাও হয়ে গেছে!

মালিক কাঁপতে কাঁপতে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার চেন ধরে টান মারল? চল, চল, বাড়ি চল–জলদি।

ভয় পাওয়া খরগোশের মতো আমরা দুজনে তরতর করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তা তখন আরও নির্জন হয়ে গেছে। হালকা কুয়াশা কালো রাতকে ধীরে-ধীরে ঘোলাটে করে দিচ্ছে।

আমি দুঃখে মাথা নাড়ছিলাম। যদি আমার মালিকের আগেই একটা হিল্লে হয়ে যেত তা হলে আজকের প্রেতিনীর ফাঁদে মোটেই পা দিতে হত না। ব্যাপারটা আর-একটু এগোলে কী সর্বনাশ হত কে জানে!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা শোভাবাজার ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে সবে ডানদিকে বাঁক নিয়েছি, এমন সময়…এমন সময় একটি মেয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

লম্বা, স্মার্ট চেহারা, চোখে হালফ্যাশানের চশমা, কাঁধে ঝোলানো সাইডব্যাগ, হাতের মুঠোয় একটা রুমাল।

রাস্তার আলোয় মেয়েটির শাড়ির রং গাঢ় বলেই মনে হল। আর গায়ের শালটা সাদাটে।

ঠান্ডায় গায়ের শালটাকে প্রায় আঁকড়ে ধরেছে মেয়েটি। শীতে কষ্ট হলেও মুখে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে মালিককে জিগ্যেস করল, নন্দরাম সেন স্ট্রিট কীভাবে যাব একটু বলে দেবেন? স্ট্যান্ডে একটাও অটো পেলাম না। রাস্তাটা অন্ধকার-অন্ধকার…কী বলব..মানে একটু ভয়-ভয় করছে..।

আমি শুধু পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে আর কোনও ভয়ের গন্ধ ছিল না। তাই মালিককে বললাম, লেডি ইন ডিসট্রেস। নাও, হেল্প করো। আমাদের সঙ্গে ওকে ডেকে নাও। আমরাও তো অনেকটা সেদিকেই যাব।

আমি কথা বলায়–মানে, ঘেউঘেউ করায়–মেয়েটা আমাকে খেয়াল করল, সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, কী সুন্দর পমিরেনিয়ান! দারুণ দেখতে।

নাও, নাও, শুরু করো তোমার কুকুর রচনা। কুইক।

মালিক পাথরের মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ চকের মতো সাদা। দেখলাম, ওর ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছে না। আর হাতের আঙুলগুলো অল্প-অল্প কাঁপছে।

বুঝলাম, মালিক ভয় পেয়েছে।

আমি চেঁচিয়ে মালিককে বললাম, তুমি ভুল করছ, মালিক। তুমি যা ভাবছ ও তা নয়। তোমার লাইফটাকে পালটে নেওয়ার এটা একটা সুযোগ।

আপনার কুকুরটা তো ভীষণ চেঁচাচ্ছে! একটু মজার সুরেই বলল মেয়েটা, কী নাম ওর?

মালিক সেকথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে আঙুলের ইশারা করে বলল, জাম্প, পম, জাম্প!

মালিকের এই কথায় আমি থতমত খেয়ে গেলাম। লাফ দেব! কিন্তু কেন?

মালিককে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করে বললাম, লাফ দেব কেন, মালিক? এই মেয়েটি তোমারই মতো রক্ত-মাংসের তৈরি–অন্য কিছু নয়। তুমি যা ভাবছ তা নয়।

মালিক শুনলে তো আমার কথা!

আমার দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল মালিক। আঙুলের ইশারা করে মেয়েটিকে দেখিয়ে আমাকে শক্ত গলায় বলল, জাম্প আই সে! লাফ দে, হারামজাদা শিগগির!

সুতরাং কী আর করি! সামান্য কুকুর হয়ে কী করে মালিকের আদেশ অমান্য করি!

তাই দিলাম লাফ! একেবারে মেয়েটির গায়ে গিয়ে পড়লাম। ওর শরীরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম রাস্তায়।

আর সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি হাউমাউ করে একেবারে লাফিয়ে উঠল। কাঁদো কাঁদো গলায় পেঁচিয়ে মালিককে বলল, কী বাজে লোক আপনি। বিপদে পড়ে হেল্প চাইলাম আর আপনি কুকুর লেলিয়ে দিলেন! ছিটেফোঁটাও কি ভদ্রতা শেখেননি? দাঁড়ান, আপনার নামে আমি পুলিশে কমপ্লেন করব। আনকালচারড ব্রুট।

শেষ কথাটা মেয়েটি বোধহয় আমাদের দুজনকেই বলল। দেখলাম ওর চোখে জল এসে গেছে। শাড়িতে শালে আমার জল কাদা মাখা পায়ের নোংরা ছাপ। বারবার ও নিজের পোশাকের হাল দেখছে আর বলছে, দেখলেন, আমার শাড়ির কী অবস্থা করল শয়তান কুকুরটা! ইশ! শালটারও কী সর্বনাশ করল!

আমি মালিককে বললাম, তোমাকে বারবার বললাম, তাও তুমি শুনলে না। সেই কেলো করে ছাড়লে!

মালিক তখন মুখ নীচু করে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই অবস্থায় ঘন-ঘন শ্বাস ফেলছে। আর মাথা নাড়ছে।

এদিকে মেয়েটির চেঁচামেচিতে এই শীতেও দেখি দূর থেকে দু-চারজন লোক এগিয়ে আসছে। ওরা যদি কাছে এসে পড়ে তা হলে পরিণাম নির্ঘাত গণধোলাই। আর আমার মালিকের যা খ্যাংরাকাঠি চেহারা–ওই পাবলিক পালিশ সইতে পারলে হয়।

সুতরাং মালিকের প্যান্ট কামড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান মারলাম। বললাম, বাঁচতে চাও তো শিগগির পালিয়ে চলো।

মালিক আমার এই কথাটা বোধহয় পুরোপুরি বুঝতে পারল। কারণ, আর দেরি না করে ছুট লাগাল, সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমিও ছুটলাম।

ছুটতে ছুটতে একটা কথা ভেবে আমার হাসি পেল। ভূতের কাছ থেকে যত না জোরে আমরা ছুটে পালিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে ছুটে পালাতে হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে।

একেই বোধহয় বলে কপাল– কুকুরের কপাল।

# হারিয়ে যাওয়া

**হারিয়ে যাওয়া**

প্রথমে গিয়েছিল বিক্রম শর্মা আর রণবীর সেন।

তার দু-মাস পরে সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। কিন্তু ওরা কেউই ফিরে আসেনি ওই রহস্যে-ঢাকা প্রাচীন জঙ্গল ফরেস্ট-এক্স থেকে! গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্যপ্রকৃতির বুকে খুশিমতো বেড়ে উঠে ঘন হয়েছে ওই রহস্যময় জঙ্গল।

গবেষণার প্রয়োজনে ওটাকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল, প্রতি একশো বছর অন্তর-অন্তর অভিযান চালানো হবে ওই জঙ্গলের অভ্যন্তরে। খতিয়ে দেখা হবে তার গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর বিবর্তনের নানা লক্ষণ। পর্যবেক্ষণ করা হবে তাদের আচার আচরণ-প্রকৃতি।

আর সেইমতোই শুরু হয়েছিল প্রথম অভিযান।

তারপর…।

সেন্ট্রাল কন্ট্রোল-এর চিফ ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী টেবিলে রাখা কম্পিউটার টার্মিনালের বোতাম টিপলেন। ভিডিয়ো পরদায় ফুটে ওঠা সবুজ লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ ছোট হল।

আমি টেবিলের এ-প্রান্তে বসে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। কাজ ছাড়া আমার মন বসে না। অলস থাকলে আমার অ্যালার্জি হয়। অবশ্য শুধু আমার নয়। অপারেশান ডিভিশনের সকলেরই এই একই অভ্যেস। মনোবিজ্ঞানের নানান পরীক্ষার মাধ্যমে অপারেশান ডিভিশনের লোক বাছাই করা হয়। তার মধ্যে দুটি

প্রধান শর্ত হল ও প্রার্থীকে কাজ-পাগল হতে হবে এবং তার মধ্যে কল্পনার ছিটেফোঁটাও থাকবে না। ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী কম্পিউটার ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, দাস, আপনাকে সংক্ষেপে ওদের হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। তবে কম্পিউটারের মেমোরিতে এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য রয়েছে। আপনাকে তার একটা কপি করে দিচ্ছি। সময়মতো দেখে নেবেন।

ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। একটা লুকোনো সুইচ টিপতেই টেবিল ছুঁড়ে দু-গ্লাস শরবত উঠে এল। ব্রিগেডিয়ার ইশারা করতেই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটা গ্লাস তুলে নিলাম। এই শরবতই আমাদের সেন্ট্রাল কন্ট্রোল অফিসের একমাত্র সুষম পানীয়। এর সমস্ত উপাদান বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক করেছেন। এই শরবত কর্মঠ লোকেদের কাজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ব্রিগেডিয়ার ধীরে-ধীরে কথা বলছিলেন, দাস, আপনি হয়তো জানেন, প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে গত আড়াইশো বছর ধরে আমরা বিচ্ছিন্ন। সারা পৃথিবীতে এমন সিনথেটিক ঘেরাটোপে ঢাকা চল্লিশ হাজার দুশো শহর রয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচার জন্যে এই ঘেরাটোপের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, ঘেরাটোপের মধ্যে আমরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি–খুশিমতো। ঘেরাটোপের এই কৃত্রিম অথচ আরামের পরিবেশে স্বস্তির মধ্যে বেড়ে উঠেছি আমরা। ফলে বাইরের প্রকৃতিতে পা রাখিনি। আমাদের মধ্যে যারা বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চায় তাদের এই অভ্যেস করানো হয় ছোটবেলা থেকেই।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, জানি, স্যার।

কারণ আমাকেও এই অভ্যেস করানো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। এখানকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়েস হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। এছাড়া, তাদের নিয়ে অন্যান্য দৈহিক এবং মানসিক পরীক্ষাও চালানো হয়। এইসব পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সরকার থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও পেশা। এইসব পরীক্ষার রেজাল্ট দেখেই আমাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের জন্যে। তারপর আট বছর পরে আবার একদফা পরীক্ষা নিয়ে তবেই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনে।

সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে বাইরের পরিবেশে রপ্ত করানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে সোশ্যাল লাইসেন্স। এরকম লাইসেন্স ওদেরও ছিল। ওই হারিয়ে যাওয়া চারজনের : বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। সুতরাং বাইরের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তাছাড়া, ওদের সঙ্গে ছিল অভিযানের উপযুক্ত আত্মরক্ষার আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র, আর প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও…।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী শরবতের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চিন্তাজড়ানো গলায় বললেন, দাস, বাইরের পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তবে ফরেস্ট-এক্স, আমাদের সংরক্ষিত ওই জঙ্গল, ওদের কাছে নতুন। শর্মা আর সেন যখন রওনা হয় তখন আমরা ঠিক করেছিলাম, অভিযান শেষ করতে হবে দশদিনের মধ্যে। কিন্তু দু-মাস পরেও যখন ওরা ফিরল না, তখন পাঠালাম সিং আর মহান্তিকে। বুঝতেই পারছেন, ওরা পুরোপুরি আমড় ছিল। ওদের সঙ্গে যে-ব্লাস্টার ছিল তা দিয়ে ফরেস্ট-এক্সকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যে-কোনও হিংস্র জন্তু ওই ব্লাস্টারের আক্রমণে স্রেফ ধুলো হয়ে যাবে। অথচ তা সত্ত্বেও ওই চারজনের কেউই ফিরে এল না। ব্যস, অভিযান মাথায় থাক, এখন দুশ্চিন্তায় গোটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ভেঙে পড়েছে। গভর্নমেন্ট নানা সন্দেহ করছে। যেখানে গত দুশো বছরে সারা পৃথিবীতে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র দশ হাজার মানুষ, সেখানে তিন মাসের মধ্যে চার-চারজন স্পেশ্যালিস্ট নিরুদ্দেশ! আনথিংকেবল, দাস। সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি।

আমার শরবত শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার আবার লুকোনো বোতামটি টিপলেন। খালি গ্লাস দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল টেবিলের গহ্বরে। টেবিল আবার যথারীতি মসৃণ। জানি, আমাদের চোখের আড়ালে ওই গ্লাস দুটো পরিষ্কার ও স্টেরিলাইজড হয়ে অপেক্ষা করবে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহারের জন্যে।

ব্রিগেডিয়ারের আঙুল আবার চলে গেল কম্পিউটারের কি-বোর্ডে। দ্রুত নড়াচড়া করল বোতামের ওপরে। ভিডিও পরদায় জটিল রঙিন ছবি ফুটে উঠল। ব্রিগেডিয়ার আপনমনেই বললেন, ফরেস্ট-এক্স-এর টোপোলজিক্যাল ম্যাপ। বলে একটি বোতাম টিপে ম্যাপের একটা ছাপা কপি বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর পরদায় ফুটিয়ে তুললেন হারিয়ে-যাওয়া বিজ্ঞানীদের রুট-ম্যাপ। বের করে নিলেন সেটারও হার্ড কপি। আর সবশেষে অনেক পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিয়ে

আমাকে লক্ষ করে বললেন, এতে অভিযান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দিলাম। এছাড়া পাবেন ফরেস্ট-এক্স-এর বিষয়ে সমস্ত খবর–সেখানে আবহাওয়া কীরকম, কোন-কোন ধরনের প্রাণী ওখানে আছে বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে। অবশ্য এসবই একশো বছরের পুরোনো। তবু যদি আপনার কোনও কাজে লাগে।

কম্পিউটার টার্মিনাল ছেড়ে ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারের বায়ুচাপ সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারটা ইঞ্চি-চারেক উঁচু হল। তখন তিনি কম্পিউটারের প্রিন্ট আউটের পুরো গোছাটা পলিথিন কভারে মুড়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতে দিলেন। তারপর চেয়ারটাকে আবার ঠিক করে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। শেষে বললেন, মনে করুন ফরেস্ট-এক্স-এ গিয়ে আপনি দেখলেন…।

ব্রিগেডিয়ার বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না। ভাবছিলাম, প্রায় চার বছর পরে আমি আবার বাইরে যাব। আর এবারের যাওয়াটা অন্যান্য বারের মতো নয়। অন্যান্য বারে আমি বাইরে থেকেছি বড় জোর বারো ঘণ্টার জন্যে। সে নতুন কাউকে বাইরের আবহাওয়ায় অভ্যেসের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে, নয়তো কোনও অটো-টানেল পরীক্ষা করার জন্যে, অথবা কোনও মহাকাশযান রওনা হওয়াকালীন নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু এবারের অপারেশান অন্যরকম।

…হঠাৎ করে যদি এইরকম কোনও ঘটনা হয়, তখন আপনি কী করবেন, দাস?

আমার খেয়াল হল, ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে দেখছেন। আমার জবাবের অপেক্ষা করছেন। তিনি আবার বললেন, বলুন দাস, তখন আপনি কী করবেন?

আমি হাসলাম। বুকের কাছে লুকনো আধুনিক জেনারেটর গানটা একবার অনুভব করলাম। তারপর বললাম, আপনার কথা আমি কিছুই শুনিনি, স্যার…।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর মুখ লালচে হতে লাগল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, শুনিনি, কারণ ধরি, মনে করি, যদি, হয়তো, সম্ভবত, এইসব শব্দ দিয়ে কোনও কথা শুরু হলে আমি বাকিটা আর শুনি না। কল্পনার ওপরে আমার কোনও আস্থা নেই, স্যার।

ব্রিগেডিয়ার যে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি ওঁকে অপমান করতে চাইনি। কারণ, এটাই আমার বরাবরের অভ্যেস। শুধু আমার কেন, আমাদের অপারেশান ডিভিশনের প্রত্যেকেরই। আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী আমার সম্পর্কে পুরো খোঁজখবর না নিয়ে আমাকে ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারে ডেকেছেন, তা আমি মনে করি না। উনি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্রতিটি মানুষের পার্সোনাল কম্পিউটার কোড জানেন এবং টার্মিনালের বোতামে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে যে-কোনও সময়ে পড়ে ফেলতে পারেন আমাদের আগাপাশতলা ইতিহাস। তাহলে এই মুহূর্তের অপমানিত ভাবটুকু কি ব্রিগেডিয়ারের অভিনয়?

ঠিক সেই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের ডানদিকে রাখা একটা ছোট্ট টিভির পরদায় একটা সবুজ সঙ্কেত ফুটে উঠল। দু-বার বিপ বিপ শব্দ শোনা গেল। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার পরদার দিকে তাকালেন। ততক্ষণে সেখানে একজন লোকের রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে এবং সেই অতিথি ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

টিভির সামনে রাখা মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী একটা কোড নম্বর বললেন। পরক্ষণেই পালটা একটা নম্বর শোনা গেল স্পিকারে। ব্রিগেডিয়ার হাসলেন। বললেন, প্লিজ কাম ইন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু সুরেশ চোপরা। আট বছর ধরে মিশিগানে ছিল। মহাকাশযানের কঠিন জ্বালানি নিয়ে গবেষণা করছিল। এখন চলে আসছে জাপানে। সেই ফাঁকে একমাস ভারতে থাকবে। আজ আমাদের সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারটা...।

আমি নির্লিপ্তভাবে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর কথাগুলো শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, সুরেশ চোপরার জীবনী জেনে আমার লাভ কী। আর ফরেস্ট-এক্স-এর সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী?

ইতিমধ্যে সুরেশ চোপরা ঘরে ঢুকে পড়েছেন এবং ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে করমর্দনের পর একটা বাতাস-চেয়ারে বসেও পড়েছেন। আমি ভাবছিলাম, এবারে বিদায় নিলে হয়, কিন্তু চিফ না নির্দেশ দিলে সেটা ভালো দেখায় না। সুতরাং চুপচাপ বসে রইলাম।

সুরেশ চোপরা ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছিলেন–পুরোনো, নতুন, নানা কথা। আর ওঁরা দুজনেই খুব হাসছিলেন। কথায় কথায় সময় কাটতে লাগল। একসময় একগ্লাস শরবত টেবিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সুরেশ চোপরার জন্যে। তিনি তখন মিশিগানের নানা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। কথা থামিয়ে শরবতে চুমুক দিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

একহাতে শরবতের গ্লাস ছিল। অন্য হাতে ব্লাস্টারটা বের করে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাক করে ধরলেন সুরেশ চোপরা। তার মুখের হাসি, শরবতের গ্লাস ধরে রাখার ভঙ্গি, এমনকী, ব্লাস্টার বের করে আনার কাজটিও এত স্বাভাবিক যে, চট করে তা নজর কাড়ে না।

কিন্তু আমার নজর কাড়ল।

স্লো মোশনে আমি সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম। ব্রিগেডিয়ারের মুখে একটা ফ্যাকাসে পরদা ছড়িয়ে গেল চকিতে। প্রযুক্তি এখন লক্ষ গুণে উন্নত হয়ে উঠলেও মানুষের কয়েকটি মৌলিক প্রতিক্রিয়া এখনও বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেইজন্যেই সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফও ভয় পেলেন–মৃত্যুভয়। আর তখন সুরেশ চোপরার একটু আগের হাসিখুশি ভাবটা খুব ধীরে পালটাচ্ছিল।

আমার কাছে এই সুরেশ চোপরা লোকটা একজন অচেনা আগন্তুক ছাড়া কিছু নয়। সে হঠাৎ করে চিফের ঘরে ঢুকে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ব্লাস্টার তুলে ধরেছে। চুলোয় যাক মিশিগানের গবেষণার গল্প, আর চিফের সঙ্গে লোকটার পুরোনো বন্ধুত্বের কাহিনি। এসব নির্ভেজাল সত্যি কি না তার কোনও প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।

সুতরাং কয়েকশো মিলিসেকেন্ড ভাবনাচিন্তার পর আমি মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আধ পাক গড়িয়ে চোপরার বাতাস-চেয়ারে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। এবং জেনারেটর গান তাক করে লো-লেভেল ফায়ার করলাম।

লাথির চোটে চোপরা টাল খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। তার ওপর লো-লেভেল ফায়ারে পলকে অসাড় হয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন।

ট্রিগারে চাপ দিলে জেনারেটর গান থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। এই আহিত কণার তীব্রতা তিন রকমের হয় ও লো-লেভেল, হাই-লেভেল, আর আলট্রা হাই-লেভেল। লো-লেভেল ফায়ারে কোনও মানুষ ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে শুধু অসাড় হয়ে থাকে। হাই-লেভেলে তার চেতনা ফিরবে সাত দিন চিকিৎসার পরে। কেউ-কেউ আবার ওপরেও চলে যায়। আর আলট্রা-হাই ফায়ারিংয়ে সরাসরি নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। যেহেতু চিফের কথা সত্যি কিংবা মিথ্যে দুই-ই হতে পারে তাই চোপরাকে লো-লেভেল ট্রিটমেন্ট করেছি। সত্যি-সত্যি চিফ কোনও পুরোনো বন্ধু হারান তা আমি চাই না।

মেঝে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি ব্রিগেডিয়ার আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তাকে খানিকটা উদ্বিগ্নও মনে হল। সেটার কারণ আঁচ করতে পেরে আমি বললাম, লো-লেভেল ডোজ দিয়েছি, স্যার। কিন্তু সত্যিই কি উনি আপনার বন্ধু?

চিফ হেসে বললেন, হ্যাঁ, ওকে আমি আসতে বলেছিলাম। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে। আর আমি চোপরা সম্পর্কে আপনাকে আগে থাকতেই সাজেশন দিয়েছিলাম যাতে আপনি ওকে নিরাপদ মনে করেন। সেই অবস্থায় দেখতে চাইছিলাম আপনি কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে পারেন।

আমি সামান্য হেসে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?

চিফ বললেন, বসুন, দাস।

আমি বসলাম।

এই পরীক্ষা আমি করেছি আপনার কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যে নয়। শুধু এটা দেখতে যে, ফরেস্ট-এক্স থেকে আপনার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কি না। ব্রিগেডিয়ারের গলার স্বর কিছুটা ভারি হল ও আমার ধারণা ওই গভীর জঙ্গলে এমন কোনও ভয়ংকর প্রাণী আছে যাকে আমাদের আধুনিক কোনও অস্ত্র ঘায়েল করতে পারে না। আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি হয়তো প্রাণ দিয়েছে সেই ভয়ংকর প্রাণীর আক্রমণে। আমাদের অজানা-অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। কিন্তু আমি চাই, আপনি ফিরে আসুন। ওদের জীবিত অথবা মৃত সঙ্গে নিয়ে অথবা না নিয়ে।

আপনাকে আমি ফেরত চাই, দাস। কারণ ফরেস্ট-এক্স এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী। গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন বোধহয়। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনি কাল ছটার সময়ে রওনা হয়ে পড়ুন। সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি রিপোর্ট ব্যাক না করেন তা হলে ব্যাপারটা রীতিমতো মারাত্মক হয়ে উঠবে। তখন হয়তো ওই বায়োরিজার্ভটাকে–মানে, ফরেস্ট-এক্সকে ডেস্ট্রয় করে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। এনিওয়ে, আই ওয়ান্ট য়ু ব্যাক, দাস-অ্যাট এনি কস্ট।

আমি তা হলে কাল ছটার সময় রওনা হচ্ছি, স্যার।

হ্যাঁ। উইশ য়ু বেস্ট অব লাক। ব্রিগেডিয়ার শুভেচ্ছা জানালেন আমাকে। তারপর আমি যেই উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি উনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, এ-ঘরের কথাবার্তা কারও সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে চোপরার ব্যাপারটা। আর অপারেশান ডিভিশনের চিফকে যেটুকু বলার আমি বলে দিচ্ছি।

ও. কে., স্যার। বলে সুরেশ চোপরার দিকে একবার দেখলাম। পাথর হয়ে শুয়ে আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবে মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে। দেড় ঘণ্টা হতে এখনও এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট দেরি!

.

অটো টানেলের স্বচ্ছ দেওয়াল ঘণ্টায় পাঁচশো কিলোমিটার বেগে পিছনে ছুটে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে গাড়িতে বসে আছি। কারণ অটো টানেলে যেসব গাড়ি চলে সবই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত।

ঘেরাটোপে ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে অটো স্টেশনে এসে আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নিজস্ব গাড়ি বেছে নিয়েছি। এই বেছে নেওয়ার কাজটা কম্পিউটার পরিচালিত। আইডেন্টিফিকেশান ও ভয়েস চেক পজিটিভ হলেই অটো টানেলের লক খুলবে। তারপর গাড়িতে উঠে ভ্রমণের সম্পূর্ণ মানচিত্র গাড়ির কম্পিউটারের বোতাম টিপে জানাতে হবে। তা হলেই কৃত্রিম বুদ্ধিমান গাড়ি যাত্রীকে নির্দিষ্ট

সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। গাড়িগুলোতে দুজনের বসার জায়গা আছে। তবে আমি চলেছি একা।

আমাদের কাছাকাছি শহরগুলো সবই অটো টানেল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। আর দূরের যাত্রাপথে আমরা স্পেস-প্লেন ব্যবহার করি। এই প্লেন আবহাওয়ামণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে যায় মহাশূন্যে। তারপর মোট উড়ানের সিংহভাগটাই সম্পন্ন করে মহাশূন্যে। অবশেষে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে। আবহাওয়ামণ্ডল কেটে নেমে আসে নির্দিষ্ট প্লেন-পোর্টে।

ফরেস্ট-এক্স-এ যাওয়ার জন্যে স্পেস-প্লেন আমি পছন্দ করিনি। কারণ তাতে জেট ল্যাগের জন্য শরীর ভারী হয়ে থাকে। আমার কাজ শুরু করতে অসুবিধে হবে। তাই অপেক্ষাকৃত আরামের অটো টানেল ভ্রমণই বেছে নিয়েছি। অটো টানেলের গাড়ির কোনও চাকা নেই। ম্যাগনেটিক লেভিটেশানে টানেলের অটোলাইন থেকে কয়েক মিলিমিটার ওপর দিয়ে ভেসে চলে। সুতরাং আঁকুনির কোনও ব্যাপার নেই। আর ইচ্ছে করলে গাড়ির গতিবেগ আমি ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত তুলতে পারি। কিন্তু আমার কোনও তাড়া নেই। বরং ধীরেসুস্থে সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় আমি ফরেস্ট-এক্স-এর সীমানায় পৌঁছাতে চাই। যে করে তোক হারানো চারজনকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। যে করে হোক।

আমি চোখ খুললাম। সাপের মতো টানেল ধরে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। পাশের সিটে রাখা ব্রিগেডিয়ারের দেওয়া কম্পিউটার প্রিন্ট আউটগুলো তুলে নিলাম। এর আগে তিনবার এগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি ওই চারজনের মধ্যে কোথায় কোথায় মিল রয়েছে, আর কোথায়ই বা অমিল। এছাড়া, ফরেস্ট-এক্স-এর প্রাণীর তালিকাটাও দেখেছি বারবার। তাদের বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে ছবি। ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি কোন ভয়ংকর জন্তু ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি। তবু আর একবার ওগুলো পড়তে শুরু করলাম । প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ…। তার পর নিজের মনেই বললাম, বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি,..তোমরা হারিয়ে গেলে কেন?

এমনসময় চোখ গেল কম্পিউটার ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে। ফরেস্ট-এক্স স্টেশনে পৌঁছোতে আর আধঘণ্টা বাকি। এই সময়টুকু দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

অটো টানেল স্টেশনের পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। মাথার ওপর থেকে গাড়ির স্বচ্ছ ছাদ সরে গেল। দরকারি একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে। ছাদ আবার জায়গামতো বসে গেল। পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে রিকগনিশান লক করে দিলাম। আমি ছাড়া এই গাড়ি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ির কম্পিউটার-চোখ শুধুমাত্র আমাকে চিনতে পারলেই দরজা খুলবে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঘেরাটোপে ঢাকা স্টেশনের এক নির্জন কোণে কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হারিয়ে যাওয়া ওই চারজনকে নিয়ে যখন আমি ফিরে আসব তখন আমার জন্যে বাড়তি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে এই কম্পিউটার টার্মিনাল। এই স্টেশনটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অধীনে। সুতরাং এখন এখানে মানুষ বলতে একমাত্র আমি।

কম্পিউটার চালু করে টার্মিনালের বোতাম টিপে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ঠিকমতো স্টেশনে পৌঁছেছি এবং এক্ষুনি কাজে নামছি। তারপর প্যাকেট খুলে জারকোনিয়াম অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়া বিশেষ ধরনের সিনথেটিক পোশাক বের করে পরে নিলাম। এই পোশাক আগুন, তাপ, জল ও জীবাণুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। জেনারেটর গান, লেসার ব্লাস্টার, বিপার ইত্যাদি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরীক্ষা করে পোশাকের নানা জায়গায় ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর ট্রান্সমিটার ও ঘন খাবারের টিন কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরোলে সবসময়েই দেখেছি শরীর ও মনের ওপরে একটা ধাক্কা লাগে। অথচ বাইরে আমি সব মিলিয়ে প্রায় দুশো ঘণ্টারও বেশি সময় থেকেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে বাইরের জগৎটাকে সবসময় নতুন বলে মনে হয় কে জানে!

মাঝ-বেলার সূর্যের কিরণ পিঠের ওপরে আছড়ে পড়ছে। বাতাস বইলেও সেটা পোশাকের জন্যে টের পাচ্ছি না। তবে দেখতে পাচ্ছি, লম্বা-লম্বা ঘাসের ঝোঁপ এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সামনে দূরে ছোট-বড় পাথুরে টিলা। আর অসমান জমিতে আগাছার জঙ্গল। বাইরের নির্জন বিশালতা আমাকে যেন একটু ভয় পাইয়ে দিল।

কিছুটা দূরেই চোখে পড়ছে ফরেস্ট-এক্স। ঘাসের ঝোঁপ আর আগাছার জঙ্গল সেদিক পানে যতই এগিয়েছে ততই যেন ঘন হয়েছে, আর উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। তারপর শুরু হয়েছে সবুজ পাতায় ঢাকা মহীরুহের জটলা।

পকেট থেকে গ্রাফিক্স রুট-ম্যাপটা বের করে নিলাম। তারপর রওনা হলাম।

জঙ্গলের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। জঙ্গল আমি আগে যা দেখেছি সবই ছবিতে কম্পিউটার সিমুলেশনে। কিন্তু সত্যিকারের একটা প্রাচীন জঙ্গলের মধ্যে কেমন এক বিচিত্র গন্ধও মিশে আছে। আর সেইসঙ্গে রয়েছে নানা শব্দ। তার কয়েকটি পাখির ডাক বলে আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু অন্য শব্দগুলো কীসের?

স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে পা ফেলতে বা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎই পায়ের কাছে সাপের মতো কী একটা নড়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ব্লাস্টার তাক করে ফায়ার করলাম। সাদা আর বাদামি ডোরাকাটা সরীসৃপটার মাথায় ছোট-ছোট দুটো শিংয়ের মতো কী রয়েছে। আর তার মাঝে একথোকা কালো চুল! ওটার শরীর মাঝখান থেকে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাণীটার কথা ব্রিগেডিয়ারের কম্পিউটার প্রিন্টআউটে পাইনি। এই রহস্যময় জঙ্গল হয়তো এরকম বহু অজানা-অচেনা প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে। আর তাদেরই কেউ হয়তো ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি।

তখনই চোখ পড়ল আরও দুটো অদ্ভুত প্রাণীর দিকে। চেহারায় ভোঁদড়ের মতো, তবে লম্বায় প্রায় দেড়গুণ। আর সামনের পায়ে ধারালো বিশাল নখ, গায়ের রং সবুজ, তার ওপরে কালচে ছোপ। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আগাছার ঝোঁপ চিরে সরীসৃপটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সামনের নখে দুটো টুকরো দুজনে বিঁধিয়ে ছিটকে চলে গেল ঝোঁপের আড়ালে।

আমি এক পা পিছিয়ে এসে ব্লাস্টার তাক করেছিলাম, কিন্তু ফায়ার করিনি। মনে হয়েছিল, আমার এই পোশাক ভেদ করে চট করে কোনও ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

প্রাণী দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি সামনে পা বাড়ালাম। এগুলোর ছবি কম্পিউটার প্রিন্টআউটে দেখেছি। মার্কোনক্স। একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং

মাংসাশী। এরা খায় না এমন জিনিস নেই। তবে মৃত প্রাণীদের শরীরে দাঁত-নখ বসাতে এরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

ক্রমেই সূর্যের আলো গাছের অসংখ্য পাতায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা বড় বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে নানারকমের পরজীবী লতা। তাদের কোনও কোনওটায় ফুটে রয়েছে বিচিত্র আকার এবং রঙের বাহারি ফুল। আর তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে রংবেরঙের একঝক প্রজাপতি। এইসব প্রজাপতি ও ফুলের নিখুঁত ছবি আমি দেখেছি। তবে আসল জিনিসটা চোখের সামনে দেখে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। কী যে হল, জীবাণুর ভয় না করেই হাতের দস্তানা খুলে একটা গোলাপি ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। গোলাপি ফুলটার পাপড়িগুলো সুষম ছন্দে কাঁপতে লাগল, আর তার রং পালটাতে লাগল ধীরে-ধীরে। গোলাপি লাল-বেগুনি-নীল-হলদে-গোলাপি…

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই ফুলটা হলদে রঙে তৃতীয়বার পৌঁছে তার রঙ-বদলের খেলা শেষ করল। রামধনু ফুল ফরেস্ট-এক্স-এর অলঙ্কার। আমি মুগ্ধ চোখে তখনও ফুলটাকে দেখছিলাম।

সেই কারণেই পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণকারীকে দেখতে পাইনি। সুতরাং প্রথম আঘাতের ধাক্কা আমাকে ছিটকে ফেলে দিল বুনো ঘাসে ছাওয়া ভেজা মাটিতে। মাথা ঠুকে গেল কোনও বিশাল গাছের শক্ত শেকড়ে। আর তখনই আক্রমণকারীকে চোখে পড়ল। বুলবোয়া! দু-পেয়ে ভয়ংকর প্রাণী। হাত বলে কিছু নেই, তবে দেহে অসম্ভব শক্তি। গায়ে একটুও লোম নেই। বড়-বড় লাল চোখ। লম্বা ধারালো দাঁত। পিছনে কুমিরের মতো কাঁটাওয়ালা মোটা লেজ।

অদ্ভুত গর্জন করে বুলবোয়াটা আমার ওপরে দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই আমি বাঁ-হাতে ব্লাস্টারের ট্রিগার টিপলাম। বুলবোয়ার বিশাল মাথাটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটার গর্দান থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ভারি বাতাসে। জমি কাঁপিয়ে শব্দ করে আছড়ে পড়ল জন্তুটার বিশাল দেহ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাজ্জব করে দেওয়া ক্ষিপ্রতায় প্রায় এক ডজন মার্কোনক্স কোথা থেকে হাজির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতদেহটার ওপরে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক করে নিলাম। দস্তানাটা হাতে পরে নিয়ে আরও জোরে পা চালালাম। একটা জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল।

মার্কোনক্সরা কেমন করে মৃতদেহের খোঁজ পায়? ওরা যেভাবে কোনও সদ্য-মৃত প্রাণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে মনে হয়, ওই নিখোঁজ চারজন যদি এই জঙ্গলে মারাও গিয়ে থাকে তবু তাদের কোনও চিহ্নই আমি পাব না। কিন্তু কোনও-না-কোনও সূত্র যে আমাকে পেতেই হবে! বেশ চিন্তিতভাবে আমি পথ চলতে শুরু করলাম আবার। মাথার পিছনটা অল্প-অল্প ব্যথা করছিল।

জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। বেলা পড়ে আসার ঢের আগেই চারদিক আঁধার হয়ে আসছে। রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুতরাং পুরোনো নিয়ম মেনে একটা জুতসই গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। কয়েকটা বড়-বড় ডালের জোড়ের কাছে গুছিয়ে বসলাম। তারপর পকেট থেকে টেপ-রেকর্ডার বের করে এখন পর্যন্ত যা যা হয়েছে সব বিবরণ বলে গেলাম। টেপ বন্ধ করে বিপারটা অন করে দিলাম। এই বিপারের সঙ্কেত সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের মেইনফ্রেম কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। তা থেকে ওরা জানতে পারবে আমি এখন জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় আছি।

সামান্য খাবার খেয়ে নিয়ে আমি শোওয়ার আয়োজন করলাম। আলো সরে গিয়ে আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কানে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ। তার মধ্যে কয়েকটা সুর বেশ মিষ্টি। রাতের কোনও পাখি জেগে উঠল নাকি?

একটু পরে যখন ঘুমে চোখ বুজে এল তখন রামধনু ফুলটার রং-বদলানো পাপড়ির কথা আমার মনে পড়ছিল।

সে-রাতে অনেক বছর পর আমি স্বপ্ন দেখলাম। আমাকে ঘিরে অসংখ্য রামধনু ফুলের দল পাগলের মতো তাদের পাপড়ির রং পালটে চলেছে।

.

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির গানে। রেকর্ড করা এই গান আগে অনেক শুনেছি। আমাদের যে-কোনও শহরে বহু কৃত্রিম বাগিচা আছে যেখানে নকল ফুল ফোটে, যন্ত্রের পাখিরা উড়ে বেড়ায়, গান গায়। কিন্তু ঝকঝকে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে, অসংখ্য রঙিন ফুল ছুঁয়ে যে-গান এখন ভেসে আসছে তার আকর্ষণ ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। পাতার ফিশফিশ শব্দ আর পাখির সুর যেন একে অপরের যুগলবন্দি।

গাছ থেকে নেমে তৈরি হয়ে আবার শুরু করলাম পথ চলা। চলতে-চলতে টের পেলাম একটা খসখস শব্দ। না, একটা নয়, অনেক। আমাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে কারা যেন চলেছে আমার পাশাপাশি। আমি পথ চলা থামালে সেই শব্দগুলোও থেমে যাচ্ছে। কারা এভাবে লঘু পায়ে অনুসরণ করছে আমাকে?

উত্তরটা জানা দরকার। তাই পকেট থেকে খুদে অস্ত্রসম্ভারের প্যাকেটটা বের করলাম, তা থেকে বেছে নিলাম একটা সাউন্ড ট্র্যাকার। তার ছুঁচলো মুখে ঘুমের ওষুধ মাখানো একটা উঁচ লাগিয়ে আন্দাজে ভর করে ফায়ার করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ কানে এল। আমি ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আগাছার ঝোঁপ আর লতাপাতার ঝাড় সরিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই চোখে পড়ল আমার অনুসরণকারীদের একজনকে। শব্দভেদী সাউন্ড ট্র্যাকার নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। একটা মার্কোনক্স।

বুঝলাম, মার্কোনক্সের দল আড়ালে থেকে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওরা বোধহয় আন্দাজ করেছে, আমার সঙ্গে পথ চললেই ওরা মৃতদেহ পাবে, ওদের খিদে মিটবে। তা সে-মৃতদেহ আমারই হোক বা অন্য কোনও প্রাণীর।

ঘুমন্ত মার্কোনক্সটার শরীর থেকে সাউন্ড ট্র্যাকারটা তুলে নিয়ে সরে আসা মাত্রই প্রায় হাফ ডজন মার্কোনক্স ওটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল ওদের নির্মম কাটাছেঁড়া। ওরা বোধহয় সাউন্ড ট্র্যাকারটা তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিচিত্র চেহারার সাউন্ড ট্র্যাকার একটা প্রাণীর শরীরে বিঁধে থাকা অবস্থায় ওরা ঠিক এগোতে সাহস পাচ্ছিল না।

আবার চলতে শুরু করলাম জঙ্গলের পথ ধরে। এবং টের পেলাম একই সঙ্গে মার্কোনক্সদের গোপন অনুসরণও শুরু হয়েছে। হোক। ওদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এভাবে কতদিন খোঁজ করব আমি? ফরেস্ট-এক্স-এর ঘন জঙ্গলে, অন্ধকারে, শত্রুসঙ্কুল পরিবেশে এরকম এলোমেলো খোঁজ করে কোনও ফল পাওয়া যাবে কি?

এইসব ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা ভারী কিছু আমার পিঠের ওপর পড়ে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্লাস্টার রেডি। কঁটাওয়ালা একটা বিশাল সাপ। সারা গায়ে লাল আর রুপোলি ডোরা, আর তারই মাঝে শিরদাঁড়া বরাবর ধারাল সরু কাটা। চোখ দুটো নীল। আলো-

আঁধারির মাঝে জ্বলছে দপদপ করে। না, এটার কথা রিপোর্টে নেই। কিন্তু প্রাণীটার ভয়ংকর সৌন্দর্য আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিবশ করে দিল। সাপটা বাতাস কেটে অদ্ভুত ভঙ্গি মায় ছোবল ছুঁড়ে দিল আমার পা লক্ষ করে, আর একইসঙ্গে লেজের কাঁটাওয়ালা দিকটা আছড়ে দিতে চাইল আমার গায়ে। ক্ষিপ্রতায় কোনও প্রাণীকে পরাস্ত করাটাই অপারেশান ডিভিশনের অপারেটরদের পেশা। সুতরাং ব্লাস্টার চালালাম। সাপটার শরীরের খানিকটা অংশ মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওটা আমার পায়ে ছোবল মেরেছিল, কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের পাতে মোড়া বিশেষ ধরনের জুতো সেই ছোবল ভেঁতা করে দিয়েছে।

যথারীতি মার্কোনক্সের দঙ্গল হামলে পড়ল সাপটার দেহের ওপরে। আমি সেদিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই একটা সন্দেহজনক শব্দ আমার কানে এলকারও পায়ের শব্দ। আমার পাশাপাশি চলেছে।

জঙ্গলের লতাপাতায় আমার হাত-পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছি। তখনই একটা গাছে আমার হাত লাগতেই খুব অস্পষ্টভাবে জলতরঙ্গের সুর বেজে উঠল। অদ্ভুত ঢিমে তালে বাজতে লাগল সেই বাজনা। আমার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। এ কোন ঘুমপাড়ানি গাছ! এর কথা তো রিপোর্টে নেই! বাজনার সুরটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। আমি ঘোর লাগা মানুষের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের জন্যে পুরোপুরি ভুলে গেলাম নতুন পায়ের শব্দটার কথা। চেহারায় সাধারণ এই গাছ কোথা থেকে পেল স্বর্গীয় এই জলতরঙ্গের সুর?

সংবিৎ ফিরতেই চলা শুরু করলাম এবং নতুন পায়ের শব্দটা আবার শোনা গেল। এবার ফরেস্ট-এক্স-এর মোহময় নেশা কাটাতেই আমি রীতিমতো হিংস্রভাবে জেনারেটর গান বের করে নিলাম। তারপর শব্দ আন্দাজ করে একসঙ্গে পুরো এক মিনিট লো-লেভেল ফায়ার করলাম। আর্তনাদ অথবা গোঙানির মতো একটা শব্দ হল। দূরের একটা ঝোপে কেউ যেন নড়াচড়া করল। আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজে বের করলাম শিকারকে। লতাপাতার জালে জড়িয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ!

মানুষটার চেহারা ও পোশাক বড় অদ্ভুত।

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। কোমরে একটা নোংরা কাপড় জড়ানো। আর ডান হাতের কাছেই পড়ে রয়েছে কাঠের ছুঁচলো ফলা লাগানো একটা বল্লম। এটা দিয়ে কি আমাকেই আক্রমণ করতে চাইছিল এই জংলিটা?

ফরেস্ট-এক্স-এ কোনও মানুষ আছে বলে জানতাম না। তাই একটু অবাক হলাম। অসাড় লোকটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তখনও ঝোঁপের আড়াল থেকে অল্পস্বল্প শব্দ পাচ্ছিলাম। বোধহয় মার্কোনক্সদের দল উশখুশ করছে। সুতরাং ঠিক করলাম, লোকটাকে সঙ্গে নেব। এর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখব কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।

ঝুঁকে পড়ে দেহটা তুলে নেওয়ামাত্রই বৃষ্টি শুরু হল। মুখ তুলে ওপর দিকে দেখলাম। এক টুকরো আকাশও চোখে পড়ছে না। শুধু ঘন পাতায় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। লক্ষ করলাম, গাছের ডাল বেয়ে সরসর করে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েক রকমের ছোট-বড় চিত্র-বিচিত্র সাপ। বৃষ্টির জল ওদের চঞ্চল করে তুলেছে।

আমি জংলি মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর-পর লোকটাকে মাটিতে নামিয়ে দম নিচ্ছিলাম। হঠাৎই একসময়ে খেয়াল হল, জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। বৃষ্টি তখনও ধরেনি।

এরপর খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। আর একই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ কানে আসছিল। গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়ে মাঝারি মাপের একটা পাহাড়ের অংশ চোখে পড়ল। তার একটু পরেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন যেন একটা ধাক্কা খেল।

অসাড় দেহটাকে ভিজে মাটির ওপরে নামিয়ে রেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম সামনের দৃশ্য।

বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তবে ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি। ফলে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে অসুবিধে হল না। আমার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে একটা বিশাল হ্রদ। তার নীল জল চিকচিক করছে। হ্রদের কোল ঘেঁষে একটা পাহাড়। একটু

আগে এই পাহাড়টাকেই আমি জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় আর একপাশে অনেক গাছ চোখে পড়ছে। তাদের মাথায় মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের নানা রঙের আলো। আর পাহাড়ের মাথায় লুকোনো কোনও স্রোতস্বিনী থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে নিচের হ্রদে। তারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা হ্রদের জলতলে পড়ে যেন খই ফুটছে। আর তারই গা থেকে ঠিকরে পড়ছে শেষ বিকেলের আলো। ঝরনার জলের ধারা থেকে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল শত-শত জলকণার রেণু। তাদের গায়ে ফুটে উঠেছে রামধনুর বর্ণালি। এতক্ষণ বাতাসের জোর বোঝা যায়নি। এখন তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

পায়ের কাছে একটা অচেতন দেহ ফেলে রেখে আমি সার্কাসের সঙের মতো মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টি আমি আগে দেখেছি। পাহাড়ও আমি দেখেছি। দেখেছি হ্রদ, ঝরনা, পড়ন্ত বিকেল, জঙ্গলের গাছপালা আর রঙিন ফুল। আমি জানি, এগুলোর নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এইসব জিনিস একসঙ্গে একই জায়গায় আমি কখনও দেখিনি। ফলে এখন টের পেলাম, প্রকৃতির এইসব টুকরো-টুকরো ছবি জোড়া লেগে গোটা ছবিটা তৈরি হলে পর তার আকর্ষণের কোনও তুলনা নেই।

এরই মধ্যে বৃষ্টি থামল। মেঘ সরে পরিষ্কার হল আকাশ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডুবে যাওয়া লাল সূর্যকে কিছুটা দেখা গেল। পিছনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল পাখির ডাক আর অচেনা কোনও প্রাণীর চিৎকার। প্রকৃতির মধ্যে ওরাও আছে, আমরাও আছি।

এমনসময় পায়ের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মানুষটা এক ঝটকায় উঠে বসে আমার পা ধরে এক টান মারল। আমি ঘোর লাগা অবস্থাতেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম ঘাস-জমিতে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ব্লাস্টার বের করে ফায়ার করার জন্যে উঁচিয়ে ধরলাম।

আমাকে ঠিক না চিনতে পারলেও জংলিটা বোধহয় লেসার ব্লাস্টার চিনতে পারল। তাই দু-হাত মাথার ওপরে তুলে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, প্লিজ, ডোন্ট শুট! ডোন্ট শুট!.

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু-হাত মাথার ওপরে রেখে লোকটাও উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে। ওর সভ্য কথাবার্তা আমাকে চমকে দিয়েছিল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে রেখেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

লোকটা বলল, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফ জুওলজিস্ট সত্যদেব সিং।

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখতে লাগলাম। ফরসা শরীর রোদে-জলে কালচে, মুখে চুল-দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, পরনে বনবাসীর কৌপিন। আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের কী প্রাগৈতিহাসিক দশা! কিন্তু কেন? আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, রঘুনাথ মহান্তিই বা কোথায়? সে কথাই জিগ্যেস করলাম সত্যদেব সিংকে। সেইসঙ্গে নিজের পরিচয়ও দিলাম। বললাম, কেন আমি এসেছি।

সত্যদেব বলল, চলুন, যেতে-যেতে সব কথা বলছি।

সূর্য ডুবে গেলেও শেষ বিকেলের আলো রয়ে গেছে। ঝরনার রিমঝিম শব্দ অনেক জোরালো মনে হচ্ছে এখন। আমরা দুজন এগোলাম পাহাড়ের দিকে। কারণ সত্যদেব বলল, পাহাড়ের ও পিঠেই নাকি সবকিছুর উত্তর রয়েছে।

একটু থেমে সত্যদেব আবার বলল, আজ আমাকে দেখে আপনি যেমন আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তেমনই বিক্রম শর্মাকে এখানে প্রথম যখন খুঁজে পাই তখন আমি আর রঘুনাথ মহান্তিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি, একজন আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী এরকম পালটে যেতে পারে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম শর্মা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম পাগল বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক নয়, শর্মা হয়ে গেছে প্রকৃতি-পাগল। ও আমাকে বলেছিল, সিং, একসঙ্গে এত সুন্দর জিনিস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এই ঝরনা, পাহাড়, হ্রদ, ফুল, পাখি, এসব দেখে আমিও বুঝেছিলাম, ওর কথা কী মর্মান্তিক সত্যি। শহরের ঘেরাটোপে বসে কম্পিউটারে আঁকা প্রকৃতির ছবি দেখে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

ফাঁকা জমি পেরিয়ে যখন আমরা এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করছি তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সত্যদেব বলল, এখনও অনেকটা পথ বাকি। রাতটা এখানেই কোথাও পার করে দিলে ভালো হয়। সুতরাং তাই করলাম।

একটা বড় মাপের টিলার ওপরে চড়ে বসলাম দুজনে। একটা ছোট গাছে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আমি আকাশ দেখতে লাগলাম। সত্যদেব বলতে শুরু করল আবার বিক্রম শর্মা আমাদের নিয়ে গেল রণবীর সেনের কাছে। কথা বলে বুঝলাম তারও ওই একই অবস্থা। কৃত্রিম শহরগুলোয় সে আর ফিরে যেতে চায় না। ওখানে নাকি একটাও আসল জিনিস নেই। সবই মানুষের তৈরি, নকল। তারপর…।

সত্যদেব সিং বলে যাচ্ছিল একটানা। আর আমার নেশা ধরে যাচ্ছিল–হ্যারিয়ে যাওয়ার নেশা। আমি রং বদলানো রামধনু ফুলের ঝক দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছি তরুলতার জলতরঙ্গ আর পাখির ডাক, আমার চোখের সামনে হ্রদের নীল জলে বৃষ্টির খই ফুটছে, গুঁড়ি-গুড়ি জলকণায় রামধনুর ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের কোলে অস্ত যাওয়া সূর্যের চোখজুড়োনো রং, আর আকাশে মেঘের দলে কোলাকুলি।

আমি ভুলে যাচ্ছিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, টেপ-রেকর্ডার, ব্লাস্টার, জেনারেটর গান আর কম্পিউটারের কথা। কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোল আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী।

এমনসময় সর্বনাশের মতো মাথার ওপরে কালো আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল।

ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। ঝরনার জলের রিমঝিম বাজনা এখন আরও মাতাল। তারই মধ্যে সত্যদেব কথা শেষ করে গুনগুন করে একটা গান ধরল। গানের কথা একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল যেন গানটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শেষবারের মতো দেখলাম, সত্যদেব মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে গান গেয়ে চলেছে।

.

জঙ্গলের ভেতরে ভোর হয়েছিল একরকম ভাবে। আর এইখানে খোলা আকাশের নিচে সকাল হল একেবারে অন্যরকম।

পিছনে জঙ্গল থাকার জন্যে আমরা এখনও ছায়ায় ঢাকা। কিন্তু সকালের রোদ গিয়ে পড়েছে দূরের একটা পাহাড়ে, হ্রদের জলের মাঝামাঝি, আর বহতা স্রোতস্বিনীর ওপরে। নিচের ফাঁকা জমিটাকে এখান থেকে কিছুটা ছোট দেখাচ্ছে। বেশ কিছু নাম-না-জানা বড়সড় পাখি এসে ভিড় করেছে হ্রদের কিনারে। সেখানে কয়েকটা মার্কোনক্সকেও চোখে পড়ল। পাখির কিচিরমিচির শব্দ হয়তো নেহাতই কোলাহল–কিন্তু আমার বেশ লাগছিল।

সত্যদেব চিৎপাত হয়ে ঘুমিয়েছিল। ওকে ঠেলা মেরে ডাকলাম। ও উঠে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, চলুন, এবারে আমরা এগোব। আট-দশ ঘণ্টার পথ।

হাঁটতে-হাঁটতে দুপুরবেলা নাগাদ আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হ্রদের ওপরে কিছুটা জায়গা ছেড়ে আবার শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। সত্যদেব বলল, আপনাকে এতক্ষণ বলিনি। রণবীরের ভীষণ জ্বর হয়েছে। মনে হয় কোনও ইনফেকশান। আপনার সঙ্গে কোনও ওষুধপত্র আছে?

আমি বললাম, আছে।

বাকি পথটুকু ঢালু হওয়ায় আমরা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে এলাম। জায়গাটায় গাছগাছালি রয়েছে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। তারই মধ্যে দিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটিতে পা ফেলে আমরা এগোলাম।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম ওদের আস্তানায়। এবং আমার অবাক হওয়ার তখনও বোধহয় কিছুটা বাকি ছিল।

বিকেলের নরম আলোয় আমার চোখে পড়ল লতাপাতায় ছাওয়া এক মনোরম কুটির। তার চালে অসংখ্য রঙিন ফুল ফুটে আছে। আর সামনে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তার কিছুটা দূরে একটা ছোট পুকুর–তাতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। সূর্যের ছায়া পড়েছে সেখানে। আর কুটিরের গা ঘেঁষে বিশাল বাগান। তবে মানুষের হাতে তৈরি বাগান নয়, প্রকৃতির খামখেয়ালি বাগান। আশ্চর্য অমিত্রাক্ষর। এত সব রংবাহারি ফুল, তোরা কোথায় লুকিয়ে ছিলি?

সত্যদেব আমাকে কুটিরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। মেঝেতে শুকনো পাতার ওপরে রণবীর সেন শুয়ে রয়েছে। দু চোখ বোজা। গায়ে কয়েকটা পাতার প্রলেপ। আর ওর মাথার পাশে বসে রয়েছে রঘুনাথ মহান্তি। সত্যদেব আমাকে বসতে বলল। পরিচয় করিয়ে দিল মহান্তির সঙ্গে। রণবীর সেন কথাবার্তার শব্দ পেয়ে দুর্বল স্বরে কী যেন বলল, চোখ মেলে তাকাল।

রঘুনাথ বলল, বিক্রম শর্মা শিকারে গেছে।

সত্যদেব ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে-গড়া একটা কলসি থেকে জল গড়িয়ে রণবীরকে দু-একঢোক খাওয়াল।

লক্ষ করলাম, ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। শুধু ছোট-বড় কয়েক টুকরো কাঠ আর শুকনো ঘাসপাতা।

রণবীরের কপালে হাত রাখলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পোশাকের পকেট হাতড়ে ওষুধের প্যাকেট বের করলাম। একটা ট্যাবলেট বেছে নিয়ে ওর মুখে দিলাম। রণবীর ম্লান হাসল, অস্পষ্টভাবে বলল, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন?

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। চার-চারজন সেরা বিজ্ঞানীর কী পরিণতি! ওদের ফেরানো আমার পক্ষে আর কি সম্ভব?

সত্যদেব বলল, দাস, আপনি রণবীরকে কোনওরকমে নিয়ে যান। এখানে থাকলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রিগেডিয়ারের কথা মনে পড়ছিল। উনি বলছিলেন কোনও ভয়ংকর প্রাণীর কথা। আমাদের অজানা অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। যে বুলবোয়ার চাইতেও শক্তিশালী, হিংস্র এবং ভয়ংকর। মোহিনী প্রকৃতি! এই চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে এই একটা জায়গাতেই দারুণ মিল ও প্রকৃতি ওদের টানে।

আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। এই প্রথম যদি, মনে করি, ধরা যাক এইসব শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া একরাশ কাল্পনিক কথা আমার মাথার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনের কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী, সুশোভন দাস, কল্পনায় বারবার টলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

সত্যদেব আমাকে বাইরে নিয়ে এল। বাগানের কাছে গিয়ে আমরা বসলাম।

হঠাৎই সত্যদেব জিগ্যেস করল, আচ্ছা, দাস, বলুন তো, ফুল আমাদের কী কাজে লাগে?

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখলাম, মরা বিকেলের রোদ ওর মাথায়, দাড়িতে এসে পড়েছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার যুক্তি কার্যকারণ ইত্যাদি ক্রমশ তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সত্যদেব বলল, অনেক প্রশ্ন নিয়ে কখনও আমরা ভাবিনি। অবশ্য ওই কৃত্রিম শহরের ঘেরাটোপে বসে তা ভাবা সম্ভবও নয়। যেমন, প্রজাপতি আমাদের কী কাজে লাগে। কিংবা চাঁদ-তারা না দেখলে কি কোনও ক্ষতি হয়?

আমার চোখের সামনে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর দূরে গাছের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আমার মনে হল, অস্ত-যাওয়া সূর্য না দেখতে পেলে কি কোনও ক্ষতি হয়?

আমি চুপচাপ বসে সত্যদেবকে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে দেখি কুটির থেকে রঘুনাথ ও রণবীর বেরিয়ে আসছে। রঘুনাথ দু-হাতে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসছে ওকে।

সত্যদেব তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওদের কাছে। রঘুনাথ বলল, কী করব, শুনছে না। বলছে, বাগানে নিয়ে যেতে।

ওরা দুজনে রণবীরকে এনে বাগানের নরম ঘাস-জমিতে শুইয়ে দিল। রণবীর সেন, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নামজাদা এনটোমোলজিস্ট–পতঙ্গবিজ্ঞানী, তখন বিহ্বল চোখ মেলে ধূসর আকাশ, রঙিন ফুল, অস্তায়মান সূর্য আর প্রজাপতি দেখছে।

রঘুনাথ একটু উঁচু গলায় বলল, সেন, তুমি দাসের সঙ্গে শহরে ফিরে যাও। সেখানে তুমি সেরে উঠবে।

রণবীর সেন প্রকৃতির দিক থেকে চোখ সরাল না। শুধু হাসল, বলল, মহান্তি, তোমার কি মনে হয় না শহরের একশোটা জীবনের চেয়ে এইখানে এইভাবে মারা যাওয়াটা অনেক বেশি দামি?

সত্যদেবের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও আমার হাত চেপে ধরল।

এমনসময় দেখা গেল, বিক্রম শর্মা জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাতে ঝুলছে ছোটখাটো কোনও প্রাণীর মৃতদেহ।

কাছাকাছি এসেই মৃতদেহটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিক্রম। দৌড়ে এল আমাদের পাশে। একপলক আমাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ল রণবীরের ওপরে। রঘুনাথ রণবীরের কপালে হাত রাখল। সত্যদেব ধরল ওর কব্জি। সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে। সিসের আস্তর দেওয়া অন্ধকার নামছে জঙ্গলে। প্রজাপতিরা বেশির ভাগই চলে গেছে, শুধু কয়েকটা আশ্চর্য নিশাচর প্রজাপতি বাগানে উড়ছে। ওদের ডানার রং আধো-আঁধারিতে প্রতিপ্রভ হয়ে জ্বলছে। ঠিক একইভাবে জ্বলজ্বল করছে। কয়েকটা রঙিন ফুলও।

রণবীর সেদিকে একবার দেখল। তারপর অস্ফুটস্বরে কী একটা বলে চোখ বুজল। আচমকাই ওর ঘাড়টা কাত হয়ে গেল একপাশে।

বাকি তিনজন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হল, কান্নার কি কোনও দাম আছে। কিন্তু টের পেলাম, আমার চোখ জ্বালা করছে।

সত্যদেব চোখ ঢেকে বসে ছিল। অন্ধকার থিতিয়ে বসছে। আগুনের কুণ্ডের লালচে আলো আমাদের মুখে-গায়ে। জঙ্গল থেকে পাখি ডাকছিল। আর শোনা যাচ্ছিল হিংস্র গর্জন। ঝরনার জলের কুলকুল শব্দ এখন আরও স্পষ্টভাবে কানে আসছে।

ঠিক সেই সময়ে আকাশের সন্ধ্যাতারা আমার চোখে পড়ল। আকাশের প্রথম চোখ। আমাদের দেখছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে এক অসহ্য জ্বালাপোড়া। ছটফট করতে করতে সমস্ত পোশাক-আশাক-জুতো সব খুলে ফেললাম। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, ব্লাস্টার, জেনারেটর গান–সব। ওরা তিনজন এবারে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল।

আর আমি দেখছিলাম, অন্ধকার বাগানে ফুটে থাকা উজ্জ্বল রঙিন ফুল, নিশাচর রঙিন প্রজাপতি, সন্ধ্যাতারা। শুনছিলাম, ঝরনার শব্দ, রাতপাখির ডাক, পাতার ফিশফিশ।

জঙ্গলের দুরন্ত বাতাস আমার বুক-পিঠ, মুখ-চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রতি একশো বছর অন্তর বেশ কিছু মানুষ ফরেস্ট-এক্স-এর আকষর্ণে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

কোনও বাধাই সেই হারিয়ে যাওয়া রুখতে পারবে না।

# নখের আঁচড়

**নখের আঁচড়**

শো শেষ করে গ্রিনরুমে এসে ধড়াচূড়া ছাড়ছি, পরদা সরিয়ে অনন্ত এসে ঘরে ঢুকল। বলল, মোহনদা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বাইরে অপেক্ষা করতে বলে এসেছি।

অনন্ত আমার ফাস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। ভীষণ কাজের ছেলে। ম্যাজিশিয়ান হিসেবে আমার যেটুকু নামডাক তার অনেকটাই অনন্তর জন্যে। ছেলেটার বুদ্ধি আছে, নিয়মমাফিক কাজ করে, আর খাটতেও পারে খুব। আমার সারা বছরের প্রোগ্রাম ও-ই ঠিক করে। বলতে গেলে অনন্ত একরকম আমার ম্যানেজার, ডান হাত, ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, সবকিছু। সেই গোড়া থেকেই ও আমার ম্যাজিকের দলে রয়েছে।

পাগড়ি, আলখাল্লা, সিল্কের পাজামা খুলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে অনন্তকে বললাম, মিনিট দশেক পরে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ো।

অনন্ত ঘাড় নেড়ে ব্যস্তভাবে চলে গেল। আজ ওর ব্যস্ত থাকার কারণ আছে। সাতদিনের শো করতে আমরা রাণাঘাটে এসেছিলাম। আজ তার সপ্তম দিন শেষ হল। কাল ভোরেই আমরা রওনা হব কৃষ্ণনগরের দিকে। সেখানে দশদিনের প্রোগ্রাম আছে। সুতরাং শেষ রজনীর শো খতম হওয়ামাত্রই অনন্ত গোছগাছের তত্ত্বাবধানে লেগে পড়েছে। দলে আমি আর অনন্ত ছাড়া আছে আরও চোদ্দোজন মেয়ে-পুরুষ। তাদের সবরকম দায়দায়িত্বই অনন্তর একার কাঁধে।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে নিলাম। শীতটা এবারে যেন বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তাঁবুর ভেতরেও কাঁপুনি ধরে যায়।

একটু পরেই পরদা সরিয়ে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। তার ঠিক পিছনেই অনন্ত। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমি একটা টুল এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে বললাম।

আমি এখনও অটোগ্রাফ দেওয়ার মতো নামি ম্যাজিশিয়ান হইনি। ভোলা মাঠে তাঁবু ফেলে ম্যাজিক শো করাই আমার অভ্যেস। থিয়েটার হলের জাতে উঠতে পারিনি। সুতরাং আমার সঙ্গে লোকজন দেখা করতে আসে সাধারণত দুটো কারণে কোথাও শো করতে নিয়ে যাওয়ার চুক্তি করতে, কিংবা কোনও ম্যাজিকের কৌশল জানতে। প্রথমটির জন্যে আসে বয়স্করা, আর শেষের কারণে আসে ছেলে-ছোকরারা। এই ভদ্রলোক আমাকে কোথায় কল-শোর আমন্ত্রণ জানাতে চান?

ভদ্রলোকের পরনে ছাই রঙের ঢোলা ফুলপ্যান্ট। গায়ে ঢোলা একটা হাতকাটা বাদামি সোয়েটার। আর গলায় হলদেকালো চেক চেক কম্বল মাফলার। এককালে বোধহয় স্বাস্থ্য ভালো ছিল, এখন ভেঙে গিয়ে পোশাকগুলো ঢিলেঢালা হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকালে বয়েস পঞ্চাশের এপিঠে বলে মনে হয়, কিন্তু তার ভাঙা গাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের নীচে কালি, এসব দেখামাত্রই বয়েসটা একলাফে ষাটের ওপিঠে চলে যেতে চায়।

টুলে বসে ভদ্রলোক গ্রিনরুমটা জরিপ করছিলেন। নানারকম জিনিসে ছোট্ট ঘরটা একেবারে জবরজং। পোশাক, টুল, কাঠের বাক্স, রঙিন ফিতে, বিচিত্র আসবাব, মুখোশ, পাখির খাঁচা, আরও কত কী! ভদ্রলোক বোধহয় কোনও ছোটখাটো জাদুকরের গ্রিনরুমে কখনও ঢোকেননি।

মিছিমিছি সময় বয়ে যাচ্ছিল দেখে শেষ পর্যন্ত আমিই মুখ খুললাম, বলুন, কী দরকার?

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়েছিল দুশ্চিন্তায়। আমার দিকে ফিরে কপাল সাফ করে হাসতে চেষ্টা করলেন। বললেন, মোহনবাবু, আমার নাম নিমাইচন্দ্র সরকার। চূর্ণি নদী পেরিয়ে গাঙনাপুরে আমি থাকি। এই সাতদিনে সাতবার আমি আপনার ম্যাজিক দেখেছি। দেখে মনে হয়েছে আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারবেন, আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। সাতবার আমার ম্যাজিক দেখে নিমাইবাবুর মনে হয়েছে আমি ওঁকে, ওঁর ছেলেকে বাঁচাতে পারি! ভদ্রলোক বলছেন কী! ওঁর মাথার গোলমাল হয়নি তো!

কিন্তু আমি কিছু বলে ওঠার আগেই ঠিক আমার মনের কথাটি পড়ে নিয়ে তিনি বললেন, মোহনবাবু, আমি পাগল নই। তবে মরিয়া মানুষ বোধহয় পাগলের মতোই আচরণ করে। আপনার ভাসমান তরুণীর খেলা দেখে আমি বুঝেছি আপনি সত্যি-সত্যি হিপনোটিজম জানেন। আর যে ভয়ানক বিপদে আমি পড়েছি তাতে হিপনোটিজম জানা কোনও বিশেষজ্ঞ ছাড়া বোধহয় আমার গতি নেই। অবশ্য তাতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তা হলে ধরে নেব গোটা ব্যাপারটা অলৌকিক, ভূতপ্রেতের নিষ্ঠুর খেলা।

ভাসমান তরুণীর খেলায় আমি একজন পঙ্গু যুবতাঁকে সম্মোহিত করে শূন্যে ভাসিয়ে দিই। তারপর তার শরীরের ওপরে বিভিন্ন মুদ্রায় হাত চালিয়ে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলি। বলা বাহুল্য, তরুণীটি মোটেই পঙ্গু নয়, আর পুরো ব্যাপারটাই স্রেফ ম্যাজিকের কৌশল। তবে আলোছায়াময় পরিবেশে অনন্তর দক্ষ পরিচালনায় আর আমার নিখুঁত উপস্থাপনায় ওই ম্যাজিকটা সব দর্শকদের একেবার মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। ম্যাজিকটা শেষ হলে সকলে যেন স্বপ্ন ভেঙে চেতনা ফিরে পায়।

নিমাইবাবু বললেন, মেয়েটিকে মঞ্চের ওপরে হিপনোটাইজ করার সময়ে আমি আপনার হাত চালানোর ভঙ্গি প্রতিদিনই খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি হিপনোটিজম জানেন..ভালোরকমই জানেন। দয়া করে অস্বীকার করবেন না। আমাকে আপনি বাঁচান, প্লিজ, মোহনবাবু।

ভদ্রলোক সোজা উঠে এসে আমার দু-হাত চেপে ধরলেন। ঝুঁকে পড়ে আর্ত অনুনয়ের সুরে বললেন, আমার যথাসাধ্য আপনাকে আমি দেব। দয়া করে এই হতভাগা বাপটাকে নিরাশ করবেন না।

আমি খুব দোটানায় পড়ে গেলাম।

মঞ্চের ব্যাপারটা অভিনয় হলেও হিপনোটিজম যে আমি জানি না তা নয়। অনেকের মতে বেশ ভালোই জানি। আর সেইসঙ্গে পড়তে শুরু করেছি সম্মোহনবিদ্যাসংক্রান্ত নানান বইপত্র। বহু দেশি-বিদেশি বই গুলে খেয়েছি,

অভ্যাস করেছি দিনরাত, পরিশ্রম করেছি প্রাণপাত। এ পর্যন্ত সম্মোহন বা জাদুবিদ্যা কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছি জানি না, তবে জাদুকর মোহনকুমারের নাম পশ্চিমবাংলার লোকের কাছে এখন আর একেবারে অজানা নয়।

কিন্তু কাল ভোরেই যে সদলবলে আমাকে কৃষ্ণনগরে রওনা হতে হবে। আবার নিমাইবাবুর সমস্যাটা শুনতেও কৌতূহল হচ্ছে খুব। ভদ্রলোক এখনও আমার হাত দুটো আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আপনি এখানে বসুন। আমি একটু কথা বলে দেখি–

বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় বড় গ্রিনরুমটায় অনন্তকে খুঁজে পেলাম। ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে সংক্ষেপে সব জানালাম। ও খুব অবাক হয়ে গেল। চোখে-মুখে কৌতূহল ফুটে উঠল। আমি বললাম, অনন্ত, তুমি আর সবাইকে সবকিছু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কৃষ্ণনগরে রওনা করে দাও। আমরা দুজন আর একটা-দুটো দিন এখানে কাটিয়ে যাই। কৃষ্ণনগরে দুদিন দেরির ব্যাপারটা পরে ম্যানেজ করে নেব। এরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুযোগ আর বোধহয় আসবে না।

অনন্ত এককথায় রাজি।

আমি ফিরে এসে নিমাইবাবুকে সিদ্ধান্তের কথা বললাম। উনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, আপনারা তা হলে আমার বাড়িতে চলুন। দুটো দিন আমার অতিথি হয়ে সেখানেই থাকবেন। যেতে যেতে ঘটনাটা সবিস্তারে আপনাকে খুলে বলব।

আমি নিমাইবাবুর আশায় উজ্জ্বল শীর্ণ মুখটা দেখছিলাম। আমি কি পারব ওঁকে কিংবা ওঁর ছেলেকে বাঁচাতে?

.

সামান্য লটবহর নিয়ে অনন্ত একটা সাইকেল রিকশায় উঠল। অন্য একটা রিকশায় উঠলাম আমি ও নিমাইবাবু। রিকশা গাঙনাপুরের পথে রওনা হতেই ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে নটা। আমাদের রিকশা অনন্তকে পথ দেখিয়ে চলল। এর

মধ্যেই রানাঘাটের আলো-জনরব স্তিমিত হয়ে চারপাশে ঘুম নেমে আসছে। রিকশার হর্ন বলতে গেলে বাজাতেই হচ্ছিল না।

নিমাই সরকার সিগারেট বের করে আমাকে দিলেন, নিজে একটা ঠোঁটে রাখলেন। তারপর দেশলাই জ্বেলে দুটো সিগারেটে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। ধীরে-ধীরে বললেন, মোহনবাবু, মাত্র মাসখানেক হল আমি কৃষ্ণনগরে বদলি হয়ে এসেছি। সেখানে ঘর পেতে অসুবিধে হচ্ছিল, তখন পরিচিত একজন গাঙনাপুরে একটা বাড়ির সন্ধান দেয়। বেশ সস্তায়। ফলে রাজি হয়ে গেলাম। সেখানে থেকেই কৃষ্ণনগরে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করি। আমার বাড়িটা একতলা। গুটি তিনেক ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর, আর ছোট্ট এক টুকরো বাগান মতো আছে পিছনদিকে। আমার সংসার ছোট। স্ত্রী আর দুই ছেলে। বড় ছেলে বিনোদ একটা ওষুধ কোম্পানির সেলসম্যান, আর ছোট ছেলে রূপক ক্লাস টেন-এ পড়ে। আমি বদলি হওয়ায় ও একমাস হল রানাঘাট হাই স্কুলে পড়ছে। আগে আমরা কলকাতায় ছিলাম। তখন ও হিন্দু স্কুলে পড়ত। পড়াশোনায় বেশ ভালো। তবে দিন পনেরো হল ওকে নিয়েই গোলমালটা শুরু হয়েছে।

রিকশা গতি নিয়েছে। শীতের বাতাস গায়ে বিঁধছে ছুঁচের মতো। আকাশে আধখানা চাঁদ আর কুচি কুচি তারা। আমি নিমাইবাবুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি আবার বলতে শুরু করলেন ও রূপকের একটা বদ অভ্যেস আছে। ও ঘুমের মধ্যে প্রায়ই কথা বলে। কিন্তু সে-কথার মাথামুন্ডু কিছুই বোঝা যায় না। তা ছাড়া মাঝে-মাঝে ও কোনও-কোনও কাজ করে যা পরে ওর একদম মনে থাকে না। বেমালুম ভুলে যায়। অথচ পড়াশোনার ক্ষেত্রে এরকম ভুল ওর হয় না। যাই হোক, এ নিয়ে আমরা তেমন দুশ্চিন্তায় পড়িনি। ভেবেছি, বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দিন পনেরো আগে একটা ঘটনা আমাদের সবাইকে ভয় পাইয়ে দিল।

নিমাইবাবু সিগারেটে গভীর টান দিলেন। একটা ছোট কাশি সামলে নিয়ে বললেন, বিনোদ প্রায় দিন কুড়ি আগে কোম্পানির কাজে ট্যুরে গিয়েছিল। ও থাকলে দু-ভাই একসঙ্গেই শোয়। বিনোদ চলে যাওয়ার পর রূপক একাই শুতে চাইল। ওর মা-কে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, একা শুতে ওর একটুও ভয় করে না। আমরাও আর জোর করিনি। কিন্তু দিন পনেরো আগে, একটু আগে যা বলছিলাম, দেখি ঘুম থেকে উঠে রুপু খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আয়নায় মুখ দেখছে।

একটু পরে ও আমার কাছে এসে বলল ভালো করে ওর মুখটা দেখতে। ছেলেটা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। একটু ভয়ও পেয়েছিল বোধহয়...।

আমি আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, কী কী দেখলেন ওর মুখে?

সামনের আঁধারি পথের দিকে চোখ রেখে ক্লান্ত স্বরে নিমাইবাবু বললেন, ছোট-ছোট কয়েকটা আঁচড়ের দাগ। দেখে নখের আঁচড় বলেই মনে হল। ধারালো নখের সূক্ষ্ম আঁচড়।

নিমাইবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমাদের রিকশা এখন চূর্ণি নদীর ব্রিজের ওপর দিয়ে চলেছে। আমি গায়ের শালটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে নিলাম। হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, তারপর?

তারপর আর কী! পরদিনও আবার সেই নখের আঁচড়! মুখে আর হাতে। লক্ষ করলাম, দু-এক জায়গায় বিন্দু বিন্দু রক্তও জমাট বেঁধে রয়েছে। অথচ রুপু এর বিন্দুবিসর্গও কিছু জানে না। মোহনবাবু, এদিকটা বেশ খোলামেলা জায়গা, গাছগাছালিও কম নয়। সুতরাং নানা জাতের পাখিও অনেক আছে। আমি ভেবেছি, রাত-বিরেতে আঁধারকানা কোনও পাখি হয়তো জানলা-টানলা দিয়ে ঢুকে পড়েছে রূপকের শোওয়ার ঘরে। তারপর অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘরময় উড়ে বেড়িয়েছে, আর তখনই রুপুর হাতে-মুখে তার নখের আঁচড় লেগেছে। রুপু হয়তো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তাই টের পায়নি। পরে পাখিটা জানলা দিয়েই কোনওরকমে আবার উড়ে বেরিয়ে গেছে। তবে একটা কথা, এরকম সন্দেহ আমার হয়েছিল বটে, কিন্তু পাখির ওড়াউড়ির জন্যে ঘরের কোনও জিনিস ওলটপালট অবস্থায় দেখিনি। সে যাই হোক, তৃতীয় রাতে রুপুকে সব জানলা-দরজা ভালো করে ছিটকিনি এঁটে ঘুমোতে বললাম। কিন্তু পরদিনও একই ব্যাপার। বরং আঁচড়ের চিহ্ন যেন আরও বেশি।

ঘরে ঘুলঘুলি আছে? আমি নিমাইবাবুকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

–আছে, তবে সেগুলো সিমেন্টের ঢালাই করা। একটা চড়ুই পাখিও গলতে পারে না।

–তারপর?

–তারপর আর কী! একদিন দু-দিন ছাড়া-ছাড়া ওই একই ব্যাপার। আমি ওর সঙ্গে রাতে শুয়ে দেখেছি, কিন্তু কিচ্ছু টের পাইনি। ওর মা শুয়েছে, কিন্তু আঁচড়ের চিহ্ন ঠেকাতে পারেনি। বিনোদ দিন চারেক আগে ফিরে এসে সব শুনেছে। শুনে সারা রাত্তির জেগে ছোটভাইকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মাঝরাতে আচমকাই ও ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়েছে। ঘুম ভেঙেছে সেই সকালে। রূপকের হাতে-মুখে তখন নতুন নখের আঁচড় পড়েছে। আমি আর আমার স্ত্রীও রাত জেগে রুপুকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের অবস্থাও হয়েছে ঠিক বিনোদের মতো। হঠাৎই যেন গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেছি।

চূর্ণি নদী পেরিয়ে গাঙনাপুরে কিছুটা ঢুকে পড়েছি। পিছনে তাকিয়ে অনন্তর রিকশাটাকে একবার দেখে নিলাম। নিমাইবাবু পুরোনো সিগারেট শেষ করে নতুন একটা ধরিয়েছেন। তাতে কয়েকটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আলো-আঁধারির মধ্যেও তাঁর চোখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তিনি যেন নীরবে আমাকে অনুনয় করে বলছেন, মোহনবাবু, কিছু বলুন।

আমি জিগ্যেস করলাম, রূপককে ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ক্লান্তভাবে নিমাই সরকার বললেন, হ্যাঁ, এমনিতেই তো আঁচড়ের জন্যে টেট ভ্যাক ইঞ্জেকশান দিতে হয়েছে। তা ছাড়া একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গেও কথা বলেছি। ভদ্রলোক কৃষ্ণনগরে বসেন। উনি সব শুনে-টুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বললেন, ঘুমের ঘোরে ও নিজেই নিজের হাতে মুখে আঁচড় কাটে না তো! তখন আমি বলেছি, না, কারণ আঁচড়গুলো বেশ সূক্ষ্ম–অনেকটা সুতোর মতো। মানুষের নখে হওয়ার কথা নয়। পরে আমি এক সকালে রুপুর নখ পরীক্ষা করে দেখেছি। সেখানে ছাল-চামড়া বা রক্তের কোনও চিহ্ন দেখিনি।

নিমাই সরকার হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই ঘটনার যুক্তিসঙ্গত কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক আমাকে সমনামবুলিজম, হিপনোটিজম, মেসমেরিজম, এইসব ভারী-ভারী শব্দ শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে হিপনোটিজম শব্দটাই আমার যা একটু চেনা। তখন হিপনোটিজম নিয়ে কয়েকদিন বেশ পড়াশোনা করলাম, কিন্তু রহস্যের কিনারা করতে পারলাম না। পরে আমার স্ত্রী কমলাকে হিপনোটিজম-এর কথা বলতেই সে আপনার কথা আমাকে বলল। পোস্টার না হোর্ডিং কিসে যেন সে দেখেছে আপনি রানাঘটে আসছেন সাতদিনের শো করতে। এমনিতে আমরা তো খুবই ভেঙে পড়েছিলাম,

তা ছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবদের নানারকম উপদেশ আর পরামর্শে আমি কীরকম যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ফলে কমলার কথাটা বেশ মনে ধরল...।

ডানদিকের একটা পুকুরে চাঁদের ছায়া পড়েছিল। সেদিকে এক পলক চোখ রেখেছিলাম। হঠাৎই টের পেলাম নিমাইবাবুর কর্কশ হাতের চেটো আমার হাতের ওপরে। তিনি চাপা গলায় বললেন, এখন আপনিই আমাদের শেষ ভরসা, মোহনবাবু!

তারপর একটু থেমে গলার স্বর স্বাভাবিক করে আবার বললেন, আমরা এসে গেছি।

চোখে পড়ল, সামনে খানিকটা ফাঁকা জমিতে একটা একতলা বাড়ি। তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে দু-চারটে একই ঢঙের বাড়ি দাঁড়িয়ে। তারও ওপিঠে কয়েকটা আলোর বিন্দু, গাছগাছালি, আর অন্ধকার।

রিকশা থেকে নেমে নিমাইবাবুর বাড়িতে ঢোকামাত্রই আমার কেমন শীত শীত করে উঠল।

.

পরিচয় এবং খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ করে আমি আর অনন্ত রূপকের শোবার ঘরে এলাম। ও তখন পড়াশোনা শেষ করে সবে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। বিনোদ একপাশে একটা চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। আমাদের ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা টর্চ ছিল। সেটা আমাকে দিয়ে মলিন হেসে বলল, এটা রাখুন। একটু থেমে আবার বলল, আমি তা হলে যাই। রাত-বিরেতে কোনও দরকার পড়লেই ডাকবেন কিন্তু।

লক্ষ করলাম, বাইশ-তেইশ বছরের যুবকটিকে এখনই কেমন বুড়োটে দেখাচ্ছে। নিমাইবাবু আমাদের পিছনে-পিছনে ছেলেদের শোওয়ার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন। চাপা গলায় আয় বিনু বলে বিনোদকে ডেকে নিলেন।

ওঁরা চলে যেতেই টর্চটা পকেটে রেখে আমি চটপট দরজা বন্ধ করে দিলাম। শুধু-শুধু দেরি করে লাভ নেই। অনন্ত তখন ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। আর রূপক শুয়ে-শুয়েই কৌতূহলী চোখে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

বাড়িতে এসে কমলাদেবীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভদ্রমহিলা যে ভীষণ ভেঙে পড়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। রূপকের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলছিলেন বারবার। বড় ভাই বিনোদ খুব কম কথা বলছিল। ছোট ভাইকে সুস্থ করতে না পারার গ্লানি বোধহয় ওকে ভিতরে ভিতরে কষ্ট দিচ্ছিল।

রূপককে সেই তুলনায় বেশ হাসিখুশি দেখছি। মা-বাবা-দাদার মনমরা ভাব ওকে সে সামান্য অবাক করেছে তা-ও ওর অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট ছিল। প্রথম পরিচয়ের সুযোগেই ওর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছি। এমনকী দু-চারটে চটজলদি ম্যাজিক দেখিয়ে ওকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছি। বলেছি, চলে যাওয়ার আগে অনেক ম্যাজিক ওকে শিখিয়ে দিয়ে যাব। অনন্তও ম্যাজিকের নানান গল্প করে ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। খেতে বসে লক্ষ করছিলাম, ওরা একমনে গল্প করে চলেছে, আর মাঝে-মাঝেই হেসে উঠছে একসঙ্গে।

আমি রূপকের কৌতূহলে ভরা মিষ্টি মুখটা দেখলাম। অলৌকিক আঁচড়ের চিহ্নগুলো এক নিষ্ঠুর ছবি এঁকে দিয়েছে সেখানে। তবে কোনও আঁচড় থেকেই ঘা হয়নি। নিমাইবাবুর কাছে শুনেছি, ওকে নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হচ্ছে। তা ছাড়া টেট ভ্যাক ইঞ্জেশান তো নেওয়াই রয়েছে। সেইজন্যেই জ্বালাযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছে বেচারা।

অনন্তকে বললাম, ঘরের সব জানলা ভালো করে বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দাও।

অনন্ত কোনও প্রশ্ন না করে কাজে লেগে গেল। আমি ঘরের ভিতরে অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিলাম। একটা ডবল বেড খাট-রূপক আর বিনোদের জন্যে। একজোড়া চেয়ার, একটা টেবিল, টেবিলের পাশে দেওয়ালের তাকে রূপকের বই-খাতা, টেবিলেও তার কিছু কিছু ছড়ানো। দেওয়ালে দুটো ক্যালেন্ডার–দুটোই ওষুধ কোম্পানির। একটা দেওয়াল-আয়না, তাছাড়া দুর্গা ও সরস্বতীর ফটো ফ্রেমে বাঁধানো। খাটের তলায় দুটো ট্রাঙ্ক আর একটা বেতের মোড়া।

ঘরে মোট চারটে জানলা, একটা দরজা, আর দুটো ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির ফাঁকগুলো খুব ছোট যেমনটি নিমাইবাবু বলেছিলেন।

আমার কথায় চারটে জানলার কাচের পাল্লাই অনন্ত ঠিকঠাক এঁটে দিল। তারপর খাটের ওপরে গিয়ে বসল। রূপককে জিগ্যেস করল, ভয় করছে?

রূপক বলল, না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল, মোহনদা, তোমরা ওটাকে ধরতে পারবে তো?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কাকে?

রূপক চোখ বড় বড় করে বলল, ওই কালো ভ্যাম্পায়ারটাকে। যেটা মাঝরাতে এসে আমার গায়ে আঁচড় কেটে রক্ত খেয়ে যায়।

–এসব কথা তোমাকে কে বলেছে?

–ইস্কুলের বন্ধুরা। গল্পের বইয়ে নাকি এরকম লেখা আছে।

আমার খুব কষ্ট হল। ক্লাস টেনের ছেলে, কিন্তু মনটা এখনও অনেক কচি কাঁচাও বলা যায়।

আমি ওর কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, ওসব বাজে কথা। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি আর অনন্তদা তোমার অসুখ সারিয়ে দেব। কোনও ভয় নেই। কাল থেকে তোমার গায়ে কেউ আর আঁচড় কাটবে না।

রূপক আশ্বস্ত হয়ে চোখ বুজল। কিন্তু আমার কথাগুলো নিজের কানেই কেমন ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনাল। নিমাইবাবু তিনটে কথা আমাকে বলেছিলেন ও সমবুলিজম, হিপনোটিজিম আর মেসমেরিজম। কেন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যেই কোথাও রহস্যের সূত্র লুকিয়ে আছে। এর ওপর ভিত্তি করে একটা থিয়োরিও আমি খাড়া করেছি।

পাশের ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ছমছমে শব্দ করে রাত এগারোটা বাজল। রূপক পাশ ফিরে গুটিশুটি মেরে শুল। মনে হল ঘুম আসতে ওর দেরি হবে না। আমি এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে একটা লাঠি জাতীয় অস্ত্র খুঁজছিলাম, হঠাৎই চোখ গেল রূপকের পড়ার টেবিলের পিছনে। দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে একটা হকি স্টিক। এগিয়ে গিয়ে সেটা বের করে নিলাম। বেশ মজবুত। অনন্ত প্রশ্ন ভরা চোখে আমাকে লক্ষ করছিল। তাই হেসে ছোট্ট করে বললাম, সাবধানের মার নেই।

অনন্ত বলল, আমাদের যেমন করে তোক জেগে থাকতেই হবে, মোহনদা। হঠাৎ করে ঘুমে ঢলে পড়লে চলবে না।

আমি বললাম, নিশ্চিন্ত থাকো, সে ভয় নেই। আমি দরজার কাছে চেয়ার নিয়ে বসছি। তুমি বিছানায় থাকবে। নাও, এবারে আলো নিভিয়ে দাও।

অনন্ত উঠে গিয়ে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। ঝুপ করে অন্ধকার লাফিয়ে নেমে এল ঘরে। শরীরের প্রতিটি স্নায়ু উল্কণ্ঠা ও উত্তেজনায় টানটান। অপেক্ষা করছি কোনও ভয়ংকর ঘটনার জন্য। তবে কী সে ঘটনা তা জানি না। আর আজ রাতে সে-ঘটনা ঘটবে কি না তা-ও জানি না। কিন্তু তবুও সজাগ থাকতেই হবে। নিষ্পাপ ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে এই নিষ্ঠুর অভিশাপ থেকে।

অন্ধকার ভেদ করে রূপকের লেপে মোড়া দেহটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। অনন্তর চেহারাও খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। জানলার কাচের শার্সির ওপিঠে শীতের রাত ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাছপালা আকাশ কিছুই প্রায় চেনা যাচ্ছে না। খুব ভালো করে নজর করলে কয়েকটা তারার ফুটকি শুধু চোখে পড়ে। মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে রাতপাখির ডাক আর শেয়ালের আর্তকান্না।

অপেক্ষায় কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎই একটা অদ্ভুত তন্দ্রার আমেজ আমার কাঁধে চেপে বসল। চোখের পাতা হঠাৎই হয়ে উঠল লোহার মতো ভারী, আর মনটা যেন পলকে কুয়াশা মোড়া ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু তখনও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি, একটা গাঢ় থমথমে বাতাস যেন ঘরের ভিতরে জাঁকিয়ে বসছে। ঠিক ফুটবলে পাম্প করা বাতাসের মতো ঘরের বাতাসের চাপ বাড়ছে… ক্রমেই বাড়ছে। চোখ বুজে আসতে চাইছে। আর নাম-না-জানা এক বুনো গন্ধ নাকে ঢুকে পড়ে সমস্ত চেতনাকে যেন অবশ করে দিচ্ছে।

আমি এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হকি স্টিকটাকে শব্দ করে মেঝেতে ঠুকলাম একবার। কিন্তু কোনও অলৌকিক বাতাস যেন আমার শরীরের সমস্ত শক্তি ক্রমশ শুষে নিচ্ছে। আর কতক্ষণ আমি দুপায়ে খাড়া থাকতে পারব জানি না। প্রাণপণ চেষ্টায় হকি স্টিকটা মেঝেতে আবার ঠুকলাম। এপাশ-ওপাশ ঝটকা মেরে মাথা ঝাঁকিয়ে ডেকে উঠলাম, অনন্ত! অনন্ত!…তার পর পকেট থেকে টর্চ বের করে খাট লক্ষ্য করে বোতাম টিপলাম।

কোনও উত্তর নেই। অনন্ত আর রূপক দুজনেই ঘুমে অসাড়। টর্চ নিভিয়ে দিলাম।

বন্ধ কাচের জানলার বাইরে রাতের চেয়েও গাঢ় অন্ধকার কোনও ছায়া যেন নেমে এসেছে। ঘিরে ধরেছে নিমাই সরকারের ছোট্ট বাড়িটাকে।

আমার ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে অন্য কারও ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। আড়ালে থেকে কেউ যেন শুষে নিতে চাইছে আমার মনের জোর, মনের সমস্ত প্রতিরোধ। আমি আবার চিৎকার করে অনন্তর নাম ধরে ডেকে উঠলাম।

কোনও সাড়া নেই। তবে রূপক ঘুমের ঘোরেই জড়ানো গলায় কী যেন বলে উঠল।

এবারে স্পষ্ট বুঝলাম, আড়ালে অদৃশ্য থেকে কেউ আমাদের সম্মোহিত করতে চাইছে! কে সে? কোন সম্মোহন-বিশারদ?

প্রাণপণ জেদ আর প্রতিজ্ঞায় নিজেকে সচেতন রাখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল। বুঝলাম, লড়াইয়ে জিতে গেছি। কিন্তু তখনও মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছিল।

বিনোদ বলেছিল রাত-বিরেতে কোনও দরকার পড়লেই ডাকতে। অতএব বেশ চিৎকার করেই বিনোদ এবং নিমাইবাবুর নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম। ফল যা আশা করেছিলাম তাই হল : কোনও সাড়া নেই।

ঠিক কী যে ঘটতে চলেছে সেটা স্পষ্ট বুঝে উঠতে না পারায় কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আবার টর্চ জ্বেলে অন্ধকার ঘরের নানান কোণে সতর্কভাবে নজর করে দেখলাম। ভাবলাম, ঘরের আলোটা জ্বেলে দিই, কিন্তু কাজে তা করে ওঠার আগেই দেখি এক ঝটকায় লেপ সরিয়ে রূপক বিছানায় উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিভিয়ে দিলাম। হকি স্টিকটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ওকে লক্ষ করতে লাগলাম।

রূপক খুব স্বাভাবিক ও অভ্যস্তভাবে বিছানা থেকে নেমে এল। জামা সোয়েটার সব ঝটপট গায়ে চড়িয়ে নিল। তারপর ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি উত্তেজিত হয়ে ডাকলাম, রূপক! রূপক!

ও ভ্রূক্ষেপও করল না। মনে হল না আমার ডাক শুনতে পেয়েছে। দরজার দিকে তড়িঘড়ি এগোতে গিয়ে রূপক চেয়ারে টেবিলে ধাক্কা খেল–অনেকটা অন্ধ মানুষের মতো। কিন্তু যন্ত্রণা বা বিরক্তির কোনও শব্দ বেরিয়ে এল না ওর মুখ থেকে। পরক্ষণেই আমাকে পাশ কাটিয়ে ও দরজার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর ছিটকিনি খুলে দরজা হাট করে সোজা ঘরের বাইরে।

আমি অনন্তকে বৃথাই আরও বারদুয়েক ডাকলাম। তারপর টর্চ আর হকি স্টিক বাগিয়ে ধরে রূপককে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বারান্দায় এসে রূপক জুতো পরে নিল। তারপর সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরে।

ওকে অনুসরণ করতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। যেন ভারী বাতাস ঠেলে লড়াই করে এগোতে হচ্ছে। কিন্তু চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে চটপট বাইরে আসতেই দমচাপা আবহাওয়াটা যেন একটু হালকা হল।

এপাশ-ওপাশ তাকাতেই রূপককে দেখতে পেলাম। ডানদিকে বাঁক নিয়ে ও বাড়ির পিছনদিকে যাচ্ছে। আধখানা চাঁদের আবছায়া আলোয় ওকে দেখতে তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু যখন ও ফাঁকা জমিতে এসে পড়ল তখন যেন মনে হল একটা কুৎসিত কালো কুয়াশা ওকে ঘিরে রয়েছে। ফলে রূপক অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে আমার চোখে।

রূপককে অনুসরণ করে কতক্ষণ পথ চলেছি মনে নেই। অন্ধকার মাঠ, গাছপালা, ডোবা পুকুর, সব পেরিয়ে অবশেষে যেখানে এসে ও থামল, সে-জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। একপাশে একটা উঁচু পাঁচিল, আর তার গা ঘেঁষে বিশাল বিশাল একজোড়া বটগাছ। তাদের ডালপালা, পাতা, ঝুরি সব মিলে চাঁদের আলোকে রুখে দিয়েছে।

আমি কিছুটা দূরত্ব রেখে রূপককে অনুসরণ করছিলাম। অন্ধকার জায়গাটায় ঢুকে পড়তেই আমি রূপককে আর দেখতে পেলাম না। নিঝুম রাতের কনকনে শীতে আমার হাত-পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, হকি স্টিকটা এই বুঝি মুঠো থেকে আলগা হয়ে পড়ে যাবে। নিতান্তই মনের জোরে সামনে এগিয়ে চললাম।

এদিকটায় কোনও বসতি নেই। সামনে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যে-পুরোনো আমলের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি সেটা বোধহয় পরিত্যক্ত। হয়তো কোনওকালের রাজবাড়ি কি জমিদারবাড়ি হবে। আর একটু এগোতেই অন্ধকার এবং পাঁচিল বাড়িটাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিল। তারপরই একটা উৎকট দুর্গন্ধ আমার নাকে এল।

গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে পুরোপুরি ঢুকে পড়তেই একটা খসখস শব্দ আমার কানে এল। তরপরই ঝটপটানির শব্দ এবং কয়েকটা চাপা কর্কশ চিৎকার। আমি টর্চ জ্বেলে ওঠার আগেই হুটোপুটি আরও বেড়ে গেল, বেড়ে উঠল চিৎকার।

টর্চ জ্বালতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

প্রকাণ্ড মাপের চার-পাঁচটা শকুন জোড়া-বটগাছের গুঁড়ির কাছে রূপককে ঘিরে ঝটপটিয়ে বেড়াচ্ছে। আঁধারকানা হয়ে শকুনগুলো ছেলেটাকে আঁচড়াচ্ছে, ঠোকরাচ্ছে, বিশাল ডানা ঝাঁপটে কর্কশ চিৎকার করছে। কিন্তু ছেলেটার সেসব দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন শকুনগুলোর কোনও অস্তিত্বই ও টের পায়নি। ও একমনে বটগাছের গুঁড়ির কাছে এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে মাটি খুঁড়তে চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে, লুকোনো কিছু যেন মরিয়া হয়ে খুঁজছে।

টর্চের আলো একটু বাঁদিকে ঘোরাতেই দুর্গন্ধের উৎসটাও খুঁজে পেলাম। মৃত পশুর একটা ভাগাড়। শেয়াল-শকুনে খুবলে খাওয়া গলিত শবদেহের নরক। কয়েকটা কালো শকুন সেখানে বসে আছে। উশখুশ করছে।

আমি হাতের টর্চটা জ্বলন্ত অবস্থাতেই মাটিতে রাখলাম। তারপর হকি স্টিক নিয়ে এগিয়ে গেলাম আচ্ছন্ন রূপককে শকুনের হিংস্র নখের আঁচড়ের হাত থেকে বাঁচাতে। ও তখনও বটগাছের গোড়ায় মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করছে।

আমি বারকয়েক এলোপাতাড়ি স্টিক চালাতেই শকুনগুলো তীব্র চিৎকার করে সরে গেল তফাতে। আমার গায়ের শালটা খুলে পড়ে গেল। আমি তখনও ক্ষিপ্তের মতো হকি স্টিক চালাচ্ছি। কনকনে শীতের অনুভূতি মুহূর্তেই যেন উবে গেছে।

রূপকের নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম। ও শুনতেই পেল না। তখন ঝুঁকে পড়ে ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। কিন্তু ও ঝটকা দিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিল। আবার মাটি খুঁড়তে লাগল।

শকুনগুলো আবার ধেয়ে এসেছে আমাদের কাছে। ঠোঁট নখে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে। ওদের শরীরের বিশ্রী গন্ধে যেন বমি পেয়ে যাবে এখুনি। আমি স্টিক ঘুরিয়ে আবার ওদের হটিয়ে দিলাম। তারপর রূপকের হাত ধরে প্রাণপণে টান মারলাম। ও বাধা দিতে চেষ্টা করল। টের পেলাম, রোগা ছেলেটার শরীরে কী অস্বাভাবিক ক্ষমতা! যেন অলৌকিক কোনও শক্তি ভর করেছে। তবে আমি হাল ছাড়লাম না। ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি চালিয়ে গেলাম পুরোদমে। ওকে ঘিরে থাকা একটা রহস্যময় কুয়াশা আমার এই আক্রমণে অস্থিরভাবে পাক খেতে লাগল। একটা বুনো গন্ধ নাকে আসছিল—আমার চেতনা অবশ করে দিতে চাইছিল যেন। আমি লড়াই করে চললাম—শরীর ও মনের লড়াই।

হঠাৎই কুয়াশাটা কেটে গেল। মনের চাপটাও হালকা হয়ে গেল একইসঙ্গে। দড়ি টানাটানির খেলায় আচমকা কেউ যেন অন্য প্রান্তের মুঠো আলগা করে দিয়েছে।

রূপকের প্রতিরোধ শিথিল হয়ে এল। ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে ছুটতে চেষ্টা করলাম। হকি স্টিক ফেলে রেখে জ্বলন্ত টর্চটা তুলে নিলাম। টর্চের আলোর তেজ কিছুটা কমে এলেও একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি। কোথা থেকে দু-টুকরো ছেঁড়া মেঘ এসে চাঁদকে আড়াল করে দিয়েছে। ফলে ফেরার পথে টর্চের আলো কাজে লাগল। ঘোলাটে অন্ধকারে দ্রুত পা ফেলে আমরা ফিরে চললাম। রূপকের মুখে কোনও কথা নেই। যন্ত্রের মতো আমার পাশে পাশে পা চালিয়ে চলেছে। শকুনগুলোর ডানা ঝাপটানির শব্দ এখন কানে আসছে না বটে, তবে তাদের কর্কশ ডাকের বিক্ষিপ্ত অংশ এখনও শোনা যাচ্ছে।

নিমাইবাবুর বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম তখন শরীর ভীষণ ক্লান্ত। একইসঙ্গে ঠান্ডা লেগে গলা ভারী হয়ে উঠেছে।

রূপকের ঘোর তখনও বোধহয় পুরোপুরি কাটেনি। কারণ, ও জুতো খুলে প্রথমেই গেল কলতলার দিকে। মাটি-মাখা হাত-পা ধুয়ে নিল। তারপর হাত-পা মুছে সটান ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল। জামাকাপড় ছেড়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আমি ঘরের আলো জ্বেলে ওর কিশোর মুখটির দিকে দেখলাম। সরল নিষ্পাপ ঘুমন্ত মুখে বিশ্রী নখের আঁচড়। কয়েক জায়গায় রক্তও ফুটে বেরুচ্ছে। জানি, ওর হাতেও একইরকম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফিরে এসে বাড়িটাকে আগের মতোই নিঝুম অবস্থায় পেয়েছি। কারও ঘুম ভাঙেনি, এমনকী অনন্তও রূপকের খাটে একপাশে ঘুমোচ্ছে। দরজা বন্ধ করে

ওকে নীচু গলায় ডাকলাম। কিন্তু ওর ঘুম ভাঙল না। তখন আলতো করে বারকয়েক ধাক্কা দিলাম। এবারে অনন্ত ধড়মড়িয়ে চোখ কচলে উঠে বসল। আমার দিকে তাকিয়েই ও বলে উঠল, এ কী, মোহনদা, আপনার শাল কোথায়! আর পোশাকেরই বা এই হাল কেন?

অকুস্থল থেকে শালটা ফেরত আনা হয়নি। তা ছাড়া পাখিগুলোর আঁচড়ে পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। সারা পোশাকে ময়লা মাটির দাগ। হাতের দু-এক জায়গায় ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। তবে রক্ত বেরোয়নি।

অনন্তকে বললাম রূপকের মুখটা দেখতে। দেখে ও অবাক হয়ে বলল, সে কী, আজ রাতেও ঠেকানো গেল না!

আমি বললাম, না। তবে রহস্যটা কিছুটা ভেদ করেছি। বাকিটা সমাধান করব কাল সকালে। এখন ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তুমি একটু সরে শোও দেখি। এই খাটেই তিনজনে ভাগাভাগি করে ঘুমিয়ে পড়ি।

জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। খুব শীত করছিল। খাটের পায়ের কাছে বাড়তি কম্বল ছিল। সেটা টেনে নিয়ে গায়ে মুড়ি দিলাম।

যতদূর মনে পড়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

.

গভীর সম্মোহনে রূপককে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের দরজা খুলে দিলাম। বাইরে অনন্ত অপেক্ষা করছিল। ওকে বললাম, বাড়ির সবাইকে আসতে বলল। রহস্যের বাকি সমাধানটুকু সকলের সামনেই হোক।

অনন্ত চটপট চলে গেল সবাইকে ডেকে আনতে। আমি জানি কী ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নিমাইবাবু, কমলাদেবী আর বিনোদ অপেক্ষা করছে। খুব ভোরে নিমাইবাবু আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছেন। তারপর রূপকের অবস্থা দেখে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, ছেলেটাকে তা হলে আর বাঁচাতে পারলাম না, মোহনবাবু!

আমি তাঁকে ভরসা দিয়ে বলেছি, আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি। রূপক ঘুম থেকে উঠুক। কিছু খেয়েদেয়ে নিক। তারপর ওকে আমি কিছুক্ষণের জন্যে

হিপনোটাইজ করব। আমার ধারণা, সম্মোহিত অবস্থায় প্রশ্ন করলেই রূপকের কাছ থেকে সব রহস্যের উত্তর আমরা পেয়ে যাব। আপনাকে শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, ওর গায়ে-মুখে যে-আঁচড়ের দাগ গত পনেরো দিন ধরে দেখেছেন সেগুলো শকুনের নখের আঁচড়।

–শকুনের নখ!

–হ্যাঁ।–গত রাতের সব ঘটনা তখন তাকে খুলে বলেছি।

তারপর প্রাতরাশের পালা শেষ করে আমি রূপককে নিয়ে তৈরি হয়েছি। অনন্তকে বলেছি ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে। গভীর সম্মোহনের সময়ে তৃতীয় কেউ সামনে থাকলে আমার অসুবিধে হয়।

রূপককে গভীর সম্মোহনে ডুবিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ওর ঘুমের ঘোরে কথা বলার অভ্যাস, তা ছাড়া কিছুটা ভুললামনও বটে। এই ধরনের মানুষদের সচেতন জগৎ থেকে অবচেতন জগতে ঠেলে দেওয়া বেশ সহজ। এরাই সম্মোহনের আদর্শ পাত্র।

একটু পরেই সবাইকে সঙ্গে করে অনন্ত এসে ঘরে ঢুকল।

রূপক চোখ বুজে টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে। নিমাইবাবু, তার স্ত্রী ও বিনোদ রূপকের মাথার দিকে গিয়ে দাঁড়াল। অনন্ত রইল আমার পাশে।

আমি নিমাইবাবুকে লক্ষ করে বললাম, সম্মোহনের ঘোরে রূপক এখন ঘুমিয়ে। কিন্তু আমি ওকে যেসব প্রশ্ন করব ও ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার ঠিক-ঠিক উত্তর দিয়ে যাবে। আপনার যা জিগ্যেস করার আমাকে জিগ্যেস করবেন। কারণ আমি ছাড়া আর কারও কথাই রূপক এখন শুনতে পাবে না।

সকলে নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তখন রূপকের শরীরে ঝুঁকে পড়ে আমি আরও বারকয়েক সম্মোহনের ভঙ্গিতে ওর দেহের ওপরে হাত চালালাম। তারপর শুরু হল প্রশ্ন-উত্তরের পালা।

–রূপক, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

ক্লান্ত স্বরে ঘুমন্ত রূপক উত্তর দিল, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

–আমি যা জিগ্যেস করব তুমি তার ঠিক-ঠিক জবাব দেবে। আমি ছাড়া আর কারও আদেশ তুমি এখন মানবে না।

না, মানব না।

–তা হলে বলো, পোড়া জমিদারবাড়ির পাশের জোড়া বটতলায় তুমি রোজ কী করতে যাও?

সকালে বিনোদের কাছেই জেনেছি পাঁচিল-ঘেরা পুরোনো বাড়িটা এককালে জমিদারবাড়ি ছিল।

রূপক বলল, মেসমারের পুঁথি খুঁজতে।

মেসমারের পুঁথি! আমি অবাক হয়ে গেলাম। মেসমার সম্পর্কে এই বালক কতটুকু জানে? ঘরের আর সবাই আমার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি স্পষ্ট স্বরে ঘুমন্ত রূপককে প্রশ্ন করলাম, তুমি ঠিক বলছ, মেসমারের পুঁথি? তুমি জানো মেসমার কে?

সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর পাওয়া গেল, হা, জানি। অস্ট্রিয়ান ডাক্তার ফ্রানৎস্ আন্তন মেসমার। ১৭৩৪ সালে জার্মানিতে জন্ম, মারা গেছেন ১৮১৫ সালে জার্মানিতেই। রুগিদের দেহের ওপরে চুম্বক চালিয়ে রোগ সারাতেন। পরে চুম্বক ছেড়ে শুধু হাত চালিয়েই রোগ সারাতে শুরু করেন। তিনি এটাকে বলতেন অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম। কিন্তু কয়েকজন রুগির রোগ সারাতে গোলমাল হওয়ায় পুলিশের নজরে পড়েন। তখন দেশছাড়া হয়ে চলে যান প্যারিসে। পরে একই কারণে তাকে প্যারিস ছাড়তে হয়। সকলে মেসমারকে প্রতারক, ভণ্ড বলে অভিযুক্ত করে। তার রোগ সারানোর পদ্ধতি নাকি পুরোপুরি ফঁকিবাজি ছিল। কিন্তু মেসমার যে ভণ্ড ছিলেন না তার দু-দুটো উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত, স্কটল্যান্ডের সার্জন জেমস ব্রেইড উনিশ শতকের মাঝামাঝি মেসমারের পদ্ধতিকে উন্নত করে তার নাম দেন হিপনোটিজম গ্রিক শব্দ হিপনোসিস থেকে হিপনোটিজম শব্দটা তিনি তৈরি করেছিলেন। হিপনোসিস-এর অর্থ হল ঘুম। যেমন আমি এখন ঘুমিয়ে রয়েছি। হা, যা বলছিলাম। ফ্রানৎস্ মেসমাসের নাম থেকেই মেসমেরিজম শব্দটা এসেছে যার অর্থ হিপনোটিজম।

পড়া মুখস্থ বলার মতো কথা শেষ করে রূপক থামল। শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

ও থামতেই নিমাইবাবু আমাকে জিগ্যেস করলেন, মোহনবাবু, ও যা যা বলল, সব সত্যি?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, সব সত্যি।

তখন আত্মগতভাবে নিমাই সরকার বললেন, কৃষ্ণনগরের সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক বলেছিলেন, সামবুলিজম, হিপনোটিজম, মেসমেরিজম...।

তারপর আমার চোখে চোখ রেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, মোহনবাবু, সন্নামবুলিজম মানে কী? ওটাও কী হিপনোটিজম?

আমি একটু কেশে বললাম, না। ওর মানে হল, ঘুমিয়ে-চলা। যেমন রোজ রাতে রূপক ঘোরের মধ্যে চলাফেরা করে, জোড়া বটতলায় গিয়ে মাটি খোঁড়ে। আপনার কাছে সব শুনে আমার মনে হয়েছিল রূপক ঘরের মধ্যে আক্রান্ত হতে পারে না। তা হলে কি রাতে ও বাইরে বেরোয়? বেরিয়ে কোনও পশু বা পাখির নখের আঁচড়ে আহত হয়? দেখলাম, আমার সন্দেহই সত্যি হল। সম্মোহনের ঘোরে রূপক রোজ রাতে বেরিয়ে পড়ত বাইরে–ঠিক ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো।

কমলাদেবী হঠাৎ মুখে আঁচল গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলেন। বিনোদ মা-কে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি রূপককে আবার প্রশ্ন করলাম, মেসমারের পুঁথিতে কী আছে?

রূপক বলল, তাতে হিপনোটিজম-এর অনেক বিচিত্র পদ্ধতির কথা লেখা আছে। মেসমারের নিজের হাতে লেখা–জার্মান ভাষায়। মেসমারের সময়ে টাইপরাইটার আবিষ্কার হয়নি, তাই হাতে লেখা। পুঁথিটা খুব দামি। এটার কথা পৃথিবীর মানুষ এখনও জানে না।

–পুঁথিটা জোড়া বটতলায় কোথায় আছে তুমি জানো?

না। জানি না বলেই তো রোজ রাতে খুঁজতে যাই। তবে ওখানে কোথাও আছে নিশ্চয়ই।

রূপকের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ বুঝতে পারলাম না। কেউ কি ওর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছে?

–পুর্থিটা কার?–পরের প্রশ্ন করলাম ওকে লক্ষ্য করে।

আগ্রহে, কৌতূহলে অনন্ত আমার কাছে এগিয়ে এল।

রূপক বলল, ওটা উলফগ্যাং মুলার-এর কাছে ছিল। উনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন জানি না। পরে তার কাছ থেকে কিনেছিলেন হরিশ চক্রবর্তী।

–উলফগ্যাং মুলার কে?

সম্মোহন-বিশারদ। জার্মানি থেকে পালিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। মুলার মেসমারের পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। তাই হরিশ চক্রবর্তীকে তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন।

–আর হরিশ চক্রবর্তী।

তিনিও সম্মোহনশাস্ত্রে পণ্ডিত। মেসমারের পুঁথিটা কেনার পর তার পাঠোদ্ধার করার আগেই সেটা তাঁর বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়।

–কে চুরি করেছিল?

বুড়ো পতিতপাবন। সে হরিশ চক্রবর্তীর বাড়িতে কাজ করত। তাকে অন্য কেউ বোধহয় অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছিল। তাই সে কিছু না বুঝেই পুঁথিটা চুরি করে। হরিশ চক্রবর্তী পতিতপাবনকে সন্দেহ করে জেরা করেন। তারপর তাকে সম্মোহন করে অনেক প্রশ্ন করেন। তাতেই জানা যায় পতিতপাবন পুঁথিটা জোড়া বটতলায় লুকিয়ে রেখেছে।

রূপক সামান্য উশখুশ করছিল দেখে আমি আরও কয়েকবার গভীর মনোযোগে ওর শরীরের ওপরে হাত চালালাম। ও আবার শান্ত হল।

আমি জিগ্যেস করলাম, জোড়া বটতলার কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা পতিতপাবন বলেনি?

–না। তার আগেই সম্মোহিত অবস্থায় সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। তার অনেক বয়েস হয়েছিল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খাটের কাছ থেকে সরে এলাম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে গা ছেড়ে বসে পড়লাম। নিমাইবাবু, কমলাদেবী ও বিনোদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রূপকের কথা শুনছিল। আমাকে চেয়ারে বসে পড়তে দেখে উদগ্রীব স্বরে তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, কী হল, মোহনবাবু!

আমি হেসে বললাম, কিছু না। একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। রূপকের উত্তর শুনে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় কেউ ওকে এসব কথা সবিস্তারে বলেছে, ওকে পাখি-পড়া করে শিখিয়েছে। আর যে শিখিয়েছে, সম্ভবত সেই হিপনোটাইজ করে ওকে দিয়ে পুঁথিটা খোঁজাচ্ছে। রহস্যটা এবারে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে আপনাদের কাছে?

–কিন্তু কে ওকে হিপনোটাইজ করে বারবার রাতের অন্ধকারে মেসমারসাহেবের পুঁথি খুঁজতে পাঠাচ্ছে?–বিনোদ জোরালো গলায় জানতে চাইল। যেন নামটা জানতে পারলেই সে লোকটাকে একহাত দেখে নেবে।

আমি বললাম, সেটা রূপককেই জিগ্যেস করে দেখি।

তারপর চেয়ারে বসেই রূপককে উদ্দেশ করে উঁচু গলায় প্রশ্ন করলাম, তোমাকে কে পুঁথি খুঁজতে পাঠায়?

ও স্পষ্ট গলায় বলল, হরিশ চক্রবর্তী।

আমি ঘরে উপস্থিত সবাইকে জিগ্যেস করলাম এই নামে কাউকে তারা চেনেন কি না। তাতে নিমাইবাবু, কমলাদেবী, বিনোদ সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি নিমাইবাবুকে বললাম, নিমাইবাবু, রাতের ওই ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য আমি রূপককে সম্মোহিত অবস্থায় কতকগুলো আদেশ দিয়ে যাচ্ছি। তাতে কতটুকু বা কতদিন কাজ হবে বলতে পারছি না। বরং সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আপনি এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে পারেন। কারণ, দু-দুটো সম্মোহনের শক্তির লড়াইয়ে রূপকের মনের কোনও ক্ষতি হতে পারে। ওর পড়াশোনাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কমলাদেবী ডুকরে কেঁদে উঠে স্বামীকে বললেন, তুমি কালই এ-পাড়া ছেড়ে চলো।

বিনোদ কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বলল, সেই ভালো, বাবা।

আমি তখন চেয়ার ছেড়ে খাটের কাছে উঠে এলাম। রূপককে বারবার করে নির্দেশ দিলাম, জোড়া বটতলায় আর কখনও যেন সে না যায়। ওকে বোঝালাম, হরিশ চক্রবর্তীর সমস্ত কাহিনি মিথ্যে, পুঁথির কথা মিথ্যে, পতিতপাবনের কাহিনি মিথ্যে, সব মিথ্যে।

রূপক সম্মোহনের ঘোরেই বলল, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। আমি আর জোড়া বটতলায় যাব না, কিছুতেই যাব না।

অনুভব করলাম, হঠাৎই ঘরের মধ্যে বাতাসের চাপ বাড়ছে। রূপকও একটু যেন ছটফট করছে। নাকে আসছে হালকা বুনো গন্ধ। আর কাল রাতের মতোই শুরু হয়ে গেছে দু-দুটো ইচ্ছাশক্তির টানাপোড়েন।

আমি সমস্ত মনোযোগ এক করে রূপককে নির্দেশ দিয়ে চললাম। ওর শরীরের ওপর হাত চালাতে লাগলাম বারবার। নিজের কানেই আমার গলার স্বর কেমন হিসহিসে ভয়ংকর শোনাচ্ছে।

একটু পরেই রূপক ভীষণ ঝিমিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওর কথাগুলো কেমন অস্ফুট শব্দে থেমে-থেমে বেরিয়ে আসছে ঠোঁট চিরে। ঘরের বাতাসের চাপ ধীরে-ধীরে যেন কমে গেল। বুনো গন্ধটা মিলিয়ে গেল। ইচ্ছাশক্তির টানাপোড়েনও আলগা হল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে বুলিয়ে নিলাম। এই শীতেও আমি ঘেমে উঠেছি। মনে-মনে খুব আনন্দ হল। হরিশ চক্রবর্তীর সম্মোহনের জাদুকে হারিয়ে দিতে পেরেছে জাদুকর মোহনকুমার।

কিন্তু একটা কথা ভেবে বেশ খটকা লাগল। হরিশ চক্রবর্তী এখন কোথায় জানি না। তবে দূরে থেকেও সে কিন্তু রূপককে সম্মোহন করতে পেরেছে। এই দূরসম্মোহনবিদ্যা আমার জানা নেই। কখনও এ-বিষয়ে শুনিওনি কিছু। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, হরিশ চক্রবর্তী সম্মোহনবিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষ। কারণ, দূরত্বের ব্যবধান পেরিয়ে তার সম্মোহন অচেতন করে দিতে পারে কোনও সচেতন

মানুষকে। এমনকী আমার মনের ওপরেও চাপ সৃষ্টি করেছিল দূর থেকে। কিন্তু এখন কোথায় সে? কত দূরে আছে?

সেকথাই জিগ্যেস করলাম রূপককে। ও ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, জানি না। অনেক দূরে...।

একটু থেমে আবার বলল, আগে তো এই ঘরেই থাকতেন। রোজ রাতে বেরিয়ে জোড়া বটতলায় যেতেন পুঁথি খুঁজতে। একদিন...এক ঝড়বৃষ্টির রাতে বটতলা থেকে হাতে-পায়ে কাদামাটি মেখে বাড়ি ফেরার সময়ে তার মাথায় বাজ পড়ে। তারপর থেকে উনি কোথায় গেছেন জানি না। অনেক দূরে...জানি না...সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা...জানি না...অনেক দূরে...।

শীতের বাতাস ঘুরপাক খেয়ে গেল ঘরের ভেতরে। কমলাদেবী ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। বিনোদ হাঁ করে ছোটভাইকে দেখছিল। আর নিমাইবাবু পাথর।

রূপকের শেষ কথাগুলো ফিশফিশে প্রতিধ্বনি হয়ে ঘরের মধ্যে ভাসছিল। জানলার বাইরে দিনের আলো যেন কমজোরি হয়ে গেল সহসা। একটা শকুনের আর্ত চিৎকার শোনা গেল দূর থেকে।

আমি অনন্তর দিকে ফিরে বললাম, অনন্ত, কাজ শেষ। এবারে তৈরি হয়ে নাও। রূপকের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েই আমরা কৃষ্ণনগরে রওনা হব।

আমি নিমাইবাবুকে বললাম, এ-বাড়িতে একটা দিনও থাকবেন না। প্রেতের সম্মোহনের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমার নেই। আজ না হয় কাল আমাকে হারতেই হবে। শেষ পর্যন্ত অলৌকিক সম্মোহন জিতবেই।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি ধীরে-ধীরে রূপকের ঘুম ভাঙালাম। সম্মোহিত অবস্থায় সব কথা যেন ও ভুলে যায় সেরকমই নির্দেশ দিয়েছিলাম। ফলে ঘুম ভেঙে আমাকে দেখেই রূপক বলল, কী মোহনদা, ম্যাজিক হয়ে গেল! কই, দেখাও! আর সেই পয়সার ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেবে বলেছিলে–।

আমি ওকে শুয়ে থাকতে বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় নিমাইবাবু শেষ পর্যন্ত আমাকে পাজামা-পাঞ্জাবি ও একটা কাশ্মীরী শাল উপহার দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের ট্রেনে তুলে দিতে এসে

দু-হাত ধরে বারবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

ওই ঘটনার পর বহুদিন কেটে গেছে, কিন্তু আজও আমি হরিশ চক্রবর্তীর কথা ভুলিনি। ভুলিনি মেসমারের পুঁথির কথা। বিশ্বাস হতে চায় না, আবার অবিশ্বাস করি এমন মনের জোরও আমার নেই।

# চুনিলালবাবুর লাল চুনি

**চুনিলালবাবুর লাল চুনি**

গুপ্তাসাব, ব্যাপারটা ঠিক খুন নয়–তবে অনেকটা খুনের মতো।

গাড়ির জানলার বাইরে চোখ রেখে বিকেলের কলকাতা দেখতে-দেখতে কথাটা বলল ইনস্পেক্টর রঘুপতি যাদব।

ক্যাডবেরি রঙের মারুতি আটশো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ছুঁয়ে এগোচ্ছিল বাগবাজারের দিকে। গাড়ির পিছনের সিটে উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিল রঘুপতি। ওর পাশেই বসে অধ্যাপক ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে এসিজি। তার সরু-সরু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত ডানহিল সিগারেট।

এমনিতে এসিজির প্রিয় উইলস ফিলটার। কিন্তু রঘুপতি কোথা থেকে যেন এক কার্টন ডানহিল জোগাড় করে এসিজিকে উপহার দিয়েছে একটু আগেই। আর সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে একটা সমস্যা–যেটা ঠিক খুন নয়, খুনের মতো।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রাক্তন ছাত্র রঘুপতিকে দেখছিলেন এসিজি।

ছোট করে ছাঁটা চুল, কাঁচা-পাকা চওড়া গোঁফ, ফরসা মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। হাতের শিরা এবং পেশি দুশমনদের সাবধান করে দেওয়ার মতো। আর চোয়ালের উদ্ধত রেখা সেখানে জুড়ে দিয়েছে একটা বেপরোয়া ভাব। এ ছাড়াও একটা কিলার ইন্সটিংক্ট যেন আবছাভাবে খুঁজে পাচ্ছিলেন এসিজি।

ছাত্রজীবনের রঘুপতির সঙ্গে আজকের কাজপাগল ইন্সপেক্টর রঘুপতি যাদবের কতটা অমিল, সেটাই ভাবছিলেন ওর প্রাক্তন স্যার অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

এ ছাড়া, স্যার, ব্যাপারটার মধ্যে পাখিও আছে– এসিজির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল রঘুপতি, আপকা ফেবারিটপছি। অওর উসকে সাথ এক রুবি কি কাহানি।

মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে তুললেন অশোকচন্দ্র ও রুবির কাহিনি? তার মানে?

রুবি–যাকে বাংলায় আপনারা চুনি বলেন। জেমস্টোন। খুব কলি।

ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন এসিজি। বললেন, তোমার টেনশান কমাও রঘুপতি। তখন থেকে যেরকম খাপছাড়াভাবে ইনফরমেশানের টুকরো ছড়িয়ে চলেছ, তাতে আমার মতো থিঙ্কিং মেশিনেরও মস্তক ঘূর্ণিত। তোমাকে তো বহুবার বলেছি, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাউ কাম অন, বেশ রয়েসয়ে গুছিয়ে গল্পটা বলো আমাকে।

একটু আহত হয়ে রঘুপতি বলল, বলছি গুপ্তাসাব, কিন্তু ঘূর্ণিত মানে কী?

হো-হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ হুনুর। ছোট হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, সে তোমাকে পরে বলে দেব। এখন শুরু করো তোমার রুবিকি কাহানি

ওঁদের গাড়ি তখন বাগবাজারে বাটার দোকানের কাছে বাঁ-দিকে বাঁক নিচ্ছে।

রঘুপতি যাদব একটু গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করল। ওর ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সামান্য ছোট হয়ে এল।

ওর পাশে বসা খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা বৃদ্ধ মানুষটি তখন আনমনাভাবে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছেন, আর বাগবাজার বাটার মোড়ে পুজোর কেনাকাটার ভিড় দেখছেন। কিন্তু তার কান ও মস্তিষ্কের মনোযোগ পুরোপুরি রঘুপতির দিকে। রঘুপতির কাছ থেকে সংক্ষেপে যা জানা গেল, তা হল এই

বাড়িটার নাম লালমহল। বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি দুমহলা পুরোনো বাড়ি। বাড়ির দালানে বিশাল বিশাল ডোরাকাটা থাম। থামের মাথায় কার্নিশের খাঁজে গোলা পায়রার বাস। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এখনও ছোট মাপের দুর্গাপুজো হয়।

বাড়িটার রং লাল। অন্তত এককালে তাই ছিল। কালের প্রকোপে সেই লাল কোথাও গোলাপি, কোথাও বা বর্ণহীন হয়ে পড়েছে। বাড়ির সদর দরজায় রং-চটা শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা রায়বাহাদুর রবীন্দ্রলাল গোস্বামী।

রবীন্দ্রলাল অন্তত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে ইহলোক ছেড়েছেন। তবে তাঁর চার ছেলে এখনও বহাল তবিয়তে লালমহল-এ বাস করেন।

বড় ছেলে শ্যামসুন্দরলাল গতকাল মারা গেছেন। তিনি সবসময় পাখি নিয়ে মেতে থাকেন– মানে, থাকতেন। বাড়ির অনেকটা অংশ খাঁচায়-খাঁচায় ছয়লাপ।

মেজো ছেলে চুনিলাল মণিরত্নের ব্যবসা করেন। দেবদেবীভক্ত ধর্মভীরু মানুষ। অন্য ভাইদের মতো সংসার-ধর্ম করেননি।

সেজ রঙ্গলাল হিসেব মতো বেকার। তবে শোনা গেছে তিনি নাকি টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ করেন।

আর সকলের ছোট গজেন্দ্রলাল এখনও ঠিক কোনও ব্যবসায় থিতু হয়ে বসতে পারেননি।

ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল, দুপুর দুটো নাগাদ।

শ্যামসুন্দরলালের কাছে একটা ফোন এসেছিল। কে ফোন করেছিল সেটা জানা যায়নি। টেলিফোনে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে বলতেই তিনি আচমকা হার্টফেল করে মারা যান।

তার চিৎকারে বাড়ির অনেকে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

ব্যাপারটার এমনিতে কোনও জটিলতা ছিল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। তা ছাড়া শ্যামসুন্দরলালের বয়েসও হয়েছিল প্রায় বাষট্টি।

কিন্তু গোলমাল বাঁধালেন চুনিলালবাবু। তিনি বললেন যে, প্রায় দু-লাখ টাকা দামের একটা টকটকে লাল চুনি তিনি তাঁর বড়দার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন।

সেটার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্যই গুপ্তাবকে জরুরি তলব করেছে রঘুপতি। খুঁজে বের করতে হবে চুনিবাবুর চুনি।

রঘুপতির কথা শেষ হতে-না-হতেই এসিজি প্রশ্ন করলেন, শ্যামসুন্দরলালের মারা যাওয়ার ব্যাপারটাকে তুমি খুনের মতো বলছ কেন?

বলছি কি আর সাধে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রঘুপতি। তারপর বলল, ওই হতচ্ছাড়া জেবরাতের জন্যে কদিন ধরেই কোন এক আদমি শ্যামসুন্দরবাবুকে থ্রেট করছিল। তাতে উনি ভয়ও পেয়েছিলেন, আবার খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, উনি এভাবে মারা না গেলে হয়তো ওই আন্নোন পারসনের হাতে খুন হয়ে যেতেন…।

এসিজি এক ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলেন আবার। চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, সেই লোকটা কেমন করে জানল যে, চুনিটা শ্যামসুন্দরলালবাবুর কাছে আছে?

ঠোঁট উলটে রঘুপতি বলল, কে জানে! হয়তো কারও কাছ থেকে ইনফরমেশান পেয়েছে।

যখন শ্যামসুন্দর মারা যান তখন চুনিলাল কোথায় ছিলেন?

বাড়িতেই। কথাটা বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রঘুপতি কী যেন দেখল। তারপর বলল, স্যার, আমরা লালমহলে এসে গেছি।

বাড়ির সামনে ভাঙাচোরা ট্রাম-রাস্তা। কোথাও কোথাও জল জমে আছে। বাড়ির উলটোদিকে দুটো বিশাল মাপের গোডাউন। তার পিছনেই বোধহয় গঙ্গা।

ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলে রঘুপতি এসিজিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, আইয়ে স্যার,–ওয়েলকাম টু লালমহল।

এসিজি প্রাক্তন ছাত্রের ভঙ্গি দেখে সামান্য হাসলেন। তারপর মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, চলো, দেখা যাক তোমার চুনিলালবাবুর চুনি উদ্ধার করা যায় কি না।

কলিংবেল টিপতেই বাড়ির দরজায় একজন বয়স্ক পুরুষ এসে হাজির হলেন। দেখে বনেদি বাড়ির পুরাতন ভৃত্য বলেই মনে হল। রঘুপতি নিজের পরিচয় দিতেই দ্রুত আদর-আপ্যায়ন শুরু হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে রঘুপতি যাদব নীচু গলায় বলল, ব্যাপারটা লালবাজার পর্যন্ত গড়াত না। তবে চুনিলালবাবুর থোড়াবহত আপার লেভেল কানেকশা আছে। সেইজন্যেই..।

কথা বলতে বলতে ওঁরা চৌকো মাপের বিশাল ঠাকুর-দালানে এসে পড়েছিলেন। তার একপাশে চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। এখন শুধু শেষ তুলির টান আর সাজসজ্জা বাকি।

হঠাৎই ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামলা রঙের একজন ভদ্রলোক। তার ডান হাতের তিন আঙুলে রুপো দিয়ে বাঁধানো তিনটে পাথরের আংটি। প্রকট হেসে তিনি বললেন, আগমনের খবর পেয়েছি । তাই রিসিভ করতে এসেছি। অধমের নাম রঙ্গলাল / চুনিটা বেপাত্তা হয়েছে। গতকাল।

এসিজি অবাক হয়ে লালমহলের রঙ্গলালবাবুকে দেখছিলেন।

পরনে ফতুয়া গোছের পাঞ্জাবি আর ধুতি। মাথার মাঝখানে সিঁথি। তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুল। ছোট-ছোট চোখ। কপালের বাঁ-দিকে একটা ছোট আঁচিল। নাকটা সামান্য বড় মাপের। দাড়ি গোঁফ কামানো। মুখে প্রসাধনের সুবাস। আর সদাসঙ্গী আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

শ্যামসুন্দরলালবাবু কোন ঘরে মারা গিয়েছিলেন? রঘুপতি জানতে চাইল।

রঙ্গলাল অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে বললেন, দোতলায় পাখি ঘরে / ওই ঘরটার ঠিক ওপরে– আঙুল তুলে দূরের কোণে একটা ঘর দেখালেন তিনি।

এসিজি যে কথাটা মনে-মনে ভাবছিলেন সেটাই মুখে প্রকাশ করলেন, আপনি কি সবসময় ছড়া কেটে কথা বলেন?

রঙ্গলালবাবু মাথা সামান্য নীচু করে বললেন, আমি একজন স্বভাবকবি । কবিতায় কথা বলা আমার হবি।

রঘুপতি যে এই উত্তর শুনে ঠোঁট টিপে হাসল সেটা বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখ এড়াল না।

পুজো এবার দেরিতে। তাই রোদ্দুর পড়ে আসছে তাড়াতাড়ি। উঠোন থেকেও রোদ সরে যাচ্ছে পুবের দিকে।

মাথার ওপরে কয়েকটা পায়রা ঝটপট করছিল। শানবাঁধানো উঠোনে নানা জায়গায় ওদের অপকীর্তির ছাপ।

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে এগোলেন দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। তখনই কোথা থেকে ছুটে এল বছর ন-দশের একটা ছোট্ট মেয়ে। হাঁফাতে-হাঁফাতে রঙ্গলালবাবুকে লক্ষ্য করে বলল, জেঠু, মেজো-জেঠু বলেছে ওঁদের পাখিঘরে নিয়ে বসাতে।

কথাটা বলেই মেয়েটা ছুট্টে চলে গেল।

রঙ্গলালবাবু বললেন, গজেন্দ্রর ছোট মেয়ে। সবসময়

–চলে ধেয়ে। পাদপূরণ করে হেসে উঠলেন এসিজি।

পুরোনো আমলের শানবাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। পালিশ করা মেহগনি কাঠের রেলিং। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর দেওয়ালে এক অভিজাত পুরুষের তৈলচিত্র। গিল্ট ফ্রেমে বাঁধানো। কে জানে ইনিই হয়তো স্বর্গীয় রবীন্দ্রলাল গোস্বামী।

এসিজি আর রঘুপতি রঙ্গলালকে অনুসরণ করে উঠছিলেন। রঘুপতি চাপা গলায় ওর প্রাক্তন স্যারকে বলল, অজীব ব্যাপার, গুপ্তাসাব। যাঁর নাম চুনিলাল তিনি চুনি, মানে হিরে-জহরতের বেওসা করেন। যার নাম রঙ্গলাল তিনি সবসময় মজাক করে কথা বলেন। তবে যিনি মারা গেছেন…।

রঘুপতি কথায় বাধা দিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বললেন, শ্যামসুন্দরলাল গোস্বামীর নামটা প্রথম থেকেই আমার পিকিউলিয়ার লাগছিল। এরকম নাম কখনও শুনিনি। তবে শ্যামসুন্দর নামে একরকম মুনিয়া পাখি পশ্চিম বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের বাগানে এদের বাসা আমি দেখেছি। মাপে চড়ুই পাখির মতো। মাথা কালো, বুক সাদা, বাকি গাঢ় বাদামি রঙের। ইংরেজি নাম ব্ল্যাক হেডেড মুনিয়া,আর ল্যাটিন নাম লোনচুয়া মলাক্কা। সুতরাং শ্যামসুন্দরলালবাবুর শখটাও তার নামের সঙ্গে মিল রেখে।

তা হলে বাকি রইলেন গজেন্দ্রলালবাবু। তিনি কি হাতির ব্যবসা করেন, নাকি হাতির খোঁজখবর রাখা তার শখ?

সামান্য মজা করে বলা রঘুপতি যাদবের কথাটা বোধহয় রঙ্গলালবাবুর কানে গিয়ে থাকবে। কারণ, হঠাৎই তিন-চার ধাপ ওপর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বলে উঠলেন, হস্তী নয়– হস্তীদন্ত / গজেন্দ্রর পয়মন্ত।

এসিজি আর রঘুপতি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। গজেন্দ্রলাল তা হলে হাতির দাঁতের ব্যবসা করেন!

গতকালই একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে এ-বাড়িতে। অথচ রঙ্গলালকে দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না তেমন কোনও আঘাত পেয়েছেন। তবে বাড়িটাকে কেমন যেন বেশিরকম চুপচাপ মনে হল। শুধু পায়রার বকবকম ওঁদের কানে আসছিল।

এসিজির সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। দোতলায় পাখিঘরে পৌঁছেই তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন। ঘরটাকে একপলক দেখার পর তিনি যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সেটা রঘুপতি যাদব স্পষ্ট বুঝতে পারল।

কারণ, পাখিঘরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য পাখির স্টাফ করা মডেল। নানান মাপের রংবেরঙের পাখি। কিন্তু ওরা সকলেই স্থির, চুপচাপ।

পাখিঘরটাকে ঘর না বলে হলঘর বলাই ভালো। ঘরের মাপ অন্তত বিশ-তিরিশ ফুট। ঘরের মেঝেতে সাদা কালো মার্বেল পাথরের নকশা। সেই নকশায় সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি। এখনও দিব্যি ঝকঝকে তকতকে।

চুনিলালবাবু একটা আরামকেদারায় চিন্তিত মুখে বসেছিলেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ লাল।

ওঁদের ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সংক্ষেপে পরিচয়ের পালা শেষ করে বললেন, কিছু মনে করবেন না, ইনস্পেক্টর যাদব। সরাসরি কাজের কথায় আসি। অশৌচ অবস্থায় কী বিশ্রী ঝাটে পড়লুম বলুন তো! একটু থেমে কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঘুপতি যাদবকে বসতে বললেন, বসুন, আপনারা বসুন। আপনারা আসছেন শুনে ছোটভাইকে বাইরে কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি আপনাদের জন্যে ওয়েট করছি।

এমন সময় ছোট্ট মেয়েটা এক দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকল। রঙ্গলালবাবুর কাছে গিয়ে বলল, বসন্তদা চা নিয়ে আসছে। মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

কথাটা শেষ করেই মেয়েটা বেণী দুলিয়ে আবার দে ছুট।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চা-মিষ্টি ইত্যাদি ট্রে-তে সাজিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মাঝবয়েসি একজন লোক। শ্বেতপাথরের তৈরি একটা গোল টেবিলে কাপ-প্লেটগুলো নামিয়ে রাখতেই রঙ্গলালবাবু সেগুলো সবিনয়ে এগিয়ে দিলেন রঘুপতি ও অশোকচন্দ্রের দিকে।

চুনিলালবাবুর পরনে হাফহাতা সাদা শার্ট আর পাজামা। গলায় সরু সোনার চেন। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। জুলপির কাছটায় চুলে দিব্যি পাক ধরেছে। ভুরু লোমশ। দুই ভুরুর মাঝখানে চিরস্থায়ী বিরক্তির ভাব।

এসিজি ঘরটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলেন।

ঘরের আসবাবপত্র যা কিছু সবই ব্রিটিশ আমলের। একপাশে বড় মাপের চেয়ার-টেবিল। চেয়ারে ফুলকাটা তাকিয়া বসানো। আর টেবিলে গাদা-গুচ্ছের বই আর কাগজপত্র। সেইসঙ্গে রয়েছে। পেন-পেনসিল, আতসকাচ, পেতলের পেপারওয়েট আর কয়েকটা পাখির পালক। টেবিলের বাঁ-দিকে রাখা কর্ডলেস টেলিফোন।

দেখে বোঝাই যায়, এটা ছিল শ্যামসুন্দরলালের পড়াশোনার ঘর।

ঘরটার তিনদিকের দেওয়ালে বড়-বড় মাপের দেওয়াল আলমারি। তাতে ঠাসা রাজ্যের বই। এসিজির নজরে পড়ল সেখানে সালিম আলি ও ডিলন রিপলির কয়েক খণ্ডে লেখা ভারত ও পাকিস্তানের যাবতীয় পাখির হাত-বই পরপর সাজানো রয়েছে।

ঘরের সিলিং-এ ঝুলছে দুটো চার ব্লেডের পাখা। দেখে বোঝা যায়, ব্লেডগুলো কাঠের তৈরি। আর ঘরের দু-দিকের দেওয়ালে ডিজাইন করা শৌখিন পেতলের ব্র্যাকেটে ঝুলছে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় চুনিলালবাবু সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দিলেন। তারপর রঘুপতির কাছে এসে বললেন, আমার দাদা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ওঁর

হার্টের প্রবলেম ছিল ঠিকই, কিন্তু হয়তো আরও কয়েক বছর বাঁচতেন। আমার জন্যেই অকালে বড়দার প্রাণটা গেল। বউদির দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। অথচ আমারও উপায় নেই। চুনিটা খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাকেও হয়তো গুপ্তঘাতকের হাতে মরতে হবে। তাই শোক তাকে তুলে রেখে পাগলের মতো চুনি খুঁজতে বসেছি...।

চুনিলালবাবু থামতেই রঘুপতি তাকাল অশোকচন্দ্রের দিকে।

বৃদ্ধ তখন চোখ বুজে সিগারেটে জম্পেশ টান দিচ্ছেন।

রঘুপতি বলল, গুপ্তাব, আমার সঙ্গে চুনিবাবুরই টেলিফোনে কথা হয়েছিল। আপনি এঁকে কী জিগ্যেস করবেন করুন।

এসিজি চোখ খুলে পাখির মেলার দিকে তাকালেন। কম করেও একশো পাখি সাজানো রয়েছে ঘরের ডানদিকটায়। তার সবই পশ্চিমবাংলার পাখি। ছোট মাছরাঙা, বাঁশপাতি, টুনটুনি, চন্দনা, দোয়েল, কাদাখোঁচা, শ্যামা, ময়না, নীলকণ্ঠ, চাক দোয়েল, বেনেবউ, এমনকী একটা মোহনচূড়াও রয়েছে। পাখিগুলোর পায়ের কাছে সাদা কার্ডে ওদের পরিচয় লেখা–ঠিক যেমনটি জাদুঘরে থাকে।

এসিজি মাথার চুলে টান মেরে জানতে চাইলেন, ট্যাক্সিডার্মি করা এই পাখিগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে?

চুনিলালবাবু বললেন, দাদার খেয়াল। বেশিরভাগই কেনা। তবে কয়েকটা বোধহয় নিজে অর্ডার দিয়ে করিয়েছেন।

চুনির ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটু খোলসা করে বলুন।

চুনিলালবাবু ওঁদের কাছাকাছি একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ উশখুশ করে তার পর বললেন, আমি মণিরত্নের ব্যবসা করি। মানে দামি পাথর কেনা-বেচা করি। নিজে পাথর কাটিংও করি, পালিশও করি। তবে সেরকম এক্সপার্ট নই। ছাদের দক্ষিণ দিকের একটা ছোট ঘরে আমার কাটিং মেশিন আর গ্রাইন্ডিং মেশিন আছে।

সে যাই হোক, পাথরের কাজকারবারে আমাকে প্রায় রোজই বটতলা আর মেছুয়ায় যেতে। হয়। সেখানে মহাজনদের কাছ থেকে দরকার মতো মাল নিয়ে

আসি। তত দিনসাতেক আগে মেছুয়াতে এক মহাজনের ঘরে আমি একটা বার্মিজ রুবি পেয়ে যাই। চুনিটার রং ঠিক পায়রার রক্তের মতো গাঢ় লাল। আর একেবারে বেদাগ।

আমি সেখানে গিয়েছিলাম খড় কিনতে।

খড় মানে? চুনিলালকে বাধা দিয়ে জানতে চেয়েছেন এসিজি।

খড় মানে একেবারে র পাথর—যেটা দেখে দামি পাথর বলে একেবারেই বোঝা যায় না। সেগুলো অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করে ঠিকমতো কেটে পালিশ-টালিশ করতে পারলে অনেকগুলো দামি পাথর পাওয়া যেতে পারে। এর আগে বেশ কয়েকবার খড় কিনে আমি ভালো প্রফিট করেছি।

তারপর কী হল? অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল রঘুপতি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার একজন কোটিপতি কাস্টমার বার্মিজ চুনির কথা বলে রেখেছিল। এই চুনিটার হদিস পেতেই আমার মনটা নেচে উঠল। এটা তাকে বেচতে পারলে অন্তত থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট করা যাবে।

সেই কাস্টমারের নাম কী? রঘুপতি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

চুনিলালবাবু অবাক চোখে তাকালেন রঘুপতির দিকে ও মাফ করবেন, ইনস্পেক্টর যাদব। কাস্টমারের নাম বলতে পারব না—ট্রেড সিক্রেট।

মাথার সাদা চুলের গোছায় হাত চালিয়ে এসিজি জিগ্যেস করলেন, পাথরটার সাইজ কীরকম ছিল?

চুনিলাল গোস্বামী ব্যবসায়ীর ঢঙে বললেন, প্রায় সাড়ে ন রতি। মানে, পৌনে নক্যারাট এর কাছাকাছি।

ক্যারাট-এর হিসেব কেমন জট পাকিয়ে যায়, হেসে বললেন এসিজি, এক ক্যারাট মানে কত গ্রাম?

দুশো মিলিগ্রাম। এই পাথরটার ওজন প্রায় পৌনে দু-গ্রাম মতো ছিল। আর বেশ লম্বাটে।

ফির কেয়া হুয়া? রঘুপতির ধৈর্যে যে ভালোরকম টান পড়েছে সেটা তার প্রশ্নের ঢঙেই বোঝা গেল।

চুনিলাল কী যেন চিন্তা করছিলেন। রঘুপতির প্রশ্নে চমকে উঠে বললেন, পাথরটা আমি চেনা মহাজনের কাছ থেকে দু-সপ্তাহের ধারে নিয়ে আসি। কিন্তু ওটা নিয়ে আসার পরদিন থেকেই কেউ আমাকে টেলিফোন করে হুমকি দিতে থাকে। বলে যে, পাথরটা যেন আমি কাউকে বিক্রি না করে সোজা আবার মহাজনের কাছে ফেরত দিয়ে আসি।

মিস্টার গুপ্ত, আমাদের হিরে-জহরতের লাইনে উড়ো টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার ব্যাপারটা নেহাতই মামুলি। তাই আমি প্রথম-প্রথম ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু দিনতিনেক যেতে-না-যেতেই হুমকির ব্যাপারটা সিরিয়াস চেহারা নিতে থাকে। মার্কেট থেকে কানাঘুষো খবর পেলাম, এতবড় বার্মিজ চুনি বাজারে বহুদিন আসেনি। তাই হিসেব-ছাড়া দাম দিয়ে কেনার মতো দু-তিনজন কাস্টমার নাকি ওটার জন্যে হন্যে হয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের এজেন্টরা নাকি মারাত্মকরকম ডেঞ্জারাস।

তখন আমি... একটু থেমে চুনিলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তখন আমি ব্যাপারটা বড়দাকে খুলে বলি। বড়দা ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে একরকম পুত্র-স্নেহে ছোট-ছোট ভাইদের মানুষ করেছেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সজাগ হয়ে দেখাশোনা করেছেন। আমাদের সবরকম বিপদ-আপদ থেকে আগলে-আগলে রেখেছেন– চুনিলালবাবুর চোখে জল এসে গেল। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, বড়দা চলে গিয়ে আমাদের মাথার ওপর থেকে বটগাছের ছায়া সরে গেল। আমার বিপদের কথা শুনে বড়দা আমাকে বললেন, তোর কোনও চিন্তা নেই। তুই চুনিটা আমার কাছে দে, আমি ওটা রেখে দেব। তারপর দেখি, কে ওটা আমার কাছ থেকে নিতে পারে!

আমি সেইমতো বড়দাকে পাথরটা দিয়ে দিই পরশুর আগের দিন–মানে, শুক্রবার। কিন্তু আশ্চর্য, তার পরদিন থেকেই সেই নাম-না-জানা লোকটা বড়দাকে যা-তা বলে শাসাতে থাকে।

দাদার একটাই দোষ ছিল–অল্পেতেই ভীষণ রেগে যেতেন। এই করে করেই হার্টের ট্রা বাধিয়েছিলেন। আগে দুবার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। তাই দাদা যখন

লোকটার সঙ্গে টেলিফোনে চিৎকার করে কথা বলতেন তখন আমার ভয় করত। পরশু রাতেই আমি ঠিক করি, ঢের হয়েছে, চুনি বেচে প্রফিটে কাজ নেই। ওটা মহাজনকে ফেরতই দিয়ে দেব। কিন্তু দাদাকে সে কথা বলতেই তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। ফলে আমি গৃহশান্তির কথা ভেবে চুপ করে যাই।

তারপর…তারপর..কাল দুপুরে, ওই লোকটা আবার টেলিফোন করে। দাদা সেসময়ে এই ঘরে ওই চেয়ারটায় বসেছিলেন। দাদার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আমি পাখিঘরে ছুটে আসি। দাদা তখন টেলিফোনে বলছেন, আমি থাকতে কেউ চুনির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারবে না। আমাকে ভয় দেখানো অত সহজ নয়…।

আমি দাদাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কারণ, দাদার তখন চোখ-মুখ লাল, বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন। ভয় হচ্ছিল, খারাপ কিছু না একটা হয়ে যায়…।

চুনিলালবাবু একটু থামতেই এতক্ষণ নীরবে সাক্ষী হয়ে বসে থাকা রঙ্গলাল বললেন, সেই মুহূর্তে আমিও ছুটে আসি । গজেনকেও পেলাম পাশাপাশি–

চুনিলালবাবু বিরক্ত হয়ে তাকালেন ছোট ভাইয়ের দিকে : আঃ, রঙ্গ কী হচ্ছে! পদ্য নিয়ে পাগলামির একটা লিমিট থাকা দরকার। এখন কি একটু স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যায় না!

রঙ্গলালের মুখে আহত ভাব ফুটে উঠল। তিনি মিনমিন করে স্বগতোক্তির মতো বললেন, লিমিট থাকলে সেটা কখনও কবিতা হয় নাকি! কবিতার নামে সেটা তখন হয়ে যায় ফকি…।

আবারও ছন্দ!

দোহাই, তোর স্বভাবকবিতা এবার বন্ধ কর। চুনিলালবাবু যে বেশ রেগে গেছেন সেটা তার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল।

একটু সময় নিয়ে তারপর তিনি খবর পড়ার মতো নিরুত্তাপ গলায় বললেন, তারপর আমাদের তিন ভাইয়ের চোখের সামনেই বুক খামচে বড়দা টেবিলে কাত হয়ে পড়েন। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই তিনি টেবিলে পড়েছিলেন বলে সেরকম আঘাত পাননি। কিন্তু বুকের কষ্টটা নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক হচ্ছিল। কারণ, তিনি

বুকের কাছে হাত ঘষছিলেন বারবার। আর যন্ত্রণার টুকরো টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছিল তার মুখ দিয়ে।

আমি গজেনকে পাঠালাম পাড়ারই এক ডাক্তারকে তক্ষুনি ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, বড়দার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীর প্রায় স্থির। মুখ থেকে একটানা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

বড়দা আমাকে বলেছিলেন, চুনিটা তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন যে, কেউ ওটা খুঁজে পাবে না। সে কথা আমার মনে ছিল। তাই ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছি, বড়দা, চুনিটা কোথায় রেখেছ?

উত্তরে বড়দা গোঙানির মতো শব্দ করে দুবার বললেন, পেলি না গো, পেলি না গো– তারপরই সব শেষ।

কাল দুপুর থেকে আমরা দাদার সৎকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর কাল সারা রাত ধরে আমি চুনিটার খোঁজ করেছি। বউদি ওই শোকের মধ্যেই দারুণভাবে সাহায্য করেছেন। আমাকে হয়তো সবাই অমানুষ ভাবছে, মিস্টার গুপ্ত, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বুঝুন! একে ওই হুমকি। তার ওপর চুনিটার দাম প্রায় পৌনে দু-লাখ টাকা। মহাজনকে যে এক কথায় দাম দিয়ে দেব তারও উপায় নেই। তাই মরিয়া হয়ে লোকজন ধরে লালবাজারে খবর দিয়েছি।

রঘুপতি জিগ্যেস করল, আপনারা সব জায়গা খুঁজে দেখেছেন? সিন্দুক-টিন্দুক, ব্যাঙ্কের লকার–সব?

চুনিলালবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, আজ সকালেই বউদিকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়েছিলাম। লকারে ওটা নেই।

অশোকচন্দ্র গুপ্ত ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে চলে গিয়েছিলেন পাখির ঝাঁকের কাছে। রংবেরঙের পাখিগুলো দেখতে-দেখতে কল্পনায় যেন ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। ঘাড়ের কাছে সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার।

তারপর দূর থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন চুনিলালবাবুর দিকে ও কোনও জায়গায় খুঁজতে বাকি রাখেননি? সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন?

চুনিলালবাবু বিষণ্ন হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, প্রাণের দায়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। যে করে হোক চুনিটা মহাজনকে ফেরত দিয়ে আমাকে আগে প্রাণে বাঁচতে হবে।

পাখিগুলো ভীষণ আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন এসিজি। আর একইসঙ্গে কী যেন ভাবছিলেন।

নীচের তলা থেকে একটা বাচ্চার কান্না ভেসে এল। সেই সঙ্গে কোনও মহিলার বকাবকির শব্দ।

রঙ্গলালবাবুও বোধহয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন, মেজদা, এমনও তো হতে পারে, বড়দা মারা যাওয়ার সময় চুনিটা কোথায় আছে সেটা বলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন…।

বোঝা গেল, মেজদার ধমকে স্বভাবকবি তাঁর কাব্য প্র্যাকটিস আপাতত মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু রঙ্গলালবাবুর কথায় ঝটিতি ঘুরে তাকালেন থিঙ্কিং মেশিন অশোকচন্দ্র গুপ্ত। দু-ভাইয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, শেষ কথাটা আপনারা ঠিক শুনেছিলেন?

চুনিলাল ইতস্তত করে বললেন, আমার তো পেলি না গো বলেই মনে হয়েছিল। গোঙানির মধ্যে স্পষ্ট করে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, তুই কী শুনেছিস, রঙ্গ?

একটু আমতা-আমতা করে রঙ্গলাল বললেন, আমার..আমার যেন গেলি না গো বলে মনে হয়েছিল…।

এর তো বাংলাটাও গণ্ডগোলের। এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, বাক্যের প্রথমটা তুই সম্বোধনে, আর শেষটা তুমি..কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে…।

রঘুপতি যাদব বেশ চিন্তিতভাবে রঙ্গলালকে বলল, আপনি ওই শেষ কথাটা একবার আপনার বড়দার মতো করে বলে শোনাতে পারেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয় । এতে কোনও শক্ত কাজ নয়। মেজদার দিকে একপলক তাকিয়ে রঙ্গলাল সোজা গিয়ে শ্যামসুন্দরলালবাবুর চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, গেলি না গো, গেলি না গো!

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান হয়ে গেলেন এসিজি। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

ঘরের সকলেই তো এসিজির কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক।

রঘুপতি অবাক সুরে বলল, স্যার, কেয়া বাত হ্যায়? কোই চুটকুলা ইয়াদ আয়া?

কোনওরকমে হাসি থামিয়ে এসিজি বললেন, চুটকুলা–মানে, চুটকিই বটে, রঘুপতি। আশা করি তোমার মিষ্ট্রি সম্ভ হয়ে গেছে। চুনিলালবাবুকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, একটা চিমটে এনে দিন। আপনার অমূল্য চুনি বোধহয় আমি খুঁজে দিতে পারব।

কথাটা শোনামাত্রই রঙ্গলালবাবু তিরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন, হাতে একটা লম্বা চিমটো দিয়ে অনায়াসে কোনও দৈত্যের মাথার পাকাচুল বাছা যায়।

রঙ্গলালের পিছু-পিছু যিনি এলেন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি গজেন্দ্রলাল। চুনিলালবাবু তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় কীসব বলতে লাগলেন।

কিন্তু ততক্ষণে রঙ্গলালের হাত থেকে চিমটে নিয়ে স্টাফ করা পাখিগুলোর একটার কাছে গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন অশোকচন্দ্র।

পাখিটা মাপে পায়রার চেয়ে ছোট। মেটে রঙের শরীরে কালো ছোপ ছোপ দাগ। পেটের দিকটা সাদা। আর সরু লম্বা ঠোঁট।

এসিজি ওঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, এই পাখিটার নাম কাদাখোঁচা। মাছ, শামুক-টামুক খায়। নাকি সুরে ডাকে। গ্রাম-বাংলার সব জায়গাতেই দেখা যায়। এটার ডান চোখটা দেখুন–দেখেই বোঝা যায়, এটা নিয়ে কারিকুরি করেছে কেউ…।

এসিজি কথা বলতে বলতেই ডান চোখের পুঁতিটা খুঁচিয়ে তুলে চিমটে দিয়ে তার ভেতরটা আরও ভালো করে খোঁচাচ্ছিলেন।

হঠাৎই বেরিয়ে পড়ল হারানো চুনিটা। মেঝেতে ঠিকরে পড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর থামল।

ঘরের আলোয় ওটার লাল আভা ছড়িয়ে চিকচিক করতে লাগল।

একটা অস্ফুট শব্দ করে চুনিলালবাবু ছুটে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন লাল টুকটুকে পাথরটা। ওটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে আবেগ থরথর গলায় বললেন, মা তারা ব্রহ্মময়ী!

তারপর পাথরটা শার্টের বুকপকেটে রেখে এসিজির হাত চেপে ধরলেন? মিস্টার গুপ্ত, আপনি দেবদূত হয়ে আজ আমাকে বাঁচালেন–

এসিজি হেসে বললেন, আমি নয়, আপনাকে বাঁচিয়েছেন রঙ্গলালবাবু। উনি ঠিকই বলেছেন। শ্যামসুন্দরলালবাবু মারা যাওয়ার সময় পেলি না গো, পেলি না গো বলেননি, উনি বলেছিলেন গেলিনাগো গেলিনাগো। কথাটা বাংলা নয় কাদাখোঁচা পাখির বৈজ্ঞানিক নাম। এই দেখুন, এই কার্ডে ইংরেজি আর ল্যাটিন নাম–দুটোই আছে।

সকলে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল কার্ডে লেখা নাম দুটো? Fantail Snipe (gallinago gallinago)

রঘুপতি যাদব এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানাল এসিজিকে : স্যার, য়ু আর এ জিনিয়াস!

অশোকচন্দ্র নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে শুধু তোমার মতে, রঘুপতি। নাও, এবার চলো–

রঙ্গলাল এসিজির সামনে এসে জোড়হাতে করে দাঁড়ালেন। আকর্ণ হেসে ছন্দে বললেন, প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানী ছিলেন অ্যারিস্টটল । আপনি আরও জ্ঞানী স্টুদে ব্যারিস্টটল।

এসিজি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, ব্যারিস্টটল মানে!

ওই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশান– মাথা নামিয়ে বিনয়ের হাসি হাসলেন রঙ্গলাল ও কবিতার শেষটা মেলানোর জন্যে ব্যারিস্টার আর অ্যারিস্টটলের সন্ধি করেছি।

আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

# ড্রাকুলা

**ড্রাকুলা**

(অনুসারী সময়-লিপি অরুণাভ দত্তগুপ্তের পার্থিব পারিপার্শ্বিকে লেখা কিছু মানসিক চিন্তার প্রতিফলন, অপার্থিব চিন্তার অনুপ্রবেশের সন্ধিক্ষণে যার সমাপ্তি।)

**প্রথম দিন : সূত্রপাত**

ব্র্যাম স্টোকারের কুখ্যাত (?) ড্রাকুলা আমি পঁয়তাল্লিশের কাঠ-সিঁড়িতে দাঁড়িয়েও পড়িনি শুনে কিঞ্চিৎ মূল্যবান উপদেশ এবং কৃপাবর্ষণ করে (ঈশ্বর, এর এই অনবধানজনিত অপরাধকে ক্ষমা করো বাণী দানও বাদ যায়নি) অভিজিৎ এক কপি বই আমাকে কিনেই দিয়েছিল। দ্বিধা এবং কৌতূহলের দ্বৈরথকে মস্তিষ্কে অনুভব করে সন্ধের মুখেই বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। ফিরে এসে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে শমিতাকে ডেকে নিয়ে এলাম। খাটে পাশাপাশি বসে বাদামি কাগজে মোড়া প্যাকেটটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, বলো তো, এতে কী আছে?

শমিতা যথারীতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জবাব দিল, ডায়েরি আমার জন্যে।

বছরের শুরু। অতএব শমিতার দোষ নেই।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাবধানতা দেখিয়ে প্যাকেটটা খুলে বইটা বের করলাম। তুলে ধরলাম ওর চোখের সামনে। প্রচ্ছদের বিবর্ণ মেয়েটির চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে শমিতা বলে উঠল, তুমি আর আমি যে-সিনেমাটা দেখেছিলাম সেই বইটা?

আমি অভিজিতের কাছ থেকে আহরিত জ্ঞানের স্মৃতি থেকে বললাম, না, সেটা ড্রাকুলা চরিত্রের ওপর নির্ভর করে ওয়ার্নার কোম্পানির লেখা গল্প। আর এটা ব্রাম স্টোকারের লেখা, এক এবং অদ্বিতীয় ক্ল্যাসিক ড্রাকুলা।

শমিতা বলে উঠল, যত সব গাঁজাখুরি গপপো।

হঠাৎ কী হল জানি না, মনে হল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শিরা-উপশিরা টনটন করে উঠল। মাথার মধ্যে ঘটে গেল হাজার-হাজার মেগাটনের বিস্ফোরণ। খাট ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ডান হাতের আঙুল উঁচিয়ে শমিতাকে লক্ষ করে সংযত স্বরে বলতে চেষ্টা করলাম, গাঁজাখুরি? অমন ছেলেমানুষের মতো মন্তব্য আর কোরো না। এবারের মতো ক্ষমা করলাম।

আমার গম্ভীর স্বরে শমিতা অবাক হয়ে গেল, থতোমতো খেয়ে গেল। কিছুক্ষণ আমার, আমার হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মাথার চুলে হাত চালিয়ে বইটা খাটে নামিয়ে রেখে এক গ্লাস জল ঢেলে নিলাম কুঁজো থেকে। ঢকঢক করে গিলে ফেললাম। খাটে ফিরে এসে বসতেই ড্রাকুলার প্রচ্ছদে চোখ পড়ল। প্রথমে লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম, মেয়েটির উন্মুক্ত কাঁধে রুপোলি নখের একটা হাত। হাতের মালিক পশ্চাৎপটের অন্ধকারে অদৃশ্য।

ড্রাকুলা-সংক্রান্ত গোটা চার-পাঁচ ছবি আমি দেখেছি। শমিতা বিয়ের পরে আমার সঙ্গে একটা ছবিই দেখেছে–আর সর্বক্ষণ আমার কানের কাছে বিড়বিড় করেছে, উদ্ভট-আজগুবি কল্পনারও একটা সীমা আছে। এসব ছেলেভোলানো গল্প ইত্যাদি। সুতরাং ড্রাকুলা-সংক্রান্ত পরবর্তী ছবিগুলোতে আমি একাই গিয়েছি। মনে-মনে কেমন একটা রোখ চেপে গিয়েছিল, শমিতাকে কাউন্টের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাবই। রোখের কারণ বলতে পারি না।

ছোটবেলাকার কয়েকটা কথা আমার বেশ মনে পড়ে। ঘটনাগুলো ছোটখাটো হলেও ভুলতে পারি না।

একবার আমাদের গ্রামে নররাক্ষস এসেছিল খেলা দেখাতে। ধবধবে একটা সাদা পায়রা নিয়ে লোকটা কাঁচাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছিল, আর খেতে-খেতেই রক্তাক্ত মুখে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করছিল। তার পাশের লোকটি বারবার চেঁচিয়ে

বলছিল, বাবুমশায়েরা, ইয়া আর যে পারিব, তারে আমরা দশ টাকা দিব। বাবুমশায়েরা– আমি আর থাকতে পারিনি। দশ বছরের শরীরটাকে দর্শক বৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি পারব। এবং আমার সেই পুঁচকে সাহসের ঢঙ দেখে দর্শক তথা কুশীলব মহলে প্রচণ্ড অট্টহাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। তখন অপমানে ক্ষোভে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। অন্ধের মতো ছুটতে শুরু করেছিলাম বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে মা-কে সাতকাহন করে সে-ঘটনা শুনিয়েছি। মা-ও যথারীতি সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে ভুলিয়েছে। কিন্তু সেদিনকার অপমান আমি আজও ভুলিনি।

অভিজিৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু। একমাত্র ওরই সঙ্গে এই বয়েসেও আমার যোগাযোগ আছে। মনে পড়ে, সন্ধের আঁধারে যখন আমরা লুকোচুরি খেলতাম, তখন আমার লুকোনোর প্রিয় জায়গা ছিল বরাটদের ভাঙাচোরা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। কারণ, বাদুড়, পাচা এবং অন্ধকার (তা ছাড়া না জানি আরও কত কী!)–এই তিনের ভয়ে আমার অসমাসহসী বন্ধুবান্ধবরাও কেউই ভাঙা বাড়িতে ঢুকত না। অন্ধকারে গাছের আড়াল দেওয়া কাঁচা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওরা তারস্বরে চিৎকার। করত, অরুণ–অরুণ-বেরিয়ে আয়!

সুতরাং অবশেষে আমারই জয়লাভ।

এই যে অন্ধকার-আসক্তি, এটা ক্রমশ একটা নেশার মতো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তবুও সবসময়ই মনে হয়েছে অন্ধকার আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করেনি, আমাকে সে ফাঁকি দিয়েছে। সেইজন্যে মাঝে-মাঝে অন্ধকারের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে। আমাকে যে-সুযোগ (কী সুযোগ জানি না) থেকে সে বঞ্চিত করেছে, সেই সুযোগের ফলকে আয়ত্ত করে ইচ্ছে করে, চিৎকার করে বলি, তোমরা দ্যাখো, আমি প্রাক্তন পার্থিব শ্রীঅরুণাভ দত্তগুপ্ত…।

ক্রি-রি-রিং–ক্রি-রি-রি-রিং—

চমকে উঠলাম। টেলিফোন।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

৪৫-৯৫৯৩। অরুণাভ দত্তগুপ্ত বলছি।

শালা, তোর বাবা বলছি।-ও-প্রান্ত থেকে অভিজিৎ সান্যালের স্বর ভেসে এল, বসে-বসে কী করছিস? ড্রাকুলা?

এক পলক চোখ রাখলাম বইটার ওপর। বললাম, না, এখনও শুরু করিনি।

অপদার্থ! তা হলে শোন, একটা কথা বলি! ঠিক রাত বারোটায় বইটা শুরু কর। কিন্তু ঝট করে শেষ করিস না যেন। বেশ তারিয়ে-তারিয়ে নেশা করার মতো রোজ পড়বি। বুঝলি?

হুঁ।

যাকগে, কাল ক্লাবে আসছিস তো? একটু খাওয়াটাওয়া যাবে।

ঠিক আছে, যাব। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। এগিয়ে এসে ড্রাকুলা বইটা হাতে তুলে নিলাম। মনে মনে উচ্চারণ করলাম, আজ রাত বারোটায়…মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা বাকি…।

## প্রথম রাত : জোনাথান হার্কার

দেওয়ালঘড়ির ঘণ্টার শব্দে লুপ্ত হল শমিতার গভীর নিশ্বাসের ছন্দ। রাত বারোটা। সুতরাং মাথার কাছে বেডসুইচ টিপে জ্বেলে দিলাম রিডিং ল্যাম্প। আয়েশ করে গা এলিয়ে হাতে তুলে নিলাম বইটা বুকের মধ্যে তৃষ্ণার তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল।

প্রথম পর্বে জোনাথান হার্কারের কাহিনি আমাকে মুগ্ধ করল। কিন্তু যেখানে সে কাউন্ট ড্রাকুলাকে বেলচা দিয়ে আঘাত করল, সেখানে মনে হল আমার সমস্ত শরীর যেন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। রক্তস্রোত হয়ে উঠল চঞ্চল।

চট করে উঠে বসলাম। ঘুমন্ত শমিতাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে শুরু করলাম।

শমি–শমিতা।

কী?–ঘুমজড়ানো স্বরে ও উত্তর দিল। তারপর পাশ ফিরে আবার মাথা গুঁজে দিল বালিশের মধ্যে।

আমি ক্ষান্ত হলাম না। আবার ওকে আঁকুনি দিয়ে ডাকলাম। এবারে ও উঠে বসল। ঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল।

কী, ব্যাপার কী?–একটু রুক্ষ স্বরেই প্রশ্ন করল ও।

আমি হাতের বইটার দিকে ইশারা করে বললাম, তোমার গাঁজাখুরি শব্দটা এবারে তুমি পালটাতে বাধ্য হবে। জানো, বইটার প্রথম পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠায় কী লেখা আছে?

শমিতা আমার মুখের দিকে হাঁ করে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। রাত দুটোয় কোনও স্বামী যে-কোনও স্ত্রী-কে ঘুম ভাঙিয়ে এই ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন করতে পারে তা সম্ভবত ওর কল্পনাতেও আসেনি।

আমি হাসলাম। বললাম, দ্যাখো, এই জায়গায় পড়ে দ্যাখো।

এবং একইসঙ্গে বইয়ের একটা বিশেষ পাতা (যে-পাতায় লেখা আছে, কাউন্ট ড্রাকুলা রাতের অন্ধকারে কালো পোশাকে শিকার করতে বেরোচ্ছে–টিকটিকির মতো প্রাসাদের দেওয়াল বেয়ে…) ওর বিস্মিত চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

এই রাত দুটোয় রসিকতা করার কোনও মানে হয়?শমিতার সুরে ঈষৎ কাঠিন্যের পরশ।

সব জিনিসকে রসিকতা বলে মনে কোরো না।

আমি এখনও তোমার মতো পাগল হইনি!বলে শমিতা শুয়ে পড়ল।

ওই একটা মুহূর্ত আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কী ঘটত জানি না। কিন্তু সামনের আয়নায় আমি আমার নৃশংস প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম, এবং সংযত হলাম। বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আলো নিভিয়ে বইটাকে মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। বিপন্ন জোনাথানের সঙ্গে কাউন্টের মানসিক সংঘাতের মুহূর্তগুলো শ্লথগতি চলচ্চিত্রের মতো তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম। নাঃ, অভিজিৎ সান্যাল আমার কাছ থেকে অন্তত একটা ধন্যবাদ আশা করতে পারে।

## দ্বিতীয় দিনঃ বিপন্ন সকাল

সকালে ঘুম ভাঙল এক আকস্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে। স্বপ্ন দেখছিলাম কি না জানি না, মনে হল বুকের কাছটা যেন হঠাৎই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। এক অদ্ভুত চোরাবালিতে আমার শরীরটা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছে। কোনওরকমে চারপাশের জমি আঁকড়ে আমি মাথাটাকে ওপরে ভাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি। বিস্ময়াহত দৃষ্টি যখন মেলে ধরেছি, তখন আর সইতে পারিনি। এক শীৎকৃত আর্তনাদে মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম। মাথার কাছের জানলা (বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!) দিয়ে সূর্যের প্রখর রোদের এক পেনসিল-প্রমাণ রশ্মিরেখা এসে আছড়ে পড়েছিল আমার চোখের ওপর। সেই আলো আমাকে যেন হঠাৎই বেসামাল করে দিয়েছে।

প্রকৃতিস্থ হতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। অবশেষে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে করমচা-লাল চোখজোড়াকে পরখ করছি, তখনই আমার পাশে ভেসে উঠল শমিতার প্রতিবিম্ব।

কী হয়েছে?

দেওয়ালঘড়ি ঢং-ঢং শব্দে সকাল নটার সঙ্কেত ঘোষণা করল। পলকের জন্যে চমকে উঠেছিলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলাম, হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

নিশ্চয়ই এই বইটা পড়ার জন্যেই হয়েছে। শমিতা দৃঢ় স্বরে বলল। এবং অপার-অবাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কারণ, আমি তখন উন্মত্তের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছি।

আধ মিনিটের পরও আমার হাস্যকর অবস্থার পরিবর্তন না দেখে শমিতা চলে গেল নিজের কাজে হয়তো রাগ করেই। কিন্তু কী করে ওকে বোঝাই, বইটার সঙ্গে আমার যে-আত্মীয়তার সম্পর্ক, তাতে বই পড়ে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এই পার্থিব দুনিয়ার প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো আমাকে কেমন অস্বস্তিতে ফেলছে। সূর্যের কিরণ আমি আর সহ্য করতে পারছি না (যেমন কাউন্টও পারেনি দিনের আলো সহ্য করতে)।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, অফিসে যাব না। শমিতা প্রথমে গজগজ করলেও পরে খুশি হল। বলল, চলো, তা হলে একটা ছবি দেখে আসি। আমি সটান সেই প্রস্তাবকে না মঞ্জুর করে দিয়ে উত্তর দিলাম, উঁহু, সারা দুপুর

বসে-বসে বইটা শেষ করব। হ্যাঁ, আর একটা কথা, দুপুরে আমার রান্না কোরো না খিদে নেই।

তার মানে?–শমিতা যথেষ্ট অবাক হল।

মানে খিদে নেই ব্যস। বলে দ্রুত পা ফেলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

মনে পড়ল, জোনাথান হার্বার কখনও কাউন্টকে খাওয়ার টেবিলে দেখেনি। কারণ? কী জানি, বলতে পারি না…।

## দ্বিতীয় দিনঃ অবসন্ন দুপুর

শরীরের অভ্যন্তরে তখন বেপরোয়া সাইক্লোন বয়ে চলেছে। দুটো কারণে। এক, খিদের জ্বালায়। দুই, জাহাজের ক্যাপ্টেনের রোজনামচাটা পড়ে (যেখানে জাহাজ থেকে একের পর এক যাত্রী এবং নাবিকরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কাউন্টের শিকার হয়ে) মনের মধ্যে অনুভব করছি এক অজানা উল্লাস। অনেকটা কৃতিত্বের অথবা যুদ্ধজয়ের উল্লাসের মতো। হয়তো কাউন্টের এই অভাবনীয় কার্যকলাপ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

শমিতা শোওয়ার ঘরে প্রাত্যহিক দিবানিদ্রায় মগ্ন। আমি বসবার ঘরে বসে বইটা গোগ্রাসে গিলছি। ঠিক করেছি, আজ সন্ধ্যায় ক্লাবে যাওয়ার আগে বইটা পুরোটা না পারলেও প্রায় শেষ করে ফেলব। কারণ, অভিজিৎ হয়তো আমার মতামত জানতে চাইবে।

অতএব সমস্ত চেতনা কেন্দ্রীভূত হল বইয়ের পাতায়…ক্রমে-ক্রমে পেরিয়ে গেল লুসি ও উন্মাদ আশ্রমের রোগী রেনফিল্ডের অধ্যায়। যখন রেনফিল্ডের মৃত্যু হল তখন আমার চমক ভাঙল দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে। সন্ধে সাতটা বাজে। অবাক হলাম, শমিতা আমাকে একবারের জন্যেও ডাকতে আসেনি বলে। বইটা রেখে শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি ও তখনও ঘুমোচ্ছে। বেশবাসের পারিপাট্য স্বভাবতই আয়ত্তের বাইরে। সুন্দর ফরসা মুখের পর তিন ভাঁজওয়ালা নিটোল গলা..আমার মনে পড়ল অসহায় লুসির কথা। বইয়ের গল্পটার মতো এখানেও শমিতার মাথার কাছের জানলাটা খোলা। কিন্তু বাইরের আঁধারি আকাশে কোনও উড়ন্ত স্বৈর্যশীল কালো বাদুড়কে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক ওই মুহূর্তে একটা বাদুড়ের

অভাব অনুভব করলাম। যদি একটা বাদুড় পেতাম! তখনই মনে মনে ঠিক করলাম, একটা বাদুড় আমাকে জোগাড় করতেই হবে–তা সে যেমন করেই হোক!

কিছুক্ষণ দ্বিধার পর ঝুঁকে পড়লাম শমিতার ওপর। আমার ঠোঁট আলতোভাবে স্পর্শ করল ওর ঠোঁট, তারপর ধীরে-ধীরে নেমে এল গলায়…।

এক ভয়ংকর আর্তচিৎকার করে বিস্ফারিত চোখে এক ঝটকায় উঠে বসল শমিতা। আমি মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়লেও নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সময় লাগল না। চেষ্টা করে কাষ্ঠহাসি হাসলাম।

ও, তুমি! শমিতার নিশ্বাস গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ও শাড়িটাকে ঠিকভাবে শরীরে জড়িয়ে নিতে লাগল।

হ্যাঁ। অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম । স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি? অমন চমকে উঠলে যে?

শমিতা কিছুক্ষণ নীরব। তারপর মুখ খুলল, না, মনে হল কেউ যেন আমার গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে–তাই।

সতর্ক স্বরে বললাম, কী জানি! যাকগে, তুমি এবার ওঠো, আমি একটু ক্লাবে যাব।

শমিতা খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। ওর মনের পরদায় সংশয়ের ছায়াটা তখনও বোধহয় পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

### দ্বিতীয় রাতঃ মিনা হার্কার

আমি শুয়ে। শমিতাও শুয়ে।

আমি জেগে। ও ঘুমিয়ে।

সারাদিনে দু-চার পেগ ও কিছু স্ন্যাকস্ ছাড়া আমার পেটে আর কিছু পড়েনি, কিন্তু তার জন্যে অস্বস্তি বা কোনওরকম কষ্টও অনুভব করিনি। তবে একটা মানসিক হোঁচট খেয়েছি ক্লাবে ঢুকেই।

ক্লাবে যেতেই প্রথম নজরের মিলন অভিজিতের সঙ্গে। ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সন্ধের উত্তাল চিন্তাটার কথা চুপিচুপি বলেছি, আমাকে একটা বাদুড়

কিনে দিতে পারিস?

দীর্ঘ এক মিনিট আমরা নীরব। কিন্তু অভিজিতের ছলছলে ঘোলাটে চোখ আমাকে পাগল, নির্বোধ ইত্যাদি শব্দে নিঃশব্দে গালাগাল দিতে লাগল।

অবশেষে উচ্চারণ করল, রাবিশ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অভিজিতের প্রতি আমার চিরন্তন ঘৃণার জন্ম হল। কারণ মুখে বললেও ওর অভিব্যক্তি আমাকে জানিয়ে দিয়েছে–ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে দিয়েছে– ওর মনের ভাব। সুতরাং বাদুড় কেনার কার্যকারণ ওকে খুলে বলার প্রবৃত্তি আমার হয়নি। ক্লাব থেকে সটান ফিরে এসেছি। মনে মনে ভেবেছি সব ব্যবস্থা আমাকে নিজেই করতে হবে। কারণ শমিতাকেও যখনই কিছু বলতে গেছি, ও বিস্ময়ভরা চোখ মেলে তাকিয়েছে, তারপর হেসে উঠেছে। (যতসব আজগুবি চিন্তা!)।

শমিতার এই বদ্ধমূল অবিশ্বাস ক্রমশ আমাকে একরোখা করে তুলেছে। আমার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, উদ্দেশ্য সব কেন্দ্রীভূত হয়েছে ড্রাকুলার অস্তিত্ব প্রমাণের সাফল্যে। কোনওকালেই বেশি কথার মানুষ আমি ছিলাম না। তাই বউয়ের সঙ্গে অযথা তর্ক করিনি। মনকে সংযত করে পালটা প্রশ্ন করেছি, ভগবানকে কোনওদিন চোখে দেখেছ?

আমার বক্তব্যে শমিতা কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল। তারপর হালকা সুরে বলেছে, উঁহু, কেউই দেখেনি।

অথচ ভগবানে বিশ্বাসের ব্যাপারে তোমাদের কমতি নেই!–আমার তিক্ত স্বর শমিতার মস্তিষ্কে যেন কেটে কেটে বসল। ও কোনও জবাব দিতে না পেরে ইতস্তত করতে লাগল।

আর যখনই আমি কাউন্ট ড্রাকুলার কথা বলছি, তখনই তোমার সমস্ত অবিশ্বাস ঝরে পড়ছে, ব্যঙ্গ করেছ আমার নির্বুদ্ধিতাকে নিয়ে, তাই না? যেহেতু কাউন্ট ড্রাকুলাকে তুমি চোখে দ্যাখোনি!

আমার রূঢ় স্বরে শমিতা হয়তো আঘাত পেল। কিন্তু আমি নিরুপায়। ওর কাঁপা ঠোঁটে এক পলক চোখ রেখে শোওয়ার ঘরে গিয়ে খাটে গা এলিয়ে দিয়েছি।

বইটার অসমাপ্ত অধ্যায়গুলো পড়তে শুরু করেছি। রাতে কিছু মুখে দেওয়ার প্রবৃত্তি আর হয়নি।

বইটা শেষ করে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলাম। যথারীতি বইয়ের পরিণতি আমার মোটেই ভালো লাগেনি। ইংরেজি ফিল্মগুলোতে যে-পরবর্তী অধ্যায়ের আশ্বাস পেয়েছিলাম, এখানে তার আভাসমাত্র নেই। বরং এখানে কাউন্ট ড্রাকুলা পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছে সামান্য মানুষের হাতে! অবাস্তব তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মিনা হার্কারের অধ্যায় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বইটা রেখে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে দেরি হল। ভাবতে লাগলাম অদূর ভবিষ্যতের কথা, অভিজিতের কথা, শমিতার কথা, আর সবশেষে কাউন্ট ড্রাকুলার কথা।

## কালো বাদুড় ও কালো পোশাক

হাটবারে পাখির বাজার তন্নতন্ন করেও কোনও বাদুড়ের সন্ধান পাইনি। অনেকে অবাক হলেও বাদুড়ের বদলে পাচা হলে চলবে কি না প্রশ্ন করেছে–কোনও জবাব দিইনি। বহু অনুসন্ধানের পর একজন দোকানদার স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আমার প্রয়োজনের কারণ জানতে চেয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। আমি তাকে শুধু প্রয়োজনটাই (প্রয়োজনের কারণ নয়) জানিয়েছি। অবশেষে দীর্ঘ দু-ঘণ্টার জন্যে আমাকে প্রতীক্ষায় রেখে সে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা নিয়ে ফিরে এল। কিঞ্চিৎ দরাদরির পর সে পারিশ্রমিক, খাঁচা ও পাখি (পাখি?) বাবদ পঁয়ষট্টি টাকা চেয়ে বসল। আমি আর কোনওরকম প্রতিবাদ না করে টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়ে খাঁচা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি। শমিতাকে না জানিয়ে খাঁচাটাকে চুপিচুপি লুকিয়ে রেখেছি খাটের নীচে। তারপর চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে (ইদানীং সানগ্লাস ছাড়া আমি দিনের বেলায় মোটেই রাস্তায় বেরোতে পারি না) বসবার ঘরের চেয়ারে বসে চোখ বুজে বিশ্রাম করছি, শমিতা এসে ঘরে ঢুকল।

অভিজিৎবাবুর ফোন এসেছিল।

কী বলল?

আজ রাতে আসবেন।

চমকে উঠলাম। আনন্দ, ঘৃণা, তৃপ্তি, একসঙ্গে প্রকাশ পেল আমার উত্তরে, তাই বুঝি? কেন?

কী জানি, শমিতা নির্বিকার। তবে চলে যেতে গিয়ে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে গেল, পাশের বাড়ির ওদের তোমার এই ড্রাকুলাপুঙ্গবের কথা (শমিতা, খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো! নইলে এক টানে তোমার ওই কচি গলা ছিঁড়ে…) বলছিলাম। সব শুনে ওরা তো হেসেই খুন (খুন? হ্যাঁ, তাই তো বলে একে–)! শেষে বলল, তোমার নাকি রাঁচির হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া (পাগল রেনফিল্ড? না, রেনফিল্ডকে আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!) দরকার।

আমি জানি, এসব শুনে আমার প্রচণ্ড উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল রাগে পাগল হয়ে শমিতার গলা টিপে ধরা–কিন্তু দুইয়ের কোনওটাই আমি করলাম না। খুব শান্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, শমি, পাশের বাড়ির ওদের আর কয়েকদিন পরে ওই একই প্রশ্ন করলে দেখতে, ওদের উত্তরটা একটু অন্যরকম হত।

শমিতা কেন জানি চুপ। দৃষ্টি দিশেহারা।

## তৃতীয় রাত : অভিজিৎ সান্যাল

অভিজিৎ যখন এল, আমার শোওয়ার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে রাত নটা বাজল।

শমিতাকে সেই সন্ধেবেলাতেই পাঠিয়ে দিয়েছি পাশের বাড়ির ওদের সঙ্গে গল্প করতে। বলেছি, রাত দশটার আগে যেন না ফেরে, কারণ, অভিজিৎ সান্যালের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি আলোচনা আছে। আমি চাই না সে-সময়ে ও হাজির থাকুক ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও কোনও প্রতিবাদ না করেই চলে গেছে।

বসবার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। আমি ছিলাম প্রতীক্ষায় অভিজিতের প্রতীক্ষায়। ও প্রথমে বসবার ঘরের দরজা খুলেই দেখল ঘন অন্ধকার, (যে-অন্ধকার বরাবর আমাকে প্রতারিত করে এসেছে, কিন্তু আজ আমি ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পেয়েছি। অন্ধকারকে আমি এখন, এই মুহূর্তে, পরমাত্মীয় বলে ভাবতে পারছি…) এবং দেখেই থামল।

অরুণাভ–অরুণ!

অভিজিতের স্বর যেন একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল।

আমি স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, কী রে, তুই এসেছিস?

সঙ্গে-সঙ্গেই দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টায় সশব্দে রাত নটার সংকেত পড়ল।

অভিজিৎ আমার গলার শব্দ অনুসরণ করে শোওয়ার ঘরে এসে ঢুকল। তখনই দেখল, দেওয়ালে যে-ঈষৎ আলোর ইশারা দূর থেকে চোখে পড়েছিল, তার উৎস এক কোণের টেবিলে বসানো একটা মোমবাতি। এবং ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ।

হঠাৎই একটা ডানা ঝাপটানোর ঝটপট শব্দ শোনা গেল।

চমকে উঠল অভিজিৎ। দেখল, একটা কালো ছায়া হাওয়ায় ভর করে ক্ষিপ্রভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে শোওয়ার ঘরের আকাশে। ভয়ে চোখ ঢাকল অভিজিৎ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়াল। লক্ষ্য, দরজা।

ঠিক তখনই আমাকে ওর চোখে পড়ল। শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে তৃপ্ত অভিব্যক্তি নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

আমার গায়েও লম্বা কালো-লাল আলখাল্লার দিকে তাকিয়ে ওর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল, মাই গড!

আমি যেন হাওয়ায় ভেসে চট করে ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। মুচকি হাসলাম। বললাম, তুই এসেছিস বলে ধন্যবাদ।

হঠাৎ কাঁধের কাছে কোনও স্পর্শে লাফিয়ে উঠল অভিজিৎ।

কালো ছায়াটা ওকে পাশ কাটিয়ে সামনের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল–পড়ে গেল মাটিতে। আবার উঠল।

কী কী ওটা? –ওর গলার স্বরে কি ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ ক্রিয়া করছে?

বললাম, বাদুড়–আজই কিনে এনেছি।

হোয়াট? রাগে ফেটে পড়ল অভিজিৎ : কিনে-এনে-ছিস?

হ্যাঁ। আর এই কালো পোশাকটাও।–মাথা নীচু করে আলখাল্লাটা দেখালাম : এখন বল, কেমন মানিয়েছে?

আমার হাসি অভিজিৎকে সংক্রামিত করতে পারল না। ও গম্ভীরভাবে বলল, এসব কাণ্ডকারখানার জন্যেই কি অফিস যাওয়া বন্ধ করেছিস? অল দিজ ননসেন্স?

শাট ইয়োর ট্র্যাপ।আমি হিসহিস করে বলে উঠলাম, এর মর্ম তুই বুঝবি না। অন্ধকারের আনন্দ আলোর আনন্দের চেয়ে কিছু কম নয়! তুই তো ড্রাকুলা পড়েছিস।

ব্যস। আর কিছু বলে ওঠার আগেই অভিজিৎ উন্মাদের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ওর হাসিতে আলো-আঁধারিতে উড়ন্ত বাদুড়টাও বুঝি চমকে উঠল। মোমবাতির কাঁপা আলো চকিতে পিছলে গেল আমাদের যুযুধান মুখে। হাসতে-হাসতেই নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করল অভিজিৎ। বলল, ওঃ বয়! কান্ট য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্লু হ্যাভ গন রাউন্ড দ্য বেন্ড?

আমার পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত শিরশির করে উঠল। উড়ন্ত বাদুড়ের ছায়া কেঁপে উঠল আমার রক্তিম চোখে। একটা ঝাপসা পরদায় ভাসতে লাগল অভিজিতের আতঙ্ক-বিকৃত মুখ…।

সামনে পা ফেলার আগে বললাম, আমি দুঃখিত, অভিজিৎ..।

অভিজিতের সঙ্গে সেই আমার শেষ কথা।

## এবং শেষ রাতঃ শমিতা

রাত দশটা। বসবার ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল শমিতা।

ঘর যথারীতি এখনও অন্ধকার।

আমার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে অনিশ্চিত পায়ে ও চলে এল শোওয়ার ঘরে। মোমবাতিটা জ্বলতে-জ্বলতে ছোট হয়ে এসেছে। বাদুড়টাও ক্লান্ত ডানা নিয়ে ঘরের

চার দেওয়ালের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর আমি? আমি সেই কালো আলখাল্লা পরেই টান-টান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি।

শমিতা প্রথমে বাদুড়টাকে দেখে প্রচণ্ড এক চিৎকার করে উঠল। কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করল ঘরের মধ্যে। অবশেষে থামল এসে বিছানার কাছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে আমাকে ডাকল, এই, শুনছ, ওঠো।

ওর গলা থরথর করে কঁপছে।

তখনই ওর চোখ পড়ল আমার শুয়ে থাকার বিচিত্র ভঙ্গির ওপর, কালো আলখাল্লার ওপর, টুকটুকে লাল ঠোঁটের ওপর। সুতরাং ও থমকে গেল। রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করল, কী হচ্ছে এসব বাড়ির মধ্যে?

আমি ধীরে-ধীরে উঠে বসলাম বিছানার। শমিতা হুস-হুঁস করে বাদুড়টাকে তাড়াতে লাগল।

পোশাকটা কীরকম? পছন্দ হয়?–ওকে প্রশ্ন করলাম।

ও সেই পুরোনো কথাই উচ্চারণ করল, যতসব উদ্ভট আজগুবি চিন্তা।

আমি তরল ভঙ্গিতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম এখনও অবিশ্বাস?–হ্যাঁসলাম ঠোঁট টিপে।

ওই বইটা পড়ে আর সিনেমা দেখে-দেখে তোমার মাথাটা একেবারে গেছে। সব রকম গাঁজাখুরি ব্যাপার বিশ্বাস করতে শুরু করেছ।

কথা বলতে-বলতে ও অন্ধকারের মধ্যেই ব্রস্তপদে এগিয়ে চলল আলোর সুইচের দিকে। এবং কয়েক পা গিয়েই হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাড়তে-হাতড়ে এই পতনের কারণ অনুভব করতে গিয়ে ওর মুখে ফুটে উঠল অন্ধ আতঙ্কের ছাপ, বিস্ময়ের জোয়ার, অনিশ্চয়তার মেঘ।

এ কী? কী এটা? শমিতার স্বর আমার অচেনা লাগছে।

আমি বিছানার পাশে দাঁড়িয়েই জবাব দিলাম, মানুষ–আমার বন্ধু অভিজিৎ সান্যাল।

চকিতে উঠে দাঁড়াল শমিতা : কী হয়েছে ওঁর? উনি পড়ে আছেন কেন?

আমি ধীরে ধীরে পা ফেলে শমিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফিশফিশ করে বললাম, এখনও অবিশ্বাস, শমিতা? নিজের স্বামীকে অবিশ্বাস?

শমিতা পাগলামো ছাড়ো বলতেই আমি ওর দুকাঁধে হাত রাখলাম আলতো করে। বললাম, পাগলামো?

তারপর ওর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে হাসলাম।

বাদুড়ের কালো ছায়াটা সারা ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। মোমবাতির আলো কমে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার দেখতে অসুবিধে হল না। অনুভবে ভুল হল না।

আমার দু-হাতের মধ্যে শমিতার শরীরটা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। ওর আতঙ্কে ভেজা চোখের চকচকে তারায় আমায় মুখের প্রতিবিম্ব কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল আমার ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট, এবং সেইসঙ্গে ভেসে উঠল আমার ঝকঝকে শূদন্তের ধারালো নির্মোঘ প্রতিবিম্ব।

শমিতার সরব সম্মতি না পেলেও ওর অভিব্যক্তি আমার এতদিনকার প্রশ্নের (এখন বিশ্বাস করো, শমিতাঃ) জবাব দিয়ে গেল।

আমাদের পরস্পরের ব্যবধান আরও কমে আসতেই বাদুড়ের ভাসমান ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

কারণ, প্রদীপ (প্রকৃতপক্ষে, মোমবাতি) নিভিয়া গেল।

.

(অরুণাভ দত্তগুপ্তকে এই পার্থিব পরিবেশে আর দেখা যায়নি। তবে একটা ছোট্ট কাগজে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে গেছেন। তাতে তাঁর ট্রাসিলভ্যানিয়া যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি।)

# অয়স্কান্তের অন্তিম ইতিহাস

### অয়স্কান্তের অন্তিম ইতিহাস

(অয়স্কান্ত রুদ্রের কুয়াশাচ্ছন্ন অপমৃত্যুর সম্ভাব্য সমাধান কেউই করতে পারেননি। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য মৃত্যুকে সর্বক্ষণের সঙ্গী করে দিনের পর দিন মানসিক কুরুক্ষেত্রের অংশীদার হয়েছে তার স্ত্রী অরুণা রুদ্র। অবশেষে কতকগুলো সাদা কাগজের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া গেছে অয়স্কান্তের জীবনের অন্তিম দিনগুলোর কালো সাদা সাক্ষ্য। যেমন বিক্ষিপ্তভাবে তার শুরু, তেমনি বিক্ষিপ্তভাবে তার শেষ। তবু কি ফুটে ওঠে না এক অবিশ্বাস্য অশুভ ইঙ্গিত? ঘটনা ও ফলাফলকে আঙ্কিক নিয়মে যোগ করে অরুণার অন্তত তাই মনে হয়েছে।)

### ৫ মে, রাত দশটা

ক্লাব থেকে ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে গেল। অরুণা মনে হয় বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছে। কারণ সংক্ষিপ্তভাবে বহু প্রচলিত এবং বহু ব্যবহৃত শব্দগুলো (খাবার ঢাকা আছে) বলে ও শোওয়ার ঘরে চলে গেল। ভেবেছিলাম খাওয়াদাওয়ার পর মানভঞ্জনে আজকের রাতটা খরচ করব, কিন্তু শ্রীকান্তর কথাগুলো মনে পড়ায় তা আর হয়ে উঠল না। টেবিলে বসে খালি ওর কাছে শোনা কথাগুলোই ভেবেছি। জানি, ক্লাবের আর সকলে ওর কথায় তেমন আমল দেয়নি, হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি তা পারছি কই? সত্যিই কি সামান্য এক টুকরো সুতোর মধ্যে অত শক্তি আছে? ওই এক টুকরো সুতোর চাপে কেউ কখনও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়? কে জানে! শ্রীকান্ত বলছিল, স্ত্রী-হত্যার অপরাধে সেই ভদ্রলোকের কোনও শাস্তি হয়নি। কারণ সামান্য একগাছা সুতো দিয়ে যে কাউকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা যায়, আদালত সে কথা একেবারেই বিশ্বাস করেনি। ওই অবিশ্বাস্য ঘটনার পর ভদ্রলোক পাগল হয়ে যান। তিনি তো সত্যিই

স্ত্রীকে খুন করতে চাননি। নিছক একগাছা সুতো গলায় জড়িয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল!

না, এই সুতোর ঘটনাটা অরুণাকে বলা ঠিক হবে না। ও হয়তো ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, এই অবাস্তব ব্যাপারটা শুধু আমাকেই কেন এরকমভাবে ভাবিয়ে তুলেছে?

**৬ মে, রাত দশটা**

আজ সকালে অফিসে যাওয়ার সময় একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ধুতিটা আলমারি থেকে নিয়ে পরতে যাব, দেখি, একগাছা সরু কালো সুতো সাদা ধবধবে ধুতির ওপর সাপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে। জিনিসটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঘর আঁট দেওয়ার সময় আপদ দূর হবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ, অফিস থেকে ফিরে এসে টেবিলের ওপর আবিষ্কার করলাম ওই কালো সুতোটাকে। আমার ফাউন্টেন পেনটার পাশে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে। জানি না কেন, ওটাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠেছিলাম। তা হলে কি আমার হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল বিশ বছর আগেকার স্মৃতির কথা? আমার ছোটবেলার কথা? নিশীথের কথা?

**৮ মে, রাত বারোটা**

বলব না বলব না করেও অরুণাকে আমার অস্বস্তির কথাটা জানিয়ে ফেলেছি। ও ব্যাপারটাকে যথারীতি আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তা তো দেবেই। ও তো আর জানে না বিশ বছর আগেকার ছোট্ট ঘটনাটা। জানে না নিশীথের আকস্মিক অপমৃত্যুর কথা! তা ছাড়া শ্রীকান্তর বলা গল্পটাও তো ওকে আর বলিনি!

**১০ মে, রাত একটা**

রাত দশটায় খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুম আসেনি। কারণ, কালো সুতোটা এখনও আমার সঙ্গ ছাড়েনি। আজ সকালে অফিসে যাওয়ার পথে ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে এসে দেখি সেই আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সুতোটা আমার ড্রয়ারের ভিতরে নিরীহভাবে পড়ে রয়েছে। তা হলে নিশীথ কি এতদিন পরে ওর প্রতি অবিচারের ন্যায়বিচার চাইতে

এসেছে? আজও আমি ভুলিনি বিশ বছর আগের সরস্বতী নদীর কথা, তার ওপরের তালগাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি সাঁকোটার কথা। আর ভুলিনি এক লাটাই কালো সুতোর কথা। ওই সামান্য সুতো নিয়েই এক ধূসর সন্ধ্যায় নিশীথের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়, তারপর অনিবার্যভাবে হাতাহাতির শুরু। ওই ধস্তাধস্তির মধ্যে নিশীথ কীভাবে যে জলে পড়ে গেল, আমার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, ডান হাতের শক্ত মুঠোয় লাটাইটা আঁকড়ে ও ছিটকে পড়েছিল সাঁকোর ওপর থেকে। সাঁতার জানত না নিশীথ। তাই অসহায়ভাবে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে গেছে ঘোলা জলের নীচে। সন্ধের ঝাপসা অন্ধকারে নিঃসঙ্গ আমি শ্রান্ত পায়ে ফিরে এসেছি ঘরে। নিশীথের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ঘটনা একেবারেই চেপে গেছি। কিন্তু দিন তিনেক বাদে মাইল দুয়েক দুরে ভেসে উঠল নিশীথের মৃতদেহ। সাত গাঁয়ের লোক ছুটল ওকে দেখতে। আমিও গেলাম। নিশীথের সারা শরীর গ্যাসবেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। চোখের জায়গায় দুটো বীভৎস কোটর। দেহের জায়গায় জায়গায় মাংস খোবলানো। কিন্তু ওর ডান হাতের শক্ত মুঠোয় লাটাইটা তখনও ধরা ছিল।

নিশীথের মৃতদেহের নৃশংস স্মৃতি আমাকে একটি রাতের জন্যেও মুক্তি দেয়নি। তখন আমার বয়স ছিল বছর বারো-চোদ্দো। আরও বছর পনেরো পর যখন অরুণাকে বিয়ে করলাম, তখন সে স্মৃতি বেশ ধূসর হয়ে এসেছে। তারপর এই পাঁচ বছরে নিশীথকে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীকান্তর বলা গল্পটা, আর এই সামান্য কালো সুতোটা, আমাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে সেই ভুলে যাওয়া বিষণ্ণ ধূসর সন্ধ্যার কথা। নিশীথের লাটাইয়ের কথা। কালো সুতোর কথা।

তা হলে কি এই সুতোই সেই সুতো? যে-সুতো আর সরস্বতী নদী সাক্ষী ছিল সেই বিয়োগান্ত নাটকের চরম পরিণতির?

### ১৩ মে, দুপুর দুটো

আমার টেবিলে একটা ছোট কাঠের মূর্তি আছে। হানিমুনের সময় কাশ্মীর থেকে অরুণাই ওটা পছন্দ করে কিনেছিল। মূর্তিটা একজন পুরুষের। কালো মিশমিশে তার সুগঠিত দেহের রং। দুটো হাত জয়ের ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তোলা।

প্রথমটা আমি ঠিক খেয়াল করিনি। রাত তখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। শনিবার বলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে অরুণাকে নিয়ে একটা বাংলা ছবি

দেখতে গিয়েছিলাম। সুতোটাকে তখনও ড্রয়ারেই দেখে গেছি। কিন্তু ফিরে এসে খাওয়ার পাট সেরে টেবিলে গিয়ে বসতেই লক্ষ করলাম ড্রয়ারটা হাট করে খোলা। অরুণাও সেটা লক্ষ করে বলে উঠল চোর-টোর এসেছিল কি না। কিন্তু আমি জানি, আসেনি। অরুণাকে শুতে যেতে বলে আমি ড্রয়ারটা পুরোটা খুললাম। ঠিক যা ভেবেছিলাম, তাই। সুতোগাছাটা ড্রয়ারে আর নেই।

ড্রয়ার বন্ধ করে টেবিলের ওপরে রাখা কালো মুর্তিটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। টেবিল ল্যাম্পের আলো সরাসরি গিয়ে পড়েছে মূর্তিটার ওপরে। তারই আলোর স্পষ্ট দেখলাম, মূর্তির যে-হাত দুটো জয়ের ভঙ্গিতে ওপরে তোলা ছিল, তাদের অর্থ কেমন যেন পালটে গেছে। হাতের ভঙ্গিতে কোনও রদবদল না হলেও এখন মনে হচ্ছে, মূর্তিটা যেন নিদারুণ আতঙ্কে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নিঃশব্দ চিৎকারে ঘর ভরিয়ে ফেলছে। ঠিক তখনই আমার চোখে পড়ল কালো সুতোটা। মূর্তিটার গলায় সাপের মতো পাকে-পাকে জড়িয়ে রয়েছে সেই কালান্তক সুতো।

ভয়ে-ভয়ে হাত বাড়িয়ে সুতোটা খুলে নিতে চেষ্টা করলাম।

আশ্চর্য! অনায়াসেই ওটা খুলে চলে এল আমার হাতে। আরও আশ্চর্য, একইসঙ্গে যেন ফিরে এল মূর্তিটার আগের জয়োল্লাস। আতঙ্কের জমাট পরদাটা তার মুখ থেকে একেবারে নিঃশেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। এ কীসের ইঙ্গিত? শ্রীকান্তর বলা গল্পটা আরও একবার মনে পড়ল।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঠিক করলাম, অরুণাকে সব জানানো দরকার। তাই রাতে শোওয়ার সময় ওকে বললাম, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা?–ঘুমজড়ানো স্বরে অরুণা জানতে চাইল।

আবছা অন্ধকারে শূন্য দৃষ্টি মেলে ওকে শ্রীকান্তর বলা গল্পটা জানালাম।

ও প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ল, বলল, সুনু, তুমি ঠাট্টাও করতে পারো।

নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হতে লাগল। তা হলে এই বিপদের মুহূর্তে আমার পাশে কেউ নেই। অরুণার হাসির কোনও জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে

পড়লাম। সুতোটাকে কালো মূর্তিটার গলা থেকে খুলে কোথায় যে রেখেছি, আর মনে করতে পারছি না।

একটা সামান্য সুতো আমার জীবনকে যেন অদৃশ্য ফঁসে বেঁধে ফেলতে চাইছে।

**১৪ মে, সন্ধ্যা সাতটা**

ক্লাবে আজ আর যাইনি। একটু আগেই চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বলে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়ার জন্যে শাসন করছিল অরুণা। তারপর পাশেই যেন কোন প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গেছে সান্ধ্য পরনিন্দাচক্রে যোগ দিতে। ওকে নিশীথ বা কালো সুতোটা সম্পর্কে আর কোনও কথাই বলিনি। এও বলিনি যে, অফিস থেকে ফিরে একটু আগেই আমি কালো সুতোটাকে আবার খুঁজে পেয়েছি। খুঁজে পেয়েছি ভারি অদ্ভুত জায়গায়, ভারি অদ্ভুতভাবে।

অরুণার ড্রেসিং টেবিলে আমাদের বিয়ের (গলায় মালা দেওয়া অবস্থায়) একটা ফ্রেমে বাঁধানো বড় ফটো আছে। অফিস থেকে ফিরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি কালো সুতোটা অরুণা আর আমার ফটোর মাঝখানে পাঁচিল হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় অলসভাবে ঝুলছে। হাত বাড়িয়ে সুতোটাকে খুলে নিতে গিয়ে টের পেলাম, আমার কেমন যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এমনকী ফটোতে আমার মুখের হাসিখুশি ভাবটা পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে অনিশ্চয়তায় ভরা এক হতবুদ্ধি যুবকের আতঙ্কিত মুখ। হঠাৎ কী হয়ে গেল, পাগল করা রাগে সুতোটাকে দু-হাতের মুঠোয় ধরে আমি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলাম। পাঁচ মিনিট পর যখন সংবিৎ ফিরে পেলাম, দেখি সুতোটা পাঁচ টুকরো হয়ে আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। মনে হল, সুতোর টুকরোগুলো যেন কেঁচোর মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। হাজারো চিন্তায় আমার যুদ্ধক্লান্ত মস্তিষ্কে যেন অবশ হয়ে পড়েছে। বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় নদীর জলের বাষ্প অনুভব করলাম। শুনলাম, কিছু একটা জলে আছড়ে পড়ার ঝপাং শব্দ। আমি কি ধীরে ধীরে কারও সুপ্ত অপূর্ণ ইচ্ছের শিকার হতে চলেছি।

**১৪ মে, রাত একটা**

শোওয়ার পর আজ কিছুতেই ঘুম এল না। সুতোটার অশরীরী উপস্থিতি আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। নিশীথের জলে ভেজা ফুলে ওঠা মুখটা এই মুহূর্তে

যেন আরও বেশি করে মনে পড়ছে। ওর হাতের লাটাইয়ের কালো সুতো তো এত সহজে শেষ হওয়ার কথা নয়! সরস্বতী নদীর ঘোলাটে জলে সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আমার প্রতিবিম্ব নিশীথের জল-তল স্পর্শের আলোড়নে একই ছন্দে কাঁপছে। নিঃসঙ্গ আমি ধানখেতের আল ধরে আনমনাভাবে হেঁটে চলেছি। সন্ধের অন্ধকার চেপে বসেছে মাথার ওপরে। চোখের সামনে ভাসছে নিশীথের কালো সুতোয় ভরা লাটাইটা। আমি যেন…।

কীসের একটা যেন শব্দ হল। হালকা অথচ স্পষ্ট শব্দ। ঘরের অন্ধকারের ভিতরে যেন ফুটে উঠল নিশীথের ক্ষত-বিক্ষত চোখের মণিহীন মুখটা। শব্দটা কি ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে? কে যেন আমাকে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াতে বলছে, কানের কাছে জলের নেশা-ধরানো কল্লোল, আমার হাত যেন শিথিল হয়ে আসছে, গলায় কীসের যেন অস্পষ্ট সুড়সুড়ি, বেশ শীত শীত করছে। আমার, কই অরুণা তো ঘুম ভেঙে উঠে এল না…একটা…একটা সাপিনীশীতল পরিবেশ আমাকে পরতে-পরতে ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। নিশীথ, আমি তো তোকে খুন করিনি, নিশীথ, নিশীথ…।

(আচমকা এক চিৎকারে নাকি সে-রাতে অরুণার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই ও বুঝতে পারে সে-চিৎকার সুনুর, অর্থাৎ, তার স্বামী অয়স্কান্তের। পাশের ঘরে এসেই অরুণা আবিষ্কার করল ঘর অন্ধকার। কোনওরকমে হাতড়ে হাতড়ে ও যখন আলোর সুইচ জ্বালল, তখন দেখল ভারি অদ্ভুত এক দৃশ্য। অয়স্কান্ত রুদ্রের বিশাল দেহটা ঘরের সিলিং থেকে শূন্যে ঝুলছে। দেহটা দুলছে– ঠিক পেন্ডুলামের ধাতব দোলকের মতো। তখনই একটা ছোট্ট জিনিস নজরে পড়েছিল অরুণার। ঝুলন্ত দেহ ও সিলিংয়ের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে শুধু একটা সরু কালো সুতো।)

# অবচেতন

**অবচেতন**

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার আলতো করে হাত রাখলেন তার পোষা অ্যালসেশিয়ানের লোমশ পিঠের ওপরে। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। বিস্তৃত কপালে উড়ে আসা কয়েকগুচ্ছ রুপোলি চুলকে স্বস্থানে ফেরত পাঠিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন।

আমি পাঁচফুট চওড়া টেবিলের এ-প্রান্তে বসে বলে উঠলাম, ডক্টর, স্বপ্ন হোহাক, দুঃস্বপ্ন থোক– এর মানে কী?

আমার স্বরে উত্তেজনার আভাস পেয়ে কুকুরের পিঠ থেকে হাত তুললেন ডক্টর সমাদ্দার। সাইন পেনটা উঁচিয়ে ধরে সাদা প্যাডের ওপরে কিছু লেখার জন্যে তৈরি হয়ে বললেন, ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার রায়, আপনার গল্পটা আমি প্রথম থেকে আর-একবার শুনতে চাই। কাইন্ডলি একটু স্লোলি বলবেন। নিন, শুরু করুন।

আমি, সুদর্শন রায়, চেয়ারে গুছিয়ে বসলাম। ঘরে এয়ারকুলার থাকা সত্ত্বেও মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। ঘর এবং আসবাবপত্রের রং নিষ্কলঙ্ক, সাদা। ডক্টর সমাদ্দারের গায়েও সাদা স্ট্রেচলনের স্যুট। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। হাতের অনামিকায় হিরের আংটি।

একমাত্র ব্যতিক্রম দুশমন : ডক্টর সমাদ্দারের সাড়ে চারফুট লম্বা বিশাল অ্যালসেশিয়ান কুকুর। ওর রং কুচকুচে কালো। কাচের গুলির মতো চোখদুটো সবসময় ধকধক করে জ্বলছে।

ডক্টর সমাদ্দারের চেম্বারে আমি আগেও কয়েকবার এসেছি। কারণ, আমার মাঝে-মাঝে দেখা দুঃস্বপ্নগুলো। তাই দুশমন এবং তার প্রভু, দুজনের সঙ্গেই আমি যথেষ্ট পরিচিত।

আমার আগের দেখা দুঃস্বপ্নগুলো যেমন অবাস্তব, তেমনই উদ্ভট। প্রথম দুঃস্বপ্নে দেখেছি, একটা এরোপ্লেন থেকে আমি একজন পাইলটকে ধাক্কা দিয়ে শুন্যে ফেলে দিচ্ছি। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখেছি জলের তলায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমার মরণপণ যুদ্ধ চলছে। অবশেষে তাকে গলা টিপে খুন করে আমি জলের ওপরে ভেসে উঠছি (এবং একইসঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানায় উঠে বসেছি)।

দুঃস্বপ্ন হলেও সেগুলো কখন স্থায়ী হয়নি। ক্ষণিকের দেখা, এবং ক্ষণিকেই তা মিলিয়ে গেছে। সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার বলেছিলেন, এ-দুঃস্বপ্ন দেখার কারণ মনের অবচেতনে অপরাধ করার সুপ্ত বাসনা—এর বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

এসব ঘটনা প্রায় বছরখানেক আগের।

কিন্তু গত সাতদিন ধরে এক অদ্ভুত ধারাবাহিক স্বপ্ন আমি দেখে চলেছি। যা প্রথমে ছিল অর্থহীন, কিন্তু পরে...।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলাম। রুমাল বের করে চোখ মুছলাম। ডক্টর সমাদ্দার নীরবে আমার কথা বলার অপেক্ষায় রইলেন। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করলাম, ডক্টর, সবকিছুর শুরু লাস্ট মঙ্গলবার। আমি বিয়ে করিনি। শুতে-শুতে রোজই বেশ রাত হয়। সেদিনও রাত হয়েছিল। কিন্তু ঘুম আসতে আমার কখনও দেরি হয় না। সুতরাং মিনিটকয়েকের মধ্যেই গভীর ঘুমে ডুবে গেছি। সে-রাতেই অদ্ভুত স্বপ্নটা প্রথম দেখলাম।

দেখলাম, আমি একটা বিশাল বাড়ির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে ব্যস্ত লোকজন সাদা পোশাকে চলাফেরা করছে। ফ্লুওরেসেন্ট আলো-ঝলমলে তেলচকচকে করিডর ধরে আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। কাজে ব্যস্ত লোকজন কেউ যেন আমাকে দেখেও দেখছে না। এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি ঢুকে পড়লাম একটা ঘরে। সে-ঘরে সাজানো সারি-সারি স্প্রিং-এর খাট। তাতে শুয়ে আছে নানান বয়েসের নারী-পুরুষ। তাদের শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে।

প্রথম দিনের স্বপ্ন এখানেই শেষ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম, কিন্তু দ্বিতীয় দিন একই স্বপ্ন আমি আবার দেখেছি। কিন্তু সেদিনের স্বপ্ন আমাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেল। দেখলাম, সেই বিশাল সাদা ঘরটার একপ্রান্তে একটা ছোট দরজা। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো যান্ত্রিকভাবে সেই ছোট দরজাটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম।

দরজার চৌকাঠ পেরোতেই নজরে পড়ল একটা ছোট্ট ঘর। ঘরটা হয়তো রান্নাঘর, হয়তো বাথরুম, হয়তো ভঁড়ার ঘর–ঠিকমতো কিছু বলতে পারব না। কারণ, ঘরের শুধুমাত্র ডানদিকের একটা অংশ আমার নজরে পড়েছে। সেটা একটা সাদা বেসিন। স্টিলের কল থেকে টইটম্বুর বেসিনে টপটপ করে জল পড়ছে। আর আমি যেন নেশার ঘোরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই জল পড়ার শব্দ শুনছি…।

তৃতীয় দিনের স্বপ্নে প্রথম থেকে শুরু করে সেই বেসিন পর্যন্ত আসার পর খেয়াল করলাম, ঘরে আমি একা নই। একজন লম্বা মানুষ, পরনে সাদা ধবধবে আলখাল্লা, বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার মুখে ব্যঙ্গের হাসি। বিশ্বাস করুন ডক্টর, সেই সাদা পোশাক পরা ভদ্রলোকের চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে! যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার কালো জোড়া ভুরু, টিকোলো নাক, কালো কুচকুচে শৌখিন গোঁফ, ছোট-ছোট চোখ, ফরসা গালের বাঁ-দিকে একটা আঁচিল তিরতির করে কঁপছে।

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার এবার নড়েচড়ে বসলেন। বাঁ-হাতটা দুশমনের পিঠে রেখে বললেন, এক্সকিউজ মি ফর দ্য ইন্টারাপশন, মিস্টার রায়। এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। একটা জিনিস আপনার জানা প্রয়োজন। সাধারণত কোনও স্বপ্নে আমরা যখন আমাদের অচেনা কোনও মানুষকে দেখি, তখন চেতনা ফিরে সেই স্বপ্নে দেখা মানুষের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা আমরা কখনও দিতে পারি না। ইটস আউট অ্যান্ড আউট ইমপসিবল সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লম্বা লোকটিকে আপনি আগে কোথাও দেখেছেন। য়ু মাস্ট হ্যাভ সিন হিম সামহোয়্যার। আই অ্যাম শুওর অফ ইট!

আমার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে সম্ভবত একটা বিহ্বল ভাব ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, মিস্টার রায়। যেটা হওয়া উচিত সেটাই আপনাকে এক্সপ্লেইন করলাম। নাউ গেট অন উইথ ইয়োর স্টোরি

বলে চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে সাদা ফ্লানেলে লেন্সদুটো ঘষে নিলেন। তারপর চশমা চোখে দিলেন।

আমি ঘটনা-পরম্পরা একবার ভেবে নিয়ে বলে চললাম, তৃতীয়দিনের স্বপ্ন সেখানেই শেষ। চারনম্বর দুঃস্বপ্ন দেখলাম আরও দু-দিন পরে, এবং আগের মতোই তিননম্বর স্বপ্নের অসমাপ্ত অংশ এবারেও শেষ হল চারনম্বরে গিয়ে।

একটু ইতস্তত করে আবার বলতে শুরু করলাম, ডক্টর, আমাকে দেখে সেই ভদ্রলোক হাসলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার রায়। আই অ্যাম ডক্টর শঙ্করদাস গিরি। আমি চুপ করে রইলাম। তারপর ডক্টর গিরি ঘুরে গেলেন বেসিনের দিকে। মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালেন কলের সামনে। বাঁ-পাশের ছোট্ট তাক থেকে একটা সাদা রঙের সাবান নিয়ে তিনি মুখে ঘষতে লাগলেন। আমি ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ধোওয়া লক্ষ করে চললাম। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা টের পেলাম। আমার হাতদুটো যেন অধৈর্য আর চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। শেষে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। এগিয়ে গেলাম ডক্টর গিরির কাছে খুব কাছে। তারপর বিদ্যুঝলকের মতো ক্ষিপ্রতায় বেসিনের ওপর ঝুঁকে থাকা তাঁর মাথাটা চেপে ধরলাম। ডক্টর গিরির শরীরটা ঝটকা দিয়ে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। উনি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও তারপরেই সর্বশক্তি দিয়ে আমার সঙ্গে যুঝতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর মাথাটা বেসিন-ভরতি জলের দিকে ঠেলে নিয়ে চললাম। আমি পেছনে থাকায় ডক্টর গিরি বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। একসময় হেরে গেলেন।

ডক্টর গিরির মাথাটা জলে ডুবিয়ে চেপে ধরতেই তাঁর শরীরটা প্রচণ্ড আক্ষেপে কেঁপে উঠতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চলল শরীরের ঝটাপটি। একসময় সব থেমে গেল।

দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে যখন জেগে উঠলাম, তখন আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলাম। অসহায় চোখে তাকালাম অম্বিকা সমাদ্দারের দিকে। তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মাঝে-মাঝে প্যাডের কাগজে কী যেন লিখছেন।

হঠাৎই মুখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, তারপর?

আমি মৃদুস্বরে জবাব দিলাম, তারপর, গতকাল, অর্থাৎ, সোমবার, স্বপ্নটা আবার শুরু থেকে দেখতে শুরু করলাম। সেই করিডর, সেই ঘর, সেই ছোট দরজা–অবশেষে ডক্টর গিরির নিথর শরীরের কাছে দাঁড়িয়ে আমি।

আমি গিরির বডিটা একটা ঘোরের মধ্যে কাঁধে তুলে নিলাম। ওঁর মাথার ভিজে চুল থেকে তখনও টপটপ করে জল পড়ছে।

আগে খেয়াল করিনি, এখন দেখলাম, ছোট ঘরটার ডানপাশে, বেসিন থেকে কিছুটা এগিয়ে, একটা খোলা দরজা। আমি একটুও ভয় না পেয়ে শঙ্করদাসকে কাঁধে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সামনের করিডরে একটা অল্প পাওয়ারের বা জ্বলছিল। সেটা পেরোতেই চোখে পড়ল একটা ছোট দরজা। দরজা খুলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে অন্ধকার খোলা মাঠ। দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে। আমি একটুও না থেমে হেঁটে চললাম। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না।

একসময় দেখলাম, একটা হালকা জঙ্গলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে কয়েকটা বড় বড় গাছ। কী গাছ জানি না। শঙ্করদাসের দেহটা ঘাসছাওয়া মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। তারপর একটা কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম। কোদালটা কোত্থেকে যে আমার হাতে এল বলতে পারি না।

মাটি খোঁড়া শেষ হল। সেই গর্তে ডক্টর গিরিকে আমি শুইয়ে দিলাম। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, তাঁর চোখদুটো কোটর ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ওঁর ডানহাতের শক্ত মুঠোয় ধরা রয়েছে সেই সাদা সাবানটা।

কেমন একটা ভয় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। তাড়াহুড়ো করে গর্তে মাটি ঢালতে লাগলাম। একসময় ভরাট হল গর্ত। কোদালটা হাতে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছি, তখনই আমার নজরে পড়ল, ডক্টর গিরির ডানহাতটা কবরের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। সে-হাতের শক্ত মুঠোয় তখনও ধরা রয়েছে সাদা সাবানটা। আমি ভয় পেয়ে খোলা মাঠ ধরে ছুটতে শুরু করলাম। কোদালটা কোথায় হারিয়ে গেল জানি না...।

একটু পরেই দেখি, আমি সেই বিশাল ঘরটায় দাঁড়িয়ে। যে-ঘরে সারি-সারিভাবে স্প্রিং এর খাট সাজানো রয়েছে। ঘরে একটা নীল রঙের আলো জ্বলছে। সাদা

চাদরে ঢাকা মানুষগুলোকে পেরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। দেখলাম, একেবারে শেষে একটা খাট খালি। কোনও লোক সেখানে শুয়ে নেই। আমি বাধ্য শিশুর মতো গিয়ে সেই ধবধবে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চাদরে ঢেকে ফেললাম আমার শরীর। ক্রমশ ঘুমে চোখ বুজে এল...।

স্বপ্নটা এখানেই শেষ, ডক্টর। আমার গলার স্বর যেন আশঙ্কায় কেঁপে উঠল । কিন্তু আজ দুপুরে ঘুমের মধ্যে আবার এই একই স্বপ্ন। করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত, আবার দেখলাম। আমার ভয় হচ্ছে, এবার থেকে হয়তো এই দুঃস্বপ্নটা রোজ রাতে আমাকে দেখা দেবে।

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার ডানহাত আর বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুল পরস্পরের মাথায় চুঁইয়ে কয়েকমুহূর্ত নীরব রইলেন। আপনমনেই বারকয়েক মাথা নেড়ে বললেন, আপনার অনুমান ভুল নয়। আমারও বিশ্বাস এ-দুঃস্বপ্ন রোজ রাতে আপনাকে দেখা দেবে। আপনার স্বপ্ন নিয়ে আমাকে দুটো দিন ভাবার সময় দিন। তারপরই আমি আপনাকে এর রিমেডি জানাব। আজ তা হলে।

আমি ইঙ্গিত বুঝতে পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে গুনে-গুনে চৌষট্টি টাকা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ডক্টর সমাদ্দার মাথা ঝুঁকিয়ে বিলটা লিখতে লিখতে বললেন, আপনি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় আসুন। আর এর মধ্যে যদি ওই নাইটমেয়ার আবার দেখেন তা হলে আমাকে জানাবেন, কেমন?

ইয়েস, ডক্টর। বিলটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পকেটে ভরলাম। যথাক্রমে দুশমন এবং তার প্রভুর সঙ্গে নজর মিলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। স্প্রিং-এর দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ি নামতে নামতে মনের আয়নায় ভেসে উঠল শঙ্করদাস গিরির মুখ। এবং পরক্ষণেই যেন দেখতে পেলাম কবরের বাইরে বেরিয়ে থাকা তাঁর সাবান-ধরা ডানহাতটা...।

.

বৃহস্পতিবার বিকেল ঠিক পাঁচটায় ডক্টর সমাদ্দারের চেম্বারে হাজির হলাম। আমাকে দেখে পরিচিতের হাসি হেসে তিনি বসতে বললেন। দুশমন যথারীতি তার

প্রভুর পাশে বসে। ডক্টর সমাদ্দারকে জানালাম তাঁর অনুমানই ঠিক। এই দু-দিনে সেই স্বপ্ন আমি আরও দুবার দেখেছি।

উত্তরে মনের বক্তব্যকে যেন গুছিয়ে নিলেন ডক্টর সমাদ্দার। মাথার রুপোলি চুলে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, মিস্টার রায়, এ দু-দিন আমি আপনার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। তাতে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তার খানিকটা আমি আগেরদিনই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ, ডক্টর শঙ্করদাস গিরিকে আপনি সত্যি-সত্যি কোথাও-না-কোথাও দেখেছেন।

আমি বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লাম।

ডক্টর সমাদ্দার বলে চললেন, তা ছাড়া আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। মিস্টার রায়, কখনও কি আপনি কোনও হসপিটাল, নার্সিং হোম বা মেন্টাল হোমে ছিলেন?

আমি স্পষ্টস্বরে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, ছিলাম। সামান্য মেন্টাল প্রবলেম হওয়ার জন্যে আমাকে মাসখানেক মাইথনের একটা মেন্টাল হোমে কাটাতে হয়।

কবে?

গতবছর শীতে।

সেই মেন্টাল হোমের নাম আর অ্যাড্রেস আপনার মনে আছে?

আছে। আমি নাম ও ঠিকানা বললাম।

প্যাডের কাগজে সেটা টুকে নিলেন ডক্টর সমাদ্দার। তারপর বললেন, এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন : স্বপ্নে দেখা সেই বাড়ির সঙ্গে মাইথনের সেই হোমের কি কোনও মিল আছে? ভালো করে ভেবে জবাব দিন।

অত ভাবার দরকার নেই, ডক্টর বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, অনেকটাই মিল আছে।

তা হলে আমার অনুমানই ঠিক। ধীরে-ধীরে বললেন অম্বিকা সমাদ্দার, কারণ, বাড়িটার এমন বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোনও

হসপিটাল বা নার্সিং হোমের। সুতরাং, এখন আপনার উচিত মাইথনের সেই মেন্টাল হোমে যাওয়া, এবং স্বপ্নে দেখা ব্যাপারগুলো মিলিয়ে নেওয়া। যেমন ধরুন, সত্যিই শঙ্করদাস গিরি নামে কোনও ডক্টর সেখানে আছেন কিনা। অথবা সেই জঙ্গল, মাঠ–সত্যিই এসবের কোনও অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে কিনা। তা হলেই আপনার কনশাস আর সাবকনশাস মাইন্ডের গরমিলগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানে গিয়ে আপনার খোঁজখবরের রেজাল্ট আমাকে জানাতে ভুলবেন না, কেমন?

আলোচনা-শেষের স্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু আমি বসেই রইলাম। ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। অভিব্যক্তিতে একটি নীরব প্রশ্নচিহ্ন ফুটিয়ে অপেক্ষায় রইলেন।

ডক্টর, আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। একটু ইতস্তত করে বললাম, মাইথনে আমার সঙ্গে আপনাকেও আসতে হবে। ওখানে একা যেতে হলে আমি খুব শেকি ফিল করব। ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড–এ জন্যে আপনার ফিজ যা লাগে আমি দেব। প্লিজ, ডক্টর, প্লিজ, আমার সঙ্গে আপনি চলুন। একটা দিনের তো ব্যাপার!

ডক্টর সমাদ্দার কয়েকমিনিট চুপ করে রইলেন। কী যেন ভাবলেন মনে-মনে। অবশেষে মুখ খুললেন, আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি, মিস্টার রায়, কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া একটু প্রবলেম। আমার চেম্বার রয়েছে, রয়েছে দুশমন, তা ছাড়া।

আপত্তি করবেন না, ডক্টর। অনুনয়ের সুরে বললাম, প্লিজ, একটা দিন আপনি আমার জন্যে সময় দিন। বললাম তো, আপনার প্রপার ফিজ আমি নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে। প্লিজ।

কিন্তু দুশমন? দুশমনের পিঠে হাত রাখলেন ডক্টর সমাদ্দার, আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না। আমি ছাড়া কারও কথা ও শোনে না, কারও হাতে খাবার খায় না।

মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, ওকেও তা হলে সঙ্গে নিন। আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ডক্টর, প্লিজ, ওখানে আমাকে একা যেতে বলবেন না।

ডক্টর সমাদ্দার দুশমনের লোমশ কালো পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আপনার কথাই থাক। দুশমনও আমাদের সঙ্গী তোক। তারপর দুশমনের পিঠে চাপড় মেরে গেট রেডি, দুশমন, কাল আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।

উত্তরে দুশমনের হিংস্র দাঁতের ফাঁক থেকে একটা চাপা গরগর শব্দ ভেসে এল।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর। আবেগে ডক্টর সমাদ্দারের হাত চেপে ধরলাম। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভিজিট-এর চৌষট্টি টাকা তুলে দিলাম তাঁর শীর্ণ হাতে। বললাম, তা হলে আগামীকাল দুপুরের ট্রেনে আমরা রওনা হচ্ছি।

মৃদু হেসে ঘাড় হেলালেন অম্বিকা সমাদ্দার।

ওঁর চেম্বার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম।

*

মাইথনের সেই মেন্টাল হোমের দরজায় যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধে সাড়ে ছটা।

বর্ষার শেষ এবং শরতের শুরু। হয়তো সেই কারণেই বেলাশেষের আলোটুকু পশ্চিমপ্রান্তে অদৃশ্য হওয়ার আগে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধাগ্রস্ত আমিও। এই নির্জন পরিবেশে দাঁড়িয়ে সেই দুঃস্বপ্ন যেন ফিরে আসছে বারবার।

সদর দরজায় লাগানো নামের ফলকের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম, ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দারের স্বরে চমক ভাঙল, মিস্টার রায়, অকারণে সময় নষ্ট করে লাভ কী? চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

অতএব আমরা এবং দুশমন–তিনজনেই পা বাড়ালাম অন্দরমহলের দিকে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটায় আলো জ্বলছে। সারি সারি জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা আলো যেন মাঝপথেই অন্ধকারের কাছে হার মেনে থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখে এসে পড়ছে শুধুমাত্র তাদের মলিন আকৃতিটুকু।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেই টানা করিডর। তার দুপাশে কিছুদূর পরপর পরদাটাকা দরজা। দরজার মাথায় সাইনবোর্ডের মতো বেরিয়ে থাকা কাঠের ফলকে অফিস, এনকোয়ারি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইত্যাদি স্পষ্ট ইংরেজি হরফে লেখা। করিডরে নজরে পড়ছে সাদা-পোশাকে ফিটফাট কর্মীদের আনাগোনা।

করিডর ধরে অফিসরুমে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে অনুসরণ করলেন ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার। সঙ্গে দুশমন।

অফিস বলতে যা বোঝায়, ঘরটা ঠিক তাই। একেবারে নিখুঁত।

খুঁত শুধু টেবিলের ওপারে বসে থাকা ভদ্রলোকের ডানচোখে। চোখটা কালো প্যাঁচ দিয়ে ঢাকা। হয়তো কোনও দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ল, গত শীতে এঁকে আমি দেখিনি।

আমাদের বসতে অনুরোধ করে তিনি প্রশ্ন করলেন, ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

জবাব দিলেন ডক্টর সমাদ্দার। যদিও প্রশ্নটা করা হয়েছিল আমাকে লক্ষ্য করেই। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার নাম ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার, সাইকিয়াট্রিস্ট। মিস্টার সুদর্শন রায় আমার পেশেন্ট। গতবছর, শীতের সময়, ইনি আপনাদের কেয়ারে কিছুদিন ছিলেন। এখন এঁর ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আপনাদের একটু কোঅপারেশান দরকার–যেমন, প্রথমে মিস্টার রায়কে নিয়ে এই গোটা বিল্ডিংটা আমি একবার ঘুরে দেখতে চাই। তারপর–।

ডক্টর সমাদ্দারকে বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম, এক্সকিউজ মি, এখানে ডক্টর শঙ্করদাস গিরি নামে কেউ আছেন?

শঙ্কর-দাস-গিরি? নামটা আপনমনেই বারকয়েক বিড়বিড় করলেন ভদ্রলোক। তারপর বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন।

পরক্ষণেই সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন বেয়ারা দরজায় এসে দাঁড়াল। তাকে লক্ষ্য করে একচক্ষু ভদ্রলোক আদেশ করলেন, ভাটিয়াসাব কো সেলাম দো–।

মিনিটকয়েক নীরবতার পর বেঁটেখাটো এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। বারদুয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একচক্ষু ব্যক্তিকে

উদ্দেশ করে বললেন, হোয়াট্‌স দ্য ম্যাটার, মিস্টার মহাজন?

আসুন, মিস্টার ভাটিয়া। ইশারায় তাকে চেয়ারে বসতে বললেন মহাজন : এঁরা জানতে চাইছেন শঙ্করদাস গিরির কথা। আমি তো এখানে নতুন, তাই ভাবলাম, খবরটা আপনিই ভালো দিতে পারবেন।

ভাটিয়া চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, দেখুন, ডক্টর শঙ্করদাস গিরির ব্যাপারটা একটু মিস্টিরিয়াস। মাসছয়েক আগে, গত শীতে, হঠাৎই একদিন তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। বহু চেষ্টা করেও তার কোনও খবর আমরা পাইনি।

আমার হাত-পা থরথর করে কঁপতে লাগল। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করল। শরীরে রক্তের চাপ হঠাৎ বেড়ে ওঠায় ভাটিয়ার আর কোনও কথা আমার কানে ঢুকল না। শুধু শঙ্করদাস গিরির নিখোঁজ হওয়ার খবরটা আমার মাথার ভেতরে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল।

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। চাপা গলায় বললেন, বি স্টেডি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

নিজেকে সামলে নিয়ে দেখি ভাটিয়া ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। মহাজন আমাদের দিকে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে। ডক্টর সমাদ্দার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে উঠতে ইশারা করলেন। দুশমনও উঠে পড়ল।

ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ডক্টর সমাদ্দার মহাজনকে জানালেন তাঁর খুব বেশি হলে আধঘণ্টা সময় লাগবে।

করিডর ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। এক-এক পা এগোচ্ছি আর আমার বুকের ঢিপঢ়িপ শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার কিন্তু নির্বিকার। দুশমনও নীরবে তার প্রভুকে অনুসরণ করে চলেছে।

মিনিটতিনেক হাঁটার পর চোখে পড়ল, আর-একটা করিডর আড়াআড়িভাবে প্রথম করিডরকে কেটে এগিয়ে গেছে। সেই চৌরাস্তায় পৌঁছে আমি একবার ডানদিকে এবং বাঁ-দিকে তাকালাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ডানদিকে এগোলাম। ডক্টর সমাদ্দারও আমাকে অনুসরণ করলেন।

কয়েক পা যেতেই বাঁ-দিকে একটা খোলা দরজা আমার নজরে পড়ল। দরজা পেরোতেই একটা বিশাল ঘর। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। আর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সাজানো রয়েছে সারি-সারি স্প্রিং-এর খাট। তাতে শুয়ে আছে বিভিন্ন বয়েসের পুরুষ। তাদের শরীর সাদা চাদরে খানিকটা করে ঢাকা। দেখে তাদের অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।

বিশাল ঘরটায় ডানকোণে একটা ছোট দরজা দেখে আমি একটুও অবাক হলাম না। কারণ, এখন বুঝতে পারছি, এরপর কোন-কোন দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ছোট দরজা লক্ষ করে এগিয়ে চললাম। পেছনে অম্বিকা সমাদ্দার ও দুশমন।

ছোট দরজায় দাঁড়িয়ে আমার আর ডক্টর সমাদ্দারের চোখাচোখি হল। কারণ, দরজা পেরিয়েই একটা ছোট ঘর। সেই ঘরের ডানদিকে রয়েছে আর-একটা দরজা, আর দরজার পরে দেওয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে একটা ধবধবে সাদা বেসিন। সেটা জলে টইটম্বুর। কল থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল টপটপ করে বেসিনে পড়ছে। বেসিনের বাঁ-পাশে ছোট তাকে একটা সাবান রয়েছে । তার রং নীলসাদা নয়।

এবার আমি সম্মোহিতের মতো ডানদিকের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকালাম না। কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম ডক্টর সমাদ্দারের ভারী বুটের শব্দ।

সামনের করিডরে একটা অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেটার শেষ প্রান্তে একটা খাটো দরজা। দরজাটা ভেজানো ছিল, আমি সেটা খুলে বাইরের অন্ধকার খোলা মাঠে পা রাখলাম।

অন্ধকারের মধ্যেই দুরে কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে। আমি অক্লান্ত পায়ে হেঁটে চললাম। গন্তব্যস্থল কোথায় জানি না।

হঠাৎই পায়ের কাছে একটা আলোর বৃত্ত দেখে চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি ডক্টর সমাদ্দার পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বেলেছেন। এই ঘন অন্ধকারে তাঁর সঙ্গে হেঁটে চলা দুশমনকে স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে না।

আমাকে ফিরে তাকাতে দেখে বলে উঠলেন অম্বিকা সমাদ্দার, মিস্টার রায়, একমিনিট। আপনার কি মনে হচ্ছে যে, আপনার স্বপ্নের সঙ্গে এইসব মিলে যাচ্ছে?

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। শুধু মাথা ঝাঁকালাম।

ডক্টর সমাদ্দার থমকে দাঁড়ালেন। আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম তাঁর মুখোমুখি।

আমার মনে হয়, আপনার অন্য স্বপ্নগুলোর মতো এটাও আপনার কল্পনা। শুধু এই হোমের পটভূমি আপনার কল্পনাকে স্বপ্নে গড়ে তুলতে হেল্প করেছে, তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং, আমার মনে হয়, আর সময় নষ্ট না করে আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো। বাড়ি ফিরে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করুন, ঘুরে বেড়ান, দেখবেন দু-দিনেই ওই নাইটমেয়ার কোথায় মিলিয়ে গেছে। সো, লেটস গো ব্যাক–

ডক্টর সমাদ্দার ঘুরে দাঁড়াতেই আমি চাপা গলায় বলে উঠলাম, নো ডক্টর, নেভার। আমি এর শেষ দেখতে চাই।

অন্ধকারে সমাদ্দারের অভিব্যক্তি আমার নজরে পড়ল না। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শেষ মানে? ও. কে.–অ্যাজ য়ু উইশ। কাম অন, দুশমন–

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

আচ্ছন্নের মতো চলতে-চলতে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, একটা হালকা জঙ্গলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ভিজে হাওয়ার ঝাপটা আমার চোখে-মুখে ঠান্ডা পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। চারপাশে চেয়ে দেখি কয়েকটা বড়-বড় গাছ : কী গাছ জানি না। তারই মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পায়ের কাছে টর্চের আলোর বৃত্তে নজরে পড়ল ঘাসে ছাওয়া মাটি।

আমাকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অম্বিকা সমাদ্দার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুশমনের চাপা হিংস্র গর্জন তাকে থামিয়ে দিল। দুশমন আমাদের ছাড়িয়ে চট করে কিছুটা এগিয়ে গেল। ছটফটে পায়ে ফাঁকা জায়গাটাতে পায়চারি করতে লাগল।

আমার বুকের ভেতরে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। একটা অদ্ভুত আশঙ্কা যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে।

দুশমনের গর্জন একটু জোরালো হল। অন্ধকারে ওর আবছায়া শরীরটা ঘাস-ছাওয়া জমিতে নড়াচড়া করছে।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম নড়াচড়া নয়, দুশমন প্রাণপণে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

ডক্টর সমাদ্দারের টর্চ-ধরা হাত কেঁপে উঠল। তারপর গিয়ে স্থির হল দুশমনের কালো বিশাল শরীরের ওপরে। ওর তীক্ষ্ণ থাবার আঁচড়ে ওপরের ঘাস ছিঁড়ে নীচের মাটি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে।

মাত্র কয়েকমিনিট। তারপরই যে-দৃশ্য দুশমন দেখাল, তাতে আমি অবাক না হলেও ডক্টর সমাদ্দার চমকে উঠলেন। তাঁর মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। গর্জন করে উঠল দুশমন। আমি নিশ্চপ, নিথর। ডক্টর সমাদ্দারের টর্চের আলো খাবলানো মাটির ওপরে থরথর করে কাঁপছে। তবুও দেখতে আমাদের কোনও অসুবিধে হল না। স্পষ্ট দেখলাম, সামান্য খোঁড়া মাটি থেকে বেরিয়ে রয়েছে পচে যাওয়া একটা হাত। সে-হাতের কোনও-কোনও জায়গায় সাদা হাড়ের আভাস নজরে পড়ছে। আর সেই বিধ্বস্ত হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা ময়লা সাদা সাবান।

# না ভেবে খুন কোরো না...

**না ভেবে খুন কোরো না...**

অনাদি সামন্ত আগে কখনও খুন করেনি। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই শুভ উদ্বোধন বলে একটা কথা আছে, সুতরাং অনাদি সামন্তর জীবনেও সেই শুভ উদ্বোধন এল। শুভ ১লা বৈশাখের পুণ্য লগ্নে সে তার জটিলা এবং কুটিলা স্ত্রী নিরুপমা সামন্তকে খুন করল।

খুনটা সে করেছিল নেহাতই গলা টিপে। নিরুপমার দেহটা যখন অসাড় হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল তখন রাত নটা।

অনাদির বাড়ি বউবাজার অঞ্চলে। ফ্ল্যাট ভাড়া করে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে থাকত। খুন করার আগে অতশত সে ভাবেনি। তাকে যদি কেউ প্রশ্ন করত, বউয়ের এই পঁয়ষট্টি কেজি লাশ তুমি গায়েব করবে কী করে, সে সোজা উত্তর দিত, অতশত এখনও ভেবে দেখিনি। সুতরাং, নিরুপমা মৃতসমা হওয়ার পরই সে একটু চিন্তায় পড়ল। লাশটা নিয়ে কী করা যায়?

প্রথমে ভাবল ঘরের ভেতরেই ওটা জ্বালিয়ে দেবে কি না। পরে চিন্তা করে দেখল, তাতে পাড়াপড়শি ও বাড়িওয়ালার দুর্গন্ধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কোনও পন্থা ভেবে বের করার আগে সে রহস্য-রোমাঞ্চ বইয়ে পড়া লাশ গায়েবের উপায়গুলো স্মৃতির পাতা হাতড়ে খতিয়ে দেখতে শুরু করল।

নিরুপমাকে টুকরো-টুকরো করে আচার দিয়ে খেয়ে ফেলবে? নাকি খণ্ড-খণ্ড করে মৃতদেহের অংশগুলো কাগজে মুড়ে কলকাতার জনবহুল রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেবে? আবার ট্রাঙ্কে ভরে ট্রেনে তুলে দেওয়ার কায়দাটাও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তার চিন্তাধারা অব্যাহত গতিতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে চলল।

নিরুপমা যখন শক্ত-পোক্ত (রাইগ্যর মর্টিস) হল তখন অনাদি সামন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছল। এতক্ষণ সে ঘরের আলো জ্বেলে নিরুপমার মাথার কাছে বাবু হয়ে বসেছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল কাটারি আনতে। কাটারি নিয়ে এসে তার চেষ্টাচরিত্র শুরু হল।

প্রথম কোপটা পড়ল নিরুপমার গলায়। যে-নিরুপমা বেঁচে থাকলে তীব্র প্রতিবাদে ছটফট করে উঠত, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠত, সে এখন চুপটি করে রইল। অনাদির অস্বামীসুলভ আক্রমণ নিরুপমার শরীরে অব্যাহত রইল সারাটি রাত। মাঝখানে শুধু একবার হাত-পা ধুয়ে সে খেতে গেল। সামান্য একটু আঁশটে গন্ধ ছাড়া খাওয়াদাওয়া করতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি।

সুপ্রভাত হল। ক্লান্ত-শ্রান্ত অনাদি ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা নিরুপমার কাছেই শুয়ে। কাটারিটাও অনাদি সামন্তর অদূরে ঘুমিয়ে আছে। কাকের ডাক ও নিরুপমার গন্ধে অনাদির ঘুম ভাঙল। সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্যাকিং-পর্ব শুরু হল। বারোটা প্যাকেটে গুছিয়ে ফেলা হল পঁয়ষট্টি কেজির নিরুপমাকে।

অনাদি সামন্ত সেকেন্ডারি বোর্ডের অফিসে কাজ করে। সুতরাং পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলটার রাতের নির্জন চরিত্র তার ভালোই জানা। গোটা দিনটা সে অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে রইল। নিরুপমা পর্যায়ক্রমে কাঠিন্য, নম্রতা ও গন্ধ বদল করে চলল। অবশেষে রাত সাড়ে নটা নাগাদ নিরুপমার মাথার প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে অনাদি সামন্ত রাস্তায় পা দিল। রওনা হল পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

রাস্তায় বেরোনোর আগে নিরুপমার সুগন্ধির শিশি নিজের গায়ে উজাড় করে দিল অনাদি। হাড়কাটার মোড় থেকে বেলফুলের মালা কিনে হাতে জড়াল। এইভাবে বেলফুল ও সুগন্ধির পরিচিত রাবার স্ট্যাম্প মেরে নিজেকে খারাপ পাড়ার খদ্দের সাজিয়ে ফেলল।

ট্যাক্সি পাওয়া এখন আর সৌভাগ্য নয়। কিন্তু তবুও পাওয়া গেল না। সুতরাং, নিরুপমার মাথা সঙ্গে নিয়ে ট্রামে চড়ে বসল অনাদি। এই প্রথম নিরুপমা আংশিকভাবে ট্রামে চড়ল।

ওয়েলিংটনে নেমে ট্রাম বদল করল। ট্রাম এখন খালি। নিরুপমাকে ট্রামে ফেলে রেখে নেমে পড়লে কেমন হয়? যথা ভাবনা তথা কাজ। ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলের সামনে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অনাদি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ফার্স্ট ক্লাসের গদিমোড়া সিটে মাথা রেখে শুতে নিরুপমার কোনও অসুবিধে হবে না।

কিন্তু তাকে অবাক করে চলন্ত ট্রামটা কয়েক পা এগিয়ে আবার থামল। কন্ডাক্টর গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল অনাদিকে। কষ্টকৃত অন্যমনস্কভাব দেখিয়েও কোনও লাভ হল না। আশেপাশে বিশেষ কোনও লোকজন নেই যে, অনাদি না বোঝার ভান করে ন্যাকামো করবে। সুতরাং ফিরতে হল। কন্ডাক্টরের হাত থেকে নিরুপমাকে ফেরত নিতে হল।

আবার হাঁটতে শুরু করল অনাদি। আস্তে-আস্তে বলল, নিরু, এখনও আমায় ছাড়বি না?

নিরুপমা জবাব দিল না।

পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছে খুশি হল অনাদি সামন্ত। নির্জনতা, জনশূন্যতা ইত্যাদি একসঙ্গে পরিবেশে হাজির। ডানদিকে ঘুরে রাস্তা পার হয়ে অ্যালেন গার্ডেনে ঢুকল সে। একটা ঝোঁপের পাশে ঘাসের ওপরে বসল। এবং পরমুহূর্তেই নিরুপমাকে রেখে উঠে পড়ল।

ডাকটা এল পিছন থেকেই। কেউ তাকে ডাকছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হল অনাদি। একটি লাল শাড়ি পরা চটকদার সাজগোজ করা দেহাতি মহিলা ঘাসের ওপরে ফেলে যাওয়া প্যাকেটে মোড়া নিরুপমার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখন প্যাকেটটা তুলে না নিলে এই মেয়েটিই পরে অনাদি সামন্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলায় সাক্ষী দেবে। অতএব ট্রামের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

এরপর ক্যামাক স্ট্রিট। একটা ডাস্টবিনের কাছে প্যাকেটটা প্রায় ফেলেই দিয়েছিল অনাদি, থমকাল জনৈক রিকশাওয়ালাকে দেখে।

এইভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতেই লাগল। কখনও নির্জনতা খোঁজা প্রেমিক-প্রেমিকা, কখনও মেয়েছেলের দালাল, কখনও-বা প্রহরারত পুলিশ।

ভূমিকা তাদের একই। অনাদি সামন্তর কাছ থেকে নিরুপমা সামন্তর মাথাকে অবিচ্ছিন্ন রাখা।

রাত যখন সাড়ে বারোটা হল, তখনও নিরুপমাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে অনাদি। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন। কাউকে খুন করে দেহের টুকরোগুলো সবার অলক্ষ্যে কলকাতা শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়াটা মোটেই সহজ কাজ নয়। অন্তত গল্পের বইয়ের মতো।

অনাদি সামন্ত এবার অন্ধকার রাস্তার ধারে বসে পড়ল। প্যাকেটে ভরা নিরুপমাকে দুহাতে ধরে মুখের খুব কাছে এনে ফিশফিশ করে ওর সঙ্গে অনেক কথা বলল। তারপর হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে আবার শুরু করল পথ চলা।

.

একজন রোগা ছাপোষা লোককে একটা প্যাকেট নিয়ে রাত একটা নাগাদ থানায় ঢুকতে দেখে সদর দরজার সেপাই অবাক হল।

অনাদি সামন্ত সটান ঢুকে গেল অফিসারের ঘরে। তার টেবিলে প্যাকেটটা নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, ইনস্পেক্টর সাহেব, একজন লোক বিরক্ত হয়ে তার বউকে হঠাৎই একদিন খুন করে ফ্যালে। গল্পের বইয়ে পড়া বিদ্যে থেকে সে ঠিক করে বউকে টুকরো-টুকরো করে লুকিয়ে কলকাতা শহরে ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে পারল না। দেখল, কলকাতায় কোনও নির্জন জায়গা নেই। এখানে সবজায়গাতেই সাক্ষী হাজির। আজ নয় কাল পুলিশের হাতে ধরা সে পড়বেই। সুতরাং রাস্তার ধারে বসে সে তার বউয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল। তারপর সে চলে এল পার্ক স্ট্রিট থানায়। অফিসার-ইন-চার্জের সামনে সব ঘটনা খুলে বলে হালকা হল…।

কথা বলতে-বলতে টেবিলে ঝুঁকে পড়ল অনাদি সামন্ত। অতি যত্নে প্যাকেটটা খুলতে লাগল। একটু পরে হতভম্ব অফিসারের সামনে কোমল স্ফীত নিরুপমা প্রকাশিত হল।

অনাদি সামন্ত নিরুপমার চুল সরিয়ে দিল কপাল থেকে। নিরুপমা সামনে তাকিয়ে। অনাদি একবার হাসল, তারপর বলল, নিরু, এবার তুই খুশি তো?

নিরুপমা কোনও জবাব দিল না। অনাদি অফিসারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, ..সেই লোকটাকে ফাঁসি দিন, স্যার, সেই লোকটাকে ফাঁসি দিন…।

# নষ্ট চাঁদ, কষ্ট চাঁদ

**নষ্ট চাঁদ, কষ্ট চাঁদ**

গল্পের নামটা ভালো হল না–তাই না রে? আসলে কবিতা কবিতা করতে চেয়েছিলাম–কেমন যেন গদ্যের আঁশটে গন্ধ ঢুকে পড়ল। যাকগে। আসলে এটা তো আর গল্প নয়–তোকে লেখা শেষ চিঠি। কিন্তু তুই কি আর চিঠিটা পড়বিমানে, পড়তে পারবি?

মনে পড়ে, সেটা ছিল শ্রাবণ মাস। তোর ভালোবাসার দোকানে আমি কী করে যেন ঢুকে পড়েছিলাম। হা–দোকানই তো! যেখানে সবসময় তোর ভালোবাসা চাওয়ার এত ভিড়। সুজাতা, বন্যা, তিতি, অনিতা–আরও কারা কারা যে তোর সঙ্গে ঘুরতে চাইত, থাকতে চাইত কে জানে!

না, আমি চাইনি। কারণটা তো তুই জানিস। আমার গায়ের রং কালো, রূপও কালো। কখনও কেউ ঘুরে তাকাবে না–এমন মেয়ে আমি। তুই যেমন এটা জানিস আমিও তো জানি। জানব না আর! রোজ হতচ্ছাড়া আয়নাটা যে আমাকে জানিয়ে দেয়!

যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম, যখন বড় হব–আরও বড় হব–তখন এই আজেবাজে চেহারাটা একটু-একটু বদলে গিয়ে কমবাজে হয়ে যাবে। সেই আগুলি ডাকলিং-এর মতো। তখন কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাকাবে। আমার বাপি, মামণি আর কাকিমা-জেঠিমারা আমার বিয়ে হবে কি-হবে না সেই নিয়ে কী চিন্তাই না করত! অবশ্য আমার সামনে কিছু বলত না। কিন্তু আড়াল থেকে আমি শুনতাম। আর আমার কান্না পেত। ওঃ, একটা মেয়ের জীবনে পুরুষ এত জরুরি। কেন, কেন?

পড়াশোনায় খারাপ ছিলাম না–ভালোই ছিলাম। নইলে তোর সঙ্গে সায়েন্স কলেজে দেখা হল কী করে! তুই লেখাপড়ায় আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো। আর দেখতে? তুই যে কেন সিনেমায় কিংবা টিভি সিরিয়ালে গেলি না কে জানে! সুজাতা, বন্যারা তোকে বারবার সে কথা বলত। অবশ্য তুই আমাকে পরে বলেছিলি ওগুলো তোকে খুশি করার জন্যে।

বাইরে আমাকে দেখতে যা-ই হোক আসলে ভেতরে-ভেতরে আমি তো একটা মেয়ে। তখন রোজ ভাবতাম, বিউটি ইজ ওনলি স্কিন ডিপ। চামড়া ডিঙোলেই সৌন্দর্য শেষ। তা হলে কেন? কেন এরকম হবে? তোরা–মানে, পুরুষরা–শুধু বাইরেটাই দেখবি? ভেতরের সুন্দরকে দেখবি না! তুই তো তখন জানতিস না ভেতরে-ভেতরে আমি কী আশ্চর্য রূপসি।

আমি মনে-মনে ভাবতাম, বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়ায় ভোরের আলো এসে পড়লে যেমন অপরূপ দেখায়, আমি সেইরকম। শীতের পর বসন্ত এলে মরাগাছের ডালে যখন ঝকঝকে সবুজ নতুন পাতা ফোটে–ওদের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আমি ওদের মতন। কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ যেমন ডালে-ডালে ফুলের আগুন জ্বালিয়ে রূপসজ্জায় সবাইকে মাতিয়ে দেয়, আমি সেইরকম।

তো এইসব ভাবতাম আর বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে শব্দ না করে কাঁদতাম। নইলে পাশের ঘরে শুয়ে থাকা বাপি আর মামণি শুনতে পাবে যে!

আমার কল্পনা আমার ছিল। আমার স্বপ্ন আমার। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! একটা কাগজের গোল বল সব তালগোল পাকিয়ে দিল।

মনে আছে নিশ্চয়ই তোর, সেদিন আমরা সবাই মিলে টিএসপি-র ক্লাস করছিলাম। উনি জের্যান্টোলজির মেন্টাল এজিং নিয়ে কীসব বকবক করছিলেন। আমি মন দিয়ে শুনতে পারছিলাম না। কারণ, গতকাল ক্যান্টিনে বন্যা একটা কমেন্ট করেছিল। হয়তো ঠাট্টা করেই কিন্তু সেটা আমাকে খুব বিঁধেছিল।

আমি তখন গৌরদার ক্যান্টিনে সেকেন্ড দরজা দিয়ে ঢুকছি। তোরা লম্বা বেঞ্চটায় বসে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি ঢলাঢলি করছিলি। আমাকে দেখেই বন্যা হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, অ্যাই, আলো জ্বেলে দে–মিস ডার্কনেস এসে গেছে!

তখন ঘোর দুপুর। আলো জ্বালার কোনও প্রশ্নই নেই। সুতরাং, বুঝতেই পারছিস আমি এসেছি বলে কেন আলো জ্বালতে হবে।

তাই ক্লাসে বেশ অন্যমনস্ক ছিলাম। তাকিয়েছিলাম টিএসপি-র দিকে, কিন্তু শুনছিলাম না কিছুই। হঠাৎই কী একটা যেন গায়ে এসে লাগল। মাথা ঘুরিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা কাগজের বল। ক্লাসে যেমন ছোঁড়াছুড়ি হয় আর কী! কিন্তু আমার গায়ে কেউ কখনও ছোড়েনি।

অপরাধীর খোঁজে তাকাতেই তোকে দেখলাম। তুই একটু-একটু হাসছিলি। আমি ভাবলাম, ব্যাপারটা তোর কাজ। কিন্তু তুই হঠাৎ আমার গায়ে কেন কাগজের বল ছুড়বি এর উত্তরটা কোনও যুক্তিতেই মাথায় আসছিল না। কিন্তু তুই হাসছিলি। আর আমি তোর দিকে তাকাতেই চোখের ইশারায় বললি, পরে কথা হবে।

চাপতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুকের ভেতরে পাগল করা একটা ঢেউ উঠল। আমাকে ভিজিয়ে দিল, ভাসিয়ে দিল। মনে হল, একটা অলৌকিক স্বপ্ন যেন কোন ম্যাজিকে জ্যান্ত হয়ে হঠাৎ করে ক্লাসরুমে নেমে এসেছে।

পরে তোর সঙ্গে কথা হল। প্রথমে ক্যান্টিনে–তারপর রাস্তায়। ক্যান্টিনে আরও অনেকে। ছিল…কিন্তু রাস্তায় আর-কেউ ছিল না। শুধু তুই, আর আমি। আমাদের পাড়ার কোন একটা দোকানের ঠিকানা খোঁজ করার ছুতোয় তুই আমার হেল্প চেয়েছিলি। এই ছুতোটা হয়তো শুধু আমার জন্যে নয়–বন্যা, তিতি, সুজাতাদের জন্যেও। বেশ মনে আছে, ওরা বেশ অবাক চোখে তোর দিকে তাকিয়েছিল।

রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে তুই যে কত কথা বলেছিলি! খইয়ের বস্তার মুখ আচমকা ছিঁড়ে হাট হয়ে গেলে যেভাবে খই ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে তোর কথাগুলো শব্দের বন্যা হয়ে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

মনে আছে, অনেক কথার মাঝে তুই আমাকে ফস করে বলেছিলি, তুই সবসময় পাঁচিল দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখিস কেন? কারও সঙ্গে কথা বলিস নাসরে-সরে থাকিস…।

কী মারাত্মক কথা! তুই কী করে এটা বুঝলি কে জানে! সত্যিই তো, আমি সবসময় নিজেকে আড়াল করে রাখি। ছেলেদের সঙ্গে মিশি না। অথচ মিশতে

ইচ্ছে করে। কিন্তু ওরা যদি আমার এই হতচ্ছাড়া চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করে! ঠাট্টার খোঁচা কখনও দিয়ে ফ্যালে আমায়! অথচ দ্যাখ, বাইরের চেহারার ওপর কারও কি কোনও হাত থাকে? ওটা তো আকাশ থেকে আসে। তাই আমি যে কত যত্ন নিয়ে আমার ভেতরটা সাজিয়েছি–রোজ সাজাই–তার খবর কে রাখে!

তুই আবার বললি, অনেক চেষ্টা করে তারপর তোর ভেতরটা আমি দেখতে পেয়েছি। তোর ভেতরে-ভেতরে এত!

কী সর্বনেশে কথা! আমি আর কোনও কথা বলতে পারিনি।

প্রথমদিনের পর তোর আর আমার দেখা হওয়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। এতে আশপাশে যে ফিশফাশ হচ্ছে সেটা টের পাইনি এমন বোকা আমি নই। একদিন বন্যা যে চাপা গলায় অনিতাকে বলেছিল, শালা ব্যাপক কম্বিনেশান!–সেটাও আমার কানে এসেছিল। কিন্তু আমি তখন অন্ধ। নিঃশব্দ চরণে যে এসেছে তাকে আমি পাগলের মতো আঁকড়ে ধরেছিলাম। মনে-মনে বলেছিলাম, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না।

কবিতা লেখার অসুখ ছিল আমার। কিন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে। ভাবতাম কালো কুৎসিত মেয়ের আবার কবিতা! একটা কাল্পনিক লজ্জা, একটা কাল্পনিক অপমানের ভয়, একটা কাল্পনিক সংকোচ আমাকে সেই বালিকা বয়েস থেকেই শামুকের মতো গুটিয়ে দিয়েছিল। একদিন, দু-দিন, তিনদিনে তুই সেই খোলসটাকে চুরমার করে দিলি। লুকোনো কবিতা সামনে এসে গেল। তোর সামনে।

অবিশ্বাস্য হলেও তোর সঙ্গে আমার কী করে যেন কী হয়ে গেল। অনেকটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মতন।

শ্রাবণ গড়িয়ে ভাদ্র এল। আমি তোর নেশায় পাগল। আমার ছিন্নছেঁড়া জীবনটা তখন যেন একটু-একটু করে মানে খুঁজে পাচ্ছে। তুই আসা-যাওয়া করছিস আমাদের বাড়িতে। বাড়ির আবহাওয়াটা বদলাচ্ছে। মামণি আর বাপির চোখেমুখে চাপা স্বস্তির ভাব টের পাচ্ছি। হা-হুঁতাশ আঁধারের মধ্যে ওরা যেন একটু আলো দেখতে পেয়েছে।

তোর নিশ্চয়ই সেদিনটার কথা মনে আছে? মানে, সেই রাতটার কথা। বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। আমাদের ফাটল-ধরা ছাদে দুজনে বসেছিলাম। তুই হঠাৎ বললি, চাঁদের আলোয় তোকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

কী করে আমাকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল জানি না। চাঁদের আলো কি অন্তর পর্যন্ত যায়? তাতে কি ভেতরের সৌন্দর্যটা ধরা পড়ে? তবে সেদিনটা বোধহয় নষ্টচন্দ্রের রাত ছিল। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থীর রাত। শুনেছি এই চাঁদ দেখলে কলঙ্ক হয়। হলও। যে-কলঙ্কের আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীর আর মন বহুবছর ধরে অপেক্ষা করেছে তুই আমার সেই আশ মেটালি।

প্রথমে হাতে হাত। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট। আর সবশেষে শরীরে শরীর। সে রাতে আমি পূর্ণ হলাম। তৃপ্তি আর বিস্ময়ে সারাটা রাত ঘুমোতে পারিনি। পরদিন সায়েন্স কলেজে, সুযোগ পেতেই, তোর হাতে একটা আবছা নীল কাগজ ধরিয়ে দিলাম। তাতে একটা কবিতা লেখা ছিল। শুধু তোর জন্যে। তোকে লেখা আমার প্রথম চিঠি। তার চারটে লাইন এই মুহূর্তেও আমার মনে পড়ছে?

ওষ্ঠাধরে কোমল নিপীড়ন,
সয়েছিলাম মধুর যন্ত্রণাতে–
স্পর্শকাতর আমার স্পষ্ট হাত,
রেখেছিলাম তোমার নষ্ট হাতে।

তুই আমাকে বলেছিলি, তোর নৌকোয় কোনও মাঝি ছিল না। অথচ ভাসতে-ভাসতে সেই দিশাহীন নৌকোটা কী করে যেন হঠাৎ তীর খুঁজে পেল। সত্যিই জীবন বড় আশ্চর্য!

তোর কথাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। এ যেন আমারই মনের কথা– তোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বিশ্বাস কর, আমি তখন মনে-মনে তোর সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু একদিন…।

জানি, এইখান থেকে চিঠিটা লিখতে আমার বেশ কষ্ট হবে। কিন্তু লিখতে তো আমাকে হবেই।

সেদিন জেসিএম-এর পিরিয়ডটা অফ ছিল। তো আমি লাইব্রেরিতে একটা বই চেঞ্জ করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে ক্লাসে ঢুকতে যাব–হঠাৎ শুনি তোর গলায় আমার নাম। ক্লাসের বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুই কী বলছিস আমার নামে? কাকেই-বা বলছিস? আমাদের দুজনের যা একান্ত গোপন কথা, যা শুধু আমরা দুজনই জানি–সেসব বলবি না তো?

শুনলাম তুই আমার নাম করে বলছিস, জানিস, ওকে সেদিন নামিয়ে দিয়েছি।

কে একজন জিগ্যেস করল, বস, নামিয়ে দিয়েছ মানে?

সালা ন্যাকা! কিছু বোঝে না!–তুই বললি, নামিয়ে দিয়েছি মানে ওর কেস কমপ্লিট। ছাদে চাঁদের আলোয় বোল্ড করে দিয়েছি।

তা হলে তো তুমি বস ম্যান অফ দ্য ম্যাচ প্রাইজ পাবে। ওরকম বিশখোবড়া থোড়া তুমি ট্যাক্স করলে কী করে?

তোর হাসির শব্দ পেলাম। তারপর তুই বললি, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল। ক্লাসরুমের কাছ থেকে ছুটে চলে যেতে চাইলাম। কিন্তু দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে মাথাটা সাংঘাতিক টলে উঠল। কোনওরকমে রেলিং ধরে সামলে নিলাম। বসে পড়লাম সিঁড়ির ধাপে।

ও মিথ্যে কথা বলছে। আমার মুখে ও মোটেই রুমাল চাপা দেয়নি। বরং আকাঙ্ক্ষার চরম মুহূর্তে ও আমার দিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু কে এখন বিশ্বাস করবে এ-কথা! কেউ না!

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সেই মুহূর্তেই মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু…কিন্তু তখন যদি আমি সুইসাইড করতাম তা হলে তোর মিথ্যেটাই যে চিরস্থায়ী হয়ে যেত। সে আমি হতে দিই কেমন করে!

সেদিনটা কাটল কোনওরকমে। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তুই আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলি। কিছুটা আমিও। পরপর কয়েকটা দিন চোখ-কান খোলা রেখে আরও কিছু খবর পেলাম। জানলাম যে, চারপাশে আড়াল তোলা কুৎসিত এই মেয়েটাকে বোল্ড আউট করবি বলে তুই জয়জিতের

সঙ্গে বিরিয়ানি বাজি রেখেছিলি। না, এই খবরটা নতুন করে কোনও ব্যথা দেয়নি আমাকে। এমনকী খবরটা সত্যি না মিথ্যে সেটা জানার জন্যেও কোনও আগ্রহ জাগেনি। শুধু ওই রুমালের মিথ্যেটা বুকের ভেতরে নিষ্ঠুর অপমানের ছুরি চালিয়েছিল।

তুই ভালো করেই জানতিস, নিজের ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স আড়াল করার জন্যে আমি সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের পাঁচিল তুলে দিয়েছিলাম আমার চারপাশে। আকাঙ্ক্ষায় কাতর এই অরূপ মেয়েটাকে সবাই ভাবত পুরুষবিদ্বেষী, অহঙ্কারী। আজ আর ভালো করে ঠাহর করতে পারি না, আমি তোর প্রেম স্টোর্সে ঢুকে পড়েছিলাম, নাকি তুই আমার পাঁচিলটাকে তোড়ফোড় করে আমার অন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিলি। স্রেফ একপ্লেট বিরিয়ানি খাওয়ার জন্যে।

এই মুহূর্তে সব আমার গুলিয়ে গেছে। শুধু ওই নৃশংস মিথ্যেটুকু সত্যি হয়ে আমার কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসছে। কদিন ধরেই শুনছি এই হাসিটা। আর হৃৎপিণ্ডের গা থেকে নখ দিয়ে খুঁটে ক্রমাগত নুনছাল তুলছে কেউ। জ্বালা–অসহ্য জ্বালা!

তাই আর সইতে না পেরে টেলিফোনে কান্নাকাটি করে তোকে একবারের জন্যে ডেকেছিলাম। বলেছিলাম, শেষবারের জন্যে। আর কোনওদিনও তোকে আসতে বলব না। এই একটিবার অন্তত আয়। ফর ওল্ড টাইমস সেক।

তুই এলি। সঙ্গে তোর রূপ, অহংকার আর মেয়েভোলানো আত্মবিশ্বাস।

সবকিছুই ছিল ঠিক সেদিনের মতো।

আকাশে নির্লজ্জ শুক্লচতুর্থীর চাঁদ। চারপাশে বৃষ্টিভেজা বাতাস। আর নির্জন ছাদের রহস্যময় অন্ধকার।

তুই সেদিনের মতো আবার বললি, চাঁদের আলোয় তোকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, জানি।

তারপর তুই আমায় জাপটে ধরলি। এবার কপালে বিরিয়ানি জুটুক-না-জুটুক, পড়ে পাওয়া চোদ্দোআনা হাতছাড়া করার কোনও মানে হয় না। তাই আবার তুই

আমার কেস কমপ্লিট করলি। ছাদে চাঁদের আলোয় আমাকে দ্বিতীয়বার বোল্ড আউট করলি তুই।

তারপর?

তারপর আমার পালা।

মাংসকাটার ছুরিটা কোথায় লুকোনো ছিল তুই দেখতে পাসনি। কী করেই বা দেখবি! ওটার রং তো আমার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তা ছাড়া ওই রহস্যময় অন্ধকার।

তোর গলার নলি ফাঁক হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল আমার শরীর। তুই ছাদের ফাটল ধরা রুক্ষ মেঝেতে ছটফট করতে লাগলি। শেষবারের মতো চিৎকার করতে চেয়েছিলি বোধহয়– কিন্তু চিৎকারের কঙ্কালটা ঘড়ঘড় শব্দে গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল।

আমি এবারে চাদরের নীচে লুকোনো ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম।

শোনা গেল তোর গাঢ় গলা ও চাঁদের আলোয় তোকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

তোর বলা কথাগুলো মণিমুক্তো হয়ে ধরা রইল চিরকালের জন্যে। এই সত্যিটা এবার চিরস্থায়ী হল।

কিন্তু এখনও যে আমার আর-একটা কাজ বাকি!

তাই তোর স্থির-হয়ে-আসা শরীরের পোশাক হাতড়ে তোর রুমালটা বের করলাম। তুই তখন হাঁ করে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে। চাঁদও ভ্যাবাচ্যাকা মুখে তোকে দেখছে।

তোর মুখটা রুমালে ঢেকে দিলাম আমি। সুন্দর যেমন কুৎসিতকে ঘৃণা করে, কুৎসিতও তেমন ঘৃণা করতে পারে সুন্দরকে। এই যেমন আমি এখন তোকে।

এইবার...এইবার আমার দ্বিতীয় সত্যিটা চিরস্থায়ী হল। কেউ আর একে পালটাতে পারবে না। তুইও না। তোর খোঁজে সবাই যখন আসবে, তখন দেখবে–

আমার নয়, তোর মুখই রুমালে ঢাকা। আর তোর শরীরের পাশে রাখা টেপরেকর্ডারে শুনবে তোর শেষকথা। তোর শেষ সত্যি কথাটা।

এখন নীচের ঘরে এসে এই চিঠি লিখছি। খারাপ লাগছে চিঠিটা তুই পড়তে পারবি না বলে। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই।

এবার আমি ছাদে যাব আবার। অন্ধকারে তোর পাশে শুয়ে পড়ব। তারপর রক্তাক্ত ছুরিটা আরও একটা গলার নলি ফাঁক করবে। বেশ হবে, তাই না? আমি আর তুই পাশাপাশি শুয়ে থাকব। আর আমি অপলকে নষ্ট চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকব…তাকিয়ে থাকব…।

# ভুলোমন ভুলোদা

## ভুলোমন ভুলোদা

মায়ের মুখে কথাটা শুনে আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। ভুলোদার সঙ্গে নেমন্তন্নে যাওয়া!

ওরে বাবা, সে আমি পারব না! মউ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হাততালি দিয়ে বলল, ঠিক হয়েছে, ভুলোদার সঙ্গে গেলে মজাটি টের পাবে।

আমার মুখে একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠেছিল। হয়তো সেটা লক্ষ করেই মা বললেন, ভয় কী রে! তুই তো ভুলোর সঙ্গে-সঙ্গেই থাকবি। দরকার হলে ওকে খেয়াল করিয়ে দিবি।

মউ এখনও আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। মা ওকে ধমক দিয়ে বললেন, দাদার সঙ্গে ফাজলামো হচ্ছে! চল, পড়তে বসবি।

মা ওকে নিয়ে পড়াতে বসলেন। কাল মউয়ের ইংরেজি পরীক্ষা। আমার অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত পরশু। আর তার জন্যেই পড়তে হল এমন বিপদে। কারণ পরীক্ষা শেষ না হলে ভুলোদার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠত না। এ যেন অ্যানুয়াল পরীক্ষার চেয়েও কঠিন পরীক্ষা।

ভুলোদাকে এ-পাড়ার প্রায় সব্বাই ভয় পায়। বিশেষ করে আমি। কারণ, সে সব কিছু শুধু ভুলে যায়। আর এই ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে যখন-তখন। একবার নাকি রাত দেড়টার সময় উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চেঁচিয়ে পড়তে বসে গিয়েছিল। বাড়ির সবাই তো জেগে উঠেছে ভুলোদার ভারী গলার চিৎকারে। তারপর তাকে জিগ্যেস করে জানা গেল, তখন যে রাত সেটা ভুলোদা ভুলে গেছে। ভেবেছে ভোর হয়েছে, তাই হাত-মুখ ধুয়ে পড়াশোনায় মন দিয়েছে।

ভুলোদার আসল নাম বিপ্রদাস সরকার। আমার বড়মাসির ছেলে। থাকে আমাদের বাড়ির পাঁচটা বাড়ি পরে। তার ওই ভুলো মনের কাণ্ডকারখানা দেখে কবে যে ভুলো নামটা চালু হয়ে গেছে জানি না। এখন তার আসল নামটাই বেশ কষ্ট করে মনে রাখতে হয়।

ভুলোদা আমার চেয়ে চার বছরের বড়। গত বছরে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। এত ভুললামন নিয়ে কী করে যে ঠিক-ঠিক উত্তর লিখতে পারল, কে জানে! সবাই যখন একথা জিগ্যেস করে তখন ভুলোদা বলে, কী জানি ভাই, ওই একবারই হয়তো ভুল করে ঠিক-ঠিক উত্তর লিখে ফেলেছি।

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর ভুলোদা কলেজে ভরতি হয়েছে। একইসঙ্গে আবার ব্যায়াম করতে শুরু করেছে। মাঝে-মাঝে বলে, পড়তে ভালো লাগছে না– অথচ সময় পেলেই আমাকে পড়া-টড়া দেখিয়ে দেয়। এমনিতে ভুলোদা সত্যি খুব ভালো। শুধু ওই ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটুকু ছাড়া।

আজকের নেমন্তন্ন ছোটমাসির ছেলের মুখে-ভাত উপলক্ষ্যে। বাবা অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। মা মউকে পড়াতে ব্যস্ত থাকবেন। একমাত্র আমিই পরীক্ষার পাট চুকিয়ে খেলাধুলো নিয়ে মেতে আছি। অতএব আমাকেই যেতে হবে। যেতে রাজিও ছিলাম। কারণ, জানতাম বড়মাসির বাড়ির অনেকে যাবে। কিন্তু একটু আগেই মায়ের মুখে শুনলাম, ওরা কেউ যেতে পারবে না। কীসব ঝামেলায় পড়ে গেছে। যাওয়ার লোক বলতে রয়েছে শুধু ভুলোদা। ব্যস, এখন আর আমার নিস্তার নেই।

ছোটমাসিদের বাড়ি সেই খিদিরপুর, আর আমাদের বাড়ি বরানগর। শ্যামবাজার পেরিয়ে গেলে রাস্তাঘাট আমি কিছু চিনি না। স্রেফ ভুলোদা ভরসা। যদি নেমন্তন্নে যাওয়ার সময় ভুল করে অন্য দিকে চলে যায়! কিংবা আমাকে ফেলে রেখে বাস থেকে কোথাও নেমে পড়ে! ভুলোদা কোথায় যে কী করে বসবে তার কোনও ভরসা নেই। তার ওপর গত সপ্তাহেই যে-দুটো ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার ভয়টা অনেক বেড়ে গেছে। যাকে বলে একেবারে বুক ঢিপঢিপ করছে।

গত সপ্তাহের প্রথম ঘটনা আমার সাইকেল নিয়ে।

ক্লাস সেভেন থেকে এইটে ওঠার পর বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছেন। বেশ বড়সড় সাইকেল। আগে একটা ছোট সাইকেল ছিল। সেটার

চাকা ছিল মোট চারটে। দুটো বড়, আর পেছনের চাকার দু-পাশে দুটো রডের মাথায় খুদে-খুদে দুটো চাকা–যাতে চালাতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে না যাই। ছোট সাইকেলটা এখন মউ চালায়, বড়টা আমি।

বড় সাইকেলটা একদিন ধার চাইতে এল ভুলোদা। বলল, বাবান, তোর সাইকেলটা একটু দে তো। চিড়িয়ামোড়ের কাছে একটা জরুরি কাজ আছে, ঝটপট সেরে আসি।

আমি সাইকেলটা ভুলোদাকে দিয়ে বললাম, মনে করে আবার দিয়ে যেয়ো কিন্তু।

আরে সে নিয়ে ভাবিস না–। বলে সাইকেলে চড়ে ভুলোদা রওনা হয়ে গেল।

তারপর থেকে তিন-তিনটে দিন ভুলোদার আর পাত্তা নেই। সুতরাং গেলাম বড়মাসির বাড়ি। ধরলাম ভুলোদাকে। বললাম, আমার সাইকেল কী হল, ভুলোদা?

মাথায় হাত দিয়ে জিভ কেটে ভুলোদা বলল, এই রে, একদম ভুলে গেছি! শিগগিরি চ, শিগগিরি চ–।

আমার হাত ধরে টানতে-টানতে সোজা রাস্তায়। সেখান থেকে বাসে চেপে চিড়িয়ামোড়। চিড়িয়ামোড়ে নেমে একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল ভুলোদা। দোকানদারকে বলল, বিকাশদা, আমার সাইকেলটা…।

ভদ্রলোক হেসে দোকানের এক কোণ থেকে সাইকেলটা এনে ভুলোদার হাতে দিলেন। তার হাসি দেখেই বুঝেছি ভুলোদাকে তারা ভালো করেই চেনেন।

বাড়ি ফেরার পথে ভুলোদার মুখে সব শুনলাম। তিনদিন আগে সাইকেলটা বিকাশবাবুর দোকানে রেখে সে কী একটা কাজে গিয়েছিল। বলেছিল, একটু বাদে এসে সাইকেলটা নিয়ে যাবে। তারপর ভুল করে বাসে চড়ে সোজা বাড়ি চলে গেছে। ব্যস, সেদিন থেকে বেমালুম ভুলে গেছে সাইকেলের কথা।

দ্বিতীয় ঘটনা আরও সাঙ্ঘাতিক।

ভুলোদার কলেজের এক বন্ধু ভুলোদাকে ডাকতে এসেছিল বাড়িতে। দুজনে মিলে কোথায় যেন যাওয়ার কথা। বন্ধুর ডাকে ভুলেদা নেমে এসেছে সদর দরজায়। বলেছে, দাঁড়া, জামাকাপড় পরে এক্ষুনি আসছি। তারপর একছুটে দোতলায় উঠে গেছে পোশাক পালটাতে।

দশ মিনিট। পনেরো মিনিট। অবশেষে আধঘণ্টা কেটে গেল, তবুও ভুলোদার পাত্তা নেই। তখন অধৈর্য হয়ে সেই বন্ধু ডাকাডাকি করতে শুরু করল ভুলোদার নাম ধরে। বড়মাসি দেখা দিলেন দোতলার বারান্দায়। বন্ধুটি বলল, মাসিমা, বিথকে আসতে বলুন। জামা-প্যান্ট-ছেড়ে আসছি বলে সেই যে গেছে পুরো আধঘণ্টা হয়ে গেল দেখা নেই। যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে দেরি হয়ে যাবে।

ছেলের বন্ধুর কথা শুনে বড়মাসি তো হাঁ। অবাক গলায় বললেন, সে কী, বাবা! ভুলো যে জামাকাপড় পরে মিনিট কুড়ি আগে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল! বলল, শঙ্করদের বাড়ি যাব, ভীষণ জরুরি দরকার।

বন্ধুটি আরও অবাক। কারণ তারই নাম শঙ্কর। তাকে সদরে দাঁড় করিয়ে রেখে খিড়কি দরজা দিয়ে চলে গেছে ভুলোদা! গেছে আবার তাদেরই বাড়িতে, তার সঙ্গে দেখা করতে।

মাসিমা, আমারই নাম শঙ্কর– এ-কথা চেঁচিয়ে বলে সে তখন ছুটতে শুরু করেছে বাস স্টপের দিকে। যদি কোনওরকমে ভুলোদাকে ধরা যায়।

ভুলোদাকে ধরা গিয়েছিল। তখন জিভ কেটে মাথায় হাত দিয়ে সে বলে উঠেছিল, ইশ! একদম ভুলে গেছি রে!

সুতরাং এইরকম ভুলোদার সঙ্গে নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে ভয় করবে না। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই।

সুতরাং সন্ধেবেলা রওনা হয়ে গেলাম দুজনে। মা বারবার করে বলে দিলেন, ভুলো, তোর ছোট ভাইটিকে ভুলে যাস না যেন।

ভুলোদা হেসে বলল, তুমি কিছু ভেবো না, মাসি। ভুল আমার হয়, তবে বাবানকে ভুলে যাব, এতবড় ভুলো আমি নই। মউ তখন মুচকি মুচকি হাসছে। আমিও রেগে গিয়ে বলে দিলাম, কাল পরীক্ষায় লাড্ডু পাবি।

মউ নাকিসুরে প্রতিবাদ করতেই মা বললেন, কী হচ্ছে বাবান। ও-কথা বলতে নেই।

সন্ধেবেলা রওনা হওয়ার পর থেকেই আমি ভুলোদার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছি। যদি হঠাৎই কিছু ভুল করে বসে! কপাল ভালো যে, যাওয়ার পথে বা ছোটমাসির বাড়িতে সময়টুকু বেশ ভালোয়-ভালোয় কেটে গেল। তারপর আমরা রওনা হলাম বাড়ির দিকে। তখন রাত প্রায় দশটা।

পাড়ার বাসস্টপে যখন নামলাম তখন রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে। চারপাশ বেশ অন্ধকার। অর্থাৎ, লোডশেডিং। নির্জন অন্ধকার রাস্তায় চলতে গিয়ে গা-টা বেশ ছমছম করে উঠল। চাঁদের আলোয় পথ দেখে আমি আর ভুলোদা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎই একটা দোকানের আড়াল থেকে অন্ধকার কুঁড়ে দুটো লোক বেরিয়ে এল। দুটো কালো ছায়া। সোজা এসে একেবারে আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। ওদের মুখগুলোও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কর্কশ গলায় একজন বলল, মালকড়ি যা আছে ঝটপট দিয়ে দে।

ঠিক তক্ষুনি দ্বিতীয় লোকটা একটা রিভলভার বের করল। ছবিতে যেমন দেখেছি ঠিক সেইরকম, সত্যিকারের রিভলভার। তারপর রিভলভারটা ভাজ করে গুলির চেম্বারটা দেখিয়ে বলল, দেখেছ তো, চেম্বারে গুলি ঠাসা আছে! গোলমাল করলেই খুলি উড়ে যাবে!

আমি পকেট থেকে কটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বের করে প্রথম লোকটার হাত তুলে দিলাম। কাঁপা গলায় ভুলোদাকে বললাম, ভুলোদা, যা দেওয়ার দিয়ে দাও।

দ্বিতীয় লোকটা তখন রিভলভার ঠেকিয়ে ধরেছে ভুলোদার বুকে? জলদি!

সেই মুহূর্তেই ভুলোদা এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। রিভলভার ধরা লোকটার নাকে সপাটে বসিয়ে দিল এক বিরাশি সিক্কার ঘুসি। লোকটা ব্যায়াম করা হাতের ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। আর ভুলোদা সঙ্গে-সঙ্গে, বাবান, কুইক। বলে দে ছুট। চমক ভেঙে আমিও ছুটতে লাগলাম ভুলোদার পেছনে। মুখ ফিরিয়ে দেখি, প্রথম গুন্ডাটা ছুটে পালাচ্ছে। দুনম্বরটা বোধহয় তখনও সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছে।

ছুটতে ছুটতে খেয়াল হওয়ায় হঠাৎ ভুলোদা চিৎকার শুরু করে দিল, পুলিশ! পুলিশ!

আমিও তার দেখাদেখি চিৎকার শুরু করলাম। তারপর দু-চারজন মানুষের সাড়া পেতেই আমরা থেমে পড়লাম। আরও লোক জড়ো হতে লাগল। নাইট ডিউটির দুজন পুলিশ কনস্টেবলও হাজির হল সেখানে।

সবাই মিলে যখন অকুস্থলে হাজির হলাম, তখনও গুন্ডাবাবাজি অজ্ঞান। টর্চের আলোয় দেখলাম তার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। রিভলভারটা পড়ে আছে পাশেই। আমাদের নামধাম লিখে নিয়ে বলা হল পরদিন থানায় দেখা করতে।

পরদিন একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড! সারা পাড়ায় রটে গেল, ভুলো ডাকাত ধরেছে। একেবারে যে-সে ডাকাত নয়, রিভলভার-ধরা সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। থানার অফিসারও ভুলোদাকে পিঠ চাপড়ে বারবার বাহবা দিলেন। বললেন, ওই কুখ্যাত ফেরারি গুন্ডাটিকে তারা বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজছিলেন।

থানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভুলোদাকে আমি বললাম, ভুলোদা, তোমার এত সাহস! ছ-ছটা তাজা কার্তুজ ভরা রিভলভারওলা লোকটাকে তুমি এক ঘুসিতে শুইয়ে দিলে! তোমার কি প্রাণের ভয় নেই!

ভুলোদা উদাস মুখে বলল, ভয় কি আর নেই রে, বাবান। আসলে তুই যখন বললি, ভুলোদা, যা দেওয়ার দিয়ে দাও, আমি ভাবলাম তুই বোধহয় গুন্ডাগুলোকে ধোলাই দেওয়ার কথা বলছিস। ব্যস, দিলাম একখানা হুক সামনেরটাকে বসিয়ে। তখন কি আর রিভলভারের কথা আমার মনে আছে রে! সে তো একদম ভুলেই গেছি!

# সন্দেহের এক কণা

**সন্দেহের এক কণা**

স্পেসপোর্টে ফ্যালকন-১ নেমে পড়তেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। ছমাস– মানে একশো আশি দিন পর আবার পৃথিবী। জন্মভূমি। আমার ঘর-বাড়ি। কেমন আছে রুনু আর টুনু? কেমন আছে সুমিতা?

মহাকাশযান থেকে নেমে ম্যাগনেটিক অটো ট্র্যাকে সবে পা রেখেছি, সঙ্গে-সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা দশাসই চেহারার দুজন লোক কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে গেল আমার দু-পাশে। ওদের পোশাকে সিকিওরিটি ডিভিশনের প্রতীক-চিহ্ন আঁকা। কোমরের কাছে উঁকি মারছে জেনারেটর গান। চোখে কালো চশমা। মাথায় মেটাল হেলমেট।

আমাদের জুতোর নীচে স্টিলের পাত লাগানো। ফলে চলমান ম্যাগনেটিক ট্র্যাকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। দ্রুতগতির অটো ট্র্যাক আমাদের নিয়ে ছুটতে থাকে।

ওদের একজন জিগ্যেস করল, আপনি সান্যাল?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চাঁদের এক সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে কোনওরকমে বেঁচে ফিরে এসেছি।

দ্বিতীয়জন আমার বাহু চেপে ধরল শক্ত হাতে ও সেটা অপারেশান ডিভিশন যাচাই করে দেখবে।

তার মানে? আমি বেঁচে ফিরেছি কি না সেটা যাচাই করে দেখবে অপারেশান ডিভিশন? আমি, ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, গোটা মানুষটা জলজ্যান্ত বেঁচে ফিরে এলাম

এটাই কি যথেষ্ট নয়? চাঁদের ওই সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমাদের ল্যাবরেটরি। শুধু ফ্যালকন-১ বেঁচে গিয়েছিল। ওটা আমি রেখেছিলাম ল্যাবরেটরি থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরের একটা খাদের মধ্যে। সেখান থেকে পাথর বেয়ে উঠে হেঁটে পেরিয়েছি পনেরো কিলোমিটার পথ। চাঁদের বুকে এটুকু পথ কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছভাগের একভাগ মতো হওয়ায় চলাফেরায় কষ্ট অনেক কম, তবে অভ্যেসের দরকার। আমি আগে আরও চারবার বিভিন্ন অভিযানে চাদে গিয়েছিলাম। চাঁদ আমার মোটামুটি সয়ে গেছে।

অদ্ভুত দক্ষতায় লোক দুটো অটো ট্র্যাকের পথ পালটাচ্ছিল। ট্র্যাকের অসংখ্য কাটাকুটির মধ্যেও সিকিওরিটি বিল্ডিংয়ের পথ চিনে নিতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হচ্ছিল না ওদের। আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ইতস্তত করে বললাম, আগে বাড়িতে একবার দেখা করে গেলে হত না? আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, ছমাস ওদের দেখিনি।

লক্ষ করলাম, আমার এই কথায় একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে অভদ্রভাবে হাসল, তারপর বলল, ওসব পরে হবে, মিস্টার সান্যাল।

অন্য সময় হলে এই অভদ্র উত্তরের উপযুক্ত জবাব দিতাম। কিন্তু এখন সবকিছুই কেমন অস্বাভাবিক গোলমেলে লাগছে। তবে সিকিওরিটি ডিভিশনে আমার ছোটবেলার বন্ধু রাকেশ ব্যানার্জি রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করলেই মনে হয় সব মিটে যাবে। ওদের বললাম, আমি রাকেশ, রাকেশ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এবারে দ্বিতীয়জনের বিদ্রূপ-মাখানো হাসির পালা। বলল, ওঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেরকমই নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে।

এবারে ভয় পেলাম। তা হলে কি সুমিতা বা রুনু-টুনুর কিছু হয়েছে! যে-ছমাস আমি ছিলাম না তার মধ্যে...ওঃ, ভগবান! আমি আর ভাবতে পারছি না।

চারপাশে অটো ট্র্যাকে অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। কোনও শব্দ নেই। সকলেই স্থির হয়ে ট্রাকে দাঁড়িয়ে।

চারপাশের বাতাস বিশুদ্ধ! কারণ অক্সিজেন-নাইট্রোজেন সবই নিখুঁত শতকরা হিসেবে মিশিয়ে এই বাতাসকে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। অটো ট্র্যাকের মানুষগুলো সব ঝাপসা হয়ে আসছে। আর আমার কানে চাঁদের বিস্ফোরণের শব্দ আঘাত করছে বারবার।

তারই মধ্যে টের পেলাম প্রথম লোকটিও আমার হাত চেপে ধরল। ওদের হাতে বন্দি হয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। বন্দি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় একে!

.

ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। লুকোনো আলোয় আলোকিত। জানি, সাধারণ দৃশ্য আলো ছাড়াও এ-ঘরে অবলোহিত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে এক্স-রে ছবি তোলার আধুনিক আয়োজন। ঘরে আসবাবপত্র বলতে চারটে এয়ার কুশন, বাতাসে ভাসমান গদিওয়ালা চেয়ার। আর তার পাশে একটা পলিমারের সাতকোণা টেবিলে হোস্ট কম্পিউটারের টার্মিনাল।

জেনারেটর গানটা বের করে টেবিলে রাখুন, মিস্টার সান্যাল।

আমার জেনারেটর গানটা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। যে-দুজন গার্ড আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে ওরাও পায়নি। কিন্তু এখন আদেশ শুনে বুঝলাম, অপারেশন ডিভিশনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারিনি। ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

রাকেশ কম্পিউটার টার্মিনালে বসে কি-বোর্ডের বোতাম টেপাটেপি করছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অপরিচিতের চোখে তাকাল। কিছু বলল না।

আমাকে জেনারেটর গান বের করে দেওয়ার নির্দেশ, অথবা আদেশ, যিনি দিয়েছিলেন এবারে তাকে দেখলাম। শক্ত চোয়াল, কপালে ভাঁজ, ফ্রেঞ্চকাট কাঁচাপাকা দাড়ি, মুখটা লম্বা ধরনের, রোগাটে দীর্ঘকায় চেহারা, আর শুধু চোখের নজর দিয়েই বোধহয় মানুষ খুন করতে পারেন।

রাকেশ, আমি ফিরে এসেছি। আমি জেনারেটর গানটা টেবিলে রেখে রাকেশের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম, তোদের ভালোবাসার টানেই বোধহয় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরেছি।

রাকেশ এক ঝটকায় কি-বোর্ড ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখের রেখাগুলো বীভৎস হয়ে গেল। ওর হাতে কখন যেন একটা জেনারেটর গান গজিয়ে উঠেছে। ওর কথার প্রতিটি শব্দ যেন ভয়ংকর বজ্রপাতের মতো শোনাল, মিস্টার দাসানি, এই রোবটটাকে জিগ্যেস করুন ইন্দ্রজিৎ সান্যালের ডেডবডিটা ও চাঁদের কোথায় লুকিয়ে এসেছে!

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এসব কী শুনছি আমি? কোনওরকমে বললাম, রাকেশ, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? এই দ্যাখ, আমি, তোর ছোটবেলার বন্ধু ইন্দ্রজিৎ।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আমার পিঠে টোকা মারলেন। বললেন, ব্যানার্জি ভুল বলেছে। রোবট নয়, অ্যান্ড্রয়েড–যাদের চেহারাটা হুবহু মানুষের মতো কিন্তু ব্যাটারি ছাড়া চলতে পারে না। হাসলেন দাসানিঃ যাই হোক, মাথাগরম করে লাভ নেই, ব্যানার্জি। আমি এখনও কাজ শুরু করিনি। আগে শুরু করি, তারপর দেখবেন ওসব শেখানো বুলি কোথায় যায়। তবে আপাতত এই মেশিনটাকে আমরা ইন্দ্রজিৎ সান্যাল বলেই ডাকব। তাতে জেরার সুবিধে হবে। আপনি বসুন, মিস্টার সান্যাল। আমার জেরা বহুক্ষণ ধরে চলে, অ্যান্ডয়েডদেরও পা ব্যথা হয়ে যায়।

দাসানির হাতে একটা খুদে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট ছিল। সেটার কী-একটা বোতাম টিপতেই ঘরের একমাত্র দরজায় নেমে এল স্বচ্ছ প্লাস্টিকের দেওয়াল। দরজা বন্ধ। ঘরে শুধু আমরা তিনজন।

রাকেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, সান্যাল, তুমি বোধহয় জানো না, নরেন্দ্র দাসানি কাউন্টার এসপাইয়োনেজ ইউনিটের রোবোসাইকোলজিস্ট। শত্রুপক্ষের রোবটরা আজ পর্যন্ত ওঁকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

আমি চেয়ারে বসে পড়েছিলাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, আজ ছমাস পর আমি দেশে ফিরে এলাম…সুমিতা, রুনু-টুনু…কতদিন ওদের দেখিনি। একটু থেমে রাকেশকে লক্ষ করে অনুরোধ করলাম, বাড়িতে একটা ফোন করতে দিবি?

রাকেশ একবার দাসানির দিকে তাকাল। তারপর ঘরের সাদা দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিদ্রুপের হাসি হেসে আমার বাড়ির ভিডিওভেন নম্বরটা উচ্চারণ করল। রাকেশ নম্বরটা জানে। ও আমার বাড়িতে গেছে বহুবার। সুমিতাকে বউদি বলে ডাকে, আর রুনু-টুনুর কাছে কাকু।

রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা পকেটে রেখে দিয়ে নরেন্দ্র দাসানি চুপচাপ আমাকে লক্ষ করছিলেন। তার নজরে সন্দেহ। আর ভাবখানা এই, কতক্ষণ তুমি আমার চোখে ধুলো দেবে, বাছাধন।

রাকেশ নম্বরটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা সাদা দেওয়াল জুড়ে ভেসে উঠল সুমিতার মুখ। রাকেশ বলল, বউদি, আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। ইন্দ্রজিতের বদলে এই রোবটটা ফিরে এসেছে চাঁদ থেকে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

রাকেশ একপাশে সরে গিয়ে ইশারায় আমাকে দেওয়ালের কাছে ডাকল। আমি ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম সুমিতার কাছে। সুমিতা আমাকে দেখছে। ভুরু কুঁচকে গেছে, চোখ সন্দেহে কুটিল। ওর প্রশ্ন ছুটে এল বুলেটের মতো।

কোন তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল?

আমার কান্না পেয়ে গেল। রাকেশ আর দাসানি সফল হয়েছে। সুমিতার মনেও সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ওরা। কিন্তু রুনু-টুনু?

সুমিতা কঠিন গলায় প্রশ্নটা আবার করল।

আমি মাথা নিচু করে উত্তর দিলাম। দেওয়ালের ছবির দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না।

সুমিতা আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমি জবাব দিলাম। রাকেশ ও দাসানি বাজপাখির নজরে খুঁটিয়ে দেখছে আমার প্রত্যেকটা প্রতিক্রিয়া। একবার মাথা তুলে দেখলাম, সুমিতার মুখের ভাব এতটুকু পালটায়নি।

এরপরই দেওয়ালে ফুটে উঠল রুনুর ছবি। আমার দশ বছরের মেয়ে রুনু। ফুটফুটে। সবাই বলে আমার মতো নাকি দেখতে।

রুনু, কেমন আছিস?

রুনু হাসিমুখে সবসময় যেমন ঠাট্টা করে ঠিক সেভাবেই বলল, বাপি, বলো তো আমার জন্মদিন কবে?

রুনু যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে শব্দটা আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দু-হাতে মুখ ঢাকলাম আমি। গলার কাছটা ব্যথা করছে।

হঠাৎই শুনতে পেলাম কেউ আমাকে ডাকছে, বাপিসোনা!

আমি দেওয়ালের দিকে তাকালাম। টুনু। আমার পাঁচ বছরের ছেলে। একমাথা কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো সবসময় কথা বলে। ও আমাকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না।

টুনু– আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলাম।

বাপিসোনা, বলো তো, আমার ভালো নাম কী? ওটা ছাড়া আর-একটা কোন নামে তুমি আমাকে ডাকো?

আমি বসে পড়লাম মেঝেতে। আর পারলাম না। এতক্ষণের চেপে রাখা কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দুহাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম।

আর তখনই শক্ত কঠিন একটা স্পর্শ টের পেলাম ঘাড়ে। জেনারেটর গানের নল। আর একইসঙ্গে দাসানির আদেশ, জবাব দিন, ব্যানার্জি। যদি প্রমাণ করতে চান আপনি সত্যিই রাকেশ ব্যানার্জি-মানুষ!

আমি কাঁদতে কাঁদতেই টুনুর প্রশ্নের জবাব দিলাম।

একটু পরেই শুনতে পেলাম রাকেশের গলা, ওরা ট্রেনিংয়ে কোনও ভুল রাখেনি। রাকেশ ব্যানার্জির যাবতীয় তথ্য গুঁজে দিয়েছে এর পজিট্রনিক ব্রেনে।

দাসানি এক হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। দেখলাম, দেওয়ালটা আবার আগের মতো ছবিহীন সাদা হয়ে গেছে।

রাকেশ অধৈর্য হয়ে বলল, দাসানি, ছুরি দিয়ে ওর হাত-পা চিরে দেখুন রক্ত পড়ে কি না।

নরেন্দ্র দাসানি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ইশারায় শান্ত হতে বললেন রাকেশকে। তারপর আমাকে বললেন, ইন্দ্রজিৎ, এখানে আসাটা আপনার

সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। যাই হোক, আপনার মুখে চাঁদের গল্পটা একবার শোনা যাক। যদিও রেডিও মেসেজ আমরা ঠিকমতোই পেয়েছি।

রাকেশ এগিয়ে এসে জেনারেটর গানটা ঠেকিয়ে ধরল আমার কপালে। এটা থেকে তিনরকম লেভেলে ফায়ার করা যায়, লো-লেভেল, হাই-লেভেল আর আলট্রা-হাই-লেভেল। দেখলাম সিলেক্টর সুইচটা এখন আলট্রা-হাই-লেভেলে।

দাসানি কিছু করে ওঠার আগেই রাকেশ বাঁ-হাতে কোথা থেকে একটা ছুরি বের করে ক্ষিপ্রগতিতে বাতাস কেটে চালিয়ে দিল আমার গালে। পাকা হাত। গাল চিরে গেল শুধু। দাসানি চিৎকার করে উঠলেন, ব্যানার্জি কী হচ্ছে! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?

আমিও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। ডানগাল বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সত্যিকারের রক্ত। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরলাম গালে। রাকেশ রক্ত দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বোধহয় বুঝল আমি রোবট নই, মানুষ। ওর চোখে আবার আমার বন্ধু রাকেশের দৃষ্টি ফিরে আসছিল। কিন্তু দাসানির কথায় আমার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। রাকেশের দৃষ্টিও হয়ে গেল উদভ্রান্ত পাগলের মতো।

নরেন্দ্র দাসানি বললেন, কী তখন থেকে ছেলেমানুষি করছেন, ব্যানার্জি! আপনাকে তো সেই গোড়া থেকেই বলছি, এটা অ্যান্ড্রয়েড–রোবট নয়। অ্যান্ড্রয়েডদের রক্ত-মাংস থাকে মানুষেরই মতো। শুধু ব্রেন আর হার্ট, ওই দুটোই যন্ত্র–চলে ব্যাটারিতে। কিন্তু এক্স-রে কিংবা মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না। আপনি যান তো, চেয়ারে গিয়ে চুপ করে বসুন।

কিন্তু রাকেশ চেয়ারে গিয়ে বসল না। ছুরি ফেলে দিয়ে একহাতে আমার জামা খামচে ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর বলতে লাগল, বল, ইন্দ্রজিৎকে তুই খুন করে কোথায় পুঁতে রেখেছিস– বল…।

দাসানি এবার জোর করেই সরিয়ে দিলেন রাকেশকে। ঠেলে দিলেন একটা চেয়ারের দিকে। রাকেশ বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বড়-বড় শ্বাস নিয়ে হাঁফাতে লাগল।

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। পৃথিবী এখন আর আমার ঘর-বাড়ি নয়, কিচ্ছু নয়। এখানে আমার আপনজন বলতে আর কেউ নেই।

দাসানি আবার ফিরে এলেন আমার কাছে। কাঁধে হাত রেখে বললেন, ইন্দ্রজিৎ, এবারে চাঁদের গল্পটা আপনি বলতে পারেন।

আমি ধীরে-ধীরে সব বললাম।

তিন বছর আগে আন্তর্জাতিক খনন সংস্থা উঁদের টেরা অঞ্চলে একটা আধুনিক খনন কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নেয়। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এই কেন্দ্র তৈরি করা হয় দু-বছরের চেষ্টায়। এবং কাজ হল চাঁদের মাটি ও পাথর থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ নিষ্কাশন করা। লুনার হাইল্যান্ডস-এ অবস্থিত এই কেন্দ্রটি চাঁদের ওপিঠে। অর্থাৎ, চাঁদের যে-দিকটা সবসময় পৃথিবীর কাছ থেকে আড়ালে থাকে, সেই দিকে। নিউক্লীয় শক্তিচালিত এই কেন্দ্রের তদারকির জন্যে পালা করে বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়। কিন্তু সমস্যা বাধে টাইটান উপগ্রহের বিদ্রোহী সভ্যতাকে নিয়ে।

প্রায় চারশো বছর আগে যন্ত্রসভ্যতায় বিশ্বাসী কয়েক হাজার পৃথিবীবাসী শনির টাইটান উপগ্রহে গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তোলে। টাইটানের নাইট্রোজেন আর মিথেন ঘেরা আবহাওয়ায় আশ্চর্য দক্ষতায় তারা তৈরি করে নিরাপদ আবরণে ঢাকা শহর। তারপর বছরের পর বছর ধরে তারা প্রযুক্তিকে উন্নত করেছে। আর একইসঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। শোনা যায়, ওদের বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। চাদে আমাদের নতুন পরিকল্পনার কথা যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা বোধহয় খবর পেয়ে যায়। তারপর ওদের গুপ্তচরের অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে অন্তত আমার তাই অনুমান চাঁদের খনন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসি।

এখন বুঝতে পারছি, টাইটানের অ্যান্ড্রয়েড গুপ্তচর সন্দেহ করে সিকিওরিটি ডিভিশনের গার্ড পাঠানো হয় আমাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করার জন্য। আর এখন আমার দেশপ্রেমের পুরস্কার দেওয়ার জন্যে অপারেশন ডিভিশন উন্মুখ। একেই বলে অদৃষ্ট!

নরেন্দ্র দাসানি ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। মাঝে-মাঝে ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। ওঁকে আমি আগে কখনও এখানে দেখিনি। একটা বিশাল বাড়িকে দুভাগে ভাগ

করে তৈরি হয়েছে দুটো ডিভিশন ও সেন্ট্রাল সিকিওরিটি ডিভিশন ও সেন্ট্রাল অপারেশন ডিভিশন। দাসানি কোনটায় চাকরি করেন কে জানে!

একটা বাতাস-চেয়ার টেনে নিয়ে দাসানি বসলেন আমার মুখোমুখি। তারপর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

স্কটল্যান্ডের ফোর্থ ব্রিজের ওপরে আমাকে একটা সনেট লিখে দিন তো..।

ও আমার দ্বারা হবে না। কবিতা আমি একদম লিখতে পারি না।

৩৪৯৫৭-এর সঙ্গে ৭০৭৬৪ যোগ দিলে কত হয়?

তিরিশ সেকেন্ড মতো চুপ করে থেকে বললাম, ১০৫৬২১।

আপনি দাবা খেলেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

ধরুন দাবা খেলায়।

রাকেশ জেনারেটর গান টেবিলে রেখে কম্পিউটার কি-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ঝিম মেরে বসে ছিল, হঠাৎই খেপে উঠে চিৎকার করে বলল, দাসানি, আপনারা কি টুরিং টেস্ট নিয়ে খেলা করছেন?

কোনও যন্ত্র ভাবতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে নকলনবিশি নামে একটা খেলার পরিকল্পনা করেছিলেন এক প্রাচীন বিজ্ঞানী। নাম অ্যালান ম্যাথিসন টুরিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক। ওঁর সেই খেলাকে পরে অন্য বিজ্ঞানীরা টুরিং টেস্ট নাম দেন। এখন, টুরিং মারা যাওয়ার প্রায় ছশো বছর পরে, নরেন্দ্র দাসানি আমাকে টুরিং টেস্টের প্রশ্নগুলোই করছিলেন, আর আমিও হুবহু সেই উত্তরগুলো দিচ্ছিলাম। সেইজন্যে যোগ অঙ্কের উত্তরটাও ভুল দিয়েছি।

দাসানি থেমে গেলেন। ভুরু কুঁচকে রাকেশের দিকে তাকালেন। একটু ভেবে বললেন, দেখুন তো, পোস্টমর্টেম টিম চাঁদে রওনা হয়েছে কি না। আমার মনে হচ্ছে ওরা এই অ্যান্ড্রয়েডটার নকল ব্রেনে আসল ইন্দ্রজিতের সমস্ত স্মৃতির হুবহু

ছাপ তুলে দিয়েছে…পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মেমোরি ম্যাপ। টুরিং টেস্ট দিয়ে একে ধরা যাবে না।

দাসানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। পরনের মেটাল-ফাইবারের পোশাকের কোনও একটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট চেহারার একটা ডিজিটাল যন্ত্র বের করলেন। বললেন, এই স্ক্যানারটা এক্স-রে আর আলট্রাসনিক স্ক্যান দুটোই করতে পারে।

রাকেশ কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বোতাম টিপছিল। দাসানির দিকে চোখ তুলে বলল, ফ্যালকন-১ তল্লাশির কাজ শেষ করে পোস্টমর্টেম টিম লুনার হাইল্যান্ডস-এ পৌঁছে গেছে। ফ্যালকন ১-এ কিছু পাওয়া যায়নি। ওদের রেডিও মেসেজ আসছে কন্ট্রোল রুমে। আপনি জলদি একে স্ক্যান করে দেখুন, কোনও অস্বাভাবিক মেটাল পার্টসের ছবি পাওয়া যায় কি না।

দাসানি বোধহয় ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কলার ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাকে। ওঁর শক্তি আমাকে অবাক করে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ধরা তোমাকে দিতেই হবে। শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা। প্রতিদিন আমি হাফডজন অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই।

তারপর ডিজিটাল স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যানিংয়ের কাজ শুরু করলেন।

যন্ত্রে কিছুই ধরা পড়ল না। আমি জানতাম পড়বে না। কিন্তু সন্দেহের বিষ ওদের পাগল করে দিয়েছে। সুমিতা, রুনু, টুনু–ওরাও বাদ যায়নি। বিশ্বাসের ভিত এত সহজে টলে যায় জানতাম না।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও দাসানির কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। যন্ত্রটা পকেটে রেখে আপনমনেই বিড়বিড় করে তিনি বললেন, যে করে থোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। এর আগে ডেল্টা থ্রি-র দুর্ঘটনায় কথা আমরা কেউ ভুলে যাইনি। টাইটান থেকে এক অ্যান্ড্রয়েড স্পাই এসেছিল আমাদের ডেল্টা থ্রি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে। ওর শরীরের ভেতরে লুকনো ছিল একটা এইচ বোমা। বিশেষ একটা কোড ওয়ার্ড যদি অ্যান্ড্রয়েডটা উচ্চারণ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোমাটা এক্সপ্লোড করবে। এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম টাইটানের আর-এক মানুষ গুপ্তচরকে সাইকোপ্রোব করে। তারপর অতিকষ্টে আমরা অ্যান্ড্রয়েডটাকে ধ্বংস করেছিলাম। পাওয়ার প্ল্যান্টটা অল্পের জন্যে বেঁচে

গিয়েছিল… হঠাৎই গলার স্বর চড়িয়ে আমাকে লক্ষ করে দাসানি বললেন, আপনার কোড ওয়ার্ডটা কী, মিস্টার সান্যাল?

আমারও ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল। তাই চেঁচিয়ে জবাব দিলাম, গণ্ডমূর্খ!

দাসানি বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন আমার গালে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্তের স্বাদ পেলাম জিভে।

রাকেশ বলল, একে ইন্দ্রজিতের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, দেখবেন ধরা পড়ে গেছে। সুমিতা বউদি, রুনু, কিংবা টুনু–কেউ না কেউ ঠিক ধরে ফেলবে একে। তারপর শুরু হবে আমাদের খেলা।

থাপ্পড় কষানোর পরমুহূর্ত থেকে দাসানি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন। সম্ভবত প্রতিক্রিয়া দেখছিলেন। রোবট আর মানুষের প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চয়ই তফাত থাকবে। ওঁর গুণী চোখ নিশ্চয়ই সেটা বুঝতেও পারবে। আমি আশা-ভরা চোখ নিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডানগালটা অসহ্য জ্বালা করছিল।

দাসানি রাকেশকে লক্ষ করে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যানার্জি, ইন্দ্রজিতের বাড়িতেই নিয়ে যাই একে–।

সেই মুহূর্তে দাসানির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করছিল আমার।

নরেন্দ্র দাসানি বিদ্রুপের স্বরে বলতে লাগলেন, আসলে এই যন্ত্রটার কোনও দোষ নেই। ইন্দ্রজিতের মেমোরি ম্যাপ করে দেওয়ায় ওর এখন বিশ্বাস যে, ও-ই আসল ইন্দ্রজিৎ সান্যাল। ফলে ওর অভিনয়ে কোনও ফাঁক থাকবে না। ও জানে যে, ও-ই আসল লোক। কিন্তু আমিও এত সহজে ছাড়ছি না।

দাসানি আমাকে ইশারা করলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। রাকেশকে একপলক দেখলাম। ও তখনও কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত।

দাসানি রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা বের করে বোতাম টিপলেন। প্লাস্টিকের দেওয়াল সরে গেল। আমরা বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সুমি, রুনু, টুনুকে সামনাসামনি দেখতে পাব ভেবে ততটা আর মনখারাপ হচ্ছিল না।

অটো টানেল ধরে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়িতে উঠেই দাসানি আমার বাড়ির স্থানাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছেন কম্পিউটারকে। সঙ্গে-সঙ্গে সবচেয়ে সুবিধেজনক পথের ছবি ফুটে উঠেছে কম্পিউটারের পরদায় এবং গাড়িটাও সেই অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছুটতে শুরু করেছে।

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলাম। সূর্য সবে ডুবে গেছে পশ্চিমে। আকাশে এলোমেলো লাল-হলুদ রং। হঠাৎই ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়ি। দাসানি পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে বললেন, তোমাকে এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি–তারপর একটা জেনারেটর গান বের করে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, এখনও বলো, কে তুমি?

লক্ষ করেছিলাম, ওঁর জেনারেটর গানের সেফটি লক খোলা নেই। সুতরাং চোখের পলকে জোরালো এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম দাসানির মুখে। আবার আর-একটা–এবারে রগের ওপরে। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। দাসানির চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, কাত হয়ে পড়ে গেলেন সিটের ওপরে। ওঁর হাত থেকে খসে পড়া জেনারেটর গানটা তুলে নিলাম হাতে। দাসানিকে ঠেলে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। তারপর আবার গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

আমার বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। সেখানে বাগান করেছিলাম। ফুলগাছ লাগিয়েছিলাম নিজের হাতে। এখন শীতের শেষে গোধূলিতে ফুলের গন্ধ পেলাম। দেখলাম, বাড়ির চারটে জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে বন্দুক ফেলে দিলাম। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম ফুলগাছগুলোর কাছে। বুকভরে ঘ্রাণ নিলাম। আঃ। ঠোঁটের কোণে জ্বালাটা আবার টের পেলাম। একটা ছোট্ট গোলাপ ছিড়ে নিলাম গাছ থেকে। ছোট্ট সুন্দর ফুলটা ওর রূপে আর ঘ্রাণে আমাকে যেন পোষ মানিয়ে নিল। ফুলটা আমাকে সন্দেহ করে না।

ফুলটা পকেটে রেখে বাড়ির দরজার দিকে এগোলাম। ছমাস চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে কাটিয়ে এখন যে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে না তা নয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা যান্ত্রিক স্বর আমাকে পাসওয়ার্ড জিগ্যেস করল। একমাত্র বাড়ির বাসিন্দারা ছাড়া পাসওয়ার্ড কেউ জানে না। জানানো হয় না। তবে খুব অন্তরঙ্গ পারিবারিক বন্ধু হলে অন্য কথা। যেমন রাকেশ আমাদের দরজা খোলার পাসওয়ার্ড জানে। আমি, সুমিতা আর রুনু জানি। টুনুকে এখনও শেখানো হয়নি।

আমি পাসওয়ার্ড বলতেই দরজা খুলে গেল এবং ভেতরে কোথাও একটা ঘণ্টি বেজে উঠল।

সামনেই আলোয়-ভেসে-যাওয়া বসবার ঘর। আর-একটু দূরে দু-পাশে দাঁড়িয়ে রুনু আর টুনু।

রুনু-টুনু।

রুনু কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। টুনু একটু যেন হাসতে চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎই কেঁদে চিৎকার করে উঠল, তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।

কোথা থেকে যেন আচমকা হাজির হল সুমিতা। ঠিক ওদের দুজনের মাঝে। আমি সুমিতার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। আর ঠিক তখনই সুমিতা ওর হাতে ধরা জেনারেটর গান থেকে ফায়ার করল। আমি চৌকাঠের ওপর বসে-পড়লাম ঝরা ফুলের মতো।

সুমিতা তখন আতঙ্কে পাগলের মতো চিৎকার করছে। বলছে, রাকেশ আমাকে ঠিক সময়েই খবর দিয়েছিল। বলেছিল, নরেন্দ্র দাসানি রোবটটাকে সঙ্গে করে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এটা দাসানিকে শেষ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে না হাজির হয়। যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে তুমি তৈরি থেকো, বউদি। আমি হাতের কাজ শেষ করেই যাচ্ছি। রাকেশের কথাই শেষপর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। আমার স্বামীকে শেষ করে তুমি আমাদের সবাইকে শেষ করতে এসেছ।

সুমিতা কোন লেভেলের ফায়ার করেছে জানি না, কিন্তু ওর কথাগুলো আমি যেন বহুদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। রুনু, টুনু অবাক চোখে আমাকে দেখছিল। সত্যিই তো, আগে কখনও কোনও রোবটকে মরতে দেখেনি ওরা।

ঠিক সেই সময়ে শুনতে পেলাম ভারী বুটের শব্দ। কারা যেন দৌড়ে আসছে অন্ধকার বাগানের পাশ দিয়ে। পায়ের শব্দ কাছে এল। রাকেশ আর দাসানি। সুমিতার হাবভাব আর জেনারেটর গান দেখেই ব্যাপারটা ওরা বোধহয় বুঝতে পারল।

দাসানি ঝুঁকে পড়ে আমার পোশাক তল্লাশ করতে লাগলেন। কিছু কাগজপত্র পেলেন। তারপরেই পেলেন গোলাপটা। লক্ষ করলাম, ওই ছোট্ট তাজা ফুলটা পাথরের মতো মানুষটাকে বদলে দিল। ওঁর চোখ ছোট হল, কপালে ভাঁজ পড়ল। হাঁটু গেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমার মুখের ওপরে। বিড়বিড় করে বললেন, অ্যান্ড্রয়েড কখনও নিজের খেয়ালে গাছ থেকে ফুল ছেঁড়ে না কখনও না। অ্যান্ড্রয়েডদের সব কাজের পিছনেই একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে–কোনও না কোনও কারণ।

উত্তেজিতভাবে রাকেশের দিকে তাকিয়ে দাসানি বললেন, ব্যানার্জি, আমাদের বোধহয় ভুল হয়েছে।

রাকেশ তখন ছোট্ট একটা ডিজিটাল ট্রান্সিভারে কার সঙ্গে যেন বেতার-যোগাযোগে কথা বলছিল। খট করে যন্ত্রটার সুইচ অফ করল ও। দেখলাম, ওর চোখ চিকচিক করছে। ধরা গলায় থেমে-থেমে ও বলল, চাদে ওরা টাইটানের অ্যান্ড্রয়েড-স্পাইয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। ওরা যে ইন্দ্রজিৎ সান্যালের নকল করে অ্যান্ড্রয়েড গুপ্তচর পাঠাচ্ছে সেই খবরটা ঠিকই ছিল…কিন্তু মনে হয়, ডিজাইনে কোনওরকম গোলমাল থাকায় ঠিক সময়ের আগেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তারপর…।

রাকেশ আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে, চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল, ইন্দ্র…ই… সত্যিই তুই ফিরে এসেছিলি…!

আমার মুখে ওর হাতের ছোঁয়া টের পেলাম। ঠিক তখনই সুমিতারুনু-টুনু একসঙ্গে কেঁদে উঠল। চোখে জল ওদের সন্দেহ ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

প্রিয়জনেরা যদি চোখের জলে বিদায় জানায় তা হলে মরতে কারও খারাপ লাগে না। আমারও লাগবে না।

# বকুলফুলের দিনগুলি

**বকুলফুলের দিনগুলি**

এক-একজনের সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেলে মনের ভেতরে এক-একরকমের ঢেউ ওঠে।

কিন্তু রত্নাদির সঙ্গে প্রায় পাঁচ বছর পর আচমকা দেখা হতেই মনের ভেতরে যে-ঢেউ উথলে উঠল সেটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিল।

কারণ, এই ঢেউটা আমি বুকের অনেক গভীরে অনেক গোপনতায় ঢেকে রেখেছিলাম– ঠিক কবর দেওয়ার মতো।

কিন্তু ওকে দেখামাত্রই বুঝলাম, কবর দেওয়া হতচ্ছাড়া জিনিসটা এখনও মরেনি। দিব্যি নড়েচড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

বকুল! তুই…!

বাস স্টপে আমাকে দেখামাত্রই রত্নাদির চোখমুখ খুশিতে ভেসে গেল। চোখের পলকে ওর বয়েস পাঁচ বছর কমে গেল। বাস স্টপের অত লোকের সামনে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। তারপর আমার দুগালে দু-হাতের আঙুল ছুঁইয়ে বলল, তুই ঠিক সেই একইরকম আছিস…

সন্ধেবেলা পার্ক স্ট্রিটের বাস স্টপে মানুষজন কিছু কম থাকে না। তাদের সবার সামনে রত্নাদির এই উচ্ছ্বাস আমাকে বিব্রত করে দিল। আলতো করে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নটা করে রত্নাদিকে দেখছিলাম।

পাঁচটা বছর শরীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলেও ব্যাপারটা ততটা বোঝা যায় না। রত্নাদিকে দেখতে সেই আগের মতোই সুন্দরী। ফরসা মুখে টানা-টানা চোখ। ডান গালে ছোট্ট তিল। সুঠাম শরীরে জড়ানো কালো-গোলাপি নকশার সিনথেটিক শাড়ি। কাঁধে লম্বা স্ট্র্যাপে ঝোলানো বাদামি ব্যাগ।

রত্নাদির মুখে একটা আলগা ক্লান্তির ছাপ লক্ষ করলাম। দেখে মনে হল, সারাদিন অফিসের কাজের শেষে বাড়ি ফেরার জন্যে বাস স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে রত্নাদি পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল : তুই কি বাড়ি পালটেছিস? তোকে আমি পরপর চারটে চিঠি দিয়েছিলাম...।

রত্নাদির চারটে চিঠিই আমি পেয়েছি, কিন্তু কোনও উত্তর দিইনি।

সেইজন্যেই মিথ্যে কথা বললাম, হ্যাঁ, বাড়ি পালটেছি। বছর চারেক হল কেষ্টপুরের দিকে চলে গেছি।

আগে আমি হাতিবাগানে থাকতাম। গতবছর বিয়ের পর দমদমের বাসিন্দা হয়েছি। আর রত্নাদির চিঠিগুলো আমি পেয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় তিন-চার বছর আগে হাতিবাগানের বাড়িতে।

জানিস বকুল, হস্টেলের দিনগুলো আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না...।

আমি ছোট্ট করে বললাম, হুঁ...আমারও মনে পড়ে...।

এ কথা বললাম বটে, আসলে বোধহয় দিনগুলো আমি ভুলতে চাই। এতদিন পর কয়েক মিনিটের জন্যে রত্নাদির সঙ্গে দেখা হল–সত্যি কথা বলে ওকে আমি আর কষ্ট দিতে চাই না।

রত্নাদি আমার হাত ধরে টান মারল, বলল, চল, কোথাও বসে একটু চা খাই। কোনও তাড়া শুনছি না ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আমি রত্নাদির সঙ্গে হাঁটা দিলাম। সেই হস্টেলের দিনগুলোর মতো রত্নাদি আমাকে ধীরে-ধীরে অধিকার করে

ফেলছিল। মনে হচ্ছিল, এমন কোনও কোনও সম্পর্ক আছে যেগুলো সহজে মরে না। বুকের ভেতরে ওরা শীতঘুম ঘুমিয়ে থাকে সময় এলেই আবার জেগে ওঠে।

বাস-মিনিবাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কারের জটলা পেরিয়ে আমরা কিড স্ট্রিটের দিকে এগোলাম। যেতে-যেতে রত্নাদি বলল, এইদিকটা একটু নিরিবিলি...।

একটা ছোট রেস্তোরাঁয় বসলাম দুজনে। রত্নাদি খাবারের অর্ডার দিয়ে বলল, তুই কিন্তু ব্যাগ খুলবি না। এতদিন পর দেখা হল...আমি খাওয়াচ্ছি...।

আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। হস্টেলের সেই দিনগুলোতেও আমি রত্নাদির ওপরে কথা বলতে পারতাম না।

রত্নাদির কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম ও আমার সিঁদুরের চিহ্ন দেখতে পায়নি।

আমি চাকরি করি ক্যামাক স্ট্রিটের একটা অফিসে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, সিঁদুরের রেখা অস্পষ্ট এবং গোপন থাকলে চাকরির ক্ষেত্রে অসুবিধে কম হয়। আর পুরুষদের মেলামেশার আগ্রহও যেন বেড়ে যায়।

রত্নাদি অনেক কথা বলছিল। ওর বাড়ির কথা, মায়ের কথা, ভাইয়ের কথা। ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যাপারে পার্ক স্ট্রিটের কোন-একটা অফিসে খোঁজখবর করতে এসেছিল রত্নাদি। নইলে অফিসপাড়ায় ওর আসাই হয় না।

নানারকম গল্প করতে করতে রত্নাদি হঠাৎই বিষণ্ণ গলায় বলল, জানিস, আমার না কিচ্ছু ভালো লাগে না। হস্টেল ছেড়ে আসার পর থেকেই চারপাশটা কেমন কঁকা-ফাঁকা লাগে। তবে আজ তোর সঙ্গে দেখা হয়ে দারুণ লাগছে। মনে হচ্ছে, পুরোনো দিনগুলো ফিরে এসেছে। এক চিলতে হাসল রত্নাদি। ওর হাসিটা দারুণ মিষ্টি।

কথা বলতে বলতে এক অদ্ভুত আবেগে আমার হাত চেপে ধরল রত্নাদি, নরম গলায় প্রায় ফিশফিশ করে বলল, কেমন আছিস, বোনটি? দিদিভাইকে তোর আর মনে পড়ে না?

আমার ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেল। রেস্তোরাঁর টেবিল-চেয়ার, শৌখিন-বাতি, নকশা কাটা দেওয়াল–সব বনবন করে ঘুরপাক খেতে শুরু করল লাটুর

মতো। সেই দিশেহারা আচ্ছন্ন অবস্থাতেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি রত্নাদির হাত চেপে ধরে বলছি, তুমি কেমন আছ, দিদিভাই?

আর রত্নাদির চোখের কোণ বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। ও ফিশফিশ করে বলল, বোনটি আমার..বকুলফুল…।

বকুলফুল!

এই ম্যাজিকশব্দটা ভেতরের কী এক ঝড়ে চোখের পলকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বেশ কয়েক বছর পেছনে–আমার হস্টেলের দিনগুলোতে।

.

হস্টেলের কথা ভাবলেই সবার আগে আমার কাঁঠালচাপা গাছটার কথা মনে পড়ে। পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডের মাঝে গাছ বলতে তো ওই একটাই! বাকি সব ছোটখাটো এলোমেলো সাধারণ ফুলগাছ।

সদরের বড় লোহার গেটটা পেরোলেই বাঁ-দিকে রাজকীয় অহঙ্কারে দাঁড়িয়ে কাঁঠালচাপা গাছটা। তার নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা ফুল। আমি হস্টেলে প্রথম যখন পা রাখি তখন ওই ছন্নছাড়া ফুলগুলোই আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

তিনতলা পুরোনো হস্টেল বিল্ডিংটা দেখে আমার সেলুলার জেলের কথা মনে পড়েছিল। তাই দাদা-বউদির হাত ধরে খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। কিন্তু দাদা বুঝতে পেরেছিল হস্টেলে থেকে পড়াশোনা না করলে আমার পক্ষে পড়াশোনা করা অসম্ভব। আর বউদি চায়নি আমার লেখাপড়া হোক। হস্টেলের খরচ নিয়ে আমার সামনেই দাদাকে কম কথা শোনায়নি।

সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে মাতৃস্নেহে আপন করে নিয়েছিলেন রীণাদি আমাদের হস্টেল সুপার। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাদা-বউদিকে বলেছিলেন, কোনও চিন্তা করবেন না–আজ থেকে ও আমাদের মেয়ে।

বেশ মনে আছে। সেদিন চার-পাঁচজন মেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে ভরসা দিয়েছিল, আমার সঙ্গে গল্প করেছিল, মজার কথা বলে আমাকে হাসাতে চেষ্টা করেছিল। আমাকে ছেড়ে ওরা কোথাও যায়নি।

ওদের মধ্যে রত্নাদিও ছিল। রত্নাদি তখন সবে থার্ড ইয়ারে উঠেছে। আর আমি ফার্স্ট ইয়ারের পড়াশোনা শুরু করতে চলেছি।

কটা দিন পেরোতে না পেরোতেই আমার মনটা শান্ত হয়ে এল। আর তখনই সুটকেস থেকে ইনল্যান্ড লেটার বের করে দাদাকে আর মা-কে চিঠি লিখতে বসলাম। দাদা কলকাতায় থাকে, কিন্তু মা থাকে সুলুপে দেশের বাড়িতে। সেখানে রোজই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মায়ের কান্নাকাটিতেই দাদা আমাকে কলকাতায় পড়াতে নিয়ে এসেছে।

আমি একমনে ডেস্কে বসে চিঠি লিখছি, হঠাৎই পেছন থেকে পারফিউমের গন্ধ পেলাম। ঘুরে তাকাতেই দেখি ফার্স্ট ইয়ারের নন্দনা।

নন্দনা সবসময় খুব সেজে থাকে, দামি-দামি শাড়ি পরে, পায়ে রুপোর তৈরি ভারী নূপুর, আর ওর পারফিউমের খুব শখ। ও যখন হাঁটে তখন ছমছম করে মিষ্টি শব্দ হয়। শুনেছি ও নাকি শ্রীরামপুরের রাজপরিবারের মেয়ে। ভীষণ বড়লোক।

আমি চিঠি লেখায় এতই মগ্ন ছিলাম যে ওর নূপুরের শব্দ পাইনি।

কী, লাভারকে চিঠি লিখছ? নন্দনা প্রশ্ন করল।

নন্দনার কথাবার্তাই এইরকম। যা মনে হয় ফস করে তাই বলে দেয়। তাই অন্য বন্ধুরা ওকে সাবধান করে? হুটহাট করে যা খুশি তাই বলিস না। সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের দিদিরা কোনদিন খেপে গিয়ে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে।

নন্দনা তাতে ঠোঁট উলটে জবাব দিয়েছিল, কী করব বল, অভ্যেস হয়ে গেছে। দিদিরা কী করবে না করবে ওসব আমি কেয়ার করি না।

তাতে আমার রুমমেট ঝরনা চাপা গলায় বলেছিল, কেয়ার করবে কেন? ওর সঙ্গে তো শুক্লাদির দিদিভাই-বোনটি আছে।

তার মানে? খানিক অবাক হয়ে ঝরনাকে প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

ঝরনা চোখ মটকে বলেছিল, এখন না–পরে বলব। তারপর একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, আমাকে তো ভগবান ওর মতো রূপ দেয়নি, তাই

আমাকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়েই থাকবে হবে।

সত্যিই নন্দনাকে এত সুন্দর দেখতে যে, আমরা অনেকেই হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঈশ্বর প্রচুর অবসর নিয়ে ওকে গড়ে তুলেছেন।

নন্দনার কথায় আমি ছোট্ট করে বললাম, দাদাকে আর মা-কে চিঠি লিখছি। আমার চিঠি পেলে মা চিন্তা করবে।

তোমার লাভার নেই?

একটু অস্বস্তি পেয়ে বললাম, আছে। তবে ওকে চিঠি দেওয়া একটু অসুবিধে...

নন্দনা হাসল। সামনের তক্তপোশের এক কোণে বসে পড়ল। পায়ের ওপর পা তুলে কিছুক্ষণ পা নাচাল। নূপুরের ছমছম শব্দ হতে লাগল। তারপর একসময় বলল, আমাকে তোমার বয়ফ্রেন্ডের ডিটেইল্সটা দিয়ো, আমি চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

এর মধ্যেই জেনেছি, হস্টেল সুপার রীণাদি খুব কড়া ধাতের মানুষ– নিয়মকানুনের এদিক ওদিক মোটেই বরদাস্ত করেন না। সেইজন্যেই বোধহয় নন্দনার কথায় আমার মুখে একটু অবাক ভাব ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে নন্দনা চোখ মটকে মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, রীণাদি কিচ্ছুটি টের পাবে না। ওকে ম্যানেজ করে তোমার লাভারের চিঠি কুরিয়ার সার্ভিসে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। একদম নো চিন্তা...।

নন্দনা একটু পরেই হিন্দি সিনেমার গান গুনগুন করতে করতে উঠে চলে গেল।

আমি চিঠি লেখা শুরু করলাম আবার। তখনও জানি না, সে-রাতে আমাকে নিয়ে থার্ড ইয়ারের দিদিরা কী কাণ্ড করবে।

মাঝরাতে হঠাৎই আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। আর মশারিটা কারা যেন খুলে দিয়েছে। মশার কামড়ে হাতে পায়ে চাকা-চাকা হয়ে ফুলে গেছে।

আমি জেগে উঠতেই রিনরিনে হাসির হুল্লোড় উঠল। চোখ পিটপিট করে দেখলাম, সেকেন্ড ইয়ার আর থার্ড ইয়ারের ছ-সাতজন দিদি আমার বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গে তখনও আমার তেমন করে পরিচয় হয়নি। ওদের মধ্যে রত্নাদিও ছিল।

আমাদের রুমে আমরা ছজন ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে থাকি। ওদেরই মধ্যে কেউ বোধহয় ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে। সেটা থার্ড ইয়ারের দিদিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেও হতে পারে, অথবা ভয়েও হতে পারে।

আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। খেয়াল করে দেখি, ওরা পাশের ঘর থেকে হস্টেলে নতুন-আসা আর-একজন মেয়েকেও ধরে নিয়ে এসেছে। শুনেছি ওর নাম শর্মিলা–নন্দনা ওর রুমমেট।

আমাকে আর শর্মিলাকে নিয়ে এরপর যা শুরু হল, পরিভাষায় তার নাম র‍্যাগিং।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দুটি হরিণশিশুকে ঘিরে ধরে চলল চিতাবাঘের দঙ্গলের ছেলেখেলা। তবে সব কথাবার্তাই বেশ চাপা গলায় হচ্ছিল, যেন রীণাদি শুনতে না পয়ে। অবশ্য রীণাদি মোটাসোটা গোলগাল মানুষ–ঘুমোনো তাঁর নেশার মতন। তার ওপর তার ঘর তিনতলায়–একেবারে কোণের দিকে।

প্রথমে আমাকে আদেশ করা হল ক্যাবারে নাচ নাচার জন্যে। আর শর্মিলাকে সাজতে হল ক্যাবারে নাচের মাতাল দর্শক। সেইসঙ্গে চলল আমাদের দুজনের নাইটি ধরে দিদিদের টানাটানি।

খুশিতে আর মজায় কেউ-কেউ একেবারে গড়িয়ে পড়ছিল। আর দু-একজন লালসায় টগবগ করে ওঠা দর্শকের মতো আমার শরীরের নানা জায়গায় ছোবল মারছিল।

নাচের পালা শেষ হলে দিদিরা আমাকে আর শর্মিলাকে ঝগড়ার অভিনয়ের নির্দেশ দিল। তাও আবার যে সে ঝগড়া নয়, ফিশফিশে চাপা গলায় ননদ-ভাজের ঝগড়া।

এসব আজগুবি অভিনয় করতে করতে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল। শর্মিলার অবস্থা তো আরও করুণ! কিন্তু উপায় কী!

ঝগড়ার অভিনয়ের পর মুখ ভ্যাংচানোর কম্পিটিশান, খারাপ মেয়েদের মতো কদর্য অঙ্গভঙ্গি, গর্ভবতী বউয়ের হাঁটাচলার ঢং আরও কত কী যে করতে হয়েছিল!

আর সবার শেষে এল চুমু খাওয়ার পালা। আমাকে আর শর্মিলাকে পছন্দ করবে থার্ড ইয়ারের দুই দিদি। ওদের লাভার মনে করে আমাদের আবেগজর্জর চুমু খেতে হবে ওদের ঠোঁটে।

শর্মিলা গাঁয়ের সরল সাদাসিধে রোগাসোগা মেয়ে। বেচারি তো একেবারে কেঁদেই ফেলল।

ওকে কে পছন্দ করবে তাই নিয়ে দিদিদের মধ্যে ঠেলাঠেলি চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটু পুরুষালি চেহারার তন্দ্রাদি শর্মিলার কাছে এগিয়ে গেল। এত জোড়া চোখের সামনে ঘটে গেল সেই বিচিত্র ঘটনা। সবাই হেসে আকুল হয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। শর্মিলা একেবারে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মেঝেতে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তারপরই আমার পালা।

রত্নাদি আমাকে পছন্দ করে নিজে থেকেই সামনে এগিয়ে এল। আমি আড়ষ্টভাবে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, ওর সুন্দর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম।

আমার ভেতর থেকে একটা বিতৃষ্ণা উথলে উঠছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রত্নাদির চাপা আবেগ টের পেয়েছিলাম। ওর সুন্দর ফরসা মুখে লালচে আভা খেলে গিয়েছিল।

আমি সরে আসতেই রত্নাদি বলেছিল, তোর ঠোঁট দুটো কী মিষ্টি রে!

সঙ্গে-সঙ্গে সকলের খিলখিল হাসি।

এমন সময় একটা মেয়ে দরজার কাছ থেকে আচমকা উঁকি দিল ঘরে। বলল, অ্যাই, সুপার আসছে।

ব্যস! চোখের পলকে ঘর ফাঁকা। শুধু যাওয়ার আগে তন্দ্রাদি শাসনের ভঙ্গিতে বলে গেল, আলো নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়। সুপারের কাছে মুখ খুললে খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।

কে যেন ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। আর-একজন দরজাটা বন্ধ করে দিল। কতকগুলো চঞ্চল পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল করিডর আর সিঁড়িতে।

বুঝলাম, দিদিরা সুপারের ঘুমের নেশার ওপরে ঠিক ভরসা করতে পারেনি। তাই ঠিকঠাক জায়গায় গুপ্তচর মোতায়েন করে এসেছিল।

অন্ধকারে এক বিছানায় শুয়ে আমি আর শর্মিলা সে-রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল, আর হস্টেলটাকে বন্দিনিবাস বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু তারই মধ্যে রত্নাদির উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁওয়া আমি টের পাচ্ছিলাম। আর সেইসঙ্গে তোর ঠোঁট দুটো কী মিষ্টি রে! কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম বারবার।

রতীন একবার আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে এইরকম কথা বলেছিল। নন্দনার ভাষায় রতীন আমার লাভার।

কিন্তু-রতীন আর রত্নাদি তো এক নয়!

দুটো-একটা মুহূর্তের জন্যেও কি এক নয়?

*

রোববার দিনটা রীণাদি কোথায় যেন চলে যান।

সেই সাতসকালে বেরোন, আর ফিরে আসেন রাত আটটা নাগাদ। ফলে রোববার দিনটা আমাদের বেশ স্বাধীনভাবে হইহুল্লোড় করে কাটে। যে যার খুশি মতো গান করি, কবিতা বলি, নিজেদের মধ্যে খারাপ কথা চালাচালি করি, এমনকী পোশাক-আশাকেও একটু বেপরোয়া হয়ে যায় কেউ কেউ।

রীণাদি চলে গেলে ওঁর ঘরের দখল থার্ড ইয়ারের দিদিদের দিয়ে যান। ওঁর ঘরে মিউজিক সিস্টেম আর কালার টিভি আছে। সেগুলো চালিয়ে একটু আমোদ

করলে উনি কিছু মনে করেন না।

রীণাদি বিয়ে করেননি কিংবা ডিভোর্সি। অন্তত শুন্য সিঁথি সেই কথাই বলে। কেউ-কেউ বলে, ওঁর কোনও ভালোবাসার লোক আছে–সে আবার নাকি বিবাহিত। আবার কেউ বলে রীণাদি একটু অদ্ভুত ধরনের, পুরুষদের পছন্দ করেন না। ছোটবেলায় নাকি কী একটা হয়েছিল। থার্ড ইয়ারের মৌসুমীদি নানান আত্মীয়ের ডালপালা মারফত ব্যাপারটা আবছাভাবে শুনেছে।

রীণাদির ঘরে বসে আমরা চার-পাঁচজন টিভি দেখছিলাম। তার মধ্যে শর্মিলাও ছিল। সেই রাতের পর থেকে ও আমার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আমার সঙ্গে বাড়ির নানা গল্প করে, মনের সুখ-দুঃখের কথা বলে।

সিরিয়াল দেখতে-দেখতে কী একটা মজার ব্যাপার দেখে আমরা হেসে উঠেছি, এমন সময় ঘরে রত্নাদি এসে হাজির।

এখন সবে সকাল নটা, কিন্তু এর মধ্যেই রত্নাদির স্নান শেষ। শ্যাম্পু করা চুল এখনও ভিজে। জানলা দিয়ে রোদের আভা মুখে এসে পড়েছে। মুখটা কী সুন্দর টলটলে দেখাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই রত্নাদি আমাকে ডাকল, অ্যাই বকুল, শোন।

আমি বাধ্য শান্তশিষ্ট বোনের মতো টিভি দেখা ছেড়ে রত্নাদির কাছে গেলাম। অন্য দু-একজন আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

রত্নাদি স্নেহের গলায় বলল, নটা বেজে গেল, এখনও ব্রেকফাস্ট খাসনি, এই করলে শরীর থাকবে! শিগগির নীচে যা, মঙ্গলামাসি গজগজ করছে।

আমি বললাম, শর্মিলাও খায়নি।

রত্নাদি শর্মিলাকে একবার দেখে নিয়েই আমাকে বলল, যা, ওকে নিয়ে খেতে চলে যা।

শর্মিলা উঠে এল আমার কাছে। আমরা দুজনে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, রত্নাদি পেছন থেকে ডাকল : বকুল।

আমি ঘুরে তাকালাম রত্নাদির দিকে।

দুপুরে একবার আমার রুমে আসিস তো, দরকার আছে।

আচ্ছা।

আমি আর শর্মিলা নীচে নামছি, হঠাৎই গ্রাম থেকে আসা সরল সাদাসিধে মেয়েটা মন্তব্য করল, রত্নাদি তোমাকে খুব লাইক করে।

হু সংক্ষেপে বললাম আমি।

ব্যাপারটা আমি যে লক্ষ করিনি তা নয়। এ নিয়ে আমার রুমের কৃষ্ণা আর সোনালিও আমাকে দু-চারবার খেপিয়েছে। তা ছাড়া সেই রাতের র‍্যাগিং-এর পর রত্নাদি একা সন্ধেবেলা আমাকে দোতলার বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, বকুল, ওই ব্যাপারটায় কিছু মাইন্ড করিস না, হস্টেলে নতুন কেউ এলে তার সঙ্গে ওরকম একটু মজা করা হয়। তুই ওসব ভুলে যাস।

রত্নাদির বলার মধ্যে এক অদ্ভুত নম্রতা ছিল। সন্ধের আঁধারে কঁঠালাপ ফুলের গন্ধ মাখা বাতাসে আমি সেই নম্রতার ছোঁয়া পেয়েছিলাম।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই একতলার ডাইনিং হলে এসে হাজির হলাম। সেখানে দুটো বড় বড় টেবিলে আট-দশজন মেয়ে বসে আছে, নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা-গল্প করছে।

নন্দনা আর শুক্লাদি পাশাপাশি বসেছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই নন্দনা চেঁচিয়ে বলল, শুক্লাদি, বকুলকে জিগ্যেস করে দ্যাখো–ওর তো বাংলায় অনার্স, ও বাংলায় আমাদের চেয়ে অনেক স্ট্রং।

এতে সেকেন্ড ইয়ার আর থার্ড ইয়ারের তিন-চারজন দিদি একেবারে হইহই করে ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস! বলে উঠল।

শুক্লাদি তখন হেসে আমাকে জিগ্যেস করল, বল তো, আমাদের দারোয়ান দুজনের নামের সন্ধিবিচ্ছেদ কী হবে?

আমাদের হস্টেলে দুজন দারোয়ান : একজনের নাম সত্যেন্দ্র, আর-একজনের নাম বালেশ্বর। একজনের দেশ বিহার, আর একজনের উড়িষ্যা।

আমি বললাম, সত্য প্লাস ইন্দ্র সত্যেন্দ্র।

আর পরেরটা?

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললাম, জানি না।

একদফা হাসির রোল উঠল ডাইনিং হলে।

তখন সেকেন্ড ইয়ারের অস্মিতাদি জিগ্যেস করল, সন্ধি না জানিস, সমাস আর ব্যাসবাক্য পারবি?

আমি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম, না, পারব না। তোমরা বরং কে. সি.-কে জিগ্যেস করে নিয়ো–।

কে. সি. আমাদের বাংলা অনার্সের ক্লাস নেন। খুব ভালো পড়ান।

এক পশলা হইচই আর হাসির মধ্যে শুনতে পেলাম কে যেন বলল, আর কিছু বলিস না মাইরি, বকুল খচে ফায়ার হয়ে গেছে।

আমি আর শর্মিলা ব্রেকফাস্ট নিতে কিচেনের দিকে গেলাম। সেখানে দুপুরের রান্নাবান্না নিয়ে হস্টেলের দুই কাজের মাসি সারদামাসি আর মঙ্গলামাসি–এলাহি হিমশিম খাচ্ছে। থার্ড ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারের তিনজন দিদি ওদের সাহায্য করছে।

সোনালি ওর খাওয়া শেষ করে চলে যাওয়ার সময় আমার পিঠে একটা টোকা মেরে গেল। বলল, বকুল, তোর কেয়ো কার্পিনটা আজ একটু নেব, আমারটা ফুরিয়ে গেছে

আমি ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লাম।

খাবারের প্লেট নিয়ে টেবিলে এসে যখন বসছি, দেখি নন্দনা আর শুক্লাদি রীতিমতন জড়াজড়ি করে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে গেল। নন্দনার পা ফেলার

তালে-তালে ছমছম করে শব্দ হচ্ছিল। আর শুক্লাদি আদরের হাতে নন্দনার কপালে-চলে-আসা চুলের গুছি ঠিকঠাক করে দিচ্ছিল।

ওদের চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে সেকেন্ড ইয়ারের জয়শ্রীদি চাপা গলায় বলল, দিদিভাই বোনটিকে তোমরা যেন ওপরে গিয়ে আর ডিসটার্ব কোরো না। এখন ওদের ইয়ের সময়।

ওর বলার ঢঙে আশপাশের কয়েকজন চাপা গলায় হেসে উঠল।

.

ঝরনার কাছ থেকে দিদিভাই-বোনটি-র ব্যাপার পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই আমি সেই রহস্যের মাঝে গিয়ে পড়লাম। তারপর সাগরের ঘূর্ণি যেভাবে খুশি মরজিমতন নিয়ে যায়, আমিও উথালপাতাল ভেসে গেলাম।

সেদিন দুপুরে রত্নাদির কাছে আমি গিয়েছিলাম।

রত্নাদি আমাকে বিশেষ কোনও দরকারে ডাকেনি। তিনতলার ঘরে একটা জানলার ধারে বসে আমার সঙ্গে নানা গল্প করতে লাগল। আমার বাড়ির কথা জিগ্যেস করল, পড়াশোনা নিয়ে কিছু পরামর্শ দিল, কলেজের প্রফেসারদের কারও কারও সম্পর্কে সতর্ক করে দিল। এ ছাড়া আরও অনেক এলোমেলো কথা বলল।

কথা বলার সময় রত্নাদি আমার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছিল, শাড়ির আঁচল ঠিক করে দিচ্ছিল, আর কখনও বা আমার কানের ইমিটেশান দুল কিংবা গলার হারের ডিজাইন হাতে ধরে পরখ করছিল।

প্রথম-প্রথম একটু অস্বস্তি হলেও পরে ব্যাপারটা আমি স্নেহ বলে ধরে নিয়েছিলাম। বাড়ির আপনজনদের ছেড়ে আসার পর এখানে যদি কেউ এতটুকুও আপন করে নেয় সেটা কিছু কম পাওয়া নয়।

সেদিন সন্ধের মুখে আমি রত্নাদির কাছ থেকে চলে এসেছিলাম। বলেছিলাম, কিছু নোটস তৈরি করার আছে।

রত্নাদি মিষ্টি করে বলেছিল, পরে আবার আসিস। আর কোনও অসুবিধে হলে আমাকে বলবি কিন্তু।

এরপর ক্লাস নোট আর পড়াশোনায় বেশ কদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। তবে তারই মধ্যে কিছু উটকো ঝাট লেগে থাকত। যেমন জয়শ্রীদির ময়েশ্চারাইজারের কৌটো কোথায় উধাও হয়ে গেল সে নিয়ে হইচই। শর্মিলার একটা সালোয়ার দিয়ে কে যেন পেনের কালি মুছেছে। নন্দনার ব্যাগ থেকে একশো টাকা চুরি গেল একদিন। সে নিয়ে মাসিদের সঙ্গে নন্দনার প্রায় বচসা লেগে গেল।

মাসিরা সকাল-সন্ধে আমাদের ঘর ঝাড়পোছ করে। আমাদের বেশিরভাগের সঙ্গেই ওদের বেশ ভালো সম্পর্ক। ওরা আমাদের অনেক অন্তরঙ্গ কথা শোনে, অন্তরঙ্গ অনেক কিছু দ্যাখে। তাই ওদেরকে বকশিশও দেয় কেউ-কেউ। নন্দনাও দেয়। কিন্তু একশো টাকা চুরি যাওয়াতে নন্দনা খেপে গিয়ে রীণাদিকে ব্যাপারটা জানাল। রীণাদিও ওর ঘরের সব মেয়েকে ডেকে বেশ কড়া ভাষায় বকে দিলেন। সারদামাসি আর মঙ্গলমাসিকেও শাসাতে ছাড়লেন না।

এই ঘটনার ঠিক পরেই একদিন সোনালি বলল, দুপুরবেলা বালেশ্বর নাকি একতলার বাথরুমের ঘষা কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল। থার্ড ইয়ারের দিদিরা ব্যাপারটা শুনে বালেশ্বরকে আড়ালে চেপে ধরল। তারপর সুপারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মাঝবয়েসি লোকটাকে একতলার সিঁড়ির পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে কান ধরে দশবার ওঠবোস করাল। মাসিরা ব্যাপারটা শুনে যে-ভাষায় বালেশ্বরকে গালিগালাজ করল আগমার্কা রকবাজ ছেলেও সে-ভাষা শুনে লজ্জা পাবে।

এইভাবে একটা সপ্তাহ ঘুরতেই রোববার সকালবেলা চলে এল আবার।

ঝরনার বাড়ি থেকে কাকা এসেছে দেখা করতে। ও তাড়াতাড়ি ড্রেস করে নিচ্ছিল। ব্রা টা কোনওরকমে পরে ও আমার কাছে এসে পেছন ঘুরে দাঁড়াল। বলল, হুকটা লাগিয়ে দে তো!

আমি সোমবারের ক্লাসের জন্যে দরকারি কয়েকটা নোট গুছিয়ে রাখছিলাম। সেটা ছেড়ে ঝরনার ফরসা পিঠে চোখ রাখলাম। তারপর হুকটা লাগিয়ে দিলাম।

ঝরনা রোজ অলিভ অয়েল মাখে, তাই ওর ত্বক খুব মসৃণ। ওর সুন্দর পিঠের দিয়ে তাকিয়ে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তোর স্কিনটা খুব মোলায়েম।

ঝরনা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ব্রা-র কাপ দুটো ঠিকমতো সেট করতে করতে বলল, তোর আবার এত মোলায়েম ব্যাপারের দিকে নজর কেন রে! তোরটা কি কিছু কম মোলায়েম!

না, তা না– আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম।

ঝরনা ফিক করে হেসে বলল, দাঁড়া আজ রাতে মেপে দেখব কারটা বেশি মোলায়েম

একথায় আর-এক রুম মেট কাকলি ওর পড়া থামিয়ে বলল, উঁহু, আজ রাতে বকুলেরটা মাপবে রত্নাদি।

আমি অবাক হয়ে কাকলির দিকে তাকালাম। এর মানে!

আমার প্রশ্নময় দৃষ্টির উত্তরে কাকলি বলল, আর সিক্রেট রেখে লাভ নেই, কী বলিস, ঝরনা?

ঝরনা শুধু খিলখিল করে হাসল, তারপর কামিজটা পরে নিল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

কাকলি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, আজ রাতে তোমাকে আর রত্নাদিকে ঝোলানো হবে–

ঘরে আমি, কাকলি, আর ঝরনা। আর সবাই এদিক-ওদিক কোথাও গেছে। আমি কাকলির কথায় আরও অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, আমাকে আর রত্নাদিকে ঝোলানো হবে মানে?

ঝরনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলে গেল, কাকলি, তুই বকুলকে যা বলার বলে দে, আমি চললাম।

কাকলি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আবদারের সুরে পালটা প্রশ্ন করল আমাকে, আগে বল, রত্নাদিকে তোর কেমন লাগে?

আমি কয়েক লহমা ভেবে ইতস্তত করে জবাব দিলাম, ভালোই।

রত্নাদির সঙ্গে কথাবার্তা মেলামেশার মুহূর্তগুলো মনে পড়ছিল আমার।

কাকলি তখন বলল, তোকে রত্নাদির ভীষণ পছন্দ। হস্টেলের সবাই এটা জানে। তাই তোদের দুজনের মধ্যে দিদিভাই-বোনটি পাতিয়ে দেওয়া হবে। আজ সন্ধেবেলা সেই ফাংশান–সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়ে গেছে।

কাকলির কথায় আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এ কোন নতুন র‍্যাগিং শুরু করল থার্ড ইয়ারের দিদিরা। আমার আর রত্নাদির সম্পর্কের মধ্যে নতুন কোন মাত্রা যোগ করবে আজ সন্ধের ফাংশান?

সারাদিন আমি আর ঘর ছেড়ে বেরোলাম না। নানা কথা ঘুরপাক খেতে লাগল মনের ভেতরে।

বিকেলে দাদা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। দাদাকে দেখে যতটা খুশি হওয়ার কথা ততটা খুশি হতে পারলাম না। দাদা চলে গেলে পর হস্টেলের ভেতর দিকের মাঠে চলে গেলাম।

আমাদের হস্টেল বিল্ডিংটা ইংরেজি ইউ অক্ষরের ধাঁচের। তারই অন্দরের কোলে ছোট মাপের একটা সবুজ মাঠ আছে। তার চারদিকে নানান ফুলগাছ। আমরা চাঁদা তুলে ফুলগাছ কিনি। ফুলের পরিচর্য্যা করি। সত্যেন্দ্র এই কাজে আমাদের সাহায্য করে। আমাদের ফাইফরমাশের জিনিসপত্র আনার ব্যাপারে ও আর বালেশ্বরই আমাদের ভরসা।

সন্ধে সামান্য গাঢ় হতেই আমি মাঠের কিনারে একটা করবী গাছের গোড়ায় চুপচাপ গিয়ে বসে পড়লাম। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নন্দনা আর শুক্লাদির কথা ভাবতে লাগলাম। ওদের নিয়ে বেশ কিছু মজা আমার কানে এসেছে। সেগুলো সব সত্যি বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবে তার মধ্যে কমবেশি রোমাঞ্চও আছে।

শুনেছি, নন্দনা নাকি প্রায়ই রাতে ওর বিছানায় থাকে না–তিনতলায় শুক্লাদির কাছে গিয়ে শোয়। সকালবেলা ঘর ঝাট দিতে গিয়ে সারদামাসি ওদের বহুবার বেআব্রু অবস্থায় দেখেছে–তবে সুপারকে কিছু বলেনি।

এও শুনেছি, থার্ড ইয়ারের ঈশিতাদি একদিন ভীষণ তাড়াহুড়োর সময় স্নান করতে গিয়ে বাথরুম বন্ধ দেখে হইচই শুরু করে দিয়েছিল। কারণ, একটা

বাথরুম নাকি আধঘণ্টা ধরে বন্ধ শুক্লাদি আর নন্দনা একসঙ্গে স্নান করছে। পাশের বাথরুমে মেয়েরা তখন সবে ঢুকে দরজা দিয়েছে। তাদের চেঁচামেচি, ঈশিতাদির রাগী মন্তব্য ইত্যাদির মাঝে শুক্লাদি নাকি দরজা খুলে ঈশিতাদিকে ডেকে নিয়েছে। বলেছে, আমাদের দেরি হবে–তুই বরং আয়, চট করে চান করে চলে যা–।

ঈশিতাদি সেই বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেটুকু সময়ে ও দিদিভাই আর বোনটি-কে যে অবস্থায় দেখেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থার্ড ইয়ারের দিদিদের কাছ থেকে চোরাপথে চুঁইয়ে ফার্স্ট ইয়ারের আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। এবং সেটুকু খবরই আমাদের গাল এবং কান লাল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে কৌতূহলও কি মনের মধ্যে উঁকি মারেনি? সাধ হয়নি অ্যাডভেঞ্চারে গা ভাসিয়ে দেওয়ার? ঝরনার ভাষায় সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন থেকে ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন হতে কি ইচ্ছে করেনি?

আমাদের অনেকের মনেই বোধহয় এই গোপন ইচ্ছে উঁকিঝুঁকি মারে। তা নইলে নন্দনাকে সকলে এত হিংসে করে কেন?

মাঠে হাওয়া খেলছিল, গাছের পাতা উথালপাতাল করছিল। আর রান্নাঘরের দিক থেকে ফোড়নের ঝাঁঝ ভেসে আসছিল। একইসঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলাম মাসিদের কথাবার্তার টুকরো, টেপরেকর্ডারে বাজানো গানের কলি।

হঠাৎই তন্দ্রাদি, কাকলি আর সোনালি আমাকে ডাকতে এল।

কী রে, তুই এখানে বসে আছিস! তন্দ্রাদি হেসে বলল, চল, চল সাড়ে ছটা বাজে। আর দেরি করলে সুপার এসে পড়বে। ওপরে সবাই রেডি হয়ে বসে আছে।

একটা দোলাচল নিয়ে উঠে পড়লাম।

হাসাহাসি করতে করতে ওরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল তিনতলায় রত্নাদিদের ঘরে।

সেখানে গিয়ে দেখি রত্নাদির বিছানায় রজনীগন্ধা আর জুই ফুল ছড়ানো। ঘরের একপাশে ধূপকাঠি জ্বলছে। রত্নাদি কপালে চন্দনের টিপ পরে খোঁপায়

ফুলের মালা লাগিয়ে বিছানায় একপাশে বসে আছে। আর বিছানা ঘিরে যথারীতি মেয়ের দঙ্গল।

আমাকে সাজাতে এগিয়ে এল সেকেন্ড ইয়ারের চন্দ্রা আর সুদক্ষিণা।

এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম আমি।

সাজগোজের পর আমাকে বসিয়ে দেওয়া হল বিছানায় রত্নাদির মুখোমুখি। তারপর রজনীগন্ধার দুটো গোড়ে মালা ধরিয়ে দেওয়া হল দুজনের হাতে।

তারপর?

তারপর যা ভবিতব্য তা-ই হল। সকলের হাসি-ঠাট্টা উলুধ্বনির মধ্যে মালাবদল। রত্নাদি আমাকে বোনটি বলে ডাকল। উত্তরে আমাকে দিদিভাই বলে ডাকতে হল।

তারপর সবার শেষে, শুক্লাদি জানাল, পরস্পরকে চুমু খাওয়ার পালা।

র‍্যাগিং-এর দিনের ব্যাপারটা একরকম ছিল…আর আজ…অন্যরকম।

আমি কেমন যেন সঙ্কোচহীন হয়ে গেলাম। বেশ সপ্রতিভভাবেই চুমু খেলাম রত্নাদির ঠোঁটে।

সঙ্গে-সঙ্গে হইহুল্লোড় নাচ-গানের ঝড় উঠল। সেইসঙ্গে কত রসালো মন্তব্য।

ঝড় থামলে শুরু হল মিষ্টিমুখ।

সবাই মিষ্টি খেল। আমি রত্নাদিকে মিষ্টি খাইয়ে দিলাম, আর রত্নাদি আমাকে।

এইভাবে শেষ হল আমাদের ঝোলানো-র অনুষ্ঠান।

সে-রাতে, বলাবাহুল্য, রত্নাদির বিছানায় রত্নাদির সঙ্গে আমাকে শুতে হয়েছিল। ফুলশয্যার রাতের অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম।

গোটা ঘরটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে অন্য মেয়েরা চলে গেল। রত্নাদি বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দরজায় খিল তুলে দিল।

আমাদের আজ রাতে খাওয়া বারণ কারণ এটাই নাকি নিয়ম। চলে যাওয়ার আগে তন্দ্রাদি হেসে বলে গেছে, আজ তোদের ডাইনিং হলে খাওয়া বারণ। যা খাওয়া-খাওয়ি সব তোদের ওই বিছানায় সারতে হবে।

অন্ধকারের মধ্যে আমরা ঘন হয়েছিলাম।

আমি কাঠ হয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকলেও রত্নাদি চঞ্চল হয়ে পড়ছিল। বারবার বোনটি, বোনটি– বলে চুমুতে-চুমুতে আমাকে ভরিয়ে দিচ্ছিল। আর ওর হাত অবাধ্যভাবে যততত্র আমাকে আদর করছিল।

প্রথম দিকে রত্নাদির আদরের মধ্যে স্নেহের ভাব থাকলেও একটু পরেই সেটা পালটে গেল। ওর স্নেহের পোশাক ছেড়ে ভালোবাসা যেন আলতো করে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর ক্রমেই তা বেপরোয়া প্রগলভ হয়ে উঠল। বহুদিন ধরে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা নদীর জল বাঁধ ভাঙার পর যেভাবে পাগলপারা ছুটে যায়, রত্নাদির অবস্থাও যেন হল অনেকটা তাই।

বকুল বকুল–বোনটি আমার…বকুলফুল.. রত্নাদি বিড়বিড় করে বলছিল।

আর আমার ভেতর থেকে একটা অবাঞ্ছিত আমি ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল। একসময় শুনতে পেলাম, আদর খেতে-খেতে আমারই গলায় আমার মুখ দিয়ে কে যেন বলছে, রত্নাদি… দিদিভাই..আরও আদর করো আমাকে…।

বকুল…বকুলফুল…।

আদরে-আদরে আমায় শেষ করে দাও, দিদিভাই…।

প্রায় সারা রাত ধরে আমরা পাগলের মতো যা করেছিলাম পরদিন ঘুম থেকে উঠে সে কথা ভেবে একটা গ্লানিবোধ আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। অথচ আমার পাশটিতে আলুথালু বেশে শুয়ে থাকা রত্নাদির মুখে কী সুন্দর নিষ্পপ তৃপ্তির ছাপ!

সকাল আটটায় মেয়ের দল এসে আমাদের দুজনকে হইহই করে জাগিয়ে তুলেছিল। তারপর আবার হাসি-মশকরা মন্তব্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার হস্টেলের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেল সবাই। শুধু আমার আর তেমন করে ফেরা হল না।

কিন্তু না-ফেরা জীবনটাও আমার কাছে বোধহয় খুব একটা অপছন্দের ছিল না।

আমি সবসময় রত্নাদির কাছে কাছে থাকতাম। আর রত্নাদিও চাইত আমার কাছে থাকতে। অন্যান্য মেয়ের কাছ থেকে এরকম মন্তব্যও শুনতাম, ওরা দেখছি নন্দনা আর শুক্লাদিকেও ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করার কোনও প্রশ্নই ছিল না।

আমার সামান্য জ্বর হলে রত্নাদি রাত জেগে শিয়রে বসে আমার সেবা করত। দু-বেলা আমাকে নিয়ম করে হরলিক্স তৈরি করে দিত। পরীক্ষার সময় ডাব আর টিফিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত কলেজের দোতলার বারান্দায়। কোনও কারণে কলেজ থেকে আমার ফিরতে দেরি হলে হস্টেলের দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত। আমি ছুটিতে বাড়ি গেলে ঘন-ঘন চিঠি দিত।

সব মিলিয়ে আমাকে ভালোবাসার ব্যাপারে রত্নাদি লজ্জাহীন হয়ে পড়েছিল।

রত্নাদির এই ভালোবাসা, যত্ন, আদর–সবই আমার ভালো লাগত। বাড়ি থেকে এত দুরে এসে আপন করে কাউকে পাওয়া কিছু কম নয়। আমি যেন সত্যি একটা আশ্রয় পেয়েছিলাম রত্নাদির কাছে। আমাদের রাতের ভালোবাসা যেমন মিথ্যে ছিল না, দিনের ভালোবাসাও তাই। প্রথম দিকে রাতে রত্নাদির আদরের সময় আমি ভাবতাম রতীন আমাকে আদর করছে। পরে আমি সরাসরি রত্নাদিকেই ভাবতে পারতাম।

সত্যিই বড় অদ্ভুতভাবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি।

এইভাবে দেখতে-দেখতে একটা বছর পেরিয়ে গেল।

রত্নাদির হস্টেলের পালা শেষ হয়ে এল, আর আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম।

কিছুদিন ধরেই মনের ওপরে একটা চাপ পড়ছিল, তার প্রকট ছাপ ফুটে উঠেছিল চোখেমুখে। আমি, নন্দনা, শুক্লাদি আর রত্নাদি আমাদের সবারই একই দশা। যেন ফাঁসির দিন শিগগিরই এগিয়ে আসছে।

একটা অদ্ভুত আতঙ্কে আমি সবসময় রত্নাদির খুব কাছাকাছি থাকতে লাগলাম। এমনিতে সপ্তাহে দু-তিনদিন ওর কাছে গিয়ে শুতাম–এখন সেটা প্রায় রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

অন্ধকারে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে রত্নাদির বলে, বকুলফুল, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

আমি দিদিভাইয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলি নিজেই ও দিদিভাই, আমাকে ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেয়ো না।

কয়েকটা দিন এভাবে কাটতে না কাটতেই রত্নাদির দিন ফুরোল।

ওর চলে যাওয়ার দিন আমি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েরা আমাকে ধরে রাখতে পারছিল না। কেঁদে চিৎকার করে আমি রত্নাদির ট্যাক্সির দরজায় আছড়ে পড়ছিলাম বারবার। আর ট্যাক্সির ভেতরে ওর বাবার কাঁধে মাথা রেখে রত্নাদি হাউহাউ করে কাঁদছিল।

ট্যাক্সিটা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই আমি নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আমার প্রায় একমাস সময় লেগেছিল।

নতুন থার্ড ইয়ারে ওঠা অস্মিতা, জয়শ্রী, চন্দ্রাদিরা আমার অবস্থা দেখে অন্য কারও সঙ্গে দিদিভাই-বোনটি পাতানোর পরামর্শও আমাকে দিয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। নতুন করে কষ্ট পেতে আর আমি রাজি নই।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমি ভেতর থেকে বদলে যেতে শুরু করলাম। শুক্লাদি চলে যাওয়ার দিন আমি ঘর ছেড়ে বেরোইনি। নন্দনা আর শুক্লাদির হাহাকার কান্না আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। কিন্তু আমি কানে আঙুল চেপে পাথর হয়ে পড়েছিলাম।

এরপর একদিন মনে হল রত্নাদির সঙ্গে দিদিভাই-বোনটি ব্যাপারটা আমার নয়–অন্য কোনও বকুলের হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভেতরের দুটো বকুল ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।

এইভাবে একসময় একটা বকুল প্রায় হারিয়ে গেল। রত্নাদির চিঠি ওকে আর উতলা করে না। রত্নাদির কথা তেমন করে আর মনে পড়ে না ওর।

যে হারিয়ে গেল তার নাম বকুলফুল।

আর আমার ভেতরে যে পড়ে রইল সে শুধু বকুল।

.

রত্নাদির ডাকে হারিয়ে যাওয়া ঘুমিয়ে পড়া বকুলফুল আবার ফিরে এল আমার ভেতরে।

কফির কাপ সামনে রেখে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতার হাত ধরে বসে রইলাম দুজনে। অনেক অর্থহীন কথা বললাম।

রত্নাদি পুরোনো দিনের পৃষ্ঠাগুলো খুলে বকুলফুলকে লোভ দেখাল আবার। সেই বিচিত্র দাম্পত্যজীবন লাস্যময় হাতছানি দিতে চাইল আমাকে।

আমি চোখের জল মুছে নিয়ে জড়ানো গলায় বললাম, রত্নাদি, আমি বিয়ে করেছি।

রত্নাদি স্থিরচিত্র হয়ে গেল পলকে। ওর ফরসা মুখের রক্তকণা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। তারপরই ওর সুন্দর মুখের জ্যামিতি ভাঙচুর হয়ে ও কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কান্না ঠিক একটু আগের আবেগের কান্নার মতো নয়। এ কান্না যেন সর্বহারার লজ্জাহীন কান্না। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল রত্নাদি।

অনেক-অনেকক্ষণ পর নিজেদের সামলে আমরা উঠে পড়লাম। মামুলি কিছু কথা বলে যে যার পথ ধরলাম। রত্নাদির শরীরটা সন্ধের আঁধারে মিশে যেতে লাগল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমার দিদিভাইয়ের চলে যাওয়া দেখলাম।

আচ্ছা, আবার যদি তিন-চার বছর পর রত্নাদির সঙ্গে আমার দেখা হয় তা হলে কি আমরা আবার এরকম বিষণ্ণ হয়ে পড়ব? আমাদের অন্যরকম ভালোবাসার এই অদ্ভুত স্মৃতি আমার বুকের ভেতরের কবর খুঁড়ে আবার বেরিয়ে আসবে নিয়তির মতো?

হয়তো আসবে। সেদিনের সেই বকুলফুল বোধহয় একেবারে মূল্যহীন নয়। আমি জানি, যতবারই বকুলফুল সামনে এসে দাঁড়াবে, ততবারই এই বকুল দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে ওকে সত্যিকারের ভালোবাসবে।

# আরশিনগরের অসভ্য লোকটা

**আরশিনগরের অসভ্য লোকটা**

**০১.**

বলব না বলব না করেও শেষ পর্যন্ত লোকটার কথা নন্দিনীকে বলে ফেললাম।

লোকটাকে আমি গত তিনদিন ধরে লক্ষ করছি। সবসময় চোরের মতো আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছে। প্রথম-প্রথম ভাবতাম, লোকটা বুঝি লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাকে দ্যাখে। কিন্তু এই তিনদিনেই বুঝেছি, না আমাকে না–লোকটা লুকিয়ে লুকিয়ে নন্দিনীকেই দেখার চেষ্টা করে।

অবশ্য সবসময় যে দ্যাখে তা নয়। লুকিয়ে দেখার জন্য ও ঠিক মোক্ষম মুহূর্তগুলোই বেছে নেয়। যেমন, নন্দিনী বাথরুম থেকে স্নান সেরে ঘরে এলেই লোকটা তৈরি হয়ে যায়। ওর চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। গলার শিরা ফুলে ওঠে। ফরসা মুখে রক্তের ফোয়ারা ছোটে। সব মিলিয়ে লালসা মাখানো কামুকনজরে ও চোখ বড়-বড় করে নন্দিনীকে দেখতে থাকে। কারণ ও জানে, এক্ষুনি নন্দিনী কাপড় ছাড়বে। তারপর..ওঃ, অসহ্য!

আর নন্দিনীকেও বলিহারি যাই! জানি, সুন্দর করে সাজানো অ্যাটাচ্‌ড বাথওয়ালা এই মাঝারি ফ্ল্যাট একেবারে আমাদের নিজের। বাথরুম থেকে স্নান সেরে নন্দিনী খালি গায়ে বেরোলেই-বা কে দেখতে পাবে–আমি ছাড়া! তখন ওর ফরসা গায়ে, বুকে, চুলে জলের ফোঁটা আটকে থাকে। এমনকী নাকের ডগায়, চোখের পাতায়, অথবা ঠোঁটেও ছুঁয়ে থাকে জলবিন্দু। তখন আমার তো আর মাথার ঠিক থাকে না, তাই ওকে জাপটে ধরে ঠোঁট দিয়ে সারা শরীরের জলের

ফোঁটা মুছে নিই। আর স্পষ্ট বুঝতে পারি, কেন জলের আর-এক নাম জীবন। কারণ, ওই সময়ে নন্দিনীকে আদর করতে–পারলে আমি মরে যেতাম।

বিয়ের পর তিনটে বছর দারুণ কেটে গিয়েছিল। দিনে বা রাতে আমাদের ভালোবাসায় কোনও হেরফের হত না। মনে হত, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমাদের ভালোবাসা যেমন ছিল, এখন তারই অ্যাকশান রিপ্লে চলছে। তা-ই চলত যদি না মাঝখান থেকে ওই অসভ্য লোকটা এসে দেখা দিত।

ভোরবেলা নন্দিনী যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন সে এক দেখার মতোই দৃশ্য! যাকে বলে টপ। মানে টপলেস। ব্লাউজ-এর বালাই নেই। আর শাড়ি-সায়াটা বায়না করা বাচ্চার মতো কোনওরকমে ওর কোমর আঁকড়ে ঝুলছে। তখন ঘুম জড়ানো চোখে যেই আমি নন্দিনীকে দেখি অমনি আমার ঘুম ছুটে যায়। হ্যাংলার মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। অথচ, কিছুক্ষণ আগেই, সারারাত ধরে ওকে নিয়ে কত-না হামলা-হামলি করেছি। শরীর-মন-বিছানা সব উথালপাতাল। তবুও সকালের আলোয় ওর ওই ফরসা ইয়েগুলো দেখলে আমি কেমন ইয়ে হয়ে যাই। এইজন্যেই বোধহয় মুনি-ঋষিরা বলেছেন : লোভ অতি বিষম বস্তু।

তা এই লোভের টানেই বোধহয় ওই অসভ্য লোকটা তাক বুঝে উঁকিঝুঁকি মারে। ভোরবেলা নন্দিনীর ঘুমভাঙা থেকে শুরু হয় লোকটার নজরদারির কাজ। তারপর স্নান করতে যাওয়ার আগে পরে। কাপড় ছাড়ার সময়। রাতে শুতে যাওয়ার আগে। এমনকী আধো-আঁধারি বিছানায় দিকেও ওর নজর থাকে। অবশেষে সকালবেলার ব্যাপারটা তো আছেই।

লোকটার অসভ্যতার এত খুঁটিনাটি আমি টেরও পেতাম না, যদি-না অফিস থেকে দশদিনের ছুটি নিতাম। অফিসে কাজের টেনশান দিনকে দিন বেড়েই চলেছিল। তাই ডাক্তারি পরামর্শে দশদিন ছুটি নিয়েছি বিশ্রামের জন্যে। কিন্তু ওই লোকটা আমাকে বিশ্রাম দিল কই!

তিন-তিনটে দিন লোকটাকে ভালো করে লক্ষ করার পর আজ সকালে নন্দিনীকে ডেকে বললাম, অ্যাই শোনো।

কী?

জানো, একটা অসভ্য লোক সবসময় লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে দ্যাখে।

নন্দিনী হেসে বলল, সে আর জানি না, সেই লোকটা তো এখনও আমাকে হ্যাংলার মতো দেখছে।বলে আমার বুকে আঙুল দিয়ে টোকা মারল দুবার।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আমি না, আমি না–একটা অন্য লোক।

নন্দিনী তখন বেশ ঘাবড়ে গেল। এক-পা পিছিয়ে গিয়ে চারপাশে তাকাল। তারপর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কে? কোথা থেকে দ্যাখে?

আমি দেখলাম, আর লুকিয়ে লাভ নেই। সুতরাং ওকে বলেই ফেললাম, লোকটাকে চিনি না। তবে লোকটা দ্যাখে ওই আয়নার ভেতর থেকে। বলে আমি আঙুল তুলে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটার দিকে দেখালাম।

এই ড্রেসিং-টেবিলটা বিয়ের সময় নন্দিনীর মা আমাদের দিয়েছিলেন। এটা তিনি আবার পেয়েছিলেন তার মায়ের কাছ থেকে। অর্থাৎ অ্যান্টিক। আর চেহারা দেখেই তার আভিজাত্য দিব্যি বোঝা যায়। যেমন, মেহগনি কাঠ। সূক্ষ্ম কারুকাজ যার মধ্যে রয়েছে শিল্পীর ধৈর্য ও দক্ষতার প্রমাণ। তা ছাড়া আয়নাটাও মাপে বেশ বড়। প্রায় ছফুট উঁচু, আর চওড়ায় প্রায় দু-ফুট। তার ওপর আবার দু-পাশে দুটো ভাজ করা আয়নার ফালি জোড়া রয়েছে–পাখির ডানার মতো।

বিয়ের পর সময় করে আমি ড্রেসিং-টেবিলটাকে ভালো করে পালিশ করিয়ে নিয়েছিলাম। আর সুন্দর ঝালর দেওয়া সরু লেসের কাজ করা পরদা ঝুলিয়ে দিয়েছি ওটার ওপরে। আমাদের ফ্ল্যাটে যে-ই আসুক, ড্রেসিং-টেবিলটা দেখে তারিফ না করে পারে না। বলে, দামি কাঠ, বেলজিয়ামের কাচ, ব্রিটিশ আমলের জিনিস, এর দাম কম করে দশ-পনেরো হাজার টাকা হবে।

এখন সেই অভিজাত ড্রেসিং-টেবিলের আড়ালেই আশ্রয় নিয়েছে নির্লজ্জ বেহায়া লোকটা।

নন্দিনীকে আয়নাটা আঙুল দিয়ে দেখাতেই ওর মুখ পলকে খানিকটা ফ্যাকাশে হলে গেল। চট করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল বিছানার কাছে। নরম গদির ওপরে ঠেলে বসিয়ে দিল আমাকে। গায়ে, মুখে, কপালে হাত বোলাতে বোলাতে জিগ্যেস করল, সকালে ওষুধ খেয়েছিস?

বিয়ের আগে আমাদের তুই-তুই প্রেম ছিল। বিয়ের পরেও আদুরে ভালোবাসা জানাতে আমরা দুজনে-দুজনকে তুই বলে ডাকি। কিন্তু ওর মুখে ওষুধ শব্দটা

শুনেই আমার আদুরে ভালোবাসা বিগড়ে গেল।

অফিসের কাজের চাপে আমার টেনশান হয় বলে নন্দিনী একরকম জোর করেই আমাকে একদিন ডক্টর সোমেন বাসুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে মাসে একবার করে ডক্টর বাসুকে দেখাতে যাই। ইনি কী দেখেন ভগবান জানেন। তবে কী একটা বিচ্ছিরি ট্যাবলেট আর সিরাপ খেতে দিয়েছেন। নন্দিনীর খেয়াল আর যত্নে একটিবেলাও সে-ওষুধ বাদ দেওয়ার জো নেই। আর সাম্প্রতিক ছুটি নেওয়ার পরামর্শটাও ওই মহা-চিকিৎসকের।

নন্দিনীকে আমি রাগাতে চাই না। তাই ওর বুকে মুখ গুঁজে বললাম, হ্যাঁ, ওষুধ খেয়েছি।

নন্দিনী কোনও কথা না-বলে আমার মাথাটা বুকে চেপে রেখে আমার চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আমার বেশ ভালো লাগছিল। কিছুক্ষণের জন্যে বেমালুম ভুলে গেলাম অসভ্য লোকটার কথা।

পদ্ম নামে একটি বউ আমাদের ঠিকে কাজ করে দেয়। ওর আসার কথা সকাল আটটায়, কিন্তু প্রায় রোজই আসে সাড়ে নটা-দশটায়। ওর দেরি দেখে আমি রেগে যাই, অথচ নন্দিনী ওকে কিছু বলে না। কী করে পদ্ম ওর বউদিমণিকে ম্যানেজ করে রেখেছে, কে জানে!

আজও পদ্ম আসতে দেরি করছে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। নিশ্চিন্তে নন্দিনীর আদর খেতে পারছি। পদ্মর মেয়ে সুখী আসে বেলা বারোটা নাগাদ। এসে সারাটা দিন নন্দিনীর কাছেই থাকে, আর দরকার হলে ফাইফরমাশ খাটে। রাত নটা বাজলে খেয়েদেয়ে মেয়েটা মায়ের ডেরায় চলে যায়।

তোর কী হয়েছে বল তোনন্দিনী আমাকে আলতো করে জিগ্যেস করল।

আমি ওর বুকের মধ্যেই আড়ষ্টভাবে সামান্য মাথা নেড়ে বললাম, কিচ্ছু না। শুধু ওই অসভ্য লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। লোকটা সবসময় ওই আয়নার আড়াল থেকে তোকে দ্যাখে।

কথাটা বলেই আমি সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকালাম আয়নাটার দিকে। ওটার ওপরে লেসের পরদা টানা ছিল। কিন্তু তবু যেন আমি একটা অস্পষ্ট ছায়াকে চট করে সরে যেতে দেখলাম। চোখগুলো বড়-বড়। ঠোঁটের কোণে লোভাতুর হাসি।

নন্দিনীকে কিছু বলার আগেই ও বলে উঠল, সন্দীপ, এসব নিয়ে তুই একদম ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিনী সান্ত্বনা দিলে কী হবে, আমি জানি, এত সহজে সব ঠিক হবে না। ওই লোকটার নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে আলতো ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ওর পেছনটা বেশ ভারী। বিয়ের আগে এতটা ভারী ছিল না।

নন্দিনী টেলিফোনে মিষ্টি করে হ্যালো বলল।

এটা কি সেই টেলিফোন?

মানে, কিছুদিন ধরে একটা ফোন আসছে, সেটা আমি ধরলেই সব চুপচাপ– কেউ কথা বলে না। শুধু দম নেওয়ার ফোঁসফোঁস শব্দ শোনা যায় কয়েক লহমা। আর তারপরই লাইন কেটে যায়।

অথচ নন্দিনী যদি ফোন ধরে তা হলে আর লাইন কাটে না। কখনও সেই ফোনে কথা বলে নন্দিনীর মা, অথবা আমার ছোটপিসি, বা আমেরিকা থেকে নন্দিনীর বড়দা, আর নয়তো দীপেশ।

নন্দিনী টেলিফোনে কথা বলছিল। আমি হাঁ করে ওর কথাগুলো শুনছিলাম। কে ফোন করছে। এখন?

আমার মুখ দেখে নন্দিনী বোধহয় নীরব প্রশ্নটা টের পেল। রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিশফিশে গলায় বলল, দীপেশ–।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপেশ আমাদের দুজনেরই বন্ধু। ইউনিভার্সিটিতে আমরা তিনজনে একসঙ্গে পড়েছি। দীপেশটা যাচ্ছেতাই নম্বর পেয়ে প্রত্যেক

ইয়ারে ফার্স্ট হত। তার ওপর কী দারুণ চেহারা! আমার সঙ্গে তো একেবারে গলায়-গলায় ছিল। একসঙ্গে কত সিনেমা দেখেছি আমরা। তখন নন্দিনীর সঙ্গে আমার অতটা মাখামাখি ছিল না।

পাশ-টাশ করে একটা দারুণ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি নিয়ে দীপেশ স্টেট্স-এ চলে গেল। আমিও চাকরি পেলাম। তার কিছুদিন পর নন্দিনীও চাকরিতে ঢুকল। চাকরি করা অবস্থায় আমাদের প্রেম চলেছিল বছরখানেক। কিন্তু তারপর আর পারা যাচ্ছিল না। নন্দিনীর বাবা একটা ফ্ল্যাট গিফ্ট করতেই সব প্রবলেম সম্ভ হয়ে গেল। নন্দিনী চাকরি ছেড়ে দিল। বলল, সন্দীপ, চাকরির চেয়ে বিয়ে অনেক বেটার। তুই একা চালাতে পারবি না?

আমি খুব পারব বলে ওকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিয়েছিলাম। আর তারপরই দু গালে প্রচণ্ড চকাৎ-চকাৎ শব্দে দুটো চুমু। নন্দিনী আচমকা বিব্রত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, কী হচ্ছে। কী হচ্ছে!

আমি হেসে বলেছিলাম, সোনা, চুমুতে যখন বিকট শব্দ হয় তখন তাকে বলে হামি।

করিডর ধরে কে যেন এগিয়ে আসছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে নন্দিনীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের বিয়ের মাসতিনেক পর দীপেশ কলকাতায় ফিরল। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই আসে আমাদের আস্তানায়। ওকে দেখলেই আমার ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। নন্দিনীর সঙ্গে পিরিত করার জন্যে ও আমাকে কম ওসকায়নি। বন্ধুবান্ধব সকলের মাঝে লুকিয়ে আমার পেছনে চিমটি কেটে বলেছিল, জাগো বাঙালি, লড়ে যাও।

নন্দিনী টেলিফোনে খুব হাসছিল। তারপরই খেয়াল করলাম ও দীপেশকে আমার কথা বলছে।

আমি আয়নার দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম। না, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু দীপেশকে এক্ষুনি ওই লোকটার কথা বলার দরকার নেই। ও কী মনে করবে কে জানে!

নন্দিনীকে ইশারা করে বারণ করলাম, দীপেশকে এখন যেন কিছু না-বলে।

নন্দিনী আমাকে আশ্বস্ত করে হাসল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল। রাখার সময় স্পষ্ট দেখলাম, রিসিভারটা ওর বাঁ-দিকের বুকে ঘষে গেল। রিসিভারটাকে হিংসে হল আমার।

নন্দিনীকে কাছে ডাকতে যাবে, অমনি কলিংবেল বেজে উঠল। ও আমাকে লক্ষ করে জিভ ভেঙাল। বলল, পদ্ম না-এলে আমার কপালে বোধহয় একটি ফোঁটাও বিশ্রাম জুটত না। দীপেশ এলে বলব, তুমি একটুও কথা শোনো না।

নন্দিনী দরজা খুলতে গেল।

আর ঠিক তখনই একটা আবছা ছায়া আয়নার ওপরে আড়াআড়ি সরে গেল যেন।

.

## ০২.

নন্দিনী অলস ভঙ্গিতে চিত হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়। ঘরের নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। তার নীল আলোয় নন্দিনীর শাড়ির রং ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোককে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ওদের মুখ অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য মোটেই অস্পষ্ট নয়। ওদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র হাতে খপ করে চেপে ধরল নন্দিনীর শাড়ি। তারপর একটা উল্লাসের হেঁচকি তুলে শাড়িটা টানতে শুরু করল। বিছানায় নন্দিনীর দেহটা সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে, আর শাড়িটা একটু একটু করে খুলে আসছে ওর শরীর থেকে। বাকি তিনজন লোক নন্দিনীর বস্ত্রহরণ চুপচাপ দেখছে। আবছা আলোতেও ওদের চোখে ফুটে ওঠা তৃপ্তি বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ওই চারজন দস্যু চমকে উঠে এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় চারজন গায়ে গায়ে মিশে গিয়ে একজন মানুষ হয়ে গেল। এবং সেই লোকটা একছুটে চলে গেল ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার কাছে। আয়নার পরদা সরিয়ে চোখের পলকে ঢুকে গেল আয়নার ভেতরে।

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের মধ্যেই বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। কারণ, দেখি, নন্দিনী আলুথালু বেশে উঠে বসে আমার বুকে হাত বোলাচ্ছে, মাথায় হাত বোলাচ্ছে, কপালে-গালে ভয়-ভাঙানো চুমু খাচ্ছে।

কী হয়েছে রে? বাজে স্বপ্ন দেখেছিস?–নন্দিনীর গলায় উৎকণ্ঠা।

হ্যাঁ, খুব বাজে স্বপ্ন। বড়-বড় শ্বাস নিতে নিতে আমি বললাম, আয়নার ওই লোকটা তোর শাড়ি ধরে..শাড়ি ধরে…।

থাক, থাক। এখন ঘুমো।

আমাকে একগ্লাস জল দিল ও। ঢকঢক করে জল খেয়ে ওর নরম বুকে মুখ গুঁজে আমি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল থেকে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি নানা অছিলায় আয়নার কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগলাম। নন্দিনী ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে লক্ষ করছিল। ওর নজর দেখেই বুঝলাম, আমার মতলব ও ধরে ফেলেছে, কিন্তু আমাকে কিছু বলল না।

বেলার দিকে একবার ফোন বেজে উঠতেই আমি ফোন ধরলাম। নন্দিনী রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ছুটে আসছিল ফোন ধরতে। কিন্তু আমাকে রিসিভার তুলতে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি টেলিফোনে কথা বললাম।

হ্যালো।

কোনও উত্তর নেই। তবে টের পেলাম, ও-প্রান্তে শোনা যাচ্ছে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

আমি আরও বেশ কয়েকবার হ্যালো-হ্যালো বললাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না।

আমি আয়নার দিকে একবার তাকালাম। নাঃ, সেখানে কেউ নেই।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছি, নন্দিনী সাত-তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমাকে দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

আমি রিসিভারটা ওকে বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলাম। আয়নার দিকে না দেখার ভান করে আড়চোখে নজর রাখলাম–যদি শয়তানটা উঁকিঝুঁকি মারে।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, টেলিফোনে দিব্যি কথা চলছে। নন্দিনী কথা বলছে আর হাসছে।

একটু পরেই কথা শেষ করে ও রান্নাঘরে চলে গেল। যাওয়ার আগে আমাকে মিষ্টি করে বলে গেল, বারোটার সময় ওষুধটা খেতে ভুলো না।

রান্নাঘর থেকে পদ্মর মশলা বাটার শব্দ আসছিল। আর নন্দিনী সেখানে ঢুকেই কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বোধহয় কিছু ছাড়ল। কারণ ছ্যাক করে এমন শব্দ হল যে, মনে হল আমার কপালে ছ্যাকা লেগেছে।

বিছানায় চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। টেনশান কাটাতে ডক্টর বাসু আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কিন্তু ডক্টর বাসু তো আর আয়নার ওই লোকটার কথা জানেন না!

লোকটার কথা ভাবতে-ভাবতেই অলস চোখে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। আমার মাথার ভেতরে কোথাও একটা টেলিফোন ক্রমাগত বেজে যাচ্ছিল।

জানলার বাইরে চড়া রোদ্দুর। উলটোদিকের ফ্ল্যাটের কার্নিশে একটা মেয়ে-চড়ুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একটা কাম-জর্জর পুরুষ-চড়ুই দু-পাশে ডানা নামিয়ে মুখটা উদাসীনভাবে ওপরে তুলে মেয়ে চড়ুইটিকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একটা থিয়োরি মাথায় এল। মানে, ওই অসভ্য লোকটার ব্যাপারে। যতই ভাবতে লাগলাম, থিয়োরিটা ততই কম অবাস্তব ঠেকতে লাগল। কিন্তু না, নন্দিনীকে এখন বলব না। শুনলে ও হয়তো খিলখিল করে হেসে উঠবে। তারপর বলবে, রে তোর টেনশান এখনও কাটেনি।

নন্দিনী মনে হয় আমার কথায় খুব একটা আমল দিচ্ছে না। দীপেশ বললে ব্যাপারটা ও কিন্তু এরকম হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে পারত না। আজ সন্ধেবেলা

দীপেশ যদি আসে তা হলে সবকিছু ওকে বলব। বলা দরকার। তা না-হলে আয়নার ওই লোকটা দিন-দিন আমার মাথায় চড়ে বসবে।

ঘোর দুপুরে নন্দিনীকে বিছানায় কাছে পেয়ে আমি কয়েকঘন্টা আগে দেখা কার্নিশের চড়ুই পাখিটার মতো হয়ে গেলাম। সুখী পাশের ছোট ঘরটার মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। আর আমাদের ঘরে ঢোকার সব দরজাই বন্ধ। সুতরাং আমরা দুজনে এখন দুজনের।

আমার ভালোবাসায় বাধা দেওয়ার ছল করে নন্দিনী বলল, একটু ঘুমোও না, তা হলে টেনশানটা একটু কমবে।

আমি হাসলাম, বললাম, টেনশান কমানোর এটাই সবচেয়ে ভালো ওষুধ ট্যাবলেট বা সিরাপ নয়।

জানলাগুলোয় পরদা টানা ছিল। তাই ঘরে হালকা ছায়ার একটা আস্তরণ ছিল। কিন্তু তাতে নন্দিনীকে আগাপস্তলা দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না আমার। ওর শরীর নিয়ে পাগলামি করতে করতেই কী যে হল, হঠাৎ করে চোখ গেল আয়নার দিকে।

আবছা আঁধার এবং লেসের কাজ করা পরদা থাকা সত্ত্বেও লোভী ছায়াটাকে আমি দেখতে পেলাম। আমি ঝটকা মেরে উঠে বসতেই ছায়াটা সড়াৎ করে সরে গেল।

নন্দিনী অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী হল?

ওই লোকটা।–আয়নার দিকে দেখালাম আমি, বললাম, ওঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে।

নন্দিনী কোনও কথা না বলে চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট করে বলল, শুয়ে পড়ো। সন্ধেবেলা দীপেশ এলে ওকে বলে দেখি কী বলে–

ওর কথামতো চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। নাঃ, সন্ধেবেলা দীপেশকে ব্যাপারটা বলতেই হবে।

সন্ধেবেলা দীপেশ এল। ওর কলিংবেল বাজানোর নিজস্ব ঢং আছে। শুধু কলিংবেল কেন, সব ব্যাপারেই ওর নিজস্ব কতকগুলো ঢং আছে। মনে পড়ে, ইউনিভার্সিটির দিনগুলোয় আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে নকল করার চেষ্টা করতাম। ওকে আমার মাঝে-মাঝে হিংসে হত। এখনও যে হয় না তা নয়।

ডাইনিং স্পেসে টিভি চালিয়ে চায়ের আসর বসিয়েছিলাম আমরা তিনজনে। একথা সে কথার মাঝে নন্দিনীই ফস করে বলে বসল লোকটার কথা। আমি ভেবেছিলাম দীপেশ হো-হো করে হেসে উঠবে, কিন্তু ও হাসল না। সিরিয়াস মুখ করে লোকটার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে। কেমন দেখতে, কখন কখন উঁকি মেরে নন্দিনীকে দ্যাখে, আমাকে দেখিয়ে নন্দিনীকে কোনওরকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি তখন একটু ভরসা পেয়ে সামান্য ইতস্তত করে নতুন থিয়োরিটার কথা দীপেশকে বলে ফেললাম।

আমার কী মনে হয় জানিস? ড্রেসিং-টেবিলের ওই আয়নাটা আসলে একটা দরজা।

দরজা!অবাক হয়ে নন্দিনী বলল।

আর-একটু বুঝিয়ে বল তো। দীপেশ চেয়ারে নড়েচড়ে বসলে। হাতের সিগারেটে টান দিতে ভুলে গেল।

আমি হয়তো বিব্রত হয়ে পড়তাম, কিন্তু দীপেশের আগ্রহ আমাকে ভরসা দিল।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ, দরজা। দরজার একপাশে হচ্ছে। আমাদের জগৎ মানে, আমাদের এই ফ্ল্যাট, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, এইসব আর অন্যদিকে ওই লোকটার দুনিয়া। আয়নাটা হচ্ছে এই দুটো জগতের মাঝের দরজা। আমরা সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে পারি না, কিন্তু লোকটা হয়তো পারে–কে জানে!

আমি ভাবছিলাম, আমার কথায় দীপেশ আর নন্দিনী হয়তো হো-হো করে হেসে উঠবে। কিন্তু না, ওরা কেউ হাসল না আমার থিয়োরি শুনে। নন্দিনী একবার চিন্তিত মুখে তাকাল দীপেশের দিকে। দীপেশ গম্ভীরভাবে আমাকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জিগ্যেস করল, আর কী কী মনে হয় তোর?

এইজন্যেই দীপেশের জবাব নেই। ও আর-একজনের মনের অবস্থা সবসময় ঠিক-ঠিক বুঝতে পারে। এইজন্যেই কারও কাছের মানুষ হয়ে উঠতে ওর এতটুকু দেরি হয় না।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, আমার আরও কী মনে হয় জানিস! ওই লোকটা নির্ঘাত কোনও বদ মতলবে ঘুরঘুর করছে।

কী মতলব?

সেটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না।

তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

একসময় দীপেশ বলল, সন্দীপ, তুই লোকটাকে যেমন লক্ষ রাখছিস সেরকম লক্ষ রাখ। এটা নিয়ে এক্ষুনি থানা-পুলিশ করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে থাকাই ভালো। আমি আজ চলি, নন্দিনী, তোরা একটু সাবধানে থাকিস।

দীপেশ চলে যাওয়ার পর সুখীকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে পাঠালাম। নন্দিনীকে একা পেয়ে জাপটে ধরে দুটো চুমু খেয়ে বললাম, শুনলি তো, এখন থেকে তোকে সাবধানে থাকতে হবে।

নন্দিনী অদ্ভুত হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এখন না, রাতে। তারপর চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

আমি টিভিটা অফ করে দিয়ে চলে এলাম শোওয়ার ঘরে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়নার পরদা সরিয়ে দিয়ে ঠান্ডা কাচে হাত দিলাম। এটা আসলে দরজা! ভাবা যায়! ওই লোকটা কোথায় গেল?

আয়না লক্ষ করে কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে দিলাম। তারপর আয়নার খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, আয়না, তুই সত্যি করে বল, কাকে তুই লুকিয়ে রেখেছিস।

আয়না কোনও উত্তর দিল না।

শুধু আমার প্রতিবিম্ব আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

.

## ০৩.

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তবে আমি সেটা জানতে পেরেছি এটা নন্দিনী বা দীপেশ– কাউকে বুঝতে দিইনি।

সন্ধের পর একটা ফোন এল। আমিই ফোনটা ধরলাম। তারপর হ্যালো বলা সত্ত্বেও ও প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর নেই। তবে মনোযোগ দিয়ে কান পেতে শুনতে পেলাম ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

নন্দিনী বাথরুমে গা ধুতে ঢুকেছে। সুতরাং আরও কয়েকবার চেঁচিয়ে হ্যালো বলে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম খটাস করে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ। তাকিয়ে দেখি, ভেজা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নন্দিনী এগিয়ে আসছে।

দাও তো, আমি একবার দেখি।

নন্দিনীকে রিসিভারটা দিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জলে ভেজা নন্দিনীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলাম। ও ছোট-ছোট আদুরে শব্দের ফাঁকে ফকে ফোনে কথা বলতে লাগল। আমি আদর করতে করতে ওর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম।

হ্যালো, নন্দিনী বলছি। হ্যাঁ, বলো। এই তো, ঘরেই রয়েছে। না, ডক্টর বাসুকে ফোন করিনি। পরশুদিন একেবারে ওকে নিয়ে যাব। তুমি কী করছ এখন? আমি? আমি এই তো গা ধুয়ে বেরোলাম। ইয়ারকি কোরো না। তুমি কবে আসছ? আচ্ছা। রেখে দিই তা হলে।

ফোন রেখে দিল নন্দিনী। ওর উ, আঃ– শব্দগুলো এবার জোরে হতে লাগল। ও আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেসব আলগা আপত্তি করছিল সেগুলো যে আসলে কোনও আপত্তিই নয় তা এই তিন বছরে আমি ভালো করে জেনে গেছি।

সুতরাং ভিজে শাড়িটা ওর গা থেকে খসিয়ে দিলাম। তারপর ওকে নিয়ে গেলাম বিছানায় কাছে। ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ, আর পরদা ঢাকা আয়নার আবছাভাবেও কাউকে নজরে পড়ছে। না। তা হলে ফুলশয্যা হতে আর বাধা কী!

আদর-ভালোবাসার দমকে আয়নার দিকে তাকানোর কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু সবকিছুর শেষে ক্লান্ত দেহে যখন শুয়ে আছি, তখনই লোকটাকে দেখতে পেলাম। আয়নার বাঁ-দিকের এককোণে ওর বাঁ-চোখ আর চুলের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

আমি বিছানায় উঠে বসতেই লোকটা সরে গেল।

নন্দিনী অবাক চোখে আমাকে একবার দেখল, তারপর বলল, কী হল!

সেই লোকটা।–আমি আয়নার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলাম।

ও–।

নন্দিনী বিছানা ছেড়ে উঠে মেঝেতে পড়ে থাকা ভিজে শাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ অলসভাবে শুয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম আমার থিয়োরিটার কথা। লোকটার নিশ্চয়ই কোনও খারাপ মতলব আছে। হয়তো সুযোগ বুঝে ও ওই দরজা পেরিয়ে চলে আসবে আমাদের জগতে। ঢুকে পড়বে আমাদের ফ্ল্যাটে। তারপর সাংঘাতিক কিছু একটা কাণ্ড করে…।

আমার মাথাটা কেমন দপদপ করছিল। বোধহয় টেনশানটা বাড়ছে। নাঃ, একটু রাস্তায় বেরোই, পায়চারি করে মাথাটা হালকা করে আসি।

নন্দিনীকে বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। কাছেই একটা মাঠ আছে, সেখানে বসে একটু জিরিয়ে নেব।

ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একটা লোককে হঠাৎই দীপেশ বলে মনে হল। আমি চেঁচিয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গাড়িটা চলে যেতেই রাস্তাটা এখন অন্ধকার হয়ে গেল যে, ধন্দে পড়ে গেলাম। বোধহয় দীপেশ না, অন্য লোক। দীপেশকে কাছে। পেলে আমি খুব

ভরসা পেতাম। তাই কখনও ওকে কাছছাড়া করতে চাইতাম না। কিন্তু সেসব দিন এখন কোথায়!

খোলা মাঠে ঠান্ডা বাতাসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ফিরে চললাম বাড়ির দিকে।

ফ্ল্যাটের দরজায় এসেই ভেতর থেকে হাসি আর কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। কী ভেবে কান পাতলাম দরজায়।

ওঃ, সন্দীপের নতুন থিয়োরির জবাব নেই। কোনও পুরুষের ভারী গলা। তারপর আমার গলা নকল করে ব্যঙ্গের সুরে সে বলল, আমার কী মনে হয় জানিস? ড্রেসিং-টেবিলের ওই আয়নাটা আসলে একটা দরজা। তারপরই দরাজ গলায় অট্টহাসি।

এবার নন্দিনীর গলা শুনলাম? ওর আজগুবি ফ্যানটাসি নিয়ে ওকে থাকতে দাও। ওষুধপত্র খাচ্ছেকদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ডক্টর বাসু বলেছেন, ওকে কখনও কনট্রাডিক্ট না করতে। বলেছেন, ওর সব গল্পে সায় দিয়ে যেতে।

তাই তো দিচ্ছি। ও কোথায় গেছে এখন?

এই আশেপাশে একটু পায়চারি করতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

আমি কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরে কথাবার্তা থেমে গেল।

নন্দিনী দরজা খুলল। আমাকে দেখেই মিষ্টি করে হাসল। বলল, কী বেড়ানো হল?

আমি অল্প হেসে হু বলে জবাব দিলাম। ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দীপেশকে দেখতে পেলাম। ও সহজভাবে হাসতে চেষ্টা করল, বলল, কী রে, কেমন আছিস?

না, কিছুতেই ওদের বুঝতে দেব না যে, ওদের কথাবার্তা আমি শুনে ফেলেছি। তাই বললাম, ভালো। তারপর শোওয়ার ঘরের দিকে যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে যোগ করলাম ও ওষুধ তো খাচ্ছি– কদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ করলাম, পলকের জন্যে নন্দিনী আর দীপেশের মধ্যে চোখাচোখি হল।

আমি শোওয়ার ঘরে ঢুকে গায়ের জামাটা খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, সাংঘাতিক একটা কিছু না-হওয়া পর্যন্ত ওই লোকটার কথা ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আগের দিন আমার থিয়োরির কথা শুনে দীপেশ তো একটুও ঠাট্টা করেনি! আর নন্দিনীও তো কখনও আমার কথায় প্রতিবাদ করেনি। এ-সবই কি ওদের অভিনয়? নাকি ডক্টর বাসু ওদের যেরকম শিখিয়ে দিয়েছেন ওরা সেরকমই ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে!

একটু পরেই ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম, দীপেশ চলে গেল।

আমি চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। নন্দিনীর সঙ্গেও এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ওরা ওদের বিশ্বাস নিয়ে থাক। দীপেশ যত পারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুক আমাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাসে ওরা চিড় ধরাতে পারবে না কিছুতেই।

আমার মন বলছে, আয়নার ওই লোকটার মতলব মোটেই ভালো নয়।

.

**শেষ**

যা ভয় করছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল। লোকটাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। ওকে কিছুতেই আটকাতে পারলাম না।

রাত তখন কটা হবে? বড়জোর সাড়ে এগারোটা। আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকেই দেখি নন্দিনী কেমন অদ্ভুতভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। একটা হাত বুকের ওপরে, আর একটা হাত ছড়ানো। শাড়িটা উঠে গেছে হাঁটু পর্যন্ত। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি ছুটে গেলাম ওর কাছে। দেখি ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। দাঁত দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে একফোঁটা রক্ত, আর ওর নরম গলায় কালশিটের দাগ।

আমি ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওর পাস দেখলাম। কোনও সাড় নেই। ওর নাকের কাছে হাত রাখলাম। না, নিশ্বাস পড়ছে না। তখন ঝুঁকে পড়লাম

ওর শরীরের ওপর। বুকে কান চেপে ধরলাম। না, কোনও শব্দ নেই।

আমি ঘামতে শুরু করলাম। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। ভয়ে-ভয়ে তাকালাম আয়নার দিকে। কোথায় গেল লোকটা? নিশ্চয়ই অপকর্মটি সেরে লুকিয়ে পড়েছে।

আমি দৌড়ে গেলাম ফ্ল্যাটের দরজার কাছে। যা ভেবেছি তাই! দরজার লক, ছিটকিনি সব ঠিকঠাক রয়েছে। বাইরের কেউ ফ্ল্যাটে ঢোকেনি। সুতরাং আর কাউকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি যখন বাথরুমে ঢুকেছি তখনই সুযোগ বুঝে ওই লোকটা বেরিয়ে এসেছে আয়নার ভেতর থেকে। ঘুমিয়ে থাকা নন্দিনীকে নিয়ে নিজের সাধ মিটিয়েছে। তারপর ওকে খুন করে আয়না দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আমি যে এখন কী করি! দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কাউকে ডাকাডাকি করতে যাব সে উপায় নেই। কারণ সেই ফাঁকে লোকটা হয়তো টুক করে বেরিয়ে আসবে আয়না থেকে, তারপর কায়দা করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সোজা হাওয়া হয়ে যাবে। তখন তাকে আর কে খুঁজে পাবে!

আমি নন্দিনীকে জাপটে ধরে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলাম।

কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তুই আমাকে চেঁচিয়ে একবার ডাকতে পারলি না!

নন্দিনী ফ্যাকাশে মুখে শুন্য চোখে চুপচাপ তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

হঠাৎই আমার দীপেশের কথা খেয়াল হল। ওকে ফোন করে ব্যাপারটা বলি। তারপর বাকি যা ব্যবস্থা করার ও করবে।

দীপেশকে ফোন করতেই ও-প্রান্ত থেকে ওর ঘুম জড়ানো গলা পেলাম।

হ্যালো।

সন্দীপ বলছি।

দীপেশ চমকে উঠল। উৎকণ্ঠার সুরে বলল, কী ব্যাপারে রে, এত রাতে?

আমি ওকে সব বললাম।

দীপেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্পষ্ট গলায় নন্দিনীর নামটা দু-বার বিড়বিড় করল। তারপর বলল, তুই এ কী করলি, সন্দীপ?

আমি? দীপেশ বোধহয় আমার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। তাই ওকে বুঝিয়ে বললাম, আমি কিছু করিনি। আয়নার ওই লোকটা গলা টিপে নন্দিনীকে খতম করেছে। আমি এখন ফ্ল্যাটে বসে পাহারা দিচ্ছি যাতে শয়তানটা পালাতে না-পারে। তুই তো আমার থিয়োরিটাকে আমল দিলি না–এবার দেখ, আমার কথা ঠিক হল কি না!

দীপেশ আমার কথা বুঝতে চাইল না। ও শুধু বলেই যেতে লাগল, ছি, ছি সন্দীপ, তুই এটা কী কাজ করলি! তুই কেন এসব করলি? নন্দিনীকে তুই...।

দীপেশের গলা বুজে এল। আমি শুধু ওর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

অনেকক্ষণ পর দীপেশ বলল, তুই ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাস না যেন। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই লোকজন নিয়ে যাচ্ছি।

না, না, আমি এখানেই আছি–নন্দিনীকে ফেলে আর কোথায় যাব।

ফোন রেখে দিলাম।

তারপর শুধু অপেক্ষা। আয়নার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা আর পাহারা। ওই শয়তান অসভ্য লোকটাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়িতে যেন বেশ কয়েকজোড়া ভারী বুটের শব্দ পেলাম। তারপরই কলিংবেল বেজে উঠল। আর একইসঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজায় অধৈর্যভাবে দুমদুম করে ধাক্কা মারল কেউ।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপেশ লোকজন নিয়ে এসে গেছে। আমার দায়িত্ব শেষ। সব দায়িত্ব শেষ।

ঘুমে দু-চোখ জড়িয়ে আসছে আমার।

# আমার স্ত্রীর আততায়ী

**আমার স্ত্রীর আততায়ী**

ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা দেখেই বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল।

কোনও-কোনওদিন অফিস থেকে ফিরে দরজা যে সামান্য খোলা পাই না তা নয়। কিন্তু আজ এমনভাবে এমন ভঙ্গিতে দরজার পাল্লাদুটো খোলা রয়েছে যে, দেখামাত্রই একটা অশুভ ঘণ্টা বুকের ভেতরে ঢং-ঢং করে বাজতে শুরু করেছে। ঘুমন্ত মানুষ ও মৃতদেহের মধ্যে ঠিক এইরকম তফাতই বুঝি থাকে। অজান্তেই বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে।

চকিতে নজর চলে গেল হাতঘড়ির দিকে। সাড়ে সাতটা সবে পেরিয়েছে। রোজ এরকম সময়েই অফিস থেকে ফিরি। বন্ধ দরজায় ঠকঠক করলে কুসুম এসে দরজা খুলে দেয়। সকালে আমি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সারাটা দিন বলতে গেলে ও একাই থাকে। শুধু কাজলের মা এসে সকাল-বিকেল দু-বেলার ঠিকে কাজটুকু সেরে দিয়ে যায়। কুসুমকে সবসময় বলি দরজা বন্ধ করে সাবধানে থাকতে। দরজায় কেউ নক করলে হুট করে দরজা না-খুলতে। ওর সুবিধের জন্য দরজায় একটা ম্যাজিক আই বসিয়ে দিয়েছি। যাতে দরজায় দাঁড়ানো মানুষটিকে ভেতর থেকেই ও দেখতে পায়। বুঝতে পারে সে চেনা কি অচেনা।

ফ্ল্যাটের দরজায় আলোটা জ্বলছিল। পঁচিশ পাওয়ারের বাল্ব। এ-বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলোর বেশিরভাগেরই দরজায় কোনও আলো নেই। বাল্ব লাগানোর দরকার মনে করেনি ভাড়াটেরা। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ খরচ বাঁচিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী কুসুম একা থাকে। রাতে দরজায় কেউ নক করলে ম্যাজিক আই

দিয়ে নজর করে আগন্তুককে ওর দেখা দরকার। তাই আমি বিদ্যুৎ-খরচের কথা ভাবিনি।

খোলা দরজা পেরিয়ে সরু একচিলতে করিডর। ডানদিকে রান্নাঘর আর বাথরুম। দুটোই অন্ধকার। বাঁদিকে বসবার ঘর। সেখানে আলো রয়েছে। সামনে শোওয়ার ঘর। সেখানেও আলো জ্বলছে।

কুসুমের নাম ধরে মাঝারি গলায় বারদুয়েক ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই। বুকের ধুকধুকুনি বাড়তে লাগল।

জুতোজোড়া করিডরে একপাশে চটপট খুলে রেখে বসবার ঘরে ঢুকলাম। আবার কুসুমের নাম ধরে ডাকলাম।

বসবার ঘর খালি। একজোড়া সোফা, টেবিল, বুককেস, ফুলদানিসবই জায়গা মতো পরিপাটি করে সাজানো। ঘরে কেউ নেই। এসেছিল বলেও মনে হয় না। কারণ সোফার গদিতে কোনও গভীর ছাপ নজরে পড়ল না।

উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় প্রথমে খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন একধরনের থমথমে নীরবতার মধ্যে একজন পুরুষের গলা কানে এল। ভেতরে শোওয়ার ঘরে কেউ যেন কথা বলছে। কিন্তু সদর দরজা হাট করে রেখে শোওয়ার ঘরে বসে কুসুম কারও সঙ্গে কথা বলবে কি? বসবার ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলাম। প্রায় ছুটে শোওয়ার ঘরে গেলাম। পুরুষের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেই একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম।

যে-লোকটির কথা বসবার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম এখন তাকে দেখতে পেলাম। টিভি-র চৌকো ফ্রেমের মধ্যে সে অভিব্যক্তিহীন মুখে খবর পড়ছে। ঘরে কেউ নেই। গোটা ঘর লন্ডভন্ড। যেন একডজন কালবৈশাখী জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে হাডুডু খেলেছে।

প্রথমেই চোখে পড়ে বিছানা। কুসুম খুব গোছানো স্বভাবের মেয়ে। ঘর গোছানো ওর শখ। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, বিছানার যে-হাল চোখে পড়ছে তা আর বলার নয়। বেডকভারটা কেউ খামচে টেনে এনেছে খাটের কিনারায়। কিছুটা অংশ শাড়ির আঁচলের মতো ঝুলছে। বম্বে ডাইং এর সুন্দর চাদরটা ছিঁড়ে ফালাফালা।

একটা বালিশ মেঝেতে। অন্য আর-একটা বিছানার মাঝখানে। ফেটে তুলো বেরিয়ে এসেছে। অন্য বালিশগুলো এলোমেলো।

টিভি-তে পড়া খবরের একটা শব্দও আমার কানে ঢুকছিল না। বুকের ভেতরে বারবার বাজ পড়ছিল। চেষ্টা করে চোখের নজর পরিষ্কার রাখতে হচ্ছিল।

চট করে হাত বাড়িয়ে টিভি অফ করে দিলাম। নিস্তব্ধতার প্যারাশুট নিঃশব্দে ঘরে নেমে এল। আমি কুসুমের নাম ধরে নরম গলায় বারকয়েক ডাকলাম। দেখছি ঘর খালি, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমি যদি তেমন করে ডাকতে পারি তা হলে কুসুম নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনও উপায়ে কোথাও-না-কোথাও থেকে আমার সামনে এসে হাজির হবে।

অগোছালো ঘরের ছোট-বড় টুকিটাকি চিহ্নগুলো একে-একে নজরে পড়ছিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়না ভেঙে চৌচির। মাকড়সার জালের মতো ফাটল একটা বিন্দু থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আয়নার পরিসীমার দিকে। ড্রেসিং-টেবিলে সাজিয়ে রাখা চিরুনি, পাউডার, লিপস্টিক, সিঁদুর–সবই এখন ছত্রখান। কুসুম সাজতে ভালোবাসত, সাজাতে ভালোবাসত। এখন কষ্ট করেও সেটা বোঝবার উপায় নেই।

মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে একটা পেতলের ফুলদানি, জল, তেলানো রজনীগন্ধার স্টিক, কাচের চুড়ির টুকরো, ভাঙা শাঁখা, আর ছোট মাপের কয়েকটা কালচে ছোপ। রক্ত কি না জানি না। পরীক্ষা করে দেখতে ভয় করল।

আমার কান্না পাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে গেছে এই ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরে। ভাঙা গলায় কুসুমের নাম ধরে আবার ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই।

এখন কী করব? চেঁচিয়ে তোক জড়ো করব, না পুলিশে খবর দেব? সন্দেহ নেই, চোর, লুঠেরা অথবা ডাকাতের দল হানা দিয়েছিল ফ্ল্যাটে। কিন্তু তারপর তারা কী করেছে? কুসুমকে কিডন্যাপ করেছে, না কি...?

ভয়ংকর কতকগুলো সম্ভাবনা মাথায় রঙিন বাবের মতো দপদপ করে উঠল। মাথায় হাত চেপে ছন্নছাড়া মেঝেতে বসে পড়লাম। শরীরের ভেতর থেকে তৈরি হয়ে নির্লজ্জভাবে বেরিয়ে আসা থরথর কাঁপুনিকে চেষ্টা করেও বশে আনতে

পারলাম না। আর ঠিক তখনই একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ আমার কানে এল। আমাকে দারুণভাবে চমকে দিল।

বেডকভারটা খাটের কিনারায় ঝুলে থাকায় খাটের তলাটা একরকম আড়ালই হয়ে গিয়েছিল। মনে হল যেন গোঙানির শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেলাম। একটানে বেডকভারটাকে ফেলে দিলাম মেঝেতে। খাটের তলায় চোখ গেল। কুসুম–অথবা কুসুমের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম।

খাটের তলায় আধো অন্ধকার, তবে দেখতে কোনও অসুবিধে হল না। বিচিত্র ভঙ্গিতে দলা পাকিয়ে কুসুম পড়ে রয়েছে। জায়গার অভাবে একটা ট্রাঙ্ক আর একজোড়া সুটকেস খাটের নীচে থাকত। সেগুলো এখন ছিটকে গেছে দেওয়ালের গায়ে কোনের দিকে। সেই একটা সুটকেস অদ্ভুতভাবে আঁকড়ে ধরে কুসুম কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। গোঙাচ্ছে।

কুসুম। কুসুম! অনেক কিছু মিশে ছিল এই ডাকের মধ্যে ও উবেগ, ভয়, স্বস্তি, আনন্দ, আরও কত কী!

ঝুঁকে পড়ে খাটের নীচে ঢুকে গেলাম খানিকটা। হাত বাড়িয়ে কুসুমকে ধরলাম। ছোঁওয়ামাত্রই ও যেন আঁতকে উঠল। ছিটকে যেতে চাইল আমার কাছ থেকে। একটা অদ্ভুত চাপা-আর্তনাদ করে উঠল।

আমি অন্ধকারের মধ্যেই ওর কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম। বললাম, কুসুম, আমি রণবীর রুণু।

তারপর ওকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম খাটের তলা থেকে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলাম ছত্রখান বিছানার। দেখলাম, সেখানে ও চমৎকার মানিয়ে গেছে। কারণ, ওর শরীরটাও ছত্রখান।

খোঁপা খুলে চুল এলোমেলো। সিঁদুর ঘষে গিয়ে ফরসা কপাল লালচে। ডান-চোখের নীচটা বিশ্রীভাবে ফুলে রয়েছে, কালসিটে পড়ে গেছে। বাঁ-গালে দুটো ক্ষতের দাগ, চামড়া কেটে মাংস দেখা যাচ্ছে। ওপরের ঠোঁট জখম হয়ে কষ বেয়ে রক্তের দাগ নেমেছে। একইরকম রক্তের দাগ দেখলাম হাতে, বাহুতে, কোমরে। শাড়ি ছিঁড়ে জট পাকিয়ে কোমরের কাছে জড়ানো। ব্লাউজ গলার কাছে টান

মেরে ছেঁড়া। ধবধবে গলায়, বুকে, নখের আঁচড়ের কয়েকটা সমান্তরাল দাগ চোখে পড়ল। অন্তর্বাস জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ছিঁড়েছে ব্লাউজের হাতা, কোমরের কষি।

সব মিলিয়ে সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

কুসুম কোনওরকমে চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর আমার কোলে মুখ গুঁজে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। আমি আলতো করে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল।

.

কুসুম, কী হয়েছিল?

যতটা সম্ভব শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা করে কুসুমকে কিছুটা সুস্থ করে তুলেছি। এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দিতে যাব। কিন্তু তার আগে, সবকিছু জানাজানি হওয়ার আগে, পরিস্থিতির ওজনটুকু আঁচ করা দরকার।

কুসুমের সামনে যতই সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তুলি না কেন ভেতরে-ভেতরে একটা ভয়ংকর রাগ দাপাদাপি করছিল। যে করেই হোক, আমার বউয়ের ওপরে এই অত্যাচারের শোধ তুলতেই হবে। যেমন করেই হোক বদলা আমার চাই-ই চাই। অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে শুয়ে থাকা কুসুমকে আবার নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছিল, কুসুম?

দুর্বল অস্পষ্ট গলায় থেমে-থেমে বহুক্ষণ ধরে ও যা বলল তার সারমর্ম হল এই : হাতের কাজ-টাজ সেরে রোজকারমতো ছটা বত্রিশে ও টিভি দেখতে বসে। কাজলের মা তার একটু আগেই চলে গেছে। কতক্ষণ টিভি দেখছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ শোনে দরজায় কেউ নক্ করছে। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, নক্ করার ভঙ্গিটা ঠিক আমার মতো। ভেবেছিল, আমি হয়তো অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। তবুও অভ্যাসবসে দরজার কাছে গিয়ে ও ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখে। যে নক্ করেছিল সে একপাশে দাঁড়িয়েছিল, কারণ, শুধু তার কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। আর আশ্চর্য, যে-নীল রঙের জামাটা কুসুমের চোখে পড়ে আমার ঠিক সেইরকম একটা জামা আছে–যদিও আজ অন্য রঙের

জামা পরে আমি অফিসে গেছি। কিন্তু সেইমুহূর্তে কুসুমের সেটা খেয়াল হয়নি। মোটামুটিভাবে আমি ফিরে এসেছি ভেবেই ও দরজা খুলে দেয়।

লোকটি ঢুকেই বলে যে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, একটু অপেক্ষা করবে। অস্বস্তি হলেও কুসুম তাকে ঠিক মুখের ওপর না বলতে পারেনি। বসবার ঘরে গিয়ে বসতে বলেছে। অপরিচিত একজন পুরুষ ফ্ল্যাটে ঢোকার ফলে ইচ্ছে করে ফ্ল্যাটের দরজাটা ও আর বন্ধ করেনি। হাট করে খুলে রেখে দিয়েছে। তারপর চায়ের আয়োজন করবে বলে শোওয়ার ঘরে আসে কাচের আলমারি খুলে সুদৃশ্য কাপ-প্লেট বের করার জন্যে ও অতিথি-অভ্যাগত এলে তবেই এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শোওয়ার ঘরে ঢুকে আলমারির কাছে পৌঁছোনোর আগেই দরজায় একটা শব্দ শুনতে পায় কুসুম। পেছন ফিরে দেখে সেই লোকটা শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তখন তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। কুসুম কিছু একটা বলতে যাবে, তার আগেই লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। দাঁত বের করে হেসে বলে, শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন কেন, মাইরি! কুসুম চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু সেই চিৎকার আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা বোধহয় শুনতে পায়নি। প্রথমত, ভয়ে কুসুমের গলা প্রায় বুজে গিয়েছিল, তাই চিৎকারের আওয়াজটা হয়তো ঠিকমতো বেরোয়নি। দ্বিতীয়ত, ঘরে টিভি চলছিল। আর তৃতীয়ত, সান্ধ্য আইন অনুযায়ী এ-বাড়ির প্রতিটি ফ্ল্যাটেই জোরালো ভলিয়ুমে টিভি চলে।

এরপর যা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কুসুমের পক্ষে অস্বস্তিকর। লোকটা হঠাৎই খ্যাপা জানোয়ার হয়ে ওকে আক্রমণ করে। কুসুম নিজেকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণপণ লড়াই করেছে। শেষে মরিয়া হয়ে ও ঢুকে পড়ে খাটের তলায়। ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে। হঠাৎই সিঁড়ির কাছে কয়েকজনের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ শোনা যায়। লোকটা তাতেই কেমন যেন ভয় পেয়ে কুসুমের মুখে একটা ঘুষি মেরে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ওকে ছেড়ে দেয়। ওর তখন মাথা ঝিমঝিম করছে, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে রয়েছে, শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করার মতো সাড়টুকুও নেই। দেখল, লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারির আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লোকটা চলে যেতেই কুসুম বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। কারণ, আমার ডাকে চেতনা ফিরে পেয়ে ও আমাকেই হঠাৎ আততায়ী বলে মনে করেছিল।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কুসুম বারবার কেঁদে ফেলছিল। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলাম। আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ জ্বালা করছিল। অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কা আমার টুটি টিপে ধরছিল বারবার।

শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্নই করলাম ওকে।

লোকটাকে কেমন দেখতে? আবার দেখলে চিনতে পারবে?

কুসুম ইতস্তত করে বলল, গায়ের রং কালো। মুখ ভালো করে দেখিনি–আর আমার মুখের ওপরে যখন মুখ নিয়ে এসেছিল তখন কিছু দেখে থাকলেও মনে নেই। তবে মনে হয়, লোকটার ঠোঁটের নীচে ডানদিকে একটা বড় আঁচিল ছিল। আর ভুরু দুটো খুব ঘন, জংলা–তার নীচ দিয়েই লোকটার চকচকে চোখজোড়া তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আর…।

আমার মনে পড়ল, কুসুম বলেছে লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসেছিল। তাই জিগ্যেস করলাম, লোকটার দাঁতগুলো মনে আছে?

কুসুম ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার চোখে। তারপর বলল, সত্যিই তো একদম খেয়াল করিনি–লোকটার ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত অর্ধেকটা ভাঙা ছিল। এছাড়া আর কিছু মনে নেই।

আর কিছু? আমি মনে-মনে হাসছিলাম। আততায়ীর যে খুঁটিনাটি বর্ণনা কুসুম দিয়েছে তাতে একে খুঁজে বের করতে পুলিশের সাতদিনও লাগবে না–যদি অবশ্য আমি পুলিশে খবর দিই। চেষ্টা করলে আমি নিজেও হয়তো ওই ইতর ছোটলোকটাকে খুঁজে বের করতে পারব। লোকটাকে খুঁজে পাবই, এ-বিশ্বাস মনের মধ্যে নিশ্চিত হলেও একটা ব্যথা বুকের ভেতরে আঁচড় বসাচ্ছিল বারবার : কলকাতা শহরে এত বাড়ি থাকতে ওই ভয়ংকর ক্ষুধার্ত আততায়ী আমার ফ্ল্যাটটাই বেছে নিল। বুঝতে পারছি, আমার নামটা জানতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। কারণ, সেটা প্লাস্টিকের হরফে ফ্ল্যাটের দরজার গায়েই লেখা আছে।

কুসুমকে বললাম, আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

আমাদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে ডক্টর দাস থাকেন। অসুখ-বিসুখ হলে উনিই আমাদের দেখেন। ওঁর নানারকম বিলিতি ডিগ্রি আছে। ফ্ল্যাট ছেড়ে

বেরোনোর সময় কুসুমকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বললাম, আমার গলা না-পেলে একদম দরজা খুলবে না। শুধু আজ নয়, কোনওদিন এরকম হুট করে আর দরজা খুলবে না।

কুসুম সেই তখন থেকেই মুখ নামিয়ে রয়েছে। আমার দিকে যেন সহজভাবে তাকাতে পারছে । আমার কথায় কুসুম ছোট্ট করে বলল, হু। তারপর দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

আমি সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম।

.

ডক্টর দাস অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে কুসুমকে পরীক্ষা করলেন।

আমি শোওয়ার ঘরের দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ কাটছিলাম। ঘরটা আমিই ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করেছি। আতঙ্কের দুনিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাইরেটুকু অন্তত। শুধু ভাঙা আয়নাটা স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরটা দেখে, কুসুমকে দেখে, বিশ্বাসই হতে চাইছে না কোনও আততায়ী মাত্র ঘণ্টাদেড়েক আগে ঢুকে পড়েছিল এই ঘরে।

সিঁড়িতে কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ শুনে লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে যারা উঠছিল বা নামছিল, তারা নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাটবাড়িরই বাসিন্দা বা তাদের আত্মীয়স্বজন। আমার ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা দেখেও তারা কৌতূহলী হয়নি, ফ্ল্যাটের ভেতরে উঁকি মারেনি। নিজেদের মনে ঠাট্টা-মশকরা করতে করতে চলে গেছে। যদি কেউ একবার ফ্ল্যাটে ঢুকত তা হলে ওই লোকটা নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। আমি এ-বাড়িতে কিছুদিন হল এসেছি। এখনও ভালো করে সবার সঙ্গে আলাপ সালাপ হয়নি। সেইজন্যেই কি সিঁড়ির মানুষগুলো আমার ফ্ল্যাটের খোলা দরজাকে উপেক্ষা করেছে? নাকি এটাই ওদের অভ্যাস?

ডক্টর দাস কুসুমকে ইনজেকশান দিলেন। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে উঠে এলেন। আমাকে ডেকে বললেন, একটু বাইরে আসুনকথা আছে।

করিডরে বেরিয়ে আমার আগে লক্ষ করলাম, কুসুম কৌতূহলী নজরে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

বসবার ঘরের কাছে এসে ডক্টর দাস আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন : ওষুধগুলো আনিয়ে নিন। প্রথম ট্যাবলেটটা রাত দশটা নাগাদ খাইয়ে দেবেন, বাকিগুলো কাল থেকে শুরু হবে। সব লেখা আছে। এখন ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছি–রেস্ট দরকার। যা ধকল গেছে!

আমি যন্ত্রের মতো সব কথা শুনে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শেষ কথাটায় একটা ধাক্কা খেলাম। চমকে তার দিকে তাকালাম।

ডক্টর দাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আরে না, না! ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন সান্ত্বনার ঢঙে। আপনি যা ভাবছেন সেরকম কিছু হয়নি। ভাগ্যিস লোকটা মাঝপথে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

কুসুমের কাছে শোনা সব কথাই ডক্টর দাসকে খুলে বলেছি। কিছুই লুকোইনি। আমি ওঁর মুখটা লক্ষ করছিলাম। লক্ষ করতে করতেই পকেট থেকে ভিজিটের টাকা বের করে ওঁর হাতে দিলাম। শুনতে পেলাম উনি আরও বলছেন? ইউ আর এ লাকি ডগ। নেহাত কপাল ভালো, নইলে আরও অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। যাকগে, এ-নিয়ে আর থানা-পুলিশ করে কোনও ঝামেলা করতে যাবেন না যেন। সেরকম কিছু হলে তখন না-হয় থানা-পুলিশ করতেন। প্রতিবেশি হিসেবে এটাই আমার সাজেশান।

আমি অবাক হয়ে বিলিতি ডিগ্রিওয়ালা মধ্যবয়েসি ডাক্তারবাবুকে দেখছিলাম। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক আমার স্ত্রীকে আক্রমণ করল, তাকে অপমান করল, এমনকি মারধোরও করল, সেটা আমার মুখ বুজে সইতে হবে। অবশ্য ডাক্তারি মতে আমার স্ত্রীর সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। হলে পরে থানা-পুলিশ, হইচই, আরও অনেক কিছু করা যেত।

করিডরের উলঙ্গ বালবের আলো ডাক্তার দাসের মুখে পড়েছে। উনি এমনিতে ফরসা, তবে এখন কেন যেন ভীষণ কালো দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো কেমন চকচক করছে। ভুরু দুটো কী ঘন, জংলা! ইশ, ঠোঁটের নীচে ডানদিকে যদি একটা বড় আঁচিল থাকত! জানি না, ওর এই চেহারাটা কুসুমের নজরে পড়েছে কি না। পড়লে হয়তো ও আঁতকে উঠত।

ডক্টর দাস ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময়েও বারবার বলতে লাগলেন, ওঃ আপনার স্ত্রী খুব বাঁচান বেঁচে গেছে মশাই, খুব বাঁচান বেঁচে গেছে। কলকাতা শহর

বলে কথা, এখানে একটু সাবধানে না-থাকলে চলে।

উনি চৌকাঠ পেরোনোমাত্রই আমি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কী খেয়াল হতে ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখলাম। দেখলাম, নীল জামা পরা একটা শরীরের অংশ দরজায় ওপিঠে সরে গেল।

.

পরদিন সকালেই অন্যান্য ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল।

মনে হল, গতকাল ওরকম একটা ঘটনা না-ঘটলে ওদের সঙ্গে কবে ভালো করে আলাপ হত কে জানে! হয়তো কোনওদিনই হত না। কী করে ওরা খবর পেল জানি না। আমি ওদের কিছু বলিনি। কিন্তু গতকাল রাতে কি ওরা খবর পায়নি? কাল তো কেউ আসেনি। আজ, এই রোদ-ঝকঝকে সকালে, ওরা এসে হাজির। ওদের দেখলে মনে হয় পৃথিবীর কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই–কোনওদিন ছিল না।

আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। কুসুমের এখন বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া, এমন একটা সময়ে অপরিচিতি মানুষগুলোর মুখোমুখি হওয়াটা ওর কাছেও রীতিমতো অস্বস্তিকর। কিন্তু কাউকে সে কথা বলতে পারছিলাম না, আর ওরাও নিজে থেকে বুঝতে পারছিল বলে মনে হল না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে গতকালের ঘটনা ওদের বলতে একরকম বাধ্য হয়েছি।

নানাজনে নানা কথা বলছিল।

আচ্ছা, আমাদের পাড়ার পুঁটেদা, চ্যাংলাদা, ওদের দলের কারও কি সামনের দাঁত ভাঙা আছে?

রণবীরবাবু, আপনি খবরের কাগজের আপিসে যান। ওদের সব খুলে বলুন। এইসব রেপ কেসগুলো আজকাল বড্ড বেড়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া হওয়া দরকার।

আমার মনে হয়, ঘটনাটা পুলিশে জানানো উচিত। লোকটা যখন একবার এই বাড়িটা নোট করে গেছে তখন আবার এখানে ঘুরে আসতে পারে। আপনার

ফ্ল্যাটে হয়তো আর কিছু করবে না, তবে আমাদের কারও ফ্ল্যাটে হানা দিতে পারে। আপনারা কী বলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সিকিওরিটি বলে একটা ব্যাপার আছে তো!

আমার স্ত্রীও তো মশাই সারাটা দিন একা বাড়িতে থাকে!

চ্যাটার্জিদা, আপনার ওসব ভয় নেই! বুড়োবুড়িদের ফ্ল্যাটে ওসব লোক ঢুকবে না।

তুমি তো ভালো কথাই বললে, ভায়া! আমাদের বুড়োবুড়ির না-হয় ভয় নেই, কিন্তু ছুঁড়ি ঝি-টা রয়েছে না!

ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী যেন নাম? লতা, তাই না। হ্যাঁ, ওর চেহারাটা বেশ ডাগর-ডোগর…।

আপনার স্ত্রীর কমপ্লিট রেস্ট দরকার। একটা মেন্টাল চাপও তো গেছে। আপনি না-হয় কিছুদিন অফিস ছুটি নিয়ে নিন।

যদি বলেন তো আমি লোক্যাল থানায় ইনফর্ম করতে পারি। থানার ও.সি. আমার চেনা।

আপনার স্ত্রীর ক্ষমতা আছে! ওইরকম একটা অবস্থার মধ্যেই লোকটার চেহারা মনে রেখেছে। দেখবেন, পুলিশ দু-দিনেই লোকটাকে পাকড়াও করে ফেলবে।

শুনেছি এসব লোকদের আবার নাকি পুলিশে হাত থাকে। কে জানে, ধরার দু-দিন পরে আবার ছেড়ে দেবে কি না। তখন লোকটার আক্রোশ আরও বাড়বে।

আচ্ছা, আপনি আমাদের সত্যদাকে একটু ধরুন না।

সত্যদা?

আরে আমাদের লোকাল এম-এল-এ। সত্যরঞ্জন চাকলাদার। শুনেছি লোকাল লোকদের খুব হেল্প-টেল্প করেন। ওঁর হেল্প পেলে লোকটার সাজা হবেই হবে। গ্যারান্টি।

চলি, আমার আবার অফিস যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

ভাবছি, বউকে আর ছেলেকে কদিনের জন্যে বাপের বাড়িতে রেখে আসব।

আপনিও সেখানে চলে যান না, মিস্টার গুপ্ত, তা হলে একটা ফ্ল্যাট খালি হয়। আমার শালা অনেকদিন ধরে বলছিল।

কেন, আমার কি শালা নেই নাকি?

চলি, কাল আবার খবর নেব।

খবরের কাগজের ব্যাপারটা ভুলবেন না যেন।

চলি–।

ওরা সব চলে গেল। আমি বসবার সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। জানি, কর্তারা অফিস-কাছারিতে বেরিয়ে গেলেই এরপর একে-একে এ-বাড়ির নানা ফ্ল্যাটের মেয়েরা-বউরা আসবে!

কিন্তু এখন কী করব? কী করা উচিত! নাঃ, থানায় খবর একটা দেওয়া দরকার। আমি খবর না-দিলেও অন্য কেউ খবরটা দিতে পারে। সকলের সিকিওরিটির ব্যাপার রয়েছে।

সুতরাং কাজলের মাকে সতর্ক থাকতে বলে, কুসুমকে ওষুধ খাইয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোলাম। ডক্টর দাস আজ রাতে একবার দেখতে আসবেন বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তার বোধহয় আর দরকার হবে না। ঠিক করলাম থানায় যাওয়ার পথে ওঁর বাড়িতে জানিয়ে দেব।

রাস্তায় পা দিয়ে প্রতিটি পথচারীকে আমি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। খুঁজতে লাগলাম নীল জামা, জংলা ভুরু, আঁচিল, আর ভাঙা দাঁত। এই শহরেই কোথাও-না-কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে শয়তানটা।

আমার শরীর আবার জ্বালা করছিল।

.

রেপ কেস?

ডায়েরির খাতার ওপরে পেনসিল থামিয়ে অফিসারটি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারলাম না।

ওসির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনিই একজনকে ডেকে আমাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ঘরটা বেশ বড়। তিনটে টেবিল, গোটাচারেক চেয়ার আর কয়েকটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। মাথার ওপরে, পরস্পরের কাছ থেকে কিছুটা দুরে দুটো জম্পেশ ফ্যান কাচকাচ করে ঘুরছে।

ফাঁকা ঘরে মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর একজন উর্দি পরা অফিসার খাতা-পেনসিল হাতে নিয়ে ঢুকেছেন। হয়তো এস-আই টেস-আই হবেন। আমার মুখোমুখি বসে খাতা খুলে প্রথমেই আমার নাম-ঠিকানা সব টুকে নিলেন। তারপর বললেন, কী কমপ্লেন বলুন।

আমি মোটামুটি সব খুলে বলতেই তিনি বললেন, রেপ কেস?

এটা প্রশ্ন না মন্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অফিসার পেনসিল দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। শব্দ করে ডায়েরির খাতাটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাই তুলে বললেন, লোকটা ধরা পড়লে আপনার ওয়াইফকেই ঝাটে পড়তে হবে। উকিলদের জানেন তো, ওদের মুখে কিছু আটকায় না। কাঠগড়ায় আপনার বউকে দাঁড় করিয়ে উকিলরা অনেক খারাপ-খারাপ প্রশ্ন করবে। যেমন, লোকটা ঠিক কী কী করেছে। শরীরের ঠিক কোথায়-কোথায় হাত লেগেছে। তারপর, ধরুন ইয়ে করার সময় আপনার বউ ঠিক কী কীভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সরকারি ডাক্তাররা আপনার স্ত্রী-কে নানা পরীক্ষা করে দেখবে, জোর করে–মানে ইয়ের সময় জবরদস্তির চিহ্ন আছে কি না…।

হঠাৎই টেবিলে দু-হাতের ভর দিয়ে অফিসার সামনে ঝুঁকে এলেন। আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, পারবেন এসব সহ্য করতে?

আমি মিনমিন করে বললাম যে, উনি যা ভাবছেন ঠিক তা নয়। মানে, এটা ঠিক রেপ কেস নয়। বরং অ্যাসাল্ট বা মলেস্টেশান বলা যেতে পারে। আমি সেইরকমই একটা অভিযোগ দায়ের করতে চাই। সোশ্যাল সিকিওরিটির একটা ব্যাপার রয়েছে…।

অফিসার অবাক চোখে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, আপনি তো আজব লোক মশাই। রেপ-টেপের ব্যাপার কিছু হয়নি আর ফালতু-ফালতু ডায়েরি লিখিয়ে গায়ে কাদা ছেটাতে চাইছেন! আপনি জানেন…।

অফিসার আরও কীসব বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। আমি একনজরে অফিসার ভদ্রলোককে দেখছিলাম। ওঁর বাঁ-গালের ওপরে একটা আঁচিল রয়েছে। গায়ের রং কালো। মোটা জংলা গোঁফ। সামনের কোনও দাঁত ভাঙা নেই।

খুব ইচ্ছে করছিল ওঁর গালের আঁচিলটা এক খাবলায় তুলে নিয়ে ঠোঁটের নীচে ডানদিকে বসিয়ে দিই। গোঁফজোড়া উপড়ে নিয়ে সমান দু-ভাগে কেটে বসিয়ে দিই চকচকে দু-চোখের ওপরে সূক্ষ্ম ভুরুর জায়গায়। আর ভারী নোড়ার গুঁতোয় ভেঙে দিই ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত। তারপর শুধু একটা নীল জামা পরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা।

হঠাৎ দেখি আমার চোখের সামনেই আঁচিলটা গালের ওপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেল ঠোঁটের নীচে ডানদিকে। গোঁফজোড়া জায়গা ছেড়ে উঠে এল, দুভাগে ভাগ হয়ে বসে গেল ভুরুর ওপরে। একটা অদৃশ্য নোড়া যেন দাঁতের পাটিতে পুঁতো মারল। একটা নীল জামা…।

আমি বললাম, ডায়েরিটা ক্যানসেল করে দিন।

এরপর থানা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

এখন কী করা উচিত? কুসুমের নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা আমাকে যে করতেই হবে। আর ওই অত্যাচারের শোধ নিতে চেয়েছিলাম, তাই-বা নেব কেমন করে? শরীরের ভেতরে রক্ত যেন ফুটছে।

অজান্তেই আমার পা-জোড়া এগিয়ে যাচ্ছিল সত্যরঞ্জন চাকলাদারের পার্টি-অফিসের দিকে, কিন্তু আমি জোর করে তাদের থামালাম। রাস্তায় গনগনে

রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে সত্যরঞ্জন চাকলাদারের মুখটা ভেসে উঠছিল । গায়ের রং কালো, চকচকে চোখ, জংলা ভুরু, ঠোঁটের নীচে আঁচিল, ভাঙা দাঁত। আমি জানি, সত্যি-সত্যি যদি ভদ্রলোককে ওরকম দেখতে নাও হয়, আমার স্ত্রীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শুনলেই তার মুখের চেহারার রদবদল হবে। শেষ পর্যন্ত ওই একইরকম হয়ে যাবে। এমনকী প্রতিবেশীদের পরামর্শমতো খবরের কাগজের অফিসে গেলেও সেখানকার সাংবাদিক বা সম্পাদকের চেহারাও হয়তো পালটে যাবে একইভাবে। সুতরাং বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

ফেরার পথে আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, রাস্তায় প্রত্যেকটি মানুষকে একইরকম দেখতে ও কালো রং, চকচকে চোখ, জংলা ভুরু...।

জানি, বাড়ি ফিরে গিয়ে অন্যান্য ফ্ল্যাটের মানুষগুলোকে যদি দেখতে পাই তা হলে তাদেরও হয়তো একইরকম চেহারা দেখব। সত্যিই কি গোটা শহরের প্রত্যেকটি মানুষ একইরকম দেখতে হয়ে গেছে? এবং গতকাল রাতের ঘটনার জন্য কি আমি, আমরা, প্রত্যেকটি মানুষ, সমানভাবে দায়ী? আমরা প্রত্যেকেই কি সমানভাবে কুসুমের আততায়ী? তাই যদি হয়, তা হলে এখন থেকে শোওয়ার ঘরের ওই ভাঙাচোরা আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার বেশ ভয় করবে।

# খুন করা সহজ

**খুন করা সহজ**

গোল্ডফিশটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি।

কাচের জারের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মাছটার ছন্দময় অলস সাঁতার দেখছিলাম, তারপর জলের মধ্যে ঢেলে দিলাম ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড। প্রথমে কয়েক ফোঁটা–তাতে মাছটার সাঁতারের গতি অনেক দ্রুত হল–আর তারপর একেবারে গোটা বোতলটা উপুড় করে দিলাম। আমার হাত দস্তানায় ঢাকা। যদি অ্যাসিড লেগে যায়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম, কীভাবে অ্যাসিড ধীরে-ধীরে মিশে যাচ্ছে জলে, উদ্গত ফেনা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে জারের কিনারা থেকে।

মাছটা চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বৃত্ত রচনা করল ওপরে-নীচে। আমার মনে পড়ে গেল মেলায় দেখা নাগরদোলার ঘূর্ণি-খাওয়া কাঠের ঘোড়ার কথা। অ্যাসিড চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতেই মাছটা যেন পাগল হয়ে উঠল। অ্যাসিড ওটাকে কুরেকুরে খেতে লাগল, ক্রমশ ঢুকে পড়ল ওটার শরীরের ভেতরে।

কাকাতুয়াটা আর কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। ওটা জারের কাছে এসে দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, মাথা কাত করে দেখত গোল্ডফিশটাকে, যেন এখুনি জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করবে।

কাকাতুয়াটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে খাওয়ার ঘরের টেবিলে রাখা ফলের রস তৈরির যন্ত্রটার দিকে তাকালাম। একদিকে ফল ঢুকিয়ে হাতল ঘোরালেই অন্যদিক দিয়ে রস বেরিয়ে আসে।

কাকাতুয়াটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি। খাঁচায় হাত ঢোকাতেই ওটা কঁকিয়ে উঠেছিল। আমি ওটাকে চেপে ধরলাম দস্তানা পরা হাতে। যদি কামড়ে দেয়! রস তৈরির যন্ত্রের মুখে ওটার মাথাটা ঢুকিয়ে যখন চেপে ধরলাম, তখনও ওটা চেঁচাচ্ছে। ধীরে-ধীরে হাতল ঘোরাতে শুরু করলাম। কুড়মুড় কুড়মুড় শব্দ হল। ওর শরীরের থকথকে লাল অবশেষ টেবিলে গড়িয়ে পড়তেই কাকাতুয়াটা চুপ করে গেল। ওটার ছোট্ট কচি হাড়গুলো মড়মড় করে ভাঙতে লাগল। আমি হাতল ঘুরিয়ে চললাম।

কাকাতুয়াটার পালক আর রক্তমাখা থকথকে ঘন অবশেষ হাতে করে চেঁছে তুলে নিলাম। একটা ঠোঙায় ওগুলো ভরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলাম।

বেড়ালটা আর কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। ওটা কেবলই খাঁচার পাশে রাখা চেয়ারে লাফিয়ে উঠত আর একটা থাবা কাকাতুয়াটার খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করত।

বেড়ালটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে জ্বলন্ত উনুনের দিকে তাকালাম।

বেড়ালটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি।

ওটাকে তুলে নিয়ে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে উনুনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার পর–একদম আলতো করে ওটাকে বসিয়ে দিলাম উনুনের গনগনে আঁচে। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ালটা লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু ভারী সাঁড়াশিটা দিয়ে ওটাকে চেপে ধরলাম গরম কয়লার সঙ্গে। পোড়া লোমের কটু গন্ধে ঘর ভরে গেল। মাঝে-মাঝে গরম কয়লাগুলো ফটফট শব্দে ফাটতে লাগল।

আরও কিছু কয়লা এনে উনুনে চাপিয়ে দিলাম, বেড়ালটার দগ্ধ হাড়-মাংসের ওপরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরে নাচতে শুরু করল।

কুকুরটা আর কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। ওটা দিনভর উঠোনে-বাড়িতে বেড়ালটাকে তাড়া করে বেড়াত, ঘেউঘেউ করত বিচিত্র সুরে। অবশেষে বেড়ালটা গাছ বেয়ে উঠে পড়ত, হয়তো লাফিয়ে পড়ত পাশের বাড়ির ছাদে বাঁচার জন্যে।

কুকুরটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রঙের টিনটার দিকে তাকালাম।

কুকুরটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হয়নি।

তবে কুকুরটা বেড়ালটার চেয়েও বেশি ধস্তাধস্তি করেছিল। কারণ, ওটার কখনও কোলে চড়া অভ্যেস ছিল না। ওটাকে কোলে তুলে এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাতে রঙের টিনটা তুলে নিতেই বড়-বড় আকুতি ভরা চোখে সে আমার দিকে তাকাল। আধ টিন ঘন নীল রং ঢেলে দিলাম কুকুরটার চোখে-মুখে। ওটা বিচিত্র শব্দ করে বমি করল, পা ছুঁড়তে লাগল বীভৎসভাবে। ওটাকে চেপে ধরে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু উপায় কী! বাকি আধ টিন রং তো ঢালতে হবে!

বমি মেশানো আঠালো নীল রং গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে, আমার গায়ে। অবশেষে ওটা মারা গেল। ওকে ছেড়ে দিতেই নীল রং মাখা ছোট্ট দেহটা শব্দ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

কুকুরটার জন্যে আমার বউ খুব দুঃখ পাবে–সেইসঙ্গে বেড়ালটার জন্যেও, মাছটার জন্যেও, কাকাতুয়াটার জন্যেও। সবাইকে ও ভালোবাসত। ওদের জন্যে আমার বউটার বড় কষ্ট হবে। আমি আত্মহত্যা করলে ও দুঃখ পেত। আমি মরে গেলে আর কাকে ও দিন-রাত অপমান করবে, যন্ত্রণা দেবে? শাসন করার, বিরক্ত করার আর তো কেউ থাকবে না।

মাছটা, কুকুরটা, কাকাতুয়াটা, বেড়ালটার মতো আমাকেও যদি আমার বউ ভালোবাসত, তা হলে কত ভালো হত! অনেক ভালো হত।

এই তো, দরজায় কে কড়া নাড়ছে। আমার বউ এসে গেছে। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিই।

আমার বউয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সামনের রাস্তায় দাঁড় করানো সিমেন্ট মেশানোর যন্ত্রটার দিকে তাকালাম।

আমার বউটাকে মেরে ফেলতে কোনও কষ্ট হবে না।

# ডাম্পির সুখ-দুঃখ

**ডাম্পির সুখ-দুঃখ**

এ বাড়িতে আমি কবে এসেছি তার সাল-তারিখ মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, ছোড়দার ছেলে অন্তুর বয়েস তখন ছিল ছমাস। এরকম মনে থাকারও একটা কারণ আছে। প্রথম দিন ছোড়দা আমাকে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল ওর মায়ের ঘরে। সে-ঘরে পিসিমাও থাকেন। মা খবরের কাগজ পড়ছিলেন চোখে চশমা দিয়ে, আর পিসিমা ঠাকুরের ছবির সামনে বসে ধূপ জ্বেলে গুনগুন করে প্রার্থনা করছিলেন।

ছোড়দা আমাকে দেখিয়ে বলল, মা, এই যে, বলেছিলাম না সন্তোষদার কাছ থেকে একটা দারুণ কুকুর নিয়ে আসব। এটাই নিলাম–ডোবারম্যান।

ছোড়দা আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। আর আমি তখন গন্ধ শুকছিলাম। ঘরের গন্ধ। ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ। মায়ের গন্ধ। পিসিমার গন্ধ। ছোড়দার গন্ধ। সবরকম গন্ধ যে আমাকে শুঁকতে হবে। আলাদা করে চিনতে হবে। মনে রাখতে হবে।

মা জিগ্যেস করেছিলেন, বয়েস কত এর?

ছ’মাস মতো হবে। আমি নাম রেখেছি ডাম্পি। দ্যাখো, নাম ধরে ডাকলে কেমন তাকাবে আমার দিকে।

ছোড়দা কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। ডাম্পি নামটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। কিন্তু ছোড়দা এত গর্ব করে মা-কে কথাটা বলেছে যে, স্রেফ ওর মান রাখতেই ডাকের তালে-তালে ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকালাম।

মা আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন, ছমাস বয়েস? আমাদের অন্তুরও তো তাই।

পরে জেনেছি, অন্তু ছোড়দার ছেলে।

ছোড়দা মায়ের কথা শুনতে পেয়েছিল। হেসে বলল, কীরকম মজার ব্যাপার হবে বলো তো! ওরা দুজনে একসঙ্গে বড় হবে!

পিসিমার পুজো-আর্চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অবাক চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ওর লেজটা কাটা কেন রে?

ছোড়দা হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, এও জানো না! খুব বাচ্চা বয়েসেই ডোবারম্যান কুকুরের লেজ কেটে দেয়। ওদের লেজ সরু, বিচ্ছিরি হয়–অনেকটা টিকটিকির মতো–তাই কেটে দেয়।

পিসিমা শুধু বলেছিলেন, আহা রে, ব্যথা লাগে না!

না, লেজ কাটার সময়কার ব্যথা আমার মনে নেই। কুকুরের এ-ধরনের স্মৃতিশক্তি খুব একটা জোরালো হয় না।

এটাই ছিল আমার প্রথম দিন।

তারপর একে-একে আলাপ হল বাড়ির সকলের সঙ্গে–বড়দা, বড়বউদি, ছোটবউদি, বাড়ির কাজের লোক প্রৌঢ় রামনাথ, ঠিকে কাজ করতে আসা দু-বউ, আর সবার শেষে দেখলাম অন্তুকে– বিছানার শুয়ে-শুয়ে হাত-পা ছুড়ছে।

প্রথম আলাপের সময় থেকেই আমি প্রত্যেকের গন্ধ আলাদা করে চিনে নিয়েছিলাম। বেশ মনে পড়ছে, নানা জনে নানা কথা বলেছিল আমাকে নিয়ে।

ছোটবউদি বলেছিল, বাদামি রঙের নিলে কেন? কালো পেলে না?

ছোড়দা গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছে, জানো, বাদামি ডোবারম্যানের প্রেস্টিজই আলাদা।

আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। ছোড়দার গায়ে গা ঘষেছি বারবার।

বড়বউদি আমার কাছে এসে জিগ্যেস করল, কী রে ডাম্পি, চোর ধরতে পারবি তো?

আমি আমার মতো করে বলেছিলাম, পারব।

বড়বউদি আমার কথা না বুঝে বলল, বাব্বাঃ, গলায় বেশ জোর আছে তো!

বড়দা জানতে চেয়েছিল, কী খেতে দেওয়া হবে আমাকে। ছোটবউদি দুবার হুস-হুঁস করেছিল আমাকে লক্ষ্য করে। তারপর ছোড়দাকে বলেছিল, ভালো করে ট্রেনিং দিয়ে এটাকে সিনেমায় যেমন দেখায়।

আর রামনাথ বেশ দূর থেকেই ভয়ে-ভয়ে জানতে চেয়েছিল, ছোড়দাদাবাবু, এই কুকুর পয়লা কোথায় কামড়ায়? হাতে, পায়ে, গলায়?

কথা শুনে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

ছোড়দা মজা করে বলেছিল, সেটা ডাম্পিকেই জিগ্যেস করো না!

তারপর থেকে দিনগুলো বেশ কাটতে লাগল।

একটু পুরোনো বাতিল সোফার আমার বিছানা তৈরি হল। সেই বিছানায় চোদ্দোটা বছর কেটে গেল কোথা দিয়ে কে জানে! এখন সেই সোফাটা আরও পুরোনো হয়েছে। গদি ছিঁড়েছে, তুলো বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা। তবুও ওটার ওপরে শুতে আমার ভালো লাগে। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সোফাটার ওপরে। তা ছাড়া রোজকার চেনা গন্ধটাও আমার কাছে ভীষণ আরামের, ভীষণ স্বস্তির।

ছোটবউদি নিয়ম করে খেতে দেয় আমাকে। সেই খাবার যে সবসময় ভালো লাগে তা নয়। তাই মাঝে-মাঝেই আমি খাবার ফেলে ঘুরে বেড়াই। আর অন্য কোনও কুকুরের ডাক শুনতে পেলেই ছুটে যাই রাস্তার দিকের বারান্দায়। গলা ফাটিয়ে চেঁচাই। ওদের সাবধান করে জানিয়ে দিই, আমি আছি এ-বাড়িতে। তোরা কেউ কাছে ঘেঁষবি না কিন্তু।

দাদারা যখন সেজেগুজে অফিসে বেরোয় তখন বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। দুপুরবেলা মা আর পিসিমা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন, বিশ্রাম নেন। কিন্তু আমার তো ঘুম আসে না। তাই একবার এ-ঘর, আর একবার ও-ঘর করি।

বড়বউদি দুপুরে ঘুমোয় না। টিভি দ্যাখে আর সেলাই করে। আমি বড়বউদির পায়ের কাছে গিয়ে বসি। টিভি দেখি। এখন আর টিভির ছবিগুলো তেমন স্পষ্ট দেখতে পাই না। কেমন যেন ঝাপসা দেখায়।

কী আনন্দেই না কেটেছে আমার ছেলেবেলা আর তার পরের দিনগুলো। অন্তু বড় হয়ে উঠতেই ওর সঙ্গে কত খেলা করেছি। ছুটোছুটি। নকল কামড়াকামড়ি। আরও কতরকম খেলা।

বাড়ির কাছেই একটা ছোট পার্ক আছে। আমি, ছোড়দা, অন্তু সেই পার্কে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই। কোনও-কোনও দিন সঙ্গে থাকে রামনাথ। সেখানে আমি আর অন্তু ছুটোছুটি করি। ছোড়দা দূরের বেঞ্চিতে বসে দ্যাখে। আগে আমাকে বল ছুঁড়ে দিয়ে খেলাত ছোড়দা। আমি ছুঁড়ে দেওয়া বলটা এক ছুটে গিয়ে মুখে করে নিয়ে আসতাম। জিভ বের করে হাঁফাতাম। জিভ দিয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ত।

ছোড়দার মুখেই শুনেছি, এরকম ছুটোছুটি করলে নাকি আমার নখ ক্ষয়ে যায়। তা না হলে নখ যদি খুব বড় হয়ে যায় তা হলে পায়ের আঙুল ব্যথা করবে। পা ফেলে হাঁটতে বা ছুটতে কষ্ট হবে। এখন তো আর আমি তেমন ছুটতে পারি না, তাই নখ বড় হয়ে যায়। তখন সত্যিই পা ব্যথা করে। ভালো করে হাঁটতে পারি না। ছোড়দা বা ছোটবউদি আমার খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটার ধরন দেখেই সব বুঝতে পারে। তখন ছোড়দা কচির মতো কী একটা যন্ত্র দিয়ে নখগুলো কেটে দেয়। তারপর কী যে আরাম লাগে আমার! ছোট-ছোট ডাক ছেড়ে ছোড়দাকে বলি, ছোড়দা, তুমি কী ভাল! ছোড়দা বা ছোটবউদি আমার কথা বুঝতে পারে না। তবে ছোড়দা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে। নাম ধরে ডাকে বারবার।

ছোড়দা যখন অফিসে বেরিয়ে যায় তখন আমার খুব বিচ্ছিরি লাগে। মনে হয়, ছোড়দার সঙ্গে অফিসে চলে যাই। শুনেছি, ছোড়দার অফিসের সামনে অনেকটা খোলা জমি আছে। তা সারাটা দিন আমি তো সেখানে ছুটোছুটি করে খেলা করে কাটিয়ে দিতে পারি। তারপর অফিস ছুটির পর ছোড়দার সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা! সে যে কী আনন্দের ব্যাপার...। কিন্তু সেটা তো হওয়ার উপায় নেই। তাই ছোড়দা বেরিয়ে গেলেই আমার ঘুরঘুর করার কাজ শুরু। তখন দেখি বাড়িতে কে কোথায় কী করছে।

মা আর পিসিমা নিজেদের মধ্যে গল্প করেন, ঝগড়া করেন। এই দেখি আড়ি তো এই দেখি ভাব। আমাকে দেখলেই মা সাবধান করেন। বলেন, ডাম্পি, তুই পায়ের কাছে একদম ঘুরঘুর করবি না। তোর জন্যে কোনওদিন হোঁচট খেয়ে পড়ব।

পিসিমাও বলেন, যা যা, এখন কাজলের কাছে যা–।

কাজল মানে ছোটবউদি। ছোটবউদি তো এখন অন্তুকে খাওয়াতে ব্যস্ত। বড়বউদি বাড়ি নেই। কোথায় যেন গেছে বড়দার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে তা হলে খেলা করবে কে! কথাই বা বলবে কে!

এসবের জন্যেই মাঝে মাঝে আমি খাটের তলায় এক কোণে ঢুকে চুপটি করে বসে থাকি। বসে-বসে আমার মায়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভালো মতো মনে পড়ে না।

ছোটবউদি সময় হলেই খেতে দেয় আমাকে। এ-ঘরে ও-ঘরে খুঁজে না পেয়ে নাম ধরে ডাকে। এক-একদিন এত মন খারাপ থাকে যে, অনেক করে ডাকলেও সাড়া দিই না। পরে ছোটবউদি যখন খাটের তলায় উঁকি মেরে আমাকে খুঁজে বের করে তখন গজগজ করতে করতে বেরিয়ে আসি। খিদেয় পেট চুইচুই। অগত্যা কী আর করা!

ছোড়দা যখন অফিস থেকে বাড়ি ফেরে তখন পায়ের শব্দ চিনতে পারি আমি। দোতলা থেকে একছুটে সিঁড়ি নেমে পৌঁছে যাই একতলায় দরজার কাছে। ছোড়দার গায়ে গা ঘষে কুঁইচুঁই শব্দ করে কত যে নালিশ করি আমি! সবার নামেই নালিশ থাকে আমার শুধু অন্তু ছাড়া। ছোড়দা আমার নালিশ কি ছাই একটুও বোঝে! খালি নাম ধরে ডাকে আর আদর করে।

বেড়াল, আরশোলা কি ইঁদুর দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। ওদের পেছনে পাগলের মতো তাড়া করি। ওদের গায়ের গন্ধও কী বিচ্ছিরি! আমার ছুটোছুটি আর ঘেউঘেউ করা শুনে মা আর পিসিমা ভারী বিরক্ত হন। মা বলেন, চোর ধরার নামে দেখা নেই, শুধু ইঁদুর-বেড়াল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে!

কিন্তু আমি কী করব! বাড়িতে চোর না এলে আমি তাকে ধরি কেমন করে! ছোড়দাদের এই পাড়াটা এতই শান্ত যে, চোরের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

গত চোদ্দো বছরে একবার মাত্র চোর ধরেছি আমি। তাও সেই ছেলেটাকে ঠিক চোর বলা যায় কি না জানি না।

বছর তিনেক আগের কথা। দিনটা ছিল রবিবার। সন্ধে সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। আমি তিনতলায় বড়বউদির ঘরে বসে টিভি দেখছিলাম। বড়দা বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। টিভিতে সিনেমা হচ্ছিল। বড়বউদি একটা বড় বাটিতে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, চানাচুর দিয়ে মুড়ি মেখে খাচ্ছিল। সিনেমার প্রতিটি ছবির দিকে চোখ যেন আঠা দিয়ে আটকানো। দাদা-বউদির কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, সিনেমাটা রঙিন। কিন্তু আমি সাদা-কালোই দেখছিলাম। আমাদের চোখে তো আর বর্ণালির সাত রং ধরা পড়ে না। আমাদের জগৎটাই সাদাকালোর জগৎ। সেইজন্যেই তো ছোড়দা, রামনাথ, কিংবা অন্তু যখন আমাকে লাল বল দিয়ে খেলাত, তখন আমি সেটাকে কালচে রঙের দেখতাম।

সিনেমা দেখতে-দেখতে অচেনা একটা পায়ের শব্দ পেলাম। শব্দটা এসেছে দোতলার সিঁড়ি থেকে। ছোড়দা বাড়ি নেই। অন্তুকে নিয়ে কাছেই কোন এক বন্ধুর বাড়ি গেছে। রামনাথ গেছে মোড়ের মাথায়—বটতলায় আড্ডা মারতে। প্রতি রোববারেই যায়। মা আর পিসিমা নিশ্চয়ই ওঁদের ঘরে বসে সিনেমা দেখছেন। ছোটবউদি একটু আগে রান্নাঘরে রান্না করছিল দেখে এসেছি—এখন কী করছে জানি না।

টিভি দেখা ছেড়ে আমি চুপচাপ দোতলায় নেমে এলাম। নামতে নামতে অচেনা গন্ধটা নাকে এল। ছোড়দা বা বড়দার কোনও নতুন বন্ধু হতে পারে। ওদের নানান বন্ধুবান্ধব প্রায়ই আসে বাড়িতে। তবে এই বন্ধু হয়তো আগে বাড়িতে আসেনি।

পায়ের খুটখুট শব্দ আর গন্ধ লক্ষ্য করে চলে গেলাম ছোড়দার ঘরে। গিয়ে দেখি রোগা চেহারার একটা ছেলে ঘরের সব জিনিসপত্র হাঁটকাচ্ছে। ছেলেটার মাথার চুল উশকোখুশকো, গায়ে ছেঁড়া জামা, আর মুখ থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে।

দেখলাম, ছেলেটা ছোড়দার টেবিলে রাখা খুচরো টাকাপয়সা তুলে নিল। তারপর তুলে নিল ছোটবউদির হাতঘড়িটা। ওগুলো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে যখন স্টিলের আলমারির দিকে এগোচ্ছে, তখনই আমি জোরে গর্জন করে উঠলাম।

ছেলেটা যে চুরি করছে সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। মা যে দিনরাত ধিক্কার দেন আমি চোর ধরতে পারি না, সেটাও মনে ছিল আমার। সুতরাং আমি ছেলেটার ওপরে আঁপিয়ে পড়তে পারতাম। পারতাম ওর গলায় কিংবা কাঁধে সাংঘাতিক কামড় বসাতে। কিন্তু ছেলেটার ওইরকম অভাবী রুগ্ন চেহারা আমাকে থামিয়ে দিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ওর গায়ে একফেঁটা জোর নেই, একফেঁটা সাহসও নেই। দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পায় কি না কে জানে!

আমার দ্বিতীয় গর্জন বোধহয় ছোটবউদি শুনতে পেয়েছিল। আমার নাম ধরে কী হল, ডাম্পি! কী হল, ডাম্পি! বলতে-বলতে কোথা থেকে যেন ছুটে এল। এসেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল চোর, চোর! বলে।

ব্যস, আর যায় কোথায়! সারা বাড়িতে যাকে বলে একেবারে হুলুস্থুলু। বাড়িসুদ্ধ লোকের হইচই চিৎকারের মধ্যেই ছেলেটা ছুটে পালিয়ে গেছে রাস্তায়। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেনি। পাড়ার ছেলেরাই মিনিটখানেক পরে ধরে নিয়ে এল ওকে। আর তার ঠিক আগেই ছোড়দা আর অন্তু ফিরে এল।

ছোড়দা, বড়দা, অন্তু আর দুই বউদি তখন বাড়ির দরজার। আর মা-পিসিমা দোতলার বারান্দায় শরীর ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। রামনাথ গিয়েছিল গলির মোড়ে চোর ধরে নিয়ে আসতে। আমি ছোটবউদির কাছে কাছে ঘুরছিলাম।

ছোড়দাকে ঘিরে পাড়ার বহু লোকের জটলা। ছোঁড়া সবাইকে আমার কথা বলছিল। প্রশংসা করছিল খুব। আমার ভালো লাগছিল। মা নিশ্চয়ই এবার খুশি হবেন।

ঠিক এমন সময় ছেলেদের দঙ্গল চোরটাকে পাকড়াও করে আমাদের বাড়ির গেটে নিয়ে এল। সঙ্গে রামনাথ। সে ছেলেটার কলার ধরে আছে শক্ত করে।

ছেলেটাকে দেখে আমি চমকে গেলাম। এ কী দশা হয়েছে ওর! জামা ফর্দাফাই। সারা গায়ে কালো রঙের ছিটে। রক্তের ছিটে। আমি তো রক্তের লাল রং দেখতে পাই না, কালো দেখি। ওর বাঁ-গাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। মাথা ঝুঁকিয়ে টলছে। মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

এই যে গৌতমদা, ওর পকেটে এগুলো পাওয়া গেছে। পাড়ারই মুখ-চেনা একটা ছেলে ছোটবউদির ঘড়ি আর টাকাপয়সা এগিয়ে দিল ছোড়দার দিকে। হইচই

চিৎকার আরও বেড়ে গেল। কেউ বলছে ছেলেটাকে পুলিশে দিতে। আবার কেউ বলছে আচ্ছা করে পিটিয়ে ছেড়ে দিতে।

এরই মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেল মার। অসহায় ওই ছেলেটাকে সব্বাই মিলে পেটাতে লাগল। যারা মারছিল তাদের মুখগুলো কী বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছে। মুখ কুঁচকে গেছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

আমি ছোড়দার দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বললাম, ছোড়দা, ওকে ছেড়ে দাও। ওকে আর মেরো না। মারতে বারণ করো। ছেলেটা মরে যাবে যে!

আমার কথা কেউ বুঝতে পারল না। ছোড়দা সামনে দাঁড়ানো এক বন্ধুকে বলল, দেখছিস, ডাম্পি আবার কেমন চেঁচাচ্ছে। ওর রাগ এখনও কমেনি।

আমি আবার বললাম, জিনিস তো সব পেয়ে গেছ, ছোড়দা! ওকে ছেড়ে দিতে বলো!

আমার কথা কেউ বুঝতে পারল না। তখন আমি চুপচাপ বাড়িতে ফিরে এসে মায়ের খাটের তলায় এক কোণে গিয়ে বসে পড়লাম। ইশ, ছেলেটাকে দেখে যদি আমি চিৎকার না করতাম তা হলে ভালো হত। কী দরকার ছিল আমার চোর ধরার! ছেলেটার কী দশা করবে ওরা কে জানে!

কিছুক্ষণ পর হইচই থেমে গেল। তার একটু পরেই ছোড়দা উঠে এল দোতলায়। আমাকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগল। শুনলাম ছোটবউদিকে বলছে, দেখলে, এই হচ্ছে ডোবারম্যানের জাত! কী সাহস!

মনে আছে, সেদিন ছোড়দার হাজারটা আদরের ডাকেও আমি সাড়া দিইনি।

আমি চোর ধরায় মা ও পিসিমা খুশি হয়েছিলেন। বাড়িতে যেসব অতিথি আসত তাদের সবিস্তারে শোনানো হত আমার বীরত্বের কাহিনি। আমি লজ্জা পেয়ে সরে যেতাম সামনে থেকে। ওই ছেলেটার কাটা-ছেঁড়া মুখটা মনে পড়ত। আরও লজ্জা করত আমার।

মা আর পিসিমা এই চোদ্দো বছর ধরে কত যে শাসন করেছেন আমাকে। সন্ধেবেলা বা রাত্রিবেলা লোডশেডিং হলে আমার শরীরটা মিশে যায় অন্ধকারে!

সেটা কি আমার দোষ! অথচ মা সবসময় আপনমনে গজগজ করেন : কেন যে গৌতম একটা কালো কুকুর নিয়ে আসতে গেল!

আমি তখন অন্ধকার থেকেই চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করি : মা, আমার গায়ের রং তো কালো নয়, বাদামি। ছোড়দাকে জিগ্যেস করে দেখো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সব ব্যাপারেই শুধু আমার দোষ। গা কুটকুট করলে আমি যে মেঝেতে গড়াগড়ি দিই তাতে মা-পিসিমা ভীষণ রাগ করেন। বকাঝকা করেন আমাকে। এতে নাকি ঘরে লোম ওড়ে। তাতে আবার ছোটবউদির অ্যালার্জি হয়। সেইজন্যেই তো ছোটবউদি আমার ছেঁড়া সোফাটায় হাত পর্যন্ত দেয় না। জানি, ঘেন্না করে। তা হলে চারবেলা আমাকে খেতে দাও কেন? কেন ভালোমন্দ দ্যাখো আমার? দয়া করে? দয়া আর ভলোবাসা তো এক নয় ছোটবউদি।

তা এইরকম করে, এইরকম দয়া-মায়া অথবা ভালোবাসার মধ্যে, কেটে গেছে আমার চোদ্দটা বছর। অন্তুও এখন চোদ্দো বছরের। এখন ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। আগে যেমন আমার সঙ্গে সবসময় খেলাধুলো করত, অনেকদিন হল আর করে না। রামনাথও বেশ বুড়িয়ে গেছে। মাথার চুল সব সাদা। রাত্রিবেলা বাড়ির দরজায় বসে হাততালি দিয়ে ভজন গায়, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে...। আমি ওর পাশটিতে চুপ করে বসে থাকি। শুনি। রামনাথের গায়ের গন্ধ নাকে আসে। রামনাথ মাঝে-মাঝে কথা বলে আমার সঙ্গে। বলে, কী রে ডাম্পি, মন দু খাতা। কেয়া?

আমি রামনাথের চোখে তাকাই। ওর মুখ ঝাপসা দেখায়। বুঝতে পারি, আমার চোখের নজর আর আগের মতো প্রখর নেই। পাশের বাড়ির বুড়ি পুষিটা খুব কাছে এসে না পড়লে আমি ওকে দেখতে পাই না, ওর গন্ধও টের পাই না। ঘ্রাণশক্তিও ক্ষয়ে এসেছে আমার।

বড়দা, ছোড়দা কি মা-পিসিমা বা বউদিরা সদর দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেই আমি দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াই। দেখি, সিঁড়ি দিয়ে কে উঠে আসছে। ওপরে উঠে আসা মানুষটাকে আমি সবার প্রথমে চিনতে পারি পায়ের শব্দে। তখনও আমি দাঁড়িয়ে থাকি নিজের জায়গায়। ক্রমশ মানুষটাকে আমি ঝাপসাভাবে দেখতে পাই। তারপর সে খুব কাছে এসে পড়লে পায়ে নাক ঠেকিয়ে খুব জোরে শ্বাস টেনে গন্ধ শুকি। তখন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হই। না, এ আমার চেনা লোক।

বড়বউদির ঘরে বসে কদিন আগে টিভি দেখছিলাম। হঠাৎই বউদি বড়দাকে বলল, জানো, ডাম্পির চোখে না ছানি পড়ছে।

ও, সেইজন্যেই আমি দেখতে পাই না ভালো করে! কিন্তু আমি যে ভালো করে স্পষ্ট করে কোনও শব্দ শুনতে পাই না, ভালো করে গন্ধ চিনতে পারি না, একটু ছোটাছুটি করলেই যে আমার হাঁপ ধরে, এ সবই কি ছানির জন্যে? মায়ের চোখেও তো ছানি পড়েছিল, পিসিমারও তাই। ওঁরা তো অপারেশান করে সারিয়েছেন। ওঁদের তো কত বয়েস! বরং অন্তু আমার বয়েসিকই, ওর তো কিছু হয়নি!

ছোড়দা আজকাল খুব কম সময় বাড়িতে থাকে। চাকরির পর সন্ধেবেলা কীসব নাকি পড়াশোনা করছে। কিন্তু তাও আমি সারাটা বাড়িতে ছোড়দার গায়ের গন্ধ পাই। সারা গায়ে ছোড়দার নরম হাতের ছোঁয়া পাই।

গতকাল রাতে ছোড়দা, ছোটবউদি আর অন্তু খেতে বসেছিল। আমি খাবার টেবিলের তলায় ছোড়দার পা ছুঁয়ে বসেছিলাম। অন্তু হঠাৎ বলল, বাবা, ডাম্পি বুড়ো হয়ে গেছে, না?

ছোড়দা ছোট্ট করে বলল, হ্যাঁ।

ছোটবউদি বলল, দেখলি না, সেদিন পুষিটাকে দূর থেকে দেখতে পেল না।

অন্তু খেতে-খেতে বলল, ডাম্পি মরে গেলে কী হবে, বাবা? বাড়ি পাহারা দেবে কে? যদি কখনও চোর আসে সেবারের মতো!

ছোটবউদি বলল, সন্তোষদাকে বলো না, একটা অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা দিতে।

ছোড়দা ভাতের গ্রাস মুখে দিয়ে বলল,হুঁ বলব।

কিছু বলতে চাইনি, কিন্তু মুখ দিয়ে ভাঙাচোরা কতকগুলো আওয়াজ বেরিয়ে এল আমার।

ছোড়দা ছোটবউদিকে বলল, ডাম্পির বোধহয় খিদে পেয়েছে, ওর খাবারটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।

আশ্চর্য! এই সাধারণ কথাটা কখনও মনে হয়নি আমার। আমি ভেবেছিলাম চিরকাল আমি থাকব এ-বাড়িতে। মা-পিসিমার সঙ্গে। ছোড়দা-বড়দার সঙ্গে। ছোটবউদি-বড়বউদির সঙ্গে। রামনাথের সঙ্গে। অন্তুর সঙ্গে। সবার সঙ্গে।

বোকার মতো ভেবেছি, ছোটবউদি রোজ আমাকে খেতে দেবে। ওই তুলো বের করা সোফায় সবসময় তৈরি হবে আমার বিছানা। আর, সবার গায়ের চেনা গন্ধ নিয়ে রোজ আমি ঘুমোতে যাব।

মা-পিসিমা আমাকে অনেক বকাবকি করেন। কিন্তু ওঁদের ভেতরের ভালোবাসা কি আমি টের পাই না! ওঁদের ছেড়ে যেতে আমার যে কষ্ট হবে। বড়বউদির ঘরে গিয়ে আমি তো প্রায়ই টিভি দেখি। তখন বড়বউদি আদর করে আমাকে। আর আমি টিভি দেখতে পাব না। বড়বউদিকেও না। কাল রাতে রামনাথ সুর করে নতুন গান গাইছিল ও মালিক জাগে, বান্দা সোয়ে। অন্তরমে কভি সুবহ্ না হোয়ে… ওর গান আর শুনতে পাব না। অন্তু, ছোড়দা, ছোটবউদি-ওদের কাউকেই আমি আর…।

আমার কেমন হাঁফ ধরছিল। এতই সহজে একটা ডোবারম্যান অ্যালসেশিয়ান হয়ে যাবে! চোদ্দো বছরের কোনও দাম নেই? এত চেনা প্রিয় সব গন্ধ ছেড়ে কেমন করে চলে যাব আমি! আমার জীবনে কোনও রং নেই–সবটাই সাদা-কালো। কিন্তু এই জীবনটাই তো আমি ভালোবেসেছি।

ছোড়দার পায়ে মাথা ঘষতে লাগলাম আমি। সেইসঙ্গে ওকে ডেকে বললাম, ছোড়দা, শুনছ, তোমাদের ছেড়ে আমি যাব না। কিছুতেই না। ছোড়দা, তোমার কি মনে নেই, অন্তুর আর আমার একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার কথা ছিল? এ-বাড়ি ছেড়ে আমি যাব না–জীবনে না। মানছি, তোমাদের পাঁচভাগের একভাগ আমার জীবন কিন্তু সেটাও তো জীবন, ছোড়দা! আমার ডাকাডাকিতে খাওয়া থামিয়ে মাথা হেলিয়ে টেবিলের নীচে দেখল ছোড়দা। ছোটবউদিকে বলল, এই কাজল, জলদি করো, ডাম্পির সত্যি খুব খিদে পেয়ে গেছে।

# বিকল্পকবি সুবল বসু

**বিকল্পকবি সুবল বসু**

সুবলকে খুব একটা কেউ চেনে না। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে খেলাধুলো করতাম দেশবন্ধু পার্কে। তারপর স্কুল পেরিয়ে কলেজ, ইউনিভারসিটি–এবং সবশেষে চাকরি। সুবল

আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি সবসময়। যেমন, কলেজে আমরা একইসঙ্গে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়েছি। তারপর, নম্বর যথেষ্ট ভালো থাকা সত্ত্বেও, ও হঠাত্ একদিন জানাল, আর পড়ব না।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন? পড়বি না কেন?

মাথার কোঁকড়া চুলের গোছায় টান মেরে সুবল বলেছে, নাঃ, পড়াশোনার মধ্যে কোনও সিমেট্রি নেই–

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সিমেট্রি? প্রতিসাম্য? পড়াশোনার মধ্যে আবার সিমেট্রির খোঁজ পড়ল কেন?

ওকে অনেক করে বোঝালাম। ফিজিক্সে আমার চেয়ে ওর নম্বর বেশি ছিল। সুতরাং বারবার করে বললাম, এরকম ভুল করিস না। মাসিমা মেসোমশাই কষ্ট পাবে।

সুবল কোনও কথায় কান দিল না। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন পার্কের সীমানায় ইউক্যালিপটাস গাছের মাথায় লাল সূর্য হেলে পড়েছে। পার্কের বড় মাঠে বল খেলছে। সবাই। ধুলো উড়ছে।

সুবল বলল, অতীন, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। শ্যামলা রং। চোখ উজ্জ্বল। সেখানে লালচে ছায়া পড়েছে। জিগ্যেস করলাম, কী?

এই রোজ সূর্য ওঠা আর অস্ত যাওয়ার মধ্যে কেমন একটা সিমেট্রি–।

সত্যিই তো, আগে তেমন করে ভাবিনি। ভোরের সূর্যও লাল, শেষবেলার সূর্যও লাল। আর দুপুরের সূর্য সবচেয়ে প্রখর। জ্বলন্ত এক হলদে চোখ।

সুবল আবার বলল, ঠিক একইরকম ব্যাপার চাঁদের মধ্যেও রয়েছে। আস্তে-আস্তে বাড়ে, আবার আস্তে-আস্তে কমে। অমাবস্যা-পূর্ণিমার সিমেট্রি–।

আমার ভারী অদ্ভুত লাগল। সূর্য বা চাঁদের আচরণে প্রতিসাম্য আছে বলেই পড়াশোনার মধ্যেও সিমেট্রি থাকতে হবে! এ কী অদ্ভুত দাবি!

সুবল বলল, অতীন, গত কয়েকমাস ধরে সিমেট্রি খোঁজাটা আমার একটা অসুখের মতো হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর, আমি আর পারছি না।

ওর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। আর সেই সময়ে ওর মুখে কেমন এক অসহায় ছেলেমানুষের ভাব ফুটে উঠেছিল। আমার খুব কষ্ট হল। ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে না তো?

সন্ধের ছায়া গাঢ় হচ্ছিল ক্রমশ। ছেলের দল খেলা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে। পাখিরা বড় বড় কঁকড়া গাছের আস্তানায় ফিরে এসে রোজকার ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিয়েছে। সুবলকে বললাম, ওসব আজেবাজে চিন্তা ছাড় তো। চল, ওঠ–।

পাড়ার দিকে ফিরতে ফিরতে আমি জিগ্যেস করলাম, তোর হঠাৎ করে এসব সিমেট্রির কথা মনে হল কেন?

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, অতীন, তুই কখনও আমার পুরো নামটা খেয়াল করেছিস?

কেন করব না? সুবল বসু।

ও গাঢ় গলায় বলল, নামটা উলটো করে পড়লে কী হয় বল তো!

আমি বিড়বিড় করে ওর নামটা আওড়ালাম। সুবল বসু…সুবল বসু…আরে! এ যে দেখছি একই নাম ফিরে পাচ্ছি!

ওকে কথাটা বলামাত্রই ও বিষণ্ণ হাসল। বলল, আমিও প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। এ ধরনের শব্দ কিংবা সেনটেন্সকে ইংরেজিতে প্যালিনড্রোম বলে। গ্রিক প্যালিড্রোমাস শব্দ থেকে এসেছে। এর মানে হল, এমন কোনও শব্দ, বাক্য বা সংখ্যা যা সোজা কিংবা উলটো করে পড়লেও পালটায় না। দ্বিমুখী অবিকল

আমি একটু অবাক হয়েই ওর কথা শুনছিলাম। এতসব অ-পদার্থবিদ্যার জিনিস ও পড়ল কখন?

জিগ্যেস করতেই সুবল বলল, সাধ করে কি আর পড়েছি! এ-লাইব্রেরি সে-লাইব্রেরি ঘেঁটে সামান্য কয়েকটা লেখাপত্তর পড়তে পেরেছি। তাতেই আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্যালিড্রোমের মতো সিমেট্রি রয়েছে। যেমন তোকে বললাম চঁদ আর সূর্যের কথা–

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

সুবল শব্দ করে হাসল। সামনে থেকে একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসছিল। ওর মুখে জোরালো আলো পড়ল। সেখানে কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ দেখতে পেলাম।

সুবল বলল, শুধু নাম নয়। নামের ব্যাপারটা টের পাওয়ার পরও আমি এ নিয়ে এতটা ভাবিনি। কিন্তু নামের সঙ্গে জন্মতারিখটা মেলাতেই কেমন যেন হয়ে গেলাম।

কত তোর জন্ম তারিখ?

১৯ জানুয়ারি ১৯৯১–।

তাতে কী হল?

কাছাকাছি একটা পানের দোকানে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ও। একচিলতে কাগজ আর ডট পেন চেয়ে নিয়ে লিখল : ১৯-১-৯১। তারপর বলল, শুধু

জন্মসালটা যে প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা তা নয়, ১৯১৯১ সংখ্যাটাও একটা দ্বিমুখী অবিকল।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটার পর সুবল আবার বলল, আমার পিসিমা আমাকে ঠাট্টা করে সবসময় বলে বাপ কা বেটা। কারণ, প্রথম কথা বলতে শিখে আমি নাকি বাবা বলেছিলাম। সাধারণত বাচ্চারা মা কথাটা দিয়ে শুরু করে। এ নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি। কিন্তু প্যালিড্রোম ব্যাপারটা মাথায় ঢোকার পর অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, বাবা শব্দটা দ্বিমুখী অবিকল–।

আমি হেসে বললাম, এসব নিতান্ত কাকতালীয় ছাড়া আর কিস্যু না–।

সুবল হাসল না। বলল, অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও নাকি নিছকই কাকতালীয় ঘটনা।

হেমন্তের রাতের বাতাস আমার ঘাড়-গলা ছুঁয়ে গেল। সুবলের কথায় কাঁটা দিল গায়ে।

এরপর বেশ কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। হঠাৎই একদিন হাতিবাগান বাজারে নরেনের সঙ্গে দেখা। নরেনও আমার কলেজের বন্ধু। তবে এখন বিধান সরণি আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ফোটোগ্রাফির দোকান করেছে। নিছক কুশল বিনিময় করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নরেন আমাকে ডাকল। বলল, একটু বাইরে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

ভুরু কুঁচকে নরেনের পেছন-পেছন বাজারের বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফলের দোকানগুলোর সামনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে নরেন জিগ্যেস করল, অ্যাই, সুবলের কি মাথায় কোনও গোলমাল হয়েছে?

আমি বললাম, না তো। তবে ও আর পড়াশোনা করবে না।

সে না করুক। আরে, এখন তো ও আমার দোকানে প্রায়ই আসে। প্রথম তো আমার নাম নিয়ে পড়েছিল। বলল, আমার নামটা নাকি প্যালিড্রোম না কী যেন। তারপর মুখের আধখানা করে ফটো তোলাতে শুরু করেছে। ওর মুখের ডানদিকের ছবি তুলে, বাঁ-দিকের আধখানার সঙ্গে মিলিয়ে বলতে হবে কতটা কি

তফাত। বোঝ ব্যাপার! ওর মুখের ছবি তুলে সুপারইমপোজ করে মিলিয়ে-টিলিয়ে তো দিলাম। তারপর থেকে ও বিভিন্ন লোকের ছবি নিয়ে আসতে শুরু করল। সব ছবি থেকেই শুধু মুখের ছবিটুকু তুলে নিয়ে ডান দিকের আধখানা বাঁ-দিকের আধখানার সঙ্গে মিলিয়ে কতটা গরমিল তা বলে দিতে হবে।

তুই করে দিয়েছিস সেগুলো?

হ্যাঁ, করব না কেন। পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে ও কখনও গোলমাল করেনি। তা ছবি-টবি সব দেখে সুবল ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। কারণ, কারও মুখেরই দুটো আধখানা হুবহু মিলছিল না। আমরা তো ফটো তুলি, জানি। যে-কোনও মানুষের মুখকে লম্বালম্বি দু-ভাগে ভাগ করলে দুটো ভাগ কখনও আয়নার ছায়ার মতো একরকম দেখতে হয় না। ওকে সে কথা বলতেই কেমন চুপসে গেল। দোকানের আর-পাঁচজন কাস্টমারের সামনেই বলল, আমার থিয়োরি তাহলে ভুল? হতেই পারে না। তারপর দুমদাম করে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে।

একটু দম নিল নরেন। তারপর বলল, সেইজন্যেই তোকে জিগ্যেস করলাম সুবলের মাথায় কোনও গোলমাল হয়েছে কি না।

আমি হতবাক হয়ে মাথা নাড়লাম। একটা অটোরিকশা আমাদের পেছনে এসে কর্কশ স্বরে হর্ন বাজাচ্ছিল। আমি আসি বলে আবার বাজারে ঢুকলাম।

সেদিন বিকেলে সুবলকে দেখলাম। মাথার মাঝবরাবর সোজা করে সিঁথে কেটেছে। আর দুপাশের চুলের ছাঁদ হুবহু একরকম। বুঝলাম, ও নিজের থিয়োরি প্রমাণ করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু থিয়োরিটা যে ঠিক কী, সেটাই আমার মগজে কখনও ঢোকেনি।

আমি ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সুবলই আমাকে ডাকল। বলল, আয় না, বোস, কটা কথা বলব তোকে।

সুতরাং নিরুপায় হয়ে ওর সঙ্গে বসে পড়লাম ফুটপাথের একটা চায়ের দোকানে। ভাঁড়ে চা নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করলাম। দু-এক চুমুক পরেই সুবল হঠাৎ বলল, জানিস, অতীন, আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করছি।

আমি চুপচাপ দেখতে লাগলাম ওকে। এখন আর সহজে অবাক হব না আমি।

সুবল ওর জামার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। তারপর সেটা খুলে দেখাল আমাকেঃ

ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা

ভালোবাসা বড়, অনেক বড়,
প্রিয়তমা হে
ঈশ্বর, আকাশ, সাগর
সবকিছু মিছে।
ভালোবাসা এইটুকু বুকে—
যেন মহাকাশ।

মহাকাশ যেন বুকে,
এইটুকু ভালোবাসা।
মিছে সবকিছু
সাগর, আকাশ, ঈশ্বর।
হে প্রিয়তমা,
বড়, অনেক বড় ভালোবাসা।

কবিতাটা পড়েই বুঝলাম, সুবল এর মধ্যেও সিমেট্রি এনেছে। কবিতার নামে তো বটেই, এমনকী প্রথম স্তবক আর দ্বিতীয় স্তবকও হুবহু এক। প্রথম স্তবকটা উলটে পড়লেই পাওয়া যাবে দ্বিতীয় স্তবক।

আমি হেসে বললাম, তুই তা হলে কবি হয়েছিস!

কবিতার কাগজটা পকেটে রেখে সুবল পালটা হাসল। মাথার মাঝবরাবর সিঁথে কাটায় ওর মুখটা একটু যেন অন্যরকম লাগছে। ও বলল, অতীন, আমি কবি নই বিকল্পকবি।

এবারে অবাক হলাম। বিকল্পকবি কথাটার মানে কী?

সুবল বুঝল আমার প্রশ্নটা। বলল, আমার কবিতা সবই প্যালিড্রোম। তাই আমার কবি পরিচয়ও বিকল্পকবি। অর্থাৎ, সাধারণ কবির থেকে আলাদা, আর তা ছাড়া..তুই রাগ করবি না তো!

না, না, রাগ করব কেন?

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে সুবল বলল, খেয়াল করিসনি, বিকল্পকবি শব্দটা একটা প্যালিড্রোম।

নাঃ, নরেনের কথাই দেখছি ঠিক। ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাড়টা ফেলে উঠে দাঁড়ালাম ও চলি–

সুবল আমাকে হাত ধরে টেনে বসাল। দোকানদারকে বলল আবার চা দিতে। তারপর নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, অতীন, আমার দুঃখ কী জানিস? আমার কথা কেউ মন দিয়ে শুনতে চায় না। তুই যদি একটু শুনিস, তা হলে আমার মনটা শান্ত হয়। শুনবি?

ওর গভীর দুটো চোখে কাতর অনুনয় ফুটে উঠেছিল। পাশের বেঞ্চে বসা আর-একজন মাঝবয়েসি খদ্দের আমাদের দেখছিল। দ্বিতীয় ভড় চা হাতে নিয়ে আমি বললাম, বল, শুনব।

প্রথম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় ভঁড়ে চুমুক দিল সুবল। বলল, প্রকৃতিতে কত সিমেট্রি আছে দেখেছিস? একটা গাছের কথাই ধরকাণ্ডের দুপাশে মোটামুটি সমতা বজায় রেখে বেড়ে ওঠে। এ ছাড়া পশু-পাখি, এমনকী মানুষও। তাদের চেহারার আদলে কি সিমেট্রি নেই? যেমন, আমাদের শরীরে যেসব জিনিস জোড়সংখ্যায় আছে, সেগুলো সমানভাব দুপাশে সাজানো। যেমন, হাত-পা, চোখ, আঙুল, মেয়েদের বুক। আর যেগুলো একটা করে রয়েছে, সেগুলো ঠিক দেহের মাঝবরাবর সাজানো। কপাল, নাক, মুখ, নাভি! তা হলে এবার তুই-ই বল, আমাদের শরীরটা একটা প্যালিড্রোম কি না?

সত্যি, এভাবে কখনও ভাবিনি। সুবলকে আমি কী বলব, পাগল, না দার্শনিক?

সুবল ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বলে যাচ্ছিল।

এ কমাসে আমি অনেক বইপত্তর পড়ে ফেলেছি। তুই ভাবিস না যে, দ্বিমুখী অবিকল কবিতা আমিই প্রথম লিখেছি। বাংলায় আমার আগে কেউ লেখেনি ঠিকই, তবে বহুকাল আগে সংস্কৃতে লেখা হয়েছে। সংস্কৃতে লেখা শিশুপাল বধ কবিতায় এরকম চরণ ছিল। পণ্ডিতরা এগুলোকে বলত সর্বোতোভদ্রঅর্থাৎ, সবদিক থেকেই নিখুঁত। দেখ, ঠিক এইরকম ব্যাপারটাই প্রকৃতির বহু জায়গায়

রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ, উপগ্রহ, তারা থেকে পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক–কোনওটাতেই এর অভাব নেই।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওঠার মুখে সুবল বিড়বিড় করে বলল, শুধু শালা আমাদের জীবনটাতেই কোনও সিমেট্রি নেই।

ওর কথাগুলো আমি শুনতে পেয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, এই প্যালিড্রোম পাগল ছেলেটা সিমেট্রির জন্যে কতদূর যেতে পারে।

এর বছরদেড়েক পরে সুবল কনকলতা নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করল। মেয়েটি রেলওয়েতে চাকরি করে। বিয়েটা শুনেছিলাম প্রেম করেই, কিন্তু সুবল নিজে আমাকে কখনও কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, ওর নামটাকে হেঁটে আমি কনক করে নিয়েছি। বুঝলাম, বিয়ের পরেও ওর মাথা থেকে প্যালিড্রোমের ভূত যায়নি।

এরপর সুবলের সঙ্গে খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ও বাড়ি ছেড়েই বেরোত খুব কম। তবে রাস্তায় কনকলতার সঙ্গে দেখা হলে সুবলের খবর নিতাম। শুনতাম, ও নাকি দিনরাত্তির বই আর কাগজপত্রে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া ঘরের সব জিনিসই ও নতুন করে সাজিয়েছে– যাতে মোটামুটি একটা সিমেট্রি বজায় থাকে। আর খুঁটিনাটি যে-কোনও জিনিস কেনার সময়েও তাই। যেমন, সিলিং ফ্যান কিনেছে চার ব্লেডের। গোলমরিচ ঢালার ছোট্ট শৌখিন কৌটোয় বিজোড় সংখ্যার ফুটো ছিল বলে নিজে আর-একটা ফুটো করে নিয়েছে।

কনকলতার মুখে আমি যন্ত্রণার ছাপ দেখেছিলাম। সুবল যে চাকরি-বাকরি করে না, তা নিয়ে ওর কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু ও আর-একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠলে ভালো হত। অসহায় কনকলতাকে মেকি আশ্বাস ছাড়া আর কী-ই বা আমি দিতে পারতাম!

দিন চার-পাঁচ আগে একদিন দেখা পেলাম সুবলের।

রাত সাড়ে নটার সময়ে অরবিন্দ সেতুর রেলিঙে একা-একা বসে রয়েছে।

আমি মুদির দোকান থেকে বিস্কুট কিনে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎই একটা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওকে চিনতে পারলাম।

কাছে গিয়ে সুবলকে দেখে খুব কষ্ট হল। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! চুল উশকোখুশকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চামড়ায় শুকনো ভাঁজ। শূন্য চোখে তাকিয়ে অরবিন্দ সেতুর ওপরে ছুটে চলা যানবাহনগুলো দেখছে।

সুবল।

আমার ডাকে ও চমকে উঠল। একটু দেরিতে চিনতে পারল আমাকে। তারপর ম্লান হেসে বলল, ও, তুই।

এত রাতে এখানে বসে কী করছিস?

ও স্বাভাবিক সুরে জবাব দিল, দেখছি, যে-গাড়িগুলো এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যায়, সেগুলো আবার ফিরে আসে কি না। জানিস অতীন, নম্বর মিলিয়ে দেখেছি, বেশিরভাগ গাড়িই আবার ফিরে আসে। এটাকে নিশ্চয়ই তুই সিমেট্রি বলে মানবি?

আমি ওর হাত ধরে ওকে রেলিং থেকে নামালাম, বললাম, বাড়ি যা। তোর বউ একা রয়েছে। বাড়িতে।

সুবল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আপনমনে দু-বার ঘাড় নেড়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। মনে হল, একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে গিয়ে ও হিমসিম খাচ্ছে কিছুতেই সেটা মিলছে না।

ঠিক এর দুদিন পর, অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার আত্মহত্যা করেছে সুবল।

পাড়ার বেশিরভাগ লোকই এই অমিশুকে ছেলেটাকে চিনত না। কিন্তু আত্মহত্যা করার ফলে ওকে চিনে ফেলল সবাই।

চার ব্লেডের পাখার সঙ্গে নাইলনের দড়ি বেঁধে ফাঁস তৈরি করেছিল সুবল। ফাঁসের দুপাশে দড়ি দিয়ে সমান মাপের দুটো ফুল তৈরি করা ঠিক বাচ্চা মেয়েদের বিনুনির মতো।

এ ছাড়া একটা সুইসাইড নোটও লিখে গেছেঃ

জীবন এইরকম সবচেয়ে ভালো
ভ্রূণ থেকে যৌবন, যৌবন থেকে ভ্রূণ,
ভালো সবচেয়ে, এইরকম জীবন।

জীবনের সিমেট্রির কথা মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও ভোলেনি বিকল্পকবি সুবল বসু।

# মোনালিসার নতুন বন্ধু

**মোনালিসার নতুন বন্ধু**

আজ একজন নতুন বন্ধু মোনালিসার বাড়িতে এসেছে। এই নতুন বন্ধুটা খুব ভালো। কখনও ঝগড়া করে না, আড়ি করে না। এরকম একটা ভালোমানুষ নতুন বন্ধুই তো চেয়েছিল মোনালিসা। এরকম বন্ধু আর কারও নেই। শানু, তোতা, রুবি, বাবাই কারও নেই।

ছাদের কোণে বসে মোনালিসা ওর নতুন বন্ধুর সঙ্গে রান্নাবাটি খেলছিল আর নানান গল্প করছিল। তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। ছাদের পাশেই উঁকি মারছে তিনটে তালগাছ। মোনালিসার রান্নাবাটি খেলা দেখছে। গাছের পাতার জাফরির ফাঁক দিয়ে সূর্যের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। তাই সূয্যিমামাও খেলাধুলোর পাট সেরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তারপরই বইখাতা নিয়ে পড়তে বসবে হয়তো।

মোনালিসার নতুন বন্ধুর নাম রবি। কী ফুটফুটে দেখতে! কী ভালো-ভালো কথা বলে। আবার কান পেতে মনোযোগ দিয়ে মোনালিসার সব কথা শোনে। রবি খুব ভালো। কখনও ঝগড়া করে না। তাই ওকে নিয়েই পড়াশোনা করতে বসে মোনালিসা। মাকে বলেছে, রবির সঙ্গেই আমাকে খেতে দেবে। আর ও আমার কাছেই ঘুমোবে।

সত্যি, রবি আসার পর মা আর বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নইলে রোজই তো শুনতে হয় মেয়ের নালিশ ও বাপি, তোতা ওর বলটা আমাকে খেলতে দিচ্ছে না। ওকে বকে দাও না। অথবা কখনও এসে বলে, মা, মা, জানো বাবাইটা কী খারাপ ছেলে! আমি একটা কী চমৎকার রাখি ওকে দিয়েছি, আর বলে কিনা পচা রাখি! আমি ওর সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি।

মা আর কী বলবেন! বাবা আড়ালে মুখ টিপে হাসেন। সাত বছরের এইটুকু মেয়ের এত ঝগড়া এত নালিশ! মায়ের আর ভালো লাগে না। বাবাকে বলেন, কী করবে করো। দেখবে, তোমার মেয়ে বড় হয়ে ভীষণ ঝগড়ুটে হবে।

বাবা তাতে আরও হাসেন। হাসতে হাসতে চোখের চশমা খুলে যেতে চায়।

মা যখন পুঁচকে মেয়েটাকে বকুনি দিয়ে বলেন, কী রে, তুই সবার সঙ্গে রোজ-রোজ ঝগড়া করিস কেন রে!

মোনালিসা হাত-পা নেড়ে চোখ পাকিয়ে বলে, বা রে, আমি ঝগড়া করি নাকি! শানু, তোতা, ওরাই তো ঝগড়া করে। বারবার আড়ি করে, ঝগড়া করে।

মা গালফোলা মেয়েটাকে দেখেন। চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন অভিমানী মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন মা। চুমু দেন মাথায়। বলেন, তুই রোজ বিকেলে খেলতেও বেরোবি, আবার এসে নালিশও করবি। কী যে করি!

তখন মোনালিসা বলেছে, আমি আর খেলতে বেরোব না, বাড়িতে বসে একা-একা খেলব।

সত্যি তাই করল মেয়েটা। পরপর দুটো দিন একদম বেরোল না বাড়ি ছেড়ে। তাই দেখে মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বাবাকে বললেন, কিছু একটা করো। মেয়েটা যে ঘরকুনো হয়ে গেল। বাড়িতে বসে একা-একা কখনও খেলতে পারে!

এই ব্যাপার? বাবা আবার হেসেছেন। তারপর বলেছেন, তা হলে দ্যাখো এবার কী করি!

ব্যস। পরদিন বাবা কোথা থেকে যেন কিনে এনেছেন রবিকে। বাচ্চাদের খেলার সাথি বাচ্চা রোবট। যন্ত্রের খেলনা, কিন্তু দেখতে অবিকল মানুষের মতন। মাথায় চকচকে কালো চুল। টকটক করে কথা বলে। বড়-বড় চোখে এদিকে-ওদিকে তাকায়। কী সুন্দর করে হাসে! নাম রবি।

এইভাবেই ওদের বাড়িতে এসেছে রবি। তারপর এক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেছে মোনালিসার নতুন বন্ধু।

নতুন বন্ধুর সঙ্গে মোনালিসার কোনও ঝগড়া নেই, কোনও আড়ি নেই। কারণ রবি কখনও মোনালিসার সঙ্গে তর্ক করে না, ওর কাছ থেকে কোনও খেলনা কেড়ে নেয় না, ওর নামে নালিশও করে না। ওরা দুজনে ঘরে, কিংবা বারান্দায়, অথবা ছাদে খেলা করে। ছুটোছুটি করে, লুকোচুরি খেলে, এক্কা-দোক্কা বা ইকড়িমিকড়ি খেলে।

ওদের মিল দেখে বাবা-মা খুব খুশি। বাবা মাকে বলেন, দেখলে তো, কেমন ম্যাজিক দেখিয়ে দিলাম!

মা হেসে উত্তর দেন, সত্যি, এরকম মিল! না দেখলে বিশ্বাসই হত না কখনও।

এইভাবেই দিন যাচ্ছিল বেশ। হঠাৎ একদিন বাবা দেখলেন, মোনালিসা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আর রবি একটু দূরে বসে লুডোর ছক পেতে বন্ধুকে ডাকছে, কী হল মোনালিসা, খেলবে এসো।

বাবা চলে এলেন মেয়ের কাছে। জিগ্যেস করলেন, কী রে, কী হয়েছে?

মোনালিসা বাবার দিকে না তাকিয়েই বলল, রবির সঙ্গে আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না, বাপি।

কেন রে? রবি ঝগড়া করেছে?

না। ও কখখনও ঝগড়া করে না। মোনালিসা গম্ভীরভাবে বলল।

ও, তা হলে বুঝি আড়ি করে দিয়েছে তোর সঙ্গে?

না, ও কখখনও আড়ি করে না।

বাবা এবারে হেসে ফেললেন, বললেন, তা হলে ভালোই তো । মন খারাপের কী হল?

মোনালিসা বাবার দিকে তাকাল। বলল, আমি শানু, বাবাই, তোতা ওদের সঙ্গে খেলব, বাপি। রবির সঙ্গে খেলতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।

এমন সময় মা এসে পড়েছিলেন বারান্দায়। শুনতে পেয়েছেন মেয়ের শেষ কথাটা। আর ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন। রবির সঙ্গে খেলতে ভালো লাগছে না!

মা আর বাবা অবাক হয়ে মেয়েকে দেখছিলেন। গায়ে ফুটফুটে লাল ফ্রক, মাথার চুলে জোড়া বিনুনি, তাতে লাল ফিতের ফুল। শুধু ফরসা মুখটা হাসিখুশি হলেই বেশ মানাত।

সন্ধে এখনও নামেনি। নীচের গলিতে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে কুমিরডাঙা খেলছে। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল। আর তার সঙ্গে আরও নানান রং। কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। সবই ভালো, শুধু মোনালিসার মুখে হাসি নেই।

মা এবার বললেন, রবি তো কখনও তোর সঙ্গে ঝগড়া করে না, আড়ি করে না! তা হলে ওর সঙ্গে খেলতে তোর বিচ্ছিরি লাগছে কেন!

মোনালিসা আর থাকতে পারল না। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে দিল। চাপা গলায় বলল, রবি ঝগড়া করে না, আড়ি করে না। তাই কখনও ভাবও করে না আমার সঙ্গে। তুমিই বলো মা, আড়ি না হলে ভাব হবে কেমন করে? আর ঝগড়া না হলে আড়ি হবে কেমন করে? আমি শানু, বাবাইদের সঙ্গে খেলব কাল থেকে।

মা হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের মাথায়। তারপর তাকালেন বাবার দিকে। বাবা হেসে বললেন, ও ঠিকই বলেছে, বুঝলে। আড়ি না হলে কি কেউ বুঝতে পারে ভাব করতে কী দারুণ ভালো লাগে!

মা বললেন, তুমি রবিকে কালই দোকানে ফেরত দিয়ে এসো। ভাব করতে জানে না এমন বন্ধু আমাদের দরকার নেই।

সত্যিই তো, যে বন্ধু ভাব করতে জানে না সে আবার বন্ধু কীসের!

# মুশকিল আসান

**মুশকিল আসান**

সত্যি, এতদিন কোথায় ছিলেন বলুন তো? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, কত ঋতু, কত মাস, কত বছর কেটে গেল তবু আপনার দেখা নেই। অথচ আপনার খোঁজখবর নেহাত কম করিনি। বহু ডাকাডাকিও করেছি সবাই মিলে। সবাই বলতে, এই তিন কুড়ি ঠেকা বুড়ো আমি, আমার বউ, আর ছেলেটা, মেয়েটা। না, ছোট ছেলে আর ছোট মেয়ে এসবের মধ্যে নেই। ওরা আবার লোকের কাছে কারণে-অকারণে হাত পাতা পছন্দ করে নামানে, করত না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, ওরা এখন বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে? সেটা অকপটে বলে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? আপনি এত দিন পর দয়া করে এসেছেন, এসময়ে এরকম একটা খবর শুনিয়ে আপনাকে বিব্রত করাটা কি উচিত হবে আমার? অবশ্য বিপদ-আপদের কথা তো আপনাকেই শোনানো উচিত। এগুলো শোনাই তো আপনার কাজ। তা ছাড়া এখন আমার তো আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যে এসব ফালতু কথা সময় খরচ করে কান পেতে শুনবে!

জানেন, আপনাকে দেখে সবচেয়ে যে খুশি হত সে আমার বউ। কিন্তু বেচারি এমনই অভাগিনী, কপালে এ-সুখ সইল না। গত মাসেই চলে গেল। তবে মানতেই হবে, ওই রোগা আধপেটা রুগ্ন শরীরে বহুদিন টিকে ছিল। ও আপনাকে যা ভক্তি-মান্য করত সে আর কী বলব! মাঝে-মাঝে আমারই তো বিরক্তি ধরে যেত। মনে হত, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দয়া করে অপরাধ নেবেন না। যা সত্যি তাই বললাম। আসলে অভাবের সংসারে মেজাজটা সবার তিরিক্ষি হয়েই থাকে। তার ওপর রাজ্যের অসুখ-বিসুখ। বউটা কোত্থেকে যে আলসার বাধিয়েছিল জানি না। বাড়তে বাড়তে সেটা এমন হল যে, ডাক্তার-বদ্যিতেও আর ভারসা পাই না। বড় ছেলেটা মা-কে নিয়ে এ হাসপাতাল ও-হাসপাতাল ঢের দৌড়ঝাঁপ করল। মাঝে-মাঝে একটু ভালো হয়, আবার পড়তির দিকে। তারপর শুধুই বিছানায় শোয়াহা,

এই বিছানাটায়। তারপর শুধুই বিছানায় পড়ে থাকে, আর আপনাকে ডাকে, খোঁজ করে। ভাবে আপনিই একমাত্র ওর কঠিন অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। বড় ছেলে সিন্টুরও আপনার ওপরে ছিল অগাধ ভরসা। সে-বেচারা মা-কেও ভালোবাসত খুব। তাই যদুর সম্ভব পয়সাও খরচ করল মায়ের রোগের পেছনে। কত খরচই বা করবে! মাড়োয়ারির গদিতে কেরানিগিরি করত যে! তবে ছেলেটার বোধ-বুদ্ধি ছিল, হাতের লেখাটাও ছিল মুক্তোর মতো। বোকার মতো ভাবত, ভালো হাতের লেখা থেকেই নাকি চাকরিতে ওর উন্নতি হবে। বি. এ. পাশ যে করেছিল, তার ওপর ভরসা করত না। বলত, বাবা, বি. এ. পাস ছেলেমেয়ে তো গণ্ডায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মতো সুন্দর হাতের লেখা কজনের আছে বলো? এই বলে দিলুম তোমায়, ওই হাতের লেখা থেকেই আমার হাত খুলে যাবে। শুনলেন তো, কী সব ছেলেমানুষি কথা!

না, ছেলের হাত তো খুলল না, তবে আমার বউটার পেট খুলল ডাক্তাররা। ছুরি-কাঁচি দিয়ে নানান কাটাছেঁড়া করল। তারপর পেটটাকে আবার সেলাই করে দিল। বউটা কদিন কাতরাল, কদিন অজ্ঞান হয়ে রইল। শরীরটা রোগ থেকে আরও রোগা হয়ে অবশেষে হল কাকলাসের মতো। কী বলছেন? অপারেশানের টাকা কোথায় পেলাম? সিন্টুই সব জোগাড় করেছিল। শুনতে অবাক লাগলেও ওর ওই মাড়োয়ারি মালিকই সব টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তবে ধার হিসেবে। বলেছিল, পরে আস্তে-আস্তে শোধ করে দিলেই হবে। কিন্তু এত কাণ্ড করে লাভ কিছু হল না। অপারেশানের পর কখন যে সেপটিক হয়ে গেছে তা ডাক্তাররাও বুঝতে পারেনি, আমাদের কথা তো বাদই দিলাম! সে-দিনগুলো যে কীভাবে কেটেছে কী বলব! সিন্টু অফিসে ওভারটাইম করে, যাতে ধারটা জলদি শোধ হয়। বড় মেয়েটা ফাংশানে গান-টান করত। হুঁ, ঠিকই ধরেছেন, অল্পবিস্তর টাকা পয়সাও পেত তার জন্য। ফলে একটু রাত করে ফিরত। ছোট মেয়েটা ইস্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আর পড়েনি–মানে পড়াতে পারিনি। ও বাড়ি-বাড়ি ঘুরে টিউশনি করে। যা পায় তার কিছু আমাকে দেয়, বাকিটা নিজের সাজগোজে খরচা করে। বলে, ঠিকমতো না সাজলে নাকি টিউশনি পাওয়া যায় না। কী জানি, আমি তো এসব বুঝি না, সেকেলে মানুষ। হয়তো আপনি বুঝবেন, আপনার অজানা তো কিছুই নেই।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সবাই তো বাইরে বাইরে। ছোট ছেলে রিন্টু দিনরাত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায়। বাড়ির কাজ বলতে সকালবেলার দোকানপাটটুকু সেরে দেয়, আর হপ্তায়-হপ্তায় রেশনটা। হাতখরচের পয়সা কোথায় পায় জানি না, তবে

যেভাবে হোক জোগাড় করে নেয়। ঘরে ছেলেটা ফেরে রাত করে। দুটো মুখে গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ে। তার পরদিন আবার একই রুটিন। ফলে নিঃঝুম সন্ধেটা আমার যেন কাটতে চাইত না। তেলচিটে বিছানায় রুগ্ন বউটা শুয়ে কোঁকাচ্ছে। ঘরে কেরোসিনের কুপির টিমটিমে আলো, আর দম আটকানো কালো ধোঁয়া। আমি দরজার চৌকাঠে বসে এক মনে ঠোঙা তৈরি করতাম। চোখের জ্যোতি বেশ কিছুদিন হল কমে এসেছে। আগে একার হাতে দৈনিক পাঁচশো ঠোঙা তৈরি করতে পারতাম, কিন্তু নজর কমে যাওয়ার পর থেকে দু-আড়াইশো বড় জোর হয় কি হয় না। আমার ছোট ছেলেটা বাপের খুব খেয়াল রাখত বোধহয়। কারণ, একদিন হুট করে এসে বলে, বাবা, তোমার প্লাস না মাইনাস? আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি। রিন্টু কি অঙ্ক জিগ্যেস করছে নাকি? আমার ওই হতভম্ব অবস্থা দেখে ও পকেট থেকে একটা চশমা বের করল। পুরোনো চশমা। ফ্রেমের ডাঁটির কাছটা ফেটে গেছে। সবুজ ছাতা পড়েছে ভেতরে। বললাম, কার চশমা এটা? রিন্টু বলল, সে জেনে কী হবে! তুমি চোখে দিয়েই দ্যাখো না। ওর কথা অমান্য করলাম না। চশমাটা চোখে দিলাম। রিন্টু জিগ্যেস করল, আগের চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? সত্যিই, যা আগে ঝাপসা ঠেকত তা যেন কম ঝাপসা ঠেকতে লাগল। ওকে সে কথা বললাম। রিন্টু খুশি হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চলে গেল। কিন্তু পরদিনই শুনলাম, আমাদের পাড়ার ইস্কুল বাড়ির লাগোয়া মাঠে তারিণী মাস্টারকে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর তার চোখের চশমাটা নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কী বললেন? না, না, রিন্টুকে আমি কিছুই জিগ্যেস করিনি। জিগ্যেস করলেই হয়তো পালটা বলত, কোন অধিকারে তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ? বাবা হলেই কি পৈতৃক সম্পত্তির মতো সব অধিকার বর্তে যায়? নাঃ, ওর প্রশ্নও বুঝি না, তার উত্তরও জানি না। শুধু জানি চশমাটা আমার দৈনিক ঠোঙার সংখ্যাকে তিনশোর কোঠায় নিয়ে গিয়েছিল।

সেই নিঃঝুম সন্ধেয় বসে ঠোঙা ভাঁজতে-ভঁজতে শুধু আপনার কথা মনে পড়ত। দম আটকানো কালো ধোঁয়ায় নেড়ি কুকুরের মতো হাঁ করে হাঁফাতাম। কখনও কখনও কাশ উঠত। বুকের ভেতর ঘড়ঘড় শব্দ হত। থুথু আর কফ দলা পাকিয়ে জিভের ওপরে ঘুরঘুর করত। মাঝে মাঝে বউয়ের কেঁকানি জোরালো হলে উঠে গিয়ে জল দিলাম, কি কফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলাম গলায়। তারপর আবার ঠোঙা। এইরকম একঘেয়েভাবে ঠোঙা বানাতে-বানাতে একসময় মনে হত আমি নিজেই কখন ঠোঙা হয়ে গেছি। আমি ঠোঙা, আমার বউ ঠোঙা, সিন্টু, রিন্টু, সবিতা, পলা সবাই এক-একটা ঠোঙা। খালি ঠোঙা। এমনকী তার আঠার জোড়ও খুলে আসছে একটু-একটু করে। আপনি হাসছেন? অথচ তখন যদি

আপনি আসতেন, কাছে দাঁড়িয়ে এইরকম বরাভয় হাসি হাসতেন, কিংবা বলতেন, ভয় নেই, আমি আছি-দুঃখে সুখে পুণ্যে পাপে পতনে উত্থানে সবসময় পাশে আছি, তা হলে ওই তেলচিটে বিছানাটাও আজ আর হা-হা খালি থাকত না, সিন্টু আর সবিতাও হাজির থাকত আপনাকে সসম্মানে আপ্যায়ন করার জন্যে। সত্যি, এত দেরি করলেন কেন বলতে পারেন?

আজ আমার সঙ্গেও আপনার দেখা হত কি না কে জানে! আপনার হয়তো অবাক লাগছে, একটা হেঁপো বুড়ো কী করে ঘরদোর আগলে একা-একা যখের মতো দিন কাটাচ্ছে। জানেন, অবাক আমারও লাগে। কী করে যে টিকে আছি! হ্যাঁ, টিকে থাকার কিছুটা কেরামতি কিন্তু নিমাদ জালানের–সিন্টুর মাড়োয়ারি মালিক। কেন জানতে চাইছেন? আসলে মাড়োয়ারি হলে হবে কি, লোকটার মনটা ভারী নরম। আমার বড় ছেলেটা তো দিনরাত্তির ঘাড় গুঁজে কাজ করে ধার শোধ করে চলেছে। একদিন নিমাদ তাকে বললে, সিন্টুবাবু, উধার শোধ করতে আপনার তো ছসাল লেগে যাবে। সিন্টু চুপ। কারণ কথাটা মিথ্যে নয়। অবশেষে নিমচাঁদ প্রস্তাব দেয়, সিন্টুর দু-ভাই বোন যদি তার কাছে নোকরিতে লেগে যায় তা হলে ছসাল সময়টা দু-সালে নেমে আসবে। সিন্টু নিমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু রিন্টু রাজি হল না। ও তখন কদাচিৎ বাড়িতে থাকে। কোথায় যায় কী করে কেউ জানে না। অবশ্য আপনি নিশ্চয়ই জানতেন। ওকে তখন একটু-আধটু শাসন করে ঘরমুখো ফেরালেই পারতেন। আপনার কথা নিশ্চয়ই অমান্য করত না। কী বলছেন? নিয়তির ওপরে কারও হাত নেই? আপনারও নেই? হ্যাঁ, তা তো বটেই। নইলে আমিই বা এরকমভাবে বেঁচে রয়েছি কেন!

রিন্টু রাজি হয়নি, তবে বড় মেয়ে সবিতা রাজি হয়েছিল। ও চাকরি নিল নিমাদের অফিসে। আর রাতে ফাংশান। নিমাদের ধার বেশ তাড়াতাড়ি শোধ হতে লাগল। অথচ দেখি সিন্টু দিনের পর দিন কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছে। ওকে ডেকে যতই জানতে চাই, কী ব্যাপার, ও কোনও জবাব দেয় না। মাঝে-মাঝে শুধু বলে, হাতের লেখা ভালো হয়ে কোনও লাভ নেই, বুঝলে, বাবা। আমি তখন মুখের ভেতরে নল ঢুকিয়ে রবারের পাম্প টিপে গলায় ওষুধ দিচ্ছি। দুবার ওয়াক তুলে সামলে নিয়ে বললাম, কে বলেছে লাভ নেই। আমার বাবা সিন্টু আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ছোট্ট করে বলল, কে আবার বলবে, নিমাদ বলেছে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েও পারলাম না। আমার বড় ছেলেটা খুব সোজা-সরল, নিরামিষ খায়। ওকে ঠকাতে কষ্ট হল।

বুঝলেন, এরপর থেকেই বড় ছেলেটা কেমন যেন ধার্মিক হয়ে যেতে লাগল। কণ্ঠি নিল। নামগান শুনতে যায়। বাড়িতে পাঁচালি নিয়ে বসে। ভাই-বোনগুলো আড়ালে হাসাহাসি করে। তবে ওর মা খুশি। ওকে উৎসাহ দিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে, কোনও ভালো কাজ কখনও বিফলে যায় না রে! না, সিন্টুর ভালো কাজ বিফলে যায়নি। ও একদিন চলে গেল বাড়ি ছেড়ে। দু কলম লিখে জানিয়ে দিল, সংসারে পাপ আছে। এখানে হাতের লেখা ভালো হলেও কারও উন্নতি হয় না। তাই চলে গেলাম।

আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, সেদিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। রোজগেরে ছেলে না বলেকয়ে উধাও হলে কোন বাপটা না ভয় পায়! কী বলছেন? সেরকম ভয়ের কিছু ছিল না? হ্যাঁ, মানে দু-মেয়ে রোজগার করছিল বটে, তবে হাজার হলেও মেয়ে তো! সবিতার কাজে নিমচাঁদ খুশি! ওর প্রমোশন হয় চাকরিতে। যদিও ওর হাতের লেখা ভালো নয়। সবিতা টাকা দিয়ে এই তে-পায়া সংসারটার একটা পায়া ধরে রেখেছে। আর পলা? একইসঙ্গে ওর সাজগোজ আর টিউশনি, দুই-ই বাড়ছে। মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব ভালো পড়ায়। খুব খাটতেও পারে। জানেন, মাঝে মাঝে বেশ খারাপ লাগত। মেয়ের রোজগারে খাওয়া! কী বলছেন? আজ আর সে-যুগ নেই? ঠিকই বলেছেন। আজ শুধু ঠোঙা বানানোর যুগ, কিংবা ঠোঙা হয়ে যাওয়ার যুগ।

সিন্টু গেল। রিন্টুর যাতায়াত কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ব্যস, সে-ও গেল। কিন্তু আমার বউটা যাই-যাই করেও যায় না। তখনও আপনার খোঁজে মত্ত। ওর হাবভাব দেখে মনে হত এই আপনি এসে পড়লেন বলে। এই বুঝি সিন্টু-রিন্টুকে খুঁজে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন! এই বোধহয় আমার বউয়ের পেটের দগদগে ঘা সেরে গেল! আর আমার মতো হেঁপো বুড়োকেও বুঝি ম্যাজিক দিয়ে জোয়ান করে দেবেন। কিন্তু না। কিছুই হল না। দু মেয়ে বাইরে গতর খাটায়। আর ঘরে আমার বউ কোঁকায়, আমি হাঁপ টানি। বউ আপনাকে ডাকে, আমি ঠোঙা বানাই। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, ও যেন আপনাকে ডাকছে আমার হয়ে ঠোঙা বানিয়ে দেওয়ার জন্যে। হতেও পারে। হয়তো আমাদের জীবনের জোড়গুলোয় আশা-আকাঙ্ক্ষার আঠা লাগিয়ে ঠোঙা তৈরি করাটাই আপনার নেশা। পরে আকাঙ্ক্ষা যখন খসে যায়, তখন ঠোঙাও খুলে গিয়ে দাঁত ছরকুটে চৌরাস্তার কাদায় বে-আব্রু হয়ে পড়ে থাকে।

না, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা খসে যায়নি আমাদের। তা-ই যদি বলি তা হলে সবিতাই বা কোম্পানি থেকে কোয়ার্টার পাবে কেন, আর পলাই বা নামকরা টিউটোরিয়াল হোমে চাকরি পাবে কেন! কোয়ার্টার পাওয়ার পর সবিতা চিঠি লিখেছিল, বাবা, সবই দয়াময়ের ইচ্ছে। মার চিকিৎসার যেন কোনওরকম ব্যাঘাত না হয়…। দয়াময়? দয়াময় জালান? নিমর্চাদের কেউ হয় নাকি? সে কথা বউকে বলতেই ও হেসেছে। আশ্চর্য, ওর হাসিতে এখনও ঘা হয়নি! হেসে ও বলেছে, তোমার আর কবে বুদ্ধি হবে? দয়াময় বলতে একজনই আছেন। সত্যি বলছি, সেই একজন কে আমি বুঝতে পারিনি। আসলে আধপেটা খেয়ে দিনে তিনশো ঠোঙা তৈরি করলে কারই বা বুদ্ধি ঠিক থাকে, বলুন? আমি চালসে পড়া চোখে ধার করা চশমা লাগিয়ে একমনে ঠোঙা ভঁজি আর আনমনে পাঁজরার হাড়গুলো গুনি, যেন তা থেকেই জানতে পারা যাবে আপনার আসতে আর কত দেরি। নাকি আমার যেতে?

আজকালকার ছেলেমেয়েরা অকৃতজ্ঞ হয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সিন্টু চিঠি দেয় না। রিন্টুও না। সবিতার চিঠি কমে এসেছে। আর পলাও থাকার জায়গা পেয়েছে টিউটোরিয়ালে। ঘরটা যেন এখন সত্যি শ্মশান। বিছানায় শোওয়া একটা আধমরা দেহ। আর সেই দেহকে আগলে আমি বসে আছি। ঘরে রয়ে গেছে ছেলেমেয়েগুলোর স্মৃতির কঙ্কাল।

হ্যাঁ, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড চশমা। রিন্টু। সুন্দর হাতের লেখায় ভরা দুটো খাতা। সিন্টু। একটা পুরোনো হারমোনিয়াম–তাতে এখন আর খুশির সুর বাজে না। সবিতা। পাউডার, স্নো, সেন্ট, কাচপোকার টিপ, নেলপালিশ, লিপস্টিক। পলা। আমার স্মৃতি আমি নিজে। আর বউয়ের স্মৃতি ওই অক্ষয় মিষ্টি হাসি! কিন্তু শেষমেশ তাও গেল।

সবিতার চিঠি একদিন বন্ধ হল। চিঠির সঙ্গে টাকা আসত। তাও বন্ধ হল। নিমাদের ঋণ কি শোধ হয়ে গেছে তা হলে? পলার সাহায্য আসত কখনও সখনও। একসময় তাও ডুমুরের ফুল। এখন শুধু আমি, ঠোঙা, আর বউ। তিনজনে মিলে ধরে রেখেছি তেপায়া টেবিলটাকে। বউয়ের মুখে চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু আপনার কথা। আপনার গুণাবলী সাতকাহন করে শোনায় আমাকে। বলে, আপনি কত ভালো। কত ক্ষমতা আপনার। কত মহান আপনি। আমি শুনি, ঠোঙা বানাই, রান্না করি, ঠোঙা বানাই, রান্না করি, ঠোঙা বানাই, শুনি, রান্না করি, ঠোঙা বানাই…।

আপনার কি একঘেয়ে লাগছে? কী বলব বলুন। একঘেয়ে জীবনের গল্প সবসময় একঘেয়েই হয়। তবে খুব বেশি দিন একঘেয়েমিতে কাটেনি আমার। আপনার খোঁজ করে করে বউটা শেষে চলে গেল। না, নিয়তির ওপরে তো কারও হাত নেই! আপনারও নেই। আমারও নেই। ফলে এখন শুধু আমি আর ঠোঙা রয়ে গেলাম।

গত একটা মাস খুব কষ্টে কাটিয়েছি, মহামান্য। পরের জন্যে কষ্ট করলে কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয় না। কিন্তু নিজের জন্যে কষ্ট করলে সে-কষ্ট লক্ষগুণ হয়ে বুকের মধ্যে চেপে বসে। একটা মাস আমি একা এই একশো চুয়াল্লিশ বর্গফুট রাজ্যের ওপর দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছি। কিন্তু আর সইছে না। যে রাজ্যে প্রজা নেই সে রাজ্যের রাজার কষ্ট আপনি বুঝবেন না, মহানুভব। কী বলছেন? কষ্টের মধ্যেই মোক্ষ? হয়তো তাই। আর আমিও তো তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু পেলাম কই?

অনুমতি না নিয়ে কেশে ফেললাম। মাফ চাইছি, মহাত্মন। আসলে শরীরের ওপরে সমস্ত নিয়ন্ত্রণই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার এই শীর্ণ হাত, আমার এই জীর্ণ দুটি পা আজ ভাবতে অবাক লাগে যে, এগুলো আমারই শরীরের প্রত্যঙ্গ। ইচ্ছেমতো এগুলো আমি নাড়াচাড়া করতে পারি। কী বলছেন? পায়ের এই ক্ষতটা কীসের? বিশেষ কিছু নয়, কাচে সামান্য কেটে গেছে। আপনার কাছে লুকিয়ে তো লাভ নেই, আপনি সর্বজ্ঞ। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, এতদিন প্রতীক্ষার পর যখন এলেন, তখন অধমের একটা প্রার্থনা আপনাকে পূরণ করতেই হবে। আপনার তো অদেয় কিছুই নেই! আমার এই…কী বলছেন? ঘরে এত কাচের গুঁড়ো কোত্থেকে এল? কিছুই না, বাঁধানো ফটোর কাচটা আচমকা ভেঙে গেছে। এতদিন ঠিকই ছিল! বউটা ভীষণ যত্ন-আত্তি করত ফটোটার। ফুল ধূপ-ধুনো কিছুই বাদ দিত না। মরবার আগেও অসহায় চোখে চেয়ে ছিল এই পরমাত্মা ছবিটার দিকে। আপনি তো সবই জানেন! কি? ফটোটা ফ্রেম ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে কেন? কে জানে। আমার তো কদিন ধরে বিশেষ জ্ঞানগম্যিই নেই। আধপেটা ভগ্নাংশ হয়ে কবেই সিকিপেটায় ঠেকেছে। সিকির ভগ্নাংশ, তার আবার ভগ্নাংশ, এইরকম বহু ভগ্নাংশ হতে-হতে এখন আমার পেটের ঠিক কত অংশ ভরতি তার কোনও স্পষ্ট হিসেব আমার কাছে নেই, প্রভু। আর সেইজন্যেই তো আপনার কাছে একটাই প্রার্থনা! জানিনা, ফটোর কাচ ভেদ করে ধূপ-ধুনো ফুলের গন্ধ আপনার খুঁতহীন নাকে পৌঁছেছিল কি না। জানি না, আমার বউয়ের নিত্যদিনের আকুল পুজোপিট আপনার সর্বশব্দগ্রাহী কানে পৌঁছেছিল কি না। নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। নইলে দেরিতে হলেও আপনি এলেন কী করে? কী বলছেন? আমার কাচে কাটা পা আর এই

ফটোর গুঁড়ো হয়ে যাওয়া কাচের মধ্যে…না,, প্রভু! আমার জ্ঞান ছিল না, সংযম ছিল না, নিয়ন্ত্রণ ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল না, ভক্তি ছিল, সম্ভ্রম ছিল না–এ কী! আপনি চলে যাচ্ছেন, মহামান্য?

দয়া করুন, দেবাদিদেব! করুণা করুন, দয়াময়। অত্যন্ত সহজ একটি প্রার্থনা পূরণ করলেই আপনি আমার চেতনায় সমস্ত বোধ ফিরিয়ে আনতে পারেন সম্ভ্রম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিয়ন্ত্রণ, সংযম, জ্ঞান, সব, সব!

হে ঈশ্বর, করুণাসিন্ধু! শুনেছি আপনার ক্ষমতা ও শক্তি অপরিমেয়। বহু অত্যাচারী শক্তিশালীকে নিছক বাহুবলে দমন করেছেন আপনি। প্রভু, আমার বুকের সামান্য নীচে, তলপেটের কিছুটা ওপরে, অর্থাৎ নাভির আশেপাশে, একটা ভয়ংকর দৈত্য লুকিয়ে আছে। আমি কিছুতেই একে বাগে আনতে পারছি না। ওর দাপাদাপি আমাকে পাগল করে তুলেছে। দয়া করে একে সংহার করুন, প্রভু! আমার জোড় খুলে যাওয়া ঠোঙাটা আবার বেঁচে উঠুক। এ কী, দয়াময়, আপনি চলে যাচ্ছেন? কেন, মহামান্য, কী অপরাধ আমি করেছি? কী? ওই চূর্ণ-বিচূর্ণ ছবি, আমার কেটে যাওয়া পায়ের চেটো, আমার অবিশ্বাসী রুক্ষ দৃষ্টি আপনাকে সন্দিহান করে তুলেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন– তবু আপনি চলে যাচ্ছেন? একজন ভক্তের আর্তিকে উপেক্ষা করছেন আপনি? আপনার মনে কি করুণা নেই, করুণাময়? হয় আমাকে, নয় ওই দৈত্যকে সংহার করতেই হবে আপনাকে! প্রভু! মহাত্মন! করুণাসিন্ধু! দেবাদিদেব! এতবার অনুনয় করে বলছি তবু আপনি টলছেন না? শুনুন…।

…ওরে শালা, যাওয়ার আগে আমার পেটের এই দৈত্যটাকে ঘাড় মটকে নিকেশ করে দিয়ে যা।

# বুদ্ধি যদি বৃদ্ধি পায়

**বুদ্ধি যদি বৃদ্ধি পায়**

সোমা! সোমা! শিগগির একটু বরফ নিয়ে এসো গলা ফাটিয়ে হাঁক ছেড়েছেন পুরন্দর, আর ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে একবার যাচাই করে নিয়েছেন ওটা ঠিকঠাক ফুল স্পিডে ঘুরছে কি না। পুরন্দরের মাথার ভেতরটা কীরকম অস্থির-অস্থির করছিল। মনে হচ্ছিল, দুজন ধুনুরি তার মাথার ভেতরে বসে তোশক তৈরির কম্পিটিশন লাগিয়ে দিয়েছে।

বিকুন বেশ ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাবার দিকে। বরফ দিয়ে কী করবেন বাবা? মুখ লালচে, থমথমে। বিকুনকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আজ বোধহয় তার অফিসটাই কামাই হয়ে যাবে!

এর মধ্যে মা-ও এসে হাজির হয়ে গেছেন। আটপৌরে শাড়ি পরে রান্না করছিলেন। হাতে হলুদের রং, মুখে বিনবিন ঘাম। বোঝা যায়, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও জরুরি হাঁক শুনে ছুটে এসেছেন।

সোমা বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী রে! ও-মা, ও-মা, করে ডাকছিস কেন? এখন আমার মরবার সময় নেই।

ও, রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দের জন্য মা তা হলে বরফ আনার ব্যাপারটা শুনতে পাননি! বিকুন ভাবল। আর বাবার সোমা ডাককে বিকুনের ও-মা বলে ভুল করেছেন।

পুরন্দর রাগ-থমথমে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, ও ডাকেনি, আমি ডেকেছি। জলদি ফ্রিজ থেকে একটু বরফ দাও–একটা রুমালে জড়িয়ে দিয়ো।

বরফ! বরফ দিয়ে এখন কী করবে? তুমি চান করতে যাবে না? এরপর অফিসে দেরি হয়ে গেলে আবার আমাকে।

পুরন্দর এবার ফেটে পড়লেন, বলছি তো জলদি বরফ নিয়ে এসো, আমার মাথায় দেব। ওকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আমার মাথাটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।

সোমার ভুরু কুঁচকে গেল। বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী রে, আবার কী ভুল করলি?

বিকুন ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় গর্জন করে উঠলেন পুরন্দর, ভুল আবার কী! ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না। তোমার ছেলের মাথায় কিস্যু নেই। ও..ও একটা শম্বুক নাড়ুগোপাল!

বিকুন তো একেবারে থ। শম্বুক মানে যে শামুক সেটা ও জানে। কিন্তু শামুক আর নাড়ুগোপালের মধ্যে কোথায় যে মিল তা ওর মাথায় ঢুকছে না। তা ছাড়া, ওই দুটি বস্তুর সঙ্গে বিকুনেরই বা মিল কোথায়!

সোমা জানেন, ভীষণ রেগে গেলে পুরন্দর বিকুনকে তোমার ছেলে বলে অভিযোগ করেন।

তিনি কোনওরকমে ঠান্ডা করতে চেষ্টা করলেন উত্তেজিত পুরন্দরকে, আহা, কী হয়েছে। বলবে তো।

পুরন্দরের কথা থেকে ব্যাপারটা জানা গেল। তিনি সাধারণ একটা আয়-ব্যয়ের অঙ্ক বোঝাতে বসেছিলেন বিকুনকে। তাতে রয়েছে, রামবাবু মাসে ২০০০ টাকা আয় করেন, আর প্রতি মাসে তার ১৬০০ টাকা করে খরচ হয়। তা হলে বছরের শেষে তার সঞ্চয় কত? তা অঙ্ক কষা তো দূরের কথা, বিকুনের বক্তব্য, প্রতি মাসে সমান টাকা খরচ হতে পারে না–বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই! বাবাকে সে স্পষ্ট জানিয়েছে, তুমিই তো সবসময় একথা বলো।

ব্যস, অঙ্ক উঠেছে মাথায়। বাবা-ছেলেতে লেগেছে তর্ক। পুরন্দর যতই বোঝান, এটা অঙ্ক। বিকুন ততই বলে, না, অঙ্কে ভুল আছে।

বিকুন যে মাথা নীচু করে এবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে সেটা খেয়াল করেছেন সোমা। তাই পুরন্দরকে বলেছেন, তুমি যাও তো, তাড়াতাড়ি চান করে তৈরি হও। ও-অঙ্ক আমি বুঝিয়ে দেব।

ফোঁস করে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরন্দর উঠে পড়লেন। তিনি যে পড়াশোনায় বরাবরই তুখোড় ছিলেন এটা আর কাউকে বলা যাবে না। সবই নিয়তি।

বিকুনকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা কম নয়। কী করে ছেলেটা এমন বোকাসোকা হল! কেন ওর মাথায় একফোঁটা বুদ্ধি নেই? অথচ ওর দিদি ঝুনু লেখাপড়ায় কী দারুণ! মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পাঁচটা বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছিল, তা ছাড়া স্টার তো বটেই। সামনের বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সারাদিন শুধু মন দিয়ে পড়ে। মা-বাবা তো ভালো করেই জানেন, ঝুনু সবাইকে খুশি করার মতো রেজাল্ট করবে। আর তারই ছোটভাইয়ের কিনা এই দুরবস্থা!

পড়াশোনা করতে বিকুনের যে খুব একটা খারাপ লাগে তা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগে গাছপালা, পাখি আর প্রজাপতি দেখতে। সেগুলো দেখে ও যেসব রঙিন ছবি আঁকে তা দেখে বড়দের তাক লেগে যায়। তা ছাড়া, কবিতা আবৃত্তি করতেও বেশ লাগে ওর। পাড়ার দু-একটা ফাংশানে ও কয়েকবার আবৃত্তি করে বেশ প্রশংসাও পেয়েছে। তখন তো বাবা মা দুজনেই ওকে আদর-টাদর করেছিলেন! অথচ অঙ্ক আর বিজ্ঞানের মাথা না খুললে সেই দুজন মানুষই কেমন যেন হয়ে যান। আচ্ছা, সবাই কি সব পারে! কেন যে সবসময় দিদির কথা বলে বিকুনকে সবাই খোঁচা দেয় কে জানে! দিদি মোটেই ছবি আঁকতে পারে না। আর আবৃত্তির ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।

কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, বিকুনকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই বাবা-মা বেশ মুশকিলে পড়ে যান। এমনকী অপ্রস্তুতের একশেষও হয়েছেন এক-একবার।

এই তো গত সপ্তাহে সোনামাসিরা বেড়াতে এসেছিলেন বিকুনদের বাড়িতে। সোনামাসি ভীষণ ভালোবাসেন বিকুনকে। সবসময় ওর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। সেদিন সন্ধেবেলা মাসি মেসো, ওঁদের দুই ছেলেমেয়ে নিশানদাদা আর রীতাদিদি, মা-বাবা, ঝুনু-বিকুন সবাই মিলে খুব হইহুল্লোড়, গল্পগুজব হচ্ছিল।

তারই মধ্যে বিকুন ফস্ করে হঠাৎ বলে বসেছে, সোনামাসি, জানো তো, স্কুলে বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধুমাস্টার বলে ডাকে।

সোনামাসি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছেন, সে আবার কী নাম!

বিকুন বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছে, বুঝলে না, যাদের মাথায় খুব বুদ্ধি– মানে, অনেক বুদ্ধিমানের মোট বুদ্ধির চেয়েও বেশি বুদ্ধি তাদেরকেই বুন্ধুমাস্টার বলে... বন্ধুরা বলেছে।

হাসিঠাট্টার তাল কেটে গেল। সবাই চুপ। তারপর হাসিতে ফেটে পড়েছে নিশান, রীতা আর ঝুনু। বাবা আর সোনামেসো ওদের ধমক দিয়েছেন। বিকুন লক্ষ করেছে, মা-বাবার মুখ কেমন লালচে হয়ে গেছে। একটু পরেই মা ওকে নিয়ে চলে এসেছেন পাশের ঘরে। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, তোর কি কোনওদিন এতটুকু বুদ্ধি হবে না মাথায়!

হয়তো সেই কারণেই পরদিন সকালে ঝুনু রবীন্দ্রনাথের মাকাল কবিতাটি বিকুনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছে, তুই এবার থেকে শুধু এই কবিতাটাই আবৃত্তি করবি, বুঝলি? বলে ঝুনু বেরিয়ে গেছে কোচিং ক্লাসে।

বিকুন যখন সত্যি-সত্যিই সেটা মুখস্থ করে আবৃত্তির চেষ্টা করছিল তখন মা কোথা থেকে এসে ওকে থামিয়েছেন।

প্রায়ই এইরকম সব ব্যাপার হয় বলে বিকুন সবসময় ভাবে, ইশ, আমার যদি সত্যি-সত্যি অনেক-অনেক বুদ্ধি হত! মাঝে-মাঝে ও স্বপ্ন দেখে, চোখের পলকে কঠিন-কঠিন সব অঙ্ক কষে ফেলছে, আর বাবা-মা চোখ ছানাবড়া করে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন।

কদিন পর ঠিক এইরকম অবস্থাই হল পুরন্দরের। সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আয়েশ করে খবরের কাগজ পড়াটা তার রোজকার অভ্যেস। সেদিন কাগজের তিন নম্বর পৃষ্ঠার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখ ছানাবড়া, মুখ হাঁ। তিনি ভুল দেখছেন না তো! সাতবার পড়ার পরেও যখন বিজ্ঞাপনটা এতটুকু পালটে গেল না, তখন তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। পাশের টেবিলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে যেতে লাগল, কিন্তু পুরন্দরের চোখ বিজ্ঞাপনের দিকে একেবারে গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা।

বিজ্ঞাপনটা এইরকমঃ

বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র
পরিচালক ড. বিকাশ বর্ধন (বিদেশ প্রত্যাগত)
এই চিকিৎসা কেন্দ্রে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের আই. কিউ./বুদ্ধি বাড়ানো হয়।
আধঘণ্টায় নিশ্চিত ফল। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তার নীচে সেই বিদেশ প্রত্যাগত ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে।

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সোমার নাম ধরে হাঁক পাড়লেন পুরন্দর। বিকুনের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার এরকম অপূর্ব সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে!

সোমা এসে হাজির হতেই পুরন্দর বিজ্ঞাপনটা ওঁকে দেখালেন। তারপর বললেন, আজ আর অফিস যাব না। ঝুনু কলেজে বেরিয়ে গেলে বিকুনকে নিয়ে চলো, আমরা এই সেন্টার থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখি না কী হয়!

সোমা ইতস্তত করে বললেন, কত টাকা নেবে কে জানে! তা ছাড়া…ইয়ে..মানে, ঠকাবে না তো?

টাকার চিন্তা তুমি কোরো না। হাত নেড়ে জবাব দিলেন পুরন্দর, আর ঠকালেই হল! বিজ্ঞাপনে তো লিখেছে আধঘণ্টায় নিশ্চিত ফল। ফল না পেলে টাকা দেব কেন।

সুতরাং বিকুনকে সঙ্গে নিয়ে সোমা এবং পুরন্দর কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক দশটার সময় বেরিয়ে পড়লেন বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধি অভিযানে। ট্যাক্সি ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই তারা পৌঁছে গেলেন বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্রর ঠিকানায়।

কেন্দ্রের চেহারাটা বেশ আহামরি। কাচের দরজা। তার ওপরে ডক্টর বিকাশ বর্ধনের নাম লেখা। নামের শেষে ডিগ্রি জানাতে ইংরেজি বর্ণমালার প্রায় ছাব্বিশটা হরফই ফুটকি দিয়ে বসানো। আর তার পাশে বিদেশ প্রত্যাগত ব্যাপারটাও জানানো আছে।

চেম্বারে ঢুকে একজন রিসেপশনিস্টের কাছে নাম-ধাম ইত্যাদি বিবরণ লিখে দিলেন পুরন্দর। তারপর সোমা আর বিকুনকে নিয়ে একটা লম্বা সোফায়

বসলেন। ঘরে আরও কয়েকজন বাবা মা তাদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই কেমন একটা আশঙ্কার ভাব।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি একটা পার্সোনাল কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে ছিল, আর তার কি বোর্ডের বোতাম টেপার ফাঁকে-ফাঁকে পাশে রাখা একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে কীসব কথা বলছিল। হঠাৎই ফোন নামিয়ে রেখে সে ডেকে উঠল, মিস্টার নকুল সামন্ত।

ঘরের এককোণে বসে থাকা এক রোগামতন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভেতরের দিকে যাওয়ার একটা কাচের দরজা দেখিয়ে বলল, যান, ভেতরে যান ছেলেকে নিয়ে।

নকুল সামন্ত তার স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বিকুন এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। তিনটে কী সুন্দর সুন্দর ক্যালেন্ডার। একটাতে পাহাড়ের ছবি, একটায় জঙ্গলের মাঝে হাতির পাল, আর একটাতে হাতে আঁকা নদী আর গাছপালা। এ ছাড়া, আরও একটা বিশাল রঙিন ছবি টাঙানো রয়েছে ঘরে ও মানুষের মগজের ছবি। ছবিতে অনেকগুলো লাল-নীল তিরচিহ্ন আঁকা। তাদের পাশে-পাশে ইংরেজিতে অনেক কথা লেখা।

হঠাৎই ভেতরের দরজা ঠেলে তিনজন বেরিয়ে এল বাইরে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা, আর একটি বছর আটেকের মেয়ে। মেয়েটির চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বাইরের দরজার দিকে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই মেয়েটি হঠাৎ বিরক্তভাবে বলল, বাপি, আমার চশমার ডানদিকের লেন্সের ফোকাল লেংথটা ঠিক নেই–দু-মিলিমিটারের মতো গোলমাল রয়েছে।

পুরন্দর লক্ষ করলেন, বাবা-মা বেশ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিকুনের ডাক পড়ল।

ভেতরের ঘরে ঢুকে তো সোমা আর পুরন্দরের একেবারে তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়। বিকুনও বেশ অবাক হয়ে গেল। ও হাঁ করে সবকিছু দেখতে লাগল।

বেশ বড় ঘর। ঘরটা সিনেমা হলের মতো ঠান্ডা। তার একপাশে বিশাল টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন বেঁটেখাটো একজন টাকমাথা মানুষ। পোশাকে বেশ চেকনাই রয়েছে। গলায় স্টেথো, ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। চুরুটটা নিভে গেলেও ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পাননি, কারণ মাঝে-মাঝেই ওটাকে নেড়েচেড়ে টান মারছেন। আর তার মুখে সবসময়েই একটা হাসি লেগে রয়েছে।

ঘরের দেওয়ালে নানারকম রঙিন চার্ট আর ছবি টাঙানো। একপাশে নানা যন্ত্রপাতি আর একটা অদ্ভুত ধরনের গদিওয়ালা চেয়ার।

পুরন্দরদের দেখে ভদ্রলোক চুরুটটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর একগাল হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আসুন-বসুন। আমারই নাম ডক্টর বিকাশ বর্ধন। তবে ওটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম হরিপদ তলাপাত্র। বুঝতেই পারছেন, নামটাই এমন যে, ও-নাম শুনে রুগিটুগি বিশেষ আসত না। তাই নাম পালটে বিকাশ বর্ধন নাম নিয়েছি। নামটা এমনিতে বেশ ভালো–তার ওপর বুদ্ধি বাড়ানোর কাজ নিয়ে যখন আছি তখন বিকাশ, বর্ধন–এইসব ক্যাচি ওয়ার্ডগুলো পেশেন্টদের মা-বাবাদের কাছে খুব এফেক্টিভ হবে।

পুরন্দর আর সোমা হতবাক হয়ে ডাক্তারবাবুটিকে দেখছিলেন। ছদ্মনামধারী ডাক্তার! এঁর কাছে এসে ওঁরা ভুল করেননি তো! প্রায় ধপাস করেই ওঁরা দুজনে বিকাশ বর্ধনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লেন। সোমা হাত ধরে টেনে বিকুনকে বসিয়ে দিলেন নিজের পাশের চেয়ারটিতে।

ডাক্তার জেঠু, আপনি ফরেনে গিয়েছিলেন? ফস করে প্রশ্ন করে বসল বিকুন।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। বললেন, হ্যাঁ, জেঠু, ফরেন… ইয়ে… মানে নেপাল আর ভুটানে আমি অনেক বছর ছিলাম। ওখানেও এই বুদ্ধিতে শান দেওয়ার কাজ করতাম।

ডাক্তারবাবু, আমাদের এই ছেলেটার মাথায় ভীষণ বুদ্ধি কম। যদি আপনি ওর একটা ব্যবস্থা করেন…। সোমা রীতিমতো কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন।

নো প্রবেলম। বলে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলেন বিকুনের কাছে। তারপর সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুদ্ধি বেশি হলে আমার কাছে কেউ আসে না।

এইবার বিকুনকে লক্ষ্য করে তিনি জিগ্যেস করলেন, বলো তো জেঠু, ইফ যদি ইজ হয়। বাট কিন্তু হোয়াট মানে কী?

বিকুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

ডক্টর বর্ধন হাতে হাত ঘষে আবার হাসলেন। বিকুনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন, পারলে না তো! ওই সেনটেন্সটার মধ্যে, ইফ, ইজ, বাট আর হোয়াট শব্দগুলোর বাংলা মানে কায়দা করে বলা আছে।

সোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ডাক্তারবাবুর ওপরে ওঁর ভরসা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

এইবার টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কী যেন পড়লেন ডক্টর বর্ধন। তারপর বিকুনের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, তোমার ভালো নাম শুভঙ্কর মিত্র?

বিকুন ঘাড় নাড়ল।

বাঃ, চমৎকার নাম! এইবার এসো তো, শুভঙ্করবাবু, এদিকটায় এসে বসো তো এই চেয়ারটায়। বিকুনকে ডেকে বিশেষ ধরনের গদিওয়ালা চেয়ারটায় বসতে বললেন বিকাশ বর্ধন। তারপর সোমা আর পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আই. কিউ. মিটার দিয়ে ওর আই. কিউ.-টা প্রথমে একবার টেস্ট করে নেব।

বিকুন ভয়ে-ভয়ে গদিওয়ালা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। ডক্টর বর্ধন কাপের মতো ছোট-ছোট চারটে টার্মিনাল লাগিয়ে দিলেন ওর মাথার চারপাশে। তারপর দূরে একটা বোর্ডের কাছে সুইচ অন করে একটা ডিজিটাল মিটারে কীসব দেখলেন। পরক্ষণেই সুইচ অফ করে আক্ষেপের চুকচুক শব্দ করলেন, মাথা নাড়লেন ধীরে-ধীরে। বললেন, খুবই স্যাড ব্যাপার। শুভঙ্করকে নিয়ে আপনাদের তো প্রবলেম হবেই। ওর আই. কিউ. মাত্র ৮৮। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক বলা হয়, তাদের আই. কিউ. হয় ১০০। আর যাঁরা খুব নামকরা বিজ্ঞানী, তাদের আই. কিউ. জেনারেলি খুব বেশি হয়। যেমন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আই. কিউ. ছিল ১৪৬।

পুরন্দর আমতা-আমতা করে বললেন, বিকুনের–মানে, শুভঙ্করের আই. কিউ.-টা ওইরকম বাড়িয়ে দেওয়া যায় না?

ঘাড় নাড়লেন ডক্টর বর্ধন। হেসে বললেন, যায়, যায়, নিশ্চয়ই যায়। তবে বুঝেশুনে ধাপে ধাপে বাড়াতে হবে–যাতে ও বুদ্ধিবৃদ্ধির চাপটা সইতে পারে। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওটা আমার ব্যাপার। আজ আমি কয়েকটা স্পেশাল ডোজ দিয়ে ওর বুদ্ধি বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওর ব্রেনের, মানে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্যারিটাল লোব আর ফ্রন্টাল লোবে একটু এক্সাইটিং সিগনাল দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। নানারকম সেন্স আর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি প্যারিটাল লোব থেকেই জন্ম নেয়। আর ফ্রন্টাল লোবের কাজ হল যুক্তিপ্রয়োগ আর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সাহায্য করা। এই দুটো লোবকে একটু চাঙ্গা করে দিলেই শুভঙ্করের বুদ্ধি বেড়ে যাবে। তবে এই বাড়তি বুদ্ধির এফেক্ট মাত্র তিনদিন–মানে ৭২ ঘণ্টা থাকবে। যদি ব্যাপারটা ঠিকমতো শুভঙ্করের সুট করে যায় তা হলে আর কোনও প্রবলেম নেই–তিনদিন পর ওকে নিয়ে আসবেন, ওই বর্ধিত বুদ্ধিটা একেবারে পারমানেন্ট করে দেব। মানে, কংক্রিট ঢালাই যাকে বলে–

কথা বলতে বলতে শুভঙ্করের চেয়ারের মুখোমুখি রাখা কয়েকটা লোহার স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেছেন ডক্টর বর্ধন। তারপর একটা বড় বাক্স থেকে চারটে বড়-বড় চাকতি বের করে পাশাপাশি দাঁড় করানো স্ট্যান্ডগুলোয় ফিট করে দিয়েছেন। চক্রগুলোয় দাবার ছকের মতো কালো-সাদা ছক কাটা রয়েছে। সেই ছকগুলো চক্রের কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে মাপে ক্রমশ বড় হতে-হতে এগিয়ে এসেছে চক্রের কিনারায়।

বিকাশ বর্ধন কোথায় কী একটা বোতাম টিপে দিতেই চক্রগুলো ধীরে-ধীরে ঘুরতে শুরু করল।

এইবার সুইচ টিপে ঘরের সবকটা আলো নিভিয়ে দিলেন তিনি। তারপর হঠাৎই দেখা গেল চারটে জোরালো আলোর ছটা এসে পড়েছে চারটে চক্রের ওপরে। বিকুনের মাথায় লাগানো টার্মিনালগুলো পালটে দিয়ে আরও কীসব সুইচ খটাখট করে বিকাশ বর্ধন গম্ভীর গলায় বললেন, বিকুনবাবু, তুমি পালা করে পরপর ওই চারটে চক্রের দিকে একমনে তাকিয়ে যাও। লক্ষ্মী ছেলে। দেখবে, একটু পরেই তোমার বুদ্ধি বেড়ে যাবে। আর তোমার লেখাপড়ার খিদে এমন বেড়ে যাবে যে, সবাই একেবারে চমকে যাবে।

হালকা আলোর আভায় বিকাশ বর্ধনের মুখ দেখা যাচ্ছিল। তার চোখেমুখে উৎসাহ আর আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

বিকুন কেমন যেন ঝিমুনির ঘোরের মধ্যে বলে উঠল, ডাক্তার জেঠু, শুধু চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই তোমার বুদ্ধি একেবারে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।

আমার মাথার ভেতরটা কেমন চুলকোচ্ছে– বিকুন একটু ভয়ার্ত গলায় বলল, যেন অনেকগুলো শুয়োপোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে...।

ইউরেকা! শুয়োপোকা! ব্রেনোটিকা! উৎফুল্ল হয়ে হাতে হাত ঘষলেন বিকাশ বর্ধন ও সাকসেসফুল, মিস্টার মিত্র, সাকসেসফুল! ওই শুয়োপোকার ব্যাপারটাই হল আসলমানে, ওটাই হল মগজের ভেতরে বুদ্ধির কামড়। আর কোনও চিন্তা নেই আপনাদের। আজ বুধবার। আপনারা শনিবার এরকম সময়ে শুভঙ্করকে আমার এখানে নিয়ে আসুন–তখন একেবারে ফাইনাল ঢালাই করে দেব।

মাত্র ৫০০ টাকা নিলেন বিকাশ বর্ধন। পুরন্দর যা ভেবেছিলেন তার তুলনায় বলতে গেলে একেবারে জলের দর।

বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে সোমা চাপা গলায় পুরন্দরকে জিগ্যেস করলেন, কী গো, ডাক্তারবাবু তো বললেন ওর বুদ্ধি বেড়ে গেছে, কিন্তু আমরা বুঝব কেমন করে!

বিকুন মা-বাবার একটু আগে-আগে হাঁটছিল। হঠাৎই পিছনে তাকিয়ে সোমাকে লক্ষ করে বলে উঠল, , তুমি একটু সাবধানে হাঁটো। এ-জায়গাটার মেঝের সঙ্গে তোমার জুতোর হিলের কোইফিশেন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন ভীষণ কম। সাবধানে না হাঁটলে তুমি পা পিছলে পড়ে যাবে।

সোমা বিকুনের কথা শুনতে-শুনতে সত্যিই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন, পুরন্দর ওঁকে সময়মতো ধরে ফেলে পদভঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তারপর অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী ফ্রিকশন বললি?

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বিকুন বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, স্ট্যাটিক কোইফিশেন্ট অফ ফ্রিকশন– স্থিতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। মেঝের সঙ্গে মায়ের জুতোর হিলের যে ঘষা লাগছে তা থেকে এটা হিসেব কষে বের করা যায়। সে ভীষণ জটিল ব্যাপার...।

পুরন্দর ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু খুশিও হলেন ভেতরে-ভেতরে। ঘণ্টা দেড়েক আগে শোনা আট বছরের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল তার। চশমার লেন্সের ফোকাল লেংথের গোলমাল নিয়ে কী যেন বলছিল মেয়েটা। এইটুকু এইটুকু বাচ্চা ছেলেমেয়ে এরকম সব দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলছে! বিকাশ বর্ধনের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে কি এইরকমই হয়?

বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকবার পুরন্দর আর সোমাকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হল। কারণ ফ্রিকশনের কীসব দিয়ে শুরু করেছিল বিকুন, পথে গতিবেগ, ত্বরণ, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের শতকরা হিসেবের গরমিল, বুলবুলি পাখি কেন সাধারণত জোড়ায়-জোড়ায় থাকে, পিঁপড়ে কেন লাইন ধরে চলে–এসব বিষয় নিয়ে পুরন্দর আর সোমাকে প্রায় কাহিল করে দিল।

দুপুরে বাড়ি ফিরে পুরন্দর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্রর গোটা ব্যাপারটা তার কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

একটু দম নিয়ে পুরন্দর যখন স্নান করতে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন, বিকুন স্নানটান সেরে ডাইনিং টেবিলে বসে অঙ্ক বই নিয়ে একমনে পাতা ওলটাচ্ছে। পুরন্দর খুশি হলেন। যাক, ছেলেটার তাহলে অঙ্কে আগ্রহ বেড়েছে।

তিনজনে যখন খাওয়া শুরু করলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পুরন্দর গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, অঙ্ক বই নিয়ে কী করছিলি?

একগ্লাস ভাত মুখে পুরে দিয়ে বিকুন নির্বিকারভাবে জবাব দিল, মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্কগুলো একবার করে কষে নিলাম।

পুরন্দরের খাওয়া থেমে গেল।

সোমার হাতে ধরা ডালের হাত থেকে ডাল চলকে পড়ে গেল।

মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলেছে বিকুন।

পুরন্দর তাকালেন সোমার দিকে। সোমার কপালে ভাঁজ পড়েছে। ওঁরা দুজনে হাঁ করে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

এরপর প্রায় দেড় দিন বিকুন শুধু বইপত্র নিয়ে কাটাল।

নিজের যত বইখাতা তার সমস্ত লেখা গোগ্রাসে গিলল। তারপর শুরু করল তিনরকম ডিকশনারি আর দিদির বই। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে পাড়ার লাইব্রেরিতে হানা দিল। এ ছাড়া, আরও কোথায়-কোথায় যে ও ঘুরে বেড়াল কে জানে!

যতক্ষণ ছেলেটা বাড়িতে থাকে ততক্ষণই নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ওর যত অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা।

একদিন সন্ধেবেলা ঝুনু মাকে বলছিল, পাশেই ওর বন্ধু অরুণাদের বাড়িতে যাবে ভিডিয়োতে সিনেমা দেখতে। বিকুন ইংরেজি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। ফস্ করে জিগ্যেস করল, দিদি, বলতো, ভিডিয়ো কথাটার মানে কী?

ঝুনু ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল মায়ের দিকে। ওর মুখ বেজার। এ আবার কী বিপদ!

বিকুন বলল, ভিডিয়ো মানে হচ্ছে, আমি দেখি। তেমনই অডিয়ো মানে হচ্ছে, আমি শুনি। এ দুটোই ল্যাটিন শব্দ।

ঝুনু বেশ ভয়ের চোখে ভাইকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিন রাতেও সেই একই ব্যাপার।

রেডিয়োতে গান শোনা পুরন্দরের বরাবরের অভ্যাস। নিজে এককালে সংগীতচর্চা করতেন, হয়তো সেইজন্যই। ট্রানজিস্টর রেডিয়ো হাতে নিয়ে মেজাজে আধুনিক গান শুনতে-শুনতে এঘর ওঘর আর বারান্দা করছিলেন তিনি। বিকুন হঠাৎই বলে উঠল, বাবা, বড় ডার এফেক্ট হচ্ছে।

ডপলার এফেক্ট! পায়চারি থামিয়ে চোখ কপালে তুললেন পুরন্দর।

জানো না, চলতে-চলতে শব্দ করলে সেই শব্দ যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শোনে, তার মনে হয় শব্দের কম্পাঙ্ক পালটে গেছে।

পুরন্দরের বিষয় ছিল ইকনমিক্স। ডার কী-না কী–এই ব্যাপারটা বোধহয় বিজ্ঞানের। কিন্তু তিনি ধৈর্য না হারিয়ে বিকুনের খুব কাছে এসে মোলায়েম গলায় জিগ্যেস করলেন, ব্যাপারটা আর-একটু খোলসা করে বল তো–ঠিক বুঝলাম না।

বিকুন নড়েচড়ে বসল। বলল, শোনো। তুমি ধরো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ। আর দূর থেকে হুইসল বাজিয়ে ট্রেন আসছে। তখন তোমার কানে হুইসলের শব্দটা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ শোনাবে। মানে হুইসলের শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে বলে মনে হবে। আবার এর উলটোটাও হতে পারে। ট্রেন যখন হুইসল বাজিয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে তখন সেই শব্দের তীক্ষ্ণতা অনেক কম মনে হবে। এই ব্যাপারটা প্রথম ব্যাখ্যা করেন অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী সি. জে. ডলার।

পুরন্দর ছেলের কথা শুনতে-শুনতে রেডিয়োর সুইচ অফ করে দিয়েছিলেন। এবার হাঁ করে নিজের ছেলেকে দেখতে লাগলেন।

বিকুন এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, এরকম করে তাকিয়ে থেকো না, বাবা, তোমার রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। রেটিনার যেসব রড আর কোন রয়েছে...।

পুরন্দর ছেলেকে বাধা দিলেন, থাক, থাক, আর তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

তখন বিকুন বলল, বড় গরম লাগছে। পাখার আর. পি. এম.-টা একটু বাড়িয়ে দেবে, বাবা?

আর. পি. এম.!

রিভোলিউশানস পার মিনি–টসংক্ষেপে আর. পি. এম.। তোমরা যাকে চলতি কথায় স্পিড বলো আর কী!

পাখার স্পিড বাড়িয়ে ফুলস্পিড করে দিলেন পুরন্দর। তারপর মানে-মানে সরে পড়লেন ছেলের কাছ থেকে।

রাতে এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে একটু আলোচনা করতে চাইলেন পুরন্দর।

সোমা প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থায় নিজের হেনস্থার কথা জানালেন স্বামীকে। বললেন, আর বোলো না! আজ সকালে বিকুন রান্নাঘরে ঢুকে আমাকে খাবার-

দাবারের ক্যালরি, মেটাবলিজম, গ্যাসের দহন, পরিবেশ দূষণ এসব নিয়ে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। তারপর বলে কী, নুনের মধ্যে আছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন। নুন নোনতা। আর চিনির মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। চিনি মিষ্টি। এরকম তফাত হল কেন? তারপর টাইঅ্যালিন নামে কী একটা জিনিসের নাম করে বলল, ওটা নাকি একটা এনজাইম, আমাদের থুতুর মধ্যে আছে। আবার সেটার বানান নাকি পি অক্ষর দিয়ে শুরু। আমি তখন তরকারিতে হলুদগুঁড়ো দিচ্ছিলাম, বলে কি হলুদের মধ্যে কী কী রাসায়নিক উপাদান আছে বলো তো মা।সোমা কাতর গলায় অনুযোগ করে বললেন, তুমি বলো, এসব আমি কখনও বলতে পারি?

পুরন্দর সিগারেট খাচ্ছিলেন। তাতে হিংস্রভাবে এক লম্বা টান মেরে বললেন, বিকাশ বর্ধন বলেছিলেন, ঠিক তিনদিন এর এফেক্ট থাকবে। তিনদিন শেষ হতে আর কত ঘণ্টা বাকি আছে বলো তো?

সোমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, প্রায় সাঁইতিরিশ ঘণ্টা!

সাঁইতিরিশ ঘণ্টা! সাঁইতিরিশ ঘণ্টা বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধির এফেক্ট ঠিকমতো সহ্য করতে পারলে হয়! ভাবলেন পুরন্দর।

.

ব্যাপারটা যে ঝুনুর পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা পরদিন ওর অসহায় অবস্থা দেখেই বোঝা গেল। ও মাকে এসে অভিযোগ জানাল, বিকুনের সঙ্গে এক ঘরে বসে ও আর পড়বে না। বিকুন প্রায় মিনিটে মিনিটে ওকে থামিয়ে দিয়ে কীসব উলটোপালটা বোঝাচ্ছে।

সোমা ঝুনুকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঝুনুর তখন শান্ত হওয়ার মতো মনের অবস্থা আর নেই। ও প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, সব তো মনে নেই…তবুও ওর যে কটা প্রশ্ন মনে আছে শোনো। ওডোমিটার কাকে বলে? ইংল্যান্ডের কোন রাজা ইংরেজি বলতে পারতেন না। জেরান্টোলজিস্টরা কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন? মোটরগাড়ির চাকায় খাঁজ কাটা থাকে কেন? বাংলাভাষায় কোন তিনটে অক্ষরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি? ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে বিজ্ঞানী স্টিফেন কী যেন…।

সোমা সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেললেন। বললেন, এ কী বিপদে পড়লাম বল তো! এ কী সর্বনাশ হল আমাদের!

ঝুনু হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল, আর সর্বনাশ! অপর্ণাদি বলেছেন বিকুন সামনে বসে থাকলে উনি আমাকে আর পড়াবেন না।

অপর্ণাদি ঝুনুর প্রাইভেট টিউটর। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। প্রায় তিনবছর ধরে ঝুনুকে পড়িয়ে আসছেন।

সোমা কান্না থামিয়ে চোখ বড় বড় করে জিগ্যেস করলেন, সে কী! অপর্ণাদিকে বিকুন আবার কী করেছে?

কী আবার, ওই আই. কিউ.-র ওভারডোজ! বিরক্তভাবে বলল ঝুনু।

সোমা দুশ্চিন্তায় চোখ বুজে ফেললেন। বোধহয় ভগবানের নাম-টাম নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সত্যি, শেষ পর্যন্ত কী যে হবে কে জানে! ছেলেটা এ দু-দিনে একটাও ছবি আঁকতে বসেনি, এক লাইনও কবিতা আওড়ায়নি। বারান্দায় একটিবারও যায়নি গাছপালা বা পাখি দেখতে। তা ছাড়া, বিকেলে আজ আর খেলতে বেরোয়নি। কাল সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর গলায় মাকে বলেছে, আমি আর টিটো, তাতন, চুনির সঙ্গে খেলব না। ওরা আমার সঙ্গে খেলতে চাইছে না।

সোমা ব্যাপারটা খানিক যেন আঁচ করতে পারলেন। তবু জানতে চাইলেন, সে কী রে, কেন?

বিকুন গজগজ করতে করতে উত্তর দিল, কে জানে কেন! আমি কাল বল খেলার সময় ওদের বারনুলির থিয়োরেম আর ম্যাগনাস এফেক্টের কথা জিগ্যেস করেছিলাম। তাতে ওরা কেমন ভয় পেয়ে গিয়ে আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল।

সোমা অবাক হলেন না। কারণ আজ প্রায় একই কারণে বিকুনের স্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই ফোন করেছিলেন পুরন্দরের অফিসে। ফোন করে তিনি বলেছিলেন, আপনার ছেলের মাথায় বোধহয় সামান্য কিছু প্রবলেম হয়েছে। সেটা সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওকে স্কুলে পাঠাবেন না। মাস্টারমশাইরা কেন জানি না খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

সোমা বেচারা ঝুনুকে একবার দেখলেন, তারপর আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ডক্টর বর্ধনের হিসেবমতো এখনও প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা বাকি।

চোদ্দো ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা বিকুন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সেটুকু সময়ই যা নিশ্চিন্ত! বাকি সময়টা পুরন্দর-সোমা বেশ ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছেন। ছেলেকে আশেপাশে দেখতে পেলেই পুরন্দর হয় বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছেন নয়তো সটকে পড়েছেন রাস্তায়। আর সোমা কাজের ছুতো করে সারাক্ষণ এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। ঝুনু বিজ্ঞ ভাইয়ের কবল থেকে বাঁচতে বইপত্র নিয়ে চলে গেছে অরুণাদের বাড়ি।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিকুনকে ঘিরে জড়ো হল সবাই। ও তখন একমনে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে। তখনকার মতো ওরা সরে গেলেও ঘুরে-ফিরে নজর রাখতে লাগল বিকুনের ওপরে। একটু পরেই দেখা গেল বিকুন ইংরেজি কাগজের ক্রসওয়ার্ডটা চটপট সভ করছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই বিকুন মুখ তুলে বাবা-মা-দিদিকে একবার সামান্য অবাক চোখে দেখল, তারপর আবার মন দিল শব্দছকের দিকে।

পুরন্দর আজ অফিস কামাই করেছেন। ঝুনুও কলেজে যায়নি। বিকাশ বর্ধনের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আজ বারোটা নাগাদ তার অভিনব চিকিৎসার এফেক্ট শেষ হওয়ার কথা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে পুরন্দর বিকুনের কাছে হাজির থাকতে চেয়েছেন। কে জানে, নতুন করে আবার কোনও বিপত্তি হবে কি না! ঝুনুও একই আগ্রহে ক্লাস ডুব মেরেছে। আর সোমা বারবার তাকাচ্ছেন দেওয়াল ঘড়ির দিকে। সময়টা ঠিক কখন?

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘটনাটা ঘটল। শব্দছকের শেষ শব্দটা খুঁজতে গিয়ে আটকে গেল বিকুন। ওর দুচোখে কেমন এক শূন্যদৃষ্টি। একটা হাত এলোমেলোভাবে মাথায় বোলাচ্ছে। ওর মুখ থেকে উঃ, আঃ, ইশ ইত্যাদি টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছে থেকে-থেকে।

পুরন্দর অতি উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, কীরে, লাস্ট শব্দটা পারছিস না?

বিকুন কেমন বিমূঢ় গলায় জবাব দিল, না। দেখো না, শব্দটা একেবারে মাথায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু ফস্ করে কী যে একটা ওলটপালট হয়ে গেল…।

পুরন্দর খুশির এক চিৎকার করে সোমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একছুটে ওর অঙ্ক বইটা নিয়ে আসি। ওটা দিয়েই ফাইনাল টেস্ট করব...।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুরন্দর ঘর থেকে উধাও। আর সোমা বিকুনের কাছটিতে এসে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ঝুনু তখনও অবাক চোখে ভাইকে দেখছে।

বলতে গেলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই পুরন্দর সেই অঙ্ক বই নিয়ে বিকুনের সামনে এসে হাজির, এবং চোখের পলকে আয়-ব্যয়ের সেই সহজ অঙ্কটি মেলে ধরেছেন ছেলের সামনে।

বল তো! এই সহজ অঙ্কটা মুখে-মুখে বুঝিয়ে দে তো আমায়।

বিকুন গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে অঙ্কটা রিডিং পড়ল। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মন্তব্য করল, অঙ্কটায় ভুল আছে, বাবা। প্রতি মাসে কখনও সমান টাকা খরচ হতে পারে না। বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই!

আর যায় কোথায়! পুরন্দর হাত-পা শূন্যে ছুঁড়ে পাক্কা দু-হাত লাফিয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, হিপ হিপ হুররে! সোমা, দ্যাখো, দ্যাখো, বিকুন আবার অঙ্কে কাঁচা হয়ে গেছে। ওঃ, বাঁচা গেল!

সোমা ছেলেকে একেবারে জাপটে ধরলেন। ওঁর চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, বুঝলে, আমার বোকাসোকা সুন্দর ছেলেটাই অনেক ভালো। ওর মুখটা কী মিষ্টি! কী সুন্দর আঁকতে পারে ও! আর আবৃত্তিতে তো একেবারে চ্যাম্পিয়ান! আমার আর বুদ্ধিমান ছেলের দরকার নেই গো!

ঝুনু বিকুনের ছোট্ট মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নরম গলায় বলল, মা, যা স্বাভাবিক তাকে কখনও চাপ দিয়ে বোধহয় পালটাতে নেই। পালটালে তার ফল ভালো হয় না।

পুরন্দর হেসে বললেন, এইজন্যেই কথায় বলে, খোদার ওপর খোদকারি করতে নেই। আমি যাই, যতই বেলা হোক, এককেজি মুরগির মাংস নিয়ে আসি। বিকুনের অনারে আজকের স্পেশাল মেনু কষা মাংস আর পরোটা উইথ জলপাইয়ের চাটনি। ঝুনু, আজ তুই মায়ের সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাবি।

বাজারের থলে হাতে বেরোনোর সময় সোমার কানের কাছে মুখ এনে পুরন্দর চাপাগলায় বললেন, ভাগ্যিস হরিপদ তলাপাত্রের কথায় বিকুনের বুদ্ধিটা ফাইনাল ঢালাই করিনি! তা হলে এক্ষুনি হয়তো ছেলেটা আমাকে মুরগির মাংসের কেমিক্যাল কম্পোজিশন জিগ্যেস করে বসত।

স্বামীর কথায় সোমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

দুপুরের রোদ তখন জানলায় খেলা করছে।

# সাত ঋতুর জীবন

**সাত ঋতুর জীবন**

**০১. এসো, জলধারা এসো**

আজ সকাল থেকেই দিনটা শ্রাবণে শ্রাবণ।

তাই যতই সময় গড়াতে লাগল আদিত্যর মন খারাপ ততই বাড়তে লাগল। অথচ মন খারাপ হওয়ার তেমন কোনও কারণ নেই। গতকাল রাতে ওর বেশ ভালোই ঘুম হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে অনুরাধাকে স্বপ্ন দেখেছে। অবশ্য স্বপ্নের অনেকক্ষণ বাস্তবের নাকি কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। কিন্তু যা-ই হোক, ওকে স্বপ্নে দেখতে আদিত্যর ভালোই লাগছিল। অনুরাধার কথা ভাবলেই ওর মন ভালো হয়ে যায়। আদিত্য ওকে বলে মন-ভালোকরা মেয়ে।

তারপর ঘুম ভাঙতেই মায়ের আদেশে ছাতা মাথায় দিয়ে বাজারে দৌড়োনো।

বাজার করার ব্যাপারটা সাংঘাতিক বিরক্তিকর। অনুরাধাকে ও এ-কথা বহুবার বলেছে। অনুরাধা অবাক হয়ে বলেছে, সে আবার কী! বাজার না করলে আমরা খাব কী!

তুমি কাছে থাকলে আমার খাওয়ার কোনও প্রবলেম হবে না। আদিত্য হেসে বলেছে, তুমি তোমার ব্যাপারটা ভাবো।

অনুরাধা মুখ গম্ভীর করে বলেছে, হুম্। বিয়ের পর আমাদের দেখছি অনেক ঝামেলা হবে। দু-চার বছর পর সেপারেশান না হয়ে যায়!

সে সেপারেশান হয় তোক গে। শুধু বাজার করতে পারব না, আর তোমাকে ছাড়তে পারব না।

অনুরাধা চোখ কপালে তুলে বলেছে, তার মানে!

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে আপনমনেই হেসে ফেলল আদিত্য। বৃষ্টির তেজ বাড়ছিল, কিন্তু ওর মনটা ধীরে-ধীরে ভালো হতে শুরু করল।

ঠিক দশটার স্নান করতে ঢুকল আদিত্য। এগারোটার মধ্যে সায়েন্স কলেজে পৌঁছোতে হবে। রিসার্চের কাজে ঢিলে দিলে চলবে না। পি-এইচ. ডি.-টা তাড়াতাড়ি দরকার। তার ওপর ওর গাইড বড় খিটখিটে লোক। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু জানে না মানুষটা।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের কল শেষ প্যাঁচ পর্যন্ত খুলে দিয়ে আদিত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ও আর অনুরাধা সিনেমা দেখে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজছে।

বাইরে মেঘ ডাকছিল। ফলে শাওয়ারের নীচে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে স্বপ্নটাকে বাস্তবের অনেক কাছাকাছি মনে হচ্ছিল।

ঠিক তখনই একটা চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেলে ও। কে যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

চমকে উঠে চোখ খুলল আদিত্য।

অবাক হয়ে দেখল, বাথরুমের এককোণে হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসে একজন বৃদ্ধ কাঁদছে। তার ফরসা পিঠ স্থির কম্পাঙ্কে ফুলে-ফুলে উঠছে। চামড়ার ভাঁজগুলো কখনও আবছা হচ্ছে, কখনও গম্ভীর হচ্ছে।

শাওয়ারের জলধারা আদিত্যর ওপরে অঝোরে ঝরে পড়ছিল। সে কথা ভুলে গিয়ে আদিত্য শীর্ণ ফরসা বৃদ্ধকে দেখতে লাগল। শাওয়ারের জলের ফোঁটা ছিটকে পড়ছে তার মাথায়, পিঠে। অথচ সেদিকে তার কোনও খেয়ালই নেই।

কে আপনি? এখানে বসে এভাবে কাঁদছেন কেন?

আদিত্যর প্রশ্নে চোখ তুলে তাকাল বৃদ্ধ। প্রশান্ত গভীর চোখ। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

বৃদ্ধ বাথরুমের দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। পরনে শুধু একটা ধুতি–তার বেশ খানিকটা ভিজে গেছে। বাথরুমের আয়নায় বৃদ্ধের মুখের পাশটা দেখতে পাচ্ছিল আদিত্য। তার ডান কানের নীচে একটা লালচে তিল।

এভাবে কাঁদছেন কেন আপনি? আদিত্য আবার জিগ্যেস করল।

এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের ঠোঁটে। তাতে কান্নাটা আরও ব্যথাতুর হয়ে উঠল। ছোট্ট করে কেশে বৃদ্ধ বলল খসখসে গলায়, কাঁদছি তোমার কথা ভেবে।

আদিত্য কিছুক্ষণ কোনও কথা খুঁজে পেল না।

আমার কথা ভেবে!

হ্যাঁ, কী কষ্টের তোমার জীবন।

কোথায় কষ্ট! কীসের কষ্ট? অনুরাধার কথা ভাবল আদিত্য। ওর মন ভালো হয়ে গেল নতুন করে।

বৃদ্ধ কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। তারপর বলল, এখন তো কষ্ট টের পাওয়ার বয়েস নয়, বাবু। টের পাবে আমার বয়েসে পৌঁছেলে।

আদিত্য বৃদ্ধের কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। কে এই লোকটা? কোথা থেকেই বা ঢুকে পড়ল এই কলঘরে!

আমার জীবন নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আদিত্যর গলা একটু রুক্ষই শোনাল নিজের কানে।

হাসল বৃদ্ধ। দড়ির মতো শিরা বের করা হাত নেড়ে বলল, তোমার জীবন আর আমার জীবনে কোনও তফাত নেই গো–শুধু সময়ের তফাত। তুমি বর্তমান–আর আমি ভবিষ্যৎ। তোমার জীবনের কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না। নাকি আমার জীবনের কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না?

আমি নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছি, ভাবল আদিত্য। সন্ধেবেলা যদি ও অনুরাধাকে এই ব্যাপারটা বলে তা হলে আর দেখতে হচ্ছে না। লেগ পুল করে করে ওকে একেবারে শেষ করে দেবে।

আপনাকে, আমি আগে কখনও দেখেনি– আদিত্য যেন আপনমনেই মন্তব্য করল।

দ্যাখোনি কারণ আমি দেখা দিইনি।

আজ তা হলে হঠাৎ এলেন কেন?

তোমাকে সাবধান করতে। তোমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে। অথচ তুমি কিছুদিন ধরেই দারুণ সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখছ–।

স্বপ্ন দেখা কি অন্যায়?

মোটেই না। আমরা স্বপ্ন দেখি সেই সব জিনিসের, যা সত্যি হলেও হতে পারে। পুরোপুরি যা অবাস্তব বা অলীক সেগুলো আমরা স্বপ্ন দেখি না, কারণ সেগুলো যে আগাপস্তলা স্বপ্ন তা আমরা সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারি। যেমন, তুমি নিশ্চয়ই এখন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার স্বপ্ন দ্যাখো না?

না, দেখি না, কিন্তু তাই বলে মানুষ কি স্বপ্ন দেখবে না!

তা কেন, তা কেন– হাত নেড়ে হাসল বৃদ্ধ, বলল, স্বপ্ন দেখার অসুখ কি সহজে যেতে চায়! কিন্তু তুমি সাবধানে স্বপ্ন দেখো–সে কথাই আমি বলতে এসেছি। তুমি যদি একটু কম স্বপ্ন দ্যাখো, তা হলে আমার কষ্ট একটু কম হয়, আমাকে একটু কম চোখের জল ফেলতে হয়।

বৃদ্ধের কথায় আদিত্য বেশ অবাক হচ্ছিল। একটা অদ্ভুত ঘোর লাগছিল ওর মনে। শাওয়ারের তলায় ভিজতে ভিজতেই ও বলল, আমি তো খুব বেশি কিছু চাই না–শুধু সুখী হতে চাই।

ওর কথা শুনে হাসল বৃদ্ধ। হাসতে-হাসতে কাশি পেয়ে গেল তার। বেশ কয়েকবার কেশে লাল হয়ে যাওয়া চোখ-মুখ মুছে নিয়ে সে বলল, বেশ বলেছ। সুখী হতে চাই। এ যেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মতোই সহজ-সরল ব্যাপার।

ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার কাকে বলে তুমি জানো। তাই সেটা হতে চাওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু তুমি কি জানো, সুখী কাকে বলে?

আদিত্য কোনও জবাব দিতে পারল না।

তখন হেসে বৃদ্ধ বলল, যা তুমি জানো না, চেনো না, তা কি কখনও হওয়া যায়! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল । আমি জানি, তোমার খুব ইচ্ছে তোমার দেখা সুন্দর সুন্দর স্বপ্নগুলো সত্যি হয়ে উঠুক। কিন্তু বিশ্বাস করো, সেগুলো সত্যি হলেই দেখবে ব্যাপারটা আর ততটা সুন্দর লাগছে না।

আপনি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? প্রতিবাদের ঢঙে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল আদিত্য, আমি বেশ ভালো আছি। আমি ভালো থাকতে চাই। দরকার হয় জোর করে ভালো থাকব। কিছুতেই মন খারাপ করব না। আমার ভেতরে-বাইরে যত দুঃখ কষ্টই থাক, আমি সেগুলোকে ভুলে থাকব ভালো থাকব।

তোমার মনের জোর আছে। অন্তত তুমি মনের জোর দেখাতে চেষ্টা করছ। ভালো। কিন্তু অনুরাধার সঙ্গে যদি পর-পর তিনদিন দেখা না হয় তুমি ভালো থাকতে পারবে? তুমি পারবে একটানা তিনদিন ওকে ফোন না করে থাকতে?

অনুরাধা! অনুরাধার কথা লোকটা জানল কেমন করে?

সন্দেহের চোখে বৃদ্ধকে দেখল আদিত্য। জিগ্যেস করল, আপনি কি অনুরাধার কেউ হন?

না, তুমি যেরকম ভাবছ সেরকম কেউ না– একটু হাসল বৃদ্ধ, বলল আসলে তুমি একটু ভুল করছ। তোমাকে তো প্রথমেই বললাম, তোমাতে আমাতে কোনও তফাত নেই–শুধু সময়ের তফাত ছাড়া…তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দাওনি।

অনুরাধাকে তিনদিন না দেখে থাকা! তিনদিন ফোন না করে থাকা! ওর সঙ্গে একদিন দেখা না হলেই আদিত্যর বুকের ভেতরটা কেমন করে। পরপর দুদিন ফোন না করতে পারলে ওর শ্বাসকষ্ট হয়। কিন্তু এই দুর্বলতার কথা বৃদ্ধকে বলা ঠিক হবে না।

তাই আদিত্য বলল, হ্যাঁ, পারব।

একথা শুনে বৃদ্ধের মুখ আবেগে ভেসে গেল। সে বলল, বাঃ, খুব ভালো। আমার কষ্ট তা হলে অনেক কমবে। এখন যে অনুরাধা তোমার কাছে থাকলেই তোমার ভালো লাগে, এমন দিন হয়তো আসতে পারে যখন ও কাছে থাকলেই তুমি বিরক্ত হবে।

শাওয়ারের বৃষ্টির মধ্যেই হো-হো করে হেসে উঠল আদিত্য। কিছুক্ষণ পর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, আপনার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। আর-একটু আগে আপনিই আমাকে স্বপ্ন দেখতে বারণ করছিলেন!

বিষণ্ণ গলায় বৃদ্ধ বলল, আমি তো চাই তুমি সবসময় ভালো থাকো। তুমি ঠিক যেমনটা চাও তোমার জীবনটা ঠিক সেইরকম হোক। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত–এই ছটা ঋতু পরপর নিয়মমাফিক বয়ে যাক তোমার জীবনে। কিন্তু... একটু থেমে বৃদ্ধ নীচু গলায় বলল, কিন্তু তা তো হয় না! কারও জীবনে বর্ষা খুব দীর্ঘ হয়ে যায়, কারও জীবনে শীত। আবার কারও জীবনে বসন্ত বেশিক্ষণ থেকে যায়। আসলে ব্যাপারটা কী জানো! একটা পয়সা নিতে হলে তার দুটো পিঠই নিতে হয়। এক পিঠ নেওয়া যায় না। তাই শুধু বসন্ত দিয়ে জীবন তৈরি করা যায় না– তার সঙ্গে অল্পবিস্তর শীত অথবা বর্ষা থেকে যায়। এদের তুমি বাদ দিতে পারো না। তুমি ভাবছ তোমার জীবনে বসন্ত খুব বেশি। অথচ চল্লিশ বছর পর আমার জায়গায় পৌঁছেলে তুমি বুঝতে পারবে, তোমার জীবনে শীতও কিছু কম ছিল না। অবশ্য সেই শীত তুমি এখন টের পাচ্ছ না– কারণ, শীত এখনও তোমাকে জানান দেওয়ার কাজটা শুরু করেনি। কিন্তু আমি তো জানি!

বৃদ্ধের চোখে বোধহয় জল এসে গিয়েছিল। হাত দিয়ে সেটা মোছার চেষ্টা করে সে আবার বিড়বিড় করতে শুরু করল, তারপর..শীতের পর...বাকি জীবনটা চলে যাবে বর্ষার দখলে। তখন তোমার এক চোখে থাকবে আষাঢ়, অন্য চোখে শ্রাবণ। ঠিক আজকের দিনটার মতন। তাই তোমাকে আজ সাবধান করতে এসেছি। শুধু বসন্ত দিয়ে জীবন তৈরি করা যায় না।

কথা শেষ করে বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার বুকের খাঁচাটা হাপরের মতো ওঠা নামা করছিল।

আদিত্য কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। সাঁতরে ভেসে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুতেই যেন পেরে উঠছিল না।

বৃদ্ধ আবার কাঁদতে শুরু করেছিল। কান্না-ভাঙা গলায় আর্তস্বরে সে বলল, আজ আমি যাই। তুমি একটু সাবধানে থেকো। এই বসন্তটাকে যতদিন পারো আঁকড়ে ধরে রেখো।

কী করে ধরে রাখব? উদ্ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করল আদিত্য।

তুমি অনুরাধাকে আঁকড়ে ধরে রেখো। তোমার মা-কে আঁকড়ে ধরে রেখো। এটা মনে রেখো, হাতের মুঠো আলগা হলেই ওরা সরে যাবে আর বসন্তও তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে। তারপর…তারপর..শীত আসবে। আর বর্ষা তার পেছন থেকে উঁকি দেবে…।

আদিত্য কোনও কথা বলতে পারল না। ও ভাবছিল, অতীত বর্তমান তৈরি করে। আর বর্তমান থেকেই তৈরি হয় ভবিষ্যৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তিনটের মধ্যে এত তফাত কেন!

ভাবতে-ভাবতে আদিত্য আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখল বৃদ্ধ আর নেই। ও একা-একা শাওয়ারে নীচে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

আদিত্যর স্নান শেষ হতে অনেক সময় লাগল। ও মনে-মনে ঠিক করল, মাকে আর অনুরাধাকে ও আঁকড়ে ধরে রাখবে। ওরা ছাড়া তো ওর জীবনে আর কেউ নেই!

.

## ০২. এই ভালোবাসা অকারণ

হ্যালো, অনুরাধা?

হ্যাঁ, বলছি।

এখন কী করছিলে?

মাম্মির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

কী গল্প?

সেরকম কিছু না–টিডবিটস–।

জানো, আজ একটা ফ্যানট্যাসটিক ব্যাপার হয়েছে।

কোথায়?

বাথরুমে।

ওরে বাবা! না, না, আমি শুনতে চাই না!

না, না–তুমি যেরকম ভাবছ নাথিং লাইক দ্যাট।

কে জানে! তোমার মুখে তো কিছু আটকায় না!

একটা ওল্ড ম্যান ঢুকে পড়েছিল বাথরুমে। আমি তখন শাওয়ারের নীচে।

তার মানে?

মানে আর কী! আমিও ভীষণ সারপ্রাইজড হয়ে গিয়েছিলাম। লোকটা হেভি উলটোপালটা কথা বলছিল। আমার জন্য কাঁদছিল–

ইজ নট আ জোক?

না, অনুরাধা, না। লোকটা দেখলাম আমার ব্যাপার-ট্যাপার সবই জানে। তোমার কথা বলছিল, মায়ের কথা বলছিল। বলছিল এই রিলেশানগুলোকে হাত মুঠো করে আঁকড়ে ধরে রাখতে কিছুতেই যেন মুঠো আলগা না হয়।

লোকটা কাঁদছিল কেন?

ঠিক জানি না। বলছিল যে, আমার জন্যে কাঁদছে। তারপর…তারপর ছটা ঋতুর কথা বলছিল। বলছিল, এখন বসন্ত চলছে। তারপর শীত আসতে পারে… তারপর বর্ষা। আমি লোকটার কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারিনি, তবে লোকটা আমার মুড অফ করে দিয়ে গেছে।…লোকটা তোমার কথাও বলছিল…।

কী বলছিল আমার কথা?

বলছিল, তোমাকে তিনদিন না দেখে আমি থাকতে পারব কি না। একটানা তিনদিন ফোন করে থাকতে পারব কি না!

তুমি কী বললে?

বললাম, পারব।

তা হলে এখন ফোন করেছ কেন?

তুমি কি চিরকাল ছেলেমানুষ থেকে যাবে? মানুষের কিছু-কিছু উইকনেস গোপন রাখা দরকার। তোমার কাছে গোপন করি না, কারণ, তোমাকে আমি আলাদা বলে ভাবি না। কিন্তু লোকটা আমার কে যে ওকে সব বলতে যাব!

ওই লোকটা কে তুমি বুঝতে পারোনি?

না। তা ছাড়া তুমি তো জানো, অনেক কিছুই আমি ঠিকমতো বুঝতে পারি না।

যেমন?

যেমন, তোমাকে আমি কেন এত ভালোবাসি জানি না। কখনও এর কোনও কারণ খুঁজে পাই না। তাই মনে-মনে বলি ও সম্পূর্ণ অকারণে তোমাকে আমি এত ভালোবাসি। এতে আমার খুব আনন্দ হয়।

কেন?

ভালোবাসার কোনও কারণ খুঁজে পেলেই তা থেকে স্বার্থের গন্ধ বেরোতে চায়। মা-কে যে আমি ভালোবাসি তারও সেরকম কোনও কারণ নেই।...তোমার ভালোবাসার কি কোনও কারণ আছে, অনুরাধা?

আগে কখনও এভাবে ভাবিনি। তবে মনে হচ্ছে, আমারটাও ঠিক তাই সম্পূর্ণ অকারণে।

তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছু করার নেই।

জানো, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের কাছে আমি আপাদমস্তক ঋণী–?

হোয়াট? আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল!

হ্যাঁ–টেলিফোন আবিষ্কার করার জন্যে। নইলে তোমাকে রোজ ফোন করতাম কী করে!

ধন্য ইমাজিনেশান!

ইমাজিনেশান নিয়েই তো আমি বেঁচে আছি, অনুরাধা। ছোট-বড় স্পষ্ট-অস্পষ্ট কতকগুলো স্বপ্ন। আলটপকা বুড়োটা স্বপ্ন নিয়েও অনেক কথা বলছিল। বলছিল, সুন্দর স্বপ্ন যখন সত্যি হয়ে ওঠে তখন নাকি আর ততটা সুন্দর থাকে না।

সরি, একমত হতে পারলাম না।

জানো, আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা কেমন মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে। যদি শুধু স্বপ্ন নিয়েই আমাকে বাঁচতে হয়, তা হলে যে-স্বপ্ন কোনওদিন সত্যি হতে পারে না সেরকম অলীক স্বপ্ন নিয়েই বাঁচব।

এসব কী বলছ!

ওই লোকটার কথা মনে পড়লেই আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একা-একা কেমন দিশেহারা লাগছে। সেইজন্যেই তোমাকে আরও বেশি করে দেখতে ইচ্ছে করছে।...আমি এখন চলে যাব তোমাদের বাড়ি? জানলা দিয়ে শুধু তোমাকে একটিবার উঁকি মেরে দেখব, তারপর ফিরে আসব–

পাগল নাকি!

পাগল তো দু-বছর আগেই হয়েছি। দ্বিতীয়বার কি আর পাগল হওয়া যায়! একা-একা আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে...আমার কিছু ভাল্লাগছে না...।

মাম্মি তোমার রিসার্চের প্রগ্রেস জানতে চাইছিল।...এই তো, মাম্মি আমার সামনে বসে আছে।

আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না...তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে...।

মাম্মিকে বলছি কাল সায়েন্স কলেজে গিয়ে তোমার রিসার্চের প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে আসব।

একা-একা আমি আর পারছি না…।

রিসার্চ নিয়ে এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই। কাল তো তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমাকে বাঁচাও, অনুরাধা…।

এত আপসেট হলে আমার খারাপ লাগে। প্লিজ।

কাল আসবে তো?

বললাম তো, যাব। এখন একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করে দেখি।

রাখছি তা হলে…।

হ্যাঁ—

টা-টা, লাভ য়্যু…।

.

## ০৩. জড়িয়ে ধরো, মাতৃস্নেহলতা

বারান্দায় বসে রাতের আকাশ দেখছিল আদিত্য। বিধাতা বীজধান ছড়ানোর মতো নক্ষত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে। আর হতবাক সুন্দর চাঁদ নয়ন মেলে সেই অনুপম দৃশ্য দেখছে। কে বলবে আজ সারাটা দিন মেঘ-বৃষ্টির দখলে ছিল!

বারান্দায় লাগোয়া ঘর অন্ধকার। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা খাটে মা শুয়ে আছে। খাটের মাথার কাছে রাখা ছোট টেবিলে টেপরেকর্ডার চলছে।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায় যায় মা– পূর্ণ-আশা, পূর্ণ-সাধ কোনও মানুষ কখনও দেখেনি আদিত্য।

প্রায় তেরো বছর আগে বাবা যখন ক্যানসারে মারা যান তখন তার সাধ অপূর্ণ ছিল। পরিণাম নিশ্চিত জেনে বাবা অপারেশনে রাজি হননি। ভাঙা গলায় দিনরাত শুধু অস্পষ্ট স্বরে বলতেন, তোমাদের ছেড়ে যেতে মন চায় না। কিন্তু কী যে করি…নিয়তির টান…।

আদিত্য মেঝেতে বসে বই পড়ত, আর বাবা কখন যেন নিঃশব্দে ওর কাছটিতে এসে দাঁড়াতেন। তারপর উবু হয়ে বসে ওর মাথায় হাত বোলাতেন।

দিতু, আমার সময় হয়ে এল রে…।

আদিত্য অবাক হয়ে দেখত বয়স্ক পুরুষমানুষটা নিলজ্জের মতো কাঁদছে।

অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না বুক ফেটে ভেঙে যায় মা / সকলি ফুরায়ে যায় মা…।

শ্যামাসংগীত মায়ের খুব প্রিয়। প্রায়ই রাতে ঘর অন্ধকার করে মা গান শোনে। মন ভেঙে গিয়েছিল তেরো বছর আগেই–তারপর, এই তেরো বছরে, শরীরটাও ভেঙে গেছে। কিন্তু তাই বলে আদিত্যকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় কখনও এতটুকু টান পড়েনি। প্রতিমুহূর্তেই আদিত্য শেকড়টা টের পায়। এখনও পাচ্ছিল।

বারান্দা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকল আদিত্য।

দেখল, মা বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে আছে। জানলা দিয়ে ছিটকে আসা কয়েক টুকরো আলোয় মাকে ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

মা, তোমার মনে পড়ে ছোটবেলার দিনগুলো? উনুনে বসানো কড়াইয়ে মশলার আঁঝ, তোমার ঘামতেল মুখ, খেলনা মোটরগাড়ি ভেঙে গিয়ে আমার কান্না, বাবা অফিস বেরোবেন, তোমার ছুটোছুটি, পাশের বাড়ির ছুটকির মা এসে তোমাকে ডাকাডাকি, ছুটকির কান বেঁধাতে হবে তোমাকে, আমাকে স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, রাতে কত গল্প শোনানো…। এই করে করে এক ক্লাস ডিঙিয়ে আর এক ক্লাসে, বড় হয়ে ওঠা, কত গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত পার করে দেওয়া। ঋতুরা আসা-যাওয়া করেছে। ছায়াছবির মতো।

আদিত্যর মনে পড়ল, এক শীতের রাতে তিন-চার জ্বরে কপালে মায়ের ঠান্ডা হাত। সেই স্পর্শ আজও টের পায় ও।

এইভাবে তিলতিল করে গড়ে উঠেছে সম্পর্ক, আর সবকিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষণটিও এগিয়ে এসেছে কাছাকাছি। কিন্তু তবুও তো মানুষ সম্পর্ক আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়!

আদিত্য হাত মুঠো করল প্রাণপণ শক্তি দিয়ে। আধো-আঁধারিতে ওর মুঠো করা হাত ঘিরে এক আকুল মায়া জড়িয়ে ছিল। ভালোবাসা দিয়ে এই সম্পর্কও আঁকড়ে ধরে রাখবেকিছুতেই আঁকড়ে ধরা মুঠো খুলবে না–যতই গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত আসুক। ভালোবাসা এইসব ঋতুর চেয়ে কিছু কম নয়। ছটা ঋতুই মাত্র দু-মাস করে থাকে–যায়, আবার আসে। কিন্তু ভালোবাসার ঋতু কখনও যায় না–থেকে যায় চিরকাল।

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল…।

পূর্ণসাধ কোনও মানুষ আদিত্য কখনও দেখেনি, দেখতে চায় না। যে-জীবনে কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, তাকে জীবন বলতে ইচ্ছে করে না আদিত্যর। সামান্য মানুষ হিসেবে যৎসামান্য আকাঙ্ক্ষা বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখাটা কোনও পাপ নয়।

অন্ধকারে অন্ধকার ছবির মতো দাঁড়িয়ে আদিত্য তাই ভালোবাসার ঋতুর কথা ভাবছিল– আর ভাবছিল, যদি সেই আলটপকা বুড়ো আবার ওকে দেখা দেয়, তা হলে তাকে ও কেমন মুখের মতো জবাব দেবে।

# তোমার আসা চাই

**তোমার আসা চাই**

ঠিক এইভাবেই সিদ্ধার্থকে বলত নিনি। যেন জন্মদিনের পার্টিতে ওকে ইনভাইট করছে। বিয়ের আগে যখনই রাস্তাঘাটে, মেট্রো রেলের কাউন্টারের সামনে, কিংবা সিনেমা হলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত তখন এইভাবেই জোর দিয়ে বলত নিনি। অথচ ও নিজেই দেরি করে আসত–সবসময়। এ নিয়ে সিদ্ধার্থ কিছু বলতে গেলেই হাউমাউ করে বাধা দিয়ে বলত, মেয়েদের ওরকম একটু দেরি হয়। পরে আসব না তো কি আগে এসে ভোম্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব!

এখন অন্ধকারে বসে সেসব কথা মনে পড়ছিল আর চোখের কোণে জল আসছিল। আজ আসবে তো সিদ্ধার্থ? নাকি আসবে না?

ঘরের এককোণে ধূপ জ্বলছিল। অন্ধকারে উজ্জ্বল লাল ডগাগুলো গুনল নিনি। তেরোটা। সাগরিকা বলেছে, তেরোটা ধূপ জ্বালালে ভালো হবে। বেশ স্পিরিট-ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হবে।

নিনির সামনে গোলটেবিল। টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে একটা লম্বা মোমবাতি। একপায়ে দাঁড়িয়ে জ্বলছে। সেই মলিন আলোয় কালচে টেবিলের কাঠ অল্পসল্প চকচক করছিল। সেখানে একটা সাদা কাগজ পাতা, তার ওপরে ধ্যাবড়া করে খানিকটা সিঁদুর মাখানো। আর সেই সিঁদুরের ওপরে ত্রিভুজের চেহারায় সাজানো তিনটে কড়ি। কড়ির গায়ে মোমের আলো হাইলাইট তৈরি করছে।

নিনির বাঁ-পাশ থেকে সঙ্গীতা ফিশফিশ করে বলল, অ্যাই, নড়িস না। কনসেনট্রেট কর। একমনে সিদ্ধার্থর কথা ভাব…।

টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে ওরা চারজন।

নিনি, সাগরিকা, সঙ্গীতা আর সন্দীপন।

আজকের মেইন আইডিয়াটা সন্দীপনের। তাতে ওর বউ সঙ্গীতা, আর নিনির বেস্ট ফ্রেন্ড সাগরিকা উৎসাহের ইন্ধন জুগিয়েছে। নিনির একেবারেই মত ছিল না। কিন্তু তিনজনের চাপের কাছে ও শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে।

সিদ্ধার্থ অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে আজ কতদিন? কুড়ি পেরিয়ে একুশদিন।

চারতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। রাত তখন বড়জোর এগারোটা। নিনিও ছাদে ছিল। আকাশের তারা আর উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনের আলো দেখছিল। একইসঙ্গে ছুটে আসা বাতাসের আদর উপভোগ করছিল।

হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! একটা আচমকা আর্ত চিৎকার : নিনি–।

চমকে ঘুরে তাকিয়েছিল। অন্ধকার পাঁচিলের ওপরে সিদ্ধার্থের সিলুয়েট আর দেখা যাচ্ছে। না। সিগারেটের আগুনের বিন্দুটাও আর নেই।

ছুটে পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল নিনি। অনেক নীচে, গুলি খাওয়া বেলে হাঁসের মতো, এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে সিদ্ধার্থ।

নিনির মাথাটা কেমন পাক খেয়ে গিয়েছিল। শুধু মনে আছে, ছাদে লুটিয়ে পড়ার আগে ও আকাশের তারা দেখতে পেয়েছিল।

সেইদিন থেকে সংসারে নিনি একা হয়ে গেল। বাবা চলে গেছেন সেই কোন ছোটবেলায়। মা-ও চলে গেছেন চারবছর আগে। ভাই-বোন কেউ ছিল না। তাই শুধু সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ও বেঁচে ছিল।

অন্ধকারে একটা খসখস আওয়াজ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপনের চাপা গলা শোনা গেল, কেউ কি এসেছেন?

চাপা কাশির শব্দ শোনা গেল।

নিনির হাতের ওপরে সঙ্গীতার হাতের চাপ বেড়ে গেল। ডানদিকে বসা সাগরিকার শুধু হাতের চাপ বাড়ল না, হাতটা তিরতির করে কাঁপতে লাগল।

কেউ কি এসেছেন? আবার সন্দীপন।

কাপড়ে কাপড় ঘষার শব্দ হল। অচেনা একটা গলা অস্পষ্টভাবে বলে উঠল।

নিনি ভয় পেয়ে গেল। যদিও প্ল্যানচেট-ফ্যানচেটে ওর এতটুকুও বিশ্বাস নেই। সে কথা ও বারবার বলেছে। কিন্তু ওরা তিনজন শুনলে তো!

সন্দীপন একই প্রশ্ন তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার করল, কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ঘরের চতুর্দিকে তাকাল নিনি। মোমের আলোর পরিধি পেরিয়ে ঘরের অন্ধকার আনাচেকানাচে ওর সন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়াল। কোনও অস্বাভাবিক বাড়তি ছায়া কি নজরে পড়ছে?

সিদ্ধার্থর চলে যাওয়াটা খুব দুঃখের হলেও তার মধ্যে একটা সান্ত্বনার ছোঁয়া আছে। কয়েকদিন আগে ওকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে করতে সাগরিকা হঠাৎ বলে ফেলেছে, শোন, সিদ্ধার্থর ব্যাপারটা খুব স্যাড মানছি–বাট এটা তো ঠিক যে, এখন তুমি ব্যাপক বড়লোক। লাইফে সেফটির জন্যে টাকা একটা মেজর ফ্যাক্টর। সিদ্ধার্থর সবকিছু তো তুই-ই পাবি। যে যাওয়ার সে গেছে কিন্তু তোমার মুখের রুপোর চামচ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না…।

না, সাগরিকা কিছু ভুল বলেনি। সিদ্ধার্থর সাম্রাজ্য নেহাত ছোট ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর থেকে নিনির কোনও স্বপ্নকে আমল দেয়নি ও। ওর কাছে জীবন বলতে ভালো থাকা-খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, গাড়ি, বাড়ি, হইহুল্লোড়, ফুর্তিব্যস।

অথচ নিনির আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল, ছবি আঁকা শিখে বড় পেইন্টার হওয়ার সাধ ছিল। ও ভেবেছিল, আমেরিকায় গিয়ে এই সাধগুলো ও পূরণ করবে, কিন্তু হয়নি। সিদ্ধার্থ ওর ইচ্ছেগুলোয় সায় দেয়নি। বরং ওর পেইন্টার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কখনও-সখনও বাজে ঠাট্টা করেছে। ওর সঙ্গে এ নিয়ে তর্কাতর্কিও করেছে নিনি। তারপর তর্ক থেকে ঝগড়া।

কিন্তু শুধু এই সমস্যাটুকু ছাড়া সিদ্ধার্থর আর কোনও সমস্যা ছিল না। হি ওয়াজ আ গুড হাজব্যান্ড।

হঠাৎই ফিশফিশে গলায় কে যেন টেনে-টেনে উচ্চারণ করল, নি—নি–।

নিনির গায়ে কাঁটা দিল। এই প্রথম ওর মনে হল ও যেন প্রাণ খুলে সিদ্ধার্থকে বলতে পারছে না, তোমার আসা চাই! বরং যেন মনে হচ্ছে, এই অন্ধকার ঘরে ও যেন না আসে। ও যদি প্রেতলোকে এখন থেকে থাকে তা হলে সেখানেই থাক। কিন্তু সিদ্ধার্থ কি এখন নিনির কথা শুনবে? ও কি নিনির চিন্তা টের পাচ্ছে?

আবার পা টেনে চলার ঘষটানির শব্দ। এবং হালকা অস্পষ্ট গলায় কে যেন বলল, নিনি। নিনি–আমি এসেছি।

নিনির মনে হল, এই কাঁপা কাঁপা ফিশফিশে স্বর যেন অন্য কোনও হিমশীতল জগৎ থেকে ভেসে আসছে।

কিন্তু এ অসম্ভব! নিনি ভালো করেই জানে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। ওরকম যা-কিছু শোনা যায় সবই মনের ভুল–দেখা কিংবা শোনার ভুল। এখন ও যে কথাগুলো শুনছে সবই হ্যালুসিনেশন।

নিনি…নিনি..আমি..আমি এসেছি…।

সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র ভয়ের চিৎকার।

মেয়েলি গলায় ওদেরই কেউ চিৎকার করেছে। মনে হল, চিৎকারটা নিনির ডানদিক থেকে এল।

চিৎকারের তীব্রতায় নিনি আঁতকে উঠল। সন্দীপন হঠাৎই জোরালো গলায় বলল, কোনও ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। আমি আলো জ্বালছি…।

আলো জ্বলে উঠল।

সাগরিকা মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সঙ্গীতা আর সন্দীপন ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎই সন্দীপন দু-হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল, ও. কে. বাবা! সরি। সরি এভরিবডি, সরি। ওইসব ভূতের আওয়াজ আমি করেছি। আর নিনির নাম ধরে ফিশফিশ করে ভুতুড়ে কথাগুলো আমিই বলেছি। স্রেফ মজা করার জন্যে আর নিনিকে আওয়াজ দেওয়ার জন্যে। ও সবসময় বলে ভূত বলে কিছু নেই।

সাগরিকার মাথায় হাত বোলাল সন্দীপন: সাগরিকা, কাম ডাউন লেডি। আই সেইড আই অ্যাম সরি....।

নিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ ওর কেমন যেন দম আটকে আসছিল।

শেষ পর্যন্ত বহু তোয়াজ করে সাগরিকাকে শান্ত করা গেল। সন্দীপন মজা করে একথাও বলল, আচ্ছা, এবার চুপ কর–তোকে একটা এক্সট্রা-লার্জ ক্যাডবেরি খাওয়াব।

প্ল্যানচেট-পর্ব এভাবেই শেষ হল।

একটু পরে ওরা তিনজন চলে গেল। আড়াইহাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে নিনি এখন একা। গেস্ট বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ও গোলটেবিলটার দিকে তাকাল। নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতিটা একপায়ে দাঁড়িয়ে। ধূপকাঠিগুলো জ্বলে-জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। সিঁদুর মাখানো কাগজ আর কড়িগুলো এখন কত নিরীহ দেখাচ্ছে।

সন্দীপনটা বরাবরই একটু ফাজিল। প্র্যাকটিক্যাল জোক করে অন্যকে হেনস্থা করে। তবে মানুষটা ভালো। হয়তো নিনির মন ভালো করার জন্যই ও এরকম একটা ভয়ের নাটক করেছে।

গেস্ট বেডরুমের আলো নিভিয়ে দিল নিনি। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল। এখন ও কত একা! কিন্তু একইসঙ্গে কত স্বাধীন!

গুনগুন করে দু-লাইন গান গাইল নিনি। অতীত এখন অতীত। এখন ওকে তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। ওর ইচ্ছেগুলো এখন ইচ্ছেমতো ডানা মেলতে পারে।

হঠাৎই দরজায় নক করার শব্দ শুনতে পেল।

চমকে উঠল নিনি। আওয়াজ লক্ষ করে ফিরে তাকাল।

গেস্ট বেডরুমের দরজার ওপাশ থেকে কেউ আলতোভাবে নক করছে। ঠকঠক। ঠক ঠক।

নিনির নার্ভ মোটেই কমজোরি নয়। ও একটুও ভয় পেল না। উলটে বন্ধ দরজাটার খুব কাছে এগিয়ে গেল।

দরজাটা খুলবে না কি?

আবার নক করার শব্দ।

তারপর ফিশফিশে গলায় কেউ ডেকে উঠল, নিনি, আমি এসেছি।

সন্দীপন কি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মজা করছে?

অসম্ভব! কারণ, ওরা তিনজন অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। নিনি ওদের ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। তারপর নিজের হাতে দরজা লক করেছে। এতে কোনও ভুল নেই, ভ্রান্তি নেই।

আবার ডাকল সে, নিনি, দরজা…খোলো। আমি…আমি এসেছি…। যন্ত্রণায় কাতর একটা মানুষ হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস টেনে-টেনে কথা বলছে।

নিনি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি তো সবসময় বলতে, তোমার আসা চাই। তাই আমি এসেছি। দরজা খোলো, নিনি– তোমার সঙ্গে কথা আছে….। ।

নিনি একটু ভয় পেল এবার। উদভ্রান্ত চোখে চারপাশে তাকাল। কী করবে ভেবে পেল না।

নক করার শব্দ ক্রমশ জোরালো হতে লাগল। হতে-হতে সেটা ধাক্কায় বদলে গেল।

নিনি! নিনি!

গলাটা এবার সিদ্ধার্থর মতো লাগছে না?

এখন নিনি কী করবে? চিৎকার করবে? অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনদের ডাকবে?

কে? কে তুমি? নিনি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

নিনি, তুমি দরজা না খুললে…..আমি…দরজা…ভেঙে…।

না! তুমি সিদ্ধার্থ নও! তুমি…তুমি…।

হ্যাঁ, আমি সিদ্ধার্থ। আমি জানি…সেদিন রাতে…ছাদে স্মোক করার সময়…কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তুমিও সেটা ভালো করে জানো, নিনি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ একথা জানে না। এবার বিশ্বাস হল তো! নাউ বি আ গুড গার্ল…অ্যান্ড ওপেন দিস ড্যাম ডোর, উইল য়ু?

# আকাশে কীসের শব্দ

**আকাশে কীসের শব্দ**

আপনারা সকলেই জানেন, গত ১১ নভেম্বর, শনিবার, বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণের শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকায় এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এই শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগে গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ থেকে শুরু করে আমতলা, নরেন্দ্রপুর পর্যন্ত সবাইকে জানান দিয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুতেই এই শব্দের উৎসের হদিস পাওয়া যায়নি। কোনও বিস্ফোরণের ঘটনাও টের পাননি কেউ, অথবা কেউ যে হতাহত হয়েছেন এমন খবরও শোনা যায়নি। ফোর্ট উইলিয়ামের চিফ অফ স্টাফ জে. কৌশিক বলেছেন, সেদিন কোনও শব্দ তারা শোনেননি। আওয়াজের ধরনের বিবরণ শুনে তিনি বলেন, ব্যাপারটা সনিক বুম হতে পারে। সুপারসনিক কোনও প্লেন আকাশপথে উড়ে গেলে একটা শক ওয়েভ তৈরি হয়। তার ফলে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় বাজ পড়ার মতো জোরালো শব্দ হতে পারে। অথচ তার আশপাশের মানুষজন সেরকম কোনও শব্দই শুনতে পাবেন না। শনিবার বারবেলার শব্দটা ছিল হয়তো তাই।

শব্দের রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে, কারণ সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ কোনও অজ্ঞাতকুলশীল সুপারসনিক প্লেন কলকাতার আকাশপথে উড়ে গেছে এমন কোনও প্রমাণ কেউই দিতে পারেননি।

অথচ প্রচণ্ড শব্দ যে একটা হয়েছে তাতে কোনও ভুল নেই। আর বহু বাড়ির কাচের জানলাও যে তখন ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়েছে তাও তো মিথ্যে নয়!

তা হলে কীসের শব্দ শোনা গিয়েছিল নভেম্বরের ১১ তারিখে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরাও বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। সনিক বুম, মাক নাম্বার, মাক কোন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা রচনা প্রকাশিত হয়েছে নানান পত্রপত্রিকায়। এমনকী অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী আর্স্ট মাকের জীবনীও ছাপা হয়েছে একটি কিশোর-পত্রিকায়। তার ফলে, বিজ্ঞানী মাকের নাম থেকেই যে মাক নাম্বার, মাক কোন্—এইসব নামকরণ করা হয়েছে, সেটাও জনসাধারণ জেনে গেছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও শব্দের কারণটা কেউই জানতে পারেনি।

কারণ, এতদিন আমি মুখ খুলিনি। আর শুভদীপের গোপন পরীক্ষার কথাও কাউকে বলিনি। সেইসঙ্গে শুভদীপের স্ত্রী রনিতার কথাও খুলে বলা হয়নি কাউকে। ফলে নিখোঁজ বিজ্ঞানী শুভদীপ পালচৌধুরীর সঙ্গে এই বিস্ফোরণের যে কোনও সম্পর্ক আছে, সে-কথা কেউ বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আর অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। কারণ, গতকালই শুভদীপের পাঠানো একটা মোটা খাম আমার ঠিকানায় এসে হাজির হয়েছে। আমাকে লেখা শুভর শেষ চিঠি।

চিঠিটা আমি যতই পড়েছি ততই অবাক হয়েছি। চিঠি তো নয়, সে যেন শুভদীপের জীবনের এক গোপন অধ্যায়ের বিবরণ। কী করে একটা সাধারণ ব্যাপার থেকে ওর জীবন এরকম বিপজ্জনক দিকে এগিয়ে গেল তা ভাবতে অবাক লাগে। অথচ শুভদীপ উচ্ছল হাসিখুশি ছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই ওকে দেখেছি আমি। যেমনই বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা তেমনই প্রিয় ছিল সকলের। আর ওর দাজ দিলখোলা হাসি আমি যেন এখনও শুনতে পাই। যদিও জানি, শুভদীপ আর কখনও হাসবে না, কাঁদবে না। এমনকী আমার পিঠে এক জোরালো থাপ্পড় কষিয়ে আর কখনও বলে উঠবে না, বুঝলি শালা, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই কেউ বিজ্ঞানী হয় না।

আমি ওর কথায় মোটেই আহত হতাম না। কারণ, আমরা বেশিরভাগই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করার জন্যে, ভালো-ভালো চাকরি পাওয়ার জন্যে, বিদেশে যাওয়ার জন্যে, অধ্যাপনার দায়সারা কর্তব্য পালনের জন্যে।

আর শুভদীপ? ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করত বিজ্ঞানকে ভালোবেসে।

আমি তাও মজা করে ওকে বলতাম, তুই বুঝি বিজ্ঞানী!

ইয়েস ব্রাদার, আমি রোজ মর্নিং-এ বিজ্ঞান দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই। একথা বলেই শুভদীপ হো-হো করে হেসে উঠত।

শুভদীপ আমাদের অনেকের কাছেই প্রিয় ছিল, কিন্তু আমি বোধহয় ওকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। আমাদের ভালোবাসা এমনই ছিল যে, সাহেবদের দেশ হলে হয়তো অন্যায় সম্পর্কের অভিযোগে হাজতবাস করতে হত।

শুভদীপ পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে দিব্যি ছিল। কিন্তু রনিতাকে বিয়ে করার পর ওর জীবনটা হঠাৎই বোধহয় অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকেই ধীরে-ধীরে ওর জীবনটা এগিয়ে গিয়েছিল গত ১১ নভেম্বরের দিকে।

১১ নভেম্বর সেই ভয়ংকর শব্দটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছিল। কান্না এসে গিয়েছিল গলায়। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বহুদিনের প্রিয় বন্ধু শুভদীপ আর নেই। ওই আশ্চর্য শব্দের মাধ্যমে ওর বিচিত্র মৃত্যুটাকে ও যেন ঘোষণা করে গেল।

না, শুভদীপ আত্মহত্যা করেনি। জীবনে অনেক শোক-দুঃখ ও পেয়েছে, কিন্তু কখনও আত্মহত্যার কথা ভাবেনি। বরং আমি কখনও ওই প্রসঙ্গ তুললে হেসে বলত, ব্রাদার, আত্মহত্যা করার সাহস যদি কারও থাকে, তা হলে তার আর আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় না।

শুভদীপ হাসত বটে, কিন্তু ওর মুখের আড়ালে আমি অনেক শোকগাথা টের পেতাম। অথচ রনিতাকে বিয়ে করার পর তখন সবেমাত্র বছরদুয়েক কেটেছে।

শুভদীপের ব্যাপারটা নিয়ে এই এক মাস আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। কলেজ-জীবনে তোলা আমাদের গ্রুপ ফটোটা দেখেছি। বারবার। ওর সুন্দর নিষ্পাপ মুখটা যেন আমার চোখে তাকিয়ে নীরবে বলেছে, বুঝলি, আমি চলে গেলাম। তোরা সব দুধে-ভাতে থাকিস।

কথায় কথায় শুভদীপ শুধু বলত, না ভাই, আমি দুধে-ভাতে মানুষ, আমার ওসব পোষাবে না।

একথা শুনে আমাদের আড্ডার নতুন কোনও সঙ্গী ভাবত, ও বুঝি খুব বড়লোক। তখন আমরাই হেসে ওর ঠাট্টার মর্মার্থটা বুঝিয়ে দিতাম তাকে। বলতাম, শুভদীপের কেষ্টপুরের বাড়িতে দুটো গরু ছিল। সেইজন্যেই ওর খাদ্যতালিকার প্রধান আইটেম ছিল দুধ-ভাত। বাবা-মায়ের চাপে এই মেনু ওকে প্রায় বিশ বছর সহ্য করতে হয়েছে।

তারপর ফিজিক্স নিয়ে এম. এসসি. পার্ট টু পরীক্ষা দেওয়ার সময় ও একদিন সগর্বে জানাল, ও আর দুধ-ভাত খাচ্ছে না।

আমরা সবাই জিগ্যেস করলাম, কেন? কেন?

ও বেশ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে জানাল, ওদের গরু দুটো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওর বাবা বলেছেন, এখন তো তুই-ই বড় হয়ে গেছিস, তা হলে আমার আর ও-গরু দুটোকে রেখে লাভ কী?

ওর কথায় আমরা হো-হো করে হেসে উঠেছি।

গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি শুভর চিঠিটা পড়েছি। চিঠি তো নয়, সুদীর্ঘ এক কাহিনি।

সেই লেখা পড়ার পর বাকি রাতটা আমি আর ঘুমোতে পারিনি। আমার কানের কাছে ১১ নভেম্বরের সেই শব্দটা আবার বেজে উঠেছিল। একবার নয়, বারবার। যেন কামান দেগে ওর মৃত্যুকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হচ্ছিল।

আজ সকালে নতুন সূর্য দেখার পর আমার মনটা যেন খানিকটা আশ্বাস পেল। মনে হল, শুভর কথা যদি আমি সবাইকে জানাই, তা হলে শুভর আত্মা বোধহয় তৃপ্তি পাবে। আর রনিতার? রনিতা বোধহয় অখুশি হবে না। কারণ, শুভকে ও ভীষণ ভালোবাসত।

অবশ্য রনিতাও তো এখন আর নেই! শুভর শেষ চিঠি পড়েই ব্যাপারটা জানতে পেরেছি আমি। কারণ, গত একবছর ধরে শুভ আমার সঙ্গে সেরকম যোগাযোগ রাখত না। শুধু মাঝে মাঝে খেয়ালখুশি মতো ফোন করত। কিছু জিগ্যেস করলেই বলত, এখন ও একটা অদ্ভুত গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছে। তার বেশি আর কিছু কখনও বলেনি। আর কথা শেষ করার আগে বলত, কোনওদিন যদি একটা জোরালো এক্সপ্লোশানের শব্দ শুনিস তা হলে বুঝবি আমি আর নেই।

এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। শুভর শেষ চিঠি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে। তাই ওর সম্পূর্ণ কাহিনিটাই আমি আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। অন্তত আমি যেমন করে বুঝেছি। আর আগেই তো বলেছি, এখন আর চুপ করে থাকার কোনও মানে হয় না।

.

বারান্দার টবের গাছগুলোয় জল দিচ্ছিল রনিতা, আর আপনমনে কথা বলে যাচ্ছিল। আসলে ও প্রাণভরে গালমন্দ করছিল হতচ্ছাড়া চড়ুইপাখিগুলোকে। দুষ্টু পাখিগুলো রোজই ওর সাধের গাছগুলোর কচি পাতা আর ফুল ঠুকরে-ঠুকরে খেয়ে যায়।

শুভদীপ ওর পড়ার টেবিলে বসে বই আর কাগজপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত ছিল। ডানহাতের কাছে চায়ের কাপ। সামনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সকালের সূর্য। বারান্দার যেটুকু চোখে পড়ে তাতে রঙিন মরশুমি ফুল, দু-একটা চঞ্চল চড়ুইপাখি, সবুজ গাছের পাতা, আর রনিতাকে দেখা যাচ্ছে।

এই সকালবেলার শীতের আমেজ ঘেরা পরিবেশে সবই সুন্দর। রনিতাও। ঠিক এই সময়টা শুভদীপের মনে হয় বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও বেঁচে থাকার অন্যান্য আরও আকর্ষণ চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু রনিতার কথা ওর নরম ভাবনায় বাধা দিচ্ছিল বারবার।

রনিতা, চড়ুইগুলো এখনও এত সভ্য হয়ে ওঠেনি যে, তোমার বাংলাভাষা বুঝবে। শুভদীপ ঠাট্টা করে কথাটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিল।

বাংলাভাষা না বুঝুক, লাঠির ভাষা তো বুঝবে– রনিতা জানলার কাছে এগিয়ে এল। দেখা গেল ওর হাতে চড়ুইপাখি তাড়ানোর জন্য মানানসই একটা কাঠি।

সকালের মন-ভালো করা আলোয় রনিতাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শুভদীপ ওকে দেখল একটু অবাক হয়ে। রনিতা এত সুন্দর, অথচ এত কথা বলে!

বিয়ের পর বছরখানেক যেতে-না-যেতেই রনিতার কথা বলার বাড়াবাড়ি বাতিকটা টের পেয়েছে শুভ। রনিতা কখনও অল্পে থামে না। একদিন সন্ধেবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওকে জিগ্যেস করেছে।

তুমি এত কথা বলো কেন, রনিতা?

আমি বেশি কথা বলি? অবাক হয়ে স্বামীর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে রনিতা। ও তখন নিজের শাড়ি-জামাকাপড় ঠিকঠাক করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখছিল। আলমারির কাছ থেকেই একটু চোখা স্বরে ও আরও বলেছে, শেষকালে তুমি আমার এই বদনাম দিলে! জানো, সত্যি-সত্যি কাদের টকেটিভ বলে? যারা অপ্রয়োজনে বাড়তি কথা বলে। আমি তো দরকার ছাড়া একটি কথাও বলি না। আমাকে তুমি আর যাই বলো, টকেটিভ বলতে পারবে না। জানো তো, আমাদের।

হাত তুলে ওকে বাধা দিয়েছে শুভ ও থাক, থাক, বাবা। আমারই ভুল হয়েছে। তুমি বিন্দুমাত্রও টকেটিভ নও। বরং খুবই লক্ষ্মী মেয়ে।

তুমি কি চাও আমি বোবা হয়ে থাকি?

শুভ বুঝতে পারল রনিতা একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে। তাই ও চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে উঠে গেল আলমারির কাছে। দু-হাতে আলমারির ভোলা পাল্লা ধরে রনিতাকে আগলে দাঁড়াল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, এখন তোমাকে দু-চার- সেকেন্ড বোবা করে দেব।

রনিতা একটু অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

তার মানে এই। বলে রনিতাকে হতভম্ব করে দিয়ে চট করে ওকে চুমু খেল শুভদীপ।

সত্যি-সত্যি দু-চারসেকেন্ড পর ব্যাপারটা শেষ হতেই রনিতা আলতো রাগের ভান করে বলল, এটা কী হল!

শুভদীপ হাসতে-হাসতে জবাব দিল, চুমু খাওয়া হল। এতে তোমার রাগের কী আছে। আমি তোমার অফিসিয়াল চুম্বক, মানে, ম্যাগনেট।

চুম্বক! রনিতা আরও অবাক।

শুভ হেসে বলল, ব্যাকরণ ভালো করে পড়োনি? চুম্বন করে যে সে-ই হল চুম্বক। আমি তোমার হাজব্যান্ড–সো, অফিশিয়াল ম্যাগনেট।

এরপর রনিতা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বেশি কথা বলার অভিযোগটা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু রনিতার বেশি কথা বলার ব্যাপারটা ধীরে ধীরে শুভদীপের মাথায় বাসা বেঁধে ফেলল। ও যখন রনিতার সঙ্গে কথা বলত তখনই ওর মাথার ভেতরে বিজ্ঞানী মন তার কাজ করে যেত।

সুতরাং একদিন কাজের বউয়ের বিনা নোটিসে কামাই করা নিয়ে রনিতা যখন সুদীর্ঘ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সবে শেষ করেছে, তখন শুভ বলে বসল, রনি, একটা নতুন আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে।

রনিতা প্রায় অপ্রস্তুত হয়ে জিগ্যেস করল, কী আইডিয়া?

শুভ ওকে কাছে ডেকে নিজের পাশে বসাল। তারপর আগ্রহ দেখিয়ে বলল, মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করো। যদিও ব্যাপারটা বিজ্ঞানের, তবু মনে হয় না তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে।

রনিতার বিষয় ছিল ফিলজফি। বিজ্ঞান সম্পর্কে ওর বিচিত্র আতঙ্ক আছে। কিন্তু শুভকে ও জানে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে শুভ বেশ একরোখা। নতুন আইডিয়ার ব্যাপারটা যখন ও রনিতাকে শোনাতে চায়, তখন ও শোনাবেই।

রনিতা ছোট্ট করে ঘাড় নাড়তেই শুভ বলতে শুরু করল, দ্যাখো, শব্দ হল একরকমের শক্তি। যেমন আলো, তাপ–এসবই হল শক্তি। শক্তির কোনও বিনাশ নেই, তবে রূপান্তর হতে পারে। আমাদের এই মহাবিশ্বে আদিম অবস্থায় যে-পরিমাণ শক্তি ছিল, এখনও তাই আছে। শুধু শক্তির নানারকমের রূপান্তর হয়েছে।

রনিতা বলল, আমার একটু-একটু গুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নো প্রবেলেম–তুমি বলে যাও।

তোমাকে তো বললাম, শব্দ একরকম শক্তি। এই যে তুমি এতক্ষণ ধরে কাজলের মায়ের কামাই নিয়ে এত কথা বললে, তাতে অনেক শব্দ হল–।

এত কথা আবার বললাম কোথায়! আমি তো শুধু বললাম, ও যে আসবে না সেটা আগে–।

রনিতা, প্লিজ। আমাকে আগে বলতে দাও, তারপর যত খুশি কথা বোলো।

রনিতার মুখ সামান্য গোমড়া হল।

শুভদীপ সেটা তেমন গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল না করে বলে চলল, তোমার উচ্চারণ করা শব্দগুলোকে নিয়ে আমি যদি রূপান্তর ঘটাতে পারি তা হলে হয়তো দেখা যাবে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে। মানে, সাউন্ড এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। বলা যায় না, তোমার একটু আগের বলা কথাগুলো থেকে হয়তো ১৫ ওয়াটের একটা বাকে মিনিটপাঁচেক জ্বালানো যাবে।

রনিতা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ওর ফরসা মুখে কালচে ছায়া পড়েছে। শুভদীপের দিকে না তাকিয়েই ও বলল, ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছে, তাই না?

শুভদীপ একটু সাবধানী গলায় বলল, হ্যাঁ, মানে একটু মজা তো আছেই। তবে…ইয়ে…আসল কথাটা শুনবে? যা বললাম, তা বোধহয় খুব একটা মিথ্যে নয়।

রনিতা সহজ হওয়ার ভান করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। অনেকটা নিজের সঙ্গে কথা বলার ঢঙেই বলল, তুমি উচ্চশিক্ষিত সায়েন্টিস্ট মানুষ। সব ব্যাপারে তোমার কথাই শেষ কথা।

শুভও পালটা জেদ দেখিয়ে বলল, বিজ্ঞান কখনও মিথ্যে কথা বলে না।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারে।

সেই মুহূর্তে ছন্দপতন ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু শুভদীপ একটা হিসেব কষছিল মনে-মনে। আচ্ছা, এটুকু সময়ে কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করল রনিতা? দুশো, তিনশো, নাকি আরও বেশি শব্দ উচ্চারণ করেছে?

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে শুভদীপ ঠিক করল গুনে দেখবে। এরপর থেকে হিসেব করে দেখবে চব্বিশ ঘণ্টায় রনিতা কত কথা বলে মানে কটা শব্দ

উচ্চারণ করে। তারপর তা থেকে হিসেব করবে, প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণের পিছনে ঠিক কত আর্গ বা জুল শক্তি খরচ হয়। তারপর উত্তরটাকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াট-ঘণ্টা বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে। তখনই বোঝা যাবে, রনিতা কদিন কথা বললে সেই শব্দ-শক্তি থেকে একটা ১৫ ওয়াট পাওয়ারের বাকে পাঁচমিনিট জ্বালানো যাবে।

এরপর থেকে রনিতার উচ্চারণ করা শব্দ গুনতে শুরু করেছে শুভদীপ। তখনই বুঝতে পেরেছে, বলা যত সহজ, বাস্তবে কাজটা তত সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষক শুভদীপ তাতে পেছপা হয়নি। একটা নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা কোনও খাঁটি গবেষকের কাছে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। শুভদীপ এই রোমাঞ্চকর নেশায় ডুবে গেল।

ও খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখল, কোনও মানুষ কথা বলার সময়ে উচ্চারণ করা শব্দগুলোর মাঝে সেভাবে কোনও ফাঁক রাখে না–যেমনটা পাওয়া যায় লেখা কথার সময়ে। রনিতার কথা গুনতে গিয়ে ও ঠিক এই সমস্যায় পড়ল। কিন্তু তার চেয়েও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল রনিতার মেজাজ।

প্রথম-প্রথম শুভদীপ যখন রনিতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করত তখন মাঝপথেই কথা থামিয়ে রনিতা বলে উঠত, কী আপনমনে বিড়বিড় করছ! তুমি আমার কথা কিছুই শুনছ না!

গুনলে কখনও আর শোনা যায়। শুভ তখন তাড়াতাড়ি রনিতার কথায় মন দিয়েছে। নিজের সাফাই হিসেবে বলেছে, না..ইয়ে…একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। প্লিজ, আর-একবার বলবে।

এভাবে বেশ কিছুদিন চেষ্টার পর শুভদীপ হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু ওর মনে কেমন একটা জেদও চেপে বসল–একটা-না-একটা পথ ওকে বের করতেই হবে। এই চিন্তায় ও দিনরাত ডুবে রইল। বইপত্র আর কাগজ নিয়ে নানান অঙ্ক কষল।

তার পর একদিন ও আর্কিমিদিসের মতো ইউরেকা! বলে চিৎকার করে উঠল। এবং গবেষণাগারে ওর কাজ শুরু করল।

দুধে-ভাতে মানুষ কথাটা শুভদীপ মজা করে ব্যবহার করলেও ওর পৈতৃক সম্পত্তি নেহাত কম ছিল না। এ ছাড়া ও নিজেও ভদ্রস্থ টাকা উপার্জন করে।

সুতরাং দক্ষিণ কলকাতার ছিমছাম এলাকায় ওর এই ফ্ল্যাটের মাপ যথেষ্ট বড়। আর সেই কারণেই তার একটা ঘরকে ও একরকম ওর গবেষণাগার বানিয়ে ফেলেছে।

সমস্যাটার চলনসই একটা সমাধান খুঁজে পাওয়ার পর শুভদীপ ওর গবেষণাগারে আরও জোরালো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠল।

ও দেখেছে, রনিতা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চাররকম স্পিডে কথা বলে। আর স্পিড যতই বাড়তে থাকে ওর কথার তীব্রতা ততই উচ্চগ্রামে চড়তে থাকে। এ ছাড়া ওর কথার কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে শুভদীপ দেখেছে, কথার স্পিড বেড়ে গেলে কম্পাঙ্কের ঊর্ধ্বসীমা আরও ওপরে উঠে যায়।

সুতরাং, এইসব তথ্য এবং বেশ কয়েকবার ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরার করার পর শুভদীপ একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারল। যন্ত্রটা খুব নিখুঁত হল না বটে, কিন্তু রনিতার উচ্চারণ করা শব্দের মোটামুটি একটা হিসেব কষতে পারল।

যন্ত্রটার তত্ত্ব খুব সহজ-সরল। প্রথমে উচ্চারণ করা শব্দগুলোর কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে উচ্চতম কম্পাঙ্কটি সে নির্ণয় করে। তারপর মেপে নেয় ডেসিবেল তীব্রতা। এই দুটি তথ্য থেকে সে হিসেব কষে বের করে বক্তা কোন স্পিডে কথা বলছে। রনিতার চারটে স্পিডের জন্য প্রতি সেকেন্ডে উচ্চারণ করা শব্দের সংখ্যার চারটি গড় মান যন্ত্রটিকে আগেই জানানো আছে। সুতরাং স্পিড জানার পর যন্ত্রটা হিসেব করে বক্তা কত সেকেন্ড কথা বলল। তারপর সেই সময়কে নির্দিষ্ট গড়মান দিয়ে গুণ করে নিজের মেমোরিতে সঞ্চয় করে রাখে। এইভাবে সঞ্চিত তথ্যকে সে পরপর যোগ করে যোগফল বের করে রাখে। ফলে যে-কোনও সময় উচ্চারিত শব্দের সংখ্যা জানতে চাইলেই যন্ত্রটা সাম্প্রতিকতম যোগফল দেখিয়ে দেয়। এই যোগফলে ভুলের সম্ভাবনা বড়জোর শতকরা ১৭ ভাগ।

যন্ত্রটা যদি নির্দিষ্ট কোনও মানুষের কণ্ঠস্বরে টিউন করা থাকে তা হলে অন্য কারও কথা সে তার হিসেবের মধ্যে ধরবে না।

শুভদীপ যন্ত্রটার নাম দিল ডিজিটাল অডিয়ো ওয়ার্ড কাউন্টার।

নিজে কথা বলে ও বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যন্ত্রটির দক্ষতা যাচাই করল। যখন দেখল, যন্ত্রের ভুল কোনও সময়েই শতকরা ১৭ ভাগের বেশি হচ্ছে না, তখন ও

দারুণ খুশি হল। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় রইল, কবে ও ফ্ল্যাটটাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য একা নিজের দখলে পাবে।

সুযোগ এসে গেল আটদিনের মাথায়। রনিতা নীচের ফ্ল্যাটের মিসেস সেনের সঙ্গে পাড়ার মহিলা সমিতির একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেল। বলল, ঘণ্টাতিনেক পরেই ফিরবে। শুভদীপের তখন আনন্দে সাতহাত লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল।

অতএব নদিনের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল আসল পরীক্ষা।

পাঁচটা খুদে-খুদে মাইক্রোফোন ও বসিয়ে দিল ফ্ল্যাটের নানা জায়গায়। সেই মাইক্রোফোনগুলো রনিতার সমস্ত কথা নিখুঁতভাবে ধরে পৌঁছে দিতে লাগল শুভদীপের মূল যন্ত্রে। আর শুভদীপ প্রতিদিন রাতে সেই যন্ত্রে জুড়ে দেওয়া কম্পিউটারের কিবোর্ডে বসে রনিতার উচ্চারণ করা শব্দের হিসেব রাখতে লাগল।

দশদিন পর একটা গড় হিসেব কষল শুভ। তাতে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো : ১৬৬৪৩।

পরদিন চায়ের টেবিলে রনিতাকে খবরটা জানাল শুভ।

জানো, লাস্ট ১০ দিনে তুমি অ্যাভারেজে ডেইলি সাড়ে ১৬ হাজার শব্দ বলেছ।

রনিতা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। চোখ না তুলেই বলল, সবসময় ইয়ারকি ভাল্লাগে না।

না, ইয়ারকি না। সিরিয়াসলি বলছি।

এইবার খবরের কাগজ রেখে শুভর দিকে সরাসরি তাকাল রনিতা। কিছুক্ষণ স্বামীকে জরিপ করে জিগ্যেস করল, কী করে গুনলে?

শুভদীপ ওর যন্ত্রের ব্যাপারটা রনিতার কাছে একটুও ভাঙেনি। এখনও ভাঙতে চাইল না। তাই চোখ মটকে বলল, সে একটা কায়দা আছে। এখন বলব না। পরে বলব।

রনিতা আর কোনও কথা বলেনি। আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওর ভাবভঙ্গিতে শুভদীপ এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, রনিতা ব্যাপারটা খুব খুশি মনে নেয়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শুভদীপ এই রোমাঞ্চকর নেশায় ডুবে যাচ্ছিল। ওর যন্ত্রে রনিতার সমস্ত কথা টেপ করার ব্যবস্থাও ছিল। কখনও কখনও ও গভীর রাত পর্যন্ত টেপরেকর্ডার চালিয়ে রনিতার কথাগুলো শুনত আর নিজের নানান বৈজ্ঞানিক হিসেব-নিকেশ করত। রনিতার কথার শব্দ শোনা আর শব্দ গোনা ওকে ক্রমশ যেন পাগল করে তুলল।

রনিতাকে ও ঠাট্টা করে মাঝে-মাঝেই ওর কথা বলার হিসেবটা শুনিয়ে দেয়। বলে, ডার্লিং, এই উইকে তোমার টকিং অ্যাভারেজ ১৫ হাজারের কিছু কম।

রনিতা কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু দিনের-পর-দিন একই ধরনের হিসেব শুনতে-শুনতে ও ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসে। শুভদীপের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। শুভদীপ কিছু জিগ্যেস করলে দায়সারা ছোট্ট জবাব দেয়। কিন্তু তাতে ওর দৈনিক গড় হিসেবে তেমন কোনও হেরফের হয় না। কারণ শুভদীপ যখন থাকে না, তখন রনিতা কাজের বউ, বারান্দার চড়ুইপাখি, বাথরুমে ঢুকে পড়া পায়রা, আচমকা বৃষ্টি, কিংবা চড়া রোদ্দুর–এদের সঙ্গে বকবক করে ওর ঘাটতি পুষিয়ে নেয়।

রনিতার সুন্দর চোখের তলায় ধীরে-ধীরে একটা কালচে ছোপ পড়ছিল। এখন ও সারাটা দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। সে ব্যস্ততা এমনই যে, কাজ না থাকলেও ও সর্বক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করতে থাকে আর আপনমনেই বকবক করে যায়। শুভদীপ যখন ওকে কিছু বলতে চায় তখন কেমন রুক্ষভাবে জবাব দেয়। চেহারা আগের তুলনায় অনেক ভেঙে গেছে। প্রায়ই হজমের গোলমালে ভোগে।

শুভদীপ একদিন ওকে ডাক্তার দেখানোর কথা বলতেই রনিতা একেবারে কঁঝিয়ে উঠল, বলল, আমি ঠিক আছি, ডাক্তার আমার দরকার নেই, দরকার আসলে– কথা শেষ করেনি রনিতা।

একদিন রাতে, অন্ধকারে, শুভকে পরম আগ্রহে অকুলপাথারে খড়কুটোর মতো জড়িয়ে রনিতা বলল, তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো–।

মেনে নিচ্ছি, আমি বেশি কথা বলি। তুমিই জিতলে, আমি হারলাম। কাল থেকে তোমার ওই এক্সপেরিমেন্ট তুমি বন্ধ করবে?

অন্ধকারে মশারির ছাদের দিকে তাকিয়ে শুভ বলল, দেখি।

কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শুভদীপ টের পাচ্ছিল, এই নেশাটা ময়াল সাপের মতো ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। ১৫ ওয়াটের একটা বা পাঁচমিনিট না জ্বালানো পর্যন্ত ওর নিস্তার নেই। একটা বিকৃত জেদ ভেতর থেকে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

রনিতার উচ্চারণ করা কথা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য পাগলের মতো মেতে উঠল শুভদীপ। প্রায় সাড়ে চারমাসের অক্লান্ত গবেষণায় ও তৈরি করল একটা অভিনব যন্ত্র–তার নাম দিল এনার্জি ট্র্যাপার। এনার্জি ট্র্যাপার বা শক্তি-ফঁাদ ওকে এতই খুশি করল যে, ও পাঁচদিন বিজ্ঞানের কাছ থেকে ছুটি নিল আর রনিতার কথাও গুনল না।

কিন্তু তারপর থেকেই ও আবার মেতে উঠল শক্তি-ফঁাদ নিয়ে।

রনিতার টেপ করা কথাগুলোকে ও স্বাভাবিক ভলিউমে প্লে-ব্যাক করে তা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্ট্যান্ডে বসানো একটা ছোট্ট গোলকে শব্দ-শক্তিকে ফোকাস করে কেন্দ্রীভূত করল শুভদীপ। তারপর অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্স ফিল্ড প্রয়োগ করে সেই শক্তিকে বন্দি করল। আর তখনই চকচকে গোলকটা ভেসে উঠল শুন্যে। তার গায়ে আলো পড়ে অদ্ভুত এক বর্ণালী তৈরি করে ওটা যেন একটা স্বপ্নের বুদবুদ হয়ে ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।

শুভদীপ অবাক হয়ে দেখতে লাগল রনিতার কথা ভেসে বেড়াচ্ছে ওর ল্যাবরেটরিতে। তার গায়ে বর্ণালীর খেলা।

এরপর অন্তত মাসখানেক ধরে শুভদীপ ওর এনার্জি ট্র্যাপার নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলল।

এখন ওর ল্যাবরেটরি দরজা খুললেই দেখা যায় ছোট-বড় অসংখ্য রঙিন বুদবুদ স্থির হয়ে ভেসে আছে ঘরের ভেতরে। বাতাসে সামান্য আলোড়ন তুললেই সেগুলো হেলেদুলে নড়েচড়ে বেড়ায়। শুভদীপ ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওগুলোকে দ্যাখে। আর একটা অদ্ভুত তৃপ্তি ওর বুকের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

একদিন সন্ধেবেলা কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে শুভদীপ রনিতাকে বলল, রনি, আজ একটা গুড নিউজ আছে।

রনিতা নীচুগলায় যান্ত্রিকভাবে বলল, কী?

ডক্টর দত্ত, আমাদের ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর, বলেছেন আমার রিসার্চের থার্ড স্টেজ সাকসেসফুল হলে এই বিষয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট শুরু করবেন–আমি হব তার চিফ ইনভেস্টিগেটর।

শুনে খুশি হলাম। রনিতার স্বরে কোনও প্রাণ ছিল না।

জানো, থার্ড স্টেজ মানে কী?

না, জানি না।

শুভদীপের মনে হল, ও যেন কোনও রোবটের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু তাতেও ও দমে গিয়ে বলল, থার্ড স্টেজ মানে একটা বাল্ব জ্বালানো–পাঁচ মিনিটের জন্যে।

রনিতা কোনও কথা বলল না। কোনওরকম প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না ওর চোখেমুখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রনিতা বলল, যাই, তোমার জন্যে চা করি গিয়ে।

শুভ ওকে খুশি করার জন্য বলল, একবার ও-ঘরে গিয়ে দেখবে চলো, ঘরময় কতকগুলো রঙিন বল ভেসে বেড়াচ্ছে। ওই বলগুলোর ভেতরে তোমার কথার শক্তি লুকিয়ে আছে। ভাবতেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয় না?

রনিতা অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি যখন থাকব না, তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?

হ্যাঁ। তুমি তো জানো, বিজ্ঞানীরা চলে যায় একের-পর-এক কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।

রনিতা হঠাৎই গলা পালটে কেমন অসহায় সুরে বলল, আমার কথা তুমি একটুও ভাবো না ।

শুভদীপ মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বলল, ভাবি। কিন্তু আমার রিসার্চটা যে অনেকটা সময় নিয়ে নেয়…।

রনিতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আর শুভদীপ ওর গবেষণার তৃতীয় ধাপ নিয়ে ভাবতে লাগল।

একটা ব্যাপার শুভদীপ লক্ষ করছিল। ওর সামনে রনিতা ইদানীং ভীষণ কম কথা বললেও সারাদিনে ওর টকিং অ্যাভারেজ আগের তুলনায় অনেক বেশি। শুভর ডিজিটাল অডিয়ো ওয়ার্ড কাউন্টার সেই তথ্যটাই রোজ-রোজ জানিয়ে দিচ্ছিল ওকে।

রনিতার টেপ করা কথাগুলো রাতে শোনার সময় বেশ তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিল শুভদীপ। আগে ওর কথাবার্তার পিছনে যদিও বা কোনও অজুহাত বা কারণ থাকত, এখন সেসবের কোনও বালাই নেই। যখন-তখন যা খুশি বকবক করে যায় ও, কথার কোনও মাথামুন্ডু নেই। একেবারে যেন পাগলের প্রলাপ।

রনিতা কথা বলতে এত ভালোবাসে!

শুভদীপ মাঝে-মাঝেই ভাবে, এ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করবে। কিন্তু ওর ভেতরে একটা জেদি আর কৌতূহলী মন ওকে থামতে দেয় না।

একদিন শুভদীপের গবেষণার তৃতীয় ধাপও সফল হল।

একদিন সত্যি-সত্যিই ও একটা ১৫ ওয়াটের বালবকে সাড়ে ছ মিনিটের জন্য জ্বালিয়ে রাখতে পারল। তখন ও খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চা ছেলের মতো। ওর গবেষণা নিয়ে রনিতার সঙ্গে আবোলতাবোল অনেক কথা বলে গেল। আনন্দের ঝোঁকে ও খেয়ালই করল না, রনিতার মুখে এক থমথমে ছাপ–মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে, চোয়ালের হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সেদিন রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

রাত তখন কত হবে শুভদীপ জানে না। জিনিসপত্র ভাঙচুরের শব্দ পেয়ে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

প্রথমেই যেটা খেয়াল করল, রনিতা পাশে নেই।

তখন শুভদীপ আর দেরি করেনি। পলকে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে উঠে রওনা হয়েছে শব্দ লক্ষ করে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, শব্দগুলো ভেসে আসছে ওর ল্যাবরেটরি থেকে।

ল্যাবে গিয়ে এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখল শুভদীপ।

ঘরের বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ওলটপালট করে ভেঙেচুরে ফেলেছে রনিতা। ঘরের বুদবুদগুলো এপাশে-ওপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর অসহায় ভাঙাচোরা মেয়েটা মেঝেতে বসে হাউমাউ করে কাঁদছে।

এসব কী হচ্ছে, রনি! কাঁদছ কেন?

রনিতা স্বামীর কথায় ভ্রূক্ষেপই করল না, আকুল হয়ে কেঁদে চলল।

শুভদীপের কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো লাগছিল। ও অনেক করে রনিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও লাভ হল না। এক প্রচণ্ড জেদ রনিতাকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। ও শুভর কোনও কথায় কান দিল না। শুধু কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে জড়ানো গলায় কীসব বলল। কথাগুলো শুভদীপ ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও দেখল ওঁর ডিজিটাল কাউন্টারের ডিসপ্লে প্যানেলে সংখ্যার মান বেড়ে যাচ্ছে।

অনেক চেষ্টার পর ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে শুভদীপ শোওয়ার ঘরে ফিরে এল। অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। তখনও ওর কানে রনিতার কান্নার গোঙানি ভেসে আসছে।

ভোরবেলা শুভদীপই রনিতার মৃতদেহ আবিষ্কার করল।

ডাইনিং হলে সিলিং পাখার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছে ও। লম্বা হয়ে থাকা নিষ্প্রাণ পায়ের নীচে ডাইনিং টেবিল উলটে পড়ে আছে। আর ডাইনিং হলে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটো শব্দের বুদবুদ। ল্যাবরেটরি থেকে কীভাবে ওরা এ-ঘরে এল কে জানে! শুভর মনে হল, এই বুদবুদজোড়া রনিতার আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী।

কয়েকটা চড়ুইপাখি ঘরের জানলায় বসে কিচিরমিচির করছিল, ওদের সঙ্গে কথা বলার আর কেউ নেই।

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সুইসাইড নোটটা দেখতে পেল শুভদীপ। ডাইনিং হলের একপাশে একটা ক্যাবিনেটের ওপরে স্টিলের গ্লাস দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল। তাতে রনিতা লিখে গেছে?

আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।
অনেক কথা বলার ছিল বলা হল না।

শুভদীপ আর সইতে পারেনি। বেপরোয়া কান্নায় ভেঙে পড়েছে রনিতার পায়ের নীচে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সুইসাইড নোটের শেষ লাইনটায় রনিতা যা বলতে চেয়েছে তার মর্ম শুভদীপ ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না।

এরপর থানা-পুলিশ, পাড়া-প্রতিবেশীদের গুজব আর মন্তব্যে বেশ কটা দিন কেটে গেল। তারপর থেকে শুভদীপ একা। ওকে সবসময় ঘিরে থাকে রনিতার কথার রঙিন বুদবুদ। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি শব্দের বুদবুদ।

মাঝে-মাঝে টেপ চালিয়ে রনিতার কথা শোনে ও। মনে পড়ে, রনিতা বলেছিল, আমি যখন থাকব না তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না? আর শুভদীপ উত্তরে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমি তো জানো বিজ্ঞানীরা চলে যায় একের-পর-এক–কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।

সবসময় এই কথাগুলোই এখন ঘুরে বেড়ায় শুভদীপের মনে। রনিতার কথা থেকে আরও অসংখ্য বুদবুদ তৈরি করতে থাকে ও। এনার্জি ট্র্যাপার নিয়ে কাজ করে যায় পাগলের মতো। যেন শব্দের বুদবুদ তৈরি করা ছাড়া এখন ওর নিঃসঙ্গ জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নেই।

শুভদীপ ক্রমশ মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল। তা ছাড়া ওর সবসময় মনে হত রনিতা ওর কানের কাছে ক্রমাগত বকবক করে চলেছে। ওর

বিজ্ঞানী মন বলে উঠত, ব্যাপারটা শ্রুতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ওর মনের একটা অংশ এই সরল যুক্তি মানতে চাইত না।

রনিতাকে হারিয়ে শুভদীপ একা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও একা থাকতেই চেয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে, ও রনিতার কথার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল।

এরপর এমন একটা সময় এল যখন শুভদীপ রনিতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। ল্যাবরেটরিতে বসে রনিতার কথার টেপ চালিয়ে ওর কথার পিঠে কথা বলে যেত। কোনও-কোনও সময় একা-একাই বিড়বিড় করত আপনমনে। রনিতা যে ওর কাছে নেই সেটা ও বুঝতে পারত না।

এইরকম একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থায় ও একদিন ঘোর দুপুরে একটা শব্দের বুদবুদ সঙ্গে করে বেড়াতে গেল লেকের ধারে। প্রায় জনহীন মাঠে দুপুরের রোদে বুদবুদটাকে শূন্যে ভাসিয়ে ও তার গায়ে নানা রঙের খেলা দেখতে লাগল।

ক্রমে-ক্রমে এই দুপুরে বেড়ানোটা শুভদীপকে পেয়ে বসল নেশার মতো। বুদবুদের গায়ে রঙের খেলা দেখতে-দেখতে ও বিড়বিড় করে কথা বলত রনিতার সঙ্গে। মাঝে মাঝে ভাবত, রনিতার অসংখ্য কথা মাঠে-ঘাটে-আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি যখন থাকব না তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না? শুভদীপের বুকের ভেতরে রনিতা কথা বলে উঠত।

এইভাবে যখন সময় কেটে যাচ্ছে তখন একদিন শুভদীপ ঠিক করল, ঘনীভূত শব্দের বুদবুদগুলোকে দুপুরের খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে সমস্ত শব্দ-শক্তিকে এক মুহূর্তে ছড়িয়ে দেবে আকাশে। বাতাসে। তাতেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি খুশি হবে রনিতা। আর শুভদীপের অপরাধবোধও একেবারে হালকা হয়ে যাবে। এইভাবেই বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে মুক্তির পথ।

দুপুরবেলা খোলা মাঠে গাছতলায় বসে শূন্যে ভেসে থাকা দু-একটা বুদবুদের রঙিন শরীরের দিকে তাকিয়ে শুভদীপ এই মুক্তির কথা ভাবত আর রনিতার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলত আপনমনে।

ওর আশা ছিল শুধু একটাই, ও চলে যাবে, কিন্তু ওর বিজ্ঞান থেকে যাবে সকলের জন্য।

.

এখন আমি বুঝতে পেরেছি, ১১ নভেম্বর বেলা বারোটা নাগাদ কী হয়েছিল। লেকের মাঠ থেকে রনিতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে-বাতাসে। আর সেইসঙ্গে একজন ভেঙে পড়া নুয়ে পড়া আদ্যন্ত বিজ্ঞানী তরুণের ছিন্নভিন্ন দেহ ধূলিকণার মতো মিশে গিয়েছিল বাতাসে।

সেদিন দুপুরে এই ঘটনার সাক্ষীও যদি কেউ থেকে থাকে তা হলে দূর থেকে শব্দের বুদবুদগুলোকে সে নিশ্চয়ই রঙিন গ্যাস-বেলুন বলে ভেবেছে। আর গ্যাস বেলুন থেকে যে এতবড় বিস্ফোরণ হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই কেউই বিশ্বাস করেনি।

চিঠির শেষে শুভদীপ লিখেছেঃ

আমার নির্দেশ মতো এ-চিঠি তোর হাতে পৌঁছোবে চরম ঘটনার বেশ কিছুদিন পর। তবে তার আগেই তুই শব্দ শুনে টের পেয়ে যাবি, আমি আর নেই। না, আমার এই ব্যাপারটাকে তুই সুইসাইড বলে ভুল বুঝিস না। এটা আমার এক্সপেরিমেন্টের একটা পার্ট। যদিও রনিতার কথা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে গেলে কী হবে তা দেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমার গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র এই সঙ্গে পাঠালাম। এগুলো আমাদের ইন্সটিটিউটের ডিরেকটর ডক্টর দত্তকে দিয়ে দিস।

আমি জানি, এ চিঠি পেলে তুই দুঃখ পাবি। কিন্তু জানিসই তো, বিজ্ঞানী চলে যায়, কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।

এটাই ছিল শুভদীপের শেষ চিঠির শেষ লাইন।

# বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি

**বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি**

প্রতিদিন সন্ধেবেলা একটা সান্ধ্য আজকাল কেনা রমাপদবাবুর অভ্যেস। সারাদিনের খাটুনির পর অফিসপাড়া থেকে হেঁটে চলে যান বাবুঘাটে। সেখানে লাইন দিয়ে উঠে পড়েন বাসে। একটা সিট দখল করে ঝিমোতে থাকেন। কারণ, দমদম ক্যান্টনমেন্ট অনেক দূরের পথ। সুতরাং তাঁর প্রৌঢ় শরীরটা তখন একটু জিরিয়ে নেয়। নইলে বাড়ি ফেরার পরই তো নিত্যকার অভাবের সঙ্গে জুডোক্যারাটের লড়াই। এ লড়াইয়ে অভাব কখনও ক্লান্ত হয় না। তা ছাড়া তার সঙ্গে হাত মেলায় মনোরমা আর জয়িতা। বউ আর মেয়ে।

বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়লেই রমাপদবাবু ভয় পান। আবার সেই জরাজীর্ণ বট-অশ্বত্থের শেকড় গজানো আস্তানা। উনুনের ধোঁয়া। জনতা বাথরুম। জলের ভাগাভাগি নিয়ে চুলাচুলি। তার ওপর মনোরমা আর জয়িতা।

জয়িতার বিয়ের বয়েস পেরোতে চলল, তবু একটা পাত্র জুটল না। একটা প্রেম-ট্রেমও করে উঠতে পারল না মেয়েটা! দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু ইদানীং খিটখিটে হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে বোধহয় একটু লোভীও। ওর আর দোষ কী! মায়ের ধাত পেয়েছে।

কতদিন রমাপদবাবুর মনে হয়েছে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তারপর একলা নিরিবিলি জীবন। বাড়ি ফেরামাত্রই কেউ আর কিচিরমিচির শুরু করে বিরক্ত করবে না, কিন্তু মধ্যবিত্ত সাহসে কুলোয়নি। সমাজ হচ্ছে এক অদ্ভুত অভিভাবক ও খাওয়ানোর মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই।

খরচ বাঁচানোর জন্য সকালে খবরের কাগজ কেনেন না রমাপদবাবু। তবে কম খরচে সান্ধ্য আজকাল কেনাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ঠিক মানিকতলার মোড়ে এলেই তাঁর ঝিমুনি কেটে যায়। কারণ একটা বাচ্চা ছেলে সান্ধ্য আজকাল-এর গোছা নিয়ে বাসে উঠে চিৎকার করতে থাকে, সান্ধ্য আজকাল! সান্ধ্য আজকাল! রমাপদবাবু ওর কাছ থেকে একটা কাগজ কিনে পড়তে শুরু করেন। বেশিভাগই চনমনে খবর। আর প্রতি শুক্রবারে সান্ধ্যবাসর শিরোনামের বিভাগে একটা করে গল্প। রমাপদবাবু কাগজের একটি অক্ষরও বাদ দেন না। এমনকী বিজ্ঞাপনগুলোও রেহাই পায় না তার নজর থেকে।

আজ শুক্রবার। মানিকতলার ক্রসিং-এ এসে সেই চেনা ছেলেটার কাছ থেকে একটা সান্ধ্য আজকাল কিনলেন রমাপদবাবু। তার আশেপাশে আরও কেউ-কেউ কাগজ কিনলেন ছেলেটার কাছ থেকে। ||||||||| বাসের স্তিমিত আলোয় সামান্য ঝাঁকুনির মধ্যেও তিনি কাগজে চোখ বোলাতে শুরু করলেন। প্রথম কটা পাতায় চোখ বুলিয়ে চলে এলেন গল্পের পাতায়। ভারী অদ্ভুত নামের একটা গল্প ছাপা হয়েছে আজ। রমাপদবাবু গল্পটা পড়তে শুরু করলেনঃ

বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি
সমীর সরকার

বিশ্বাস করুন, ভীষণ বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি। আপনি সান্ধ্য আজকাল-এর পাঠক। সুতরাং আপনিই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পারেন এই বিপদ থেকে। আর কিছুদিন এইভাবে চললে আমি সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যাব।

আমার এই কাহিনি মোটেই গল্প নয়, বরং নিষ্ঠুর সত্যি। আপনার কাছে এ আমার আন্তরিক আবেদনঃ আমাকে বাঁচান! এভাবে আমি আর পারছি না।

ঘটনাটা গোড়া থেকেই তা হলে খুলে বলি।

আজকের মতোই সেদিনটা ছিল শুক্রবার। অফিস থেকে বাসে করে বাড়ি ফিরছি। হাতে ছিল আপনারই মতো এক কপি সান্ধ্য আজকাল। বাসে হকারের কাছ থেকে কেনা। বাসের অল্প আলোয় ঝিমুনি কাটিয়ে খবরের কাগজটার পাতায় চোখ বোলাচ্ছিলাম, এমন সময় পাশ থেকে কে যেন ডেকে বলল, কী ব্যাপার, সমীরবাবু! চিনতে পারছেন?

চমকে তাকিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমার পাশের দুজন ভদ্রলোকের ঠিক পরেই বসে আছেন। তারও হাতে সান্ধ্য আজকাল।

বৃদ্ধের থুতনিতে সামান্য খোঁচা-খাঁচা দাড়ি। মাথার চুল প্রায় সাদা। কপালে ও গালে ভাঁজ পড়েছে। ফরসা মুখ। নাকটা বেশ মোটা ও লালচে। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। চশমার পাওয়ার যথেষ্ট বেশি। কারণ, কাচের ওপরে রিং-এর মতো দাগ পড়েছে, আর ভদ্রলোকের চোখজোড়া কুতকুতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

বৃদ্ধ হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে। হাতের কাগজটা ভাঁজ করে বললেন, চিনতে পারলেন না তো!

আমি বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কাগজ পড়া মাথায় তুলে হন্যে হয়ে ভাবতে শুরু করলাম? কোথায় দেখেছি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে? কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

বৃদ্ধ রঙ্গ করে বললেন, গত মাসে ব্যান্ডেলে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেন ভুলে গেলেন! আপনার তো সকাল-বিকেল ব্রাহ্মীশাক খাওয়া উচিত।

ব্যান্ডেলে যে আমি গত মাসে নেমন্তন্ন খেতে গেছি একথা সত্যি। আমার শ্যালিকার মেয়ের বিয়ে ছিল। কিন্তু…সেখানে এই বৃদ্ধটিকে দেখেছি বলে…।

আশপাশের লোকজন কৌতূহলী হয়ে আমাদের কথা শুনছিল। ফলে আমার অস্বস্তিও ক্রমশ বাড়ছিল।

কী করব ভাবছি, এমন সময় রহস্যময় বৃদ্ধটি আমাকে বাঁচালেন। বললেন, আসুন, একটু নামি। আপনার সঙ্গে খুব দরকারি কথা আছে। কদিন ধরেই আপনাকে খুঁজছি।

আমার যথেষ্ট অবাক লাগছিল। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে ওঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম। বাস থেকে নেমে পড়লে হয়তো নিরিবিলির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালাটা শেষ করা যাবে।

মানিকতলার ট্র্যাফিক সিগনালে বাস দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমরা দুজনে নেমে পড়লাম রাস্তায়।

সামনেই একটা ছোট্ট পেট্রল পাম্প। তার পাশের আধো-অন্ধকার গলিতে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, সমীরবাবু, একটা জিনিস আপনাকে দেব। একদম খাঁটি জিনিস।

বলেই কাপড়ে জড়ানো একটা ছোট পুঁটলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে আমার হাতের মুঠোয় একেবারে গুঁজে দিলেন। বৃদ্ধের দড়ির মতো আঙুলের ছোঁয়া লাগল আমার হাতে। আঙুলগুলো হিমঘরের মতো ঠান্ডা।

আমি কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যেন দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু দেখলাম, ভদ্রলোকের চোখ দুটো আলোয় বিন্দু হয়ে জ্বলছে।

চলি, সমীরবাবু–পরে আবার দেখা হবে।

বৃদ্ধ চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন।

আমি ওই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও কোনওরকমে জিগ্যেস করলাম, কোথায় দেখা হবে?

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে হাসলেন। অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, কোথায় আবার, এই বাসেই দেখা হবে! আজকের মতন। দেখবেন সান্ধ্য আজকাল হাতে বসে আছি।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক সরু গলি ধরে হাঁটা দিলেন। আমি পিছু ডাকতে গিয়েও থমকে গেলাম। কী নামে ডাকব?

তারপর গুটিগুটি পায়ে পুঁটলিটার ওজন পরখ করতে করতে বাস-রাস্তায় এলাম। সেখান থেকে বাস ধরে সোজা বাড়ি।

বাড়িতে ঢুকেই দেরির জন্যে একপ্রস্থ মুখঝামটা খেলাম মল্লিকার কাছে। রেগে গেলে ওকে আরও কুৎসিত দেখায়। আমাদের আস্তানাটার মতো ওর শরীরটাও শুধু হাড় আর পাঁজর দিয়ে তৈরি। তার ওপর বারো মাসের মাথাব্যথার রুগি।

তপতী একটু দূর থেকে আমাদের ঝগড়া দেখছিল। বোধহয় ভাবছিল, ঠিক কখন থেকে ও মায়ের পক্ষ নেওয়া শুরু করবে।

মা-মেয়ের এই নিত্য আক্রমণ আমি আর সইতে পারি না। তপতীটার বিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচতাম। আমার বোঝা অন্তত অর্ধেকটা কমত। কিন্তু সেটাই বা হচ্ছে কই!

সুতরাং নেহাতই আত্মরক্ষার জন্যে হাতের পাকানো খবরের কাগজটা তেলচিটে ময়লা বিছানার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, আজ আমার অফিসের একজন চেনা লোক আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।

ওদের কাছে ভুলেও সত্যি কথা বলা যাবে না। বললে দুজন দু-পাশ থেকে প্রশ্নে-প্রশ্নে আমাকে একেবারে নাজেহাল করে দেবে। ওরা লালবাজার কি সি. বি. আই.-তে চাকরি নিলে দারুণ উন্নতি করতে পারত।

কথা শেষ করেই পুঁটলিটা আমি পকেট থেকে বের করে ফেলেছি। আর ঘরের মলিন বালবের আলোয় সেটা খুলেও ফেলেছি চটপট।

দেখি পুটলির মধ্যে রয়েছে সাতটা ঝিকিমিকি লাল আর সবুজ পাথর।

আমরা তিনজনেই পাথর হয়ে গেলাম।

মল্লিকা আর তপতী লোভ-চকচকে চোখে অপলকে তাকিয়ে রইল পাথরগুলোর দিকে। আমাকে প্রশ্ন করতে ভুলে গেল ওরা। আর করলে কী-ই বা জবাব দিতাম আমি!

পাথরগুলো নিশ্চয়ই খুব দামি। কিন্তু একজন অজানা-অচেনা লোক এগুলো শুধু শুধু কেন দিয়ে গেল আমাকে! ব্যান্ডেলের বিয়েবাড়িতে সত্যিই কি ওই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার?

প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল। পাথরগুলো চলে গেল মল্লিকা আর তপতীর জিম্মায়। ওরাই এখন এগুলোর মালিক। নিজেরা বোঝাঁপড়া করে ভাগাভাগি করে নেবে। তখনও কি ছাই জানি, আর এক আশ্চর্য ঘটনা অপেক্ষা করে রয়েছে আমার জন্যে! সকাল হলেই নতুন এক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি মল্লিকা বা তপতী কেউই বাড়ি নেই। ঘর খালি, রান্নাঘর খালি, কলতলা খালি। গোটা বাড়ি শুনসান। কোথায় গেল ওরা।

জুতো-চটি ইত্যাদি পরীক্ষা করে বুঝলাম, ওরা কেউ বাড়ির বাইরে যায়নি। অথচ বাড়ির ভিতরেও নেই। তা হলে কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

সকাল থেকে চা নেই, জলখাবার নেই, রান্না বন্ধ। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পাথরগুলোর কথা জানতে পেরে কোনও গুণ্ডার দল ওদের কিডন্যাপ করল নাকি! ঠিক করলাম, ঘণ্টা দু-তিন অপেক্ষা করে তারপর থানায় খবর দেব। কিন্তু পুলিশে জানালেও তো আর-এক ঝকমারি! কোথা থেকে ওই দামি পাথরগুলো পেলাম, তার কী জবাব দেব?

ফাঁকা বাড়িতে নিরিবিলি বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই কেমন যেন একঘেয়ে লাগতে শুরু করল। মনে পড়তে লাগল আমার বিয়ের কথা, ফুলশয্যের কথা। তারপর তপতীর জন্মের পর আমাদের আড়াইজনের জীবন। তখনও অভাব ছিল, কিন্তু সে-অভাব সইবার মনের জোর ছিল। আর এখন…।

কখন যেন আনমনে মল্লিকার নামটা ডেকে উঠেছিলাম। হঠাৎই সাড়া পেলাম, তুমি কোথায়? তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন! চারপাশটা কী অন্ধকার।

আমি চমকে উঠলাম। চারপাশে তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। তা হলে কি ব্যাপারটা আমার মনের ভুল?

মনের ভুল যে নয় সেটা বুঝলাম তপতীর গলা শুনে : বাবা, তুমি কোথায়? আমার এখানে ভয় করছে।

আমি আকুলভাবে ওদের নাম ধরে ডেকে উঠলাম ও মল্লিকা! তপতী!

ওরা ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার চোখের সামনে ওরা কি আর কখনও আসতে পারবে না? আমি দু-হাতে শূন্য হাতড়ালাম। সবটাই শূন্য। শুধু ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। তা হলে কি ওরা অশরীরী হয়ে গেছে?

আমার কান্না পেতে লাগল। ঘরের চারপাশটা দেখলাম। কত ঝগড়া, কত ভালোবাসার সাক্ষী ঘরের এই চারটে পুরোনো দেওয়াল!

সেদিন অফিসে না গিয়ে আমি সারাদিন ধরে মল্লিকা আর তপতীর সঙ্গে কথা বললাম। ওদের সঙ্গে এত কথা যে আমার বলার আছে তা আগে কখনও বুঝিনি।

ওরা আমাকে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলল।

লাল আর সবুজ পাথরগুলো ওরা মা-মেয়েতে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ছুঁয়ে টের পেয়েছিল, পাথরগুলো কী অদ্ভুত ঠান্ডা। রাতে ঘুমোনো পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু তারপরই ওরা দ্যাখে, চারপাশটা অন্ধকার–আর পাথরগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

এরপর থেকেই চলেছে এক অদ্ভুত জীবন। আমি একা মানুষ বাড়িতে থাকি। নিজে হাতে চা করি, রান্না করি, খেয়েদেয়ে অফিসে যাই। আর বাড়িতে যতক্ষণ থাকি সারাক্ষণ বউ আর মেয়ের সঙ্গে গল্প করি। মাঝে-মাঝেই ওরা বলে, এখানে কী কষ্ট! এই অন্ধকারে আর থাকতে পারছি না। মা গো!

আমি সেই আর্তনাদ শুনে ডুকরে উঠি, নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুড়ি। কিন্তু তার বেশি আর কিছু করতে পারি না।

যতই দিন যেতে লাগল তপতী আর মল্লিকার কথা অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল, ওরা যেন বহুদূর থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে। ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। আমার কাছ থেকে। যেমন, যদি মল্লিকাকে আজ দুপুরে জিগ্যেস করি, তোমার মাথাব্যথাটা কেমন আছে? কমেছে? তা হলে পরদিন ভোরবেলা ওর উত্তর শুনতে পাই। যেন আমার কথা বাতাসে ভেসে ওর কাছে পৌঁছোতে বেশ সময় লাগছে। আবার উত্তর ফিরে আসার সময়েও ঠিক তাই।

তপতী মাঝে-মাঝে বলে, বাবা, তোমার কথা খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে।

মল্লিকাও বলে, আর একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না।

বুঝতে পারছি, আমার হাতে আর সময় নেই। এইভাবে দূরে সরতে সরতে ওরা একেবারে মিলিয়ে যাবে। এমনিতেই আমি আমার অশরীরী সংসার নিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছি, তার ওপর যদি ওরা চিরকালের মতো হারিয়ে যায় তা হলে…।

তাই আমি প্রতিদিন সন্ধেবেলা বাসের ভিড়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে খুঁজি। থুতনিতে সামান্য খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল প্রায় সাদা। চোখের মণি যেন আলোয় ফুলকি। নাকের ওপরে হাই পাওয়ারের চশমা। আর হাতে সান্ধ্য আজকাল।

আমি পাগলের মতো প্রতিটা দিন কাটাই, আর পাগলের মতো সেই বৃদ্ধ লোকটিকে খুঁজে বেড়াই–যে লাল-সবুজ ঝিকিমিকি পাথর দিয়ে আমার জীবন পাথর করে দিয়েছে।

আপনি কি তাকে দেখেছেন? দেখতে পেলে অবশ্যই সান্ধ্য আজকাল-এর দপ্তরে অন্তত একটা পোস্টকার্ড দিয়ে জানাবেন। আমি যে তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।

দয়া করে আমাকে বাঁচান। সংসার-হারানো এক প্রৌঢ়কে দয়া করে সাহায্য করুন। আপনার কাছে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

.

গল্পটা পড়া শেষ করে রমাপদবাবু কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন। ভারি অদ্ভুত গল্প তো! গল্প, নাকি সত্যি?

খবরের কাগজটা ভাজ করে সতর্ক চোখে চারপাশটা একবার দেখে নিলেন রমাপদবাবু। যেই একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলতে যাবেন অমনি বাঁ-পাশ থেকে কে যেন ডেকে বলল, কী ব্যাপার, রমাপদবাবু! চিনতে পারছেন?

রমাপদবাবু চোখ ফেরালেন। বাঁ দিকে আড়াআড়ি সিটে জানলার দিকে পাশেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর হাতে এক কপি সান্ধ্য আজকাল।

রমাপদবাবুর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ হাসলেন। হাতের কাগজটা ভাঁজ করে বললেন, চিনতে পারলেন না তো!

# ঝামেলা ও লম্ফমান ফুটবল

**ঝামেলা ও লম্ফমান ফুটবল**

খেলতে-খেলতেই ঘটে গিয়েছিল আশ্চর্য ব্যাপারটা। ৬ কলকাতা শহরে তখন দি-ফাটা ঝা-ঝাঁ গরম। মাঠে-মাঠে ফুটবল, আর ঘরে-ঘরে টিভি তে ক্রিকেট। খেলা নিয়ে তুমুল হইচই নানা জায়গায়, সকলের মুখে শুধু খেলার কথা। এমনকী বাচ্চা রোবট ঝামেলাও খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

একদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে বসে ভারত-পাকিস্তানের একটা ওয়ানডে ম্যাচ দেখছিল যমজ দু-ভাই চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত–যাদের ডাকনাম ঝালাপালা। ওদের সবসময়ের সাথী তিনফুট হাইটের পিকিউলিয়ার রোবট ঝামেলা দু-ভাইয়ের গা ঘেঁষে বসে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। শচীন তখন একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলছিল। কোনও বলকে তোয়াক্কা না করে শুধু চৌকা আর ছক্কা লাগাচ্ছিল। ঝালাপালা বারবার খুশিতে চিৎকার করে উঠে হাততালি দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই ঝামেলা ওর মিহি গলায় মন্তব্য করল, এই সাহসী ছেলেটা তোমাদিগের তুলনায় যারপরনাই উন্নত প্রাণী। বিবর্তনের পথে তিরবেগে ছুটে অস্বাভাবিক অগ্রসর হইয়াছে। আর কিঞ্চিৎ সুযোগ পেলে আমার ন্যায় সুপারম্যানকেও হয়তো বা স্পর্শ করিয়া ফেলিবে।

ঝামেলার এই এক দোষ। যখন-তখন জ্ঞান দিতে শুরু করে। ওর ধারণা, বানর থেকে এসেছে মানুষ আর মানুষ থেকে বিবর্তন হয়ে এসেছে রোবট। তাই ও নিজে হল সুপারম্যান। সেইজন্যই ও মাঝে-মাঝে ঝালাপালাকে শুনিয়ে দেয়, কোন আদ্যিকালে তোমরা পড়ে আছ ভাবিলে বড় সরো হয়। সরো মানে যে দুঃখ সেই তথ্যটি অবগত আছ তো!

ঝামেলার ভাষা ভারী অদ্ভুত। কথ্য ভাষা, সাধু ভাষা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত মিশিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ভুলভাল যা খুশি বলে যায়। আবার উচ্চারণ কঠিন হলে আটকেও যায়।

ঝামেলার জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য শুনে ইন্দ্রকান্ত বলল, অতই যখন নিজেকে বড় ভাবো, তা হলে শচীনের বদলে ইন্ডিয়া টিমে ঢুকে পড়লেই পারো!

ঝামেলা এ-কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে বলল, আমি ব্যাট ধরিলে ক্রিকেট হিস্টিরিয়া নূতন করিয়া লিখতে হবে।

ও বোধহয় হিস্ট্রি বলতে চাইছে। ইন্দ্রকান্ত বলল।

ঝামেলা রিনরিনে গলায় হেসে উঠল, তারপর চন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদিগকে লইয়া যে কী করি! এই সহজ ওয়ার্ডটিরও মানে জানো না!

ইন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলল, ঝামেলা স্ট্যাচু!

সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলা যেন পাথরের স্ট্যাচু হয়ে গেল।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল, এ চিজকে ট্রেনিং দেওয়া কি সহজ কথা!

ঝামেলাকে জটিল প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করেছে ঝালাপালার ছোটকা প্রসেনজিৎ চৌধুরী। ইলেকট্রনিক্সবিদ্যায় ছোটকার জুড়ি নেই। ছোটকা চাকরি করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। নানান কাজে ওকে সবসময়েই দেশে-বিদেশে উড়ে বেড়াতে হয়। এখন, কিছুদিন হল, কলকাতার অফিসে আছে।

ঝালা-পালা ছোটবেলায় ভীষণ কান্নাকাটি চেঁচামেচি করত, সকলের কান একেবারে ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা আদর করে ওদের নাম দিয়েছে ঝালাপালা। আর উপহার দিয়েছে এই বাচ্চা রোবট ঝামেলা। ছোটকা বলেছে, তোরা রোবটটাকে ভালো করে ট্রেনিং দে। কিন্তু ট্রেনিং ওরা দেবে কী, উলটে ঝামেলার কাছেই ওদের ট্রেনিং নেওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েকদিনেই ঝামেলা কী করে যেন খেলা-পাগল হয়ে উঠেছে। ঝালাপালা যখন বিকেলে মাঠে খেলতে বেরোয় তখন ঝামেলা বরাবরই হেলেদুলে ওদের সঙ্গ নেয়। কিন্তু কোনওদিনও খেলব বলে বায়না ধরেনি। আজ বিকেলে দু-ভাই যখন

কেডস জুতো পরে ফুটবল খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখনই ঝামেলার আবদার শুরু হল।

আমিও ফুটবল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করব। ছোটকাকে বলে আজকেই আমাকে তোমাদিগের ন্যায় কম্বলের জুতা কিনিয়া দাও।

ঝামেলার ভাষায় আজকে মানে এখনই। আর কম্বলের জুতো মানে যে কেস জুতো সেটা ঝালাপালা স্পষ্ট বুঝতে পারল। ওরা ঝামেলাকে অনেক করে বোঝাল যে, ফুটবলের মতো বাজে খেলা আর হয় না। ফুটবল খেলায় বিপদের অনেক ঝুঁকি। যে-কোনও সময় হাত-পা ভাঙতে পারে।

এতসব ভয়ংকর কথা শোনার পরেও ঝামেলার সেই এক গোঁ : পেলে যদি নির্ভয়ে খেলিস্যান্তি তা হলে আমিও পারন্তি। অর্থাৎ, পেলে যখন নির্ভয়ে খেলতে পেরেছে তখন আমিও পারব।।

ঠিক আছে, ছোটকা অফিস থেকে বাড়ি ফিরুক, তখন একটা ব্যবস্থা করব। ইন্দ্রকান্ত ঝামেলার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল।

চন্দ্রকান্ত ওকে ক্যাডবেরি খাওয়াবে বলে আশ্বাস দিল।

অনেক বাবা-বাছা করার পর ওরা ঝামেলাকে রাজি করিয়ে রাস্তায় বেরোল। ওদের সঙ্গে হেলেদুলে যেতে-যেতে ঝামেলা বারবারই জিগ্যেস করতে লাগল, ছোটকাবাবু কব আয়েগা? তাঁহাকে অফিসে টেলিফোন করিয়া দাও।

.

যখন ওরা ফুটবল খেলার মাঠের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে তখন ঝামেলা হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে উঠল। ওর কপালের লাল-নীল-হলুদ বাতিগুলো জ্বলতে নিভতে শুরু করল। ও হাততালি দেওয়ার চেষ্টা করে মিহি গলায় উল্লাসের সুরে বলতে লাগল, ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা! ব্রায়ান লারা একটি ফোর আঘাত করিয়াছে!

ঝালাপালা বুঝতে পারল লারা এইমাত্র একটা বাউন্ডারি মেরেছেন। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে খেলা। টিভিতে তারই লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। আশপাশের কোনও বাড়ির টিভির ধারাবিবরণী নিশ্চয়ই

ঝামেলার কানে এসে পৌঁছেছে। ওর কান এমনভাবে তৈরি যে, বহুদূরের শব্দ ও স্পষ্ট শুনতে পায়, আর আলট্রাসনিক শব্দও ওর কান এড়িয়ে যেতে পারে না। এ ছাড়া ওর চোখ দুটো পুঞ্জাক্ষি–দেখে মনে হয় কাচের তৈরি টেনিসবল–ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। অনেক জটিল লেন্স জুড়ে তৈরি এই চোখ দিয়ে ও প্রায় একমাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

ঝামেলার এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে দু-ভাই হিংসে করে। একদিন ইন্দ্রকান্ত ছোটকাকে বলেছিল ওদের কান আর চোখ ঝামেলার মতো পাওয়ারফুল করে দিতে। তাতে ছোটকা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, বলেছিল, তা কখনও হয়! তোরা হলি মানুষ, আর ঝামেলা হল মেশিন। তা ছাড়া তোদের ওইরকম কান আর চোখ করে দিলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে।

মাঠে পৌঁছে ঝালাপালা দেখল খেলা শুরু হয়ে গেছে। ওদের বন্ধুর দল একটা ফুটবল নিয়ে দিব্যি পেটাপিটি করছে আর নিজেদের মধ্যে হইচই চিৎকার করছে।

মাঠের একপাশে সুন্দর ফুলের গাছ। তার গা ঘেঁষে সরু পিচের রাস্তা। অনেকে সেখানে পায়চারি করছে। কেউ-কেউ বসে আছে ঘাসের ওপরে। বেশ কয়েকজন তাদের পোষা রোবট সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে বলল, তুমি অন্য রোবটদের সঙ্গে খেলা করো। দেখো, আবার যেন কোনও ঝামেলা পাকিয়ো না।

ঝামেলা তৎক্ষণাৎ হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করল। সামনেই একটা লম্বা রোবট ঝুঁকে পড়ে ফুলের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঝামেলা অবাক হয়ে তার মাথার দিকে তাকিয়ে রইল। কী লম্বা রোবটরে বাবা! মনে-মনে ভাবল ঝামেলা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঝামেলা লম্বা রোবটটাকে প্রশ্ন করল, তুই এত লং কেন রে?

রোবটটা তার ধাতব ঠোঁট চওড়া করে বোধহয় হাসতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, আমার বাড়ি শিলং, তাই। কিন্তু তুই এরকম ন্যাড়া কেন?

ঝামেলাকে কেউ ন্যাড়া বললে ও ভীষণ চটে যায়। ও খেপে গিয়ে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই ফুটবল খেলার মাঠের দিক থেকে একটা

প্রচণ্ড হইহই শোনা গেল।

ঝামেলার সব ব্যাপারেই কৌতূহল বড় বেশি। সুতরাং ঝগড়া মুলতুবি রেখে ও হেলেদুলে রওনা হল ঝালাপালার দলবলের দিকে।

মাঠে তখন একটা বিচিত্র কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝালাপালাদের ফুটবলটা মাঠে একনাগাড়ে ড্রপ খেয়ে চলেছে।

ফুটবল যে শূন্যে উঠলে আবার মাটিতে পড়বে, ড্রপ খেয়ে আবার শূন্যে লাফিয়ে উঠবে, এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই। আর এটাই স্বাভাবিক যে, ফুটবলটার লাফ ক্রমশ কমে আসবে এবং একসময় তার লাফালাফি একেবারে থেমে যাবে।

কিন্তু ঝালাপালাদের ফুটবলটার বেলায় সেরকম কিছু হচ্ছে না। ফুটবলটা ঠিক যতটা উঁচু থেকে নীচে এসে পড়ছে, ড্রপ খেয়ে আবার ঠিক ততটাই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

ঝামেলা অবাক হয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগল।

লাফানো বলটাকে ঘিরে তখন ভিড় জমে গেছে। খেলতে আসা ছেলের দল তো বটেই, এ ছাড়া রয়েছে নানানবয়েসি লোকজন–সবাই একজোট হয়ে হাঁ করে বলটার কীর্তিকলাপ দেখছে। কয়েকটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে কীসব বলাবলি করছে। বোধহয় বলটাকে নিয়েই আলোচনা করছে।

চারপাশের চিৎকার, গুঞ্জন, হাসাহাসি মিলেমিশে এক জটপাকানো কোলাহল তৈরি হয়েছে বলটাকে ঘিরে।

ওই ডামাডোলের মধ্যে চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত কী করে যে ঝামেলাকে খুঁজে বের করল কে জানে! ওদের ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েই ঝামেলা দ্যাখে দু-ভাই ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে।

ওদের কাছেই পুরো ব্যাপারটা শুনল ঝামেলা।

দিব্যি নাকি ফুটবল খেলা চলছিল। হঠাৎই ওদের এক বন্ধু বুবু জোরে একটা স্কাই শট মারে। তাতে বলটা প্রায় তিনতলার সমান শূন্যে উঠে যায়। বলটা মাটিতে নেমে আসার সময় ওদের আর একজন বন্ধু অপু ছুটে যায় বলটাকে শট মারতে। কিন্তু কীভাবে যেন ওর শট ফসকে যায়। তখন সবাই অবাক হয়ে দ্যাখে যে, বলটা আবার তিনতলার সমান উঁচুতে উঠে গেছে। এই ব্যাপার দেখে সবাই বেশ ভয় পেয়ে যায়। কে একজন বলে যে, বছর পনেরো আগে একজন ফুটবল খেলোয়াড় মাঠের ধারের একটা বকুলগাছে গলায় দড়ি দিয়েছিল। এ নাকি তারই প্রেতাত্মার কারসাজি। এ কথা শুনে সবাই সরে যায়, আর বলটা আপনমনে তিনতলার সমান লাফাতে থাকে। এখন কী করা হবে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

সব কথা শোনার পর বুকে হাত ঠুকে ঝামেলা বলল, একটি লক্ষ্যমান ফুটবলকে ভয় পাওয়ার যে কী কারণ থাকিতে পারে তাহা কিছু বুঝতে পারছি না। রবিঠাকুর বলে গেছেন, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা। তোমরা কি তাহা জানো না?

ইন্দ্রকান্ত ঝামেলার রণং দেহি ভাবসাব দেখে বলল, তুমি কি জানো, কে যেন বলে গেছেন, হাতি-ঘোড়া গেল তল/মশা বলে কত জল?

আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া কোনও প্রফিট হইবে না। ঝামেলা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল এবং হাঁটা দিল লম্ফমান ফুটবলের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতেই পিছন ফিরে ও চন্দ্র-ইন্দ্রকে বলল, দেশের কাজে যাচ্ছি। দয়া করে যেন ঝামেলা, স্ট্যাচু বলে আমাকে বাধা দিয়ো না। তোমাদিগকে ভরসা করা বড়ই কঠিন।

এই কথা বলে এঁচোড়ে পাকা রোবট রওনা দিল বলের দিকে, আর ঝালাপালা ওকে অনুসরণ করল। এই অদ্ভুত বিপদে কী করবে ওরা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময় ছোটকা থাকলে খুব ভালো হত! ওরা মনে-মনে ভাবল।

ভিড় ঠেলে চক্রব্যূহের ভেতরে ঢোকার সময় লোকজনের নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল।

মনে হচ্ছে কোনও ফুটবল প্লেয়ারের প্রেতাত্মা ফুটবলটার ওপরে ভর করেছে।

বলটার ভেতরে কোনও স্প্রিং ফিট করা নেই তো!

বলটার ভেতরে মনে হয় কোনও বাচ্চা ক্যাঙারু ঢুকে পড়েছে।

ওরা তিনজনে মাঝের গোল কঁকা জায়গাটায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। ঝামেলা লক্ষ করল, নানান মানুষজনের ভিড়ে বেশ কয়েকটা রোবটও দাঁড়িয়ে আছে। তারাও হাঁ করে লাফানো বলের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

হঠাৎই ষোলো-সতেরো বছরের একটা মোটাসোটা ছেলে ছুটে গেল বলটার দিকে। বলটা তখন নীচে নেমে আসছিল। বলটা ড্রপ খাওয়ামাত্রই ছেলেটা একটা চিৎকার করে বলটাকে জাপটে ধরল।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল।

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েই বলটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। আগের মতোই তিনতলার সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেল অনায়াসে।

মাঠের কৌতূহলী দর্শর্করা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার ছাপিয়ে কে যেন ডেকে বলল, পল্টু, ভয় পাস না। বলটাকে চেপে ধরে রাখ।

পল্টু আকাশ থেকে এই পরামর্শ শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। তবে স্পষ্ট দেখা গেল, ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। আর ও প্রাণপণে বলটাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

এইবার বলটার নেমে আসার পালা।

পল্টুসমেত বলটা নেমে আসতে লাগল।

অত উঁচু থেকে মাটিতে এসে পড়লে পল্টু যে আর আস্ত থাকবে না সেটা সকলেই বুঝতে পারল। এমনকী ঝামেলাও। তাই বাচ্চা রোবটটা কখন যেন এগিয়ে গেছে লাফিয়ে ওঠা বলটার ঠিক নীচে। তারপর বল এবং পল্টু যখন নেমে এল তখন পঞ্চাশ কেজি ওজনের ঝামেলা ওর ইস্পাতের লিকলিকে হাত পেতে ক্যাচ লোফার মতো লুফে নিল পল্টুকে।

চারপাশ থেকে এমন চিৎকারের রোল উঠল যেন শচীন তেন্ডুলকর শোয়েব আখতারের ছবলে ছটা ছক্কা হাঁকিয়েছে।

ঝামেলা পল্টুকে বাঁচাল বটে কিন্তু বলটাকে ধরে রাখতে পারল না। বল ওর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে আবার উঠে গেছে শুন্যে।

ছ-সাতজন ছেলে ছুটে গেল পল্টুর কাছে। ও তখন মাটিতে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে–বোধহয় এত ভয় আর টেনশনে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ঝামেলা শুন্যে লাফানো বলটাকে কয়েকপলক দেখল। তারপর হেলেদুলে ফিরে এল ঝালা পালার কাছে। ন্যাড়ামাথা এপাশ-ওপাশ নেড়ে মিহি গলায় বলল, কেস একেবারে নটবর। কিছু করার নেই। ছোটকাবাবুকে দ্রুত অফিসে ফোন করিয়া দাও। আমি লক্ষ্যমান বলের নিকটে হার মানিলাম।

ঝালাপালাও বুঝল গতিক সুবিধের নয়। তাই ওরা ঝামেলাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ছুটল ছোটকাকে ফোন করতে।

.

একটা পেল্লায় মাপের জিপে চড়ে ছোটকা যখন অকুস্থলে এসে হাজির হল তখন বিকেলের আলো মরে এসেছে। কিন্তু লক্ষ্যমান ফুটবল তার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এতটুকুও ক্ষান্তি দেয়নি।

ছোটকার সঙ্গে নানান যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। কালো রোগা চেহারার ছোটখাটো মানুষ। ছোটকা তাকে বর্মন বলে ডাকছিল।

চন্দ্র আর ইন্দ্র টেলিফোনেই গোটা ব্যাপারটা ছোটকাকে জানিয়েছিল। ছোটকা সব শুনে ওদের সাবধান করে দিয়ে বলেছে, তোরা সবাই চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থাক। বলটাকে মোটেই ডিসটার্ব করবি না। আমি অফিস থেকে লোকজন আর যন্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা খুব পিকিউলিয়ার ফেনোমেনন।

ছোটকাকে লটবহর নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে ভিড় করে থাকা লোকজন গলা ফাটিয়ে হইহই করে উঠল।

ঝামেলা ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা! বলে হেলেদুলে লাফাতে লাগল। ওর কপালের লাল-নীল হলুদ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল। খুব খুশি হলে অথবা উত্তেজিত হলে ঝামেলা

এইরকম করে। জাপানের আগ্নেয়গিরির সঙ্গে ওর উল্লাসের যে কী সম্পর্ক তা ও-ই জানে!

ছোটকার নানান সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চলতে লাগল। সকলে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছোটকার কার্যকলাপ খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল।

ছোটকা একটা যন্ত্র চোখে দিয়ে বলটাকে ভালো করে দেখল। সবুজ রঙের কী একটা রশ্মি ফেলল বলটার গায়ে। তারপর সেটাকে লক্ষ করে খুদে-খুদে এক ঝক মিসাইলের মতো কী যেন ছুঁড়ে দিল।

কিন্তু কোনওটাতেই কোনও ফল হল না। বলটা একরোখাভাবে লাফাতেই লাগল।

ঝামেলা ভেবেছিল ছোটকা বলটাকে থামাতে পারবে। কিন্তু ছোটকাকে ব্যর্থ হতে দেখে সে ফেসফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, আমার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসগুলি যথেষ্ট সুদীর্ঘ হইতেছে না।

ধীরে-ধীরে সন্ধের ছায়া নেমে এল মাঠে।

ছোটকা বর্মনকে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে জিপে উঠতে বলল। তারপর জমায়েত মানুষজনকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলল, আপনারা যে যার বাড়ি চলে যান। এ-লাফানি সহজে থামবে না। নিজে থেকেই যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, দেখবেন, নিজে থেকেই হঠাৎ থেমে যাবে।

তা বলে সারা রাত ধরে বলটা একা-একা অমন লাফাবে? ইন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

তাতে তোর কী! ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ছোটকা।

ওরা যখন দল বেঁধে বেরিয়ে আসছিল তখন মাঠের চারপাশে নানা জায়গায় লাগানো ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

সেই মলিন আলোয় ফুটবলটা দিব্যি একমনে লাফিয়ে চলেছে।

.

ঝালাপালা আর ঝামেলাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছোটকাকে ভীষণ আনমনা দেখাচ্ছিল। বোধহয় বল লাফানোর রহস্যের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ঝামেলা হঠাৎই ছোটকার দিকে মুখ তুলে বলল, বল উল্লউল্ল–উল্ল–।

উল্লম্ফন। ছোটকা ওকে ধরিয়ে দিল।

হ্যাঁ, বল উল্লম্ফনের পশ্চাতে প্রেতাত্মার কোনওরূপ ইয়ে নাই তো?

এ-প্রশ্নে ছোটকা হাসল না। বরং বেশ সিরিয়াস মুখে বলল, এইভাবে লাফানোর একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে…।

কী কারণ? ঝালাপালা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

কোথাও থেকে এনার্জি এসে ঢুকে পড়ছে বলটার ভেতরে। তোরা তো জানিস, একটা বল লাফাতে শুরু করলে ক্রমশ তার লাফের মাপ কমতে থাকে। এইভাবে লাফানোর উচ্চতা কমে যাওয়ার অনেক কারণ আছে? যেমন, ঘর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, বাতাসের বাধা। ফলে, শুরুতে যে-শক্তি নিয়ে বলটা লাফাতে শুরু করে, এইভাবে শক্তি খরচের জন্যে ক্রমেই তার লাফানোর শক্তি কমতে থাকে। যদি বাইরে থেকে কোনওভাবে ক্ষয়ে যাওয়া শক্তিটুকু সাপ্লাই করা যায়, তা হলে বলটার লাফের উচ্চতা আর একটুও বদলাবে না। শুধু ওটার কাইনেটিক এনার্জি পালটে যাবে পোটেনশিয়াল এনার্জিতে, আবার পোটেনশিয়াল এনার্জি পালটে যাবে কাইনেটিক এনার্জিতে। এইভাবে গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তির রূপবদল হয়। তবে লাফানোর সময় যে-কোনও পজিশনে বলটার গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তির যোগফল একই থাকে।

বলটাকে ক্ষয়ে যাওয়া এনার্জির জোগান দিচ্ছে কে? চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।

ছোটকা খানিকটা আনমনাভাবে বলল, ফানেল দিয়ে যেমন তেল ঢালে, সেইরকমভাবে বলটার মধ্যেও কেউ এনার্জি ঢেলে দিচ্ছে। যেহেতু ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেহেতু মনে হচ্ছে, ফোর্থ ডায়মেনশনের কোনও একটা বিন্দু থেকে আমাদের থ্রি ডায়মেনশনের দুনিয়ায় একটা এনার্জি টানেল তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের মতো ব্ল্যাক হোল আর হোয়াইট হোলকে যে-ব্রিজ জুড়ে দেয়। যাক গে, বাদ দে-ওসব বিজ্ঞানের কচকচি তোরা বুঝবি না। শুধু এটুকু বুঝে নে, সেই অদৃশ্য এনার্জি টানেলের একমাথায় আছে

একটা উৎস, আর এই মাথায় রয়েছে এই ফুটবলটা। বলটা ফোর্থ ডায়মেনশন থেকে এনার্জি সাপ্লাই পেয়ে চলেছে। তবে টানেলের এ-প্রান্তে বলটা যে কী করে হঠাৎ জুড়ে গেল তা বলতে পারব না। যখন টানেলটা আবার বল থেকে সরে যাবে, তখন এনার্জি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে–তা হলেই বলটা স্বাভাবিক নিয়ম মেনে থামবে। তার আগে নয়।

ওঃ ব্বাবা! একটা বল লাফানোর পেছনে এত কাণ্ড! ইন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বলল।

ছোটকা গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, সত্যি-সত্যি এত কাণ্ড আছে কি না জানি না। আমি শুধু সায়েন্সের দিক থেকে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

ঠিক তখনই ঝামেলা মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এইমাত্র একটি চারের সাহায্যে ব্রায়ান লারার সেঞ্চুরি পূর্ণ হইল। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!

# আস্তিনের তাস

## আস্তিনের তাস

প্রথমে হুমকি দেওয়া কয়েকটা ফোন পেয়েছিলাম। তারপর অফিসে দুবার হানা দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপর আর আসতে পারেননি।

প্রথমবারে যখন আসেন তখন ওঁর চেহারায় পরিপাটি একটা ব্যাপার ছিল। ভেতরে উত্তেজনা থাকলেও মুখে শান্ত ভাব বজায় রেখেছিলেন। আমার চেম্বারে ঢুকে পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, আমি সীমারেখার হাজব্যান্ড-অশোকেন্দু–মানে, অশোক বোস…।

সীমারেখা। ওর শরীর আর যৌবনের কোনও সীমানা নেই। তাই ওকে সবসময় আমি অসীমা বলে ডাকতে ভালোবাসি।

এই লোকটা–এই কালো চেহারার হোঁতকা কালাচাঁদ পাবলিকটা সীমারেখার স্বামী! ভাবাই যায় না।

সীমা অবশ্য বলেছিল, ওর স্বামীকে কুৎসিত দেখতে–শুধু দেখতে নয়, ভেতরটাও কুৎসিত। সুযোগ পেলেই ওকে মারধোর করে। আর ওই স্যাডিস্টটার সঙ্গে বিছানা মানে লাঞ্ছনা আর যন্ত্রণা।

আমি লোকটাকে বসতে বলিনি ইচ্ছে করেই। কারণ, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তা হলে এই লোকটাই গত কদিন ধরে আমাকে টেলিফোনে হুমকি দিচ্ছে।

সে কথাই জিগ্যেস করলাম অশোকেন্দুকে। এবং আশ্চর্য! তিনি মুখের ওপরে সোজাসাপটা বলে দিলেন, হ্যাঁ–আমিই। আপনি সীমার সঙ্গে বৃন্দাবনটা এবার বন্ধ করুন। নইলে…।

নইলে কী? শান্ত চোখে অশোকেন্দুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম।

নইলে আজেবাজে কিছু হয়ে যেতে পারে। আমি সিরিয়াসলি বলছি। সেইজন্যেই ফোন ছেড়ে আপনার অফিসেই সোজা চলে এসেছি। আপনাকে এটাই আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট…।

একবার মনে হল, লোকজন ডেকে হতচ্ছাড়া স্বামীটাকে কষে পালিশ করাই। কারণ, এই অফিসটার মালিক আমি। আমার মুখের কথা এই অফিসের সংবিধান।

কিন্তু একটু পরেই মনে হল, না, তাতে কেচ্ছা ছড়াবে। তাই ওঁকে বসতে বলে ঠান্ডা গলায় কথা বলেছি। এমনকী বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কও আনিয়ে দিয়েছি।

অনেক করে বুঝিয়েছিলাম অশোকেন্দুকে। বলেছিলাম, দেখুন, ব্যাপারটা শুধু আমার একার নয় সীমাও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ওকে আমি যেমন ভালোবাসি, তেমনই ও-ও আমাকে…। মানে, আপনি ডির্ভোস টাইপের কিছু ভাবতে পারলে ভালো হত। মানে, আমাদের বাকি লাইফটা…।

অসম্ভব। সীমারেখাকে আমি হার্ট অ্যান্ড সোলমানে, ওকে ছাড়া লাইফ আমি ভাবতেই পারি না। ও আমার কাছে.আমার কাছে…।

অশোকেন্দুর গলা কাঁপছিল। কিছু কিছু হাজব্যান্ড এমন সেন্টিমেন্টাল হয় যে, লজিক বুঝতে চায় না। এটাও দেখছি সেই টাইপের।

আমার চেম্বারে এসি চলছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সীমারেখার স্বামী ঘামছিল। লোকটা কি অন্য কোনও মতলব নিয়ে এসেছে নাকি? বারবার প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে, বের করছে। কেমন যেন উশখুশ করছে।

আমার সন্দেহ ধীরে ধীরে বাড়ছিল। লোকটা কেমন যেন একটা দোটানায় ভুগছে।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না। অশোকেন্দু তীক্ষ্ণ নজরে আমাকে মাপছিলেন। সীমারেখাকে হারানোর ভয়টা ওঁর মুখে ছেয়ে ছিল।

আশ্চর্য! কদিন আগেও যে-মানুষটা আমাকে মোবাইল ফোনে হুমকি দিচ্ছিল, আজ সে একেবারে তুলতুলে টুলটুলি!

অশোকেন্দুর চোখের কোণে দু-একফোঁটা জলও দেখতে পেলাম। মনে হল, বউকে তিনি সত্যি সত্যিই ভালোবাসেন। কিন্তু কী করব? আমিও যে ওঁর বউকে ভালোবাসি!

অশোককে আমি বললাম, দেখুন, প্রবলেমটা ডিসকাস করার জন্যে আমার এই চেম্বারে আপনি আসতে পারেন...তবে একটু সন্ধে করে আসবেন। তখন অফিস একেবারে ফঁকা হয়ে যায়– ডিসটার্ব করার কেউ থাকে না। আমি তো মাঝে-মাঝে একা-একা বসে একটু এনজয়ও করি... হাত বাড়িয়ে আমার ঠিক পেছনে টাঙানো একটা ভারী পরদা সরিয়ে দিলাম। তাকে সাজানো গ্লাস আর বোতলগুলো দেখা গেল। একটা শ্বাস টেনে বললাম, একদিন সন্ধের পর আসুন...দুজনে মিলে একটু ঠুনঠুন পেয়ালা করা যাবে। সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও রাখব। আপনার ভালো লাগবে...আই প্রমিস...।

অশোকেন্দু এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি ঘেন্না করার মতো একটা কুপ্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমি ওঁর চাউনি গায়ে মাখলাম না। জীবন কখন কী বাঁক নেয় কে বলতে পারে! হয়তো একদিন এই লোকটাই ছুটে আসবে আমার কাছে আমার আসরে ভাগ বসাতে চাইবে।

শেষ পর্যন্ত আমাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে অশোকেন্দু চলে গেলেন।

অশোকেন্দু যখন দ্বিতীয়বার হানা দিলেন তখন ঠিক, যা ভেবেছিলাম, তাই হল। আমার একক আসরে ভাগ বসালেন তিনি। তবে তার আগে যেসব কাণ্ড হল তা রীতিমতো মারাত্মক।

রাত প্রায় আটটার কাছাকাছি। অফিসে আমার চেম্বারে একা-একা বসে একটু ঢুকুটুকু করছিলাম। হঠাৎই এসি রুমের কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল অশোকেন্দুন্দ্র বোস।

ওঁর যা চেহারা দেখলাম তাকে এককথায় বলা যায় উদভ্রান্ত।

চোখের কোল বসে গেছে। মাথার চুল উশকোখুশকো। শার্টের দুটো বোতাম খোলা। কপালে ঘামের ফোঁটা। অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছেন।

ঘরে ঢুকেই আমার গ্লাসটপ টেবিলের ওপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন অশোক : সীমারেখা কোথায়?

আমি হাসলাম। বললাম, উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন।

শিগগির বলুন–রেখা কোথায়? অশোকেন্দুর গলা কাঁপছিল।

আমি আর-একটা গ্লাস তৈরি করলাম। সুরা, সোডা এবং জল যথাযথ অনুপাতে মেশালাম। ওঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে শান্তভাবে বললাম, বসুন। এটা খেয়ে একটু রিল্যাক্স করুন। আপনি এসেছেন…ভালোই হয়েছে। আপনার সঙ্গে কতকগুলো জরুরি কথা আছে।

আমার নির্লিপ্ত মেজাজ দেখে অশোক কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। ওঁর উত্তেজনার বারুদে ধীরে-ধীরে যেন জল পড়ল। জামার হাতা দিয়ে মুখ মুছলেন। চোখও। তারপর ধরা গলায় বললেন, পরশু থেকে রেখাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে আপনার ইস্যুটা নিয়ে ওর সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছিল। তাতে ও রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ভেবেছিলাম দু-চার ঘণ্টা পর ফিরে আসবে– কিন্তু আসেনি। পরদিন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি। সরাসরি সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না–তাতে নিজেদেরই কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে। বড়-বড় শ্বাস নিলেন অশোক। চেয়ারে বসতে গিয়েও বসলেন না। গ্লাসটা ধরতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, ..তবু যতটা সম্ভব ঠারেঠোরে খোঁজ নিয়েছি। খোঁজ পাইনি। সীমারেখা কোথায় কেউই বলতে পারল না। তখন বাকি রইলেন আপনি…।

কথা বলতে বলতে টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে আমার কাছাকাছি চলে এলেন অশোক। আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, তুই-তুই সব জানিস। বল, রেখা কোথায়?

অশোক কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বটে, তবে একইসঙ্গে মসৃণ ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে আমার গলায় চেপে ধরেছেন।

চেঁচালেই গলা ফাঁক করে দেব। বল, রেখা কোথায়।

আমি ভয় পেলাম। হঠাৎই গলা শুকিয়ে জিভটা শিরীষ কাগজের টুকরোর মতো ঠেকল। কিন্তু বেশ কষ্ট করে মুখের হাসি-হাসি ভাবটা বজায় রাখলাম।

কারণ, কানের নীচে ছুরির ধারালো চাপটা টের পাচ্ছিলাম। কোনওরকমে আওয়াজ বের করে বললাম, বলছি সব বলছি। আপনি প্লিজ ঠান্ডা হয়ে বসুন। প্লিজ…।

অশোকেন্দু কী ভাবলেন। গলায় ছুরির চাপটা নরম হল। বুঝলাম, মানুষটার একরোখা ভাব একটু কমেছে। তাই লোহা গরম থাকতে-থাকতে পেটানো দরকার সেই সূত্র মেনে অনুরোধ উপরোধের বন্যা বইয়ে দিলাম।

কাজ হল। অশোকেন্দু আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন। ছুরিটাকে ঢুকিয়ে ফেললেন পকেটে। তারপর ও এবার বলুন, সীমারেখা কোথায়?

আমি গলায় বারকয়েক হাত বুলিয়ে বললাম, আপনি এক্সাইটেড হয়ে এসব কী কাণ্ড করতে যাচ্ছিলেন? যদি সত্যিই ওই ছুরিতে একটা অঘটন ঘটে যেত, আপনি কি পার পেতেন? সীমারেখাই পুলিশে খবর দিত। হয়তো একথাও বলত যে, আমার মার্ডারের ব্যাপারে আপনাকেই ও সন্দেহ করে…।

অশোকেন্দু অদ্ভুতভাবে হাসলেন, বললেন, অত ভেবে মানুষ খুন করে না। তা ছাড়া খুনের সাক্ষী পুলিশ পাবে কোথা থেকে? আপনার অফিসে তো এখন একটা দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। ঢোকার সময় ওকে পাঁচশো টাকা বকশিশ দিয়েছি। টাকা নিয়ে ও হাওয়া খেতে গেছে। ও ফিরতে-ফিরতে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আপনার চেম্বারে ঢোকার প্যাসেজের দরজাটা আমি ভেতর থেকে লক করে দিয়েছি। এখানে আমাদের কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না…। টেবিলে আঙুলের টোকা মেরে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন। তারপর : আর সীমারেখার কথা বলছেন? আপনি খরচ হয়ে গেলে প্রথম কদিন হয়তো ও কান্নাকাটি করবে। তারপর সামলে নেবে। আর পুলিশ- টুলিশে খবর ও দেবে না। আপনিই যখন আর নেই তখন পুলিশে খবর দিয়ে ও শুধু শুধু কেন কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির পাবলিসিটি করবে? বরং দু-বেলা খাওয়া-পরা-ফুর্তির নিশ্চিন্ত জীবনকেই বেছে নেবে। আমার টাকায় লাইফকে এনজয় করতে রেখা ভালবাসে…আবার হাসলেন– তবে এবারের হাসিটা আত্মবিশ্বাসের : …তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছেন?

আমি ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লাম, বললাম, হু, বুঝতে পারছি।

তা হলে শিগগির বলে ফেলুন, সীমারেখা কোথায়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম : নাঃ, আর লুকিয়ে লাভ নেই। সত্যি কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি…।

গুড। ঠোঁট বেঁকিয়ে সামান্য হাসলেন অশোকেন্দু।

ওঁর গ্লাসটার দিকে ইশারা করে বললাম, নিন। চিয়ার্স।

অশোক গ্লাসটা এবার নিলেন, চুমুক দিলেন। আমার কথা শোনার জন্যে ওঁর চোখ আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

টেবিলের একপাশে একটা শৌখিন টিফিনবক্স রাখা ছিল। সামান্য ঝুঁকে পড়ে ওটা কাছে টেনে নিলাম।

স্টিলের ঢাকনাটা খুলতেই মাটন কাবাবের ফুরফুরে গন্ধ ঝাপটা মারল। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম দিয়ে ফ্রাই করা ছোট-ছোট বোনলেস মাংসের টুকরো।

আমার চেয়ারের পেছনের পরদা সরিয়ে একটা টমেটো সসের শিশি বের করে নিলাম। শিশিটায় কঁকুনি দিয়ে টিফিন কৌটোর চিত করা ঢাকনায় সস ঢালোম। অশোকেন্দুকে ইশারা করে বললাম, নিন, দারুণ খেতে…। তারপর আমি একটুকরো কাবাব তুলে নিয়ে সসে ঠেকিয়ে মুখে ফেললাম : আঃ, গ্র্যান্ড।

অশোক হাত বাড়িয়ে একটুকরো কাবাব পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম সমেত গুছিয়ে নিলেন। সস মাখিয়ে মুখে দিয়ে তৃপ্তি করে চিবোতে চিবোতে বললেন, ঊ, একসেলেন্ট। হ্যাঁ, আপনি কী যেন বলছিলেন…।

হ্যাঁ…বলছি। শুনলে আপনার অবাক লাগবে…সীমারেখা কখনও সেভাবে আমাকে ভালোবাসেনি। ও আমাকে।

আমাকে বাধা দিয়ে অশোকেন্দু বললেন, ওসব গালগল্প ছেড়ে আসল কথা বলুন। তারপর গ্লাসে চুমুক দিলেন।

বিশ্বাস করুন, এটাই আসল কথা। এটাই ভেতরের কথা। আর এটা আমি জেনেছি মাত্র তিনদিন আগে। অথচ ওকে বিয়ে করব বলে আমি মনে-মনে তৈরি ছিলাম। আমি..মানে, আমরা দুজনেই তৈরি ছিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, সবই আমার কপাল! সেদিন যখন রেখাকে বললাম, এসো, এবার

একটা দিন ঠিক করে সাতপাক হয়ে যাক, তখন ও বেঁকে বসল। বলল, কেন, এই তো বেশ চলছে–এটা খারাপ কী! ডিভোর্সের ব্যাপারটা খুব ডেলিকেট। আমি অনেক ভেবে দেখেছি..আমি ওসব পারব না। প্লিজ, তুমি একটু আমার দিকটা ভেবে দ্যাখো…।

ব্যস, সব আশনাই শেষ। বললাম না, সবই আমার কপাল। সারাটা জীবন আমি ব্যর্থ প্রেমের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তাই আমি ড্রিঙ্ক করি মনের দুঃখে।

আমি একটুকরো কাবাব মুখে দিলাম। স্বাদ নিতে নিতে আয়েস করে চিবোতে লাগলাম। অশোকেন্দু কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছিলেন। চোখ না সরিয়েই টিফিনবাক্সের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, আপনার কাবাবে ভাগ বসাচ্ছি… আপনি কিছু মাইন্ড করছেন না তো?

দুর, কী যে বলেন! রেখার খোঁজে আপনি আসতে পারেন ভেবেই বেশি করে তৈরি করেছি।

আপনি এটা রান্না করেছেন নাকি? ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলেন অশোক।

হ্যাঁ। কেন, খেতে খারাপ লাগছে?

না, না। দারুণ…।

আসলে ব্যাচিলার মানুষ। একা-একা থাকি। তাই রান্না শিখতে হয়েছে বহুকাল আগেই…। যাকগে, যা বলছিলাম…।

প্রথম আমি ভালোবেসেছিলাম তানিয়া চৌধুরীকে। হয়তো ও-ও আমাকে। তারপর একদিন বিয়ের কথা উঠল। তাতে ও অসভ্যের মতো হেসে ফেলল। বলল, আমার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব করা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। হঠাৎ আমার মধ্যে এমন বিয়ের বাতিক জেগে উঠল কেন…বেশ তো চলছিল। তো এইরকম সব কথাবার্তা বলল তানিয়া। বিয়ে করার সাধটা যে একটা বাতিক সেটা ওর কাছেই প্রথম জানলাম।

কিন্তু আমার মুশকিলটা কোথায় জানেন, মিস্টার বোস? আমি কখনও হার মানতে শিখিনি। তাই একদিন ডেকে পাঠালাম তানিয়াকে…ওকে গঙ্গার ধারে

আসতে বললাম…আউটরাম ঘাটে।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে কাবাব আর গ্লাস চলছিল। গ্লাস খালি হলেই আমি সোডা, জল আর ইয়ে মিশিয়ে দিচ্ছিলাম। আর আয়েস করে কাবাব চিবোচ্ছিলাম দুজনেই।

তারপর? আগ্রহে জানতে চাইলেন অশোক। ওঁর চোখে কৌতুকের খেলা দেখে বুঝতে পারছিলাম আমার গল্পটা এখনও গল্পই থেকে গেছে ওঁর কাছে।

…তানিয়া এল। সন্ধে হল। দুজনে বসে অনেক গল্প করলাম। আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম। তারপর হঠাৎ ওকে খুন করে ফেললাম।

নির্জন রাত। নরম গলা। আর আমার শক্ত হাত। কোনও অসুবিধেই হল না ওকে খতম করতে। মুখের কাবাবের টুকরোটা শেষ করে গ্লাসে চুমুক দিলাম : পরদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল। ওর প্রেমিক হওয়ার সুবাদে পুলিশ আমাকে প্রচণ্ড হ্যারাস করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। কারণ, কোনও প্রমাণ ছিল না ওদের হাতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ব্যস। তানিয়া শেষ–তানিয়ার গল্পও শেষ। এবার কুন্তলিনীর গল্প শুরু…।

অশোকেন্দুর মুখ থেকে কৌতুকের আস্তরণ অনেকটা সরে গেছে। শান্তভাবে গ্লাসে চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করলেও লক্ষ করলাম, ওঁর হাত কাঁপছে। একটু যেন উশখুশ করছেন এখন।

কুন্তলিনী কে?

আমার দ্বিতীয় প্রেমিকা। কুন্তলিনী রায়। ও ম্যারেড ছিল সীমারেখার মতো। ওর হাজব্যান্ডের নাম ছিল অলক।

যাই হোক, দ্বিতীয়বারেও সেই একই গল্প। কুন্তলকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। ওর পাতলা চেহারা, টানা-টানা চোখ আর চওড়া ঠোঁটে যে কী ম্যাজিক ছিল কে জানে! তা ছাড়া খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। ওর দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে যেতাম। তাই ওকে ছেলেভোলানো মেয়ে বলে ডাকতাম–ওকে খ্যাপাতাম।

মাসছয়েক চলেছিল আমাদের প্রবল প্রেম। তারপর, এক সন্ধ্যায়, ওর একক সংগীতের আসর শেষ হওয়ার পর ওকে বিয়ের কথা বললাম।

না, কুন্তল তানিয়ার মতো বাজে ভাবে হেসে ওঠেনি। বরং খুব সিরিয়াস মুখ করে বলে উঠেছে, অলককে আমি ভীষণ ভয় পাই। বেসিক্যালি হি ইজ আ বিস্ট। ড্রিঙ্ক করলে ওর আর কোনও জ্ঞান থাকে না। ডিভোর্স-টিভোর্সের কথা বললে হি উইল জাস্ট গো ওয়াইল্ড। সব রাগে ছারখার করে দেবে, তছনছ করে দেবে। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, প্লিজ…।

ক্ষমা শব্দটা আমি খুব ঘেন্না করি, মিস্টার বোস। আমার দিকটা কুন্তলিনী মোটেই ভাবেনি। ও আমার সঙ্গে রিলেশানটা শেষ করে দিতে চাইল। তাই আমিও ওকে শেষ করে দিলাম…শেষ…চিরকালের মতো।

আমি একটুকরো কাবাব তুলে নিয়ে সস ছুঁইয়ে কামড় দিলাম। বললাম, দারুণ টেস্টফুল, না? আসলে এটা একটা স্পেশাল কাবাব…।

অশোকেন্দুও কাবাব চিবাচ্ছিলেন। একটু যেন থমকে গেলেন। জিগ্যেস করলেন, শেষ করে দিলেন মানে?

হাসলাম আমি : শেষ মানে শেষ। ফুলস্টপ। ওকে আমি ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলাম। বাড়িতেই। সে-রাতে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছিল রাত নটায় রাস্তায় কোনও লোক ছিল না। ও এল ভিজে একসা হয়ে। বলল, ওর হাজব্যান্ড ড্রিঙ্ক করে বেহেড হয়ে পড়ে আছে।

বেশ জুত করে আমরা ডিনার সারলাম। তারপর ভারী চপারের এক কোপে কুন্তলের গলার নলি কেটে দিলাম। ডাইনিং টেবিলে সে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড।

যাই হোক, মাঝরাত পর্যন্ত খুব খাটুনি গেল আমার। ওর বডিটা টেনে নিয়ে গেলাম বাড়ির পেছনের ছোট বাগানটায়। রক্ত-টক্ত সব ধুয়ে-মুছে নিলাম। তারপর বডিটা ছোট-বড় টুকরোয় কুচিয়ে ছড়িয়ে দিলাম বাগানে।

আপনাকে বলা হয়নি, আমার কুকুর পোষার শখ আছে। তিনটে ডোবারম্যান। কালো রঙের। কান ক্রপ করা। ওদের দু-দিন না খাইয়ে চেন বেঁধে রেখেছিলাম। চেন খুলে দিতেই গন্ধের টানে ওরা ছুটল বাগানে। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি

চলল–তার সঙ্গে চাপা হিংস্র গর্জন। সেদিন প্রায় সারারাত ধরে ওদের ফুর্তি চলেছিল। এবং কুন্তলিনী জাস্ট ভ্যানিশ হয়ে গেল এই দুনিয়া থেকে।

আমি চাপা বিষণ্ন গলায় একঘেয়ে সুরে কুন্তলিনীর শেষকৃত্যের কথা শোনাচ্ছিলাম। লক্ষ করলাম, অশোকেন্দু বেশ গোল-গোল চোখ করে আমাকে দেখছেন। প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছেন, গল্পটা বানানো, না সত্যি।

গ্লাসে মদিরা ঢালোম। অশোকেন্দুর গ্লাসেও। তারপর আমরা প্রায় একইসঙ্গে চুমুক দিলাম।

পরশু সকালে, এই নটা নাগাদ, সীমারেখা আমাকে ফোন করেছিল। ওকে আবার রিকোয়েস্ট করলাম। হতভাগার মতো কেঁদেও ফেললাম। কিন্তু ও অটল-অনড়। যেমন চলছে চলুক না। ডিভোর্সের কথা বলে আমি নাকি ফর নাথিং কমপ্লিকেশান তৈরি করছি। এত অবুঝ হওয়ার কোনও মানে হয়।

আমি কান্না থামিয়ে মন শক্ত করলাম। সীমাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালাম…।

হ্যাঁ, পরশু সন্ধে থেকেই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তেজিতভাবে বললেন অশোকেন্দু। সামনে ঝুঁকে কাবাব তুলে নিলেন আবার। চিবোতে চিবোতে জড়ানো গলায় বললেন, আপনি জানেন রেখা কোথায় আছে। বলুন, ও কোথায়?

আমি গ্লাসে দুবার চুমুক দিয়ে বললাম, সীমারেখা আমার কাছেই আছে। ও আর ফিরবে না, মিস্টার বোস–।

অশোকেন্দু আমার শেষ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ওঁর হাসিটা কেমন শুকনো দেখাল। তবু সহজ হওয়ার চেষ্টায় কাবাব খেতে-খেতে জড়ানো স্বরে বললেন, রেখা ফিরবে না এটা হতেই পারে না। বলুন, ও কোথায় আছে?

আমি কাবাবসুদ্ধু টিফিনবক্সটা অশোকেন্দুর মুখের সামনে তুলে ধরে বললাম, এইখানে। এই সীমাকাবাব আমি নিজের হাতে রান্না করেছি।

অশোক বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করলেন। কাশতে কাশতে ওঁর মুখ বেগুনি হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। যন্ত্রণা কমাতে বুক খামচে ধরলেন। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন টেবিলের ওপরে। ওঁর গ্লাস, সসের শিশি, সব ভেঙে চুরমার। গোটা টেবিল সুরার গন্ধে ম-ম করে উঠল।

আমি আপনমনেই ঠোঁটের কোণে হাসলাম। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। সীমারেখার নম্বর ডায়াল করলাম।

ও ফোন ধরতেই বললাম, সব শেষ। আর কোনও প্রবলেম নেই। অশোকেন্দু এইমাত্র বিষম খেয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। তোমার সঙ্গে অ্যাট লিস্ট ফিফটিন ডেজ আমার কোনও কনট্যাক্ট থাকবে না। আমাকে একদম ফোন-টোন করবে না। বরং বিধবার রোলে পারফেক্ট অ্যাক্টিং-এর চেষ্টা করো। তুমি এক্ষুনি হোটেল থেকে বাড়ি ফিরে যাও। ও. কে.? আই লাভ য়ু, অসীমা…।

আই লাভ য়ু টু। মিষ্টি গলা ভেসে এল।

পরশু থেকে সীমারেখা হোটেল আইল্যান্ড-এ আছে। আর অশোকেন্দুর হার্ট প্রবলেমের খবর ও-ই আমাকে দিয়েছিল। তবে বাকি গালগপ্প মানে, তানিয়া, কুন্তলিনী ইত্যাদি সব আমারই তৈরি।

আমি ছোট্ট করে বললাম, চিয়ার্স। তারপর আরাম করে গ্লাসে চুমুক দিলাম। একটুকরো কাবাব তুলে নিয়ে সস মাখিয়ে মুখে দিলাম।

সত্যি, নিখুঁত খুনের মজাই আলাদা।

# ভোলাকে ভোলা যাবে না কিছুতেই

**ভোলাকে ভোলা যাবে না কিছুতেই**

ভোলাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যাবে না। তার মানে এমন নয় যে, আমি ওকে ভুলতে চেষ্টা করেছি। বরং এটাই আমি সাদাকালোয় জানাতে চাই, ওকে ভুলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও এমন সব কাণ্ড করেছিল যে, এই তিরিশ-বত্রিশ বছরেও ওর ছবিটা এতটুকু মলিন হয়ে যায়নি।

অনেকে ভাবতে পারেন, এ আর এমনকী! অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকেই তো আমরা চিরদিন মনে রাখি! তা হলে ভোলাকে ভুলতে না পারার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে!

আছে এই কারণেই যে, ভোলা মানুষ নয়–রোবট।

এইবার বলুন, আজকের এই কলকবজার যুগে একটা যন্ত্রের কথা এতবছর ধরে কেউ মনে রাখতে পারে–যদি না সেই যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত কিছু থাকে।

আজ সেই ভোলার কথাই বলব।

খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গিয়েছিল। আমার বাবা যখন আমাকে নিয়ে বেজায় হিমশিম খাচ্ছে, তখনই এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি থেকে ভোলাকে নিয়ে আসে। ভোলা ছিল ভি. এক্স থ্রি মডেলের ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট, অর্থাৎ, গৃহস্থের উপযুক্ত সঙ্গী রোবট।

এসব কথা আমি বড় হয়ে বাবার কাছে শুনেছি।

ছোটবেলা থেকেই ভোলাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়াটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। একবারের জন্যেও মনে হয়নি ও যন্ত্রদাস কিংবা রোবট।

ভোলার চেহারায় চোখে পড়ার মতো আলাদা কিছু ছিল না। ও যে আসলে কী, সেটা ওকে দেখে একটুও বোঝা যেত না। তবে চলাফেরা কথাবার্তায় ব্যাপারটা আঁচ করা যেত।

ভোলার মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখটা গোল ধরনের। চোখজোড়া সবসময়েই ছানাবড়া যেন কোনও কিছু দেখে অবাক হয়ে গেছে। গায়ে রংচঙে হাফশার্ট, পায়ে ডোরাকাটা পাজামা। হাত পাগুলো সরু-সরু হলেও তেমন বেমানান নয়। আর উচ্চতা ছিল চার ফুট।

ভোলার সঙ্গে খেলাধুলো করে আমার দিব্যি সময় কাটত। খেলতে-খেলতে আমি একসময় হাঁফিয়ে পড়তাম, ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ধপাস করে বসে পড়তাম মেঝেতে।

ভোলা কিন্তু মোটেই ক্লান্ত হত না, হাঁফাত না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছানাবড়া চোখে আমাকে দেখত। তারপর জিগ্যেস করত, কী হল, ভাইটি, আর খেলবে না?

আমি বলতাম, না, ভোলা, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তোমার লাগছে না?

না, গো–আমার টায়ার্ড হওয়ার জো নেই।

আমি অবাক হয়ে ভোলাকে দেখতাম। ভাবতাম, মানুষের চেয়ে যন্ত্রই ভালো ইচ্ছেমতন যতক্ষণ খুশি খেলতে পারে।

প্রথম-প্রথম ভোলাকে আমি ভোলাদা বলতাম। কিন্তু বাবা একদিন শুনতে পেয়ে আমাকে বারণ করল? কী বলছ, সন্তু! রোবট আবার দাদা কীসের! ওকে তুমি নাম ধরেই ডাকবে–যেমন আমি ডাকি।

ভোলা কিন্তু বরাবর আমাকে ভাইটি বলেই ডাকত।

আমরা দুজনে সমসময় একসঙ্গে থাকতাম। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে ভোলার কাছে আমাকে নিশ্চিন্তে রেখে যেত।

আমার স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই ভোলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। বড় রাস্তা পার করে বাস ধরে আমাকে পৌঁছে দিত স্কুলে। তারপর সারাক্ষণ স্কুলের বাইরে একটা গাড়িবারান্দার নীচে বসে অপেক্ষা করত।

স্কুল ছুটি হলে আবার আমাকে আগলে নিয়ে আসত বাড়িতে।

ওকে নিয়ে সবচেয়ে ঝামেলা হত পরীক্ষার সময়। সবসময় কানের কাছে বলত, ভালো করে পড়ো, ভাইটি, ভালো করে পড়ো। বাবা যত না বলত তার চেয়ে অনেক বেশি বলত ভোলা। পড়তে-পড়তে যখন আমি ঘুমে ঢুলে পড়তাম তখন ভোলা আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকত : ভাইটি, লক্ষ্মী আমার, ঘুমিয়ো না। কাল যে পরীক্ষা।

আমি চোখ ডলে ঘুম তাড়িয়ে আবার পড়তে শুরু করতাম। কিন্তু খুব রাগ হত ভোলার ওপর। বলতাম, তোমার কি কখনও ঘুম পায় না!

ভোলা হাসত। হাসলে ওর ঠোঁটটা সামান্য চওড়া হত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, ঘুম পেলে আমাদের চলে না, ভাইটি।

অনেকসময় এমন হয়েছে যে, ইতিহাস পড়তে-পড়তে ভীষণ বিরক্ত হয়ে চটাস শব্দে বই বন্ধ করে ফেলেছি ও দুর, কিচ্ছু মুখস্থ হতে চাইছে না! বারবার ভুলে যাচ্ছি।

ভোলা তখন বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়েছে : কই, আমায় বইটা দাও দেখি! কোন জায়গাটা বলো তো…।

ওকে পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, শুধু সাল-তারিখ আর গুচ্ছের রাজা-বাদশার নাম! এসব কখনও সহজে মুখস্থ হয়!

ভোলা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে দু-পলক তাকাল, তারপর বইটা বন্ধ করে বলল, নাও, তুমি এবার চোখ বুজে শুনে যাও। একমনে শুনবে কিন্তু…।

ব্যস! ভোলা গড়গড় করে পৃষ্ঠাগুলো মুখস্থ বলে যেত আমার কানের কাছে। আর আমি ওর তাকলাগানো ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ওর মুখে শুনতে-শুনতে ইতিহাসের পড়া দিব্যি মুখস্থ হয়ে যেত।

আমি ভোলাকে বলতাম, আমার বদলে তুমি পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট অনেক ভালো হত।

ভোলা প্রতিবাদ করে বলত, না, ভাইটি, আমি ফেল করতাম। কোথা থেকে কোন পর্যন্ত লিখতে হবে সেটাই তো আমি বুঝতে পারি না!

তা হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি পরীক্ষা দেব।

আমার এই অদ্ভুত বায়না শুনে ভোলা হেসে বলত, ভাইটি, এভাবে পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই।

আমি ওর কথাটা মন দিয়ে ভাবতাম। এতসব ও বোঝে কেমন করে!

আমার সঙ্গী হয়ে সময় কাটানো ছাড়াও কিছু-কিছু বাড়তি কাজ ভোলাকে করতে হত। যেমন, বাবার ফাইফরমাশ খাটা, দোকানে যাওয়া, টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিকের বিল জমা দিয়ে আসা– এইসব। কিন্তু এত কাজ করেও ভোলাকে কখনও বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। ওকে যদি জিগ্যেস করতাম, এত কাজ করতে করতে কখনও তোমার বিরক্ত লাগে না? তা হলে ও হয়তো হেসে বলত, বিরক্ত হলে আমাদের চলে না, ভাইটি।

আমার দেখাদেখি ভোলা বাবাকে বাবা বলেই ডাকত। বাবার অফিসের ব্যাগটা হাতে তুলে দিত, জুতো পালিশ করে দিত, বাবা কখন অফিস থেকে ফিরবে জিগ্যেস করত, সাবধানে যাতায়াত করার জন্যে পরামর্শ দিত।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বাবা মাঝে-মাঝে আমাকে বলত, একটা ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবটের কাছ থেকে এত সার্ভিস পাব ভাবিনি।

আমি কোনও জবাব দিতাম না। তবে ভোলার সঙ্গে রোবট, সার্ভিস, এই শব্দগুলো জুড়ে কথা বলাটা আমার ভালো লাগত না।

একদিন আমরা তিনজনে ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমি, বাবা, আর ভোলা। ছবিটার নাম দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আর নাচ-গান নিয়ে দারুণ জমাটি ছবি। হল থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎই শুনলাম ভোলা গুনগুন করে গান গাইছে : ডো আ ডিয়ার, আ ফিমেল ডিয়ার/রে আ রে অফ গোল্ডেন সান/ মি আ নেম আই কল মাইসেলফ...।

আমি জিগ্যেস করলাম, ভোলা, ছবি কেমন লাগল?

ভোলা বলল, দারুণ! যদিও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।

বাবা হেসে বলল, যাক, ভোলা অন্তত সত্যি কথাটা বলেছে!

আমি বললাম, রোবটরা মিথ্যে কথা বলে না, বাবা।

ফেরার পথে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখনও আমরা একটা খালি ট্যাক্সি জোগাড় করতে পারিনি। ছাতা সঙ্গে না থাকায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করছি।

হঠাৎই একটা বিশাল অফিসবাড়ির আড়ালের এক অন্ধকার কোণ থেকে তিনটে ছায়া এগিয়ে এল আমাদের দিকে। মাথায় কঁকড়া চুল। পরনে টি-শার্ট আর চোঙা প্যান্ট।

খুব কাছাকাছি এসে একটা ছেলে বাবাকে লক্ষ্য করে বলল, দাদা, ফুলকি হবে, ফুলকি?

বাবা থতোমতো খেয়ে বলল, ফু-ফুলকি…মানে?

তখন পাশ থেকে তার এক সঙ্গী কড়া মেজাজে মন্তব্য করল, আরে ফুলকি মানে আগুন– সালা ন্যাকাষষ্ঠী! একটা সিগারেট কোথা থেকে বের করে ঠোঁটে রাখল সে।

এইবার বাকি দুজন বাবার দু-পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, মালকড়ি যা আছে ঝটপট দিয়ে দে।

তিননম্বর ছেলেটা একটা ক্ষুর বের করে বাবার গলার পাশটায় চেপে ধরল।

আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া, কাছাকাছি এমন কাউকে চোখেও পড়ল না যে আমাদের বিপদে এগিয়ে আসবে।

হঠাৎই ভোলা দিব্যি স্বাভাবিক গলায় আমায় বলল, ভয় পেয়ো না, ভাইটি। দেখছি কী করা যায়। তারপর ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করে ঠান্ডা এবং শান্ত গলায়

বলল, বাবাকে ছেড়ে দাও।

তা হলে তোমাদেরও আমি ছেড়ে দেব।

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছেলে তিনটে খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল।

একজন পেটে হাত চেপে হাসতেহাসতে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল। তারপর কোনওরকমে হাসির দমক কমিয়ে বলল, লে, চারফুটিয়া কী বলছে শোন। তারপর বাচ্চাদের আধো-আধো উচ্চারণে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, ওলে বাবা! বিলাট মাছতান এচে গ্যাচে! পালা, পালা, ছিগিল পালা!

কথা বলতে বলতে ছেলেটা ভোলাকে লক্ষ্য করে লাথি চালিয়েছে। ভোলা কিন্তু নড়ল না– চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোহার সঙ্গে মানুষের পায়ের সংঘর্ষ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে বিকট চিৎকার করে ছেলেটা বসে পড়ল রাস্তায়। ডান পা-টা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, আর কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

ক্ষুর হাতে ছেলেটা ভোলার মুখ লক্ষ করে অস্ত্রটা চালাল। ভোলা বাঁ-হাতে ওর ডানহাতটা খপ করে ধরে ফেলল। এবং ডানহাতে একটা মামুলি থাপ্পড় বসিয়ে দিল ছেলেটার গালে।

থাপ্পড়ের শব্দ কিংবা ফলাফল কোনওটাই মামুলি হল না।

ছেলেটার মুণ্ডুটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। চোয়ালের হাড়ও সরে গেল বোধহয়। ও ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

তিন নম্বর ছেলেটা ভীষণ বুদ্ধিমান। তাই ও চোখের পলকে বৃষ্টিভেজা রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ঘটনা আমাকে আর বাবাকে একরকম হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আমরা যেন আবার সিনেমা দেখছিলামযার নায়ক চারফুট উচ্চতার একটি নিরীহ গেরস্থালি রোবট।

আমাদের মাথা কাজ করছিল না। বুঝতে পারছিলাম না, থানায় যাব, নাকি অকুস্থল থেকে সরে পড়ব।

সমস্যাটার সমাধান করে দিল ভোলা।

একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে চট করে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। রাস্তায় পড়ে থাকা ছেলে দুটোকে দেখিয়ে বলল, এইমাত্র চারটে গুন্ডা এই ছেলে দুটোকে মারধোর করে পালিয়ে গেল। এক্ষুনি হয়তো গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। আমাদের একটু হেল্প করুন–শিগগির এখান থেকে নিয়ে চলুন, ভালো বকশিশ দেব।

বাড়িতে ফিরে ধাতস্থ হতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লাগল। তারপর বাবা ভোলাকে বলল, অতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার ঠিক হয়নি। যদি এরপর পুলিশের ঝামেলা হয়?

আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকালাম। ভোলা মারাত্মক বিপদে আমাদের বাঁচাল, আর বাবা বলছে বাড়াবাড়ি!

ভোলা গায়ের জামাটা ঠিকঠাক করতে করতে বলল, ঝামেলা কিছু হবে না, বাবা। দেখবে, ওই ছেলেগুলোর নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় নাম আছে।

বাবা যা-ই বলুক, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল, ভোলার কাছে আমাদের ঋণ থেকে গেল। বাবাকে এসব কথা কিছু বলিনি। কারণ, বললেই বাবা হয়তো বলে বসবে, রোবটের কাছে আবার ঋণ কীসের! যতসব আজগুবি ভাবনা!

এর কয়েকমাস পর বাবা বাড়িতে একটা কম্পিউটার কিনে নিয়ে এল। তারপর থেকেই বাবা ওই যন্ত্রটা নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। সময় পেলেই শুধু কম্পিউটারের কি-বোর্ড নিয়ে মেতে ওঠে। আর আমাকেও একটু-আধটু শিখিয়ে দেয়।

তখন থেকে বাবা প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে, ভোলাটার যদি ঘটে আর-একটু বুদ্ধি থাকত তা হলে ওকে কম্পিউটারে বসিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম।

বাবা কিন্তু ভোলাকে দিয়ে কম্পিউটার চালানোর চেষ্টা করতে ছাড়েনি। তবে হলে হবে কী, ভোলা মেশিন ছেড়ে উঠে চম্পট দিতে পারলেই বাঁচে! ও আমাকে আড়ালে বলত, ভাইটি, সবাইকে দিয়ে কি সব কাজ হয়!

আমি ওর কথা শুনে হাসতাম।

একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে একথা সে কথা বলতে বলতে বাবা হঠাৎই ভোলার প্রসঙ্গ তুলল।

ভোলার নানান কাজ নিয়ে, কাজের খুঁত নিয়ে কয়েকটা মন্তব্য করল বাবা। তারপর ও কম্পিউটার চালাতে পারে না, আধুনিক যুগের কাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, এইসব বলে বেশ বিরক্তি দেখাল।

ভাগ্যিস ভোলা তখন সামনে ছিল না। থাকলে আমার ভীষণ বাজে লাগত। তা ছাড়া, বাবার মুখে-মুখে আমি ঠিক কথা বলতে পারি না। তাই বাবার কথায় আমার খারাপ লাগলেও কিছু বলতে পারিনি।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, রান্নাঘরের দিক থেকে ভোলা একগ্লাস জল নিয়ে আসছে। আমিই ওকে জল আনতে বলেছিলাম।

বাবা খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, শোনো, সন্তু। এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি একটা এক্সচেঞ্জ অফার অ্যানাউন্স করেছে। ভি. এক্স-থ্রি মডেলের রোবট আর তিরিশ হাজার টাকা দিলে ওরা ওদের লেটেস্ট কম্পিউটার কম্প্যাটিবল ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট দেবে। মডেলটার নাম ভি. এক্স. আই. কিউ-ওয়ান। এই রোবটটা কম্পিউটার চালাতে তো জানেই, তা ছাড়া আরও বহু আধুনিক কাজ জানে…।

আমি বুঝতে পারছিলাম বাবা কী বলতে চলেছে। তাই মুখের মধ্যে ভাত নিয়ে শক্ত করে চোয়াল বন্ধ করে বসেছিলাম। কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল আমার।

ভোলা অনেকটা কাছে চলে এসেছিল। বাবার কথা ও ঠিক কতটা শুনতে পেয়েছে বুঝতে পারলাম না। ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ভাইটি, এই নাও তোমার জল। গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ভোলা।

বাবা মাথা ঘুরিয়ে একবার বিরক্তভাবে ভোলাকে দেখল। তারপর বলল, নাঃ, আর কোনও উপায় নেই! ভোলাকে পালটে ওই নতুন মডেলের রোবটটা নিয়ে আসতেই হবে। কাজের ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে…।

বাবা ভোলা এক অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। ওর হাত থেকে জল ভরতি গ্লাসটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

আমি যেন স্লো-মোশানে কোনও সিনেমা দেখছিলাম।

জল ভরতি গ্লাসটা বাতাস কেটে পড়ছে-তো-পড়ছেই। তার মধ্যে বন্দি জল চলকে উঠে ঢেউ তুলছে। তারপর গ্লাসটা ধাক্কা খেল মেঝেতে। কাচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হল, জল ছিটকে পড়ল চারিদিকে। জলের ফোঁটাগুলো শূন্যে লাফিয়ে উঠে হিরের কুচির মতো দেখাল। তারপর মেঝের অনেকটা ভিজে গেল। জলে মাখামাখি কাচের টুকরোগুলো এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে পড়ে রইল।

আমার বারবার মনে হচ্ছিল, মেঝেতে জল নয়–রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাচ ভাঙার এককণা শব্দও আমার কানে ঢোকেনি। কারণ, ভোলার বুক ভাঙা বাবা! ডাকটা বারবার আমার কানে বাজছিল।

বাবা মেঝের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটার হাল দেখে বলল, হোপলেস।

ভোলা পায়ে-পায়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কদমছাঁট চুল, ছানাবড়া চোখ, চারফুট হাইট, অথচ ওকে দেখে এখন মোটেই হাসি পাচ্ছিল না।

বাবা, আমার মডেলটা পুরোনো বলে, তুমি আমাকে বদলে ফেলতে চাইছ!

বাবা কোনও জবাব দিল না।

ভোলা উত্তরের জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, আমি যে এত বছর তোমাদের কাছে রইলাম, তোমাকে, ভাইটিকে এত যত্ন করলাম, তার কোনও দাম নেই! তুমি বলছ, বাজারে এখন অনেক ভালো মডেলের রোবট পাওয়া যাচ্ছেতাই আমাকে বদলে ফেলতে চাও। তা হলে একটা পালটা উদাহরণ তোমাকে দিই–শুনতে হয়তো তোমার খারাপ লাগবে। ভোলা একবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ও ভাইটির বয়েসি অনেক ছেলেকে আমি দেখি যারা ভাইটির চেয়ে দেখতে ভালো, লেখাপড়ায় ভালো, অনেক গুণ আছে–মানে, অনেক ভালো মডেলের ছেলে। তা হলে তুমি কি চাইবে, ভাইটিকে বদলে আর একটা ভালো মডেলের ছেলে নিয়ে আসতে? সম্পর্কের কোনও দাম নেই তোমার কাছে?

বাবা রাগে কাঁপতে শুরু করেছিল। ভোলার দিকে আঙুল তুলে বলল, এসব কী উলটোপালটা বকছ! তোমার আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।

আজ আমাকে বলতেই হবে, বাবা! জেদি গলায় বলল ভোলা, তুমি বলছ আমি অনেক কাজ পারি না। ঠিক কথা। কিন্তু অন্য অনেক কাজ তো পারি! তুমিও তো অনেক কাজ পারো না, বাবা! এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম ও কেউই সব কাজ পারে না। তাতে তো লজ্জার কিছু নেই। এত বছর ধরে তোমাদের জন্যে যা-যা কাজ আমি করেছি সবই তো নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছি। কখনও তো বিরক্ত হইনি। তা হলে বলো, আমার দোষটা কোথায়! আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না, বাবা।

বাবা ভোলার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়ল ও নাঃ, একে বোঝানো যাবে না। মনে হয়, ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলো সব ঘেঁটে গেছে।

ভোলা আবার যখন কথা বলল ওর গলাটা কেমন ভাঙা কান্নার মতো শোনাল ও আমাকে। তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না, বাবা। তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

বাবা এবার অন্য পথ ধরল। হাত নেড়ে বেশ শান্ত গলায় ভোলাকে বোঝাতে চাইল।

শোনো, ভোলা, তুমি আসলে একটা রোবট–চাকর রোবট। তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকো বটে, কিন্তু আমি তোমার বাবা নই, তুমিও আমার ছেলে নও। আমার মনে হয়, তোমার ভেতরের প্রোগ্রামগুলো সব গোলমাল হয়ে গেছে। তুমি একটু স্থির হয়ে..।

কী বলছ, বাবা! তুমি আমার বাবা নও! আমিও তোমার ছেলে নই!

ভোলার কথাগুলো আমাকে বিরাট ধাক্কা দিল। এই শক্ত কথাগুলো বাবা ওকে না বললেও পারত। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, প্লিজ, ভোলা, ভুল বুঝো না। তুমি ছেলে না হলে কী হয়েছে–ছেলের মতো তো বটেই! আমিও তোমার ভাইয়ের মতো…।

ভোলা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ছিটকে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। ওর অভিব্যক্তিহীন যান্ত্রিক চোখজোড়া যেন পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল। সে-চোখের দৃষ্টি

থেকে ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আমি ওর চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলাম না–চোখ সরিয়ে নিলাম।

ভোলা খুব ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে বলল, ভাই…এর..মতো! ছেলে…র… মতো!

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, আমাকে আর বাবাকে বারবার দেখতে লাগল।

অবশেষে খুব আলতো গলায় বলল, সম্পর্কের তা হলে কোনও দাম নেই, ভাইটি? বুঝেছি..তোমরা আসলে মানুষ নও…মানুষের মতো…।

শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করতে করতে ঘরের দরজার দিকে এগোল ভোলা। ওর চোখের নজর বোধহয় ঠিকমতো কাজ করছিল না–কারণ, ও একটা চেয়ারে ধাক্কা খেল, তারপর দেওয়ালের কোণে ওর মাথা ঠুকে গেল।

কোনওরকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজার পাশটিতে উবু হয়ে বসে পড়েছিল ভোলা। মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল ভাঁজ করা দুটো হাতের ফাঁকে।

পরদিন বিকেলে এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানির গাড়ি এসে ওকে তুলে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ও একইভাবে বসে ছিল।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি বেশ কয়েকবার ওকে ডেকেছিলাম। কিন্তু ও কোনও সাড়া দেয়নি। হয়তো আমাদের কথায় ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলো তছনছ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওর ভেতরটা শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছিল। কে জানে!

সেই থেকে ভোলাকে আমি কখনও ভুলতে পারিনি ভুলতে পারবও না।

ও আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয়, আমি মানুষের চেয়ে একটুখানি কম। সেইজন্যেই আমি সারাটা জীবন ধরে পুরোপুরি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

# আমরা সবাই সমান

## আমরা সবাই সমান

বাপি অফিসে বেরিয়ে গেলে রূপান নিজেকে একজন কেউকেটা বলে মনে করে। কারণ, তখন বাড়িতে সে-ই একমাত্র পুরুষ সিংহ–অতএব হেড অফ দ্য ফ্যামিলি।

সদর দরজার কলিংবেলটা যখন বাজল তখন মা রান্নাঘরে–গরম কড়াইয়ে ছাকোর-ছোঁকর শব্দ তুলতে ব্যস্ত। আর রূপান অঙ্কের হোমটাস্ক নিয়ে মশগুল ছিল।

কিন্তু কলিংবেল বেজে উঠতেই রূপানের মনে হল, দরজা খোলার দায়িত্বটা হেড অফ দ্য ফ্যামিলিরই নেওয়া উচিত। তাই দৌড়োনো আর হাঁটার মাঝামাঝি ঢঙে ও পৌঁছে গেল দরজার কাছে।

কে এল এই অসময়ে? এখন তো কারও আসার কথা নয়!

ম্যাজিক আই-এ চোখ রেখে চকচকে একটা কিছু চোখে পড়ল। ঠিক যেন স্টিলের বাসন টাসন।

কিন্তু দরজা খুলতেই অবাক হয়ে দেখল স্টিলের বাসন নয়, একটা রোবট দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়।

পথে-ঘাটে এখন যে-হারে রোবট ঘুরে বেড়ায় তাতে একটা মেটাল বডির রোবট দেখে ক্লাস সেভেনে পড়া রূপানের মোটেই অবাক হওয়ার কথা নয়। ও অবাক হয়েছে ওদের বাড়ির দরজায় একটা রোবটকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

রোবটটা লিকলিকে। চোখগুলো মানুষের মতো। বেশ টানা টানা। মাথায় চকচকে নাইলনের চুল অ্যালবার্ট কেটে আঁচড়ানো। পরনে রঙিন হাফশার্ট আর প্যান্ট। তবে মুখ আর দু-হাতে কোনও ঢাকাটুকি নেই। রোদ পড়ে চকচক করছে।

কাকে খুঁজছেন? রূপান গলাটা একটু ভারী করে জানতে চাইল।

আমি ম্যাথমেটিকা গ্রহ থেকে আসছি, স্যার,– রূপানকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে মিহি গলায় বলল রোবটটা, আমার নাম লেবেসগিউ। আমি প্রফেসর শান্তারাম মিত্রের বাড়িটা খুঁজছি। আমাদের কাছে যা ডেটাবেস রয়েছে তাতে ওঁর বাড়িটা এই এলাকাতেই হওয়ার কথা, স্যার...।

রোবটটা ওকে স্যার বলে দুবার ডাকায় রূপানের মনে হল, ও আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই–দু-চার ফুট শুন্যে উঠে পড়েছে। একইসঙ্গে ও লেবেগিউর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল । রোবটটার ভেতরের কলকবজা কিংবা সফটওয়্যার বিগড়ে যায়নি তো! যার জন্য ও ভুল করে ভাবছে যে, ও অন্য গ্রহ থেকে এসেছে!

না, প্রফেসর শান্তারাম মিত্র নামে এই এলাকায় কেউ থাকেন না। কিন্তু রোবটটা ওঁকে খুঁজছে কেন? ভীষণ জানতে ইচ্ছে করল রূপানের।

এই নামে এ পাড়ায় কেউ থাকে বলে মনে হয় না। গম্ভীর গলায় বলল, রূপান, কিন্তু ওঁকে খুঁজছেন কেন জানতে পারি?

হ্যাঁ, স্যার, বলছি–হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লেবেসগিউর নাক দিয়ে, তারপর বলল, সমান চিহ্ন নিয়ে ওঁর কাছে আমাদের একটা কমপ্লেন আছে। আপনাদের এই পৃথিবীতে ওটা ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করা হয় না।

মানে? তাজ্জব হয়ে গেল রূপান। এ-রোবটটা বলছে কী! ও নিজে সমান চিহ্ন ব্যবহার করে কত যে অঙ্ক করেছে তার হিসেব নেই।

হ্যাঁ, স্যার। আপনি তো জানেন, অঙ্কে এই ইকোয়ালস টু চিহ্নটা সবসময় ব্যবহার করা হয়। কারণ অঙ্ক মানেই তো ইকোয়েশান বাঁ-দিকের সাথে ডানদিন সমান। এই সমান চিহ্নটা ছাড়া অঙ্ক অচল। অন্তত আমাদের গ্রহে তো তাই, স্যার...।

রূপান তখনও বুঝতে পারছিল না, লেবেগিউ কী বলতে চায়। তাই ও চুপ করে রইল।

যেমন ধরুন স্যার… রোবটটা বলে চলল, ছয় যোগ চার সমান দশ। এই অঙ্কটা লিখে ফেললে দেখবেন, সমান চিহ্নের বাঁ-দিকে ছয় যোগ চার, আর ডানদিকে দশ। ৬+৪ লেখাটার সঙ্গে ১০ লেখাটার চেহারায় কোনও মিল নেই কিন্তু চেহারায় মিল না থাকা সত্ত্বেও ওরা সমান…।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন… রূপান সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা ভেবে একটু অবাকও হল।

তারপর, মনে করুন, এই পৃথিবীর সমস্ত অঙ্ক থেকে যদি সমান চিহ্নটা উধাও করে দেন তা হলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে! সবকিছু একেবারে ঘেঁটে যাবে। তার মানে, যে-কোনও অঙ্কে সমান চিহ্ন থাকাটা সবচেয়ে জরুরি…।

রূপান আবার সায় দিল।

আমাদের গ্রহে দুজন মানুষের মধ্যে চেহারা কিংবা অন্য কিছুর মিল না থাকলেও তাদের মধ্যে সমান চিহ্ন বসানো হয়। অর্থাৎ, ওরা সমান। দেখতে আলাদা হলেও ওদের মধ্যে আসলে কোনও তফাত নেই। তাই আমাদের গ্রহে সবাই সমান। কিন্তু পৃথিবী গ্রহে ইকোয়াল্স টু চিহ্নটার ব্যবহার শুধু অঙ্কের মধ্যেই আটকে গেছে মানুষের মধ্যে আসতে পারেনি। সেটা জানানোর জন্যেই ম্যাথমেটিকা গ্রহের মানুষরা আমাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছে। বলেছে, ম্যাথমেটিশিয়ান প্রফেসর মিত্রকে আমাদের অভিযোগ জানাতে। উনি যদি বিষয়টা সবাইকে বোঝাতে পারেন…। ঠিক আছে, চলি, স্যার–প্রফেসর মিত্রের বাড়িটা খুঁজতে হবে…।

রূপানের মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, রূপান, কে এসেছে?

রূপান বলল, কেউ না, মা–

লেবেসগিউ লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে রূপানের খুব ভালো লাগছিল। আজ ওকে রোবটটা অভিনব এক অঙ্ক শিখিয়ে গেল? সমান চিহ্নের ঠিকঠাক ব্যবহার।

আসলে আমরা সবাই সমান।

# ভয়ের খুব কাছে

**ভয়ের খুব কাছে**

ব্রিজেশ ঢেউ গুনছিলেন, আর মনে-মনে বেশ মজা পাচ্ছিলেন। বিনিমাইনের এই চাকরিটা শখের খেলা হিসেবে মন্দ না।

পুরীর সমুদ্র বরাবরই ব্রিজেশের খুব প্রিয়। কারণ, সমুদ্রের সৌন্দর্যের পাশাপাশি এর মধ্যে কোথায় যেন একটা একগুঁয়ে ফোর্স লুকিয়ে রয়েছে। বিউটির সঙ্গে ফোর্স মিশে গেলে তার আকর্ষণই আলাদা!

একটু আগেই সমুদ্রের ভেতর থেকে সূর্য উঠেছে। এখন তার লাল-কমলা আলো জলের ওপরে চকচক করছে। বহুদূরে দুটো নৌকো দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই ওগুলো কালো ফুটকি হয়ে শেষে মিলিয়ে যাবে।

সমুদ্রের খুব কাছাকাছি ব্রিজেশ বসেছিলেন। লোকাল একজন মহিলা দশটাকার বিনিময়ে প্লাস্টিকের চেয়ার ভাড়া দেয়–এক ঘণ্টার জন্য। তার কাছ থেকে দুটি চেয়ার ভাড়া নিয়েছেন– ছাই রঙের হাতলওয়ালা চেয়ার। একটায় ব্রিজেশ বসেছেন আর তার পাশের চেয়ারে সানিয়া। ভাবতে অবাক লাগে, কতদিন পর ওঁরা স্বামী-স্ত্রী এমনভাবে পাশাপাশি বসেছেন, অলসভাবে সময় কাটাচ্ছেন।

সমুদ্রের হাওয়া চোখে-মুখে ঝাপটা মারছিল। সামনে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার, আর সঙ্গে ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ব্রিজেশ চাইছিলেন, সময় এখন থেমে যাক, সমুদ্রের অদ্ভুত গন্ধটা চিরস্থায়ী পারফিউমের মতো শরীরে লেগে থাক।

গুনগুন গান কানে আসায় সনিয়ার দিকে মুখ ফেরালেন।

কপালের দু-পাশে চুল সাদা হয়ে গেছে, ত্বক আর আগের মতো মসৃণ নেই, কিন্তু গানের গলাটা একইরকম রয়ে গেছে। এই মেয়েটার সঙ্গে দু-দুটো যুগ কাটিয়ে দিয়েছেন ব্রিজেশ। ওঁর হাই প্রোফাইল করপোরেট লাইফে সানিয়া সবসময় সলাস আর স্টেবিলিটি জুগিয়েছেন–শান্তি আর স্থিতি। তাই এই কম কথা বলা মেয়েটাকে ব্রিজেশ এখনও পছন্দ করেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হয়, অফিসে যেমন সাবর্ডিনেটেরা ওপরওয়ালার মরজিমাফিক চলার চেষ্টা করে সানিয়া সেরকম কিছু করছে না তো!

অফিসের কথা মনে পড়ল ব্রিজেশের। ওঁর আন্ডারে এমপ্লয়ির সংখ্যা একশো বারো। নট আ ম্যাটার অফ জোক। ওই একশো বারোজন এমপ্লয়ি ব্রিজেশ দত্ত চৌধুরীর কথায় ওঠ-বোস করে।

কিন্তু এখন অফিস ভুলে থাকার সময়। তাই পুরী রওনা হওয়ার সময় থেকেই অফিশিয়াল মোবাইল ফোন বন্ধ। প্রাইভেট ফোনের নম্বরটা ব্রিজেশ শুধু কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুনন্দন শর্মাকে দিয়ে এসেছেন। বলেছেন, এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি ছাড়া ওঁকে যেন ফোন না করা হয়। কারণ, পুরীর এই তিনটে দিন তিনি পুরোপুরি অলসভাবে কাটাতে চান, জীবনের স্রোতে নিজেকে স্রেফ ভাসিয়ে দিতে চান।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্রিজেশ। চারপাশে তাকালেন। সি-বিচে মোটামুটি ভিড়। কাছে দূরে কয়েকটা চায়ের দোকান। দোকানদার খদ্দেরদের জন্য কয়েকটা করে কাঠের বেঞ্চি পেতে রেখেছে। সেখানে টুরিস্টরা বসে চা খাচ্ছে, সমুদ্র উপভোগ করছে।

লোকাল হকাররা ঘুরে-ঘুরে শাঁখ, জগন্নাথের ফ্রেমে বাঁধানো ফটো, মুক্তোর মালা বিক্রি করছে। ভোরবেলা থেকে এই একঘণ্টার মধ্যেই ওরা ব্রিজেশদের অন্তত বারচারেক বিরক্ত করে গেছে। হকারগুলো মহা নাছোড়। মুখের সামনে এসে এমন করতে থাকে যে, ব্রিজেশের মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেন। অফিস হলে ব্যাপারটা এতক্ষণে ঘটে যেত। কিন্তু এটা তো আর অফিস নয়!

সানিয়া গুনগুন গান থামিয়ে জিগ্যেস করলেন, কোথায় চললে?

কোথাও না। সাগরের জলে একটু পা ভিজিয়ে আসি।

আজ সানরাইজ খুব ভালো দেখা গেছে, তাই না?

ব্রিজেশ ছোট্ট করে জবাব দিলেন, হু। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, হকারদের কাছ থেকে ফালতু জিনিস কিছু কিনে বোসো না যেন!

সানিয়া বললেন, না, কিনব না।

স্বামী লোকটাকে দেখছিলেন সানিয়া।

বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হলেও কম দেখায়। এই বয়েসেও হালকা শরীরচর্চা ওঁর নেশা। চওড়া গোঁফ, কদমছাট চুল। অল্পস্বল্প নেশা যে করেন সেটা চোখের কোল দেখলে বোঝা যায়। মুখে কেমন যেন একটা যান্ত্রিক শক্ত ভাব আছে। কিন্তু ওঁর হাসি এত সুন্দর-সরল যে, হাসলে ওঁর সাত খুন মাফ করে দেওয়া যায়। দু-যুগ আগে সানিয়া ওঁর এই হাসি দেখেই প্রেমে পড়েছিলেন।

ব্রিজেশের গায়ে লাল লেগো আঁকা একটা সাদা টি-শার্ট আর ছাই রঙা বারমুডা। বালির ওপরে পা ফেলে সমুদ্রের জলের দিকে এগোচ্ছিলেন। জল আসছে, যাচ্ছে তার সঙ্গে ভেসে আসছে রঙিন জেলিফিশ। গতকাল ভোরবেলা একটা বড় মাপের কচ্ছপও ভেসে এসেছিল। লোকাল। জেলেগুলো বলেছিল, কচ্ছপটা ভালোরকম চোট পেয়েছে, ওটা আর বাঁচবে না।

কী করে চোট পেল সে-কথা জিগ্যেস করাতে ওরা বলেছে, হয়তো ওটা কোনও জাহাজের প্রপেলারে ধাক্কা খেয়েছে।

কাল ভোরে কচ্ছপটাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছিল। কেউ-কেউ মোবাইলে ওটার ছবিও তুলছিল।

ব্রিজেশ জলের কিনারায় নেমে এলেন। পা ভেজালেন নোনা জলে। একপলকের জন্য মনে। হল সমুদ্র ওঁর পা ধুয়ে দিচ্ছে। অফিসের ওই একশো বারোজনও কম-বেশি এই কাজটা করে থাকে। আর আশ্চর্য, ব্রিজেশ সেটা এনজয় করেন। যেমন এখন সমুদ্রের পা ধোয়ানোটা বেশ এনজয় করছেন।

সানিয়া স্বামীকে কিছুক্ষণ লক্ষ করছিলেন। কিন্তু ব্যাগের ভেতরে রাখা মোবাইল ফোন বেজে ওঠায় মনোযোগ সরে গেল। ছোট হাতব্যাগের মুখ খুলে ভেতরে উঁকি মারলেন। না, ব্রিজেশের ফোন নয়, সানিয়ার ফোনটাই বাজছে।

ফোন ধরলেন। অপরূপার ফোন। লস এঞ্জেলিস থেকে।

ব্রিজেশ আর সানিয়ার একমাত্র মেয়ে। দু-বছর আগে বিয়ে হয়েছে। তারপর থেকেই স্টেটসে। যোগাযোগ বলতে দিনে দু-তিনটে ফোন। ব্যস।

একটা লম্বা শ্বাস ফেলে হ্যালো বললেন সানিয়া। চোখের কোণ দিয়ে ব্রিজেশকে একবার দেখলেন। জলের ওপরে আয়েশি পা ফেলছেন। তারপর অপরূপার সঙ্গে কথায় ডুবে গেলেন।

সমুদ্রের হাওয়া ব্রিজেশের ভালো লাগছিল। দেখছিলেন, হাওয়ার দাপটে দুটো পায়রা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিরবেগে বাতাসে ভেসে চলেছে। ব্রিজেশও এখন ওদের মতো অলসভাবে প্রকৃতির হাত ধরে ভেসে চলেছেন। করপোরেট জীবনের কোনও বাঁধন নেই, শাসন নেই। ওই সূর্যের মতো তিনি স্বাধীন। কিংবা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

ঠিক তখনই একটা জিনিস ব্রিজেশের চোখে পড়ল।

একটা প্রকাণ্ড মাপের জিনিস–একটা বস্তা কিংবা সেই জাতীয় কিছু সমুদ্রের জলে ভেসে আসছে।

ব্রিজেশের কাছ থেকে পনেরো-বিশ ফুট দূরে ভাসছে–অথবা, সাঁতার কেটে আসছে– জিনিসটা।

আবার একটা উন্ডেড কচ্ছপ নাকি?

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জিনিসটা ব্রিজেশের খুব কাছে এসে গেল। সমুদ্রের জল ওটাকে প্রায় ব্রিজেশের পায়ের কাছে জমা দিয়ে চলে গেল। আর বস্তুটা হামাগুড়ি দিয়ে বালির ওপরে অনেকটা উঠে এল।

অন্য কেউ হলে অবশ্যই চিৎকার-চেঁচামেচি করে একলাফে ছিটকে সরে যেত, কিন্তু ব্রিজেশ অন্য ধাতুতে গড়া। এক পলকেই প্রাণীটাকে তিনি যা দেখার দেখে নিয়েছেন।

না, প্রাণীটা কচ্ছপ নয়। এমন অদ্ভুত প্রাণী বোধহয় কেউ কখনও দেখেনি।

প্রাণীটার চেহারা কচ্ছপ আর শঙ্কর মাছের মাঝামাঝি। মাপে নেমন্তন্ন-বাড়ির নৌকোর মতো। মেটে রঙের শরীরে পায়রা-চঁদা মাছের মতো কালো চাকা-চাকা দাগ। শরীরটা মসৃণ নয়– এবড়োখেবড়ো। যেন খাবলা-খাবলা মাটি চাপিয়ে তৈরি। আর গায়ের চামড়াটা ব্যাঙের মতো খসখসে–তার ওপরে ডুমো-ডুমো আঁচিল।

প্রাণীটার পিছনদিকে অক্টোপাসের শুড়ের মতো গোটা চারেক লেজপাখনার মতো ছড়িয়ে আছে। চারটে শক্তপোক্ত পা। পায়ের আঙুলগুলো হাঁসের পায়ের পাতার মতো চামড়া দিয়ে জোড়া। আঙুলের ডগায় মোটা বাঁকানো নখ।

সবচেয়ে বীভৎস হল প্রাণীটার চোখ। অন্তত ব্রিজেশের তাই মনে হল।

চোখ তো নয়, যেন নীল রঙের দুটো টেনিস বল–তাও আবার শরীরের বাইরে উঁচু হয়ে আছে! এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে–যেন কাউকে খুঁজছে।

প্রাণীটা নখ দিয়ে ভিজে বালির ওপরে খুব ধীরে-ধীরে আঁচড় কাটছিল। বোধহয় অচেনা পরিবেশে আচমকা হাজির হয়ে ঠিক কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

ব্রিজেশ আর দেরি করলেন না। উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকালেন। কাছেই একজন বৃদ্ধ লাঠি হাতে বালির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখের পলকে ব্রিজেশ ছুটে গেলেন তার কাছে।

এক্সকিউজ মি বলে এক ঝটকায় লাঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। তারপর ছুটে আবার প্রাণীটার কাছে চলে এলেন। কালী পুজোয় খাঁড়া উঁচিয়ে যেমন করে পাঁঠাবলি দেয় ঠিক সেইভাবে লাঠিটা শক্ত দু-হাতে তুলে ধরলেন মাথার ওপরে। এবং ভয়ংকর শক্তিতে প্রাণীটার মাথা তাক করে সেটা নামিয়ে আনলেন।

বেলুন ফাটার মতো শব্দ হল। একটি চি-চিঁ শব্দও বেরিয়ে এল প্রাণীটার মুখ থেকে। কিন্তু ব্রিজেশ বুঝলেন, লাঠির ঘায়ে প্রাণীটাকে সেরকম কাবু করা যায়নি।

চায়ের দোকানদারদের পেতে রাখা বেঞ্চিগুলোর দিকে চোখ গেল ব্রিজেশের। ওগুলো বেশ ভারী কাঠ দিয়ে তৈরি। সুতরাং লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা খালি বেঞ্চির দিকে ছুটে গেলেন।

প্রাণীটা ঘিরে ততক্ষণে ভিড় জমতে শুরু করেছে। কিন্তু সব দর্শকই ভয়ংকর প্রাণীটার কাছ থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখেছে।

বেঞ্চি কাঁধে নিয়ে ব্রিজেশ চিৎকার করে ছুটে এলেন। ওঁর মারমুখী চেহারা দেখে সবাই চটপট সরে গিয়ে ওঁকে পথ করে দিল।

প্রাণীটা তখন ওর লম্বা লাল জিভ বের করে ভিজে বালির ওপরে বোলাচ্ছে। ওর চারটে লেজ ছটফট লাফাচ্ছে। নীল চোখ এলোমেলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

দর্শকদের গুঞ্জন জোরালো হল। আর ব্রিজেশ কাঠের বেঞ্চিটাকে গদার মতো ব্যবহার করলেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটা বসিয়ে দিলেন প্রাণীটার দেহে।

ওটার পিঠের চামড়া ফেটে গেল। কালচে তরল ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। প্রাণীটা ওর শরীর মোচড়াতে লাগল। চোখ উলটে পা ছুঁড়তে লাগল। চি-চিঁ শব্দটা আরও জোরালো হল।

ব্রিজেশ কিন্তু থামেননি। বেঞ্চিটাকে বারবার কাঁধে তুলে প্রাণীটাকে একের পর এক আঘাত করতে লাগলেন।

দর্শকদের একটা অংশ চেঁচিয়ে ব্রিজেশকে উৎসাহ জোগাতে লাগল। কেউ-কেউ ইশ! আহা! করতে লাগল।

হইচই আর ভিড় দেখে সানিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। অনেক মুখের ভিড়ে স্বামীর মুখটা খুঁজছিলেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলেন না।

কাঠের বেঞ্চিটা ওঠা-নামা করাতে করাতে ব্রিজেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যখন থামলেন তখন প্রাণীটা একেবারে থেঁতলে গেছে। নেহাত ওটার রক্ত লাল নয়–নইলে দৃশ্যটা অনেক বীভৎস দেখাত। প্রাণীটার গোটা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও চোখ দুটো অক্ষত ছিল। প্রাণীটার নীল চোখ দুটো কেমন শান্ত মায়াময় দেখাচ্ছিল।

মৃত প্রাণীটাকে ঘিরে জটলা বাড়ছিল। প্রাণীটার নাম কী, কোন জাতের, এইসব বিষয় নিয়ে জোরালো আলোচনা চলছিল। ব্রিজেশ বেঞ্চিটা একপাশে নামিয়ে রেখে হাঁপাচ্ছিলেন। অনেকেই ব্রিজেশের শক্তি আর সাহসের তারিফ করছিলেন।

বলছিলেন, ব্রিজেশ প্রাণীটাকে খতম না করলে সি-বিচে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। কেউ-কেউ গতকাল ভেসে ওঠা কচ্ছপটার কথা বলছিলেন।

সানিয়া ততক্ষণে ব্রিজেশকে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু সমুদ্রের কিনারায় জটলাটা ঠিক কীসের সেটা বুঝতে পারছিলেন না। তাই উবিগ্ন হয়ে ব্রিজেশের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

ব্রিজেশ সানিয়ার দিকে তাকালেন। সানিয়া বেশ খানিকটা দূরে, অনেকটা উঁচুতে, বালির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রিজেশ হাত তুলে ওঁকে আশ্বাস দিলেন। বোঝাতে চাইলেন যে, চিন্তার কিছু নেই, এখুনি তিনি স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবেন।

কিন্তু ব্রিজেশের প্ল্যান ভেস্তে গেল একটা উটকো লোকের জন্য।

লোকটা ভিড় ঠেলে সরিয়ে, বলতে গেলে আচমকাই, ব্রিজেশের সামনে এসে উদয় হল।

লোকটার গায়ের রং বেশ কালো। লম্বাটে মুখ। ঢ্যাঙা চেহারা। গায়ে পুলিশের খাকি উর্দি। মাথায় ক্রিকেটারদের কালো ক্যাপ। হাতে তামাটে রঙের ব্যাটন।

হয়তো ওর পুলিশের পোশাক আর হাতের লাঠি দেখেই জটলা পাকানো জনতার ভিড় বেশ কিছুটা পাতলা হয়ে গেল।

লোকটা পান চিবাচ্ছিল। প্রাণীটার ডেডবডির খুব কাছে এসে ও মুখ ছুঁচলো করে পুচ করে ভিজে বালিতে পানের পিক ফেলল। তারপর লাঠিটা আলতো করে বাঁ-হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুখগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল।

লাঠিটা মরা প্রাণীটার দিকে তাক করে পুলিশটি বাতাসে রুক্ষ প্রশ্ন ভাসিয়ে দিলঃ এটাকে কে মারল রে?

জনতার গুঞ্জন শুরু হল। দু-একজন একটু ইতস্তত করে ব্রিজেশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

ব্রিজেশও প্রায় একইসঙ্গে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, আমি–আমি মেরেছি…।

লোকটা ব্রিজেশের দিকে দু-পা এগিয়ে এল। লাঠি উঁচিয়ে বেশ উদ্ধতভাবে জানতে চাইল, কেন? মারলেন কেন?

এ-এমনি...।

এমনি মানে? ব্যঙ্গের হাসি হাসল পুলিশ ও সমুদ্রের মাছ-মছলি-বকচ্ছপ কি আপনার বাপের সম্পত্তি যে, এমনি-এমনি মেরে ফেললেই হল?

ব্রিজেশ একটা ধাক্কা খেলেন। লোকটা কী অভদ্রের মতো কথা বলছে! একটা পেটি কনস্টেবলের এত সাহস আর আস্পর্ধা! ব্রিজেশ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে এভাবে কথা বলছে! এখুনি দুটো ফোন লাগাবেন নাকি? কী করে এইসব চাকরবাকর মার্কা পুলিশের প্যান্ট খুলে নিতে হয় সেটা ব্রিজেশ ভালোই জানেন।

কী হল? কেন মারলেন, বলুন? লোকটা পান চিবোতে চিবোতে জিগ্যেস করল।

না, মানে...অ্যানিম্যালটা খুব ডেঞ্জারাস ছিল...।

কী করে বুঝলেন ডেঞ্জারাস?

এইরকম একরোখা প্রশ্নের তোড়ের মুখে পড়ে ব্রিজেশ কেমন যেন থতোমতো খেয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, মানে...ওটার চোখ দুটো কী বড়-বড়...।

হ্যাঁঃ, বড়-বড়! তাচ্ছিল্যের শব্দ করে মুখ বেঁকাল লোকটা : আপনার চোখগুলোও তো খুব বড়-বড়। তো তাই বলে আপনাকে আমি কি লাঠিপেটা করে মেরে ফেলব? বড়-বড় চোখ দেখলে কি আপনার অ্যালার্জি হয়, না পেটখারাপ হয়?

ব্রিজেশের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। এই পুলিশ কনস্টেটাকে এবার থামানো দরকার। পাবলিকের সামনে এভাবে ব্রিজেশকে হেনস্থা করছে!

ব্রিজেশ সানিয়ার দিকে তাকালেন। সানিয়া এখন উদবিগ্ন মুখে ব্রিজেশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ব্রিজেশ ইশারায় ওঁকে কাছে ডাকলেন। ওঁর ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোনটা নেওয়া দরকার। প্রথম ফোনটা ব্রিজেশ করবেন লালবাজারে, ডেপুটি কমিশনারকে। তারপর দ্বিতীয় ফোনটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

শিল্পমন্ত্রীকে। গত একবছর ধরে কোম্পানির মেগা-এক্সপ্যানশনের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে অনেকবার আলোচনায় বসেছেন ব্রিজেশ। ভদ্রলোক বেশ সেনসি আর পজিটিভ।

ব্রিজেশ হঠাৎই খেয়াল করলেন, ওঁদের ঘিরে থাকা ভিড়টা বেশ হালকা হয়ে গেছে। আর এখন যারা মরা প্রাণীটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা নেহাতই বালক-বালিকা গোছের।

পুলিশটার শেষ মন্তব্যের কোনও জবাব দেননি ব্রিজেশ। কী-ই বা জবাব দেবেন। তিনি সানিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোবাইল ফোনটা ক্রমশ ওঁর হাতের নাগালে আসছিল।

পুলিশ লোকটা বাতাসে লাঠি নেড়ে ভিড় ফাঁকা করতে লাগল। তারপর ব্রিজেশের নামিয়ে রাখা কাঠের বেঞ্চির আশপাশ থেকে পাবলিক হটাতে লাগল। বেঞ্চিটা দেখিয়ে ব্রিজেশকে লক্ষ্য করে বলল, এটা মাডার ওয়েপন। এভিডেন্স ডিসটার্ব করা ঠিক না।

মার্ডার ওয়েপন! একটা সামুদ্রিক প্রাণীকে মেরেছেন বলে সেটাকে এই অসভ্য লোকটা মার্ডার বানিয়ে ফেলল।

অসভ্য লোকটা ততক্ষণে পকেট থেকে নোটবই আর পেন বের করে ফেলেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পানের পিক ফেলে ব্রিজেশকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন শুরু করল।

নিন, এবার আপনার নাম-ঠিকানা বলুন।

ব্রিজেশ দু-এক লহমা ইতস্তত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর শান্ত গলায় নিজের নাম-ঠিকানা বললেন।

লাঠিটা বগলে চেপে ধরে লোকটা মনোযোগ দিয়ে সেটা নোট করে নিল।

পুরীতে নিশ্চয়ই বেড়াতে এসেছেন? লিখতে লিখতেই পরের প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

হ্যাঁ—।

সঙ্গে আর কে-কে আছে?

শুধু আমার ওয়াইফ আর কেউ না।

সানিয়া ব্রিজেশের কাছে এসে পড়েছিলেন। তাই উত্তরটা দেওয়ার সময় ব্রিজেশ হাতের ইশারায় সানিয়াকে দেখালেন।

চোখ সরু করে সানিয়াকে দেখল পুলিশটা। তারপর বাঁকা সুরে বলল, সত্যিকারের ওয়াইফ, নাকি বানানো-প্যাচানো?

তা-তার মানে! ব্রিজেশ উত্তেজনায় তোতলা হয়ে গেলেন : আ-আমাদের বয়েসটা দেখেছেন। এই বয়েসে কেউ।

হাত তুলে ব্রিজেশকে মাঝপথে থামিয়ে দিল লোকটা। বালিতে পানের পিক ছুঁড়ে দিয়ে বলল, সেক্সের কেসে বয়েসটা ফ্যাক্টর নয়। পুলিশের লাইনে আমরা এরকম সুজ্জা-সুড্ডির কেস ঢের দেখেছি। যাকগে, ওয়াইফের নাম বলুন…।

ব্রিজেশ বললেন। ওঁর মুখে রক্তের আভা। কানের ডগা লালচে। সানিয়ার অবস্থাও একইরকম। ওঃ, এই ছোটলোকটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না!

সানিয়ার কাছ থেকে নিজের মোবাইলটা চেয়ে নিলেন ব্রিজেশ। তারপর সবে ওটার বোতাম টিপতে শুরু করেছেন, কবজির ওপরে লাঠির আলতো টোকা পড়ল : কাকে ফোন করছেন? এখন ফোন-টোন করা যাবে না–সব বন্ধ।

তার মানে? রুক্ষ গলায় প্রতিক্রিয়া দেখালেন ব্রিজেশ, ফোন করা যাবে না মানে!

হাসল উদ্ধত ছোটলোক পুলিশ। পেনটা পকেটে রাখল। তারপর হাতের এক ছোবলে ব্রিজেশের মোবাইলটা কেড়ে নিল। অনায়াসে ছুঁড়ে দিল সমুদ্রে, অনেক দূরে।

ব্রিজেশ প্রথমটা হতবাক হয়ে গেলেও তারপর ফুঁসে উঠলেন। আঙুল তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই লোকটা লাঠি উঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, একদম গরম দেখাবেন না। মার্ডার করে আবার গরমবাজি! আবার বেচাল দেখলেই ডান্ডা মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাব।

লোকটার রাগি মারমুখী ভাব ব্রিজেশকে থামিয়ে দিল। সানিয়া ভয়েভয়ে বললেন, প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন…।

লোকটা সানিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। দাঁতে পানের লাল ছোপ।

ম্যাডাম, আপনার হাজব্যান্ড একটু আগে সমুদ্রের এই প্রাণীটাকে মার্ডার করে ফেলেছেন– মরা প্রাণীটার দিকে লাঠির ইশারা করল লোকটা? তাই নিয়ে আপনার হাজব্যান্ডকে গোটকয়েক কোশ্চেন করতে চাইছিলাম কিন্তু তিনি তো গরম খেয়ে বসে আছেন। যার জন্যে আমার ইনভেস্টিগেশানের কাজটাই ঠেকে গেছে।

সানিয়া স্বামীর বাহুতে হাত রেখে নীচু গলায় কীসব বললেন।

ব্রিজেশ চুপচাপ কয়েকবার মাথা নাড়লেন। মনে হল সানিয়ার কথায় সায় দিলেন। তারপর পুলিশের লোকটাকে লক্ষ্য করে শান্ত গলায় বললেন, বলুন, কী জানতে চান।

লোকটা চারপাশে ভিড় জমানো মানুষজনকে আচমকা খেঁকিয়ে উঠল : কী চাই আপনাদের? যান, যান, নিজের নিজের কাজে যান। এখান থেকে ফুটুন। কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা শূন্যে লাঠি নাচিয়েছিল।

ওর ধমকে ভালোই কাজ হল। তা সত্ত্বেও একটু ফাঁকা জায়গায় সরে দাঁড়াল লোকটা ব্রিজেশদেরও ইশারায় ডেকে নিল।

এবার ব্রিজেশের দিকে তাকাল পুলিশ ও একদম শুরু থেকে বলুন। অ্যানিম্যালটাকে প্রথম কখন দেখলেন? তখন ওটা কী করছিল?

ব্রিজেশ এতক্ষণ চুপচাপ থেকে নিজেকে ধাতস্থ করছিলেন। সানিয়ার দিকে একপলক তাকিয়ে প্রাণীটার সঙ্গে ওঁর দেখা হওয়ার ব্যাপারটা খুলে বললেন।

লোকটা চুপচাপ শুনতে লাগল। লাঠি বগলে রেখে ব্রিজেশের স্টেটমেন্ট টুকে নিল। তারপর নোটবই-পেন পকেটে রেখে হাতে হাত ঘষল।

অ্যানিম্যালটা কি আপনাকে অ্যাটাক করতে এসেছিল?

ব্রিজেশ ইতস্তত করে বললেন, না মনে হয়…না।

হুঁ– তা হলে ওটাকে আপনি মারতে গেলেন কেন?

ওটা ওরকম বড় বড় চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মানে, না-নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। তাই…।

তাই অ্যাটাক করলেন?

ব্রিজেশ কেমন বিভ্রান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ। মানে, ওরকমই বলতে পারেন।

চুপচাপ পান চিবাতে লাগল পুলিশ। তারপর শব্দ করে পানের পিক ফেলে বলল, আচ্ছা, দেখুন–এমনও তো হতে পারে, আপনাকে দেখে ওই অ্যানিম্যালটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওটা…।

বাধা দিয়ে ব্রিজেশ বললেন, ওটা দেখতে খুব বীভৎস…।

প্রাণীটার ডেডবডি লক্ষ্য করে তাকালেন ব্রিজেশ। ওটা ঘিরে এখনও লোকজনের ভিড়। সক্কালবেলা এরকম রোমাঞ্চকর দৃশ্য কে ছাড়ে! না, মানুষের পাঁচিল ভেদ করে প্রাণীটাকে দেখা যাচ্ছে না।

পুলিশটা মুচকি হেসে ব্রিজেশকে বলল, আমি যদি বলি, প্রাণীটা আপনার বীভৎস চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ব্রিজেশ থতোমতো খেয়ে গেলেন। এ আবার কেমন কথা! ব্রিজেশকে দেখতে বীভৎস? আশ্চর্য!

আমাকে বীভৎস দেখতে?

হ্যাঁ হাসল পুলিশঃ ওই প্রাণীটার চোখে। আহা-হা, রাগ করবেন না–এরকম হতেও তো পারে! ফলে জানবেন, আপনার দেখার অ্যাঙ্গেলটাই সব নয়। অন্যদের আঙ্গেলটারও একটা দাম আছে।

সানিয়া ব্রিজেশের কাছ ঘেঁষে এসে স্বামীকে কানে-কানে কী যেন বললেন। ব্রিজেশ হাতের ইশারায় ওঁকে বোঝাতে চাইলেন, ঠিক আছে, দেখছি।

দু-একবার ঢোক গিলে ব্রিজেশ পুলিশটাকে বললেন, দেখুন, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন ব্যাপারটা কীভাবে মেটানো যায় বলুন।

ভুরু কপালে তুলল পুলিশ ও তার মানে? আমাকে কি আপনি ঘুষ খাওয়ানোর কথা ভাবছেন?

না, না–সে-কথা বলিনি…।

একটা হাত কোমরে রাখল, অন্য হাতে লাঠিটা নাচাল।

কী বলছেন আমি ভালোই বুঝেছি। চমৎকার! একে তো একটা নিরীহ প্রাণীকে বলা নেই কওয়া নেই অ্যাটাক করে খুন করলেন। তার ওপরে একজন সৎ পুলিশকর্মীকে অসৎ করার চেষ্টা করছেন?

সানিয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন, প্লিজ, অফিসার। ওকে মাফ করে দিন। ও ভুল করে ফেলেছে। প্লিজ!

ব্রিজেশ স্ত্রী-কে প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, হ্যাভ য়ু গন ক্রেজি, সানি? হোয়াই আর য়ু বেগিং টু আ পেটি কনস্টেবল?

শাট আপ! লোকটা এমনভাবে চিৎকার করে ধমকে উঠল যে, ব্রিজেশের পিলে চমকে গেল। সানিয়ার দিকে তাকিয়ে লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল, ম্যাডাম, আপনার ইংলিশ মিডিয়াম স্বামীকে সামলে রাখুন। নইলে, এখানেই ফেলে পেটাতে শুরু করব। পাছায় দু-ডান্ডা দিলে সিধে হয়ে যাবে। কথা বলতে-বলতে লাঠিটা মারাত্মক ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধরল লোকটা। ওর চোখ লাল। মনে হচ্ছে যেন চোখ দিয়ে পান চিবিয়েছে।

ব্রিজেশ সঙ্গে-সঙ্গে আত্মরক্ষার ঢঙে দু-হাত তুলে সরি! সরি! বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নিজের রাগ সামলে নিল পুলিশ। সানিয়াকে দেখে মায়া হল ওর। ব্রিজেশের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, আসলে কী জানেন, আপনাদের মতো প্রাণীদের প্রবলেম হল, যে-জিনিস আপনারা কখনও দেখেননি সেটা আপনাদের শত্রু। আপনাদের চোখে সেটা বীভৎস, ডেঞ্জারাস। তাই তাকে

দেখামাত্রই খতম করতে হবে। তক্ষুনি। আরও সহজ করে বলতে হলে, আপনাদের অপছন্দের জিনিসকে আপনারা সহ্য করতে পারেন না।

থু-থু করে পানের পিক ফেলল পুলিশটা। মাথার টুপিটা খুলে নিল। মাথায় হাত বোলাল। তারপর টুপিটা আবার মাথায় বসিয়ে বলল, আমাদের স্বাধীনতার লড়াই লালমুখো ব্রিটিশদের পছন্দ ছিল না। তাই শালারা সেটা ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ কিংবা সিপাহি-বিদ্রোহের বেলায়ও তাই। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা চাওয়ার লড়াই মার্কিন সরকার বা ফরাসি সরকারের পছন্দ ছিল না। তাই কত প্রাণ বেমালুম খরচ হয়ে গেল!

তেমনই আপনি। ওই যে–মরে পড়ে আছে–ওই প্রাণীটা আঙুল তুলে ডেডবডি ঘিরে থাকা জটলার দিকে দেখাল পুলিশ ও ওটা আপনার অপছন্দের ছিল, তাই আপনি ওটাকে সরাসরি খুন করলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনাকে অনেকেই অপছন্দ করে? যেমন, ওই প্রাণীটা। আপনার অফিস কি ব্যবসায় জড়িয়ে থাকা অনেক লোক। সানিয়ার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে হাসল, বলল, এমনকী আপনার ওয়াইফও হয়তো আপনাকে অপছন্দ করেন।

ব্রিজেশ প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিল পুলিশ। খেঁকিয়ে উঠে বলল, একদম চুপ। আপনার কথা ঢের শুনেছি–এখন আপনি শুনুন। আপনাকে যারা-যারা অপছন্দ করে তারা কিন্তু এখনও আপনাকে খতম করেনি। ওই প্রাণীটাও হয়তো আপনাকে অ্যাটাক করে ছিন্নভিন্ন করতে পারত, কিন্তু করেনি। এখন করেনি–কিন্তু পরে যে করবে তার গ্যারান্টি কিন্তু কেউ দিতে পারবে না। আমিও না। তাই এখন থেকে সাবধান থাকবেন– সিরিয়াসলি বলছি…।

সানিয়া স্বামীর হাত চেপে ধরলেন। ব্রিজেশ টের পেলেন সানিয়ার হাত কঁপছে। সেইসঙ্গে ওঁর নিজেরও।

পুলিশটা ইউনিফর্মে হাত ঘষল। তারপর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

ব্রিজেশ চাননি, কিন্তু ওঁর মুখ দিয়ে হঠাৎই বেরিয়ে এল, থ্যাংক্স…। সেইসঙ্গে বেরিয়ে এল একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস। এতক্ষণ ওঁর বুকটা কেমন ধড়ফড় করছিল, বুকের ভেতরে টেনশান জমা হচ্ছিল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল পুলিশ। ব্রিজেশের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আজ সমুদ্রে খুব ভালো করে স্নান করবেন। সমুদ্র অনেক বড়। অনেক ময়লা ধুয়ে দেয়। আপনাকে ধুয়ে-টুয়ে সাফ করে দেবে।

এই কথা বলে লোকটা চলে গেল।

ব্রিজেশ তাকিয়ে-তাকিয়ে লোকটার চলে যাওয়া দেখতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর চোখ সরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। ওঁর মনে হল, সত্যি, বড় দেরি হয়ে গেছে। আজ সমুদ্রে খুব ভালো করে স্নান করবেন ব্রিজেশ।

# বাক্সের ভিতরে কী আছে? (নভেলেট)

**বাক্সের ভিতরে কী আছে? (নভেলেট)**

প্রশ্নটা করে কৃপানাথ মজুমদার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রত্যাশায় দু-চোখ জ্বলজ্বল করছে। ময়লা হয়ে যাওয়া বাবের আলো তেরছাভাবে পড়েছে ওঁর মুখে। তোবড়ানো গাল আর চামড়ার ভঁজে ছায়া পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। খোলা জানলা দিয়ে ছাট আসছে। বর্ষার প্রথম বৃষ্টি। তাই বেশ লাগছে। সেইজন্যেই বোধহয় কৃপানাথ জানলা খুলে দিয়েছেন।

কালো আকাশ চিরে গেল আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখায়। তারপর শোনা গেল গুড়গুড় শব্দ। ক্যামেরার ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশগানের মতো বিদ্যুতের ঝিলিক পলকের জন্যে ছুঁয়ে গেল বিশাল বাক্সটাকে। ওটা ধাতব গা চকচক করে উঠল হঠাৎ। আর তখনই একটা অদ্ভুত খচড়-খচড় শব্দ ভেসে এল বাক্সের ভিতর থেকে।

কৃপানাথ মুচকি হাসলেন। আবার প্রশ্ন করলেন, কী হল, বলুন, বাক্সের ভিতরে কী আছে?

কৃপানাথ মজুমদারের সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের। কিন্তু প্রথম থেকেই ভদ্রলোককে আমার কেমন একটু অদ্ভুত মনে হয়েছে।

অফিস ছুটির পর, বিকেল পাঁচটা নাগাদ, দাঁড়িয়ে ছিলাম এসপ্ল্যানেডের মোড়ে। চারপাশে মানুষজনের ভিড়। বাস, ট্যাক্সি আর গাড়ির জটলা। দূরে একটা ডবল ডেকার বাস আসছে দেখে আমি গলা উঁচিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম বাসটা কত নম্বর। এল-৯ যদি হয় তা হলে আমি নিশ্চিন্ত। এক বাসে চড়েই সোজা বাগবাজার। বাড়ি ফেরার যে খুব একটা তাড়া আছে তা নয়। তবে আকাশে

সকাল থেকেই ভয়-দেখানো কালো মেঘ। গত বিশদিন ধরে একটানা যে-গরম চলেছে তাতে সবাই বলছে আজ-নয়কাল শহর ভাসানো বৃষ্টি হবেই। সেইজন্যেই ঘরে ফেরার পথে অযথা দেরি করব না ভেবেছি।

বাসটা কত নম্বর বলুন তো!

প্রশ্নটা কি আমাকে লক্ষ্য করেই? পাশে তাকিয়ে দেখি রোগা ঢ্যাঙা চেহারার এক প্রৌঢ়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরনে পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে মেটাল ফ্রেমের শৌখিন চশমা। ডান হাতের আঙুলে তিন-তিনটে রঙিন পাথর বসানো সোনার আংটি, বাঁ-হাতে একটা হালকা ব্রিফকেস।

ভদ্রলোকের গাল তোবড়ানো, মুখের চামড়ায় বয়েসের ভাঁজ। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা প্রাচীন বনেদিয়ানার ছাপ রয়েছে। আর তার চোখের নজর অদ্ভুতরকম শান্ত।

আমি আবার বাসটার দিকে তাকালাম। ওটা অনেক কাছে এসে গেছে। না, এল-৯ নয়, পাঁচ নম্বর।

ভদ্রলোককে বাসের নম্বরটা বললাম। একবার দেখলাম ওঁর চোখের দিকে। চশমা পরেও কি ঠিকঠাক দেখতে পান না।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে অকারণেই হাসলেন। তারপর বললেন, আমার নাম কৃপানাথ মজুমদার। ব্যবসা করি…।

অপরিচিত লোকের আত্মজীবনী শোনার কোনওরকম আগ্রহ কোনওকালেই আমার ছিল না। তাই আবার নজর ফেরালাম বাস-রাস্তার দিকে।

বলুন তো, এর পর কত নম্বর লাল রঙের বাস আসবে?

কী অদ্ভুত প্রশ্ন! একটু অবাক হয়েই তাকালাম কৃপানাথের দিকে। ভদ্রলোক প্রথমটা একটু সিঁটিয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরই দিব্যি সামলে নিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না। এটা স্রেফ একটা মজার খেলা। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ব্রেনটা একটু রিল্যাক্স করা আর কী! ওই দেখুন, দূরে একটা লাল বাস আসছে। বলুন তো, কত নম্বর হতে পারে?

কেমন এক দোটানার মধ্যে পড়লাম। এই বিচিত্র লোকটার বায়নায় ধরা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে যাব? বাড়িতে বুবু-টুটুর সঙ্গে যে মাঝেমধ্যে ছেলেমানুষি করি না এমন নয়। বুবু ফাইভে পড়ে, আর টুটু ওয়ানে। ওদের সঙ্গে হুল্লোড় করার সময় অনুরাধা এক-এক সময় ভীষণ খেপে যায়। বলে, তিন-তিনটে ছেলে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা! তার মধ্যে একটা অবশ্য ধেড়ে! উত্তরে আমি শুধু হাসি। আর খেলা চালিয়ে যাই। টুটু তাতে মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তাই বলে এখন এরকম ছেলেমানুষি খেলা!

আরে তাড়াতাড়ি বলুন, বাসটা কাছে এসে যাচ্ছে–এরপর নম্বর স্পষ্ট দেখা যাবে...।

কৃপানাথের অধৈর্য তাড়ায় কী যে হয়ে গেল! বাসটা একতলা, তাই ফস করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, চোদ্দো নম্বর।

বাসটা কাছে আসতেই তার নম্বরটা পড়া গেল। চোদ্দো। কৃপানাথ হেসে উঠে বললেন, শাবাশ! আপনি জিতেছেন।

তারপরই আমাকে অবাক করে দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কড়কড়ে একটা একশো টাকার নোট বের করে গুঁজে দিলেন আমার হাতে।

কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারলাম না। কৃপানাথ মজুমদার এখনও পর্যন্ত আমার নামও জিগ্যেস করেননি। সুতরাং সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা একজন মানুষকে অযথা একশোটা টাকা দিয়ে দেওয়া...নাঃ, ভদ্রলোক যতই বড়লোক হোন না কেন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

নাকি এটা এক ধরনের জুয়া খেলা! বাসের নম্বর না মিললে আমাকে কি একশো টাকা দিতে হত?

কৃপানাথ আমার অস্বস্তি আঁচ করে বললেন, মাপ করবেন, আপনার নামটা এখনও জিগ্যেস করা হয়নি...।

আমি বললাম, আমারই বলা উচিত ছিল। অচিন বন্দ্যোপাধ্যায়।

একশো টাকার নোটটা তখনও আমার হাতের মুঠোয় ধরা। বুঝতে পারছি না নোটটা নিয়ে এখন কী করা উচিত।

অচিনবাবু, এই সামান্য টাকাটা আপনি নিলে আমি খুব খুশি হব। না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। এটা জুয়া নয়। বাসের নম্বর না মিললে আপনাকে কোনও টাকা দিতে হত না। একটু থেমে উদাস চোখে কালচে আকাশের দিকে দেখলেন কৃপানাথ। তারপর বললেন, আসলে ব্যাপারটা এক বড়লোক বৃদ্ধের খেয়াল বলতে পারেন। গত বিশ-তিরিশটা বছর একা-একা আছি। সঙ্গী বলতে একটা মানুষও নেই। তাই রোজ বিকেলে, অফিস কাছারি ছুটির সময় ধর্মতলায় এসে ঘোরাফেরা করি, মানুষজনের সঙ্গে একরকম গায়ে পড়েই আলাপ করি… একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কৃপানাথ। তারপর কিছুটা হতাশ করুণ সুরে বললেন, আশা করি এই বুড়োর ছেলেমানুষিতে আপনি কিছু মনে করেননি। ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে গল্প করে মজা করে খানিকক্ষণ সময় কাটাব, চা-টা খাব, কিন্তু..কপালে নেই…।

আমার মনের মধ্যে একটু-আধটু তোলপাড় চলছিল। মাসের শেষ সপ্তাহ। সুতরাং যথারীতি টাকার টানাটানি চলছে। এরকম পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা কি ছেড়ে দেওয়া উচিত? তা ছাড়া আমি তো খেলায় জিতেছি। আবার এই খামখেয়ালি বুড়োটার সঙ্গে গল্পগাছা করেও বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হবে। আমার সময়ের দাম হয়তো কম, কিন্তু তবু তার দাম তো আছে!

এইসব ভাবতে-ভাবতেই মনের মধ্যে বেশ কতকগুলো জোরালো যুক্তি তৈরি হয়ে গেল। এবং একশো টাকার নোটটা দিব্যি পকেটে চালান করে দিয়ে কৃপানাথকে বললাম, চলুন, কাফে ডি মোনিকোয় বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

কৃপানাথ মজুমদার খুশিতে একেবারে ফেটে পড়লেন। চশমার আড়ালে ওঁর ঘোলাটে চোখ পলকের জন্যে চকচক করে উঠল। তারপর আগ্রহী পা ফেলে আমার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলেন রাস্তা পার হওয়ার জন্যে।

ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

কয়েকটি স্কুলের মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই ট্রাফিক সিগন্যাল বদলে যাওয়ায় গাড়ি, বাস, ট্যাক্সির মিছিল চলতে শুরু করে দিল। জনা আষ্টেক মেয়ে মাঝরাস্তায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের মুখে দিশেহারা ভাব। বোধহয় স্কুল

থেকে এদিকে মিউজিয়াম বা বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম দেখতে এসেছিল। দেখলাম, আমাদের দিকের ফুটপাথে ওদের দলের বাকি সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত নেড়ে চিৎকার করে মাঝরাস্তায় আটকে পড়া বন্ধুদের ডাকাডাকি করছে।

এমন সময় গাড়িগুলোর গতি একটু কমতেই তাদের ফাঁকফোকর দিয়ে তিনটে মেয়ে ছুট লাগিয়ে চলে এল এপারে।

আর সঙ্গে-সঙ্গে কৃপানাথ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে উঠলেন, বলুন তো, আর কটা মেয়ে এক্ষুনি রাস্তা পেরিয়ে এপাশে চলে আসতে পারবে?

আবার ফাটকা? নাকি কৃপানাথ মজুমদারের মজা?

আমি অবাক চোখে ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই উনি অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন, বললেন, বলুন না, মশাই। এ তো স্রেফ মজার খেলা!

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, দুজন পারবে মনে হয়।

কিন্তু না, এবার হেরে গেলাম। এক ঝেকে আরও চারটে মেয়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে এল। এপারে দাঁড়ানো দলবলের কাছে।

কৃপানাথ মুচকি হেসে বললেন, ব্যাড লাক, মিলল না...।

মিলে গেলে কি আবার একশো টাকা পেতাম নাকি!

বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার মনের মধ্যে লোভ উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু আশ্চর্য, আগে কখনও আমি জুয়া খেলিনি।

একটু পরেই ট্রাফিক সিগন্যাল বদলে গেল। আমরা দুজনে নিরাপদে রাস্তা পেরিয়ে রওনা হলাম কাফে ডি মোনিকের দিকে। ফুটপাথের ভিড়, হকারদের উৎপাত, গাড়ির হর্নের শব্দ–এইসব মিলিয়ে বাকি পথটুকু কোনও কথাই বলতে পারলাম না আমরা।

সন্ধের অন্ধকার ঘন হয়েছে। বড় বড় অট্টালিকার ওপরতলায় গ্লো-সাইনের লাল-সাদা সবুজ নকশা জ্বলছে-নিভছে। আর হঠাৎই কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ল কালো আকাশ থেকে।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে দরজার কাছাকাছি একটা টেবিলে বসলাম আমরা। কৃপানাথ বেয়ারাকে দুটো কফি দিতে বললেন। তারপর আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, অচিনবাবু, প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই কৌতূহল আছে। চাঁদকে দেখে কৌতূহল হয়েছিল বলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। আর লেখাপড়ার মোদ্দা ব্যাপারটাই তো কৌতূহলের ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি আর কী বলব! একটু আগেই এই ভদ্রলোক প্রায় অকারণেই আমাকে একশোটা টাকা দিয়েছেন। সুতরাং ওঁর একটু-আধটু জ্ঞান আমার শোনা উচিত।

কৃপানাথ পকেট থেকে ক্লাসিক সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। আমাকে অফার করলেন। তারপর নিজে একটা নিলেন। আমি মামুলি একটা লাইটার বের করে ওঁর সিগারেট ধরিয়ে দিলাম, তারপর নিজেরটা ধরালাম। প্রথম ধোঁয়া ছাড়তে না ছাড়তেই কৃপানাথ রেস্তোরাঁর কিচেনের দিকে চোখের ইশারা করে বললেন, কফি আসছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, একজন রোগা ঢ্যাঙা উর্দি পরা বেয়ারা কফির ট্রে হাতে এগিয়ে আসছে। তার দিকে নজর রেখে চোখ ছোট করে সিগারেটে জোরালো টান দিলেন কৃপানাথ। তারপর আচমকা বলে উঠলেন, বলুন তো, বেয়ারাটা কার সামনে আগে কফির কাপ রাখবে? আপনার, না আমার?

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই বৃদ্ধ ঝটপট তাগাদা দিলেন আমায় : কী হল, জলদি বলুন, কুইক–।

আবার ওই একশো টাকার নোট। আবার লোভ। আবার মাসের শেষ সপ্তাহের অভাব। এই তিন-তিনটে ব্যাপার মিলেমিশে সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। তার ওপর একটু আগে বলা কৃপানাথের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথার ভিতরে। কৌতূহল। কৌতূহল থেকেই বাজি, জুয়া, সবকিছুর জন্ম। এই কৌতূহলের খপ্পরে পড়েই কৃপানাথের আজগুবি খেলায় নাম লিখিয়েছি আমি।

সুতরাং বলেই ফেললাম, আপনার সামনে আগে কাপ রাখবে।

কথা শেষ করার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কৃপানাথের সামনে কফির কাপ রাখল বেয়ারা। তারপর আমাকে কফি দিল।

লোকটা সরে যেতেই কৃপানাথ হাসলেন। বললেন, আপনি দারুণ লাকি, অচিনবাবু। বলেই পকেট থেকে আবার একটা একশো টাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে এগিয়ে দিলেন আমার সামনে।

আমি কফিতে চুমুক দেওয়া থামিয়ে আপত্তি জানালাম ও এ আপনি কী শুরু করেছেন, কৃপানাথবাবু! খেলা খেলাই–তার সঙ্গে এভাবে টাকা-পয়সা জড়ানো কি ঠিক?

ভদ্রলোক একেবারে আমার হাত চেপে ধরলেন। চাপা আন্তরিক গলায় বললেন, দয়া করে এই বুড়োটার তৃপ্তি কেড়ে নেবেন না। আমার আর টাকার দরকার নেই–শুধু একজন বন্ধু দরকার– আপনার মতো। প্লিজ, এই সামান্য টাকা কটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে কষ্ট দেবেন না।

গত এক-দেড় ঘণ্টার লড়াইয়ে আমার বিবেক ক্রমশই কাহিল হয়ে পড়ছিল। সুতরাং টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাতে খুব বেশি সময় লাগল না।

তারপর চলতে লাগল আমাদের কফির কাপ আর সিগারেটে চুমুক। রেস্তোরাঁর খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। ফুটপাথের জনস্রোতে মাঝে-মাঝেই ছাতা চোখে পড়ছে। আবার কখনও বা ব্যাগ কিংবা রুমাল ছাতার বিকল্প হিসেবে কাজ করছে।

কফি আর সিগারেট শেষ হতেই কৃপানাথ মজুমদার আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। আমার স্বাস্থ্য নাকি নজর কাড়ার মতো। আমার ব্যক্তিত্ব একটু অন্য ধরনের–সাদামাঠা নয়। আমার চোখ বেশ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে। আমার সৌজন্যবোধের কোনও তুলনা নেই। এইরকম আরও কত কী!

মুখোমুখি বসে একটানা অহেতুক প্রশংসা শুনতে হচ্ছিল। সুতরাং যেই গুনগুনিয়ে একটু আধটু বিনয়ী প্রতিবাদ করতে শুরু করেছি তখনই হঠাৎ কৃপানাথ বলে উঠলেন, অচিনবাবু।

বলুন।

আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখবেন? বলেই কৃপানাথ মজুমদার আমার হাত চেপে ধরলেন। অনুনয়ের সুরে আবদার করলেন, এ অনুরোধটুকু আপনাকে

রাখতেই হবে।

এই খ্যাপাটে বৃদ্ধ এবার কী অনুরোধ করবেন কে জানে! খানিকটা সতর্ক হয়েই প্রশ্ন করলাম, কী অনুরোধ?

আধঘণ্টার জন্যে আমার বাড়ি যাবেন? ঠিক আধঘণ্টা। একটুও বাড়তি সময় নেব না। চলুন, আপনাকে একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাব।

ওঁর বাড়ি কতদূর কে জানে! তা ছাড়া এই বৃষ্টিভেজা সন্ধের প্যাঁচপেচে পথ পেরিয়ে ওঁর ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখার তেমন একটা আগ্রহ আমার নেই। তবে যদি…।

কৃপানাথ বোধহয় আমার মতো মধ্যবিত্তদের মন জানেন। কারণ, আমার চোখেমুখে সামান্য ইতস্তত ভাব লক্ষ করে চাপা গলায় বললেন, এবার আর একশো টাকা নয়, এক লক্ষ টাকা!

এক লক্ষ টাকা! আমি কানে ঠিক শুনছি তো!

বৃষ্টির তেজ হঠাৎই দ্বিগুণ হয়ে গেল। আর আমার কানের ভিতরে কেউ যেন তপ্ত তাওয়ায় রুটি সেঁকতে শুরু করল।

রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে চপ-কাটলেটের ম-ম গন্ধ আসছিল। আচমকা সেই গন্ধ মুছে গিয়ে একটা নেশা-ধরানো মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল নাকে।

ওই ঝিমঝিম অবস্থার মধ্যেই কৃপানাথের চাপা অথচ স্পষ্ট গলা শুনতে পেলাম ও এক লক্ষ টাকা, অচিনবাবু! আর হেরে গেলে আপনাকে একটি টাকাও দিতে হবে না। এ একেবারে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা।

আমি কোনওরকমে বাঁ-হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে ছটা। আধঘণ্টার ব্যাপার। তা ছাড়া এক লক্ষ টাকা। ওঁর বাড়ি খুব একটা কি দূরে হবে?

আপনার বাড়ি কোথায়? প্রশ্নটা করার সময় আমার গলার স্বর সামান্য কেঁপে গেল।

এই তো, কাছেই…বাদুড়বাগান। ট্যাক্সি ধরব আর টপ করে পৌঁছে যাব।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বিল মিটিয়ে ব্রিফকেস তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কৃপানাথ। আমাকে হাত নেড়ে তাড়া দিলেন : চলুন, চলুন, বৃষ্টি আরও জোরে এসে গেলেই মুশকিল।

খুশিতে ডগমগ শিশুর মতো কাফে ডি মোনিকো থেকে ফুটপাথে নেমে পড়লেন কৃপানাথ। বৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই তড়িঘড়ি পায়ে এগিয়ে গেলেন রাস্তার দিকে। আমি ওঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন। কারণ, এবারেও সেই একশো টাকার নোট। তেমন ওজর-আপত্তি তোলার আগেই তিনি একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়েছেন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের হাতে। লোকটার মুখ দেখেই বোঝা গেল, আমাদের গন্তব্য যদি বাদুড়বাগান না হয়ে জাহান্নম বা দোজখ হত তা হলেও তার আপত্তি হত না।

বৃষ্টি, জল আর যানজট পেরিয়ে কৃপানাথ মজুমদারের বাড়ির সামনে এসে যখন পৌঁছোলাম, তখন সাতটা বেজে গেছে। গলিতে জমে ওঠা বৃষ্টির জল গোড়ালি ছাড়িয়ে হাঁটুর দিকে রওনা দিয়েছে। লম্বা সরু গলিতে মাত্র দুটো বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। আলোছায়ায় যে কটি বাড়ি দেখতে পেলাম তার সবগুলোই পুরোনো আমলের। আকারে বিশাল অথচ চেহারায় জীর্ণ।

বৃষ্টির জলে ছপছপ শব্দ তুলে কৃপানাথ একটা রংচটা গোলাপি বাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। বড় মাপের ভারী কাঠের দরজার নানান কারুকাজ। একটা নম্বর প্লেট বসানো থাকলেও আলো আঁধারিতে নম্বরটা ঠিক ঠাহর হল না।

শঙ্কর! শঙ্কর! বলে কৃপানাথ কাকে যেন ডাকলেন।

একটু পরেই বেশ শব্দটব্দ করে দরজা খুলে গেল। দরজার অল্পবয়েসি একটি রোগা ছেলে। বয়েস বিশ-বাইশ হবে বড়জোর। চোখগুলো ড্যাবড্যাবে। মাথায় কঁকড়া চুল। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট।

কৃপানাথ আমাকে ডাকলেন? আসুন, ভিতরে আসুন, অচিনবাবু।

ভিজে জামাকাপড়ে সপসপ আওয়াজ তুলে দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

জায়গাটা উঠোন মতো। বেশ বড়সড়ো। একপাশে বড়-বড় টবে কয়েকটা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। টবগুলো ইট দিয়ে ঘেরা।

উঠোন পেরিয়েই তিনতলা বাড়ি। বাড়ির কার্নিশে লতাপাতা-পরির কারুকাজ। সামনেই শান বাঁধানো সিঁড়ির তিনটে ধাপ। তার দুপাশে মার্বেল পাথর বসানো রোয়াক। রোয়াকের কিনারায় কয়েকটা নকশা কাটা লোহার থাম।

শঙ্কর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি আর কৃপানাথ তিনটে সিঁড়ির ধাপ উঠে ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভিতরে। যেতে যেতে পেছনদিকে মুখ ফিরিয়ে শঙ্করকে লক্ষ্য করে কৃপানাথ বললেন, ওঁকে দোতলার ঘরে বসাচ্ছি। তুই চায়ের ব্যবস্থা কর।

বাড়িটার অলিন্দ, সিঁড়ি, বারান্দা সবকিছুর মধ্যেই যেন জমিদারি মেজাজ। কিন্তু গোটা বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। মোট তিনটে প্রাণী ছাড়া আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আরও একটা প্রাণী বাড়িতে আছে।

দোতলার একটা সাবেকি ঘরে আমাকে বসালেন কৃপানাথ। বললেন, আগে একটু চা-টা খেয়ে নিন, তারপর খেলা-টেলা হবেখন।

ঘরটা একইসঙ্গে বসবার ঘর এবং শোওয়ার ঘর। মেঝেতে যথারীতি মার্বেল পাথর। দক্ষিণের দেওয়ালে খড়খড়ি দেওয়া বিশাল দুটো জানলা। জানলার সামনে রঙিন কাচের শার্সির ভাজ করা পাল্লা সামান্য খোলা রয়েছে। খাটটাকে খাট না বলে পালঙ্ক বললেই মানায় বেশি। বোঝা যায়, কৃপানাথ এই ঘরেই বাস করেন।

ঘরটা সাজানো-গোছানো শৌখিন। তবে আলোর ব্যবস্থা পুরোনো ধাঁচের। অলিন্দ, সিঁড়ি, বারান্দা, ঘর–সব জায়গাতেই সাধারণ বৈদ্যুতিক বা, টিউব লাইটের কোনও ব্যাপার নেই।

তা হোক। এক লক্ষ টাকা সব সময়েই এক লক্ষ টাকা–তা সে যে আলোতেই গুনি না কেন!

কৃপানাথ একটা তোয়ালে নিয়ে এসে আমার হাতে দিলেন। বললেন, গা-হাত-পা-মাথা সব মুছে নিন। যা ভেজান ভিজেছেন!

আমি বৃষ্টির শব্দ শুনতে-শুনতে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছলাম। তারপর গা-হাত-পা যতটা সম্ভব মুছে নিলাম। নাকটা সুড়সুড় করে তিনবার হাঁচি হল। কৃপানাথ তোয়ালে ফেরত নিতে নিতে বললেন, এক কাপ গরম চা খেলেই সব সেরে যাবে। আপনি একটু বসুন, আমি ভিজে জামাকাপড়গুলো ছেড়ে আসছি।

কৃপানাথ চলে যাওয়ার পর আমি একটা সিগারেট ধরালাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কর ঘরে ঢুকল। হাতের ট্রে থেকে কাপ-প্লেটগুলো নামিয়ে দিল টেবিলে। কাপে সুন্দর রঙের ধোঁয়া-ওঠা চা। আর প্লেটে ডিমের বড়া, সঙ্গে টোম্যাটো সস।

আমি আর দেরি করতে পারলাম না। শীত শীত ভাবটাপ কাটাতে সিগারেটে টানের সঙ্গে-সঙ্গে চা খেতে শুরু করলাম।

একটু পরেই কৃপানাথ ঘরে এলেন। ভিজে পোশাক পালটে একটা ঘিয়ে রঙের হাফহাতা হাওয়াই শার্ট আর পাজামা পরে এসেছেন।

আমার প্রায় মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন কৃপানাথ। ওঁকে সিগারেট অফার করতে হাত তুলে না বললেন। তারপর ডিমের বড়ায় কামড় দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ করলেন। বললেন, শঙ্করটা বড় ভালো রান্না করে।

হঠাৎই আমার চোখ পড়ল কৃপানাথের বাঁ-হাতের দিকে। এতক্ষণ ওঁকে পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় দেখেছি, তাই ব্যাপারটা আগে নজরে পড়েনি।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, কৃপানাথের বাঁ-হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত অনেকগুলো শুকনো ক্ষত। ক্ষতের চেহারা পুরোনো আমলের টিকের দাগের মতো–যেন চিতাবাঘের চাকা-চাকা দাগ।

আমার নজর কৃপানাথের চোখ এড়ায়নি। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খানিকটা সময় নিলেন। তারপর শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে সামান্য হেসে জিগ্যেস করলেন, কী দেখছেন, অচিনবাবু?

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। ওঁর বাঁ হাতের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। বললাম, না, কিছু না।

কৃপানাথ এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটিয়ে তুললেন ঠোঁটে। বললেন, একটু আগেই আপনাকে বলছিলাম না, কৌতূহলই সব কিছুর মূলে। তবে আপনার কোনও চিন্তা নেই–একটু পরেই সবকিছু জানতে পারবেন।

জানলায় বৃষ্টির শব্দ রীতিমতো বেড়ে উঠেছে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে কোথায় যেন খটাস খটাস শব্দ হচ্ছে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেমন গুমোট ভাব। ঘরের মার্বেল পাথর বসানো মেঝেতে আমাদের অদ্ভুত ছায়া নড়ছে।

সিগারেট ও চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ভাবছিলাম, কৃপানাথ কখন আবার এক লক্ষ টাকার প্রসঙ্গ তুলবেন। বুঝতে পারছি, পাগলের পাল্লায় পড়েছি। তবে বড়লোক পাগল বলেই এখনও খানিকটা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি।

খেতে-খেতে আমরা টুকটাক গল্প করছিলাম। আমি অনুরাধা, বুবু-টুটুর কথা বললাম। কৃপানাথ ওঁর জমিদার বাপ-ঠাকুরদার কথা বললেন। তারপর হঠাৎই বিষণ্ন হেসে বললেন, আপনার মতো আমিও বিয়ে করেছিলাম। প্রায় তিরিশ বছর আগে। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই বেচারি বউটা মরে গেল।

কৃপানাথের শান্ত চোখ আচমকা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই।

আমিও উঠে পড়লাম।

কৃপানাথ ফ্যানটা অফ করে দিলেন। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দা ধরে হাঁটা দিলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। বুকের ভিতরে কেমন যেন টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল।

বৃষ্টির ছাটে চওড়া বারান্দার অনেকটাই ভেসে গেছে। বাতাসে উড়ে আসা অসংখ্য জলকণা মিহি পাউডারের গুঁড়োর মতো আমাদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। কেমন এক অদ্ভুত ঠান্ডা আমেজ টের পাচ্ছিলাম। কোথায় যেন কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল।

বারান্দার রেলিঙের কাছে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে আকাশ দেখলাম। সেখানে বোধহয় জমাট কালো মেঘ, কারণ কিছুই দেখতে পেলাম না। তারই মাঝে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল।

কৃপানাথ আমাকে তাড়া দিলেন : কী হল! আসুন–দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দেরি! কিসের দেরি!

প্রশ্ন না করে তাড়াতাড়ি কৃপানাথকে অনুসরণ করলাম।

বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন কৃপানাথ। দরজার ভারী তালা ঝুলছে। পকেট থেকে চাবি বের করে

তালা খুললেন। তারপর দু-হাতে ঠেলে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিলেন।

অন্ধকার ঘরের মধ্যেই ফুলঝুরির মতো কয়েকটা রঙিন আলোর ফুলকি হঠাৎ যেন ঝলসে উঠেই নিভে গেল। কোথা থেকে এল এই রঙিন আলো? নাকি আমার দেখার ভুল?

ঘরে ঢুকেই কৃপানাথ আলো জ্বেলে দিলেন, ফ্যান অন করলেন। ওঁকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকেই কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। সামান্য ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি গন্ধ।

ঘরটার চেহারা বা চরিত্র কৃপানাথের ঘরের মতোই শুধু মাপে একটু ছোট। আর ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ কালো পরদা দিয়ে ঢাকা।

ঘরের জানলা মাত্র একটি। কৃপানাথ জানলার রঙিন শার্সির পাল্লা খুলে দিলেন। তারপর জানলার পাল্লাও খুলে দিলেন। বর্ষা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। সেই সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস।

ঘরের যে জিনিসটা প্রথমেই চোখ টানে সেটা একটা প্রকাণ্ড বাক্স। বাক্সটার মাপ অন্তত ছফুট বাই ছফুট বাই আট ফুট। অ্যালুমিনিয়াম অথবা স্টেইনলেস স্টিল, ওই জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি। বাবের আলো পড়ে বেশ চকচক করছে। লক্ষ করলাম, বাক্সের গায়ে তিন-চার জায়গায় বেশ কয়েকটা করে ফুটো রয়েছে।

অদ্ভুত বাক্সটা আমাকে বেশ অবাক করল।

বাক্স ছাড়া ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা শৌখিন ক্যাবিনেট। টেবিলে কয়েকটা লেখার প্যাড আর ডট পেন রয়েছে।

কৃপানাথ একটা চেয়ারের দিকে ইশারা করে আমাকে বসতে বললেন। তারপর ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে তার পাল্লা খুলে ফেললেন।

তখনই আমার চোখে পড়ল থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিল।

আন্দাজেই বুঝতে পারলাম, এক লক্ষ নয়, তার অন্তত চার-পাঁচ গুণ টাকা রয়েছে ক্যাবিনেটে।

কৃপানাথ শব্দ করে দু-হাতে তালি দিয়ে হাত ঝাড়লেন। তারপর আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে মুচকি হেসে বললেন, অচিনবাবু, এইবারে শুরু হোক মজার খেলা। বলুন দেখি, ওই বাক্সের ভিতরে কী আছে?

প্রশ্নটা করে কৃপানাথ মজুমদার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রত্যাশায় দু-চোখ জুলজুল করছে। ময়লা হয়ে যাওয়া বাবের আলো তেরছাভাবে পড়েছে ওঁর মুখে। তোবড়ানো গাল আর চামড়ার ভঁজে ছায়া পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। বাজ পড়ছে। মেঘ ডাকছে। তবু তারই ফাঁকে বাক্সের ভিতর থেকে ভেসে আসা একটা খচড়-খচড় শব্দ কানে এল।

কৃপানাথ আবার একই প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, যদি ঠিক ঠিক বলতে পারেন তা হলে ওই ক্যাবিনেট থেকে ক্যাশ এক লাখ টাকা আপনাকে দিয়ে দেব।

আর যদি না পারি? মিথ্যে বলব না, আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। কী আছে ওই বাক্সের ভিতরে? কী রহস্য লুকিয়ে আছে রঙিন আলোর ফুলকি আর ঝাঝালো মিষ্টি গন্ধের পেছনে?

কৃপানাথ আবার হাসলেন। দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ হল। বৃষ্টির একটানা ঝমঝম আর আলাদা করে কানে আসছে না।

একবারে ঠিক-ঠিক বলতে হবে তা তো বলিনি! কৃপানাথ বাক্সটার দিকে শান্ত উদাস চোখে তাকিয়ে বললেন, একবার না পারলে আবার চেষ্টা করবেন। তাতেও না পারলে আবার।

মনে একটু ভরসা পেলাম। যাক, তা হলে অনেকবার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠিক কবার? সেকথাই জিগ্যেস করলাম কৃপানাথকে।

তিনি হেসে বললেন, আপনিই বলুন, কতবার চান্স দেব আপনাকে।

বুকের ভিতরে কেমন গুড়গুড় শব্দ হল। কবার সুযোগ চাইব? একশো, দুশো, তিনশো, না কি পাঁচশো?

এক হাজার এক বার। সংখ্যাটা আচমকাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার। আর তখনই বাক্সটার ভিতর থেকে ঝটাপটির শব্দ পেলাম।

কৃপানাথ চট করে উঠে চলে গেলেন বাক্সের কাছে। বাক্সের গায়ে পরম মমতায় হাত বোলাতে বোলাতে চুকচুক শব্দ করলেন মুখ দিয়ে, তারপর আলতো করে শিস দিয়ে এক অদ্ভুত সুর ছড়িয়ে দিলেন বাতাসে।

বাক্সের ভিতরে সব শান্ত হয়ে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে কৃপানাথ মলিন হেসে বললেন, দেরি হচ্ছে তো, তাই বড় অধীর হয়ে উঠেছে। একটু থেমে আবার বললেন, আপনার কথাই সই। এক হাজার এক বার চান্স দেব আপনাকে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই পেরে যাবেন। নিন, শুরু করুন।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বাক্সটার কাছে এগিয়ে গেলাম।

লক্ষ করলাম, বাক্সটার একদিকে একটা ছোট্ট চৌখুপি জানলা রয়েছে। তবে জানলাটার পাল্লা ছোট্ট হাঁসকল দিয়ে আটকানো।

এটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না, বাক্সের ভিতরে কোনও প্রাণী রয়েছে। কৃপানাথের পোষা প্রাণী।

আমি বাক্সের গায়ের ফুটোগুলোয় চোখ রাখলাম। কিন্তু ভিতরে জমাট অন্ধকারে ঠিকমতো কিছু ঠাহর করতে পারলাম না।

তখন ঝুঁকে পড়ে বাক্সের ঠান্ডা ধাতব দেওয়ালে কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। একটা খড়খড় শব্দ, আর তার সঙ্গে জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলার ফেস-ফোঁস শব্দ–আর কিছু শোনা গেল না।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, শজারু?

কৃপানাথ হেসে মাথা নাড়লেন। বললেন, হল না। তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। ডট পেন তুলে নিয়ে একটা প্যাডের পাতায় খসখস করে কী লিখলেন। বললেন, আপনি কতবার চেষ্টা করলেন প্যাডের পাতায় তার হিসেব রাখছি। নিন, বলুন, আর হাজারটা চান্স রয়েছে। আপনার–।

ইঁদুর?

নাঃ, হল না। প্যাডের ওপরে পেন সক্রিয় হল আবার।

কুকুর? বেড়াল?

না

খরগোশ? বেজি?

হল না। কৃপানাথ শান্তভাবে আমার অনুমান খারিজ করে দিলেন।

শুয়োর? হায়না? না কি নেকড়ে?

উঁহু, কোনওটাই না।

বানর? হনুমান?

উঁহু–আর নশো নব্বইটা চান্স আছে আপনার। কৃপানাথ ঠান্ডা গলায় বললেন। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বাক্সের একটা ফুটোর কাছে মুখ এনে সুর করে শিস দিলেন। বাক্সের ভিতর থেকে যা সামান্য কিছু অস্থির শব্দ আসছিল সব পলকে শান্ত হয়ে গেল।

আর নশো নব্বইটা চান্স বাকি! টাকার বান্ডিলগুলোর দিকে চোখ গেল আমার। আবার কান পাতলাম বাক্সের গায়ে। কোন হতচ্ছাড়া প্রাণী লুকিয়ে আছে এই বাক্সের ভিতরে? এর মধ্যেই এগারোবার আমার ভুল হয়েছে। যদি বাকি নশো নব্বইবারও ভুল হয়? তা হলে কী হবে! কৃপানাথ আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। না কি এবারও সেই আগের তিনবারের মতো একমুখো বাজি?

আমার দ্বিধাগ্রস্ত মুখ দেখে কৃপানাথ হাত উলটে জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার? কী ভাবছেন?

একটু দোনামনা করে আমি বলেই ফেললাম, যদি বাকি নশো নব্বইবারও আমার ভুল হয়, তা হলে কী হবে?

কৃপানাথ কিছুক্ষণ ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এক পা এগিয়ে এলেন আমার কাছে। বাতিটা পেছনদিকে থাকায় ওঁর মুখটা অন্ধকার দেখাল। থেমে

থেমে তিনি বললেন, ভয় নেই, এক লাখ টাকা চাইব না। তবে খুব সাধারণ একটা জিনিস চাইব। খুব সাধারণ–একেবারে মামুলি।

কী সাধারণ জিনিস? যদি সেটা না থাকে আমার কাছে!

আমি একটু হোঁচট খেয়ে বললাম, না, মানে…যদি সেটা আমি দিতে না পারি…।

কৃপানাথ হাসলেন। বললেন, পারবেন না মানে! একেবারে মামুলি জিনিস..আপনার সঙ্গেই আছে..।

আমার সঙ্গেই আছে! সঙ্গের জিনিস বলতে তো জামা-প্যান্ট, চশমা, কিছু খুচরো টাকা পয়সা, কৃপানাথের দেওয়া দুটো একশো টাকার নোট, একটা ছোট ডায়েরি, রুমাল, আর অফিসের আলমারির চাবি। এর মধ্যে কোন জিনিসটা কৃপানাথ মজুমদারের দরকার?

কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। ঝোড়ো বাতাসে বৃষ্টির ছাট তীব্র হয়ে উঠল। বাক্সের ভিতরের নাম-না-জানা প্রাণীটা আচমকা দাপাদাপি শুরু করে দিল।

কৃপানাথ চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে জামার খুঁট দিয়ে কাচ মুছলেন। তারপর সেটা আবার যত্ন করে নাকের ওপরে বসিয়ে আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধটা আবার হালকাভাবে ভেসে আসতে লাগল বাক্সের দিক থেকে।

কৃপানাথ বললেন, অচিনবাবু, আপনাকে প্রাণীটা সম্পর্কে কয়েকটা হিন্টস দিতে পারি– তবে নাম বলতে পারব না। আপনি আপনার খুশি মতো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি যদূর সম্ভব উত্তর দেব।

আমি বাক্সটাকে একবার দেখলাম, তারপর বাক্সের মালিককে, আর সবার শেষে তাকালাম খোলা ক্যাবিনেটের দিকে। টাকার আকর্ষণী ক্ষমতা চুম্বকের চেয়েও বেশি। হাতে এখনও নশো নব্বইবার চান্স রয়েছে। নিশ্চয়ই তার মধ্যে পেরে যাব।

সুতরাং কিছু হিন্টস চেয়েই দেখা যাক।

প্রাণীটা কি স্থলচর?

আমি অন্তত সেরকমই জানি। কৃপানাথ মজুমদার হেঁয়ালিভরা সুরে উত্তর দিলেন।

ওটার কটা পা?

আমার হিসেবমতো চারটে।

লেজ আছে?

একটু সময় নিয়ে তারপরঃ আছে।

কটা চোখ?

বোধহয় দুটো।

নিজের পোষা প্রাণী নিয়ে কৃপানাথ কি আমার সঙ্গে মজা করছেন? আমি একটু রুক্ষভাবেই জিগ্যেস করলাম, বোধহয় দুটো মানে?

কৃপানাথ হেসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, রেগে যাচ্ছেন কেন, ভাই। এই ধরুন মাছির চোখ। এমনিতে দেখলে মনে হয় দুটো, অথচ আসলে অনেক– মানে পুঞ্জাক্ষি আর কি! এই প্রাণীটারও হয়তো সেরকম হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল। চারটে পা, একটা লেজ, স্থলচর প্রাণী– অথচ পুঞ্জাক্ষি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!

কৃপানাথ এবার ছোট ছোট পা ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। শান্ত চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন।

আমি জিগ্যেস করলাম, টিকটিকি?

কৃপানাথ বললেন, না।

গোসাপ?

না। কোমোডো দ্বীপের ড্রাগন? আর্মাডিলো?

উঁহু।

আমি একের পর এক প্রাণীর নাম বলে যেতে লাগলাম। আর কৃপানাথ শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রত্যেকবারই জানিয়ে দিতে লাগলেন, হয়নি। একইসঙ্গে তিনি প্যাডের কাগজে পেন দিয়ে লিখে হিসেব রাখছিলেন। আমার শিশুপালের কথা মনে পড়ছিল। এক হাজার এক কখন শেষ হবে?

ক্রমেই আমার ধৈর্য কমছিল, আর কৌতূহল বাড়ছিল। আমি একের পর এক প্রাণীর নাম বলতে-বলতে কান্ত হয়ে পড়লাম। অবাক হয়ে শুনলাম, আমি বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, উট, জিরাফ, এমনকী জেব্রার নামও বাদ দিলাম না। তারপর একসময় সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপের নামও বলেছি, কিন্তু যথারীতি ঠিক হয়নি। ক্লান্ত হয়ে ভুল করে তিমি আর হাঙরের নামও উচ্চারণ করে ফেলেছি। মরিয়া হয়ে ড্রাগন আর খোকা ডাইনোসরের কথাও বলেছি। তখন কৃপানাথ হেসে বললেন, আপনার মাথা আর কাজ করছে না, অচিনবাবু। একটু ভেবেচিন্তে বলুন। এখনও আপনার সাতশো বত্রিশটা চান্স রয়েছে।

এখনও সাতশো বত্রিশ!

আমার মুখে ফেনা কাটছিল। জিভে টক স্বাদ। জানলা খোলা থাকা সত্ত্বেও কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একসময় আর না পেরে বলে উঠলাম, আমি আর পারছি না, কৃপানাথবাবু। আর কোনও প্রাণীর নাম ভাবতে পারছি না।

কৃপানাথ প্যাড-পেন একপাশে সরিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন, আড়াইশো নাম হতে না হতেই সব হাঁফিয়ে পড়ে। একজন মাত্র সাড়ে চারশোর মতো নাম পর্যন্ত বলতে পেরেছিল।

কৃপানাথ আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, তা হলে এই খেলাটায় আপনি হেরে গেলেন, অচিনবাবু?

আমি ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লাম ও নাঃ, পারলাম না। এক লাখ টাকা আমার আর জেতা হল না।

কৃপানাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ওঁর চোখেমুখে উল্লাস এখন আর লুকোনো নেই। বললেন, আপনি এবার প্রাণীটাকে দেখতে পারেন। তা হলেই বুঝতে পারবেন, কেন ওটার নাম আপনি বলতে পারেননি–কোনওদিনও পারতেন না। আসলে আমিও ওটার নাম জানি না। কী নামে ডাকি বলুন তো ওকে! কিম্ভুত?

আমি কোনও জবাব দিলাম না। আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, আজ বিকেলে এই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভালো হত। বিনা পরিশ্রমে পাওয়া দুশো টাকার তৃপ্তি কখন যেন উবে গেছে মন থেকে। ঘড়িতে প্রায় নটা বাজে। অথচ তখনও বাইরের কালো আকাশে শুধু বিপর্যয়ের ছবি।

আসুন, ওটাকে দেখবেন আসুন। কৃপানাথ আমাকে বাক্সের কাছে ডাকলেন, ওই ফুটোগুলোয় চোখ রাখুন, আমি ভিতরের একটা আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

আমি চোখ রাখলাম।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত অন্ধকার। তবে তারই মধ্যে ছিটকে বেরোল কয়েকটা রঙিন আলোর ফুলকি। আর পরক্ষণেই জোরালো আলোর ভেসে গেল বাক্সের ভিতরটা। এবং অদ্ভুত প্রাণীটাকে আমি দেখতে পেলাম।

কৃপানাথ মজুমদার মিথ্যে বলেননি। এরকম বিচিত্র গা শিরশির করা প্রাণীর নাম পৃথিবীর প্রাণিজগতের তালিকায় যে নেই, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

বুলডগের মতো থ্যাবড়া মুখ। চ্যাপটা মাথার ওপরদিকে দুটো টকটকে লাল চোখ। মুখের সামনের দিকে কয়েকটা ছুঁচোলো দাঁত বিশ্রীভাবে বেরিয়ে আছে। উজ্জ্বল গোলাপি রঙের পুরু ঠোঁট। ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে মোটা পাইপের মতো একটা কালো জিভ বারবার বেরিয়ে আসছে বাইরে। লম্বায় জিভটা প্রায় হাত দুয়েক হবে। জিভটা সাপের মতো এপাশ-ওপাশ নড়ছে–যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রাণীটার সারা শরীর যেন এবড়োখেবড়োভাবে সিমেন্ট জমিয়ে তৈরি। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। রং ধূসর, তার মাঝে কালো ছোপ-ছোপ। এ ছাড়া আঁশের মতো চাকা-চাকা কোনও জিনিস দিয়ে সারা শরীরটা ঢাকা।

কৃপানাথ ঠিকই বলেছিলেন, প্রাণীটার চারটে পা, আর একটা লেজ আছে।

তবে ঠিক বলতে শুধু ওইটুকুই। কারণ চারটে পা চার রকম মাপের এবং শরীরের বেখাপ্পা চারটে জায়গা থেকে বেরিয়ে আছে সাধারণ প্রাণীর মতো কোনও সামঞ্জস্য সেখানে নেই। তবে প্রত্যেকটা পায়েই দশ-বারোটা করে আঙুল, আর আঙুলের ডগা থেকে ছুঁচের মতো সরু-সরু নখ বেরিয়ে রয়েছে।

প্রাণীটার লেজটাও ভারি অদ্ভুত। আঁশ দিয়ে ঢাকা একটা মাংসপিণ্ড ওটার শরীরের পেছনদিকে ঝুলছে। পিটার চেহারা অনেকটা পানের মতো। আর তার রং লাল-সবুজ ডোরাকাটা।

সব মিলিয়ে প্রাণীটার দৈর্ঘ্য তিন-সাড়ে তিন ফুট হবে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওটা চলে বেড়াচ্ছে বাক্সের ভিতরে–মেঝে, দেওয়াল, সিলিং–সব জায়গায়। ক্ষিপ্রভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যাচ্ছে বুলেটের গতিতে। তারপর থামছে। ওটার চোখ নড়ছে, জিভ নড়ছে। আর সারা শরীরে লেগে রয়েছে হলদেটে সবুজ শ্যাওলার মতন লালা। ওটার মুখ থেকেই ওই আঠালো তরল বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাক্সের নানা জায়গায়।

হঠাৎই ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধটা পেলাম। তবে সেটা লালার গন্ধ, না ওটার শরীরের গন্ধ, তা বুঝতে পারলাম না।

আমার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরের বাতিটা অফ করে দিয়ে কৃপানাথ আমাকে জিগ্যেস করলেন, ভয় পেলেন, অচিনবাবু?

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, বমি পাচ্ছিল। তবু তারই মধ্যে লক্ষ করলাম, অন্ধকার বাক্সের ভিতরে কয়েকটা রঙিন আলোর ফুলকি ঠিকরে বেরোচ্ছে। কৃপানাথের সঙ্গে এ-ঘরে ঢোকার সময় অন্ধকারে এই রঙিন আলোর ঝিলিকই আমি দেখতে পেয়েছিলাম। প্রাণীটার দেখছি গুণের শেষ নেই!

আমার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে কৃপানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, ওকে দেখে সবাই ভয় পায়। অথচ ও যে কী ভালো আপনাকে কী বলব! সেই জন্ম থেকেই তো ওকে দেখছি। আমিই ওর মা, আমিই ওর বাপ। আসুন, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই। বাক্সের ফুটো দিয়ে আবার দেখুন।

আমি বোধহয় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। নইলে কৃপানাথের সব কথা সুবোধ ছাত্রের মতো শুনবই বা কেন!

ওঁর কথায় বাক্সের গর্তে আবার চোখ রাখলাম।

কৃপানাথ টিউব লাইটের মতো একটা আলো জ্বেলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিচিত্র ব্যাপার আমার চোখে পড়ল।

প্রাণীটার সারা শরীর নানান রঙে রঙিন হয়ে গেছে। জিভটা নীলচে বেগুনি, আর মাথা বুক সব গনগনে লাল–তার মধ্যে হলদে রঙের ছিটে। ওর শ্যাওলার মতো হলদেটে সবুজ লালার রং এখন উজ্জ্বল নীল।

কৃপানাথ বাক্সের অন্য দেওয়ালের গর্ত দিয়ে প্রাণীটাকে দেখছিলেন। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, যে-আলোটা জ্বেলেছি সেটা আলট্রাভায়োলেট আলো। দেখেছেন, ওর গায়ের রং কেমন পালটে গেছে! খিদেয় পাগল হয়ে গেলে এই আলোর ওর চেহারাটা এরকম গনগনে লাল দেখায়।

বাক্সের ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে কৃপানাথ মজুমদার আলো নিভিয়ে আমার কাছে এলেন। নীচু গলায় বললেন, অচিনবাবু, আপনাকে আমার বউয়ের কথা বলেছিলাম–বিয়ের দু-বছর পর মারা গেছে। ওর ছবি দেখবেন?

আমি ফ্যালফ্যাল করে কৃপানাথের দিকে তাকালাম। শেষ বাজিটায় হেরে গিয়ে আমি বোধহয় একটা মানসিক ধাক্কা খেয়েছি। অনুরাধা-বাবু-টুটু এখন যেন কত দূরের মানুষ। শুধু এই ঘোরতর বৃষ্টি, বাজ পড়ার শব্দ, সাবেক আমলের বাড়ি, কৃপানাথ মজুমদার, এই রহস্যময় বাক্স এবং তার বাসিন্দা ওই ভয়ংকর প্রাণী–শুধু এইসবই সত্যি।

কোথায় আপনার স্ত্রী-র ছবি, দেখি?

কৃপনাথ সতেজ পায়ে বাক্সের পেছনদিকের দেওয়ালের কাছে চলে গেলেন। দেওয়ালটার খানিকটা জুড়ে যে-কালো পরদা ছিল সেটা টেনে সরাতেই ধুলো উড়ল, মাকড়সার জাল-ঝুল-কালি চোখে পড়ল। আরও চোখে পড়ল মলিন দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি। এক মহিলার ছবি। সম্ভবত তেলরঙে আঁকা।

কিন্তু এ কেমনধারা ছবি!

লাল টকটকে বেনারসি কাপড়ে মহিলার কপাল আর চোখের বেশ খানিকটা ঢাকা। থ্যাবড়া মুখ। লালচে চোখের তারা। পুরু গোলাপি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা ছুঁচোলো দাঁত বেরিয়ে রয়েছে।

বিশ্রী শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। মনে হল যেন বুকের ভিতরে। বৃষ্টি ভেজা বাতাবরণে শনশন শব্দে বাতাস ছুটল। বড় একটা গাছের ডাল মিটাস করে ভেঙে পড়ল কাছাকাছি।

ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন কৃপানাথ, আমার ওয়াইফ সহধর্মিণী! বিয়ের দু-বছরের মাথায় বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে। তবে বাচ্চাটা বেঁচে গিয়েছিল।

ছেলে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে।

কৃপানাথ তেতো হাসলেন। ওঁর শান্ত চোখ এখন উন্মাদ, উদ্ভ্রান্ত। দু-পাশে ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে ভয়ংকর সুরে বললেন, হুঁ! ছেলেও নয়, মেয়েও নয়–বাচ্চা। তবে কীসের বাচ্চা কে জানে! সেটাকেই আমি মায়ের মমতায় আর বাপের স্নেহে আটাশ বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছি–ওই বাক্সের ভিতরে–ওই ইবলিশের বাচ্চাটাকে।

আমার বুকের ভিতরে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। এতক্ষণ ধরে ভিজে কাপড়ে থাকার জন্যেই বোধহয় শীত-শীত করতে লাগল আবার। কৃপানাথ মজুমদারের কালো ছায়ার খানিকটা বাক্সের গায়ে, খানিকটা দেওয়ালে কালো পরদার পাশে। পরদাটা জোলো বাতাসে অল্প-অল্প কাঁপছে। নাকে মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ বেশ টের পাচ্ছি। আমার কেমন ঘুম পেতে লাগল।

কৃপানাথ ভাঙা গলায় বিকৃত স্বরে বলতে লাগলেন, ওই তো আমার বউ–আর এই তো আমি! বুকে হাত চাপড়ালেন তিনি? অথচ এই কিস্তৃত বাচ্চাটা যে কেমন করে জন্মাল ঈশ্বর জানেন! ওটার জন্মের সময় দুজন নার্স অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আর একজন ডাক্তার মারা যায়– কে যেন তার শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে বের করে নিয়েছিল। হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠলেন কৃপানাথ। জড়ানো গলায় বললেন, পরে বুঝতে পেরেছি, কে ওই কাজ করেছে।

ছবির দিকে আঙুল তুলে অভিযোগের সুরে চেঁচাতে লাগলেন কৃপানাথ, তোমার বাচ্চা, সুরমা, তোমার বাচ্চা! এই আটাশটা বছর ধরে প্রতি মাসে একবার করে ওর খাবার জোগাড় করতে করতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। মাসে একবার করে অচিনবাবুর মতো সোজাসাপটা ভালোমানুষ কোনও লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে, কৌতূহল চাগিয়ে, আমাকে খুঁসলে নিয়ে আসতে হয় এই বাক্সের কাছে। তারপর সেই একই খেলা–মজার খেলা। বলুন, বাক্সের ভিতরে কী আছে! ওঁদের লোভ আর কৌতূহলই আমার ভরসা।

আচমকা হাসতে শুরু করলেন কৃপানাথ মজুমদার। কিন্তু এক অদ্ভুত হাহাকার লুকিয়ে ছিল সেই হাসিতে। এক ক্লান্ত পিতার সন্তান লালনপালনের কষ্ট আর একইসঙ্গে মমতার টান কী বিচিত্র টানাপোড়েনের মধ্যেই না ফেলেছে মানুষটাকে!

এক রিনরিনে হাসির আওয়াজ শুনলাম মনে হল। না কি বৃষ্টির শব্দে ভুল শুনেছি? সুরমার ছবিতে বেনারসি শাড়ির ঘোমটা সামান্য নড়ে গেল। না কি আমার দেখার ভুল? গোলাপি রঙের লিপস্টিকে রাঙানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লাল টুকটুকে জিভের ডগা সামান্য উঁকি মারল, আরও কটা দাঁত দেখা গেল।

আমার বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এক ঝটকায় ছবির ওপরে পরদা টেনে দিলেন কৃপানাথ। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে এগিয়ে এলেন আমার কাছে। খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন। ওঁর গায়ের জোর অনুভব করে তাজ্জব হয়ে গেলাম। কে বলবে কৃপানাথ বৃদ্ধ!

আসুন, অচিনবাবু–আপনি হেরে গেছেন। সুতরাং আপনার কাছ থেকে একটা মামুলি জিনিস চাইছি–আপনার সঙ্গেই সেটা আছে অনেক আছে।

আমি কোনও বাধা দিতে পারলাম না। মনে হল, বাড়তি কোনও শক্তি কৃপানাথ মজুমদারকে সাহায্য করছে। কারণ, অতি অনায়াসে বৃদ্ধ আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন বাক্সের কাছে। বাক্সের ভিতর থেকে তখন উত্তাল ঝটাপটির শব্দ ভেসে আসছে।

বাক্সের চৌখুপি জানলার কাছে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন কৃপানাথ। বললেন, শুধু-শুধু বাধা দেবেন না, অচিনবাবু। কারণ শঙ্করকে ডাকলে সে তো

আসবেই–তা ছাড়া বাক্সের পেছনের দরজাটা যদি খুলে দিই তা হলে যার খিদে পেয়েছে সে নিজেই আপনাকে।

মাঝপাথে কথা থামিয়ে বিচিত্র সুরে শিস দিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, আঃ, এবার একটু শান্ত হ দিকি। তারপর আমার দিকে ফিরে : খাবার জোগাড় করতে দেরি হলেই ও এমন অধৈর্য হয়ে পড়ে। খানিকটা মায়ের ধাত পেয়েছে।

হাঁসকল সরিয়ে জানলার পাল্লা খুলে দিলেন কৃপানাথ। আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন চৌখুপির ভিতরে। শেষ মুহূর্তে বোধহয় আমার ঘোর কেটে গিয়েছিল, কারণ আমি হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু ওই পর্যন্তই!

বাক্সের ভিতরে এক ভয়ংকর জাঁতিকল চোখের পলকে এঁটে বসল আমার কবজিতে। যন্ত্রণায় আমার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। চিৎকার করতে গিয়েও পারলাম না। যেন টুটি টিপে ধরেছে। কেউ। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। প্রবল বৃষ্টির ছাট জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে আমার চোখমুখ ভিজিয়ে দিল। হঠাৎই বিকট শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। আর আমার আমার প্যান্ট ভিজে গেল।

স্পষ্ট বুঝলাম, অনুরাধা-বুবু-টুটুর কাছে আর কোনওদিনও আমি ফিরতে পারব না।

ঝাপসা চোখে দেখলাম, কৃপানাথ চেয়ারে গিয়ে বসেছেন। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বলছেন, খা, খা, সব্রাহ্মণের রক্ত খা–। তোর সময়মতো খাবার জোগাড় করতে না পারলে আমি কি তোকে কম রক্ত দিয়েছি! ক্ষতচিহ্ন ভরা নিজের বাঁ-হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে চললেন কৃপানাথ, শুধু বাপ বলে প্রাণে রেহাই পেয়েছি। কী করে যে তুই আমাকে চিনিস কে জানে! যাক, আবার একটা মাস বিশ্রাম…।

একটু পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন কৃপানাথ। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়িয়ে শঙ্করকে ডেকে বললেন, শঙ্কর, পিছনের বাগানে এবার একটু জায়গা তৈরি কর। আর বড় বস্তাটা এ-ঘরে দিয়ে যা।

একটা চিনচিনে ব্যথা আমার ডান হাতে শুরু হয়েছিল। সেটা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে আমার মাথার ভিতরে। ঝাঝালো মিষ্টি গন্ধটা এখন এত বেড়ে গেছে যে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দুকানে ভোঁ-ভোঁ শব্দ। আর বুকের ভিতরে টিপটিপ। আটাশ বছর আগে মারা যাওয়া সেই ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ল আমার। কৃপানাথের সাজিয়ে দেওয়া কৌতূহল আর লোভের ফাঁদে পা দিয়ে এ কোন পিশাচের হাতে নিজেকে তুলে দিলাম। আমার চোখ ফেটে হু-হু করে জল বেরিয়ে এল। অনুরাধা-বুবু–টুটু, তোদের ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। আর যে সময় নেই!

চেতনা হারানোর মুহূর্তে আমি ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলাম।

# টিরা গ্রহের ভয়ংকর (নভেলেট)

**টিরা গ্রহের ভয়ংকর (নভেলেট)**

**০১. প্রথম দুর্ঘটনা**

অন্ধকার মহাকাশে মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। যেন দেওয়ালির উৎসব শুরু হয়েছে চারিদিকে। মহাকাশযান সোলার ছুটে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। লক্ষ্য পৃথিবীর কক্ষপথ। সুদীর্ঘ অভিযান শেষ করে সোলার ঘরে ফিরে চলেছে।

অশোক চিরিমার নেভিগেশান প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। মুখ-চোখ ফ্যাকাশে। মহাকাশ-মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে ও। হঠাৎই ওর গোটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শরীরে কেমন একটা অস্বস্তি। বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছে।

ঠিক তখনই লম্বা-চওড়া চেহারার আর-একজন মানুষ নেভিগেশান রুমের খাটো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। অশোক চিরিমারের পিঠে আলতো থাপ্পড় মেরে হেসে বলল, যাক, শেষ পর্যন্ত তা হলে বাড়ি ফেরা হচ্ছে। ওই কাঠখোট্টা রুক্ষ গ্রহে দু-মাস কাটিয়ে আমার মেজাজটাই কাঠখোট্টা হয়ে যাচ্ছিল।

কথা বলতে-বলতে নেভিগেশান প্যানেলের টিভি-পরদায় চোখ রাখল ধনপত রাই। পরদায় একটা উজ্জ্বল লাল ফুটকি। পৃথিবী! সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে পুরু প্লাস্টিকের স্বচ্ছ আবরণ দেওয়া জানলার দিকে তাকাল ধনপত রাই। অন্ধকার মহাকাশে অসংখ্য তারার ফুটকি জ্বলছে।

ঘরে ফেরার এত আনন্দ জানতাম না। ধনপত রাই বলল। তারপর অশোকেন্দুর পাশে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল, চিরিমার, তোমার আনন্দ হচ্ছে

না?

অশোক ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ধনপতের দিকে দেখল ও আনন্দ হচ্ছে–তবে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে।

সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঝটকা মেরে উঠল অশোকেন্দুর শরীর। চোখ বিস্ফারিত। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। ও ঝুঁকে পড়ল নেভিগেশান প্যানেলের ওপরে।

ধনপত রাই ওকে চেপে ধরল দু-হাতে। উত্তেজিত স্বরে বলল, চিরিমার, কী হয়েছে! শরীর কেমন লাগছে?

অতিকষ্টে ফিশফিশ করে জবাব দিল অশোক, রাই, শিগগির ডক্টর শ্রীবাস্তবকে খবর দাও। আমার বুকের ভেতরে খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শিগগির–।

আবার ঝাঁকুনি খেল অশোকেন্দুর দেহ। প্যানেলের ওপরে ওর হাতের বাঁধন শিথিল হল। অশোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল নেভিগেশান রুমের মেঝেতে।

ধনপত রাই তৎপর ভঙ্গিতে ওকে ধরতে চেষ্টা করল। চিত করে শুইয়ে দিল। জরুরি স্বরে বলল, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, চিরিমার, এক্ষুনি ডক্টর শ্রীবাস্তবকে খবর দিচ্ছি।

কিন্তু ততক্ষণে অশোক চিরিমারের দেহ যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। কাশির দমকে মুখ লাল, দম আটকে চোখজোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখের রং নীল। তীব্র আক্ষেপে শরীরটা ঝাঁকুনি খেতে খেতে হঠাৎই স্থির হয়ে গেল। সব শেষ।

ধনপত রাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল নেভিগেশান প্যানেলের শেষ প্রান্তে। এক ঝটকায় তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। দ্রুত হাতে ডায়াল ঘুরিয়ে ব্যস্ত গলায় বলে উঠল, সেন্ট্রাল কন্ট্রোল? নেভিগেশান রুম থেকে বলছি! শিগগিরই ডক্টর শ্রীবাস্তবকে এখানে পাঠিয়ে দিন। মনে হচ্ছে…।

কী মনে হচ্ছে? ও-প্রান্ত থেকে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ভেসে এল।

মনে হচ্ছে… মেঝেতে পড়ে থাকা নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে ভয়ার্তভাবে একবার দেখল ধনপত রাই। তারপর বলল, মনে হচ্ছে নেভিগেশান রুম

সুপারভাইজার অশোক চিরিমার এইমাত্র মারা গেছে।

.

## ০২. সন্দেহের সূত্রপাত

নিউম্যাটিক রিল্যাক্সার-এ আধশোয়া ভঙ্গিতে বসেছিলেন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব। পলিথিনের ব্যাগে বাতাস ঠেসে তৈরি বিচিত্র এই নিউম্যাটিক রিল্যাক্সার–আধুনিক আরামকেদারা। হেলান দিয়ে বসলেই চোখে ঘুমের আমেজ জড়িয়ে আসে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ডক্টর শ্রীবাস্তবের চোখে ঘুমের আমেজ নেই, বরং দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে আছে। সামনে পা ছড়িয়ে থমথমে মুখে তিনি তাকিয়ে আছেন অবজারভেশান পোর্টের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে বাইরের অন্ধকারের দিকে। অভিব্যক্তিহীন শূন্য দৃষ্টি। মাথার চুল এলোমেলো। ডান হাতের সরু-সরু আঙুলের ফাঁকে ধরা একগোছা কাগজ। সোলার মহাকাশযানে উপস্থিত একাশি জন অভিযাত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট। একটু আগেই কম্পিউটার রুম থেকে রিপোর্টগুলো তাঁর হাতে এসেছে। রিপোর্টগুলো দেখার পরই ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, একা লাগছে, আর ভয় করছে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার অগোছালো চুলে হাত চালিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর দশাসই লম্বা কাঠামো সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। শক্ত চোয়ালের ওপর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সরু গোঁফ। মাথার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে কপাল অনেকটা বড়। কপালে একটা নীল শিরা দপদপ করছে। দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ইশারা।

ডক্টর শ্রীবাস্তব ধীরে ধীরে কথা বলেন, মার্জিত তার আচরণ, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেন, সবসময় সকলের শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজখবর করেন, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ না হলেও তিনি পরিশ্রমী, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন। হয়তো এই কারণেই টিরা গ্রহের দীর্ঘ অভিযানে বিশজন চিকিৎসকের মধ্যে থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অতিরিক্ত দায়িত্বজ্ঞানের জন্য সঙ্গী অভিযাত্রীরা তাকে ঠাট্টাও করে। বলে, ডক্টর, আপনি বড় বেশি ডাক্তারি করেন।

ডক্টর শ্রীবাস্তব হেসে উড়িয়ে দেন সেকথা। তিনি জানেন, এইসব গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাবধান হওয়াটা কত জরুরি। আর সাবধান ছিলেন বলেই না মেডিক্যাল রিপোর্টের মারাত্মক গরমিলটা তার নজরে পড়েছে। এর আগে তিন-

তিনটে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে মেডিক্যাল চেকআপে ঢিলেমির জন্যে পৃথিবীতে ফিরে আসা মহাকাশযানে গ্রহান্তরের মারাত্মক জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

টিরা গ্রহের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ বললে অনেক কমই বলা হয়। সৌরজগৎ থেকে ৮.২৬ আলোকবর্ষ দূরের তারা ম্যাক্সিমা সেন্টরি। আধুনিকতম মহাকাশযান সোলার হাইপারস্পেসের মধ্যে দিয়ে স্পেস জাম্প করে অনেক কম সময়ে অতিক্রম করেছে ৮.২৬ আলোকবর্ষের সুবিশাল দূরত্ব। পৃথিবীর অভিযাত্রী দল সেখানে পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দুমাস সময় কাটিয়েছে। তন্নতন্ন করে অভিযান চালিয়েছে টিরা গ্রহের রুক্ষ জমিতে। কিন্তু সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছে। টিরা সম্পর্কে মানুষের এত আশা ছিল, এত উত্তেজনা ছিল, অথচ শেষপর্যন্ত নিট ফল হল শূন্য। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত শুধুই হতাশা। এই অভিযানের ফলাফলে কোনও কৃতিত্ব নেই, কোনও যশ নেই, কোনও আবিষ্কার নেই, কিচ্ছু নেই।

অন্তত একঘণ্টা পর্যন্ত ফলাফল সেইরকমই ছিল। কারণ তখনও মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো মোহন শ্রীবাস্তবের হাতে আসেনি, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। কিন্তু রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে স্টাডি করার পর অবয়বহীন বিকৃত এক আতঙ্ক জমাট বেঁধেছে ডক্টর শ্রীবাস্তবের মনে।

পায়চারি থামিয়ে বাইরে করিডরে এলেন। আঁধারি করিডরের শেষে ক্যাপ্টেন মিত্রের কেবিন। কেবিনের খাটো দরজার ওপরেই একটা ছোট্ট আলো জ্বলছে। ক্যাপ্টেন মিত্র ঘরেই আছেন তা হলে! দৃঢ় পায়ে সেদিকে এগোলেন ডক্টর। কলিংবেলে চাপ দিলেন। ক্যাপ্টেন কি বিশ্বাস করবেন তার কথা? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আর কোনও পথ খোলা নেই মোহন শ্রীবাস্তবের সামনে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন নীতীশ মিত্র ঘুরে তাকালেন। হেসে বললেন, আসুন ডক্টর, কী খবর বলুন।

মোহন শ্রীবাস্তব ক্যাপ্টেনের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনের পাশে একটা রিল্যাক্সার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, খবর খারাপ, ক্যাপ্টেন। একটা বিপদের আঁচ পেয়েছি আমি।

বিপদ! কীসের বিপদ? হালকা মেজাজে হাসলেন নীতীশ মিত্র, এই নিষ্ফলা অভিযানে বিপদটা আসবে কোত্থেকে?

তা জানি না, তবে এসেছে। গম্ভীরভাবে বললেন শ্রীবাস্তব, আমাদের মহাকাশযানে একজন বিচিত্র মানুষ রয়েছে, ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন মিত্রের হালকা হাসি মিলিয়ে গেল : বিচিত্র মানুষ!

বিচিত্র শুধু নয়, অবিশ্বাস্য। মানুষটা দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, সুস্থ, জোয়ান– অথচ তার মরে যাওয়ার কথা।

মরে যাওয়ার কথা! অবাক বিস্ময়ে ডক্টর শ্রীবাস্তবকে দেখলেন ক্যাপ্টেন, আপনি একজন ডাক্তার হয়ে এসব কী বলছেন!

মেডিক্যাল রিপোর্টের কম্পিউটার আউটপুটগুলো ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিলেন মোহন শ্রীবাস্তব ও এই মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো একবার দেখুন। আপনি তো জানেন, টিরা থেকে রওনা হওয়ার পরদিনই আমি প্রত্যেকের থরো মেডিক্যাল চেকআপের নির্দেশ দিয়েছিলাম। তাতে সোলার এর একাশি জন যাত্রীর প্রত্যেককে মেডিক্যাল বোর্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছে–আপনি আমি কেউই বাদ যাইনি। কোনও অভিযান থেকে ফেরার পর এটাই সাধারণ নিয়ম- অভিযাত্রী দলের কেউ যে কোনও জীবাণু বা অন্য কিছু থেকে ইনফেক্টেড হয়নি সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যেই এত নিয়ম-কানুন। একটু থেমে ডক্টর শ্রীবাস্তব যোগ করলেন, মেডিক্যাল চেকআপের যে-রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা ভারী অদ্ভুত।

ক্যাপ্টেন মিত্র একটা সিগারেট ধরালেন। তার মুখে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল।

ডক্টর বলে চললেন, একাশি জনের মধ্যে আশি জনের কোনও গোলমাল নেই। তারা সসম্মানে পাস করেছে পরীক্ষায়। কিন্তু একজন– কথা থামিয়ে সেই বিশেষ রিপোর্টটি বের করলেন তিনি এ-মানুষটির সবকিছুই স্বাভাবিক ব্লাড কাউন্ট, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, অ্যালবুমিন– গ্লোবিউলিন রেশন, সবকিছু। কিন্তু ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে আমরা হোঁচট খেলাম– সামনে পা ছড়িয়ে দিলেন ডক্টর। মেঝের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে নীতীশ মিত্রের চোখে সরাসরি চোখ রেখে বললেন, এই লোকটার বডিতে ব্লাড সুগারের কোনও নামগন্ধ নেই! ব্লাড সুগার জিরো।

ক্যাপ্টেন মিত্রের মুখ কঠিন হল, চোখ বিস্ফারিত অবিশ্বাসে? কী বলছেন, ডক্টর! আমি ডাক্তার নই, তবে আমিও জানি যে ব্লাড সুগার ছাড়া কোনও মানুষ।

বাঁচতে পারে না। ক্যাপ্টেনের কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করলেন শ্রীবাস্তব। তারপর মাথা নাড়লেন সম্মতি জানিয়ে : ঠিকই বলেছেন আপনি। তবে এখানেই শেষ নয়–আরও আছে। ব্লাড সুগারের কোনও হদিস না পেয়ে আমরা ব্লাড ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে দেখলাম। ক্রিয়েটিনিন তৈরি হয় শরীরের প্রোটিন ভেঙে। কিডনি এটাকে চটপট ছেকে বের করে দেয় রক্ত থেকে, আর ক্রিয়েটিনিন শরীর থেকে বেরিয়ে আসে ইউরিনের সঙ্গে। ক্রিয়েটিনিন ছেকে রক্ত থেকে বের করে না দিতে পারলে বিপদ নেমে আসে খুব তাড়াতাড়ি। একশো সিসি রক্তে সাধারণত ক্রিয়েটিনিন থাকে এক থেকে চার মিলিগ্রাম। এর পরিমাণ দশ মিলিগ্রামের ওপরে গেলেই রোগীর পক্ষে তা মারাত্মক। কখনও যদি এটা কুড়ি-পঁচিশের ওপরে চলে যায় তা হলে ডায়ালিসিস ছাড়া রোগীকে বাঁচানো অসম্ভব। ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু কুড়ি-পঁচিশের কাছাকাছি নিয়ে কোনও মানুষ সুস্থভাবে হাঁটা-চলা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকতেই পারে না। অথচ এক মুহূর্ত থামলেন মোহন শ্রীবাস্তব। কপালের কাল্পনিক ঘাম মুছলেন : পরীক্ষায় এই লোকটার ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু বেরিয়েছে একশো পঁয়তিরিশ!

অপলকে ডক্টর শ্রীবাস্তবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন মিত্র। তারপর মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো নিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন। চুপচাপ সেগুলো উলটেপালটে দেখতে থাকলেন।

দেখা শেষ হলে অনেকটা আপনমনেই বললেন, স্যাম্পল নেওয়ার সময় যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে…অথবা ল্যাবরেটরির টেস্টে যদি কোনও বাজে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে…। আচমকা মুখ তুলে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকালেন। বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, ..তা ছাড়া, কম্পিউটারও তো ক্যালকুলেশনে ভুল করতে পারে–মানে, প্রোগ্রামে যদি কোনও গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকে।

মোহন শ্রীবাস্তব হেসে ফেললেন : ক্যাপ্টেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনার সন্দেহগুলো আপনার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকছে। তবুও বলি, না, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম কোনও গোলমাল হয়নি। আমার মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট। একটু থেমে আবার বললেন, ওই বিচিত্র মানুষটির ব্লাড সুগার ও ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু পাওয়ার পর আমি তাকে ডেকে

পাঠিয়েছিলাম। সে হাসিমুখে ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির। সুস্থ-সবল চেহারা, অসুস্থতার ছায়া পর্যন্ত নেই। আমি আবার তার শরীর থেকে রক্ত নিলাম। তারপর অ্যানালিসিস করলাম আমি নিজেই। দ্বিতীয়বারে যে-রিপোর্ট পেলাম তাতে আবার দুশ্চিন্তা কমে না গিয়ে উলটে বেড়ে গেল। কারণ দ্বিতীয়বারের রক্ত একেবারে স্বাভাবিক হাত বাড়িয়ে একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব, এই যে, দুবারের রিপোর্টই এতে আছে।

ক্যাপ্টেনের আঙুল কেঁপে উঠল। অস্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, কোনও মানুষের রক্তের কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি এভাবে নিজে থেকে পালটে যেতে পারে–এরকম আচমকা?

না, পারে না। কাকতালীয়, দুর্ঘটনা, যা-ই বলুন না কেন, কোনওমতেই এটা সম্ভব নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। দু-বার রক্ত নেওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র কুড়ি ঘণ্টা। না, স্যাম্পল ওলটপালট হয়নি। কারণ প্রত্যেক স্যাম্পল-এর সঙ্গে ছিল নির্দিষ্ট নম্বর এবং যার স্যাম্পল তার আঙুলের ছাপ। আমরা সেগুলো চেক করে দেখেছি। একই লোকের শিরা থেকে দুটো ব্লাড স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে।

টেবিলে রাখা ইন্টারকম টেলিফোন বেজে উঠল। নীতীশ মিত্র রিসিভার তুললেন। ও-প্রান্তের ধাতব স্বর ব্যস্তভাবে কী সব বলল। নীতীশ জবাব দিলেন, ঠিক আছে, এক্ষুনি যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঝটিতি ঘুরলেন ডক্টরের দিকে ও ডক্টর শ্রীবাস্তব, নেভিগেশান রুমে আরও বড় বিপদ হয়েছে। সুপারভাইজার অশোক চিরিমার এইমাত্র মারা গেছে।

.

## ০৩. ভয়ংকরের সূচনা

মানুষটার দেহে প্রাণ নেই।

মোহন শ্রীবাস্তব মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধনপত রাইয়ের বাহুতে হাত রেখে বললেন,

ধনপত, তোমার কিছু করার ছিল না। তুমি ফোনে খবর দেওয়ার আগেই অশোক মারা গেছে।

দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান ধনপতের চুল উশকোখুশকো, চোখ লালচে, ডানহাত মুঠো, করছে আর খুলছে। রুদ্ধস্বরে ধনপত বলল, আজ সকালবেলা ওকে দারুণ মেজাজে দেখেছি। সারাদিন ধরে আমার সঙ্গে কাজ করেছে, একটিবারের জন্যেও মনে হয়নি ও অসুস্থ। হঠাৎই কী করে যে এমনটা হল…!

দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, কী মনে হচ্ছে, ডক্টর?

ইশারায় ধনপতকে নেভিগেশান রুমের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি। বললেন, অশোক চিরিমারের ব্লাড টেস্ট না করে আমি কিছু বলতে চাই না।

দুজনেই চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। চোখে-চোখে অনেক কথাই যেন হয়ে গেল। অবশেষে ডাক্তারি ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করলেন শ্রীবাস্তব। অ্যালকোহল দিয়ে সিরিঞ্জ পরিষ্কার করে ঝুঁকে পড়লেন অশোকেন্দুর মৃতদেহের ওপর।

ক্যাপ্টেন মিত্র দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। শ্রীবাস্তবের চোয়ালের রেখা কঠিন। সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ এঁকে দিয়েছে কেউ।

কাজ শেষ করে মোহন শ্রীবাস্তব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ক্যাপ্টেন, দশ মিনিটের মধ্যে টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে আমি আপনার ঘরে হাজির হচ্ছি।

দুজনেই বেরিয়ে এলেন নেভিগেশান রুমের বাইরে। ধনপত করিডরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন বললেন, রাই, এখন থেকে তুমি হলে নেভিগেশান রুম সুপারভাইজার।

থ্যাঙ্ক য়ু, ক্যাপ্টেন। ধনপত কাছে এগিয়ে এল।

উইশ য়ু লাক। একটু থেমে আবার বললেন নীতীশ, চিরিমারের বডিটা সাব জিরো রুমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তুমি একটু হেল্প কোরো।

ও.কে., ক্যাপ্টেন। ধনপত রাই নেভিগেশান রুমে ঢুকে পড়ল।

আবছায়া করিডর ধরে ওঁরা দুজনে ফিরে চললেন। মোহন শ্রীবাস্তবের মুখে নতুন আশঙ্কার ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পনেরো মিনিট পরে ক্যাপ্টেনের ঘরে আশঙ্কা পরিণত হল আতঙ্কে।

ব্লাড সুগার জিরো, ক্রিয়েটিনিন লেভেল একশো তিরিশের বেশি, আর এন. পি. এন. একশো পঞ্চাশ! অবসন্ন সুরে উচ্চারণ করলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব, অশোক চিরিমারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।

এন. পি. এন… ক্যাপ্টেন একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

নন-প্রোটিনাস নাইট্রোজেন। ক্রিয়েটিনিনের সঙ্গেই তৈরি হয়। নরমাল লেভেল প্রতি একশো সি সি রক্তে আট থেকে দশ মিলিগ্রাম। ক্রিয়েটিনিন বাড়লে এন পি এন-ও বাড়ে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এন পি এন-টাও চেক করেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না…।

ডক্টরকে বাধা দিয়ে নীতীশ মিত্র বলে উঠলেন, তা হলে অশোক চিরিমারই সেই বিচিত্র মানুষ! কিন্তু আপনি না বললেন তার রক্ত আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে?

শ্রীবাস্তব দু-হাতের আঙুলে জট পাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেটাই তো অবাক কাণ্ড, ক্যাপ্টেন! আমি যার কথা বলেছিলাম সে অশোক চিরিমার নয়।

নীতীশ মিত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে অস্ফুটে বললেন, অশোক চিরিমার নয়!…তা হলে কে সে?

কমল সেনগুপ্ত। প্রেসার চেম্বারের মেইনটিনান্সে আছে। চিরিমারের রিপোর্ট এর আগে পুরোপুরি নরমাল ছিল।

ডক্টর, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমাদের স্টেরিলাইজেশানকে ফাঁকি দিয়ে কোনও জীবাণু হয়তো পৃথিবী থেকেই ঢুকে পড়েছে মহাকাশযানের ভেতরে।

অসম্ভব! অবাস্তব! উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন ডক্টর, রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : মহাকাশযান থেকে টিরার মাটিতে পা দেওয়ার আগে প্রত্যেকটি অভিযাত্রীর মেডিক্যাল চেকআপ করা হয়েছে। তখন কোনও গোলমাল ধরা

পড়েনি। পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে টিরার মিল থাকায় কোনওরকম স্পেস স্যুট ছাড়াই আমাদের লোকজন টিরা গ্রহের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে। দু-মাস ধরে তারা নানা অভিযান চালিয়েছে। তারপর যখন তারা মহাকাশযানে ফিরে আসে তখন। ডিসইনফেক্ট করার জন্য প্রত্যেককে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশানের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় সোলার এর ভেতরে। তখন তো রোগজীবাণুর হদিস আমরা পাইনি! দুমাসেও কারও কোনও রোগ হয়নি, অথচ এখন হঠাৎ– ক্যাপ্টেনের খুব কাছে মুখ এনে শ্রীবাস্তব প্রশ্ন করলেন, এটাকে আপনার কি কোনও রোগ বলে মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন?

নীতীশ সামান্য শিউরে উঠলেন। বাতানুকূল পরিবেশে তার শীত-শীত করতে লাগল। তিনি চেষ্টা করে যুক্তি খুঁজে পেতে চাইলেন : ডক্টর বহু স্পেসশিপকে আমি রোগের কবলে পড়তে দেখেছি। যেমন গত মাসে টাইটান উপগ্রহ থেকে যে স্পেসশিপটা ফিরে আসে তাতে প্লেগ-এর মারাত্মক জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। কোনও উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত মহাকাশযানটিকে জ্বালিয়ে দিতে হয়। ওই জীবাণু প্রতিটি যাত্রীর ফুসফুস অ্যাটাক করেছিল–এবং মাত্র ছঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মহাকাশযানে। অতএব, আবারও ভেবে দেখুন, ডক্টর–।

মোহন শ্রীবাস্তব কোনও কথাই শুনছিলেন না। চোখ বন্ধ করে রিল্যাক্সারে হেলান দিয়ে কী একটা বিষয় মনে করার চেষ্টা করছিলেন। খুব কাছাকাছি এসেও ব্যাপারটা তার মনের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অশোক..অশোক চিরিমার..অশোক চিরিমার…মনে পড়েছে!

রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তব। লম্বা কাঠামো ঋজু করে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন দেওয়ালে আঁটা একটা ক্যাবিনেটের দিকে। মহাকাশযানের যাবতীয় মেডিক্যাল রিপোর্ট থাকে ক্যাপ্টেনের ঘরে, এই ক্যাবিনেটে।

উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশান, ক্যাপ্টেন– বলে ক্যাবিনেট খুললেন। নতুন-পুরোনো নানা কম্পিউটার প্রিন্টআউট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। কতকগুলো রিপোর্ট বেছে নিয়ে সেগুলো মিলিয়ে দেখলেন। বারবার চেক করলেন। তারপর থমথমে কালো মুখে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললেন, আমি জিতেছি, ক্যাপ্টেন–তবে না জিতলেই বোধহয় ভালো হত…।

নীতীশ মিত্র অবাক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন শ্রীবাস্তবের দিকে।

রিপোর্টগুলো আবার ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে রেখে মোহন শ্রীবাস্তব ক্যাপ্টেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, অশোক চিরিমার একবারের জন্যেও টিরার বুকে পা দেয়নি। গত দু-মাসের ওপর ও সোলারের সিক রুমে ছিল। টিরা থেকে রওনা হওয়ার দুদিন পরে ও সেরে ওঠে। গতকাল ওকে আমি লাস্ট ইঞ্জেকশান দিয়েছি। অর্থাৎ, যখন আমরা সবাই টিরার জমি চষে বেড়াচ্ছি তখন ও ছিল বিছানাবন্দি। ওর ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস হয়েছিল। একবারের জন্যেও অশোক চিরিমার মহাকাশযান ছেড়ে মাটিতে নামেনি।

ক্যাপ্টেন মিত্রের চোখে-মুখে দিশেহারা উৎকণ্ঠা। পরাজিত কোণঠাসা মানুষের মতো নিরুপায় সুরে তিনি বললেন, এসবের কারণ কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, ডক্টর!

রিল্যাক্সারে আবার বসলেন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি। টিরা গ্রহের কোনও অদ্ভুত অজ্ঞাত প্রাণী আমাদের কয়েকজন অভিযাত্রীর দেহে ঢুকে পড়েছে।

.

## ০৪. অনুমান, আলোচনা, সিদ্ধান্ত

অতিকায় মহাকাশযান সোলার ছুটে চলেছে মহাশূন্যের শরীর ভেদ করে। পৃথিবীর হিসেবমতো চতুর্থ রাত শুরু হয়েছে। পঞ্চম দিনের শুরুতেই সোলার স্পেস জাম্প দেবে হাইপারস্পেসের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং মহাকাশযান পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ সাময়িকভাবে শেষ করে নীতিশ মিত্র এসেছেন শ্রীবাস্তবের কেবিনে।

দুজনের আলোচনা চলছিল। একসময় আলোচনায় ছেদ টেনে কফি তৈরি করতে উঠলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। কেবিনের একপাশে টেবিলে বসানো মাইক্রোওয়েভ কুকারে কফি তৈরি করে কাপে ঢাললেন। একটা কাপ এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের দিকে, অন্যটায় নিজে চুমুক দিলেন।

ক্যাপ্টেন মিত্র পায়চারি করছিলেন। কফির কাপ নিয়ে একটা রিল্যাক্সারে শরীর এলিয়ে বসলেন। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ।

মোহন শ্রীবাস্তব নরম সুরে বললেন, কুল ডাউন, ক্যাপ্টেন, উত্তেজিত হবেন না।

কফিতে চুমুক দিয়ে নীতীশ মিত্র জবাব দিলেন, উত্তেজিত না হয়ে উপায় কী! এই মহাকাশযানের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব আমার–আমি এই স্পেসশিপের ক্যাপ্টেন। এমনিতেই আমাদের টিরা অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দেশের মানুষের কোটি-কোটি টাকা খরচ করে শূন্য হাতে আমি ঘরে ফিরছি। টিরাতে কোনওরকম প্রাণের সন্ধান আমরা পাইনি, কোনও উদ্ভিদ সেখানে নেই, দামি খনিজ পদার্থের টিকিও দেখা যায়নি। তবুও আমরা প্রাণপণ খেটেছি। স্যাম্পল নিয়েছি পাথরের, মাটির, বাতাসের। ফটো তুলেছি, রিপোর্ট লিখেছি, তারপর কাগজপত্র গুটিয়ে রওনা হয়েছি বাড়ির দিকে। এ যেন পরীক্ষায় ফেল করে মার্কশিট হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার মতো।…আর এখন, বাড়ি ফেরার পথে রওনা হওয়ার তিনদিন পর আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর কথাগুলো শোনালেন। টিরার অদ্ভুত অজ্ঞাত প্রাণী! কফির কাপ টেবিলে নামিয়ে গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললেন, বিশ্বাস হতে চায় না, অথচ অশোক চিরিমার যে মারা গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই বিচিত্র মেডিক্যাল রিপোর্টগুলোকেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

রিল্যাক্সার টেনে নিয়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি বসলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব ও ক্যাপ্টেন, একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। অশোক চিরিমার আর কমল সেনগুপ্তের শরীরে যে-অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেছে তা কোনও মানুষের শরীরে হওয়া অসম্ভব। আমাদের বডির মেটাবলিজম নানান অবস্থার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু কতকগুলো জিনিস আছে যা হিউম্যান মেটাবলিজম-এর পক্ষে অসম্ভব : যেমন, জিরো ব্লাড সুগার, একশো তিরিশের ওপর ক্রিয়েটিনিন আর এন পি এন ভ্যালু, অথচ মানুষটা বেঁচে আছে!

হতে তো পারে টিরা গ্রহের কোনও কোনও রোগজীবাণু।

না, হতে পারে না! এক ঝটকায় মোহন শ্রীবাস্তব সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কফি চলকে পড়ল তার হাতে ধরা কাপ থেকে : কতবার একই কথা আপনাকে বলতে হবে, ক্যাপ্টেন? এটা নতুন কোনও রোগজীবাণুর ব্যাপার নয়, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা ঘটনা। হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেমে এ-ধরনের ঘটনা কোনওদিন ঘটতে পারে না, পারে না, পারে না!

নীতীশ মিত্রের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কফির কাপ টেবিলে রেখে আবার রিল্যাক্সারে বসলেন শ্রীবাস্তব। তার হাত কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে কপালের নীল শিরা।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইলেন। তারপর ইতস্তত করে নীচু গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, টিরা গ্রহে কোনও প্রাণের সন্ধান তো আমরা পাইনি, ডক্টর।

না, পাইনি। আর কেন পাইনি তারও একটা ব্যাখ্যা আমি অনুমানে খাড়া করেছি। ডক্টর শ্রীবাস্তব সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : টিরাকে আমরা যেরকম প্রাণহীন ভেবেছি সেরকম যদি না হয়, ক্যাপ্টেন? হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন পাগলের কল্পনা, কিন্তু তবুও ধরে নিন টিরা গ্রহে প্রাণ ছিল–চালাক, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল এবং শক্তিশালী প্রাণ। আমরা যখন টিরা গ্রহে নেমেছি তখন ওরা হয়তো তৈরি ছিল হয়তো ওরা আগে থেকেই টের পেয়েছিল আমরা টিরায় ল্যান্ড করতে চলেছি। তারপর থেকে সর্বক্ষণ ওরা আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা, অভিযান, খোঁজাখুঁজি যখন চলছিল তখন ওরা সবসময়েই ছিল আমাদের সঙ্গে, তবে অলক্ষ্যে, গোপনে। হয়তো ওরা আমাদের দেখা দিতে চায়নি, অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল ওদের। যদি এমন হয়, টিরার যেসব অংশে আমরা অভিযান চালিয়েছি সেগুলো আমাদের জন্যে আগেভাবেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। ওরাই তৈরি করে রেখেছিল যাতে আমরা কিছু দেখতে না পাই, কিছু খুঁজে না পাই, কিছু জানতে না পারি টিরা সম্পর্কে, এবং ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে ফিরে যাই পৃথিবীতে যেমন খালি হাতে আমরা রওনা হয়েছিলাম পৃথিবী থেকে।

সামনে ঝুঁকে এলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। দু-হাত নেড়ে জোর দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেনঃ এবারে তর্কের খাতিরে ধরে নিন, টিরার প্রাণীদের আমাদের মতো নির্দিষ্ট কোনও চেহারা নেই। হয়তো ওরা নিছকই এক ধরনের জেলির মতো প্রোটোপ্লাজম যে-কোনও ধরনের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হয়তো খুশিমতো ওরা যে-কোনও জিনিসকে নকল করতে পারে। এইরকম নকল কোনও চেহারা নিয়েই ওরা হয়তো আমাদেরই নাকের ডগায় বসে আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপের ওপরে নজর রাখছিল। কে বলতে পারে, ওরা হয়তো পাথর, বালি, কিংবা জল সেজে আমাদের দেখছিল। এমনকী–।

এমনকী মানুষের চেহারাও নিয়ে থাকতে পারে! শ্রীবাস্তবের না-বলা কথাগুলোই উচ্চারণ করলেন ক্যাপ্টেন মিত্র। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখার বাইরে চলে গেছেন তিনি।

ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। ডক্টর শ্রীবাস্তব সমর্থন করলেন নীতীশমিত্রকে ও এবারে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে। মনে করুন, টিরার প্রাণীরা আমাদের গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চায়, আমাদের স্টাডি করে দেখতে চায়, পৃথিবীতে গিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চায় নিজেদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে– তা হলে বলুন, কী করে এসব কাজ ওদের পক্ষে সহজে করা সম্ভব?

নীতীশ মিত্র নিশ্চপ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের প্রশ্নের সুর শুনেই বোঝা যায় তার উত্তর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর মনে রয়েছে। অতএব দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে উত্তরটা তিনিই দিলেন।

ক্যাপ্টেন, আমার অনুমান টিরার প্রাণীদের কেউ মানুষের চেহারা নিয়ে উঠে এসেছে আমাদের মহাকাশযানে। হয়তো টিরার পাথর-বালি ছড়ানো রুক্ষ প্রান্তরে ওরা খুন করেছে কমল সেনগুপ্তকে। তারপর তাকে নকল করে–চেহারায়, কথাবার্তায়, হাবভাবে, সবকিছুতে–ওদের একজন ঢুকে পড়েছে সোলারে। এই আশা নিয়ে ঢুকে পড়েছে যে, তাকে কমল সেনগুপ্ত মনে করে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে যাব। কিন্তু ধরুন, নকল করতে গিয়ে কোথাও যদি গরমিল হয়ে গিয়ে থাকে। মানছি, ওই বিচিত্র প্রাণী কমলের স্মৃতি পর্যন্ত চুরি করেছে, নইলে আপনাকে বা আমাকে নকল কমল চিনতে পারল কেমন করে! কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শরীরে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। অতএব সেই কারণেই নকল কমল জানতে পারেনি মানুষের রক্তের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন কীরকম হয়। আর সেখানেই তার পা ফেলতে ভুল হয়েছে। নিজের আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কমলকে নকল করতে প্রাণীটার সময় লেগেছে। বাইরের খোলসটা হুবহু নকল করে সে তাড়াহুড়ো করে সোলার-এ ঢুকে পড়েছে, কিন্তু তখন ভেতরটা পুরোপুরি বুঝে ওঠা হয়নি। সে পাগলের মতো তথ্য হাতড়ে চলেছে…দিশেহারা, বিভ্রান্ত…যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেতরটা সঠিক নকল করা দরকার। ঠিক এইরকম বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার শরীর থেকে ব্লাড স্যাম্পল টানা হল। অতএব স্বাভাবিক কারণেই যে-রক্ত আমরা পেলাম তা ভুলভাল, গোলমেলে, অবাস্তব, অসম্ভব। প্রাণীটা কিন্তু বসে নেই। তার মন ও অনুভবের অদৃশ্য অ্যান্টেনা দিয়ে সে প্রতিমুহূর্তে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে সোলারের অন্যান্য অভিযাত্রীর কাছ থেকে, মহাকাশযানের নানান নথিপত্র থেকে সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। এইভাবেই সে জানতে পারল মারাত্মক ভুলটা কোথায় হয়েছে। এও বুঝতে পারল ভুলটা মেডিক্যাল রিপোর্টে ধরা পড়েছে, এবং আমাদের চোখে পড়েছে। তখন আমাদের চোখে ধুলো দিতে, ভুল চাপা দিতে, সে খুন করল

অশোক চিরিমারকে। তাকে নকল করল, তারপর মরে যাওয়ার ভান করল। ইচ্ছে করে রক্তে দেখিয়ে গেল কমল সেনগুপ্ত এর মতো গোলমাল। এর কারণ, আমরা ভাবব কোনও রহস্যময় রোগের জীবাণু আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। আর বাড়ি ফেরার পথে সারাটা সময় এই রহস্যের সমাধান খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে আমাদের মস্তিষ্ক। কিন্তু কোনওমতেই সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে না। আমার এই ধারণা যদি সত্যি হয়, ক্যাপ্টেন?

ক্যাপ্টেন মিত্র হাতে হাত ঘষলেন। মাথা নীচু করে গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, যদি তাই হয় তা হলে কমল সেনগুপ্ত কমল সেনগুপ্ত নয়! অশোক চিরিমার অশোক চিরিমার ছিল না! আচমকা মুখ তুললেন তিনিঃ কিন্তু প্রমাণ কই, ডক্টর, প্রমাণ কই? কী করে নিঃসন্দেহ হব আমরা?

ভালো প্রশ্ন করেছেন। কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, টিরার প্রাণীটি মানুষের দেহে ঢুকে পড়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চষে বেড়িয়েছে দেহের প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি কোষ, রাসায়নিক গঠন, অনুপাত, মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তার ছাপ। তারপর স-ব সে নকল করে ফেলেছে। এবং খুন করেছে মানুষটিকে। কমল সেনগুপ্তের রক্তাক্ত মৃতদেহ হয়তো পড়ে আছে টিরার কোনও খাদে। আর অশোক চিরিমারের মৃতদেহ সম্ভবত সোলারের ডিসপোজাল চেম্বার দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে মহাশূন্যে। এখন এই নকল মানুষটা সব দিক দিয়েই আসল মানুষটির মতো–অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিখুঁত কপি করেছে ওরা। শুধু নকল দেহটার ভেতরে এককোণে রয়ে গেছে। একটা শয়তান ভিনগ্রহের মন, শয়তানি মতলব নিয়ে শুধু ভাবছে…ওত পেতে রয়েছে। শ্রীবাস্তব মাথার চুলে আঙুল চালালেন। হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, যত নিখুঁত নকলই ওরা করুক, ক্যাপ্টেন, হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেম এক বিচিত্র জিনিস–একমেবাদ্বিতীয়। সেইখানেই ফাঁদ পাতব আমি। তবে গোপনীয়তার খাতিরে আমার মতলবটা এখনই আপনাকে খুলে বলতে পারছি না। কারণ, নিজেকে ছাড়া আমি এখন আর কাউকে বিশ্বাস করি না!

দুজনে পরস্পরের চোখে চোখ রাখলেন। মোহন শ্রীবাস্তবকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে। ইঞ্জিনের চাপা গুনগুন শব্দ কেবিনের নিস্তব্ধতাকেও আরও প্রকট করে তুলেছে। ক্যাপ্টেন মিত্রের হাত ঘামছে। সোলারের একাশি জন মানুষ নাকি উনআশি জন?… শুধু তাই নয়, টিরার ভয়ংকর প্রাণী যদি একবার পৃথিবীতে পৌঁছোয় তা

হলে গোটা মানবজাতির সর্বনাশ নেমে আসবে। ডক্টরকে সে কথাই জিগ্যেস করলেন তিনি।

প্রাণীটার উদ্দেশ্য কোনওরকমে একবার পৃথিবীতে পৌঁছোনো, তাই না?

হ্যাঁ–ভয়ংকর মনে হলেও কথাটা সত্যি।

যদি আমরা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সোলার-কে মহাশূন্যে উড়িয়ে দিই? উত্তেজনায় দপদপ করছে নীতীশ মিত্রের মুখ।

তাই দেব–যদি না ফাঁদ পেতে ধরতে পারি।

আমাদের হাতে সময় বেশি নেই, ডক্টর–।

জানি। সোলার-কে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলে এতগুলো মানুষের প্রাণ যাবে, তা ছাড়া, ধুলো হয়ে যাবে কোটি-কোটি টাকার এই মহাকাশযান। সুতরাং শেষ চেষ্টা আমি করবই, ক্যাপ্টেন। এ পর্যন্ত এমন কোনও জালিয়াতি বা নকলের কথা আমি শুনিনি যা ধরা পড়েনি। সুতরাং টিরার প্রাণীকেও ধরা পড়তেই হবে। আমি হাতেনাতে প্রমাণ করে দেব যেকমল সেনগুপ্ত আমাদের মহাকাশযানে এখন রয়েছে সে টিরার প্রাণী–একটা নকল পুতুল! এমন ফাঁদ পাতব যা আন্দাজ করা সেই ভয়ংকর প্রাণীর কল্পনার বাইরে।

রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তব ও খুব ঘুম পাচ্ছে, ক্যাপ্টেন। আপাতত গুড নাইট। একটা কথা, আমাদের আলোচনার ব্যাপারটা একটু গোপন থাকলে ভালো হয়।

শুভরাত্রি জানিয়ে নীতীশ মিত্র বেরিয়ে এলেন শ্রীবাস্তবের কেবিন থেকে। দুশ্চিন্তার ঢেউ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতরে। মাথা দপদপ করছে। তবুও কোথায় যেন একটা কৌতূহল খোঁচা মারছে? কী ফাঁদ পেতেছেন ডক্টর শ্রীবাস্তব? সেই ফাঁদে টিরা গ্রহের প্রাণী পা দেবে তো? কে জিতবে এই বুদ্ধির খেলায়?

.

## ০৫. হার-জিত

মানুষটা বাঙ্কে শুয়ে ছিল। নিশ্চল। ঘুমন্ত। তার মাথার ভিতরে, নিমীলিত দু-চোখের পিছনে অন্য একটা মন নড়ে উঠল–পিছল সরীসৃপের মতো। তারপর চিন্তা ও অনুভূতির অদৃশ্য অ্যান্টেনা ছড়িয়ে দিয়ে আর-একটা মনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। ভিনগ্রহী দুটো শয়তান মন কথা বলতে লাগল। মহাকাশযানের দু-প্রান্তের দুটো কেবিনের মধ্যে যেন তৈরি হয়ে গেল অদৃশ্য টেলিফোন যার অন্য নাম টেলিপ্যাথি। একটা মন নৃশংস, নিষ্ঠুর, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর অন্যজন ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা।

আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমরা ধরা পড়ে গেছি। ডক্টর শ্রীবাস্তব আমাদের ধরে ফেলেছে…!

কক্ষনো না! তীব্র স্বরে উত্তর দিল দ্বিতীয় মন।

এখনও ফিরে যাওয়ার সময় রয়েছে! সোলার স্পেস জাম্প দেওয়ার পর আমরা অনেক দূরে চলে যাব। তখন আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকবে না।

ভীতু! বিশ্বাসঘাতক! দ্বিতীয় মন রাগে গর্জে উঠল। সরীসৃপের মতো কিলবিল করে ফুঁসতে লাগল ও এসব চিন্তা করার আগে তোমার মরে যাওয়া উচিত!

কিন্তু আমাকে সন্দেহ করছে যে! …ডক্টর আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। এত নিখুঁতভাবে নকল করেছি যে, কোথাও কোনও গরমিল নেই, অথচ…ডক্টর মনে-মনে কী মতলব ফেঁদেছে কে জানে…।

ঘৃণা মেশানো শাসনের সুর ভেসে উঠল নীরব কণ্ঠে : ডক্টর শ্রীবাস্তব একটা গদর্ভ, বুন্ধু! ও কিছুতেই আমাদের ধরতে পারবে না।

কিন্তু আমাকে যে কোণঠাসা করতে চাইছে! আতঙ্ক আরও গাঢ় হয়েছে, তীব্র হয়েছে প্রথম মনে ও ডক্টরের মতলব আমি আঁচ করতে পারছি না। জানি না নকল করতে গিয়ে কোথাও কোনও ভুল করে ফেলেছি কি না।

মনঃসংযোগে শোনা গেল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি : ডক্টর আমাকে সন্দেহ করে না বরং বিশ্বাস করে। ভয় পেয়ো না। ডক্টর শ্রীবাস্তব একটা আস্ত বোকা। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা পৃথিবীতে নামবে। সেখানে এরকম কত তাজা মানুষ রয়েছে একবার ভাবো তো। সেখানে আমরা দিব্যি লুকিয়ে কাজ সারতে পারব– নির্লজ্জ প্রত্যাশায় যেন লালা ঝরছে দ্বিতীয় মন থেকে : তারপর ওদের শেষ করে

ওদেরই মহাকাশযান নিয়ে আমরা ফিরে আসব আমাদের দেশে। মহাকাশযান বোঝাই করে আর সবাইকে নিয়ে যাব পৃথিবীতে। ওঃ, তখন সেখানে হবে আমাদের নতুন বসতি..। আনন্দে উল্লাসে টগবগ করে উঠল নীরব কণ্ঠস্বর।

কিন্তু ডক্টর...ওকে আমাদের খুন করতে হবে...।

না, না..তা হলে ওরা মহাকাশযান পৃথিবীতে নামাবে না। সবাই সন্দেহ করবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে ওরা মহাকাশযান উড়িয়ে দেবে মহাকাশে। তার চেয়ে বরং ডক্টরকে ওর খেলা খেলতে দাও। ভয় পেয়ো না একটুও।

কিন্তু টের পাচ্ছি, আমি কোণঠাসা হয়ে পড়ছি কীভাবে তা বুঝতে পারছি না। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। এখনই। এখনও সময় আছে...।

নিষ্ঠুর হাসির মধ্যে দিয়ে ঘৃণা ভরা নৃশংস মনটা যেন তার হাজারো অ্যান্টেনা দিয়ে উগ্র বিষ ঢেলে দিল ও ভয় পেয়ো না। মনে রেখো, আমাদের একজন বেঁচে থাকলেই চলবে। তুমি...কিংবা আমি...।

.

ক্যাপ্টেন নীতীশ মিত্রের কেবিনে ঢুকলেন মোহন শ্রীবাস্তব। ক্যাপ্টেন ফিরে তাকাতেই বলে উঠলেন, আমি জিতেছি, ক্যাপ্টেন। আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে নকল কমল সেনগুপ্ত। সে ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে।

শ্রীবাস্তবের মুখে জয়ের হাসি। রিল্যাক্সারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। লাইটারটা হাতে নিয়ে খেলা করতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন মিত্র জয়ের খবরে তেমন যেন আশ্বস্ত হতে পারেননি। নীচু গলায় বললেন, ডক্টর, আপনার অনুমানই তা হলে সত্যি হল! আমি আর ভাবতে পারছি না। সবকিছু যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। কাল রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ঘুমোতে পারিনি। তা ছাড়া, আজ যতবারই কমলের মুখোমুখি হয়েছি ততবারই নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়েছে। ছেলেটা এত নিষ্পাপ, সরল–।

ক্যাপ্টেনকে বাধা দিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, যে কমল সেনগুপ্তকে আপনি দেখছেন সে ঘোর পাপী এবং কুটিল। প্রথম সুযোগেই সে আপনাকে আমাকে

সবাইকে খতম করে দেবে। কিন্তু এখন আর তা হবে না। উলটে আমরাই তার ব্যবস্থা করব…।

কী প্রমাণ পেয়েছেন, ডক্টর? অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে জিগ্যেস করলেন নীতীশ মিত্র।

পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। খাম থেকে বেরোল একটা ফি। সেটা আলোর দিকে ধরে একবার দেখলেন। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কমল সেনগুপ্তের পাকস্থলীর সনোগ্রাফিক ফিল্ম। সনিক জেনারেটার লাগিয়েছিলাম কেবিনের সিলিংয়ে, এবং ওর বাঙ্কের তলায় ফিল্ম প্লেটটা সেট করে অনেক কষ্টে লুকিয়ে এই ছবি তুলেছি। দেখুন–।

ক্যাপ্টেন মিত্র ফিল্মটা দেখলেনঃ কীসের ছবি?

কাল রাতে কমল সেনগুপ্ত যা-যা খেয়েছিল তার ছবি।

কই, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না! ক্যাপ্টেন অবাক হলেন।

শ্রীবাস্তব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন : কমল আমার ফাঁদে পা দিয়েছে, তাই কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন বিমূঢ় চোখে ডক্টরকে দেখতে লাগলেন। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

শ্রীবাস্তব হাসলেন। তারপর পকেট থেকে আর-একটা খাম বের করলেন। খাম থেকে বেরোল। ছটা একই ধরনের ফিল্ম।

ক্যাপ্টেন, কমলের ছবির সঙ্গে এই ছবিগুলো মিলিয়ে দেখুন। আমাদের মেডিক্যাল টিম বহু পরিশ্রমে গোপনে ছবিগুলো তুলেছে। অবশ্য আমি ছাড়া আর কেউ ছবি তোলার কারণ জানে না। হাতের সিগারেটে গভীর টান দিলেন ডক্টর। ফিল্মগুলো রাখলেন ক্যাপ্টেনের ডেস্কের ওপরে। তারপর বললেন, ক্যাপ্টেন, কাল রাতে ক্রু-দের যে-খাবার দেওয়া হয়েছিল তাতে আমি গোপনে পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম–না, আপনার অনুমতি নিতে পারিনি–তার জন্যে আমি দুঃখিত। রাতের খাবার খেয়ে আজ সকলেই বদহজমের অভিযোগ করেছে–একমাত্র কমল সেনগুপ্ত ছাড়া। ওই ছটা ফিল্ম লক্ষ করলে দেখতে পাবেন

স্টোনডাস্টের ছবি সনোগ্রাফে অত্যন্ত স্পষ্ট–যা কমলের ছবিতে নেই। অর্থাৎ, স্বাভাবিক কারণেই খাবারের সঙ্গে অজান্তে পাথরের গুড়ো খেয়ে ছজন অভিযাত্রী তা হজম করতে পারেনি। কিন্তু নকল কমল জানত না পাথরের গুঁড়ো তার হজম করা উচিত কি অনুচিত। আসল কমলের মস্তিষ্কের মেমোরি থেকে এ-বিষয়ে কোনও খবর সে জানতে পারেনি আর জানা সম্ভবও ছিল না। এ-খবর একমাত্র দিতে পারত হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেম যার আচার-আচরণ টিরার অতিচালাক প্রাণীর পক্ষেও হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। অতএব পাথর হজম করে নকল কমল নিজেকে এক্সপোজ করে দিয়েছে। আর তার লুকোনোর পথ নেই!

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হাসলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। লাইটার জ্বেলে নতুন একটা সিগারেট ধরালেন? আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম ক্যাপ্টেন, এ-পর্যন্ত এমন কোনও জালিয়াতি বা নকলের কথা আমি শুনিনি যা ধরা পড়েনি। দরকার শুধু সময়...।

ক্যাপ্টেন মিত্র একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখলেন। তারপর ডক্টরের হাত থেকে লাইটারটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

খবরদার! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলেন মোহন শ্রীবাস্তবঃ ছোঁবেন না আমাকে!

ডক্টরের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করলেন নীতিশ মিত্রঃ আমি লাইটারটা নিতে যাচ্ছিলাম, ডক্টর।

সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন শ্রীবাস্তব। লজ্জিতভাবে লাইটারটা এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের ডেস্কে। বললেন, সরি, ক্যাপ্টেন, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। সবাইকেই আমি ভয় করতে শুরু করেছি। সবসময় টিরার প্রাণীর দুঃস্বপ্ন দেখছি। ওদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি। সবটাই হয়তো বোকামি, কিন্তু আমি সাবধান থাকতে চাই, ক্যাপ্টেন... ছোট্ট করে হাসলেন শ্রীবাস্তবঃ এখন চলুন, নকল কমলের একটা ব্যবস্থা করি।

কী ব্যবস্থা? সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা ডক্টরের তালুর ওপর ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ডক্টর শ্রীবাস্তব সেটা লুফে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। তারপর

ফিল্মগুলো খামে ভরে নিয়ে রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেনও উঠে দাঁড়ালেন তাঁর সঙ্গে রওনা হওয়ার জন্য।

শ্রীবাস্তবের চোয়াল শক্ত হল। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, চরম ব্যবস্থা। চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন…।

ওঁরা দুজনে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেনের কেবিন ছেড়ে। করিডর ধরে এগোতে এগোতে মোহন শ্রীবাস্তব বললেন, একটু আগে আমি কমলকে স্টারবোর্ডের দিকে স্পেস লকটা পরিষ্কার করতে বলে এসেছি। ও যদি স্পেস লকের মধ্যে থাকে তা হলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।

ক্যাপ্টেন মিত্র কোনও কথা বললেন না। তিনি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন, কিন্তু ডক্টর শ্রীবাস্তবের র‍্যাঙ্ক তার সমান। তা ছাড়া, মহাকাশযান ও অভিযাত্রীদের রোগজীবাণুমুক্ত রাখতে ডক্টর শ্রীবাস্তব যা ভালো বোঝেন করতে পারেন ক্যাপ্টেনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। একই কারণে তিনি হুকুম চালাতে পারেন ক্রু-র ওপরে। গত এক দশকে রোগজীবাণুর জন্য বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। সেই কারণেই আজকাল যে-কোনও অভিযানে চিফ মেডিক্যাল ম্যান ক্যাপ্টেনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়তো বা তার চেয়েও বেশি। তবে নীতিশ মিত্র এটুকু আশা করেন, শ্রীবাস্তব যা করবেন তা বুঝে-শুনে দায়িত্ব নিয়েই করবেন।

.

মোহন শ্রীবাস্তব নিজের বোকামির কথা ভাবছিলেন। কমল সেনগুপ্ত ছাড়াও যে অন্য কেউ টিরার প্রাণী হতে পারে এই সন্দেহের কথা ওভাবে প্রকাশ করাটা ঠিক হয়নি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ব্যাপারটা যদি পাঁচকান হয় তা হলেই বিপদ! নিজের সন্দেহের কথা এই মুহূর্তে তিনি কাউকে জানাতে চান না।

স্টারবোর্ডের স্পেস লকের সামনে করিডরে অফিসার অংশুমান যাদবের সঙ্গে দেখা হল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর যাদবকে বললেন, নেভিগেশান রুমে গিয়ে ধনপত রাইকে বলো স্পেস জাম্পের জন্যে তৈরি হতে। আমরা একটু পরে আসছি।

যাদবকে সরিয়ে দিয়ে দুজন এগিয়ে গেলেন স্পেস লকের দরজার সামনে। ভারী ধাতব দরজা। দরজার ওপরের অংশে পুরু প্লাস্টিকের স্বচ্ছ প্যানেল বসানো। প্রেসার চেম্বারের ভেতরে কমল সেনগুপ্ত কাজ করছে। একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করছে। নিখুঁত একজন মানুষ–চেহারা, চালচলন, সব।

হঠাৎই ক্ষিপ্র চিতার মতো দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শ্রীবাস্তব। এক ঝটকায় লক আটকে বেরোনোর পথ বন্ধ করে দিলেন। তারপর দরজার পাশেই একটা প্যানেলের লাল বোতামে চাপ দিলেন। চেম্বারের ভেতরে লাল আলো জ্বলে উঠল। মৃদু গুঞ্জন তুলে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্প কাজ শুরু করল। প্রেসার চেম্বারের বাতাস ক্রমশ বেরিয়ে যেতে লাগল।

লাল আলো দেখে কমল চমকে উঠল, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ছেড়ে ছুটে এল দরজার কাছে। আতঙ্কে চোখ বেরিয়ে আসছে, মুখে বিমূঢ় বিস্ময়।

ডক্টর! ও চিৎকার করে উঠল। ভারী দরজা ভেদ করে ওর ক্ষীণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ও ডক্টর, শিগগির সবুজ বোতামটা টিপে দিন! দেখছেন না, আমার গায়ে প্রেসার স্যুট নেই!

ক্যাপ্টেন মিত্রের ঠোঁট চিরে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে তিনি ডক্টরকে দেখছেন। কোনওরকমে বললেন, কী করছেন আপনি! ছেলেটা যে মরে যাবে!

ছেলেটা নয়, টিরার প্রাণী! গম্ভীর গলায় শ্রীবাস্তব উত্তর দিলেন, আমাদের মতো ওরাও বায়ুমণ্ডলে অভ্যস্ত। অতএব বায়ুশূন্য অবস্থায় বাঁচতে পারবে না। চুপচাপ শুধু দেখে যান। ডক্টরের চোখ প্লাস্টিক প্যানেলের ওপরে নিবদ্ধ।

কমল সেনগুপ্ত অন্ধ আতঙ্কে কাঁপছে। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল আবার, ডক্টর! ক্যাপ্টেন! সবুজ বোতামটা টিপে দিন, প্লিজ! ডক্টর, শিগগির করুন! নইলে আমি মরে যাব– আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

পাগল করা রাগে, উত্তেজনায়, হতাশায়, কমল ঘুসি মারতে লাগল ধাতব দরজায়, প্লাস্টিক প্যানেলের ওপরে। ওর হাত ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। স্বচ্ছ

প্যানেল লালে মাখামাখি হয়ে গেল। তারপর লাল থেকে ধীরে-ধীরে পালটে যেতে লাগল বিচিত্র বেগুনি রঙে।

কমল নিজের গলা আঁকড়ে ধরল, হাঁটুগেড়ে পড়ে গেল মেঝেতে। প্রেসার গেজ-এর কাটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে শূন্যের দিকে। কমল ছটফট করছে আহত সরীসৃপের মতো, কাশির দমকে কেঁপে উঠছে ওর শরীর।

হঠাৎই ওর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। শেষ আক্ষেপে মোচড় খেল ওর দেহ। তারপরই সব স্থির। নিস্পন্দ।

এবং কমল সেনগুপ্তের দেহে পরিবর্তন শুরু হল। আকৃতি পালটে যেতে লাগল ধীরে-ধীরে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবয়ব গলে-গলে মিশে যেতে লাগল–হ্যাঁত-পা, চুল–অবশেষে রয়ে গেল শুধু একতাল বেগুনি জেলি। যেন এক অতিকায় অ্যামিবা। তিরতির কাঁপন জাগছিল জেলির স্তরে। আচমকা সেটাও থেমে গেল। প্রাণের সব স্পন্দন শেষ।

প্যানেল থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নাড়লেন ডক্টর। অবসাদ ভরা শরীরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, এই আমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ক্যাপ্টেন। আমি ভুল করিনি।

ক্যাপ্টেন মিত্র কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই এক লহমায় টানটান হয়ে দাঁড়ালেন মোহন শ্রীবাস্তবঃ ক্যাপ্টেন, একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে। অশোক চিরিমার মরেছে, কিন্তু তার ভেতরের বেগুনি জেলি মরেনি! নকল কমল সেনগুপ্তেরই একটা অংশ তৈরি করেছিল নকল চিরিমার। সে মরে যাওয়ার ভান করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। আমি এক্ষুনি গিয়ে সাব জিরো রুম লক করে সিল করে দিয়ে আসছি। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে মৃত চিরিমারকে পরীক্ষা করে দেখব। আর এই প্রেসার চেম্বারটা আপনি সিল করে দিন। কেউ যেন এটা না খোলে। দেখি, ওদিকে আবার কোনও বিপদ হল কি না!

শ্রীবাস্তব ক্ষিপ্র পায়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলেন। ঘটনাচক্রে অথবা দুর্ঘটনায় কোনও অভিযাত্রী মারা গেলে তার মৃতদেহ অক্ষত রাখার জন্যেই সাব জিরো রুমের ব্যবস্থা। কপাল ভালো বলতে হবে, এখন সেখানে একমাত্র অশোক চিরিমারের মৃতদেহ রয়েছে। তার হাতে সোলারের অন্য কেউ আক্রান্ত হয়েছে কি না কে জানে! আবার কাউকে খুন করে শয়তানটা তাকে নকল করেনি তো! না,

এখানে আর পরীক্ষা চালানোর সময় নেই। সামনেই বিপজ্জনক স্পেস জাম্প। অতএব যা করার পৃথিবীতে ফিরেই করতে হবে।

ছুটতে ছুটতে সাব জিরো রুমে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর। দরজা বন্ধ। আশপাশে কেউ নেই। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুললেন। বরফ-ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় তার চোখ-মুখ যেন জমে গেল। ঘরের মধ্যে সাদা ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ছে। ধাতব দেওয়াল, ধাতুর বাঙ্ক, সব–সব জায়গাতেই চাপচাপ বরফের স্তর জমে আছে। একটা বাঙ্কে নিশ্চল শুয়ে আছে মৃত অশোক চিরিমার। হাতে মুখে তুষারের কণা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মোহন শ্রীবাস্তব। দরজা বন্ধ করে লক করে দিলেন। কাউকে ডেকে সিল করার ব্যবস্থা করতে হবে এখুনি।

দরজা সিল করে কেবিনে ফিরে যেতে-যেতে তার মনে হল, সাব জিরো রুমের ওই হিমশীতল উষ্ণতায় টিরার প্রাণী কি আর বেঁচে আছে? স্পন্দনের ইশারা কি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে ওই বেগুনি জেলিতে?

পৃথিবীতে ফিরে গিয়েই সব প্রশ্নের উত্তর তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করবেন তিনি।

.

## ০৬. শত্রুর মুখোমুখি

পরদায় পৃথিবীকে বিশাল দেখাচ্ছে। সবুজ, উজ্জ্বল, প্রক্সিমা সেন্টরির দিকে যাত্রা শুরুর সময় যেরকম দেখা গিয়েছিল। স্পেস জাম্পের পরীক্ষায় নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়েছে সোলার। এখন তার গতি কমে আসছে। পৃথিবীর কক্ষপথে কয়েকবার পাক দেওয়ার পর নির্দিষ্ট ব্যালিস্টিক পাথ ধরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে সোলার। অভিযাত্রীরা যার-যার নির্ধারিত জায়গায় তৈরি। মহাকাশযান নামার সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রত্যেকটি কর্মীকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে করতে হবে। সেখানে চুলচেরা ভুল হওয়ার উপায় নেই। সুতরাং প্রত্যেকেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

ছায়া-অন্ধকার করিডর ধরে মহাকাশযানের পিছনের অংশে এগিয়ে চলেছেন মোহন শ্রীবাস্তব। সঙ্গে সনোগ্রাফের ফিম সমেত খাম দুটো। ক্যাপ্টেন মিত্রকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে এসেছেন। যে, বিপদ কেটে গেছে। টিরার প্রাণী মৃত। একজন

মারা গেছে বায়ুশূন্যতায়, অন্যজন হিম তাপমাত্রায়। অতএব সোলার এখন বিপদমুক্ত।

কিন্তু সবটাই শ্রীবাস্তব ভুল বুঝিয়েছেন। গালগল্প প্রচার বন্ধ করার জন্যই তাকে ক্যাপ্টেনের কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছে। এখন তিনি লাইফবোট রকেটে চড়ে একা রওনা হয়ে যাবেন পৃথিবীর দিকে। পৌঁছোবেন সোলারের আগে। ফিল্মগুলো কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেবেন সোলার-এর প্রতিটি যাত্রীকে যাচাই করার জন্য। বিপজ্জনক মহাকাশযানে নীতীশ মিত্রকে রেখে যেতে তার খারাপ লাগছে, কিন্তু কোনও উপায় নেই। অন্যান্য যাত্রীর মতো ক্যাপ্টেনকেও তিনি সন্দেহ করেন। কে বলতে পারে, টিরার রুক্ষ ভূমি থেকে একজন, দুজন, না তিনজনকজন ছদ্মবেশী প্রাণী উঠে এসেছিল সোলারে!

লাইফবোট রুমে মোট নটা রকেট ছিল। টর্চের আলোয় আটটা রকেটের ইগনিশান সার্কিট শর্ট করে দিলেন শ্রীবাস্তব। এগুলো ঠিক করতে এখন কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। অতএব পৃথিবীতে সবাইকে নামতে হবে সোলা-এর বন্দি হয়েই। তারপর...।

ননম্বর রকেটটা সোলারের আশ্রয় ছেড়ে গা ভাসাল মহাকাশে। সাবলীল গতিতে নেমে চলল উষ্ণ সবুজ পৃথিবীর দিকে।

টিরার প্রাণীরা অজেয় নয়। ডক্টর শ্রীবাস্তব ভাবলেন। ওদের একজনকে তিনি বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছেন, ফঁদে ফেলেছেন, শেষ করেছেন। অতএব চেষ্টা করলে বাকিগুলোকেও পারবেন। শুধু দরকার সাহস, আর আত্মবিশ্বাস। মৃত্যুর সময় নকল কমল সেনগুপ্তের চোখে-মুখে পাগল করা রাগ ফুটে উঠেছিল। চরম ঘৃণায় টলটল করছিল চোখের দৃষ্টি। টিরার প্রাণী কমলের চোখ দিয়ে তাকে দেখছিল। ফুঁসছিল রাগে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব শিউরে উঠলেন। কমল সেনগুপ্তের বেলায় ভাগ্য তার সহায় ছিল। কিন্তু এবারে?

একঘণ্টার মধ্যেই ক্যালকাটা কসমোড্রোমে ল্যান্ড করল শ্রীবাস্তবের লাইফবোট রকেট। তার পরই ব্যস্ত কথাবার্তা, উত্তেজনা, ছুটোছুটি, সনোগ্রাফ পরীক্ষা, সংশয়, আতঙ্ক। একটা ম্যাগনেটিক কারে চড়ে আনডারগ্রাউন্ড টানেল ধরে

শব্দের গতিতে রওনা হয়ে গেলেন মোহন শ্রীবাস্তব। লক্ষ্যঃ কসমোড্রোম সিকিওরিটি ব্যুরো।

.

আকাশের দিকে রুপোলি নাক উঁচিয়ে বিশাল মহাকাশযান সোলার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন অপরূপ এক অতিকায় পাখি ডানা মেলার মুহূর্তে ছবি হয়ে গেছে। মনে-মনে সোলারের গঠনের তারিফ করলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর অটোমেটিক এলিভেটরে চড়ে সোলার-এর গা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। তার সঙ্গে সবুজ ইউনিফর্ম পরা চারজন কসমোড্রোম সিকিওরিটি পুলিশ। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে আলট্রাসনিক-শকার। ট্রিগারে চাপ দিলেই লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসবে অদৃশ্য আলট্রাসনিক শক্তির ফোয়ারা। শব্দোত্তর তরঙ্গের জোয়ারে অদৃশ্য শত্রু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। বেশিক্ষণ ব্যবহার করলে তার করুণ মৃত্যুও ঘটবে।

ধাতব শব্দের আর্তনাদ তুলে ওপরে, আরও ওপরে, উঠতে লাগল এলিভেটর। এক সময় এসে থামল সোলার-এর প্রধান দরজার সামনে। সেখানে দুজন সিকিওরিটি অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডক্টরকে দেখেই তাঁদের একজন বললেন, সবাই নেমে গেছে, ডক্টর শ্রীবাস্তব। আপনার কথা মতোই সকলকে সিকিওরিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে–

থ্যাংক য়ু, অফিসার। নির্বিঘ্নে কাজ শেষ হওয়ার তৃপ্তি পেলেন মোহন শ্রীবাস্তব।

সিকিওরিটি কমান্ডার তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছেন। কমান্ডারই আদেশ দিয়েছেন সোলার এর প্রতিটি যাত্রীকে সিকিওরিটি ফোর্স দিয়ে সেন্ট্রাল ক্লিনিকে নিয়ে যেতে। অবশ্যই ডক্টর শ্রীবাস্তবের পরামর্শে। ক্লিনিকে প্রত্যেককে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে জেরবার করে ছাড়বেন শ্রীবাস্তব। একের পর এক নতুন-নতুন ফঁদ পাতবেন। সময় লাগবে, ধৈর্যও লাগবে। তবে টিরার একটি প্রাণীও রেহাই পাবে না।

হঠাৎ কী মনে হতে মোহন শ্রীবাস্তব অফিসারকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, স্পেসশিপ থেকে নামার সময় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের ফটো আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখা হয়েছে?…আর একটা বডি ছিল…।

হ্যাঁ, ডক্টর। আমরা লিস্ট মিলিয়ে নিয়েছি। কোনও গরমিল হয়নি। অশোক চিরিমারের ডেডবডি আমরা সাবধানে নামিয়েছি। তারপর পাঠিয়ে দিয়েছি ক্লিনিকে। আপনার কথামতো বডিটা আমরা চেক করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনওরকম ডিফেক্ট পাইনি। তখন স্টেরিলাইজড ব্যাগে ভরে নামিয়ে নিয়েছি।

যাক, নিশ্চিন্ত। হাতে হাত ঘষলেন শ্রীবাস্তব। মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আরও বেশি শীত করছে। এখানে হাওয়ার দাপট অনেক বেশি। নীচে শুয়ে থাকা কলকাতাকে লিলিপুট শহরের মতো দেখাচ্ছে। সেন্ট্রাল ক্লিনিকে ফিরে গিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্ট শুরু করার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু, না। এখনও সামান্য একটু কাজ বাকি রয়েছে। স্টারবোর্ড স্পেস লক থেকে সংগ্রহ করতে হবে বেগুনি জেলির পিণ্ডটা–এতক্ষণে ওটা হয়তো শুকিয়ে এসেছে। তা ছাড়া কেবিন থেকে নিতে হবে কিছু নো, কয়েকটা রিপোর্ট। শুধু নোস আর রিপোর্টের কথাই অফিসারকে বললেন তিনি। একজন সিকিওরিটি পুলিশের হাত থেকে একটা আলট্রাসনিক-শকার চেয়ে নিয়ে অফিসার দুজনকে বললেন, আপনারা অ্যালার্ট থাকুন। আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখবেন, আর-কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে। কেউ না!

ও.কে., ডক্টর! একসঙ্গে বলে উঠলেন দুজন অফিসার। কমান্ডারের নির্দেশ, ডক্টর শ্রীবাস্তবের কথা অক্ষরে-অক্ষরে শুনতে হবে। এত কাণ্ডকারখানার কী কারণ তা তারা কেউই জানেন না।

শকার হাতে নিয়ে সোলার-এ ঢুকলেন শ্রীবাস্তব। তার চোখে ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই যতক্ষণ না পৃথিবীকে বাঁচাতে পারছেন টিরার ভয়ানক শত্রুর হাত থেকে।

পিছনে প্রধান দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই করিডর আবছায়া অন্ধকার হয়ে গেল। অতিকায় মহাকাশযানে নিজেকে ভীষণ একা মনে হল ডক্টর শ্রীবাস্তবের। ইঞ্জিনের সেই চেনা গুঞ্জন নেই, নেই অভিযাত্রীদের কর্মব্যস্ততা। সব শান্ত, চুপচাপ, শূন্য।

করিডরে বাঁক নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চললেন তিনি। তাঁর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ধাতব দেওয়াল থেকে দেওয়ালে।

হঠাৎই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন প্রতিধ্বনি থেকে যেন শব্দের ধাঁধা তৈরি হচ্ছে। আর একটা শব্দ কানে এল না! তার পায়ের শব্দ নয়। একটু অন্যরকম। ডক্টর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। উৎকর্ণ। প্রতিটি স্নায়ু টান-টান। শকার যে-কোনওরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি।

ওই আবার! অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করলেন ডক্টর। সব আলো কি বিকল হয়ে গেছে? কবরখানার নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছে চারিদিকে। কপালে জন্ম নিচ্ছে নোনা ঘামের বিন্দু। এবারে স্পষ্ট শোনা গেল শব্দটা। পায়ের শব্দ! ভেসে এল করিডরের অন্য প্রান্ত থেকে।

সোলার-এ মোহন শ্রীবাস্তব একা নন! আরও কেউ রয়েছে...লুকিয়ে... গোপনে...।

কী ভীষণ বোকামি করেছেন তিনি! মহাকাশযানে একা ঢুকে পড়া তার উচিত হয়নি। তিনি ছাড়া আরও একজন রয়েছে ভেতরে। তার শত্রু! কিন্তু কে? সবাই তো নেমে গেছে সিকিওরিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে! তা হলে?

আলট্রাসনিক-শকার চারপাশে ঘুরিয়ে সতর্ক চোখে সব জরিপ করলেন শ্রীবাস্তব। তার মন তখন ব্যস্তভাবে একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

সোলার-এ এমন কেউ রয়েছে যে কমল সেনগুপ্তের পুরো ঘটনাটা জানে। সে জানে ভিনগ্রহের প্রাণী ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছে সোলার-এ। জানে, কেন মহাকাশযানের সব যাত্রীকে পাহারা দিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইজন্যই সে ভয়ে নামেনি সোলার থেকে ধরা পড়ার ভয়ে। সে জানে ডক্টর শ্রীবাস্তবের সন্দেহের কথা।

এত সব জানে শুধু দুজন। একজন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব নিজে, আর দ্বিতীয় জন...।

ক্যাপ্টেন মিত্র। চিৎকার করে উঠলেন শ্রীবাস্তব, চালাকি করে কোনও লাভ নেই! পালাবার কোনও পথ নেই তোমার! সব আমি ফাঁস করে দিয়েছি। একজন ক্যাপ্টেন মিত্র আগেই নেমে গেছে সোলার থেকে। মহাকাশ্যানের চারিদিকে কড়া পাহারা। মাছি গলার জো নেই। তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ নকল নীতীশ মিত্র!

বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে বিদ্রুপের কলরোল তুলে একসময় মিলিয়ে গেল কথার স্বনন। সব চুপচাপ। শত্রুর তরফ থেকে কোনও জবাব নেই। মোহন শ্রীবাস্তবের শরীর কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড ছুটে চলেছে পাগলা ঘোড়ার মতো উদ্দাম বেগে। একটা ভয় হঠাৎই তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলেন। ফিরে চললেন প্রধান দরজার দিকে।

দরজার কাছে পৌঁছেই শরীর হিম হয়ে গেল। দরজা ভেতর থেকে লক করা, এবং লকের চাবি উধাও। চেঁচিয়ে বা শব্দ করে কোনও লাভ নেই। বাইরে থেকে কেউ দরজা খুলতে পারবে না। যদি দরজা কাটতে হয়, তা হলে তো ঘণ্টাদুয়েকের ব্যাপার! ততক্ষণে…।

শ্রীবাস্তবের গলা বুজে আসতে চাইল ক্ষোভে, হতাশায়। অসহায় কান্না দলা পাকাতে লাগল বুকের ভেতরে। কী মারাত্মক ভুল করেছেন তিনি। একেবারে ভুলে গেছেন টিরার একজন অনায়াসে দুজন মানুষকে নকল করতে পারে। যেমন, একজন নকল করেছিল অশোক চিরিমার ও কমল সেনগুপ্তকে। বাকি অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মহাকাশযান থেকে নেমে গেছেন, তবে তারই একটা অংশ থেকে গেছে সোলারের ভেতরে। এখনও যার চেহারা নীতীশ মিত্রের মতো। সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কীসের জন্য?

যতক্ষণ পর্যন্ত টিরার প্রাণী মহাকাশযানে বন্দি ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসহায়। এখন সে হয়তো মাথা খুঁড়ে মরছে কী করে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরোনো যায়। নৃশংস নিষ্ঠুর ভিনগ্রহীর মনে কোনও দয়া নেই, মায়া নেই। ডক্টরকে বাগে পেলেই সে শেষ করে দেবে। সুতরাং শ্রীবাস্তবই আগে খুঁজে বের করবেন তাকে।

সন্তর্পণে পা ফেলে ছায়া-ছায়া করিডর ধরে আবার এগিয়ে চললেন মোহন শ্রীবাস্তব। শব্দটা আবার শুনতে পেলেন তিনি ও ওপরের ডেক থেকে আসছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে চলেছে সামনে। দ্রুতগতিতে বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় করিডর ধরে নিঃশব্দে ছুটলেন ডক্টর–যেদিকে চলেছে ওপরতলার পায়ের শব্দ সেদিকে।

খাড়া ধাতব সিঁড়ির কাছে পৌঁছে মোহন শ্রীবাস্তব হাঁফাতে লাগলেন। ওপরে একটা কেবিনের দরজা খুলল, বন্ধ হল। ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকেছে নকল নীতীশ মিত্র। ওপরের করিডর ছাড়া ওই কেবিন থেকে বেরোনোর দ্বিতীয় পথ নেই। শত্রুকে ফাঁদে পাওয়া গেছে। সুতরাং ধীরে-ধীরে চুপিসাড়ে সিঁড়ি বেয়ে

ওপরে উঠলেন শ্রীবাস্তব। উঁকি মেরে দেখলেন। ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ছোট ফোঁকর দিয়ে লম্বা শরীরটাকে তৎপরভাবে ওপরের করিডরে তুলে ফেললেন ডক্টর। তারপর শকার উঁচিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে তৈরি হলেন।

বেরিয়ে এসো, নীতীশ! গর্জন করে উঠলেন তিনি, তোমার বাঁচার কোনও পথ নেই! স্পেসশিপটা ওরা তুলোধোনা করে খুঁজবে। দরকার হলে সোলার-কে ওরা জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে–তোমাকে সমেত। এখনও বেরিয়ে এসো বলছি।

কোনও শব্দ নেই। কোনও উত্তর নেই। দরজার পাল্লায় এক জোরালো লাথি বসিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব। পাল্লা খুলে গেল ভেতরে। কেবিন ফাঁকা! সেখানে কেউ নেই।

বিমূঢ় ভাবটা কেটে ওঠার আগেই একটা জোরালো আঘাত আছড়ে পড়ল শ্রীবাস্তবের হাতে। প্রতিটি স্নায়ু যেন চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়। শকার ছিটকে পড়ল যন্ত্রণাবিদ্ধ অসাড় হাত থেকে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষ হল। ঠনঠন। একটা ভারী শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডক্টরের ওপরে। কিন্তু আহত হলেও সহজাত ক্ষিপ্রতায় পলকে সরে গেলেন ডক্টর। দেখলেন নীতীশ মিত্রের দেহটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে।

সাবধান! চিৎকার করে উঠলেন শ্রীবাস্তব। লাফিয়ে পড়লেন ছিটকে পড়া শকার লক্ষ্য করে? তোমার রেহাই নেই, নকল ক্যাপ্টেন! পাহারাদারদের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না!

একটা ঠান্ডা হাসি ভেসে এল শত্রুর দিক থেকে। স্ফটিকের পাহাড় ঝুরঝুর করে খসে পড়ার মতো আলতো সেই হাসি। সরীসৃপের হাসি। তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের হাসি। এবং একটা ভারী ধাতব পিণ্ড ছুটে গেল ডক্টরকে লক্ষ্য করে। তখন তার হাত সবে ঠিকরে পড়া শকারটা ছুঁয়েছে। ভারী ধাতুর আঘাতে ডানহাতের তালুর হাড়গোড় যেন গুড়ো হয়ে গেল। লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেল ডান বাহু বরাবর। মস্তিষ্কে পৌঁছে বৈদ্যুতিক শক অচেতন করে দিতে চাইল শ্রীবাস্তবকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এক রক্ত-হিম করা দৃশ্য ডক্টরের চেতনাকে ঝাঁকুনি দিল প্রাণপণে।

কারণ, নীতীশ মিত্রের অবয়ব তখন ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে অন্য এক চেহারায়। শ্রীবাস্তবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নীতীশ মিত্রের কাঠামো আরও লম্বা হল, চোয়াল শক্ত হয়ে ফুটে উঠল সরু গোঁফ, মাথার সামনের চুল অদৃশ্য হয়ে কপাল বিস্তৃত হল, সেখানে দপদপ করছে নীল শিরা। একটা জেলির তাল যেন নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করল নতুন মানুষ।

ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব!

মেঝেতে পড়ে থাকা শ্রীবাস্তব দেখলেন অবিকল তারই চেহারায় একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে হাসছে। টিরার ভয়ংকর প্রাণীর দাবা খেলার শেষ চাল। আসল ডক্টরকে খুন করে নকল ডক্টর শ্রীবাস্তব নিরাপদে নির্বিঘ্নে নেমে যাবে মহাকাশযান থেকে। কেউ তাকে সন্দেহ। করবে না। সে সেন্ট্রাল ক্লিনিকে গিয়ে আসল মানুষগুলোকে খতম করে মুক্তি দেবে নকল মানুষগুলোকে। তারা বুকভরা হিংসা ও লালসা নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। তারপর...।

.

নকল মানুষটা তখন দু-হাতে তুলে নিয়েছে ইস্পাতের তৈরি অস্বাভাবিক ভারী একটা কন্ট্রোল বক্স। কয়েক মুহূর্ত...তারপরই সব শেষ হয়ে যাবে...প্রাণপণ শক্তিতে শরীরটাকে দু-পাক গড়িয়ে শকারের কাছে এগিয়ে গেলেন মোহন শ্রীবাস্তব। সুস্থ বাঁ-হাতে কোনওরকমে তুলে নিলেন আলট্রাসনিক-শকার। ভারী কন্ট্রোল-বক্সটা ছুটে আসছে তার দেহ লক্ষ্য করে। আঁকুনি দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে যন্ত্রণায় চোখ বুজে শকারের ট্রিগার টিপলেন ডক্টর। হাই এনার্জি আলট্রাসনিক ওয়েভ ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ল শত্রুকে লক্ষ্য করে। ঝনঝন শব্দে কন্ট্রোল-বক্স দেওয়ালে আছড়ে পড়ল। একটা মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল শত্রুর ঠোঁট চিরে। কেঁপে-কেঁপে প্রতিধ্বনি তুলে সেটা মিলিয়ে গেল সোলার-এর গহ্বরে কন্দরে।

নকল শ্রীবাস্তবের দেহটা আবার নমনীয় হয়ে গেল। মেঝেতে আছড়ে পড়ল সশব্দে। অবয়বহীন হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল বেগুনি জেলির তাল। তখনও কাঁপছে তিরতির করে। কমল সেনগুপ্তের মতো।

শকারটা ফেলে দিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন মোহন শ্রীবাস্তব। হাতমুখ ঘাম-রক্তে মাখামাখি। শরীর ক্লান্ত, দুর্বল। কিন্তু আত্মবিশ্বাস এখন যেন শতগুণ

বেড়ে গেছে। সামান্য খোঁজ করতেই দরজার লকের চাবিটা দেখতে পেলেন তিনি। জেলির পিণ্ড থেকে কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিলেন। ধাতব চাবিতে এখনও এক অদ্ভুত উত্তাপ।

করিডর ধরে রওনা হওয়ার আগে আলট্রাসনিক-শকার থেকে জেলি লক্ষ্য করে আর-একবার ফায়ার করলেন শ্রীবাস্তব। জেলির কাঁপন স্থির হয়ে গেল। সব শেষ!

চোয়াল শক্ত করে সোলার-এর প্রধান দরজায় দিকে এগোলেন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব। মনে-মনে উচ্চারণ করলেন : সেন্ট্রাল ক্লিনিকে টিরার প্রাণী যদি কেউ থেকে থাকে তা হলে মরবার জন্যে তৈরি হও। ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব তোমাদের খতম করতে আসছে।

# ছকের বাইরে (নভেলেট)

**ছকের বাইরে (নভেলেট)**

প্রাকবিবাহকালে ইলার প্রেমিকের সংখ্যা কত ছিল বিয়ের পর সে নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাইনি। অবশ্য ইলাও যে আমার ভূতপূর্ব প্রেমিকার সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করছে, এমন নয়। অথচ এই ব্ল্যাকমেল সংক্রান্ত ব্যাপারটা যে আমাদের অতীত জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকাকে জড়িয়েই, তা বুঝতে আমার অসুবিধে হল না। তবুও বোকা-বোকা, ন্যাকা-ন্যাকা চোখ মেলে সামনে বসে থাকা শকুনটার দিকে তাকিয়ে আধো-আধো স্বরে বললাম, কই, আমি তো কিছু জানি না।

লোকটা একটু অপমানিত বোধ করল। রুমাল জড়িয়ে খঙ্গ নাকটাকে পাকড়ে ধরে সশব্দে নাক ঝাড়ল। তারপর কাচের মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ধরল আমার দিকে, তাই বুঝি?

এবার অপমানিত হওয়ার পালা আমার। কারণ, কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাড়জিরজিরে হাতটা বাড়িয়ে আমার থুতনিটা ঈষৎ তুলে ধরেছে লোকটা।

একঝটকায় ওর হাত ছাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কী, কী চান আপনি?

ট-এ আকার, ক-এ আকারটাকা।–নিঃশব্দে হাসল লোকটা। বাইরে চুপ করে থাকলেও মনে-মনে পরিস্থিতির গুরুত্ব ওজন করলাম। একদিকে আমার সুনাম, সামাজিক মর্যাদা, আর অন্যদিকে টাকা, হয়তো বিশাল অঙ্কের টাকা। আর যদি এই অর্থপিশাচের কথার প্রতিবাদ করি তা হলে অনিবার্যভাবেই ও সব ফাঁস করে দেবে। রাস্তার লোকে আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে বেড়াবে, ওই যে বৎসগণ,

যে-ব্যক্তিটি তোমাদের চর্মচক্ষুর সম্মুখ দিয়া ছন্দোময় পদবিক্ষেপে উত্তরদিক অভিমুখে চলিয়াছেন, তিনি একজন নিরীহ নাগরিকের বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিয়া উক্ত নাগরিককে বাধিত এবং দেশের জনসাধারণকে আহ্লাদিত করিয়াছেন। অতএব বৎসগণ…।

নাঃ, আর ভাবতে পারছি না। শেষে কি প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীঅমিত সান্যাল মুখে চুনকালি মেখে সং-এর নাচ নাচবেন? অসম্ভব।

আপনার নামটা জানতে পারি?–শকুনমুখো লোকটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

অবশ্যই। আমারই নাম প্রাণকান্ত সমাদ্দার।

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। জলে ভেসে থাকা নৌকোর মতো দুলে উঠল গোটা ঘরটা। কোনওরকমে উচ্চারণ করলাম, আপ–আপনিই?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সলজ্জ নম্র স্বরে উত্তর দিল প্রাণকান্ত সমাদ্দার, আমিই সেই হতভাগ্য, আপনার স্ত্রীর ভূতপূর্ব স্বামী। ইলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আইনত ছেদ হয়েছে বলে আমার তো মনে পড়ে না।

বিয়ের পর ইলার অতীত ভুলে গিয়ে (সেইসঙ্গে আমার অতীতটাও ভুলেছিল ইলা) আমি ওকে মেনে নিয়েছিলাম। আরও প্রাঞ্জল করে বলতে গেলে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করেছিলাম দূর অস্ত সুখের প্রাসাদের পাসপোর্ট হিসেবে। তখন বুঝিনি ইলা প্রেম, ভালোবাসা ছাড়াও বিবাহজাতীয় একটা বিরক্তিকর জিনিস আগেভাগেই সেরে বসে আছে। জানলে কি আর ওই ভুল করি!

ইলাকে ভালোবাসার পর আমার জীবনে এসেছে সাফল্যের ঝাপটা। যে আমি রোজ নতুন জুতো কিনে পাবলিশারদের বাড়ি-বাড়ি ধরনা দিতাম, সেই আমাকেই চাকরি দিল বিখ্যাত বাংলা তোমার সঙ্গে জগ্যেস করায় বিরকার? কিন্তু সে বিয়ের কথা দৈনিক চলাচল। তাও আবার সাতশো টাকা মাইনের। সুতরাং ইলা সমাদ্দার আমার কাছে হয়ে দাঁড়াল জীবন্ত পরশপাথর। তার পরেই আমার কোন এক দূরসম্পর্কের কাকা না জ্যাঠা পরলোকগমন করে আমাকে করে দিয়ে গেল লাখপতি। জানি না ভদ্রলোক সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন কি না। নইলে আপনারজন

ছেড়ে একেবারে পরেরজন এই অধমকে কেনই-বা সব বিষয়সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া!

আমার সেই স্বর্ণযুগের সময়েই ইলা হঠাৎ বলে বসেছিল, অমিত, আমাকে বিয়ে না করলে তোমার সঙ্গে আমার এই বোধহয় শেষ দেখা।

কারণ জিগ্যেস করায় বিষণ্ন হাসি হেসে ইলা বলেছে, তোমার যা-যা পাওয়ার তা তো তুমি পেয়েই গেছ, আমাকে আর কী দরকার? কিন্তু সেটা তো আমি মুখ ফুটে বলতে পারি না। তুমি যাতে আমাকে একেবারে ছেড়ে দাও, সেইজন্যে ওই বিয়ের কথা বললাম।

ইলার কথার প্রতিটি শব্দ মিছরির ছুরির মতো আমার পুরুষত্বের ওপরে কেটে বসেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে অট্টহাসি হেসে ইলাকে বুকে টেনে নিয়েছি। এতদিনকার মিথ্যে আশ্বাসকে সত্যে পরিণত করে ওকে বিয়ে করেছি। অর্থাৎ, জীবনযুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞা দুই নরনারীর মিলন সংঘটিত হয়েছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এ বিয়েতে আমাদের দুজনেরই কোনও আপোশ ছিল না।

বিয়ের পর আমাদের পাঁচ বছর কেটে গেছে। খ্যাতি আর সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন প্রশমিত। আজ অমিত সান্যাল নামটা প্রায় প্রতিটি পাঠকের পরিচিত। আমার ছবি ছাড়া কোনও সংস্কৃতি-সংবাদ প্রকাশিত হয় না। যে-কোনও পুরস্কার বিবেচনার আগে সবার মনে পড়ে আমার নামটার কথা। চলাচল পত্রিকা ও অমিত সান্যাল আজ এক ও অভিন্ন।

উপরোক্ত ইত্যাদি ইত্যাদির ফলস্বরূপ ভবানীপুরে দেড়লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি এই ফ্ল্যাট। যে-ফ্ল্যাটে বসে এখন আমাকে কথা বলতে হচ্ছে এক ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে।

কারণ, পাঁচবছর নির্বিঘ্ন দাম্পত্যজীবনের পর গতকাল রাত বারোটার সময় হঠাৎ একটা ফোন এল।

ওয়াল ক্লকের রাত বারোটার সংকেত ঘরের চারদেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে ঘরের টেলিফোন। ইলা অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে বিছানায়। সুতরাং ওর যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয়,

সেইজন্যে সাততাড়াতাড়ি লেখার টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো, অমিত সান্যাল স্পিকিং।

অধম আপনাকে একটা সামান্য সংবাদ দিতে চায়।-ও-প্রান্ত থেকে নরম, মিঠে স্বর ভেসে এল।

কীসের সংবাদ?–রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করলাম। লোকটা খবর শোনানোর আর সময় পেল না।

আপনার স্ত্রী বিগ্যামির অপরাধে অপরাধিনী। সে আপনার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে একজন ব্যক্তির সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ব্যাটা দেখি সাধু ভাষায় কথা বলে! একটা খিস্তি দিয়ে বলে উঠলাম, কে আপনি?

শান্ত স্বরে উত্তর এল, আপনার স্ত্রী ইলা সমাদ্দারের প্রথম স্বামীর নাম শ্রীপ্রাণকান্ত সমাদ্দার। আইনত সেই ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীমতী ইলার সম্পর্ক আজও অটুট। যদি অনুমতি দেন তবে আমি আগামীকাল সন্ধে সাতটায় আপনার বাড়িতে উপস্থিত হতে চাই। মনে হয় আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এবং স্বভাবতই সে-আলোচনার সময় আপনার স্ত্রী অনুপস্থিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর লোকটার কথায় রাজি হলাম, ঠিক আছে। আগামীকাল সন্ধে সাতটায়।

ভারাক্রান্ত মনে রিসিভার নামিয়ে আবার লিখতে বসলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টার পর আলো নিভিয়ে ইলার পাশে এসে শুয়ে পড়লাম।

*

অতএব গতকাল রাতের ওই টেলিফোনের পরিণতি হিসেবে আজ সন্ধে সাতটায় এই কালান্তক সাক্ষাৎকার।

ছটা নাগাদ ইলাকে বলে-কয়ে প্রায় জোর করেই শপিং-এ পাঠিয়েছি। কেন জানি না, যে ইলা কোনওদিন আমার কথার অবাধ্য হয়নি, সে-ই হঠাৎ কেমন

বেঁকে বসেছে। ওর নাকি শরীর খারাপ। মন ভালো নেই। তা ছাড়া কেনাকাটার কীই-বা আছে! এইসব নানান কথা বলেছে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। যতরকম উপায় সম্ভব, সবকটাই প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত ওকে বাড়িছাড়া করেছি।

সাধারণত ইলার কাছে আমি কোনও কথাই গোপন করি না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ ব্যাপারটা ভালো করে তলিয়ে না দেখে ওকে কিছু বলে বসা ঠিক হবে না। তাই সেই অচেনা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করেছি।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে সাতটা বাজতেই দরজায় কারও নক করার শব্দ হল, ঠকঠক –।

উৎকণ্ঠার চরম সীমায় পৌঁছে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তাই চার-পাঁচ লাফে সোফা ও দরজার দূরত্বটুকু পার হয়ে ঝটিতি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছি। সামনেই হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো একটা লোক। ফরসা রং সূর্যদেবের অনুগ্রহে তামাটে হয়ে গেছে। তোবড়ানো গালে বয়েসের ভাঁজ। সম্ভবত অকালবার্ধক্য। ছোট-ছোট ভুরুর নীচে কটা চোখ দুটো দু-টুকরো ফসফরাসের মতো জ্বলছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে সে-চোখে ভেসে উঠছে এক প্রশান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। মাথার চুল পরিপাটি করে পাতা কেটে আঁচড়ানো। পাতলা ঠোঁটের ওপর ঝাটা গোঁফটার মতো খগ নাকটিও ভীষণভাবে বেমানান।

লোকটির পরনে ঢোলা হাওয়াই শার্ট ও একটি সুতির প্যান্ট। দুটোরই রং আকাশ-নীল। কিন্তু যত্নের অভাবে অনেক জায়গায় রং জ্বলে গেছে।

সব মিলিয়ে একটা ডানাকাটা শকুন যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা সরু-সরু কাঠির মতো হাত দুটো এক করে নমস্কার করল, নমস্কার, আমিই কাল রাত বারোটার আপনাকে ফোন করেছিলাম। একটু থেমে লোকটি আবার বলল, অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে, ইলা বাড়িতে নেই তো।

ভেতরে আসুন। একটা অজানা ভয়ে হাত-পা সিঁটিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন উত্তাল হয়ে উঠল।

লোকটা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ইশারায় সোফায় বসতে বললাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে বসলাম শকুনটার মুখোমুখি। বললাম, আমিই অমিত সান্যাল।

আজকাল আমার নিজের নামটা উচ্চারণ করতে বেশ ভালো লাগে। যেন সকলকে ডেকে বলছি, আমিই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

লোকটি কিন্তু এতে একটুও প্রভাবিত হল না। শুকনো স্বরে জবাব দিল, নামটা আমি জানি বলেই তো মনে হচ্ছে।

রাগ হলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করলাম না। লোকটা কতটা জানে, সেটা আগে আমার জানা দরকার।

ইলার ব্যাপারটা আমি আপনার কাছ থেকে খোলাখুলিভাবে জানতে চাই।

সেটা বলব বলেই তো এসেছি।একটু থেমে আবার বলল সে, ইলা আপনাকে বিয়ে করার সময় অলরেডি বিবাহিতা ছিল।

তা হলে সে কথা আপনি আমাকে পাঁচবছর আগে জানাননি কেন?–উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলাম, এখন কেন এসেছেন এ কথা বলতে?

চেঁচাবেন না, স্যার। হাত তুলে শকুনপাখি বাধা দিল আমাকে, আপনার তো আবার হার্টের রোগ আছে।

আপনি–আপনি সেটা জানলেন কেমন করে?

আমাদের জানতে হয়। শান্ত স্বরে শকুন উত্তর দিল, যাকগে, আপনি জিগ্যেস করছিলেন। আমি পাঁচবছর কেন অপেক্ষা করলাম, তাই তো? তার কারণ কুমারী গাই কখনও দুধ দেয় না। পাঁচটি বছর ধৈর্য ধরে আমি অপেক্ষা করেছি আপনার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। তারপর আজ যখন আপনি গর্ভবতী, উন্নতির চরম ধাপে, তখনই আমি আমার দোহনপর্ব শুরু করতে চাইছি। পাঁচ বছর আমার নষ্ট হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু এখন কাজটা আমার পক্ষে অনেক সোজা হয়ে গেছে।

আমার অসহায়তা লোকটি পরিষ্কার বুঝতে পারল, তাই মুচকি হেসে বলে চলল, জানি না, ইলা কেন ব্যাপারটা আপনার কাছে চেপে গেছে, তবে এটা সত্যি যে, ওর ভূতপূর্ব স্বামী এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে। তার নাম প্রাণকান্ত সমাদ্দার…সে তো কালই আপনাকে ফোনে জানিয়েছি।

ইলার মতো কোনও বুদ্ধিমতী মেয়ে যে কখনও এরকম বোকার মতো কাজ করে বসতে পারে, তা আমি কল্পনাও করিনি। আমিও তো অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রাকবিবাহজীবনে অনেক লটরপটর করেছি, কিন্তু কই, এত বড় ভুল তো করিনি!

এবার লোকটিকে বোকার মতো বলেছি, কই, আমি তো কিছু জানি না!

তারপর যখনই লোকটি বলেছে, সে-ই ইলার প্রথম স্বামী, তখন অবাক হয়ে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি।

পরিস্থিতির ঝটকা সামলে নিয়ে বললাম, কত টাকা চান আপনি?

আপাতত হাজার-দুয়েক। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটা প্যান্টের পকেট হাতড়ে কিছু কাগজপত্র বের করল, টাকা দেওয়ার আগে আমার কথা সত্যি কি না পরখ করে নিন। এই যে আমাদের বিয়ের পর তোলা ফটো। আর এটা হল ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট।

প্রাণকান্তর কথা যে আমি অবিশ্বাস করেছি, তা নয়। তবু একবার ক্ষীণ আশা নিয়ে আমার চোখের নজর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাগজগুলোর ওপরে, এবং আমার বিশ্বাস আরও মজবুত হয়েছে।

সুতরাং অকারণে সময় নষ্ট না করে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে চেকবই নিয়ে এলাম। প্রাণকান্তর সামনেই পেন বাগিয়ে ধরে লিখতে শুরু করলাম।

স্যার!

লেখা বন্ধ করে মাঝপথে মুখ তুলে তাকালাম।

স্যার, আমি ইংরেজি পড়তে জানি না, তবে মা-বাবার অনুগ্রহে এক-দুইটা জানি। তাই বলছিলাম, চেকের বদলে ক্যাশটাকা দিলে আমার পক্ষে নিতেও সুবিধে, পরখ করতেও সুবিধে।

প্রাণকান্তর মিছরিমাখা স্বরে টের পেলাম ধরা পড়ে গেছি। নাঃ, লোকটা নেহাত বোকা নয়। নগদনারায়ণের কারবারে যে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, সেটা ও ভালোই জানে।

সুতরাং চেকটা ছিঁড়ে ফেলে পেন বুকপকেটে গুঁজে ফেললাম, বললাম, তা হলে আমার পক্ষে এখন ক্যাশটাকা দেওয়া সম্ভব নয়। দিনকয়েক সময় চাই।

প্রাণকান্ত কিছুক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, ছোটবেলায় সময়ানুবর্তিতা রচনায় আমি ক্লাসে হায়েস্ট নম্বর পেয়েছিলাম। তাই ওই সময়-টময়ের ব্যাপারগুলো আমি নিখুঁতভাবে মেনটেন করি! আগামী শুক্রবার রাত নটার সময় আসব। দেখবেন স্যার, টাকাটা যেন পাই।

একটু হেঁ-হেঁ করে হাত কচলে উঠে দাঁড়াল সমাদ্দার। এগিয়ে চলল দরজার দিকে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে ধরলাম। এবং খেয়াল করলাম, আমার সাহিত্যজীবনে এই প্রথম এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি এক নিখুঁত খুনের প্লট চিন্তা করে চলেছি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅমিত সান্যাল জীবনে সর্বপ্রথম এক যুগান্তকারী গোয়েন্দা উপন্যাস লেখায় হাত দেবেন।

কিন্তু দরজা ছেড়ে বেরোনোর সময়ও প্রাণকান্ত আমার মনের পরোপকারী চিন্তাধারার কথা টের পেল না। কারণ, আমার মুখের অমায়িক হাসিটা ওকে ভাববার সুযোগ দিচ্ছিল, আমি ভয় পেয়েছি।

ইলার ফিরতে যে খুব বেশি দেরি হবে না, তা জানতাম। তাই ওর স্নায়ুর ওপর যাতে হঠাৎ চাপ সৃষ্টি করা যায়, সেইজন্যে দৃশ্যসজ্জায় চটপট মনোযোগ দিলাম। ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খুলে রাখলাম। নিভিয়ে দিলাম ঘরের সব কটা আলো। তারপর বসবার ঘর ছেড়ে শোওয়ার ঘরে গেলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসলাম দরজার ঠিক মুখোমুখি। তারপর আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকা শেড দেওয়া টেবল-ল্যাম্পটাকে জ্বেলে দিলাম। অর্থাৎ, দরজায় সামনে থেকে দেখলে আমার শরীরের সিলুয়েট ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না। আর দেখা যাবে শুধু জ্বলন্ত সিগারেটের অগ্রভাগটুকু।

প্রতীক্ষা শুরু করার মিনিট-দশেকের মধ্যেই সদর দরজায় কাছ থেকে কানে এল একটা অস্ফুট চাপা আর্তনাদ। তারপরেই ইলার কাঁপা স্বর, অমিত, অমিত।

আমি নীরব।

অমিত, তুমি কোথায়?

আমি তবুও নীরব। সিগারেটের ধোঁয়ার কালো ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের দেওয়ালে।

এবার ওর হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে, যে-ঘরে আমি বসে আছি।

দরজার কাছে আসামাত্রই আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং একইসঙ্গে ঘটে গেল তিনটে ঘটনা।

এক, কিনে আনা জিনিসপত্রের বাক্সগুলো ইলার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে গেল।

দুই, ওর ভোকাল কর্ড ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। ওর গলাফাটানো চিৎকারে গমগম করে উঠলো গোটা ঘরটা।

আর শেষ ঘটনাটা যেমন চমকপ্রদ তেমনি আকস্মিক। ইলা ঘুরে দাঁড়িয়েই উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করল।

আমিও আর দেরি না করে ক্ষিপ্রগতিতে ওকে অনুসরণ করলাম। সিগারেটের টুকরোটা বসবার ঘরের টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলাম। তারপরই ফ্ল্যাটের খোলা দরজা লক্ষ করে দৌড়তে শুরু করলাম।

বাইরে বেরোতেই করিডরের আলোয় কিছুক্ষণের জন্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হল না, ইলা সিঁড়ি ধরে দৌড়চ্ছে। সুতরাং আমিও সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে ছুটলাম।

তিনতলার সিঁড়ির কাছাকাছি এসেই ইলাকে ধরে ফেললাম। এবং ও চিৎকার করবে বুঝতে পেরেই বাঁ-হাতের তালু দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরলাম। ও বোবা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি পেছন থেকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, ভয় নেই, ইলা। আমি–আমি অমিত।

ইলা ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎই চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল আমার বুকে। ওকে ধরে ধীরে-ধীরে ওপরে নিয়ে চললাম। আমার এই সাজানো পরিবেশ যে ওর মনে এতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করবে, তা ভাবতেই পারিনি। ইলার এই আকস্মিক ভয় পাওয়ার কারণ আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। তা হলে কি…?

ওনারশিপ ফ্ল্যাটগুলোর একটা সুবিধে আছে। এরা কেউই কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। এমনকী কারও সঙ্গে কারও আলাপ-পরিচয়ও তেমন নেই। তা ছাড়া বহু ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। তাই এত গণ্ডগোল সত্ত্বেও কেউ যে দরজা খুলে বেরিয়ে এল না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার উলটোদিকের ফ্ল্যাটে যে-পাঞ্জাবি ভদ্রলোক থাকেন, তিনি যখন প্রত্যেকদিন রাত বারোটা-একটার সময় টলটলায়মান অবস্থায় ফিরে এসে একাদিক্রমে তার ফ্ল্যাটের দরজা এবং তার দজ্জাল গৃহিণীর সঙ্গে পানিপথের চতুর্থ এবং পঞ্চম যুদ্ধ বেশ উৎসাহ সহকারে শুরু করেন, তখন আমি আর ইলা বন্ধ দরজার পেছন থেকেই সে-যুদ্ধের ধারাবিবরণী শুনি। ভুলেও দেখতে যাই না যুদ্ধের ফলাফল।

সুতরাং বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে ইলাকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম। আন্দাজে হাত বাড়াতেই হাতে ঠেকল আলোর সুইচ। আলো জ্বেলে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ইলার ফোঁপানি বন্ধ হয়ে গেলেও ওর দেহটা এখনও ফুলে-ফুলে উঠছে। ওকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিলাম, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ইলা একবার মুখ তুলে আমাকে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে বসে পড়ল সোফায়।

আমি ছড়িয়ে পড়া জিনিসপত্রের বাক্সগুলো গুছিয়ে রেখে ইলার মুখোমুখি এসে বসলাম। ওর জলে ভেজা মুখটা কি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে পাঁচ বছর আগে দেখা ইলাকে। ফরসা মুখে টানা-টানা গভীর জীবন্ত কালো চোখ। হাতছানি দেওয়া স্বপ্নিল ঠোঁটের নীচে সৌন্দর্যের পরিপূরক ছোট্ট তিলটা যেন শিল্পীর হাতের নিখুঁত পরশ।

ইলা একটা সামান্য ব্যাপার তুমি আমাকে জানাতে বোধহয় ভুলে গিয়েছিলে। তাই প্রাণকান্ত সমাদ্দার এসে সেই কথাটা আজ আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

ইলা কাপড়ের খুঁট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, আমার কথা শোনামাত্রই দু-হাতে আঁকড়ে ধরল সোফার হাতল। ভাবলেশহীন কঠিন মুখে আমার দিকে তাকাল। গভীর কালো চোখে ফুটে উঠল অনুচ্চারিত বিস্ময়, আতঙ্ক।

সমাদ্দার আমাকে সবই বলেছেন, ইলা। কোনওকিছুই জানতে আমার আর বাকি নেই। সুতরাং ব্যাপারটা সত্যি কি না সেটা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।

ইলা প্রথম ভয়টাকে এতক্ষণে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। ও নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, বলল, হ্যাঁ অমিত, সত্যি।

এবার তা হলে সমস্যাপূর্ণ আসল চ্যাপ্টারটা তোমাকে আমি খুলে বলতে চাই। প্রাণকান্ত আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। সামনের শুক্রবার রাত নটায় ও আসবে প্রথম কিস্তির দু-হাজার টাকা নিতে। মনে রেখো, প্রথম কিস্তি। তারপর ব্যাপারটা চলবে–চলতেই থাকবে। একদিকে আমার সম্মান, সামাজিক মর্যাদা, আর অন্যদিকে টাকা, শুধু টাকা। জানি না, এভাবে কতদিন ওর মুখ আমি বন্ধ রাখতে পারব। আর এইরকম চলতে-চলতে আমরা হব রাস্তার ভিখিরি। শুধু আমার বইয়ের রয়্যালটির টাকায় কোনওরকমে দিন চলবে। কারণ চলাচল-এর চাকরি বজায় রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না–শুধু ওই প্রাণকান্তর জন্যে।

ওকে খুন করলে কেমন হয়?

এবার চমকানোর পালা আমার। বোবা বিস্ময়ে ইলার নিটোল নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও বলে কী! তা হলে আমাদের মানসিক বোঝাঁপড়া কি এতই নিখুঁত? প্রাণকান্তকে খুন করার কথা মনে-মনে চিন্তা করলেও, সে-সর্বনাশা-চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস বা শক্তি কোনওটাই আমার নেই। কিন্তু এখন ইলার প্রস্তাব পেয়ে উল্লাসের শিহরন বয়ে গেল আমার শরীরের শিরা-উপশিরায়। কিন্তু মনের ভাব মনেই লুকিয়ে রেখে মুখে বললাম, খুন? মানে, সেটা কি ঠিক হবে?

কেন হবে না?–ইলার সপ্রতিভ স্বর আঁজিয়ে উঠল, ওই লোকটা আমার লাইফের সব আনন্দ, সুখ কেড়ে নিয়েছিল। আজ থেকে সাত বছর আগে একটা ইমোশনাল ঝোঁকে বাড়ির সকলের কথা না শুনে আমি ওকে বিয়ে করি। কিন্তু প্রাণকান্তর অবস্থা ছিল ভীষণ গরিব। তাই বেশিদিন আমরা সুখে থাকতে পারিনি। তার ওপর ওর স্বভাব-চরিত্র ক্রমশই গড়িয়ে চলেছিল নীচের দিকে। বিয়ের ক মাস পরেই আমাকে ছেড়ে ও বেপাত্তা হয়ে যায়। তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। তারপর…তারপর একদিন বহু পুরুষের পর এলে তুমি। কেন জানি না, এবারের পরিচয়টাকে আমি হালকাভাবে নিতে পারিনি। পরের ঘটনা তো তুমি সব

জানো। আজ এতদিন পর প্রাণকান্ত আমার অবস্থায় সুযোগ নিতে এসেছে। তাই বলছি অমিত, ওই লোকটাকে খুন করার মধ্যে কোনও পাপ নেই, কোনও অন্যায় নেই।

ইলার শেষ কথাগুলোর রেশ আমার কানের পরদায় ঘুরে-ফিরে বাজতে লাগল : কোনও পাপ নেই, কোনও অন্যায় নেই।

ইলা, তা হলে একটা প্রশ্নের আমি সোজাসুজি উত্তর চাই।–নিষ্পলকে ইলার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলাম, আমাদের এই বিবাহিত জীবনে তুমি কী অসুখী?

এই আচমকা প্রশ্নে ইলা বেশ অবাক হয়ে গেল। আমার কথার জবাব না দিয়ে ও পালটা প্রশ্ন করল, কেন, হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছ কেন?

কারণ আছে, ইলা। আমি জানতে চাই তোমার কাছে কার দাম বেশি? আমার, না প্রাণকান্তর?

প্রাণকান্তকে আমি ঘৃণা করি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে কুটিল স্বরে জবাব দিল ইলা।

আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ইলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলাম ওর কোমল গালে। মৃদু স্বরে কানে কানে বললাম, প্রাণকান্ত সমাদ্দারকে আমিও ঘৃণা করি।

.

প্রাণকান্তর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। ইলার হাবভাবে কোনও পরিবর্তন দেখতে পাই না, কিন্তু জানি, ও চুপচাপ বসে নেই। প্রাণকান্তকে খতম করার ব্যাপারটা নিয়ে ইলাও যথাসাধ্য ভাবছে।

আমি কী অফিসে, কী বাড়িতে, সবসময়েই বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই নিয়ে পড়ে থাকি। ভাবতে থাকি প্রাণকান্তকে খুন করার সহজ অথচ নিখুঁত উপায়। সবার আগে আমাকে ঠিক করতে হবে সমাদ্দারের মৃত্যুটাকে পুলিশের কাছে কীভাবে উপস্থিত করব। অ্যাকসিডেন্ট? সুইসাইড? না স্বাভাবিক মৃত্যু? বেশ কিছুক্ষণ চিন্তার পর শেষ সম্ভাবনাটা মন থেকে মুছে ফেললাম। কারণ, এ

পৃথিবীর কোনও লোকই পরের ফ্ল্যাটে এসে স্বাভাবিক উপায়ে মারা যায় না। সুতরাং হাতে রইল দুই। অর্থাৎ, হয় অ্যাক্সিডেন্ট না হয় সুইসাইড। আপনারা হয়তো হাসছেন দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার কথা ভেবে। তা হাসারই কথা। এমন কোনও সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ কি আছে, যে পরের ফ্ল্যাটে এসে আত্মহত্যা করে? অতএব, শেষ সম্ভাবনাটা মনে আঁকড়ে প্রস্তুপির্বের কথা ভাবতে শুরু করলাম।

হঠাৎই মনে পড়ল একটা বিদেশি ছবির কথা। জানি না ছবিটা আপনারা দেখেছেন কি না, তবে আমি আর ইলা দুজনেই দেখেছি। সেটা আলফ্রেড হিচককের বিখ্যাত ছবি ডায়াল এম ফর মার্ডার। তাতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঘরে একটি অপরিচিত লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেই মৃত লোকটির পকেটে পুলিশ একটি মারাত্মক সূত্র পায় : একটা চাবি। যে-ঘরে লোকটি মারা যায় সেই ঘরের চাবি। তখন পুলিশ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গৃহস্বামীকে গ্রেপ্তার করে। কারণ, ওই চাবিটি ছিল ওঁরই। তিনিই ওটা মৃত লোকটিকে দিয়েছিলেন ঘরে ঢোকার জন্যে।

ওই ছবির গল্পটাকে কাজে লাগালে কেমন হয়? অবশ্য গল্পের শেষটা হবে একটু অন্যরকম। মৃত প্রাণকান্ত সমাদ্দারের পকেটে যে-চাবিটা পাওয়া যাবে, তা আমাদের ফ্ল্যাটের হলেও আমার বা ইলার চাবি নয়। সেটা হবে সম্পূর্ণ নতুন একটা তৃতীয় নকল চাবি–চাবিওয়ালার হাতে তৈরি।

পরিকল্পনাটা যতই ভাবতে লাগলাম, ততই ওটা স্পষ্ট চেহারা নিতে লাগল। তাই বৃহস্পতিবার রাতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর পাশে শুয়ে থাকা তন্দ্রাচ্ছন্ন ইলাকে ডাকলাম, ইলা, ইলা?

উ।–পাশ না ফিরেই ও অস্ফুটে জবাব দিল।

সমাদ্দারের ব্যাপারটা আমার ভাবা হয়ে গেছে।

এবারে ইলা পাশ ফিরল। মাথার কাছে জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা মরা চাঁদের আবছা আলোর ওর চোখদুটো দেখতে পেলাম। সে-চোখে নীরব প্রশ্ন।

দ্যাখো, ব্যাপারটা হবে ঠিক এইরকম। হাত নেড়ে ইলাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আগামীকাল প্রাণকান্ত এলে ওকে ওর পাওনা দু-হাজার টাকা আমি দিয়ে দেব। তারপর ও স্বাভাবিকভাবেই আরও টাকা চাইবে। তখন ওকে বলব

আগামী সপ্তাহে বুধবার আসতে। বুধবার আসতে বলার একটা কারণ আছে। তা হল, ওই দিন থেকে অফিসে আমার রুমে যে অন্য আর একটা ছোকরা কাজ করে, সে সোমবার পর্যন্ত ছুটি নিচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা খুলে বললেই সব বুঝতে পারবে। যা হোক, প্রাণকান্ত কাল টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি আমার কাজ শুরু করব। প্রথমে বাথরুম থেকে সাবানটা নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা থেকে চাবির ফুটোর ছাপ নেব। তারপর সেই সাবান নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অচেনা এক চাবিওয়ালার কাছ থেকে দরজার একটা নকল চাবি তৈরি করব। চাবি তৈরি হয়ে গেলে সোমবার সকালে থানায় গিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে বলে একটা ডায়েরি করব। আর ইতিমধ্যে তোমার কাজ হবে, সেই ছাপ নেওয়া সাবানটাকে বাথটাবে রেখে জলে পুরোপুরি গলিয়ে ফেলা এবং ওটার হাত থেকে নিখুঁতভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া। তারপর ঘরের গোটাকয়েক ড্রয়ার-টয়ার খুলে রেখে আর কাগজপত্র কিছু ছড়িয়েছিটিয়ে মঞ্চসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ করে রাখবে। পুলিশ তদন্তে এলে ভালোই হবে। ওদের এক্সপার্টরা যখন দেখবে দরজা ফোর্স করা হয়নি, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওদের নজর পড়বে চাবির ফুটোর দিকে। ওরাই আমাদের জানাবে, চোর এসেছিল নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে। আমরা সবাই যেন সাবধানে থাকি কিছু হলেই যেন ওদের খবর দিই ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ, নকল চাবির ব্যাপারটা পুলিশের মনে আমরা গেঁথে দেব।

ইলা বোধহয় এতক্ষণে আমার এই প্রাথমিক পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝতে পারল। ও চোখ গোল-গোল করে শুনতে লাগল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল। এইবার শুরু হবে প্রাণকান্ত-সংহার পালার দ্বিতীয় অধ্যায়।

বুধবার বিকেল পাঁচটা একুশের ট্রেনে আমরা দুজনে বাইরে যাচ্ছি।

কেন?–বাধা দিয়ে জানতে চাইল ইলা।

দরকার আছে, তাই। যাকগে, শোনো। সেইদিন ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় প্রাণকান্তর সঙ্গে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব। ওকে প্রচুর টাকার লোভ দেখাব, তা হলে ও ঠিক সময়মতোই আসবে। এদিকে অফিস থেকে পাঁচটা বাজতে পঁচিশের সময় আমি বেরিয়ে পড়ছি। কিন্তু আমার সহকর্মী সমর জানবে আমি বেরুলাম ঠিক পাঁচটায়–পাঁচটা বাজতে পঁচিশে নয়। কারণ, বুধবার আমার রুমের দেওয়াল-ঘড়ির কাটা সমরকে লুকিয়ে আমি পঁচিশমিনিট এগিয়ে দেব। এগিয়ে

দেব আমার হাতঘড়ির কাটাও। এবং সমরের হাতঘড়ির কাটাও যে করে থোক আমাকে সরাতে হবে। মোটমাট পাঁচটা বাজতে পঁচিশ মিনিটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে আমি সোজা বাড়িতে আসছি।

এখন ভালো করে শোনো তোমাকে কী করতে হবে। ঠিক পাঁচটা বাজতে পঁচিশের সময় তুমি রেডি হয়ে বাইরে বেরোবে–অবশ্য বেরোনোর আগে তোমার ঘড়ির কাটা পঁচিশ মিনিট এগিয়ে নেবে। যাতে সময় তখন পাঁচটা বলে মনে হয়। ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়েই তুমি অরোরাদের (আমাদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটের সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোকদের কথা বলছি) ফ্ল্যাটের দরজায় আস্তে নক করবে। নক করেই চট করে এসে ঝুঁকে দাঁড়াবে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়। বেশ খটাং-খটাং করে চাবি ঘোরাবে। তবে দরজার পাল্লায় সামান্য ফাঁক রেখে দেবে যাতে ঘরের ভেতরের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যায়। এদিকে তোমার পেছনে অরোরাদের ফ্ল্যাটের দরজা ততক্ষণে খুলে গেছে। আর সেই দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস অরোরা বেশ কৌতূহলে তোমাকে লক্ষ করছেন (যেহেতু মিস্টার অরোরা রাত বারোটার আগে কোনওদিনই বাড়ি ফেরেন না)। তখন তোমার কাজ হবে ওঁর সঙ্গে কথা বলা। নকল চাবি দিয়ে যে আমাদের ফ্ল্যাটে গত রবিবার চোর ঢুকেছিল, সে কথা ওঁকে চটপট জানিয়ে দেবে। তুমি যে আমার সঙ্গে পাঁচটা একুশের ট্রেনে বাইরে যাচ্ছ সে কথাও বলবে এবং রোববার পর্যন্ত, অর্থাৎ, যে কদিন আমরা থাকব না, ওঁকে আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে একটু নজর রাখতে রিকোয়েস্ট করবে। বলা তো যায় না, সেই চোরটা কখন আবার এসে নকল চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে? মিসেস অরোরা নজর রাখতে পারুন আর নাই পারুন, একগাল হেসে নজর রাখবেন বলে তোমাকে আশ্বাস দেবেন এবং আমিও সেটাই চাই। কারণ, পরে প্রাণকান্তর ডেডবডি পাওয়ার পর মিসেস অরোরা ওঁর নজর রাখার কাজে গাফিলতি করেছেন বলে নিজেই আপশোশ করবেন। ইশ, কেন তিনি ভালো করে নজর রাখলেন না! নয়তো ওই চোরটি কি কখনও ঢুকতে পারত?–যাক, আশা করি ব্যাপারটা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, এইবার কথার ফাঁকে তোমার ঘড়িতে যে পাঁচটা বাজে (অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে সময় তখন পাঁচটা বাজতে পঁচিশ মিনিট) সেটাও বেশ কায়দা করে জানিয়ে দেবে ওঁকে। আর ঠিক সেইসময় তুমি কাঁটা এগিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের দেওয়াল-ঘড়িতেও ঢং-ঢং করে পাঁচটা বাজবে। সুতরাং ভবিষ্যতে মিসেস অরোরা যদি কোনওদিন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়েন, তখন তিনি শপথ করেই বলবেন যে, ঠিক পাঁচটার সময় তুমি ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে গেছ। ব্যস, তারপর মিসেস অরোরার চোখের সামনে দিয়েই চাবি ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে তুমি লিফটে চড়ে নামতে শুরু করবে।

এইবারই শুরু হচ্ছে পরিকল্পনার সবচেয়ে জটিল এবং কুটিল অংশ। লিফট চলতে শুরু করামাত্রই তুমি চোখে একটা গগল্স লাগিয়ে নেবে, চুলের কায়দা সামান্য পালটে নেবে। এবং আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক নীচের তলাতেই লিফট থামিয়ে লিফট থেকে নেমে পড়বে। তুমি লিফটের বোতাম এমনভাবে টিপবে যাতে তুমি নেমে পড়ার পর খালি লিফট চলে যায় একতলায়। কারণ, ঠিক সেইসময়ে আমি একতলায় সানগ্লাস পরে লিফট নামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

লিফট নেমে যাওয়ামাত্রই তুমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করবে। লক্ষ রাখবে, যেন কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। তুমি ফিরে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে আবার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়বে। নিঃশব্দে বন্ধ করে দেবে ফ্ল্যাটের দরজা। তারপর তোমার হাতঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসবে। দেওয়াল-ঘড়ির কাটার ব্যাপারটা আমিই ভাবব, তোমাকে ভাবতে হবে না। এবার তুমি সোফায় বসে আমার জন্যে ওয়েট করবে।

পৌনে পাঁচটার মধ্যেই (অফিস থেকে বাড়িতে আসতে আমার মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না। কারণ, অফিস আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়) আমি ফ্ল্যাটে চলে আসছি। তারপর আমরা দুজনে মিলে প্রাণকান্তর জন্যে ওয়েট করব। আমাদের ফ্ল্যাটে আসার সময় প্রাণকান্তকে যদি কেউ দেখতে পায়, তবে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ, পরে সেই ব্যক্তিই আমাদের ফ্ল্যাটে মৃত প্রাণকান্তকে শনাক্ত করে বলবে, ও সেই আগন্তুক। অর্থাৎ, নকলচাবি নিয়ে হানা দেওয়া রাতের চোর।

আমি থামতেই ইলা আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরল ও ওয়ান্ডারফুল, অমিত, ওয়ান্ডারফুল! ফিশফিশ করে ও বলল, আমাদের কেউ ধরতে পারবে না। প্রাণকান্তর হাত থেকে খুব সহজেই আমরা ফ্রি হয়ে যাব।

কিন্তু এখনও কিছুটা বাকি আছে, ইলা।

অন্ধকারেই ইলা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

পরের কাজগুলোর কথা তোমাকে বলা হয়নি।

কী কাজ?

প্রাণকান্ত পৌনে পাঁচটায় আসার পর আমরা ওকে খুন করব। ওর প্যান্টের পকেটে গুঁজে দেব আমার বানানো সেই নকল চাবিটা (পুলিশ সেই চাবিওলাকে কোনওদিন খুঁজে পাবে না বলেই আমার ধারণা)। ততক্ষণে দেওয়াল-ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা কুড়ি হবে (অর্থাৎ, আসলে ঠিক পাঁচটা)। তখন আমি দেওয়াল ঘড়ির কাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাব ঠিক কুড়ি মিনিট পেছনে। এবং দেওয়াল-ঘড়ির নিয়ম অনুযায়ী, ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার ঢং একই থাকবে। অর্থাৎ, সাড়ে পাঁচটার সময় আবার একটা ঘণ্টাই বাজবেতার বেশি নয়। এবার তুমি আর আমি ফ্ল্যাটের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ব পাঁচটা একুশের ট্রেন ধরার জন্যে।

বুধবার রওনা হয়ে আমরা ফিরে আসব রবিবার। এবং ডেডবডি আবিষ্কার করার জন্যে আমাদের তৈরি থাকবে হবে। স্টেশন থেকে বাড়িতে ফেরার পথে আমি অফিস হয়ে আসব। জানিয়ে আসব আমি কলকাতায় ফিরেছি। আর সেই সুযোগে আমার চেম্বারে গিয়ে দেওয়াল-ঘড়ির কাটা পিছিয়ে সময় শুধরে দেব। তোমাকে আগেই বলেছি, সমর বুধবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ছুটি নিচ্ছে। তাই ও কাজে লাগার আগেই ঘড়ির ব্যাপারটা আমি ঠিক করে ফেলতে চাই।

কিন্তু সমরের ঘড়িটার কী করবে?

সেটা আমি ভেবে রেখেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ইলাকে আশ্বাস দিয়ে বলে চললাম, আমাদের শেষ কাজটা হবে প্রাণকান্তর বডি আবিষ্কার করে পুলিশে খবর দেওয়া। পুলিশ তদন্ত করে জানবে ঠিক পাঁচটার সময় বেরিয়ে পাঁচটা একুশের ট্রেনে আমরা বাইরে গেছি (দরকার পড়লে ট্রেনের পাঞ্চ করা টিকিটগুলোও ওদের দেখাব)। আর আমাদের কথা সাপোর্ট করবে যথাক্রমে সমর এবং মিসেস অরোরা। অর্থাৎ, আমরা দুজনেই হব নিটোল অ্যালিবাইয়ের মালিক। তখন সেই রহস্যময় চোরের ভূমিকা মরা প্রাণকান্তের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে। পুলিশ প্রাণকান্তর পকেটে পাবে সেই নকল চাবি, যা সাবানের ছাপ তুলে কেউ তৈরি করিয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। তখন চাবি পরীক্ষা করে তাতে শুধু প্রাণকান্তরই আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে (পাওয়া যাতে যায়, সে বিষয়ে আমি বিশেষ যত্ন নেব)। অর্থাৎ, ডায়াল এম ফর মার্ডার-এর নায়কের মতো আমি আর চাবির পাচে পা দিচ্ছি না। সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশের কাছে সহজ-সরল বলে মনে হবে। প্রাণকান্তর হাত থেকে আমরা চিরদিনের জন্যে মুক্তি পাব।

কিন্তু কিন্তু প্রাণকান্তকে আমরা খুন করব কেমন করে?–অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল ইলা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলাম, কী করে খুন করব জানি না। তবে ওর মৃত্যুটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে মনে হওয়াটা খুব দরকার। সেই স্টাইলটা জানতে পারলেই আমার কাজ শেষ হবে।

ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। ইলা বলল, তুমি যখন এত বুদ্ধি করে সমস্ত কিছু সভ করতে পেরেছ, তখন ওই খুনের ব্যাপারটা আমিই বুদ্ধি করে বের করতে পারব। আমাকে এত বোকা ভাববেন না, মশাই।

প্রাণকান্তকে কীভাবে খুন করা যায় শুধু সেইটুকু ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোনোর আগে ব্যাপারটা যতই ভাবতে লাগলাম, ততই একটা কনফিডেন্স টের পেতে লাগলাম। মনে হল, পুলিশকে আমি বোকা বানাতে পারবই।

ইলাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সে-রাতের মতো নিশ্চিন্তে আর কোনওদিন ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

.

শুক্রবার দিন ঠিক করা সময়ের কিছু আগেই প্রাণকান্ত এসে হাজির হল। দরজা বন্ধ করে আগের দিনের মতোই সোফায় ওর মুখোমুখি বসলাম। কথাবার্তা শুরু করার আগে প্রাণকান্ত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে ইশারা করল, ইলা নেই তো?

না–নেই।–নির্জলা মিথ্যে বেশ মোলায়েম করে ওকে শুনিয়ে দিলাম। কারণ, শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজার ওপিঠেই কান পেতে অপেক্ষা করছে ইলা। ওর কাছে যখন কিছুই আর অজানা নেই, তখন ওর এই ছেলেমানুষি প্রস্তাবে আর না বলিনি।

তা স্যার, আমার টাকাটা।

এই যে।–পকেট হাতড়ে দুটো দশটাকার নোটের বান্ডিল বের করে ওর হাতে দিলাম।

থ্যাঙ্কস্। হাড়জিরজিরে পাঁচ আঙুলে বান্ডিল দুটো খামচে ধরল প্রাণকান্ত। একবার যেন ওজন করে দেখল টাকাটা। এবং পরমুহূর্তেই বান্ডিল দুটো চালান করে দিল আকাশ-নীল প্যান্টের পকেটে।

মিস্টার সমাদ্দার, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে, ইতস্তত করে বলেই ফেললাম কথাটা, মানে, ভবিষ্যতে আপনার আবার টাকার দরকার হবে কি না সেটা জানা থাকলে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হায়েনা হাসির সঙ্গে-সঙ্গে ওঠবোস করল প্রাণকান্তর প্রকট কণ্ঠা, লাগবে বই-কি!

কত?–স্থির চোখে শকুন সমাদ্দারের দিকে চেয়ে জানতে চাইলাম।

ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে, মিস্টার সান্যাল? প্রয়োজন অনুসারে আমার দাবির পরিমাণও ফ্লাকচুয়েট করবে।

ওসব বাজে কথা রেখে কাজের কথায় আসুন। রুক্ষ স্বরে বললাম, আমি আপনাকে একসঙ্গে একটা মোটা টাকা দিয়ে আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। বিশ হাজার টাকায় কি আপনার আপত্তি আছে?

সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণকান্তর উশখুশ ভাবটা উবে গেল। ঝুঁকে পড়া শিরদাঁড়াটা টান-টান করে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। চেষ্টা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্যে ওর মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমি কি ভুল শুনছি?

না, ঠিকই শুনছেন। অমি সোজাসুজি উত্তর চাই। হ্যাঁ কি না?

অবশ্যই হ্যাঁ। কিন্তু টাকাটা পাচ্ছি কবে?–প্রাণকান্তর স্বর এবার অর্থলালসায় উৎসুক।

আগামী বুধবার বিকেল পৌনে পাঁচটার সময়। তবে মনে রাখবেন, ঠিক পৌনে পাঁচটায়। কারণ আপনার ওই সময়ানুবর্তিতা রচনায় আমিও একবার হায়েস্ট নম্বর পেয়েছিলাম, হেঁ, হেঁ, হেঁ।–প্রাণকান্তকে ব্যঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালাম।

বিদায় দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত। সোফা ছেড়ে চটপট দরজার দিকে পা বাড়াল সমাদ্দার।

দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ইলা। ওর চোখে-মুখে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

কী, প্রথম স্বামীদেবতার মধুর কণ্ঠস্বর শোনার সাধ মিটেছে?

লোকটা…লোকটা একটা পিশাচ!–ঘৃণাভরা স্বরে জবাব দিল ইলা।

নিঃসন্দেহে পিশাচ। কিন্তু মনে রেখো, ইলা, ওকে খুন করার প্ল্যানটা আমরা এখনও ঠিক করতে পারিনি।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ইলা জবাব দিল, কে বলল পারিনি? প্রাণকান্ত সমাদ্দার মারকিউরিক ক্লোরাইডের সলিউশান খেয়ে মারা যাবে।

তার মানে? স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম ইলার দিকে।

হ্যাঁ। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, অমিত, আমরা যে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করি সেটা মারকিউরিক ক্লোরাইড। বাথরুমে বাদামি রঙের বোতলে যে কাচের দানার মতো বস্তুটা রয়েছে, আমি ওটার কথাই বলছি। সেই মারকিউরিক ক্লোরাইড জলে মিশিয়ে আমরা প্রাণকান্তকে খাওয়াব। ব্যস আর দেখতে হবে না–প্রাণকান্ত চিরকালের জন্যে একেবারে কাত হয়ে যাবে।

কিন্তু সেটা তো আর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে না, ইলা।–চিন্তান্বিত স্বরে জবাব দিলাম, অথচ…।

তুমি আমার কথা ঠিক পুরোপুরি বুঝতে পারোনি, অমিত। তুমি বোধহয় জানো না, মারকিউরিক ক্লোরাইড ইঁদুর মারার কাজেও ব্যবহার করা যায়। সুতরাং, বাইরে যাওয়ার আগে ইঁদুর মারার জন্যে আমরা এই টেবিলের (ইশারায় টেবিলটা দেখাল ইলা) ওপর এক গ্লাস জল খোলা রেখে যাব। আর টেবিলের ওপর থাকবে তোমার পুরোনো, নতুন, গোছা-গোছা পাণ্ডুলিপি। আর পাণ্ডুলিপির পাহারায় রেখে যাচ্ছি ওই এক গ্লাস জল। শুনতে ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকছে, তাই না, অমিত? কিন্তু ভেবে দ্যাখো তো, প্রাণকান্ত খুন হওয়ার পর এই ঘরের দৃশ্য ঠিক কীরকম হয়ে উঠবে? পুলিশ এসে দেখবে, তোমার পাণ্ডুলিপির বেশ কিছুটা জলে

ভেজা। টেবিলের কাছে মরে পড়ে আছে প্রাণকান্তর বিকৃত মৃতদেহ। আর তার পাশেই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে একটি কাচের গ্লাস, তার গায়ে শুধুমাত্র প্রাণকান্তরই হাতের ছাপ।

তখন জলটা আমরা কী জন্যে রেখে গিয়েছিলাম, সে-প্রশ্নটা পুলিশের কাছে আর তেমন জরুরি বলে মনে হবে না, তাই না?

ইলার যুক্তি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আনন্দে ওর হাত চেপে ধরলাম ও ইলা, আমরা দুজনে মিলে এই শতাব্দীর মোস্ট পারফেক্ট মার্ডার কমিট করব। অতএব এরপর থেকে সব চলবে প্ল্যানমাফিক। ডান।

ডান, সম্মতি জানিয়ে আমার কাঁধে মাথা রাখল ইলা।

.

বুধবার অফিসে যাওয়ার আগে গত কদিনের ঘটনাগুলো আরও একবার যাচাই করে দেখলাম, আমি ভুল করিনি। সাবানের ছাপ, নকল চাবি থেকে আরম্ভ করে পুলিশে ডায়েরি করা পর্যন্ত সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। পুলিশ এবং আমার বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসই হয়েছে যে, আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল এক অদৃশ্য চোর। কিন্তু আমার ধারণা মতো পুলিশ সরেজমিনে তদন্ত করতে একবারের জন্যেও আসেনি। অর্থাৎ, এত কষ্ট করে সাবানের ছাপ তুলেছি, সেটা ওরা আর দেখল না। অবশ্য এতে চিন্তার কারণ খুব একটা নেই। কারণ, আগামী রবিবার প্রাণকান্তর ডেডবডি আমার ফ্ল্যাটে পাওয়া গেলে, পুলিশ দরজার চাবির ফুটো থেকে শুরু করে প্রাণকান্তর পকেটে পাওয়া নকল চাবি, সবই পরীক্ষা করে দেখবে। তখন প্রমাণগুলো জোরদার হবে।

কিন্তু ইলার ইঁদুর মারার ব্যাপারটা কেমন হালকা ঠেকছে না! পুলিশ কি ওতে ভুলবে? তার চেয়ে পুলিশের কাছে অন্য একটা ব্যাখ্যা দিলে কেমন হয়? যদি বলি, ওই মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো জল ব্যবহার করব বলে ইলা তৈরি করেছিল, কিন্তু পরে ভুলে যাওয়ায় ওই এক গ্লাস বিষাক্ত জল টেবিলেই থেকে গেছে।...যাকগে, ও নিয়ে পরে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত এখনকার কাজ নিয়ে ভাবি।

অফিসের দেওয়াল-ঘড়িতে সোয়া চারটে বাজতেই সোজা হয়ে বসলাম। তাকিয়ে দেখি সমর চৌধুরী সকাল থেকে সেই একইভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে কী যেন লিখছে। না, আর দেরি নয় এখনই কাজ শুরু না করলে বিপদে পড়তে হবে। সুতরাং চট করে কাজের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। বড়-বড় পা ফেলে এগোলাম অ্যাটাচড বাথরুমের দিকে। কাটা ঘুরিয়ে আমার হাতঘড়িটা খুলে রাখলাম বেসিন স্ট্যান্ডে। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে ফিরে এলাম কাজের জায়গায়। রুমাল বের করে হাত মুছতে মুছতে সমরকে লক্ষ করে বললাম, সমর, আমি আজ বিকেল পাঁচটা একুশের ট্রেনে বাইরে যাচ্ছি।

কোথায় অমিতদা?–লেখা থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল সমর।

লিলুয়া সঙ্গে মিসেসও যাচ্ছেন। শুনলাম তুমিও নাকি আজ থেকে কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিচ্ছ?

হ্যাঁ, সোমবার পর্যন্ত। মায়ের শরীরটা ভালো নয়, তাই।

ভূমিকা ছেড়ে এইবার আসল কথায় এলাম।

কী লিখছ সেই সকাল থেকে, দেখি? হাতটা বাড়িয়ে দিলাম সমরের দিকে। ওর হাত থেকে লেখাটা নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ যেন খুব দেরি করে ফেলেছি এমনি ভাব দেখিয়ে বলে উঠলাম, নাঃ, আর দেরি করলে বোধহয় ট্রেন ধরতে পারব না।বলে ক্যাসুয়ালি একবার আমার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম: আরে, কোথায় গেল ঘড়িটা? নীচে ফেলে আসিনি তো। সমর, ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড, প্লিজ, একবার দেখ না, ঘড়িটা আমি সুকান্তর কাছে ফেলে এসেছি কি না?

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল সমর। বেচারা অনেক উন্নতির আশা রাখে, তাই বসকে অখুশি করতে চায় না।

সমর বেরিয়ে যেতেই আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। একলাফে হাজির হলাম দেওয়াল-ঘড়ির সামনে। দেওয়াল-ঘড়িতে তখন চারটে বেজে একুশ মিনিট। সুতরাং কাটা ঘুরিয়ে সাড়ে চারটের জায়গায় নিয়ে গেলাম। ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজতেই মিনিটের কাটাটা এগিয়ে দিলাম ৪-৪৬ মিনিটের জায়গায়। বাথরুমে আমার হাতঘড়ি ফেলে আসার সময় ঘড়ির কাটা পঁচিশ মিনিট এগিয়ে দিয়েছিলাম। অতএব এখন বাকি শুধু সমরের ঘড়িটা।

এবার বাথরুমে গিয়ে ঘড়িটা হাতে পরে বেরিয়ে এলাম। অফিস রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সমরের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট-পাঁচেক পরে দোতলায় সারা অফিস চষে ও ফিরে আসতেই বললাম, তোমাকে শুধু শুধু বিরক্ত করলাম। ঘড়িটা ভুল করে বাথরুমেই ফেলে এসেছিলাম। আমি দরজা আগলে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যাতে সমর ভেতরে ঢুকে দেওয়াল-ঘড়ির সময় না দেখে ফেলে।

ঘড়ির কথা ওঠায় একটা কথা মনে পড়ে গেল, সমর।

সমর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আমার দিকে।

আমাকে একটা ঘড়ি কিনতে হবে, এক রিলেটিভের জন্যে। এই ধরো একশো-সোয়াশোর মধ্যে (সমর আগে একদিন বলেছিল, ওর ঘড়িটার দাম একশো তিরিশ টাকা। ভাগ্যিস কথাটা মনে ছিল)। এখন কী ঘড়ি দিই ভাবছি।

কেন, অ্যাংলো সুইস দিন না।

আচ্ছা দেখি, তোমার হাতটা দেখি।–বলতে-বলতে সমরের ঘড়িসুদ্ধ বাঁ-হাত টেনে নিলাম আমার বুকের কাছে। আমার বুড়ো আঙুলের ডগা এমন নিখুঁতভাবে ওর হাতঘড়ির ডায়াল ঢেকে রইল যে, সমরের পক্ষে তখন সময় দেখা সম্ভব হল না।

তোমার ঘড়িটা কী ঘড়ি?–এবং এবার কথা শেষ হতে না হতেই সমরের হাতঘড়ি আমি খুলে নিয়েছি, নিয়ে ডায়ালটা আমার দিকে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করেছি।

অ্যাংলো সুইস।–আমার ব্যবহারে একটু অবাক হলেও সমর নির্বিকার।

তা হলে এইরকম একটা ঘড়িই কিনে দেওয়া যেতে পারে।–ঘড়িটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললাম, কত দাম তোমার ঘড়িটার? দেড়শোর বেশি হলে আমার পক্ষে…।

না না, ওটার দাম মাত্র একশো তিরিশ টাকা।

সমরের কথা শেষ হতে না হতেই ওর হাতঘড়িটা আমার আঙুলের আওতা ছাড়িয়ে (অথচ আমি জানি, কতখানি কুশলী হলে সমরের চোখের সামনে ওইরকম কায়দা করে ঘড়িটাকে মেঝেতে ফেলা যায়!) মেঝেতে ছিটকে পড়ল, এবং অনিবার্যভাবেই ঘড়ির ডায়ালের কাচ তখন ভেঙে গেছে।

সমর অস্বস্তিভরে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সমর, এক্সট্রিমলি সরি। রোববার দিন আমি ফিরছি। কথা দিচ্ছি, তোমার ঘড়িটা মেরামত করিয়ে সোমবার দিনই তোমাকে দিয়ে দেব। বলে অচল ঘড়িটা নির্বিবাদে পকেটে ভরে ফেললাম।

না, না, অমিতদা, তার কোনও দরকার নেই। আমিই ওটা সারিয়ে নেবখন। সমর ইতস্তত করে বলে উঠল।

কিন্তু ও কী করে জানবে আমার মনের কথা। সুতরাং ওর সদিচ্ছায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে বললাম, আমি যদি ঘড়িটা সারিয়ে দিই, তবে কি তোমার আপত্তি আছে, সমর? আফটার অল দোষটা যখন আমারই।

সমর নিশ্চপ। বস বলে কথা।

যাও, লেখাটা শেষ করে ফ্যালো গিয়ে বেশ জমেছে। আমি এখন হাতের কাজটা সেরে নিই। ওদিকে তোমার বউদির সঙ্গে একেবারে স্টেশনে গিয়ে দেখা করতে হবে। টিকিট অবশ্য আগেই কাটা আছে।বলতে-বলতে সমরের লেখাটা ফেরত দিলাম। তারপর ধীরেসুস্থে আমার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

যাক, ঘড়ির ব্যাপারটা অনেক কষ্টে কায়দা করা গেছে। ওদিকে ইলা কী করছে কে জানে। ওকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে সময় চুরির পরিকল্পনাটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। এরপর ও যদি ঠিকমতো মিসেস অরোরাকে বোকা বানাতে না পারে, তো সমস্ত কিছুই ওলটপালট হয়ে যাবে।

লেখা নিয়ে ব্যস্ত সমরের দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে যেন ইলার গতিবিধি আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

.

আসল সময় অনুযায়ী ঠিক পাঁচটা বাজতে চব্বিশ মিনিটের সময় ইলা সান্যাল ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে এল। কিন্তু ওর হাতঘড়ি, এবং ঘরের দেওয়াল-ঘড়ি দুটোতেই পাঁচটা বাজতে এক মিনিট। অর্থাৎ ওর স্বামীর কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছে ইলা। বাইরে বেরিয়ে ও দরজা ভেজিয়ে দিল, কিন্তু সামান্য ফাঁক রেখে দিল। চারপাশে একবার তাকাল। তারপর টুক করে করিডরের কার্পেট মোড়া প্রস্থটুকু নিঃশব্দে পার হয়ে অরোরাদের দরজায় আস্তে নক করেই নিজের জায়গায় আবার ফিরে এল, ঝুঁকে পড়ল দরজায় কাছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি চাবি বের করে লকের ভেতর গলিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে খটাং-খটাং শব্দ করতে লাগল।

ঠিক এইসময় ইলার পিছনে অরোরাদের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল, ভেসে এল ভরাট গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ, আপনি কি দরজায় নক করেছিলেন?

ভীষণভাবে চমকে উঠল ইলা। মিসেস অরোরার গলা তো এত গম্ভীর নয়! দরজায় চাবি ঘুরিয়ে চাবি ভ্যানিটি ব্যাগে ভরল ইলা।

ততক্ষণে আরও একবার আপনিই কি একটু আগে নক করছিলেন? জিগ্যেস করা হয়ে গেছে।

এবার দুরুদুরু বুকে ঘুরে দাঁড়াল ইলা: কই, ন্-না, না তো!

তা হলে আমারই বোধহয় শুনতে ভুল হয়েছে। মিস্টার অরোরা দরজা বন্ধ করতে যেতেই বেপরোয়া হয়ে ইলা বলে উঠল, শুশুনছেন!

(ইস, এভাবে যে হুমদো বুড়োটা বেরিয়ে আসবে কে জানত! অমিত বলেছিল, মিস্টার অরোরা রাত বারোটার আগে ফেরেন না। কিন্তু…)

কী?–অরোরার ভুরু ঊর্ধ্বমুখী হল।

মিসেস অরোরা আছেন? ওঁর সঙ্গে একটু কথা ছিল। ইতস্তত করে বলল ইলা।

কী দরকার আমাকেই বলুন না।–আলাপের আগ্রহের সুরে বললেন অরোরা। এমনিতে মহিলাদের সঙ্গে আলাপে ওঁর কোনও আপত্তি নেই, বরং ভালোই লাগে। আর এখন ইলাকে দেখে ওঁর মনে হচ্ছে, আ বিউটি ইন ডিসট্রেস। মরিয়া হয়ে

ইলা মিসেস-এর পরিবর্তে মিস্টারের সঙ্গে ই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছক বাঁধা কথা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

আপনি বোধহয় শুনেছেন, লাস্ট সানডে আমাদের ফ্ল্যাটে চোর এসেছিল?

হ্যাঁ, ভারী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ। বলছিলাম, আজ পাঁচটা একুশের ট্রেনে আমি আর উনি বাইরে যাচ্ছি। এ কটা দিন সুযোগ-সুবিধে মতো যদি আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে একটু নজর রাখেন, তা হলে বড় উপকার হয়।

কেন, দরজায় তালা দেননি বুঝি?অরোরার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

(এই রে! গবেটটা লক্ষই করেনি কত কায়দা করে আমি দরজায় তালা দিলাম। নাকি ব্যাটা নকল চাবির কথা জানে না?)

হ্যাঁ, দরজায় চাবি দিয়েছি। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, চোর নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকেছিল, তাই।

তা হলে এক কাজ করুন না, আমি কড়া আর শেকল দিয়ে দিচ্ছি–ছুতোরমিস্তিরি ডাকিয়ে শেকলটা লাগিয়ে নিন, আর তাতে একটা তালা লাগিয়ে দিন।অরোরা ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোতে গেল। সম্ভবত শেকল আর কড়া আনার জন্যে। আর ঠিক তখনই ইলা দেখতে পেল অরোরার হাতে কোনও ঘড়ি নেই।

ও নিশ্চিন্ত হয়ে অরোরাকে বাধা দিল, না, না, আপনার কষ্ট করার দরকার নেই। বাইরের ঘরে আমরা তেমন কিছু রেখে যাইনি। তা ছাড়া এখন তো আর সময়ও নেই। পাঁচটা বাজে। বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল ইলা। আর একইসঙ্গে বন্ধ দরজার ওপিঠ থেকে ওদের দেওয়াল-ঘড়ির চাপা ঢং-ঢং শব্দ ভেসে এল।

অনেকটা স্বস্তি পেল ইলা। বলল, ওই পাঁচটা বাজল। আর দেরি হলে ট্রেন ফেল করব। তা ছাড়া উনি স্টেশানে ওয়েট করছেন।

তা হলে এক কাজ করুন। আমাদের যে-বাচ্চা চাকরটা আছে, ওটাকে বলে দিই, এ কটা দিন আপনাদের ফ্ল্যাটেই ও রাত কাটাক। চোর-টোরের ভয় তা হলে

আর থাকবে না।

(ড্যাম য়ু) না, না, শুধু-শুধু একটা বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? আপনি একটু নজর রাখলেই হবে। থ্যাংক য়ু।

অরোরার দিকে চেয়ে একটুকরো মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিল ইলা। তারপর হনহন করে এগিয়ে গিয়ে লিফটে উঠল।

ইলার পিছনটা জরিপ করতে করতে ফ্যান্টাবুলাস! বলে শিস দিয়ে উঠলেন অরোরা। তারপর দরজা বন্ধ করে, নিজের দজ্জাল বউকে বিয়ে করে যে কী ভুল করেছেন সে কথা ভাবতে ভাবতে ডিক্যান্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

.

সকলের চোখ এড়িয়ে নিজের ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছোলাম, তখন পাঁচটা বেজে ন মিনিট (অর্থাৎ, আসল সময় পাঁচটা বাজতে চোদ্দো মিনিট)। দরজা ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দেখি ঘরের সোফায় ইলা বসে রয়েছে। আমাকে দেখেই ও ঘাড় হেলিয়ে জানাল সবকিছুই ঠিক আছে। তার মানে, পরিকল্পনার কোথাও কোনও চেঞ্জ হয়নি।

মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো জলের গ্লাসটা কোথায়?–চাপা গলায় ওকে প্রশ্ন করলাম।

রান্নাঘরে।–আস্তে জবাব দিল ইলা। ।

ঠিক এইসময় দরজায় সামান্য শব্দ হতেই আমি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ম্যাজিক আই দিয়ে তাকিয়ে দেখি, বাইরে নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রাণকান্ত সমাদ্দার। অতএব সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে ওকে ভেতরে টেনে নিলাম। তারপর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। প্রাণকান্ত সোফায় এসে বসতেই আমি তিরিশটা দশটাকার বান্ডিল টেবিলের ওপর অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিলাম। প্রাণকান্ত স্থির লোভাতুর চোখ মেলে নোটের বান্ডিলগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

আমি এইবার আসল কথাটা উচ্চারণ করলাম, মিস্টার সমাদ্দার, মোট তিরিশহাজার আছে, দশহাজার টাকা বোনাস। আমাদের আপনি মুক্তি দিন।

প্রাণকান্ত কাঠ হয়ে বসেই রইল। লম্বা জিভটা বের করে শুকনো ঠোঁটে একবার বুলিয়ে নিল।

ইলা, মিস্টার সমাদ্দারের বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে।

ইলা বুঝল আমার ইঙ্গিত। ও চট করে রান্নাঘরে চলে গেল।

একটু পরে ও যখন জলভরা গ্লাসটা এনে সমাদ্দারের সামনে ধরল, সমাদ্দার স্বপ্নচ্ছন্নের মতো যান্ত্রিকভাবে গ্লাসটা নিয়ে পুরো জলটাই খেয়ে নিল। ওর স্বচ্ছ দৃষ্টি তখনও ওই টাকার স্তূপের দিকে।

বিপর্যয় ঘটল কয়েকসেকেন্ড পরেই।

প্রাণকান্ত মেঝেতে উলটে পড়ল। তারপর শুরু হল ওর ছটফটানি। দু-হাতে গলা খামচে ধরে সমাদ্দারের দেহটা ওলটপালট খেতে লাগল।

সেই মুহূর্তে শুরু হল আমার আর ইলার কাজ।

এক : দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা ঠিক করলাম।

দুই : নোটের বান্ডিলগুলো আবার সিন্দুকে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তিন : ইলা রান্নাঘর থেকে আরও কিছুটা মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো জল নিয়ে এসে টেবিলে রাখা আমার কয়েকটি পাণ্ডুলিপির ওপর সেই জল ছিটিয়ে দিয়ে বাকি জল টেবিলে ঢেলে দিল।

চারঃ প্রাণকান্তর জল খাওয়া গ্লাসটা রুমালে ধরে টেবিল থেকে তুলে মেঝেয় ফেলে দিলাম। গ্লাসটি সশব্দে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

প্রাণকান্তর অবস্থা তখন ভয়ংকর। দু-হাতে ও হাওয়া আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। দেহটা ক্ষণে-ক্ষণেই খিচুনি মেরে কেঁপে উঠছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সাদা গাজলা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বিষাক্ত প্রাণকান্তকে রেখে আমি আর ইলা চটপট ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম (তার আগেই নকল চাবিটা প্রাণকান্তর পকেটে গুঁজে

দিয়েছি)। দরজায় চাবি দিয়ে সকলের চোখ এড়িয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সিঁড়ির দিকে।

আমার উত্তেজিত হৃৎপিণ্ড তখন আতঙ্কে ধুকপুক করছে। উত্তেজনা কমানোর জন্যে পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে মুখে পুরে দিলাম। নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। বেশি বয়েসে এত ঝক্কি পোয়ানো বোধহয় ঠিক হয়নি। সামনের রোববারের কথা ভেবে নাড়িভুড়ি যেন উলটে এল। নাঃ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণকান্তর বরফশীল বিকৃত মৃতদেহটা আমাদেরই আবিষ্কার করতে হবে।

ইলার দিকে একবার তাকালাম। ও কী ভাবছে, কে জানে! কিন্তু ওর মুখে আতঙ্কের লেশমাত্র ছায়াও কাঁপতে দেখলাম না।

*

রবিবার দিন অফিসের দেওয়াল-ঘড়ির সময় শুধরে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছলাম, হাতঘড়িতে (এখন ঘড়ি ঠিক সময় দেখাচ্ছে) তখন রাত আটটা। অফিসে গিয়ে সমর ফেরেনি দেখে আরও নিশ্চিন্ত হয়েছি। কারণ, আমার চেম্বারের দুটো চাবির একটা থাকে আমার কাছে, আর অন্যটি থাকে সমরের কাছে। সুতরাং ঘড়ির কারসাজি যে কেউ ধরে ফেলেছে এমন সম্ভাবনা নেই।

লিফটে উঠতে-উঠতে পাশে দাঁড়ানো ইলার দিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য! ওর এতটুকু ভয়ডর নেই? সুখের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে ওর চোখে-মুখে।

ইলা, দরজা কি আমিই খুলব?–ওকে জিগ্যেস করলাম। মনে ক্ষীণ আশা, যদি ও দরজা খুলতে রাজি হয়।

কেন, তোমার কি ভয় করছে?ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল ইলা।

এ কোন নতুন ইলা? একটু অবাক হলাম।

যতই লিফট উঠছে দুদ্দাড় করে বেতালা ছুটে চলেছে হৃৎপিণ্ড। কখনও কি থামবে না এর অশান্ত গতি? নাকি ট্যাবলেট খেয়ে নেব একটা?

লিফট থামতে দুজনে করিডরে পা রাখলাম। পকেট হাতড়ে ফ্ল্যাটের চাবি বের করে বাগিয়ে ধরলাম। করিডরের আলো সোজা গিয়ে পড়েছে আমাদের ফ্ল্যাটের

দরজায়।

চাবি ঢোকাতে গিয়ে অবাধ্য ডানহাত বারকয়েক কেঁপে গেল। আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ইলা। দরজায় ওর ছায়া এসে পড়েছে।

কী হল, খোলো?–পেছন থেকে ইলার অধৈর্য স্বর ভেসে এল। কোনওরকমে চাবি ঘোরালাম। খট করে লকটা সরে গেল।

হাতের চাপে ধীরে-ধীরে খুলতে শুরু করল সেগুন কাঠের বার্নিশ করা দরজা।

ভেতরটা কালো অন্ধকার।

দরজা যতই খুলছে, করিডরের আলোর ফলা ততই চওড়া হচ্ছে ঘরের ভেতরে।

দরজা পুরোটা খুলতেই যে-দৃশ্য দেখলাম তাতে..।

অন্ধকার ঘরের আলোছায়ায় পড়ে রয়েছে প্রাণকান্ত। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে ওর দেহটা। দু-চোখ বিস্ফারিত। ধীরে-ধীরে ও উঠে দাঁড়াল। দু-হাতের দশ আঙুল শকুনের নখের মতো বাঁকিয়ে ঘৃণাভরে কুটিল চোখ নিয়ে টলতে টলতে ও এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। নিষ্ফল আক্রোশে হাওয়া আঁকড়ে ধরছে ওর হাত। জীবন্ত শীতল মৃতদেহের মতো অনিশ্চিত পদক্ষেপে ও এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে রক্তপিপাসায়। কাছে আরও কাছে…।

বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। লাফিয়ে উঠল গলা দিয়ে। মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছেয় শেষবারের মতো উন্মাদ হয়ে এসে আঘাত করল টাকরায়।

সেই মুহূর্তে পেছন থেকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল কেউ। হুমড়ি খেয়ে ছিটকে গেলাম প্রাণকান্তর আওতায়। ওর বাঁকানো নখসুদ্ধ দশ আঙুল আঁকড়ে ধরল আমার গলা…।

পুরো ব্যাপারটার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ভেবে ওঠার আগেই আমার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে ছিটকে পড়ল। তারপর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে।

অন্ধকার ঘরের ভেতর অমিত সান্যালের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়তেই ইলা ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিল। তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রাণকান্তর প্রসারিত হাতের বাঁধনে ধরা দিল ও বিজন–বিজন!

ইলার মাথায় হাত বুলিয়ে বিজন বলল, ভয় পেয়ো না, ইলু সোনা। আমরা দুজনে মিলে এইমাত্র এই শতাব্দীর নিখুঁততম খুন এক্সিকিউট করেছি। ডাক্তার অমিত সান্যালকে হার্ট ফেলিয়োর কেস বলেই রায় দেবে, তাই না?

ইলা বিজনের বুক থেকে মুখ তুলল : তুমি এখন চলে যাও, নয়তো বিপদে পড়বে। আমি এদিকে ডাক্তার ডেকে ব্যাপারটার একটা শেষ ফয়সালা করে ফেলি।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। বলে বিজন সোফায় বসল । এই তিনদিন একটা বন্ধ ফ্ল্যাটে কাটাতে আমার ভীষণ বোর লেগেছে। অবশ্য তুমি যে রান্নাঘরে খাবারের স্টক রেখে যাবে, সেটা জানতাম।

ইলা হাসলঃ জানো, যখন তুমি শুধু জল খেয়ে পড়ে গিয়ে অভিনয় করতে শুরু করলে, তখন অমিত ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তা তো পাবেই। তবে আমি একটু ওভারঅ্যাকটিং করে ফেলেছি।

বিজন সেন এবার ওর পকেট থেকে একটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট বার করে ইলার দিকে এগিয়ে দিল । এই নাও, তোমার হতভাগা প্রথম স্বামীর কাগজখানা ফেরত নাও। কে জানত ছবছর আগে যে-প্রাণকান্ত সমাদ্দার মারা গেছে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ের কাগজখানা এতদিন পরে হঠাৎ কাজে লাগবে। তবে ইলা, আমাদের একসঙ্গে তোলা এই ফটোখানা কিন্তু আমি ফেরত দিচ্ছি না। বলে বিজন সেটা ইলাকে দেখাল।

রেখে দাও, কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু ওই ফটোটাকে প্রাণকান্ত আর আমার বলে চালাতে কে শিখিয়ে দিয়েছিল, স্যার?

হেসে ইলাকে কাছে টেনে নিল বিজন। ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, অমিত সান্যাল একটি গর্দভ। তোমার নতুন প্রেমিকের খোঁজ ও রাখেনি।

# অর্ধেক পুরুষ (নভেলেট)

**অর্ধেক পুরুষ (নভেলেট)**

সুপ্রতিম একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর মন বলছিল, ফোনটা আসবে। যদিও স্টুডিয়োতে লাইন পাওয়া বেশ ঝকমারি, তবুও ওর মনে হচ্ছিল সেই মেয়েটি যেরকম নাছোড়বান্দা তাতে লাইন ও পাবেই।

সন্ধে ছটা থেকে সাড়ে ছটা–এই আধঘণ্টা ধরে সাইবার চ্যানেল-এর মুশকিল আসান অনুষ্ঠান টিভিতে দেখানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সুপ্রতিম আর ওর অনুষ্ঠান-সঙ্গিনী মোনা। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। মাত্র চারমাসেই মুশকিল আসান সকলের মন কেড়ে নিয়েছে।

দর্শকরা নানান প্রশ্ন পাঠান সুপ্রতিমদের কাছে। সুপ্রতিম আর মোনা পালা করে সেসবের উত্তর দেয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠান চলার সময় বহু ফোনও আসে ওদের স্টুডিয়োতে। কেউ-কেউ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন, আর কেউ-বা নিজের কোনও সমস্যা তুলে ধরেন ওদের কাছে।

চিঠিপত্রের উত্তরগুলো সাইবার চ্যানেল-এর অফিসে কয়েকজন বসে ঠিক করেন। সেখানে সুপ্রতিম আর মোনাও থাকে। তবে টেলিফোনে পাওয়া সমস্যাগুলোর সমাধান সুপ্রতিম বা মোনাকেই চটজলদি করে সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হয়। এর জন্য যে-বুদ্ধি এবং স্মার্টনেস দরকার, সেটা সুপ্রতিম আর মোনা দুজনেরই আছে।

সুপ্রতিমের চেহারা বেশ সুন্দর। ওর সৌন্দর্যে কীরকম যেন একটা বনেদি ঢং আছে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। ফরসা। স্বাস্থ্য মাঝারি। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ

করা। দাড়ি সুন্দর করে কামানো হলেও ফরসা গালে, থুতনিতে, নীলচে আভা থেকে গেছে। ঠোঁটের ওপরে গোঁফ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। বয়েস পঁয়তিরিশ হলেও অনেক কম দেখায়।

সুপ্রতিম যত না সুন্দর তার চেয়েও অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারে। ওকে ঘিরে অনেক দর্শকেরই কৌতূহল–বিশেষ করে মেয়েদের। অনেকেই ওকে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি দেয়। আবার কেউ-কেউ ওকে নানান ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চায়। সেইসব প্রশ্নের পাশকাটানো মজার উত্তর দেয় সুপ্রতিম।

ওর ডান ভুরুর ওপরে একটা কাটা দাগ আছে। সেটা নিয়ে এক তরুণী জিগ্যেস করেছিল, আপনার ডান ভুরুর ওপরে ওই লাভলি কাটা দাগটা হল কেমন করে?

সুপ্রতিম জবাব দিয়েছিল, ছোটবেলায় এভারেস্ট থেকে পড়ে গিয়ে।

একজন কিশোরী চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, আপনার নামটা দারুণ। ভীষণ এক্সাইটিং।

জবাবে সুপ্রতিম বলেছিল, মোটেই তা নয়। সুপ্রতিম মানে হচ্ছে ভালোর মতো কিন্তু পুরোপুরি ভালো নয়।

একজন পুরুষের কৌতূহল : আপনি কি বিয়ে করেছেন?

সুপ্রতিমের উত্তরঃ করিনি বললে আমার ছজন ওয়াইফ রেগে আগুন হয়ে যাবেন। আর বিয়ে করেছি বললে অনেক দর্শক দুঃখ পাবেন। তাই এই সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।

আসল ঘটনা হল সুপ্রতিম বিয়ে করেছে। স্ত্রী নয়নার সঙ্গে ওর পরিচয় সাত বছরের। তার মধ্যে প্রথম তিনবছর ওর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে, আর বাকি চারবছর চুটিয়ে সংসার করেছে। এখনও করছে। সুপ্রতিম যা কিছুই করে, সবসময় চুটিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে নয়নার সঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশ ঝামেলাও হয়।

নয়না দেখতে বেশ সুশ্রী, মিষ্টি মেয়ে। তবে সুপ্রতিমের চেহারার পাশে নিজের চেহারা নিয়ে সবসময় ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। সুযোগ পেলেই ওই

প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে। সুপ্রতিম রোজ যখন অফিসে রওনা হয়, নয়না তখন আকুল চোখে স্বামীকে দ্যাখে।

সুপ্রতিম অবাক হয়ে বলে, কী ব্যাপার। এমনভাবে তাকিয়ে আছ যেন এই প্রথম চার চোখের মিলন হল!

নয়না ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় ওর দিকে, বলে, ইচ্ছে করছে, থুতু ছিটিয়ে কানের লতিতে কুট করে কামড়ে দিই।

সুপ্রতিম ওর দিকে বাঁকান এগিয়ে দিয়ে বলে, এই নাও, তাই দাও। পারলে কপালের পাশে একটা কাজলের টিপও বসিয়ে দাও।

নয়না ওর কানটা কষে মুলে দিয়ে বলে, সাবধান! কারও দিকে বেশিক্ষণ তাকাবে না। কেউ যেন নজর না দেয়। তা হলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।

টিভির মধ্যে দিয়ে কারও দিকে তাকানো যায়। তবে মোনা তো পাশে থাকে, ওর দিকে না তাকিয়ে উপায় নেই...।

মোনা খুব ভালো মেয়ে। বরং তোমাকেই বিশ্বাস নেই।

মোনার সঙ্গে নয়নার পরিচয় আছে। মোনা অনেকবার সুপ্রতিমের বাড়িতে এসেছে। দরকারে অদরকারে প্রায়ই ফোন করে। নয়না ওকে খুব পছন্দও করে।

মোনা এলাহাবাদের চৌকশ মেয়ে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। সুন্দর, স্মার্ট। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুলে সামান্য লালচে ভাব। টানা-টানা চোখ। শুধু ওর বাংলায় সামান্য টান আছে।

ও সুপ্রতিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। ওর কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তেই শেখার চেষ্টা করে। কথায় কথায় বলে, সুপ্রতিমদা, য়ু আর সিম্পলি লা-জবাব। আপনি সাইবার চ্যানেল-এর অ্যাসেট।

মুশকিল আসান অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সুপ্রতিমের দারুণ লাগে। অনুষ্ঠানের কিছুটা অংশ আগে রেকর্ড করা হয়। আর খানিকটা লাইভ। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য নামীদামি ডাক্তার উকিল-জ্যোতিষী ইত্যাদি নানান পেশার মানুষ পালা করে এই অনুষ্ঠানে আসেন। অনেক সময়

বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদেরও নিয়ে আসা হয় বিশেষ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। তবে সবশেষে থাকে মজাদার প্রশ্ন-উত্তরের পালা। তখন সুপ্রতিম আর মোনা যেন আরও স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে মুশকিল আসান একেবারে সুপারহিট।

দিনকুড়ি আগে একটা খাম এসে পৌঁছোয় সুপ্রতিমদের দপ্তরে। খাম খুলেই সুপ্রতিম দ্যাখে ভেতরে একটা টাটকা লাল গোলাপ, আর একটা চিঠি। খামের ওপরে কোনও ডাকটিকিট ছিল না। বোধহয় কেউ কুরিয়ারে পাঠিয়েছে।

চিঠিটা পড়েই সুপ্রতিমের কেমন অস্বস্তি হল।

প্রিয় সুপ্রতিম,

তোমার অনুষ্ঠান আমি সবসময় দেখি। খুব ভালো লাগে। তবে তার চেয়েও ভালো লাগে তোমাকে। শুধু তোমাকে দেখার জন্যেই অনুষ্ঠানটা প্রাণভরে দেখতে হয়। অনুষ্ঠানগুলো আমি সবসময় ভিডিয়ো ক্যাসেটে ধরে রাখি। তারপর যখনই মনখারাপ লাগে, তখনই ওগুলো চালিয়ে তোমাকে দেখি। তোমার সব সুন্দর নাক, মুখ, চোখ, এমনকী ভুরুর কাটা দাগটাও জানো, তোমার ওই কাটা দাগটা নকল করে আমি আমার বুকের বাঁ-দিকে একটা কাটা দাগ এঁকেছি। তোমার প্রতিটি অঙ্গের জন্যে আমার প্রতিটি অঙ্গ সবসময় কাঁদে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্তু অনুষ্ঠান চলার সময় কিছুতেই স্টুডিয়োর ফোনের লাইন পাই না। তাই বলে চেষ্টা ছাড়িনি। আবার চিঠি দেব। সঙ্গে যে-গোলাপটা পাঠালাম, সেটার কথা টিভিতে বলবে তো! বললে বুঝব আমার ভালোবাসা তুমি ফিরিয়ে দাওনি।

অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো–<br>
ঝুমুর চৌধুরী<br>
কলকাতা ১৪

সাইবার চ্যানেল-এর দপ্তরে প্রচুর প্রেমপত্র আসে। তাতে মোনার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করতে চাওয়া চিঠিই বেশি, সুপ্রতিমের কম। মোনাকে বিয়ে করতে চেয়েও বেশ কয়েকজন সুপাত্রের চিঠি এসেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ওরা কেউই তেমন একটা মাথা ঘামায়নি। কারণ, এ-ধরনের স্পন্সরড প্রোগ্রামে এসব উৎপাত

নেহাতই মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এই চিঠিটা যেন ঠিক মামুলি নয়। কেমন যেন একটু অন্যরকম।

মোনা চিঠিটা নিয়ে সুপ্রতিমের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে পিছনে লেগেছিল। কিন্তু সুপ্রতিম পুরোপুরি সহজ হতে পারেনি। দু-একদিন চিন্তা করার পর ও মোনার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিঠিটার একটা নির্দোষ উত্তর দিয়ে দেবে।

সাধারণত অফিসের সমস্যা বাড়িতে খুব একটা আলোচনা করে না সুপ্রতিম। কিন্তু ঝুমুর চৌধুরির চিঠিটার কথা বলল।

নয়না সেটাকে কোনও গুরুত্বই দিল না। বলল, ওর আর কী দোষ বলো! টিভিতে অমন হেসে-হেসে সুন্দর-সুন্দর করে কথা বলবে, আর প্রেমপত্র আসবে না–এ তো হতে পারে না! তুমি বরং বেচারিকে একটা সান্ত্বনাপত্র লিখে দিয়ো। আর শোনো, তোমাকে একটা গুড নিউজ দেব। আমি একটা বই লিখতে শুরু করেছি। নাম দিয়েছি সুন্দর সোয়ামীর সমস্যা।

ঠাট্টা কোরো না নয়না। কপালে ভাঁজ ফেলে বলেছে সুপ্রতিম, চিঠিটার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে।

নয়না একটা হাতব্যাগে সুতোর নকশা বুনছিল, সিরিয়াস হয়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। খামের মধ্যে ফুল পাঠানো, ভুরুর ওই কাটা দাগ নকল করা…। তুমি বরং একটা মামুলি উত্তর দিয়ে দিয়ো। উত্তর না দিলে আবার যদি কিছু হয়…।

পরের মুশকিল আসান অনুষ্ঠানে উত্তর দিয়েছিল সুপ্রতিম।

কলকাতা চোদ্দো থেকে গোলাপফুল পাঠিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবাসা জানিয়েছেন ঝুমুর চৌধুরী। তাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আর আপনারা, যারা এখন এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের জানাই–আপনারা যত খুশি প্রেমপত্র পাঠান, তবে মনে রাখবেন, সেগুলো যেন শুধু এই অনুষ্ঠানের নামেই হয়। আমার বা মোনার নামে নয়। কারণ, আমাদের জীবনে প্রচুর প্রেম আছে। আর বাড়তি প্রেম আমরা চাই না। হেসে মোনার দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম জিগ্যেস করেছে,

কী বলো, মোনা?

ঠিকই বলেছেন, সুপ্রতিমদা–এই অনুষ্ঠানকে আমরা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই। আমরা চাই, এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক আপনাদের আরও-আরও প্রিয়।

এই উত্তর ঝুমুর চৌধুরীকে যে খুশি করতে পারেনি, বরং ব্যথা দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল ওর পরের চিঠিতে।

প্রিয় সুপ্রতিম,

কিছু দিতেই যদি চাও, তা হলে দুঃখ দাও কেন! তোমার এড়িয়ে যাওয়া উত্তরে খুব দুঃখ পেয়েছি আমি। সারাদিন, সারারাত শুয়ে-শুয়ে কেঁদেছি। তোমার অনুষ্ঠানকে ভালোবেসে আমি গোলাপ পাঠাইনি, তোমাকে ভালোবেসে পাঠিয়েছি। তুমি বলেছ তোমার জীবনে প্রচুর প্রেম আছে, বাড়তি প্রেম তুমি চাও না। তোমার মতো সুপুরুষ দেবতাকে অনেকেই যে ভালোবাসবে, সে তো স্বাভাবিক। তাই এ কথায় দুঃখ পাইনি। তবে তুমি জেনে রাখো, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। আমার বুকের কাটা দাগটায় আমি যখন আঙুল বোলাই তখন বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। মনে হয় আমি তোমার ভুরুতে আলতো করে আঙুলের ছোঁওয়া এঁকে দিচ্ছি। তোমাদের স্টুডিয়োর লাইনটা কবে পাব বলতে পারো। সবসময় খালি এনগেজড। ভাবছি, এবার থেকে বাড়ির ফোনেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করব। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তোমার নাম্বারটা পাব তো! বাড়িতে ফোন করলে তুমি কি রাগ করবে? আমি জানি, তুমি রাগ করবে না বরং খুশিই হবে। তারপর.একদিন..যখন আমাদের দেখা হবে…ওঃ! আমি আর ভাবতে পারছি না। বিশ্বাস করো সুপ্রতিম, তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না–তুমিও না। আজ শেষ করছি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো–

তোমার, শুধু তোমার
ঝুমুর

চিঠিটা পড়ার পর সুপ্রতিম কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে বসে রইল। ঝুমুরকে ঘিরে এলোমেলো চিন্তা ছুটোছুটি করতে লাগল ওর মাথার ভেতরে। মেয়েটি কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে নাছোড়বান্দা। তা ছাড়া চিঠির কোনও-কোনও জায়গায় কি পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছে? নইলে সুস্থ কোনও মেয়ে হলে

প্রথম চিঠির এড়িয়ে যাওয়া উত্তরেই তো সব বুঝতে পারত, আর তার ভালোবাসার অসুখটাও সেরে যেত।

ঝুমুর বাড়িতে ফোন করতে পারে ভেবে সুপ্রতিম একটু ভয়ও পেল। যদি ও সত্যি পাগল এবং নাছোড়বান্দা হয় তা হলে তো ফোন করে করে জ্বালিয়ে মারবে! তখন হয়তো পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আর পুলিশে খবর দিলেই তো যত ঝামেলা! বাজে পাবলিসিটি!

আচ্ছা, ও যদি টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সুপ্রতিমের ঠিকানা জেনে বাড়িতে এসে হাজির হয়! তা হলে তো আবার সেই থানা-পুলিশ!

প্রায় দু-দিন নানান দুশ্চিন্তার পর সুপ্রতিমের আশঙ্কা ধীরে-ধীরে কেটে গিয়েছিল। ও নয়নাকে বলে রাখল ঝুমুর চৌধুরী নামের কেউ ফোন করলে নয়না যেন বলে দেয় রং নাম্বার।

পরের দু-দিনে তিনবার ঝুমুরের ফোন এল। রং নাম্বার বলে ওকে কাটাতে পারেনি নয়না। তার মধ্যে দুবার সুপ্রতিম সত্যিই বাড়ি ছিল না। আর একবার নয়না আড়চোখে সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে ফোনে বলে দিল, উনি তো এখন বাড়ি নেই।

কখন ওঁকে পাওয়া যাবে বলুন তো?

ওঁর তো ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা মতন হবে। আপনি বরং প্রোগ্রাম চলার সময় স্টুডিয়োতে ট্রাই করে দেখুন।

ঠিক আছে। স্টুডিয়োতেই ট্রাই করব। রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল ঝুমুর।

নয়না সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, মেয়েটার গলাটা যেন পিকিউলিয়ার।

পিকিউলিয়ার মানে? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছে সুপ্রতিম।

কেমন যেন আদুরে, খসখসে।

হো-হো করে হেসে উঠেছে সুপ্রতিম। হাসতে হাসতে বলেছে, আদুরে! খসখসে! মাই গুডনেস। কী বিচিত্র অ্যাডজেটিভ! তুমি সেলাই ছেড়ে সাহিত্য করলে

পারতে।

একটু পরে হাসি থামিয়ে সুপ্রতিম সিরিয়াস ঢঙে জানতে চাইল, অ্যাই, মেয়েটার বয়েস কীরকম হবে বলো তো? আঠেরো-উনিশ? নাকি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ?

ঠিক বোঝা গেল না। সাতাশ-আটাশ হবে বোধহয়। ইতস্তত করে নয়না বলল।

তারপর থেকেই সুপ্রতিম কেমন এক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। ঝুমুর চৌধুরীর ছবিটা ওর কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। এ-ধরনের গায়ে-পড়া প্রেমিকাদের ও বহুবার সামাল দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ও যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। প্রতিদিনই অনুষ্ঠান শুরু করার পর থেকেই ও স্টুডিয়োতে ঝুমুরের ফোনের জন্য ভয়েভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আজ ওর মন বলছে, ফোনটা আসবে। আজ ওদের স্টুডিয়োর ব্যস্ত লাইনে টুক করে ঢুকে পড়বে ঝুমুর।

এবং সুপ্রতিমের আশঙ্কাই সত্যি হল। ঝুমুর যে ফোনটা করেছে সেটা ফোনে সাড়া দেওয়ার পরই ও বুঝতে পারল।

হ্যালো–মুশকিল আসান

সু-সুপ্রতিম! আমি গো…আমি বলছি…ঝুমুর…।

নয়না ঠিকই বলেছিল। খসখসে আদুরে গলা। কেমন যেন ফিশফিশ সুরে কথা বলছে।

নিজেকে শান্ত রেখে পেশাদারি ঢঙে কথা বলল সুপ্রতিম, কাইন্ডলি আপনার পুরো নাম বলুন।

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর একটু ধাক্কা খেল : আমায়…আমায় চিনতে পারছ না! আমি ঝুমুর চৌধুরী। কলকাতা চোদ্দো থেকে বলছি। কত কষ্ট করে তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।

ওদের টেলিফোন-ব্যবস্থাটা এমন যে, সব কথাবার্তাই টিভির দর্শকরা শুনতে পান। সেইজন্যেই সুপ্রতিম বেশ বিব্রত হয়ে পড়ছিল। ও ভাবছিল, কন্ট্রোল প্যানেলের একটা সুইচ টিপে টেলিফোনের কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দেবে কি না। নাকি রিসিভার নামিয়ে রেখে লাইন কেটে দেবে? কিন্তু পাগল মেয়েটা তো রোজ ফোন করার চেষ্টা করে জ্বালাতন করে মারবে।

এইসব ভাবতে-ভাবতে সুপ্রতিম কষ্ট করে পেশাদারি হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। তারপর ওর নিজস্ব ঢঙে জানতে চাইল, বলুন ম্যাডাম, কী আপনার সমস্যা? মুশকিল আসান নিশ্চয়ই তার সমাধান বাতলে দেবে।

আমার…আমার প্রবলেম তুমি। আমি তোমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। যখন..যখন আর কেউ থাকবে না। তোমার ফোন নাম্বার খুঁজে বের করে বাড়িতে তিনবার ফোন করেছিলাম…তোমাকে পাইনি। একটা মেয়ে ফোন ধরে বলে কী, রং নাম্বার। হুঁ, বললেই হল! কে ফোন ধরেছিল? তোমার…তোমার ওয়াইফ?

শেষ প্রশ্নটা দর্শকরা শুনতে পাওয়ার আগেই কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপে কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দিল সুপ্রতিম। কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখল না। ঝুমুর চৌধুরী সম্পর্কে একটা কৌতূহল ওর মধ্যে মাথাচাড়া দিল।

হ্যাঁ–আমার বউ নয়না। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। কথাটা বলার সময় আড়চোখে মোনার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সুপ্রতিম। ওকে হাত নেড়ে ইশারা করল প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

হুঁ! জানতাম! বিরক্তি ফুটে উঠল ঝুমুরের গলায়। কিন্তু তারপরই ও কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। খসখসে আদুরে গলার হাসি?

একটু পরে হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বলল, কাউকে আমি পরোয়া করি না। কেন জানো? কারণ, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। কবে তোমার বাড়ি যাব বলো? শেষ প্রশ্নটায় যেন কোনও কিশোরীর মিনতি ঝরে পড়ল।

সুপ্রতিমের মন খুব দ্রুত চিন্তা করছিল।

মেয়েটি তো মনে হচ্ছে নিশ্চিত পাগল। ওর সঙ্গে দেখা করে সামনাসামনি বুঝিয়ে বললে কি ওর এই প্রেমের পাগলামি সারতে পারে? ওকে বলবে একবার

বাড়িতে আসতে? কিন্তু নয়না যদি কিছু মাইন্ড করে!

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধেবেলা নয়না কাছাকাছি একটা সেলাই-স্কুলে এমব্রয়ডারির কাজ শেখাতে যায়। ছটায় বেরোয়, দু-আড়াই ঘণ্টা পর ফেরে। ওর হাতের কাজ খুব ভালো। তা ছাড়া সূক্ষ্ম সেলাই নিয়ে সময় কাটাতে ওর বেশ লাগে। মঙ্গলবার সাড়ে ছটা-সাতটা নাগাদ তা হলে ঝুমুরকে আসতে বলবে সুপ্রতিম। তখন ফ্ল্যাট ফাঁকাই থাকবে। ঠিকে কাজের লোক বিমলামাসিও রোজ সন্ধেবেলা বাসন মেজে, ঘর মুছে, ছটার মধ্যেই চলে যায়।

কিন্তু ফ্ল্যাটে ওকে একা পেয়ে মেয়েটা কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসবে না তো! দুর, কী আর করবে! সুপ্রতিম নিজে ঠিক থাকলে আর ভয় কীসের! কিন্তু মেয়েটার বয়েস কত? সতেরো, আঠারো বা কুড়ি হলে তো ইমোশনাল প্রবলেম হতে পারে।

সুপ্রতিম কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। ঠিকমতো আর ভাবতে পারছিল না।

কবে যাব, বলো? খসখসে আদুরে গলায় আবার জানতে চাইল ঝুমুর।

মঙ্গলবার সন্ধেবেলা। ঠিক সাতটায়। সুপ্রতিমের মুখ দিয়ে কেমন যেন আলতোভাবে খসে পড়ল কথাগুলো।

তোমার ফ্ল্যাটবাড়িটা আমি দেখে এসেছি। কঁকুড়গাছিতে। সামান্য হাসল ঝুমুর। একটু থেমে তারপর বলল, তোমার ফ্ল্যাটটা তো একতলায়...।

পলকে ঘাম ফুটে উঠল সুপ্রতিমের কপালে। এর মধ্যেই ওর ঠিকানা বের করে বাড়িটা চিনে এসেছে মেয়েটা! মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে আবার কোনও বিপদ হবে না তো! তখন হয়তো সত্যি-সত্যি থানা-পুলিশ করতে হবে। কিন্তু আর তো ফেরার পথ নেই! তির ছিটকে গেছে হাত থেকে।

মঙ্গলবার সন্ধেবেলা যাব। ঠিক...সাতটায়...। দেখা হওয়ার আগে তা হলে ফোন করব না। একটু চুপচাপ। তারপর ও আমাকে একপলক দেখলেই তুমি বুঝবে কেন আমার ভালোবাসা অন্যরকম। চাপা গলায় কথাগুলো বলে অল্প হাসল ঝুমুর ও আই লাভ য়ু, লাভ। তুমি অপেক্ষা কোরো। ঠিক সাতটায়...।

রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সুপ্রতিম। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্মার্ট ঢঙে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যেন তাল

কেটে গেল। তা সত্ত্বেও সুপ্রতিম মোনার সঙ্গে কথা বলে অনুষ্ঠানে সহজভাবে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল।

মোনা, তুমি ভীষণ সেলফিস।

কেন? মোনা দুষ্টু হেসে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে।

পাগলের প্রবলেমগুলো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে দিব্যি মজায় আছ। তারপর দর্শকদের লক্ষ্য করে : কী আপনারাই বলুন–

মোনাও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মজার সুরে বলল, যারা অন্যকে পাগল করে সেইসব পাগলের প্রবলেম তাদেরই সম্ভ করতে হবে। এটা আপনাদের সকলের প্রতি আমার উপদেশ। আশা করি ঠাট্টা করলাম বলে আপনারা কিছু মনে করবেন না। বড় করে হাসল মোনা। তারপর সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, সুপ্রতিমদা, এবার সাক্ষাকারপর্ব শুরু করুন। হাতে আর সময় বেশি নেই।

হ্যাঁ। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন ডক্টর পার্থসখা মণ্ডল। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। উনি শিশু ও কিশোরদের মানসিক সমস্যা নিয়ে আমাদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেবেন…।

এরপর শুরু হয়ে গেল আগে রেকর্ড করা ডক্টর মণ্ডলের সাক্ষাৎকার।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে সুপ্রতিম ঠিক করল ঝুমুরের বাড়ি আসার ব্যাপারটা ও নয়নাকে জানাবে না। মোনা ওকে টেলিফোনের কথার্বাতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল। সুপ্রতিম ওকে সবই বলেছে। শুধু মঙ্গলবার সন্ধে সাতটার সাক্ষাৎকার-এর কথা বলেনি।

সুপ্রতিম হিসেব করে দেখল মঙ্গলবার আসতে এখনও ঠিক তিনদিন বাকি। সেদিন ওকে স্টুডিয়ো থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

.

দরজায় কেউ টুং-টাং করে কলিংবেল বাজাতেই সুপ্রতিম চমকে উঠল। চকিতে ওর নজর চলে গেল দেওয়ালে টাঙানো শৌখিন ইলেকট্রনিক পেন্ডুলাম ঘড়ির দিকে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়িও শব্দ করে ওকে জানিয়ে দিল এখন ঠিক সাতটা।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে ঝুমুরের জন্য অপেক্ষা করছিল সুপ্রতিম। অপেক্ষা করতে করতে ওর টেনশান ক্রমে বাড়ছিল। নয়না, বিমলামাসি, অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। তখন থেকে সুপ্রতিম ফ্ল্যাটে একা। হাতে সময় পেয়ে সামান্য একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। শরীরের এখানে-ওখানে ডিওডোরান্ট স্প্রে করেছে। অবচেতনে ঝুমুরের আসার ব্যাপারটা মাথায় ছিল।

আবার বেজে উঠল কলিংবেল।

ঘোর কাটল সুপ্রতিমের। চটপট উঠে দরজার কাছে গিয়ে ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখল।

ঝুমুর নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। ম্যাজিক আই-এর লেন্স দিয়ে যেটুকু বিকৃত ছবি দেখা গেল তাতে বলা যায় লোকটি ফরসা, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখে যেন একটা ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ ভাব।

দরজা খুলল সুপ্রতিম। সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশি পারফিউমের গন্ধ ওকে ভাসিয়ে দিল।

লোকটি, অথবা ছেলেটি, সামান্য হাসল। হাসিতে লজ্জা, সঙ্কোচ। কোনওরকমে বুকের কাছে হাত তুলে সৌজন্যের নমস্কারের ভঙ্গি করল। তারপর এক পা বাড়িয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়ল, বলল, একটু কথা আছে।

উচ্চারণগুলো এতই অস্পষ্ট যে সুপ্রতিমকে বেশ কষ্ট করে কথাগুলো বুঝতে হল।

কখনও কখনও দু-একজন যশোপ্রার্থী মানুষ সুপ্রতিমের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কী করে টিভিতে চান্স পাওয়া যায় তার কৌশল বা সুলুকসন্ধান জিগ্যেস করে সুপ্রতিমকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে। ইনিও বোধহয় সেই দলের–ভাবল ও।

লোকটি বেশ রোগা, উচ্চতায় নিতান্তই খাটো, তবে মাথার চুল বেশ বড় কষে তেল মেখে কীর্তনীয়াদের মতো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ টানা-টানা– কেমন এক তন্দ্রার ভাব সেখানে জড়িয়ে আছে। বাঁ-গালে, চোখের সামান্য নীচে, সরষের মাপের একটা কালো জজুল। পুরুষটি মেয়ে হলে ওটাকে বিউটি স্পট বলা যেত। পরনে সাদার ওপরে নীল স্ট্রাইপ দেওয়া ফুল শার্ট, আর নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট।

আর বয়েস কতই-বা হবে! বড় জোর তেইশ-চব্বিশ।

বলুন, কী দরকার? সুপ্রতিম জিগ্যেস করল।

এরপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে গেল।

সুপ্রতিমের চোখে চোখ রেখে লোকটি ডানহাতে খোলা দরজায় পাল্লাটাকে ঠেলে বন্ধ করে দিল। ক্লিক শব্দে নাইট ল্যাচ আটকে গেল।

তারপর আদুরে খসখসে গলায় বলল, তোমাকে চাই গো, তোমাকে চাই।

এবং তাড়া-খাওয়া হরিণের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুপ্রতিমের গায়ে। ওকে আঁকড়ে ধরে চকাৎ করে এক তীব্র চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

গায়ে আরশোলা বা মাকড়সা পড়লে মানুষ যেমন ঘেন্না, অস্বস্তিতে শিউরে ওঠে, ঠিক সেইরকম প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল সুপ্রতিম। ওর গা ঘিনঘিন করছিল। হাতের পিঠ দিয়ে বারবার ঘষে-ঘষে ঠোঁট মুছল।

ছেলেটি পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে উঠে বসে কাতর আকুল চোখে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে। অদ্ভুত এক মেয়েলি সুরে বলল, আমাকে তুমি… চিনতে পারোনি… আমি…ঝুমুর…ঝুমুর চৌধুরী।

সুপ্রতিম ভীষণ একটা ধাক্কা খেল।

এতদিন এই ছেলেটাই ওকে মেয়ে সেজে চিঠি দিয়েছে, ফোন করেছে! একটা জঘন্য বৃহন্নলা! এইজন্যই পাগলটা চিঠিতে লিখেছিল? .আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি।

সুপ্রতিমের গা গুলিয়ে উঠল। ওয়াক উঠতে চাইল গলা দিয়ে।

ঝুমুর তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোলাপ ফুল আর একটা রঙিন কাগজে মোড়া বাক্স বের করে ফেলেছে। সে-দুটো সুপ্রতিমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এই ফুল আর একটা পার্কার পেন…তোমার জন্যে এনেছি। তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না..প্লিজ…।

ঝুমুর যদি পুরুষ হয় তা হলে ওর গলাটা মেয়েলি। আর যদি ও মেয়ে হত তা হলে বলা যেত গলাটা কেমন যেন পুরুষালি। কিন্তু আসলে ও কী?

ঝুমুর উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে এল সুপ্রতিমের কাছে। মিষ্টি করে হেসে উপহার দুটো বাড়িয়ে দিল। বলল, আমি একটুও রাগ করিনি গো। আমার ভালোবাসার প্রথম প্রথম এরকম হয়– পরে সব ঠিক হয়ে যায়। এই নাও।

সুপ্রতিম কেমন এক অশুভ হাওয়া-বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ঝুমুরের কথায় ঘোর কাটতেই প্রচণ্ড রাগে সপাটে এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে।

বিশ্রী একটা শব্দ হল। ঝুমুরের ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে এল। ও আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে। উপহারগুলো হাত থেকে পড়ে ছড়িয়ে গেল।

সুপ্রতিম ভেতরে-ভেতরে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল। একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে সব কথা কেমন যেন আটকে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরে অনেক কিছু দপদপ করছে। এখুনি যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে।

এই মুহূর্তে বেরোও। জানোয়ার কোথাকার! আউট! হাঁফাতে-হাঁফাতে চেঁচিয়ে বলল সুপ্রতিম।

কিন্তু ঝুমুর ওর ধমক গ্রাহ্য করল বলে মনে হল না।

রক্তাক্ত মুখেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। ওর সাদা জামায় রক্তের ছিটে লেগেছে। সেই অবস্থাতেই বিচিত্র বিভঙ্গে শরীর দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ও। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, আমি কিছু মনে করিনি, হানি। তোমাকে আমি চাই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাই। হাজার টরচার করেও তুমি আমাকে টলাতে পারবে না। তোমার হাতের ছোঁওয়া আমার কাছে যে কী, তা তুমি জানো না। আর…আর এইটা দ্যাখো। বলে একটানে জামাটা ছিঁড়ে দিল ঝুমুর। কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে গেল। বুকের কাছটায় অনেকখানি ফেঁসে গেল জামাটা। আর তখনই ঝুমুরের খালি বুক দেখা গেল।

ওর ঈষৎ মেয়েলি ঢঙের বুকে বাঁ-দিকে সত্যিকারের একটা ছোট্ট কাটা দাগ। সুপ্রতিমের ডান ভুরুর দাগটার মতো।

ঝুমুর চিঠিতে লিখেছিল, ও বুকে একটা কাটা দাগ এঁকে নিয়েছে। কিন্তু এ তো সত্যিকারের কাটা দাগ। ব্লেড, ছুরি অথবা ক্ষুর দিয়ে চিরে ও তৈরি করেছে।

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমুর। রক্তমাখা মুখে ওর হাসি কেমন অলৌকিক দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই ও আবার ঝাঁপিয়ে এল সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম খপ করে এক হাতে ওর গলা চেপে ধরল। তারপর ওর পলকা শরীরটাকে পিছনদিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দরজার কাছে।

য়ু সান অফ আ বিচ! ফাকিং গে বাস্টার্ড! আর কখনও যদি আমাকে ডিসটার্ব করো তা হলে একেবারে খুন করে ফেলব!

দরজা খুলে ঝুমুরের দেহটাকে বলতে গেলে বাইরে ছুঁড়ে দিল সুপ্রতিম। ওর মাথাটা সিঁড়ির রেলিঙে ঠুকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটার চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। ও কাত হয়ে টলে পড়ে যেতে গিয়েও সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনওরকমে সামলে নিল। ঘোলাটে নজরে তাকাল ওর ভালোবাসার পুরুষের দিকে। জড়ানো খসখসে গলায় বলল, আমি কিছুই মাইন্ড করিনি। যতই ফিরিয়ে দাও, আবার আমি আসব। একদিন-না-একদিন তুমি আমাকে মেনে নেবেই…।

ওর গায়ে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল সুপ্রতিম। তারপর দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিমের সারা শরীর অবসাদ আর ক্লান্তিতে কেমন ভারী হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে ও চোখ বুজে হাঁফাতে লাগল।

এক অদ্ভুত গ্লানি সুপ্রতিমকে জড়িয়ে ধরেছিল। বারবার ওয়াক উঠে আসতে চাইছিল ওর গলা দিয়। এরকম গা ঘিনঘিনে ঘটনার কথা কাউকে কি বলা যায়। শেষ পর্যন্ত কি সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে?

ঝুমুরকে ঘুষি মেরে সুপ্রতিমের ডানহাতের পিঠটা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছিল। ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ঠোঁটে লাগিয়ে জোরে-জোরে কয়েকবার চুষল ও। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা দলিত গোলাপ আর রঙিন প্যাকেটটার দিকে তাকাল। ঝুমুরের রক্ত-মাখা মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার।

গোপনে কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা করলে সে-ঘটনাটা নয়নার কাছে ও অবশ্যই গোপন করতে চাইত। কিন্তু এই ব্যাপারটা এত অস্বস্তির আর এত লজ্জার যে, এটা আরও বেশি করে গোপন করতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু নয়নাকে বলতেই হবে–সে ও যা-ই ভাবুক।

সবরকম দ্বিধা কাটিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল সুপ্রতিম। নয়নাকে সেলাই স্কুলে। ফোন করে এখনই বাড়ি আসতে বলবে। তারপর...।

.

নয়নাকে সব কথা খুলে বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের কান্না পেয়ে গেল। একটা অসহ্য রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা ওর ভেতরে দলা পাকিয়ে উথলে উঠছিল। নয়নাকে জড়িয়ে ধরে সুপ্রতিম বাঁচার একটা পথ খুঁজছিল। সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এমনই সুপুরুষ-সৌন্দর্য যে, একজন পুরুষও তার প্রেমে পড়ে যায়!

সারাটা রাত ওদের উথালপাতালভাবে কাটল। শেষ পর্যন্ত নয়না ওকে বলল, ব্যাপারটা থানায় জানানো দরকার।

সুপ্রতিম রাজি হল। তারপর মোনাকে ফোন করে জানিয়ে দিল, আপাতত সাত-দশদিন ওর পক্ষে অফিস করা সম্ভব হবে না। না, না, তেমন সিরিয়াস কোনও ব্যাপার নয়। পারিবারিক কয়েকটা ব্যাপারে চাপ এসে পড়েছে। ওরা যেন সুপ্রতিমের বদলে আর কাউকে দিয়ে কটা দিন কাজ চালিয়ে নেয়।

সুপ্রতিম জানে, ওরা বিপ্লব সরকার কিংবা অনির্বাণ পুরকায়স্থকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে। আগেও দু-একবার এরকম হয়েছে।

মোনা অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সুপ্রতিম ঝুমুরের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও বলল না। ও চাইছিল না ব্যাপারটা বেশি জানাজানি তোক। অদ্ভুত এক লজ্জা আর সঙ্কোচ ওর গলা টিপে ধরছিল।

নয়না আর সুপ্রতিম বেলা বারোটা নাগাদ থানায় পৌঁছোল।

বাইরের ঘরটায় কয়েকটা লম্বা-লম্বা বেঞ্চি পাতা। একপাশে বড় মাপের একটা টেবিল। তাকে ঘিরে চারটে চেয়ার। টেবিলে পুরোনো আমলের টেলিফোন, কিছু

ফাইলপত্র, বড় কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

ঘরটা এমন অন্ধকার-অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও দু-দুটো টিউব লাইট জ্বেলে রাখতে হয়েছে। সিলিং-এ সাবেকি একটা বেঢপ পাখা টিমে তালে ঘুরছে। তার হাওয়ায় দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

টেবিলের ওপাশে সাদা ইউনিফর্ম পরে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। বয়েস বড়জোর পঁয়ত্রিশ। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখে উদাসীন বিরক্ত ভাব।

টেবিলে রাখা কাঠের নেমপ্লেট পড়ে জানা গেল অফিসারের নাম টি. দাস., সাব-ইনস্পেক্টর।

সুপ্রতিম আর নয়না বসল।

দাসবাবু সপ্রশ্ন নজরে ওদের দিকে তাকালেন।

একটু ইতস্তত করে সুপ্রতিম বলল, আমি…আমি…একটা ডায়েরি করতে চাই।

কথা বলতে বলতে ও চারপাশে দেখছিল। দু-একজন লোক এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। তাদের চোখেমুখে ব্যস্তসমস্ত ভাব।

সুপ্রতিমের মনে হল, দাসবাবু ছাড়া কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না। তাই দাসবাবু যখন ডায়েরি-বই নিয়ে ডটপেন বাগিয়ে বললেন, বলুন–, তখন ও প্রথমে নিজের পরিচয় দিল, তারপর সহজভাবেই ঝুমুরের ব্যাপারটা বলে গেল। টেবিলের আড়ালে নয়না ওর একটা আঙুল ছুঁয়ে ওকে সাহস জোগাচ্ছিল। ও টের পেল, সুপ্রতিমের আঙুল কাঁপছে।

কিছু লেখার আগে দাসবাবু ব্যাপারটা শুনে নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে ছোটখাটো শব্দ করছিলেন, আর ডটপেনটা ডায়েরি-বইয়ের পাতায় ঠুকছিলেন।

শুনতে-শুনতে একসময় তার মুখে মজা পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং!

হঠাৎই একজন সাদা-পোশাকের অফিসার সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে এলেন। ধপ করে বসে পড়লেন দাসবাবুর পাশের চেয়ারটায়। আড়চোখে নয়নার

সৌন্দর্য চেটে নিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, কী কেস, দাস?

হোমো কেস। দাস মুচকি হেসে বললেন।

নয়না আর সুপ্রতিম হোমো শব্দটা শুনে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।

বলুন, তারপর কী হল– সুপ্রতিমকে তাড়া দিলেন দাস।

খুঁড়িয়ে চলা ছ্যাকড়াগাড়ির মতো থতিয়ে-থতিয়ে কথা শেষ করল সুপ্রতিম। টের পেল, ওর ঘাড়ে, কপালে, ঘাম জমছে।

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্রই সাদা-পোশাকের অফিসারটি বলে উঠলেন, এ-ডায়েরি নিয়ো না, দাস–এই ভদ্রলোক ফেঁসে যাবেন।

দাসবাবু ওঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, ঠিকই বলেছেন, শঙ্করদা।

নয়না অবাক চোখে জানতে চাইল, কেন? ডায়েরি নেবেন না কেন? লোকটা আমাদের লাইফ হেল করে দিচ্ছে...।

সবুর, ম্যাডাম, সবুর...। সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে সাদা-পোশাকের অফিসারটি বললেন, একটু মাথা খাটান, তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা ইয়াং ছেলে আপনার হাজব্যান্ডকে আমি ভালোবাসি বলে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছে। মানছি, অন্যায় করেছে। কিন্তু তার বদলে আপনার হাজব্যান্ড কী করেছেন? না ছেলেটাকে তুলোধোনা করে মুখ-মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছেন। কী, ঠিক বলছি তো? শেষের প্রশ্নটা সুপ্রতিমকে লক্ষ্য করে।

সুপ্রতিম কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। নয়নাও ঠিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সাদা-পোশাকের অফিসারের কথার খেই ধরে দাস সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই ছেলেটা যদি থানায় এসে আপনার নামে এফ.আই.আর. করে তা হলে তো আপনি ভেতরে ঢুকে যাবেন! তখন বিচ্ছিরি রকম স্ক্যান্ডাল হবে, লোক জানাজানি হবে–একটা কেলো হয়ে যাবে। একটু সময় দিলেন ওদের ও তার চেয়ে বরং বাড়ি যান। ছেলেটা আবার এলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে নিন। ওর সঙ্গে মিউঁচুয়াল করে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনও ওয়ে

আউট দেখছি না। শঙ্করদা কী বলেন? সাদা-পোশাকের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন দাস।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে শঙ্করবাবু বললেন, এ ছাড়া কোনও পথ নেই। এসব হোমো কেস নিয়ে ক্যাচাল যত কম হয় আপনাদের পক্ষে ততই ভালো। তবে এরপর কী হয়-না-হয় সেটা আমাদের ইনফর্ম করতে পারেন। সিরিয়াস কোনও টার্ন নিলে তখন…।

সুপ্রতিম আর নয়না ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অফিসাররা যে ঠিক কথাই বলছেন, সে নিয়ে ওদের মনে কোনওরকম সন্দেহ ছিল না।

এক অদ্ভুত আতঙ্কে অবশ হয়ে শোলার তৈরি পায়ে ওরা বাড়ি ফিরে এল। নয়না মনে মনে ভাবছিল, কেমন দেখতে এই ঝুমুর চৌধুরীকে?

সুপ্রতিম যখন ফ্ল্যাটের দরজায় নাইট ল্যাচের চাবি ঘোরাচ্ছে তখন শুনতে পেল ঘরের ভেতরে টেলিফোন বাজছে।

দরজা খুলে তাড়াহুড়ো করে ফোন ধরল সুপ্রতিম।

হ্যালো।

সুপ্রতিম…মাই লাভ.আই লাভ য়ু…।

নয়না স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল ওর মুখটা চোখের পলকে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নয়না বুঝতে পারল, সুপ্রতিমকে কে ফোন করেছে।

.

ঝুমুরের টেলিফোনের উৎপাত চলতেই থাকল, কিন্তু সুপ্রতিম কিছুতেই আর বিরক্ত হল না। থানার দুই অফিসারের কথা ওর মনে ছিল। তাই ও মোলায়েমভাবে কথা বলে ঝুমুরকে নিরস্ত করতে চাইল। ওকে অনুনয় করে বলল, তুমি যেরকম ভালোবাসা চাও আমার মধ্যে সেরকম ভালোবাসা নেই। তুমি ভুল করছ।

ওকে বাধা দিয়ে আদুরে ঢঙে ঝুমুর বলল, না, না, ভুল নয়। তুমি আমার কাছে ধরা দিলেই বুঝবে আমি ভুল করিনি। আমি মনের মতো মনের মানুষ পেয়েছি।

সুপ্রতিম অনেক চেষ্টা করেও গা ঘিনঘিন করা ভাবটা চেপে রাখতে পারেনি। এবং টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

কিন্তু পরে আবার ঝুমুরের ফোন এসেছে।

সুপ্রতিম প্রতিবারই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। ফোনের ও-প্রান্তে ঝুমুর কেঁদে ভাসিয়েছে। আত্মহত্যা করবে বলে ওকে ভয় দেখিয়েছে। কখনও বলেছে, গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। কখনও বলেছে, ট্রেনের তলায় মাথা দেবে। আবার কখনও বা বলেছে, গলায় দড়ি দেবে।

সুপ্রতিম বেশ বুঝতে পারছিল, ওর জীবনের কোথায় যেন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।

ঝুমুরের নিয়মিত ফোন আর ইনিয়েবিনিয়ে প্রেম সুপ্রতিমকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কয়েকদিন পর ওর মনে হতে লাগল ও বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই ঝুমুরের অন্যরকম ভালোবাসার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে।

সুপ্রতিমের এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে এক মঙ্গলবার সন্ধে সাতটা নাগাদ ওদের ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

নয়না বাড়িতে নেই। সেলাইয়ের স্কুলে গেছে। সুপ্রতিমকে একা রেখে ও যেতে চায়নি, কিন্তু সুপ্রতিমই জোর করে ওকে পাঠিয়েছে, বলেছে, আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি! তা ছাড়া ওই ঝুমুর চৌধুরীকে ভয়ের কী আছে! অগের দিন ওকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। আজ যদি হতচ্ছাড়াটা আসে তা হলে হকি স্টিক দিয়ে পেটাব।

সুপ্রতিম একসময় হকি খেলত। ওর হকি স্টিকটা বেডরুমের দেওয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা থাকে। সেটা এখন ও ড্রইংরুমের সোফার তলায় এনে রেখেছে। কারণ, ওর মন বলছিল, ঝুমুর যেরকম খ্যাপা তাতে ও কোনও একটা মঙ্গলবার সন্ধে সাতটায় আবার ওদের ফ্ল্যাটে এসে হানা দিতে পারে সুপ্রতিমকে একা পাওয়ার জন্য।

তাই কলিংবেলের আওয়াজ শুনেই চমকে উঠেছিল সুপ্রতিম। তারপর সতর্ক পায়ে দরজার কাছে গিয়ে ম্যাজিক আই দিয়ে উঁকি মেরেছে।

না, ঝুমুর চৌধুরী নয়। দরজায় দাঁড়িয়ে ন্যাড়া মাথা গোঁফওয়ালা একজন লোক।

দরজা খুলে দিল সুপ্রতিম।

রোগা ছোটখাটো চেহারার লোকটি ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা ছোট ব্রিফকেস। শার্ট, প্যান্ট, টাই পরে একেবারে ফিটফাট। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

সেল্সম্যান নাকি! ভাবল সুপ্রতিম। কিন্তু এই সন্ধে সাতটার কী বিক্রি করতে এসেছে?

সুপ্রতিম ভদ্রতা করে বলল, বলুন, কী চাই?

খুব ইমপর্ট্যান্ট বিজনেস। চাপা গলায় অস্পষ্টভাবে বলল লোকটি। তারপর খুব সহজ ভঙ্গিতে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিম লোকটির দিকে পিছন ফিরে সোফার দিকে একটা পা বাড়িয়েছিল, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ততক্ষণে ঝুমুর ওর নকল গোঁফটা একটানে খুলে ফেলে দিয়েছে ঘরের মেঝেতে। আর হাতের ব্রিফকেসটাও একপাশে নামিয়ে রেখেছে।

তুমি!

হ্যাঁ গো, আমি। তোমার কাছে না এসে থাকতে পারলাম না। ফোনেই তো বলেছিলাম, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যদি তুমি মুখের ওপরে দরজা দিয়ে দাও, তাই মাথা ন্যাড়া করে নকল গোঁফ লাগিয়ে আসতে হয়েছে…।

ঝুমুর বিচিত্র ঠমক-ঠামক করে কথা বলছিল। কটাক্ষ হানছিল। ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছিল।

সুপ্রতিম পাথর হয়ে তাকিয়ে ছিল অদ্ভুত এই প্রাণীটার দিকে। আর প্রাণপণে গা ঘিনঘিন করা ভাবটাকে সামাল দিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল।

তুমি রাগ করলে না তো! তোমার ওপরে আমার কোনও রাগ নেই। যাকে ভালোবাসি তার ওপরে কি রাগ করে থাকা যায়!

কথাগুলো বলেই সুপ্রতিমের দিকে ঝাঁপিয়ে এল ঝুমুর। সুপ্রতিম ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ও আবেগজর্জর প্রেমিকার মতো সুপ্রতিমের বুকে মুখ ঘষতে লাগল, আর ইনিয়েবিনিয়ে বলতে লাগল, আমার আদর করো। লক্ষ্মীসোনা, আমায় আদর করো। আর আমি পারছি না। প্লিজ...প্লিজ...। আমার শুধু বাইরেটা পুরুষ–ভেতরটা নয়।

সুপ্রতিম মুখ নামিয়ে দেখল একটা ন্যাড়া মাথা ছেলে ওর বুকে মুখ ঘষছে। ও এমন নির্লিপ্তভাবে দেখছিল, যেন ওটা ওর বুক নয়–অন্য কোনও পুরুষের বুক।

হঠাৎই বিকট শব্দে ওয়াক তুলল সুপ্রতিম। ওর সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। এবং একইসঙ্গে এক ঝটকায় ঝুমুরকে ছিটকে ফেলে দিল। তারপর মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বারবার বমির হেঁচকি তুলতে লাগল।

ওর গলার পাশে শিরা ফুলে উঠল। খানিকটা জল আর লালা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ঝুমুর তখন মেঝেতে সোজা হয়ে বসেছে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে সুপ্রতিমের দিকে। আর গুনগুন করে গাইছে, ...তোমার আদর পেলে আমি স্বর্গে চলে যাই / মর্ত্যে যে আর আমার কিছু নাই...।

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সুপ্রতিমের মাথায়। ওর চোখ চলে গেল সোফায় নীচে হকি স্টিকের দিকে। হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে ওটা। চুলোয় যাক দাসবাবু আর শঙ্করবাবুর হিতোপদেশ! দাঁত বের করে বসে থাকা ওই জানোয়ারটা ওঁদের তো কিছু করেনি। শুধু সুপ্রতিমের জীবনটাকে নরক করে তুলেছে।

কয়েক সেকেন্ড নিজের সঙ্গে লড়াই করল সুপ্রতিম। তারপর ডানহাত বাড়িয়ে দিল হকি স্টিকটার দিকে। ওটা আঁকড়ে ধরল শক্ত মুঠোয়।

আজ শুয়োরের বাচ্চাটার একদিন কি আমার একদিন। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল ও।

তারপর হকি স্টিক হাতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল ঝুমুরের কাছে। এবং খ্যাপা দাঁতালো শুয়োরের রাগ নিয়ে হকি স্টিক চালাতে শুরু করল।

ছোটবেলায় ধুনুরিদের লেপ-তোশক তৈরি করতে দেখেছে সুপ্রতিম। শীতের রোদে ছাদে বসে জমাট বাঁধা শক্ত তুলোকে তারা পিটিয়ে-পিটিয়ে নরম করে। এখন হকি স্টিক চালাতে-চালাতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তবে ধুনুরিদের শব্দ যদি সত্তর-আশি ডেসিবেল হয় তা হলে সুপ্রতিমের আঘাতের শব্দ কম করেও একশো ডেসিবেল। তা ছাড়া ধুনুরিদের বেলা এমন রক্তারক্তি ব্যাপারটা ছিল না।

সুতরাং মেঝেতে বসে থাকা ছোটখাটো ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে তালগোল পাকিয়ে দিল সুপ্রতিম। ঝুমুর ওর পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে কুকুরছানার মতো কেঁউকেঁউ করতে লাগল। শব্দটা কেমন কান্না মেশানো গোঙানির মতো লাগছিল। ওর মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, জামায় রক্তের ফোঁটা ছিটকে লেগেছে, শরীরটা যেন ভাঙাচোরা দ হয়ে গেছে।

উন্মত্ত রাগ কমে এলে সুপ্রতিম হকি স্টিকটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছিল ও। ভাবছিল, এত শব্দ-টব্দ পেয়ে লোকজন না ছুটে আসে ওর ফ্ল্যাটে। তারপর থানা-পুলিশ...।

কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্ক হয়েছিল সুপ্রতিম। সেই ফাঁকেই ওর উরুতে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

তালগোল পাকানো ছেলেটা বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল। একবার, দুবার, তিনবার। প্রথম দুবার ঊরুতে, তৃতীয়বার হাঁটুর নীচে।

সুপ্রতিমের মনে হল ওর পায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঘষে দিয়েছে কেউ। ও ঝুঁকে পড়ে পা চেপে ধরল।

আর তখনই ওর কোমরে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

যত না যন্ত্রণা পেল তার চেয়ে বেশি অবাক হল সুপ্রতিম। ও বিশ্বাসই করতে পারছিল না ওর পায়ের কাছে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা ক্ষীণজীবী মাংসপিণ্ডটা এইরকম ভয়ানক কাজ করতে পারে।

সুপ্রতিম পড়ে গেল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই পাগলটা লাফিয়ে উঠে এল ওর শরীরের ওপরে। ডানহাতে ধরা ক্ষুরটা চেপে ধরল সুপ্রতিমের বাঁকানের নীচে, খসখসে আদুরে গলায় বলল, ভালোবাসা আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই গো। তোমাকে খতম করে দিলে আমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ভালোবাসা না পেলে কষ্ট যে আরও বেশি! আই লাভ য়ু, ডার্লিং...।

খুব কাছ থেকে ঝুমুরের মুখটা লক্ষ করে এই প্রথম ওকে ভয় পেল সুপ্রতিম। ওরা দুজনেই হাঁফাচ্ছিল। একজনের নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাই-অক্সাইড ঢুকে পড়ছিল আর-একজনের নাকে। তাই ওদের দুজনেরই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

এক অজানা ভয়ে সুপ্রতিম কাঠ হয়ে গেল। ও টের পাচ্ছিল, ওর কোমর, উরু, পা থেকে চুঁইয়ে-চুইয়ে রক্ত পড়ছে। নয়না এখনই এসে পড়ছে না কেন! নয়নার ফিরে আসার জন্য মনে মনে আকুল প্রার্থনা করতে লাগল ও।

ঝুমুর হিসহিস করে বলল, অসভ্যতা করলে গলা ফাঁক করে দেব। আর যদি চেঁচাও, তা হলে চিৎকারটা মুখ দিয়ে বেরোবে না–গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ঝুমুর সুপ্রতিমের বুকের ওপরে উঠে বসল। বাঁ-হাতে টান মেরে সুপ্রতিমের জামা ছিঁড়ে দিল। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর বুকে ক্ষুর চালিয়ে আড়াআড়ি দাগ টেনে দিল।

সুপ্রতিম যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করে ঝুমুর বলল, চুপ, সোনামণি। অনেক কষ্ট সয়ে তবেই আসল ভালোবাসা পাওয়া যায়।

প্যান্টের পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করল ঝুমুর। ডান হাতের ক্ষুর নাচাতে নাচাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সুপ্রতিমের মাথার দিকটায় গেল। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল। ক্ষুরটা হাতের কাছেই নামিয়ে রেখে নোড়ো না, লক্ষ্মীটি। নইলে বিপদ হবে। বলতে বলতে সুপ্রতিমের দুটো হাত বাঁধতে শুরু করল।

হাত দুটো শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেলে দড়ির প্রান্তটা বেঁধে দিল একটা সোফার দু-পায়ার সঙ্গে। এখন অনেক চেষ্টা করে সুপ্রতিম হয়তো সোফাটাকে সামান্য

নাড়াতে পারবে, কিন্তু সুপ্রতিম কোনওরকম চেষ্টা করছিল না। ও চোখ ঘুরিয়ে অন্যরকম ঝুমুরকে লক্ষ করছিল, আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল।

দড়ির বাকি অংশটা ক্ষুর দিয়ে কেটে নিল ঝুমুর। চলে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। পা দুটো জোড়া করে শক্ত করে বাঁধল।

এমন সময় ঘরের টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

ঝুমুর টেলিফোনটার দিকে একবার তাকাল শুধু। তারপর টেলিফোনের শব্দ কোনওরকম গ্রাহ্য না করে আর-একটা সোফা টেনে নিয়ে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। জোড়া পা বাঁধা পড়ল সোফায় দু-পায়ার সঙ্গে।

ঝুমুর এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অদ্ভুতভাবে হাসল। ক্ষুরটা রেখে দিল সোফার ওপরে। তারপর নিজের পোশাক খুলতে শুরু করল। সুপ্রতিম ভয়ার্ত চোখে ওকে দেখতে লাগল।

বাজতে-বাজতে ক্লান্ত হয়ে টেলিফোন থেমে গেল একসময়।

ততক্ষণে সুপ্রতিমের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়েছে প্রায়-নগ্ন ঝুমুর। ওর পরনে শুধু গাঢ় নীল রঙের জাঙ্গিয়া।

ফরসা ফ্যাকাসে রোগা শরীর, ন্যাড়া মাথা, মাথায় রক্তের দাগ, গলায় সামান্য রক্তের ছিটে, মুখে চওড়া হাসি, অথচ ঠান্ডা চোখ। ঝুমুরকে কেমন যেন অলৌকিক প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল।

এইবার ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে মেঝেতে বসল ঝুমুর। ওটা খুলতেই দেখা গেল মেয়েলি প্রসাধনের নানান জিনিস। একটা হাত-আয়না নিয়ে ঝুমুর সাজতে বসল। আর একইসঙ্গে গুনগুন করে গাইতে লাগল ও ভালোবাসার তুমি কী জানো? ভালোবাসার তুমি কী জানো? উ..উ..উ…পায়ের ওপর পা-টি তুলে / হিসাবের খাতা খুলে / বসে রও আপন ভুলে / যত বলি ঢের হয়েছে, / মানা না মানো। / ভালোবাসার তুমি…উ..উ..উ…।

মুখে পাউডার-ক্রিম ইত্যাদি মাখা হয়ে গেলে চোখে কাজল পরতে শুরু করল। তারপর চোখের পাতার ওপরে রং ঘষতে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান দিক থেকে নিজের প্রসাধন আয়নায় পরখ করল।

প্রসাধনে সন্তুষ্ট হয়ে হাতে লিপস্টিক তুলে নিল ঝুমুর। লাল ডগাটা বের করে ঠোঁটে ঘষতে লাগল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল। কয়েকবার কোমর বেঁকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েলি নাচের ভঙ্গি করল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে এগিয়ে এল অসহায় রক্তাক্ত সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম শুয়ে-শুয়েই স্নো-পাউডারের গন্ধ পেল।

সুপ্রতিমের ঠোঁটে, মুখে, বুকে লিপস্টিক ঘষে দিল ঝুমুর। তারপর লিপস্টিক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওকে কষে চটকাতে লাগল, আর জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগল, আমি তোমায় বড় ভালোবাসি / তোমায় বড় ভালোবাসি…আমি তোমায় বড় ভালোবাসি…।

সুপ্রতিম ভাবছিল, ও কি বেঁচে আছে? এই ঘটনাগুলো কি সত্যি? নাকি দুঃস্বপ্ন।

বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো। একবার বলো, আমায় ভালোবাসো। তুমি আমার আর কারও নয়। শুধু একবার বলো…।

অসুস্থ উন্মত্ত ছেলেটা সুপ্রতিমের জামা সরিয়ে দিয়ে খোলা বুকে মুখ ঘষছে। ঠোঁটে, গালে, চোখে যথেচ্ছ চুমু খাচ্ছে। হাতড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে। আর অনর্গল ভালোবাসার কথা বলছে।

ঝুমুর ওর প্যান্টের বোতাম খোলা শুরু করতেই সুপ্রতিম চাপা চিৎকার করে উঠল।

কী, কষ্ট হচ্ছে? ঝুমুর নিষ্পাপ স্বরে জিগ্যেস করল, তুমি শুধু একবার বলো, আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসবে…তা হলেই তোমার সব বাঁধন খুলে দেব। তুমি শুধু আমায় একটা চুমু খাও…একটা…তা হলেই আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে যাব।…শুধু একবার…।

সুপ্রতিমের গলা দিয়ে বমি উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু গলা ফাঁক হয়ে যাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। ওর মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা করা দরকার…।

দাঁতে দাঁত চেপে সুপ্রতিম কোনওরকমে বলল, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ঝুমুর।

প্যান্টের জিপার খুলতে গিয়ে ঝুমুরের হাত থেমে গেল। ও আদুরে গলায় বললল, কী বললে গো? আর-একবার বলো। প্লিজ...।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। আরও ভালোবাসতে চাই।...আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও, প্লিজ...। কথা বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের দম আটকে যাচ্ছিল।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো চট করে উঠে পড়ল ঝুমুর। হাঁফাতে হাঁফাতে সুপ্রতিমের বাঁধন খুলতে শুরু করল। উত্তেজনায় ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

বাঁধন খোলা হতেই সুপ্রতিমের কপালে হাত বুলিয়ে নরম সুরে ঝুমুর বলল, নাও এবার ওঠো।

ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে বসল সুপ্রতিম। কাটা জায়গাগুলো ভীষণ জ্বালা করছে।

ঝুমুরের আর তর সইছিল না। ও সুপ্রতিমের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। ওর কোলে উঠে বসল একেবারে।

সুপ্রতিমের মনে হল একটা কোলাব্যাঙ ওর কোলে বসে আছে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে ও ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে-গালে চুমু খেল। বিড়বিড় করে বলল, আই লাভ ইউ ঝুমুর...।

শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসা বমির দমক রুখে দিয়ে সুপ্রতিম ভাবল, নয়না এখনও আসছে না কেন!

আর ঠিক তখনই ঝুমুরের নগ্ন কাঁধের ওপর দিয়ে সোফার ওপরে পড়ে থাকা ক্ষুরটা ও দেখতে পেল। হাতের প্রায় নাগালে রয়েছে ওটা।

ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে কোনওরকমে হাঁটুগেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রতিম। পলকা ছেলেটা সুপ্রতিমের আশ্লেষে আনন্দে টইটম্বুর হয়ে ভালোবাসার প্রলাপ বকছে শুধু। আর সুপ্রতিম নিজের প্রাণ বাঁচাতে একের-পর-এক চুমু খেয়ে চলেছে ওর স্নো-পাউডার ঘষা মুখে।

ক্ষুরটা এখন পুরোপুরি সুপ্রতিমের হাতের নাগালে।

ও মুঠো করে অস্ত্রটা ধরল। তারপর ঝুমুরকে আদর করতে করতে ক্ষুরটা নিয়ে এল ওর গলার খাঁজের কাছে।

কতক্ষণ আর সুপ্রতিমের শক্তি থাকবে কে জানে! মাথা ঝিমঝিম করছে। রক্তে চটচট করছে হাত-পা-বুক।

চুলোয় যাক ভদ্রতা, সভ্যতা, নীতি, দয়া ইত্যাদি।

আত্মরক্ষা মানুষের একটা আদিম ধর্ম।

বাঁ-হাতে ঝুমুরের মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়েই ডান হাতে ক্ষুর টেনে দিল সুপ্রতিম।

ঝুমুরের ভালোবাসার প্রলাপ মাঝপথেই থেমে গেল। তার বদলে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোতে লাগল মুখ আর গলা দিয়ে। ঝুমুর আর নেই।

রক্তে মুখ-গলা-বুক ভেসে গেল সুপ্রতিমের। ওর মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে পড়ল মেঝেতে। ঝুমুরের মৃতদেহ তখনও ওকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

একটি অচেতন দেহ ও একটি মৃতদেহ অসাড় হয়ে নয়না অথবা আর কারও জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যে প্রথম এসে ঢুকবে ঘরে।

রক্তের ধারা তখন মেঝেতে গড়িয়ে-গড়িয়ে সময়ের হিসেব রাখছিল।

# ইনস্পেক্টর রনি ও অলৌকিক সার্কাস (নভেলেট)

**ইনস্পেক্টর রনি ও অলৌকিক সার্কাস (নভেলেট)**

সার্কাসের বাঘের খেলা থেকেই যত গোলমালের শুরু।

সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। একাই। কিন্তু সার্কাস দেখতে আমার এখন আর ভালো লাগে না। কারণ, সার্কাস দেখতে গেলে মনে পড়ে যায় আমার মেয়ে টুসির কথা। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকবার সার্কাস দেখেছি। ও বাঘ-সিংহের খেলা দেখতে ভালোবাসত। লাল-নীল-সবুজ রঙের ম্যাকাও পাখির কেরামতি দেখে ছোট-ছোট হাতে খুব হাততালি দিত। কতই বা বয়েস ছিল তখন ওর–বড় জোর আট। এখন যদি ও আমার পাশে থাকত তা হলে বয়েসটা আরও দু-বছর বেশি হত।

বাঘের খেলা দেখাচ্ছিল রিং-মাস্টার। পরনে সোনালি পোশাক, হাতে বৈদ্যুতিক চাবুক। তাকে ঘিরে নটা হিংস্র ডোরাকাটা বাঘ ভিজে বেড়ালের মতো বসে আছে। দেখে কে বলবে, এদের থাবার এক ঘায়ে এরকম আড়াইজন রিং-মাস্টার খতম হয়ে যেতে পারে!

সার্কাসটা একটু নতুনরকমের। বাঘের খেলা বা সিংহের খেলা দেখানোর সময়ে এরা কোনওরকম লোহার রেলিং ব্যবহার করে না। তার বদলে কাজে লাগায় অদৃশ্য ফোর্স ফিল্ড। সেটা পেরিয়ে জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ, কেউই দর্শকদের নাগাল পাবে না। এ ছাড়া, দর্শকদের সুবিধের জন্যে প্রায় দোতলা-সমান উঁচুতে টাঙানো রয়েছে চার-চারটে বিশাল মাপের লিকুইড ক্রিস্টাল টিভি পরদা। তাতে বাঘ আর রিং-মাস্টারের মুখের ক্লোজ আপ ছবি দেখা যাচ্ছিল।

আমার ঠিক পাশেই বসেছিল বছর পাঁচেকের একটা বাচ্চা মেয়ে। গায়ের রং কালো, তবে মুখখানা ভারী মিষ্টি। মাথা-ভরতি ঝোঁকড়া চুল। তাতে আবার লাল ফিতে বাঁধা। পরনে গোলাপি রঙের ফ্রক। সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা পুতুল।

বাচ্চা মেয়েটা হাত-পা নেড়ে ফুরফুর করে কথার খই ফোঁটাচ্ছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বাবা-মাকে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছিল। প্রশ্নের বিষয়ও যথারীতি বহুমুখী। যেমন, বাঘের লেজ কেন রাস্তার কুকুরের মতো গোল পাকিয়ে থাকে না, বাঘ যদি সিংহের মতো দেখতে হত তাহলে কী হত, ডোরাকাটা বাঘা বেড়ালের সঙ্গে বাঘের সত্যি-সত্যিই কোনও আত্মীয়তা আছে কি না, ইত্যাদি।

মেয়েটার বাবা শেষ পর্যন্ত আর না পেরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, কী সাংঘাতিক মেয়ে দেখেছেন! কোথায় মন দিয়ে বাঘ দেখবে, তা না, খালি উদ্ভট সব প্রশ্ন।

আমি হাসলাম। মুখের পেশিতে সামান্য টান লাগল। একটা স্বাভাবিক জবাব দেওয়া দরকার। ভদ্রলোক যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন আমার বুকের ভেতরে রয়েছে একটা মাইক্রোপ্রসেসর চিপ, আর মস্তিষ্কের খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে অর্ধপরিবাহী স্মৃতিকোষ।

তাই অনেকক্ষণ সময় নিয়ে তারপর জবাব দিলাম, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি! কী নাম তোমার?

মেয়েটা চটপট বলে উঠল, আমার নাম শর্বরী। শর্বরী মানে রাত্রি–।

ওর জবাব দেওয়ার ঢং দেখে আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম। ঠিক তখনই জোরালো সুরে বাজনা বেজে উঠল, আর সেটা ছাপিয়ে শোনা গেল বাঘের গর্জন।

সাধারণ সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর সময় কোনওরকম মিউজিক বাজানো হয় না। কিন্তু এই সার্কাসের সবই একটু অন্যরকম।

আমি শর্বরীকে বললাম, তুমি এক-দুই গুনতে পারো?

ও ঝটিতি ছোট্ট মাথাটাকে কাত করে, প্রায় কাঁধে ঠেকিয়ে বলল, হ্যাঁ–

তা হলে তুমি বাঘ গুনতে থাকো।

টুসিকে শান্ত করার জন্যে এই কৌশলটা মাঝে-মাঝে কাজে লাগাতাম আমি।

আমার কথায় শর্বরী ছোট্ট হাতের তর্জনী উঁচিয়ে এক-দুই করে বাঘ গুনতে শুরু করল।

শর্বরীর মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, আপনি একাই সার্কাস দেখতে এসেছেন?

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে জবাব দিলাম, হ্যাঁ–

এই অপরিচিত মানুষ দুজনকে কী করে আমি বলি, আমার আর কেউ নেই! টুসিকে নিয়ে শেষ যখন সার্কাস দেখতে এসেছিলাম তখন সঙ্গে সুনন্দা ছিল। এই শর্বরীর মতো টুসিও এসেছিল ওর মা-বাবার সঙ্গে। তারপর হল সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা। আমাকে নিয়ে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। শেষপর্যন্ত মানুষ জিতল বটে, তবে টুসি আর সুনন্দা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রোবট গবেষণায় তাক লাগিয়ে-দেওয়া এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার আমাকে নতুন জীবন দিলেন। ব্যাটারি, তার, মাইক্রোপ্রসেসর, আই. সি. চিপ, ধাতুর পাত এইসব কেমন করে যেন ঢুকিয়ে দিলেন। আমার শরীরের নানা জায়গায়। সেইসঙ্গে কীসব জটিল প্রোগ্রাম চালু করে দিয়েছিলেন। ব্যস! লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অপারেশান ডিভিশনের ইনস্পেক্টর রনি সরকার নতুন জীবন ফিরে পেল। কিন্তু কী অদ্ভুত আমার এই নতুন জীবন! থেমে যাওয়া জীবনকে আবার প্রাণের জোগান দিল ইলেকট্রনিক্স, আর বিশ্বকর্মা ডক্টর মজুমদার- আমার ঈশ্বর, আমার জীবনদাতা। প্রতি মাসে আমি একবার করে ওঁর কাছে যাই, রুটিন চেক আপের জন্যে।

আমার পুরোনো স্মৃতির প্রায় সবটুকুই মুছে গিয়েছিল, কিন্তু ধীরে-ধীরে সেগুলো ফিরে পাচ্ছি। টুসি আর সুনন্দার খোঁজ এখনও করিনি। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, এখনও সময় হয়নি–তুমি এখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যন্ত্র, আর পঞ্চাশ ভাগ মানুষ। তোমার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আরও সময় লাগবে। সেই সময়টা যাতে কম লাগে তার জন্যে তোমাকে স্বাভাবিক সব কাজকর্ম করতে হবে। আগের জীবনে যা যা করতে সেইসব কাজ করবে।

ডক্টর মজুমদারের পরামর্শেই আমার আজ সার্কাস দেখতে আসা। অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়েছি বিশ্রামের জন্যে। আজ তার দ্বিতীয় দিন।

শর্বরীর বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে তখনও আমাকে দেখছিলেন। শর্বরীর মাও আড়চোখে দেখছেন আমাকে। আমি একটু অস্বস্তি পেলাম। কারণ আমার অভিব্যক্তিগুলো এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ওঁরা সেটা ধরে ফেলেননি তো! তা ছাড়া, আমার গলার স্বরে সামান্য মেটালিক আওয়াজ থেকে গেছে। ফলে ওঁদের সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

কিছু একটা ভেবে বলতে যাব, তার আগেই শর্বরী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমি বাঘ গুনতে পারব না। একবার আটটা হচ্ছে, একবার নটা হচ্ছে।

আমি এবার একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, বাচ্চা মেয়ে তো, ভালো করে গুনতে শেখোনি।

আমার কথায় শর্বরী একেবারে চোখ গোল-গোল করে চেঁচিয়ে উঠল, না, আমি হানড্রেড পর্যন্ত কাউন্ট করতে জানি। বিশ্বাস না হয়—

তখনই বিশ্বাস হল আমার। দেখলাম, রিং-মাস্টার আটটা বাঘ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। অথচ একটু আগেই ন-টা বাঘ ছিল–আমি নিজে দেখেছি। আমার শরীরের ভেতরে রাখা ডিজিটাল কাউন্টারে সেই সংখ্যাটা ধরাও পড়েছিল। কিন্তু এখন আটটা। এটা কি ডক্টর মজুমদার বিশ্বাস করবেন? নাকি আমার প্রোগ্রাম বা সার্কিটের গোলমাল বলে ধরে নেবেন?

দেখেছেন, ওই বাঘটা মাপে কীরকম বড়! একটা বাঘের দিকে আঙুল তুলে মন্তব্য করলেন শর্বরীর বাবা। চোখের চশমাটা একবার নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে বসালেন।

বাঘটাকে আমিও দেখলাম। সত্যিই মাপে বেশ বড়। আর গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলোও যেন একটু অন্যরকম। আর একই সঙ্গে লক্ষ করলাম, বাঘের সংখ্যা এখন আবার নয়।

শর্বরীর বাবা-মা দুজনেই এটা লক্ষ করেছিলেন। চারপাশে তাকিয়ে বুঝলাম, আরও কয়েকজন যে ব্যাপারটা খেয়াল করেননি তা নয়। আর আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে রিং-মাস্টারের অসহায় হতভম্ব অভিব্যক্তি স্পষ্ট ধরা পড়ল।

চার পাশে আলোর ফোয়ারা, বাজনার ছন্দ, টিভি-পরদায় বাঘের ছবি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। দেখলাম, সার্কাস কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট গ্যালারিতে বেশ ভিড়। দু-একজন কর্তাব্যক্তি আঙুল তুলে এরিনার দিকে দেখাচ্ছেন। বাঘের গোলমালটা ওঁদেরও নজরে পড়েছে।

কী করব ভেবে ওঠার আগেই সেই প্রকাণ্ড বাঘটা হঠাৎই ফোর্স ফিল্ডের অদৃশ্য দেওয়াল লক্ষ্য করে লাফ দিল। সাধারণভাবে ফোর্স ফিল্ডে বাধা পেয়ে বাঘটার থেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছুই হল না। ওটা দিব্যি এসে পড়ল দর্শকদের এলাকায়।

আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হইচই।

চিৎকার-চেঁচামেচি-ছুটোছুটি। মাইকে বারবার ঘোষণা করা হতে লাগল, আপনারা শান্ত হোন। বাইরে যাওয়ার সবকটা দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তাকর্মীরা কাজে নেমে পড়েছে…।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! চেয়ার উলটে পড়ল, গ্যালারি ভেঙে পড়ল। আর বেপরোয়া ছুটোছুটি চলতেই থাকল। অথচ বাঘটাকে তখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

বাইরে যাওয়ার আটটা দরজাই দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা। সেখান দিয়ে বাঘটা যে বেরিয়ে যাবে তার কোনও উপায় নেই। আর রিং-মাস্টারের কাছে চুপচাপ বসে আছে আটটা ডোরাকাটা পশু।

শর্বরীর বাবা-মা ভয়ে চিৎকার করছিলেন। বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কোথা দিয়ে পালাবেন বুঝতে পারছিলেন না। আমি শর্বরীকে কোলে তুলে নিলাম। মেয়েটা পালকের মতো হালকা। মাকে কাঁদতে দেখে ওরও মুখ কাঁদো কাঁদো। ওকে কোলে নিয়ে এগোতে এগোতে বললাম, আপনারা আমার পেছন পেছন আসুন।

সবুজ ইউনিফর্ম পরা নিরাপত্তাকর্মীর দল তখন তাঁবুর চারপাশটা ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শকার। ওরা হন্যে হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাঘটাকে খুঁজছে। আর বেয়াদব দর্শকদের শাসন করছে। কিন্তু বাঘের কোনও দেখা নেই। কোথায় গেল অত বড় জন্তুটা?

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছিলাম। আর একইসঙ্গে চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা দেখছিলাম। ছুটোছুটি-ধাক্কাধাক্কি-হইচই যেমন চলছিল তেমনই চলছে। রিং-মাস্টার আটটা বাঘ নিয়ে চলে যাচ্ছে এরিনা ছেড়ে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে অবিরাম। নিরাপত্তাকর্মীরা দিশেহারা দর্শকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

স্বাভাবিক কারণেই দর্শকের ভিড় দরজার কাছেই বেশি। আমি সেদিকে না গিয়ে দুটো দরজার মাঝবরাবর একটা ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করে এগোলাম। শর্বরীর বাবা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, এখান দিয়ে কী করে বেরোবেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা বা সময় কোনওটাই ছিল না। টের পেলাম, শর্বরীর মা আমার শার্টের পিঠের দিকটা খামচে ধরে আছেন।

সার্কাসের গোটা এলাকাটা প্লাইউড আর টিন দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে সুন্দর গোলাপি রঙের আস্তর থাকায় সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। বোঝা গেল দেওয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দেওয়ার পর।

শর্বরীকে ডানহাতে সামলে রেখে আমি প্রথম ঘুসিটা মেরেছিলাম বাঁ-হাতে। তাতেই বেশ বড়সড়ো একটা গর্ত হয়ে ফেটে গেল প্লাইউডের দেওয়াল। তার ওপাশের টিনও গেল তুবড়ে। কিন্তু এখান দিয়ে বেরোতে গেলে ভাঙতে হবে অনেকটাই, আর হাতেও খুব বেশি সময় নেই। তাই শর্বরীকে ওর মায়ের কোলে দিয়ে পরের ঘুসিটা মারলাম ডান হাতে। আর তারপরই ডানপায়ের দুটো জোরালো লাথি।

বেশ জোরে শব্দ হল। প্লাইউডের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে ওপাশের একটা টিন ভেঙে পড়ে গেল। শর্বরীদের ডেকে নিয়ে বেরোতে যাব, কোথা থেকে একজন নিরাপত্তাকর্মী ছুটে এল আমাদের সামনে। আমার দিকে শকার উঁচিয়ে বলল, ফ্রিজ! আপনাকে আমার সঙ্গে অফিসে আসতে হবে। আপনি কোম্পানির প্রপার্টি ড্যামেজ করেছেন।

আমি জামার বুকপকেট থেকে ম্যাগনেটিক আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে লোকটির দিকে উঁচিয়ে ধরলাম। কার্ডে আমার হলোগ্রাফিক ফটো রয়েছে। রয়েছে পরিচয়।

কার্ডটা ওর চোখের সামনে নেড়ে বললাম, ইনস্পেক্টর রনি সরকার অপারেশন ডিভিশন, লালবাজার! সরি অফিসার, এখন আপনার সঙ্গে যাওয়ার সময় নেই–পরে এসে কথা বলব–। কার্ডটা আবার রেখে দিলাম পকেটে।

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটা শকার ফায়ার করতে যাচ্ছিল, তাই আমি বাঁ-হাতের তর্জনী শক্ত করে ওর কপালের ঠিক মাঝখানে এক টোকা মারলাম। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল। জানা কথা হবেই। কারণ আমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো ইস্পাতের রড দিয়ে তৈরি। লোকটা কাত হয়ে পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে টাল সামলে নিল। আর একই সঙ্গে শকারটা মুগুরের মতো ঘুরিয়ে চালিয়ে দিল আমার মুখ লক্ষ্য করে। আমি আড়াআড়িভাবে বাঁ-হাত তুলে সেটা রুখে দিলাম। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হল। আর সংঘর্ষের প্রচণ্ড আঁকুনি লোকটার হাতে গিয়ে পৌঁছোল। ও শকার ছেড়ে দিয়ে হাত কঁকাতে লাগল। অবাক হয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

শর্বরী ততক্ষণে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আর দেওয়ালের ফোকর দিয়ে লোকজন বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। আমি নিরাপত্তাকর্মীর গাল টিপে ধরলাম বাঁ-হাতের দু-আঙুলে। ওর চোখ দেখে বুঝলাম, দু-গালে লোহা টের পেতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বললাম, এই দেওয়াল ভাঙা নিয়ে আমরা পরে কখনও কথা বলব, অফিসার। আমার নামটা মনে আছে তো! রনি সরকার, অপারেশান ডিভিশন, লালবাজার।

ওকে ছেড়ে দিয়ে আমি দেওয়ালের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তাতে ফাঁকটা বোধহয় আরও খানিকটা বড় হয়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, শর্বরীরা আমার ঠিক পেছনেই আছে। ওদের পেছনে অন্যান্য লোকজনের ভিড়।

বাইরের খোলা মাঠে বেরোতেই ঠান্ডা বাতাস টের পেলাম। আমার শরীরের টেম্পারেচার সেন্সরগুলো ঠিকমতো কাজ করছে তা হলে! মাঝে-মাঝে ওগুলো গোলমাল করে। ওপরে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার আকাশে লালচে মেঘ জমেছে। দূরে হয়তো কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। শর্বরীর বাবা চেঁচিয়ে বললেন, টালা পার্কের দরজার কাছে আমাদের গাড়ি রয়েছে।

আমি বললাম, আপনারা জলদি চলে যান। শর্বরীকে সামলে রাখবেন।

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। তার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা। একটা ভিজিটিং কার্ড খুঁজে দিলেন আমার বুকপকেটে। বললেন, একদিন সময় করে এলে সত্যি খুব খুশি হব।

শর্বরীর মা ছোট্ট করে আসি বললেন। ওঁর কাঁধে এলিয়ে-থাকা শর্বরী কচি গলায় বলল, টা টা, আঙ্কল–।

আমি হাত নাড়লাম। ওঁরা একরকম ছুটে চলে গেলেন।

সার্কাস এলাকার বাইরেটা খোলা মাঠ। তার একটা পাশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাকা রাস্তায়। সার্কাস থেকে বেরিয়ে সেই ঢাল বেয়ে মানুষের ভিড় ছুটে চলেছে রাস্তার দিকে। সার্কাসে ঢোকার সময়ে দেখেছিলাম, বাইরেটায় ঘুগনি, ফুচকা, ভেলপুরি, গ্যাস বেলুন এসব বিক্রি হচ্ছে। এখন সেসব চোখে পড়ার উপায় নেই। শুধু দেখি তিনটে লাল-হলদে গ্যাস বেলুন সুতো-ঘেঁড়া অবস্থায় ভেসে যাচ্ছে আকাশে।

আমি নীচের রাস্তায় নেমে এসে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালাম।

এদিকটা অন্ধকার। সার্কাস এলাকার হ্যালোজেন বাতির আলো এতদূর এসে পৌঁছোতে পারেনি। পেছনের পকেট থেকে মিনি সেলুলার ফোন বের করে অপারেশান ডিভিশনে যোগাযোগ করলাম। বললাম, টালা পার্কের কাছে রকেট সার্কাস-এ একটা ঝামেলা হয়েছে।

ওপাশে ফোন ধরেছিলেন সার্জেন্ট রমাতোষ নন্দী। ভদ্রলোকের বুদ্ধি কম, তবে পরিশ্রম দিয়ে সেটা পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আর বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হলেও দেখায় পঁয়ষট্টির মতো।

নন্দী জিগ্যেস করলেন, সরকার, আপনি ওখানে কী করছিলেন?

সত্যি কথাটাই বললাম, সার্কাস দেখছিলাম।

কয়েক সেকেন্ড ওপাশে হাসির ফোয়ারা ছুটল। শুধু রমাতোষ নন্দী কেন, হেডকোয়ার্টারের প্রায় সকলেই জানে আমার সঙ্গে সার্কাস দেখার মতো কেউ নেই। আসল রনি সরকারের ছিল। রনির সেই পুরোনো জীবনের সঙ্গে নতুন জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা এখন আমাকে বলতে গেলে মানুষ বলেই মনে

করে না। কিন্তু সম্পর্ক যে সত্যি একটা আছে সেটা মানি শুধু আমি আর ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার।

অনেকক্ষণ পর নন্দী বললেন, আপনি তো এখন ছুটিতে রয়েছেন।

আমি এই মুহূর্তে লিভ ক্যান্সেল করছি। আপনি বসকে জানিয়ে দেবেন। আর এখানে জলদি কাউকে পাঠান। দুজন হলে কাজের সুবিধে হয়। আমি গাড়িতে ওয়েট করছি।

নন্দী কী একটা অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি টেলিফোনের সুইচ অফ করে দিয়েছি।

পরের টেলিফোনটা করলাম আর. জি. কর হাসপাতালে। ফোন করে রকেট সার্কাস-এর গোলমালের কথা বলতেই ওরা বলল, একটু আগেই খবর পেয়েছে। এক্ষুনি ওরা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছে।

ফোনটা অফ করে পকেটে রেখে রকেট সার্কাস-এর দিকে তাকালাম। বিশাল উঁচু তাঁবু। তাকে ঘিরে নানা রঙের আলোর নকশা। সার্কাসের কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস খেলার মডেলও তৈরি করা হয়েছে আলো দিয়ে। আর তার সঙ্গে বেজে চলেছে মন-মাতানো বাজনা।

বাইরেটা এত জমকালো, অথচ ভেতরে আতঙ্ক! ফোর্স ফিল্ডকে অগ্রাহ্য করে একটা বাঘ এরিনার বাইরে পালিয়েছে এবং চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

হইচই এখন অনেক কমে গেছে। লোকজনের ছুটোছুটিও নেই। শুধু এখানে-ওখানে নানা জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তারই মধ্যে সার্কাসের নিরাপত্তাকর্মীরা ঘোরাফেরা করছে। আহত ক্ষতবিক্ষত মানুষদের ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের চাপে পায়ের নীচে পিষে কেউ মারা গেছে কি না কে জানে!

আমি ভারী-ভারী পা ফেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। পকেট থেকে রিমোট ইউনিট বের করে বোতাম টিপতেই গাড়ির অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। আমি ভেতরে ঢুকে বসতেই দরজাটা নিজে থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সুইচ টিপে গাড়ির মাথায় বসানো ঘুরপাক খাওয়া লাল-নীল বাতি

জ্বেলে দিলাম। এর ফলে লালবাজার থেকে যে-ই আসুক, আমাকে চট করে খুঁজে পাবে।

আমি ছুটিতে থাকলেও অফিস আমাকে গাড়িটা সবসময় ব্যবহার করতে দেয়। যেমন, এই মুহূর্তে আমার উরুর লাগোয়া সিকিওরিটি চেম্বারে একটা হেভি ডিউটি জেনারেটর গান রয়েছে। এটাও অফিস আমাকে সবসময় ব্যবহার করতে দেয়।

আমি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

.

ঘরে এয়ারকুলার চলছিল। লুকোনো হলদে আলো সুদৃশ্য ঘরটাকে সমানভাবে আলোকিত করে রেখেছে। আমার সামনে সাদা ধবধবে টেবিল। টেবিলে পৃথিবীর একটা রঙিন ছবি। ছবিটা থেকে-থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রং পালটাচ্ছে। বোধহয় ক্রেমোস্ক্যান টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে।

টেবিলটা মাপে বেশ বড়। তার একদিকে আমি আর সার্জেন্ট সন্দীপ বর্মন। হেড কোয়ার্টার থেকে ওকেই পাঠিয়েছে। ও আমাকে এখনও ঠিক সহজভাবে নিতে পারে না, কিন্তু খুব একটা অপছন্দও করে না।

সন্দীপ বর্মন একটু আগেই এসে পৌঁছেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকতে ঢুকতে আমি ব্যাপারটা মোটামুটি ওকে খুলে বলেছি। রকেট সার্কাস-এর নিরাপত্তাকর্মীরা এখনও আটটা দরজায় শকার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে আহত মানুষদের কাতর আর্তনাদ। এই নিরাপত্তাকর্মীরাই সম্ভবত ত্রাণের কাজে হাত লাগিয়েছে। ওদের একজনকে ডেকে জানালাম আমাদের পরিচয়। বললাম, সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাতে সন্দেহ-মাখা নজরে আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুজন অফিসার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চলার পথে দেওয়ালের ভাঙা জায়গাটা বর্মনের চোখে পড়ল। সেখানে একজন নিরাপত্তা কর্মী পাহারায় ছিল। ও সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সরকার, এটা দেখেছেন?

আমি ছোট্ট করে বললাম, আমি ওখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

আমার কথা শুনে আমাদের সঙ্গের দুজন লোক অবাক হয়ে আমাকে খানিকক্ষণ দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

বর্মন পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে লাইটার জ্বেলে ধরাল। একটু ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বলল, দেখবেন, বসকে যেন আবার ফস্ করে বলে দেবেন না। তা হলে আমার চাকরিটা লস হয়ে যাবে।

আমি ঘাড় নাড়লাম। বর্মনের এই একটা মারাত্মক দোষ। ভীষণ সিগারেটের নেশা। অন ডিউটি অফ ডিউটি মানে না।

একটু পরেই আমরা একটা অফিসঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। কানে এল বাঘ অথবা সিংহের গর্জন। আর তারপরই হাতির ডাক। একজন নিরাপত্তা কর্মী বলল, আপনারা এখানে একটু ওয়েট করুন। তারপর সবুজ রঙের একটা প্লাস্টিকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। দরজার নেমপ্লেটে ঝকঝকে তামার ওপরে টানা-টানা সুন্দর হরফে লেখা রয়েছে–ড. পি. বিজয় রাঘবন। প্রোপ্রাইটার, রকেট সার্কাস।

বর্মন চাপা গলায় আমাকে বলল, কী কী জিগ্যেস করবেন ভেবে রেখেছেন?

আমি বর্মনের ঠোঁটের দিকে দেখলাম। ঠোঁট নড়া দেখে আমি কথা বুঝতে পারি। চাপা গলায় কেন, ফিশফিশ করে বললেও কারও কথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয় না। বর্মনের কথার উত্তরে বললাম, এখনও কিছুই ভাবিনি।

এমনসময় ভেতর থেকে ডাক এল। বর্মন সিগারেটটা ফেলে দিল একপাশে। তারপর আমরা দুজনে ডক্টর রাঘবনের চেম্বারে ঢুকলাম।

সুন্দরভাবে সাজানো ঘর। ঘরের চার দেওয়ালেই সার্কাসের নানা খেলার রঙিন ফটোগ্রাফ। ড. রাঘবন লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আলতো করে ওঁর হাত ধরলাম, যাতে ব্যথা না লাগে। একই সঙ্গে ওঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

রাঘবন বেশ মোটাসোটা লোক। মাথার চুল প্রায় কদমছাঁট। গায়ের রং মাঝারি। ছাই রঙের একটা কোট পরে রয়েছেন–সেটা বোধহয় ঘরের তাপমাত্রার জন্যে। কপালে সাদা আর লাল টিপের ছোঁওয়া। গলায় চর্বির থাক।

পরিচয় দিয়ে আমি আর বর্মন বসলাম রাঘবনের মুখোমুখি চেয়ারে। আমি বেশ সাবধানেই বসেছি, কিন্তু তাও স্টিল ফ্রেমের চেয়ারে কাচ-কোঁচ শব্দ হল।

গদিটাও যেন বসে গেল অনেকটা।

রাঘবন নিজের চেয়ারে বসলেন। তারপর সামনে দাঁড়ানো লম্বা-চওড়া মানুষটিকে বললেন, কৃষ্ণন, তুমিও বসো, কথা আছে।

রিং-মাস্টার কৃষ্ণনকে আমি আগেই চিনতে পেরেছি। এখন ওর পোশাক-আশাক পালটে গেছে, কিন্তু উপায় কী! কোনও মুখ একবার দেখলে সেটা আমি আর ভুলি না। তবে আমার এই অদ্ভুত ক্ষমতার সবটুকু কৃতিত্বই ডক্টর অভিজিৎ মজুমদারের।

কৃষ্ণন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। লক্ষ করলাম, ওর চোখেমুখে কেমন একটা বেপরোয়া রুক্ষ ভাব। হয়তো সবসময় বাঘ-সিংহ নিয়ে খেলা দেখায় বলে একটা আলগা অহংকার লেগে আছে।

রাঘবন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনস্পেক্টর সরকার, আমি আর কৃষ্ণন ওই বাঘের গোলমালের ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। আমাদের বাঘ নটা। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ আটটা বাঘ নিয়েই কৃষ্ণন শো করছে। কারণ আমাদের একটা ফিমেল বাঘ পদ্মিনী চারদিন আগে খাঁচায় মারপিট করে চোট পেয়েছে।

রাঘবনের কথার খেই ধরে কৃষ্ণন বলল, নাকের পাশে আর কাঁধের কাছটায় বেশ চোট পেয়েছে। অনেকটা রক্ত পড়েছে। আমাদের দলের ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছেন, ইনজেকশানও দিয়েছেন। এ কদিন ধরে পদ্মিনী আলাদা খাঁচায় রয়েছে। একটু আগেই ওকে দেখে এলাম। এরিনায় ও আসেনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নটা বাঘ আমিও দেখেছি। তক্ষুনি কীরকম যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। সঙ্গে রঙিন আলোর ঝলকানি এবং ভিডিও টেলিফোনের পরদায় একজন নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা গেল। তার চোখেমুখে উত্তেজনা ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

রাঘবন গম্ভীর থমথমে গলায় জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার, মনসুর?

স্যার, হাসপাতাল থেকে লোকজন নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছে। উন্ডেডদের আমরা গাড়িতে তুলে দিয়েছি। আর বাকিদের ফার্স্ট এইড দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু–।

কেউ মারাটারা যায়নি তো!

না, স্যার। টেন্ট এখন বলতে গেলে ফাঁকা। শুধু আমরাই চারপাশ গার্ড দিচ্ছি। আর তিনজন সুইপার টেন্ট বঁট দিয়ে সাফ করছে।

গুড। রাঘবন তৃপ্তির শব্দ করলেন জিভে। তারপর বললেন, তোমরা সবদিকে কড়া নজর রাখো। লালবাজার থেকে পুলিশ অফিসাররা এসেছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলছি। কৃষ্ণনও আমার কাছে আছে। লক্ষ রাখবে, টেন্ট থেকে অচেনা কেউ যেন তোমাদের নজর এড়িয়ে বেরোতে না পারে। আর উটকো কোনও লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। দিস ইজ মাই অর্ডার।

ও. কে. স্যার। মনসুর ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিল। লোকটা যে ভয় পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন?

কিন্তু একটা কথা ছিল, স্যার।

রাঘবন ভিডিয়ো ফোন অফ করতে গিয়ে থমকে গেলেন।

কী কথা, মনসুর?

টেন্টের মধ্যে কিছু একটা ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটার চলার আওয়াজ পাচ্ছি, বুঝতেও পারছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

রাঘবন যে ঢোঁক গিললেন সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। তার চোখ দুটো বড় হতে চাইছিল, কিন্তু তিনি ঝটিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। উত্তেজিত গলায় বললেন, হোয়াট দ্য হেল ডু য়ু মিন?

যা বলছি, সব সত্যি, স্যার। আমরা একটু নার্ভাস হয়ে গেছি।

রাঘবন আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ইনস্পেক্টর সরকার, কিছু বুঝতে পারছেন?

আমি মাথা নেড়ে না বললাম। তবে এটা বুঝলাম, মনসুর মিথ্যে বলছে না। কারণ ঘণ্টাখানেক আগে, সার্কাস চলার সময়ে, বাঘটা যখন ফোর্স ফিল্ড অগ্রাহ্য

করে লাফ দেয়, তখন আমি দেখেছি। লাফ দেওয়ার পরে বাঘটাকে আর দেখা যায়নি।

রাঘবনকে বললাম, মনসুর ঠিকই বলছে। চলুন, ওখানে গিয়ে দেখা যাক।

ডক্টর রাঘবন ভিডিওফোনে বললেন, ও. কে., মনসুর, আমি যাচ্ছি। তুমি চ্যাটার্জিকে বলো, স্ট্রং ফোর্স ফিল্ড অ্যাপ্লাই করে গোটা তাঁবুটাকে ঘিরে ফেলতে আর তোমরা প্রত্যেকে অ্যালার্ট থাকো।

ফোন অফ করে দিলেন রাঘবন। আর তখনই কৃষ্ণন চাপা গলায় বলে উঠল, ওটা বাঘ নয়। হয়তো কোনও অপদেবতা, জিন।

আমি অবাক হয়ে কৃষ্ণনকে দেখলাম। ও সত্যিই ভয় পেয়েছে। নইলে এরকম হাস্যকর কথা কখনও বলত না। ছেলেভোলানো গল্প তৈরি করতেই একমাত্র অপদেবতা-জিনজাতীয় বস্তুগুলো কাজে লাগে। বাস্তবের ডিকশনারিতে এদের নাম নেই, কখনও ছিল না।

আমরা চারজন উঠে দাঁড়ালাম প্রায় একইসঙ্গে। দরজার কাছে যেতেই দরজাটা নিজে থেকে খুলে গেল। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় বর্মন আমার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, সরকার, এই প্রবলেম সভ করতে গেলে পুলিশ দিয়ে কোনও কাজ হবে না, ম্যাজিশিয়ান দরকার।

আমি বর্মনের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলাম। মুখের পেশিতে যথারীতি টান লাগল। তবে এটা ভেবে ভালো লাগল যে, আমি রসিকতা বুঝতে পারছি। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, রসিকতা বোঝাটা কোনও যন্ত্রমানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র সুস্থ মানুষই রসিকতা বুঝতে পারে। তা হলে আমি কী?

প্লাস্টিকের পাতে তৈরি মসৃণ রাস্তা ধরে আমরা এরিনার দিকে এগিয়ে গেলাম। জন্তু জানোয়ারের চাপা গর্জন কানে আসছে। সার্কাসের খেলোয়াড়রা এখানে-ওখানে জটলা করছে। এরিনার এলাকায় ওদের ঢোকা এখন বারণ। তাই সিকিওরিটি গার্ডদের কাছ থেকে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে যে যার মতো গল্পগুজব করছে।

চলার পথে একজন লোক আমাদের দলে যোগ দিল। পরনে তার নিরাপত্তা কর্মীদের সবুজ ইউনিফর্ম। বুকে একটা লাল রঙের ব্যাজ লাগানো। তার

চারপাশে নীল বর্ডার।

ডক্টর রাঘবনের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, স্যার, ফোর্স ফিল্ড চালু হয়ে গেছে। তবে ফোর্স ফিল্ড দিয়ে ওই ইয়েটাকে বোধহয় ঠেকানো যাবে না।

রাঘবন আমার আর বর্মনের সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনুদীপ চট্টোপাধ্যায়– রকেট সার্কাস-এর সিকিওরিটি চিফ। আমি চ্যাটার্জির সঙ্গে হাত মেলালাম। টের পেলাম, ওর গায়ে চিফ হওয়ার শক্তি আছে।

আমাদের দু-পাশে ছোট-ছোট তাঁবু। তার দরজায় দরজায় কৌতূহলী চোখমুখ। হ্যালোজেন বাতির আলোয় সেইসব মুখে ভয়ের ছাপও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। বর্মন চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছিল। রঙিন ফাইবার গ্লাসের খুঁটি, হ্যালোজেন বাতি, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে রকেট সার্কাস-এর জাঁকজমকের কোনও খামতি নেই। ডক্টর রাঘবন কত টাকা ঢেলেছেন কে জানে!

ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় এগারোটা। কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই। আমার তো স্লিপ সার্কিট অন না করলে ঘুম পায় না। সুতরাং যখন-তখন ঘুম পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। অনুদীপ চ্যাটার্জি পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে কয়েকটা বোতাম টিপল। বোধহয় ফোর্স ফিল্ড অফ হয়ে গেল। তখন চ্যাটার্জি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বলল, আসুন, ভেতরে আসুন।

ইলেকট্রিক শকার হাতে তিনজন নিরাপত্তাকর্মী দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়তেই চ্যাটার্জি আবার রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে তার বোতাম টিপতে লাগল।

আমি আর বর্মন তখন এরিনা ও তার আশপাশটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছি।

ডক্টর রাঘবন কোটটা খুলে নিলেন গা থেকে। সেটা বাঁ-হাতের ওপরে ঝুলিয়ে চ্যাটার্জিকে বললেন, সব লাইট অন করে দিতে বলো–।

তার দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে সার্কাসের ভেতরটা চোখের পলকে দিন হয়ে গেল। সার্কাস চলার সময় আলোর বেশিরভাগটাই থাকে এরিনার মধ্যে।

দর্শকদের বসার অংশে সেরকম একটা আলোর ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু এখন তফাত বোঝার উপায় নেই। গোটা তাবুটাই হ্যালোজেন আলোর ঝকঝক করছে।

এখন কোনও মিউজিক বাজছে না। তবে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, চারটে টিভি-পরদা জীবন্ত। তাতে তাবুর বিভিন্ন অংশ ধরা পড়েছে। একটা পরদায় কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা যাচ্ছে। ভয়ার্ত মুখ। হাতের শকার যে কোনও মুহূর্তে খসে পড়তে পারে।

তাঁবুর মাথাটা ছুঁচোলো হয়ে কত ওপরে উঠে গেছে কে জানে! অদ্ভুত ধরনের এক পলিমার দিয়ে তাবুটা তৈরি। সেটা দেখতে অনেকটা ঘষা কাচের মতো। তাবুর ভেতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তবে ডক্টর রাঘবনের ঘরের মতো অত ঠান্ডা নয়। চারপাশের অসংখ্য ফাইবার গ্লাসের খুঁটিতে লাইট এমিটিং ডায়োড দিয়ে তৈরি বহুরকমের রোলিং ডিসপ্লে। তার কোনওটায় লেখা ধূমপান নিষেধ, আবার অন্য কোনওটায় লেখা রকেট সার্কাস যদি না দেখে থাকেন তা হলে আপনি রকেট কাকে বলে জানেন না, আর সার্কাস কাকে বলে তাও জানেন না।

সন্দীপ বর্মন আবার সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সরকার, আমি আগে কখনও সার্কাস দেখিনি।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমরা এখানে সার্কাস দেখতে আসিনি। টের পেলাম, কথাটা বলার সময় গলার স্বরে ধাতব ছোঁয়াটা মাথাচাড়া দিল।

তাঁবুর ভেতরে মোট বাইশজন নিরাপত্তাকর্মী আমার চোখে পড়ল। ওরা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুদীপ চ্যাটার্জিকে দেখেই ওরা খানিকটা তটস্থ হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

আমি কৃষ্ণনকে জিগ্যেস করলাম, আপনি কখন প্রথম গোলমালটা টের পেয়েছিলেন?

কৃষ্ণন বিরক্তভাবে আমার দিকে তাকাল। বোধহয় এর আগে ডক্টর রাঘবনও ওকে একই কথা জিগ্যেস করে থাকবেন।

একটু চুপ করে থাকার পর ও বলল, আপনি তো খেলা দেখেছেন। রেখা যখন উঁচু টুলটায় উঠল, তখনই আমি একটা বাড়তি বাঘ টের পেলাম। কারণ, তখন রেখার দু-পাশে তিনটে আর চারটে–মোট সাতটা বাঘ থাকার কথা। কিন্তু

দেখলাম, আটটা মানে মোট ন-টা। তার মধ্যে আবার একটা বাঘ সাইজে বেশ বড়।

অনুদীপ চ্যাটার্জি আমাদের ছেড়ে নিরাপত্তা কর্মীদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ির শব্দ কানে এল। সেইসঙ্গে কারও চিৎকার।

তাকিয়ে দেখি, অনুদীপ আর তিনজন নিরাপত্তাকর্মী এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে। আর ছ সাতটা চেয়ার উলটে গেছে। দুজন কর্মী শকার চার্জ করেছে। কারণ শুন্যে বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ল না।

তাঁবু এলাকার মেঝেটা নকশা কাটা প্লাস্টিকের তৈরি। ফলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আমার শরীরের যা ওজন তাতে এর ওপর দিয়ে দৌড়োনা ঠিক হবে না। বর্মন ব্যাপারটা আঁচ করল। এক ঝটকায় সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হোলস্টার থেকে জেনারেটর গান বের নিল। সেটা উঁচিয়ে ছুটে গেল চ্যাটার্জির দিকে।

মাই গড! বলে ডক্টর রাঘবনও ছুটলেন সন্দীপ বর্মনের পিছু পিছু।

কৃষ্ণন চেঁচিয়ে উঠল। বলল, হাওয়া-জিন ওদের ধাক্কা মেরেছে। আমি বাঘের সঙ্গে লড়তে ভয় পাই না, কিন্তু জিনের সঙ্গে তো আর জোর চলে না। বলে কৃষন তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল।

আমি ওকে ডেকে বললাম, যাবেন না, কৃষ্ণন, দরজায় স্ট্রং ফোর্স ফিল্ড রয়েছে। তারচেয়ে আসুন, আমরা সবাই মিলে ওটাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করি।

কৃষ্ণন দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি অটোমেটিক লক খুলে সিকিওরিটি চেম্বার থেকে হেভি ডিউটি জেনারেটর গানটা বের করে নিলাম। লেসার গানের তুলনায় এই বন্দুকে নিরাপত্তা অনেক বেশি।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, একটা কিছু তাঁবুর ভেতরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। ডক্টর রাঘবন কয়েকটা খুঁটির আড়ালে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। অনুদীপ চ্যাটার্জি নিজেকে সামলে নিয়ে রাঘবনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর নিরাপত্তাকর্মীরা আতঙ্কে গোলাপি দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিপদের আশঙ্কা যে ঠিক কতটুকু তা ওরা বুঝতে পারছে না।

এই নাম-না জানা প্রাণীটা যদি অদৃশ্য হয় তা হলে সে কি অন্ধ! কারণ আলোকবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে অদৃশ্য প্রাণীকে অন্ধ হতেই হবে। তার শরীরের প্রতিটি অংশকেই হতে হবে বায়ুর মতো–অর্থাৎ, তার শরীরের প্রতিসরাঙ্কের মান হতে হবে প্রায় ১.০। তার চোখের বেলাতেও তাই। সেইজন্যেই ওই চোখে বায়ুমাধ্যম দিয়ে আসা আলোকরশ্মি কোনও প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারবে না।

এই প্রাণীটাও কি সেইরকম? কিন্তু এ যে মাঝে-মাঝে দিব্যি চোখে-দেখা যায় এমন বাঘ হয়ে যাচ্ছে!

আমি আর কৃষ্ণন সামনে এগিয়ে গেলাম। এরিনার চারপাশ থেকে ফোর্স ফিল্ড তুলে নেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণন আমাকে বলে সেদিকে উঠে গেল। আর ঠিক তখনই একটা অর্ধেক বাঘ আমার চোখে পড়ল।

আমি কিছুতেই দৃশ্যটাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ঠিক পেটের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে একেবারে লেজের ডগা পর্যন্ত। শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে। এবং সেই অসম্পূর্ণ প্রাণীটা তিরবেগে ছুটছে।

ছুটতে ছুটতেই সেটা সটান এসে ধাক্কা মারল কৃষ্ণনকে। সেই ধাক্কায় কৃষ্ণন ছিটকে পড়ল হাত-পাঁচেক দূরে, আর ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আমি জেনারেটর গান তাক করে ফায়ার করলাম– একবার, দু-বার।

আমি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই না। এবারও হলাম না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে স্তম্ভিত করে দিল।

জেনারেটর গানের হাই লেভেল ফায়ারিং-এ প্রাণীটা একটুও বিচলিত হল না। বরং চোখের পলকে ওটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেনারেটর গানের হাই লেভেল ফায়ারিং-এ ভীষণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসও থাকে। এই ফায়ারিং-এর তেজ সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও প্রাণীর নেই। অন্তত আমি তাই জানতাম। তাই স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম, এই বিচিত্র অদৃশ্য প্রাণীটা এল কোথা থেকে!

সন্দীপ বর্মন দূর থেকে চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছিল। আমি ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে ডক্টর রাঘবনকে চেঁচিয়ে বললাম, ডক্টর রাঘবন, এক্ষুনি

একটা বড় জালের ব্যবস্থা করুন। নইলে এই জন্তুটাকে ধরা যাবে না। ওটা বাঘ নয়।

কৃষ্ণন উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল এরিনার কিনারার কাছে। সেখানে একটা ফাইবার পোলের গায়ে একটা নাইলন দড়ির মই জড়ানো ছিল। সেটা খুলে নিয়ে ও তরতর করে ওপরে উঠে যেতে লাগল। ওর হাতের পেশি, চোয়ালের হাড় ফুলে উঠেছে।

আমি নীচ থেকে চেঁচিয়ে ওকে ডাকলাম, কিন্তু ও শুনল না। দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে একটা ট্র্যাপিজের ওপরে বসে পড়ল।

ততক্ষণে রাঘবন অনুদীপ চ্যাটার্জিকে নির্দেশ দিয়েছেন জাল নিয়ে আসার জন্যে। দুজন নিরাপত্তাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাটার্জি তাঁবুর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মী এপাশ-ওপাশ ছুটোছুটি করছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সন্দীপ বর্মন ছুটে এল আমার কাছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, সরকার, হেড কোয়ার্টারে খবর দিন। ওরা দু-গাড়ি ফোর্স পাঠাক–।

একটা ব্যাপার আমাকে বেশ অবাক করেছিল। সেটা হল, অজানা এই প্রাণীটার আচরণ। এ-পর্যন্ত ওটা কারও কোনও ক্ষতি করেনি। ওটা যদি সত্যি-সত্যি একটা বাঘ হত, তা হলে এর মধ্যে কজন যে ওটার হাতে খতম হত কে জানে! বোধহয় কৃষ্ণনকে দিয়েই শুরু হত খতমের খেলা। সুতরাং এটা বলা যায়, প্রাণীটা আর যাই হোক, বিপজ্জনক নয়।

সন্দীপ বর্মনের কথার জবাবে বললাম, ফোর্সের কোনও দরকার নেই। এখানে বিশ-বাইশ জন সিকিওরিটি গার্ডই তো আমাদের সাহায্যের জন্যে রয়েছে। তা ছাড়া, প্রাণীটাকে আমি মারতে চাই না–ওটাকে জ্যান্ত ধরতে চাই।

কিন্তু এরকম একটা ভয়ংকর প্রাণীকে আপনি।

বর্মনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বাধা দিলাম, এটাই তো সবচেয়ে বড় গোলমাল, বর্মন। যে-প্রাণী আমাদের চোখে অদৃশ্য, তাই আমাদের কাছে ভয়ংকর। যে-প্রাণী কখনও আমরা চোখে দেখিনি, তাকে সামনাসামনি হঠাৎ দেখতে পেলে আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে কোনও অস্ত্র দিয়ে তাকে ঘায়েল

করা। অথচ সেই প্রাণীটা হয়তো নিরীহ, অসহায়। একটু থেমে আমি আরও বললাম, আসল গোলমালটা কোথায় জানেন? মানুষই সবচেয়ে বেশি হিংস্র, বিপজ্জনক। আপনার যদি এখানে ভয় করে তা হলে রাঘবনের চেম্বারে চলে যান। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। ইচ্ছে হলে মাঝে-মাঝে ফোনে খবর নেবেন।

এইসব কথা বলার সময় আমার উত্তেজনা বাড়ছিল। আর সেইসঙ্গে ধাতব সুর ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ছিল।

বর্মন অপমানিত মুখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আপনিই জিতলেন বলে আবার ফিরে গেল ডক্টর রাঘবনের কাছে।

অদৃশ্য প্রাণীটার নড়াচড়া বা ছুটোছুটি বোধহয় থামেনি। কারণ, শব্দ কানে আসছিল, দর্শকদের জন্যে সাজানো চেয়ার থেকে-থেকেই উলটে পড়ছিল, ছিটকে পড়ছিল। নিরাপত্তাকর্মীরাও তাদের ভয়ার্ত ব্যস্ততা বজায় রেখেছে। নিজেদের মধ্যেই চ্যাঁচামেচি করে কীসব বলছে।

এমনসময় চ্যাটার্জি ফিরে এল। সঙ্গে সেই দুজন নিরাপত্তাকর্মী ও চারটে মাউস মোবাইল বা মোমো। চারটে মোমো বয়ে নিয়ে আসছে প্রকাণ্ড একটা নাইলনের জাল। বিশেষ ধরনের নাইলনের সুতোয় বোনা।

মোমোর আকৃতি অনেকটা বাচ্চাদের প্র্যামের মতো। কিন্তু চলে হাই পাওয়ার ব্যাটারিতে। গাড়িগুলোর রং কমলা আর কালো। সামনে হাতের মতো চারটে ধাতব রড বেরিয়ে আছে। আর পেছনে লেজের মতো একটা ক্র্যাঙ্ক চলার তালে-তালে নড়ছে। ঠিক যেন একটা নেংটি ইঁদুর। সেইজন্যেই নাম মাউস মোবাইল।

মোমোর ড্রাইভাররা বসে আছে গাড়ির পেটের ভেতর সেঁধিয়ে। তারা চারজন পাশাপাশি চালিয়ে নিয়ে আসছে গাড়ি। সামনে বেরিয়ে থাকা ষোলোটা রডের ওপরে রাখা আছে নাইলনের জালটা। রং তার সাদা, কিন্তু শঙ্খের মতো চিকচিক করছে। এরকম নাইলন আমি চিনি–খুব হালকা অথচ শক্তিশালী।

আমি চ্যাটার্জিকে বললাম, তাবুর একপাশ থেকে জালটা ঘিরে ধীরে-ধীরে টেনে নিয়ে আসতে। ঠিক যেমন করে পুকুরে ঘেরা-জাল দিয়ে মাছ ধরে। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। চারটে মোমো আর জনাদশেক নিরাপত্তাকর্মী

চ্যাটার্জির নির্দেশমতো কাজ শুরু করে দিল। তবে প্রত্যেকের মুখেই আতঙ্কের ছাপ।

আমি জেনারেটর গান সিকিওরিটি চেম্বারে রেখে দিলাম। ওটা যে এখন কোনও কাজে লাগবে না তা একটু আগেই বোঝা গেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণন এখনও ট্র্যাপিজের ওপরে বসে। ভূত-প্রেতের অহেতুক আতঙ্কই ওর বারোটা বাজিয়েছে।

সন্দীপ বর্মন আর ডক্টর রাঘবন ব্যস্তভাবে জাল টানার তদারকি করছিলেন। যে-দেওয়াল ভেঙে আমি সার্কাসের বাইরে বেরিয়েছিলাম, সেদিকটা থেকেই শুরু হয়েছিল জাল টানার কাজ। আর আমি এরিনার এপাশে ঠিক ওদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

মোমোর ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ আর লোকজনের হইচই শব্দের তীব্রতা প্রায় ১১০ ডেসিবেলে নিয়ে গেল। কিন্তু এইসব শব্দের মধ্যে আর-একটা শব্দও শোনা যাচ্ছিল। সেটা ওই প্রাণীটার ছোটাছুটির শব্দ। এই জালের ফাঁদে প্রাণীটাকে ধরা যাবে তো!

আমাদের কপালে যে আরও দুঃখ আছে সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। জাল টানার কাজ আধাআধি হতেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, প্রাণীটার ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে জালের ওপিঠ থেকে। অথচ জাল যেভাবে টানা হচ্ছে তাতে জালের পাশ দিয়ে প্রাণীটার সটকে পড়ার কোনও পথ নেই। অন্তত পৃথিবীর কোনও প্রাণী হলে পারত না। তা ছাড়া, জালের ফুটোগুলোর মাপ এক বর্গইঞ্চির বেশি হবে না। তার ভিতর দিয়ে কি গলে বেরিয়ে যেতে পারে এই অদ্ভুত প্রাণী?

জাল টানার কাজ যতই শেষ হয়ে আসছে, আতঙ্কের মাত্রা তার সমানুপাতে বাড়ছে। একটা আস্ত ডোরাকাটা বাঘ দিয়ে যার শুরু, তার শেষ যদি এইরকম হয় তা হলে ভয় পাওয়ারই কথা।

লোকজনের হইচই-চ্যাঁচামেচি চলছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, ডক্টর রাঘবন, জাল টেনে আর লাভ নেই। ওটা এভাবে ধরা পড়বে না। জাল গুটিয়ে ফেলতে বলুন।

সুতরাং চারটে মোমো আর নিরাপত্তাকর্মীরা ক্ষিপ্রগতিতে জালটাকে আবার ভাঁজ-টাজ করে ষোলোটা ধাতব হাতের ওপরে সাজিয়ে দিল। ইঞ্জিনের গর্জন তুলে মোমোগুলো বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে। রওনা হল রকেট সার্কাসের অন্দরমহলের দিকে।

কৃষ্ণন ওপর থেকে চিৎকার করে বলল, ইনস্পেক্টর সরকার, দেখলেন, আমার কথা ঠিক হল কি না!

আমি শুধু একবার ওর দিকে তাকালাম। কিছু বললাম না। তখন আমি ভাবছি, কীভাবে প্রাণীটাকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখা যায়।

ডক্টর রাঘবন আমার কাছে এলেন। হাতের কোটটা কখন যেন একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখেছেন। এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও সামান্য ঘেমেছেন। কপালের টিপ ধেবড়ে গেছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে আমাকে প্রশ্ন করলেন তিনি, হোয়াট নেক্সট?

সন্দীপ বর্মন গম্ভীর মুখে হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার সামনে। ওর চোখেমুখে তাচ্ছিল্যের ভাব। বোধহয় আমার দৌড় দেখতে চায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বর্মন বলল, তা হলে এবার হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ফোর্স চেয়ে পাঠাই। ওদের বলি দুটো অ্যানিহিলেটর কামান নিয়ে আসতে।

আমি চমকে বর্মনের দিকে তাকালাম। অ্যানিহিলেটর কামান! ওটাই আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। ওটা কোনও জিনিসের দিকে তাক করে ফায়ার করলে পলকে তার তাপমাত্রা ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। প্রায় সব ধাতু ওই তাপমাত্রায় গলে যায়, কোনও প্রাণী তো কোন ছার! অ্যানিহিলেটর ব্যবহার করা মানে এই বোবা প্রাণীটা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ততক্ষণে আর-একটা মতলব মাথায় এসে গেছে আমার। বর্মনকে বললাম, একটা শেষ চেষ্টা করে দেখি। তাতে কোনও কাজ না হলে হেডকোয়ার্টারে খবর দেব, ওরা অ্যানিহিলেটর কামান নিয়ে আসবে। আমি চোখ ফেরালাম ডক্টর রাঘবনের দিকে, আপনার কাছে রং করার স্প্রে-গান আছে?

হ্যাঁ, আছে। সার্কাসের যত পেইন্টিং-এর কাজ সবই আমাদের নিজের লোকেরা করে।

কটা স্প্রে-গান হতে পারে?

তা দশ-বারোটা তো হবেই।

আমি বললাম, তা হলে চটপট লোক লাগিয়ে ব্যবস্থা করুন। আমি ওই অদৃশ্য প্রাণীটার গায়ে সাদা রং স্প্রে করে ওর চেহারাটা অন্তত দেখতে চাই।

অনুদীপ চ্যাটার্জি চোয়াল শক্ত করে পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। আমার কথা শেষ হতেই হইহই করে দলবল নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। লোকটার উৎসাহের প্রশংসা করতে হয়।

বড়জোর মিনিট পনেরো। তারমধ্যেই দেখলাম ওরা তৈরি হয়ে নিয়েছে। মনে হল, প্রাণীটা যে নিরীহ এটা বোধহয় ওরা সকলেই আন্দাজ করেছে।

এবারে কাজে নেমে পড়ল সাতটা মোমো আর চারজন নিরাপত্তাকর্মী। ফলে মোট এগারোটা স্পে-গান ধোঁয়ার মতো সাদা রং ওড়াতে লাগল বাতাসে। কর্মীরা সকলেই নাকে-মুখে রুমাল বেঁধে নিয়েছে। মোমোর ড্রাইভাররাও মুখ ঢেকে নিয়েছে কাপড়ে।

শুধু তাদের কপাল আর চোখ দেখা যাচ্ছে। তাদের প্রায় কাঁধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে একজন করে নিরাপত্তাকর্মী প্রে-গান চালাচ্ছে।

সাদা ধোঁয়া উড়তে লাগল তাবুর বাতাসে। স্পে-গানের শব্দ, মুখ-ঢাকা অবস্থায় জড়ানো কথার হইচই, আর সাতটা মোমোর ইঞ্জিনের গর্জন বোধহয় শব্দের তীব্রতা ১২০ ডেসিবেলে নিয়ে গেল। আমি দরকারি বোতাম টিপে আমার শ্রবণ ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে নিলাম। নইলে কানে বড় লাগছিল।

ডক্টর রাঘবন রুমালে মুখ ঢেকে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, ইনস্পেক্টর সরকার, প্রাণীটাকে দেখার পর আমরা কী করব?

আমি বললাম, জানি না। তবে যদি সম্ভব হয়, ওটার কয়েকটা খেলা আপনার সার্কাসের শো-তে কাল থেকে জুড়ে দেবেন।

ডক্টর রাঘবন হাসলেন না। অনেকটা আপনমনেই বললেন, জুওলজি নিয়ে ডক্টরেট করেছি– এরকম কোনও প্রাণী যে পৃথিবীর কোথাও জন্ম নিতে পারে তা

কখনও কল্পনাও করিনি। আমার বাবা এই রকেট সার্কাসের পত্তন করেছিলেন। তাঁর ভয়ডর বলতে কিছু ছিল না। আমারও ওই ব্যাপারটা বেশ কম।

আমি আঙুল তুলে ওপরে কৃষ্ণনের দিকে দেখালাম।

ডক্টর রাঘবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, ও রিং-মাস্টার হিসেবে খারাপ নয়। আগে আর-একটা কোম্পানিতে ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত। সেখানে বাঘ-সিংহ নিয়ে তালিম নিত। ওই কোম্পানিতে রিং-মাস্টার হঠাৎই হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়–শো চলার সময়। তখন কৃষ্ণন সেই শো চালিয়ে দেয়। সেই থেকেই সার্কাসের সার্কিটে ওর নাম খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমার কাছে ও আছে চার বছর। কিন্তু কখনও এরকম ভয় পেতে দেখিনি।

এমনসময় বাড়তি একটা জোরালো শব্দ হল। চমকে তাকিয়ে দেখি কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা মোমো উলটে পড়ে গেছে। সাদা ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে ওটাকে দেখা গেলেও ওটার ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ, চাকার ভনভন, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মোমোর দুজন মানুষই ছিটকে পড়েছে গাড়ি থেকে। ওরা ওঠার চেষ্টা করছে। আর ওদের সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে চার পাঁচজন নিরাপত্তাকর্মী।

রকেট সার্কাসের তাঁবু এখন বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। রঙিন যা কিছু ছিল ফাইবারের খুঁটি, চেয়ার, নাইলনের দড়ি, ইলেকট্রনিক রোলিং ডিসপ্লে–সবই সাদা রঙের পোশাক পরে নিয়েছে। দশটা স্পে-গান চলছে তো চলছেই। স্পে-গানের ক্যানের রং ফুরিয়ে গেলে দুজন কর্মী তিনটে রঙের ড্রাম থেকে তড়িঘড়ি রং ভরতি করে দিচ্ছে ক্যানে। প্লাস্টিকের মেঝে, এরিনা, দেওয়াল, সব রঙে মাখামাখি। নিরাপত্তাকর্মীদের আলাদা করে চিনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনুদীপ চ্যাটার্জিকে আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু সন্দীপ বর্মনকে চট করে চিনতে পারলাম ওর হাতে ধরা জেনারেটর গানের জন্যে।

ডক্টর রাঘবনও রঙের হাত থেকে রেহাই পাননি। আর আমার অবস্থাও প্রায় একইরকম।

হঠাৎই এক তীব্র চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা করেছে একইসঙ্গে অন্তত তিনজন। ডক্টর রাঘবন আমার হাত খামচে ধরলেন উত্তেজনায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নিলেন। অবাক চোখে দেখলেন আমার হাতের দিকে।

আমি সবসময় ফুলহাতা শার্ট পরি। তাই বাইরে থেকে ধাতুর কারিকুরি কিছু বোঝা যায় না। সুতরাং রাঘবনও কিছু বুঝতে পারলেন না। শুধু কোনওরকমে চাপা গলায় বললেন, ওরা বোধহয় প্রাণীটাকে দেখতে পেয়েছে।

রাঘবনের কথাই যে ঠিক সেটা বুঝতে পারলাম লোকজনের পরিত্রাহি ছুটোছুটি দেখে। তবে বাকিরা খানিকটা দূরত্ব থেকে কিছু একটা দেখতে চেষ্টা করছে।

অকুস্থলটা এরিনার ডানদিকে, ঠিক পাশ ঘেঁষে।

আমি এগিয়ে চললাম সেদিকে। টের পেলাম, ডক্টর রাঘবন আমার পেছনেই রয়েছেন।

সাদা ধোঁয়ার মেঘ সরিয়ে খানিকটা এগোতেই প্রাণীটা নজরে পড়ল আমার। কী বিচিত্র তার চেহারা! তবে চেহারার নির্দিষ্ট কোনও বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই তা পালটাচ্ছে।

লম্বায় প্রায় কুমিরের মতো। লেজের অংশটার তিনটে মুখ রয়েছে। সারা গায়ে আর্মাডিলোর মতো বড়-বড় আঁশ। মাথাটা থ্যাবড়া মতো। গলার কাছে আট-দশটা ভাঁজ। পা কিংবা হাতের সংখ্যা ছয়। তাতে দুটো করে আঙুল কিন্তু মাঝে-মাঝেই সেই আঙুলের সংখ্যা বেড়ে চারটে হয়ে যাচ্ছে। প্রাণীটার নাক বেশ বড়, তাতে বিশাল দুটো ফুটো। নাকটা ডাইনে-বাঁয়ে নড়ছে। নাকের দু-পাশে দুটো চোখ। এক-একটা চোখ যেন চার ইঞ্চি ব্যাসের মার্বেল। তার ওপরে সাদা রঙের আস্তরণ থাকা সত্ত্বেও নড়াচড়া করছে। হয়তো সবকিছু দেখতেও পাচ্ছে। মুখটা বন্ধ করে রাখলেও কী করে যেন একটা কালো জিভ বারবার বাইরে বেরিয়ে আসছে।

প্রাণীটা মাঝে-মাঝে নিজের শরীরটাকে ভাঁজ করে নিচ্ছিল। ওটার নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথবা রঙের রাসায়নিক ওকে অবশ করে দিয়েছে।

সব কটা স্প্রে-গান থেমে গেছে। মোমোগুলোও দাঁড়িয়ে পড়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একটু আগের হইচই শব্দ হঠাৎই কমে গিয়ে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছে চাপা আলোচনা, গুঞ্জন।

বর্মন আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, সরকার, নিন, কাজ গুছিয়ে এবার চলুন।

আমি তখন ভাবছিলাম, এটা ভিনগ্রহের প্রাণী নয়তো?

কনট্যাক্ট নামে একটি সংস্থা প্রায় দশ-বারো বছর ধরে ভিনগ্রহী প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছে। কলকাতায় গত বছরেই ওদের একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। সেখানে ওরা কম্পিউটার গ্রাফিক্সে তৈরি করা অন্তত পঞ্চাশরকমের ভিনগ্রহী প্রাণীর ছবি দেখিয়েছিল। আমাদের ডিপার্টমেন্টকে ওরা সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এ. সি. বিকাশ মিত্র ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ভিনগ্রহীদের সেই গ্রাফিক্স ছবিগুলো আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। এখন, এই প্রাণীটাকে দেখে, সেই ছবিগুলো মনে পড়ে গেল। ছবিগুলোয় দেখা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এটার মধ্যে যেন দেখতে পাচ্ছি।

কনট্যাক্ট সংস্থাকে পৃথিবীর সব দেশই বেশ গুরুত্ব দেয়। কারণ, তার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে পুঁদে কল্পবিজ্ঞান লেখক, মনোবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রযুক্তিবিদ, পরিবেশবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, পুরাণীবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ। ওদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল ওরা সম্মেলনে প্রকাশ করে। সুতরাং মনে-মনে খুঁজে পাওয়া মিলগুলো বেশ কয়েকবার খতিয়ে দেখে আমি জোরের সঙ্গে বললাম, ডক্টর রাঘবন, এই প্রাণীটা হয়তো অন্য কোনও গ্রহ থেকে কোনওভাবে আমাদের এখানে এসে পড়েছে। আমাদের এখুনি কনট্যাক্ট-এ খবর দেওয়া দরকার।

কনট্যাক্ট? অনুদীপ চ্যাটার্জি একটুকরো কাপড় দিয়ে মুখের রক্ত মুছছিল। অবাক হয়ে কথাটা বলল।

আমি জবাবে কিছু একটা বলতে যাব, ঠিক তখনই একটা তীক্ষ্ণ ভ্রমরগুঞ্জন শোনা গেল। মিহি শব্দটা এত তীক্ষ্ণ যে সকলেই চমকে উঠে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল। প্রাণীটার মধ্যেও যেন হঠাৎই একটু চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। আর তখনই ভেসে বেড়ানো আলোর বিন্দুটা আমাদের নজরে পড়ল।

.

এরিনার ঠিক মাঝখানে উড়ন্ত জোনাকিপোকার মতো একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু পাক খাচ্ছে দুরন্ত গতিতে, ওঠা-নামা করছে নির্দিষ্ট ছন্দে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শোনা যাচ্ছে ভ্রমরগুঞ্জনের শব্দ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, আমাদের অবাক চোখের সামনে, আলোর বিন্দুর ঘিরে রাখা জায়গায় একটা অবয়ব দেখা দিল। প্রথমে ঝাপসা, তারপর ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই অদ্ভুত চেহারা। গলানো রুপোর মতো নমনীয় হয়ে নড়তে লাগল বেহিসেবিভাবে। যেন ঠিক করতে পারছে না, শেষ পর্যন্ত কোন আকৃতি নেবে।

একটু পরেই মানুষের চেহারা নিয়ে স্থির হল সেই অবয়ব। তার সারা শরীর রুপোর পাতের মতো ঝকঝক করছে। ধারালো নাক-মুখ-চোখ। স্পষ্ট হাত-পায়ের পেশি।

অদ্ভুত মানুষটা সম্পূর্ণ রূপ নিতেই আলোর বিন্দুটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরই পরিষ্কার গলায় কেউ যেন বলে উঠল, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, নিভিয়ালটাকে এতক্ষণ এখানে আটকে রাখার জন্যে। আমার আসতে আর-একটু দেরি হলেই ওটা হয়তো এখান থেকেও পালাত।

আমরা সকলেই হতবাক। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছি রুপোলি মানুষটার দিকে। সে তার চকচকে চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেখল। তারপর আবার বলল, আমাকে দেখে অবাক হবেন না। ভয়ও পাবেন না। আমি আসছি বহুদূরের এক নক্ষত্রের একটি গ্রহ থেকে। এই নক্ষত্রটিকে আপনারা জিটা অরিওনিস নাম দিয়েছেন। আমরা খুব সহজে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারি, মস্তিষ্কের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি। আর অন্য কোনও প্রাণীর স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা নিজেদের স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করে নিতে পারি যখন-তখন। তাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

রুপোলি মানুষের চেহারা-নেওয়া ভিনগ্রহী প্রাণীটি নেমে এল এরিনা থেকে। তার শরীর থেকে কেমন এক অদ্ভুত আলোর আভা বেরোচ্ছে। ডক্টর রাঘবনের কাছে এসে সে বলল, ডক্টর, আপনার মতো আমিও একটা সার্কাসের মালিক। নানা গ্রহে ঘুরে-ঘুরে আমি সার্কাসের শো করি। আমার দলে হরেকরকম বিচিত্র

জীবজন্তু রয়েছে। মাঝে-মাঝে এইসব প্রাণী সংগ্রহের জন্যে আমি অন্যান্য গ্রহে চলে যাই। সেখানকার পাহাড়ে, সমুদ্রে, জঙ্গলে, ঘুরে বেড়াই।

আমি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জিগ্যেস করলাম, এই নিভিয়ালটাকে কোথায় পেয়েছেন?

আপনাদের সৌরজগতের ছ-নম্বর গ্রহটির পঞ্চম উপগ্রহে।

শনির উপগ্রহ–রিয়া?

হ্যাঁ, আপনারা ওই নামই দিয়েছেন ওটাকে। আপনারা ওটা আবিষ্কার করেছেন প্রায় ৩২০ বছর আগে। আর আমরা ওটার সন্ধান জেনেছি প্রায় ১০০০ বছর আগে। রিয়ার ব্যাস প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। বরফে ঢাকা। তাতে জমাটবাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড আর মিথেনই বেশি। কিছুদিন আগে সেখানে আমরা একটা অভিযান চালিয়েছিলাম। তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিন্দুক দেখতে পাই। সিন্দুকে একটা সতর্কবাণী লেখা ছিল।

কী লেখা ছিল? ডক্টর রাঘবন প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে নিভিয়ালটার কাছ থেকে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল। নিরাপত্তাকর্মীরা নড়ছে, নড়ছে! বলে চিৎকার করে উঠল।

রুপোলি মানুষটি কোনও ভয় নেই বলে এগিয়ে গেল প্রাণীটার কাছে। ডান হাতটা শুন্যে তুলে ধরল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। পরের মুহূর্তেই একটা সবুজ আলোর সুতো বেরিয়ে আসতে লাগল মানুষটির তর্জনীর ডগা থেকে। বিদ্যুতের রেখার মতো এঁকেবেঁকে সেই সবুজ প্রতিপ্রভ সুতো জালের মতো জড়িয়ে যেতে লাগল নিভিয়ালটার গায়ে।

প্রাণীটাকে এখন লক্ষ করে বেশ অবাক হলাম। ওটা শুধু যেন নড়ছে তাই নয়, ওটার গায়ের সাদা রং অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। আর শরীরের কোনও-কোনও অংশের রং হালকা নীল প্লাস্টিকের মেঝের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ফলে হঠাৎ করে প্রাণীটাকে জায়গায়-জায়গায় খাপছাড়াভাবে অদৃশ্য মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, প্রাণীটার শরীরের আকৃতিও এখন বেশ পালটে গেছে। লেজটা অনেক খাটো হয়ে গেছে। মাথাটা হয়ে গেছে সরু, লম্বা। হাত বা পায়ের সংখ্যা ছয়ের বদলে এখন চার।

প্রাণীটা নড়াচড়া করছিল, তবে মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করছিল না। এখনও পর্যন্ত ওর কোনও গর্জন শোনা যায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা সবুজ আলোর সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি হয়ে গেল।

কাজ শেষ করে রুপোলি ভিনগ্রহী ফিরে তাকাল আমাদের দিকে। ঠোঁট প্রসারিত করে হাসতে চেষ্টা করল।

কী লেখা ছিল ওই সিন্দুকের গায়ে? ডক্টর রাঘবন অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন আবার।

হাত তুলে ডক্টর রাঘবনকে আশ্বস্ত করল সে। বলল, বলছি। এবারে একটু নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। নিভিয়ালটাকে আমি হাই পাওয়ার লেসার লক দিয়ে বন্দি করেছি, এখন ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত।

আগন্তুকের বাঁ কাঁধের কাছটা কেমন যেন গলে গিয়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। সেটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে সে বাঁ-হাতটা শূন্যে তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে গলিত রুপো যেন সুষম স্রোতে প্রবাহিত হয়ে কাঁধের আকার আবার মেরামত করে দিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আগের কথার খেই ধরে বলতে শুরু করল সে, ওই সিন্দুকের গায়ে সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল, একটা আশ্চর্য প্রাণী বন্দি রয়েছে এই সিন্দুকের মধ্যে। নাম নিভিয়াল। একে ক্ষতিকর মনে হওয়ায় কোনও এক অজানা গ্রহ সিরা-টু-র বাসিন্দারা এই প্রাণীটাকে বন্দি করে চিরকালের জন্যে নির্বাসন দিয়েছে। ওরা প্রাণীহত্যা করে না। তাই এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ যেন এই সিন্দুকের কম্বিনেশন লক না খোলে।

আপনারা সেই লক খুললেন? প্রশ্নটা করল সন্দীপ বর্মন। কখন যেন সে আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে-মুখে স্পে-গানের সাদা রং লেগে রয়েছে।

আগন্তুক জবাব দিল সঙ্গে-সঙ্গেই, হ্যাঁ, খুললাম। আমাদের দলে একজন তালা খোলার ওস্তাদ ছিল। সে-ই খুলে দিল লকটা। তখন প্রাণীটাকে বের করে আমরা মহাকাশযানে তুলে নিয়ে রওনা হলাম। আমাদের দলের সবাই তো খুব খুশি। এই প্রাণীটাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা নতুন খেলা চালু করা যাবে আমাদের সার্কাসে।

প্রাণীটার কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার আমরা লক্ষ করলাম। ওটা ইচ্ছেমতো নিজের গায়ের রং খুব তাড়াতাড়ি পালটে ফেলতে পারে। আর ওটার আশ্চর্য ক্ষমতা হচ্ছে, পরিবেশ বা পটভূমির সঙ্গে গায়ের রং হুবহু মিলিয়ে দিতে পারে। ফলে তখন প্রাণীটাকে অদৃশ্য মনে হয়। ধরুন, কোনও দেওয়ালের সামনে ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেওয়ালটায় এলোমেলোভাবে পাঁচরকম রং লাগানো রয়েছে। ওই অবস্থায় ইচ্ছে হলেই এই নিভিয়ালটা দেওয়ালের রঙের নকশা হুবহু কপি করে ফেলতে পারে নিজের গায়ে। তখন ওকে আপনি দেখতেই পাবেন না। অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হবে।

উন্নত ধরনের বহুরূপী? রুপোলি আগন্তুকের কথা শুনে অন্তত তাই মনে হল। কিন্তু সিরা টু-র বাসিন্দারা এই নিভিয়ালটাকে ক্ষতিকর মনে করেছিল কেন? সে-কথা জিগ্যেস করতেই আগন্তুক বলল, সেটা ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি। নিভিয়ালটা আপনাদের এখানে এসে কোনও শব্দ করেনি, তাই না?

আমরা মাথা নেড়ে জানালাম, তাই।

আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এটা প্রায় সবসময় চিৎকার করে, কিন্তু তার সবটাই খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে সুপারসনিক লেভেলে। এই কম্পাঙ্কের শব্দ সিরা-টু-র বাসিন্দারা বোধহয় সহ্য করতে পারেনি। এতে হয়তো ওদের শরীরের ক্ষতি হত। সে যাই হোক, নিভিয়ালটাকে আমাদের খাঁচায় বন্দি করে ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক এঁটে দিয়েছিলাম। তার বাইরে থেকে প্রাণীটাকে আমরা কয়েকজন খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম। তাতে দেখলাম, ওটা খুশিমতো নিজের চেহারা পালটাচ্ছে। আবার কোনও জিনিসকে পছন্দ হলে তাকে হুবহু কপিও করে ফেলছে।

আমি ডক্টর রাঘবনের দিকে তাকিয়ে বললাম, এবারে বুঝলেন তো আপনার টাইগার মিস্ত্রি! আর অর্ধেক বাঘের ব্যাপারটাও বোঝা যাচ্ছে। কৃষ্ণনকে এবার ওপর থেকে নেমে আসতে বলুন।

ডক্টর রাঘবন হেসে এরিনার মাঝে এগিয়ে গেলেন। ওপরে তাকিয়ে হাত নেড়ে কৃষ্ণনকে নেমে আসতে বললেন। বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর কৃষ্ণন দড়ির মই বেয়ে নামতে শুরু করল।

রুপোলি আগন্তুক তখনও কথা বলছিল, নিভিয়ালটাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। ওটার অদৃশ্য হওয়া, সুপারসনিক চিৎকার, যখন-তখন চেহারা পালটানো, সবকিছুই আমাদের সার্কাসের পক্ষে ভালো। কিন্তু শুধু একটা ব্যাপারেই সমস্যা দেখা দিল।

আগন্তুকের চকচকে রুপোলি কপালে ভাঁজ পড়ল। চিন্তার সুরে সে বলল, কিছুতেই আমরা নিভিয়ালটাকে বন্দি করে রাখতে পারছি না। আর পারছি না বলেই হাইপারস্পেস দিয়ে আমাদের গ্রহে ফিরে যাওয়ার সময় কীভাবে যেন ওটা লক খুলে পালিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ করে আপনাদের সার্কাসে এসে হাজির হয়েছে। এখানে ওটার এসে পড়াটা নেহাতই একটা অ্যাকসিডেন্ট। স্পেস কার্ভেচার আর স্পেস হোলের ব্যাপার–যেমন করে হোক এসে পড়েছে। তারপর ওর কো-অরডিনেট হিসেব করে এখানে এসে পৌঁছোতে আমারও বেশ সময় লেগে গেল। এখন ওকে নিয়ে একটা স্পেস হোল দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব, ফিরে যাব আমাদের স্পেসক্র্যাফটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিভিয়ালটাকে হয়তো ছেড়েই দিতে হবে।

কেন, ছেড়ে দেবেন কেন? আমি জিগ্যেস করলাম।

কিছুতেই ওটাকে কম্বিনেশান লক দিয়ে আটকে রাখতে পারছি না। ওই সিন্দুকের কম্বিনেশান লকের গায়ে প্রাইম লক কথাটা লেখা ছিল। তার একটাই অর্থ হতে পারে। ওই কম্বিনেশানের নম্বরটা একটা মৌলিক সংখ্যা–প্রাইম নাম্বার।

বর্মন আমার কাছে সরে এসে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, সরকার, প্রাইম নাম্বার ব্যাপারটা কী বলুন তো?

আমি নীচু স্বরে জবাব দিলাম, একটা পূর্ণসংখ্যা, যাকে ১ আর সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়–এ ছাড়া অন্য কোনও পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মেলে না। যেমন ১৩, ৫৯, ১৪৯, ৩৩৩১। কেন, এগুলো পড়েননি? ইস্কুলে ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ানো হয়।

বর্মন হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, ওই একটা ব্যাপারেই আমি একটু বেশি উইক।

আগন্তুক বলছিল তখনও, তারপর থেকে আমরা এমন একটা প্রাইম নাম্বার বের করার চেষ্টা করছি যেটা অন্তত দশ অঙ্কের হবে। কারণ সিন্দুকের প্রাইম লকে দশটা কম্বিনেশন ডিজিট ছিল। আমরা আন্দাজে একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে কম্বিনেশন লক সেট করেছিলাম, কিন্তু সেটা এই নিভিয়ালটা উৎপাদকে ভেঙে ফেলেছে। অর্থাৎ, সংখ্যাটা মৌলিক সংখ্যা ছিল না। ফলে উৎপাদকে ভেঙে ফেলামাত্রই লকটা খুলে ফেলেছে প্রাণীটা।

কী সংখ্যা দিয়েছিলেন? ডক্টর রাঘবন এর মধ্যে কৃষ্ণনকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। উনিই কৌতূহলে প্রশ্নটা করলেন।

আগন্তুক বলল, ৪২৯৪৯৬৭২৯৭।

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, এর উৎপাদক হল ৬৪১ আর ৬৭০০৪১৭। এই দুটো সংখ্যার গুণফল ওই দশ অঙ্কের সংখ্যাটা। তবে এই উৎপাদক দুটো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা।

আড়চোখে দেখি বর্মন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুপোলি মানুষটা আমার দিকে এক-পা এগিয়ে এল। অনুনয়ের সুরে বলল, একটা দশ অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা বলে দিয়ে আমাকে বাঁচান। এই নিভিয়ালটাকে আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাই না।

লক্ষ করলাম, সকলেই আমার দিকে প্রত্যাশা-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে। আমি একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা ভেবে নিয়ে ওটাকে প্রাইম টেস্ট প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিলাম। সঠিক উত্তর বেরোতে অন্তত দশ মিনিট লাগবে। আমি আগন্তুককে বললাম, দশ মিনিট অপেক্ষা করুন।

এগারো মিনিট পর পরীক্ষা শেষ হল। তখন আমি মৌলিক সংখ্যাটা জানালামঃ ৫৭৬৩২১১৮৯৭।

আগন্তুক সংখ্যাটা একবার শুনে নিয়েই বলল, থ্যাঙ্ক য়ু, আর ভয় নেই। আমি তা হলে এবার নিভিয়ালটাকে নিয়ে ফিরে যাই?

আমরা সবাই পিছিয়ে দাঁড়ালাম। আগন্তুক নিভিয়ালটার কাছে গেল। ডান হাতটা শূন্যে তুলে নতুন ধরনের একটা ভঙ্গি করল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আর

প্রাণীটাকে ঘিরে একটা লাল আলোর রেখা দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগল। সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যেই ওদের ঘিরে একটা প্রতিপ্রভ আলোর জালে তৈরি লাল ঘনক দেখা গেল। নিভিয়ালটার চেহারা তখনও একটু-আধটু পালটাচ্ছে।

রুপোলি আগন্তুক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে হাসল। বলল, সুযোগ হলে আমাদের সার্কাস আপনাদের একদিন দেখাব।

কৃষ্ণন বিড়বিড় করে বলল, তার আর দরকার নেই। এর মধ্যেই ঢের সার্কাস দেখা হয়ে গেছে আমাদের।

হঠাৎ লাল ঘনক সমেত ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। শুধু আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে ডক্টর রাঘবন সবাইকে সবকিছু গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আবার শুরু হল কর্মব্যস্ততা।

রাঘবন আমাদের ডেকে নিয়ে চললেন ওঁর অফিসঘরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় পাঁচটা।

রাঘবনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে আমি আর সন্দীপ বর্মন বেরিয়ে এলাম রকেট সার্কাসের বাইরে।

বর্মন বলল, সরকার, এই ব্যাপারটার রিপোর্ট আপনি নিজে লিখবেন, ও আমার দ্বারা হবে না।

ঢালু জায়গাটা বেয়ে নামতে নামতে আমি বললাম, ঠিক আছে।

এখন তাড়াতাড়ি চলুন, ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে।

আমারও– কথাটা বলেই আমি অবাক হলাম। আমার ঘুম পাচ্ছে। অথচ স্লিপ সার্কিট আমি অন করিনি। ব্যাপারটা ডক্টর অভিজিৎ মজুমদারকে জানাতে হবে। আমার স্বাভাবিকভাবে ঘুম পাচ্ছে!

গাড়ির কাছে এসে আমি পকেট থেকে রিমোট ইউনিট বের করলাম। বোতাম টিপতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। চোখ পড়ল আকাশের দিকে। চারদিক ফরসা

হয়ে আসছে।

শর্বরীর কথা মনে পড়ল। বুকপকেটে হাত রাখতেই ভিজিটিং কার্ডটা টের পেলাম। শরীদের বাড়িতে একদিন যাব। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার দুঃখকষ্টের অন্ধকার রাতগুলো একদিন যেন শেষ হয়ে যায়।

# রক্তের দাগ ছিল (নভেলেট)

**রক্তের দাগ ছিল (নভেলেট)**

নিজের টেবিলে বসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শার্লক হোমস অমনিবাস পড়ছিল দশরথ সামন্ত। সারাটা জীবন ধরে সে ছিল তদন্ত-পাগল কনস্টেবল। বছরপাঁচেক হল রিটায়ার করেছে। রিটায়ার করার সময়েও সে প্রায় কনস্টেবলই ছিল। কারণ, প্রোমোশন সে নেয়নি–নিলে সরাসরি তদন্তের জায়গা থেকে তাকে হয়তো সরে যেতে হত।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর হঠাৎই একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দশরথের চোখে পড়ে। প্রাইভেট আই ডট কম নামের ডিটেকটিভ এজেন্সি একজন বয়স্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইছে। তদন্তের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়।

একমুহূর্তও দেরি না করে দশরথ সেখানে অ্যাপ্লাই করেছিল এবং ইন্টারভিউর ডাক পেয়েছিল।

ইন্টারভিউ নিয়েছিল এজেন্সির মালিক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। বছর তিরিশ-বত্রিশের টগবগে যুবক। লম্বা ফরসা চেহারা। মুখে কোথায় যেন একটা বেপরোয়া ভাব লুকিয়ে রয়েছে।

ইন্টারভিউর সময় দশরথ কাষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে হেসে বলেছিল, সময় মতো প্রোমোশন নিলে আমি স্যার পুলিশ কমিশনার হয়ে রিটায়ার করতে পারতাম কিন্তু করিনি। কারণ, ওই যে বললাম, ডায়রেক্ট তদন্তের প্রতি দুর্দান্ত টান। ঠিক যেন সন্তানের প্রতি মায়ের টান! তদন্ত–মানে, ইনভেস্টিগেশন ছাড়া আমি একটা মোমেন্টও থাকতে পারি না। তদন্ত আমার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ।

ইন্দ্রজিৎ বেঁটেখাটো বৃদ্ধ মানুষটাকে দেখছিল। কাঁচাপাকা চুল, তোবড়ানো গাল, কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা, কপালের বাঁ-দিকে একটা ছোট আঁচিল। বয়েসের ভারে চোখের রং খানিকটা ঘোলাটে হয়ে এলেও তা থেকে চনমনে ভাব উধাও হয়ে যায়নি। তা ছাড়া মাইনে খুব কম শুনেও মানুষটির উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি।

আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিটেকটিভের পোস্টে নিলে আপনি আর-একটা ব্যাপারে মোস্ট বেনিফিটেড হবেন, স্যার। প্রচুর রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনি আমি গুলে খেয়েছি। আর গত পঞ্চাশ বছর ধরে শার্লক হোমস আমার গুরু, আমার দেবতা। আমার এই এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আপনার তদন্তের কাজে হেভি হেল্প করবে, স্যার। যেমন ধরুন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, পাঁচকড়ি দে থেকে শুরু করে আজকের তপোজ্যোতি বর্মন, হরিহর ধর পর্যন্ত সবার লেখাই আমার নখদর্পণে। যখনই দরকার তখনই আমার কাছ থেকে রেডি রেফারেন্স পেয়ে যাবেন। পাঁচকড়ি দে-র নীলবসনা সুন্দরী কি আপনি পড়েছেন, স্যার? সেখানে...।

দশরথের পাঁচালি শুনতে-শুনতে ইন্দ্রজিতের মাথা ঘুরতে শুরু করেছিল। ও কোনওরকমে বৃদ্ধ মানুষটিকে থামিয়ে বিদায় দিয়েছে। এবং পরে ঠান্ডা মাথায় অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছে।

প্রাইভেট আই ডট কম-এর অফিস ম্যাডান স্ট্রিটে দুটি মাঝারি মাপের ঘর নিয়ে আধুনিকভাবে সাজানো।

বাইরের ঘরটা রিসেপশন গোছের। একপাশে বড় টেবিলে পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে জিনি রায়। ও একইসঙ্গে রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট এবং ইন্দ্রজিতের সেক্রেটারি। বয়েস বাইশ চব্বিশ হবে। ফরসা রোগা চেহারা। মুখের তুলনায় চোখ দুটো বেশ বড় মাপের। ঠোঁটে গাঢ় চকোলেট রঙের লিপস্টিক। চোখের পাতার ওপরে হালকা রঙের আস্তর। আর পারফিউমের সুগন্ধ ওকে চাদরের মতো জড়িয়ে রয়েছে।

ভগবান জিনিকে রূপ দিয়েছেন–তবে বুদ্ধির বিনিময়ে। কিন্তু তাতে জিনির কোনওরকম দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। ও সবসময় নিজের সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত। অফিস ছুটির পর ওকে দিয়ে একটি মিনিটও ওভারটাইম করানো যায় না।

হাবভাব দেখে মনে হয়, বিশাল বড়লোকের মেয়ে চাকরি করছে নেহাতই সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু আসলে তা নয়।

জিনির মুখোমুখি চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছে দশরথ। শার্লক হোমস অমনিবাস পড়তে পড়তে ওর বারবার হাই উঠছিল। বিনা কাজে এভাবে বসে থাকা যায়! সক্রিয় তদন্তের কোনও সুযোগ নেই। শুধু বিশ্রাম। মাইনেটাই কি সব!

দশরথ বই বন্ধ করে একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ল্যামিনেট করে বাঁধানো একটা ফটো দ্বিতীয় ড্রয়ার থেকে বের করল। ফটোটা টেবিলে সুন্দরভাবে দাঁড় করাল।

দশরথের দেবতা শার্লক হোমসের ছবি।

দশরথ ধূপকাঠি-দেশলাই বের করল ড্রয়ার থেকে। তারপর ধূপ জ্বেলে শার্লক হোমসকে আরতি করল বারকয়েক। কষ্ট করে একটা হাই চেপে বলল আপনমনেই, হে শার্লক হোমস, যে করে তোক একটা কেস এনে কোম্পানিটার বউনি করিয়ে দাও, বাবা।

জিনি একটা ছোট আয়না নিয়ে নিজের মেকাপ ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। একবার আড়চোখে দশরথকে দেখল। তারপর একটা হুঃ শব্দ করে নিজের কাজে মন দিল।

দশরথের আরতি শেষ হতে-না-হতেই ভেতরের ঘরের কাচের দরজা খুলে গেল। বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। কপালে ভাঁজ।

জিনির দিকে একপলক তাকিয়ে দশরথের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল ইন্দ্রজিৎ, বলল, দশরথদা, আজকের দিনটা গেলে চোদ্দোদিন হবে। চোদ্দোদিন হল অফিস খুলেছি, একটা কেসের খবর নেই। শুধু শো-কেস হয়ে বসে আছি! বাবা প্রথমেই বলেছিল, আমার পয়সা নষ্ট কর ক্ষতি নেই। তবে তোর ওই ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে নষ্ট করিস না। এখন বোঝো ঠ্যালা–।

দশরথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না, স্যার। আজ গুরুকে মন-প্রাণ দিয়ে হেভি ডেকেছি। আজ একটা-না-একটা কেস আসবেই। ঘরের ডিজিটাল ক্লকের দিকে একবার তাকিয়েঃ এখনও তো বারোটা বাজেনি।

না, বারোটা বেজে গেছে আমার কোম্পানির। বিরক্তভাবে সিগারেটে টান দিল ইন্দ্রজিৎঃ কী করে তোমাদের মাইনে দেব কে জানে!

জিনি এতক্ষণ সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ওদের কথাবার্তায় বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইন্দ্রজিতের শেষ কথাটা কানে যেতেই চট করে ফিরে তাকাল ওর দিকে। করুণ অথচ আদুরে গলায় বলল, মাইনে হবে না! কী বলছেন, স্যার!

ইন্দ্রজিৎ তখন স্বপ্ন-দেখার চোখে ঘরের একটা কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। আপিন মনেই বিড়বিড় করে বলল, আমাদের কোম্পানি দাঁড়াবেই। দরকার শুধু একটা কেস। জাস্ট একটা কেস।

দশরথ শার্লক হোমসের ফটোর সামনে হাতজোড় করে বলল, প্লিজ, জাস্ট ওয়ান কেস।

ইন্দ্রজিৎ সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিষঃ হেসে বলল, তোমার গুরুর বাড়ির ঠিকানাটা কী ছিল মনে আছে, দশরথদা?

মনে নেই আবার! দাঁত দেখিয়ে একগাল হাসল দশরথ ও ২২১বি, বেকার স্ট্রিট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল, ঠিক বলেছ। আমরা একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। বেকার– স্ট্রিট বেগার।

দশরথ জ্বলন্ত ধূপকাঠিটা পাশেই একটা জানলার তাকে ধূপদানিতে বসিয়ে দিয়েছিল। ইন্দ্রজিতের শেষ কথাটা শুনেই হাত বাড়িয়ে ধূপদানিটা নিল। আর-একদফা ঘুরিয়ে দিল শার্লক হোমসের ফটোর সামনে। তারপর চোখে-মুখে তীব্র ভক্তি প্রকাশ করে কাঁচুমাচুভাবে বলল, প্রভু, একটা কেস–জাস্ট একটা। তা হলেই…।

ভেতরের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ প্রায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

হ্যালো।

হ্যালো, প্রাইভেট আই ডট কম? ভারী গলায় কেউ জানতে চাইল।

ইয়েস।

আমার নাম মহেন্দ্র সেন। সল্টলেকে থাকি। কাগজে আপনাদের অ্যাড দেখেছি। তাই একটা জরুরি ব্যাপারে ফোন করছি। ফ্যামিলির ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল। সেটা আপনাদের অফিসে গিয়ে বলতে চাই। বুঝতেই পারছেন, সিক্রেসিটা খুব ইমপরট্যান্ট।

অবশ্যই, অবশ্যই! আপনি এখনই আমাদের অফিসে চলে আসুন। ঠিকানাটা জানেন তো? পাঁচ নম্বর ম্যাডান স্ট্রিট। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে। আমরা আপনার জন্যে ওয়েট করছি।

আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?

আমি এই কোম্পানির চিফ ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।

মহেন্দ্র সেন ও.কে. বলে লাইন কেটে দিলেন।

ইন্দ্রজিতের বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। হাতের নিভে যাওয়া সিগারেটটা ও টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। দু-হাত মুঠো করে কঁকিয়ে উল্লাসের ভঙ্গি করল–ব্যাটসম্যানকে বোল্ড আউট করার পর বোলাররা যেমন করে। তারপর প্রায় নাচতে নাচতে চলে এল বাইরের ঘরে। উত্তেজিতভাবে বলল, জিনি, দশরথদা–চটপট সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে নাও। এক্ষুনি আমাদের প্রথম ক্লায়েন্ট আসছেন! কথা শুনে মনে হল লাখপতি কি কোটিপতি হবে। আনন্দে হাতে হাত ঘষল ইন্দ্রজিৎ : আমাদের কোম্পানির প্রথম কেস।

দশরথ একবার চোখ তুলে ঘরে সিলিং-এর দিকে তাকাল। একবার চোখ বুজল। বোধহয় কাউকে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর শার্লক হোমসের ফটোটাকে প্রায় গড় হয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করল।

জিনি নিজের টেবিলটা চটপটে হাতে গুছিয়ে নিল। কম্পিউটারের কী-বোর্ডে খটাখট করে কয়েকটা বোতাম টিপল। তারপর নিজের মেকাপ করতে শুরু করল।

দশরথ শার্লক হোমসের ফটোটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলল। টেবিলটা টিপটপ করে সাজিয়ে নিল। তারপর নিজের পোশাকটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গুছিয়ে বসল।

ইন্দ্রজিৎ ঢুকে গেল ভেতরের ঘরে। নিজের গদিওয়ালা চেয়ারে বসে নতুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এর বিষয়ে লেখা একটা মোটা ইংরেজি বই নিয়ে পড়তে শুরু করল।

প্রাইভেট আই ডট কম-এর তিনজনেই প্রথম ক্লায়েন্টের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

.

সল্টলেকে চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে চোখ-ধাঁধানো বাড়ি বলতে একটাই–সেন কটেজ। স্যান্ড স্টোন আর গ্রানাইট দিয়ে আধুনিক ধাঁচে তৈরি তিনতলা বাড়ি। দরজা-জানলার মেহগনি কাঠ আর টিন্টেড গ্লাস।

ইন্দ্রজিতের রানি-রং মারুতি ভ্যান বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ঠিক বিকেল চারটেয়। গাড়ি থেকে নামল ইন্দ্রজিৎ, জিনি আর দশরথ।

মারুতি গাড়ির জানলার কাছে নিজের ছায়া দেখছিল জিনি, মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। হঠাৎই বাড়িটার দিকে চোখ পড়তে ও একেবার হতবাক হয়ে গেল। ওর ঠোঁট চিরে আবছাভাবে বেরিয়ে এল? ফ্যানটাস্টিক!

দশরথ হেসে বলল, এই অট্টালিকা যদি কটেজ হয়, স্যার, তা হলে হিমালয়কে আপনি উইয়ের ঢিবি বলতে পারেন।

ইন্দ্রজিৎ সামান্য মাথা নাড়ল। চোখ থেকে রে বান সানগ্লাসটা খুলে পকেটে রাখল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, দশরথদা, যা-যা বলেছি মনে আছে তো! তুমি চোখ-কান খোলা রাখবে, কোনও কিছু যেন নজর এড়িয়ে না যায়। ইন্দ্রজিৎ ঘুরে তাকাল জিনির দিকে জিনি, আমি যখন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, তখন তুমি শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে যাবে। কোনও কথা বাদ না যায়।

জিনি তখনও মুগ্ধ চোখে বাড়িটা দেখছিল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ও বলল, এটা বাড়ি নয়–স্বপ্ন। এরকম একটা স্বপ্নের বাড়িতে এরকম অঘটন ঘটেছে এটা ভাবা যায় না।

জিনি একটু বেশিরকম স্বপ্ন দেখে-বৈভবের স্বপ্ন। এ-ধরনের স্বপ্ন দেখা বোধহয় ওর শখ।

দশরথ চটপটে গলায় বলল, চলুন স্যার, আমরা তদন্তে নেমে পড়ি। শুধু-শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

পাথর বসানো পথ ধরে বাড়ির সদর দরজার দিকে এগোতে এগোতে ইন্দ্রজিতের কয়েক ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ছিল। যখন মহেন্দ্র সেন ওর ম্যাডান স্ট্রিটের অফিসে এসে হাজির হয়েছিলেন।

মহেন্দ্রকে দেখেই ইন্দ্রজিতের মনে হল, উনি লাখপতি নন–কোটিপতি।

মহেন্দ্রর চেহারা মোটাসোটা, পরনে ধবধবে পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা। গা থেকে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। ডানহাতের আঙুলে মোটা-মোটা চারটে সোনার আংটি। তাতে যথাক্রমে হীরা, চুনি ও পান্না বসানো–চার নম্বর পাথরটা ইন্দ্রজিৎ চিনতে পারল না।

মহেন্দ্রর গলায় সোনার ডগ চেন। বাঁ-হাতের বাহুতে সোনার তাবিজ। তাতেও বড় মাপের তিনটে পাথর।

মহেন্দ্রর বয়েস খুব বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ হবে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা–সোনারও হতে পারে। মাথায় শতকরা সত্তর ভাগই টাক। থলথলে মুখে ঘাম। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাঁফাচ্ছেন।

ইন্দ্রজিতের অফিসে ঢুকেই মহেন্দ্র জরিপ-নজরে সবকিছু মেপে নিচ্ছিলেন। বোধহয় বুঝতে চাইছিলেন প্রাইভেট আই ডট কম ওঁর সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি না।

ইন্দ্রজিতের মুখোমুখি চেয়ারে বসে আরামের একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করলেন মহেন্দ্র। তারপর পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেট বের করলেন নিজে

একটা নিলেন, ইন্দ্রজিৎকেও একটা দিলেন। সুরেলা শব্দ তোলা বিদেশি লাইটার দিয়ে দুজনের সিগারেট ধরালেন।

ইন্দ্রজিৎ ইন্টারকমে জিনিকে ডেকে নিল। জিনি শর্টহ্যান্ডের খাতা আর পেনসিল নিয়ে তৈরি হয়ে বসল। দশরথ তখন দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে। তদন্তের কৌতূহল ওকে সিটে বসতে দেয়নি।

মহেন্দ্র একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করলেন।

ইন্দ্রজিহ্বাবু, আমার বাবা জিতেন্দ্রনাথ বেশ বড়লোক। মানে, লাস্ট ফিনানশিয়াল ইয়ারে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছি বারো কোটি টাকা। আমাদের কোম্পানির নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন–সেন কেমিক্যাল প্রোডাক্টস।

ইন্দ্রজিৎ মাথা নাড়ল–নামটা ও শুনেছে। শুধু ও কেন, পশ্চিমবঙ্গের সবাই হয়তো শুনে থাকবে। সেন কেমিক্যাল প্রোডাক্টস দারুণ নামজাদা কোম্পানি।

আপনাদের প্রবলেমটা কী হয়েছে একটু বলবেন?

হ্যাঁ বলছি। ব্যাকগ্রাউন্ডটা না-বললে প্রবলেমটার গুরুত্ব বোঝা যাবে না। একটু থেমে মহেন্দ্র সেন আবার বলতে শুরু করলেন, আমাদের ফ্যাক্টরি দুটো–গড়িয়ায় আর সোনারপুরে। বেশ বড় মাপের ফ্যাক্টরিই বলা যায়। বাবা-ই সবকিছু দেখেন– মানে, দেখতেন। তা ছাড়া লোকজন তো আছেই। আমরা খুব একটা সময় দিতে পারি না।

আমরা মানে!

ছোট করে দুবার কাশলেন মহেন্দ্র। তারপর বললেন, আমরা মানে আমি, আমার ছোটভাই সুরেন্দ্র, আর ছোটবোন নবনীতা। আমরা আমাদের কাজকর্ম, শখ-আহ্লাদ নিয়ে থাকি। সে যাকগে, যা বলছিলাম।

মহেন্দ্রকে বাধা দিল ইন্দ্রজিৎ? একটু আগে আপনি বললেন আপনার বাবা সবকিছু দেখেন– মানে, দেখতেন। দেখতেন বলছেন কেন? এখন কি আর উনি দেখেন না?

না– কারণ, পাঁচদিন আগে উনি কিডন্যাপ্ড হয়েছেন।

কিডন্যাপড হয়েছেন!

হ্যাঁ। গত সোমবার ভোররাতে একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘর দোতলায়। আর বাবা একতলার বড় একটা ঘরে থাকতেন। আমি সিঁড়ির কাছে আসামাত্রই দেখতে পাই কয়েকটা কালো ছায়া কিছু একটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে উঠতেই তাদের মধ্যে একজন আমার দিকে রিভলভার তুলে শাসায়। বলে, চেঁচালে কি পুলিশে খবর দিলে আপনার বাবাকে খতম করে দেব। পরে আপনাকে ফোন করব। যান, ঘরে চলে যান। গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকুন। সকালে কেউ জিগ্যেস করলে বলবেন জিতেনবাবু কোম্পানির কাজে ট্যুরে গেছেন। যা-যা বললাম মনে থাকে যেন!

আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। সেই অবস্থাতেই কোনওরকমে ঘরে ফিরে গেছি।

বাড়ির সবাই খবরটা জেনেছে? ইন্দ্রজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

হ্যাঁ–সকালে সুরেন আর নবনীতা জেনেছে। আর পরানদাও জেনেছে।

পরানদা কে?

বাবার আমলের কাজের লোক। বয়েসে বাবার চেয়েও অনেক বড়। আমাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

কিডন্যাপারদের কোনও ফোন এসেছিল? টাকাপয়সা কিছু চেয়েছে?

হ্যাঁ, সোমবার সকালে ওরা ফোন করেছিল। পুলিশে কিছু জানাতে বারণ করেছে। তবে টাকাপয়সা এখনও কিছু চায়নি–বলেছে, পরে জানাবে। তারপর থেকে আর কোনও ফোন আসেনি।

ইন্দ্রজিৎ কপালে ভাঁজ ফেলে চিন্তা করছিল। মহেন্দ্র সেন আশা-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎই খেয়াল হওয়াতে হাতের নিভে-যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, মিস্টার চৌধুরী, আপনি আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে একবার আসুন। স্পটটা একবার দেখে নিন। তা ছাড়া আমার কতকগুলো পারসোনাল কথাও বলার আছে। আমাকে লেখা

বাবার একটা চিঠিও আপনাকে দেখাব। আর তার ওপর রয়েছে অনিমেষ সরকারের সমস্যা। বাবার ছোটবেলার বন্ধু–উনি গত পরশু আমাদের সল্টলেকের বাড়িতে এসে উঠেছেন। বাবা নেই, অথচ…সে এক বিরাট সমস্যা।

তার মানে! আবার কীসের সমস্যা?

ব্যাপারগুলো এখানে ঠিক ডিসকাস করা যাবে না। আপনি প্লিজ আমাদের বাড়িতে আসুন– তখন সব খুলে বলব।

আমি একা নয়–আমরা তিনজনে আজ বিকেল চারটেয় সময় আপনার বাড়িতে যাব।

তাই এসেছে ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে জিনি আর দশরথ।

কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলল একজন বয়স্ক কাজের লোক। বোধহয় পরান–ভাবল ইন্দ্রজিৎ।

জমকালো ড্রইং কাম-ডাইনিং স্পেসে ওদের আপ্যায়ন করে বসাল পরান।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এসে হাজির হলেন মহেন্দ্র। হেসে বললেন, আপনারা এসেছেন–ভীষণ খুশি হয়েছি।

ইন্দ্রজিৎ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছিল। এরকম ঘর হিন্দি ছবিতেই দেখা যায়। আসবারপত্রও ঘরের সঙ্গে মানানসই। দুরে, ঘরের শেষ প্রান্ত থেকে, সুন্দর বাঁক নেওয়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় দিকে।

আপনারা বসুন–আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। মহেন্দ্র সৌজন্য করে বললেন।

না, মিস্টার সেন। আগে বরং একটু কাজ সেরে নিই। ইন্দ্রজিৎ গা-ডুবে যাওয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালঃ চলুন, আপনার বাবার ঘরটা আগে দেখি।

জিনিকে চোখের ইশারা করে পা বাড়াল ইন্দ্রজিৎ। জিনি ওর শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেনসিল নিয়ে ইন্দ্রজিতের ছায়া হয়ে গেল।

মহেন্দ্র ইন্দ্রজিৎদের পথ দেখিয়ে দক্ষিণদিকে নিয়ে গেলেন। সেখানেই জিতেন্দ্রনাথের শোওয়ার ঘর। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে চাপা গলায় একান্তে কিছু কথাবার্তা বলছিল। ইন্দ্রজিৎদের দেখে চট করে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলল।

মহেন্দ্র সেন আলাপ করিয়ে দিলেন।

আমার ছোটভাই, সুরেন–আর বোন, নবনীতা। ইনি ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। বাবার কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে ওঁর হেলপ চেয়েছি। তোদের তো আগেই বলেছিলাম…।

নবনীতা হঠাৎই খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ওর উদ্ধত শরীরে নানারকম ভাঙচুর হতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বেশ কষ্ট করে ও বলল, বড়দা, তোমার এই গুঁড়ি গুড়ি ইমেজটা এবার ছাড়া তো! ভেতরে-ভেতরে তো আমাদেরই মতো তেষ্টায় মরে যাচ্ছ। অথচ মুখে একটা বেড়াল-তপস্বীগোছের ভাব ফুটিয়ে রেখেছ। নাঃ, সিনেমা লাইনটাই তোমার আসল লাইন ছিল। কেন যে ফর নাথিং একটার-পর-একটা নতুন-নতুন বিজনেস ট্রাই করে যাচ্ছ কে জানে!

নীতা! ইন্দ্রজিৎবাবু আমাদের গেস্ট। ওঁর সামনে তুমি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ! বাবা এখন কীরকম কষ্টের মধ্যে কী অবস্থায় আছে কিছুই জানি না। যে করে থোক বাবাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের কর্তব্য।

কর্তব্য! আবার একদফা কাচের-চুড়ি-ভাঙা হাসি। সে-হাসির মধ্যে শঙ্খচূড়ের বিষ ছিল। তারপর হাসি থামতেই ও জানি বড়দা, আসল কথাটা বলতে তোমার ভদ্রতায় আটকাচ্ছে। ও. কে., আমি বলে দিচ্ছি– ইন্দ্রজিতের দিকে ঘুরল নবনীতা : ওয়েল মিস্টার শার্লক হোমস, আসল ঘটনা হল বাবাকে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা দরকার। নইলে টাকার তেষ্টায় আমরা মরে যাব– তিনজনেই বড়দা, ছোড়দা, এবং আমি। বাবা ছাড়া আমাদের টাকার জোগান দেবে কে! কী ছোড়দা, কিছু ভুল বলছি? সুরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে নবনীতা জানতে চাইল। তারপর আবার ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করে ও পুলিশের ওপরে আমাদের কনফিডেন্স নেই–তাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এবার দেখুন চেষ্টা করে, বাবাকে

ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না! তবে করার চটপট করুন– নইলে যা ড্রাই অবস্থা! মরুভূমির চেয়েও খারাপ...।

ইন্দ্রজিৎ বেশ খুঁটিয়ে নবনীতাকে দেখছিল। জিনিও। তবে ও বোধহয় নবনীতার সাজগোজ লক্ষ করছিল।

নবনীতার ফরসা সুন্দর চেহারা। টানা-টানা চোখ, শ্যাম্পু করা চুল। চোখের কোলে অল্পবিস্তর দ্রুত জীবনযাপনের ছাপ। পরনে দামি চুড়িদার। গলায় সোনার চেন, কানে সাদা পাথর বসানো দুল–বোধহয় হিরেই হবে। এইসব জাতের বড়লোকেরা কখনও নকল গয়না পরে না। শুধু নকল জীবনের পিছনে ছোটে।

ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে আমি পরে ডিটেইলে কথা বলব। আগে জিতেনবাবুর ঘরটা একবার দেখে নিই।

ইন্দ্রজিতের কথার উত্তরে সুন্দর করে হাসল নবনীতা। বলল, আপনার সঙ্গে ডি-টে-ই লে কথা বলতে আমার বেশ ভালো লাগবে। ইউ লুক স্মার্ট। আপনাকে ডিটেকটিভ হিসেবে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। টা-টা...। হাত তুলে আঙুল নাড়ল নবনীতা : আমি দোতলায় আছি দরকার হলেই ডাকবেন। আই উড লাভ টু কাম।

মহেন্দ্র মুখ-চোখ লাল করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। নবনীতা চলে যাওয়ার পর চাপা গলায় শুধু বললেন, অসভ্য! মডেলিং-এর লাইনে আর কত ভদ্রতা শিখবে! অথচ ওকে নিয়ে মায়ের অনেক আশা ছিল...।

আপনাদের মা-কে দেখছি না। ইন্দ্রজিৎ বলল।

আমাদের মা নেই। প্রায় পনেরো বছর আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

সুরেন্দ্র এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। এখন একটু ফাঁক পেয়ে বললেন, আমাকে কি এখন থাকতে হবে, ইন্দ্রজিৎবাবু?

ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে সুরেন্দ্রর দিকে তাকাল। কারণ, গলার স্বর বেশ মেয়েলি। হয়তো সেইজন্যই কম কথা বলেন।

না, আপনি এখন যেতে পারেন–আমি পরে ডেকে নেব।

সুরেন্দ্র চলে যেতেই মহেন্দ্রকে সঙ্গে করে ঘরের ভেতরে পা রাখল ইন্দ্রজিৎ।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা বিশাল মাপের একটা অয়েল পেইন্টিং। টকটকে লাল সিঁদুর পরা এক মাঝবয়েসি মহিলা। ছবিটা মালা-চন্দনে সাজানো।

আমার মা– । মহেন্দ্র বললেন।

ইন্দ্রজিৎ এবার ঘরটার দিকে মনোযোগ দিল।

বিলাসবহুলভাবে সাজানো প্রকাণ্ড ঘর। ভোমরার শব্দ করে এয়ারকুলার চলছে। দেওয়ালে বিদেশি কোয়ার্জ ঘড়ি। পশ্চিমের রোদ একটা কাচের জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে মার্বেল পাথরের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরের বাঁ-দিক ঘেঁষে কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের খাট–তাতে ধবধবে সাদা বিছানা।

সেদিকে আনমনাভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা মহেন্দ্রর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ : আপনার ছোটবোন যা বলে গেল, সে-কথা কি ঠিক? জিতেনবাবু না থাকায় আপনারা টাকার অভাবে কাহিল হয়ে পড়েছেন?

মহেন্দ্র ইতস্তত করতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ এয়ারকুলার অফ করে দিল। একটা জানলার পাল্লা সামান্য খুলে দিল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল। মহেন্দ্রকে অফার করল, কিন্তু তিনি আলতো করে বললেন, এখন না– পরে।

বলুন, নবনীতা কি ঠিক বলেছেন? আমার কাছে লুকোনোর চেষ্টা করবেন না। ঘরে এয়ারকুলারের ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও মহেন্দ্র পকেট থেকে রুমাল বের করে কাল্পনিক ঘাম মুছলেন। তারপর খানিকটা সময় নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ– ঠিকই বলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা একটা এগ্রিমেন্টে করেছিলেন। তাতে আমরা মানে, আমি, সুরেন্দ্র আর নবনীতা মাসে-মাসে একটা ফিক্সড টাকা পাব। তার বাইরে টাকার দরকার পড়লে সেটা বাবার কাছে চাইতে হবে। সেই এগ্রিমেন্টে আমরা সই করেছিলাম না করে উপায় ছিল না।

মহেন্দ্র চুপ করে গেলেন। দুটো হাত সামনে জড়ো করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রজিৎ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখা শেষ করল। একটা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের রাস্তাটা একবার দেখল। তারপর ঘুরে তাকাল মহেন্দ্রর দিকে আপনার বাবার ওপরে কারও রাগ ছিল?

মনে তো হয় না। তবে বিজনেসের ব্যাপারে কোনও জেলাসির ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।

হুঁ। আসলে আমি কিডন্যাপিং-এর মোটিভটা বুঝতে চাইছি। কিডন্যাপাররা এখনও টাকা চায়নি বলে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা, কিডন্যাপিং-এর সময় কি ধস্তাধস্তি হয়েছিল?

দোতলা থেকে আমি সেরকম কিছু টের পাইনি। তবে আপনাকে বলতে ভুলে গেছি– বাবার বিছানার চাদরে বেশ খানিকটা রক্তের দাগ ছিল।

রক্তের দাগ! ইন্দ্রজিতের শরীরটা চাবুকের মতো টান-টান হয়ে গেল। কোথায় সে চাদরটা? দেখি–

দাঁড়ান, নিয়ে আসছি। বলে মহেন্দ্র চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ সিগারেট খেতে-খেতে ভাবছিল। কোটিপতি জিতেন্দ্রনাথের তিন ছেলেমেয়ে। তিনজনেই বোধহয় বড়লোকি চালে আয়েস করতে শিখেছেন। কেউই বিয়ে-থা করেননি। অথচ সবাই খরচ করতে ভালোবাসেন। বাবা কিডন্যাপ্ড হয়েছেন বলে কারওরই তেমন দুশ্চিন্তা নেই। একমাত্র দুশ্চিন্তা খরচের টাকা পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে। নবনীতার কথাগুলো হয়তো রূঢ়, কিন্তু মনে হয় না ও একবর্ণও মিথ্যে বলেছে।

সিগারেটের শেষ-হয়ে-আসা টুকরোটা ইন্দ্রজিৎ জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে।

এমনসময় মহেন্দ্র চাদর নিয়ে ফিরে এলেন সঙ্গে দশরথ ও পরান।

দশরথ ইন্দ্রজিতের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, স্যার, আমি একটু বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখছিলাম–মানে, ইনভেস্টিগেট করছিলাম আর কি! আড়চোখে

সন্দেহ এবং আশঙ্কার নজরে মহেন্দ্রকে কয়েকবার দেখল দশরথ, আপনি একা একটু পরানের সঙ্গে কথা বলুন। ওর কাছে প্রচুর মেটিরিয়াল আছে। ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল তার অপরাধ-বিজ্ঞান বইতে বলেছিলেন, ইনভেস্টিগেশানে বাড়ির কাজের লোকদের রোল খুব ভাইটাল। আমি আপনার হয়ে পরানকে একটু-আধটু কোশ্চেন করছিলাম....।

ইন্দ্রজিৎ হেসে জিগ্যেস করল, অপরাধ-বিজ্ঞান তুমি পড়েছ, দশরথদা?

হ্যাঁ, মানে, ছোটবেলার অল্প-অল্প পড়েছিলাম।

ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রকে বলল, মিস্টার সেন, চাদরটা দিন।

চাদরটা নিয়ে বিছানার রাখল ইন্দ্রজিৎ। উলটেপালটে রক্তের দাগ লাগা জায়গাটা বের করল।

বেশ বড় একটা রক্তের দাগ। তার খুব কাছে ছোট মাপের আরও দুটো ছোপ।

ইন্দ্রজিৎ চাদরটা ভাঁজ করে দশরথের হাতে দিল : এটা সাবধানে রাখো, দশরথদা। এটা ল্যাবে পাঠাতে হবে।

যেন লাখ টাকা দামের একটা শৌখিন কাচের গ্লাস অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করছে, এইরকম ভঙ্গিতে চাদরটা গ্রহণ করল দশরথ। ওর কাছে এটা লাখ টাকার সূত্র।

চাদরটার দিকে মুগ্ধ অথচ সাবধানি চোখে তাকিয়ে ও জানতে চাইল, আমি কি এখন যেতে পারি, স্যার?

হ্যাঁ, যাও–জিনির কাছে বোসো গিয়ে।

দড়ির ওপর পা ফেলে সন্তর্পণে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে দশরথ চলে গেল।

ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রকে বলল, আপনি জিতেনবাবুর লেখা একটা চিঠি আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন। আর অনিমেষ সরকার নামে একজনের কথা বলছিলেন...অনিমেষবাবু এখন কোথায়? বাড়িতে আছেন?

না, উনি একটু বেরিয়েছেন। এলে আপনাকে খবর দেব।

ঠিক আছে। ও-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। তার আগে পরানের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

অদ্ভুত চোখে পরানের দিকে একপলক তাকিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে মহেন্দ্র চলে গেলেন।

জিতেন্দ্রনাথের ঘরের ডানদিকে একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার পাতা ছিল। ইন্দ্রজিৎ সেখানে গিয়ে বসল–পরানকেও বসতে বলল।

লম্বা, রোগা, তোবড়ানো গাল, গালে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। দেখেই বোঝা যায়, পরানের ওপর দিয়ে বহু ঝড়-জল বয়ে গেছে। ওর বড় বড় চোখ দুটোয় কেমন এক সতর্ক ছাপ ছিল।

ওর কাছে বাড়ির লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইল ইন্দ্রজিৎ।

পরান খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তারপর মুখ খুলল। জিতেন্দ্রনাথের তিন ছেলেমেয়ে সম্পর্কে ওর মতন করে বলল।

ছোটদি সিনেমা-লাইনে কীসব করে। মাঝে-মাঝে টিভির বিজ্ঞাপনে ছোড়দিকে দেখায়। দিন রাত্তির শুধু সাজগোজ করছে আর দুনিয়ার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরছে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়। অনেক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। প্রত্যেকবারই বড়বাবু টাকা দিয়ে ঝামেলা ঝাট সামলেছে। ছোড়দির ছোট-বড় জ্ঞান নেই। যখন যা মুখে আসে বলে দেয়। বড়বাবুকে দিন রাত টাকার জন্য বিরক্ত করত। এখন বড়বাবু নেই–তাই জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। তা ছাড়া বড়বাবুর বন্ধু অনিমেষবাবু দারুণ কড়া ধাতের মানুষ। এখন ওনার দাপটে তিন ভাই-বোন সবসময় কাচুমাচু হয়ে থাকে।

ছোড়দা গানবাজনা নিয়ে থাকে। প্রায়ই বাড়িতে গানবাজনার আসর বসিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। বড়বাবু অনেকদিন বারণ করেছে, কিন্তু ছোড়দা তাতে কান দেয়নি। বরং নানান জলসার জন্য বড়বাবুর কাছে টাকা চাইত। শুনছিলাম, কী একটা ব্যবস্থা করে নাকি তিরিশজনের দল নিয়ে ফরেনে গানবাজনা করতে যাবে। তার জন্য গত শনিবার বড়বাবুর কাছে টাকা চাইছিল। আর ছোড়দা ছোড়দির চেয়ে বড় হলেও ছোড়দিকে বেশ ভয় পায়।

বড়দা মহেন্দ্র এমনিতে খুব ভদ্র। তবে ব্যবসা করার একটা রোগ আছে। সেই কোন বয়েস থেকেই জেদ ধরেছে বাবার ব্যবসা নয়–সে নিজের হাতে গড়া ব্যবসাকে বড় করে তুলবে। বড়বাবু বহুবার বারণ করেছে, কিন্তু বড়দা নিজের জেদ থেকে সরেনি। অথচ প্রতিবারই নতুন-নতুন ব্যবসা ফাদার জন্য বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা চাইত। বড়বাবু প্রথমটা রাগারাগি করতেন বটে, কিন্তু শেষমেশ টাকা দিয়ে দিতেন। এই তো, গত শনিবারই বড়বাবুর সঙ্গে বড়দার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল–ওই টাকা নিয়েই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরান বলল, শনিবার দিনটা বড়বাবুর খুব খারাপ গিয়েছে। টাকার জন্যে একের-পর-এক বিড়ম্বনা। আমি ওই জানলা দিয় স-ব দেখেছি। প্রথমে এল ছোড়দি, তারপর ছোড়দা–আর, সবশেষে বড়দা। তিনজনের সঙ্গেই বড়বাবুর রাগারাগি হল। কিন্তু ওই রাগারাগিই সার। ছেলেমেয়ের জন্যে অন্ধ স্নেহ কী আর করবেন! টাকাপয়সা সব দিয়ে-থুয়ে শেষ পর্যন্ত মায়ের ওই ফটোর সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন– ইশারা করে মিসেস সেনের অয়েল পেইন্টিংটার দিকে দেখাল পরান ও মা চলে গিয়ে বড়বাবু আরও কাবু হয়ে পড়েছেন। মা ছিলেন সত্যিকারের গৃহলক্ষ্মী।...সবই আমাদের কপাল! মা-মরা ছেলেমেয়েগুলোর একটাও মানুষ হল না। অথচ বড়বাবুর কত আশা ছিল!

শেষ কথা দুটো বলেই জিভ কাটল পরান। অনুনয় করে বলল, আমাপে মাফ করবেন, স্যার। বাড়ির কাজের লোক হয়ে অনেক আস্পর্ধার কথা বলে ফেলেছি। এসব কথা যেন বড়দা ছোড়দারা জানতে না পারেন। আসলে দোষ তো আমারও নয়। বড়বাবুদের সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো বছর জড়িয়ে গেছে। বড়দাদের সব আমিই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। বড়বাবু আমার সঙ্গে কক্ষনও চাকরের মতো ব্যবহার করতেন না। বরং একা-একা দুঃখ করতেন। বলতেন, পরান, তোর মা-কে আমি কথা দিয়েছিলাম ছেলেমেয়েদের আমি মানুষ করে তুলব। তুই তো জানিস, ওদের জন্যে আমি কী পরিশ্রম করেছি কত কষ্ট সয়েছি। কিন্তু তার ফল কী হল? শূন্য! আমার বুকটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে রে, পরান, শূন্য হয়ে গেছে....।

কথাগুলো বলতে-বলতে পরানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। গায়ের গেঞ্জি দিয়ে চোখ মুছতে লাগল ও।

ইন্দ্রজিতের কাছে পারিবারিক ছবিটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের লোভের উৎপাতে অতিষ্ঠ এক স্নেহময় ধনী পিতা। সত্যি, জিতেন্দ্রনাথের জন্য

বেশ কষ্ট হয়।

শেষ দিকটায় বড়বাবু প্রায়ই বলতেন, ওদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। উচিত শিক্ষা। যাতে ওরা স্নেহ-ভালোবাসা ভাঙিয়ে আমার কাছ থেকে আর সুযোগ নিতে না-পারে। লোভ ওদের শেষ করে দিয়েছে। ওদের কাছে সম্পর্কের আর কোনও দাম নেই।

কথা শেষ করে হতাশায় মাথা নাড়ল পরান।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলল, ঠিক আছে, পরান-তুমি এখন যাও। এসব কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। যদি সে-রকম বুঝি, তা হলে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।

পরান উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রজিৎকে নমস্কার করে ধীরে-ধীরে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

কবজি উলটে ঘড়ি দেখল ইন্দ্রজিৎ। প্রায় ছটা বাজে। ঘরের কোয়ার্জ ওয়াল-ক্লকটা পাঁচ মিনিট ফাস্ট। নাকি ইন্দ্রজিতেরটা পাঁচ মিনিট স্লো!

এমন সময় মহেন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। স্মিত হেসে বললেন, মিস্টার চৌধুরী, আসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি। দরকার হলে চায়ের পর আবার কাজ শুরু করবেন…।

চলুন– বলে মহেন্দ্রকে অনুসরণ করে ইন্দ্রজিৎ আর জিনি ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে এসে হাজির হল।

এসে দেখল দশরথ চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া শুরু করেছে।

.

চা খেতে-খেতে ইন্দ্রজিৎ জিতেন্দ্রনাথের একটা ফটো দেখতে চাইছিল। মহেন্দ্র উত্তরে বলেছেন, চা শেষ করে আমার ঘরে চলুন–ফটোও দেখাব, আর চিঠিটাও দেখাব।

সুতরাং জিনি আর দশরথকে সোফায় বসিয়ে রেখে ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রর সঙ্গে দোতলায় গেল। জিনি তখন মুগ্ধ চোখে ঘরের নানান আসবাবপত্র দেখছে। আর

দশরথ এমনভাবে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন স্রেফ ঘ্রাণশক্তি দিয়েই সে যাবতীয় রহস্য উদঘাটন করে ফেলবে।

দোতলায় নিজের ঘরে ইন্দ্রজিৎকে বসিয়ে মহেন্দ্র একটা ডেস্কের কাছে গেলেন। একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে ইন্দ্রজিতের হাতে এসে দিলেন।

আমাদের লেখা বাবার শেষ চিঠি। হাতের লেখাটা বাবার–আমরা চেক করে দেখেছি।

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা খুলে দেখল।

কাগজের দু-পিঠে কালো কালি দিয়ে লেখা। বেশ বড় চিঠি।

চিঠিটা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, বাবা যেন জানতেন উনি আর বেশিদিন নেই। এটাকে কি আপনি সিক্সথ সেন্স বলবেন?

আপনার কি ধারণা জিতেনবাবু আর বেঁচে নেই?

সেরকমই তো মনে হচ্ছে। কিডন্যাপাররা যখন আর কোনও সাড়া-শব্দ করছে না…।

ইন্দ্রজিৎ হাসল : যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কখনও কেউ খতম করে! হয়তো অন্য কোনও কারণে কিডন্যাপাররা চুপচাপ রয়েছে। তারপর…সময় এলে..আপনাদের ফোন করবে।

ইন্দ্রজিৎ এবার চিঠিটা পড়তে শুরু করল। এয়ারকুলারের ঠান্ডা বাতাসে ওর বেশ শীত শীত করছিল। মহেন্দ্রকে ওটা কমিয়ে দেওয়া জন্য অনুরোধ করল।

চিঠিতে তিন ছেলেমেয়েকেই সম্বোধন করেছেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর লিখেছেন :

পনেরো বছর আগে তোমাদের মা সীমন্তিনী যখন চলে যায় তখন আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের মানুষের মতো মানুষ করব। কিন্তু ব্যবসার চাপ, অন্ধ স্নেহ, আর তোমাদের লোভ আমার প্রতিজ্ঞা ছত্রখান করে দিয়েছে। এখন একা, গোপনে, তোমাদের মায়ের ছবির কাছে চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার আর

কোনও গতি নেই। ভুল আমারই–আমিই তোমাদের ঠিকমতো শাসন করতে পারিনি। আর শাসন করার পক্ষে এখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পিতা হিসেবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তোমাদের মানসিক অত্যাচারে আমি ক্লান্ত। আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। তাই যে-একমাত্র পথ খোলা আছে। সেই পথেই আমি যাব। না, না–ভুলেও ভেবো না আমি সুইসাইড করার কথা ভাবছি। আমার সেই একটি মাত্র পথ হল একটা নিষ্ঠুর গোপন কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরা। এ কথা জানাতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই। তোমরাই এই কাজে আমাকে বাধ্য করেছ।

আমার যত ধন-সম্পত্তি, গাড়ি-বাড়ি, ফ্যাক্টরি–কোনও কিছুরই মালিকানা আমার একার নয়। আমি শতকরা মাত্র কুড়িভাগের মালিক–বাকি আশিভাগের মালিক আমার ছোটবেলার বন্ধু অনিমেষ সরকার। ওরা আরামবাগের বনেদি বড়লোক। আমার সঙ্গে ওর নিয়মিত টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। অনিমেষ যে কোনও মুহূর্তে এসে দলিলমাফিক ওর অংশ বুঝে নিলে আমার–এবং তোমাদের অবস্থা হবে পথের ভিখারির মতো। কিন্তু অনিমেষ আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। ছোটবেলায় আমরা ছিলাম হরিহর-আত্মা। তাই কখনও ও এইসব সম্পত্তিতে ওর অংশ আছে বলে ভাবেনি। ধর্ম-কর্ম পুজো-আচ্চা নিয়েই এখন ও জীবন কাটায়। আর আমি সুখে আছি জানলেই ও সুখী।

সম্প্রতি অনিমেষকে আমি আমার মানসিক দুরবস্থার কথা জানিয়েছি। ও তাতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। লোভকে ও ঘৃণা করে। লোভীদের আর বেশি। আমি ওকে চিঠি দিয়ে বলেছি, এখানে এসে ওর সমস্ত সম্পত্তি বুঝে নিয়ে ও যেন আমাকে মুক্তি দেয়। ও উত্তরে আসবে বলে জানিয়েছে। যে-কোনও দিন ও এসে হাজির হতে পারে। ওকে অমান্য বা অসম্মান করার সাহস আমার নেই– আশা করি তোমরাও তা করবে না। অবশ্য ও খুব কড়া ধাতের সাত্ত্বিক মানুষ। অভব্যতা দেখলে ও সঙ্গে-সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে। তা ছাড়া এই বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা–সবকিছুরই তো ও আশিভাগের মালিক। ভাবছি, আমার কুড়ি ভাগও ওকে লিখে দিয়ে আমি মুক্তি নেব। তোমরা হয়তো মামলা করতে চাইবে...করে দেখো, অনিমেষ তার কেমন জবাব দেয়। ও কখনও অন্যায়ের কাছে কাবু হতে শেখেনি। ওকে সব দিয়ে দিলে আমি হয়তো পথের ভিখিরি হব, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই। তার বদলে অন্তত সুখ-শান্তি তো ফিরে পাব! তাই এখন আমি অনিমেষের আসার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

যদি আমার হঠাৎ করে কিছু হয়, তাই তোমাদের সব কথা জানিয়ে রাখলাম। ইতি– হতভাগ্য জিতেন্দ্রনাথ সেন

চিঠিটা বারদুয়েক খুঁটিয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন–উনি যেন জানতেন ওঁর খারাপ কিছু একটা হবে।

হ্যাঁ–সেটাই তো আপনাকে বলছিলাম। চিঠিটা বাবার বেডরুমে একটা টেবিলের ওপরে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া ছিল।

আপনার বাবার একটা ফটো দেখাতে পারেন?

এক মিনিট। এক্ষুনি নিয়ে আসছি। মহেন্দ্র ফটোর জোগাড় করতে চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে কানে এল মিহি গলায় কেউ গান গাইছে। সুরেন্দ্র গলা সাধছেন।

শুনে হাসি পেয়ে গেল ইন্দ্রজিতের। গানের জন্য এ-গলা তৈরি হয়নি। এ-গলা তৈরি হয়েছে শুধু দেহকে মাথার সঙ্গে জুড়ে রাখার জন্য। তবে একটা ব্যাপার ইন্দ্রজিতের ভালো লাগল। সুরেন্দ্র একজন নামী গায়িকার গানই প্র্যাকটিস করছেন। অর্থাৎ, সুরেন্দ্র গায়ক নয়, গায়িকা হওয়ারই চেষ্টা করছেন।

মহেন্দ্র একটা অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এলেন। তার একটা পৃষ্ঠা খুলে ইন্দ্রজিৎকে দেখালেন। বছরতিনেক আগে চারদিনের ফুরসত পেয়ে জিতেন্দ্রনাথ তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফটোটা সেখানেই তোলা। আলো-ঝলমলে একটা রাস্তায় জিতেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। পিছনে দূরে একটা বাড়ির মাথায় গ্লো-সাইনে তৈরি একটা ড্রাগনের ছবি দেখা যাচ্ছে।

জিতেন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রজিৎ।

লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় বিস্তৃত টাক–শুধু দুকানের পাশে চুলের ঝালর। চোখে চশমা নেই। নিশ্চয়ই কনট্যাক্ট লেন্স পরেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরা জিতেন্দ্রনাথকে বেশ সুপুরুষই দেখাচ্ছে। ইন্দ্রজিতের মনে হল, সীমন্তিনী মারা যাওয়ার পর উনি অনায়াসেই বিয়ে করতে পারতেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল, এই ফটোটা আর এই চিঠিটা হাতের চিঠিটা দেখাল ইন্দ্রজিৎ, আমি একটু রাখছি। কপি করে কাল বা পরশু আপনাকে ফেরত দেব।

মহেন্দ্র রাজি হয়ে ঘাড় নাড়লেন। ফটোটা অ্যালবাম থেকে খুলে ইন্দ্রজিতের হাতে দিলেন।

আমি এবার আপনার ভাই-বোনের সঙ্গে একটু কথা বলব…তারপর নীচে যাচ্ছি।

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে মহেন্দ্র নির্লিপ্ত মুখে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ পায়ে-পায়ে সুরেন্দ্রর ঘরে গিয়ে হাজির হল।

*

সুরেন্দ্রর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। এ-ঘরে এসি নেই।

বড় মাপের ঘর। ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ আর লতা মঙ্গেশকরের বাঁধানো ফটো ঝুলছে। এখানে-ওখানে হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। গোটা ঘরটায় কেমন অগোছালো ভাব। শিল্পীর ঘর বোধহয় এরকমই হয়!

ঘরের ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা শৌখিন শো-কেস। তাতে যত রাজ্যের ক্যাসেট। শো-কেসের ওপরে বসানো রয়েছে চার হাজার পি.এম.পি.ও.-র একটি সনি সাউন্ড সিস্টেম। তার স্পিকার দু-দিকের দেওয়ালে বসানো।

সুরেন্দ্র হামোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিলেন। ইন্দ্রজিৎকে দেখেই গানবাজনা থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্যের হাসি হেসে বললেন, আসুন।

মেঝেতে দামি কার্পেট পাতা ছিল। সেখানে ইন্দ্রজিতকে বসতে অনুরোধ করে সুরেন্দ্র নিজেও বসলেন।

আমাকে কিছু জিগ্যেস করবেন?

হ্যাঁ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল ইন্দ্রজিৎ, আপনার বাবার কিডন্যাপিং সম্পর্কে আপনার কি আইডিয়া?

একটু ইতস্তত করে সুরেন্দ্র চাপা গলায় বললেন, ওপেনলি বলব?

অফ কোর্স!

আমার মনে হয় এটা দাদার কাজ।

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠল। সুরেন্দ্রকে এমনিতে দেখে ওর ভীতু মনে হয়েছে। সুরেন্দ্র যে ওঁর দাদার নামে এরকম একটা অভিযোগ করতে পারেন সেটা ও কল্পনাও করেনি। মনে-মনে নিজের কানটা মুলে দিল ইন্দ্রজিৎ। একজন তুখোড় ডিটেকটিভকে সবরকম সম্ভাবনার কথা হিসেবে রাখতে হয়।

আপনার এরকম মনে হয় কেন?

দাদা নিত্যনতুন বিজনেস চালু করে এক্সপেরিমেন্ট করে। সেজন্যে ওর মাঝে-মাঝেই অনেক টাকার দরকার হয়। এই তো শুনলাম এখন না কি গ্লাসউলের ফ্যাক্টরি খুলবে বলে ভাবছে। আসলে দাদার ব্যবসা চালানোর কোনও মাথা নেই…।

ইন্দ্রজিৎ বাধা দিয়ে বলল, যার ব্যবসায় মাথা নেই তাঁর কিডন্যাপিং-এ মাথা থাকবে?

খুব থাকবে। প্রায় মুখ ভেংচে বললেন সুরেন্দ্র, হাতে টাকা পাওয়ার জন্যে দাদা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকলে কি কারও মাথায় বদমায়েশি বুদ্ধি থাকতে পারে না!

তাই যদি হয়, তা হলে মহেন্দ্রবাবু আমার কাছে গেলেন কেন? এতে তো ওঁরই অসুবিধে হবে।

সাধ করে কি আর গেছে। আসলে আশপাশের লোকজন পাঁচরকম কথা বলছে, তাই।

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। তারপর আচমকা বলল, আপনি তো লাস্ট শনিবার জিতেনবাবুর সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি করেছেন। গানবাজনার দল নিয়ে আপনি বিদেশে কোথায় যাচ্ছেন?

সুরেন্দ্রর মুখ থেকে পলকে সব রক্ত সরে গেল।

কে বলেছে আপনাকে? নিশ্চয়ই পরানদা!

সুরেন্দ্রর গলা মেয়েলি হলে কি হবে, ওঁর বুদ্ধির কোনও খামতি নেই। ভাবল ইন্দ্রজিৎ।

যে-ই বলুক–ব্যাপারটা তো সত্যি।

মাথা নীচু করলেন সুরেন্দ্র। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালেন ইন্দ্রজিতের দিকেঃ বাবার কালচার বলে কিছু ছিল না। গানবাজনার লেভেলটা বাবা ঠিক বুঝত না।..মা কিন্তু এরকম ছিল না।

আপনার অনেক স্বপ্ন আছে, সুরেন্দ্রবাবু। রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে বলল ইন্দ্রজিৎ, স্বপ্ন সবারই থাকে–স্বপ্ন থাকাটা দোষের নয়। তবে কথাটা কী জানেন, জিতেনবাবুরও হয়তো কিছু স্বপ্ন ছিল…।

সেটা আমরা তিন ভাই-বোনে চুরমার করে দিয়েছি। খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন সুরেন্দ্র।

ওঁর অনেক দুঃখ-কষ্ট ছিল।

দুঃখ-কষ্ট আমার নেই। আপনি জানেন, আমার এই মেয়েলি গলার জন্যে কত অপমান আমাকে ছোটবেলা থেকে সহ্য করতে হয়েছে–এখনও হয়! আমার ছোটবোন পর্যন্ত আমাকে এ নিয়ে ব্যঙ্গ করে, খোটা দেয়!

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল : নিশ্চয়ই এই দুঃখ-কষ্টের প্রতিবাদে আপনি জিতেনবাবুকে কিডন্যাপ করেননি?

সুরেন্দ্রর ফরসা মুখে রক্তের ঝলক ঝাপটা মারল। কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় ওঁর গলা চিরে গেল; বাঃ, চমৎকার! এই না হলে ডিটেকটিভ! আপনি বরং আমাকে অ্যারেস্ট করুন। অনিমেষকাকা বাড়িতে থাকলে আপনার এই ইনসাল্টের যোগ্য জবাব দিত। আপনার আর নবনীতার মধ্যে কোনও ডিফারেন্স নেই দেখছি!

সুরেন্দ্রর অভিমান ইন্দ্রজিৎকে ছুঁয়ে গেল। ও বলল, সরি, আমি ঠিক সিরিয়াসলি কথাটা বলিনি। এমনি ঠাট্টা করে বলেছিলাম…।

সুরেন্দ্র একটু স্বাভাবিক হলেন। দাঁত দিয়ে বারদুয়েক ঠোঁট কামড়ালেন। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

আচ্ছা, আপনার বাবার বন্ধু অনিমেষ সরকার কি খুব কড়া ধাতের লোক?

হ্যাঁ…বাবার তুলনায় তো বটেই!

জিতেনবাবুর চিঠির কথা তো আপনি সব জানেন!

হ্যাঁ–দাদা সবাইকে ওটা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

চিঠির কথা সব সত্যি?

ইতস্তত করে সুরেন্দ্র বললেন, প্রথমটা তো বিশ্বাস হতে চায়নি। পরে, অনিমেষকাকা আসার পর বুঝলাম, শুধু সত্যি নয়–হ্যাঁড়ে-হাড়ে সত্যি। টাকাপয়সা, কোম্পানি সবকিছুরই কন্ট্রোল অনিমেষকাকার হাতে।

মনে-মনে হেসে ফেলল ইন্দ্রজিৎ। সবকিছুর কন্ট্রোল হাতে থাকায় অনিমেষবাবুর অনিমেষকাকা হয়ে উঠতে আর দেরি হয়নি। এ-দুনিয়ায় লক্ষ্মী বড় শক্তিশালী।

আচ্ছা, সুরেন্দ্রবাবু–থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর কোঅপারেশান। পরে দরকার হলে আবার কথা বলব। আপনার ছোটবোনের ঘরটা কোনদিকে?

অদ্ভুত চোখে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন সুরেন্দ্র। তারপর চাপা গলায় বললেন, একটু কেয়ারফুল থাকবেন। খরচের টাকায়। টান পড়ায় নীতা খুব চটে আছে। কাল ও অনিমেষকাকার কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল–অনিমেষকাকা স্রেফ না করে দিয়েছেন। নীতা অনিমেষকাকার ওপরে একেবারে ফায়ার হয়ে আছে। বাবা ফিরে না এলে আমাদের এই দম আটকানো অবস্থা কাটবে না।

সুরেন্দ্র ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ মার্বেল পাথরের বারান্দার পা ফেলে নবনীতার ঘরের দিকে এগোল।

*

ঘরে ঢুকতেই এয়ারকুলারের ঠান্ডা ছোঁয়া ইন্দ্রজিৎকে জড়িয়ে ধরল। আর একইসঙ্গে হালকা পারফিউমের গন্ধ ওকে আদর করল।

ঘরে কোথাও আলতো মিউজিক বাজছিল কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

দরজার পাল্লা ঠেলে ঢোকার সময় নক করেছিল ইন্দ্রজিৎ। আর তখনই বিছানায় শুয়ে থাকা নবনীতা ঘাড় উঁচু করে তাকিয়েছিল ইন্দ্রজিতের দিকে। সুন্দর করে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল? কাম অন ইন, শার্লক। বড়দা বলছিল আপনার নাম না কি ইন্দ্রজিৎ? তা ইন্দ্রের সঙ্গে কতটা মিল আপনার?

কথা বলতে বলতে বিছানায় উঠে বসল নবনীতা। অবাধ্য চুলগুলোকে মাথার এক মনোরম ঝাঁকুনিতে পিঠের দিকে ফেরত পাঠাল। তারপর তেরছা চোখে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রজিতের দিকে– যেন একটু আগের প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করছে।

ধর্ম-টর্ম কিংবা দেবতা নিয়ে আমার তেমন একটা চর্চা নেই, ম্যাডাম। আমার কারবার অধর্ম আর শয়তান নিয়ে। বাট আই ডু লাভ ইট।

ও– করে অদ্ভুত এক শব্দ করল নবনীতা। বসে-বসেই শরীরটাকে লাটুর মতো ঘুরিয়ে পা দুটো বিছানার বাইরে ঝুলিয়ে দিল। ভুরু কপালে তুলে প্রশংসার ঢঙে বলল, স্মার্ট! স্মাট! আই ডু লাভ ইট। বিউটি আর ব্রেইন একই শরীরে…উঃ, ভাবা যায় না!

দেওয়ালে নবনীতার অনেকগুলো ফটোগ্রাফ পোস্টারের মতো করে লাগানো ছিল। তাতে নবনীতাকে নানান পোশাকে দেখা যাচ্ছে। পোশাকগুলোর বেশিরভাগই বিদেশের সি-বিচে মানানসই।

অবশ্য নবনীতার এখনকার পোশাকটাও অনেকটা সেই ধরনের। পোশাকটা ম্যাক্সিগোছের, তবে হাঁটুর নীচেই শেষ হয়েছে। হালকা নীল আর সাদা জমিতে

সুতোর কাজ করা। কাপড়টা এমনই স্বচ্ছ যে, বোঝা যাচ্ছে নবনীতা অন্তর্বাস পরেছে।

বলুন, মিস্টার ডিটেকটিভ, আমার কাছ থেকে ডিটেইলে কী জানতে চান? ঠোঁট উলটে বলল নবনীতা। একটু থেমে তারপর ও ওই চেয়ারটায় বসতে পারেন–ইশারায় হাততিনেক দূরের একটা চেয়ার দেখাল ও অথবা এইখানটায় বসতে পারেন। বিছানায় ঠিক ওর পাশটায় আলতো চাপড় মারল নবনীতা। তারপর খিলখিল করে জলতরঙ্গ শুনিয়ে দিল।

ইন্দ্রজিৎ বখে-যাওয়া মেয়েটাকে একপলক দেখল। তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

আপনি মডেলিং করেন?

বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছিল নবনীতা। পা দোলানো থেমে গেল : কেন, আপনার আপত্তি আছে?

হাসল ইন্দ্রজিৎ? কেউ নিজের ইচ্ছায় উচ্ছন্নে গেলে আমার আপত্তি করার কী আছে!

উচ্ছন্নে! কী বলতে চান আপনি! জানেন ফ্যাশান টিভি চ্যানেলে আমাকে দেখিয়েছে।

বুঝেছি–আপনি নিজেকে ভীষণ দেখাতে চান। কিন্তু কেউ যদি দেখতে না চায়?

রাগে থমথম করছিল নবনীতার মুখ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ছুঁড়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ওকে ইশারায় থামতে বলল ইন্দ্রজিং। তারপর ধীরে, ম্যাডাম, ধীরে। আমি আপনার বড়দা বা ছোড়দা নই। আর, বড়লোক হলেই কি অসভ্য হতে হবে?

নবনীতার ভেতরটা কিছু একটা করার জন্য নিশপিশ করছিল। ওর চোখে আগুন জ্বলছিল। আক্রোশ-ভরা চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখছিল ও।

আপনার বাবাকে কিডন্যাপ করার পেছনে কার হাত আছে বলে মনে হয়? শান্ত গলায় জিগ্যেস করল ইন্দ্রজিৎ।

নবনীতা রাগে গুম হয়ে ছিল। কাটা-কাটা জবাব দিল : জানি না।

আপনার ছোড়দা বলছিলেন যে, মহেন্দ্রবাবুর হাত থাকলেও থাকতে পারে।

হু! ছোড়দা পুরুষ নাকি! শুধু অন্যদের হিংসে করে। নিজের ইমপোটেন্সি ঢাকতে অন্যের নামে কাদা ছেটায়।

অনিমেষবাবু কেমন লোক?

খুব ভালো ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল নবনীতা, শুধু বাবার ঠিক উলটো। ওই লোকটা যে সত্যি-সত্যি সবকিছুর মালিক সেটা ওর কথাবার্তায় বোঝা যায়। এক নম্বরের কঞ্জুস! সবসময় পুজো আচ্চা নিয়ে থাকার ভান করে, গেরুয়া পাঞ্জাবি পরেবলে, ওটা নাকি খুব পবিত্র রং। আসলে পুরোটাই ঢং।

ইন্দ্রজিৎ মনে-মনে সবকিছু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

অনিমেষ সরকারের ওপরে তিন ভাই-বোনের রাগ থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ, শুনে যতদূর মনে হচ্ছে, কড়া ধাতের কঞ্জুষ মানুষ কখনও স্নেহকাতর পিতার বিকল্প হতে পারে না। সুতরাং জিতেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনাটা দারুণ জরুরি। কিন্তু তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? বিছানায় চাদরের ওই রক্তের দাগ বলতে চাইছে কিডন্যাপাররা নিষ্ঠুর, হিংস্র। কিন্তু ওই রক্তের দাগ কি সত্যিই জিতেন্দ্রনাথের? নাকি অন্য কারও? ল্যাব রিপোর্ট পাওয়ার আগে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

অনিমেষ সরকার কি এ-বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন? ইন্দ্রজিৎ জানতে চাইল।

মানিয়ে নেওয়ার আর কী আছে! হাত উলটে জবাব দিল নবনীতা, উনিই প্রায় সবকিছুর মালিক। দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন-ঘুরছেন, এনজয় করছেন আর আমাদের তেষ্টার ছটফটানি দেখছেন। বিনা পয়সার সার্কাস।

ইন্দ্রজিৎ বিদায় নিতে যাচ্ছিল হঠাৎই একতলার ড্রইং-ডাইনিং স্পেস থেকে প্রবল ধমকানির চিৎকার ওর কানে এসে ঢুকল।

ভরাট গলায় কেউ চিৎকার করে বলছে, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আমাদের বাড়িতে এসেছেন চারটের সময়–আর এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। অথচ তোমরা কেউ আমাকে খবরটা দেওয়ার দরকার মনে করোনি! মহেন্দ্র, জিতেনের কাছে আগেই শুনেছিলাম তুমি একটু স্টুপিড টাইপের। এখন দেখছি ও ঠিকই বলেছে। কমনসেন্স বলেও তোমার কিছু নেই। তোমার কাছে সেন্সের মানে একটাই । ননসেন্স।

ইন্দ্রজিৎ বারান্দায় চলে এল। সেখান থেকেই পাখির চোখে দৃশ্যটা দেখতে পেল।

জিনি আর দশরথের সোফার কাছাকাছি একটা জটলা মতন। সেখানে মহেন্দ্র, পরান এবং আরও একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করল, নবনীতা দরজা ফাঁক করে নীচের তলার ঘটনা দেখতে চেষ্টা করছে।

ইন্দ্রজিৎ তরতর করে সিঁড়ি নামতে লাগল। নামতে নামতে কথাবার্তাগুলো ওর কানে আসছিল।

মহেন্দ্র মিনমিন করে বলছিলেন, না…মানে…আপনি বাড়িতে নেই। কী করে খবর দেব ঠিক বুঝতে…।

না বোঝার কী আছে! তোমাদের কাছে তো আমার মোবাইল নাম্বার রয়েছে!

আর কোনও উত্তর নেই। মহেন্দ্র মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রজিৎ ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। হয়তো মহেন্দ্রদের এরকম রুক্ষ শাসনের লাগামেই রাখা দরকার, কিন্তু তাই বলে পরানের সামনে, বাইরের গেস্টদের সামনে।

অনিমেষ সরকারকে ভালো করে দেখল ইন্দ্রজিৎ।

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, নাকটা অস্বাভাবিক মোটা, গালে হালকা চাপদাড়ি।

পরনে, নবনীতা যেমনটি বলেছিল, গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। হাতে সাধারণ একটা লাঠি। হয়তো চলার সময় ভর দেওয়ার দরকার হয়। লাঠিটা দেখে নতুন বলে মনে হল।

ইন্দ্রজিৎ পরিচয় দিয়ে একগাল হাসতেই অনিমেষ সরকারের মুখের রুক্ষতা কেটে গেল। কপালে ফুটে ওঠা বিরক্তির ভাঁজও গেল মিলিয়ে।

আসুন, মিস্টার চৌধুরী, আমার ঘরে আসুন। আপনাদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হয়নি তো?

ইন্দ্রজিৎ বিনীতভাবে জানাল যে, না, হয়নি। তারপর বলল, আপনি ঘরে যান– ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি ওঁদের সঙ্গে দুমিনিট কথা বলেই যাচ্ছি– ইশারা করে দশরথ আর জিনিকে দেখাল ইন্দ্রজিৎ।

ওইটা আমার ঘর–মানে, আপাতত ওখানেই আশ্রয় নিয়েছি। জিতেন্দ্রনাথের ঘরের লাগোয়া একটা ঘর দেখালেন অনিমেষ। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে এগোলেন সেই ঘরের দিকে।

পরান ইতস্তত পায়ে ওঁকে অনুসরণ করল।

মহেন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি আসছি বলে চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ জিনির পাশে সোফায় গিয়ে বসল।

জিনি, ভেবেছিলাম দোতলায় গিয়ে ইন্টারোগেট করার সময়েও তোমাকে সঙ্গে থাকতে বলব, তুমি নোট নেবে–কিন্তু তাতে সিচুয়েশানটা এত এমব্যারাসিং হয়ে যেত যে… কথা শেষ করল না ইন্দ্রজিৎ।

জিনি মুখ ভার করে বলল, বসে-বসে শুধু বোর হচ্ছি। দশরথদা যত রাজ্যের ডিটেকটিভ গল্প শুনিয়ে আমাকে আরও বের করে দিচ্ছে।

দশরথ আমতা-আমতা করে হেসে বলল, ইনভেস্টিগেশানের মূল মন্ত্রটা ওঁকে বোঝাতে চাইছিলাম।

সেটা কী? ইন্দ্রজিৎ জানতে চাইল।

দশরথ গম্ভীরভাবে বলল, ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেট। শুধু তদন্ত করে যাও, তা হলেই ফল মিলবে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেলল। তারপর জিনিকে বলল, কয়েকটা ইমপরট্যান্ট পয়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি লিখে নাও। পরে হয়তো মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে।

জিনি নোট-প্যাড আর পেনসিল নিয়ে তৈরি হল।

ইন্দ্রজিৎ সংক্ষেপে গড়গড় করে কিছু তথ্য আর কিছু মন্তব্য বলে গেল। জিনি পেশাদারি ঢঙে সেগুলো শর্টহ্যান্ডে লিখে নিল।

দশরথ কান খাড়া করে ইন্দ্রজিতের কথাগুলো শুনতে লাগল, আর মাঝে-মাঝে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

ডিকটেশন দেওয়া শেষ হতেই ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ সরকারের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে আলোর কুচির নকশা ছড়িয়ে ছিল। তার উৎস খুঁজতে মুখ তুলে ওপরে তাকাল ইন্দ্রজিৎ।

কাট গ্লাসের ঝাড়লণ্ঠন থেকে আলোর টুকরো নানান দিকে ঠিকরে পড়ছে।

*

অনিমেষ সরকারের ঘরটা মাপে ছোট, তবে ছিমছামভাবে সাজানো। ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিলের ওপরে পাশাপাশি শিব ও কালীর ফটো–তাতে চন্দনের টিপ লাগানো।

খাটের ওপরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন অনিমেষ। ইন্দ্রজিৎকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন : আসুন, আসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন।

আগে ততটা খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করল, অনিমেষ সরকারের গলার স্বরটা কেমন যেন ফাঁসফেসে।

ওঁর দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসল ইন্দ্রজিৎ।

বলুন, জিতেনের খোঁজখবরের কোনও হদিশ পাওয়া গেল?

কপালে ভাঁজ ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল, এখনও পর্যন্ত পাইনি। তবে কতকগুলো ব্যাপারে খুব খটকা লাগছে। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ চাইতে এত দেরি করছে কেন। তারপর, কিডন্যাপিংটা যেভাবে হয়েছে মানে, বাড়িতে এসে যেভাবে ওরা জিতেন্দ্রনাথকে তুলে নিয়ে গেছে, তাতে কাজটা যে খুবই রিকি ছিল...। আই মিন, কিডন্যাপাররা হেভি রিস্ক নিয়েছিল। জেনারালি এতটা রিস্ক ওরা নেয় না। কিন্তু নিলই যখন, তা হলে টাকা চাইতে দেরি করছে কেন? যারা এত ডেসপারেট...!

ঠিকই বলেছেন। জাস্টিফায়েড পয়েন্ট। তবে ওরা হয়তো চাইছে, কটাদিন যাক–ব্যাপারটা থিতিয়ে পড়ুক, তারপর...।

কী জানি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ ও ওসব যাকগে, এবারে আপনার কথা বলুন। এ-বাড়িতে কেমন লাগছে?

ভালো কী করে লাগবে বলুন! কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা একটা টি-টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অনিমেষ : যার সঙ্গে এতদিন পর দেখা করতে এলাম সে-ই নেই। তার ওপর এরকম বাজে খবর..আমার মনটাই কেমন ডিপ্রেণ্ড হয়ে গেছে।

মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা ওদের কেমন বুঝছেন?

হু! প্রবল বিরক্তির একটা শব্দ করলেন অনিমেষ ও একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। যে-কোনও কারণেই হোক, জিতেন ওদের বড় লাই দিয়ে মানুষ করেছে। আমাকেও পরপর বেশ কয়েকটা চিঠিতে ওর দুঃখের কথা লিখেছিল। লাস্ট চিঠিটা পেয়েছিলাম দিন-পনেরো আগে। এই দেখুন– খাট ছেড়ে উঠে পড়লেন অনিমেষ। দেওয়ালের সুদৃশ্য হুকে ঝোলানো ওঁর কয়েকটা জামাকাপড়ের কাছে গেলেন। সেগুলোর পকেট হাতড়ে-হাতড়ে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করলেন। সেটা খুলে একবার দেখে নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ইন্দ্রজিতের কাছে এলেনঃ এটা পড়ে দেখুন, তা হলেই মোটামুটি সব বুঝতে পারবেন...।

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা নিয়ে পড়ল।

হাতের লেখা যে জিতেন্দ্রনাথের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাণের বন্ধুকে নিজের প্রাণের কথা লিখেছেন জিতেন্দ্রনাথ। বন্ধুকে এ-বাড়িতে আসার জন্য বারবার করে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, ..তোর বিষয়-সম্পত্তি তুই এবারে

বুঝে নে। আমাকে মুক্তি দে। আমি বিবাগী হয়ে কোথাও চলে যাই। সংসারে আর লোভ নেই।

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা ফেরত দিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি এ-চিঠির জবাব দেননি?

না। ফোনে কথা বলেছিলাম। পা টেনে-টেনে খাটে গিয়ে বসলেন অনিমেষ, ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, তুই শক্ত হাতে ছেলেমেয়ের রাশ টেনে ধর। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের শাসন করার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি।

আপনার পায়ে কী হয়েছিল?

পায়ে! ইন্দ্রজিতের আচমকা এই প্রশ্নে অনিমেষ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বছরদশেক আগে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলাম। ফিমার বোনের শ্যাফ্ট ভেঙে গিয়েছিল। ডাক্তাররা স্টিলের প্লেট বসিয়ে ওটা মেরামত করেছে বটে, তবে পায়ে একটু দোষ থেকে গেছে। কথা শেষ করে মলিন হাসলেন অনিমেষ। চোখ থেকে চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে কাচ দুটো মুছলেন। তারপর আলোর দিকে চশমাটা তুলে ধরে কাচ পরখ করে চশমাটা আবার চোখে দিলেন।

আপনি এ-বাড়িতে এসেই যখন শুনলেন জিতেনবাবু কিডন্যাপ হয়েছেন, তখন পুলিশে ইনফর্ম করার কথা বলেননি?

না, বরং অন্যরকম সাজেশানই দিয়েছিলাম। মহেন্দ্রকে বলেছিলাম, পুলিশে খবর দিলে ব্যাপারটা পাঁচকান হবে। এতে সবারই লজ্জা। তা ছাড়া কিডন্যাপাররা শাসিয়েছে। পুলিশে ইনফর্ম করলে হয়তো জিতেনের বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে। হয়তো জিতেনের সঙ্গে কোনওদিনই আমার আর দেখা হবে না...।

গলার স্বর ভেঙে গিয়ে বুজে এল। অনিমেষ সরকার মুখ নীচু করলেন। পকেট থেকে নীল কালো চেক-চেক একটা রুমাল বের করে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে মুখ তুললেন। শক্ত গলায় বললেন, সেইজন্যেই আমি পুলিশে খবর দিতে বারণ করেছি। জিতেনের বাড়িতে আমি এই প্রথম এলাম, অথচ ওর সঙ্গে দেখা হবে না–এটা ভাবা যায় না।

জিতেনবাবু ফিরে আসার জন্যে আপনি কতদিন ওয়েট করবেন?

দেখি..আরও সপ্তাদুয়েক তো বটেই! আশা করছি এর মধ্যে কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করবে। ওরা যা-ই টাকা দাবি করুক, দিয়ে দেব। টাকার অঙ্কে জিতেনের দাম মাপা যায় না। ও আমার কোন ছোটবেলার বন্ধু! জানেন, একবার…।

জিতেন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিচারণ শুরু করলেন অনিমেষ। স্কুলের গল্প, কলেজের গল্প, একসঙ্গে বেড়ানোর গল্প, বিয়ের গল্প, ব্যবসার গল্প…গল্পের আর শেষ নেই।

ইন্দ্রজিৎ মোটেই বিরক্ত হচ্ছিল না, বরং গভীর মনোযোগে শুনছিল। অনিমেষের কয়েকটা গল্প এমনই যে, খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

কথার মাঝে পরান ঘরে এসে ঢুকল। অনিমেষের চায়ের কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে ও চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই ওর চোখ পড়ল ইন্দ্রজিতের দিকে।

পরান যেন সামান্য অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না। আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ সরকারকে দেখছিল আর ভাবছিল কিডন্যাপিং-এর পিছনে এ-বাড়ির কেউ নেই তো! মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা–ওঁরা কি স্রেফ টাকার লোভে জিতেন্দ্রনাথকে কিডন্যাপ করতে পারেন? আর অনিমেষ সরকার? উনি কি কিডন্যাপ করতে পারেন জিতেন্দ্রনাথকে? কিন্তু সে নিশ্চয়ই টাকার লোভে নয়। অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে?

কুয়াশা দিয়ে তৈরি একটা ছবি ইন্দ্রজিতের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ছবিটা স্পষ্ট হতে গিয়েও বারবার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

অনিমেষ সরকারের গল্প শেষ হলে ইন্দ্রজিৎ বলল, একটা কাগজে আপনার অ্যাড্রেস আর সেলফোন নাম্বারটা একটু লিখে দেবেন?

কেন বলুন তো! এ-বাড়ির ফোন নাম্বার তো আপনি জানেন!

না, আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলার দরকার হতে পারে।

ঠিক আছে, লিখে নিন।

আমার পেনের রিফিল শেষ হয়ে গেছে। মিথ্যে কথা বলল ইন্দ্রজিৎ।

তখন নিমরাজি হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন অনিমেষ। হাতে ধরা রুমালটা পকেটে রেখে পা টেনে-টেনে কোণের টেবিলটার কাছে গেলেন। ড্রয়ার থেকে পেন বের করে একটা ছোট প্যাডের কাগজে খসখস করে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখলেন। তারপর পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে ইন্দ্রজিৎকে দিলেন।

কী মনে হচ্ছে, মিস্টার চৌধুরী? এই কেসটা আপনি সলভ করতে পারবেন?

ইন্দ্রজিৎ হাসল ও সভ তো করতেই হবে! এটা আমার প্রথম কেস।

উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক। হাসলেন অনিমেষ।

ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আপাতত ওর কাজ শেষ। তবে মারুতি ভ্যানে ওঠার আগে পরানের সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে ও ভুলল না।

ফেরার পথে স্টিয়ারিং-এ বসে ইন্দ্রজিৎ অনেক কথা বলল। দশরথ নানান প্রশ্ন করল ওকে। প্রশ্নের ঢংগুলো এমন যে, সে যেন কোনও অপরাধীকে থানায় ডেকে জেরা করছে।

ইন্দ্রজিৎ হাসিমুখে দশরথের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, আর জিনিকে বলল কথাবার্তাগুলো যতটা সম্ভব টুকে নিতে।

কাল অফিসে এগুলো ওয়ার্ড প্রসেস করে আমাকে একটা ড্রাফট প্রিন্ট-আউট দিয়ো।

জিনি বলল, ও.কে., স্যার।

উল্টোডাঙ্গা-ভি. আই. পি.-র মোড়ে গাড়ি আসতেই ইন্দ্রজিৎ ঘড়ি দেখল। রাত প্রায় নটা। খিদেয় পেট চুঁইছুঁই করছে। জিনি আর দশরথদারও বোধহয় একই অবস্থা। তাই ও বলল, এসো, এখানে কোনও একটা রেস্তোরাঁয় আমরা ডিনার সেরে নিই। জিনি, তুমি বাড়িতে একটা ফোন করে দাও। আমি তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।

রাস্তার পাশ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল ইন্দ্রজিৎ। ওরা গাড়ি থেকে নামল।

জিনি বলল, আমি চট করে একটা ফোন করে আসছি।

ও চলে যেতেই নিজের পেটে হাত বোলাল ইন্দ্রজিৎ ও দশরথদা, পেটে একেবারে ছুঁচোয় ডন মারছে। তোমারও নিশ্চয়ই একই অবস্থা?

দশরথ একগাল হেসে বলল, না, স্যার। পুলিশে চাকরি করার সময় ইউনিয়ন করতাম। তখন হাঙ্গার স্ট্রাইক করে করে খিদে সহ্য করার অভ্যেস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ হো-হো করে হেসে ফেলল।

.

প্রথমেই সবাইকে জানাই বিছানায় চাদরে যে-রক্তের দাগ পাওয়া গেছে সেটা মানুষের রক্ত নয়…মুরগির রক্ত।

ইন্দ্রজিতের কথা শেষ হতে-না-হতেই দশরথ চাপা গলায় বলল, মোরগেরও হতে পারে।

সে-কথা ইন্দ্রজিতের কানে গেল বলে মনে হল না। ও তখন কৌতূহল নিয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

ওঁরা সকলেই চমকে উঠলেন।

অনিমেষ সরকার, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা–আর পরান।

প্রথম চারজন সোফায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিলেন। আর পরান একপাশে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে।

কী বলছেন, মিস্টার চৌধুরী! অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন অনিমেষ সরকার, মানুষের রক্ত নয়! মুরগির রক্ত।

মোরগেরও হতে পারে। আপনমনেই বিড়বিড় করে আবার বলল দশরথ।

হ্যাঁ মুরগির রক্ত।

দশরথ আবার বিড়বিড় করল। কী বলল ঠিক বোঝা গেল না, তবে অনুমান করা গেল।

তা হলে বাবার কোনও বিপদ হয়নি! এবারে সুরেন্দ্র কথা বললেন।

ইন্দ্রজিৎ সুরেন্দ্রর কথাটা যেন শুনতে পেল না। সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজে বলল, এই ইনফরমেশানটা ল্যাব থেকে পাওয়ার পরই আমি অন্য অ্যাঙ্গল থেকে ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করতে শুরু করলাম...।

হঠাৎই চোখ খুলে হাসল ইন্দ্রজিৎঃ আর তখনই সব কেমন ঠিকঠাক খাপে খাপে মিলে গেল। এবং কিডন্যাপিং রহস্যের উত্তরটা ভেসে উঠল আমার চেখের সামনে।

সেন কটেজ-এর ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে বসে কথা হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাতটার ঘরে পৌঁছে গেছে। বিচিত্র ঢঙের সুন্দর-সুন্দর সব বাতি ঘরটাকে প্রায় দেওয়ালির রাত করে তুলেছে। কিন্তু এখন আবহাওয়া খানিকটা থমথমে। সবাই কেমন যেন গম্ভীর। এমনকী নবনীতাও। আজ, এই মুহূর্তে, যেন গৃহকর্তার অভাবটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

রহস্যটা খতিয়ে দেখতে মাত্র তিনদিন সময় নিয়েছে ইন্দ্রজিৎ। জিনির টাইপ করে দেওয়া তথ্য, নিজের স্মৃতি আর বুদ্ধিকে বারবার ব্যবহার করে একটা অনুমানে পৌঁছেছে। তারপর অনিমেষ সরকারের লিখে দেওয়া ঠিকানা আর ফোন নম্বর ওকে একটা প্রায়-সিদ্ধান্তের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

সুতরাং, পুরোপুরি তৈরি হওয়ার পর ও মহেন্দ্র সেনকে ফোন করেছে। জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় চায়ের আসরে ও সব রহস্যের জট খুলবে। চেষ্টা করবে, কিডন্যাল্ড হয়ে যাওয়া জিতেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনতে।

..কিডন্যাপাররা টাকা চাইতে দেরি করায় আমার প্রথম খটকা লেগেছিল। তা হলে কি কিডন্যাপিংটা যে বা যারা করিয়েছে তারা খুবই বড়লোক? তাদের টাকার দরকার নেই? একে একে মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং নবনীতাকে দেখে নিল ইন্দ্রজিৎ : সাধারণত কিডন্যাপিং-এর কেসে যেটা হয়, পণবন্দিদের লুকিয়ে রাখাটা ভীষণ রিসকি বলে কিডন্যাপাররা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে

চেষ্টা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটায় তাড়াহুড়োর বদলে কেমন যেন ডিলি ড্যালি গা-ছাড়া ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল।

সেদিন আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল, কিডন্যাপিং-এর মতো দুঃসাহসিক কাজ করার সাহস আপনাদের কারও নেই। আশা করি আমার এই মন্তব্যকে আপনারা প্রশংসা হিসেবে নেবেন। যাই হোক, বাকি আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি অনিমেষবাবুকে কয়েকটা কথা বলতে চাই–আর সেইসঙ্গে আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই, জিতেন্দ্রনাথকে কে কিডন্যাপ করেছে।

সবাই উশখুশ করতে লাগলেন। এ-ওর দিকে অস্বস্তির চোখে দেখতে লাগলেন।

অনিমেষ বললেন, বলুন, কী বলতে চান।

হাসল ইন্দ্রজিৎ অপরাধীকে ধরে ফেলার হাসি ও দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি জিতেন্দ্রনাথকে আপনিই কিডন্যাপ করেছেন।

সবাই অবাক চোখে তাকালেন অনিমেষ সরকারের দিকে। ঘরে আলোচনা আর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। দশরথ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চোখে বুজে মাথা নাড়তে লাগল।

এক মিনিট! সবাইকে কথা থামাতে ইশারা করল ইন্দ্রজিৎ : আর-একটা কথা অনিমেষবাবুকে আমার বলার আছে। জিতেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আপনার সারা জীবনেও আর দেখা হবে না। আপনি যদি একশো বছরও এ-বাড়িতে অপেক্ষা করেন, তা হলেও তার দেখা পাবেন না।

কেন, জিতেন কি আর বেঁচে নেই? অনিমেষ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

সে তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন। চোখ মটকে বাঁকা হাসল ইন্দ্রজিৎ।

বাবা…বাবাকে কি মেরে ফেলা হয়েছে? মিহি গলায় প্রশ্ন করলেন সুরেন্দ্র।

বাবা কি এ-বাড়িতে আর কখনও আসবেন না? মহেন্দ্র।

কীসব কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন। স্টপ বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ। নবনীতা।

হাত তুলে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলল ইন্দ্রজিৎ। তারপর ও অনিমেষ সরকার যতদিন এ বাড়িতে আছেন ততদিন জিতেন্দ্রনাথের এ-বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। ওঁরা দুজন হরিহর-আত্মা হলেও ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে পাওয়া ইমপসিবল।

কেন? অনিমেষ প্রশ্ন করলেন।

কারণ, আপনারা দুজনে একই লোক। হরিহর-আত্মা নন–একই আত্মা।

পলকে সবাই চুপ করে গেলেন। নিস্তব্ধতা পুরু মোলায়েম চাদরের মতো বিছিয়ে গেল সারাটা ঘরে।

অনেক-অনেকক্ষণ পর জিতেন্দ্রনাথের গলায় কথা বললেন অনিমেষ, থ্যাংক য়ু, মিস্টার চৌধুরী। এবং পরচুলা, চাপদাড়ি ও চশমা খুলে ফেললেন। নাকের ডগা থেকে টেনে খুলে নিলেন একদলা প্লাস্টিসিন।

বাবা! মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং নবনীতা।

পরান ছুটে গিয়ে জিতেন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরল। কান্না-ভাঙা গলায় ডুকরে উঠল, বড়বাবু! আপনি বড়বাবু!

জিতেন্দ্রনাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, বললেন, হ্যাঁ রে, আমি। আর কোনও চিন্তা নেই।

এবার ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনি খুব প্রমিসিং ডিটেকটিভ, মিস্টার চৌধুরী। এখন বলুন তো, আমাকে আপনি কী করে সন্দেহ করলেন?

ইন্দ্রজিৎ মাথার ঝাঁকড়া চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর ও প্রথম সন্দেহ হল, আপনি জিতেন্দ্রনাথের লেখা বহু চিঠির কথা বলেছেন, একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছেনও–কিন্তু আপনার লেখা কোনও চিঠির কথা বলেননি। বাড়িতে আপনার লেখা কোনও চিঠি পায়নি কেউ। সবসময়েই অনিমেষ সরকার ফোন করে কথা বলতেন।

দ্বিতীয়ঃ আপনার লাঠিটা নতুন। আর আপনার সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটাটা মাঝে-মাঝে ঠিকঠাক স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল।

তৃতীয়ঃ আমি যখন সন্দেহ থেকেই আপনাকে অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার লিখে দিতে বলছিলাম, আপনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।

চার নম্বরঃ আপনার রুমাল। আমি আর আপনি যখন সেদিন ও-ঘরে বসে– ইশারা করে ঘরটার দিকে দেখাল ইন্দ্রজিৎ? কথা বলছিলাম তখন আপনি রুমাল বের করে চোখ মোছার ভান করছিলেন। সেইসময়ে পরান চায়ের কাপ-প্লেট নিতে ঘরে ঢুকেছিল। আপনার হাতের রুমালটা দেখে ও চমকে উঠেছিল। আমি পরে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ওটা জিতেন্দ্রনাথের রুমাল। সে রুমাল আপনার পকেটে গেল কেমন করে?

অবশ্য তখন আমি আপনাকে কিডন্যাপিং-এর নাটের গুরু বলে সন্দেহ করেছিলাম। পুরোপুরি জিতেন্দ্রনাথ বলে ভাবিনি।

সেটা ভাবলেন কখন?

ওই রক্তের রিপোর্টটা পাওয়ার পর। তখন বুঝলাম, পয়সা থাকলে একটা নকল কিডন্যাপিং এর ব্যবস্থা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। তা ছাড়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে কিডন্যাপারদের যেন কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। এ ছাড়া আর-একটা ব্যাপার সবচেয়ে উদ্ভট ছিল…।

কোনটা?

আপনার এই মালিক বন্ধু অনিমেষ সরকারকে হঠাৎ করে জন্ম দেওয়া। আগে তো কখনও আপনি অনিমেষ সরকারের কথা ছেলেমেয়েকে বলেননি! তা হলে হঠাৎ করে এই ক্ষমতাবান বন্ধু এল কোত্থেকে!

আসলে, মিস্টার সেন–আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি দুটো করে ব্যক্তিত্ব আছে। একটা নরম, আর-একটা কঠিন। একজনের কাজ ভালোবাসা, অন্যজনের কাজ শাসন করা। যদিও ব্যাপারটা অ্যাবসোলিউটলি আপনাদের ফ্যামিলির ব্যাপার–তবুও বলছি, আপনার একটা পারসোনালিটি বহুদিন ধরে ঘুমিয়ে ছিল। অনিমেষ সরকার। আপনি জিতেন্দ্রনাথ আর অনিমেষ–দুজনকেই সজাগ রাখুন। তবে দুজনের মধ্যে ব্যালান্সটা আপনাকেই মেইনটেইন করতে

হবে। বেশি ভালোবাসাও যেমন ঠিক নয়, বেশি শাসনও তাই। যদি আপনি এবার থেকে এটা মেইনটেইন করতে পারেন তা হলে সবার ভালো হবে। আর সীমন্তিনীদেবীও খুশি হবেন।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল, বয়েসে ছোট হলেও অনেক অপ্রিয় কথা বললাম–হোপ ইউ উডন্ট মাইন্ড। আমাদের কাজ শেষ আমরা এবার যাই।

একমিনিট, মিস্টার চৌধুরী। উঠে দাঁড়ালেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর পরানকে বললেন, পরান, আমার চেকবইটা নিয়ে আয় তো।

পরান তাড়াতাড়ি চলে গেল জিতেন্দ্রনাথের ঘরের দিকে।

জিতেন্দ্রনাথ ইন্দ্রজিতের কাছে এসে আন্তরিক গলায় বললেন, আপনার কথায় আমি কিছুই মনে করিনি। বরং আপনার কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব। আসলে মেন্টাল টরচারে-টরচারে আমি দিশেহারা হয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। তারপর, ঝোঁকের মাথায় এসব করে ফেলেছি…।

চেকবই এসে গিয়েছিল। জিতেন্দ্রনাথ পেন দিয়ে খসখস করে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন। নামের জায়গায় এসে থমকালেন তিনি, কী নামে হবে চেকটা?

প্রাইভেট আই ডট কম।

কত টাকার চেক দিলে, বাবা? নবনীতা জিগ্যেস করল।

জিতেন্দ্রনাথ ওর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, দ্যাট ইজ নান অফ ইওর ব্লাডি বিজনেস, লেডি।

ইন্দ্রজিৎ বুঝল জিতেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন ভূমিকা এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছেন। ওরা তিনজনে বেরিয়ে এল সেন কটেজ থেকে।

মারুতি ভ্যানে ওঠার পর দশরথ বলল, স্যার, কাল সকালে এই চেকটা শার্লক হোমসের ছবিতে ঠেকিয়ে তারপর ব্যাঙ্কে জমা দেবেন।

ইন্দ্রজিৎ হাসল। গাড়ি স্টার্ট দিল।

জিনি বলল, আজকেও ডিনার সেরে গেলে কেমন হয়?

আমি, স্যার, ঠিক এই রিকোয়েস্টটাই করব ভাবছিলাম। কিন্তু সংকোচ আর লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করেছিল। যদিও আমার হাঙ্গার স্ট্রাইকের অভ্যেস আছে, তবু…।

মারুতি ভ্যানের মিউজিক সিস্টেম অন করে দিল ইন্দ্রজিৎ। সুরের ঝংকারে দশরথের শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।

# (খুনি) তুমি রবে নীরবে (নভেলেট)

**(খুনি) তুমি রবে নীরবে (নভেলেট)**

**নীতু মেহতা**

নীতু মেহতার মৃতদেহটা যখন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন সুদেশ সেখানে ছিল না। কিন্তু রতনলাল ছিল। সে কথা ওদের বলতে গিয়ে ঝিকিয়ে উঠেছিল রতনলালের কালো চোখ, ঝলসে উঠছিল হিংস্র দাঁতের সারি। রাহুল দস্তিদার চাপা স্বরে শাসিয়ে উঠল, রতন, রতন, আস্তে। লোকে শুনতে পাবে।

রাহুল দস্তিদার রাহুলদা–ওদের নেতা। সবাই ওর কথা শোনে। রতনলালও শুনল।

ওরা বসেছিল একটা রেস্তোরাঁয়। ওরা যখন আলোচনার জন্য জমায়েত হয়, তখন লোকজনের ভিড়ের মাঝেই আশ্রয় খুঁজে নেয়। লুকিয়ে কোনও গোপন জায়গায় সাক্ষাৎকারের চেয়ে চোখের সামনে থাকাটাই ভালো। তাতে গোয়েন্দা-পুলিশের নেকনজরটা কম পড়ে। কিন্তু সময়ে-সময়ে যে পোড়ো আস্তানায় দেখা করতে হয় না তা নয়।

রতনলালের স্বর আলতো হল। হল আরও হিংস্র। ও বলল, নীতুর কোনও আঙুলে নখ ছিল না। আঙুলগুলো ভেঙেচুরে চৌচির। আর–আর মাথায় একটা মস্ত গজাল ছুঁড়ে ছিল।

সুদেশ হুদা কেঁপে উঠল। এ সবই ওরা জানে, আগেই কানে এসেছে। কিন্তু তবুও ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ত্রাসের উলঙ্গ ছায়া। নীতু মেহতা ওদেরই একজন ছিল। ওকে মেরে ফেলা হয়েছে, একইসঙ্গে সেই বীভৎস মৃতদেহ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে দলের বাকি সবাইকে।

সামনে পড়ে আছে চায়ের কাপ, ওমলেট। খাওয়ার ইচ্ছে মিলিয়ে গিয়ে গা গুলিয়ে উঠছে। চারপাশের গুঞ্জন ওদের কানে আসে না। ওরা শুধু শুনতে পায় নিজেদের হৃৎপিণ্ডের শব্দ–টিক টিক-টিক। জীবনের ঘড়ি চলছে। এখনও।

সুদেশ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আড়চোখে তাকায় কাছে বসা পুতুল বক্সীর দিকে। ওর মুখের রং মিলিয়ে গেছে। সুদেশ অবাক হয়। মেয়েটা কেন তাদের দলে এল? আরও অবাক হয় এই ভেবে, রাহুল দস্তিদারের দলে এসে কীভাবে ও পুতুলের প্রেমে পড়ল!

রাহুল তখন নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। অর্থাৎ, ও এখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। স্টিল ফ্রেমের চশমার আড়ালে ওর চোখে এক কুৎসিত দ্যুতি।

রাহুলের চেহারা রোগার দিকে। শরীরে এমন কিছু শক্তিও নেই। কিন্তু সে ইউনিভার্সিটির এক তুখোড় ছাত্র এবং সুদেশের ধারণা, যে-গঠনমূলক বিপ্লব বিস্ফোরণের পথে এগিয়ে চলেছে, তার পিছনে অনেকটাই কাজ করেছে রাহুল দস্তিদারের মাথা।

এ ভালো কথা নয়, বিড়বিড় করে বলল রাহুল, এ মোটেই ভালো কথা নয়। নীতু…।

মানে নীতু ওদের কাছে গান গেয়েছে?–প্রশ্ন করল ফিদা জয়সওয়াল, পুলিশ তাহলে আমাদের খবর জানতে পেরে গেছে?

নীতু গান গাওয়ার ছেলে নয়, কঠিন স্বরে ফিদার সন্দেহের উত্তর দিল রতনলাল, ওদের হাজার টরচারেও ও মুখ খুলবে না–আমি জানি।

মানুষের টলারেট করার একটা লিমিট আছে। ফিদা মন্তব্য করল।

না, নীতু কথা কইবার ছেলে নয়। রতনলাল আবার বলল, এ আমি জান বাজি রেখে বলতে পারি।

শুকনো স্বরে মুখ খুলল রাহুল দস্তিদার, সে-বাজি শুরু হয়ে গেছে, রতন। নীতু গেছে। এবার আমাদের পালা। বাজিতে তোমার জিত হোক তা-ই সবাই চায়।

ফিদা জয়সওয়ালের চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। যেন গোয়েন্দা-পুলিশ এখনই ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

কী করে জানব নীতু সবাইকে ফাসায়নি?–ফিদার কণ্ঠস্বর উষ্ণ, আমাদের এখন লুকিয়ে থাকাটাই ঠিক হবে।

তার মানে, নীতুর সঙ্গে যে আমাদের কানেকশান ছিল সেটা গোয়েন্দা-পুলিশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।–চাপা অথচ শান্ত গলায় এ-মন্তব্য পুতুল বক্সীর। ওর মুখের রং ফিরে এসেছে। সুদেশ সেটা লক্ষ করল। তেজি জেনানা! ওর সহ্য শক্তি সম্পর্কে সুদেশের অনুমানে ভুল হয়েছিল!

রাহুল প্রশংসার চোখে পুতুলের দিকে তাকাল।

পুতুল ঠিক বলেছে, ফিদা। আমাদের এখন ভয় পেলে চলবে না। এখন মাথা ঠিক রাখতে হবে।–সে তাকাল সুদেশ হুদার দিকে। পুরু লেন্সের পিছনে রাহুল দস্তিদারের চোখ জ্বলছে? তুমি কী বলো, সুদেশ? একেবারে চুপচাপ যে?

সুদেশ কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, পুলিশকে এখনই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

ফিদা জয়সওয়াল তীব্র ব্যঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, নীতু যেমন ভেবেছিল!

সাপের চোখে ফিদার দিকে তাকাল সুদেশ। ওরা পরস্পরকে মোটেই পছন্দ করে না।

সুদেশ বলল, নীতু এখন সব আলোচনার বাইরে। সব সাহায্যের বাইরে। তবে আমার ধারণা, নীতু আমাদের কথা পুলিশকে বলেনি।

রাহুল তীক্ষ্ণ কৌতূহলে সুদেশকে খুঁটিয়ে দেখছিল–নীচের ঠোঁটে দাঁতের কামড়। তারপর বলল, তোমার এ ধারণার কারণ, সুদেশ?

এ তো একদম ক্লিয়ার। নীতু যদি সব ফাঁস করে দিত, তাহলে ওর ডেডবডি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে পুলিশ আমাদের অ্যালার্ট করে দিত না। ওরা প্রথমে আমাদের অ্যারেস্ট করত।

রাহুল দস্তিদার আঙুলে টুসকির শব্দ করল? সারা সন্ধের এই একটা দামি কথা। নীতু আমাদের নাম বলেছে কি বলেনি তার উত্তর হল, আমরা এখনও জেলের বাইরে। নীতু আমাদের নাম বলে থাকলে এতক্ষণে নীতু মেহতার দাওয়াই আমাদের ওপর চালু হয়ে যেত। নীতুকে যে হেভি অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে, সেটা আমাদের জানিয়ে পুলিশ বোকামি করত না। রাহুলের চোখ পিছলে গেল কাছাকাছি বসা এক যুবকের ওপর। সে খেতে-খেতে হঠাৎই চোখ তুলে তাকিয়েছিল ওদের দিকে।–ঢের হয়েছে। এবার উঠে পড়া যাক। নইলে সবাই আমাদের নজর করতে শুরু করবে। আবার আমাদের দেখা হবে। তবে, কোথায়, কখন, পরে জানিয়ে দেওয়া হবে…।

## সুদেশ হুদা

রাহুল আর সুদেশ পুতুলকে বাসে তুলে দিল। ফিদা আর রতনলাল নিজের নিজের ডেরায় চলে গেল। পুতুলের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল সুদেশের। কিন্তু নীতুর ভয়াবহ পরিণতি যেন ওদের মাঝে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শুধু নীরবে হাতে চাপ দিয়ে পুতুলকে বিদায় দিয়েছে।

বাস ছেড়ে দেওয়ার পর নিজেকে ভীষণ একা মনে হল সুদেশের। মন হয়ে উঠল বিষণ্ণ। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর মনে পড়ল, দলের কথা, বর্তমান পরিস্থিতির কথা, নিজেদের লক্ষ্যের কথা।

রাহুল দস্তিদার সুদেশের কাঁধে হাত রাখল : চলো, সুদেশ। চায়ে একটু গলা ভেজানো যাক। কথা আছে।

সামান্য হাঁটা-পথ পেরিয়ে একটা নির্জন চায়ের দোকান ওদের চোখে পড়ল। ভেতরে ঢুকে দু-কাপ চা নিয়ে বসল দুজনে। রাহুল চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বেশি গরম বলে মনে হল সুদেশের। অথচ গরম চা ওর প্রিয়। তবে আজ কেন…!

রাহুল সুদেশের দিকে তাকিয়ে। চশমার পিছনে ওর চোখ অগ্নিময়। সুদেশ, আমাদের ভেতর একজন ইনফরমার আছে।

সরাসরি এই মন্তব্যে সুদেশ প্রচণ্ড চমকে উঠল, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। রাহুলের সেটা নজরে পড়ল। সে হাসল হালকাভাবে।

তুমিও যে এ-কথা ভাবোনি, সে-কথা আমাকে বলো না, সুদেশ। এ ছাড়া নীতুর অ্যারেস্ট হওয়া বা মৃত্যুর কোনও সঠিক ব্যাখ্যা নেই–থাকতে পারে না।

কিন্তু কিন্তু, এ যে অসম্ভব!

উজ্জ্বল ময়াল-চোখ সামান্য তীক্ষ্ণ হল চশমার আড়ালে।–কেন? অসম্ভব কেন?

যদি ইনফরমার কেউ থেকেই থাকে, তা হলে সে শুধু নীতুর খবরই পুলিশকে জানাল কেন? সবাইকে কেন ধরিয়ে দিল না?

মাথা নাড়ল রাহুল, ঠোঁটের ওপর তীব্র হল ওর দাঁতের কামড়। ঠিকই বলেছ, সুদেশ। হয়তো সে নীতুর খবর পুলিশকে জানাতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো নীতু সেই ইনফরমারকে চিনে ফেলেছিল, তাই সে নিজেকে বাঁচাতে নীতুকে ধরিয়ে দেয়।

তা হলে নীতুকে ওরকম বীভৎসভাবে টরচার করা হল কেন?

রাহুল কাঁধ ঝাঁকাল, ওর ঠোঁট শক্ত হল।–এদেশের পুলিশরা স্যাডিস্ট। একটা কসাইয়ের কর্মচারীরা এর চেয়ে বেশি কী হবে?

রাহুল দেশনেতাকে কখনও নাম ধরে সম্বোধন করে না। বলে কসাই, অথবা বিশ্বাসঘাতক। দেশের রক্তচোষা।

সেই ইনফরমার আমাদের সম্পর্কে আর নতুন কী জানতে চায়? সুদেশ প্রশ্ন করল। আমরা কী, কে, তা তো সে ভালোভাবেই জানে!

সে জানতে চায় আমাদের বিস্ফোরণের দিনটা–কোন দিন আমরা আক্রমণ করব এই দুর্নীতিভরা শাসন ব্যবস্থাকে। এ ছাড়া রয়েছে আমাদের আসল নেতাদের নাম-ঠিকানা। তাঁদের পরিচয় আমিও ঠিকঠাক জানি না। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ একজন মিলম্যানের মাধ্যমে।

সুদেশ সতর্কভাবে লক্ষ করছে রাহুল দস্তিদারকে।

আর কাউকে তোমার এ-সন্দেহের কথা বলেছ? বলেছ ইনফরমারের কথা?

ক্ষুরধার হাসি ফুটে উঠল রাহুলের ঠোঁটে, এবং মিলিয়ে গেল।

তোমাকেই প্রথম বললাম, সুদেশ।

কেন? আমাকে কেন?

আবার সেই হাসিঃ দলের মধ্যে তুমি একটু অন্যরকম, সুদেশ। তুমি আমাদের দেশের লোক নও। এখানে পড়তে এসেছ সুদূর মিক্স ইস্ট থেকে। আমাদের দলে তোমার যোগ দেওয়ার কারণ স্পষ্ট এবং জোরালো। আমাদের বিরুদ্ধে ইনফরমারগিরির জন্যে তুমি এত কষ্ট করে আমাদের দলে আসবে এ সম্ভবনা কম। তোমার প্রাণ দেশপ্রেমীর প্রাণ।

ধন্যবাদ রাহুলদা। সুদেশ হাসল।আমি তাহলে সন্দেহের বাইরে আছি?

আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই, সুদেশ।

বিশেষ কাউকে তোমার সন্দেহ হয়?

তোমার হয়?

সুদেশ চোখ ছোট করে রাহুলের দিকে তাকাল ও আমাকে দিয়ে কী বলাতে চাও, রাহুলদা?

আবার হাসি।–যে-কোনও একজনের নাম করো। মনে রাখবে, আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই। সুতরাং, একজনের নাম করো। যে-কোনও একজনের।

এর কোনও মানে হয়?সুদেশ হুদা বলল, তুমি তো জানো, ফিদাকে আমি পছন্দ করি না। ওর নাম বললাম, কারণ, ওকে আমার ভালো লাগে না। ও ইনফরমার কি না জানি না– তবে হতেও পারে।

ফিদা।–আস্তে-আস্তে উচ্চারণ করল রাহুল দস্তিদার। ঠোঁট কামড়ে ধরল দাঁতে। হতে পারে। ইনফরমার আছে কি না আছে জানার আগে থেকেই ফিদাকে আমার সন্দেহ হত। বড় বেশি নার্ভাস– ওকে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। দেখেছ, নীতুর খবর শুনে কীরকম লুকিয়ে পড়ার কথা বলছিল? অন্য কারও নাম বলো।

সুদেশ ইতস্তত করতে লাগল।–রতনলাল? আমার মনে হয় ইনফরমারগিরির বুদ্ধি ওর নেই।

হয়তো সেটা ওর অভিনয় হতে পারে। কারণ, কখনও কখনও ওকে বেশ বুদ্ধি খেলাতে দেখেছি। চালাকিটা চমৎকার। ওপর-ওপর এক বোকাসোকা গোবেচারা ছাত্র। নেহাতই আমার শেখানোর ঠেলায় আর পরীক্ষার হলে টোকাটুকির জোরে পাস করে। কেই-বা ওকে সন্দেহ করবে? অন্য কারও নাম কোরো, সুদেশ।

আর কে আছে?

হালকা হাসির লক্ষ্য এবার সুদেশ। সবে তো শুরু করেছ, সুদেশ।

আমি..আমি। বলল সুদেশ, কিন্তু তুমিই তো বলেছ, আমি সন্দেহের বাইরে।

ভুল করছ, সুদেশ। আমি বলেছি, আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই।

সুদেশ রাহুল দস্তিদারের দিকে তাকিয়ে হাসল ও রাহুলদা, আমি কি নিজের সাফাই নিজেই গাইব? তিন মাস আগে আমি মিডল ইস্ট থেকে এসেছি। আমার পাসপোর্ট, কাগজপত্র, সব হোস্টেলের ঘরে আছে। পুলিশ কি আমার মতো একজন বিদেশিকে তোমাদের দলে ইনফরমার হিসেবে ঢোকানোর ঝুঁকি নেবে?

তাই বুঝি?–চশমার কাচের আড়ালে রাহুল দস্তিদারের চোখজোড়া ঝিকিয়ে উঠল। সুদেশ হুদার সেটা নজর এড়াল না। সুদেশ, তুমি আইন-পালানো দাগি হতে পারো। এখানকার গোয়েন্দা পুলিশ এইরকম দাগিদেরই ইনফরমার হিসেবে পছন্দ করে।

আমি? দাগি?সুদেশের বিস্ময়ে ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

রাহুল হাত বাড়িয়ে মৃদু চাপড় মারল সুদেশের হাতে।

আমার কথাগুলো মনে রেখো, সুদেশ। আমরা কেউই সন্দেহের বাইরে নই। এমনকী আমিও।

চেয়ারে হেলান দিয়ে রাহুলের চোখে চোখ রাখল সুদেশ।

তুমি?

মাথা নাড়ল রাহুল।–কেন নয়? সেটাই তো হবে সত্যিকারের চালাকি। যে-লোকটা সব সন্দেহের বাইরে–আমি–সে-ই হল গিয়ে আসল লোক। অ্যাটাকের দিনটার কথা আমিই প্রথম জানব। আমাদের দলের হাই লেভেল লিডারদের আমিই খানিকটা হয়তো চিনি।

রাহুলদা।–সুদেশ বলল।–এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না। আমি জানি, এই বিপ্লবের জন্য তোমার দরদ কতখানি। তুমি কখনও বিট্রে করতে পারবে না। যদি আমাদের মধ্যে ইনফরমার কেউ থেকেই থাকে, তবে সে হয় রতনলাল, নয় ফিদা।

আমার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, সুদেশ। আমি বলছি, আমাদের কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। এখনও একজন বাকি আছে যার নাম আমরা এখনও তুলিনি।

সুদেশ হুদার দু-চোখে আতঙ্ক।

অসম্ভব, রাহুলদা! পুতুল হতে পারে না।

সেও তো আমাদের একজন।–মাথা নেড়ে বলল রাহুল।

তুমি ঠাট্টা করছ।

রাহুল দস্তিদারের ঠোঁটের রেখা হিংস্র হল। বলল, নীতু মেহতার সঙ্গে কেউ ঠাট্টা করেনি।

সুদেশ হিংস্র স্বরে জবাব দিল, পুতুলকে নিয়েও ঠাট্টা চলে না।

তুমি ওকে ভালোবাসো, তাই না সুদেশ?–শান্ত গলায় বলল রাহুল, বড়ই দুঃখের কথা যে, ভালোবাসা অন্ধ হয়।

সুদেশ চোখ নামিয়ে তাকাল চায়ের কাপের দিকে। চা এখন ঠান্ডা। সুতরাং, সুদেশের জিভে বিস্বাদ ঠেকবে। ওর চোখের সামনে পুতুলের মুখ। মনে-মনে ওর ঠোঁটের স্পর্শ, শরীরের উষ্ণতা, আর একইসঙ্গে ওকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছে…সব মিলিয়ে এক বিষণ্নতা ঘিরে ফ্যালে সুদেশ হুদাকে। এই রাজনীতির মধ্যে পুতুলের আসার কী দরকারটা ছিল?

সুদেশের রাগ হল। হিংসা, প্রতিহিংসা, রাজনীতি, বিপ্লব–এসব পুরুষদের কাজ। পুতুল তো ওর পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারত, পারত না?

হঠাৎই সুদেশের মনে পড়ল, পুতুল যদি রাহুলদার দলে না থাকত তা হলে সুদেশ এখানে এসে কোনওদিনই ওর দেখা পেত না। গড়ে উঠত না ওদের এই অদ্ভুত ভালোবাসা।

হ্যাঁ, ভালোবাসি। রাহুলের দিকে চোখ রেখে সুদেশ বলল, ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, রাহুলদা। সেইজন্যেই বলছি, ওকে সন্দেহ কোরো না। অন্য কাউকে সন্দেহ করো, আমাকে করো, কিন্তু ওকে না। আমাদের বন্ধুত্বকে বন্ধুত্বের মধ্যেই ধরে রাখো, রাহুলদা।

রাহুল দস্তিদারের চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি।

তোমার জন্যে দুঃখ হয়, সুদেশ। তোমরা ইরানিরা বড় অদ্ভুত। আমরা অন্যরকম–অন্তত আমি। কোনও মেয়ে আমার নজর কাড়ে না। এই বিপ্লবই আমার মা, বোন, বউ-সব। বলতে পারো এই বিপ্লবের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে। সেই কারণেই পুতুল বক্সীকেও আমি সন্দেহের চোখে দেখি। সে পুরুষ কি মেয়ে তা দেখি না। আমি দেখি, সে আমাদেরই একজন, অতএব সন্দেহের বাইরে নয়।

আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না।–উঠে দাঁড়াল সুদেশ।

রাহুল দস্তিদার চারপাশে তাকাল। দোকানে ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন খদ্দের ঢুকেছে।

হ্যাঁ, সেই ভালো। আমাদের কথাবার্তা ক্রমশই উঁচু পরদায় উঠছে।

চশমার কাচ ভেদ করে সুদেশের দিকে তাকাল সে। আবার আমাদের দেখা হবে… শিগগিরই…দলের ডেরায়।

কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল সুদেশ হুদা।

.

সুদেশ হুদা বাড়ি ফিরতেই খবর পেল, একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারা ইরানের লোক।

আপনার দেশ থেকে এসেছেন। প্রতিবেশী মহিলা বললেন সুদেশকে। তাঁর চোখেমুখে কৌতূহলের ছাপ। যাতে ভুলে না যাই সেজন্যে তাদের নাম-ধাম লিখে রেখেছি–এই যে।

এক টুকরো কাগজ সুদেশের হাতে তুলে দিলেন তিনি। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজি। কসমোপলিটান হোটেল। রুম নাম্বার চারশো পাঁচ।

কাগজটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ফেলল সুদেশ।

কী হল, ঠিকানাটা আপনার লাগবে না?–মহিলাটি প্রশ্ন করলেন।

না। মনে থাকবে।

ওঁদের তাহলে আপনার ভালোমতো মনে আছে? ওঁরা বলছিলেন, আপনাদের ফ্যামিলির সঙ্গে নাকি ওঁদের জানাশোনা আছে। এ দেশে বেড়াতে এসে তাই ভাবছিলেন আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবেন। সত্যি, দুর-দেশে চেনা লোক পাওয়া মানে…।

হাতে স্বর্গ পাওয়া।–সুদেশের গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর।

আপনি ঠিক দেখা করবেন কিন্তু। ওঁরা অনেক করে বলে গেছেন।

কাল দেখা করব। এখন পড়াশোনা আছে। খবরটা দেওয়ার জন্যে থ্যাঙ্কস।

আলোচনায় দাঁড়ি টেনে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল সুদেশ।

**ফিদা জয়সওয়াল**

সেই রাত্রেই ফিদাকে অনুসরণ করল সুদেশ।

ফিদা ওকে দেখতে পায়নি। রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়। সুতরাং, নিজেকে গোপন রেখে অনুসরণে কোনও অসুবিধেই হয়নি।

ফিদার চালচলন এখন খেয়ালি, উদ্দেশ্যহীন। একটা দোকান থেকে একটা কোকাকোলা কিনে গলায় ঢালতে শুরু করল সে। তারপর একটা ম্যাগাজিন-স্টলে দাঁড়িয়ে দু-একটা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে দেখল। একটা সিনেমা হলের সামনে কিছুটা সময় কাটিয়ে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল ফিদা।

ফিদার সামনে চায়ের কাপ। চোখ চায়ের কাপে। মন অন্য কোথাও। ওর কপালে গভীর চিন্তার রেখা। সে-চিন্তার কি নীতু মেহতা আর নাম-না-জানা ইনফরমার জায়গা করে নিয়েছে? ভাবল সুদেশ। একটা থামের আড়ালে একটা টেবিলে বসেছে সুদেশ। গোপনে লক্ষ রাখছে ফিদা জয়সওয়ালের ওপর।

চায়ের কাপে টোকা মারছিল সুদেশ। তখনই সে দেখতে পেল জগদীশ আম্বাস্তাকে।

নেশা করা চোখ নিয়ে কালো জলহস্তীমার্কা জগদীশ আম্বাস্তা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছেন। তার বেজির মতো চঞ্চল চোখ পিছলে যাচ্ছে প্রতিটি লোকের মুখে। পুলিশ বিভাগের চরম কুখ্যাত অফিসার জগদীশ আম্বাস্তা। রাহুল দস্তিদারের দলে ঢোকার কয়েকদিন পরেই জগদীশকে চিনিয়ে দিয়েছিল রাহুলদা। গোয়েন্দা-পুলিশের দলে সবচেয়ে নৃশংস স্যাডিস্ট এই জগদীশ। বিপ্লব সফল হলে তাঁর জন্য বিশেষ পুরস্কার তাকে তুলে রেখেছে রাহুলদা। নীতু মেহতার করুণ ধ্বংসের মুলে জগদীশ আছেন বলেই সকলের ধারণা।

জগদীশ সাদা পোশাকে আছেন। গিয়ে বসলেন ফিদার মুখোমুখি। ফিদার শরীর হাই ভোল্টেজ শকে শিউরে উঠল–সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য। কিন্তু সুদেশের সেটা নজর এড়াল না।

ফিদা চিনতে পেরেছে জগদীশকে।

জগদীশ পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বের করলেন। সকলের চোখের সামনেই ভেতরের তরলটুকু গলায় ঢাললেন। জগদীশকে সকলেই চেনে। কয়েক জোড়া ভয়ার্ত চোখ ছিটকে এল কুচকুচে কালো লোকটার দিকে। ফিদা চটপট ওর চা শেষ করল। তখনই জগদীশ কী যেন বললেন ওকে। তারপর বোতলটা পকেটে রেখে একটা চুরুট বের করলেন। ফিদা একটা দেশলাই এগিয়ে দিল তার দিকে। গোটাকয়েক কাঠি নষ্ট করে চুরুট ধরালেন জগদীশ। তিনি ফিদাকে আরও কী যেন বললেন। কাধ কঁকিয়ে ফিদা তাকাল দরজার দিকে। জানোয়ারের মতো

হাসলেন জগদীশ, খামচে ধরলেন ফিদার কাঁধ। ফিদা কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। হেসে কী যেন বললেন জগদীশ। ফিদা বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

সুদেশও উঠে দাঁড়িয়ে অনুসরণ করল ফিদাকে।

ফিদা চটপট পা চালাল রাতের পথ ধরে।

নিজের আস্তানার কাছে পৌঁছে ওর চলার শব্দ আয়েশি হল। বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল ফিদা। সুদেশ অপেক্ষা করতে লাগল রাস্তায়। রাস্তার অল্প আলোয় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সুদেশের তেমন কষ্ট হল না। তারপর আলো জ্বলে উঠল ফিদার ঘরে।

তোমার নজরদারির প্রশংসা করতে হয়, সুদেশ।

বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো ঘুরে দাঁড়াল সুদেশ। ওর গলা চিরে বেরিয়ে এল এক চাপা চিৎকার– ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ানো আগন্তুকের ওপর যখন চিতাসুলভ ক্ষিপ্রতায় ও ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখনই ও চিনতে পারল মানুষটাকে।

রাহুল দস্তিদার।

অল্প আলোয় ওর চশমার কাচ চকচক করছে।

রাহুলদা! তুমি এখানে কী করছ? ফিশফিশ করে বলল সুদেশ।

তোমাকেও তো একই প্রশ্ন করতে পারি।

আমি ফিদাকে ফলো করছিলাম।

আর আমি তোমাকে।

অবাক-দৃষ্টিতে রাহুল দস্তিদারের দিকে চেয়ে রইল সুদেশ। রাহুল নিঃশব্দে হাসল।

সন্ধেবেলা তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম, রাহুল বলল, কিন্তু তুমি বাড়িতে ছিলে না। পাশের ঘরের এক ভদ্রমহিলা বললেন, তুমি বোধহয় কসমোপলিটান হোটেলে গেছ তোমার দেশের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর পথে তোমার দেখা পেয়ে ফলো করতে শুরু করলাম। পরে বুঝলাম, তুমি ফিদাকে ফলো করছ। সুতরাং, কোনও জানান না দিয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়।

তুমি সবই দেখেছ তাহলে? সুদেশ জানতে চাইল, ফিদা আর জগদীশকে দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি।

তাহলে তো সবই বুঝতে পারছ।

কী বুঝতে পেরেছি?

যে ফিদাই সেই ইনফরমার!

ফিদার ঘরের জানলার আলোর দিকে রাহুল দস্তিদারের চোখ স্থির। ঠোঁটের ওপর দাঁতের সেই পুরোনো খেলা।

আজ রাতে যা দেখেছ তার জোরেই বলছ যে, ফিদা ইনফরমার?

জগদীশ আম্বাস্তা ওর সঙ্গে কথা বলেছে। সে ফিদাকে চেনে, কিন্তু ওকে অ্যারেস্ট করছে না। কেন?

আমার তো মনে হয়েছে, জগদীশ আম্বাস্তা ফিদার কাছে দেশলাই চাইছিল।

সেই দেশলাইয়ের সঙ্গে কি কোনও সাংকেতিক খবর হাতবদল হতে পারে না? চুরুট ধরাতে জগদীশের অনেক বেশি সময় লেগেছে। কোনও খবর হাতবদল করতে তার বেশি সময় লাগে না।

ফিদার ঘরের আলো নিভে গেল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল রাহুল দস্তিদার।

তোমার কয়েকটা কথা ভাববার মতো সুদেশ। কিন্তু তা বলে ফিদা যে নির্দোষও হতে পারে সে কথা ভুলে যেয়ো না। সেই ইনফরমার অন্য কেউও হতে পারে।

রতনলাল?–অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল সুদেশ। তারপর আরও অস্পষ্ট স্বরে যোগ করল, পুতুল?

রাহুল পকেট থেকে হাত বের করে হাওয়ায় দোলাল।

সেইজন্যেই আজ তোমার কাছে গিয়েছিলাম। ক্ষমা চাইতে। এই নয় যে, পুতুলকে আমি সন্দেহ থেকে পুরোপুরি বাদ দিয়েছি। সেটা সম্ভব নয়। কারণ, অনেকগুলো লাইফের ব্যাপার। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব রাখতে চাই, সুদেশ। আজ সন্ধেয় তুমি রাগ করে চলে গিয়েছিলে। এখন ঝগড়া করার সময় নয়। আমাদের এখন একজোট হয়ে থাকতে হবে। জগদীশ আম্বাস্তা আর গোয়েন্দা পুলিশকে দূরে রাখতে গেলে এটাই একমাত্র পথ। শুনেছি, জগদীশ টরচার করতে এক্সপার্ট। আমি চাই না, সে তার টরচারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের ওপর চালাক।

চারপাশে তাকাল রাহুল। অন্ধকার নির্জন রাস্তা। ঘুমিয়ে পড়া বাড়ি-ঘর। ফিদার অন্ধকার জানলা।

রাত হয়েছে। আজ কারফিউ হতে পারে শুনেছি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। চললাম, সুদেশ। মনে রাগ রেখো না।

না। রাখব না।

সুদেশের দৃষ্টির সামনে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল রাহুল দস্তিদার। ফিদার জানলার দিকে আর একবার তাকিয়ে রওনা হল সুদেশ। আজকের পরিশ্রমের ফল কী হবে সে জানে না।

তোমার জন্যে, পুতুল।–আপনমনে ভাবল সুদেশ।–যা করছি সব তোমার জন্যে। তোমাকে বাঁচানোর জন্যে।

## জগদীশ আম্বাস্তা

পরের দিনটা সুদেশের পড়াশোনা, লাইব্রেরি নিয়েই কেটে গেল। বাড়ি ফিরতে সিঁড়িতে দেখা হল প্রতিবেশী সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তার চোখে-মুখে একটা বিস্রস্ত ছাপ।

মিস্টার হুদা! তাঁর গলার স্বরে ছেলে-কে তিরস্কারের ইঙ্গিত।–ওঁরা আবার এসেছিলেন– মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজি। আপনি কাল ওঁদের সঙ্গে দেখা করেননি বলে খুব দুঃখ করছিলেন।

সময় পাইনি।বলল সুদেশ, দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, যেতেই পারিনি।

ওঁরা কালকের প্লেনে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। কী লজ্জার কথা বলুন তো! একবার দেখা করতে পারলেন না? ওঁরা এত আশা করে এসেছেন।

আজ রাতে দেখা করব। কোনও ভুল হবে না। আচ্ছা–ধন্যবাদ।

তাঁকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সুদেশ।

ঘরে ঢুকে বইপত্র নিয়ে আবার পড়াশোনায় বসল। কিন্তু মনে চিন্তার ঘূর্ণিঝড়, কালো ঘূর্ণিঝড়।

অন্ধকার ঘন হতেই পড়াশোনায় মনোযোগ ফিকে হয়ে এল সুদেশের।

ফিদা। ফিদা জয়সওয়াল।

*

সুতরাং, সংবিৎ যখন ফিরল, তখন গতকালের মতোই ফিদাকে অনুসরণ করে চলেছে সুদেশ।

একই রাস্তা ধরে পথ চলার অভ্যেস ফিদার। ওকে খুঁজে নিতে বেশি অসুবিধে হয়নি সুদেশের। এবং আজকের অনুসরণ গত সন্ধের অ্যাকশান রিপ্লে বলা যায়। অবশেষে সেই একই রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল ফিদা। সুদেশও ঢুকল।

জগদীশ আম্বাস্তা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টলোমলো পায়ে এগিয়ে গেলেন ফিদার কাছে। একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। ফিদা এক কাপ চায়ের

অর্ডার দিয়েছিল–সেটা এসে পৌঁছলে জগদীশ ওকে কী যেন বললেন। সুদেশ শত চেষ্টা করেও কথাগুলো শুনতে পেল না।

হঠাৎই এক হিংস্র গর্জন করে লাফিয়ে উঠলেন জগদীশ। বাঁ-হাতের মুঠোয় খামচে ধরলেন ফিদার চুল। পিছন দিকে লাথি মেরে ফেলে দিলেন নিজের চেয়ার। এবং ডানহাতে গরম চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন ফিদার মুখে।

একটা জান্তব চিৎকার বেরিয়ে এল ফিদার গলা চিরে। রেস্তোরাঁর সব লোক ত্রাসে বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকিয়ে। জগদীশের লাথি-ঘুসি এখন অবাধে ছিটকে পড়ছে ফিদার শরীরে।

শালা, বিপ্লব। গর্জে উঠলেন জগদীশ আম্বাস্তা। নীতুকে দেখে শিক্ষা হয়নি? চল সালা! তোকে বিপ্লব দেখাচ্ছি।

তার পরেই শুরু হল জগদীশের অশ্রাব্য খিস্তি।

অন্যান্য খদ্দেরের মতো সুদেশও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর হাত চলে গেছে পকেটে। রিভলভারের খোঁজে। পিছন থেকে কে যেন ওর হাত চেপে ধরল।

এক ঝটকায় ফিরে তাকাল সুদেশ।

রাহুলদা। রাহুল দস্তিদার।

কেটে পড়ো এখান থেকে।–চাপা গলায় বলল রাহুল। তারপর কোলাহল আর ভিড়ের মাঝে মিলিয়ে গেল।

সুদেশ জানে, আগামীকালই হয়তো বড় রাস্তায় পড়ে থাকবে ফিদা জয়সওয়ালের বডি।

প্রথম নীতু মেহতা। দ্বিতীয় ফিদা। তিন নম্বর কে?

আশপাশে তাকিয়ে রাহুলকে একবার খুঁজল সুদেশ। পেল না।

পুতুল এখন কোথায়? ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকে পা চালাল ও।

## **পুতুল বক্সী**

মাথা নীচু করে গভীর চিন্তা নিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছিল সুদেশ, হঠাৎই আলোর ঝলক চোখে পড়তেই মুখ তুলল। একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে ওর মুখোমুখি। তীব্র হেডলাইটের আলো ঝাপটা মারছে সুদেশের চোখ-মুখে। কুঁকড়ে গেল সে। তৈরি হল বিদ্যুৎবেগে দৌড়োনোর জন্য। তখনই ভেসে এল পুতুলের মিষ্টি গলা।

সুদেশদা!

গাড়িটা দেখে সুদেশ অবাক হল। ও দেখল, ভেতরে ড্রাইভার ছাড়া পুতুল একা।

গাড়িটা পেলে কোত্থেকে?

সে জেনে কী হবে? সময়ে-সময়ে দরকার হলে পাওয়া যায়। রাহুলই জোগাড় করে দিয়েছে। এখন এসো।

পিছনের সিটে পুতুলের পাশে গিয়ে বসল সুদেশ। চোখের ইশারায় প্রশ্ন করল ড্রাইভার যুবকটিকে দেখিয়ে।

দলের ছেলে।–ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল পুতুল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। জনবহুল চঞ্চল এলাকা এড়িয়ে শান্ত নির্জন পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। সুদেশের মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা। কিন্তু কোথায় শুরু করবে ও বুঝতে পারছে না। অবশেষে ফিদার কথাই ও বলল।

পুতুল, ফিদা ধরা পড়েছে।

জানি। জগদীশ আম্বাস্তা ধরেছে।–পুতুল বক্সীর চোখ সামনের অন্ধকার পথে স্থির।

কে বলল? রাহুলদা?

হ্যাঁ। আমাদের খতমের লিস্টে এর পরের নাম জগদীশ আম্বাস্তার। শান্ত স্বরে পুতুল বলল, রাহুলদা তোমাকে সকালে খুব খুঁজেছে, সুদেশদা।

আমি লাইব্রেরিতে ছিলাম।

আমরাও তাই ভেবেছি–যখন অন্য কোথাও তোমাকে পাইনি। বাড়িতে তো একটা খবর রেখে যেতে পারো।

কী করে জানব রাহুলদা ডাকবে। আমাকে বলেছিল, এখন কয়েকদিন আমরা একজোট হব না।

তোমার পাশের ঘরের এক ভদ্রমহিলা রাহুলকে বলেছে তুমি নাকি আজকাল বাড়িতে প্রায় থাকোই না। শুধু স্নান করতে আর খেতে যাও।

এ কটাদিন খুব পড়াশোনায় চাপ যাচ্ছে। আমাদের মিটিং-এর জন্য পড়াশোনায় খুব পিছিয়ে পড়েছি। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে আমার স্কলারশিপ নষ্ট হয়ে যাবে।–চোখ ফিরিয়ে পাশে বসা পুতুলের দিকে তাকাল সুদেশ।ভয় নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না।

অল্প হাসল পুতুল।–জানি। তা ছাড়া পালিয়ে যাবেই বা কোথায়! আমাদের যতজনকে তুমি চেনো, তার চেয়েও অনেক বেশি লোক এ-শহরে ছড়িয়ে আছে, সুদেশদা।

রাহুলদা কি পুতুলকে ইনফরমারের কথা বলেছে? ভাবল সুদেশ। সে সন্দেহ করেছিল ফিদাকে। ফিদা জয়শওয়ালকে। কিন্তু তার পরিণতি কী অদ্ভুত! জগদীশের নৃশংস হাতে ধরা পড়ল ফিদা।

ফিদাকে যখন ধরা হয়, তখন আমি জগদীশকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। আনমনাভাবে বলল সুদেশ, রাহুলদা বারণ করল। জানো পুতুল, আমি ফিদাকে পছন্দ করতাম না।

পছন্দ-অপছন্দ যার-যার নিজের কাছে। ফিদার কপাল খারাপ ছিল। তুমি কিছু একটা করতে গেলে ভালোর চেয়ে খারাপ হত।

পুতুল কি জানে, রাহুলদা পুতুলকে সন্দেহ করতে চেয়েছিল? সুদেশ পুতুলের পক্ষ নিয়ে বাধা দিয়েছে? হয়তো বলেনি। বললে পুতুল এত শান্ত, নিশ্চিন্ত, থাকতে পারত না। এই অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে এক নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা ঘিরে ফেলল সুদেশকে।

ও বাইরে তাকাল। শহর ছেড়ে ওদের গাড়ি শহরতলির খোলা পথ ধরেছে। দু-পাশে অন্ধকার প্রান্তর। আলো নজরে পড়ে না। শুধু নিজেদের গাড়ির হেডলাইট ছাড়া।

আমরা কোথায় যাচ্ছি? সুদেশ জানতে চাইল।

বেশি দূরে নয়।

ঠিক কতটা দূরে? সুদেশের স্বরে কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা অধৈর্যের সুর।

পৌঁছোলেই জানতে পারবে।

মিটিং আছে?

হ্যাঁ।

আগে কখনও শহরের বাইরে আমাদের মিটিং হয়নি।

মিটিংয়ের জায়গা তো আমি পছন্দ করি না, সুদেশদা। রাহুলদা করে। মুখ ফিরিয়ে সুদেশের দিকে তাকিয়ে হাসল পুতুল। সে-হাসিতে কিছুটা বিষণ্নতা খুঁজে পেল সুদেশ।–আমাক তুমি বিশ্বাস করো না?

করি, পুতুল। সুদেশ হুদার কণ্ঠস্বর একাগ্র, একান্ত।

এই তো, এসে গেছি।বলার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতি কমে এল।

রাস্তা নির্জন নির্জনতর। অন্ধকার। শুধু ওপরের আকাশে দিশেহারা নক্ষত্ররা চোখ পিটপিট করছে। এখানে, এই অদ্ভুত জায়গায় থামছে কেন গাড়ি? কই, অন্য কাউকে, রাহুলদাকে, তো চোখে পড়ছে না? সুদেশ অবাক হতে-না-হতেই গাড়ি একেবারে থেমে গেল।

এবার আমি চলে যাব।–বলল পুতুল।

চলে যাবে? সুদেশের স্বর বিপন্ন।

হ্যাঁ, রাহুলদার তা-ই নির্দেশ।

আকাশের ছেঁড়া মেঘের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে সুদেশ। চারপাশ একেবারে চুপচাপ, শুধু গাড়ির ইঞ্জিনের চাপা গর্জন এক বিদ্রোহ।

কী ব্যাপার বলো তো, পুতুল?

জানি না।–ওর গলায় অস্বস্তির সুর। রাহুলদা আমাকে সব খুলে বলেনি। শুধু বলেছে আমি যেন এখানে না থাকি, আবার শহরেও ফিরে না যাই। গাড়ি নিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে অন্য একটা জায়গায়। সে-জায়গার নাম আমি আর রাহুলদা ছাড়া কেউ জানে না, জানবে না। তোমাকে জানানো ঠিক নয়, তবুও বলছি…অ্যাকশন সম্ভবত আজ রাতেই শুরু হবে। ফিদা ধরা পড়ার পর রাহুলদা আর দেরি করতে চাইছে না।

আজ রাতে?সুদেশের স্বর যেন পাহাড়ি প্রতিধ্বনি। তাহলে আমাকে এখানে আনা হয়েছে কী করতে?

অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার জন্য। আক্রমণের সময় তোমাকে একটা গ্রুপ লিড করতে হবে। তোমার সঙ্গে রিভলভার আছে তো?

আছে।

ভালো। ওরা যখন আসবে, তোমাকে সিগন্যাল দেবে–আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই দু-হাতে সুদেশকে জড়িয়ে ধরল পুতুল। ওর ঠোঁট থমকে গেল সুদেশের ঠোঁটে। উষ্ণতা। আচ্ছন্নতা। অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের শব্দ। সুদেশের ঘ্রাণে ফোঁটা পদ্মের গন্ধ। এই মুহূর্ত চিরন্তন হয়ে থাক।–ও ভাবল।

তোমার গায়ে আঁচ লাগতে দেব না,–পুতুল বক্সীর নরম শরীরে সুদেশের কথা জড়িয়ে যায়।–ভয় কোরো না। তোমার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না। বিশ্বাস করো।

পুতুল ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ও ফিশফিশ করে বলল, যাও–বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো। ওরা এখুনি এসে পড়বে। আমি চললাম। গুড বাই, সুদেশ।

সুদেশ হুদা যেন শোলার পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে গাড়ির অপস্রিয়মান লাল আলোর দিকে। দূরে, অন্ধকারে, কোথাও পাচা ডেকে ওঠে কর্কশ স্বরে। শরীরে শিহরন জাগে সুদেশের। এই মুহূর্তে পুতুল ওর সর্বাঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ও একা। সঙ্গী শুধু নৈঃশব্দ্য, আকাশের নক্ষত্র, আর অন্ধকার নির্জন প্রান্তর।

## ইনফরমার

সত্যিকারের সময়ের অঙ্কে খুব বেশিক্ষণ ও অপেক্ষা করেনি, কিন্তু সুদেশের মনে হল এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে। খোলা রাস্তায় ও পায়চারি করতে লাগল। কখনও রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল ঘাসে ছাওয়া অন্ধকার প্রান্তর, কখনও দেখল রাতের আকাশ। ওর মনে লক্ষ কথার ভিড়, লক্ষ ঘটনার ইশারা। পরিস্থিতি ওর বিচার-বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে কেন?

প্রথমটা মনে হয়েছিল জোনাকির ছলনা। তারপর বোঝা গেল দূরাগত কোনও আলো দুটো চিতাবাঘের চোখ–দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে। এগিয়ে আসছে সুদেশ হুদার দিকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ করে যায়। অবশেষে আলোয় উচ্ছ্বাসী ঢেউ ছন্নছাড়াভাবে স্নান করিয়ে দেয় ওকে।

যাক, তুমি তাহলে সময় মতোই এসেছ, সুদেশ।

কণ্ঠস্বর আলোয় দিক থেকে আসেনি। এসেছে তার অনেকটা বাঁ-পাশ থেকে। তাই চমকে ঘুরে দাঁড়াল সুদেশ।

রাহুলদা! সুদেশ চিৎকার করে ওঠে, তুমি?

আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, সুদেশ। এ-জায়গাটা তোমার মনে নেই? মনে থাকা উচিত। শত হোক, এখানেই তো তোমাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

অনুমানে কণ্ঠস্বরের দিকে এগিয়ে যায় সুদেশ হুদা। কিন্তু আলোয় বন্যা তার শরীরে অঙ্গাঙ্গী। পিছন থেকে কার গলা শোনা যায়,–আর-এক পা-ও এগোবে না। আমার হাতে পিস্তল আছে।

রতনলালের গলা সন্দেহ নেই।

ত্রাসে বরফ সুদেশ।

এ সব, কী রাহুলদা?–সে চিৎকার করে ওঠে, এ কী ধরনের ইয়ার্কি?

ইয়ার্কি নয়, ঠাট্টাও নয়, সুদেশ রাহুল দস্তিদারের কণ্ঠে হিংসা, উলঙ্গ হিংসা। মনে পড়ে? তিন মাস আগে এয়ারপোর্ট থেকে একজন ছাত্র ট্যাক্সি করে শহরে যাচ্ছিল। তার নাম সুদেশ হুদা। সুদূর ইরান থেকে এ-দেশে সে পড়াশোনা করতে এসেছিল। পথে জগদীশ আম্বাস্তার সিক্রেট-পুলিশ তাকে আটকায়। গাড়ি থেকে নামিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়। তারপর তারা সুদেশ হুদাকে খুন করে। পুঁতে ফ্যালে এই ঘাসজমিতে। কিন্তু অন্য এক সুদেশ হুদা ঠিকই শহরে এসে পৌঁছোয়। ইউনিভার্সিটিতে ভরতিও হয়। যদিও সে তুমি–নকল সুদেশ। জগদীশ আম্বাস্তার ডিপার্টমেন্টের লোক, গোয়েন্দা পুলিশের লোক। বুদ্ধির তোমার তুলনা নেই, সুদেশ। ওরা তোমাকে ভালোই ট্রেনিং দিয়েছিল…তারপর পাঠিয়েছিল আমার দলে। আমার কথা বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো?

সুদেশের হৃৎপিণ্ড বুকের ভেতর দামামা। মস্তিষ্ক তীব্র চিৎকারে উন্মত্ত–পালাও, পালাও! কিন্তু সুদেশের পা অনড়, নিশ্চল। শ্যামাপোকার মতো আলোর বৃত্ত ওকে সম্মোহিত করে রাখে।

তুমি প্রোটেস্ট করবে না? সাফাইও গাইবে না? রাহুলদার গলায় ঠাট্টার সুর,সব্বাইকে ঠকালেও আমি ঠকিনি, সুদেশ। বিপ্লব আমার মা, বোন, বউ আমার রক্তে শুধু বিপ্লব আছে– আর কিছু নেই। ছাত্র সুদেশ হুদার মারা যাওয়ার খবরটা খবরের কাগজে বেরোয়নি–বের করা হয়নি। সুতরাং, তোমার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। প্রথমটা হয়ওনি। নীতু মেহতা গেল। আমাকে ঠকানোর জন্যে তোমার পরিকল্পনায় সাহায্য করল জগদীশ আম্বাস্তা। ফিদার সঙ্গে মাখো মাখো ভাব দেখাল। তুমি আমাকে বোঝাবে, ফিদাই ইনফরমার। তোমার নির্দেশে ফিদা ধরা পড়ল। ছাড়াও পাবে। তখন তুমি আমাকে বোঝাবে, ফিদা জগদীশের লোক। তাই সে ফিদাকে ধরেও ছেড়ে দিয়েছে। কই, নীতুকে তো দেয়নি! আমিও তাই বুঝতাম। কিন্তু তোমার সর্বনাশ ডেকে আনল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজি।

এখন সুদেশ বুঝতে পারল অসহায়তা কাকে বলে। এই হতাশ অনুভূতিহীন মুহূর্তে বুঝতে পারল নীতুর শেষ অবস্থার কথা, জগদীশের হাতে ফিদার করুণ অবস্থার কথাও।

প্রথমে বুঝিনি তুমি তাদের এড়িয়ে চলছ কেন। নিজের দেশের লোক, প্রতিবেশী, পরিবারের বন্ধু–অথচ তাদের সঙ্গে দেখা করার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে তোমার নেই? এ তো ভালো কথা নয়! সুতরাং হোটেল কমোপলিটান-এ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গাজির সঙ্গে আমি দেখা করলাম। ওদের ঠিকানা তোমার প্রতিবেশী মহিলাই দিয়েছিলেন। যে সুদেশ হুদাকে তারা চিনতেন, সে বেঁটে এবং মোটা ছিল। তার গায়ের রংও পরিষ্কার। তুমি কে, সুদেশবাবু? নিজের লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো নোংরা মানসিকতা তোমার মনে কীভাবে জন্ম নিল? টাকার লোভে? পেটের দায়ে? তা হলে দ্যাখো, বড়লোক হয়ে ভরতি পেটে মরতে কেমন লাগে। রতনলাল!

আলো নিভে যায় মুহূর্তে। নিভেই থাকে। সময় দোদুল শূন্য। ক্রমশ গাঢ় হয় নৈঃশব্দ্যের পরদা। সুদেশ জানে, সামনে-পিছনে রাস্তা বন্ধ। এবং অন্ধকারে ওরা এগিয়ে আসছে, ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওকে শাস্তি দিতে। ওর শরীরে আলোড়ন তুলতে।

ওর সঙ্গে এখন রিভলভার নেই। সুতরাং ওরা নির্ভয়ে আসতে পারবে। ওর রিভলভার সরিয়ে নেওয়ার জন্যেই পুতুল ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। তখনই তুলে নিয়েছে সুদেশের আগ্নেয়াস্ত্র। এখন মনে পড়ছে, ওকে ছেড়ে দিয়ে পুতুলের কী কান্না! পুতুলের বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণার চেয়ে কী আর বেশি যন্ত্রণা ওরা দেবে? সুদেশ কাঁদবে না, ওর চোখে জল নেই। চোখের জল ফেলার অধিকারও ওর নেই। কারণ, সেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? নীতুর সঙ্গে, ফিদার সঙ্গে নীতুর আগে আরও অনেকের সঙ্গে, দেশের অন্যান্য জায়গায়। সুতরাং, চোখের জল ফেলার কোনও কারণ নেই। বরং কারণ আছে নীরব থাকার এবং প্রতীক্ষার। ও অপেক্ষা করছে করবে। হে ভগবান! নিঃশব্দ চিৎকারে ভাবল সুদেশ, ওরা এত দেরি করছে কেন…?

# হারিয়ে যাওয়ার ভয় (নভেলেট)

**হারিয়ে যাওয়ার ভয় (নভেলেট)**

সপ্তাহ দুয়েক আগে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের একটি ছোট রেস্তোরাঁয় বহু পুরোনো একটা সস্তা ডায়েরি পাওয়া যায়। রেস্তোরাঁর মালিক দিব্যি কেটে বলেছেন, এই নোটবইটা হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ার আগে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কোনও লোক তার দোকানে আসেনি। ডায়েরির লেখাগুলো ভারী অদ্ভুত। কেন অদ্ভুত সেটা মনে হয় পড়লেই বোঝা যাবে।

**শনিবার। সকাল।**

জানি, এগুলো লিখে রাখা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। রীণা যদি একবার দেখতে পায়, তা হলে কী হবে, সেটা সহজেই আইডিয়া করতে পারছি। আমাদের দশ বছরের বিয়েটা উচ্ছের মতো তেতো হয়ে উচ্ছন্নে চলে যাবে।

কিন্তু না লিখেও যে পারছি না! এই লেখা-লেখা অভ্যেসটা যেন একটা ম্যানিয়ার মতো আমার রক্তে মিশে আছে। যতক্ষণ না সাদা-কালো লেখায় মনের কথাটা লিখতে পারছি, ততক্ষণ শান্তি নেই। মন হালকা করতে গেলে এই লেখালেখিটা জরুরি। কিন্তু মনকে জটিল করা যত সহজ, হালকা করা বুঝি ততটাই কঠিন।

সুতরাং এখন ফিরে যেতে হবে মাসকয়েক আগে।

কী করে শুরু হল ব্যাপারটা? অবশ্যই ঝগড়া থেকে। এবং এরকম ঝগড়া এই দশ বছরে অন্তত হাজারবার আমাদের মধ্যে হয়েছে। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, সবসময়েই আমাদের ঝগড়ার বিষয় ছিল একটাই টাকা!

তুমি লিখতে পারো কি না পারো, সেটা আমার জানার দরকার নেই। হতে পারে, তুমি হয়তো ঘ্যাম লেখক! তোমার প্রতিভার দাম অপোগণ্ড প্রকাশকরা দিতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে সংসার খরচের কথা ভুলে বসে থাকলে তো চলবে না। আমার প্রশ্ন হল একটাই : রোজকার খরচের টাকা আসবে কোত্থেকে?

বক্তব্যটা যে রীণার, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবুও মিনমিনে প্রোটেস্ট করেছি আমি : কীসের রোজকার খরচ? বরং বলো অদরকারি খরচ! যেসব জিনিস আমাদের কেনার কোনও দরকার নেই সেসব কিনে ফালতু।

অদরকারি জিনিস? ফালতু খরচ! ব্যস, শুরু হল তৃতীয় মহাযুদ্ধ।

ওঃ, টাকা ছাড়া এ-দুনিয়ায় জীবনের চাকা অচল। টাকাকে হারিয়ে দিতে পারে এমন কিছুই পৃথিবীতে নেই। এখানে টাকাই প্রথম এবং শেষ কথা।

টাকা-টাকা-টাকা...এই অসংখ্য জটিল সমস্যা নিয়ে শান্তিতে দুকলম আমি লিখি কী করে? নতুন ফ্রিজ আর টিভির সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টের টাকা বাকি। তার ওপর রীণা নতুন একটা কয়ারের ম্যাট্রেস সমেত খাট কিনতে চায়–জানি না, এইসব প্রবলেম কী করে সম্ভ হবে...।

কিন্তু এত সমস্যা সত্ত্বেও আমি হদ্দ বোকার মতো সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছি।

সেদিন কি অমনভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না গেলে আমার চলত না? আগে তো কোনওদিন আমি এমন করে রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাইনি!

আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু ঝগড়া তো আমরা আগেও করেছি। জানি, ইগোই এর একমাত্র কারণ। এই লম্বা বারো বছরের হ্যাঁ, একডজন বছর!–লেখক-জীবনে লেখা থেকে আমার আয় মাত্র দু-হাজার সাতশো ষোলো টাকা! এবং সেই কারণেই আমাকে এখনও ওই হতচ্ছাড়া স্টেনো-টাইপিস্টের চাকরিটা করে যেতে হচ্ছে। সুতরাং, আমার লেখার ক্ষমতাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ওর রয়েছে। সেইজন্যেই, সমীর ওর ম্যাগাজিনে যে-চাকরিটা আমাকে দিতে চাইছে, সেটা নেওয়ার জন্যে রীণা রোজই আমাকে তাড়া দিচ্ছে।

সবকিছুই ডিপেন্ড করছে আমার ওপর। স্ট্রেটকাট হার মেনে নিয়ে সমীরের এগিয়ে দেওয়া চাকরিটা নিলেই সব সমস্যা চুকে যায়। অন্তত এখনকার মতো। পার্ট-টাইম কাজও আমাকে আর করতে হয় না। রীণাও শান্তিতে ঘরে বসে আয়েশ-আরাম করতে পারবে।

কিন্তু আমি? আমি করে বসেছি ঠিক উলটো কাজগুলো। মাঝে-মাঝে এইজন্যে নিজেকে ভীষণ গুড ফর নাথিং বলে মনে হয়।

হঠাৎই সুবোধ-সুশীল আমি একদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম কৃতান্তের সঙ্গে। কৃতান্ত আমার কলেজ লাইফের বন্ধু। বরাবর কারণবারির ভক্ত। আমি ওসব খাই-টাই না। তাই ওকে সবসময় বারণ করি। আর রেগুলার বারণ করতে করতে ও-ই শালা কখন যেন আমার জলপথে হাতেখড়ি করিয়ে দিয়েছে।

রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে আমি কৃতান্তকে ফোন করেছিলাম। তারপর ওর সঙ্গে জোট বেঁধেছিলাম। ও তখন একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ফুডের রেস্তোরাঁয় বসে দুটো ইয়াং মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিল। তার মধ্যে একজনকে আবার দারুণ দেখতে! সুন্দর তো বটেই। তার সঙ্গে মেশানো ছিল দুষ্টু দুষ্টু ভাব। আর অন্যজন ছিল ফরসা, রোগাটে।

কৃতান্ত বলেছিল, ওরা দুজন ওর বেশ ইন্টারেস্টিং ফ্রেন্ড। রাসেল স্ট্রিটের একটা লেডিজ হস্টেলে থাকে।

ইন্টারেস্টিং ফ্রেন্ড! কে জানে, কৃতান্তর সব উলটোপালটা পাগলা ব্যাপার!

রেস্তোরাঁয় আড্ডা শেষ হলে আমি আর কৃতান্ত জলপথে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম। তারপর আর কী করেছি মনে নেই। কপাল ভালো যে, রীণা থানায় খবর দেয়নি।

তবে ওই দুষ্টু-দুষ্টু মেয়েটার হাবভাব অনেকটা রীণার মতন লাগছিল–দশ বছর আগে রীণা যেমন ছিল।

না, কাজটা আমি ঠিক করিনি। তাই খুব খারাপ লাগছে। রীণাকে আমি এখনও ভীষণ ভালোবাসি। ভেতরে-ভেতরে সেটা আমি বেশ ভালো করে জানি।

**শুক্রবার। বিকেল।**

যাক বাবা, রীণা আমাকে ক্ষমা করেছে। আশা করি সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পরদিন একটু বেলার দিকে বাড়ি ফিরে চোরের মতো মুখ করে বিছানায় গিয়ে বসতেই রীণার ঘুম ভেঙে গেল। ও প্রথমে তাকাল আমার দিকে, তারপর দেওয়াল-ঘড়ির দিকে। ওর ফোলা-ফোলা চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ।

কোথায় ছিলে কাল সারা রাত? ভয় পাওয়া শিশুর গলায় জানতে চাইল ও।

কৃতান্তর সঙ্গে। আলতো গলায় বললাম, ওর বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটিয়েছি।

একটা ফোন করতেও ইচ্ছে করল না? ধরা গলায় বলল। আমার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আমার হাতটা নিয়ে গালে চেপে ধরল।

আমাকে ক্ষমা করো। প্লিজ। ভেজা চোখে কান্না-ভেজা গলায় বলল।

মুখ লুকোতে ওর শরীরে মুখ ডুবিয়ে দিলাম ও রীণা, রীণা–আমাকে ভুল বুঝো না, প্লিজ।

আমি সারা রাত কোথায় ছিলাম সে কথা নেশার ঘোরে আমিও ভুলে গেছি। তবে এটুকু মনে আছে, কৃতান্ত ওর দুজন গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে একজনকে দেখতে ফ্যান্টা। কী যেন নাম? কী যেন নাম মেয়েটার? নাঃ, মনে পড়ছে না। তবে অন্যজনের নাম ছিল রোজি।

কিন্তু এ কথাটা কিছুতেই রীণাকে বলা যাবে না। ও শুধু-শুধু কষ্ট পাবে। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। রাগের মাথায় মানুষ অনেক উলটোপালটা কাজ করে। আমিও তো তাই-ই করেছি– মাত্র একবারের জন্যে। তাও শুধু গল্পগুজব আর কিছু নয়। এটা ওর ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

তা ছাড়া, রীণা ছাড়া আমার কাছের মানুষ আর কে আছে!

কিন্তু কী যেন নাম ছিল ওই মেয়েটার? কৃতান্তর ওই সুন্দর দেখতে গার্ল ফ্রেন্ডের? নয়না? নয়না বোস? তাই কি?

**শনিবার। রাত।**

আজ সন্ধেবেলা রীণাকে নিয়ে বউবাজারে ফার্নিচারের দোকানে গিয়েছিলাম। নতুন পছন্দসই খাটটা কেনার সময় রীণা আমার কানে কানে বলেছে, একসঙ্গে এতগুলো টাকা খরচ করা কি ঠিক হবে?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিঃ পুরোনো খাটটার অবস্থাটা দেখেছ! আমি চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই একটু আয়েশ করে ঘুমাক।

দোকানদারের চোখ এড়িয়ে আড়ালে ছোট্ট করে ভালোবাসার শব্দ করল রীণা। বিছানায় গদির ওপর বসে বাচ্চা মেয়ের মতো দুলতে চাইল। বলল, দ্যাখো, কী নরম! বলে আমার হাতটা ধরে বুলিয়ে দিল গদির ওপরে।

সবকিছু আবার ঠিকঠাক চলেছে। শুধু আমার ধারের অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছে, আমার নতুন গল্পটা কেউ কিনতে চাইছে না, আর আমার সাধের উপন্যাসটা মাত্র পাঁচ জায়গা থেকে ফেরত এসেছে। তবে এবার প্রকাশক ভবনকে ওটা ছাপতেই হবে। ওরা অনেকদিন ধরে লেখাটা আটকে রেখেছে। ওদের ওপর ভরসা করেই আমি অপেক্ষায় আছি। বুঝতে পারছি, আমার লেখার দিন ফুরিয়ে এসেছে। শুধু লেখার কেন, সবকিছুরই। দিনের পর দিন, ক্রমশ যেন বুঝতে পারছি, আমি একটা হেরো ঘোড়া হয়ে যাচ্ছি।

অবশ্য, রীণা এখন অনেক ভালো আছে। এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

**রবিবার। রাত।**

আবার গণ্ডগোল! আবার ঝগড়া! কী থেকে শুরু হল, কী নিয়ে শুরু হল, বুঝতেই পারলাম না। ও রাগ করে গোমড়া মুখে বসে আছে। আর রাগে আমার সারা শরীর জ্বলছে। এইরকম অবস্থায় লেখা যায়! লেখা আসে না। রীণা সেটা ভালো করেই জানে।

ইচ্ছে হচ্ছে নয়নাকে ফোন করি। ও অন্তত আমাকে লেখায় উৎসাহ দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে নেশায় গা ভাসিয়ে দিই, হাওড়া ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে বসি, কিছু একটা করে বসি।

শিশুরা যে সুখী হবে এতে আর আশ্চর্য কী! ওদের কাছে জীবন অনেক সহজ-সরল। একটু খিদে, একটু ঠান্ডা আরামের পরিবেশ, অন্ধকারকে একটু ভয়

পাওয়া ব্যস। ওরা জানে না, কষ্ট করে বড় হওয়ার অনেক কষ্ট। জীবন অনেক জটিল হয়ে ওঠে।

একটু আগেই রীণা খেতে ডেকে গেছে। খাওয়ার ইচ্ছে আর নেই। এমনকী বাড়িতেও একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। দেখি, নয়নাকে পরে একটা ফোন করব। শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, ও কেমন আছে।

**সোমবার। সকাল।**

এই ছিল এদের মনে!

উপন্যাসটা আট মাস ধরে আটকে রেখেও ওদের শান্তি হয়নি। পাণ্ডুলিপির আগাপাশতলা জুড়ে চা-সিগারেটের দাগ খোদাই করে দিয়েছে। আর পাঠিয়েছে একটা এক লাইনের চিঠি ও দুঃখিত, এটা পাবলিশ করতে পারলাম না।

হাতের কাছে পেলে আমি ওদের হয়তো খুন করে বসতাম! ওরা জানে না, আমার জীবনের ওপরে ওরা একটা প্রকাণ্ড পাথর আজ চাপিয়ে দিয়েছে।

চিঠিটা রীণার চোখ এড়াল না।

এবার কী করবে ঠিক করলে? বিরক্ত গলায় ও বলল।

মানে? উত্তরে জানতে চাইলাম। অতি কষ্টে গলা মোলায়েম রাখলাম।

এখনও তোমার বিশ্বাস তুমি লিখতে জানো?

ফেটে পড়লাম হ্যাঁ, ওদের কথাকেই তো বেদ-বাক্য বলে মেনে নিতে হবে! ওরা যা বলবে তা-ই ঠিক! আমার লেখার কতটুকু বোঝে ওরা বলতে পারো? রাগে আমার গলা কাঁপছে।

বারো বছর ধরে তুমি লিখছ, কিন্তু কোনও লাভ হল না। তাই না?

আমি আরও বারো বছর ধরে লিখব। দরকার হলে একশো, হাজার বছর ধরে লিখে যাব।

সমীরবাবুর কাগজের চাকরিটা তুমি তা হলে নেবে না?

না, নেব না।

তুমি বলেছিলে, এই উপন্যাসটা যদি না ওতরায় তা হলে চাকরিটা নেবে।

চাকরি আমার একটা রয়েছে তার সঙ্গে পার্ট-টাইম কাজ। সুতরাং যেমন চলছিল তেমনই চলবে।

কিন্তু সেভাবে আমি তো চলতে পারছি না! ও মুখিয়ে উঠল।

রীণা কি আমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে? যাক। দেখে-দেখে আমিও টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। টাকা, টাকা। লেখা, লেখা। আর প্রকাশকদের কাছ থেকে ফেরত, ফেরত, আর ফেরত!

শুধু আমার চালাক-চতুর জীবন জটিলতার প্যাঁচ একের পর এক পেঁচিয়ে জটিলতার এক প্রকাণ্ড জিলিপি গড়ে চলেছে।

তুমি! তোমাকে বলছি! যে এই পৃথিবী, গোটা সোলার সিস্টেমটাকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে চলেছে, তাকে বলছি। যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাকে তা হলে মন দিয়ে শোনো। এই পৃথিবীটাকে একটু অন্তত সহজ-সরল করে দাও। কোনও কিছুতে আমার আর বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমার এই ছোট্ট রিকোয়েস্টটা যদি রাখো, তা হলে তুমি যা চাইবে তা-ই দিতে আমি রাজি! শুধু যদি…।

কিন্তু কী লাভ? এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। শালা, যা হওয়ার হোক!

নয়নাকে আজ রাতে ফোন করব।

**সোমবার। সন্ধ্যা।**

একটু আগেই নয়নাকে ফোন করতে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে আছে শনিবার ওর সঙ্গে দেখা করব। কারণ, শনিবার সন্ধেবেলা রীণা ওর বোনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। আমাকে ও যাওয়ার কথা কিছু বলেনি, আর আমিও যেচে সে কথা আর তুলছি না।

কাল রাতেও নয়নাকে ফোন করেছিলাম–ওর বাড়িতে। ওদের বাড়িটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল গোছের। কিন্তু অন্য একটা মেয়ে জানাল, ও বাড়ি নেই।

তাই ঠিক করলাম, আজ ওর অফিসে ফোন করব। সেখানে নিশ্চয়ই ওকে পাওয়া যাবে।

সুতরাং, মোড়ের ইলেকট্রিকের দোকানটায় গিয়ে ফোন গাইডে ওর নাম্বারটা খুঁজতে লাগলাম। হয়তো সেটা আমার মুখস্থ করে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু কী কারণে জানি না, সেটা করা হয়নি। কারণ, হাতের কাছে টেলিফোন ডিরেক্টরি তো সবসময়েই রয়েছে।

ও প্রসাধন না প্রসাধনী নামে একটা ম্যাগাজিনে কাজ করে বলে জানতাম। আশ্চর্য, ম্যাগাজিনের নামটাও আমার ঠিকঠাক মনে নেই। হয়তো তেমনভাবে ব্যাপারটা কখনও ভেবে দেখিনি।

অবশ্য ওর অফিসটা কোথায় সেটা আমার বেশ মনে আছে। মাসকয়েক আগে একদিন অফিস থেকে ওকে আর কৃতান্তকে এমব্যাসিতে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, রীণাকে বলে বেরিয়েছিলাম ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। স্টাডি করতে।

নয়নার অফিসের টেলিফোন নাম্বারটা বহুদিনের অভ্যাস থেকে জানি–ফোন-গাইডের ডানদিকের পাতার ওপরে কোনায় থাকে বারবার সেটাই দেখে এসেছি। বহুবার ওকে ফোন করেছি, কখনও জায়গাটা পালটে যায়নি।

কিন্তু পালটে গেছে আজ।

ফোন-নাম্বারটা সেই চেনা জায়গায় নেই!

প্রসাধন দিয়ে শুরু এমন যে-কটা শব্দ পেলাম সবকটাই বাঁ-পাতার নীচে, বাঁ-দিকে। এতদিন যা দেখে এসেছি, ঠিক তার উলটো।

সেই পাতায় চোখ বুলিয়ে এমন কোনও নাম চোখে পড়ল না যেটা স্মৃতিকে উসকে দেয়। অন্যান্য দিনের মতো, ও, এই তো! মনে-মনে বলে দরকারি ফোন-নাম্বারটা আজ খুঁজে পেলাম না।

খুঁজে চললাম। পাতার পর পাতা উলটে চললাম, কিন্তু প্রসাধনী নামে কোনও পত্রিকার নাম আমার চোখে পড়ল না। অবশেষে মনকে বোঝালাম, ওটা প্রসাধনী

নয়, প্রসাধন হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা খটকা মনের মধ্যে রয়ে গেল। কেউ যেন বলতে লাগল, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে।

যাকগে, পরে অন্য আর-একটা দোকান থেকে ট্রাই করব।

আমি..থাক লেখাটা পরে শেষ করব। রীণা এইমাত্র খেতে যাওয়ার জন্যে ডাক দিয়ে গেল। দেরি হলে হয়তো আবার নতুন কোনও ঝামেলা হবে।

**পরে।**

তৃপ্তি করে খেলাম। সত্যি, রীণা রান্নাটা করতে জানে। ইশ, মাঝে-মাঝে ওই টুকরো অশান্তিগুলো যদি না থাকত! জানি না, নয়না এরকম রান্না করতে পারে কি না।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু হালকা হলাম। বুঝলাম, আমার মন শান্ত করার জন্যে মাঝে এই সময়টুকু দরকার ছিল। কারণ, ওই টেলিফোন নাম্বারের পিকিউলিয়ার ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। বরং আমাকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে।

আজ আমার অফিস ছুটি, কিন্তু নয়নার পত্রিকা-অফিস খোলা। রাস্তায় বেরিয়ে ওকে একবার ফোন করলে হয়!

কিন্তু প্রসাধনী, না কি প্রসাধন?

অবশেষে প্রসাধন-এর নাম্বারটা ফোন গাইড থেকে খুঁজে বের করে ডায়াল করলাম। একজন মহিলা ও-প্রান্তে রিসিভার তুললেন।

প্রসাধন পত্রিকা অফিস। সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল।

আমি মিস বোসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। চেষ্টা করে গলা স্বাভাবিক রাখলাম।

কার সঙ্গে?

মিস নয়না বোসের সঙ্গে।

এক মিনিট। ও-প্রান্ত থেকে তিনি বললেন। এবং সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমি ভুল নাম্বারে ফোন করেছি। অন্যান্যবার ফোন করামাত্রই যে-মেয়েটি ফোন ধরত, সে দিচ্ছি বলে সঙ্গে-সঙ্গে নয়নার টেবিলে লাইন দিয়ে দিত।

নামটা কী যেন বললেন? ও-প্রান্ত থেকে ভদ্রমহিলা আবার একই প্রশ্ন করলেন।

মিস নয়না বোস। দেখুন আপনি যখন ঠিক চিনতে পারছেন না, মনে হয়, আমি হয়তো ভুল নাম্বারে ফোন করেছি।

আপনি মিস্টার ঘোষকে চাইছেন না তো?

না, না। সবসময় ফোন করামাত্রই মিস বোসের লাইন পেয়ে যাই। আমারই হয়তো রং নাম্বার হয়েছে। শুধু-শুধু আপনাকে ট্রাব্ল দিলাম। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

অস্বস্তির পোকাটা লম্বায় বড় হতে লাগল। নয়নার অফিসে আমি এতবার ফোন করেছি যে, আজকের ঘটনাকে মনের ভুল বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না।

সত্যিই ফোন-নাম্বারটা আমার মনে নেই। অথবা, মনে পড়ছে না।

প্রথমটা নিজেকে তেমন আপসেট হতে দিইনি। হতে পারে, এই দোকানের ফোন গাইডটা হয়তো পুরোনো–এখনও পালটানো হয়নি। কে জানে!

সুতরাং, মোড় ছাড়িয়ে বড় ডাক্তারখানাটায় গেলাম, এবং চেক করলাম। না, সেখানেও সেই একই বই।

ঠিক আছে, কাল অফিস থেকে আবার ওকে ফোন করব। কিন্তু এখন ওকে পেলে ভালো হত। বলে দিতাম, শনিবার সন্ধেটা ও যেন শুধু আমার জন্যেই রেখে দেয়। কৃতান্তকে না ডাকে।

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল। একটু আগেই যে-মহিলার গলা ফোনে শুনলাম, তার গলাটা আমার খুব চেনা। কারণ প্রসাধনীর অফিসে ফোন করে বরাবর এর গলাই আমি শুনে এসেছি।

কিন্তু…নাঃ, সবকিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

**মঙ্গলবার। দুপুর।**

প্রথম সুযোগেই রীণার আড়ালে বাড়ি থেকে নয়নাকে ফোন করেছি। ওর হস্টেলে।

ও-প্রান্ত থেকে চেনা গলায় উত্তর এসেছে।

আশ্বস্ত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। গত কয়েকমাসে বহুবার বলা কথাগুলোই আবার বললাম, আমি মিস নয়না বোসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। নয়না ম্যাডাম।

ধরুন। এক মিনিট।

ওপাশে অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। আমার ধৈর্যে টান পড়তে লাগল।

তারপর আবার রিসিভার নড়াচড়ার শব্দ পেলাম। উত্তরও পেলাম।

নামটা কী যেন বললেন? মেয়েটি প্রশ্ন করল।

মিস নয়না বোস, মিস নয়-না বোস, জোরের সঙ্গে বললাম, আগেও আমি ওঁকে বহুবার ফোন করেছি…।

দাঁড়ান, আর-একবার দেখছি।

সুতরাং আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা।

তারপর আবার মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম।

সরি, স্যার। এ-নামে এখানে কেউ থাকে না।

কিন্তু বললাম যে, আমি আগেও অনেকবার এখানে ফোন করেছি।

আপনার রং নাম্বার হয়নি তো?

না, না। নাম্বার ঠিকই আছে। এটা সতেরো নম্বর রাসেল স্ট্রিট তো?

হ্যাঁ–।

তা হলে তো ফোন-নাম্বারও ঠিক আছে।

কী জানি মেয়েটির স্বর অপ্রস্তুত, বাট, স্যার, এটা আপনাকে কনফার্ম করে বলতে পারি, ওনামে এখানে কোনও বোর্ডার নেই।

কিন্তু কাল রাতেও তো আমি ফোন করেছিলাম। আপনি বললেন মিস বোস এখন নেই–কোথায় বেরিয়েছেন।

সরি, স্যার, ঠিক মনে করতে পারছি না।

কী বলছেন! আপনার কোথাও একটা মেজর মিসটেক হচ্ছে।

দেখুন, আপনি যদি চান তা হলে আমি আরও একবার খোঁজ করতে পারি। বাট ইউ নো, কোনও লাভ হবে না। কারণ, ও-নামে এখানে কেউ থাকে না, বিশ্বাস করুন।

গত কয়েকদিনের মধ্যে কেউ এ-হস্টেল ছেড়ে চলে যায়নি তো?

গত এক বছরে আমাদের এখানে কোনও রুম খালি হয়নি। জানেন তো, কলকাতায় ঘর পাওয়া কী ঝামেলার।

জানি। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

ক্লান্ত পা ফেলে ফিরে এসে বসলাম। দেখি রীণা কতকগুলো কাগজপত্র হাতে নিয়ে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। বোধহয় ওর হাবিজাবি কিছু টাইপ করাতে। কাগজগুলো আমার টেবিলে নামিয়ে রেখে ও জানতে চাইল আমি একটু আগে কাকে ফোন করছিলাম।

বুঝলাম, আমার ফোন করার ব্যাপারটা ও কোনওভাবে লক্ষ করেছে।

বললাম, ওই চাকরিটার ব্যাপারে সমীরকে ফোন করেছি।

জানি, এবার রীণার তাগাদায় আমাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ হতে হবে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে এর চেয়ে ভালো মিথ্যে মাথায় এল না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ টাইপ করলাম। মন এলোমেলো থাকায় আচ্ছন্নের মতো কাজ করে চললাম।

নয়না বোস নেহাত উবে যেতে পারে না, মনে-মনে ভাবলাম। কোথাও না কোথাও ও আছেই। কারণ, গত কয়েকমাসের ঘটনা তো আর কল্পনা নয়, বাস্তব সত্যি! রীণার কাছে কৃতান্ত আর নয়নার সঙ্গে রেগুলার মিট করার ব্যাপারগুলো গোপন রাখার জন্যে কত মিথ্যেই বলেছি!

হঠাৎই মনে পড়ল, একদিন নয়নার সঙ্গে তো ওর এক বন্ধু এসেছিল–ওর সঙ্গে একই হস্টেলে থাকে! কী যেন নাম মেয়েটির? কী যেন…?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রোজি…রোজি আচারিয়া।

সুতরাং রীণাকে এড়াতে সিগারেট কিনতে যাওয়ার ছলে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এলাম। বেরিয়ে এসেই মনে পড়ল, মাস ছয়েক হল সিগারেট খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি–ডাক্তারের বারণ। রীণাও সেটা জানে। নাঃ, ক্রমশ একরাশ কমজোরি মিথ্যের জালে আমি জড়িয়ে পড়ছি।

সুবিধে মতো জায়গা বেছে নিয়ে ফোন করতে দেরি হল না।

উত্তর দিল সেই একই মেয়ে।

একটু উদ্ধতভাবেই প্রশ্ন করলাম, রোজি আচারিয়া আছেন?

একমিনিট…ধরুন।

বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা ঠেকল। আগে কখনও ফোন করার পর একমিনিট ধরতে হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গেই যাকে চাই তাকে পেয়ে গেছি। তা ছাড়া কৃতান্তর কাছেই শুনেছি, নয়না আর রোজি কম করে দু-বছর ধরে ও-বাড়িতে আছে।

সরি, একটু পরেই মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম, ও-নামে এখানে কেউ থাকে না।

ওঃ গড!

কী হল? কিছু বলছেন?

নয়না বোস, রোজি আচারিয়া, কেউই এখানে থাকে না?

আপনিই কি একটু আগে ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ।

দেখুন, এরকম বাজে ইয়ার্কি করে…।

ইয়ার্কি! কাল রাতেই আপনি আমাকে বলেছেন, মিস বোস এখন বাড়িতে নেই, কোনও খবর দেওয়ার থাকলে আমি আপনাকে দিতে পারি। আমি পরে ফোন করব বলে ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন আপনি বলছেন, ও নামে এখানে কেউ থাকে না!

দেখুন, জানি না কীভাবে আপনাকে বোঝাব। কাল রাতের সব ফোন আমিই ধরেছিলাম, কিন্তু আপনার ফোনটার কথা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। যদি বলেন, তা হলে আর-একবার খোঁজ করতে পারি!

না, থাক দরকার নেই। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

তারপর ফোন করলাম কৃতান্তকে। ওকে বাড়িতে পেলাম না। ওর স্ত্রী, কামিনী, বলল, কোথায় যেন বেরিয়েছে। কোথায় গেছে জিগ্যেস করতে জবাব পেলাম, বোধহয় ছাইপাঁশ গিলতে।

ফোন নামিয়ে রেখে বুঝলাম, আমি ভয় পেয়েছি।

**মঙ্গলবার। রাত।**

আজ রাতে রীণা পাশের ফ্ল্যাটে গল্পগুজব করতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ঘর থেকেই ফোন করলাম কৃতান্তকে। জিগ্যেস করলাম রোজির কথা।

কে?

রোজি, রোজি।

কে রোজি? ও জানতে চাইল।

শালা, তুই ভালোভাবেই জানিস কোন রোজি! ন্যাকামো হচ্ছে।

কী ব্যাপার? তুই কি ঠাট্টা করছিস নাকি? কৃতান্ত রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল।

নকশা ছেড়ে পথে আয়। কী ইয়ার্কি করছিস!

একটা প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দে দেখি! বলল কৃতান্ত, এই রোজি-টা কে?

রোজি আচারিয়াকে তুই চিনিস নানয়নার ক্লোজ ফ্রেন্ড?

না। কে সে?

তুই কোনওদিন রোজি, নয়না বোস আর আমার সঙ্গে কোথাও যাসনি?

নয়না বোস! কী উলটোপালটা বকছিস!

নয়না বোসকেও তুই চিনিস না?

না। চিনি না। আর তোর এই বেয়াড়া জোক কিন্তু এবার তেতো হয়ে উঠছে। জানি না তোর মতলব কী, কিন্তু এবার দয়া করে ক্ষান্ত দে। তুই ভালোভাবেই জানিস, আমরা দুজনেই...।

শোন! রিসিভারে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে উঠলাম তিন সপ্তাহ আগে শনিবার রাতে তুই কোথায় ছিলি?

এক মুহূর্ত ও চুপচাপ রইল। তারপর বলল, কেন, সে-রাতে আমি আর তুই সাকিতে একটু ইয়ে খেতে গিয়েছিলাম। মনে নেই?

হ্যাঁ, মনে আছে। তবে তার আগে নয়না আর রোজির সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ ম্যাড্রাস টিফিন-এ বসে আড্ডা দিয়েছিলাম, তোর মনে নেই?

না তো! আমাদের সঙ্গে তো আর কেউ ছিল না।

কোনও মেয়ে ছিল না? নয়না? রোজি?

ওহহো, আবার সেই এক কথা। হয়রান সুরে বলল কৃতান্ত, আচ্ছা, কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছে তোর?

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। পাশের দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলে নিলাম।

উঁহু কিছু হয়নি– নীচু গলায় জবাব দিলাম।

তোর শরীর ঠিক আছে তো? কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছিস!

ফোন নামিয়ে রাখলাম। সত্যিই আমি আপসেট হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে যেন সাতদিন ধরে উপোস করছি, অথচ সারা পৃথিবীতে মুখে দেওয়ার মতো কোনও খাবার নেই। কেউ যেন একরাশ হাওয়া আমার শরীরে, মাথায়, জোর করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে–দিয়ে চলেছে।

আমার হলটা কী?

**বুধবার। বিকেল।**

রোজি আর নয়না সত্যি-সত্যিই উধাও হয়ে গেছে কি না, সেটা যাচাই করে দেখার একটাই মাত্র পথ রয়েছে।

নয়নার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল কলেজের এক বন্ধুর মারফত সুধাকর…সুধাকর নন্দী। সুধাকরের বাড়ি ছিল ওদেরই পাড়ায় হিন্দুস্থান পার্কে। নয়না যে পরে আস্তানা বদল করে রাসেল স্ট্রিটে এসেছে তা জানতাম না। জেনেছি কৃতান্তকে সঙ্গে নিয়ে সেই সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে সেকেন্ড টাইম দেখা হওয়ার পর। সুধাকর প্রথম আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিল, নয়না কিন্তু খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর জেদি। তার ওপর একটু খামখেয়ালি টাইপ…।

সেইজন্যেই হয়তো এতদিন পরেও ওর নাম আর মুখ আমি ভুলিনি। কে জানে, হয়তো পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া-টগরা করে হস্টেলে গিয়ে উঠেছে।

সুধাকরের সঙ্গে কলেজের পর যোগাযোগ নেই আজ বহুবছর। তার মেইন কারণ, পড়াশোনা শেষ করে ও চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল। আর যাওয়ার

আগে দিল্লির ঠিকানা ও আমাকে দিয়ে যেতে ভোলেনি।

এত সব ভাবনাচিন্তার পর এই কথাটাই মনে আসে ও নয়না আর রোজির ব্যাপারটা মোটেও আমার কল্পনা নয়। আমি জানি ওরা রিয়েল–অন্তত একদিন ছিল।

সুতরাং ঠিক করলাম, আজ সুধাকরকে একটা ফোন করব। বলব, কী হয়েছে। ওকে রিকোয়েস্ট করব, নয়না সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাতে, যাতে আমি এই মিস্ট্রিটাকে হালকা রসিকতা অথবা কাকতালীয় বলে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তাই সুধাকরের ঠিকানা আর ফোন-নাম্বার লেখা ডায়েরির পাতাটা খুললাম।

ফোন-নাম্বার তো দূরের কথা, সুধাকরের নাম-ঠিকানাও ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে উধাও হয়ে গেছে।

আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? আমি শিয়ের যে, নাম-ঠিকানাটা এখানেই লেখা ছিল। একটা রেস্তোরাঁয় বসে যেদিন ওর ঠিকানা আর ফোন-নাম্বার ডায়েরিতে টুকেছি সেদিনটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। পেনের মুখটা ফাটা ছিল বলে কয়েক ফোঁটা কালিও পাতাটায় পড়ে গিয়েছিল– আমার ভালো করে মনে আছে।

আর এখন? পাতাটা নিষ্কলঙ্ক, সাদা!

ওর নাম আমার মনে আছে, মনে আছে ওর চেহারা, ওর কথা বলার ভঙ্গি, আমাদের কলেজ-জীবনের কীর্তিকলাপ, অফ পিরিয়ডে আমাদের আড্ডার রমেটিরিয়াল–সব মনে আছে।

একবার গরমের ছুটিতে একটা চিঠিও সুধাকর আমাকে দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে কৃতান্ত তখন ছিল আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে গল্প করছিল। চিঠিটা রসিকতা করে গালা দিয়ে সিলমোহর করে দিয়েছিল সুধাকর। সিলমোহরে ছিল ওর নাম-লেখা আংটির উলটো ছাপ। আর চিঠির ওপরে লালকালি দিয়ে লেখা ছিল একান্ত গোপনীয়। ফচকেপনার একেবারে চূড়ান্ত।

সেই চিঠিটা খুলে দেখি তো!

আশ্চর্য! যে-ড্রয়ারে চিঠিটা বরাবর থাকত সেখান থেকে হঠাৎই যেন উধাও হয়ে গেছে।

এ ছাড়া কলেজ ক্যাম্পাসে ফ্রেশার্স ওয়েলকাম-এ তোলা আমাদের দুজনের ফটোও আমার কাছে ছিল। ছবিটা আমার অ্যালবামে সযত্নে সাঁটা ছিল–এখনও আছে। তাই ঝটপট আলমারি খুলে অ্যালবামটা বের করলাম। পাতা উলটেপালটে সেই ফটোটার পাতায় পৌঁছে গেলাম।

কিন্তু…হে ভগবান! সে-ছবিতে সুধাকরের চিহ্নমাত্র নেই। আমার ডানহাত, যেটা ওর কাঁধে রাখা ছিল, সেটা এখন শূন্যে ঝুলছে। সুধাকর যেখানে ছিল, সেখানে এখন দেখা যাচ্ছে পেছনের কলেজ-বাড়ির পোরশান।

আরও খোঁজখবর করতে আমার ভয় করছে। আমি কলেজে চিঠি লিখে অথবা দেখা করে সুধাকরের কথা জিগ্যেস করতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি সুধাকর নন্দী নামে কেউ ওই কলেজে কখনও পড়েছে কি না।

কিন্তু সেটুকু করতেও আমি কেন জানি না ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

**বৃহস্পতিবার। বিকেল।**

আজ মিশন রো-তে সমীরের পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে দেখা করেছি। আমাকে দেখে ও ভীষণ অবাক হল। জানতে চাইল, ওর পত্রিকা অফিসে আমার পদধুলি পড়ার কারণ।

তুই আমার অফার করা চাকরিটা নিতে এসেছিস, এ-কথা বলিস না–বিশ্বাস করব না। ও ঠাট্টা করে বলল।

আমি জিগ্যেস করলাম, সমীর, কখনও নয়না নামে কোনও মেয়ের কথা আমার মুখে শুনেছিস?

নয়না? উঁহু, মনে তো পড়ছে না।

প্লিজ, সমীর একটু মনে করে দেখ! আমি ওর নামটা অন্তত একবার হলেও তোকে বলেছি। মনে আছে, যেদিন আমি, তুই, আর কৃতান্ত অলিম্পিয়া-তে গিয়েছিলাম? সেইদিনই বোধহয় ওর কথা তোকে বলেছি।

বলেছিস? আমার কিন্তু একদম মনে পড়ছে না বিশ্বাস কর। ও বলল, কেন, কী হয়েছে মেয়েটার?

ওকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আর কৃতান্ত হারামজাদা সরাসরি মেয়েটার কথা ডিনাই করে বলছে, সাতজন্মে ও নাকি ওর নাম শোনেনি।

সমীর হতভম্ভ হয়ে পড়ায় কথাগুলো স্পষ্ট করে আবার রিপিট করলাম।

তখন ও বলল, কী ব্যাপার রে? তুই বিয়ে করা মরদ অন্য মেয়ের এত খোঁজ নিচ্ছিস।

না রে, অন্য কিছু নয়, স্রেফ বন্ধু। ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আমার কলেজের এক বন্ধুর সোর্সে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। উলটোপালটা কিছু ভাবিস না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওসব বাদ দে। এখন বল, আমাকে কী করতে হবে।

আমি ওদের খুঁজে পাচ্ছি না–মানে, নয়নার সঙ্গে ওর এক বন্ধুও ছিল। ওরা একেবারে উধাও হয়ে গেছে। এমনকী ওরা যে-কোনওদিন এই পৃথিবীতে ছিল, তাও আমি এস্টাবলিশ করতে পারছি না।

সমীর কাধ ঝাঁকালঃ হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? তারপর জানতে চাইল ব্যাপারটা রীণা জানে কি না।

আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম।

কাগজে খোঁজ চেয়ে অ্যাড দিবি নাকি? সমীর আবার খোঁচাল আমাকে? নাকি পুলিশে যাবি?

এরপর আর কিছু বলার নেই।

একটু পরে ওর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ও বড় বেশি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিল। এর ফলে কী হবে বেশ বুঝতে পারছি। সমীর ওর বউকে বলবে। ওর বউ বলবে রীণাকে–এবং অ্যাটম বোম।

বাড়ি ফেরার পথে একটু অদ্ভুতভাবেই মনে হল, আমি নিজেও একটা অস্থায়ী জিনিস।

বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে সেই অদ্ভুত চিন্তার ভয়ংকর অর্থটা আমাকে গ্রাস করল। আর সেইসঙ্গে মনে হল, আমি যেন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছি।

ইলেকট্রিক শক খেয়ে উঠে বসলাম। আমি কি পাগল হতে চলেছি? নইলে সঙ্গে-সঙ্গেই বা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব কেন? রাস্তায় চলা এক প্রৌঢ়কে ইচ্ছে করে শুধু-শুধুই বা ধাক্কা মারব কেন? আমি বোধহয় জানতে চাইছিলাম, লোকটা আমাকে দেখতে পাচ্ছে কি না, আমার অস্তিত্বকে টের পাচ্ছে কি না। লোকটার দাঁতখিচুনি এবং গালাগালিতে আশ্বস্ত হলাম। ইচ্ছে হল, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই।

সত্যি লোকটার ব্যবহারে আমি কৃতজ্ঞ।

**বৃহস্পতিবার। রাত।**

সুধাকর নন্দীর কথা ওর মনে আছে কি না সে কথা জানতে কৃতান্তকে আবার ফোন করলাম। বাড়ি থেকেই। উত্তরে ফোন এনগেজড পেলাম। বারবার রিং করে ওই একই পি-পিঁ শব্দ! অগত্যা টেলিফোন কোম্পানির ১৯৯ ডায়াল করলাম। অপারেটার ফোন ধরতেই কৃতান্তর ফোন নাম্বারটা বললাম। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

একটা ঠান্ডা স্রোত আমার পাকস্থলী থেকে উঠে এল গলা পর্যন্ত। আমি জানি, কী হবে অপারেটারের উত্তর। এবং তাই হল।

মেয়েটা নরম গলায় জানাল, ওরকম কোনও ফোন নাম্বার নেই।

রিসিভারটা আমার হাত থেকে খসে পড়ল মেঝেতে।

শব্দ পেয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল রীণা। অপারেটর তখনও হ্যালো, হ্যালো বলছে।

তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে জায়গামতো রাখলাম।

কী হয়েছে? রীণা জানতে চাইল।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জবাব দিলাম, কিছু না, রিসিভারটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।

রীণা কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রান্নাঘরে ফিরে গেল।

বিছানায় বসতেই বুঝলাম, আমার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে।

কৃতান্ত আর সুধাকরের কথা রীণাকে বলতে আমার ভয় করছে।

ভয় করছে, কারণ যদি ও হঠাৎ বলে বসে, সাতজন্মে ওদের নাম ও কখনও শোনেনি!

**শুক্রবার।**

প্রসাধনী পত্রিকা সম্পর্কে আজ একটু খোঁজখবর করলাম। জানলাম, ওনামে কোনও পত্রিকা নেই– কোনওদিন ছিল না। তা সত্ত্বেও একরোখা মন নিয়ে নয়নার অফিসে গেলাম। বেরোনোর সময় রীণা বারবারই জিগ্যেস করছিল কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু আমি কোনও জবাব না দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আজ এ-রহস্যের সরাসরি হেস্তনেস্ত আমাকে করতেই হবে।

অফিসবাড়িটার একতলায় একরাশ কাঠের নেমপ্লেট লাগানো আগের দিনও প্রসাধনী নামটা সেখানে ছিল কিন্তু আজ আর দেখতে পেলাম না। নেমপ্লেটের জায়গাটা ফাঁকা।

ব্যাপারটা একেবারে আনএক্সপেক্টেড।

বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকল, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল।

ওই অবস্থাতেই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলাম। মনে হল যেন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছি।

চারতলায় এসে দাঁড়ালাম। চারপাশের ঘর-দরজা সবই আমার চেনা। এখনও স্রেফ চোখ বুজে আমি বলতে পারি নয়নার অফিস কোন ঘরটায়, কোন ঘরে ও বসে বসত।

কিন্তু দেখলাম, সেখানে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি রয়েছে।

এখানে একটা ম্যাগাজিনের অফিস ছিল না? রিসেপশনিস্টের কাছে প্রশ্ন রাখলাম।

ঠিক বলতে পারছি না–অন্তত আমার তো মনে পড়ছে না। ইতস্তত করে মেয়েটি বলল। তারপর নিষ্ঠুরভাবে যোগ করল, অবশ্য আমি মাত্র বছর তিনেক এখানে জয়েন করেছি।

বাড়ি ফিরে এলাম। রীণাকে বললাম, শরীর ভালো নেই, আজ আর কোথাও বেরোব না। ও বলল, ভালোই হবে। দুজনে মিলে দিনটা বাড়িতেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। একটু একা থাকার ইচ্ছেয় শোওয়ার ঘরে চলে গেলাম। নতুন চোখে তাকিয়ে রইলাম নতুন কেনা কয়ারের গদিওয়ালা খাটের দিকে।

রীণা ঘরে এসে ঢুকল। যুদ্ধং দেহি দৃষ্টি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? ও জিগ্যেস করল, আমার কি একটুও জানার রাইট নেই?

কিছু হলে তো জানবে! ছোট্ট জবাব দিলাম।

আর মিথ্যে কথা নাই-বা বললে, ও বলল, আমি জানি, কিছু একটা হয়েছে।

ভাবলাম, ওকে সব খুলে বলি। কিন্তু এগোতে গিয়েও কী এক অজানা কারণে থেমে গেলাম। বললাম, আমাকে…আমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

কাকে?

ভেতরে-ভেতরে বিরক্ত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললাম, সমীরকে লিখব।

তা হলে তোমার সমীর-কে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। আর চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে পারলে পজিটিভ কিছু বোলো– ওর গলা ঠান্ডা। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

উত্তরে কিছু একটা হয়তো বলতাম, কিন্তু তার আগেই ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জেদ নিয়ে বসলাম। কাঁপা হাতে চিঠিটা লিখতে শুরু করলাম। মনে হল, সমীরকে সবকিছু খুলে বলা দরকার। কারণ, পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো গোপন করার চরম সীমা ছাড়িয়ে ক্রমশ বিপজ্জনক এলাকায় চলে যাচ্ছে। ফোনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়। সামনাসামনি বলতে আরও লজ্জা। তাই চিঠিই একমাত্র পথ।

লিখলাম, কৃতান্ত সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। জানতে চাইলাম কৃতান্তকে ওর মনে আছে কি না।

ক্রমশ আমার কাঁপা হাত স্থির হয়ে এল। সারা শরীরে এতটুকু কাঁপুনি নেই, নেই একবিন্দু ভয়–কিংবা উত্তেজনা। আমি যেন একটা রোবট।

মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে তখন বোধহয় এরকমটাই হয়।

**শনিবার।**

আমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছি।

এই অদ্ভুত সিচুয়েশানের জ্বলন্ত প্রমাণ দাখিল করতে কী করা যায় সেটাই মনে-মনে ভাবছিলাম। হঠাৎই মনে হল, ক্যামেরার হেল্প নিলে কেমন হয়? রীণা তো এখনও আছে আমার কাছেই আছে। রয়েছে আমার বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। যদি আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের ফটো তুলি এবং সবাইকে এক কপি করে দিয়ে দিই তা হলে সেই হারিয়ে যাওয়া র ঘটনা ঘটার পর তারা আমার কথার সলিড প্রুফ পাবে। বুঝতে পারবে, আমি মিথ্যে বলছি না।

সুধাকর অদৃশ্য হয়েছে, হয়েছে কৃতান্ত। রোজি আর নয়নার খবর তো এখন একশো বছরের পুরোনো। এখনও যদি আমি কাউকে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা জানাতে না পারি তা হলে এই পৃথিবী আমাকে ক্ষমা করবে না।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাড়িতে ক্যামেরা নেই। একটা ছিল, সেটা ছোটভাই সাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে যাওয়ার সময় নিয়ে গেছে–এখনও ফেরেনি।

ফিরবে কি না জানি না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ক্যামেরা আর এক রোল ফিল্ম আমার চাই।

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শোওয়ার ঘরে গেলাম। তোশকের নীচ থেকে বের করে নিলাম ব্যাংকের চেকবই আর পাশবইটা। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। এবার সোজা ব্যাঙ্ক। টাকা তুলতে হবে।

ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা চেক লিখলাম। একটা ভালো ক্যামেরার কথা মনে রেখে টাকার অঙ্কের জায়গায় লিখলাম বারোশো টাকা। তারপর চেক আর পাশবই জমা দিয়ে টোকেন নিলাম। গিয়ে দাঁড়ালাম ক্যাশ কাউন্টারের সামনে। পরপর টোকেনের ডাক আসতে লাগল–আমারটা ছাড়া।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর রীতিমতো অধৈর্য হয়ে ক্যাশে বসে থাকা কর্মচারীটিকে প্রশ্ন করলাম, আমার টোকেনটা এসেছে কি না। উত্তরে যথারীতি নেগেটিভ জবাব পেলাম। সেইসঙ্গে সে কাউন্টারের মুখটা ছেড়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করল।

অপমানটা হজম করে প্রথম কেরানিটির কাছে গেলাম, যে আমার পাশবই আর চেক নিয়ে টোকেন দিয়েছিল।

তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা চাপা গালাগালের শেষ টুকরো আমার কানে এল। লোকটা সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর তাকাল আমার পাশবইটার দিকে। দু চার পাতা উলটে তারপর বলল, মশায় কি ইয়ার্কি-প্রিয়?

তার মানে? আমার স্বর উঁচু পরদায় উঠল।

সে পাশবইটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল, চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

সরে দাঁড়ান, পেছনে আরও লোক রয়েছে। লোকটার নুন মাখানো গলা আমার শরীরে কেটে বসল।

মনে হয় আমি চেঁচিয়েই উঠেছিলাম। নইলে সব লোক ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাবে কেন?

কী হয়েছে বলবেন তো!

দেখলাম, সামনের টেবিল ছেড়ে আর-একজন কর্মচারী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। চারপাশে ভিড় জমছে।

দ্বিতীয় কর্মচারীটি প্রথমজনের চেয়ে বয়স্ক। সেই কারণেই হয়তো তার গলাও একটু নরম, সহানুভূতি মাখানো।

কী হয়েছে, ভাই, গোলমাল কীসের?

এই ভদ্রলোকটিকে একটু ভদ্রতা শিখতে বলবেন? আমার অপমানিত শরীর কাঁপছে। স্বর কাঁপছে : ইনি আমার চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, পাশবই ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন–এসবের মানে কী?

কই, দেখি আপনার পাশবইটা। বলে হাত বাড়িয়ে পাশবইটা সে নিল। তারপরই অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল। একটু হেসে স্পষ্ট গলায় বলল, আপনার পাশবইয়ে একটা কালির দাগ পর্যন্ত নেই ধবধবে সাদা।

ছিনিয়ে নিলাম পাশবইটা। পাগলের মতো পাতা হাতড়ে গেলাম। বুকের ভেতর বুলডোজার চলছে।

পাশবইটাতে ব্যবহারের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু…

কিন্তু কী করে এমন হল– আমি প্রায় ডুকরে উঠলাম।

যদি বলেন তা হলে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমরা চেক করে দেখতে পারি। সে বলল, আপনি বরং ভেতরে আসুন।

কিন্তু পাশবইয়ে কোনও নম্বরই নেই। সেটা দেখতে আমার ভুল হয়নি। আমার দু-চোখ। ফেটে জল বেরিয়ে এল।

না…তার আর দরকার নেই– আচ্ছন্ন পায়ে ব্যাঙ্কের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এই যে ভাই, একমিনিট–শুনুন। লোকটির গলা পেছন থেকে ভেসে এল।

আমি ছুটতে শুরু করলাম।

দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম রাস্তায়।

ঘরে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলাম। দেখলাম, রীণা নেই। হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গেছে। রীণার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এখনও আমি অপেক্ষা করছি, আর দেখছি পাশবইটা। দেখছি লাইন টানা খালি জায়গাটা, যেখানে আমি নিজের নাম সই করেছিলাম। ছক কাটা শূন্য ঘরগুলো–যেখানে জমা দেওয়া টাকার অঙ্ক স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল। আমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রীণার বাবা-মা রীণাকে ঘড়ি কেনার জন্যে চারশো টাকা উপহার দিয়েছিলেন। অফিসের মাইনে থেকে বাঁচিয়ে জমানো দেড়হাজার টাকা। পাঁচশো টাকা। সাতশো টাকা।

সব খালি।

সবকিছুই ক্রমশ খালি হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে নাম, তারপর…।

ভাবছি, এখন পর্যন্ত এই–এর পর কী হবে?

**পরে।**

এখন বুঝতে পারছি।

রীণা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

প্রতিবেশীদের কয়েকজনের ফোন-নাম্বার লেখা ছিল। সেখানে ফোন করে জানলাম, রীণা সেখানে নেই।

তখন ওর দু-একজন বন্ধুর বাড়িতে ফোন করলাম। ওদের জিগ্যেস করলাম রীণা ওখানে গেছে কি না। ওরা বলল, আমি হয়তো ভুল নাম্বারে ফোন করেছি, কারণ, রীণা নামে কাউকে ওরা চেনে না। অথচ আমার নাম বলতেই ওরা চিনতে পারল!

হতবাক হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

তারপর একের-পর-এক ফোন করে চললাম। আমার মাসতুতো ভাইকে, দিদিকে, রীণার মা-কে, দাদাকে–কোনও উত্তর নেই। শুধু এনগেজড টোন। আমি জানি ১৯৯ নম্বরে ফোন করলে কী জবাব পাব–আগেও পেয়েছি। ওরাও তা হলে কৃতান্ত, নয়না, সুধাকর, রোজিকে অনুসরণ করেছে?

**রবিবার।**

জানি না এখন কী করব। সারাদিন জানলার ধারে বসে রাস্তার লোক চলাচল দেখেছি। দেখেছি এই আশায়, যদি চেনা কেউ আমার চোখে পড়ে। পড়েনি। প্রতিটি পথচারীই আমার অচেনা– যেমন ছিল গত রাতে টিভির পরদায় দেখা প্রতিটি শিল্পী, অভিনেতা। এমনটা আগে কখনও হয়নি।

এখন বাড়ি ছেড়ে বেরোতে আমার ভয় করছে। থাকার মধ্যে শুধু এটাই আছে। আর আছে আমাদের ফার্নিচার, জামাকাপড়।

শুধু আমার জামাকাপড়। রীণার পোশাকের আলমারি একেবারে কঁকা। আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই আলমারিটা খুলে দেখেছি। আমার ভয়টাই সত্যি হয়েছে।

সত্যি, পুরো ব্যাপারটা যেন ম্যাজিক। প্রত্যেকটা জিনিস কোনওরকম জানান না দিয়েই উধাও হয়ে যাচ্ছে। যেন…।

হাসি পেল। আমার নিশ্চয়ই মাথা…।

ফার্নিচারের দোকানে একবার ফোন করলাম। রোববার বিকেলে ওদের খোলা থাকে। আমার আর রীণার নাম বললাম। বললাম, দিনকয়েক আগে আমরা একটা কয়ারের গদি-ওয়ালা খাট কিনেছি।

ওরা একটু পরেই জানাল, না, ওই নামে কাউকে ওরা কোনও খাট-টাট বিক্রি করেনি।

ফোন করলাম টিভির দোকানে।

না, ও-নামে ওদের কাছ থেকে কেউ ইনস্টলমেন্টে টিভি কেনেনি।

রেফ্রিজারেটারের দোকানেরও সেই এক কথা। বলল, ইচ্ছে হলে আপনি নিজে এসে বিল বই দেখে যেতে পারেন।

ফোন নামিয়ে রেখে আবার জানলার কাছে এসে বসলাম।

ভাবলাম, খড়গপুরে আমার পিসি থাকে, তাকে একটা ফোন করি। কিন্তু ফোন নাম্বারটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আমার নাম-ঠিকানা ফোন নাম্বার লেখা ডায়েরির সব পাতাই সাদা। শুধু মলাটে আমার নামটা বড়-বড় হরফে জ্বলজ্বল করছে–অন্তত এখনও।

নাম। শুধু নামটাই এখন আমার শেষ সম্বল। এখন আমি কী করি?

সবকিছুই এত সহজ-সরল যে, আমার করার কিছু নেই। শুধু চুপচাপ বসে আমাকে এর শেষ দেখে যেতে হবে।

আজ আবার অ্যালবামটা নিয়ে বসেছি। দেখেছি সব ছবিই কেমন অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। কোনও ছবিতেই কোনও লোক নেই–শুধু আমি ছাড়া।

রীণার ছবি নেই, আত্মীয়স্বজন কারও ছবি নেই। যাঃ শালা!

আমার বিয়ের ছবিতে গলায় মালা, মাথায় টোপর পরে আমি একাই। একটা রজনীগন্ধার মালা আমার পাশে শূন্যে ঝুলছে।

বিয়ের সময় কৃতান্ত রীণাকে একটা সুন্দর টেবিল-ঘড়ি প্রেজেন্ট করেছিল। তখন সমীর ফটো তুলেছিল। এখন সেই ছবিতে কেউ নেই–শুধু শূন্যে ভেসে থাকা টেবিল-ঘড়িটা ছাড়া।

বুঝলাম, আমার ক্যামেরা কেনার আর কোনও দরকার নেই।

**সোমবার। সকাল।**

সমীরকে পাঠানো চিঠিটা Not Found ছাপ মারা।

পিওনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। আমি নেমে আসার আগেই নীচতলার ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে সে চলে গেছে। জানলা থেকে তাকে

দেখেই বুঝেছি, সে আমার সম্পূর্ণ অচেনা। আগে কোনওদিন লোকটাকে আমি দেখিনি।

বাড়ির কাছাকাছি স্টেশনারি দোকানটায় গিয়েছিলাম। দোকানদার আমাকে চিনতে পারল। কিন্তু তাকে রীণার কথা জিগ্যেস করতেই বলল, আর ঠাট্টা করবেন না। আপনি নিজেই কতদিন আমাকে বলেছেন, বিয়ে-ফিয়ে লেখকদের জন্যে নয়। ওই একটি ভুল জীবনে করছি না।

আর একটা মাত্র উপায় আমার হাতে রয়েছে। প্রচণ্ড ঝুঁকি থাকলেও কাজটা আমাকে করতেই হবে। বাড়ি ছেড়ে আমাকে একবার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যেতে হবে। সেখানে আমার, রীণার, দুজনেরই কার্ড করা ছিল। অনেকবার রিনিউ-ও করেছি। ওদের কাছে নিশ্চয়ই খাতাপত্র থাকবে, তাতে নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশান লেখা থাকবে। এই বিপন্ন মুহূর্তে ওরাই আমার একমাত্র ভরসা।

রোজনামচা লেখা এই ডায়েরিটাও সঙ্গে নিচ্ছি। এটা আমি হারাতে চাই না। এটা হারিয়ে গেলে, আমি যে পাগল নই সেটা আমাকে কে মনে করিয়ে দেবে? এই দুনিয়ায় এটাই হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

**সোমবার।**

বাড়িটা হাওয়া হয়ে গেছে। কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছি।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে ফিরে এসে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। কয়েকটা ছেলে সেখানে খেলা করছিল। ওদের ডেকে জিগ্যেস করলাম, এখানে যে বাড়িটা ছিল তার কী হল। ওরা বলল, ছোটবেলা থেকেই বরাবর এ-মাঠে ওরা খেলছে।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জেনেছি, আমার বা রীণার সম্পর্কে ওরা কিছু জানে না। ওদের কাছে কোনও রেকর্ডও নেই–কোনওদিন ছিল না।

অর্থাৎ, আমি বর্তমানে আর কেউ নই। এখন যেটুকু আমার আছে তা হল এই শরীরটা– আর তার ওপরে জড়ানো পোশাক। আমার অফিসের আইডি কার্ড, ছবি, সব মানিব্যাগ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

ঘড়িটাও হাতে আর নেই। সরাসরি কবজি থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মনে আছে, রীণা ওটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল।

ঘড়ির উলটোদিকে খোদাই করে কয়েকটা কথা লেখা ছিল। আমার মনে আছে–এখনও।

তোমাকে– রীণা।

জটিল চিন্তার হাত থেকে মনকে রেহাই দিতে এক কাপ ক–।

# অসুর (নভেলেট)

**অসুর (নভেলেট)**

শীতের দুপুরে কোনও এক শহরতলিতে তিনতলা বাড়িটা ছিল একা-একা দাঁড়িয়ে। সামনে একফালি বাগান, আর দু-পাশে খোলা মাঠের নির্জনতা। পিছন দিকটায় কিছু জংলা ঝোঁপ। বাড়ির বাসিন্দা ছজন মানুষ। কিন্তু ছজনের একজন গরহাজির ছিল সেই নির্জন দুপুরে। এবং ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হল সপ্তম ব্যক্তি…।

পরনে ফুল হাতার কালো জামা, কালো কর্ড-এর প্যান্ট। চোখে মুখে কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টি। চেহারা তার রোগার দিকেই। কিন্তু চোয়ালের কঠিন রেখা ভেতরের শক্তির একটা আভাস দিচ্ছে। পা ফেলায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। অলসভাবে মেঠো পথ ধরে সে এগিয়ে আসছিল। আধা-গ্রাম আধা-শহর মিশিয়ে তৈরি এই শহরতলিতে তার আসা এই প্রথম। এবং বোধহয় এই শেষ।

রাস্তার দুপাশে ঘাসের ছোঁওয়া এখনও আছে। চোখ তুলে তাকালে দূরে দেখা যায় ওভারহেড লাইন। সেই তারে বসে আছে কয়েকটা ফিঙে। লেজ নাড়িয়ে দোল খাচ্ছে।

এ-অঞ্চলের বাড়িগুলোকে কেউ যেন সযত্ন পরিকল্পনায় হিসেবি দূরত্বে বসিয়ে দিয়েছে। কোনওটা একতলা, কোনওটা দোতলা, আর কোনওটা-বা তিনতলা। শীতের দুপুর। সব বাড়ির জানলা, দরজা বন্ধ। হয়তো বাসিন্দারা বিশ্রাম নিচ্ছে।

তিনতলা হলদে বাড়িটা তাকে টানল কোন অদ্ভুত কারণে, তা সে নিজেই জানে না। হয়তো বাড়ির সামনের এই একফালি বাগানটা।

নির্জন মাঠের এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে সে বাড়িটার দিকে তাকাল। বাউন্ডারি গেটের হুড়কো খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

আধুনিক পরিকল্পনায় ছোঁয়াচ বাড়িটার সর্ব অঙ্গে।

ভারী কাঠের দরজার ওপরে নেমপ্লেট। তাতে লেখাঃ

সুশান্ত মল্লিক, অ্যাডভোকেট

আর একটু ওপরে, ডান পাশে কলিংবেলের সুইচ। বাগান চিরে যে-পথ দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার দু-ধারে গেঁথে দেওয়া ইটে সাদা রং করা; খাটো বাঁশের বেড়াও রয়েছে একটা।

শ্লথ পায়ে দরজার কাছে পৌঁছে কী যেন চিন্তা করল সে। চোখ তুলে তাকাল দোতলার বারান্দার দিকে। সাদা রঙের গ্রিলে ঘেরা বারান্দা জনশূন্য। এবং যে-হলদে দরজাটা বাড়ি এবং বারান্দার যোগসূত্র, সেটা বন্ধ।

চিন্তার ইতি ঘটিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলিংবেলের বোতামে হাত রাখল সে। ভেতরে ঝনঝনিয়ে ওঠা চাপা আওয়াজটা কানে আসতেই হাসল; বাঁ-হাতটা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পকেটে ঢুকিয়ে অনুভব করল ভাঁজ করা স্টিলের ছুরিটা।

আর একবার হাসল সে।

*

একটা হালকা লেপ গায়ে দিয়ে বারান্দার লাগোয়া ঘরটাতে শুয়েছিলেন সুশান্ত মল্লিক।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য দিনকয়েক ওকালতিকে ছুটি দিয়েছেন। পঞ্চাশ পার হওয়ার পর থেকে তার হৃৎপিণ্ড যেন শরীরের সঙ্গে লাগাতার বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং খাওয়াদাওয়া সেরে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। সবাই জানে, এ সময়ে তাকে বিরক্ত করা বারণ। সাধারণত গল্পের বই পাশে নিয়ে শোন। মাথার কাছে রিডিং-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ পড়েন, তারপর একসময় আলো নিভিয়ে পাশ ফিরে ঘুমোনোর চেষ্টা করেন।

সুশান্ত মল্লিকের একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন কলিংবেলের শব্দ। অর্থাৎ, দরজায় কোনও অতিথি অপেক্ষা করছে। কিন্তু তিনি ব্যস্ত হলেন না। কারণ, বেলা এখন সবে দুটো। তার স্ত্রী, মেয়ে, বিধবা বোন এবং বাড়ির কাজের লোক– সকলেই এখন জেগে। কলিংবেলের শব্দ ওরা কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে থাকবে। তারপর ওদের কেউ যাবে দরজা খুলে দিতে।

প্রমাণিত হল, সুশান্ত মল্লিকের অনুমান নির্ভুল। তাঁর স্ত্রী, রমলা মল্লিক, দোতলার রান্নাঘরে এঁটো বাসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কলের জলের শব্দে কলিংবেলের শব্দটা তার কানে যায়নি। রান্নাঘরের পাশেই একটা মাঝারি ঘর। সে-ঘরে সিনেমার পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতে ব্যস্ত ছিল সুমনা– সুশান্ত মল্লিকের মেয়ে। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর সুযোগ্য পাত্রের অপেক্ষায় দিন গুনছে। ঘণ্টার শব্দটা ওর কানে গেলেও বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা সুমনা করল না। কারণ ও জানে, আর কেউ-না-কেউ শব্দটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে থাকবে। তাই পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেও ওর কান পড়ে রইল সদর দরজার দিকে ও কখন শুনতে পাবে দরজা খোলার শব্দ। তারপর না হয় জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখবে, কে এল।

সুমনার বিধবা পিসি প্রভা রায়গুপ্ত পুজো-আচ্চা সেরে খাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন, কানে এল ঘণ্টার শব্দ। এ-বয়েসে মানুষ হয়তো একটু অধৈর্য এবং খুঁতখুঁতে হয়। তাই খাওয়ার ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি বাইরের করিডরে বেরিয়ে এসে ডেকে উঠলেন, সুমু, দেখ তো কে এল!

সুমনা দোতলায় নির্বিকার থাকলেও প্রভাদেবীর চিৎকারটা রমলাদেবীর কানে গেল। তিনি বাসন মাজা থামিয়ে চাকর অবিনাশকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, অবিনাশ, দরজা খুলে দে। কে এল দেখ– কথা শেষ করে আবার হাতের কাজে মন দিলেন তিনি।

অবিনাশের বয়স বাইশ-তেইশ। কালো স্বাস্থ্যবান চেহারা। এ-বাড়িতে সে আছে প্রায় চার বছর। রোজকার মতো একতলায় বসে সে নিজের জামাকাপড় কাচছিল। কাপড় কাঁচা হলে স্নান সেরে দোতলার গিয়ে ঢেকে রাখা খাবার খাবে। তারপর একটু গড়ানোর ব্যবস্থা করবে।

কাপড় কাচার শব্দে ঘণ্টির শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ায় সে এতক্ষণ খেয়াল করেনি। কিন্তু মায়ের গলার আওয়াজে হাতের কাজ থামাল সে। শুনতে পেল ঘণ্টার অধৈর্য শব্দ।

একটু বিরক্ত হয়ে অবিনাশ উঠল। ভিজে হাত থেকে সাবান-জল ঝাড়তে ঝাড়তে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

.

নীরবে অপেক্ষা করতে করতেই তার নজর পড়ল টেলিফোনের তারটায়। দরজার বাঁ-পাশ দিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে সাপের মতো নেমে গেছে।

মনে-মনে হাসল সে।

বিজ্ঞানের লম্বা হাত এত দুরেও এসে পৌঁছেছে! এই ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের হাসি কালো ঠোঁটজোড়ায় ছায়া ফেলল। বাঁ-হাতে ছুরিটা বের করে বুড়ো আঙুলে চাবি টিপতেই ঝলসে উঠল স্টিলের ফলা। এবং পরমুহূর্তেই নিখুঁত হাতে বিচ্ছিন্ন হল টেলিফোনের তার।

রোদ-ঝকমকে নীল আকাশে হঠাৎই যেন ছায়া ফেলল একটুকরো ঘন কালো মেঘ।

এমন সময় সশব্দে খুলে গেল সদর দরজা।

দরজায় দাঁড়িয়ে বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক। খালি গা। পরনে চেক লুঙ্গি। খাটো করে পরা। কোথাও কোথাও সামান্য ভিজে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিজে হাত দুটো লুঙ্গিতে মুছতে লাগল ছেলেটি। প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

উত্তরে মৃদু স্বরে সে বলল, সুশান্ত মল্লিক, অ্যাডভোকেট।

উনি অসুস্থ। এখন বিশ্রাম করছেন।

নীরবে খোলা দরজার চৌকাঠ পেরোল সে। ছেলেটির বিস্ফারিত চোখের সামনে পিঠ দিয়ে বন্ধ করে দিল সদর দরজা। তারপর বাঁ-হাতটা উঁচিয়ে ধরল

ছেলেটার চোখের সামনে। হাতে ধরা বস্তুর চরিত্র এই আধো-অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝল ছেলেটা। হয়তো আসন্ন বিপর্যয়ের কথা অনুমান করেই এক বুক ফাটা চিৎকারের জন্য ভোকাল কর্ডকে তৈরি করে হাঁ করল। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই অভ্যাসলব্ধ পেশাদারি ভঙ্গিতে সাপের মতো ক্ষিপ্রতায় আগন্তুকের বাঁ-হাত ছোবল মারল ছেলেটির গলায়। স্টিলের ফলাটা একইসঙ্গে তার চিৎকার এবং শ্বাসনালিকে মাঝপথেই বিচ্ছিন্ন করল।

অদ্ভুতভাবে ছেলেটার শরীরটা সামনে মাথা ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে কয়েকমুহূর্তের জন্য। তারপরই সিমেন্টের মেঝেতে আছড়ে পড়ল। মেঝে তখন রক্তে ভিজে উঠেছে।

ছটফট করা শরীরটার দিকে একপলক দেখল সে। দেখল বাঁ-হাতের রক্তাক্ত ছুরিটার দিকে। তাকাল কালো জামায় ছিটকে আসা রক্তের রেখার দিকে। তারপর নির্বিকারভাবে ছুরিটা ঘষে-ঘষে মুছে নিল জামার কাপড়ে। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ছেলেটার দেহ ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। পা থেকে চটিজোড়া এককোণে খুলে রেখে নিঃশব্দ পায়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে...।

.

সুমনা শুয়ে-শুয়েই শুনতে পেল সদর দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। সুতরাং অতিথির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার শব্দের প্রতীক্ষায় ও সময় গুনতে লাগল। কিন্তু মিনিটপাঁচেক পরেও যখন কারও পায়ের শব্দ ওর কানে এল না, তখন একটু অবাক হল ও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিনেমা-পত্রিকাটা বালিশের পাশে রেখে বেশবাস গুছিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল।

ভেজানো দরজা খুলে বাইরের অলিন্দে এল সুমনা। ডান পাশেই রান্নাঘর, এখান থেকে মায়ের বাসন মাজার শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। মা-কে আর ব্যস্ত না করে বাঁ-দিকে এগোল। সুমনা। একপলক দেখল তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে, তারপর তাকাল বাবার ঘরের দরজার দিকে। দরজা রোজকার মতোই ভেজানোযাতে কোনও অবাঞ্ছিত অতিথি সুশান্ত মল্লিকের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়।

এবার নীচে নামার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে সুমনা। যতই নামে ততই ও অবাক হয়। কারণ, একতলার বাথরুম থেকে অবিনাশের কাপড় কাঁচার একটানা

শব্দ মোটেও শোনা যাচ্ছে না। এটা রোজকার নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং অস্বাভাবিক।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নেমে কলতলার দিকে এগিয়ে চলল সুমনা।

কলতলা এবং বাথরুমের একটাই দরজা, এবং সেটা হাট করে খোলা।

ভেতরে উঁকি মারতেই কোনও শব্দ না শোনার কারণটা বোঝা গেল। কলতলার অবিনাশ নেই। বালতি, সাবান, কাপড়চোপড় সব ছড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে, কাপড় কাচতে কাচতে হাতের কাজ ফেলে অবিনাশ উঠে গেছে সদর দরজা খুলতে।

বাথরুম দেখা শেষ করে সদর দরজার দিকে চলল সুমনা।

সদর দরজার হাতপাঁচেকের মধ্যে পৌঁছোতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা জিনিসটা যে অবিনাশ সেটা ও বুঝতে পারল।

কিন্তু সদর দরজা বন্ধ!

আর রক্তে ভেসে যাওয়া সিমেন্টের মেঝেতে বিস্তভাবে পড়ে আছে অবিনাশ। দু-চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা। এবং গলার নলিটা কে যেন সযত্নে দু-টুকরো করে দিয়েছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুমনা কয়েক মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ল। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ওর মুখ থেকে সঙ্গে-সঙ্গে কোনও চিৎকার বেরিয়ে এল না। বুকে জমাট বাঁধা নিশ্বাসটা যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখনই শোনা গেল ওর উন্মাদ চিৎকার। যেন কসাইখানায় খতম হওয়ার সময়ে কোনও শুয়োর ভাঙা, মর্মন্তুদ, কর্কশ স্বরে আর্তচিৎকার করছে।

.

দোতলার ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। দেখল, বাঁ-দিকে একটা ভেজানো দরজা। দ্বিধা কাটিয়ে দরজার হাতের চাপ দিল। ধীরে-ধীরে সেটা খুলে গেল। এবং নিঃশব্দ পায়ে আগন্তুক ভেতরে ঢুকল। আবার ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

যে ঘরটায় সে পা রাখল সেটা অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার জন্য আধা ড্রইংরুমগোছের একটা ঘর। দরজার বাঁ-পাশে রেফ্রিজারেটর। সামনে সাজানো সোফাসেট এবং একটা ছোট টেবিল হলদে কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাঁ-দিকের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের তাকে বসানো রেডিয়ো। এখন বন্ধ।

ঘরের আসবাবপত্রের ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে সে এগিয়ে চলল।

সামনেই আর-একটা দরজা। আলতো করে ভেজানো।

দ্বিতীয় দরজা অতিক্রম করেই সে পৌঁছোল দোতলায় বারান্দার লাগোয়া বড় ঘরটায়। ঘরে আবছা অন্ধকার। ডানদিকে এবং বাঁ-দিকে দুটো বড় খাট। ডান পাশে দাঁড় করানো একটা বিশাল কাঠের আলমারি। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা চেয়ার ও টেবিল।

পরমুহূর্তেই তার চোখ পড়ল বাঁ-দিকের খাটে দেওয়ালের দিকে মুখ করে লেপ গায়ে ঘুমিয়ে রয়েছে একজন মানুষ। শুধুমাত্র তার মাথার পিছনটুকু অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে। খাটের বাঁ-দিকে সাজানো একটা স্টিলের আলমারি, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে কয়েকটা জিনিস রাখা আছে। বোঝা গেলেও আবছা আঁধারে ঠিকমতো নজরে এল না। স্টিলের আলমারির গায়ে লাগানো এক বিশাল আয়না। সেই আয়নায় নিজেকে একপলক দেখে বাঁ-দিকের খাটটার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

খাটের খুব কাছে দাঁড়িয়ে সে লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মাথাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জানলায় লাগানো কাচের শার্সির দৌলতে সামান্য আলো ঠিকরে পড়েছে শুয়ে থাকা মানুষটির গায়ে। তার নজরে পড়ল কাঁচা-পাকা চুলের হালকা আস্তরণ মাথার পিছনটা ঢেকে রেখেছে। মনে মনে কী ভাবল সে। তারপর পকেট থেকে ইস্পাতের ছুরিটা বের করে বাঁ-হাতে উঁচিয়ে ধরল। চাবির ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ দিতেই একটা খ করে শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে ছিটকে এল ঝকঝকে ফলাটা। শুয়ে-থাকা লোকটা সে-শব্দ শুনতে পেল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

সুতরাং নিশ্চিত ভঙ্গিতে সে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ল, দু-চোখের কালো তারা কেন যেন ধকধক করে জ্বলছে...।

*

চিৎকারটা প্রথমে শুনতে পাননি রমলাদেবী। কারণ ধাতব বাসনে ছিটকে পড়া জলের শব্দ আর-সব শব্দ ঢেকে দিয়েছিল। আচমকা কলটা বন্ধ করতেই কারও গলা চিরে বেরিয়ে আসা তীব্র চিৎকারটা পাগলের মতো তার কানের পরদায় এসে আঘাত করল। একবার-দুবার-তিনবার…।

সম্পূর্ণ হতভম্ব রমলাদেবীর হাত থেকে অ্যালুমিনিয়ামের হাতাটা খসে পড়ে গেল। দিশেহারাভাবে কয়েকমুহূর্ত তিনি উবু হয়ে বসে রইলেন। তারপর বয়েসের তুলনায় ক্ষিপ্র চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালেন। ভিজে হাত দুটো পরনের শাড়িতে মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন বাইরের অলিন্দে। স্বভাবমতো ডেকে উঠলেন, কী হল? চেঁচাচ্ছে কে কী ব্যাপার?

অলিন্দ ধরে কয়েক পা এগিয়েই তিনি বুঝলেন, চিৎকারের শব্দটা আসছে একতলা থেকেই। সুতরাং নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ সুমনার কথা মনে হতেই আবার ফিরে এলেন রান্নাঘরের পাশের ঘরটায়। হ্যাঁ, চোখের কোণ দিয়ে যেটুকু তার নজরে পড়ছিল তা সত্যি ।

ঘরে সুমনা নেই।

সিনেমার পত্রিকাটা বালিশের পাশে নামানো। ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

এবার রমলা মল্লিক ভয় পেলেন। সুমু-সুমু বলে চিৎকার করতে করতে তিনি টলোমলো পায়ে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নামার পরই বিপরীত দিক থেকে উদ্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে ছুটে আসা সুমনার সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল।

সুমনার দু-চোখ আতঙ্ক-বিস্ফারিত। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করা। ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর ভারী বুক দুটো উঠছে-নামছে।

মা-কে সামনে পেয়ে জাপটে ধরল সুমনা। মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। রুদ্ধ আবেগে ওর শরীরটা রমলাদেবীর দুহাতের মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

সেকেন্ডকয়েক পর সুমনার কাঁপা স্বর–অবিনাশ–মরে গেছে– এই শব্দ তিনটে উচ্চারণ করল এবং করেই চলল।

পাঁচবারের পর রমলাদেবী ওর কথার অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন। তখন আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন মেয়েকে। চাপা স্বরে বললেন, অবিনাশ মরে গেছে? কী করে?

সুমনা নীরবে সদর দরজার দিকে আঙুল দেখাল। ওর শরীরের কাপুনি তখনও থামেনি।

রমলাদেবীর অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। প্রথম কয়েকমিনিট তিনি দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, সুমনা মিথ্যে কথা বলছে না। কিন্তু ওর দেখা ও শোনার মধ্যে কোথাও হয়তো কোনও গলদ রয়েছে, তাই এরকম অসংলগ্ন আচরণ করছে। সুতরাং তিনি মেয়েকে সাহস দেখিয়ে বললেন, চল তো, দেখি কী ব্যাপার।

সুমনা শূন্য চোখে মায়ের চোখের দিকে দু-পলক চেয়ে রইল, তারপর নীরবে তাঁর কথা মেনে নিল। মায়ের হাত ধরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ওর শূন্য দৃষ্টি সামনে–যেন অবিনাশের মৃতদেহটা ওর চোখের তারায় ভাসছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নামতেই রমলা মল্লিকের সন্ধানী নজর পড়ল এককোণে রাখা মামুলি একজোড়া চটির ওপর। কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি থমকে গেলেন। ক্লান্ত সুমনার দিকে মনোযোগ দিলেনঃ চল, আস্তে-আস্তে চল। কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি।

সুমনা মা-কে নিয়ে মৃত অবিনাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু রক্তের কালচে রং, আর কিছু কালো মাছি ছাড়া দৃশ্যপটের আর কোনও পরিবর্তন হয়নি।

রমলাদেবীর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল। সুমনা ভাব-অনুভূতিহীন, নির্বিকার।

সংবিৎ ফিরে পেতে রমলাদেবীর যেটুকু দেরি হল সেটা তিনি পুষিয়ে নিলেন আচমকা ছুট দিয়ে। মেয়েকে ফেলে রেখে তিনি পাগলের মতো দৌড়োলেন সিঁড়ির দিকে। মেয়ের কথা তার মনেও রইল না।

মা-কে উধাও হতে দেখে সুমনাও চুপ করে থাকল না। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাকে অনুসরণ করল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যে-দৃশ্য ও দেখল তাতে অবাক হওয়ারই কথা। এবং সেইসঙ্গে ভয়ের পরশও বুঝি দোলা দিয়ে যায়...।

.

সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরে দাঁড়িয়েই নীচের তলার শোরগোলটা তার কানে গেল। একটু যেন বিচলিত হয়েই তার বাঁ-হাত পকেট ছুঁয়ে দেখল, অনুভব করল ইস্পাতের ভরসা। তারপর বেড়ালের পায়ে বেরিয়ে এল বসবার ঘরে। সিঁড়ির লাগোয়া দরজায় কান পেতে শুনতে পেল একাধিক নারীকণ্ঠ। ওরা কথা বলছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই কথা মিলিয়ে আসতে লাগল– ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

সুতরাং সে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে, চোরা পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে– পলকের জন্য রেলিঙের পাশ দিয়ে তার চোখে পড়ল রঙিন শাড়ির আভাস। নির্লিপ্তভাবে ওদের অনুসরণ করল সে।

যখন সে সিঁড়ির শেষ ধাপে, নজরে পড়ল তার রেখে যাওয়া চটিজোড়া, এবং কানে এল একটা অদ্ভুত চাপা চিৎকার–যদি তাকে চিৎকার বলা যায়। পরক্ষণেই যে কারও ফিরে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরেই চট করে চটিজোড়া হাতে তুলে নিল সে, শ্বাপদের মতো ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল। পিছনে ভেসে আসছে পায়ের শব্দ।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে লুকোনোর চেষ্টায় আবার বসবার ঘরেই ঢুকে পড়ল সে। চঞ্চল চোখে জরিপ করে ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে, সোফাসেটের ঠিক বিপরীত দিকে, সে আবিষ্কার করল একটা ছোট দরজা। ঝটিতি সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাতের চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর ভালো করে দেখতে লাগল ঘরটা।

আটফুট বাই চারফুট ছোট্ট ভঁড়ার ঘর। টুকিটাকি জিনিসে–হাঁড়ি, কড়াই, টিনের কৌটো, বালতি আর একটা বিশাল আলমারিতে ঠাসা। কোনওরকমে জনাতিনেক পাশাপাশি দাঁড়ানো যায়।

আলমারির পাশে একটা সবুজ কাঠের মই। মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। তার এক জায়গায় একটা চৌকো ফোকর–অর্থাৎ, ওপরে কুঠরি-ঘরে যাওয়ার দরজা। সেই চৌকো তক্তাটা একটা আংটা দিয়ে বাইরের কাঠের সঙ্গে আটকানো। এবার কাঠের মইটার অর্থ বুঝতে পারল সে। এই মই বেয়ে উঠে কাঠের চৌকো তক্তাটা খুলে একজনের পক্ষে ওপরের কুঠরি-ঘরে যাওয়া সম্ভব। মই বেয়ে ওপরে ওঠার ইচ্ছেটা একবার তার মনে চাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল বসবার ঘরের দরজা। হাঁফাতে-হাঁফাতে কেউ ঢুকল ঘরে। তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ছুটতে শুরু করল।

কান খাড়া করে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়েছিল সে। চোখ ভঁড়ার ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে দুরের রোদে-ধোওয়া নীল আকাশে। মনে-মনে পরিস্থিতির ওজন মাপতে চাইল সে। পারল না। সব চিন্তা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছে মশার গুনগুন একটানা কান্না…।

*

জমাট পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন রমলা মল্লিক। তেমনি নিশ্চল তার বিস্ফারিত দু-চোখ। তাকিয়ে আছেন সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দেওয়ালের পাশে একটি বিশেষ জায়গার দিকে। মায়ের হতবাক হওয়ার কারণ সুমনা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারল। মায়ের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে ও সেইদিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনও কিছুই ওর নজরে পড়ল না।

সুমনা ভয় পেয়ে দু-হাতে আঁকুনি দিল মাকে : কী হয়েছে মা? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

ক্লান্ত আচ্ছন্ন স্বরে রমলা মল্লিক বললেন, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একজোড়া চটি দেখেছিলাম, এখন দেখছি না।

কথার অর্থটা মনের গভীরে কেটে বসতে সুমনার যেটুকু সময় লাগল। তারপরই ও ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। পিছন থেকে ভেসে আসা কী হল, সুমু?-র উত্তরে ও কোনওরকমে বলল, দাঁড়াও মা, অফিস-ঘরের চাবিটা নিয়ে আসি।

রমলা মল্লিক মেয়েকে চোখের আড়াল করতে চাইলেন না। ওকে অনুসরণ করলেন। সুমনা তখন একধাক্কায় বসবার ঘরের দরজা খুলে ফ্রিজের ওপরে রাখা অফিস-ঘরের চাবিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দ্রুতপায়ে পাশ কাটিয়ে নেমে যেতে-যেতে মা-কে ও বলল, তুমি শিগগির বাবাকে ডাকো! আমি পুলিশে ফোন করছি।

মা-কে বিহ্বল অবস্থায় সিঁড়িতে রেখে সুমনা ছুটে গেল একতলার অফিস-ঘরে। অ্যাডভোকেট সুশান্ত মল্লিকের অফিসে।

মানসিক অস্থিরতায় তালার গায়ে চাবিটা ঢোকাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। তারপর এক ঝটকায় দরজা খুলে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁ-প্রান্তে বসানো টেলিফোনের কাছে পৌঁছে গেল সুমনা। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে যেতেই বুঝল, রিসিভার নিস্তব্ধ। তাতে ডায়াল টোনের সুপরিচিত কড়কড় শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শত চেষ্টাতেও যখন কিছু হল না, তখন রূঢ় বাস্তবটা সুমনা বুঝতে পারল।

ওদের বাড়ির টেলিফোনের লাইন কেউ কেটে দিয়েছে...।

.

সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে রমলা মল্লিক যখন সচল হলেন, তখন বেশ কয়েক সেকেন্ড কেটে গেছে। স্বামীকে অবিশ্বাস্য ঘটনা কীভাবে বিশ্বাস করাবেন সেই কথা ভাবতে-ভাবতে তিনি উঠে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে চাইলেন নীচের চটিজোড়ার মতো এই বসবার ঘরে কোনওরকম গরমিল চোখে পড়ছে কি না। পড়ল না। সুতরাং ধীরে ধীরে তিনি এগোলেন সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরের দিকে।

ঘরের ভেজানো দরজায় হাত রাখতেই অস্পষ্টভাবে কারও নড়াচড়ার শব্দ তার কানে এল– বোধহয় ভঁড়ার ঘরের দিক থেকে। থমকে দাঁড়ালেন রমলাদেবী। চোখ এবং পা যথাক্রমে ফেরালেন ভঁড়ার ঘরের ভেজানো দরজার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন।

ভেজানো দরজায় হাত ছোঁয়াতেই বুক কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়। তবু সাহসে ভর করে দরজায় চাপ দিলেন। ক্ষীণ প্রতিবাদে কাচক্যাচ সুরে খুলতে শুরু

করল দরজা। খানিকটা খুলতেই দরজায় ফাঁক দিয়ে দেখতে চাইলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই তার নজরে পড়ল না। অতএব মনকে বোঝালেন শব্দটা অবাধ্য ইঁদুরের। তারপর ফিরে এলেন শোওয়ার ঘরের দরজায় কাছে।

ঘরে ঢুকে প্রথমে যে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা রমলা মল্লিকের নজরে পড়ল, অথবা বলা যায়, কানে এল–সেটা সুশান্ত মল্লিকের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপস্থিতি। ঘরের প্রতিটি জিনিসই নিজের নিজের জায়গায় স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে। এমনকী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কান পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে সুশান্ত মল্লিকও স্বাভাবিকভাবে শুয়ে আছেন।

হঠাৎ যেন গতি এবং সংবিৎ ফিরে পেলেন রমলাদেবী। দ্রুতপায়ে পৌঁছে গেলেন স্বামীর বিছানায় কাছে। ঝুঁকে পড়লেন খাটের ওপর। স্বামীর গায়ে হাত রেখে ধাক্কা দিলেন, ডাকলেন, ওগো, শুনছ? শিগগির ওঠো! সর্বনাশ হয়েছে।

কিন্তু বারবার ডেকেও কোনও সাড়া না পেয়ে রমলা মল্লিক অবাক হলেন। আর তখনই তার চোখ পড়ল স্বামীর মাথার দিকে। এবং অসঙ্গতিটা নজরে পড়ল।

তার হাতের ধাক্কায় স্বামীর শরীরটা নড়ছে ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে মাথাটা প্রায় নড়ছে না বললেই চলে।

বুকভরা আশঙ্কা নিয়ে এক ঝটকায় লেপটা তুলে নিলেন রমলাদেবী। এবং বুঝলেন, মাথাটা কেন ঠিকঠাক নড়ছিল না।

সুশান্ত মল্লিকের মাথা এবং শরীরের মাঝে প্রায় চার আঙুল পরিমাণ ফাঁক যেন হাঁ করে রমলা মল্লিককে গ্রাস করতে আসছে।

রক্তাক্ত বিছানা-বালিশের রং হঠাৎ যেন হলুদ ফুলে বদলে গেল রমলাদেবীর চোখের সামনে। তিনি টলে পড়লেন মেঝেতে।

হয়তো সেই কারণেই, সুশান্ত মল্লিকের খাটের নীচে রাখা ফল-কাটার ধারালো রক্তাক্ত বঁটিটা তাঁর নজরে পড়ল না।

.

রমলাদেবীর পড়ে যাওয়ার ভারী শব্দটাও তার কানে গেল। এর আগের ছোটখাটো শব্দগুলো তার কানে গেলেও মাথায় ঢোকেনি। শেষ শব্দটায় সে চমকে উঠল। সন্তর্পণে খুলে ফেলল ভাড়ার ঘরের দরজা। ডাইনে-বাঁয়ে একপলক করে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না-পেয়ে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে।

ওপরে যাওয়ার এবং নীচে নামার সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে একটু যেন দ্বিধায় পড়ল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিল এবং নীচে যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

নিঃশব্দ শব্দটা যেন তার পায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং অবিচলিত ধীর পায়ে সে নেমে এল অফিস-ঘরের দরজার সামনে। চটিজোড়া আবার খুলে রাখল সিঁড়ির গোড়ায়। সামনেই বাথরুম। তার ভোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ছে ছড়িয়ে রাখা ভেজা কাপড়চোপড়, সাবান-জল ভরা বালতি, সব মিলিয়ে অসমাপ্ত কাজের ইশারা।

এবার তার মনোযোগ পড়ল অফিস-ঘরের দিকে।

কিছুটা কৌতূহল কিছুটা আগ্রহ নিয়ে সে ভেতরে উঁকি মারল।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে, তার দিকে পিছন ফিরে, টেলিফোন নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে একটি মেয়ে-যুবতী।

হাসল সে। ফোনের তার তো সে আগেই কেটে দিয়েছে, তা হলে?

নীরবে মেয়েটির পিছনে গিয়ে থামল সে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে ওর কাণ্ডকারখানা লক্ষ করতে লাগল। এবং নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই মেয়েটি তার মুখোমুখি হল।

মুহূর্তের নীরবতা।

তার কালো পোশাক এবং সাদা হাসির পরস্পরবিরোধী চেহারায় মেয়েটির চোখজোড়া অবাক হল, বিস্ফারিত হল।

এবং কোনও শব্দ তৈরির আশায় নরম ঠোঁটজোড়া স্ফুরিত হতেই বিদ্যুতের মতো তার থাবা আছড়ে পড়ল মেয়েটির মুখে…।

রমলাদেবীর জ্ঞান ফিরলেও আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে বেশ সময় লাগল। তিনি কোথায়, কী করে, কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তরগুলো ধীরে-ধীরে তার মনকে ভারী করে তুলল। মাথাটা দু-হাতে চেপে ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নীরবে তাকালেন স্বামীর শরীরের দিকে। স্বামীর লেপে-ঢাকা দেহটা জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। দু-চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল, জ্বালা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন। ইতস্তত তাকিয়ে ঝুঁকে পড়লেন খাটের নীচে, ফল-কাটার বঁটিটা টেনে নিতে গিয়ে থামলেন। কারণ, বঁটি রক্তে মাখামাখি। কিন্তু মনের দ্বিধা কাটিয়ে আস্থা-ভরা ডানহাতে তুলে নিলেন বঁটিটা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলে এলেন বসবার ঘরে। ভাঁড়ার ঘরের খোলা দরজা দেখে সচকিত হলেন। ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

কেউ নেই।

বসবার ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ফ্রিজের ওপর থেকে তালা এবং চাবিটা তুলে নিলেন। বঁটিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিলেন রমলাদেবী। চাবিটা কোমরে গুঁজে দোতলার বাকি দুটো ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, প্রতিটির দরজার কড়া সরু পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধলেন। পাটের দড়ির বাকিটা ফেলে দিলেন বারান্দার একপাশে। তারপর মেঝে থেকে রক্তাক্ত বঁটিটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দরজার কড়ায় দড়ি বাঁধার উদ্দেশ্য নিয়ে রমলাদেবীর মনে কোনওরকম ভুল ধারণা ছিল না। তিনি একমুহূর্তের জন্যও ভাবেননি, ওই হালকা দড়ি দিয়ে অদৃশ্য খুনিকে তিনি আটকে রাখতে পারবেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, তার অজান্তে কেউ কোনও ঘরে ঢুকলে সেটা যেন তিনি বুঝতে পারেন। আর বসবার ঘরের দরজায় তালা দেওয়ার কারণ, সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরেই তাদের টাকা-পয়সা, গয়না-সম্পত্তি ইত্যাদি থাকে। অনুপ্রবেশকারী যদি কোনও চোর-ডাকাত হয় তা হলে সেগুলো যাতে তার হাতে না পড়ে সেইজন্যই এই সাবধান হওয়া।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রমলাদেবী মনস্থির করতে কয়েক মুহূর্ত খরচ করলেন। তারপর গলা তুলে ডাকলেন, সুমু সুমুউউ!

বদ্ধ বাড়িতে তার ডাক কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

দু-মিনিট অপেক্ষার পরও কোনও উত্তর পেলেন না। শুধুই নিস্তব্ধতা।

সুতরাং, এইবার সাততাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন তিনি। লক্ষ্য অফিস ঘর। বাইরের পৃথিবী তখন তার কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে। তা নইলে রমলাদেবী হয়তো শুনতে পেতেন প্রভা রায়গুপ্তের উৎকণ্ঠিত স্বর। তিনি তখন একনাগাড়ে রমলা মল্লিক এবং সুমনা মল্লিকের কুশল সম্পর্কে প্রশ্ন করে চলেছেন।

অফিস-ঘরে পৌঁছে ঘরের যা অবস্থা রমলাদেবীর নজরে পড়ল, তাতে ঘরটাকে অফিস ঘর ছাড়া আর সব কিছু বলা চলতে পারে। কাচের টেবিলের কাচ শতটুকরো, টেলিফোনটা পড়ে আছে মেঝেতে, খাতাপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে। একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে, আর সুমনা পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। ওর বাঁকানের পাশে পড়ে আছে কালো টেলিফোন রিসিভারটা।

রমলাদেবী হাতের বঁটিটা একপাশে নামিয়ে রাখলেন। এগিয়ে গিয়ে সুমনার দেহের পাশে হাঁটুগেড়ে বসলেন। হাতের ধাক্কায় একমাত্র মেয়ের দেহটা চিত করে ফেললেন। বুঝলেন, ও আর বেঁচে নেই।

সুশান্ত মল্লিকের বেলায় রক্তপাতের যেমন ছড়াছড়ি ছিল এখানে তা নেই। টেলিফোনের কালো কর্ডটা সুমনার নরম গলায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। তার চাপে সুমনার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, মুখের ভেতরে জিভের আর জায়গা হয়নি।

চাপা রাগে, আক্রোশে রমলাদেবীর বুকের ভেতরটা প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সম্ভবত দোতলায় যে কয়েক মিনিট তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই ঘটে গেছে অফিস-ঘরের তাণ্ডব। উঠে দাঁড়াতে গিয়েই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন রমলাদেবী। তাই হাত বাড়ালেন বঁটিটার দিকে।

এবং দেখলেন বঁটিটা তার জায়গায় নেই!

সুতরাং ভুল শোধরানোর সময়টুকু তিনি পেলেন না।

পরমুহূর্তেই তার শরীরের ওঠার চেষ্টাকে থামিয়ে দিল ধারালো কোনও কিছুর অমানুষিক আঘাত...।

.

প্রভা রায়গুপ্ত এবার অধৈর্য হয়ে পড়লেন। অফিস-ঘরের সশব্দ-তাণ্ডব তাঁর শুনতে না পাওয়ার কারণ তিনি বাড়ির পিছন দিকের ছাদে নিজের এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে রাখছিলেন। এবং প্রথমবার সুমনার চিৎকার তিনি যে শুনতে পাননি তার কারণ, তখন তিনি নিত্যকার নিয়মমাফিক খাওয়ার আগে সেই ছাদে দাঁড়িয়েই পাখিদের খাওয়াচ্ছিলেন। পাখিদের খাওয়ানো হলে তবে তিনি নিজে খেতে বসেন।

কিন্তু রমলাদেবীর শেষবারের চিল্কারে তিনি বিচলিত হয়েছেন, এবং বারবার ভ্রাতৃবধূ ও তার কন্যার নাম ধরে ডেকে উঠেছেন কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মানুষের বয়েস হলে স্বভাব একটু খুঁতখুঁতে হয়, এবং অল্পেতেই ভয় পেয়ে যায়। হয়তো সেই কারণেই, রমলাদেবী অথবা সুমনার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

শীতের দুপুরে জানলা-দরজা ভেজিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শোয়াটা প্রভাদেবীর পুরোনো অভ্যেস। প্রথমত, সেই অভ্যেস ভেঙে তাঁকে ঘরের বাইরে আসতে হল। তারপর নিরুপায় হয়েই তিনতলা থেকে তিনি নেমে আসতে লাগলেন দোতলায়।

দোতলায় এসে দাঁড়াতেই দুটো জিনিস তাকে ভীষণ অবাক করল।

এক, বসবার ঘরের দরজায় তালা দেওয়া, অন্যান্য ঘরগুলোর দরজার কড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দুই, অদ্ভুত অপার্থিব নীরবতা।

কিন্তু একটা আবিষ্কার তাঁর অবাক হওয়ার প্রথম কারণকে একটু কমজোরি করে দিল। বাথরুমের লাগোয়া ঘরের দরজার কড়ায় দড়ি বাঁধা নেই। কিন্তু ভোলা

দড়িটা একটা কড়া থেকে ঝুলছে বলে সিঁড়ির কাছ থেকে তার মনে হয়েছিল দরজা বুঝি বন্ধ।

আরও অবাক হলেন প্রভাদেবী। রমলাদেবী এবং সুমনার নাম ধরে আরও দু-চারবার ডাকলেন। তার গলা ক্রমশ খাদে নেমে আসতে লাগল। একবার ভাবলেন, নীচটা দেখে আসি। সুতরাং বাথরুম, রান্নাঘর এবং সুমনার ঘরে দড়ি-বাঁধা দরজাগুলোর দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি একতলার সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলেন। তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দটা কি ক্রমশ বেড়ে ওঠায় বুকের শব্দটা জোরালো ঠেকছে?

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে প্রায় একইসঙ্গে তিনটে জিনিসের ওপর প্রভাদেবীর নজর পড়ল।

বাথরুমের খোলা দরজা।

অফিস-ঘরের খোলা দরজা।

এবং একজোড়া চটি…।

চটচটে বঁটিটা নামিয়ে সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসল মাটিতে। দেখল একপলক নিজের তৈরি ধ্বংসস্তূপের দিকে।

এখন শীতকাল সুতরাং শীত করার কথা। কিন্তু তার শরীরে যেন অসহ্য জ্বালা। সেই জ্বালা মাকড়সা-হুল ছড়িয়ে দিয়েছে তার ওলটপালট মগজে।

জটপাকানো অন্ধ মস্তিষ্কে সুষম চিন্তা করতে চেষ্টা করল সে। ভাবতে চেষ্টা করল, সে কোথায়। এখানে এল কী করে? মেঝেতে শুয়ে আছে এরাই-বা কারা? কই, এদের কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না!

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর সে সিদ্ধান্তে এল, না, এদের কাউকেই সে চেনে না, এই বাড়িটাও তার অচেনা, এমনকী এই পৃথিবীটাও তার অচেনা। একমাত্র চেনা-পরিচিত যে ছিল, ও আজ কোথায়! সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওকে। আর তখনই এই পৃথিবী তাকে বাধা দিয়েছে। গলা টিপে শেষ করেছে তার ইচ্ছে-কে। আর, এক ইচ্ছে-কে শেষ করতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে ওদের দ্বিতীয় ইচ্ছে–যে ইচ্ছে ওদের মনের মাঝে ছিল। ওরা যখন তার সব ইচ্ছে শেষ করে দিচ্ছিল, তখন

ওদের বাধা দিতে গিয়ে রুখতে গিয়ে মাথার ভেতরে ঘটে গেছে ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ। তারপর?...তার পরের ইতিহাসে আছে সাদা ধবধবে চার দেওয়াল, দৈহিক অত্যাচার, ইলেকট্রিক শক, কালো ফ্রেমের চশমা, সাদা পোশাক, আর স্টেথোস্কোপ। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে মুক্ত খোলা আকাশ, নীরব সুন্দর চাঁদ, আর মুখর তারা।

সুদীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি সে কাটিয়ে উঠেছে। তারপর এসে পৌঁছেছে এইখানে, একশো দুশমনের মাঝখানে। এখন এই শত্রুহীন মুহূর্তে নিজেকে আর-একবার ক্লান্ত বলে মনে হল। অবসাদ যেন বরফ-ঠান্ডা আস্তরে তার মনকে জড়িয়ে রেখেছে। দু-চোখ যেন চাইছে বুজে আসতে। আ–! বড় হাঁ করে শ্বাস নিল সে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ঢিলে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দোতলায়। দোতলায় এসে অবাক হয়ে লক্ষ করল, সামনের দরজাটায় তালা দেওয়া। সুতরাং ডানদিকে এগোল সে। কী খেয়ালবশে থামল গিয়ে শেষপ্রান্তে, খাওয়ার ঘরের দরজায়। কড়ায় বাঁধা দড়িটা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। দরজা ভেজিয়ে দিল। সামনের টেবিলে রাখা জলের গেলাস দেখে তেষ্টা পেল তার। সুতরাং জল ভরতি গেলাসটা তুলে ঠোঁটে ঠেকাল–।

এবং সেই মুহূর্তে এক হৃদয়বিদারী তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল।

থামল না সেই চিৎকার। বিভিন্ন লয়ে বিভিন্ন পরদায় কাটা রেকর্ডের মতো বেজেই চলল।

একরাশ বিরক্তি আর ঘৃণা নিয়ে পিছন ফিরে ঘরের দরজার দিকে তাকাল সে। দেখল চিৎকারের উৎস।

.

অফিস-ঘরের দরজায় চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি প্রভাদেবীর। বরং ঘরের দুজন যে মৃত সেটা বুঝতেই তাঁর সময় লাগল।

হতভম্ব প্রভাদেবীর সমস্ত মন যেন জমাট বেঁধে গেল সেই মুহূর্তে। অবস্থাটা ভালো করে যাচাই করার জন্য আলো জ্বাললেন তিনি। এবারে আরও স্পষ্টভাবে

সবকিছু তার নজরে পড়ল।

সুমনা, রক্তমাখা বঁটি–যেটা এখন অচেনা লাগছে, এবং রমলার ধ্বংসাবশেষ।

পাকস্থলীর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় প্রভাদেবীর শরীরটা কেঁপে উঠল। গা গুলিয়ে উঠল। পেট চেপে ধরে উপুড় হয়ে বমি করতে লাগলেন তিনি। শরীরের প্রচণ্ড কাঁপুনি যেন কিছুতেই আর থামতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ পর জল-ভরা লাল চোখে কাঁদতে কাঁদতে অফিস-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

এবং তখনই নজরে পড়ল অচেনা চটিজোড়া।

সুতরাং এবারে কৌতূহল হয়ে উঠল প্রবল। প্রভাদেবী আবার ফিরে চললেন। দোতলায়।

প্রথমে দেখতে চাইলেন সুশান্তর শোওয়ার ঘর। বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে সুশান্তর শোওয়ার ঘরে যেতে হয়। দেখলেন, সেই দরজায় তালা। তা হলে কি সুশান্ত বাড়িতে নেই? কিন্তু না, এই তো ওর চটি, জুতো–দু-জোড়াই এখানে রয়েছে।

দোতলায় উঠেই সামনের অংশটুকু জুতো রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার হয়। সেখানে শুধু সুশান্ত মল্লিক কেন, বাড়ির সকলের চটি এবং জুতোই রয়েছে।

আচ্ছন্ন প্রভাদেবী এগিয়ে চললেন খাওয়ার ঘরের দরজার দিকে। কারণ, একমাত্র ওটার দরজাই বাইরে থেকে ভোলা। সাধারণত আমিষাশীদের খাওয়ার ঘরে তিনি কখনওই পা দেন না, কিন্তু এই সংকট-মুহূর্তে সব নিয়মই ভাঙা যায়।

ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত ঠাকুরের নাম বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন প্রভাদেবী। তারপর হাতের চাপে খুলে ফেললেন খাওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা।

সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ তার বোধগম্য হল। বুঝলেন, তাঁর সামনে দাঁড়ানো এই একজনের উপস্থিতির ফলে, তার সমস্ত আত্মীয় এখন অনুপস্থিত।

মরতে ভয় পান না প্রভাদেবী। কিন্তু তবুও কেন জানি না তার গলা চিরে বেরিয়ে এল এক অদ্ভুত চিৎকার। থামল না–বিভিন্ন লয়ে, বিভিন্ন পরদায় বেজেই চলল–

আর সেই মুহূর্তেই তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল কালো পোশাক পরা লোকটা…।

.

যে তার ঘৃণাভরা চোখে, তেষ্টাভরা বুক নিয়ে, তাকাল তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বিধবা মেয়েছেলেটার দিকে। হঠাৎই জমাট আক্রোশ ফেটে পড়ল তার দু-চোখে। জলের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছ থেকে নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। কালো হাতায় ঢাকা দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দরজা লক্ষ্য করে তিরবেগে ছুটল। বিধবা বুড়িটার চিৎকার তখনও তার কানে দামামা বাজিয়ে চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে গেল, শূন্যে উঠল সাদা থান পরা শরীরটা। কালো দুটো হাতের এক ঝটকায় বারান্দার রেলিঙের আওতা ছাড়িয়ে একেবারে যেন উড়ে গেল বাইরে বাড়ির বাইরে। তার অন্তিম আর্তনাদটুকুর সাক্ষী রইল বাইরের ঘন নীল আকাশ, সোনালি রোদ্দুর, আর ধূসর প্রান্তর।

হতভম্বের মতো কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। বারকয়েক আক্ষেপে মাথা নাড়ল। তারপর পা বাড়াল বসবার ঘরের দিকে।

তালাবন্ধ দরজায় পৌঁছে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে চলল অফিস-ঘরের দিকে।

সেখানে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত মহিলার শরীর হাতড়ে চাবিটা একসময় পেল সে। সুতরাং আবার উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

তালা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে সোফায় কিছুক্ষণ সে বসল। নতুন করে ক্লান্তি অনুভব করল। তাই সোফায় গা এগিয়ে দিল।

ঘুমে যখন তার চোখ দুটো বুজে এসেছে তখন বসবার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে তিনটের সঙ্কেত বাজল, ঢং-ঢং-ঢং…।

এবার আমরা সেই অনুপস্থিত, এ পর্যন্ত অপাংক্তেয়, মানুষটির প্রসঙ্গে আসব। বয়েস তার তেরো। ক্লাস এইটের মেধাবী ছাত্র। বাড়ির ছনম্বর বাসিন্দা। সুশান্ত

মল্লিকের একমাত্র ছেলে সুকান্ত মল্লিক। রোজকার মতো স্কুলেই গিয়েছিল ও। ফিরছে এখন, পাঁচটার সময়। শীতের বেলা, তাই আঁধার নেমে এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে রোজকার মতো দুলকি চালে মেঠো পথ ধরে হেঁটে বাড়ির দিকে আসছে। ও ওই দেখুন, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপছে ছেলেটা, হা, রোজকার মতো। কিন্তু ও জানে না, রোজকার মতো নয় এমন কিছু একটা জিনিস এখন ওদের বাড়িতে রয়েছে।

সময়ের ঘড়িতে এখন পাঁচটা। স্কুলের ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে দশ-পনেরো মিনিটের পায়ে-হাঁটা পথ পেরিয়ে আসতে কিছুক্ষণ সময় লাগে বইকি!

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে পরপর দুবার অবাক হল সুকান্ত, এবং একবার আশ্বস্ত হল। প্রথম অবাক : দোতলার বাবার ঘরের আলো, যা রোজই জ্বলে, আজ জ্বলছে না।

দ্বিতীয় অবাকঃ বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, অন্যদিন যা ভেজানো থাকে। এ ছাড়া দরজার মাথায় বসানো আলোটা আজ নেভাননা রয়েছে সুতরাং ব্যতিক্রম।

আশ্বস্ত হওয়ার কারণ, রোজকার মতো একতলায় অফিস-ঘরের আলো জ্বলছে।

কলিংবেলে আঙুলের চাপ দিল সুকান্ত। পরিচিত বাজার এর কড়কড় শব্দ জোরালোভাবেই ওর কানে এল। কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বেল বাজাল ও। কিন্তু কেউই কলিংবেলের ডাকে সাড়া দিল না।

ভয় পেল সুকান্ত। দু-হাতে পাগলের মতো পিটতে শুরু করল সদর দরজা। কিন্তু কোনও ফল হল না।

তখন ও চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল, মামা! দিদি দিদি!

উত্তর নেই। তা হলে কি বাড়িতে কেউ নেই? উঁহু, তা সম্ভব নয়। কারণ, সদর দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। সুতরাং দ্বিতীয় পথের সন্ধানে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল সুকান্ত। ফুলবাগানের নরম

মাটিতে পা ফেলে এক জায়গায় এসে থামল। কাধ থেকে নামিয়ে রাখল বইয়ের ঝোলানো ব্যাগটা। তারপর বহুবছরের অভ্যাসে পাঁচিলের গায়ে পা দিয়ে বেয়ে উঠতে চেষ্টা করল। এই পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতরে আগেও অনেকবার ঢুকেছে ও। এখন এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ ওর কাছে ভোলা নেই।

পাঁচিল ডিঙিয়ে একলাফে ভেতরের ছোট্ট উঠোনে পড়ল। জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার। শুধু সামনে অফিস-ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে একটুকরো আলোর রেশ।

সেদিকে না গিয়ে প্রথমে সদর দরজার দিকে এগোল সুকান্ত। উদ্দেশ্য দরজার ছিটকিনি খোলা।

কিন্তু ওর ইচ্ছেয় বাদ সাধল অবিনাশের মৃতদেহ। অবিনাশের দেহের ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে কিছু নজরে আসে না। তাই হাতড়ে হাতড়ে দেওয়ালের গায়ে বসানো আলোর সুইচ টিপল।

আলো জ্বালতেই গোটা দৃশ্যের বীভৎসতা ওর মুখে-চোখে আছড়ে পড়ল। ঘাড় মুচড়ে পড়ে আছে অবিনাশ। কালচে রক্তের ছোপ সর্বাঙ্গে, মেঝেতে, এমনকী সাদা দেওয়ালের গায়েও ছিটেফোঁটা নজরে পড়ছে।

অস্ফুট এক শব্দ করে ডুকরে কেঁদে উঠল সুকান্ত। ওর ছোট্ট বুকটা নিঃশব্দে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ও হাঁটতে শুরু করল অফিস-ঘরের দিকে। ও যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু ভেতরের প্রচণ্ড আবেগে ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অফিস-ঘরে পৌঁছে ভেজানো দরজায় হাতের চাপ দিল। ধীরে-ধীরে খুলে গেল নরকের দরজা।

পরের পাঁচমিনিট ও পাথর হয়ে গেল। আর সেই অবস্থাতেই তাকিয়ে দেখল সবকিছু।

সে-দৃশ্যের অভিঘাত বুঝি বৃদ্ধ, যুবক, শিশু বিচার করে না। সুতরাং নির্বাক, স্তম্ভিত সুকান্ত টলোমলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

মা-কে এবং দিদিকে ও পরনের শাড়ি দেখেই চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে ফল কাটার বঁটিটাও। তবে অন্যমনস্ক থাকায় সিঁড়ির গোড়ায় রাখা চটিজোড়া ওর নজরে পড়ল না।

দোতলায় পৌঁছে শুধুমাত্র বসবার ঘরেই যে আলো জ্বলছে সেটা ওর চোখে পড়ল। এবং পুরোপুরি অবাক হয়ে ওঠার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল ডান প্রান্তে খাওয়ার ঘরের আলোটা।

সুকান্ত প্রথমে উঁকি মারল বসবার ঘরে। কেউ নেই।

চাপা স্বরে ডেকে উঠল, বাবা– বাবা!

উত্তর নেই।

তখন স্কুলের জামা-জুতো পরেই ও এগিয়ে চলল খাওয়ার ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকেই দেখল, কালো পোশাক পরা একজন অপরিচিত লোক ওর দিকে পিছন ফিরে বসে কী যেন খাচ্ছে। গলার স্বর ভারিক্কি করে ও বলে উঠল, তুমি কে?

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল লোকটা। বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ঠেলে ঘুরে দাঁড়াল।

তুমি এখানে কী করছ? আমার মা-কে, দিদিকে, অবিনাশদাকে মারল কে? তুমি?

অত্যন্ত সরল প্রশ্ন। এবং তার উত্তর ঠিক ততটাই জটিল ঠেকল লোকটার কাছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হাসল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিল ইস্পাতের ছুরিটা।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির নিয়ম অনুযায়ী এই মুহূর্তে সুকান্তর আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে ঠিক বিপরীতটাই ঘটল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বসবার ঘর লক্ষ্য করে তিরবেগে ছুটতে শুরু করল ও।

একলাথিতে চেয়ারটা মেঝেতে ছিটকে ফেলে লোকটা ওকে তাড়া করল। অনেকক্ষণ বাদে তার মুখে-চোখে জিঘাংসার পুরোনো রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

অন্ধকার বারান্দার দৈর্ঘ্য পেরিয়ে দড়াম করে বসবার ঘরের আধ-ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুকান্ত। চকিতে দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার ওপাশে লোকটার শরীর এসে আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। গোটা বাড়িটা যেন সন্ত্রস্তভাবে কেঁপে উঠল।

পরের কয়েক সেকেন্ডে সুকান্ত ওর ভাবনা-চিন্তার কাজ শেষ করল। ও জানে, এই নির্জন লোকালয়ে, এই শীতের সন্ধ্যায়, সাহায্য আশা করা উদ্ভট কল্পনা। সুতরাং ওর এখন দরকার একটা নিখুঁত লুকোনোর জায়গা, কারণ, দরজার ওপিঠে রাগী চিতাবাঘের মতো প্রচণ্ড শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলেছে লোকটা। কাঠের খিল কতক্ষণ এ-অত্যাচার সইতে পারবে কে জানে!

কী ভেবে বসবার ঘরে ছেড়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল সুকান্ত।

ঘর অন্ধকার।

কিন্তু বহুবছরের চেনা ম্যাপে অন্ধকার কোনও বাধা নয়। তা ছাড়া এখন আলো জ্বালারও সময় নেই। দরজা পেটানোর দুদ্দাড় শব্দ কামানের বিস্ফোরণের মতো কানে এসে ঠেকছে। সুতরাং তড়িৎগতিতে ডানদিকের দেওয়ালে গাঁথা তাকের কাছে গেল সুকান্ত। তাকে রাখা টর্চলাইটের ধাতব শরীর অন্ধকারেও ঝিলিক মারছিল। সেটা হাতে করে বসবার ঘরে ফিরে এল ও। রেফ্রিজারেটরের মাথায় কয়েকটা চুলের কাটা ছিল–এখানে মা-দিদি যে এগুলো রাখে তা ওর বহুদিনের জানা। সেখান থেকে একটা কাটা নিয়ে সুইচবোর্ডের প্লাগ পয়েন্টে দুটো মাথা গুঁজে দিল। তারপর প্লাগ পয়েন্টের সুইন অন করে দিল।

একটা চাপা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে গোটা বাড়িটার সমস্ত আলো নিভে গেল। আর সুকান্তের হাতে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ও জানে কীভাবে বাড়ির সমস্ত আলো ফিউজ করতে হয়। আগেও একদিন করেছিল।

এবার ও ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে। আলমারির পাশে রাখা কাঠের মইটা বেয়ে ওপরে উঠল। কাঠের সিলিংয়ের চৌকো অংশটায় জোর চাপ দিতেই ডালাটা ভেতরে

ঢুকে গেল, আর ওপরের কুঠরি-ঘরে ঢুকে পড়ল সুকান্ত।

এই ছোট্ট কাঠের কার-এ ওদের চাল-গম-সরষের বস্তা থাকে। থাকে মুড়ি-চিঁড়ের সঞ্চয়। সুতরাং ইঁদুর-আরশোলার উপদ্রবও আছে। জ্বলন্ত টর্চটাকে একপাশে নামিয়ে রেখে, ছোট্ট দুহাতে মইটাকে টেনে ওপরে তুলতে লাগল ওযাতে আর কেউ এই মই বেয়ে ওপরে উঠতে না পারে।

অতি কষ্টে, একরাশ ধুলো মেখে, মিনিটপাঁচেক পর ও সফল হল। মইটা অদ্ভুতভাবে কিছুটা ভেতরে কিছুটা বাইরে অবস্থায় আটকে রইল।

সুকান্তের সামনে-পিছনে ধুলোমাখা বস্তা আর থলে। টর্চের আলোর চোখে পড়ছে হলুদ আর শুকনো লঙ্কার ঠোঙা। এবং ওর সাধের হামানদিস্তে। প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পুজোর সময় সে হামানদিস্তে দিয়ে কাচ গুঁড়ো করে সুতোয় মাঞ্জা দেয়।

নিজের শরীরটাকে যতটা সম্ভব ভেতরে ঢুকিয়ে ও চুপটি করে বসল। নিভিয়ে দিল টর্চের আলো।

চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যেতেই দরজা ধাক্কানোর শব্দটা বিকটভাবে কানে এসে বাজল। সুকান্ত শুনল, প্রতিবাদে-প্রতিবাদে ক্লান্ত কাঠের খিলের ক্ষীণ মচমচ শব্দ। ও বুঝল, বসবার ঘরের দরজা ভাঙতে আর দেরি নেই। কিন্তু বাবা, পিসিমণি–ওরা কি এ-শব্দ শুনতে পাচ্ছে না? শুনতে যদি পেয়ে থাকে তা হলে ছুটে আসছে না কেন?..তা হলে কি ওদের অবস্থাও মা-দিদি অবিনাশদার মতো?

হঠাৎ সুকান্তর মনে পড়ল, টর্চটা নিতে শোওয়ার ঘরে ঢুকবার সময় একটা বিশ্রী আঁশটে দুর্গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মেরেছিল। ও ফিশফিশ করে ডেকে উঠল, বাবা বাবা।

.

এক সময়, এক চূড়ান্ত মুহূর্তে, ভেঙে পড়ল শেষ প্রতিরোধ, বসবার ঘরের দরজা।

লাথি মেরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্লাটা মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

সামনে অন্ধকার, পিছনেও অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠছে তার হাতের ইস্পাতের ছুরিটা। অন্ধকারে তার কালো পোশাক মিশে গেছে।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড সে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে চেষ্টা করল কারও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। তারপর ধীর পায়ে এগোল শোওয়ার ঘরের দিকে।

এখানেও যথারীতি অন্ধকার। নজর চলে না। সুতরাং পকেট হাতড়ে একটা সস্তার লাইটার বের করল সে। চাবি টিপতেই একটা নীলচে আলোর শিখা লাফিয়ে উঠল। ডানহাতে লাইটার উঁচিয়ে ধরল সে। ক্ষীণ আলোর বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা মৃতদেহটা আবছাভাবে চোখে পড়ল। নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখল সে। না, কেউই সেখানে লুকিয়ে নেই। এবং তার পরই শুরু হল তার তন্নতন্ন অনুসন্ধান পর্ব।

শোওয়ার ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজে দেখার পর সে ফিরে এল বসবার ঘরে। ইস্পাতের ছুরিটা পকেটে রেখে শোওয়ার ঘর এবং বসবার ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ করল। বসবার ঘর থেকে এক গাছা দড়ি বের করে শক্ত হাতে বাঁধল দরজায় কড়া দুটো। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল আবার। কী এক অজানা প্রতিজ্ঞায় তার চোয়াল আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। এবার ছুরিটা বের করে বাঁ-হাতে উঁচিয়ে ধরল সে।

শোওয়ার ঘর শেষ করে এবার বসবার ঘরের পালা।

প্রথমে সোফাসেটগুলোকে টেনে এনে ভাঙা দরজার মুখে স্তূপাকারে রাখল সে। উদ্দেশ্য জলের মতোই সরল : যাতে কেউ আচমকা দরজা ডিঙিয়ে পালাতে না পারে।

বসবার ঘরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে নিশ্চিত হল, বাচ্চাটা ভঁড়ার ঘরে ঢুকেছে।

বুকভরা ভারী শ্বাস নিয়ে জ্বলন্ত লাইটার হাতে ভঁড়ার ঘরে ঢুকল সে। ডানদিকে বাঁ-দিকে তাকাল। তাকাতেই ওই ছোট ঘরটায় যে-বিশাল পরিবর্তনটা তার নজরে পড়ল তা হল সবুজ কাঠের মইটা। ওটার ওপরের দিকটা ঢুকে গেছে কুঠরি-ঘরের ভেতরে। আর বাকি অংশটা বেরিয়ে আছে। বাইরে। নির্ঘাত কুঠরি-ঘরে ঢুকেছে ছেলেটা। ছুরি উঁচিয়ে ওপরে তাকাতেই একইসঙ্গে মইয়ের শেষটুকু আর বাচ্চাটার

জ্বলন্ত চোখে তার চোখ পড়ল। একমুহূর্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির হয়ে রইল। তারপর…।

.

সুকান্ত চারপাশের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিল। শুধুমাত্র শব্দ শুনেই পাশের ঘরের কাজকর্মের হদিস পাচ্ছিল ও। অবশেষে, যখন লাইটারের আলোটা ভঁড়ার ঘরের দরজায় এসে থামল, তখন ও ভয় পেল। শরীরটাকে আরও ভিতরে গুটিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর কৌতূহলে নীচের দিকে একবার উঁকি মারল।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই কালো জামা পরা লোকটার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ত্রাসে পিছিয়ে আসার আগেই ও শুনতে পেল এক অদ্ভুত জান্তব চিৎকার। সে-চিৎকারে ফেটে পড়ল জয়ের উল্লাস। পরমুহূর্তেই নীচের কালো চেহারাটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল। ইস্পাতের বিদ্যুৎ খেলে গেল সুকান্তর চোখের সামনে। ঝটিতি মুখ সরিয়ে নিল ও। লোকটার ছুরির ফলা হাওয়ায় শিস কেটে ফিরে গেল নীচে।

এবার অবাক হয়ে সুকান্ত লক্ষ করল, লোকটা ছুরিটার গায়ে চাপ দিয়ে ভাঁজ করে ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে। তারপর খানিকটা বেরিয়ে থাকা মইটা লক্ষ্য করে আচমকা লাফ দিল সে। ভয়ে চমকে পেছোতে যেতেই হামানদিস্তের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুকান্ত। অন্ধকারে অনুভব করল ভিজের ডগায় নোনতা স্বাদ। একটা ঘড়ঘড় শব্দ করে ওর গায়ে গা ঘষে কাঠের মইটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই শব্দে সুকান্তর সংঘর্ষের শব্দটা চাপা পড়ে গেল।

একমিনিট…দু-মিনিট…।

সুকান্ত বুঝল, দেওয়ালের গায়ে মই লাগিয়ে, নিজেকে তৈরি করে, ওপরে উঠতে শুরু করেছে লোকটা। একটু পরেই চৌকো কাঠের ফোকরের ভেতরে জেগে উঠল কালো মাথাটা। জুলজুলে চোখজোড়া নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লোকটা জ্বলন্ত লাইটার ধরা হাতটা ওপরে তুলে ধরতে গেল। আর সেইমুহূর্তেই এক অমানুষিক শক্তি সুকান্তর শরীরে ভর করল। হামানদিস্তের মোটা লোহার

রডটা দিয়ে দু-হাতে সর্বশক্তি দিয়ে ও লোকটার মাথায় আঘাত করল। একবার, দুবার…।

ধীরে-ধীরে মইয়ের গা থেকে ঢলে পড়তে লাগল লোকটা। মইটা কাত হয়ে গিয়ে ঠেকল দেওয়ালের কোণে, আর লোকটার শরীর শানবাঁধানো মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল। জ্বলন্ত লাইটারটা নিভে গিয়ে কোথায় যেন ঠিকরে পড়ল।

কুঠরি-ঘরের ফোকর দিয়ে টর্চের আলোর সুকান্ত দেখল, ঠিক নীচেই শ্লথ ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে লোকটা।

টর্চটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় পাশে নামিয়ে রেখে দু-হাতে গোটা হামানদিস্তেটা তুলে ধরল ও। তারপর, গুলি খেলায় যেরকম নাঙ্খু করে, সেরকম ভঙ্গিতে লোকটার মাথা লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল হামানদিস্তেটা।

লোকটার মাথার সঙ্গে পাঁচ কেজি ওজনের লোহার সংঘর্ষের শব্দটা তেমন জোরদার হল না। ফট করে একটা শব্দ হল শুধু।

জ্বলন্ত টর্চটা হাতে নিয়ে একটা পা আলমারির গায়ে দিয়ে, অন্য পা-টা হেলে যাওয়া মইয়ের গায়ে রেখে অতি কষ্টে মেঝেতে নেমে এল সুকান্ত। টর্চের আলোয় দেখল, লোকটার কালো পোশাকের সঙ্গে রক্তাক্ত মুখটা নিতান্তই বেমানান লাগছে। আর হামানদিস্তের দুটো অংশ পড়ে রয়েছে দু পাশে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সুকান্ত লোকটার শরীর ডিঙিয়ে হামানদিস্তের রডটা তুলে নিল। তারপর কী ভেবে নিভিয়ে দিল টর্চটা। এবং লোকটার মাথা আন্দাজ করে রড দিয়ে পাগলের মতো আঘাত করে চলল–একবার, দুবার…।

জ্ঞানশূন্য মিনিট পাঁচেকের পর থামল সুকান্ত। রডটা নামিয়ে রেখে টর্চটা জ্বালল। তারপর জ্বলন্ত টর্চটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে লোকটার পা দুটো দু-হাতে চেপে ধরল। অনেক কসরৎ করে পা দুটোকে টেনে নিয়ে এল ভঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে। আর শরীরের সমস্ত ক্ষমতা একজোট করে লোকটাকে টেনে নিয়ে এল বসবার ঘরে। সেখানে তাকে শুইয়ে রেখে ও আবার ভাড়ার ঘরে ঢুকল। পড়ে থাকা টর্চের আলোয় দেখতে পেল লাইটারটা। লাইটার আর টর্চটা তুলে নিয়ে ফিরে এল বসবার ঘরে। লাইটারটা পকেটে রেখে শোওয়ার ঘরের দরজায় বাঁধা রেশমি দড়িটা খুলতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিরাশ হয়ে ও

লোকটার শুয়ে থাকা শরীরের পকেট হাতড়ে ছুরিটা বের করল। চাবি টিপতেই ফাটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এরপর শোওয়ার ঘরের দরজা খোলা কয়েক সেকেন্ডের কাজ। সুতরাং…।

বাবার শরীর এবং মাথাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করেও বিচলিত হল না সুকান্ত। কারণ, ইতিমধ্যেই ও সবরকম ভাব এবং আবেগ নিঃশেষে খরচ করে বসে আছে। শুধু শ্লথ পায়ে ও ফিরে এল বসবার ঘরে। আধঘণ্টার চেষ্টায় অনেক টানাটানি করে ও সরিয়ে ফেলল সোফাসেটগুলো। তারপর ভাঙা দরজা পেরিয়ে টর্চ জ্বেলে রওনা হল তিনতলার দিকে। এখন ও খুঁজতে চলেছে পিসিকে।

তিনতলা, দোতলা, একতলায় খোঁজ করেও পিসিকে পেল না ও। তাই ফিরে এল বসবার ঘরে। কালো-পোশাকি লোকটার গায়ে টর্চের আলো ফেলে কী চিন্তা করল। তার পর ফিরে চলল খাওয়ার ঘরের দিকে।

বারান্দার বাঁ-কোণে খাওয়ার ঘরের দরজার ঠিক মুখেই থাকে কেরোসিন তেলের টিনটা। সেটাকে একহাতে নিয়ে অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে বসবার ঘরে ফিরে এল। টর্চটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় একটা সোফার ওপরে রেখে কেরোসিন তেলের টিনটা লোকটার গায়ে উপুড় করে দিল।

একটু পরে খালি টিনটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলল। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালল। আগুন ধরিয়ে দিল কালো পোশাকে। তারপর লাইটার ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল বসবার ঘর থেকে। আগুনের শিখা তখন লোকটার শরীরটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে।

অন্ধকারেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সুকান্ত।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে অন্ধকার অফিস-ঘরের সামনে একমুহূর্ত দাঁড়াল ও। তারপর এগিয়ে চলল সদর দরজায় দিকে। অন্ধকার থাকলেও এবারে অবিনাশের মৃতদেহে হোঁচট খেল না ও। পা যথাসম্ভব উঁচু করে দরজায় ছিটকিনিটা খুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

তারপর মেঠো পথ ধরে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে শুরু করল।

# দধীচি সংবাদ (নভেলেট)

**দধীচি সংবাদ (নভেলেট)**

আমার হাতে ধরা কিম্ভুতকিমাকার বস্তুটার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিম্ভুতকিমাকার লোকটা। গলার কণ্ঠাকে অতিকষ্টে কয়েকবার ওঠানামা করিয়ে প্রশ্ন করল, ওটা কী?

ঘূর্ণিকা। শান্ত স্বরে জবাব দিলাম।

ঘূ-ঘূ-উ-উর্ণিকা? হতভম্ভ সুরে সে বলে উঠল। তার কপালের কাটা দাগটা বারকয়েক কেঁপে উঠল।

বললাম, বিলিতি ভাষায় যাকে বলে রিভলভার–।

ও– সে যেন এবার আশ্বস্ত হল? আমি ভেবেছিলাম কী না কী।

এবার অবাক হলাম আমি। বাংলা শব্দে ভয় পেয়ে তার ইংরেজি অনুবাদে আশ্বস্ত হয় এরকম লোক আমি অন্তত প্রথম দেখলাম। আমার রিভলভারটা সাধারণত কাপড়ের সরু প্যাড দিয়ে সর্বদা জড়ানো থাকে। তাতে শব্দও কম হয়, এবং আঙুলের ছাপটাপের বালাই থাকে না। সেইজন্যেই হয়তো লোকটা মালটাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। এখন পারছে।

রিভলভারটা তাক করে ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, বলুন তো, এমন কোনও কারণ কি আপনার জানা আছে, যার জন্যে আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেই এখান থেকে চলে যাব?

আছে–আমি বাঁচতে চাই। ঢোক গিলে সে বলল।

হাসলাম : মানছি। কিন্তু আমিও যে বাঁচতে চাই–পুলিশের হাত থেকে। সুতরাং, আমার জন্যে আপনাকে প্রাণ দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। জানেন, দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে দধীচি মুনিও।

আ-আমার নামও দধীচি তালুকদার! ভয়েভয়ে তড়িঘড়ি বলে উঠল লোকটা।

শুনে বড়ই প্রীত হলাম। কারণ, দধীচির তনুত্যাগ কবিতাটাও আমারই লেখা। আমার নাম কবি শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুলি করলাম।

তারপর ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলাম টাকার থলেটা।

.

বাইরে আসতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে ছায়ার মতো বেরিয়ে এল ওরা চারজন। অবনী, নয়ন, পরাশর এবং রোশনলাল। আমি রিভলভার পকেটস্থ করে টাকার থলেটাকে হাতস্থ করে দোকানের দরজা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের প্রতীক্ষায় রইলাম। ওরা সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে আমার কাছে এগিয়ে এল। চাপা গলায় প্রশ্ন করল রোশন, হেমদা, (আমার নাম সত্যিই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন) কোনও গোলমাল হয়নি তো?

না। গাড়ি কোথায়?

পাশের গলিতে।

চলো। বলে আমি পা চালালাম। আমাকে অনুসরণ করল ওরা চারজন। যেতে-যেতে আড়চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, নয়ন আর পরাশর একটু যেন বিহ্বল দৃষ্টিতেই তালুকদার স্টোর্স দোকানটার দিকে চেয়ে আছে।

কালো অস্টিনটার কাছে পৌঁছে বহুদিনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দরজা এক হ্যাঁচকায় খুলে সিটে বসলাম। রোশন বসল গিয়ে ড্রাইভারের আসনে আমার পাশে। পেছনের সিটে গাদাগাদি করে (কারণ, অবনীর অবনী-প্রমাণ শরীর) অবনী, নয়ন আর পরাশর।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই একবার তাকালাম হাতঘড়ির দিকে। সাড়ে নটা। বলা বাহুল্য রাত সাড়ে নটা।

গ্রে স্ট্রিট ধরে কিছুটা এগোনোর পর মুখ খুলল নয়ন, হেম, আশা করি এতক্ষণে তালুকদার স্টোর্সের ভেতরের কেস জানার অধিকার আমরা পেয়েছি?

এখানে বলা প্রয়োজন নয়ন আমার চেয়ে বয়েসে বড় না হলেও ছোট নয়। আমাকে ও নাম ধরেই ডাকে। লেখাপড়া এককালে করেছিল করেছিল প্রেম এবং বিয়েও। তার পরিণতি সন্তান এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় ছোটবেলা থেকে। একই পাড়ায়-দাসপাড়ায়– আমরা মানুষ। নয়ন খারাপ লাইনে এলেও নীতিবাগীশ চরিত্রের দশ পার্সেন্ট এখনও ছাড়তে পারেনি। নিজেকে এখনও ও সমাজের স্বাভাবিক একজন মানুষ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নয়নের কথায় ঘুরে ওর দিকে তাকালাম। টাকার থলেটা ছুঁড়ে দিলাম ওর কোলে। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। অন্যান্য অবয়ব অস্পষ্ট।

বললাম, এটাই হল কেস।

তারপর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তুলে ধরে বললাম, আর এটা হল শুট কেস। মানে, গুড়ুম-গুড়ুম।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ রোশনলালের হাত কেঁপে উঠল। একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে এল পেছনের সিট থেকে।

নয়ন চুপ।

আমি মনে মনে হাসলাম।

শোভাবাজার এলাকায় আজ রাতে আমরা তিনটে কাজ করেছি। প্রথম দুটো বড় কাজ– বড় দোকানে। শেষেরটা, অর্থাৎ তালুকদার স্টোর্স-এর কাজটা, বলতে গেলে হঠাৎই ঘটে গেছে। কারণ, মদনমোহনতলার চিলড্রেন পার্কের পাশ দিয়ে আমরা যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পড়ছিলাম, তখনই আমার নজরে পড়েছে টিমটিমে আলো জ্বালা দোকানটা। গাড়ি থামাতে বলে আমি নেমে পড়েছি। ওরা চারজন তখন নীরব অসম্মতি নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। তারপর নেহাতই নিয়তির লিখনে দধীচি তালুকদারের তনুত্যাগ এবং কেস ও শুট-কেস-এর জন্ম।

এই থলেটায় মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা রয়েছে। জানলার কাছে হাত নিয়ে রাস্তার আলোর গণনা-পর্যায় শেষ করে নয়ন বলল। ভৎর্সনা আর ব্যঙ্গের ছোঁওয়া ওর গলায়।

আমার চোখ সামনের নির্জন-অন্ধকার ট্রাম রাস্তায়। জবাব দিলাম, কে যেন বলে গিয়েছেন, ক্ষুদ্র বলিয়া করিয়ো না অবহেলা–আগের দুটো আমদানির তুলনায় তালুকদারের তালুক ক্ষুদ্রই বটে–কিন্তু তা বলে–

হেমদা–! চাপা স্বরে গর্জে উঠল পরাশর। হয়তো কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিলাম : পরাশর, আর একটা কথা মুখ দিয়ে বেরোলে জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব!

সবাই আবার চুপ।

কারণ, আমাকে ওরা চেনে। ওরা জানে, কারও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টেনে ছিঁড়তে আমি বড় ভালোবাসি!

*

মুরারিপুকুরের ডেরায় পৌঁছে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল আমাদের। রাস্তার বাকি অংশটা আমরা নীরবে অতিক্রম করে এসেছি। অস্টিনটা গ্যারেজের দিকে চালিয়ে নিয়ে চলল রোশনলাল। কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটা চালাঘর–বর্তমানে গ্যারেজের ভূমিকায় অভিনয় করছে।

গাড়ি থেকে সবাই নেমে দাঁড়ালাম। রোশন গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে কাঠের দরজা টেনে দিল। তারপর আমরা একসঙ্গে এগোলাম শখানেক মিটার দূরে টলোমলো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের টিন-কাঠ দিয়ে তৈরি ডেরার দিকে। যাওয়ার পথে নীরবে টাকার থলেটা আমার হাতে তুলে দিল নয়ন। আমি একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে থলেটা নিলাম। অন্য টাকার ব্যাগ দুটো তখন অবনীর হাতে। গাড়ির পেছনের সিট থেকে ও-ই হাতে করে নিয়ে এসেছে।

জং ধরা তালায় জং ধরা চাবি লাগিয়ে একটু কসরত করতেই তালা খুলল। দরজার অবাধ্য কাচকাচ শব্দকে অগ্রাহ্য করে ভেতরে ঢুকলাম। আমাকে অনুসরণ করল অবনী, নয়ন, পরাশর আর রোশনলাল। পকেট থেকে লাইটার বের করে সশব্দে জ্বালালাম। অভ্যন্তরীণ জমাট অন্ধকার পিছু হটল। এগিয়ে

গিয়ে বাঁ-দিকের ভাঙা টেবিলে দাঁড় করানো মোমবাতিতে আগুন ধরালাম। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলাম লাইটারের আলো।

লাইটার পকেটে রেখে হাতের ইশারা করতেই অবনী এগিয়ে এল আমার কাছে। টাকার থলেটা আমার হাত থেকে বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল দরমার বেড়ায় ঢাকা দেওয়ালের ওপিঠে লুকিয়ে থাকা একটা খুপরি-ঘরের দিকে।

আমাদের আস্তানাটা নড়বড়ে হলেও আকারে ছোট নয়। বেড়া কাঠের দেওয়ালে একটা মা কালীর ফটো, একটা ক্যালেন্ডার, আর আছে সিনেমার পুষি-নায়িকাদের গোটাতিনেক চৌম্বকধর্মী ছবি– আঠা দিয়ে দেওয়ালে সাঁটা। আসবাবপত্র বলতে বাঁ-দিকে দাঁড়ানো খোঁড়া টেবিলটা। একটা কাঠের বেঞ্চ। একটা প্রাগৈতিহাসিক বেতের মোড়া। দুটো কালি পড়া হ্যারিকেন। কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ। একটা ট্রানজিস্টার–এখনও তা থেকে শব্দ-টব্দ বেরোয়। আর একটা জল ভরা কুঁজো– মুখে গেলাস চাপা দেওয়া।

এসব গেল বাইরের ঘরের কথা। এবার আসি খুপরি-ঘরের কথায়। বড় ঘরটার পেছনের অংশে একটা দরমার আড়াল দেওয়া। তার ডান পাশে এক পাল্লার একটা দরজা মতন। সেটা পেরোলেই একটা ছোট ঘর। সেখানে দুটো তক্তপোশে দুটো তেলচিটে বিছানা। একপাশে কাঠের শেফে গোটাকয়েক মালের বোতল, অ্যাসিডের বোতলও রয়েছে দুটো–মাঝে-সাঝে তালা-টালা ভাঙতে-টাঙতে কাজে-টাজে লাগে। তক্তপোশের নীচে আছে একটা পুরোনো জং ধরা ট্রাঙ্ক। তাতে কিছু যন্ত্রপাতি এবং হড়কানো অর্থ-সম্পত্তি রাখা হয়। এখন অবনী ঢুকেছে পেছনের সেই খুপরি ঘরে। টাকার থলে তিনটে রাখতে।

ফেরার সময় নিজের বুদ্ধিতেই মালের দুটো বোতল নিয়ে এল অবনী। সঙ্গে দুটো চিঁড়েভাজার প্যাকেট কখন কিনেছে কে জানে। ততক্ষণে ভাঙা টেবিলের ভাঙা মোমবাতির আলোর আমরা মোড়া, বেঞ্চ ইত্যাদি দখল করে বসেছি। অবনী এসে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতেই। বোতল দুটো বাড়িয়ে ধরল যথাক্রমে আমার এবং রোশনলালের দিকে। নয়ন নেশায় অভ্যস্ত নয়। ওর নীতিবাগীশ ক্যারেকটারের দশ পাসেন্টের এক পার্সেন্টের উদাহরণ।

কিছুক্ষণ গলা ভেজানোর পর টলোমলো পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অবনী। একটু জড়ানো এবং রূঢ় স্বরে বলল, হেমদা, তালুকদার স্টোর্সের লোকটাকে খুন করে তুমি ভালো করোনি।

পরাশর মৃদু স্বরে বলল, একটা মানুষের জীবনের দাম মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা?

লোকটাকে জানে মেরে ফেলার খুব একটা জরুরত ছিল কি? রোশনলালের দ্বিধাগ্রস্ত মনের প্রশ্ন ভেসে এল।

আমি এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পেছনের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললাম, নয়ন, এদের অমৃতবাণীগুলো টুকে নিয়ে কাগজে ছেপে দিস।

নয়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বাড়ি চললাম। কাল দেখা হবে।

তক্তপোশে শরীর এলিয়ে দিয়ে তখনও শুনতে পাচ্ছি ওরা তিনজন জড়ানো গলায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছে। শোনা যাচ্ছে প্রায়-খালি বোতলের ঠুং-ঠাং শব্দ।

অন্ধকারে জেগে রইলাম। একটা কথা স্পষ্ট বুঝলাম, আজকের খুনটাকে ওরা চারজন সহজ মনে নিতে পারছে না। তা হলে কি আমার সাবধান হওয়া উচিত? কিন্তু রিভলভার একমাত্র আমি ছাড়া আর কারও কাছে নেই। অবশ্য একটা জোগাড় করাও তেমন কঠিন কিছু নয়। মনে হয়, এই দধীচি তালুকদার মারা গিয়ে আমার চার বন্ধুকে আজ শত্রু করে দিয়ে গেছে।

অবশেষে বুঝলাম, আমি–হেম বাঁড়ুয্যে–ভয় পেয়েছি।

.

প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটল পরদিন সকালেই।

আমার মানসিক অঙ্কে এত অল্প সময়ের তফাতে এটা আশা করিনি।

সকালে ঘুম ভাঙতেই গত রাতের দধীচি তালুকদার এবং পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা আমার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করেছে। সুতরাং সেই আড়ষ্ট আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাতে বিছানায় উঠে বসে হাত বাড়িয়েছি শেফের দিকে। আধখালি একটা বাংলার বোতল টেনে নিয়েছি। আলগা করে গলায় ঢালতে যাব, নজরে পড়ল খুপরি ঘরের দরজা ঠেলে কেউ ঢুকছে।

স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হল। চোখের কোণ দিয়ে দরজার ওপর নজর রেখে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিয়েছি, চমকে উঠলাম রোশনলালের স্বরে–।

ওস্তাদ!

এবং বিপর্যয়টা তখনই ঘটল, আর সেইসঙ্গে বাঁচাল আমার প্রাণ।

কারণ ততক্ষণে বোতলের তরল, আমার চমকানোর সুযোগে, চলকে পড়েছে আমার বুকে, গলায়, গায়ে। আর তক্ষুনি অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, বোতলের যে-তরল আমি গলায় ঢালতে যাচ্ছিলাম, সেটা মদ নয়, ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড।

বেশ মনে আছে, এক বীভৎস চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে বিছানায় আমি লুটিয়ে পড়েছি, আর মুণ্ডহীন ধড়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে আমার অ্যাসিডে জ্বলে যাওয়া শরীর। রোশনকে যেন এগিয়ে আসতে দেখেছিলাম বিছানায় কাছে..তারপর আর কিছু মনে নেই…।

সজ্ঞান যখন হলাম তখনও আমি বিছানায় শুয়ে। বুকে-গলায় অপটু হাতের পটি– রোশনলালের প্রাথমিক চিকিৎসার স্বাক্ষর। চেতনা ফিরতেই শোয়া অবস্থা থেকে এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসলাম। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা গ্রাহ্য করলাম না। বাঁ-হাতে বালিশের নীচ থেকে প্যাড জড়ানো রিভলভারটা বের করে নিলাম। টলোমলো পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোশনলালের চোখে ভয়ের ছায়া কেঁপে উঠল।

আমি অমায়িক স্বরে প্রশ্ন করলাম, রোশন, তুমি আমার ঘরে কেন ঢুকেছ?

এতক্ষণ যেটা খেয়াল করিনি, এবার সেই খবরের কাগজটাই আমার চোখের সামনে তুলে ধরল রোশন। তিননম্বর পৃষ্ঠার এক কোণে দধীচি তালুকদারের অপমৃত্যু-সংবাদ। ও বলল, এই খবরটাই তোমাকে দেখাতে আসছিলাম।

মৃদুস্বরে বললাম, ওরা দেখেছে?

হ্যাঁ, দেখেছে।

লম্বা পা ফেলে দরমার দরজা সরিয়ে বাইরের ঘরে এলাম।

অবনী আর পরাশর ভাড়ে চা আনিয়ে খাচ্ছিল। আচমকা আমাকে মারমুখী ঢঙে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। রোশনলাল চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে লক্ষ করে বললাম, রোশন, কী হয়েছে ওদের খুলে বলো।

ওরা জানে। তোমার চিৎকার শুনে ওরা ঘরে গিয়েছিল। মৃদুস্বরে রোশন উত্তর দিল।

আমি একপলক তাকালাম আমার গায়ে লাগানো কাপড়ের পটির দিকে। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইলাম, মালের বোতল আর অ্যাসিডের বোতলের জায়গা পালটির কাজটা কে করেছে?

ওরা চুপ।

চকিতে অবনীর দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার রিভলভার ধরা বাঁ-হাতের উলটোপিঠ আছড়ে পড়ল ওর ফোলা-ফোলা গালে। ওর মুখটা অবাধ্যভাবে ডানপাশে কয়েক ডিগ্রি ঘুরে স্থির হয়ে রইল। ফরসা গাল ফেটে বেরিয়ে এল রক্তের রেখা। অবনীর দৃষ্টি নিষ্পলক।

কে করেছে, অবনী?

আমি নয়। বিড়বিড় করে ও জবাব দিল।

পরাশর? ঘুরে তাকালাম পরাশরের দিকে।

আমি জানি না।

আমি হাসলাম। রোশন, অবনী, পরাশর মেঝের দিকে তাকিয়ে। হাসতে-হাসতেই বললাম, অতএব তোমরা যখন মিথ্যে কথা বলছ না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, আজ সকালে হঠাৎ মাথাখারাপ হয়ে গিয়ে আমি দশবছরের পুরোনো কালীমার্কার নেশা ছেড়ে নাইট্রিক অ্যাসিডের নেশা শুরু করতে গেছি–আর তাতেই এই কেলো…।

আমি জোরে হেসে উঠলাম।

ওদের তিনজনের শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। ওরা ভয়ের চোখে আমার দিতে তাকাল। কারণ, আমার হাসির শব্দ ছাপিয়ে রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খোলার শব্দ ওদের কানে গেছে।

সাজানো দুর্ঘটনা আমি একেবারে পছন্দ করি না। কারণ সাজানো দুর্ঘটনা কাপুরুষের হাতিয়ার। আর, পুরুষের অবলম্বন…।

রিভলভারটা তুলে ধরতেই সদর দরজা সশব্দে খুলে গেল। বিস্মিত নয়নের প্রবেশ এবং প্রশ্ন, কী ব্যাপার, হেম, কী হচ্ছে এসব?

হঠাৎ আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। ক্ষিপ্র চিন্তায় সিদ্ধান্তে পৌঁছে রিভলভার নামিয়ে নিলাম। বললাম, নয়ন, জল ঢেলে পা ধুয়ে আয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোর মেহেরবানি কবুল করে এই তিনটে কুত্তা অন্তত কিছুক্ষণ তোর পা চাটুক।

আর দাঁড়ালাম না। স্থবির হয়ে দাঁড়ানো রোশনের হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে ঢুকে পড়লাম খুপরি ঘরে।

আসন্ন দ্বিতীয় দুর্ঘটনার জন্যে মনকে ধীরে-ধীরে তৈরি করতে লাগলাম।

.

আমার তালিকায় অ-সন্দেহভাজনদের সংখ্যা চিরকালই শুন্য। সুতরাং খবরের কাগজের খবরটা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে পড়লামঃ

গতকাল শোভাবাজার মদনমোহনতলা এলাকায় জনৈক দোকানদার কোনও এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়। সেইসঙ্গে দোকানের ক্যাশ বাক্সের টাকা অদৃশ্য হয়। পুলিশের সন্দেহ গতরাতের অন্য দুটো ডাকাতির সঙ্গে এ-খুনের সম্পর্ক রয়েছে। তদন্ত চলছে।

অতঃপর শুরু হল আমার বিশ্লেষণ। প্রথমে নয়ন সেনের পালা।

ভেবে দেখলাম, গতকাল রাতে ও খুপরি-ঘরে ঢোকেনি। আজ সকালেও এসেছে দেরিতে। সুতরাং মদের বোতল এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতলের জায়গা বদলের কাজটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব বাকি রইল অবনী, পরাশর আর রোশনলাল। এদের তিনজনেরই ছিল সমান সুযোগ। তা ছাড়া গত রাতে অবনী আমার সামনেই ও-ঘরে ঢুকে মদের দুটো বোতল বের করে এনেছিল। হয়তো সেই সময়েই..।

চিন্তা করতে গিয়ে দেখলাম, পরাশর আর রোশনলালের পারসোনাল লাইফ সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না।

অবনীর বাবা গাড়ি কেনা-বেচার দালালি করত। অবনীই আমাকে জুটিয়ে দিয়েছিল এই ঝরঝরে অস্টিনটা। অবনী বিয়ে করেনি। সংসার ছেড়ে ও আমার সঙ্গে আছে আজ চারবছর। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ একটা মালের দোকানে।

পরাশর বারতিনেক জেল খাটার পর কেমন করে যেন আমার সঙ্গে ভিড়ে গেল।

সেও প্রায় বছর-তিনেকের কথা। পরাশরের বয়েস অল্প। চোখে-মুখে কেমন একটা একরোখা ভাব রয়েছে। সম্ভবত ওয়াগন-ব্রেকার হিসেবে পুলিশের সঙ্গে ঘন-ঘন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ওর চেহারায় এই অদ্ভুত কাঠিন্য এনে দিয়েছে।

রোশনলাল বয়েসে মাঝামাঝি। এই দুনম্বরী পথে ও আছে অনেকদিন। কিন্তু ওর নার্ভাস প্রকৃতিটা এখনও ওর সঙ্গ ছাড়েনি। গুণের মধ্যে, রোশন ভালো গাড়ি চালায়।

নয়ন বাড়ি ছেড়ে বিয়ে-থা করেছে আজ দশবছর। অনেকদিন টানাপোড়েনের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে ও হাত পেতেছিল আমার কাছে। ক্রমে-ক্রমে একরকম নিরুপায় হয়েই ও আমার সঙ্গে মিশে গেছে। মাঝে-মাঝে তাই দুঃখ করে বলে, আমি মারা গেলে আমার না-খেতে পাওয়া ছেলেমেয়েগুলোকে আর আমার বউটাকে দেখিস।

নয়নের ধারণা ওর বউ চরিত্র বিক্রি করেছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কারণ ললিতাকে আমি বিয়ের আগেও চিনতাম।

এতদিন একসঙ্গে কাটানোর পর আমাকে চিনতে ওদের আর বাকি নেই। বড়লোক বাবা মায়ের কোল ছেড়ে কীসের নেশায় যে এ-পথে পা বাড়িয়েছি সে কথা আজ আর স্পষ্টভাবে মনে পড়ে না। মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া আমার পেশা

নয়, নেশা। আমার এ-নেশার কথা ওরা চারজনও জানে। তা হলে দধীচি তালুকদারকে খুন করার জন্যে ওরা কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে?

ভেবে দেখলাম, এই চারজনের মধ্যে কোনও একজন প্রতিহিংসা মেটাতে চায়। কারণ? কারণ, হয়তো পঁয়ষট্টি টাকার বিনিময়ে প্রাণহানির ব্যাপারটা সে ঠিক সরল মনে হজম করতে পারছে না, তাই প্রতিবাদে মুখর হয়েছে।

সেই বিশেষ একজনের মুখোশ খোলার নিটোল পরিকল্পনা মনে-মনে ছকে নিয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরের ঘরে এলাম।

ওরা চারজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে।

পরাশর মাথা নীচু করে হাতের নখ খুঁটছে। নয়নের চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। অবনী মুখ নেড়ে কী যেন চিবোচ্ছে সম্ভবত চানাচুর। রোশন একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেওয়ালে সাঁটা জনপ্রিয় নায়িকার জনপ্রিয় বুকের দিকে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ওরা চারজন চোখ ফেরাল আমার দিকে। এবং আশ্বস্ত হল। কারণ, আমার হাতে রিভলভার নেই।

একপাশে পড়ে থাকা মোড়াটা টেনে নিয়ে বসলাম। নয়নের দিকে চেয়ে বললাম, নয়ন, তোদের চারজনের একজন আমাকে খুন করতে চাইছে।

সেটা তোর ধারণা ও তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল।

ধারণা, কিন্তু কারেক্ট। শীতল স্বরে জবাব দিলাম, যাক সে কথা।..সেই একজনকে আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। তারপর আর কোনও প্রশ্ন কাউকে করব না। হেম বাড়ুয্যেকে তোমরা চেনো। তোমাদের মতো ভেড়ুয়াদের শায়েস্তা করে সে মাথার চুল পাকিয়েছে। সুতরাং এই পৃথিবীতে জন্মেছিল বলে সেই একজনকে রীতিমতো দুঃখ করতে হবে।

কথা শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। ঘুরে তাকিয়ে বললাম, নয়ন, তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু। ললিতাও আমাকে অনেক দিন ধরে চেনে…জানে। ওকে বিধবা করতে হলে আমি নিজেই ভীষণ কষ্ট পাব। বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি।

ডেরা ছেড়ে পা বাড়ালাম রাস্তার দিকে। ডাক্তারখানায় যাব। কারণ, রোশনের অপটু হাতের ব্যান্ডেজ বুকে বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে। মোটামুটি একটা চিকিৎসা করানো দরকার।

যাওয়ার পথে মুচিবাজার পার হতে গিয়ে মনে পড়ল, রথের দিন আমি আর নয়ন বছরের পর বছর ধরে ফুটপাথে পাঁপড় ভঁজা কিনে খেয়েছি। স্কুলেও একসঙ্গে গিয়েছি বেশ কিছুদিন। তারপর…।

কৈশোরের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়লে বলতে ইচ্ছে করে ও কৈশোর, তোমার মতো গদ্দারি এই দুনিয়ায় আর কেউ আমার সঙ্গে করেনি।

.

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর–বেলা বারোটা নাগাদ টলতে টলতে ডেরায় ফিরলাম। নয়ন বেঞ্চে বসে খবরের কাগজটা পড়ছিল, আমার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। কাগজটা ফেলে রেখে ছুটে এল আমার কাছে। আমার অনিশ্চিত ভারসাম্যে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটাকে জাপটে ধরল! উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করল, কী রে, হেম? কী হয়েছে তোর?

আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। নয়নের কাঁধে ডানহাতটা রাখলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে ফিশফিশ করে বলতে চাইলাম, আমাকে বাঁচা, নয়ন। ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে।

নয়ন নীরবে আমাকে নিয়ে চলল খুপরি ঘরের দিকে।

বিছানায় শুয়ে করমচা-লাল চোখে চোখ রাখলাম নয়নের চোখে। কাঁপা হাতে ওর ডানহাতটা চেপে ধরলাম। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলাম, ওরা কোথায়?

নয়ন অবাক চোখে আমার মুখের, শরীরের, ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়েছিল, বলল, খেতে গেছে–হোটেলে।…কিন্তু হেম, কী হয়েছে তোর? মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।

হ্যাঁ, নয়ন। আজ সকালের কেস তো তুই জানিস। রোশনের বেঁধে দেওয়া ব্যান্ডেজ নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ডাক্তার পালের কাছে, আরিফ রোডে। সেই ব্যান্ডেজ কেটে নতুন ব্যান্ডেজ করতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেছেন। অবাক

হয়েছি আমিও। কারণ, ব্যান্ডেজ বাঁধার আগে কেউ হয়তো রোশনই–আমার কাটা জায়গায় ধুলো আর লোহার মরচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। ডাক্তার পাল শুধু বললেন, হেমবাবু আর ঘণ্টা পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করলেই পারতেন, ডাক্তার খরচটুকু বেঁচে যেত। টিটেনাসের সঙ্গে শ্মশানের যা রিলেশান, তাতে শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ঠিকমতো ফেলার আর টাইম পেতেন না। টিটেনাস টক্সয়েড নিয়ে, নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে, ফিরে আসতে-আসতে শুধু একটা কথাই আমার মাথায় ঘুরছিল–অবনী, পরাশর, রোশন–ওদের তিনজনের একজন আমাকে খুন করতে চায়। কে বল তো?

আমার আগ্রহে ফেটে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে নয়ন বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লঃ জানি না। তবে এখনও আমার মনে হচ্ছে তুই কোথায় একটা ভুল করছিস।

না, নয়ন। চাপা হিংস্র স্বরে গর্জে উঠলাম, ভুল আমার হয়নি। শুধু তোকেই বলে রাখছি, আসল লোককে বের করার তুরুপের তাস আমার হাতের মুঠোয়। যে-কোনও মোমেন্টে আমি তার মুখোশ খুলে দিতে পারি! কিন্তু আজকের দিনটা আমি ওয়েট করব। তারপর…।

এখন একটু বিশ্রাম কর।

দু-হাতে নয়নের হাত চেপে ধরলাম।

নয়ন, আমার যে ঘুমোতেও ভয় করছে। বুকভরা ভয় নিয়ে কেউ কখনও গদ্দারদের সঙ্গে একই ছাদের নীচে ঘুমোতে পারে?

নয়ন উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে আচমকাই নেমে এল কঠিন ছায়া। ও বলল, খুব পারে। ললিতার সঙ্গে একই ছাদের নীচে আমি ঘুমোচ্ছি আজ দশবছর।

নয়ন পা বাড়াল বাইরের ঘরের দিকে। যেতে-যেতে বলে গেল, ভয় পাস না। নয়ন সেন এখনও তোর বন্ধুই আছে। তা ছাড়া ওরা তিনজন ফিরুক। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

.

বিকেল পাঁচটায় ঘুম ভাঙলে টের পেলাম, শরীরে অসহ্য ব্যথা। এবং তার সঙ্গে তেজি খিদে। অতি কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। মাথাটা আচমকা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হল, কেউ যেন লোহার সাঁড়াশি দিয়ে রগের পাশ দুটো চেপে ধরেছে।

শুরুর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলে উঠে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে শেলফ থেকে মালের বোতল তুলে নিলাম। অতি সন্তর্পণে বোতলের তরল পদার্থ পরনের জামার এক কোণে সামান্য ঢালোম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোনও অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ল না, তখন ধীরে ধীরে গলায় উপুড় করে দিলাম বোতলটা। শুকনো জিভের তেতো আস্বাদটা কালী মার্কার কৃপায় কেটে গেল। বোতলটা তাকে ফিরিয়ে রাখতে যেতেই আমার অবসাদে ক্লান্ত হাত কেঁপে উঠল। মেঝেতে ঠিকরে পড়ল বোতলটা। ভেঙে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলা-র তীব্র গন্ধে খুপরি ঘরটা ভরে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে উঁকি মারল নয়ন। বলল, ও–তুই উঠেছিস। দাঁড়া আসছি– বলেই পলকের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত শরীরের ভারসাম্য রাখতে বিছানার ওপরে বসে পড়লাম।

একটু পরে একটা ঠোঙায় করে মুড়ি, পেঁয়াজ, আর গোটাকয়েক তেলেভাজা নিয়ে এল নয়ন। বলল, নে–খেয়ে নে। রাসুকে চা আনতে বলেছি।

আমি ওর দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে মুড়ির ঠোঙায় হাত চালাতে শুরু করলাম।

খেতে-খেতে হঠাৎই লক্ষ করলাম, নয়নের জ্বলজ্বলে চোখজোড়া আমার মুখে সেঁটে আছে। আমাকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে ও বলল, নাঃ, তুই দেখছি এখনও আমাকে খুব বিশ্বাস করিস, হেম!

কেন?

কারণ, আমার দেওয়া খাবারে তুই সন্দেহ করিসনি।

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

নয়ন নিজের মনেই বলে চলল, আমি দুপুরে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু তোকে সরানোর চেষ্টার ব্যাপারটা ওরা তিনজনেই সমানে ডিনাই করছে। কী

জানি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ওরা কোথায়? খেতে-খেতেই প্রশ্ন করলাম।

বাইরের ঘরে শুধু অবনী রয়েছে। রোশন আর পরাশর বেরিয়েছে।

অবনীকে ডাক।

নয়ন গলার স্বর উঁচু পরদায় তুলে ওকে ডাকল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অবনী এবং রাসুর চায়ের দোকানের নুলো ছেলেটা এক ভড় চা নিয়ে খুপরি ঘরে এসে ঢুকল। অবনীর হাতে খবরের কাগজটা।

অবনী চুপচাপ সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আমি ছোঁড়াটার হাতে পনেরোটা পয়সা দিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। তারপর অবনীর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে জানতে চাইলাম, অবনী, আজ সকালে রোশন যখন আমার বুকে ব্যান্ডেজ করে দেয় তখন এ-ঘরে আর কে-কে ছিল?

আমি আর পরাশর।

কেউই ঘর ছেড়ে যায়নি?

পরাশর একবার বাইরে গিয়েছিল ব্যান্ডেজের কাপড় আনতে। ওর দেরি হচ্ছিল বলে আমি রোশনকে তোমার কাছে থাকতে বলে বাইরের ঘরে একবার বিড়ি ধরাতে গিয়েছিলাম। তখনই দেখি পরাশর ফিরে আসছে।

আমি ঘুরে তাকালাম নয়নের দিকে।

ব্যান্ডেজের কেসটা ওদের বলেছিস?

হ্যাঁ, বলেছি কিন্তু…।

কিন্তু ওরা সবাই সেকথা ডিনাই করেছে, তাইতো? আমি ব্যঙ্গভরে হাসলাম।

অবনী রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, আর কিছু জানতে চাও, হেমদা?

আমি নিঃশব্দে ডানহাত ঢুকিয়ে দিলাম বালিশের তলায়। রিভলভারটা পরখ করতে করতে চাপা স্বরে বললাম, হ্যাঁ, জানতে চাই। জানতে চাই তোমাদের মধ্যে কার আয়ু আগামীকাল শেষ হতে চলেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় বড় অল্প, তাই না অবনী? এবার ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। নয়নের নীরব অনুনয়ের দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। শান্ত স্বরে বললাম, অবনী, তুই আর ওই কুত্তার বাচ্চাদুটো কাল সকালে এখানে হাজির থাকিস। তখনই দেখবি হেম বাঁড়ুয্যের দাবার শেষ চাল! তালুকদার স্টোর্সের ওই বুড়োর জন্যে সাগরের ঢেউ তোদের বুকে আছাড় মারছে, তাই না? এবার ফোট।

একইসঙ্গে আমরা অভিব্যক্তির ইশারা পেয়ে বেরিয়ে গেল অবনী।

আমি ফিরে এসে বসলাম বিছানার। নয়নকে বললাম, ওরা ফিরলে আমাকে খবর দিস। আর শোন, অবনীর কাছ থেকে খবরের কাগজটা আমাকে দিয়ে যাস।

আচ্ছা। উঠে দাঁড়াল নয়ন ও তবে আমি বেশি রাত করব না, হেম। ছোট ছেলেটার একটু জ্বর-জুর মতো হয়েছে। মানুষের মরার চেয়ে বেঁচে থাকাতেই বেশি কষ্ট।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল নয়ন।

একটু পরে নয়নের দিয়ে যাওয়া খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে সেই বিশেষ খবরটা আমি আবার পড়তে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমার মারকাটারি প্ল্যানের কথা।

.

তৃতীয় দুর্ঘটনাটা একেবারে চরমে পৌঁছোল।

রাত তখন সাড়ে এগারোটা। খাওয়াদাওয়া সেরে বেশ কিছুক্ষণ হল ঘুমিয়েছি। ঘুমোনোর আগে ওদের তিনজনকে ডেকে আগামীকাল সকালই যে গদ্দারের লুকিয়ে থাকার টাইম লিমিট সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি। যথারীতি নিজেদের সাফাই দিয়েছে ওরা তিনজনেই। তারপর বাইরের ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে।

এমনিতে ঘুম আমার গভীর। কিন্তু আজ, বিশেষ করে বুকের জ্বালা আর মনের অন্ধ আক্রোশ, এই দুয়ের জন্যে অন্যান্য রাতের মতো সহজে ঘুম আসেনি। অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে ভেবেছি : তিনজনের মধ্যে কে? অবনী? পরাশর? রোশনাল? নাকি যাকে রেখেছি সব সন্দেহের সীমার বাইরে, সেই নয়ন সেনই এ-দুর্ঘটনাগুলোর পরিচালক এবং প্রযোজক?

এই জটিল চিন্তাভাবনার মধ্যেই একটা চাপা খসখস শব্দ আমার কানে এল। কানে এল দরমার দরজা সরানোর শব্দ।

বুঝলাম, কেউ খুপরি-ঘরে ঢুকছে।

স্বাভাবিক সতর্কতায় বাঁ-হাত চলে গেল বালিশের নীচে। আঁকড়ে ধরলাম প্যাড জড়ানো রিভলভারের বাঁট। জমাট অন্ধকার ভেদ করে দরজার দিকে নজর ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফালতু চেষ্টা। তাই সাবধানে বিছানা ছেড়ে নেমে এলাম মেঝেতে। গড়িয়ে গড়িয়ে সবেমাত্র ঠান্ডা মেঝে ছুঁয়েছি, দরমার দরজা পুরোটা খুলে গেল। দরজায় ভেসে উঠল একটা ছায়াশরীর।

নাকে মদের হালকা গন্ধ, হাতে রিভলভার, মনে ঝা–এই তিনকে সঙ্গী করে আমি অপেক্ষায় রইলাম। বুকের ভেতরে যেন একপাল সৈন্য নিখুঁত তালে মার্চ করে চলেছেধুপ…ধুপ…ধুপ…ধুপ…।

অন্ধকারের পটভূমিতে জমাট অন্ধকার শরীরটাকে আমার বিছানায় দিকে আরও খানিকটা এগোতে দেখে আমি রিভলভারটা ডানহাতে নিয়ে উঁচিয়ে ধরলাম। আর ঠিক তখনই যন্ত্রণায় উঃ করে চেঁচিয়ে উঠলাম। না, আমার বুকের ব্যথা নয়, বিকেলে ভেঙে যাওয়া বোতলটার একটুকরো কাঁচা পরিষ্কার করার সময় পরাশরের নজরে পড়েনি। সেই কাচে কনুই লাগতেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অস্ফুট আর্তনাদ।

সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারের বুক চিরে দেখা গেল নীল আলো। আগন্তুকের রিভলভারের গুলি ছুটে এসেছে আমার বিছানা লক্ষ্য করে। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। আক্রোশ ফেটে পড়ল আমার রিভলভারের নল। পাগলের মতো দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে চললাম। কারও ছুটে পালানোর দুদ্দাড় শব্দ পেলাম। তারপরই একটা গুঞ্জন ভেসে এল পাশের ঘর থেকে। শোনা গেল পরাশর, অবনী আর রোশনের গলা, কী হল, হেমদা?

আমি মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই ওরা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমার ঘরে। আমি রিভলভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর বসে পড়লাম বিছানায়। অন্ধ ক্রোধে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোচ্ছে না।

ওদের প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে শুধু বললাম, নয়নকে ওর বাড়ি থেকে কেউ ডেকে নিয়ে এসো—এখুনি।

নীরবে ঘর ছাড়ল রোশনলাল। আমি বিছানা ছেড়ে পা বাড়ালাম বাইরের ঘরের দিকে।

বাইরের ঘরে আসবাবপত্র কম থাকায় একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেল রিভলভারটা। সদর দরজা হাট করে খোলা। যেন আমাকে বোঝানোর চেষ্টা, এই অপকীর্তি বাইরের কোনও লোকের। রিভলভারের ম্যাগাজিন খুলে দেখি তাতে কোনও গুলি নেই।

রিভলভারটা বাঁ-হাতে পকেটে পুরে হ্যারিকেনের আলোটা জোর করে দিলাম। ওদের ডেকে বললাম মোমবাতিটা এ-ঘরে নিয়ে আসতে এবং অন্য হ্যারিকেনটাও জ্বেলে দিতে।

ওরা নীরবে আদেশ পালন করলে কাঠের বেঞ্চটা আঙুল দিয়ে দেখালাম: অবনী, পরাশর, তোমরা ওই বেঞ্চটায় বোসো।

আমি গিয়ে বসলাম মোড়াটায়। তারপর চলল চুপচাপ অপেক্ষা।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফিরে এল রোশনলাল, সঙ্গে নয়ন। নয়নের চোখে মুখে ঘুমের ছাপ। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কোনওরকমে তালিমারা পাঞ্জাবি আর চটিটা গায়ে-পায়ে গলিয়ে ও চলে এসেছে।

আজ নয়ন আর প্রশ্ন করল না, কী ব্যাপার, হেম? এত রাতে হঠাৎ তলব? কারণ, ও বোধহয় ঘরের থমথমে পরিবেশ এবং আমার মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল।

নয়নের দিকে চেয়ে হেসে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, নয়ন, তুই কষ্ট করে টেবিলটায় বোস। রোশন, তোমার জন্যে অবনীর পাশে জায়গা খালি রয়েছে যাও,

বোসো।

সকলে বসার পর সংক্ষেপে নয়নকে নতুন ঘটনার কথা জানালাম। তারপর পকেট থেকে বের করে নিলাম অচেনা রিভলভারটা। প্রশ্ন করলাম, এটা কার?

সবাই চুপ।

ঘড়ির কাঁটায় আমার দেওয়া আটচল্লিশ ঘণ্টা শেষ না হলেও আমার হিসেবে সে-আটচল্লিশ ঘন্টা আজ, একটু আগেই, শেষ হয়ে গেছে। এ কথা এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট যে, অবনী, রোশন, অথবা পরাশর–তোমরা তিনজনের একজন আমাকে খুন করতে চাও।

বাজে কথা! বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অবনী।

অবনী, বোসো। আর একটু পরেই যখন এ-ঘরে একটা বডি পড়ে থাকবে তখনই বোঝা যাবে কার কথা কতটুকু ঠিক।

অবনী বসল। ওদের মুখে একটা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের ছাপ।

ঘটনার শুরু কাল রাতে আমি দাঁড়িয়ে থেকেই বলতে শুরু করলাম, যখন তালুকদার স্টোর্সের লোকটা আমার হাতে খুন হয়। আমার মনে হয়েছিল, সেই খুনটাকে তোমরা কেউই ভালো চোখে দ্যাখোনি–এমনকী নয়নও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তোমরা আমাকে মার্ডার করতে চাইবে। অথচ তাই ঘটছে। তিন-তিনবার আমাকে হেম বাঁড়ুয্যেকে– মার্ডার করার চেষ্টা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপার আমি বিন্দুমাত্রও লাইক করি না। সুতরাং ফিরে তাকালাম নয়নের দিকে : নয়ন, ও-ঘর থেকে কালকের কাগজটা নিয়ে আয়।

নয়ন কাগজটা নিয়ে এসে দিল আমার হাতে। তারপর আবার গিয়ে বসল ভাঙা টেবিলে– ওর জায়গায়।

কাগজটা ভাঁজ করা অবস্থায় রেখেই বলে উঠলাম, রোশন, তালুকদার স্টোর্সের লোকটাকে তুমি চিনতে? খবরের কাগজে লোকটার নাম দিয়েছে, কিন্তু ঠিকানা দেয়নি।

না, চিনি না। জবাব দিল রোশনলাল।

অবনী?

আমি কী করে জানব।

পরাশর?

পরাশর নীরব।

আমি হাসলাম। রিভলভার হাতে নাচাতে-নাচাতে বলে চললাম, লোকটা হেভি সহজ-সরল। প্রথমে আমার হাতে এটা দেখে বুঝতেই পারেনি এটা রিভলভার। অবশ্য কপালে গুলি বেঁধার পর এই কিম্ভুতকিমাকার মালটা যে কী, সেটা বুঝতে লোকটার এতটুকুও অসুবিধে হয়নি।

হেমদা? গর্জে উঠল অবনী, তালুকদার স্টোর্সের লোকটাকে খুন করতে তোমার লজ্জা করল না?

আমি হিংস্রভাবে হাসলাম, কেন, তোমার তাতে কী প্রবলেম হয়েছে?

ক্ষতি-অক্ষতির কোশ্চেন না। তবুও বেহুদা মার্ডার করবে?

তোমার দেখছি বিবেক জেগে উঠেছে! কিন্তু বিবেক শুধু তোমারই রয়েছে নয়ন, রোশন, পরাশরের নেই?

নেই কে বলল? আছে। উঠে দাঁড়াল নয়ন ও হেমকে আমি আগেও সে কথা বলেছি।

ওস্তাদ– এবারে রোশন মুখ খুলল, পঁয়ষট্টি টাকা কখনও একটা জানের দাম হতে পারে না।

পারে, খুব পারে। ওরকম একটা ভিতু কুত্তার জানের দাম ওর চেয়ে বেশি কোনওদিন ছিল না।

হেমদা। উঠে দাঁড়াল পরাশর ও দধীচি তালুকদার তোমার কী ক্ষতি করেছিল যে, তুমি তাকে সামান্য কটা টাকার জন্যে খুন করলে?

আমার মাথার ভেতরে যেন বজ্রপাত হল! মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। রিভলভারের বাঁটে আমার পাঁচ আঙুল ইস্পাত হয়ে চেপে বসল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। শত চেষ্টাতেও গলার স্বর অবাধ্য ভঙ্গিতে কেঁপে উঠল : পরাশর, দধীচি তালুকদারের নাম তুমি কী করে জানলে?

বেঞ্চ ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল অবনী। বিস্ফোরণের আভাস পেয়ে চাবুকের মতো তৎপর হয়ে দাঁড়াল নয়ন। হতভম্ব রোশনলাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা তিনজনেই বিড়বিড় করতে লাগল, দধীচি তালুকদার–দধীচি তালুকদার।

পরাশর আমার প্রশ্নের জবাবে বলে উঠল, খবরের কাগজ পড়ে জেনেছি।

নিষ্পাপ অভিব্যক্তিতে কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ও উন্মাদের মতো পাতা হাতড়ে খবরটা বের করল। বারকয়েক মনে-মনে সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে যখন মুখ তুলে তাকাল তখন ওর মুখের চামড়ায় ধূসর প্রলেপ। কিন্তু আর তো ফেরার পথ নেই! আমার ফঁদে ও পা দিয়ে ফেলেছে।

কয়েক মুহূর্ত নিটোল নিস্তব্ধতা।

তারপর মুখ খুললাম, পরাশর, দধীচি তালুকদার তোমার কে হয়?

পরাশর বেপরোয়া হয়েই জবাব দিল, আমার বাবা!

শব্দ দুটো যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে গোটা ঘরটায় ফিরতে লাগল । আমার বাবা। আমার বাবা। আমার বাবা। আমার…।

এখন বুঝলাম, রক্তের সম্পর্ক মানুষকে কী করে বেপরোয়া করে তোলে। আমার মনে পড়ল অ্যাসিড ভরতি বোতলের কথা, বুকে বাঁধা ব্যান্ডেজের কথা, সবশেষে রিভলভারের গুলিটার কথা।

ঠান্ডা গলায় বললাম, পরাশর, এ পর্যন্ত আমি একবারও দধীচির নাম তোমাদের সামনে বলিনি। খবরের কাগজেও এ নিয়ে কিছু লেখেনি। তাই আজ সকালেই আমি প্ল্যান করেছিলাম, তোমাদের যার মুখ দিয়ে ও-নাম বের করাতে পারব, বুঝব গত তিনটে অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে সে-ই দায়ী। অতএব, ঈশ্বর দধীচি তালুকদরের পুত্র ঈশ্বর পরাশর তালুকদার, তোমার স্বর্গজীবন সুখের হোক।

রিভলভারের চাপা শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গুলির ধাক্কায় রোশনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল পরাশর। ওর মুখে পলকে জন্যে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ছায়া। তারপর ওর শরীরটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। কপাল থেকে সরু রক্তের ধারা গড়িয়ে এল বাইরে।

রোশন নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। জানতে চাইল, ওস্তাদ, দধীচি তালুকদারের কপালে কি কোনও কাটা দাগ ছিল?

হ্যাঁ, ছিল। কেন?

রোশন চুপ।

অবনী বড়-বড় পা ফেলে তড়িতে এগিয়ে গেল ভাঙা টেবিলটার কাছে। ওর বলিষ্ঠ দু-হাতে টেবিলটাকে মাথার ওপর তুলে মেঝেতে এক আছাড় মারল। প্রচণ্ড শব্দে গোটা ডেরাটা থরথর করে কেঁপে উঠল। আমরা নির্বাকভাবে দেখলাম, অবনী এক হ্যাঁচকায় ভেঙে নিল টেবিলটার একটা ভারী পায়া। ফিরে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভঙ্গিতে পা ফাঁক করে দাঁড়াল আমার কাছ থেকে হাত ছয়েক দূরে।

নয়ন আর রোশন গিয়ে দাঁড়াল অবনীর পাশে। ওরা তিনজনে মিলে আমাকে কেন্দ্র করে ছহাত ব্যাসার্ধের এক বৃত্তচাপের জন্ম দিল।

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নয়ন বলল, হেম, দধীচির নামটা আমি এই মুহূর্তেই প্রথম শুনলাম।

আমিও। একইসঙ্গে জবাব দিল অবনী আর রোশনলাল।

পরাশর জানত, তালুকদার স্টোর্স দোকানটা ওর বাবার–নয়ন বলল, কিন্তু আমি জানতাম না যে–।

তার মালিক দধীচি তালুকদার। বক্তা অবনী ও রোশন।

হেম, দধীচিকে খুন করে আমার বোনকে তুই বিধবা করেছিস। ফিশফিশে ভেজা স্বরে বলল নয়ন, আমার ছোট বোন সুনন্দাকে আমি বড় ভালোবাসি।

হেমদা, আমার নাম অবনী তালুকদার। দধীচি আমার দাদা। বাড়ি ছেড়েছি বহুদিন–কিন্তু তবুও সে আমার বড়ভাই। ছোট্ট একটা দোকান চালায় বলে শুনেছি…। গম্ভীর স্বরে বলে উঠল অবনী।

ওস্তাদ, এই দধীচি তালুকদার একদিন নিজের জান কবুল করে আমার জান বাঁচিয়েছিল। থেমে-থেমে রোশন বলল।

আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা লোপ পেল। সব কিছু যেন জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগল। পরাশর, অবনী, নয়ন, রোশন–ওদের চেহারাগুলো যেন দ্রুতগতিতে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বুঝলাম, আমি শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দধীচির তনুত্যাগে যার সূত্রপাত করেছি, বৃত্রসংহারেই তার শেষ। সেই রক্তের ঋণ শোধ করতেই ওরা এতটা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে।

আমাকে ক্ষমা করিস, হেম। নয়নের চাপা স্বর কানে এল।

আচ্ছন্ন দৃষ্টি কাটিয়ে দেখি রোশনের হাতে ঝকঝকে স্টিলেটা। অবনীর হাতে ভারী কাঠের পায়াটা। আর নয়ন, ওর রক্তাভ দুচোখ জলে চিকচিক করে জ্বলছে।

আমাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ওদের বৃত্তচাপের ব্যাসার্ধ ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগল। পরাশরের শূন্য দৃষ্টি এই শেষ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল। ওদের শরীরের ছায়া একসময় আমার গায়ে এসে পড়তেই কেমন যেন শীত-শীত করে উঠল।

আমি হেম বাঁড়ুয্যে, জীবনে এই প্রথম শিউরে উঠলাম।

এবং জানি, এই শেষবার!

# মরা মানুষের হাত (নভেলেট)

**মরা মানুষের হাত (নভেলেট)**

প্রতিদিন সকালে লক্ষ লক্ষ মানুষ সুখের আশ্রয় ছেড়ে বাড়ি থেকে ঘুম-চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর রওনা হয় রেল স্টেশানের দিকে। ট্রেন এলেই লাফিয়ে উঠে পড়ে। গন্তব্য শহরের অফিস। সেই অফিসের ভিড়ে আমিও থাকি। ভোরবেলা ঘুমজড়ানো চোখে ঘরের আরাম ছেড়ে বাইরে বেরোতে ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। ট্রেনে যাওয়া-আসার কষ্টের ব্যাপারে নতুন করে কিছু আর বলার নেই। গরমকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনই ঠান্ডা। অর্থাৎ, ট্রেন ভ্রমণের আমেজটুকু আর পাওয়া যায় না। তবে একইসঙ্গে কষ্টটাও অভ্যেস হয়ে গেছে।

গত দুমাস ধরে দেখছি ট্রেনগুলো কোন যাদুমন্ত্রবলে ঠিক-ঠিক সময়ে যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু হঠাৎই, কিছুদিন আগে, শুরু হল ট্রেন ধর্মঘট। সুতরাং কলকাতায় যাতায়াতের ট্রেন উধাও হল।

ট্রেন বন্ধ থাকলে কলকাতা যাওয়ার একমাত্র উপায় হল গাড়ি অথবা ট্যাক্সি। তা হলে অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন! শত-শত লোক শত-শত গাড়ি, ট্যাক্সি অথবা টেম্পো ধরে রওনা হয়েছে শহরের দিকে। একইসঙ্গে একে অপরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এবং রেজাল্ট ট্র্যাফিক জ্যাম। সেসময় মনে রাগ, বিরক্তি ইত্যাদি মিশ্র অনুভূতির যে কী অদ্ভুত খেলা চলে তা এরকম অবস্থায় যে না পড়েছে সে ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। সেই ট্র্যাফিক জ্যামের লম্বা সারিতে আমিও গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। আর তখনই ঘটনার সূত্রপাত।

আমার বউ রুমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। ফলে ড্রাইভারকেও ছুটি দেওয়া আছে। সুতরাং আমি নিরুপায় হয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছি

অফিসে। নইলে ট্রেন চললে পর পেট্রলের ক্রমে-বেড়েওঠা দামের কথা ভেবে গাড়ি নিয়ে সচরাচর অফিসে যাই না। এখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েও দেখছি বিপত্তি।

প্রথম কয়েকমাইল আমাদের সারিটা ধীরে-ধীরে বেশ এগোতে লাগল, কিন্তু একটা মোড় ঘুরতেই প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষলাম। আর-একটু হলেই সামনে দাঁড়ানো একটা সবুজ অ্যামবাসাডরের পেছনে ধাক্কা মারছিলাম। আমার সামনে পাশাপাশি তিন সার গাড়ি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। যতদূর চোখ যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। মনে-মনে বেশ বুঝলাম, শহরে পৌঁছানো পর্যন্ত ওই সবুজ অ্যামবাসাডরের পশ্চাৎদেশ হয়তো সারাক্ষণই আমাকে দেখতে হবে। তবে সবুজ রং দেখাটা শুনেছি ভালো–চোখ তাজা থাকে।

অফিসে পৌঁছোতে কঘণ্টা দেরি হবে সে-ভাবনা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন প্রশ্ন, এই গাড়ির জটলা থেকে মুক্তি পাব তো?

হঠাৎই পাশের এক গাড়ির আরোহী জানালেন, সামনে কোথায় নাকি একটা টেম্পো খারাপ হয়ে গেছে। চমৎকার! এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এগোনো পেছোনো সবই বন্ধ। হয়তো গাড়ির সিটে বড়ি কাত করে ঘুমিয়েই পড়তাম, কিন্তু মাঝে-মাঝে সবুজ অ্যামবাসাডারটা কয়েকইঞ্চি করে এগোচ্ছে আর যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় আমি সেই মহার্ঘ ইঞ্চিগুলো দখল করছি।

তখনই খেয়াল পড়ল স্টেশান ওয়াগনটার দিকে। মেরুন রঙের গাড়িটা আমার ডানদিকেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে। আমার ডানহাতের কনুই খোলা জানালার কিনারায় রাখা, আর ঠিক জানলা ঘেঁষেই মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা। এত কাছে যে, ইচ্ছে করলে জামার হাতা দিয়ে ওটার গা পালিশ করে দেওয়া যায়।

আমরা পাশাপাশি রয়েছি। আমি মাঝে-মাঝে এমনিই তাকাচ্ছি গাড়িটার দিকে।

গাড়ি চালাচ্ছেন একজন অতি আধুনিক মহিলা। সাজগোজ উগ্র। ঠোঁটে লিপস্টিকের আগুন, চোখে কালো সানগ্লাস। একটা ছাই রঙের স্টোল শীতকে রুখতে অলস চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝে তিনি মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে দেখছেন, আবার নার্ভাসভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তবে তারপরেও আড়চোখে আমাকে দেখতে চেষ্টা করছেন।

যখন তার নজর আমার দিকে ব্যস্ত তখন তার সামনের গাড়িটা ফুটকয়েক এগিয়ে গেল। পেছনে দাঁড়ানো গাড়ির দল সম্মিলিতভাবে হর্ন দিয়ে উঠতেই তিনি চমকে উঠে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকায় গাড়িটা এগিয়ে নিলেন সামনে এবং সামনের গাড়িটা হঠাৎ থামতেই তিনিও সজোরে ব্রেক কষলেন। ভয়ংকর ঝাঁকুনি দিয়ে স্টেশান ওয়াগনটা থামল।

ওয়াগনটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার ফলে তার পেছনের জানলাটা আমার জানলার পাশে এসে থামল, এবং আমি ওয়াগনের ভেতরটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ভেতরে চাদরে জড়ানো কী একটা যেন রয়েছে। ভদ্রমহিলা সজোরে ব্রেক কষার ফলে চাদরের একটা কোণ সামান্য সরে গেছে। সেই কোণ দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

সেদিকে একপলক তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার ক্লান্ত মস্তিষ্ক আমাকে তখন প্রাণপণে বোঝাতে চাইছে যে, আমার চোখ ভুল দেখেনি। সুতরাং আবার তাকালাম ওয়াগনের ভেতরে। না, প্রথমবারে আমি ভুল দেখিনি।

জিনিসটা একটা হাত–মানুষের হাত যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, ওয়াগনের জানালায় কাচ না থাকলে আমি হয়তো হাত বাড়িয়েই ওই হাতটা ছুঁতে পারতাম। হাতটার মাঝের দু-আঙুলে কালচে লাল কী যেন লেগে আছে–বোধহয় রক্ত। তা ছাড়া পুরোনো চাদরে জড়ানো জিনিসটার আকৃতি দেখে এই শীতে আমি ঘামতে শুরু করলাম। চাদরের নীচে অবশ্যই একটা বডি লুকোনো রয়েছে।

কী করা যায় ভাবতে লাগলাম। আমার গাড়ির চারপাশে গাড়ির সমুদ্র। গাড়ির দরজা খুলব সে-উপায়ও নেই। তা ছাড়া, এই জগাখিচুড়ির মধ্যে গাড়ি ছেড়ে নামাও যাবে না।

হাত নেড়ে স্টেশান ওয়াগনের সানগ্লাস পরা ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম– কিন্তু বৃথাই। তিনি সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে। এ অবস্থায় মনে পড়ে যায় রাতে দেখা দুঃস্বপ্নের কথা : যে স্বপ্নে কেউ আপনাকে তাড়া করে আসছে অথচ আপনি কিছুই করতে পারছেন না। এমনকী দৌড়তেও পারছেন না। আপনার পা দুটো যেন কেউ বেঁধে রেখেছে।

অবশেষে হর্ন বাজাতে শুরু করলাম। এবং একইসঙ্গে আঙুল দিয়ে স্টেশান ওয়াগনের পেছনটা দেখাতে লাগলাম।

আমার সামনের সবুজ অ্যামবাসাডরের ড্রাইভার রাগী দৃষ্টিতে পেছন ফিরে আমাকে দেখল। ভাবলাম, সে হয়তো নেমে আমাকে দুটো কথা শোনাতে ছুটে আসবে। কিন্তু যেভাবে গাড়িগুলো সব গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতে সে দরজা খুলে নামতে পারবে বলে মনে হয় না।

এমন সময় স্টেশান ওয়াগনের লাইনের গাড়িগুলো এগোতে শুরু করল। ওয়াগনটা আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তার চলার ভঙ্গিতে সবসময়েই একটা ব্যস্ত ভাব। ওটার পেছনের গাড়িটা আমাকে আড়াল করার আগেই স্টেশান ওয়াগনের নম্বরটা দেখে নিলাম। পকেট থেকে পেন নিয়ে বাঁ-হাতের তালুতে নম্বরটা লিখে রাখলাম। তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। শরীরে একটা অদ্ভুত ক্ষীণ কঁপুনি টের পেলাম।

হঠাৎ আমার পেছনের গাড়ির অধৈর্য হর্নের শব্দে খেয়াল হল আমার লাইনের গাড়িগুলো এগোতে শুরু করেছে।

আরও মাইলকয়েক নির্ভাবনায় এগিয়ে গেল গাড়ির সার। আমি ইতিউতি চেয়ে মেরুন স্টেশান ওয়াগনটাকে দেখতে চেষ্টা করছি, আর একইসঙ্গে সবুজ অ্যামবাসাডরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ কোনওরকমে এড়িয়ে চলেছি।

একসময় রাস্তার কিনারায় দাঁড়ানো একটা লালরঙের দোতলা বাড়ি আমি অন্যমনস্কভাবে পার হয়ে গেলাম। পার হতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল থানা লেখা বোর্ডটা। তক্ষুনি ব্রেক কষে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। পেছনে ছুটে আসা একটা কালো ফিয়াট বিকট আর্তনাদে ডানদিকে গাড়ি কাটিয়ে অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাল। ততক্ষণে আমি গাড়ি থেকে নেমে থানায় ঢুকে পড়েছি।

পুলিশের ইউনিফর্ম পরে একজন সার্জেন্ট একটা টেবিলে বসে কীসব লিখছিল, আমাকে ছুটে ঢুকতে দেখে চমকে মুখ তুলে তাকাল।

কী চাই?

আমি একটা খুনের রিপোর্ট লেখাতে চাই। কথাগুলো বলার সময় নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হল।

তাই নাকি?

সে উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়ার থেকে একটা ছাপানো ফর্ম মতো কী যেন বের করে নিল। তারপর কলম বাগিয়ে ধরে বলল, কাউকে আপনি চাপা দিয়েছেন?

না–আমি নয়। মানে, আমার পাশের গাড়িতে ওই হাতটা দেখলাম। একটা স্টেশান ওয়াগন, মেরুন রঙের, একজন ভদ্রমহিলা।

একমিনিট। আগে স্থির হয়ে বসুন।

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল সে। তারপর নীচু গলায় প্রশ্ন করল, আপনার শরীর খারাপ হয়নি তো?

এ-প্রশ্নের জন্যে অফিসারটিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, আমার এলোমেলো কথায় যে কেউই এ-সন্দেহ করবে। তবুও মুখে বললাম, না, শরীর খারাপ হয়নি।

ঠিক আছে। এবার বলুন। কেউ কি উন্ডেড হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে?

না, তা নয়। মানে, ওই হাতটা হঠাৎ বেরিয়ে–।

ও, বুঝেছি। তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনার নাম দিয়েই শুরু করি। কী নাম আপনার?

অফিসার বাধা দেওয়ায় ধৈর্যচ্যুতি হলেও শান্ত কণ্ঠে নিজের নাম বললাম, সান্যাল রুদ্রে সান্যাল।

ঠিকানা?

তাও বললাম।

তখন অফিসারটি লেখার কাজ সেরে মুখ তুলল।

ঠিক আছে, মিস্টার সান্যাল। এবার বলুন কী ব্যাপার? একেবারে প্রথম থেকে ধীরে-ধীরে সব গুছিয়ে বলুন।

অতএব প্রথম থেকে সব গুছিয়ে বললাম।

আমার কথা শেষ হলে সার্জেন্ট থুতনিতে হাত ঘষল। বলল, হুম। আমাদের দেওয়ার মতো সেরকম কোনও তথ্য আপনার হাতে নেই, মিস্টার সান্যাল। ঠিক বলছেন, আপনি একটা হাত দেখেছেন? আপনার ভুল হয়নি তো? মানে, আমি বলছি, ওয়াগনটার পেছনের জানলার কাচটা হয়তো ময়লা ছিল।

ময়লা থাক আর না-ই থাক, ওটা একটা হাতই ছিল। আমার ভুল হয়নি। আর, হাতটায় রক্তের দাগ আমার স্পষ্ট নজরে পড়েছে।

আমি বোধহয় একটু চেঁচিয়েই উত্তর দিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, সার্জেন্ট বলল, আস্তে, উত্তেজিত হবেন না।

সার্জেন্টের নাম অনুপম বক্সী। তার বুকে লাগানো প্লাস্টিকের চাকতি থেকেই নামটা জানতে পেরেছি। এখন ভাবতে গিয়ে দেখছি, সে তার নিজের কাজ ঠিকমতোই করেছে। তখন মনে হয়েছিল আমার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে স্টেশান ওয়াগনের পেছনে তার দৌড়ানো উচিত ছিল। এবং সেকথা তাকে বলেছিলাম।

একবার বাইরে তাকিয়ে দেখুন, মিস্টার সান্যাল। রাস্তার গাড়ির ভিড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, ধরে নিলাম আপনার ওই মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা এই ভিড়ের মধ্যেই কোথাও আটকে আছে। কিন্তু হলে কী হবে? আমাদের গাড়ি তো আর উড়তে পারে না।

তা হলে যে করে হোক রাস্তাঘাট আটকানোর ব্যবস্থা করুন।

অসম্ভব। এখন রাস্তাঘাট আটকালে সারা শহর গাড়িতে ছেয়ে যাবে। দাঁড়ান, একমিনিট দাঁড়ান…।

এই বলে অনুপম বক্সী টেবিলে রাখা ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। তারপর নীচু গলায় কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল।

না, চেক পোস্টে বরং খবর পাঠিয়ে দাও।

শুধু এই টুকরো খবরটুকুই আমার কানে এল।

মিনিটকুড়ি পরে সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল টাক মাথা এক ভদ্রলোক। শক্তসমর্থ চেহারা, গালে দিনকয়েকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে সাধারণ চেক শার্ট, কোট ও টেরিলিনের প্যান্ট।

অনুপম বক্সী নিচু স্বরে আমাকে বলল, ডিটেকটিভ অফিসার চৌধুরী। একটা ডাকাতির কেসে হেডকোয়ার্টার থেকে এখানে এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন। ওঁকে সব খুলে বলুন। যা জিগ্যেস করেন জবাব দিন।

চৌধুরী ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। আমার দিকে ভুরু উঁচিয়ে বলল, আপনিই বুঝি মিস্টার সান্যাল? বলার হয়তো দরকার নেই তবু বলে রাখছি : আপনি যা বলতে এসেছেন তা সত্যিকারের জরুরি হলেই আপনার পক্ষে মঙ্গল। ডিউটির জন্যে টানা চোদ্দো ঘণ্টা আমি না ঘুমিয়ে আছি। এখন বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি।

কোনওরকমে বলতে শুরু করলাম, আমি একটা হাতের কথা বলতে এসেছি। আমার পাশের একটা স্টেশান ওয়াগনে হাতটা আমি দেখেছি।

হাত?–চৌধুরী অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। তাকাল বক্সীর দিকে। বলল, সবরকমের মালই এখানে জোটে, তাই না বক্সী? ঠিক আছে, মিস্টার সান্যাল, বলুন–শুনি আপনার ওই হতচ্ছাড়া হাতের কথা।

সুতরাং আমার কাহিনির পুনরাবৃত্তি করলাম।

গল্পটা বলার সময় ভেবেছিলাম চৌধুরী হয়তো সামান্য হলেও অবাক হবে, উত্তেজিত হবে। কিন্তু সে একঘেয়ে বিরক্তির ভাব নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। যখন তাকে আমার বাঁ হাতে লেখা স্টেশান ওয়াগনের নম্বরটা দেখালাম, সে হাই তুলে একটা নোটবই বের করে নির্বিকারভাবে নম্বরটা টুকে নিল।

আমার কথা শেষ হলে সে বলল, মিস্টার সান্যাল, জনগণের সেবা করাটাই আমাদের কর্তব্য। সবার প্রতি সমান মনোযোগ ও সম্মান দেখানোটাই আমাদের নীতি। কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, আপনার এই গাঁজাখুরি গপ্পোটা আমি বিশ্বাস করব? হতে পারে আপনি হয়তো আসলে জানলার কাছে কোনও ছায়া দেখেছেন। হয়তো চাদরের তলা থেকে এমন কিছু বেরিয়ে এসেছে যেটা দেখতে অনেকটা হাতের মতো। কিন্তু এটা তো মানবেন, রাস্তার ভিড়ে গাড়ির

পেছনে চাদরে মোড়া ডেডবডি নিয়ে কেউ চলাফেরা করে না। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে দেখুন, মিস্টার স্যান্যাল। এবার চলুন, আমিও বাড়ি যাই, আর আপনিও বাড়ি ফিরে যান। এসব কথা ভুলে যান।

হয়তো তার কথায় রাজি হতাম। কিন্তু অবাক হলাম চৌধুরীর মুখের ভাব দেখে। তার মুখের অভিব্যক্তি চিৎকার করে যত না পারা যায় তার চেয়েও বেশি জোরে আমাকে পাগল কিংবা মিথ্যেবাদী বলছে। সুতরাং রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম, না। বাড়ি যাব না।

এ-রাগের কিছুটা চৌধুরীর ওপর : আমাকে বিশ্বাস করছে না বলে। আর বাকিটা নিজের ওপর ও এ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি বলে।

একটা হাত আমি দেখেছি। মরা মানুষের হাত। আপনারা পুলিশের লোক। আপনাদের বললাম। এবার যা হোক কিছু একটা করুন।

চৌধুরী গভীর শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, ঠিক আছে, আমি এখুনি লোক লাগাচ্ছি। আপনি বাড়ি যান। যদি কিছু খুঁজে পাই আপনাকে জানাব। কিন্তু যদি স্টেশান ওয়াগনটা খুঁজে পাই এবং দেখি আপনার কথামতো কোনও ডেডবডি ওতে নেই, তা হলে মিস্টার সান্যাল, থিংস উইল বি ভেরি গ্রেভ ফর যু…।

রাগ করছেন কেন, চৌধুরীদা, শান্ত হোন। বক্সী এগিয়ে এসে চৌধুরীর পিঠে হাত রাখল।

ওদের এ অবস্থায় রেখে আমি বেরিয়ে এলাম থানা থেকে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রওনা হলাম। এবং প্রথম সুযোগেই গাড়ি ঘুরিয়ে উলটোদিকে চলতে শুরু করলাম।

একসময় বাড়িতে এসে পৌঁছোলাম।

প্রায় এগারোটা নাগাদ খেয়াল হল অফিসে ফোন করে বলা হয়নি যে, আজ কাজে যাব না। ফোন করলাম। বস মোটেই খুশি হল না। এরকমটাই হবে ভেবেছিলাম।

এরপর ঘণ্টাতিনেক বসে রইলাম টেলিফোনের কাছে। ভাবলাম, এই হয়তো চৌধুরীর ফোন আসবে। কিন্তু এল না।

প্রায় সওয়া দুটোর সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

দরজায় চৌধুরী দাঁড়িয়ে। কাঁধ অলসভাবে ঝুঁকে পড়েছে দুপাশে, হাত মুঠো পাকানো।

মিস্টার সান্যাল, আপনাকে শুধু বলতে এলাম, ওই গাড়ির নাম্বারটা নিয়ে আমরা খোঁজখবর করেছি।–চৌধুরীর কণ্ঠস্বর মাখনের মতো নরম ও ওয়াগনটাকেও আমরা খুঁজেও পেয়েছি। ওটার রং মেরুন আপনি যেমনটি বলেছেন। ওয়াগনের মালিক এক মহিলা মিসেস কণা মিত্র। তার বাড়ি এখান থেকে মাত্র মাইদুয়েক দূরে!

তাই নাকি? তা হলে তো একেবারে কাছে।অবাক হয়ে বললাম।

এবং আপনার কথামতো সেই ডেডবডিটাও আমরা খুঁজে পেয়েছি, মিস্টার সান্যাল।

ভদ্রমহিলাকে আপনারা অ্যারেষ্ট করেছেন...।–বলতে-বলতে মাঝপথে থেমে গেলাম। কারণ দেখলাম, চৌধুরী মাথা নাড়ছে।

না, গ্রেপ্তার করিনি। কারণ গ্রেপ্তার করার মতো কোনও ক্রাইম তিনি করেননি। কিছুই করেননি। কিন্তু আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে, মিস্টার সান্যাল–আমরা মিসেস মিত্রের বাড়িতে যাব।

কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে আমার আর গিয়ে লাভ কী?

আপনাকে আসতেই হবে, মিস্টার সান্যাল, কারণ, না এলে আপনাকে আমি টানতে-টানতে নিয়ে যাব, ঢুকিয়ে দেব গাড়ির পেছনের ডিকিতে। গত পাঁচঘণ্টা ধরে আমি কীসের পেছনে ছুটে বেরিয়েছি সেটা আপনাকে দেখাতে চাই। তারপর, মিসেস মিত্রের কাছে আপনি ক্ষমা চাওয়ার পর, যদি কোনও কেসে আপনাকে ফাসাতে না পারি তা হলে বাধ্য হয়ে হয়তো আপনাকে ছেড়ে দেব।

চৌধুরীর সঙ্গে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারের দোকানপাটের সাইনবোর্ডগুলো পড়তে থাকলাম। এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না। চৌধুরী আমার দিকে একবার মুখ ফেরাল না পর্যন্ত। শুধু তাকিয়ে আছে উইন্ডশিল্ডের দিকে। চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

.

মিসেস মিত্রের পাড়াটা ব্যবসায়ীদের পাড়া। সুতরাং জমজমাট।

একটা গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে থামল চৌধুরী। ইঞ্জিন বন্ধ করে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওই যে, ওই বাড়িটায় আপনার খুনি থাকে।

বাড়ির দরজাটা আংশিক কাচের। এবং সেই ঘষা কাচের প্যানেলে লাল রং দিয়ে লেখা মিত্র ডেকরেটার্স।

দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। চৌধুরীই নক করল, আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল দরজা।

গায়ে কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে যে-মহিলা আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে চিনতে আমার কোনও ভুল হল না। ইনিই ছিলেন সেই মেরুন স্টেশান ওয়াগনে।

মহিলার চেহারা শক্তসমর্থ, লম্বায় প্রায় আমারই সমান। হঠাৎ দেখলে অ্যাথলিট বলে ভুল হতে পারে। চোখে এখন সানগ্লাস নেই। সুতরাং, তেজি ঘোড়ার মতো উদ্ধত ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

মিসেস মিত্র, ইনিই মিস্টার সান্যাল।–চৌধুরী ওঁকে বলল।

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বরফ মাখানো এক সুদীর্ঘ দৃষ্টি উপহার পেলাম।

তারপর তিনি ঘুরলেন ইন্সপেক্টর চৌধুরীর দিকে। হাসলেন। প্রশ্ন করলেন, এঁর কথাই কি আপনি আমাকে বলছিলেন? যিনি আমার স্টেশান ওয়াগনটা রাস্তায় দেখেছেন?

হ্যাঁ, ইনিই।–চৌধুরীর স্বর আবেগহীন, শান্ত। সে আরও বলল, আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি এঁকে…ইয়ে…ডেডবডিটা একটু দেখতে দেন–

নিশ্চয়ই দেখাব। দেখলে হয়তো ওঁর দুশ্চিন্তা কমবে। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

ঢুকেই ডানদিকে ভেলভেটের পরদা দেওয়া একটা ঘর। পরদা সরিয়ে সেই ঘরে আমাদের আহ্বান জানালেন মিসেস মিত্র।

ঘরটা বিশাল। দেখলে হঠাৎ করে কোনও কারখানা বলে ভুল হয়। অথবা মনে হতে পারে প্রাচীন কোনও টরচার-চেম্বার। কারণ, ঘরের এখানে সেখানে উলঙ্গ দেহ ও দেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পড়ে আছে। তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ তফাত নেই। চোখে স্থির শূন্য দৃষ্টি। ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের বড় টেবিল। তার ওপর রং, তুলি, হাতুড়ি, পেরেক ইত্যাদি অগোছালোভাবে পড়ে আছে। এক কোণে চোখে পড়ে হাত-পায়ের স্তূপ। আর, একটা টেবিলে সাজানো সারি-সারি মাথা। তার কোনও-কোনওটায় চুল থাকলেও বেশিরভাগই টাকমাথা।

হাত বাড়িয়ে একটা মাথা ছুঁয়ে দেখলাম। রুক্ষ কঠিন। নিঃসন্দেহে প্লাস্টার অফ প্যারিস।

মিসেস মিত্র এগিয়ে গেলেন ঘরের একটা কোণের দিকে। চৌধুরী পকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে রাখল। তারপর লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাল। ভাবলাম ওর কাছ থেকে একটা সিগারেট চাইব, কিন্তু ও যে-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সে-নজর ইস্পাতের ঠান্ডা পাতে পড়লে সহজেই সেটা ফুটো হয়ে যেত।

সুতরাং মিসেস মিত্র ফিরে আসা পর্যন্ত মেঝের দিকেই চেয়ে রইলাম। মিসেস মিত্র খালি হাতে ফেরেননি। কোলে করে নিয়ে এসেছেন একটা প্লাস্টারের ম্যানিকিন। তার রং মাখা মুখে বোকা বোকা হাসি।

এই হল রুকি, মিস্টার সান্যাল। মিসেস মিত্র আমাকে বললেন, এখানে তৈরি প্রতিটি মডেলের একটা করে নাম আছে। তাতে কাজের সুবিধে হয়। আজ সকালে আমার গাড়িতে আপনি নির্ঘাত ওকেই দেখেছিলেন। জানেন তো, আমি আর আমার হাজব্যান্ড মিলে নানান দোকানের শো-কেস মডেল দিয়ে সাজাই। বিশেষ করে কাপড়ের দোকান। মডেলগুলো আমরা তৈরি করি। আর দোকান থেকে দেয় মডেলের সব ড্রেস। ব্যস। তারপর আমাদের কাজ হল পোশাক-টোশাক পরিয়ে সেগুলোকে শো-কেসে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া। রুকি হল

কলকাতার বিখ্যাত কাপড়ের দোকান যমুনালাল পান্নালাল-এর প্রপার্টি। মাত্র দু-দিন আগে ওকে নতুন করে আবার রং করেছি। আজ সকালে ওকে নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম কলকাতায়।

একটু থেমে আবার বলে চললেন মিসেস মিত্র, ন্যুড অবস্থায় স্টেশান ওয়াগনে করে তো আর ডামিগুলোকে নিয়ে যাওয়া যায় না! তা হলে আপনার মতো আরও অনেকেই হয়তো ভুলভাল ভাববে। তাই প্লাস্টিকের কভার হাতের কাছে না পাওয়ায় একটা চাদর চাপা দিয়েই রুকিকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রাস্তায় অতবার থামতে আর চলতে গিয়ে চাদরটা সরে যায়। তখনই ওর একটা হাত বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

মিসেস মিত্র থামতেই আমি বললাম, কিন্তু আপনি তো রুকিকে যমুনালাল পান্নালালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তা হলে এখানে ওটা এল কী করে?

হাসলেন মিসেস মিত্র। বললেন, ও, এই কথা? আসলে কী হয়েছে জানেন, রং করার সময় ওর হাতে খানিকটা লাল রং চলকে পড়ে যায়। সে অবস্থায় ওকে তো আর শো-কেসে সাজানো যায় না। যমুনালালের দোকানে পৌঁছে যখন রুকিকে বের করতে যাই তখনই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে। ওই দেখুন।

আঙুল তুলে রুকির ডানহাত দেখালেন মিসেস মিত্র। সত্যিই তাই। কনুই থেকে শুরু হয়েছে। লাল দাগটা, এবং থেমেছে এসে ডানহাতের মাঝের দু-আঙুলের প্রান্তে।

এই হল আপনার রক্ত, মিস্টার সান্যাল।ব্যঙ্গভরে বলল চৌধুরী।

চৌধুরীর নজরে নজর মেলানোর চেয়ে হিমালয়ের চূড়া থেকে অতলান্ত সাগরে ঝাঁপ দিতেও আমি রাজি। চৌধুরীর গলা দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত চাপা গর্জন বেরিয়ে এল। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পেলাম।

আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে, মিস্টার ব্যোমকেশ বক্সী?–চৌধুরীর তিক্ত ব্যঙ্গ যেন কেটে বসল আমার শরীরে : এবারে আমরা যাব। তার আগে ওই কোণের একটা প্লাস্টারের মেয়েছেলের সঙ্গে আপনি একটু ফস্টিনস্টি করে নেবেন?

কিছুই বলার নেই আমার। একটা সামান্য ডামির জন্যে একজন ক্লান্ত ডিটেকটিভকে দিয়ে আমি কী অমানুষিক পরিশ্রম করিয়েছি। তা ছাড়া একজন

নির্দোষ মহিলাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছি। কেন যেন মনে হল, চৌধুরী আমাকে এত সহজে ছাড়বে না।

চৌধুরী আমার বাড়িতে ফিরে এল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন চালু রেখেই মুখ খুলল। মিসেস মিত্রের সামনে যেসব ভাষা চৌধুরী ব্যবহার করতে পারেনি তারই মহড়া দিল প্রায় দশমিনিট ধরে। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনলাম। ভাবলাম, আমাকে এসব বলে চৌধুরী অন্তত একটু হালকা হোক।

বাড়িতে ঢুকে কাজের লোককে বললাম কড়া করে এক কাপ কফি দিতে। তারপর শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মনে-মনে নিজেকে হাজাররকম গালাগাল দিলাম। ভাগ্যিস রুমা বাড়িতে নেই। থাকলে ওর কাছে থেকেও একপ্রস্ত শুনতে হত।

সারাদিনের ক্লান্তির জন্যেই হোক, বা এতক্ষণের দুশ্চিন্তার জন্যেই হোক, মিনিটকয়েকের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার চোখ ও মন থেকে বাইরের পৃথিবী মুছে গেল।

*

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই, তবে ঘুম ভেঙে দেখি বাইরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। অনেকে যেমন ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, আমি তেমনটা পারি না। ধীরে ধীরে অচেতন জগৎ থেকে আমি উঠে আসি চেতনার জগতে।

চোখ খুলে প্রথম তাকিয়েছি ঘরের জানলার দিকে। তখনই বুঝেছি সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়েছে। তারপর মনে পড়ল অনুপম বক্সীর কথা, এবং পরক্ষণেই ভেসে উঠল টাক মাথা অফিসার চৌধুরীর রুক্ষ মুখটা।

সমস্ত ব্যাপারটা ভুলতে আবার চোখ বুজলাম। চোখ বুজতেই আমার মন ভেসে গেল সারি সারি গাড়িতে টইটম্বুর সকালের রাস্তায়। আমি যেন আবার বসে আছি আমার গাড়িতে। সামনে সবুজ অ্যামবাসাডরটা। আর ডানদিকেই মিসেস মিত্রের মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা। আমি তাকিয়ে আছি স্টেশান ওয়াগনের পেছনে রাখা চাদর-ঢাকা অবয়বটার দিকে। হঠাৎই চাদর সরে গিয়ে বেরিয়ে এল হাতটা। কিন্তু

না, মানুষের হাত নয়। একটা প্লাস্টারের হাত। মিসেস মিত্রের স্টুডিয়োর সেই হতচ্ছাড়া ডামি, রুকির হাত। তবে

তখনই আমার তন্দ্রার ভাবটুকু নিমেষে মিলিয়ে গেল। স্পষ্ট বুঝলাম, চৌধুরী এবং আমি, দুজনেই বিরাট ভুল করেছি। মিসেস মিত্র চালাকিতে আমাদের টেক্কা দিয়েছেন। সকালের রাস্তার দৃশ্যটা স্পষ্ট আমার মনে ভাসছে। চাদরের নীচে কোনও মৃতদেহের বদলে আমি রুকিকে ভাবতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। কারণ লাল রংটা ছিল রুকির ডানহাতে, আর যে-হাতটা আমি গাড়িতে দেখেছি, সেটা কোনও মানুষের বাঁ-হাত!

বিছানায় বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। চৌধুরীকে ফোন করে সব বলব? সে আমার কথা বিশ্বাস করবে তো? আর করলেও, এখন আমরা কী করব?

কী করব ভাবতে-ভাবতে আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎই বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। অতিথি এসেছে আমার কাছে। যে-ই আসুক, সে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছে। কারণ, কড়া নাড়ার খটখট শব্দটা যে আমার মাথার ভেতর থেকে আসছে না সেটা বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে।

চৌধুরীকে ডাকব কি ডাকব না ভাবতে-ভাবতে দরজার কাছে গেলাম।

দরজা খুললাম।

দরজার দাঁড়িয়ে মিসেস মিত্র। গায়ে বিকেলের সেই কাশ্মীরি শাল। এবং একটা উলের মাফলার–যেটা তখন দেখিনি। সব মিলিয়ে তাঁর এই সাজ হাস্যকর। তবে তার হাতের মুঠোয় ধরা জিনিসটা মোটেও হাস্যকর নয়।

জিনিসটা একটা ০.৪৫ অটোমেটিক। তার নলের ফুটোটা সরাসরি আমার পেট লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছে। এবং ফুটোর আকারটা আমার কাছে জলের পাইপের মতো বিশাল ঠেকল।

আমার প্রথম কথাগুলো যেমন এলোমেলো তেমনই অর্থহীন, তবে আমার সারাদিনের অবস্থার কথা ভাবলে সে-দোষ ক্ষমা করা যায়।

হাতের হিসেবটা আপনার ভুল হয়ে গেছে, তাই না মিসেস মিত্র?

হ্যাঁ। তাই ভাবছিলাম, এটা খেয়াল হতে আপনার কতটা সময় লাগবে। কথাটা বলেই বসবার ঘরে ঢুকে এলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। তারপর বললেন, ইনস্পেক্টর চৌধুরী যখন দোকানে গিয়ে আমাকে আপনার কথা বললেন, তখন তাড়াহুড়ো করে ডামিটা আমাকে রেডি করতে হয়। আপনি কী দেখেছেন সেটা মিস্টার চৌধুরী আমাকে বলেছেন, কিন্তু কোন হাতটা যে চাদরের তলা দিয়ে বেরিয়ে ছিল তা বলেননি। সেটা আমারও ঠিক মনে পড়ল না। সুতরাং আন্দাজেই রুকির ডান হাতে রং লাগাতে হল। এবং আমার আন্দাজ ভুল হল। তবে মাত্র একঘণ্টা আগে সে-ভুলটা বুঝতে পারলাম। মনে পড়ল, চাদরের তলা থেকে যে-হাতটা বেরিয়ে ছিল সেটা বাঁ হাত।

আর আপনি ভাবলেন, আমার হয়তো সেটা খেয়াল পড়বে…।

মিসেস মিত্র হাসলেন। বললেন, রাস্তায় গাড়ির ভিড়ে আপনি আমার এত কাছে ছিলেন যে, এখন তোক পরে তোক এ-ব্যাপারটা আপনার মনে পড়তই। সুতরাং টেলিফোন-বই দেখে আপনার ঠিকানাটা বের করে চলে এলাম।

তা, এখন কী হবে?

আমরা একটু বেরোব, মিস্টার সান্যাল। প্রথমে আমরা আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব। সে একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরের হয়ে কংক্রিট মিক্সার চালায়। আমার কথা সে চোখ বুজে শোনে– অবশ্য ঠিকঠাক দাম দিলে তবেই। তারপর যেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে নীতিনের সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

নীতিন? আজ সকালে চাদরের নীচে বুঝি উনিই ছিলেন?

মিসেস মিত্র সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

হ্যাঁ। নীতিন–আমার হাজব্যান্ড। সে একটা বেহেড মাতাল, লম্পট, কাপুরুষ। শয়তান হাসি ফুটে উঠল ওঁর ঠোঁটে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, সে যাক, নীতিন তো আর নেই।

নেই? কোথায় গেছেন?

যেখানে গেলে আর ফেরা যায় না। মানে, নেক্সট ইয়ারে এই সময়ে ওর আত্মা ইহলোকের মায়া থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে, এবং একইসঙ্গে ওর কবরের ওপর গড়ে উঠবে হাই-ফাই এক লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট। সামনের সপ্তাহেই তার ফাউন্ডেশান স্টোন বসানো হবে।

টের পেলাম, আমার হাতের তালু দরদর করে ঘামছে। কিন্তু মরে গেলেও এই মহিলার কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে অনুনয়-বিনয় করতে পারব না।

তা হলে আমি ও নীতিনবাবু একইসঙ্গে একই কবরে জায়গা পাচ্ছি?–প্রচণ্ড চেষ্টায় গলার স্বর সমান রাখলাম! কিন্তু হঠাৎ এরকমভাবে আমি উধাও হয়ে গেলে ইনস্পেক্টর চৌধুরী কি সন্দেহ করবেন না? বিশেষ করে আজকের ঘটনার পর?

যত প্রাণ চায় সন্দেহ করুক। চৌধুরী কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তা হলে আমরা রওনা হই, মিস্টার সান্যাল?

রওনা হব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজার প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বাইরে যে-ই থাকুক না কেন, আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার ভীষণ জরুরি দরকার।

মিসেস মিত্র কোণঠাসা বেড়ালের মতো চকিতে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিছুটা যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। একবার ভাবলাম, ওঁর হাতের রিভলভারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু আমাদের মধ্যে দূরত্ব অনেক। চঞ্চল চোখে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তিনি রিভলভারটা লুকিয়ে ফেললেন শালের আড়ালে। কিন্তু তখনও ওটা তাক করে রইল আমার দিকে।

কিছুটা ভয়ের গলায় মিসেস মিত্র আমাকে বললেন, যে এসেছে তাকে তাড়াতাড়ি তাড়ান। আর চালাকি করে পালানোর চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার ঠিক পেছনেই থাকব। দরকার হলে একগুলিতে দুজনের লাশ ফেলে দেব।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গভীর শ্বাস নিয়ে দরজা খুলে পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করলাম। বাইরে যে দাঁড়িয়েছিল সে-ই বাকি কাজটা শেষ করল। ছিটকে খুলে গেল দরজা, এবং রকেটের গতিতে ঘরে ঢুকল চৌধুরী। এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারল আমাকে। আমি বলতে গেলে উড়ে গিয়ে পড়লাম ঘরের অন্য প্রান্তে।

দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। মিসেস মিত্র অবাক হয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন, রিভলভারটা তখনও শালের আড়ালে লুকোনো।

শালা, শুয়োরের বাচ্চা!–আমার মুখের কাছে এসে খেঁকিয়ে উঠল চৌধুরী, তোমাকে আজ তুলে নিয়ে গিয়ে যক্ষ্মা-ধোলাই দেব। আজ যখন বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি তখন কী হয়েছে জানো? অপদার্থের মতো কাজ করেছি বলে তিনি আমাকে কথা দিয়ে এক থাপ্পড় মেরেছেন। এখন আমার সব প্রোমোশান সিল হয়ে যাবে, সান্যাল। শুধু তোমার জন্যে।

কথা শেষ হতেই সে আমার একটা হাত চেপে ধরল। এক হ্যাঁচকায় আমাকে তুলে নিয়ে প্রায় ছুঁড়ে দিল অন্য একটা দেওয়ালে। হাত-পা মুড়ে ছিটকে পড়লাম শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে। যন্ত্রণা যত না টের পাচ্ছিলাম তার চেয়ে অবাক হচ্ছিলাম বেশি।

নিরপরাধ নাগরিকদের মিছিমিছি হয়রান করা। বড়সাহেব এই কথা বলে আমাকে হেভি ঝেড়েছেন। চৌধুরী বলল। তারপর ঘুরে তাকাল মিসেস মিত্রের দিকে। উনিও আমার মতোই হতভম্ব, বিস্মিত।

আমি কিন্তু চৌধুরীর প্রমোশনের জন্যে মোটেও চিন্তিত নই। বরং নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি।

মিসেস মিত্রকে লক্ষ করে চৌধুরী বলল, ভালোই হয়েছে, আপনিও এখানে রয়েছেন, মিসেস মিত্র। নইলে আমাকেই দেখা করতে যেতে হত। আপনি এই লোকটার নামে মানহানির মামলা করুন। একে পথের ভিখিরি করে ছাড়ুন।

চৌধুরী পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি তখন কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি।

সে চিৎকার করে উঠল, না, শুধু মানহানির মামলায় আমার পেট ভরবে না। তোমাকে সাতজন্মের শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।

পা তুলে সে আমার পিঠে রাখল, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। তিরবেগে দরজা দিয়ে আমি ছিটকে গেলাম শোওয়ার ঘরে। মাথাটা ঠুকে গেল একটা বুকশেলফ-এর কোণে। এবং অবশেষে বিকট শব্দে আছাড় খেয়ে পড়লাম ফ্রিজের পাশে।

এবার ভয়ার্ত চোখে তাকালাম চৌধুরীর দিকে। শুধু রাগ হলে এ-ব্যবহারের মানে বুঝতাম, কিন্তু এ তো রাগ নয়, নৃশংস প্রতিশোধের জ্বালা।

কোটের ভেতর থেকে রিভলভার বের করে এনেছে চৌধুরী। এরা দুজন মিলে যদি আমার এগেইনস্টে যায় তা হলে আমার আর বাঁচার আশা নেই।

কিন্তু চৌধুরী শোওয়ার ঘরে ঢুকেই একপাশে আড়ালে সরে গেল। ইশারায় আমাকে বলল নীচু হয়ে লুকিয়ে থাকতে। তারপর মিসেস মিত্রকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলল, রিভলভারটা ফেলে দিন, মিসেস মিত্র। মিস্টার সান্যালের আর কোনও ভয় নেই। আর আপনারও পালানোর পথ নেই। আই এম ইন চার্জ নাউ।

বিকট এক কানফাটানো শব্দে চৌধুরীর উত্তর এল। মিসেস মিত্রের রিভলভারের গুলি নিমেষে এসে বিঁধল শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে। কিছুটা সিমেন্ট-বালি খসে পড়ল মেঝেতে।

চৌধুরী সতর্ক ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। রিভলভার ধরা হাতের কবজিটা চেপে ধরল অন্য হাতে। তারপর অত্যন্ত যত্নে নিশানা ঠিক করে নিয়ে একবার গুলি ছুড়ল।

বসবার ঘর থেকে এক ভয়ংকর তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে এল। চৌধুরী লাফিয়ে বেরিয়ে গেল শোওয়ার ঘর থেকে। আমি একটু পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করলাম।

দেখলাম, মিসেস মিত্র মেঝেতে পড়ে আছেন। ওঁর পাশে পড়ে থাকা রিভলভারটা চৌধুরী কুড়িয়ে নিল। মিসেস মিত্রের শালের সামনেটা আঠালো লাল রঙে মাখামাখি। তিনি জীবিত কি মৃত সেটা বোঝার জন্যে ডাক্তারি পরীক্ষার দরকার।

চৌধুরী আমাকে বলল, ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিন। এখনও হয়তো উনি বেঁচে আছেন।

অবশেষে একসময় মিসেস মিত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাদের আশ্বাস দিলেন যে, ওঁর প্রাণের কোনও আশঙ্কা নেই, এবং শিগগিরই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর মতো সুস্থ হয়ে উঠবেন।

মনে হল প্রায় কয়েকশো সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ আসলে আট কি দশজন–আমার বাড়ি ছেয়ে ফেলেছে। সব গোলমাল মিটে যাওয়ার পর তাদের যা করণীয় তারা তাই করতে লাগল। তাদের কাজ শেষ হলে আমার বাড়ির যা অবস্থা হল তা আর বলার নয়। যেন বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা। আর চৌধুরী একটানা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমোনোর ফলে ঘরে চলাফেরা করছে জীবন্ত এবং মাতাল মমির মতো।

ঘর ফাঁকা হলেও সে বিড়বিড় করে বলল, আপনার সঙ্গে একটু গায়ের জোর দেখিয়েছি আর গালিগালাজ করেছি বলে কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সান্যাল। কিন্তু এখানে আসতে গিয়ে বাইরে মিসেস মিত্রের মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা দেখে আমি চমকে উঠি। তখন উঁকি মারি বসবার ঘরের জানলা দিয়ে। ভেতরের নাটক, মিসেস মিত্রের রিভলভার, সবই আমার চোখে পড়ল। সুতরাং আপনাকে বাঁচাতে যে-বুদ্ধিটা মাথায় এসেছে সেটাই খাঁটিয়েছি।

না, না, ক্ষমা চাইতে হবে না। আমি বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আপনি এখানে ফিরে এলেন। কেন? বিকেলবেলা তো আমি ভাবলাম, আপনি এ-মামলায় হাত ধুয়ে ইস্তফা দিলেন।

তাই করতাম। শুধু আমার বউয়ের জন্যে।–চৌধুরী জবাব দিল। আপনার বউ?

হ্যাঁ। বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার ওপর রাগে ঘুম এল না। সুতরাং বসে-বসে গোটা গল্পটা বউকে শোনালাম। আমার কাহিনি শেষ হলে ও শুধুই ঠোঁট ওলটাল। ডিটেকটিভের বউ হওয়ার ফলে ও জানে, এরকম হলে মনের অবস্থাটা কী হয়। কিন্তু হঠাৎই ও রেগে গিয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, তোমার কোটটা আবার দোকানে কাচতে দাও। কোটের হাতায় এসব কী লাগিয়ে এনেছ?

গৃহিণীরা যেরকম বলে থাকে সেরকম সুর ওর গলায়। আমার ক্লান্তির কথা, হতাশার কথা, ওর মনেও পড়ল না। কোটে দাগ লাগিয়েছি বলে খাপ্পা হয়ে উঠেছে আমার ওপরে।

ঠিক বুঝলাম না।

আমিও বুঝিনি…অন্তত তখন। তারপর কোটের হাতায় তাকিয়ে কী দেখলাম জানেন?

কী?

লাল রং।

তাতে কী?

সুতরাং, তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম। লাল রংটা আমার কোটে একমাত্র যে-জায়গা থেকে লাগতে পারে তা হল রুকির হাত। মানে মিসেস মিত্রের ওই ডামি। আর তা যদি হয়, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই দুদিন আগে ওটা রং করেননি। অথচ তিনি আমাদের তাই বলেছেন। প্রথমে যখন আমি একা ওঁর বাড়িতে যাই তখন আমাকে ওটা দেখানোর মাত্র মিনিটকয়েক আগে তিনি রুকির ডানহাতে ওই লাল রংটা লাগিয়ে দেন। স্পষ্ট মনে আছে, আমাকে দরজার দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি একবার ওই স্টুডিয়োতে ঢোকেন এবং আমি যাতে রুকির হাতে হাত না দিই সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মনে হয়, ফেরার সময় হয়তো রুকির হাতে আমার কোটের হাতাটা ঘষে গিয়ে থাকবে।

একটু থেমে চৌধুরী আবার বলতে শুরু করল, সে যাই হোক, যদি রুকির হাত থেকেই ওই লাল রংটা এসে থাকে তা হলে এটা বুঝতে হবে মিসেস মিত্র ওই ডামিটা রং করে তৈরি রেখেছেন আমাকে বোকা বানানোর জন্যে—অর্থাৎ, তিনি আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমি গাড়ি নিয়ে ছুটে গেলাম ওঁর বাড়িতে, কিন্তু দেখলাম, তিনি বাড়িতে নেই। তখন ভাবলাম, আপনার কাছেই আসি, একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে যাই ব্যাপারটা নিয়ে। এসে দেখি বাইরে মিসেস মিত্রের স্টেশান ওয়াগনটা দাঁড়িয়ে। বাকিটা তো আপনি জানেন।

একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল চৌধুরী। যেন এই কথাগুলো বলে তার অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে।

সুতরাং জিগ্যেস করলাম, ওঁর স্বামীর বডিটা কোথায়? তিনি বলছিলেন, কোথায় একটা বড় বাড়ি তৈরি হবে, সেই জমিতে নাকি পোঁতা আছে?

চৌধুরীর দু-চোখের পাতা যেন দু-দুটো ভারী পাথর। নিছক ইচ্ছেশক্তিতেই সে যেন চোখ খুলে রেখেছে।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন নয়, অনেক প্রশ্ন… বিড়বিড় করে বলল চৌধুরী, কে মিসেস মিত্রকে সাহায্য করেছে? কীভাবে ওঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে? এসব

প্রশ্নের উত্তর কাল থেকে খুঁজতে শুরু করব।

কিন্তু ডেডবডিটা খুঁজে পাবেন কী করে?

কোথায়-কোথায় নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেটা আমাদের খোঁজ করতে হবে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে খোঁজ নেব…।

সত্যি, এটা আমার মাথায় আসেনি। চৌধুরীকে মনে-মনে সাবাস দিলাম।

মিউনিসিপ্যালিটিতে খোঁজখবর নেওয়ার পর খুঁজে পাওয়া যাবে সেই বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরকে। তারপর জানতে পারব কে মিসেস মিত্রের বন্ধু যে ওঁর সব কথা চোখ বুজে শোনে এবং সেই কন্ট্রাক্টরের কংক্রিট মিক্সার চালাতে পারে। তারপর–।

চৌধুরীকে সেকথা বলতে গিয়ে দেখি সে চেয়ারে বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

অতএব, মনে-মনে শুধু ভাবলাম, ভাগ্যিস ট্রেন স্ট্রাইক হয়েছিল!

# টাইম-কিলার (নভেলেট)

**টাইম-কিলার (নভেলেট)**

লেখার শুরুতেই শ্রীহার্বার্ট জর্জ ওয়েল্স-কে আমার প্রণাম জানাই। যাকে আপনারা সবাই এইচ. জি. ওয়েল্স নামে বেশি চেনেন। ডি. এসসি., ডি. লিট. ইত্যাদি ডিগ্রিওয়ালা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখে প্রচুর নাম-টাম করেছিলেন। আজও ওঁর লেখার জবাব নেই।

কিন্তু আমি ওঁকে গুরু বলে মানি ওঁর দ্য টাইম মেশিন গল্পটার জন্যে। কারণ, ওই গল্পের আইডিয়া থেকেই এনার্জি পেয়ে আমি শুধু একটা টাইম মেশিন তৈরি করার জন্যে তেরোবছর ধরে লড়ে গেছি।

শেষ পর্যন্ত সেটা তৈরি করতে পেরেছি। তবে ওয়েল্স-এর মেশিনের চেয়ে আমার মেশিনটা একটু অন্যরকম। আর যে কাজে আমার মেশিনটাকে লাগাতে চলেছি সেটাও ওয়েল্স-এর টাইম ট্রাভেলার-এর চেয়ে অন্যরকম।

মানে, আমার টাইম মেশিনটা কাজে লাগিয়ে আমি একটা খুন করতে চলেছি। নিখুঁত খুন। পারফেক্ট মার্ডার। তবে সে-কথায় পরে আসছি।

এই দুনিয়ায় টাকার দরকার কার নেই! আমারও আছে। আর সেই দরকারটা চাগিয়ে উঠেছে। গত পনেরোবছর ধরে হাজারোরকমের যন্ত্রপাতি তৈরি করার নেশায় পাগলের মতো খরচ করার জন্যে। তাই আমার টাইম মেশিন তৈরির পেছনে একনম্বর মোটিভেশান ছিল টাকা। দু-নম্বরে যশ, খ্যাতি এটসেট্রা। তারপর...।

মোটের ওপর আর যা-ই থাক, মার্ডারটা আমার প্ল্যানে ছিল না। সেটা আচমকা মাথায় ঢুকে পড়েছিল। তা ছাড়া যখন আপনি জানেন যে, খুন করলেও পুলিশ

আপনার চুলের ডগাও স্পর্শ করতে পারবে না–আপনি সৎ-সাচ্চা নাগরিকের মতো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, তখন তো সাহস বাড়বেই!

মেশিনটা আবিষ্কার করার পর ওটা নিয়ে ছোটখাটো কয়েকটা টেস্ট করলাম। যখন দেখলাম, ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকঠাক আছে, তখন আনন্দে এক অদ্ভুত চিৎকার করে লাফিয়ে উঠেছিলাম। তাতে গ্যারাজের নিচু সিলিং-এ মাথা ঠুকে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই প্রথম আনন্দের ঝলকটা ছিল নিখাদ আবিষ্কারের উল্লাস–জেনুইন বিজ্ঞানীদের যেমনটা হয়ে থাকে। তখন কিন্তু টাকা, বড়লোক–এসব ব্যাপার মাথায় ছিল না।

প্রায় দু-দিন এই মহান আবিষ্কারের ব্যাপারটা চেপে রাখলাম। বন্ধুবান্ধব, রিলেটিভ কাউকে বললাম না। এমনকী জিনিয়ার কাছেও ভাঙলাম না। কিন্তু দু-দিন পেরোনো পর এই খুশির খবরটা চেপে রাখতে গিয়ে আমার দম প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

শেষ পর্যন্ত, তিনদিনের দিন, সাড়ে আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে চা খেতে-খেতে জিনিয়াকে বললাম, একটা দারুণ খবর দেব–।

ও টিভিতে কী একটা নাচের প্রোগ্রাম দেখছিল। তেরছাচোখে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, কী খবর? এইমাত্র নিউজপেপারে পড়লে?

না, না। আমার একটা নতুন ইনভেনশান। একটা ইউনিক মেশিন। টাইম মেশিন। সারা পৃথিবী একেবারে চমকে যাবে। আমাদের…।

চা-টা একবার সিপ করে দ্যাখো তো, চিনি ঠিক আছে কি না। খবর পড়ার ঢঙে নিপ্রাণ গলায় জিনিয়া বলল।

না, ওর কোনও দোষ নেই। আমাদের বিয়ের পর দশবছর ধরে আমার নানান আবিষ্কারের এক্সক্লুসিভ খবর শুনে-শুনে ও ক্লান্ত।

প্রথম-প্রথম ও এইসব খবর শুনে খুশি হত। তারপর একসময় লক্ষ করলাম, ও বিরক্ত হয়। ওর রিঅ্যাকশানগুলো কেমন তিরিক্ষে, ব্যঙ্গের খোঁচায় খচিত। আর ইদানীং ওর প্রতিক্রিয়া নির্লিপ্ত, তিব্বতী ইয়াকের মতো।

আমি ওকে বললাম যে, চায়ে চিনি ঠিক আছে এবং আমি একটা অভিনব আবিষ্কার করেছি।

ও আবেগহীন গলায় বলল যে, আবিষ্কারটা অবশ্যই অভিনব, সবাইকে চমকে দেওয়ার মতো, এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সম্ভাবনায় প্রেগন্যান্ট। এটার জন্যে ও আমাকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কথাগুলো বলেই ও চায়ের কাপ হাতে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। একটা সোফায় গা এলিয়ে টিভির নাচে এবং চায়ে মনোযোগ দিল।

আমি ওর মুখের দিকে একবার তাকালাম। তারপর সামনের খোলা বারান্দায় চোখ রাখলাম। সকালের রোদ, বাইরের গাছপালার সবুজ, নীলচে আকাশ–সব সত্যি। আমার টাইমে মেশিনও। কিন্তু জিনিয়া শেষের সত্যিটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না। অবশ্য সব তাবড়-বড় বিজ্ঞানীর কপালেই এইরকম হেনস্থা জুটেছে।

এমনিতে জিনিয়া খুব ভালো মেয়ে। দেখতে ভালো। ফিগার চমৎকার। সর্বাঙ্গে প্রচুর হাতছানি। তা ছাড়া গুণও আছে। একসময় নাচের চর্চা করত। এখন প্রায়ই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল করায়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর নজরুল-জয়ন্তীতে সেগুলো প্রদর্শিত হয়। প্রশংসাও পায় প্রচুর। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এসব ব্যাপারে ও সত্যিই মাহির।

শুধু ইনভেন্টর স্বামীর ব্যাপারে ও একটু বেশি টায়ার্ড।

নিজের পাগলামোয় টায়ার্ড আমিও ছিলাম। কারণ, গত পনেরোবছরে বেশ কয়েকটা ছোটখাটো আবিষ্কার করতে পারলেও আমার অসমাপ্ত কিংবা ব্যর্থ আবিষ্কারের তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু তিনদিন আগে টাইম মেশিনটা আবিষ্কারের পর আমি আবার টগবগিয়ে উঠেছি। এটাই পৃথিবীর প্রথম সফল বাস্তবের টাইম মেশিন। এটা কল্পবিজ্ঞান নয়–বিজ্ঞান। এর আবিষ্কারকের নাম দেবদত্ত রায়চৌধুরী। আমি।

এবারে মেশিনটার কথা একটু বলা যাক।

ব্যাপারটা ব্যাপক কমপ্লিকেটেড হলেও আমি সিম্পল টার্মস-এ বোঝানোর চেষ্টা করছি।

মেশিনটার মাপ একটা ছোট টিভির মতো। তার সঙ্গে লাগানো একটা একফুট বাই একফুট মেটাল প্ল্যাটফর্ম। টাইম ট্রাভেল করতে হলে এই প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়াতে হয়, বা কোনও জিনিস রাখতে হয়। তারপর ডায়াল সেট করে, কিবোর্ডে একগাদা বোম ঠুকে, নব ঘুরিয়ে, এন্টার বাটুন টিপে মেশিনটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হয়।

মেটাল প্ল্যাটফর্মটা ভাঁজ করা যায়। ওটা সমেত মেশিনটার ওজন সাড়ে চার কেজি। সুন্দর নীল রঙের একটা চৌকোনা ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢোকানো। বাইরে থেকে শুধু কয়েকটা ডায়াল, এলসিডি প্যানেল, একটা কিবোর্ড, আর চারটে নব ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। একটা রিচার্জে ব্যাটারি মেশিনটার শক্তি জোগায়। মোবাইল ফোনের মতো। চারঘণ্টা চার্জ দিয়ে নিলে মেশিনটা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক অ্যাক্টিভ থাকে।

টাইম স্কেলে আমার মেশিনটা সরাসরি পেছনদিকে যেতে পারে না। মানে, অতীতে যাওয়ার ব্যাপারে ওটার কিছু রেট্রিশান আছে। যেমন, ধরা যাক, আমি পাস্ট-এ যেতে চাই। যদি আমি পাঁচবছর আগের একটা সময়ে কোনও পারটিকুলার লোকেশানে হাজির হতে চাই, তা হলে সেই সময়ে আমি সেখানে ঠিক যে-অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় তৈরি হয়ে মেশিনটা অপারেট করলে তবেই মেশিনটা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। মানে, আমার সবকিছুই সেই পাঁচবছর আগেকার মতো হুবহু এক হতে হবে–এমনকী পোশাক-আশাকও। যাকে বলে জেরক্স কপি। তা না হলে মেশিনটা এলসিডি প্যানেলে মিসম্যাচ ফেলিয়োর এরার মেসেজ দেখিয়ে দেবে।

সোজা কথায়, একমাত্র বয়েসটাকে মেশিনটা মিসম্যাচ এরার বলে ধরে না। বাকিগুলোকে ধরে।

এই সমস্যাটির কারণ হল স্পেস-টাইম। অর্থাৎ, অতীতকে কখনও কেউ পালটাতে পারে না। একই বস্তু একই সময়ে দু-জায়গায় থাকতে পারে না।

আ সিঙ্গল অবজেক্ট ক্যান নট ফিজিক্যালি একজিস্ট অ্যাট টু ডিফারেন্ট প্লেসেস অ্যাট দ্য সেম টাইম। দ্য অবজেক্ট, ইফ সাবজেক্টেড টু টাইম ট্রাভেল ইন দ্য পাস্ট, উইল অলওয়েজ রিপ্লে ইটস রোল–অফ কোর্স ইগনোরিং দ্য এজিং ফ্যাক্টর ফ্ললেসলি। আদারওয়াইজ ইট উইল অলওয়েজ কাম আপ উইথ দ্য এরার মেসেজ মিসম্যাচ ফেলিয়োর।

মেশিনটা তৈরি এবং আবিষ্কারের ধাপগুলো নিয়ে আমি যে-বিশাল থিসিস তৈরি করেছি, তারই একটা অংশ আপনাদের মুখস্থ শোনালাম। আমি এর নাম দিয়েছি টাইম মেশিনের এজিস্টেন্স প্যারাডক্স।

মেশিনটা নিয়ে আমার কয়েকটা স্পেশাল কাজ সারা হয়ে গেলেই আমি এই আবিষ্কারটার কথা রীতিমতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সারা পৃথিবীকে জানাব। তখন আমার থিসিসটাও পাবলিশ করে সারা পৃথিবীর সায়েন্টিস্টদের চমকে দেব। এবং ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করব।

অতীত নিয়ে মেশিনটার এই প্রবলেম থাকলেও ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। যদি মেশিনটার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি নিজে ভবিষ্যতে চলে যাই তা হলে বর্তমান থেকে আমি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাব এবং আমার ডায়াল সেট করা জায়গায় আমার আবির্ভাব ঘটবে। সেখানে যতক্ষণ খুশি আমি থাকতে পারি কিন্তু সেই সময়টুকু মেশিনটার কাছে আমাকে দেখা যাবে না। আবার যখন আমি ফিরে আসব তখন আমাকে মেশিনটার প্ল্যাটফর্মের ওপরে হঠাৎ করে আবির্ভূত হতে দেখা যাবে।

সোজা কথায়, সময়ের একমুখী গতিকে কিছুতেই থামানো যাবে না, বদলানো যাবে না।

এই এজিস্টেন্স প্যারাডক্স নিয়ে আগের বিজ্ঞানীরা ভাবেননি।

ভাগ্যিস ভাবেননি! ভাবলে আমার কপালে এই কৃতিত্ব আর জুটত না।

জিনিয়ার কাছ থেকে বরফের মতো উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেই দমে গেলাম না। বরং একটা জেদ চেপে গেল মনে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে চলে গেলাম একতলার গ্যারাজে মানে, আমার ল্যাবরেটরিতে। আমার মহান আবিষ্কারের দিকে তাকিয়ে আমার আবেগ এবং ইগো একেবারে উথলে উঠল।

ওই তো নীল রঙের বাক্সটা! আমার বিলাভেড ইনভেনশান! ওর কেরামতি দেখিয়ে আমি কি জিনিয়াকে চমকে দিতে পারি না? ওর তাচ্ছিল্য আর উপেক্ষার মুখের মতো জবাব দিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি।

একটা আওয়ারা বেড়াল প্রায় বছরতিনেক ধরে আমাদের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে। জিনিয়া সবসময় ওকে খেতে-টেতে দেয়, লালনপালন করে। আমিও ওকে

মাঝে-মাঝে আদর-টাদর করি। তার কারণ, আমার ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্টের ও-ই হচ্ছে একমাত্র অ্যাভেইলেবল গিনিপিগ। তাই ওকে আমি গিনিপিগ বলেই ডাকি। জিনিয়ার মতে ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক আহ্লাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। জিনিয়া ওকে আদুরে নাম দিয়েছে মিষ্টি।

এদিক-ওদিক সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই গিনিপিগকে পেয়ে গেলাম। পাঁউরুটির টুকরো দেখিয়ে আ-আ-তু-হুঁ করে ওকে গ্যারাজে নিয়ে এলাম। তারপর টাইম মেশিনের প্ল্যাটফর্মটা ভাঁজ খুলে পেতে দিলাম। গিনিপিগকে তার ওপরে দাঁড় করিয়ে মেশিনের সুইচ অন করে দিলাম। গিনিপিগ মিউমিউ করতে লাগল।

আমি ডায়াল সেট করলাম, কিবোর্ডে ঠকাঠক বোতাম ঠুকলাম, নব ঘোরালাম, এবং ঠকাস করে এন্টার বাটন টিপে দিলাম।

চোখের পলকে বিশ্বাস করুন–চোখের পলকে গিনিপিগ উধাও হয়ে গেল। ওর মিউ মিউ-র সুইচ কেউ যেন আচমকা অফ করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে দোতলা থেকে জিনিয়ার চিৎকার শুনতে পেলাম। গিনিপিগকে হঠাৎ শূন্য থেকে হাজির হতে দেখে ও ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে।

আমি দুদ্দাড় করে দোতলায় ছুটলাম।

ড্রইং-ডাইনিং-এ ঢুকে দেখি জিনিয়ার টিভি দেখা মাথায় উঠেছে। ও সোফা ছেড়ে উঠে ঝুঁকে পড়েছে আহ্লাদী গিনিপিগের ওপরে। অবাক হয়ে কাতর গলায় বলছে, ও মা, মিন্টিসোনা! তুই এখানে কী করে এলি?

আমি বেশ গর্বের সঙ্গে বললাম, আমি পাঠিয়েছি।

কী? এইটুকু বেড়ালকে তুমি একতলা থেকে দোতলায় ছুঁড়ে দিলে!

আমি তাড়াতাড়ি হাত-পা নেড়ে ওকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলাম, না, না–ছুড়িনি, ছুড়িনি। আমার টাইম মেশিন ওকে এখানে পাঠিয়েছে। এক্ষুনি ও আবার চলেও যাবে নীচের গ্যারাজে…।

তুমি ওকে…তুমি ওকে…। জিনিয়া রেগে-টেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই গিনিপিগ ভ্যানিশ হয়ে গেল। আমি ওকে দু মিনিটের জন্যে ফিউচারে পাঠিয়েছিলাম।

জিনিয়াকে হতবাক অবস্থায় ফেলে রেখে আমি আবার একতলায় ছুট লাগালাম। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছিল। জিনিয়াকে সকাল-সকাল আচ্ছা টাইট দেওয়া গেছে। আমার এই জয়টাকে স্ত্রীর উপেক্ষায় জর্জরিত বিজ্ঞানীদের উৎসর্গ করলাম।

.

চাঁদনি চকে আমার ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস-এর একটা দোকান আছে। দোকানের নাম সুপার ইলেকট্রনিক্স। দোকানটা মাপে ছোট হলেও বেশ চালু দোকান। আমি আর দুজন ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে দোকান সামলাতে বেশ হিমসিম খাই। দোকানের রোজকার সেল সাত থেকে দশ হাজার টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্টদের মধ্যে একজনের নাম তারক, অন্যজনের নাম সতু। তারক রোগা-পাতলা। একটা চোখ সামান্য লক্ষ্মীট্যারা। সবসময় পানমশলা চিবোচ্ছে, চোয়াল নড়ছে, আর ঘনঘন পিক ফেলছে।

সতুর চেহারা বেশ ভারী। চালচলন গুরুগম্ভীর। খদ্দেরদের সঙ্গে খেঁকিয়ে কথা বলাটা বেশি পছন্দ করে। ওকে সবসময় আঃ, সতু...কেয়ারফুল। বলে ডাক দিতে হয়। এ ছাড়া ওর এফ. এম. চ্যানেল শোনার প্রবল বাতিক। ওর জন্যেই আমাকে দোকানে সবসময় রেডিয়ো চালিয়ে রাখতে হয়।

ওদের দোষ যতই থাকুক, একটা গুণ বেশ তারিফ করার মতো। ওরা দুজনেই খুব অনেস্ট। দরকার হলে চেয়ে নেবে, কিন্তু লুকিয়ে ক্যাশবাক্সে হাত ঢোকাবে না।

পরের টেস্টটার জন্যে আমি সুপার ইলেকট্রনিক্স-কে বেছে নিলাম।

কিন্তু তার আগে থিয়োরিটা শেষবারের মতো খতিয়ে দেখার জন্যে আমি একজন সরল পণ্ডিত মানুষের খোঁজ করে চললাম। কারণ, একটা আউটডোর এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার আগে ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু এক্সপার্ট কমেন্ট দরকার। আর সেই এক্সপার্টকে হতে হবে সরল–যাতে আমার কথায় তিনি সন্দেহ না করে বসেন। এবং পণ্ডিত–যাতে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামতে কোনও ভেজাল না থাকে।

অনেক খোঁজখবর করে আমার পাড়ার বন্ধু সুবীরের এক জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। ভদ্রলোকের নাম মণিমোহন সরখেল। ফিজিক্সের রিটায়ার্ড প্রফেসর। প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন। পরে সেখানেই অধ্যাপক। তারপর আমেরিকায় চলে যান। বহুবছর ক্যালটেক-এ ছিলেন, আর তিনবছর স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। মানে, সিভি যাকে বলে ব্যাপক ঘ্যাম।

একদিন বিকেলে সুবীর আমাকে প্রফেসর সরখেলের কাছে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, জেঠু আমার ছোটবেলাকার বন্ধু, দেবু–দেবদত্ত রায় চৌধুরী। ও খুব নামকরা ইয়ে... মাঝপথে আটকে গিয়ে সুবীর আমার দিকে তাকাল : কী বলে যেন তুই নিজের পরিচয় দিস?

আমি লজ্জা পেয়ে গিয়ে চোখ নামিয়ে বললাম, ওই ইনভেন্টর...মানে, বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় মজা করে বলি আর কী!

প্রফেসর সরখেল ভুরু কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে গোরিলার ঢঙে আমার দিকে তাকালেন: ইনভেন্টর? অ। তা কী নিয়ে পড়াশোনা করেছ?

ব্যস, শুরু হল তার হামানছেচা জেরা। একেবারে সি. বি. আই.-এর বাবা। আমি কোত্থেকে পাশ করেছি। কতদূর লেখাপড়া করেছি। কী নিয়ে গবেষণা করেছি। কোন-কোন জার্নালে রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছি। ফরেনে গেছি কিনা। এবং, সবশেষে, এ পর্যন্ত আমি কী কী ইনভেন্ট করেছি।

ওঁর প্রশ্নের ধাক্কায় আমি ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। নির্বিঘ্নে আমার সব প্রশ্নের উত্তর এই মানুষটার কাছ থেকে বের করতে পারব তো? নাকি এই বৃদ্ধই আমার পেট থেকে সব মতলব টেনে বের করে চারদিকে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দেবেন?

আমি বৃদ্ধ বাঘা বিজ্ঞানীটিকে হাঁ করে দেখছিলাম।

ফরসা মোটাসোটা গাবলু চেহারা। মাথায় টাক, তাকে ঘিরে বাউন্ডারি ওয়ালের ঢঙে ধবধবে সাদা চুল। গালে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। চশমার কাচের ওপরে সাদা ভুরুর ঝালর উঁকি মারছে। দু-দিকের গাল বার্ধক্যের ভারে ঝুলে পড়েছে। গায়ে সাদা ফতুয়া, পায়ে পাজামা।

প্রফেসর সরখেল একটা মোটা বাঁধানো বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে হাতে ধরেছিলেন। আমাকে জেরা করার কাজ শেষ হতে বইটা শব্দ করে সামনের টেবিলে রাখলেন।

একটা হুম শব্দ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সরাসরি আমার দিকে তাকালেন : বলো, কী বলবে?

আমি কয়েকবার ঢোক গিলে বললাম, লাস্ট দু-চারবছর ধরে আমি একটা টাইম মেশিন ইনভেন্ট করার কথা ভাবছি। আমার কনসেপ্টগুলো...।

ধীরে-ধীরে আমার আইডিয়ার নিরীহ অংশগুলো ওঁকে বললাম।

সুবীর একফাঁকে অন্দরে চলে গিয়েছিল। বোধহয় চা-বিস্কুটের বন্দোবস্ত করতে। কারণ, ও ফিরে আসার একটু পরেই একটি অল্পবয়েসি মেয়ে আমাদের তিনজনের জন্যে চা ইত্যাদি টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

আমার সব কথা মন দিয়ে শোনার পর প্রফেসর সরখেল কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তারপর চোখ খুলে চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন। চায়ের কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার ব্যাপারটা আসলে টেলি-ট্রান্সপোর্টেশান অফ ম্যাটার। মানে, আই মিন, কোনও একটা জিনিসকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পাঠানো। মানে, ম্যাটারকে যেভাবেই হোক এনার্জিতে কনভার্ট করতে হবে। তারপর সেই এনার্জিকে লাইটের ভেলোসিটিতে আর-এক জায়গায় পাঠাতে হবে। সেখানে পৌঁছোনোর পর সেই এনার্জিকে, আই মিন, রিকনভার্ট করতে হবে ম্যাটারে। আর পুরো ট্রান্সপোর্টেশানটাই তোমার হবে গিয়ে হাইপারস্পেস দিয়ে...।

সুবীর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, জিনিসটা ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে?

মণিমোহন গম্ভীরভাবে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আসবে। তোমার তাতে আপত্তি থাকতেই পারে। তুমি তো আর্টস-এর ছাত্র ছিলে–

সুবীর আর্টস-এর ছাত্র ছিল ঠিকই তবে এখন সিটিজেন ফিনান্স নামে একটা ঘ্যাম কোম্পানির একজিকিউটিভ ডায়রেক্টর। কিন্তু হলে কী হবে, বিজ্ঞানী জেঠুর কাছে ওর ওজন তিলতুল্য। তাই ও কাচুমাচু হয়ে মুখে কুলুপ আঁটার শপথ নিল বলে মনে হল।

প্রফেসর সরখেল আমার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন, মানে, আইনস্টাইনের ইকুয়েশান। ম্যাটার টু এনার্জি, এনার্জি টু ম্যাটার। রিভারসিল প্রসেস। সবটাই হবে

ফোর্থ ডায়মেনশান-আই মিন, ওই যে বললামহাইপারস্পেস দিয়ে...। শুধু কনভারশনটা হবে একটা লোকেশানের। আর রিকনভারশন হবে অন্য আর-একটা লোকেশানে। তবে লোকেশানের ডেটাগুলো ঠিকঠাক হওয়া দরকার...।

যদি ম্যাটার পাঠানোর সময় মেশিনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়? তার জন্যে কোনও প্রোটেকশান সাজেস্ট করতে পারেন? আমি এবারে আমার সমস্যার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সুপার ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পরীক্ষায় নামার আগে নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

দ্যাখো, যদি এরকম কোনও মেশিন কখনও তৈরি করা যায় তা হলে তাতে টেলি ট্রান্সপোর্টেশান-এর ব্যাপারটা ঘটবে আলোর গতিতে। বলতে গেলে একপলকে। ধরো, লাইটের ভেলোসিটি সেকেন্ডে প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার। আর আমাদের পৃথিবী পরিধি হল চল্লিশহাজার কিলোমিটার। মানে, একসেকেন্ডে আলো পৃথিবীকে সাড়ে সাতবার পাক মেরে আসবে। সুতরাং, তুমি সেফলি বলতে পারো, ট্রান্সপোর্টেশান-এর ওই পারটিকুলার মোমেন্টে তোমার মেশিনটা খারাপ হওয়ার চান্স প্র্যাকটিক্যালি জিরো। নাঃ, থিয়োরিটিক্যালি আমি তো কোনও প্রবলেম দেখছি না। মাথা নেড়ে শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

ধরুন, কোনও অবজেক্টকে অন্য জায়গায় পাঠালাম। তারপর যদি মেশিন ব্রেকডাউন হয়?

এর আনসার খুব সিম্পল — দু-হাত ঘুরিয়ে নাড়ু পাওয়ার ভঙ্গি করলেন মণিমোহন? জিনিসটা ওখানেই থেকে যাবে–মেশিন ঠিক না হওয়া পর্যন্ত। মেশিন ঠিক হলেই সেটা ফেরত আনা যাবে। আই মিন, থিয়োরিটিক্যালি এটাই লজিক্যাল...।

মেশিন যদি আর কোনওদিন ঠিক না হয়? কেউ যদি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ওটাকে চিরকালের জন্যে বিকল করে দেয়? কিংবা ওটার সুইচ অফ করে শাট ডাউন করে দেয়?

সে কথা আর সুবীরের জেঠুকে জিগ্যেস করলাম না। তবে একটা ছোট্ট ভয় আমার মনে দানা বাঁধল।

মণিমোহন জিগ্যেস করলেন, যন্ত্রটা নিয়ে তুমি কদ্দূর এগিয়েছ?

এগোইনি। থিয়োরিটিক্যাল কনসেপ্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

বেশ, বেশ। তোমার ব্যাপারটায় আমার ইন্টারেস্ট রইল। চায়র কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়ালেন: কিছু মাইন্ড কোরো না। একটু প্রেশার আসছে টয়লেটে যেতে হবে।

আমি আর দেরি করলাম না। সুবীরকে মেনি-মেনি থ্যাংকস জানিয়ে বিদায় নিলাম।

বাড়িতে এসে মেশিন নিয়ে প্রবল প্র্যাকটিস শুরু করলাম। জিনিয়া যখন বাড়িতে থাকে তখন সদর দরজা বন্ধ করে নিজে মেশিনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে মেশিন চালু করে নিজেকে যেখানে-সেখানে পাঠাতে লাগলাম। কখনও দোতলায় হুস করে হাজির হলাম, কখনও ছাদে গেলাম, কখনও মাস্টার বেডরুমে গেলাম রান্নাঘর, বাথরুম কিছুই বাদ রাখলাম না।

প্রতিক্ষেত্রেই আমি একমিনিট বা দু-মিনিট টাইম সেট করে রওনা হয়েছিলাম। ফলে একবার ছাড়া প্রত্যেকবার গ্যারাজের ভেতরেই ফিরে এলাম। শুধু লোকেশান সেট করার সময় জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান আর ফিগারেটিভ ডেটায় কিছু অ্যাক্সিমেশান থাকায় একেবারে সঠিক জায়গায় হাজির হচ্ছিলাম না। একটু-আধটু এদিক-সেদিক হয়ে যাচ্ছিল। আর ফিউচারে অন্য লোকেশানে পৌঁছে যদি আমি সেখানে হাঁটাহাঁটি করে পজিশান শিফ্ট করি তা হলে টাইম মেশিনের প্ল্যাটফর্মে ফিরে না এসে দু-দশহাত দূরে অন্য জায়গায় ফিরে আসছিলাম। একবার তো গ্যারাজের বাইরে করিডরে এসে ল্যান্ড করলাম!

তখনই ঠিক করলাম, ফিউচারে অন্য লোকেশানে পৌঁছে আমি পজিশান সম্পর্কে সবসময় অ্যালার্ট থাকব।

সাতদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় টাইম মেশিনের টার্গেট ডেস্টিনেশানের পজিশান বা কো-অর্ডিনেট এরারকে মিনিমাইজ করে ফেললাম। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এইবার সুপার ইলেকট্রনিক্স এর পরীক্ষায় নামা যায়।

পরীক্ষাটা খুবই সামান্য, তবে আমার দ্রুত বড়লোক হওয়ার প্রজেক্টের এটাই প্রথম মেজর স্টেপ।

এক শনিবার জরুরি কাজ আছে বলে সতু আর তারককে দোকানে রেখে আমি বেরিয়ে গেলাম। ওদের বললাম, বিক্রিবাটার টাকা ঠিকমতো গুনে-গেঁথে ওরা যেন ক্যাশবাক্সেই রেখে দেয়। তারপর দোকান বন্ধ করে চাবির গোছা যেন আমার বাড়িতে বউদি-র কাছে পৌঁছে দেয়। আমি পরে যা ব্যবস্থা করার করব।

ব্যাপারটা মালিকের নির্দোষ নির্দেশ বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। ওদের চাকরিজীবনে ওরা কখনও এরকম নির্দেশ আগে পায়নি। আমি জানতাম, ওরা আমার কথামতো কাজ করবে। তাই গভীর রাতে নিশ্চিন্তে আমার টাইম মেশিনে চড়ে বসলাম। তারপর ডায়াল, কিবোর্ড, নব– হুউস।

প্রথম চেষ্টায় আমি হাজির হলাম আমার দোকানের বাইরের রাস্তায়। আমি টাইম সেট করেছিলাম একমিনিট। যদি দোকানের ভেতরে ঠিকমতো হাজির হতে পারতাম তা হলে ক্যাশবাক্স খুলে ক্যাশ নিয়ে আমার গ্যারাজে ফিরে আসার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট। কিন্তু নির্জন রাস্তায় হঠাৎ গজিয়ে উঠে একমিনিট ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে সময়টা যথেষ্টর চেয়েও একশোগুণ বেশি। তা ছাড়া এতে বিপদও অনেক।

তো সেই বিপদে পড়লাম।

আমাকে ম্যাডান স্ট্রিটের মাঝখানে হঠাৎই শূন্য থেকে গজিয়ে উঠতে দেখে ফুটপাতে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে থাকা একটা মাতাল আনন্দে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমি কিছু করে ওঠার আগেই ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। হাউমাউ করে বলতে লাগল, এতদিনে দর্শন দিলে, ভোলেবাবা! কিছু মালকড়ি দাও, প্রভু। তোমার নির্দেশমতো রোজ মাল-টাল খাই। ওই মাল টানার জন্যেই কিছু মালপানি দাও, বস্। জয় ভোলেনাথ!

আমার পজিশান চেঞ্জ করলে যদি টাইম মেশিনে আবার ফিরে যেতে না পারি! শুধু এই ভয়ে আমি মাতালটার কাছ থেকে ছুটে পালাতে পারছিলাম না।

শুনশান রাস্তায় সে এক কেলেঙ্কারি! ফুটপাতে এখানে-ওখানে আর যারা সব শুয়ে আছে। তারা না জেগে ওঠে।

এদিক-ওদিক তাকালাম।

দূরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে গেল। রাস্তার লাইটগুলো নীরব সাক্ষী হয়ে জেগে বসে আছে। মাঝে-মাঝে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। রাত দুটোয় রাস্তাঘাটের অবস্থা যেমন হয়।

মাতালটা কেঁদে কঁকিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একমিনিট পূর্ণ হল। ওর ঝাপসা চোখের সামনে আমি ভ্যানিশ হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমি সাকসেসফুল হলাম। এন্টার বোতাম টেপার পরই দেখলাম, আমি আমার দোকানের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।

অন্ধকার যে থাকবেই সেটা আগে থেকেই আমার মাথায় ছিল। তাই চট করে পকেট থেকে ছোট একটা টর্চলাইট বের করে নিলাম। ক্যাশবাক্সের চাবি সঙ্গে ছিল। বাক্স খুলে ক্যাশের টাকা গুছিয়ে নিতে পনেরো সেকেন্ডের বেশি লাগল না। তারপর একমিনিট পুরো হতেই...হুউস। দোকান থেকে আমি ভ্যানিশ হয়ে গেলাম। পলকে চলে এলাম আমার ল্যাবরেটরিতে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি টাকার গোছা ঠিকমতোই রয়েছে।

এই পরীক্ষাটা সাকসেসফুল হতেই আমার কনফিডেন্স লেভেল বেড়ে গেল। এবং আমি বড়লোক হওয়ার কাজে নামলাম।

প্রথমেই বলে রাখি, ব্যাংক-ট্যাংক-কে আমি আমার টার্গেট লিস্টের মধ্যে রাখিনি। কারণ, ব্যাংকে সব কিছু ভল্ট বা সিন্দুকে নিরাপদে রাখা থাকে। ওগুলোর তালা ভাঙা আমার এলেমের বাইরে। আবার ব্যাংকিং আওয়ার্স-এ যখন নোটের বান্ডিল ছড়ানো-ছেটানো থাকে তখন গাদাগুচ্ছের লোকজনও তার সামনে দারোয়ান হয়ে হাজির থাকে।

সুতরাং, আমার টার্গেট হল ছোটখাটো দোকান। যাদের ক্যাশবাক্স খোলা থাকে এবং হাঁটকালে অল্পবিস্তর টাকা পাওয়া যায়।

আমি জানতাম যে, আমার সামনে অঢেল সময়–কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সপ্তাহে দুটো কি তিনটে অপারেশান করলেই চলবে। তা ছাড়া ক্যাশ সরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে দোকানদাররা যাতে থানা-পুলিশ বা হইচই না করে সেজন্যে আমি খুব সুক্ষ্মভাবে কাজ করে চললাম। অর্থাৎ, এক-একটা দোকান থেকে মাত্র দুশো-

পাঁচশো কি হাজার টাকা সরাতে লাগলাম। এতে বেশিরভাগ মালিকই ভাববে, ব্যাপারটা তাদের গোনার ভুল।

নির্বিঘ্নে কাজ চালাতে লাগলাম। মাসে আট-দশহাজার টাকা বাড়তি ইনকাম হতে লাগল। আমি জানি, অতি লোভ না করে ধৈর্য ধরে কাজ করে গেলে আরও সুযোগ আসবে–আয়ও অনেক বাড়বে।

সুতরাং, ধৈর্য–শুধু ধৈর্য।

এইসব অপারেশান করার আগে আমাকে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হত। দোকানের লোকেশান, ক্যাশ কোথায় রাখে, কটায় দোকান খোলে, কটায় বন্ধ হয়, দোকানের ভেতরে কেউ রাতে শুয়ে থাকে কিনা, সম্ভব হলে মালিক কোথায় থাকে–এসব তথ্য জোগাড় করে আমাকে রীতিমতো স্টাডি করতে হত।

এইভাবে কাজ করতে করতে আমার সামনে একটা বড় সুযোগ এসে গেল। একটা প্রিমিয়াম কাপড়ের দোকান থেকে সাড়ে এগারো লাখ টাকা সরানোর সুযোগ পেলাম। চোখের সামনে অতগুলো টাকা দেখে আমার নিয়ত খারাপ হয়ে গেল। সূক্ষ্ম ব্যাপার-ট্যাপার সব ভুলে গিয়ে পুরো টাকাটাই লোপাট করে দিলাম। মনে-মনে ঠিক করলাম, যদি এই মিস্টিরিয়াস চুরি নিয়ে খুব হইচই হয় তা হলে আমি থামব। এক-দু-বছর চুপচাপ থাকব। তারপর সব থিতিয়ে গেলে আবার আমি বড়লোক হওয়ার প্রজেক্টে হাত দেব।

তাই করলাম। এবং একটা ছোট্ট গণ্ডগোল হওয়ায় আমাকে থামতেই হল।

টাকাটা পরিমাণে বেশি ছিল বলে আমার গায়ের জামা খুলে নোটগুলো পুঁটলি বাঁধতে হয়েছিল। তখনই কীভাবে যেন আমার পকেটের রুমালটা স্পটে পড়ে যায়। আর জামার একটা বোতাম খসে পড়ে। সেগুলো নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হয়। পুলিশ কুকুর লাগানো হয়। খবরের কাগজে লেখালেখি হয়। আমি ভয়ে জামাটা পুড়িয়ে ফেলি।

কিন্তু একটা ঘটনা থেকে আর-একটা ঘটনা যে কীভাবে গড়ায় সেটা কেউ জানে না।

একদিন রাতে যখন শার্টটা পোড়াচ্ছি তখন জিনিয়া সেই পোড়া গন্ধ পেল। ও ছুটে এল ড্রইং-ডাইনিং-এর টয়লেটের কাছে।

এই মাঝরাতে কী করছ? ভুরু কুঁচকে ও জানতে চাইল।

এই…ইয়ে…শার্টটা পোড়াচ্ছি…। আমতা-আমতা করে বললাম।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পোড়াচ্ছ কেন?

আমার..আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট-এ লাগবে। চট করে যা মাথায় এল বলে দিলাম।

এক্সপেরিমেন্ট? নাকি লিপস্টিকের দাগ লেগেছিল?

লিপস্টিক? লিপস্টিক কোথা থেকে আসবে? দু-চোখ কপালে তুললাম আমি।

জিনিয়া ওর গালের পাশ থেকে চুল সরিয়ে বেশ খোঁচা দেওয়া গলায় বলল, কোথা থেকে আবার আসবে? যেখান থেকে আসে–কোনও দুশ্চরিত্র ছেনাল মেয়ের ঠোঁট থেকে…।

এ-মন্তব্য আমি কল্পনাও করিনি। এতটাই অবাক হয়ে গেলাম যে, আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

জিনিয়া আমাকে এখনও সন্দেহ করে? আশ্চর্য! দ্রৌপদীর ব্যাপারটা তা হলে ও ভোলেনি!

.

বিয়ের বছর-পাঁচেক পর একবার একটা গায়ে-পড়া মেয়ের সঙ্গে আমার সামান্য ইয়ে হয়েছিল। ওর নাম ছিল দ্রৌপদী। ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট কিনতে প্রায়ই আমার দোকানে আসত। তারপর কথাবার্তায় বুঝতে পারে যে, এ-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা আছে। তখন দোকানে ওর আসা-যাওয়া বাড়ে। দরকার পড়লেই আমাকে মোবাইলে ফোন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ও দরকার ছাড়াই ফোন করা শুরু করে।

এরপর একদিন দ্রৌপদীকে একটা সার্কিটের অপারেশান দেখানোর জন্যে আমি বাড়িতে নিয়ে আসি। জিনিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। জিনিয়া ওকে বন্ধুর মতো মেনে নেয়।

দিন যায়। দ্রৌপদীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা আমার বাড়তে থাকে। না, ওটা কখনও প্রেম-টেম-এর দিকে টার্ন নেয়নি। কিন্তু জিনিয়ার কয়েকটা খোঁচা দেওয়া কথায় একদিন বুঝলাম ব্যাপারটা ওর ভালো লাগছে না। ও একটা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স-এ ভুগছে। তার ওপর বাচ্চাকাচ্চা হয়নি বলে কমপ্লেক্সটা হাইপারবোলিক এক্সপ্যানশান হয়ে বীভৎস চেহারা নিয়েছে।

আমি ব্যাপারটা বুঝতাম। তাই কখনও পালটা আঘাত না দিয়ে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

একদিন জিনিয়া আমাকে আর দ্রৌপদীকে সাউথ সিটি মল থেকে বেরোতে দ্যাখে। ব্যাপারটা একেবারেই নির্দোষ ছিল। দ্রৌপদী একটা হ্যান্ডব্যাগ কেনার জন্যে ওখানে যাচ্ছিল। আর আমার দুটো জি কেনার ছিল। তাই চাঁদনি থেকে দুজনে সাউথ সিটি মল-এ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু এই কাকতালীয় ব্যাপারটা বাড়িতে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। সে-বিস্ফোরণ নাইন/ইলেভেন এর বিস্ফোরণের চেয়েও মারাত্মক।

আমাকে কদিন তুলোধোনা করার পর দ্রৌপদীকেও টেলিফোনে জঘন্য অপমান করেছিল জিনিয়া। সেসময়ে ওকে দেখে আমার মনে হয়নি ওর মধ্যে কোনও শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা রুচি-সভ্যতার ছাপ আছে।

তখন আমার মনে একটা বাজে ইচ্ছে চেপেছিল। কিন্তু নানান অসুবিধের কথা ভেবে ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করে দিই। কারণ, তখনও তো আমার টাইম মেশিন তৈরি হয়নি।

এরপর থেকে আমি বরাবর জিনিয়ার অকারণ সন্দেহের আওতায় থেকে গেছি। প্রায় বছরখানেক জিনিয়া নর্মাল ছিল। নাচের রিহার্সাল, নাচের প্রোগ্রাম– এসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাতে আমি ভেবেছিলাম, সন্দেহবাতিকটা অবশেষে গেছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, ব্যাপারটা সহজে যাওয়ার নয়।

আমি কাতরভাবে বললাম, জিনিয়া, প্লিজ, তুমি ভুল ভাবছ। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। আমি…।

তুমি যদি ক্লিন হও তা হলে আমাকেই শার্টটা পোড়ানোর দায়িত্ব দিতে পারতে। একা একা মাঝরাত্তিরে চুপিচুপি…ছিঃ!

জিনিয়া প্রবল চিৎকার করে কথা বলছিল। এখুনি আশেপাশের বাড়ির লোক না জেগে ওঠে!

জিনি, প্লিজ–আস্তে…আস্তে। পাড়ার লোকজন এবার জেগে উঠবে। প্লিজ। ওর কাছে এগিয়ে গেলাম আমি ও শোনো। তোমাকে সবটা খুলে বলছি। আমার এই নতুন এক্সপেরিমেন্টটা হল, কোনও জিনিসকে পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই থেকে জিনিসটাকে আবার তৈরি করা। রিকনস্ট্রাকশন। বুঝলে? তারই ফাস্ট স্টেপ হিসেবে এই শার্ট…মানে…।

সে-রাতে ওকে ঠান্ডা করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। ওকে বলেছিলাম, যেহেতু ও আমার বিজ্ঞান-টিজ্ঞান করার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করে না তাই ওকে লুকিয়ে মাঝরাতে শার্টটা পোড়াচ্ছিলাম।

অনেক ইনিয়েবিনিয়ে ঘ্যানঘেনিয়ে ওকে শান্ত করলাম। একেবারে শেষে কান্নাভাঙা গলায় বলেছি, আমার জীবনে শুধু বিজ্ঞান আর তুমি–এ ছাড়া আর কী আছে বলো? রোজ-রোজ দোকানে যেতে আমার একটুও ভালো লাগে না…।

যাই হোক, অনেক কষ্টে জিনিয়ার রোষ থেকে বাঁচলাম। কিন্তু পুরোনো বাজে ইচ্ছেটা আবার মাথাচাড়া দিল। এখন তো আর কোনও প্রবলেম নেই! আমার হাতে টাইম মেশিন আছে।

কিন্তু মনকে বোঝালাম। তোমার হাতে ক্ষমতা থাকলে তাকে সামলে রেখে ব্যবহার করতে হয়। সামান্য টাকাপয়সা হাতিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে–তার চেয়ে বেশি আর এগিয়ো না। নিজের ওপরে কাবু রাখো। ক্ষমতার অপব্যবহার কোরো না। লাগাম–লাগাম! লাগামের কথা কখনও ভুলবে না।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এসব কথা ভেবেছিলাম। মনে-মনে অনেক ভালো-ভালো শপথ নিয়েছিলাম।

কিন্তু সেগুলো যে সাতদিন পরেই চটকে চচ্চড়ি হয়ে যাবে সেটা তখন বুঝতে পারিনি।

কী করেই-বা বুঝব? তখন তো সোনির সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি!

আলাপটা করিয়ে দিয়েছিল সুবীর। ফলে এক অর্থে বলা যেতে পারে আমার অপকর্মের জন্যে সুবীরই দায়ী। ওই যে বলেছি, একটা ঘটনা থেকে আর-একটা ঘটনা যে কীভাবে গড়ায় সেটা কেউ জানে না। ফলে আমার মেন্টাল কন্ডিশান, সুবীরের সঙ্গে দেখা হওয়া, ওর অফিসের পার্টিতে আমার যাওয়া, সোনির সঙ্গে পরিচয়, তারপর…।

নাঃ, ব্যাপারটা শুরু থেকেই বলি।

একদিন রাতে খুব মুড অফ অবস্থায় সুবীরের সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম।

হঠাৎই ও বলল, তোর কী হয়েছে বল তো?

কিছু হয়নি। নিজেকে জাস্ট ফালতু লাগছে…।

সুবীর সিগারেট খাচ্ছিল। সেটাতে লম্বা টান দিয়ে বলল, বস, বলো তো, কেসটা কী?

আমি মুখ খুলতে না চাইলেও সুবীর ভীষণ চাপাচাপি করতে লাগল।

ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ পেরে উঠলাম না। শেষ পর্যন্ত জিনিয়ার কথা একটু-আধটু রেখে-ঢেকে ওকে বললাম।

জানিস, জিনিয়া সবসময় আমাকে সন্দেহ করে। সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমাকে কোনও পাত্তাই দেয় না।

সুবীর গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে বলল, দেবু, আমি সায়েন্সের কিছু বুঝি না, কিন্তু তোর কেরিয়ার তো আমি জানি! তা ছাড়া সেদিন তোর আর জেঠুর কথাবার্তা শুনেছি। আমার জেঠু ভীষণ স্নব টাইপের বিজ্ঞান নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। হাইফাই সায়েন্টিস্ট হলে যা হয় আর কী! কিন্তু তোর সঙ্গে জেঠু যেভাবে কথা বলেছে তাতে আমি এটুকু বুঝেছি যে, তোর মধ্যে সামথিং হ্যাজ। আমি বিশ্বাস করি, তুই একদিন দুনিয়াকে চমকে দিবি…।

সুবীরের কথাগুলো আমার কানে সান্ত্বনার মতো শোনাচ্ছিল, কিন্তু একইসঙ্গে এও বুঝতে পারছিলাম, ওর কথাগুলো খুব জেনুইন। ও আমার খুব কাছের বন্ধু।

হঠাৎ আমাকে ছোট্ট একটা ধাক্কা মারল সুবীর। রকের খিস্তি দিয়ে বলল, ওসব ফালতু চিন্তা ছাড় তো! নে একটা সিগারেট ধরা– ও জোর করে একটা সিগারেট গুঁজে দিল আমার হাতে।

আমি এমনিতে স্মোক করি না। হয়তো ছমাসে নমাসে মুড খারাপ হলে একটা সিগারেটে টান দিই। যেমন এখন।

সুবীর আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কাল দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ব্যাক কর। কাল আমাদের অফিসে একটা গ্র্যান্ড পার্টি আছে–কোম্পানির দুর্ধর্ষ বিজনেসের জন্যে। তুই আমার সঙ্গে যাবি–আমার গেস্ট হয়ে।

আমার কিছু ভালো লাগছিল না। টাইম মেশিন নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার আপাতত শেষ। তার ওপর জিনিয়ার ম্যানিয়া সঙ্গে ফাউ হিসেবে উপেক্ষা তো আছেই। আর সবশেষে আমার নতুন আবিষ্কারটার কথা সবাইকে জানাতে না পারার অসহ্য যন্ত্রণা।

আমার প্রতিবাদ করতে ভালো লাগছিল না বলেই সুবীরের কথায় রাজি হলাম।

পরদিন ওর সঙ্গে পার্টিতে গেলাম। এবং মরলাম।

সেখানে রঙিন বেলুন, হুইস্কি, মিউজিক, নাচ কী নেই! প্রথম কুড়িমিনিট কোম্পানির সাফল্য নিয়ে প্যানপ্যানানির পর পার্টির হুল্লোড় শুরু হল। এইসব পার্টিতে যে নিয়মকানুনের খুব একটা বালাই থাকে না, সেটা বুঝতে পারলাম।

আমি বোকার মতো ড্রিংক-এর গ্লাস হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, চারপাশে উদ্দাম নাচ চলছে। মনে হল, দুর, এখানে আমি কেন যে এলাম! মাথা উঁচু করে ভিড়ের মধ্যে সুবীরকে খুঁজতে লাগলাম।

হঠাৎই এক ধাক্কায় আমার হাতের গ্লাসটা ছিটকে পড়ল।

চমকে তাকিয়ে দেখি একটি ছিপছিপে লম্বা মেয়ে কোমরে মোচড় দিয়ে পেছনদিকে ঘুরে আমার চোখে তাকিয়ে আছে।

আমার মনে এই দৃশ্যটা এখনও ফ্রিজ হয়ে আছে।

সরি, লম্বা করে টেনে মেয়েটি বলল।

মোমবাতির আলোয় যে-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি মানানসই এ-মেয়েটি সেরকম সুন্দর। ওর মোলায়েম মুখ, সরু চোখ, ধনুকের মতো ভুরু, ছোট অথচ পুরু ঠোঁট, কপালের ওপরে নেমে আসা চুলের ঝালর–সব মিলিয়ে এক প্রশান্ত সৌন্দর্য। যেন সন্ধে নেমে আসা ছায়া-মাখা আলোয় দেখা দিঘির জল। যার কাছে সমুদ্রের ঢেউয়ের উজ্জ্বলতা হেরে যায়।

একজন বেয়ারা আমার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে কাচের টুকরোগুলো একটা ট্রে-তে তুলে নিচ্ছিল। আশপাশের দু-একজন ছোট-ছোট কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যে সুবীর কোথা থেকে যেন ছুটে এসে আমার কাছে হাজির হয়ে গেছে।

ব্যাপারগুলো আমার চোখে পড়ছিল, কিন্তু মাথার ভেতরে ঢুকছিল না। কারণ, মাথার ভেতরটা চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকা মুখটাকে ঘিরেই ব্যস্ত ছিল।

সাদা টপ। সাদা প্যান্ট। কোমরে মেটালের বেল্ট। গলায় টকটকে লাল ঝকঝকে পাথরের মালা। কানে ছোট-ছোট লাল পাথর।

স্টানিং বিউটি ওকে বলা যায় কি না জানি না, কিন্তু আমি স্টান্ড হয়ে গেলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও আমার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াল। আবার টেনে টেনে বলল, বাবা বললাম তো সরি…।

এবারে সুবীর পরিস্থিতির দায়িত্ব নিল। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আমি তখন জামা প্যান্টে চলকে পড়া তরল রুমাল দিয়ে মুছে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

ওর নাম সোনি। সুবীরের কোম্পানির ভিপি-র মেয়ে। ফিন্যান্স নিয়ে এম. বি. এ. করলেও সায়েন্সে প্রচুর ইন্টারেস্ট।

আমার কাঁধে হাত রেখে সুবীর বলল, সোনি, আই প্রেজেন্ট টু থু মাই হার্ট-টু-হার্ট ফ্রেন্ড দ্য গ্রেট ইনভেন্টর–দেবদত্ত রায়চৌধুরী।

হোয়াট আ ইউনিক নেম। কমপোজড অফ ফোর সারনেস! এরকম আমি কখনও শুনিনি– চার-চারটে পদবি দিয়ে তৈরি একটা নাম : দেব, দত্ত, রায়,

চৌধুরী। তার ওপর আবার ইনভেন্টর। গ্রেট। বলুন, কী কী ইনভেন্ট করেছেন আপনি?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। কোনও জবাব দিতে পারলাম না।

মিউজিক বাজছিল। কিন্তু সোনি অনেকক্ষণ নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর কী যে হল! হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমরা দুজনে হলঘরের এককোণে একটা লম্বা সোফায় বসে আড্ডা মারছি। আমার নাকে ওর পারফিউমের গন্ধ আসছে।

বলুন, আপনি কী কী ইনভেন্ট করেছেন? পুরোনো প্রশ্নটা আবার করল সোনি, সুবীরদা বলল, আপনি নাকি একজন গ্রেট ইনভেন্টর।

আমি এখন অনেকটা নরমাল হয়েছি। তাই হেসে বললাম, আমার লেটেস্ট ইনভেনশানটা দারুণ।

কী? ওর চোখে আগ্রহ।

আপনি। অবশ্য ব্যাকরণ মানতে গেলে ডিসকাভারি বলা উচিত।

একথায় সোনি হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাসি থামলে বলল, ব্যাকরণ আপনি মানেন নাকি?

আগে মানতাম–এখন আর মানি না।

আমিও তাই।

জানেন, ভীষণ মনখারাপ লাগছিল বলে সুবীর আমাকে জোর করে এই পার্টিতে নিয়ে এসেছে। এখন দেখছি এসে ভালোই হয়েছে–মনখারাপটা আর নেই।

দ্যাটস গুড। এবারে আপনার সত্যিকারের ইনভেনশানের কথা বলুন। ইনভেনশান ব্যাপারটাই খুব ইন্টারেস্টিং।

আমি ওর আগ্রহ দেখে খুশি হলাম। ওকে আমার কয়েকটা ইমপরট্যান্ট আবিষ্কারের কথা বললাম। যেমন, রুমাল কেচে শুকিয়ে ভাঁজ করার যন্ত্র, ট্রান্সপারেন্ট শিট দিয়ে তৈরি ফ্রিজ, আলট্রাসনিক শোনার স্পেশাল অডিয়ো

কনভার্টার, খুব সংক্ষেপে কোনও ছোট মাপের জিনিসের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বের করার মেশিন–এইরকম অনেক কিছু। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই টাইম মেশিনের কথা বললাম না।

আচ্ছা, সোনি, আপনি কি জানেন সারা জীবনে টমাস আলভা এডিসন মোট ক টা আবিষ্কার করেছিলেন?

না–কটা?

উনি তেরোশো পেটেন্ট নিয়েছিলেন। এডিসন মেলো পার্কে থাকতেন। সবাই ওঁকে বলত উইজার্ড অফ মেনলো পার্ক.।

আপনি কটা পেটেন্ট নিয়েছেন?

ধুস– তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মাথা কঁকালাম আমি।

বলুন না প্লিজ!

একুশটা। কথাটা বলে মনে হল এ-প্রশ্ন জিনিয়া কখনও আমাকে করেনি। ওর ধারণা, বিজ্ঞান করাটা আমার ভান। আবিষ্কারের কথা বলাটা আমার হিড়ন ডিজায়ার সংক্রান্ত একটা ম্যানিয়া।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন সোনির সঙ্গে গল্পে আমি একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের দুজনের চিন্তাভাবনা একই ফ্রিকোয়েন্সিতে বাঁধা।

সোনির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে সুবীরকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানালাম। এবং একটা বিচিত্র ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে ছাদে চলে গেলাম। অন্ধকার রাত, বাঁকা উঁদ, এবং তারা আমাকে স্বাগত জানাল। একইসঙ্গে বাতাসের ঝাপটা আমাকে ছুঁয়ে গেল।

সোনিকে ফোন করলাম।

ওর সঙ্গে আলাপ গম্ভীর হওয়ার সেটাই শুরু।

.

মিথ্যে কথা বলব না, সোনির প্রতি আমার একটা টান তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। সোনি যে রূপসি সেটা এই টানের মেজর কারণ নয়। আসল কারণটা হল, আমার কাজকে ও ভীষণ রেসপেক্ট দিচ্ছিল। একজন ইনভেন্টর হিসেবে এরকম আন্তরিক অ্যাপ্রিসিয়েশান আর রেসপেক্ট আমি কখনও পাইনি। আমার নানান আবিষ্কার নিয়ে ওর কত যে কৌতূহল আর প্রশ্ন!

সোনি আমাকে ফোন করত। আমিও করতাম। প্রথম-প্রথম সময়ে–তারপর অসময়ে। প্রায় মাসখানেক ধরে এরকম চলল। ও আমার ল্যাব দেখার জন্যে প্রায় রোজই বলত, কিন্তু আমি নতুন সমস্যা তৈরির ভয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতাম। ফোনেই টেকনোলজি আর ইনভেনশান নিয়ে প্রচুর কথা বলতাম।

এই অতিরিক্ত ফোনের ব্যাপারটা জিনিয়ার নজর এড়ায়নি। কিন্তু ওর সরু চোখে সন্দেহের কাজল যে ধীরে-ধীরে আঁকা হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল।

আমি মোবাইল হাতে কখনও ছাদে গেলে একটু পরে জিনিয়াও টবের গাছগুলো দেখাশোনার ছুতোয় সেখানে চলে আসে। কিংবা আমার ল্যাবে– যেখানে ও বলতে গেলে কখনও পদার্পণ করে না–সেখানেও কোনও-না-কোনও অজুহাতে চলে আসে। কখনও ওর কোলে আদরের মিষ্টি, আবার কখনও-বা একা।

ব্যাপারটা প্রায় গোয়েন্দাগিরির লেভেলে গিয়ে দাঁড়াল। যেন কোনও ডিটেকটিভ মরিয়া হয়ে একটা কংক্রিট এভিডেন্সের খোঁজ করে চলেছে। সেটা হাতে পেলেই…!

বেশ বুঝতে পারছিলাম, জিনিয়ার মধ্যে দ্রৌপদী সিনড্রোম আবার মাথাচাড়া দিয়েছে।

জানি, কমবেশি সন্দেহবাতিকে ভোগা স্ত্রী-ধর্ম, কিন্তু জিনিয়ার বাতিকটা এবার বোধহয় অসুখের দিকে টার্ন নিচ্ছিল। আর তাতে আমার পড়াশোনা, নতুন নতুন চিন্তা, আর যন্ত্রপাতি নিয়ে রোজকার কাজকর্ম ভীষণ ডিসটার্ড হতে লাগল।

সবমিলিয়ে সে এক অসহ্য পরিস্থিতি। আমার গবেষণা আর ইনভেনশান প্রায় লাটে ওঠার জোগাড়।

এরকম একটা অবস্থায় একদিন হঠাৎ মনে হল, সোনিকে বাড়িতে ডেকে জিনিয়ার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করিয়ে দিলে কেমন হয়! এতে জিনিয়া হয়তো খানকটা নরমাল হতে পারবে। আর সোনিও আমার ল্যাব দেখার সুযোগ পাবে। ল্যাব দেখে যে ও কী খুশি হবে সেটা কল্পনা করে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল।

আর দেরি করলাম না। সোনিকে একদিন বাড়িতে আসতে বললাম।

সোনির ব্যাপারে জিনিয়াকে আগেই সব বলে রেখেছিলাম। মিথ্যে করে বলেছিলাম, ও আমার বন্ধু সুবীরের কাজিন। এবং সুবীরকেও সোনির সঙ্গে আসার জন্যে বারবার করে বলেছিলাম।

তুই যদি আমার সুইসাইড ঠেকাতে চাস তা হলে সোনির সঙ্গে অবশ্যই আসবি। প্লিজ! আর মনে রাখবি সোনি তোর কাজিন।

উত্তরে সুবীর একটা নোংরা ঠাট্টা করে কথা দিয়েছিল, আসবে।

ওরা এল। জিনিয়ার সঙ্গে ওদের আলাপ-পরিচয় হল। জিনিয়া বেশ হাসিমুখে ওদের আপ্যায়ন করল।

খানিকক্ষণ আড্ডার পর ওদের ল্যাব দেখাতে নিয়ে গেলাম। জিনিয়া আসতে চাইছিল না, কিন্তু আমি জোরাজুরি করে ওকেও ডেকে নিলাম। গিনিপিগও ওর পেছন-পেছন গ্যারাজে চলে এল। গিনিপিগ নামে বেড়ালটার পরিচয় করিয়ে দিতেই সোনি আর সুবীরের কী হাসি!

সুবীর বলল, ইনভেনশানের ইতিহাসে গিনিপিগ অমর হয়ে গেল।

সোনি বলল, গিনিপিগ কী কিউট নেম!

জিনিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ওর কথা ছাড়ুন তো! এই মেনিটার আমি নাম দিয়েছি মিষ্টি। তারপর বেড়ালটাকে মিষ্টি মিষ্টি! বলে আদুরে গলায় ডেকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে হতভাগা বেড়ালটা মেঝে থেকে একলাফে জিনিয়ার কোলে চড়ে বসল। মিঁউ-মিঁউ করতে লাগল।

নেহাত আমার এক্সপেরিমেন্টে প্রায়ই মালটাকে কাজে লাগে তাই। নইলে এটাকে আমি লাথি মেরে বাড়িছাড়া করতাম। যখন তখন বাড়ির যেখানে সেখানে নোংরা করে!

গ্যারাজের এককোণে রয়েছে একসেট টেবিল-চেয়ার আর একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। এ ছাড়া বাকি স্পেসটা একেবারে ছন্নছাড়া। ছুরি, হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, সলডারিং আয়রন আর হাজাররকম যন্ত্রপাতি এখানে সেখানে ছড়ানো। সোনি আমার যন্ত্রগুলো দেখে গৌরী বালিকা হয়ে গেল। ওর সে কী আনন্দ, সে কী খুশি!

ও প্রশ্নে-প্রশ্নে আমাকে পাগল করে তুলল। জিনিয়া সামনে থাকায় আমি মনের উজ্জ্বল আবেগ চেপে বিজ্ঞানীর গাম্ভীর্য বজায় রেখে ছোট-ছোট জবাব দিতে লাগলাম। কোথা দিয়ে সময় গড়িয়ে গেল টেরই পেলাম না।

সুবীর আর সোনি যখন চলে গেল তখন রাত দশটা। সন্ধেটা কী দারুণ কাটল ভেবে আমি তৃপ্তির নেশায় ডুবে গেলাম। অনেক রাতে সোনিকে ফোন করলাম।

আমার ফোন চলতে লাগল। সোনির আসা-যাওয়াও। আমার আবিষ্কার নিয়ে ওর এথুর দেখলাম শেষ নেই। ওর কাছে আমার গ্যাজেটগুলোর মেকানিজম এক্সপ্লেইন করতে করতে আমি কখনওই ক্লান্ত হতাম না। কোথা থেকে যেন অফুরান এনার্জি আমার শরীর আর মনে ঢুকে পড়ত।

সোনি আমার ল্যাবের সব যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে-দেখতে প্রায়ই বলত, ইনভেন্টর, ইউ আর আ জিনিয়াস!

ওর ইনভেন্টর সম্বোধনে আমি খুশি হতাম। জিনিয়াস বলাতেও। কিন্তু জিনিয়াস-এর মধ্যে জিনিয়া অংশটুকু আমার মনে কাটার মতো খচখচ করত।

সোনি আর সুবীরকে আমার সব মেশিন দেখালেও টাইম মেশিনটা দেখাইনি। আমার বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন সাকার হয়ে গেলে তারপর হয়তো দেখাব। আর মেশিনটা দেখিয়ে জিনিয়াকে বহু আগেই বলে দিয়েছি, এই উদ্ভট বেআক্কেলে যন্ত্রটা চিরকালের জন্যে অকেজো হয়ে গেছে।

সোনির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ধরনটা জিনিয়া ঠিক বুঝতে পারেনি। আমার বিজ্ঞান নিয়ে ওর অ্যাপ্যাথি যেমন অবিচল, তেমনই সোনির ব্যাপারটা ও সবসময়

দ্রৌপদী সিনড্রোমের আলোকে বিশ্লেষণ করতে লাগল। ওর নৃত্যকলা আর নৃত্যনাট্য চর্চার ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে ও হুল ফুটিয়েই চলল।

এক-একসময় ব্যাপারটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠত। তখন সেই পুরোনো বাজে চিন্তাটা মাথায় ধাক্কা মারত।

একদিন ঝোঁকের মাথায় ঠিক করেই ফেললাম, একটা খুন করব। এটা হবে আমার মার্ডার সিরিজের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট।

আমি বেচারা সতুকে বেছে নিলাম। না, খুন করার জন্যে নয়। মানে, ওর বাড়িকে টার্গেট করলাম।

এর প্রথম কারণ, ওর সোদপুরের বাড়িতে আমি দু-চারবার গেছি। ওর বোনের বিয়েতেও গিয়েছিলাম। সুতরাং বাড়িটার জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান আমার জানা।

আর দ্বিতীয় কারণ, ও একটা টিয়াপাখি পোষে। ওই পাখিটাই হবে আমার প্রথম টার্গেট। ভিকটিম নাম্বার ওয়ান। কিন্তু পাখিটাকে খুন করতে পারব তো? উঁহু, কিন্তু কিন্তু করলে চলবে না। আমাকে পারতেই হবে।

আমার ইদানীংকার অ্যাক্টিভিটি সতু আর তারকের চোখে খুব একটা যে ভালো ঠেকছিল না সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। দোকানে ঠিকমতো যাই না। মালপত্র পারচেজের ব্যাপারে গাফিলতি। এমনকী পাওনা টাকা তাগাদার ব্যাপারেও আগের মতো উৎসাহ দেখাই না।

কিন্তু আমি ওদের অবাক চোখকে আমল দিইনি।

আমি সতুর সঙ্গে দু-দিন ধরে গল্প জুড়ে দিলাম। দোকানে বসে তেলেভাজা-মুড়ি বা অন্য কিছু আনিয়ে আমি, সতু আর তারক সান্ধ্য টিফিন সারি আর গল্প করি। কখনও কখনও মান রোল-টোলও আনাই।

গল্প করে করে সতুর বাড়ির টোপোলজিটা ভালো করে ঝালিয়ে নিলাম। জেনে নিলাম, টিয়াপাখিটা কখন একা থাকে, রাতে খাঁচাটা কোথায় রাখা হয়, বেড়ালের ভয় আছে কি না, সদর দরজা রাতে কীভাবে বন্ধ করা থাকে, ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে কিনা ইত্যাদি।

এইরকম খোঁজখবর করে টিয়াপাখির ইনফরমেশান ফাইল কমপ্লিট হওয়ার পর কাজে নামলাম।

একটা ছোট তোয়ালে আর টর্চলাইট সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন রাতে দশমিনিটের জন্যে ভবিষ্যতে উধাও হলাম। সোজা গিয়ে হাজির হলাম সতুর বাড়ির উঠোনে।

খাঁচাটা উঁচুতে একটা হুকে ঝুলছিল। তার ওপরে একটা পুরোনো শাড়ি ঢাকা দেওয়া। আমি শাড়িটা সাবধানে সরালাম। তারপর বাঁ-হাতে টর্চ জ্বেলে তোয়ালেসমেত ডানহাতটা খাঁচার ভেতরে ঢোকালাম।

হঠাৎ আলোয় টিয়াপাখিটার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। আমি ওটাকে তোয়ালেসমেত সাপটে বাইরে বের করলাম।

পাখিটা একবার চাপা চিৎকার করে উঠল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কেউ যদি জেগে ওঠে।

একটা টিয়াপাখি খুন করতে এসে যে এত ভয় করতে পারে সেটা আগে বুঝিনি। আমার হাত কাঁপতে লাগল, বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শব্দ, কান ভোঁ-ভোঁ করছে। সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। যা করার জলদি করতে হবে। দশমিনিট শেষ হতে এখনও অনেক দেরি।

আমি আর দাঁড়ালাম না। সদর দরজার খিল-ছিটকিনি খুলে চট করে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তোয়ালের ওপর দিয়েই পাখিটার গলা টিপে ধরলাম। কয়েক সেকেন্ডেই ওটার ছটফটানি শেষ। তোয়ালেসমেত পাখিটা রাস্তায় ফেলে দিলাম।

আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে এতটা হিংস্রতা লুকিয়ে ছিল আগে বুঝিনি। নিরীহ অবোলা জীবটাকে কী সহজেই না আমি নিকেশ করে দিলাম।

পথের একটা নেড়ি কুকুর আমাকে দেখতে পেয়ে ঘেউঘেউ করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার দশমিনিটের কোটাও শেষ হল। হুউস।

গ্যারাজের বদলে আমি বাড়ির ছাদে এসে ল্যান্ড করলাম।

সর্বনাশ করেছে! ছাদের দরজা তো বাড়ির ভেতর থেকে বন্ধ করা থাকে। তা ছাড়া বাড়তি সুরক্ষার জন্যে যে-কোলাপসি গেট আছে সেটাতেও তালা।

অগত্যা ছাদেই শুয়ে পড়লাম। সকালে জিনিয়ার সঙ্গে একপ্রস্ত লড়াইয়ের জন্যে মনে-মনে। তৈরি হলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! লড়াইটাকে এমনভাবে এড়িয়ে যেতে পারলাম যে, আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।

সকালে ধাক্কাধাক্কি করে বাড়ি মাথায় করতেই জিনিয়া ঘুম-চোখে এসে দরজা খুলল। ওকে বললাম যে, রাতে টাইম মেশিন দিয়ে উলটোপালটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েই আমার এই দুর্দশা। মেশিনটা সবসময় গণ্ডগোল করছে।

ও ঠান্ডা গলায় বলল, মেশিনের আর দোষ কী! যেমন ইনভেন্টর, তেমনই ইনভেনশান।

আমার সামনে অনেক বড় প্ল্যান। তাই খোঁচাটা হজম করে গজগজ করে আপনমনেই মন্তব্য করলাম, যদি আর একমাসের মধ্যে এটাকে ঠিকঠাক করে তৈরি করতে না পারি তা হলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মডেলটাকে ডেসট্রয় করে ফেলব।

বাঁচা যাবে। বলে জিনিয়া সিঁড়ি নামতে শুরু করল।

আমি তখন প্রথম খুনের সাফল্যে ভেতরে-ভেতরে টগবগ করে ফুটছি।

.

সতু পরদিন আমাকে টিয়াপাখি হত্যার করুণ কাহিনি শোনাল। বলল, বাড়ির কোনও জিনিস চুরি যায়নি–শুধু পাখিটাকে গলা টিপে মেরে বাইরের রাস্তায় কে যেন ফেলে দিয়ে গেছে। পাখিটার পাশে একটা বাদামি রঙের নতুন ভোয়ালে পাওয়া গেছে।

খুনি কী করে বাড়িতে ঢুকল সেটা কারও মাথায় ঢুকছে না। আর কেনই-বা বেচারি পাখিটাকে গলা টিপে মারল সেটাও এক রহস্য।

আমি সতুর কাহিনি শুনছিলাম আর মনে-মনে ফুলছিলাম। ইগো বুস্ট বোধহয় একেই বলে! ক্ষমতায় নিজেকে ভগবানের কাছাকাছি মনে হচ্ছিল। আমার প্রথম মার্ডার সাকসেসফুল।

ঠিক করলাম, সিরিজের দ্বিতীয় খুনটা দিন-সাতেক পরে করব। তবে এবারে আর পাখি টাখি নয় বরং চারপেয়ে কিছু। আসলে একটু-একটু করে এগোনো দরকার। তারপর…।

সোনি আমাকে এক রবিবার সন্ধেবেলা ফোন করল।

হাই, ইনভেন্টর! কেমন আছেন?

ভালো। আপনি কেমন আছেন?

ফাইন। এখন কী করছেন?

আমি বেডরুমে বিছানায় বসে খবরের কাগজের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পাতাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলাম। আমার আবিষ্কারগুলোর কথা যেদিন সবাইকে অফিশিয়ালি জানাব সেদিন এই পৃষ্ঠাতেই আমার ফটোগ্রাফ থাকবে, নিউজ থাকবে। টিভির নানান চ্যানেলে আমার ইন্টারভিউর লাইভ টেলিকাস্ট হবে।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সোনি প্রশ্নটা আবার করতেই ঘোর কাটল। বললাম যে, আমি খবরে কাগজ পড়ছি।

বলুন না, নতুন কী ইনভেন্ট করছেন–মানে, কী নিয়ে এখন রিসার্চ করছেন।

একটা ইনসেক্ট রোবট তৈরি করার চেষ্টা করছি–যেটা সাইজে সাবান-টাবানের মতো হবে, আর টুকিটাকি জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে। যেমন, বোতলের ছিপি, খুচরো পয়সা, পেনের ক্যাপ বা কাগজের টুকরো– মেঝেতে পড়ে এসব জিনিস উড়ে গেলে বা ছিটকে গেলে মেশিনটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। মানে, মেঝেতে জিনিসটা প্রথম যেখানে পড়ছে সেই ইমপ্যাক্ট পয়েন্টে জিনিসটাকে পৌঁছে দেবে।

ওঃ, গ্রেট! খুশিতে ফেটে পড়ল সোনি ও এই রোবটটা দারুণ কাজের জিনিস হবে।

আপনি এখন কী করছেন?

কী আর করব, ফিস্ক্যাল পলিসি নিয়ে স্টাডি করছি। এত বোরিং টপিক ভাবা যায় না।

বোর হয়ে গেলে অন্য কোনও বই পড়ুন–ল্যাপটপ খুলুন, নয়তো টিভি দেখুন।

দুর! ওসব ভাল্লাগে না। আপনাকে আমার হিংসে হয়।

কেন?

আপনার কাজটা কী ইন্টারেস্টিং। আমাকে আপনার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিন না।

সোনি হালকাভাবে কথাটা বললেও আমার বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল। জিনিয়া।

তখনই মনে পড়ে গেল, পাশের ঘরে–মানে ড্রইং-ডাইনিং-এ-জিনিয়ার রিহার্সাল চলছে। চারটে ছেলেমেয়ে এসেছে। সামনের মাসে কী একটা যেন জয়ন্তী টাইপের আছে। তার জন্যে প্রবল প্র্যাকটিস চলছে।

এসব কথা মুখেও আনবেন না, সোনি। আপনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হলে আমার বাড়িতে আগুন জ্বলে যাবে। আপনাকে তো আগেই বলেছি–জিনিয়া-ম্যানিয়া…।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সোনি। তারপর বেশ সিরিয়াস গলায় বলে উঠল, আগুনে একটু হাত-টাত দিতে শিখুন। আপনি তো আর ছোট নেই!

তারপরই রাখছি বলে ফোন কেটে দিল।

এটা কী কথা বলল সোনি?

আগুনে একটু হাত-টাত দিতে শিখুন। আপনি তো আর ছোট নেই!

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এভাবে কখনও আমি ভাবিনি। সোনি আমার খুব ভালো বন্ধু। আমার সব আবিষ্কারের জেনুইন অ্যাডমায়ারার। ওর সঙ্গে কথা বলে আমি কাজে নতুন উৎসাহ পাই। ও যেভাবে বলে দেখবেন, আপনি একদিন ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাবেন সেটা সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। তার সঙ্গে সোনি অবশ্য এও বলে, সেদিন আমাকে ভুলে যাবেন না তো?

তাই তো ওকে টাইম মেশিনটার কথা এখনও বলিনি! শুনলে ওর একেবারে তাক লেগে যাবে। দুনিয়ার লোককে বলে বেড়াবে।

হঠাৎ জিনিয়া এসে ঘরে ঢুকল। বোধহয় কংক্রিট এভিডেন্সের খোঁজে।

কী ব্যাপার? আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই ফোন কেটে দিলে?

আমি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। মাথাটা কেমন ফাঁকা লাগছিল। জিনিয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

চমৎকার অভিনয় করতে পারো তো! জিনিয়া নাচের বিভঙ্গে একটা হাতের ভর কোমরের নীচে রাখলঃ আমি ও-ঘরে রিহার্সাল করছি আর তুমিও বেডরুমে বসে রিহার্সাল চালিয়ে যাচ্ছ...?

আমি জিনিয়ার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়েই রইলাম। পাশের ঘর থেকে টেপরেকর্ডারের মিউজিক ভেসে আসছিল। আর সেই তালে-তালে আমি তিন নম্বর মার্ডারটার কথা ভেবে চললাম। কবে, কখন, কী কায়দায় ফাইনাল মার্ডারটা এক্সিকিউট করব সেসবের মেজর পয়েন্ট হাতড়ে চললাম।

সোনি ঠিকই বলেছে। এবারে আগুনে সত্যি-সত্যি হাত দেব। আমি আর ছোট নেই।

...আর রিহার্সাল দিয়ে কী হবে? বহুদিন তো রিহার্সাল হল–এবার আসল কাজে নেমে পড়ো। তুমি তো জানো না...।

জিনিয়া কথা বলেই যাচ্ছিল–তবে গলার স্বর তোলেনি। চাপা, হিসহিসে। কারণ, পাশের ঘরে ওর নৃত্য-ছাত্ররা রয়েছে।

আমি উদাসীন সাধুর চোখে ওকে দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য! কী সহজেই না ও নিজের শেষ সুনিশ্চিত করছে!

যখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন আমার মনে আর কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

নেক্সট স্টেপ, মার্ডার নাম্বার টু। সেকেন্ড রিহার্সাল। তারপর ফাইনাল স্টেপ, মার্ডার থ্রি। পারফেক্ট মার্ডার। ব্যস। নৃত্যনাট্যের যবনিকা।

.

দ্বিতীয় মার্ডারের ভিকটিম হিসেবে আমি একটা লোমওয়ালা পোষা কুকুরকে বেছে নিলাম।

প্রথমে পাখি। তারপর কুকুর। তারপর...।

আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা তিনতলা বড় বাড়ি আছে। বাড়ির নীচে একটা বড় মাপের ওষুধের দোকান। দোকানটার নাম মেডিকো। বাড়ি এবং দোকানের মালিক একই লোক। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ ফুলবাবুর মতো। মাথায় বাবরি চুল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, শৌখিন গোঁফ, কানে আতর মাখানো তুলো গোঁজা, পরনে সবসময় ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি।

এই বাবুটির একটি শখের কুকুর আছে। গায়ে বড়-বড় সাদা লোম, ঝিরকুটে চেহারা। সবসময়েই এদিক-ওদিক চঞ্চলভাবে ঘুরঘুর করছে আর গন্ধ শুঁকছে।

আমি বাড়িটার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলাম। শুনলাম, রাতে কুকুরটা ছাড়া থাকে। ডবল তালা দেওয়া কোলাপসিবল গেটের ওপিঠের চৌকো চাতালে ওটা সারারাত পায়চারি করে।

প্ল্যান ছকে নিতে কোনও অসুবিধে হল না।

বড়বাজারে গিয়ে একটা ছইঞ্চি ফুলার ছুরি কিনলাম। তারপর দোকান থেকে শিককাবাব কিনে তাতে র‍্যাটকিলার আর ঘুমের ওষুধ গুঁড়ো করে বেশ ভালো করে মাখিয়ে দিলাম। এবং রাত ঠিক একটার সময়ে টাইম মেশিনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রওনা হলাম।

আমি ভবিষ্যতে পাড়ি দিলাম মাত্র কুড়ি সেকেন্ডের জন্যে। আর সেটি ফ্যাক্টর বাড়ানোর জন্যে হালকা ছদ্মবেশ নিলাম। একটা পাওয়ার ছাড়া রেডিমেড চশমা কিনে এনেছিলাম। সেটা চোখে দিলাম। আর মাথায় পাগড়ির ধাঁচে একটা লাল গামছা জড়িয়ে নিলাম।

ছোট মাপের কুকুরগুলো লোক দেখলেই কেঁউকেঁউ করে চেঁচায়। তাই কুড়ি সেকেন্ডের বেশি সময় আমি কুকুরটার সামনে থাকতে চাইনি।

আমি অন্ধকার চাতালে আচমকা হাজির হতেই কুকুরটা হকচকিয়ে গেল। তার পরই একটা ছোট্ট চিৎকার করল। সঙ্গে সঙ্গে শিককাবাবের টুকরোগুলো সাদা প্রাণীটার সামনে ছড়িয়ে দিলাম। ওটা গন্ধ শুঁকতে মুখ নিচু করল। একটুকরো মাংস কপ করে মুখে তুলে চিবোতে শুরু করল।

আর দেরি করলাম না। আমার মধ্যে একটা কসাই জেগে উঠল। চোখের পলকে কুকুরটার গলায় ছুরি ঢুকিয়ে দিলাম। বাঁ-হাতে ওটার নরম শরীর চেপে ধরলাম মেঝেতে। ছুরিটা টেনে বের করে বসিয়ে দিলাম আবার। আর-একবার।

ছোট্ট একটা আর্তনাদ। রক্ত। সব শেষ।

বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা আলো জ্বলে উঠল।

ততক্ষণে আমার কুড়ি সেকেন্ডও শেষ। হুউস।

গ্যারাজে ফিরে দেখলাম আমার মাথায় গামছাটা নেই। কখন যেন খসে পড়ে গেছে। আর আমার জামা-প্যান্টে বেশ খানিকটা রক্তের ছিটে।

আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম, হাঁপাচ্ছিলাম।

চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেললাম। একতলার গেস্ট রুমে ঢুকে রক্তের ছিটে লাগা জামা প্যান্ট ছেড়ে ফেললাম। তারপর বাথরুমে স্নান করতে ঢুকলাম। কাল চশমা আর জামা-প্যান্ট দুটোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। আগেরবারের শার্ট পোড়ানোর মতো বোকামি আর আমি করছি না।

ফেলে আসা গামছাটা নিয়ে আমার একটু দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম।

দ্বিতীয় খুনটার পর বেশ টের পেলাম আমার ইগো আর কনফিডেন্স, দুটোই অনেক বেড়ে গেছে। আমি যেন এক নতুন আমি। কী সহজেই না আমি টিয়াপাখিটাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। তুলতুলে কুকুরটার গলায় নৃশংসভাবে ছুরি বসানোর সময়েও আমি কী অদ্ভুতভাবে মাথা ঠান্ডা রেখেছিলাম। তা হলে কি আমার ভেতরে একটা ঠান্ডা খুনি ঘুম থেকে ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে?

নতুন করে আবার মনে হল, আমি ভগবানের কাছাকাছি। এবং সেই হাই লেভেল থেকে আমি রোজ জিনিয়াকে লক্ষ করে চললাম। ওর হাঁটা-চলা, কথা বলা, নাচের রিহার্সাল, বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে আসার ভঙ্গি—সবই এক অদ্ভুত তৃষ্ণা নিয়ে দেখতে লাগলাম। যেন এই শেষবারের মতো দেখছি।

সত্যিই তো তাই! কদিন পরই তো এগুলো আর দেখতে পাব না!

সোনিকে নিয়েও আমি নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে টাইম মেশিনটার কথা বলি। এও ইচ্ছে হচ্ছিল, মাঝরাতে মেশিনে চড়ে ওর বেডরুমে হাজির হয়ে ওকে চমকে দিই। তারপর…।

নাঃ, ওসব বাজে চিন্তা থাক কাজের চিন্তা করি। মার্ডার নাম্বার থ্রি। দ্য পারফেক্ট মার্ডার।

তিনদিন চিন্তার পর দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললাম। সুবীরকে বললাম, আমি একটা পার্টি থ্রো করতে চাই। কিন্তু আমি যে পার্টি দিচ্ছি সেটা জিনিয়ার কাছে সিক্রেট রাখতে হবে কারণ, ও এসব পছন্দ করে না।

পার্টি দেওয়ার কারণ একটা দেখাতে হয়। তাই সুবীরকে বললাম যে, লাস্ট দু-মাসে আমার ব্যাবসায় যাচ্ছেতাইরকমের মেগা প্রফিট হয়েছে। আর সোনির সঙ্গে পার্টিতে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়াটা একটা দারুণ ব্যাপার।

উত্তরে সুবীর আমাকে চোখ মারল, ভেংচে বলল, হুঁ—দারুণ ব্যাপার।

আমি ওর ঠাট্টাটা গায়ে মাখলাম না।

আমারই প্ল্যানমতো সুবীর আমাদের পাড়া থেকে বহুদূরে সন্তোষপুরে–ওর এক বড়লোক কোলিগের ফ্ল্যাট সাজেস্ট করল। বলল, শেয়ারে রিস্ক নিয়ে শালা প্রচুর টাকা করেছে। প্রায় তিনহাজার স্কোয়ার ফুটের নতুন এই ফ্ল্যাটটা রিসেন্টলি কিনেছে। তুই ওখানে ফুটবল খেলতে পারবি…।

সুবীরের সেই কোলিগের নাম তনুময়–ডাকনাম টনি। তো আমি, সুবীর আর টনি মিলে পার্টির সব ব্যবস্থা করতে লাগলাম। জনাপঁচিশ লোককে নেমন্তন্ন করলাম। তার মধ্যে সোনি অবশ্যই ছিল। ওর বাবা-মা-কেও আসতে বললাম। সুবীর আর টনিও ওদের ক্লোজ সার্কেলের ইমপরট্যান্ট বন্ধুদের নেমন্তন্ন করল।

পার্টির চার-পাঁচদিন আগে থেকেই আমি জিনিয়ার সঙ্গে প্রেমিকের মতো ব্যবহার শুরু করলাম। যাতে কেউ বুঝতে না পারে আমাদের সম্পর্কটা আর ঠিকঠাক নেই। কোথাও একটা চোরা ফাটল ধরেছে।

জিনিয়া মাঝে-মাঝে ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখত। কয়েকবার বলেও ফেলেছে, তোমার কী হয়েছে বলো তো? সকাল-বিকেল এত মিষ্টি কথা! নিশ্চয় এর পেছনে কোনও মতলব রয়েছে।

আমি হেসে বলেছি, মতলব আছে। তোমাকে বদলে দেওয়ার মতলব। পুরোনো দিনগুলো আবার ফিরে পেতে চাই আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে ও : সে কী কখনও হয়! দিন বদলায়, মানুষ বদলায়। সেটাই নিয়ম।

ওরে বাবা! এ যে একেবারে ফিলজফারের ডায়ালগ! যাকগে, হাতে তো আর মাত্র কটাদিন!

মার্ডার নাম্বার থ্রি-র পারফেকশানের কথা ভেবে আমি আরও একটা কাজ করেছিলাম। হুবহু একইরকম দেখতে দুটো জামা আর দুটো প্যান্ট কিনেছিলাম। দু-সেটই আমার জন্যে–তবে একটা সেটের সাইজ একটু ছোট, আর-একটা একটু বড়।

ঘটনার দিন জিনিয়াকে বললাম যে, আমার একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন আছে– অনেক দুরে, এক্সট্রিম সাউথে। সুবীরের এক বন্ধুর বাড়িতে। ফিরতে রাত হবে।

জিনিয়ার চোখে সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠবে জানতাম। তাই উঠল।

আমি হেসে বললাম, যখন খুশি আমাকে ফোন কোরো। যতবার খুশি। আমিও তোমাকে ফোন করব।

জিনিয়া অবাক হল। খুশিও হল।

ও তো আর জানে না, এই ফোন করার ব্যাপারটাও আমার অ্যালিবাই এস্টাবলিশ করার একটা প্ল্যান!

জিনিয়াকে খুন করার জন্যে আমি এমন একটা দিন বেছে নিয়েছিলাম যেদিন ওর কোনও নাচের রিহার্সাল থাকে না। কারণটা খুবই সহজ। আমি খুনের কোনও সাক্ষী চাই না। খুনের যদি কোনও আই উইটনেস থাকে তা হলে টাইম মেশিনের বাবাও আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

আসল দিনটা দেখতে-দেখতে এসে গেল।

সকালবেলা আমি জিনিয়ার চোখ এড়িয়ে একটা হাতুড়ি আমাদের মাস্টার বেডরুমে তোশকের নীচে লুকিয়ে রাখলাম।

বিকেল হতে-না-হতেই টাইম মেশিনটাকে বাক্সে ঢুকিয়ে ভালো করে প্যাক করলাম। তারপর নতুন কেনা ডবল জামা-প্যান্ট পরে প্যাক করা মেশিনটা নিয়ে ট্যাক্সি করে রওনা দিলাম।

টনির বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ফোনে সুবীরকে ধরলাম। শুনলাম, ও আর টনি খানাপিনার আয়োজন অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে।

টনির ফ্ল্যাট তিনতলায়। মেশিনটা সঙ্গে করে লিফটে তিনতলায় উঠলাম। তারপর ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আমার সামনেই টনি আর সুবীর।

প্যাক করা বাক্সটা দেখে ওরা খুব অবাক হল। একগাল হেসে বললাম যে, এর ভেতরে একটা হাই পাওয়ার জেনারেটার আছে। আমার লেটেস্ট ইনভেনশান। আজকের পার্টিতে এই যন্ত্রটার আবিষ্কার আমি অ্যানাউন্স করব।

টনির অনুমতি নিয়ে যন্ত্রটা আমি টয়লেটের কাছাকাছি একটা কোণে রাখলাম। বললাম, যন্ত্রটা এখানে থাক। ওটাতে মাঝে-মাঝে জল ঢালার দরকার হয়–ব্যাটারির মতো। সেরকম কেস হলে ওটা নিয়ে টয়লেটে ঢুকে পড়তে আমার সুবিধে হবে।

ওঃ, কত মিথ্যেই না বলতে হচ্ছে! একটা পারফেক্ট মার্ডারের ঝক্কি কি কম! লাস্ট দশদিন ধরে শুধু মনে-মনে হাজার একটা প্ল্যান ভেঁজে চলেছি। চলেছি আর চলেছি। অবশেষে…।

সুবীর হঠাৎ বলল, অ্যাই, তোর সেই টাইম মেশিনের খবর কী? কদ্দূর এগোলি?

পলকে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। সামনে আয়না থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম মুখের সব রক্ত উধাও হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড মরিয়া চেষ্টার পর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল।

ওটা থিয়োরিতেই বস্ আটকে গেছি। মালটা এখনও তৈরি করতে পারিনি। তোর জেঠুর কাছে আমাকে আবার যেতে হবে।

আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। একে খাপছাড়া বর্ষার গুমোট, তার ওপর ডবল জামা ডবল প্যান্ট। আমার হাঁটতে-চলতেও বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

দমবন্ধ করে আমি সময় কাটাতে লাগলাম। কখন সাতটা-আটটা বাজবে তার অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্যান্য গেস্ট তখন এসে পড়বে। বোতলের ছিপি খোলা হবে। পার্টির হইহই তখন তুঙ্গে উঠবে। আমার দিকে ততটা কেউ আর খেয়াল করবে না। সেই সুযোগে আমি…।

সময় গড়িয়ে সন্ধে হল। সন্ধে আরও গম্ভীর হল। অতিথির ভিড়ে টনির ফ্ল্যাট একেবারে হাটবাজার হয়ে উঠল। সোনিও ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে এসে পড়েছে। সুবীর আমাকে ওদের কাছে নিয়ে গেল, পরিচয় করিয়ে দিল গ্রেট ইনভেন্টর বলে। আর সোনি আমার নামে ওর বাবা-মায়ের কাছে এত প্রশংসা করতে লাগল যে, আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

সোনিকে দেখে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, যে-পথে আমি পা বাড়িয়েছি সেই পথটাই একমাত্র সঠিক পথ।

এর মধ্যে জিনিয়া আমাকে তিনবার ফোন করেছে। দু-পাঁচমিনিট করে কথা বলেছে। আমিও ওকে পালটা দুবার রিং করেছি। সুবীরের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছি। পার্টির নেশা ধরানো মিউজিক নিশ্চয়ই জিনিয়ার কানে গেছে। ও বুঝেছে, আমি ওকে পার্টির ব্যাপারটা মোটেই ব্লাফ দিইনি।

রাত নটার সময় জিনিয়াকে ওর মোবাইলে আবার ফোন করলাম।

কী করছ?

হঠাৎ জানতে চাইছ?

এমনি জানতে ইচ্ছে হল।

শুয়ে আছি। ম্যাগাজিন পড়ছি।

আমি জানি, জিনিয়া অনেক সময় বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নানান পত্রপত্রিকা পড়ে। তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা একসঙ্গে খেতে বসি।

আমি বললাম, তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তুমি কোথায় সল্টলেকে নিজের বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে আয়েস করছ, আর আমি সন্তোষপুরে তনুময় বোসের ফ্ল্যাটে পার্টি করছি। বিলিভ মি, ভীষণ বোর লাগছে। এক্ষুনি তোমার কাছে চলে যেতে পারলে হত।

হাসল জিনিয়া : চলে এসো। অভিনয় যখন করছ ভালো করেই করো।

অভিনয়? ঠাট্টা করে বললাম, এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি। দেখাচ্ছি মজা।

আমার ডায়লগগুলো আপনারা দয়া করে খেয়াল করবেন।

জিনিয়া খুন হলে পুলিশ অফিসাররা ওর মোবাইল ফোন নিয়ে পড়বে। ওর কল লিস্ট দেখবে। এমনকী কথাবার্তার রেকর্ডও শুনবে। তখন ওরা যাতে নিশ্চিত প্রমাণ পায় যে, খুন হওয়ার পাঁচ-সাত মিনিট আগেও আমার আর জিনিয়ার মধ্যে অন্তত বিশ কিলোমিটার ফারাক ছিল, সেইজন্যেই আমার ওই কথাগুলো বলা। আর এ তো জানা কথা, ওয়াইফ মার্ডার হলে সমস্ত সন্দেহের তির আগে ছোটে বেচারা হাজব্যান্ডের দিকে।

আর দেরি করলাম না। ফ্ল্যাটের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম সবাই নাচে, গানে আর গ্লাসে মত্ত। আমার দিকে কারও নজর নেই। তাই টুক করে টাইম মেশিন হাতে টয়লেটে ঢুকে পড়লাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

কোথায় যেন প্লাগ পয়েন্টটা? ওই তো!

মেশিনটাকে তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে গেলাম। সুইচ অন করলাম। প্ল্যাটফর্মটা পেতে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার বুকের ভেতরে ডুগডুগি বাজছিল। দমবন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল।

মেশিনের ডায়াল সেট করলাম, কিবোর্ডে বোতাম ঠুকতে লাগলাম।

এত ঘামছি কেন কে জানে! আমার মার্ডার স্কিমে তো কোনও ফাঁকফোকর নেই! পারফেক্ট মার্ডার। পারফেক্ট।

এবার নব ঘোরালাম। এন্টার বোতাম টিপলাম।

.

আমাকে দেখে জিনিয়া চমকে উঠল।

হাই, জিনি!

তু-তুমি! ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। ও ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

হ্যাঁ, আমি হেসে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম : বললাম যে, এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি। দেখাচ্ছি মজা।

তুমি পার্টিতে যাওনি? সন্তোষপুরে?

উত্তরে ঝুঁকে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কপালে একটা চুমু খেলাম। বললাম, আমার টাইম মেশিনের ব্যাপারটা গল্প নয় সত্যি, জিনি। এই দ্যাখো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু-পাশে দু-হাত ছড়িয়ে দিলামঃ আমি রিয়েল আমি। রক্ত-মাংসের দেবদত্ত রায়চৌধুরী।

বিছানায় সেই জায়গাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোশকের নীচে হাত ঢুকিয়ে হাতুড়িটা বের করলাম।

বেশ ভারী হাতুড়ি। মুণ্ডুটা প্রায় পাঁচশো গ্রাম হবে। কারও মুণ্ডু গুঁড়ো করার পক্ষে বেশ নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

জিনিয়া হাঁ করেছিল। বোধহয় চিৎকার করবে বলে। কিন্তু সেটা করে ওঠার আগেই আমি শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সাংঘাতিক মোমেন্টামে হাতুড়িটা ওর মাথায় নামিয়ে আনলাম।

কিন্তু রিফ্লেক্স যাবে কোথায়!

শেষ মুহূর্তে জিনিয়া মাথাটা ইঞ্চিচারেক সরাতে পেরেছিল। তাই আমি ব্রহ্মতালু তাক করলেও হাতুড়িটা শেষ পর্যন্ত ওর মাথার বাঁ-দিক ছুঁয়ে কান ঘেঁষে কাঁধে গিয়ে পড়ল।

ও বাঁ-দিকে কাত হয়ে গেল। দেবু, কী করছ, কী করছ! বলে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। তারপরই আমাকে অবাক করে দিয়ে ঘরের দরজা লক্ষ্য করে ছুট লাগাল।

এটা আমার ছকের মধ্যে ছিল না। ও যে দৌড়ে পালাতে পারবে সেটা ভাবিনি।

আমি একমুহূর্ত হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই ওকে পাগলের মতো তাড়া করলাম। ডবল জামা-প্যান্টের জন্যে ছুটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড গোঁ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার ভেতরের ঠান্ডা খুনিটা আবার জেগে উঠেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে ও ড্রইং-ডাইনিং-এর দিকে দৌড়তে শুরু করেছিল। তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা চিৎকারও শুরু করেছিল।

কিন্তু আমি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় হাত বাড়িয়ে ওর ঘাড়ের গোড়ায় হাতুড়ি বসিয়ে দিলাম। ছুটন্ত জিনিয়া এবং চিৎকার–দুটোকেই মাঝপথে থামিয়ে দিলাম।

আঁক শব্দ করে জিনিয়া মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

জিনিয়া উপুড় হয়ে পড়েছিল। ওকে আর চিত হওয়ার সুযোগ দিলাম না। চট করে ওর পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম। হাতুড়ি নিয়ে এলোপাতাড়ি কাজ করে চললাম। ওর নাচ, সন্দেহ, দ্রৌপদী সিনড্রোম, ফিগারসব একসঙ্গে থেঁতো হয়ে যাচ্ছিল।

আমার ভেতরে বোধহয় একটা জন্তু ঢুকে পড়েছিল। কারণ, বেশ টের পাচ্ছিলাম, অন্ধ আক্রোশ, রাগ, ঘৃণা, হিংসা–সব আমার মাথার ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল। আমি ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছিলাম। জিনিয়াকে কখনও মনে হচ্ছিল টিয়াপাখি, কখনও-বা তুলতুলে কুকুর।

কিন্তু একইসঙ্গে আমি ঠান্ডা মাথায় ভাবছিলাম। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। বাড়িতে আর কেউ নেই। বারান্দার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ খিল ছিটকিনি আঁটা। সুতরাং জিনিয়ার মার্ডার মিস্ট্রির সমাধান করতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যাবে। ইমপসিল ক্রাইম। লড রুম মিস্ট্রি। খুনি বাড়িতে ঢুকল কী করে, আর বেরোলই বা কী করে? ঢোকার সময় জিনিয়া যদিও বা দরজা খুলে দিয়ে থাকে, খুন করে চলে যাওয়ার পর জিনিয়ার পক্ষে তো আর দরজা বন্ধ করে খিল-ছিটকিনি এঁটে দেওয়া সম্ভব নয়।

মনে-মনে হাসি পেয়ে গেল আমার। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। আমি হাতুড়িটা হাতে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে ওটার হাতলটা ঘষে ঘষে মুছে দিলাম। তারপর ওটাকে একপাশে ফেলে দিলাম।

জিনিয়ার বডিটা মেঝেতে উপুড় হয়ে লেপটে রয়েছে। ওর মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে। দু-তিনটে মাছি কোথা থেকে যেন এসে ওড়াউড়ি শুরু করেছে। ডিসগাস্টিং মেস।

রক্ত ছিটকে আমার জামা-প্যান্টেও লেগেছে। কিন্তু তার জন্যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওই যে বলেছি, ডবল জামা-প্যান্ট।

টনির ফ্ল্যাটের টয়লেটে ফিরে ওপরের রক্ত মাখা জামা আর প্যান্ট খুলে ফেলব। ওগুলো টাইম মেশিনের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখব। তারপর মেশিনের সঙ্গে প্যাক করে নিয়ে সোজা বাড়ি।

এবারে আর জামা-প্যান্ট পোড়ানোর গন্ধ পেয়ে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

জিনিয়ার ডেডবডির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, ওর নাচের প্রোগ্রামগুলোর এখন তা হলে কী হবে?

আর ঠিক তখনই মিয়াও-মিয়াও ডাক শুনতে পেলাম।

আচমকা ডাকে চমকে তাকিয়ে দেখি গিনিপিগ। কোথায় ছিল কে জানে! আদরের মালকিনের খোঁজে বেরিয়ে এসেছে। তারপর জিনিয়ার রক্ত মাখা ডেডবডির কাছে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে গন্ধ শুঁকছে আর মিয়াও-মিয়াও করে ডাকছে।

হঠাৎই বেড়ালটা মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তের ওপরে মাথা নামাল। জিভ বের করে চাটতে শুরু করল।

আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। ওটাকে হুস-হুঁস করে তাড়াতে চেষ্টা করলাম।

বেড়ালটা সবুজ চোখে সরাসরি তাকাল আমার দিকে। এবং কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ হোয়াও করে বিকট ডেকে উঠে আমার বুক লক্ষ্য করে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপরই হুউস।

.

টনির হলঘরে আমি সার্কাসের জোকারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি। রক্ত মাখা জামাকাপড়ে একটা বেড়ালের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আমাকে ঘিরে ঝকঝকে পোশাক পরা গেস্টের দল। পাগল করা ছন্দে ঝিনচ্যাক মিউজিক বাজছে। সেই তালে তাল মিলিয়ে সবাই এলোমেলো পা ফেলে নাচছে।

আমাকে দেখামাত্রই পলকে মিউজিক থেমে গেল। নাচ থামিয়ে সবাই যেন ফ্রিজ শট হয়ে গেল। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই। তাদের অবাক গোল-গোল চোখে নীরব প্রশ্ন।

আমার মাথা কাজ করছিল না। শুধু বুঝতে পারছিলাম আমার বাড়ির মাস্টার বেডরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম বলে ফিউচারে পৌঁছে আমার পজিশান বদলে গিয়েছিল। সেইজন্যে টাইম মেশিন আমাকে ঠিকঠাক টয়লেটের ভেতরে ফেরত নিয়ে আসার বদলে এই হলঘরে এনে হাজির করেছে।

এ ছাড়া সঙ্গে রয়েছে এই হতচ্ছাড়া পাগল বেড়ালটা। আঁচড়ে কামড়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আর আমার জামা-প্যান্টের এখানে ওখানে লেগে রয়েছে রক্ত–জিনিয়ার রক্ত।

ওদের সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করে আর কোনও লাভ নেই। টয়লেটের দরজা ভাঙলেই টাইম মেশিনটা ওরা দেখতে পাবে। তারপর…।

সোনি হাঁ করে আমাকে দেখছিল। হঠাৎই ও তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল। তার সঙ্গে আরও দু-একজন মহিলা গলা মেলাল।

অপমানে, ক্ষোভে, লজ্জায় আমার চোখে জল এসে গেল। এরই নাম পারফেক্ট মার্ডার! ছিঃ!

তাই আপনাদের হাতজোড় করে একটা রিকোয়েস্ট করছি। টাইম মেশিন হাতে থাকলেও কখনও খুন করবেন না। প্লিজ!

# অমানুষিক হাত (নভেলেট)

## অমানুষিক হাত

সকলে মিলিয়া বাসর জাগিতেছিলাম।

এই বাসর-জাগরণ অনুষ্ঠানে আমার মতো পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়ের সম্ভবত স্থান হইবার কথা নহে, কিন্তু বরপক্ষের একান্ত অনুরোধ ও দলবদ্ধ আড্ডার প্রতি আমার অনমনীয় আকর্ষণ এড়াইতে পারি নাই। বরপক্ষের একান্ত অনুরোধের একটি বিশেষ কারণ ছিল। কীরূপে যেন তাহারা জানিতে পারিয়াছিল আমার কণ্ঠসঙ্গীত তাবৎ কোকিল জাতিকে নিমেষে ব্রীড়াময় করিয়া তুলতে পারে। যদিও আমার স্ত্রী মালতী ওই মতের ঘোরতর বিরোধী, তবুও বাহিরের অভ্যাগতদের সম্মুখে নিজের স্বামীর প্রশংসা শুনিয়া সর্বসমক্ষে তাহার মত আর জাহির করে নাই। পরিবর্তে আমার কানের নিকটে মুখ লইয়া আসিয়া বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া দ্রুতগতিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

বিবাহ আমার কনিষ্ঠা শ্যালিকা মাধবীর। অন্যান্য তিন শ্যালিকা অপ্রত্যাশিত তৎপরতায় নিজ-নিজ স্বামীগৃহে রিজার্ভেশন পাইলেও মাধবীকে তিনটি বৎসর ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। অবশেষে প্রজাপতির নির্বন্ধে ও মাধবীর পিতা-মাতার অনলস প্রচেষ্টায় কলিকাতা হইতে এই যমুনাপুর নামক অজ পাড়াগাঁয়ে ইঞ্জিনিয়ার পাত্র শ্রীমান চন্দ্রমোহন বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে এই ঘোরতর শীতকালে হ্যাজাক লন্ডনের আলোয় বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করিতে আসিয়াছে।

এখন রাত্রি প্রায় বারোটা। অতএব বিবাহ এবং নিমন্ত্রণের পাট শেষ করিয়া সকলেই শয্যাভিমুখী হইয়াছে। বরযাত্রীদের অন্য বাড়িতে শয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—কেবলমাত্র চন্দ্রমোহনের তিন বন্ধু ও জনৈক আত্মীয় বিশ্বনাথবাবু

বাসর-ঘরে চন্দ্রমোহনকে সঙ্গ দিতে থাকিয়া গিয়াছেন। কন্যাপক্ষের একমাত্র পুরুষ প্রতিনিধি আমি স্বয়ং, ইহা ছাড়া যে কয়েকজন বালিকা, কিশোরী ও তরুণী ঘরে উপস্থিত, তাহারা মৌমাছির ন্যায় মধুভাণ্ডরূপ মাধবীকে ঘিরিয়া নানান জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত। কেবল মধ্যে-মধ্যে তাহাদের হাস্যরোল ও কলগুঞ্জন কানে আসিতেছে।

চন্দ্রমোহন ও তাহার তিন বন্ধু আমার সহিত অনেক গল্প করিলেও বিশ্বনাথবাবুকে লক্ষ করিলাম একেবারে নিশ্চুপ। শুধু প্রয়োজনমতো আমাদের বক্তব্য সমর্থন করিতেছেন। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আমারই সমান। শান্ত দুইটি চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে এক অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার ছাপ। জুলপির চুলে বোধ করি তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাক ধরিয়াছে। পরনের ধুতি পাঞ্জাবিকে বেষ্টন করিয়া সাদা রঙের লোভনীয় কাশ্মীরি শাল। অভিব্যক্তিতে অস্বস্তি ও বিষণ্নতা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। চন্দ্রমোহন ও তাহার বন্ধুদের সহিত বিশ্বনাথবাবুকে আমি ঠিক মিলাইতে পারিতেছি না। যেন সিঁড়ি-ভাঙা কোনও সরল অঙ্কের উত্তর বারংবার ভুল হইয়া যাইতেছে।

আমার কৌতূহলী দৃষ্টি ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব সম্ভবত চন্দ্রমোহনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সুতরাং উপযাচক হইয়া সে আমাকে বিশ্বনাথবাবুর পরিচয় দিল। কহিল, সমীরদা, বিশ্বনাথদা আমার পিসতুতো ভাই–বলতে গেলে এক মহাপুরুষ। সারা ভারতের আনাচেকানাচে বহু ঘুরেছেন। ওঁর ঝুলিতে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। তা ছাড়া খুব ভালো হাত দেখতে জানেন…।

উত্তরে বিশ্বনাথবাবু মাথা নীচু করিয়া সলজ্জ হাসিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তেমন কিছুই না, বই পড়ে শেখা বিদ্যে–

ভদ্রতাবশে আমার ডান হাতটি তাঁহার সম্মুখে বাড়াইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তিনি আলোয়ানের ফাঁক হইতে নিজের ডান হাতখানি সামান্য বাহির করিলেন। আমার হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর চশমাটি ঈষৎ বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন, আপনার ভাগ্যরেখা খুব ভালো। সচরাচর দেখা যায় না।

অনুভব করিলাম, বিশ্বনাথবাবুর হাতটি অত্যন্ত কর্কশ। অনুমান হয়, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ। তাহার কথার জবাবে কহিলাম, সে তো নিশ্চয়ই, নইলে মালতীর মতো বউ পেয়েছি!

চন্দ্রমোহন ও তাহার বন্ধুরা হাসিয়া উঠিল। বিশ্বনাথবাবু আরও যোগ করিলেন, আপনার যশ-রেখাও ফ্যালনা নয়।

চন্দ্রমোহন কহিল, তাও তো হ্যাঁজাকের আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ইলেকট্রিকের আলোয় আরও জোরদার দেখাত।

চন্দ্রমোহনের এক বন্ধু, অবিনাশ, আক্রমণাত্মক সুরে কহিল, দাদা, আর ছাড়ছি না। নিন, শুরু করুন। একটা অভাবনীয় সংগীতের মূর্ঘনায় আমাদের মূর্ছা ঘটিয়ে বিশ্বনাথদাকে প্রমাণ দিন যে আপনার যশ-রেখা সত্যিই জোরদার।

ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট। অতএব সকলের পীড়াপীড়িতে গান ধরিলাম ।

আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান…।

বান যখন মধ্যপথে, তাহাকে বাধা দিল মালতী। লক্ষই করি নাই, কখন সে দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে তাহার দশম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যাসহ ঘুমাইয়া পড়িবার কথা। অতএব চন্দ্রমোহন যখন আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল, তখন স্বভাবতই অবাক হইলাম। গান থামিল। সকলের দৃষ্টিতেই নীরব প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল। মালতী সমস্ত কিছু উপেক্ষা করিয়া মৃদু কণ্ঠে আমাকে ডাকিল, একটু শুনবে?

আদেশ নীরবে পালন করিলাম। আমি নিকটে আসিলে সে ফিশফিশ করিয়া কহিল, আমার সীতাহারটা খুঁজে পাচ্ছি না!

লক্ষ করিলাম, তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক। কারণ সীতাহারটি একাধারে আমাদের বিবাহের যৌতুক, মালতীর মাতৃবংশের ঐতিহ্যবাহী এবং সাড়ে নয় ভরি সোনায় তৈয়ারি। সর্বোপরি, উহা যে পুনরায় গড়াইয়া দেওয়া আমার ন্যায় চাকুরিজীবীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা মালতী ও আমি উভয়েই সবিশেষ জানি।

প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, কন্যাকে ঘুম পাড়াইয়া সে যখন নিত্যকার অভ্যাসমতো শয়নের আগে কানের দুলজোড়া খুলিয়া আলমারিতে রাখিতে যায়, তখনই সবিস্ময়ে লক্ষ করে যে, সীতাহারটি যেন কোন জাদুমন্ত্রবলে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ের কারণ, আলমারি সর্বদাই চাবিবন্ধ থাকে, এবং খুলিবার সময় মালতীকেও চাবি ব্যবহার করিতে হইয়াছে। বন্ধ আলমারি হইতে হার চুরি! এ

ঘটনা যেমন অভিনব, তেমনই আশঙ্কাজনক। আলমারিতে টাকাপয়সাও ছিল, কিন্তু তাহাতে হাত পড়ে নাই।

আমাদের দুজনের নিম্নই আলোচনা যখন অপর সকলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার মতো যথেষ্ট হইয়াছে, এবং আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সর্বশেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি, তখন চন্দ্রমোহন প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে, দাদা?

আমি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। এই ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বর ও বরযাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া লাভ কী? কিন্তু সীতাহার-শোকে বিহ্বলা মালতী নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। প্রায় কঁদো কঁদো হইয়া কহিল, দ্যাখো না ভাই, আলমারি থেকে আমার বিয়েতে পাওয়া সাড়ে নভরির সীতাহারটা চুরি গেছে। অথচ আলমারিটা তালাবন্ধ ছিল। তা ছাড়া, ঘণ্টাখানেক আগেও হারটা আমি দেখেছি।

ঘরে যেন বজ্রপাত হইল। সকলের মনোযোগ মুহূর্তে আকৃষ্ট হইল মালতীর দিকে। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোছায়ায় সকলেরই মুখমণ্ডলে ত্রাস ও বিস্ময়ের লুকোচুরি খেলা।

চন্দ্রমোহন হঠাৎই অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিল, বিশ্বনাথদা–।

বিশ্বনাথবাবু মুখ তুলিলেন। তাহার বিষণ্ণ মুখমণ্ডলে জটিল চিন্তার অসংখ্য রেখা। যেন ম্লান হ্রদের জলে মাছ-ধরা জাল বিছানো রহিয়াছে। তিনি চন্দ্রমোহনের সম্বোধনের কোনও জবাব দিলেন না। বরং পালটা প্রশ্ন করিলেন, আমি কি এই ঘর ছেড়ে এর মধ্যে বেরিয়েছিলাম?

একটু আগে বাথরুমে গেলে না?

ও..হ্যাঁ…। বিশ্বনাথবাবু স্বস্তির সুরে কহিলেন, ঠিকই বলেছিস, চাঁদু, আমার খেয়াল ছিল ।

কথা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমাদের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। চন্দ্রমোহন ও বিশ্বনাথবাবুর কথোপকথন কেমন অদ্ভুত হেঁয়ালি মিশ্রিত, রহস্যময়।

রহস্যের গভীরতা দ্বিগুণ করিয়া বিশ্বনাথবাবু আমার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। হয়তো হারটা খুঁজে বের করে দিতে পারব।

মালতীকে লইয়া ঘর ছাড়িবার পূর্বে বিশ্বনাথবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন, এখানে কাছাকাছি কোথাও পুকুর আছে?

আমি বললাম, বাড়ির ঠিক পেছনেই একটা ছোট ডোবা আছে।

যাক, তা হলে বেশি দূর যেতে হবে না। এই কথা বলিয়া বিশ্বনাথবাবু আমার স্ত্রী-কে একটি টর্চ বা লণ্ঠন আনিতে অনুরোধ করিলেন।

মালতী টর্চ লইয়া আসিলে অপর একজন মহিলা সঙ্গীসহ তাহারা দুইজন সীতাহার অনুসন্ধানের কাজে নিষ্ক্রান্ত হইল।

আমি যৎপরোনাস্তি হতভম্ব হইয়া চন্দ্রমোহনের নিকটে আসিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলাম। লক্ষ করিলাম, চন্দ্রমোহনের মুখভাবে অপরাধবোধের ছায়া। সে মাথা নীচু করিয়া নীরবে হাতের নখ খুঁটিতেছে। তাহার বন্ধুরা অপ্রস্তুত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। মাধবীকে ঘিরিয়া যে-মধুমক্ষিকার গুঞ্জন শুরু হইয়াছিল, তাহাও এখন স্তব্ধ। সীতাহার-দুর্ঘটনা কম-বেশি সকলকেই আঘাত করিয়াছে।

মিনিট কুড়ি পরে বিশ্বনাথবাবু ফিরিলেন। সঙ্গে মালতী। তাহাকে দেখিয়াই বুঝা যায় অভিযান সফল হইয়াছে। বিশ্বনাথবাবুকে লক্ষ করিয়া সে কহিল, আপনি হাত-পা ধুয়ে নিন। বাথরুমের দেওয়ালের দড়িতে গামছা টাঙানো আছে।

বিশ্বনাথবাবু দরজার নিকট হইতে চন্দ্রমোহনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হারটা পাওয়া গেছে, চাঁদু। পুকুরপাড়েই ছিল। আমি হাত-পা ধুয়ে আসছি। তিনি বাথরুম অভিমুখে রওনা হইলেন।

আমি উঠিয়া মালতীর নিকটে আসিলাম। সে অস্ফুট কণ্ঠে যাহা বিবৃত করিল তাহার সারমর্ম এই : টর্চ হাতে করিয়া বিশ্বনাথবাবুই পুকুরপাড়ের সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন। মালতী অত্যন্ত সাহসী। সুতরাং এক মুহূর্তের জন্যও সে ভয় পায় নাই। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর একস্থানের মাটি যথেষ্ট আলগা বলিয়া মনে হওয়ায় মালতীর হাতে টর্চ দিয়া বিশ্বনাথবাবু স্বয়ং মাটি খুঁড়িতে শুরু করেন। আপনমনে শুধু একবার উচ্চারণ করেন, জানতাম, এখানেই এনে লুকোবে।

অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই সীতাহার স্বমহিমায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহারা ফিরিয়া আসে।

এমন সময়, যাঁহাকে লইয়া আলোচনা, তিনি উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথবাবুকে দেখিয়া সকলের কৌতূহল সীমা ছাড়াইবার উপক্রম করিল। মালতী চলিয়া যাইতেছিল, বিশ্বনাথবাবু তাহাকে ডাকিলেন, গম্ভীর স্বরে কহিলেন, মালতীদেবী, যাবেন না। আসুন, এ-ঘরে বসুনকথা আছে।

তাহার স্বরে এমন কোনও প্রচ্ছন্ন জাদু ছিল, যাহাতে মালতী নীরবে সেই আদেশ পালন করিল। আমিও ঘরে আসিয়া বসিলাম। বিশ্বনাথবাবু আমার নিকটে বসিলেন। দেখিলাম, তাহার ধবধবে ধুতির শরীরে কাদার ইতস্তত কলঙ্ক লাগিয়াছে। কাশ্মীরি শালটিও পুরাপুরি রক্ষা পায় নাই। যে নীরব প্রশ্ন ও কৌতূহল আমি এ পর্যন্ত সকলের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, সম্ভবত তাহা বিশ্বনাথবাবুর নজরে পড়িল। তিনি উপস্থিত সকলের মুখের উপর পর্যায়ক্রমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎই মালতীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, মালতীদেবী, হারটা যে আপনি পেয়েছেন, সবাইকে দেখান।

বিস্মিত মালতী শাড়ির আঁচল খুলিয়া হারটি বাহির করিল এবং ঘরে উপস্থিত সকলের নিকট দৃশ্যমান হয় এমনভাবে উহা তুলিয়া ধরিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ্যাঁজাকের ছায়া-পরিম্লান আলোয় বিদ্ধ হইয়া সীতাহারটি ঝকমক করিয়া উঠিল।

মালতী হারটি পুনরায় যথাস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে বিশ্বনাথবাবু কহিলেন, সমীরবাবু, একমাত্র চঁদুর সম্মান রক্ষার জন্যেই মালতীদেবীকে সীতাহারটা সকলকে দেখাতে অনুরোধ করলাম। তা ছাড়া, এই হার চুরিতে, আর বিশেষ করে তার উদ্ধারে, আপনারা সবাই যে ভীষণ অবাক হয়েছেন, তা বেশ বুঝতে পারছি। বিশ্বনাথবাবু একটু থামিলেন। চন্দ্রমোহনকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার মুখমণ্ডলে এখন সামান্য স্বস্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে। সে নতুন বর, ফলে তাহার সঙ্কট ও লজ্জা সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন সেই সঙ্কট ও লজ্জার মেঘ অদৃশ্য হইয়া চতুর্দশীর চাঁদ স্বস্তির ইঙ্গিত বহন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বনাথবাবু আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, এই চুরি ও তার বিচিত্র আবিষ্কারের পেছনে আরও বিচিত্র এক কাহিনি আছে। কখনও সে কাহিনি কাউকে বলিনি। কিন্তু আজ বলব। কারণ, এর আগে কখনও আজকের মতো এমন অসম্মানজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। আপনারা বরপক্ষের লোকদের চোর ভেবে বসে থাকবেন, এটা চাদুর পক্ষে খুব একটা সম্মানের নয়।

আমি তাহার কথার প্রতিবাদে সৌজন্যমূলক কিছু একটা বলিতে মুখ খুলিতেই বিশ্বনাথবাবু বাধা দিলেন, বিব্রত হওয়ার কিছু নেই, সমীরবাবু। যা সত্যি, তাই বলছি। একটু আগেই চাঁদু বলছিল, আমি নাকি এক মহাপুরুষ– বিশ্বনাথবাবু হাসিলেন, পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তা মহাপুরুষ আমি না হতে পারি, কিন্তু ভারতবর্ষের আনাচেকানাচে ঘুরে বহু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি।

বর্তমানে আমি লোহার ব্যাবসা করলেও বছর কয়েক আগে পর্যন্ত কাঠ নিয়েই ছিল আমার কারবার। তখন আমি চাকরি করতাম–আধা-সরকারি চাকরি বলতে পারেন। সরকারের ইজারা নেওয়া বিভিন্ন জঙ্গলে যখন গাছ কাটা হত, তখন আমি তদারকিতে থাকতাম। আর এই কাজেই আমাকে দেশের আনাচেকানাচে গিয়ে ডেরা বাঁধতে হয়েছে।

বছর তিনেক আগে ঝাড়গ্রামে আমাকে যেতে হয় অফিসের কাজে। সেখানে তখন শালগাছ কাটার মরশুম চলছে। ফলে অফিসের কাজ শেষ হতেই আমার কাঁধে তুলে দেওয়া হল পুরোনো দায়িত্ব। অর্থাৎ, জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটার সময় তদারকির কাজ করতে হবে। কর্তার ইচ্ছা, অতএব কর্ম না করে উপায় নেই। উপস্থিত হলাম গিয়ে জঙ্গলের তাঁবুতে। যে-অফিসারটি সরেজমিনে ছিলেন, আমাকে দেখেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সব দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে দিয়ে সোজা রওনা হলেন দেশে। কালই নাকি চিঠি এসেছে, তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। ফলে আমি পড়লাম ফ্যাসাদে। তখনও বুঝিনি, কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে।

তাঁবুতে ক্যাম্বিসের খাট, বিছানা, ছোট টেবিল, হ্যারিকেন, পথ-ভুলে-চলে-আসা শেয়াল বা হায়েনার জন্যে শক্তপোক্ত লাঠি–সবকিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম। আমি বাউণ্ডুলে ব্যাচিলার মানুষ–কোনও অবস্থাকেই আর ভয় পাই না। সুতরাং তাঁবু আমার কাছে রাজবাড়ি বলে মনে হল। দেখলাম, ঝাড়গ্রামের প্রচণ্ড মশাকে প্রতিরোধ করার জন্যে একটা মশারির ব্যবস্থাও রয়েছে। আর কী চাই!

বিশ্বনাথবাবু এক মুহূর্ত থামিলেন। ঘড়ি দেখিলাম, রাত দেড়টা। চন্দ্রমোহন তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল। দেখাদেখি অবিনাশও তাহার অনুসরণ করিল। বিশ্বনাথবাবু ধূমপানের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করিয়া পুনরায় বলিতে শুরু করিলেন, যে-ছেলেটা তাঁবুতে আমার ফাইফরমাশ খাটত, সে ছিল স্থানীয় আদিবাসী। নাম ঝুমনা। বয়েস বছর ষোলো। কালো তেলতেলে রোগা চেহারা। কর্মঠ এবং চটপটে। জঙ্গলে যারা গাছ কাটে

তারাও ওই আদিবাসী দলেরই, এবং তাদেরই একজনের–পরে জেনেছি, তার নাম রমেশকীরকম যেন আত্মীয় হয় ছেলেটা। সুতরাং ঝুমনা আমার কাছে যেন দেবদূত হয়ে দেখা দিল। ওপরওয়ালার অযাচিত আশীর্বাদ।

এহেন কর্মে সুপটু ছেলেটার একটা খারাপ অভ্যেস ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে শুরু করল। আমার গলায় একটা বিছেহার সব সময় পরা থাকত–শুধু রাতে ওটা আমি খুলে রাখতাম গলায় ফুটত বলে। একদিন সকালে বিছানা ছেড়ে রোজকার অভ্যেসমতো হাত বাড়িয়েছি পাশের ছোট টেবিলটার দিকে–এবং বিছেহারটা না পেয়ে চমকে উঠেছি। চমকে ওঠার দুটো কারণ আছে : এক, হারটা সোনার। দুই, ঝাড়গ্রামের মতো এই সঙ্গীবর্জিত নির্জন গ্রামে এসে কলকাতার মতো শহুরে চোরের উৎপাত পাব, আশা করিনি। অবাক হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়টা কেটে যেতেই মনে স্বাভাবিক প্রশ্নটা জেগেছে : কে চুরি করল হারটা? ঝুমনা? বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু পরিস্থিতি নিরুপায়। সুতরাং ওকে ডেকে সরাসরি হারটার কথা জিগ্যেস করলাম, এবং ও যথারীতি উচ্চস্বরে জটিল ভাষায় জানাল, হারটার কথা ও কিছুই জানে না। আমাকে তখন চুপ করে যেতে হল। কারণ, কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই।

সেইদিনই গাছ ফেলার সময় রমেশের কানে আমি কথাটা তুললাম। ও কিন্তু আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী বিস্মিত হল না, বরং বিড়বিড় করে বলল, ও কি চুরি করছ্যা? কু-দেবতা ভর করছ্যা বটে!... এরপর ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

দ্বিতীয় চুরিটা হল দিন চারেক পরেই। এবারের শিকার পাঞ্জাবির সোনার গিলটি করা বোতাম। ঘটনা ও পরিণতি প্রথমবারের পুনরাবৃত্তি–এতটুকু তফাত নেই। কিন্তু এরপর থেকে আমি সতর্ক হলাম। ছেলেটাকে যথাসম্ভব চোখে-চোখে রাখতে শুরু করলাম। রসুল নামে যে আরদালিটি কাগজপত্র নিয়ে প্রতিদিন জঙ্গল-আপিস করত, সে একদিন আমাকে জানাল যে, আগের যে-বাবু ছিলেন, তারও নাকি একটা আংটি চুরি গিয়েছিল–কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। রসুল আরও বলল, বাবু, জেনে রাখবেন, এ ওই ঝুমনা ছোকরারই কাজ।... দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমাকে মনে-মনে রসুলের কথায় সায় দিতে হল। এমনিতে এই আদিবাসী লোকগুলো খুব সৎ, সাদামাঠা আর সরল। শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার বিষ এখনও ওদের ছোবল দিতে পারেনি। কিন্তু তারই মাঝে আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই কিশোর।

তৃতীয় চুরির সময় ঝুমনা হাতেনাতে ধরা পড়ল। আমিই ধরলাম। সকালে উঠে হাত-মুখ ধুতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়েছিলাম। ফিরে গিয়ে দেখি আচমকা আমার সামনাসামনি পড়ে গিয়ে ঝুমনা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে। যেন এক পাথরের মূর্তি। ওর একটা হাত তখনও আমার বালিশের তলায় ঢোকানো। অর্থাৎ, কীভাবে ও জানতে পেরেছে আমার হাতঘড়িটা বালিশের তলায় রেখেই আমি শুয়ে থাকি, এবং সেটা সরানোর সুযোগ পেয়ে বিন্দুমাত্রও দেরি করেনি।

আমাকে দেখেই ও সরাসরি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার পায়ে। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। চিৎকার করে বলতে লাগল, হাই বাবু, গড় করি, মোকে ছেঁড়া দে! ই কাজ আর হবেক লাই! আর হবেক লাই! বিশ্বাস কর, এ মোর দোষ লয়! কু-দেবতা আছে বটে!.. কিন্তু আমি ওকে আর ক্ষমা করতে পারি না। বিশেষ করে হাতেনাতে ধরা পড়ার পরে। তা ছাড়া ওর কু-দেবতার কথা আমার বিশ্বাস হয় না। নির্ঘাত নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই ছেলেটা ওই কু-দেবতার ধুয়ো ধরেছে। সুতরাং যা করণীয় তাই করলাম…।

বিশ্বনাথবাবু থামিলেন। লক্ষ করিলাম, ইত্যবসরে মাধবীর জনপ্রিয়তা যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহার গুণমুগ্ধ সকলেই, বয়সের সীমারেখা নির্বিচারে, বিশ্বনাথবাবু, অথবা তাঁহার কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে নববধূ মাধবীকেও বিশেষ বিচলিত বলিয়া বোধ হইল না, কারণ সেও বর্তমানে একই কাহিনি-স্রোতে অতি-মনোযোগে সন্তরণশীল।

আমি বিশ্বনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, ছেলেটাকে কী করলেন? পুলিশে দিলেন?

না, পুলিশে নয়–দিলাম ওদের সর্দারের হাতে। বিশ্বনাথবাবু উত্তর দিলেন, জঙ্গলে যেসব আদিবাসীরা গাছ কাটে, ওদের টাকাপয়সা কাজিয়া সব কিছুর সমাধান করে দেয় ওদের সর্দার বিজয় কাহার। বিজয় কাহারের বয়েস পঞ্চান্ন-ষাট হবে। মাথায় যেকটা চুল আছে সবই সাদা। পেটানেনা সমর্থ চেহারা বয়েস অনুমানে ভুল করিয়ে দিতে চায়। ঝুমনাকে নিয়ে আমি তার হাতেই তুলে দিলাম। একে-একে বললাম, হার, বোতাম ও ঘড়ি চুরির চেষ্টার কথা। বিজয় আমাকে তাঁবুতে ফিরে যেতে বলল। বলল, ছেলেটার ঘাড় থেকে ও ভূত নামিয়ে ছাড়বে। আমি তাবুতে ফিরে এলাম। মনে-মনে ঝুমনার জন্যে একটু যে কষ্ট হল না, তা নয়। কে জানে, ওরা বেচারা ছেলেটাকে কী শাস্তি দেবে!

তাঁবুতে ফিরে এসে বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করলাম। আমার অনেক সাধের ঘড়ি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবা কিনে দিয়েছিলেন। রোল্ডগোল্ডের কেস, সঙ্গে সুদৃশ্য বাদামি চামড়ার ব্যান্ড। সুইজারল্যান্ডে তৈরি বিদেশি ঘড়ি। পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর ইচ্ছে করলে ওটাতে অ্যালার্ম বাজানোর ব্যবস্থা করা যায়। এমনি দামের চেয়েও স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওটার দাম আমার কাছে অনেক বেশি। কারণ, ঘড়িটা আমাকে উপহার দেওয়ার মাস তিনেক পরেই থ্রম্বসিসে বাবা মারা যান। ঘড়ি নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে করতেই বাতাস কেটে আছড়ে পড়া চাবুকের প্রথম সপাং শব্দটা আমার কানে এল।

ঝুমনার শাস্তি শুরু হয়েছে। পরপর শোনা যাচ্ছে চাবুকের শব্দ ও পরক্ষণেই ঝুমনার কিশোর কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার। সে-চিৎকার অমানুষিক। শত হলেও বিজয় সর্দারের এই শাস্তি বরদাস্ত করা যায় না। ঘড়িটা হাতে পরে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। শব্দ ও চিৎকার লক্ষ করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম। পায়ের তলায় শুকনো শালপাতার পাঁজর ভাঙার শব্দ আমাকে এতটুকু অমনোযোগী করতে পারল না। অসংখ্য শালগাছের গোলকধাঁধা পার হয়ে অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছোলাম।

সম্প্রতি গাছ কাটার ফলে পরিষ্কার হয়েছে এমন একটা জায়গায় সব আদিবাসীরা জটলা করে দাঁড়িয়ে। ওরা পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় চাপা গলায় কীসব বলাবলি করছে। একজন আদিবাসী একটা শালগাছের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার হাতে লম্বা সরু একটা কাঁচা বাঁশের কঞ্চি। এটাকেই আমি চাবুক ভেবেছিলাম। আর সেই শালগাছের গোড়ায় গাছের গুঁড়িকে বেড় দিয়ে ঝুমনার দু-হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাছেই দাঁড়িয়ে বিজয় কাহার। সে চিৎকার করে এক-একটা সংখ্যা গুনছে আর সপাং করে কঞ্চির বাড়ি গিয়ে পড়ছে ছেলেটার হাতে–যে-হাত দিয়ে ও চুরি করেছে। ঝুমনার হাত কেটে রক্ত পড়তে শুরু করেছে। মনে হল, হাত দুটো যেন বেশ ফুলেও উঠেছে।

আমি চিৎকার করে বিজয়কে থামতে বললাম। ও চমকে ফিরে তাকাল আমার দিকে। যে আদিবাসীটি বিজয়ের নির্দেশে কঞ্চির আঘাত করছিল, সে-ও থেমে গেল। একবার আমার দিকে একবার বিজয়ের দিকে দেখতে লাগল । অর্থাৎ, সে এখন কী করবে? কার কথা শুনবে? পরক্ষণেই বিজয় ইশারায় তাকে থামতে বলল। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে যা বলল তার সরল বাংলা করলে দাঁড়ায় ও বাবু, একে আমি একশো বেত মারার শাস্তি দিয়েছিলাম, সবে আঠেরোটা হয়েছে–

তাও আস্তে-আস্তে মেরেছে। আর আপনিই এখন শাস্তি দিতে বারণ করছেন? তা হলে ছেলেটার চুরির ব্যারাম সারাব কী করে?...তবুও আমার অনুরোধে বিজয় সর্দার গজগজ করতে করতে ঝুমনাকে ছেড়ে দিল। ওর হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। রক্তাক্ত হাত নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন চলে গেল ছেলেটা।

এখানেই এ-কাহিনির শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না। কারণ সেইদিনই সন্ধ্যায় সারাদিনের কাজ শেষ করে হিসেবপত্রের পাট চুকিয়ে ক্যাম্পখাটে শরীর এলিয়ে একটা গল্পের বইয়ের পাতায় চোখ বুলোচ্ছি, তাঁবুর দরজায় একটা খসখস শব্দ পেয়ে চমকে তাকালাম। কষ্ট হলেও হ্যারিকেনের আলোয় ঠাহর করতে অসুবিধে হল না। ঝুমনা। সকালের ঘটনার পর এই ওকে প্রথম দেখলাম। ও দ্বিধাভরা কণ্ঠে জানতে চাইল, ও ভিতরে আসতে পারে কি না। তারপর অনুমতি পেয়েই ভিতরে এসে সটান আমার পা জড়িয়ে ধরল। কৃতজ্ঞতা জানাল সকালে শাস্তির হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছি বলে। আমার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে ও যা বলল, তাতে বুঝলাম, এর মধ্যেই ওর হাত দুটো ভীষণ ছটফটে অস্থির হয়ে উঠেছে। তার ওপর যদি হাত দুটোকে মারধোর করা হয়, কাটা-ছেঁড়া করা হয়, তা হলে মরিয়া হয়ে ওরা যে কী করবে বলা মুশকিল।...ওর দু-গাল বেয়ে অঝোরে নেমে এল অশ্রুর ধারা।

হাঁটুতে দু-হাত রেখে ছেলেটা বসেছিল। আমার নজর পড়ল ওর হাত দুটোর দিকে। হ্যারিকেনের আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করে দেখলাম। হাত দুটোকে দেখে কোনও বৃদ্ধের বলে মনে হয়। কুৎসিত কদাকার বড়-বড় আঙুলের গাঁট। খসখসে ভাঁজ পড়া চামড়া। নখগুলো মোটা বাঁকানো, তাতে আবার কালচে ছোপ। শিরাগুলো ফুলে উঠে পার্চমেন্ট কাগজের মতো চামড়াকে থেকে-থেকে উঁচু-নীচু করে দিয়েছে। অবশ্য সকালের শাস্তির জন্যেও শিরাগুলো ফুলে উঠতে পারে।

জলভরা চোখ নিয়ে ঝুমনা বলল, এ আমার হাত নয় বাবু। এ আমার শরীরের কেউ লয়। কিন্তু আমার আর কুননা পথও লাই। তোকে তো আগেও বলেছি, অথচ তুই বিশ্বাস করিসনি। তোকে দিব্যি করে বলেছি, এসব চুরি এই হাত দুটো নিজে নিজে করে–আমি জানতেও পারি না।

বলাবাহুল্য, ওর কথা আমার এখনও বিশ্বাস হল না। ওকে বললাম, এসব কথা আর চিন্তা না করাই ভালো। কারণ, ও চুরি করেছিল এবং তার শাস্তিও পেয়ে গেছে।

ঝুমনা ওর হাত দুটো আমার কাছে তুলে ধরল : তুই নিজের চোখেই দ্যাখ, বাবু, এ আমার হাত লয়। তবে তুকে কথা দিচ্ছি, এরা আর চুরি করবেক নাই। তোর বিছেহার, বোতাম, সব এরাই চুরি করেছে। আগের বাবুর আংটিও এরা লিয়েছে। সোনার জিনিসে এদের বেশি লোভ। তবে সোনার জিনিস না পেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই চুরি করে।

ওকে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? আর কী চুরি করেছে এরা?

ও বলল, অনেক জিনিস। প্লেট, চামচ, রুমাল, সাবান…।

ওগুলো নিয়ে কী করেছিস?

মাটিতে পুঁতে রেখেছি। বেশিরভাগ সময়েই এই হাত দুটো যা চুরি করে, নিয়ে গিয়ে কোনও পুকুরপাড়ে মাটিতে পুঁতে ফেলে। জঙ্গলের বাইরে যে-বড় দিঘিটা আছে, তারই পাড়ে সমস্ত জিনিস পোঁতা আছে। তোকে আমি জায়গাটা দেখিয়ে আনতে পারি। বিশ্বাস কর, একটা জিনিসও আমি বিক্রি করিনি। ওরা চুরি করে সব মাটিতে পুঁতে রাখে।

বলছিস তা হলে তোর কোনও দোষ নেই?

না! এ আমার হাত নয়!

তবে কার হাত?

নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়ল ঝুমনা। লজ্জায় মাথা নীচু করে অস্ফুট স্বরে বলল, আমার বাবার হাত।

কিন্তু রমেশ যে বলছিল, তোর বাবা মারা গেছে?..আমি ভীষণ অবাক হলাম।

হ্যাঁ, আমার জন্মের আগেই বাবা মারা গেছে।..ঝুমনা উত্তর দিল।

কী করে মারা গেল?

বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে সর্দারের হুকুমে।

হয়তো বিজয় কাহারের আগে যে-সর্দার ছিল তারই আদেশে। কিন্তু কেন? সে-প্রশ্ন ঝুমনাকে করতেই ও মাথা নীচু করল। আস্তে-আস্তে বলল, চুরির জন্যে, বাবু।...তারপর মুখ তুলে সরাসরি তাকাল। আমি আবার চোখ ফেরালাম ওর হাতের দিকে।

হাত দুটোর কদাকার-কুৎসিত চেহারা সত্যিই অতুলনীয় এবং ষোলো বছরের একটা ছেলের পক্ষে হাত দুটোর বয়েস অনেক বেশি। কিন্তু এগুলো যে ওর হাত নয়, ওর কথা না শুনে স্বাধীনভাবে কাজ করে বেড়ায়, একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এ-গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না। লক্ষ করে দেখি, ঝুমনা তখনও কাঁদছে।

বিশ্বনাথবাবু ঈষৎ থামিয়া ঘরের পরিবেশ নিরীক্ষণ করিলেন। ছোটরা প্রায় সকলেই তন্দ্রা অথবা নিদ্রায় আংশিক অথবা পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন। মাধবীও নিস্তার পায় নাই। কিন্তু আমি ও মালতী যতখানি সজাগ ততোধিক কৌতূহলী। চন্দ্রমোহন ও তাহার বন্ধুরা গম্ভীর হইয়া নিবিষ্ট মনে বিশ্বনাথবাবুর কাহিনি শুনিতেছে। সম্ভবত বর্তমান ঘটনার সহিত ইহার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগাযোগের সূত্রটি নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে। আমি বিশ্বনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলাম, তারপর? তারপর কী হল?

তিনি কহিলেন, ছেলেটাকে বললাম, এবার থেকে টুকিটাকি কিছু দরকার হলে যেন। আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সে বারবার করে প্রতিজ্ঞা করল, পুরোনো ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। সে একটা হেস্তনেস্ত করবেই করবে। তারপর হঠাৎ বলল, বাবু, আমাকে একটা বাক্স দিবি?

অফিসে কাঠের স্যাম্পেল পাঠানোর জন্যে মাঝারি সাইজের একরকম পিচবোর্ডের বাক্স আমরা ব্যবহার করতাম। তারই কয়েকটা তাবুর এক কোণে স্তূপাকারে পড়ে ছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়েই অনুরোধটা ঝুমনা করেছে। নির্বিবাদে একটা বাক্স ওকে দিয়ে দিলাম। তা দিয়ে ও কী করবে ও-ই জানে! বাক্সটা নিয়ে ও ছুটে বেরিয়ে গেল তাবু থেকে। মিলিয়ে গেল জঙ্গ লের গভীরে।

পরদিন খুব সকালে তাঁবুর বাইরে থেকে একটা হইচই গণ্ডগোলের শব্দ শুনতে পেলাম। বাইরে বেরিয়ে এসেই এক ভয়ংকর দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। ঝুমনা আচ্ছন্নের মতো টলছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কবজি ও কনুইয়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওর হাত দুটো কেউ কেটে নিয়েছে, আর রক্তাক্ত ভোতা

প্রান্ত দুটো কাদামাটি মাখা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে টপটপ করে তখনও ঝরে পড়ছে কাঁচা রক্ত। সে-নৃশংস দৃশ্য সহ্য করা যায় না।

সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানকার এক তরুণ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সঙ্গে-সঙ্গে ভরতি করে দেওয়া হল। রমেশ একসময় আমার পাশে এসে বলল, কু-দেবতার অভিশাপেই নাকি এমনটা হয়েছে।...ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। আদিবাসীরা রোজকার মতো জঙ্গলে কাঠ কাটতে লেগে গেল। কিন্তু ঝুমনাকে নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা দুশ্চিন্তাটা এক মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে সরাতে পারলাম না।

বিকেল হতে না হতেই হাসপাতালে রওনা হলাম ওকে দেখতে। ওর কাটা হাত দুটোয় এখন নতুন করে পরিষ্কার ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তরুণ ডাক্তারটি আমাকে আশ্বাস দিল, রক্তপাত প্রচুর হয়েছে, তবে বিশেষ ভয় নেই। ও সেরে উঠবে। আমাকে দেখেই ঝুমনা ব্যান্ডেজ করা হাত দুটো উঁচিয়ে ধরল আমার মুখের সামনে। যেন হাত দুটো কেটে ফেলায় ও ভীষণ খুশি হয়েছে এবং একই সঙ্গে স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু কে কাটল ওর হাত দুটো? কেমন করেই বা কাটল? একটু পরেই সে-প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

ওকে জিগ্যেস করলাম, এসব কেমন করে হল রে, ঝুমনা? কে এ কাজ করল?

ও জবাব দিল, এ আজ নয় কাল আমাকে করতেই হত, বাবু। তোকে কথা দিয়েছি, আর আমি চুরি করব না। সে কথা রাখতে গেলে হাত দুটো কেটে ফেলা ছাড়া আর পথ কোথায়? এ-হাত যে আমার নয়! এদের আমি বিশ্বাস করি কেমন করে?

বুঝলাম, যা হয়েছে, ওর সম্মতিতেই হয়েছে। ওকে বললাম, এ তোর ভুল ধারণা। তোর শরীরের সবই তো তোর, অন্য কারও কি হতে পারে? কিন্তু এ কাজ করল কে?

উত্তরে ও জানাল, জঙ্গলের শেষে যে বোঙার মন্দির আছে, তার গুনিন রতন মাণ্ডি এ কাজ করেছে। কারণ সে হাত দুটোকে আগে থেকেই চিনত।

কী করে চিনল?–আমি জানতে চাইলাম।

আগেও এই হাত দুটো সে দেখেছে, ঝুমনা উত্তর দিল, অনেক বছর আগে…সে আমার বাপকে চিনত…।

এরপর কথা চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কোনও ওষুধ নেই। সুতরাং ডাক্তারবাবুকে ওর দিকে নজর রাখার অনুরোধ করে আমি চলে এলাম। চলে আসার সময়েও শুনলাম ঝুমনা বলছে, আর আমার কোনও দুঃখ নেই রে, বাবু। আমার চোখে আর জল আসবে না।…কিন্তু দেখলাম, একথা বলার সময় ওর চোখ জলে ভেজা। হয়তো এর কারণ ওর শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তারবাবুর মতে ওর এখন প্রচুর বিশ্রামের প্রয়োজন। কারণ, যে-পরিমাণ রক্তক্ষরণ ওর হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। অন্তত মাসখানেক সময় তো লাগবেই।

সে-রাতে একরকম বিষণ্ণ মনেই শুতে গেলাম। মশারির ভিতরে শুয়ে উথালপাতাল দুশ্চিন্তা করতে করতে শুনতে লাগলাম বাইরের উড়ন্ত মশার মিহি গুঞ্জন। এবং একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অদ্ভুত এক খসখস শব্দে। মনে হল, তাঁবুর গায়ে বাইরে থেকে কেউ যেন আঁচড় কেটে চলেছে। আর মাঝে-মাঝে টোকা মারার ভোঁতা শব্দ। হয়তো কোনও পাচা কিংবা বাদুড় পথ ভুলে তাঁবুর গায়ে এসে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? মশারি ভেদ করে তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের খোলা আকাশ ও সেখানে মেঘের আস্তরণে ঢাকা ঘোলাটে পূর্ণিমার চাঁদ। আর তার কিছুটা নীচেই শুরু হয়েছে আঁকড়া-মাথা শালগাছগুলোর অন্ধকার ছায়াপ্রাচীর।

শত চেষ্টাতেও চোখে আর ঘুম নামল না। বেচারা ঝুমনার কথা বারেবারেই মনে পড়তে লাগল এবং চোখের সামনে থেকে-থেকেই ভেসে উঠতে লাগল ওর কাটা হাত দুটোর ভয়াবহ দৃশ্য। আর একইসঙ্গে কানে আসছে টোকা দেওয়ার হালকা শব্দ, আঁচড় কাটার শব্দ–তাঁবুর চাদরে খসখস শব্দে কেউ যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। কোনদিক থেকে যে শব্দটা আসছে, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন অনুভূতি, সব যেন মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। এ কীসের শব্দ এমন বিচিত্রভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে?

রহস্যের গভীরতা ক্রমেই যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে, তখন শব্দের ধরনটা হঠাৎই পালটাল। সবসময় হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে তাবুতে একটা বড়

অ্যালুমিনিয়ামের গামলা ছিল। বেশিরভাগ সময়েই তাতে জল ভরা থাকে। তখনও ছিল। জল ফুরিয়ে গেলে ঝুমনাই আবার জল এনে ভরতি করে রাখত। ওর বীভৎস দুর্ঘটনার পর রমেশই অনুগ্রহ করে সে কাজটুকু করে দিচ্ছিল। সুতরাং গামলার জলে ছলাৎ শব্দ শুনেই আমি চমকে উঠেছি। তার কারণ দুটো ও এক, শব্দের চরিত্র এককথায় অভিনব ও চূড়ান্ত রহস্যময়। দুই, এই প্রথম বুঝলাম, শব্দটা তাবুর বাইরে নয়, হচ্ছে তাঁবুর ভিতরে। সোজা কথায়, গামলার জলে কিছু একটা পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে গামলা বেয়ে তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে আসতে। শোনা যাচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের ওপর খরখর আঁচড়ের অতিব্যস্ত শব্দ।

বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে ঘড়িটা বের করে নিলাম। রেডিয়াম ডায়ালে চোখ রেখে দেখলাম, রাত তিনটে বাজে। সুতরাং ঘুমোনোর চেষ্টা এখন বৃথা। মশারির বাইরে বেরিয়ে নীচু হয়ে ক্যাম্পখাটের কাছে রাখা হ্যারিকেনটা তুলে নিলাম। সলতে নামিয়ে আলোটা প্রায় নিবুনিবু করা ছিল। চাবি ঘুরিয়ে সেটাকে বাড়িয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তেই হ্যারিকেন-শিখার আবছা আলোয় একটা জিনিস দেখতে পেলাম…এবং হ্যারিকেন আমার হাত থেকে খসে পড়ল মেঝেতে। ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল কাচের চিমনি। আলোয় শিখাও পলকে নিভে গেল।

আলো জ্বালিয়ে ওই অল্প সময়েই আমি দেখেছি, গামলার ভিতর থেকে পড়িমরি করে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসেছে কালো কঁকড়ার মতো অদ্ভুত দুটো প্রাণী। ছিটকে লাফিয়ে পড়েছে মেঝেতে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে রওনা হয়েছে তাঁবুর দরজা লক্ষ্য করে। প্রাণী দুটোর রং গাঢ় বাদামি, পিঠ দুটো মাকড়সার মতো উঁচু হয়ে রয়েছে, এবং তার ওপরে পার্চমেন্ট কাগজের মতো চামড়ার আস্তরণ। প্রত্যেকটা প্রাণীর পাঁচটা করে পা, এবং তাদের ছুঁচোলো ডগায় কালচে ছোপ ধরা মোটা বাঁকানো নখ। না, দেখতে আমার ভুল হয়নি। এ ঝুমনার কেটে ফেলা সেই দুটো হাত! গামলার জলে ভিজে গিয়ে সেগুলোকে কেমন অদ্ভুত চকচকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে যখন উঠে দাঁড়িয়েছি, ততক্ষণে হাত দুটো তাঁবুর বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে আমি এক ভয়ংকর অবাস্তব দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে পড়েছি। এ যে আমি বিশ্বাসও করতে পারছি না!

দ্বিতীয় একটা হ্যারিকেন তাঁবুতে ছিল। অন্ধকারে হাতড়ে সেটাকে খুঁজে বের করে জ্বেলে দিলাম। দেখলাম, আমার হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাচের চিমনির ভাঙা টুকরোগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আরও নজরে পড়ল, গামলা থেকে তাবুর দরজা পর্যন্ত একটা ভিজে দাগ। গামলার কাছে গিয়ে দেখি, সেটা জল কাদায় নোংরা ঘোলাটে হয়ে গেছে, এবং জলে তখনও ঢেউ খেলছে। যেন এইমাত্র কেউ জলে আলোড়ন তুলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যেসব আদিবাসী গাছ কাটত, তাদের কয়েকজন–জনা-চার-পাঁচ হবে কাজের শেষে আর ঝোঁপড়িতে ফিরে যেত না। আমার তাঁবুর লাগোয়া একটা তাঁবু তৈরি করে সেখানেই রান্নাবান্না করে, খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ত। হ্যারিকেনের চিমনি ভাঙার শব্দে ও আমার চলাফেরার আওয়াজে ওদের ঘুম হয়তো ভেঙে গিয়ে থাকবে। কারণ, একটু পরেই দুজন আদিবাসী আমার তাঁবুতে এসে হাজির হল। চিমনির ভাঙা কাচগুলো নজরে পড়তেই সেগুলো বঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। কিন্তু মেঝেতে ভিজে দাগের ও গামলার ঘোলাটে জলের কোনও সহজ-সরল ব্যাখ্যা ওরা দিতে পারল না। ওদের বললাম যে, প্রাণীটাকে আমি ভালো করে দেখতে পাইনি, কারণ সত্যি কথাটা আমি নিজে তখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। অন্য কেউ ওরকম গল্প আমাকে শোনালে আমি নিশ্চয়ই তার মুখের ওপর হো-হো করে হেসে উঠতাম।

তা যাই হোক, ওদের বললাম চোখ-কান খোলা রেখে সজাগ হয়ে শুতে। কারণ সেই রাতের আগন্তুক চোরও হতে পারে, কিংবা শেয়াল অথবা হায়েনাও হতে পারে।

পরদিন সকালে আবিষ্কার করলাম, আদিবাসীদের তাঁবুতে আমাদের গাছকাটার যন্ত্রপাতি যে-জায়গাটায় থাকত, সে-জায়গাটা একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। রমেশ অনেক খোঁজাখুঁজির পর বলল, দু-একটা জিনিস চুরি গেছে। অথচ আশ্চর্য, কেউ কোনও শব্দ পায়নি, এক মুহূর্তের জন্যে কারও ঘুমও ভাঙেনি। আমি ব্যাপারস্যাপার কিছুটা অনুমান করতে পারলেও চুপচাপ রইলাম।

বেলা একটু বাড়তেই হাসপাতালে ঝুমনাকে দেখতে গেলাম। ডাক্তারের কাছে শুনলাম, ওর সামান্য জ্বর হয়েছে। তা ছাড়া শরীর খুব দুর্বল। ওকে শুধু দুধ-বার্লি আর ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে দেখেই ও ব্যান্ডেজ বাঁধা দুহাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করল। ডাক্তারবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই আমি

ঝুমনাকে প্রশ্ন করলাম, তোকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করলে কি জবাব দিতে খুব কষ্ট হবে?

ও বলল, না বাবু, যা প্রাণ চায় জিগ্যেস কর। এখন আমার তো কোন দুখ লাই।

ওকে বললাম, হাত দুটো কেটে ফেলে তুই কী করেছিস?

তোর দেওয়া বাক্সটায় রতন গুনিন ওগুলো রেখেছিল।

তারপর?

তারপর বাক্সটা সমেত মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ওইটুকুই আমার জানার দরকার ছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এলাম।

সে-রাতে আর দু-চোখের পাতা এক করিনি। শেয়াল কিংবা হায়না তাড়ানোর লাঠিটা হাতের কাছে নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু কিছুই হল না। তার পরের রাত, এমনকী তৃতীয় রাতেও কিছু হল না। আমি ভাবলাম, হয়তো হ্যারিকেনের আলোতে ওই মহাচোর হাত দুটো দেখা দিতে লজ্জা পাচ্ছে। সুতরাং পরের রাতে আলো নিভিয়েই শুয়ে পড়লাম।

এক অদ্ভুত শব্দে ঘুমটা ভাঙল। আমার কানের ঠিক নীচেই আমার হাতঘড়িটার অ্যালার্ম বাজছে। বালিশ ভেদ করেও চাপা শব্দটা আমার কানে আসছে। পাথরের মূর্তির মতো নিঃসাড়ে শুয়ে রইলাম। ধীরে-ধীরে হয়তো মিনিট পনেরো কেটে গেল। কারণ, তারপরই আমার কানে এল দ্বিতীয় অ্যালার্মের শব্দ। রাত এখন কটা বাজে কে জানে! কিন্তু অ্যালার্মটা নিজে থেকে বাজছে কেমন করে? আমি তো অ্যালার্মের চাবিতে দম দিইনি!

ধীরে-ধীরে একটা হাত বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। পরমুহূর্তেই এক অমানুষিক বিকৃত চিৎকার বেরিয়ে এল আমার ঠোঁট চিরে। বালিশের তলাতেই ওরা রয়েছে। সেই হাত দুটো! আর আমার হাতঘড়িটা সেই হাতের মুঠোর মধ্যে।

ঘড়ির চামড়ার ব্যান্ডের একটা প্রান্ত সামান্য বেরিয়ে ছিল। আমি সেটা ধরেই প্রাণপণে এক হ্যাঁচকা মারলাম। কিন্তু ওই হাতের আঙুলগুলো ভীষণ শক্ত, এবং

আমার আঙুলগুলো ওরা সাঁড়াশির মতো তীব্রতায় আঁকড়ে ধরল। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম।

আমার চিৎকারে আদিবাসীদের তাবু থেকে অন্তত তিনজন ছুটে এসে হাজির হল। তাদের একজনের হাতে জ্বলন্ত হ্যারিকেন। কীসের সঙ্গে যে আমার আপ্রাণ ধস্তাধস্তি চলছে সেটা ওরা প্রথমটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না। কিন্তু আলোয় ইশারা পেয়ে হাত দুটো বোধহয় ভয় পেল এবং ঘড়িটা হঠাৎই ছেড়ে দিল। আমি চেষ্টা করেও ওদের আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলাম না। কালচে বাদামি হাত দুটো বিছানার সাদা চাদরের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎগতি কঁকড়ার মতো ছুটে গেল, মশারি ফাঁক করে ধপ শব্দে ছিটকে পড়ল মেঝেতে, তারপর ছুটে চলে গেল তাঁবুর দরজা লক্ষ করে।

ততক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে খাটের তলা থেকে লাঠিটা তুলে নিয়েছি এবং দুটো হাতের মধ্যে যেটা একটু পিছিয়ে পড়েছিল, সেটাকে লক্ষ্য করে সজোরে আঘাত করেছি। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা শূন্যে প্রায় হাতখানেক লাফিয়ে উঠল, তারপর চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। মুহূর্তের জন্যে হাতটা হতচকিত হয়ে থমকে রইল। যেন চিন্তা করল, সেই আকস্মিক আঘাতের প্রতিবাদে কী করা উচিত। তারপর হঠাৎই আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল…অনেকটা তেড়ে আসার মতো। কিন্তু কী ভেবে এক ঝটকায় দিক পালটে করে আবার ছুটে চলল দরজার দিকে। তারপর একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের জঙ্গলের আড়ালে, অন্ধকার রাতের পরদার গোপন ভঁজে।

আমি আদিবাসী তিনজনকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললাম, শিগগির বিজয় সর্দারকে খবর দাও। এক্ষুনি!

ওরা ছুটে বেরিয়ে গেল বিজয় কাহারকে খবর দিতে।

বিজয় সর্দার এসে যখন পৌঁছোল, তখন আকাশ ভোরের ইশারা নিয়ে ধূসর ইস্পাতের ছাউনির মতো হয়ে উঠেছে–শুরু হয়েছে অসংখ্য পাখির মিলিত প্রভাতী গুঞ্জন। বিজয়কে সমস্ত ঘটনা প্রথম থেকে খুলে বললাম। ও গম্ভীরভাবে সব শুনল। তারপর বলল, ঝুমনাকে নিয়ে মন্দিরে যেতে হবে। সুতরাং সবাই মিলে ছুটলাম হাসপাতালে।

তরুণ ডাক্তারটিকে অনেক অনুরোধ করার পর বিজয়ের কথায় সে নিমরাজি হল। অর্থাৎ, ঝুমনাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে আমাদের সঙ্গে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। জঙ্গলের পথ ধরে আমি, রমেশ ও বিজয় কাহার আগে আগে হেঁটে চলেছি, পেছনে আদিবাসীদের বয়ে আনা স্ট্রেচারে শুয়ে ষোলো বছরের অসুস্থ ছেলেটা। অবশ্য এখন ও আগের চেয়ে অনেকটা সেরে উঠেছে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে পৌঁছোতে জনদুয়েক আদিবাসী ছুটে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে হয়তো রতন গুনিনকে খবর দিতে। কিন্তু একটু পরেই তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। জানাল, আমরা আসছি খবর পেয়েই রতন গুনিন ভয়ে মন্দির ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে–তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা শুনে বিজয় বলল, গুনিনের দরকার নেই, ঝুমনা দেখিয়ে দিলেই হবে। তারপরই সে স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা ছেলেটার কাছে গিয়ে জানতে চাইল, হাত দুটোকে কেটে ফেলার পর রতন গুনিন সেগুলো কোন জায়গায় পুঁতেছে। উত্তরে ইশারা করে মাটিতে একটা নরম জায়গা দেখাল ঝুমনা। তখন বিজয় সবাইকে মাটি খোঁড়ার নির্দেশ দিল। প্রায় হাত আড়াই মাটি খোঁড়ার পর অতি পরিচিত পিচ-বোর্ডের বাক্সটার দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু সে বাক্স খোলা, কাদায় মাখামাখি। তার ভিতরে কোনও কাটা হাত খুঁজে পাওয়া গেল না!

হাত দুটোর সন্ধানে আমরা সকলে মিলেই খোঁজাখুজি শুরু করলাম, কিন্তু বৃথাই। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, হাত দুটো আমার পিছু ছাড়েনি। লাঠির আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ওরা তক্কেতক্কে রয়েছে।

তাঁবুতে ফিরে এসেও হাত দুটোর অদৃশ্য উপস্থিতি আমি টের পেলাম। আমার তাঁবুতে, আদিবাসীদের তাবুতে, গাছ কাটার যন্ত্রপাতির ওপরে, প্রায়ই হামলা হতে লাগল। তখন আমরা চারদিকে ইঁদুর-ধরা জাতিকল এনে পেতে রাখলাম। একদিন সকালে একটা জাতিকল বন্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। কিন্তু তার লোহার দাঁতে সামান্য একটু ছেঁড়া চামড়া ও কালচে রক্ত ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। বুঝলাম, একটা হাত ফাঁদে ধরা পড়েছিল। তখন দ্বিতীয় হাতটা এসে তাকে ফঁদ থেকে সহজেই উদ্ধার করেছে।

টোপ হিসেবে আমার হাতঘড়িটাকে বেশ কয়েকদিন খোলা জায়গায় রেখে দিলাম, কিন্তু বৃথাই। তবে যত্রতত্র হাত দুটোকে দেখা যেতে লাগল। গাছের ডালে, আমার মশারির চালে, ঘাসের ওপর, তাঁবুর গায়ে, শুকনো শাল গাছের পাতার ফাঁকে। আদিবাসীরা এত ভয় পেয়ে গেল যে, বিজয় কাহার শত বুঝিয়েও ওদের

শান্ত করতে পারল না। ওরা একে-একে কাজ ছেড়ে পালাতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে গাছ কাটার কাজ বন্ধ রেখে আমরা ক্যাম্প গুটিয়ে ফিরে এলাম। ফেরার সময় আমার প্রতিটি জিনিস বারবার করে নেড়েচেড়ে আমি দেখে নিয়েছি কোনও কিছুর ফাঁকে সেই ধূর্ত হাত দুটো লুকিয়ে আছে কি না। অবশেষে স্থানীয় অফিসে কাজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি কলকাতা রওনা হলাম।

ট্রেনে ফেরার সময় হঠাৎই আমার নজরে পড়ল, শক্তপোক্ত করে বাঁধা বেডিংয়ের ভিতরে কিছু একটা যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। কারণ বেডিংয়ের কাপড়ের একটা জায়গা অদ্ভুতভাবে কেমন উঁচু ঢিবির মতো হয়ে রয়েছে, এবং সেই ঢিবিটা যেন কষ্টেসৃষ্টে চলে বেড়াতে চেষ্টা করছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বেডিংটা খুলে ফেলেছি, কিন্তু ট্রেনের কমজোরি আলোয় ভালো করে কিছু দেখতে পাইনি। একটা অজানা আতঙ্ক আমাকে ধীরে-ধীরে ঘিরে ধরেছে। হাত দুটো কি আমাকে ছাড়বে না? ওরা কি প্রতিশোধ চায়? কিন্তু কীভাবে ওরা প্রতিশোধ নেবে? বিজয় কাহার আমাকে বলেছিল, ওই হাত শুধু চুরি করে, কাউকে খুন করার ক্ষমতা ওদের নেই। আর সেরকম ক্ষমতা থাকলে বহু আগেই আমি ওদের শিকার হতাম। সুতরাং দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় আমি যেন পাগল হয়ে উঠলাম। তারপর–

বিশ্বনাথবাবু হঠাৎই থামিলেন। চোখ হইতে চশমাটি খুলিয়া নিবিষ্ট মনে উহার কাচ দুটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা কৌতূহলে নীরব ও রুদ্ধশ্বাস। মালতী সভয়ে আমার আরও নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল। চন্দ্রমোহন ও তাহার বন্ধু অবিনাশ এতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ধূমপানে ব্যস্ত ছিল, এখন উভয়েই হস্তধৃত সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজিয়া নির্বাপিত করিল। বিশ্বনাথবাবু আমাদের দিকে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টি রাখিলেন। হ্যাঁজাকের আলো তাঁহার মুখমণ্ডলকে ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছে।

অবশেষে চশমা যথাস্থানে ফিরাইয়া তিনি কহিলেন, আজকের ঘটনার বুঝতেই পারছেন, সেই হাত এখনও আমার পেছু ছাড়েনি। সোনার জিনিসের প্রতি ওদের লোভ তো কমেইনি, বরং বেড়েছে। সেইজন্যেই আত্মীয়স্বজন কারও বাড়িতে আমি যাই না। চাকরিবাকরি ছেড়ে শুধু নিজের ব্যাবসা নিয়ে আছি। তিনি এইবার চন্দ্রমোহনের দিকে ইশারা করিয়া কহিলেন, চাদু আমার এই একাচোরা স্বভাবের কথা জানে, এমনকী চুরির ব্যাপারটাও জানে। কিন্তু কোনওদিন ওকে তার কারণ খুলে বলিনি। আজ বললাম, কারণ, এরকম অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে

আগে কখনও পড়িনি। এইজন্যেই সঁদুকে আমি বারবার বলেছি, বরযাত্রী আমি যাব না। তুই বউ নিয়ে আয়, তখন আশীর্বাদ করব, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ও বলল, তুমি চলো, আমি তোমাকে নজরে-নজরে রাখব।...আসলে চঁদুরও দোষ নেই। ও কী করে জানবে যে, যখন ওই হাত দুটো চুরি করে, তখন আমি এতটুকুও টের পাই না? কী করে জানবে, কত ভয়ংকর প্রতিশোধ ওই হাত দুটো আমার ওপরে নিয়েছে। কী করে জানবে, কত বিষাক্ত ছোবলে ওরা আমার গোটা জীবন নীল করে দিয়েছে! এই তো সেই হাত! এই তো সেই হাত! এই তো—

কাশ্মীরি আলোয়ান সরাইয়া বিশ্বনাথবাবু তাঁহার হাত দুইখানি প্রকাশিত করিলেন। গায়ের রঙের তুলনায় তাহার হাতের রং অনেক বেশি কৃষ্ণকায়। বলা যাইতে পারে, গাঢ় বাদামি। হত দুইখানির চামড়া অত্যন্ত কর্কশ। প্রতিটি শিরা-উপশিরা স্থূলভাবে প্রকট। কুৎসিত কদাকার আঙুলের গ্রন্থিগুলি অদ্ভুতরকম বেমানান। নখগুলি অত্যন্ত পুরু, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছাপে কলঙ্কিত, এবং কোনও মাংসাশী জন্তুর নখের ন্যায় বক্র।

হাত দুইখানি হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় ভয়ংকর দেখাইতেছিল। বাহিরে কোথাও হইতে কর্কশ স্বরে কোনও পাচা ডাকিয়া উঠিল। ঠান্ডা বাতাসের ঝড় উন্মুক্ত জানলা দিয়া প্রবেশ করিয়া হু হু করিয়া ঘর তোলপাড় করিল। বিশ্বনাথবাবু উন্মাদের ন্যায় হাত দুইখানি দিয়া মেঝেতে আঘাত করিতে লাগিলেন। হাত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তের ধারা বহিতে শুরু করিল। তিনি চিৎকার করিয়া কহিলেন, এ-হাত নিয়ে আমি কী করি! একে আমি না পারি রাখতে, না পারি ফেলতে! ওই ষোলো বছরের ছেলেটার মতো অত সাহস যে আমার নেই! ওঃ ভগবান, আমি এখন কী করি! আমার এ-শাস্তির কি শেষ নেই। বিশ্বনাথবাবু হাত দুইখানি ওইরূপে আঘাত করিতে করিতেই কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন। কান্নার দমকে তাহার শরীর ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মালতী অস্ফুটে এক ভয়ার্ত চিৎকার করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। চন্দ্রমোহন ও তাহার বন্ধুরা বিশ্বনাথবাবুকে সংযত করিতে মনোযোগী হইল। বিবাহোৎসবের আনন্দ মুহূর্তে মৃত্যুর বিষাদে পর্যবসিত হইয়া গেল। আমার বাকশক্তি যেন কোনও অদৃশ্য ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়া দিয়াছে...।

.

চার মাস পরে চন্দ্রমোহনের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম, বিশ্বনাথবাবু নিজ বাড়ির ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

# একতিলের জন্য

**একতিলের জন্য**

বেঁচে গেল অমৃতা।

প্রথমটা ও ঠিক বুঝতে পারেনি। ডানদিক দেখে, বাঁ-দিক দেখে, তারপর আবার বাঁ-দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য একটা পা সামনে বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি–কোথা থেকে একটা মানুষ-বোঝাই মিনিবাস ছুটে এসে হুস করে বেরিয়ে গেল ওর নাকের ডগা দিয়ে। মিনিবাসের গা ঘেঁষে ছুটে যাওয়া বাতাসের ঝাপটা ওর সোনার নাকছাবিটা ছুঁয়ে গেল। মৃত্যুভয়ে অমৃতার শরীরটা পলকে পাথর হয়ে গেল।

মিনিবাসটা ডানদিক থেকে আচমকা ছুটে এসেছিল। ট্র্যাফিক লাইট সবুজ হয়ে থাকায় ওটা আর দাঁড়ায়নি–মরণপণ ছুট লাগিয়েছে বড় রাস্তা ধরে।

সন্ধের মুখে অফিসপাড়ায় ভিড় কিছু কম ছিল না। তাই অমৃতার একতিলের জন্য বেঁচে যাওয়াটা অনেকেরই নজরে পড়েছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেশ কিছু মানুষ ছুটে এল ওর কাছে। শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি, গুঞ্জন, জ্ঞানবর্ষণ এবং কলকাতার জঘন্য যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা নিয়ে বিচিত্র সব মন্তব্যের ফুলঝুরি।

চারপাশের প্রায় কোনও কথাই অমৃতার কানে ঢুকছিল না। পাথর হয়ে ও শুধু ভাবছিল, কেমন করে বেঁচে গেলাম? মরে গেলে বেশ হত…পিছনে কাঁদার কেউ ছিল না। একা-একা অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। বসন্ত কবে থেকেই যাই-যাই করছে–তাকে সরিয়ে দিয়ে হেমন্ত উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

নাঃ, শুধু গানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা যায় না। অমৃতা এখন একজন পুরুষকে আঁকড়ে ধরতে চায়–অন্তত একটিবারের মতো।

ওর গানের প্রশংসা অনেকে করে। পুরুষরাই বেশি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গান ডিঙিয়ে ওরা আর এগোতে চায় না। অমৃতার চেহারা ওদের থামিয়ে দেয়। ওরা সৌজন্যের হাসি হেসে চলে যায়। ওদের আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ব্যবহার অমৃতাকে মনে পড়িয়ে দেয় ওকে দেখতে মোটেই ভালো নয়। ওর মুখটা অচল পয়সার মতো।

আচ্ছা, রূপই কি সব! মনটা কিছু নয়!

তিলতিল সাধনা করে গান শিখেছে অমৃতা। গানকে সুন্দর করে তুলেছে। তেমনই মনটাকেও ও সুন্দর করে তুলেছে। অথচ সেটার খবর কেউ জানতেই চাইল না!

গান গেয়ে এখন যৎসামান্য নাম-ডাক হয়েছে ওর। সকলেই এগিয়ে আসে ওই গান পর্যন্ত বাইরের কুরূপের আড়াল সরিয়ে মনের অন্দরে কেউ উঁকি দিতে চায় না।

আপনি খুব লাকি।

ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল অমৃতা। মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেল সুন্দর চেহারার এক তরুণকে। কাটা কাটা নাক, ঠোঁট, চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। ফরসা রং, একমাথা চুল, গায়ে ঢোলা জিন্স-এর শার্ট, পায়ে বাদামি কটন প্যান্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফকেস।

আর গায়ে কেমন এক হালকা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ।

এক নিশ্বাসে যুবকটিকে জরিপ করে নিল অমৃতা।

গানের ক্যাসেটে অমৃতার কোনও ছবি ছাপা হয় না। তাই ওর যারা ফ্যান তারা বেশিরভাগই ওকে চেনে না। বছরে দু-চারটে ফাংশান করে অমৃতা। তার দৌলতে কিছু লোক ওকে চেনে। এই পুরুষটি…।

আপনি যেভাবে বেঁচে গেলেন সেটাকে মিরাকল বলে। চওড়া হাসল ছেলেটি : এখন কোথাও বসে একটু রেস্ট না-নিয়ে কিছুতেই যেন বাড়ির দিকে রওনা হবেন না! এরকম বিপদ থেকে বাঁচলে পর মনটাকে সেল করার টাইম দিতে হয়।

অমৃতা ফুটপাথের ওপর সরে এসেছিল। চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল, সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত–অমৃতার দিকে নজর দেওয়ার সময় কারও নেই। তবুও অমৃতা একটু অস্বস্তি পাচ্ছিল।

আপনি গান করেন?

একটা ধাক্কা খেল অমৃতা। আবার সেই গানের প্রশংসা, ন্যাকা-ন্যাকা অভিনন্দন, তারপর পিঠ বাঁচিয়ে পিঠটান! এর চেয়ে মিনিবাসের ধাক্কা অনেক ভালো ছিল।

কী করে বুঝলেন? ভীষণ রুক্ষভাবে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল অমৃতা। তার পর আরও বিরক্ত হয়ে? আপনি জ্যোতিষী না কি?

উত্তরে মিষ্টি করে হাসল ও না, জ্যোতিষী নয়...পরপর তিনদিন ওই রেকর্ডিং স্টুডিয়োটা থেকে আপনাকে বেরোতে দেখলাম...তাই। আমি গান ভালোবাসি, তবে ভালো বুঝতে পারি না বলে সবসময় কাঁচুমাচু হয়ে থাকি। যেমন এখন।

অমৃতার হাসি পেয়ে গেল। ছেলেটিও হাসছে। ওর মুখটা মোটেই কাঁচুমাচু মনে হচ্ছে না। তবে সন্দেহ একটা তৈরি হচ্ছিল অমৃতার মনে। মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে যারা আলাপ করতে চায় এই ছেলেটি কি সেই দলের? বোধহয় না। কারণ আজ পর্যন্ত অমৃতার সঙ্গে গায়ে পড়ে কেউ আলাপ করতে চায়নি। কোনও গীতিকার, সুরকার, কিংবা ক্যাসেট কোম্পানির মালিক কখনও ওকে উলটোপালটা প্রস্তাব দেয়নি। কেউ ডিনারে নিয়ে যেতে চায়নি। কেউ সন্ধের পর ওর এক কামরার ফ্ল্যাটে আসতে চায়নি। পুরুষের হ্যাংলাপনা থেকে ও বরাবরই নিরাপদে থেকেছে–পঞ্চাশ কি ষাট পেরোনো কোনও মহিলা যেমন নিরাপদ।

আপনি কি রোজ এই স্টুডিয়োর ওপর নজর রাখেন না কি?

না। আসলে সেলসম্যানের চাকরি করি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই আমার পেশা। তারই মাঝে ফাঁক পেলে মানুষ দেখি...ওটা আমার নেশা। এই যে, আমার কার্ড...। কথা শেষ হতে-না হতেই জামার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে অমৃতার হাতে তুলে দিয়েছে ছেলেটি।

রাস্তার সোডিয়াম-আলোয় কার্ডটা পড়তে পারল অমৃতা।

সুকান্ত চক্রবর্তী। বি. এ. এল. এল. বি.। সেলস এক্সিকিউটিভ।

তার নীচে একটা সাহেবি ধরনের কোম্পানির নাম লেখা।

আপনার পারসোনালিটি আমাকে খুব স্ট্রাইক করেছে। মিনিবাসের ওরকম ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে যাওয়ার পর আপনাকে যেরকম স্টেডি দেখলাম…রিয়েলি…খুব রেয়ার কোয়ালিটি। যাদের মনের জোর খুব বেশি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভালো লাগে।

কেন?

আমার মনের জোর কম–তাই।

অমৃতা ছোট্ট করে হাসল। মনে মনে ভাবল, দেখাই যাক না, আলাপটা কতদূর গড়ায়। সুকান্তকে দেখে মনে হচ্ছে না ও সুযোগ-খোঁজা পুরুষের দলে। সেরকম হলে ও অনায়াসে কোনও সুন্দরী মেয়েকে বেছে নিত। সুন্দরী না-হোক, অন্তত অমৃতার মতো বত্রিশ-তেত্রিশের কোনও অসুন্দরী মেয়েকে বেছে নিত না।

আচ্ছা, প্রেম কি এভাবেই শুরু হয়?

ধুৎ, কীসব যা-খুশি ভাবছে অমৃতা। মনে হয়, সুকান্ত..।

আমরা কি এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলব? সুকান্ত জিগ্যেস করল, যদি আপনার অমত না-থাকে আমরা কোনও একটা দোকান-টোকানে বসতে পারি। অবশ্য আপনার তাড়া থাকলে অন্য কথা।

তাড়া? আগামী একশো বছরে অমৃতার কোনও তাড়া নেই।

সুতরাং কথা বলতে বলতে একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁয় পৌঁছে গেল ওরা।

ধোঁয়া-ওঠা ফিশ ফ্রাই সামনে রেখে মুখোমুখি বসে চলল কথার-পর কথা।

জানেন, একসময় আমার গায়ক হওয়ার শখ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না।

কেন? আপনার গলার স্বর তো বেশ…।

দোয়াত আছে, কালি নেই। স্বর আছে, সুর নেই। হাসল সুকান্ত। তারপর আলতো করে বলল, আপনার দুটোই আছে। ভগবান আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।

মাথা নাড়ল অমৃতা : দিয়েছে আবার অনেক কিছু দেয়নি। কথাটা বলতে গিয়ে অমৃতার গলা কেঁপে গেল।

সুকান্ত বুঝল। বলল, মনখারাপ করবেন না। ভগবান লোকটা কৃপণ নয়। আপনাকে যা দিয়েছে তা-ই যথেষ্ট। ভাবুন তো, যদি এই জীবনটাই আপনাকে না-দিত! তখন তো অনেক কিছুই আপনি হারাতেন। এই যে এখন এই রেস্তোরাঁয় বসে আপনার সঙ্গে গল্প করছি, সেটাও হত না। তার মানে আমিও অনেক কিছু হারাতাম।

অমৃতা সুকান্তর মুখের দিকে তাকাল। সুকান্তর কথাগুলো ওর ভালো লেগেছে বলেই তার মধ্যে তোয়াজ আছে কি না খুঁজল।

না, সেরকম কোনও ইশারা পেল না।

আপনাকে একটা মনের কথা বলি, ম্যাডাম। এই দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটা ভারি মিস্টিরিয়াস। এক ধরনের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নেয়...।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল অমৃতা। হ্যাঁ, এইরকম মানুষ ও দেখেছে।

ফিশ ফ্রাই-এর টুকরো চিবোতে চিবোতে সুকান্ত বলল, ম...ম...ম..আর-এক টাইপের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নিতে চায় না।

আপনি কোন টাইপের? অমৃতা মজা করে জিগ্যেস করল।

সেটা বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? বরং খানিকটা বন্ধুত্ব হোক, তা হলে টের পাবেন।

তারপর অমৃতার গানের কথা জানতে চাইল সুকান্ত। অমৃতা বলতে লাগল, সুকান্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনতে লাগল। সময় কাটতে লাগল একটু-একটু করে।

অনেক গল্পের পর ওরা উঠল।

সুকান্ত একরকম জোর করেই রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে দিল।

তারপর রাস্তায় পা দিয়ে বলল, আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন তো?

হ্যাঁ–।

আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছে?

কেউ না। আমি একা। একটা বড় শ্বাস ফেলল অমৃতা : শুধু-আমি, আর গান। মা-বাবা আর ছোট ভাই দেশের বাড়িতে থাকে। আমার এই গানের ব্যাপারটা ওরা খুব একটা পছন্দ করে না। আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে।

সেটা আপনাকে দেখে বোঝা যায়।

আপনার বাড়িতে কে কে আছে?

সবাই। তবে মনে-মনে আমি সবসময় একা-একা থাকি।

কেন?

দুঃখ পাওয়া আমার ছোটবেলাকার অভ্যেস। তাই সুখের হদিস পেলে খুব ভয় পাই। এই বুঝি সুখের খেলনাটা কেউ কেড়ে নিল। তাই মনে-মনে একা থাকাটাই ভালো।

আমার ব্যাপারটাও অনেকটাই তাই। মনখারাপ গলায় বলল অমৃতা।

মোটেই না। আপনার গান আছে। এখন বাড়ি গিয়ে আপনি গানের রেওয়াজ করতে বসবেন। আর আমি? হুঁ...চারপাশে আড়াল তুলে আকাশপাতাল ভাবব। তবে আজ হয়তো আপনার কথা ভাবব। কালও, পরশুও...। সেইজন্যেই আমার আজ বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।

অমৃতা সুকান্তকে দেখল। রাস্তার ঠিকরে পড়া আলোর ওর মুখে হাইলাইট তৈরি হয়েছে। সেখানে নুন-গোলমরিচের মতো দুঃখ ছিটিয়ে দিয়েছে কেউ।

জিগ্যেস করে জানল সুকান্তর বাড়ি টালিগঞ্জে। তাও ওর বাড়ি ফেরা তাড়া নেই! সেকি অমৃতার জন্য?

অসম্ভব। মনে-মনে নিজেকে এক বকুনি লাগাল অমৃতা। একটু আলাপ হতে-না-হতেই বুকের ভেতরে সারস পাখি ডানা মেলে দিয়েছে!

আপনার বাড়ি কোথায়? সুকান্ত জানতে চাইল।

কলেজ স্ট্রিটের কাছে...সূর্য সেন স্ট্রিটে...।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল। আপনার বাড়ি গেলে আপনাকে ব্রিফকেসটা খুলে দেখাতে পারতাম। রাস্তায় তো দেখানো যায় না!

কী আছে আপনার ওই ব্রিফকেসে? হেসে জিগ্যেস করল অমৃতা।

আমার সবকিছু। আমার জীবনদর্শন। মানে...ঠিক বোঝাতে পারছি না। থাকগে, পরে কখনও দেখানো যাবে।

ব্রিফকেসটা কি অজুহাত? এই ছুতোয় অমৃতার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওর সঙ্গ চাইছে সুকান্ত? না, না, প্রথম আলাপেই এতটা দুঃসাহসী কেউ হবে না। তা ছাড়া, ও যদি আজ চলে যায়, আবার কবে ওর সঙ্গে অমৃতার দেখা হবে...।

চলুন, আপনাকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত এগিয়ে দিই। নীচু গলায় সুকান্ত বলল।

ওর কি অভিমান হল? নিশ্চয়ই ও অমৃতাকে ভীতু ভাবছে।

আপনার ব্রিফকেসে কী আছে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিশোরী গলায় আবদার করল অমৃতা।

খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?

ইয়েস, খুব।

ও. কে.। তা হলে দুটো অপশান দিচ্ছি। আপনার বাড়ি যাব না। বি–আপনার বাড়ি যাব। বলুন, আপনার চয়েস কোনটা?

বি।

শিয়োর।

হ্যাঁ।

কনফিডেন্ট?

ইয়েস।

ফাইনাল জবাব? কম্পিউটার লক কর দিয়া যায়ে?

হ্যাঁ।

ও. কে. ডান। বলে হেসে অমৃতার দিকে ডানহাত বাড়াল সুকান্ত।

অমৃতাও হাত বাড়াল।

ওরা হ্যান্ডশেক করল।

ঠিক তখনই অচেনা এক উত্তেজনার তরঙ্গ অসংখ্য ডালপালা মেলে ছড়িয়ে গেল অমৃতার শরীরে। অমৃতার ভালো লাগল। এরকম নতুন ভালো-লাগা আগে কখনও ও টের পায়নি।

হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল সুকান্ত। তারপর দুজনে উঠে পড়ল তাতে। অমৃতা লক্ষ করল, সুকান্ত ভদ্রমাপের দূরত্ব রেখেই পাশে বসল।

মিনিটকুড়ির মধ্যেই অমৃতার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। অমৃতা কিছু বলে ওঠার আগেই সুকান্ত ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর ঢুকে পড়ল সদর দরজা পেরিয়ে।

বাড়িটা বেশ পুরোনো। দু-পাশে দুটো বাড়ির দেওয়ালে দেওয়াল সাঁটিয়ে তৈরি। দু-পাশের বাড়ি দুটো রং-চং করে ভোল ফেরানো হয়েছে। তাদের তুলনায় মাঝেরটা বয়েসের ভারে এতই নুয়ে পড়েছে যে, পাশের বাড়ি দুটো যেন দু-পাশ থেকে বাড়িটাকে সযত্নে সামলে রেখেছে। গান্ধীজির কথা মনে পড়ে গেল সুকান্তর–দুই সঙ্গিনীর কাঁধে ভর দিয়ে তার পথ চলা।

অমৃতার ফ্ল্যাট তিনতলায়। ফ্ল্যাট না-বলে আস্তানা বলাই ভালো। তবে ও নিজের মতো করে একটু-আধটু সাজিয়ে নিয়েছে।

ঘরে ঢুকে টিউব লাইট জ্বেলে দিল অমৃতা। ছোট্ট করে হেসে সুকান্তকে আহ্বান জানাল ও আসুন।

সুকান্ত চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিল।

অমৃতা একটু অবাক হল। সেইসঙ্গে একটু বিরক্ত। কিন্তু ধৈর্য না হারিয়ে ও শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, দরজা বন্ধ করলেন কেন?

সুকান্ত একটু বিব্রত হয়ে বলল, যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে। এসময়ে কেউ এসে পড়লে আমার ভীষণ নার্ভাস লাগবে।

কেন, নার্ভাস লাগার কী আছে! দরজাটা খুলে বরং পরদাটা টেনে দিন। বুঝতেই তো পারছেন…মি ক্লাস পাড়া…এখানে পান থেকে চুন খসলেই লোকের জিভ লকলক করে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল সুকান্ত। মিনমিন করে বলল, ঠিক আছে, খুলে দিচ্ছি। তার আগে আপনি টিভিটা চালিয়ে দিন।

এই অনুরোধটা অমৃতাকে অবাক করে দিল। কিন্তু ও কিছু বলল না। ঘরের এককোণে চোদ্দো ইঞ্চি একটা কালার টিভি দাঁড় করানো ছিল। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা অন করে দিল। তারপর ঘরের দুটো বন্ধ জানলা খোলার জন্য পা বাড়াতেই সুকান্তর গলা ওকে থামিয়ে দিল।

ওসব পরে হবে, ম্যাডাম–আগে আমার ব্রিফকেসটা দেখে নিন।

অমৃতা অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সুকান্তর দিকে। ওর আচরণে কোথায় যেন একটু সুর কেটে গেছে।

কী চায় সুকান্ত? সব পুরুষ যা চায় তাই? কিন্তু অমৃতার কাছে তোত কেউ কখনও তা চায়নি! চাইলে কী হত কে জানে! অমৃতা হয়তো খুশি হয়ে সবকিছু

উজাড় করে দিত। হয়তো দিত না। কিন্তু সুকান্তকে পছন্দ হয়েছে বলেই না ওকে ঘর পর্যন্ত নেমন্তন্ন করেছে!

অমৃতার হঠাৎই খেয়াল হল, সুকান্ত এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাই বলল, বসুন।

সুকান্ত ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা সোফায় বসল।

সামনেই খাটো টি-টেবল। তার ওপরে ব্রিফকেসটা রেখে শব্দ করে লক খুলল। তারপর ধীরে-ধীরে ঢাকনা তুলল।

অমৃতার চোখের নজর ঢাকনার দেওয়ালে আটকে গেল। ব্রিফকেসের ভেতরটা ও দেখতে পাচ্ছিল না। তবে ঢাকনার ওপর দিয়ে সুকান্তর মুখটা দেখা যাচ্ছিল।

একটু চা করি আপনার জন্যে?

ব্রিফকেসের ভেতরটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সুকান্ত। অমৃতার প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকাল। বলল, না, এখন চায়ের তেষ্টা নেই। আগে এগুলো আপনাকে দেখাই...।

অমৃতা সুকান্তর কাছে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই ফোন বেজে উঠল। তাই থমকে দাঁড়িয়ে ও টিভির পাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ফোনে কথা বলতে বলতেই অমৃতা দেখল সুকান্ত কয়েকটা কাগজ ব্রিফকেস থেকে বের করে টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখল। তারপর অমৃতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফোনে কথা বলা শেষ হতেই কাগজগুলো তুলে নিল সুকান্ত। চট করে উঠে দাঁড়াল। অমৃতার দিকে দু-পা এগিয়ে কাগজগুলো বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, বলল, এগুলো একটু পড়ে নিন...তা হলে সুবিধে হবে।

অমৃতা অবাক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে কাগজগুলো নিল।

অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং। সাদা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো। ওপরে এককোণে তারিখ লেখা। আট-দশটা কাগজ সুকান্ত ওকে পড়তে দিয়েছে।

অমৃতা কাগজগুলো পড়ছিল। সেই ফাঁকে সুকান্ত টিভির কাছে গিয়ে ভলিয়ুমটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাটিংগুলো পড়তে-পড়তে অমৃতার দম আটকে এল। কাগজ-ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

একজন খুন-পাগল মানুষের কথা লিখেছে। পরিভাষায় যাকে বলে সিরিয়াল কিলার। খবরের কাগজওয়ালারা তার নাম দিয়েছে নাইফম্যান। অজানা-অচেনা এই খুনি গত ছ-মাসে পাঁচটি মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। প্রতিটি মেয়ের শরীরে অসংখ্য ছুরির আঘাত ছিল। বিশেষ করে তাদের মুখগুলো এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, ঠিকমতো শনাক্ত করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। পাঁচটি ক্ষেত্রেই ক্ষতবিক্ষত নগ্ন মৃতদেহ পায় পুলিশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও খুনের মোটিভ বুঝতে পারেনি–খুনিকে ধরা তো দূরের কথা! এই পাঁচজন ভিকটিমের মধ্যে এমন কোনও মিল পুলিশ খুঁজে পায়নি যা থেকে বলা যায় একটি বিশেষ ধরনের মেয়েই খুনির শিকার হতে পারে। কোনও ক্ষেত্রে খুন হয়েছে নির্জন রাস্তায়। কখনও-বা খোলা মাঠে কিংবা পার্কে। আবার কখনও মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে তার ফ্ল্যাটে। অর্থাৎ, মোডাস অপারেন্ডাই-এরও কোনও সুনিশ্চিত ধারা খুঁজে বের করা যায়নি। শুধু এটুকু পুলিশ বুঝতে পেরেছে, খুনির পছন্দ ছুরি। তা-ও একরকম নয়নানা ধরনের। তিনটে খুনের বেলায় দেখা গেছে, খুনি প্রতিটি ক্ষেত্রে কম করেও চাররকমের ছুরি বা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সেই কারণেই কোনও-কোনও সাংবাদিক ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছে : খুনির বোধহয় ছুরি কাঁচির দোকান আছে।

অমৃতা কাগজে নাইফম্যান-এর কথা পড়েছিল। গত পনেরো-বিশদিনে স্মৃতি যেটুকু বা ঝাপসা হয়ে এসেছিল, খবরের কাগজের কাটিংগুলো পড়তে শুরু করামাত্র সব মনে পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেছে অমৃতার শরীরে। ওর হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। কেন যে ও অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না, সেই কথা ভেবে ও অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

এইবার সবকিছুর মানে ধীরে-ধীরে ওর কাছে স্পষ্ট হল।

কেন সুকান্ত গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছে। কেন ওর সঙ্গে বাড়ি আসতে চেয়েছে। কেন জানলা খুলতে বারণ করেছে। কেন টিভির ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিয়েছে।

অমৃতা এখন না দেখেও বুঝতে পারছে সুকান্তর ব্রিফকেসের মধ্যে কী আছে।

অমৃতার হাত থেকে কাগজগুলো খসে পড়ে গেল।

যেন তেমন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সুকান্ত সেগুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর চাপা গলায় খুকখুক করে হাসতে-হাসতে ঢাকনা খোলা ব্রিফকেসের কাছে গেল। কাগজগুলো ব্রিফকেসের পাশে রেখে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস বের করে নিল।

রবারের গ্লাভস টেনে পরতে-পরতে নির্লিপ্ত গলায় বলল, এখন আপনার আর কোনও উপায় নেই..অপেক্ষা করা ছাড়া...।

কীসের অপেক্ষা? চাপা খসখসে গলায় জিগ্যেস করল।

নিয়তির.. গ্লাভস পরা শেষ করে সুকান্ত বলল। ওর হাত দুটো এখন কী শক্তিশালী আর পুরুষালি মনে হচ্ছে।

অমৃতা চিৎকার করার জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চিৎকারটা ওর গলা দিয়ে বেরোল না। কারণ, ঠিক তক্ষুনি সুকান্ত হাতের একটানে ব্রিফকেসটা অমৃতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর অমৃতা দেখতে পেয়েছে সুকান্তর সবকিছু, সুকান্তর জীবনদর্শন।

ব্রিফকেসের ভেতরটা ঝকঝক করছে।

নানা ধরনের নানা মাপের পাঁচটা ছুরি সেখানে শুয়ে আছে। কারও ফলা সোজা, কারও ফলা বাঁকানো, আবার কারও-বা করাতের মতো খাঁজ কাটা।

সুকান্ত একটা বড় মাপের ছুরি হাতে তুলে নিল। সেটা ডাক্তারি নজরে খুঁটিয়ে পরখ করতে করতে বলল, চিৎকার করতে চাইছেন? চাইতেই পারেন। তবে ওই যে, কে যেন বলে গেছেন, চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। এখানে সেই ফাঁকটা তৈরি করবে এই ছুরিটা– আপনার গলায়...গানের গলায়। আর যদি একটুকরো চিৎকার ভুল করে গলা দিয়ে বেরিয়ে যায় তা হলেও অসুবিধে নেই। ওই টিভির শব্দ সেটাকে চাপা দেবে...।

সুকান্ত একচিলতে হাসল, তবে হাসিটা ঠোঁটেই থেকে গেল–চোখ পর্যন্ত ছড়াল না।

আ-আমি বাঁচতে চাই...। কাঁপা গলায় বলল অমৃতা।

আবার সেই চাওয়া! গ্লাভস-পরা হাতে ছুরিটা ধরে অমৃতার কাছে এগিয়ে এল সুকান্ত। চাপা গলায় প্রায় ফিশফিশ করে বলল, কাগজগুলো পড়ে তো দেখলেন, আমি কেন খুন করি কেউ জানে না। আপনাকে বলতে পারি...আপনি জানলে কোনও অসুবিধে নেই, কারণ, আপনার জানাটা আর কেউ জানতে পারবে না। আপনার চুলটা খুলে ফেলুন।

শেষ কথাটা একই ঢঙে বলে ফেলায় অমৃতা ঠিক বুঝতে পারেনি।

সুকান্ত আবার বলল, মাথার চুলটা খুলে ছড়িয়ে দিন।

ঠান্ডা গলায় কথাটা বলে বাঁ-হাতে আলতো করে অমৃতার চুলে হাত দিল সুকান্ত।

অমৃতা শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি মাথার পিছনে হাত দিয়ে শৌখিন ক্লিপটা খুলে ফেলে দিল মেঝেতে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপরে।

সুকান্ত খুব খুঁটিয়ে অমৃতাকে দেখতে লাগল। ওর চুল পরখ করতে করতে চলে এল অমৃতার পিছনে। মাথা ঝুঁকিয়ে ফুঁ দিল চুলে। কয়েকটা চুল উড়ল কি উড়ল না।

অপছন্দের ঢঙে মাথা নাড়ল সুকান্ত? উঁহু, আপনার চুল তেমন লম্বা নয়। রেশমের মতো ফিনফিনেও নয়...।

বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে অমৃতার চুলে হাত দিল। আলতো করে ওর চুলের গোছা ধরে মুখ নামিয়ে ঘ্রাণ নিল। আবার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

অমৃতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাণপণে ঠোঁট চেপে রাখা সত্ত্বেও একটা মিহি গোঙানির টুকরো কীভাবে যেন বাইরে বেরিয়ে আসছিল। বড়-বড় শূন্য চোখে

টিভির দিকে ও তাকিয়ে ছিল– কিন্তু ওর চোখ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। আর কানেও কোনও শব্দ ঢুকছিল নাসুকান্তর ঘন নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া।

অমৃতার চুলের গোছা একপাশে সরিয়ে ওর ঘাড়ের হালকা পালকের মতো চুলে ফুঁ দিল সুকান্ত।

অমৃতা শিউরে উঠল।

চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে হুট করে সামনে চলে এল সুকান্ত। সরল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, আমি কেন খুন করি জানেন? পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার জন্যে। আর সুন্দর করে তুলতে হলে অসুন্দরকে বিসর্জন দিতে হয়। যেমন, ফুলের বাগানকে সুন্দর করে তোলার জন্যে আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়...।

সুকান্ত বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল আর হাতে-ধরা ছুরিটা অমৃতার গায়ে ছোঁয়াচ্ছিল।

মাসছয়েক ধরে আমি এই সুন্দর করার কাজে নেমেছি। তাই অসুন্দরকে খতম করাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য...। হাসল সুকান্ত। তারপর ও আপনি তো জানেন, অসুন্দর থেকে অসুন্দরের জন্ম হয়। তাই মেয়েদের দিয়ে কাজ শুরু করেছি। আপনি ছনম্বর। এবার শাড়িটা খুলে ফেলুন।

আবারও বুঝতে পারেনি অমৃতা। কারণ, একটানা সুরে বেশ মোলায়েম গলায় কথাটা বলেছে সুকান্ত।

অমৃতা ইতস্তত করছে দেখে সুকান্ত ছোট্ট করে হাসল, বলল, যে-কাজ নিজে পারেন সেটা আমাকে দিয়ে করাবেন না...করালে আপনার ভালো লাগবে না। শাড়িটা খুলে ফেলুন।

এইমুহূর্তে কেউ কি এসে অমৃতার ঘরে কড়া নাড়বে না? এমন কিছু কি একটা হতে পারে না যাতে সুকান্ত অমৃতাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়? একটা লাইফলাইনও কি অমৃতার কপালে নেই?

শাড়ি খুলতে শুরু করল অমৃতা। ওর মনে লজ্জা যেটুকু-বা তৈরি হচ্ছিল তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল একরাশ ভয়। সুকান্তর হাতের ছুরিটা কখন ওর গায়ে বসবে? কখন?

সুকান্ত একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। অমৃতার শাড়ি খোলা দেখতে লাগল।

কোনও পুরুষের সামনে ও পোশাক ছাড়বে এমন গোপন ইচ্ছে অমৃতার ছিল। কিন্তু সেটা যে এইরকম একটা অবস্থায়, তা ও কল্পনা করেনি। ওর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল অনেক আগেই। এখন কয়েকটা ফোঁটা একজোট হয়ে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নেমে এল। তারপর ঠোঁটের কোণ ছুঁতেই নোনা স্বাদ টের পেল।

কাগজওয়ালারা আমার নাম দিয়েছে নাইফম্যান। হাসল সুকান্ত। আপনমনে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, আসলে আমি কী জানেন? লাইফম্যান। কুৎসিত জীবন থেকে মুক্তি দিই সুন্দর জীবনে। কারণ, মৃত্যু না-হলে তো পুনর্জন্মের কোনও চান্স নেই! আগে যে-পাঁচটা কুৎসিত মেয়েকে আমি মুক্তি দিয়েছি তার বিনিময়ে আমি কিন্তু কিছু নিইনি। আপনাকে তো আগেই বলেছি, কিছু দিলে তার বদলে কিছু-না-কিছু নেওয়া অনেকের অভ্যেস। আমি সেরকম শাইলক নই। আমি যা দিই এমনি দিই। ফ্রি।

দুঃখ দিলে সেটাকে কি দেওয়া বলে? মৃত্যু দিলে সেটাও কি দেওয়া?

অমৃতার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ও যন্ত্রের মতো শাড়ি খোলা শেষ করে ফেলেছিল। শাড়িটা পায়ের কাছে জড়ো হয়ে পড়েছিল। সুকান্ত পা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল একপাশে।

সত্যি কথা বলুন তো, ম্যাডাম, এইরকম একটা বিচ্ছিরি রূপ নিয়ে আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করে?

অমৃতা বোবা চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে চাইল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ বাঁচতে ইচ্ছে করে...।

কিন্তু সুকান্ত যেন সেটা বুঝতেই পারল না। আপনমনেই বলে চলল, আমি জানি, করে না। আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস, পরের জন্মে আপনি অবশ্যই সুন্দরী হয়ে জন্মাবেন। সেই জীবনটা আপনার এই হতচ্ছাড়া জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগবে। কী এক্সাইটিং, তাই না? এবার ব্লাউজটা খুলে ফেলুন।

কেন জানি না, অমৃতা এই নির্দেশটাই আশা করছিল।

টিভির দিকে তাকাল ও। একটা ভয়ের সিরিয়াল আছে আগামীকাল রাত নটায়–তারই বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর মনে হল আগামীকাল নয়, এখনই সিরিয়ালটা এই ঘরে শুরু হয়ে গেছে। আর টিভির ভেতরের মানুষগুলো অবাক হয়ে দম বন্ধ করে এই সিরিয়াল দেখছে।

অমৃতা আগে কখনও ভাবেনি ব্যাপারটা এরকম উলটে যেতে পারে।

একা-একটা আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে কতবার নিজেকে দেখেছে। মুখ থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত এককণা সৌন্দর্য খুঁজেছে। না, নেই। কোথাও রূপের ছিটেফোঁটামাত্র নেই। আপাদমস্তক কুরূপা কোনও তরুণীকে অনায়াসে বৃদ্ধা বলা যেতে পারে। এরকম কোনও মেয়ের যৌবনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতার কতবার যে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে!

অথচ এখন! মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকার চেয়ে সুন্দর কিছু আর নেই।

তাই, বেঁচে থাকার জন্য, ব্লাউজটা খুলে ফেলল অমৃতা।

তারপর, সুকান্তর জরিপ-নজরের সামনে, খুলে ফেলতে হল ভেতরের জামাটাও।

কারণ, নির্দেশ সেরকমই আসছিল।

সুকান্ত এবার এগিয়ে এল অমৃতার খুব কাছে। যেমন করে বসন্তের টিকে দেয়, অনেকটা সেইরকম ঢঙে ছুরির ডগা দিয়ে আঁচড় কাটল অমৃতার বুকের মাঝে।

ডুকরে কেঁদে উঠল অমৃতা। কেঁপে উঠল। সরু রক্তের রেখা মাধ্যাকর্ষণের টানে গড়িয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। জ্বালা হয়তো করছিল, কিন্তু সেটা অনুভব করার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

না, আপনার চামড়া তেমন মোটা নয়। ছুরির ডগাটা পরীক্ষা করতে করতে অনেকটা ডাক্তারি সুরে মন্তব্য করল সুকান্ত, অনেকের চামড়া অস্বাভাবিক মোটা থাকে। জোরে চাপ দিয়ে ছুরি বসাতে হয়। সবসময় আমি আগে একটু টেস্ট করে নিই–টি ই এস টি টেস্ট, টি এ এস টি ই নয়। আমি দুশ্চরিত্র নই।

কথা বলতে-বলতে ব্রিফকেসের কাছে গেল সুকান্ত, আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। এটা সৌন্দর্যের স্বাধীনতা-যুদ্ধ... ব্রিফকেসের ওপরে ঝুঁকে পড়ল ও ..পরের জন্মের কথা ভাবুন–ভালো লাগবে। উ উ.এইটা নিই...শুরুর কাজটা দারুণ হবে... ব্রিফকেস থেকে বাঁকানো ফলার একটা ছুরি তুলে নিল ও .এবার শায়াটা ছেড়ে ফেলুন। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই...।

অমৃতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সুকান্ত। দু-হাতে দুটো ছুরি। চোখে বরফের দৃষ্টি।

তড়িঘড়ি শায়ার দড়ি খুলে ফেলল অমৃতা। আঙুলগুলো অসম্ভব কাঁপছিল বলে দড়ি খুলতে দেরি হয়ে গেল।

শায়াটা খসে পড়ল পায়ের কাছে।

অমৃতা সুন্দরী হলে বলা যেতে পারত গুটিপোকার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল প্রজাপতি। কিন্তু সুকান্তর মনে হল, প্রজাপতি নয়–শুয়োপোকা।

ও চটপটে পায়ে চলে এল অমৃতার কাছে। হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কাস্তে দিয়ে আগাছা কাটার মতো শায়াটার একটা অংশ এক হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বাঁকানো ছুরি দিয়ে একপোচে কেটে দিল। শায়ার বৃত্ত ছিন্ন হল। ওটা একটানে দূরে ফেলে দিল সুকান্ত। তারপর অ্যাটলাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল অমৃতার পায়ের কাছে।

অমৃতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছিল বারবার। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে মনের অবস্থাটা কীরকম হয় সেটা ও বেশ বুঝতে পারছিল। না, আর কোনও আশা নেই। অমৃতা খবরের কাগজের খবর হতে চলেছে আগামীকাল। নাইফম্যানের ছনম্বর শিকার। কোনও অলৌকিক ঘটনা ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।

সুকান্ত পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওড়াচ্ছিল। হঠাৎই বলল, আপনি ইচ্ছে হলে চোখ বুজে ফেলতে পারেন। তা হলে শক্টা কম হবে...।

অমৃতা চোখ বুজে ফেলল। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। ও শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ভালোবাসার কাঙাল হয়ে কী ভুলটাই না ও করেছে!

সুকান্ত মাথা সোজা করে তাকাল। অমৃতার দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছনের দেওয়ালটা ওর নজরে পড়ছে। ওর চোয়াল শক্ত হল। চোখে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল।

ঠিক তখনই তিলটা ওর চোখে পড়ল।

সুকান্ত পাথর হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল তিলটার দিকে।

অমৃতার ডান উরুর ওপরের দিকে একটু ভিতর ঘেঁষে একটা কালো তিল। মাপে মসুরডালের মতো। কাজলের মতো কুচকুচে কালো। অমৃতার ময়লা রঙের ওপরেও তিলটা জ্বলজ্বল করছে।

কী সুন্দর! অপূর্ব!

সুকান্তর হাত থেকে ছুরি খসে পড়ল। অতি সাবধানে আঙুল বাড়িয়ে তিলটাকে ছুঁয়ে দেখল ও।

আসল।

পোশাকের আড়ালে কেউ কখনও নকল বিউটিস্পট তৈরি করে না।

সুকান্তর শরীরে কাঁটা দিল। আসল সৌন্দর্যকে ছোঁয়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

এবারে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল ও।

আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল অমৃতার তিলে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, এ-কী সুধারস আনে / আজি মম মন প্রাণে...।

অমৃতা থরথর করে কাঁপছিল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের দেওয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডারের দিকে।

ক্যালেন্ডার আড়াল করে ওর দৃষ্টিপথে এসে হাজির হল সুকান্তর মুখ! কারণ, ও উঠে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত এক হাসি ওর মুখে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

আপনার সৌন্দর্যের কোনও জবাব নেই, ম্যাডাম। প্রিয়ার তিলের জন্যে কবি সমরখন্দ বোখারা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর আমি আপনার প্রাণ দিতে পারব না! তা ছাড়া আপনি তো জানেন, কিছু দিলে তার বদলে আমি কিছু নিই না। আমি শাইলক নই…।

এরপর ছুরি-টুরি সব চটপট নিজের ব্রিফকেসে গুছিয়ে নিল সুকান্ত। হাসিমুখে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। শেষবারের মতো ফিরে তাকাল অমৃতার দিকে। বলল, এবার ভেবে দেখুন, আমি নাইফম্যান, না লাইফম্যান…।

তার পর খিল-ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আবার টেনে দিয়ে গেল।

একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা। ওর মধ্যে তা হলে সৌন্দর্য আছে!

না, এই নাইফম্যানের কথা ও কাউকে বলবে না, ওর গোপন সৌন্দর্য আবিষ্কারের কথা গোপনই থাক।

সত্যি, জীবন কী আশ্চর্য! একতিলের জন্য ও আবার বেঁচে গেল।

# আপনার নির্বাচন

**আপনার নির্বাচন**

আপনাকে আমি একটু সমস্যায় ফেলতে চাই। খুব বড় মাপের কিছু না হলেও এটাকে মোটামুটি মাঝারি মাপের সমস্যা বলা যায়। আসলে আমাদের গোটা ব্যাপারটাই মাঝারি। যেমন, আপনার বয়েস মাঝারি, বুদ্ধিবৃত্তি মাঝারি, যদি বউ থাকে তো বউয়ের সৌন্দর্য মাঝারি, এমনকী উচ্চতা–তাও মাঝারি।

এই মাঝারি মাপের সমস্যাটা হল নির্বাচন ও আপনার পছন্দ করার ক্ষমতা। উঁহু, ভুল হল। বরং বলা উচিত একই ধরনের কয়েকটা জিনিসের মাঝ থেকে নিজের পছন্দটি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা।

যেমন ধরা যাক, তিন-তিনটে মেয়েকে আপনি ভালোবাসেন। অথবা ভালোবাসেন বলে নিজে মনে করেন। মেয়ে তিনটির নাম ধরা যাক, রূপবতী, ধনবতী ও কলাবতী। রূপ, ধন ও কলা সংক্রান্ত গুণাবলি ওদের সকলেরই প্রায় সমান-সমান। আপনি ওদের তিনজনকেই চেনেন, জানেন, পছন্দও করেন। এমন অবস্থায় হঠাৎই একদিন আপনাকে বলা হল, তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে আপনার বেছে নিতে হবে। তখন আপনার অবস্থাটা কী হবে একবার ভাবুন তো!

আমি জানি, আপনি তিন-তিনটি রাত জেগে কাটাবেন। দাঁত দিয়ে নখ কাটবেন। কিংবা মাথার মাঝারি-সংখ্যক চুলের বেশ কিছু উপড়ে নেবেন। অথচ এতসবের পরেও আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে বলতে পারবেন না কোনটি আপনার পছন্দ।

রূপবতী, ধনবতী, কলাবতী–এই তিন নারীর গোলকধাঁধায় আপনি ঘুরপাক খাবেন। অবশেষে মরিয়া হয়ে যদি বা কিছু নির্বাচন করেন, তাহলে সন্দেহ নেই,

কয়েক দিন, কিংবা মাস, কিংবা বছরের পর আপনি সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে যাবেন যে, আপনার নির্বাচনে গলদ ছিল।

এবারে আপনাকে দ্বিতীয় উদাহরণের কথা বলি।

ধরা যাক, আপনাকে বলা হল একজন মানুষ নির্বাচন করতে যার মতো হতে পারলে আপনার আর কোনও দুঃখ, আপোেশ বা ক্ষোভ থাকে না। আপনি একবার ভাবেন নেতাজি হবেন, পরক্ষণেই হতে চান মোহনদাস। তার পর ইচ্ছে হয় রাজেশ খান্না কিংবা অমিতাভ হতে। তারও পরে হাজি মস্তান বা বিবেকানন্দ হতে মন চায়।

এইভাবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কোনও পছন্দেই আপনার আশ মেটে না, খুঁতখুঁতুনি যায় না। সুতরাং, আপনি শ্রীনিবারণ গলুই বা যা-হোক কিছু, পরিণামে নিবারণ গলুই থেকে গিয়েই ক্ষান্ত হন।

এরপর মনে করা যাক, আপনাকে বলা হল একজন মানুষের নাম করতে–যে মরে গেলে আপনার বাধা-বিপত্তি-অসুবিধে দূর হয়। সোজা কথায় আপনার আশ মেটে। ব্যস, এ-অনুরোধ করামাত্রই আপনি একটি তালিকা তৈরি করে ফেলতে চেষ্টা করবেন–যে-তালিকায় আপনার আত্মীয় পরিজন-বন্ধুবান্ধব অথবা শত্রুদের শুভনাম লিপিবদ্ধ করা আছে।

এরপর আসবে বাছাইয়ের পালা। কারণ, মাত্র একজনকে নিশ্চিন্তে নিকেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে আপনাকে। অতএব আপনার মনে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে যাবে। নানান চরিত্রের নানান খুঁটিনাটি ঘটনা টেকনিকালার ছবির মতো সরে-সরে যাবে আপনার মাঝারি-নজরী চোখের সামনে। অনেক তোলপাড় হবে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হবে এবং এরকমটা চলতেই থাকবে। কোনও সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছোতে পারবেন না।

না, আপনাকে আমি বেহদ্দ শিরদাঁড়াহীন মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছি না। আসলে এই সমস্যাগুলো আমার নিজের। কোনওরকম সমাধানে পৌঁছোতে না পেরে আপনার মনে শরণার্থী হয়ে ঢুকে পড়তে চাইছিযদি আপনার কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য কিংবা পরামর্শ পাওয়া যায়।

যেমন ধরুন, নির্বাচন-সংক্রান্ত আরও একটা সমস্যা হল জননেতা নির্বাচন। কাকে ভোট দেবেন আপনি? অনেকগুলো নাম-ধাম-চরিত্র আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই ভালো-মন্দয় মেশানো মানুষ। আপনি, শ্রীনিবারণ গলুই, আবার সংকটে পড়ে যান। বন্ধুবান্ধব, এমনকী সহধর্মিণীর পরামর্শও হয়তো চেয়ে বসেন এ-বিষয়ে। না, প্রকৃত কোনও সাহায্য তারা আপনাকে করতে পারবে না–যেমন আমার বেলাতেও পারেনি। শেষমেশ মরিয়া হয়ে যা-হোক কাউকে ভোট দিয়ে ফেলেন আপনি–সুনির্বাচিত প্রতীক চিহ্নে সিলমোহর দেগে দেন পরম প্রত্যয়ে। এবং তার পরমুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায় বিবেক-দংশন। সিদ্ধান্তের ছোট-বড় গলদ খুঁজে পান আপনি। নিজেকে ধিক্কার দেন নির্বাচনে ভুলভাল করে ফেলার জন্য। তখন নিজেকে বোকা-টোকা ইত্যাদি বলে মনে হতে থাকে।

যেসব উদাহরণগুলোর কথা আপনাকে বিরক্তিকরভাবে শোনালাম, এসব ঘটনাগুলোই আমার জীবনে বাস্তবে ঘটে গেছে। এবং যথারীতি সব নির্বাচনেই আমি বিলকুল গরমিল করে বসে আছি। আসলে এই সমস্যাগুলো আমার-আপনার সবার। সোজা কথায়, তামাম মাঝারি মানুষের এক মৌলিক সমস্যা।

যাক, এখন আর-একটু সংকটময় বিপজ্জনক নির্বাচনে আসা যাক। কখনও কি ভেবে দেখেছেন, আপনার মতে সবচেয়ে ব্যর্থ এবং অপদার্থ মানুষটি কে? লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে আপনাকে বলা হল সবচেয়ে ব্যর্থ অপদার্থ মানুষটি নির্বাচন করতে। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে আপনার ধন্দময় অনুসন্ধান। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তামাম তালাশি নেওয়ার পর আপনি শুন্য নজরে চেয়ে থাকেন। আমি জানি, কেন। কারণ, সেই বিশেষ মানুষটিকে খুঁজে পাননি আপনি। না, খুঁজে পাননি বললে ভুল বলা হয়, বরং বলা উচিত খুঁজে পেয়েও নির্বাচনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তার নামটি উচ্চারণ করতে আপনার লজ্জা এবং সংকোচ হচ্ছে।

হ্যাঁ, এরকম লজ্জা-সংকোচ আমারও হয়েছিল। কারণ, নিজের নাম উচ্চারণ করতে আমরা, মাঝারি মানুষরা, সবসময়েই লজ্জা পাই। বলুন তো, সত্যি কোনও সন্দেহ কি আছে যে, আপনার বিচারে সবচেয়ে ব্যর্থ এবং অপদার্থ মানুষটি আপনি নিজে? যেমন, আমার বিচারে আমি!

এই নির্বাচনের ফলাফলটুকু আঁচ করার পর আমার মনে হয়েছে, বেঁচে থাকার অর্থ কী? সত্যিই কি আমার, কিংবা আপনার, বেঁচে থাকার কোনও মানে আছে? যথাযথ কারণ আছে কি কোনও?

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি এবং আমি ব্যর্থ। সেরা অপদার্থও যে, তাতেও কোনও সন্দেহ কি আর বাকি আছে? আপনি এখনও ভাবছেন? না, আমার ভাবাভাবির পালা শেষ। কিন্তু তবুও আর-একটা নির্বাচনের সমস্যায় পড়েছি আমি।

আমার সামনে এই মুহূর্তে একটা নাক বোঁচা পিস্তল, তার পাশে বিষের শিশি, আরও আছে। ফাঁস লাগানোর নাইলন-দড়ি, কিংবা কেরোসিনের টিন, এবং সব শেষে অতি ধারালো জাপানি ক্ষুর। জাপান শব্দটায় কি গৌরবময় হারাকিরির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আপনার?

সে যাই হোক, এখন আপনি বলুন, কোন অস্ত্রটা আমি নির্বাচন করি! হ্যাঁ, নিজের বিচারে আমি যখন সবচেয়ে ব্যর্থ ও অপদার্থ মানুষ, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী! অন্তত নির্বাচনের সংকট থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু মুক্তি কই? এই আপন্ন মুহূর্তেও আমি অস্ত্র নির্বাচনের ক্ষুরধার সমস্যায় পড়ে গেছি! নির্বাচনের পর হয়তো বুঝব আমার বিচারে গলদ থেকে গিয়েছিল। তাই আপনার সাহায্য চাইছি আমি।

বলুন, দয়া করে বলুন, পিস্তল, বিষ, দড়ি, কেরোসিন, না ক্ষুর–কোন অস্ত্রটা আমি বেছে নিই। এ কী নিবারণবাবু, আপনিও গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন? আমারই মতো আপনিও শেষ নির্বাচনের সমস্যায় পড়ে গেলেন?

কী বললেন? ঠিক একইরকম অস্ত্রাবলি এইভাবে সাজিয়ে বহুদিন ধরে একই সংকটে ডুবে আছেন আপনিও? পছন্দ-অপছন্দের ঝড়ঝাপটায় ঘুরপাক খাচ্ছেন অসহায়ের মতো!

তাহলে এখন আমি কার কাছে যাই! কে আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে এই সমস্যায়!

আচ্ছা আপনি, হ্যাঁ, আপনি যিনি এই সমস্যায় কথা এতক্ষণ ধরে পড়লেন। আপনি একটু সাহায্য করতে পারেন আমাকে? বলতে পারেন, কোন হাতিয়ারটা পছন্দ করি? পিস্তল, বিষ, দড়ি, কেরোসিন, না ক্ষুর?

প্লিজ, ব্যক্তিগত নির্বাচনে এটুকু সাহায্য আপনাকে করতেই হবে! বলা যায় না, এই নির্বাচন হয়তো একদিন আপনার নিজেরও কাজে লাগবে। এতএব দয়া করে

বলবেন কি, পিস্তল, বিষ, দ—

# শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

♡ করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

সমস্ত বই গুলি টেলিগ্রামে পাবেন। অন্যান্য বিভিন্ন নতুন বই পেতে আমাদের গ্রুপে Volunteer হিসেবে যোগদান করুন। এগিয়ে আসুন যাতে আরও বই তৈরীতে সাহায্য করা যায়।